# গান্ধীজীর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করুন

## গঠনকর্মই তাঁহার যোগ্য স্মৃতিস্তম্ভ

*

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশ জাতীয় সপ্তাহ পালন করিয়া আসিতেছে। এই জাতীয় সপ্তাহেই গান্ধীজী জনসাধারণের অধিকার ও আত্মসম্মান উপলব্ধির জন্য এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করেন। আজ স্বাধীনতা পাওয়া গিয়াছে। কাজেই এই বৎসর জাতীয় সপ্তাহ পালনের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বর্তমানে দেশের সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য হইবে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং গান্ধী জাতীয় স্মৃতি তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা। এই তহবিলের অর্থ প্রধানতঃ ব্যয়িত হইবে জাতির পিতার আরব্ধ গঠনমূলক কর্মপন্থা পরিচালনার জন্য। এই কার্যই হইবে মহাত্মাজীর উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ।

—রাজেন্দ্রপ্রসাদ

* * * * *

অস্পৃশ্যতা একটি পাপ। ইহার অভিশাপে আমাদের লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা মনুষ্যেতর পর্যায়ে পড়িয়া রহিয়াছে। মহাত্মাজী হরিজনদের ভালবাসিতেন এবং নিজেকেও হরিজন বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাহাদের জন্য অনেক সময় তিনি ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন।

---

**গান্ধী-স্মৃতি-ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহে, হরিজন-উন্নয়নে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আত্মনিয়োগ**

কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ ব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।"

—সামাজিক প্রবন্ধ

অপিচ—"আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই ভাবটি মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব সুদ্ধ ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজির ব্যবহার না করিয়া হিন্দীতে কথোপকথন করাই ভালো।" —সামাজিক প্রবন্ধ।

দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ় করিবার আশায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত সন্তান ভূদেব বহুদূরে যাইতে রাজি ছিলেন।

"ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বণিক প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশনির্বিশেষে আপনাপন বর্ণ মধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত-সমাজ দৃঢ় সম্বন্ধ এবং হিন্দী ভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে, এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়।" —সামাজিক প্রবন্ধ।

ভূদেবের এই অভিমত কেবল চিন্তায় পর্যবসিত ছিল না, সাধ্যানুসারে কাজে রূপান্তরিত করিতেও তিনি পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার জীবনী লেখক বলিতেছেন যে,—"তিনি বিহারে দীর্ঘকাল স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। এই অঞ্চলে হিন্দীর প্রসারকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তিনি নানাস্থানে বহু আদর্শ হিন্দী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দী বিদ্যালয়ের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ (ভূদেবের মতে ১০।১৫ গুণ) বর্ধিত হয়। হিন্দী পুস্তকাদি প্রণয়ন ব্যাপারেও ভূদেবের কৃতিত্ব কম নহে। তিনি ইংরাজি পুস্তকের পরিবর্তে অনেক উৎকৃষ্ট বাঙলা পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে বিহারের আদালত সমূহে ফার্সির পরিবর্তে হিন্দী প্রবর্তিত হয়।" ভূদেবের নিজের মতে তাঁহার জীবনের "ক্ষুদ্র কর্মগুলির" মধ্যে এইটি সর্বপ্রধান। বিহার-বাসীরাও ভূদেবের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অচেতন ছিলেন না। ভূদেবের গুণকীর্তন করিয়া তখন একাধিক হিন্দী গান লিখিত হইয়াছিল। একটির কিয়দংশ প্রদত্ত হইলঃ—

"ধন্য ধন্য গভর্নমেন্ট। পরজা সুখদায়ী।
জামনীকে * দূর করী। নাগরী চলাই॥
"[illegible]ব" করি পুকার। লাট নিকট জাই।
প[illegible]খ দূর করহ। জামনী দূরাই॥"

[illegible]ক বাঙলা দেশ ভূদেবের জীবনের এই [illegible]ম কীর্তিটিকে ভুলিয়াছে, কারণ আধুনিক বাঙলা দেশ মনে মনে প্রাদেশিকতায় বিশ্বাসী। [illegible] সভায় সমিতিতে এখনও "জনগণ" গানটি গীত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ আমাদের সভার বিষয়, ঘরের বিষয় নয়, মনের বিষয় তো নয়ই। আধুনিক বাঙালীর কাছে [illegible] দেশ ভারতবর্ষের চেয়েও বৃহত্তর, সেই [illegible] এক শ্রেণীর সৌখীন বেকার এবং দায়িত্বহীন সভাসদদের ব্যক্তি বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্র[illegible]রিবার আবদার ধরিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী[illegible]সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার যে লড়া[illegible]তেছে, ইঁহারা সেই সৈন্য বাহিনীর "কা[illegible]লায়ার।" ভূদেব বিস্মৃতপ্রায়। আরও বিপর্যয়, প্রলয় প্লাবনের জল প্রচণ্ড বেগে [illegible] আসিতেছে। [illegible] [illegible]রিবার সময়ও বাকি গত। সে যুগের [illegible] মাথা একে একে ডুবিয়া যাইবে, তখন [illegible]র রিক্তপটের উপরে আবার হয়তো [illegible]শিল্পীর তুলি চলিতে থাকিবে।

* [illegible]বনিক ভাষা

## বিশ্বাস করুন আর নাই করুন

## এপার ওপার

ক্যানাডায় একদা ডিয়নদের পাঁচটি কন্যা একসঙ্গে হয়েছিল। সংবাদটা তখন অনেকেই বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু এখন প্রমাণ উপেক্ষা করতে না পেরে সকলেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু তার চেয়েও অবিশ্বাস্য একটি খবর এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার সুদূর পেরু থেকে। খবরটি অবশ্য পুরাতন কিন্তু নতুন করে জানা গেছে। পেরুর রাজধানী লিমা শহরে ১৯৩৯ সালে লিনা মেডিনা নামে একটি বালিকার একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বালিকার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হবে এতে আর অবিশ্বাস করবার কি থাকতে পারে? থাকতে পারে বই কি! কারণ লিনা মেডিনার বয়স তখন ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর।

লিনা জন্মগ্রহণ করেছিল ১৯৩৩ সালে, বর্তমানে তার বয়স পনেরো চলছে। অত্যন্ত গরীব মা-বাপের সে অষ্টম সন্তান। যখন তার বয়স মাত্র পাঁচ তখন হঠাৎ তার দেহে গর্ভবতী নারীর লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে। তার কোনো অসুখ হয়েছে অথবা পেটে টিউমার হয়েছে এইরূপ অনুমান করে তার পিতামাতা তাকে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে লিনাকে ডক্টর জেরার্ডো লজাডার চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। তিনিও প্রথমে টিউমার সন্দেহ করেছিলেন কিন্তু কিছুদিন [illegible] সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়; বালিকাটি অন্তঃসত্ত্বা।

হাসপাতালের সীমানা অতিক্রম করে সংবাদপত্র মারফৎ খবরটি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। লিনাকে তার গ্রামের ছোট্ট হাসপাতাল থেকে রাজধানী লিমাতে আনা হয়, যাতে এই অদ্ভুত ব্যাপার সকল বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। অবশেষে ১৯৩৯ সনের ১৪ই মে তারিখে লিনা সকলের আশা আশঙ্কার সমাধান করে—এ পুত্রসন্তানের জন্ম দিলে। প্রসব অবশ্য সাধারণভাবে হয়নি, তার পেট চিরে যাকে "সিজারিয়ান অপারেশান" বলা হয় সেই অপারেশান করে তার প্রসব করানো হয়। প্রসবকালে লিনার ওজন ছিল ৬৭ পাউন্ড এবং সন্তানের ওজন ছিল ৬ পাউন্ড এবং [illegible]টি পূর্ণাঙ্গই হয়েছিল। ছেলেটির নাম হয় জেরার্ডো। লিনা কিন্তু জানতো না যে, সে মা হয়েছে এবং এ খবরও নাকি সে জানে না। সে জানে জেরার্ডো তার ভাই। জেরার্ডো ও তার মাকে হাসপাতালে খুব সাবধানে ও যত্নের সঙ্গে রাখা হয়।

[illegible] এখন টিকাপো শহরে তার মার দুজনার সঙ্গে লেখাপড়া করছে। তার ছেলের আট বৎসর। সে জানে লিনা তার [illegible]। অল্প কিছুদিন পূর্বে একজন মার্কিন সাংবাদিক লিনার গ্রাম পিস্কোতে যেয়ে লিনা ও জেরার্ডোকে দেখে এসেছেন। তিনি লজাডার সঙ্গেও দেখা করেছেন, কিন্তু [illegible] বাবা সাংবাদিকটির সঙ্গে দেখা করিতে হয়নি। কিন্তু জেরার্ডোর পিতা কে তাও জানা যায় নি।

লিনা ও তার ছেলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

আফগানিস্থানের অফিসার যদি কবি পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পীর হয়েও ভা বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন ি চাকা ফাটল, আর এঞ্জিন সর্দারজীর গোসা করে দুবার গুম হলেন। চাকা হ্যাণ্ডিল্যাম তদারক করলেন সর্দারজী। মেহদি প্রলেপ লাগিয়ে বিবিজানের কদম মেরামত করা হল, কিন্তু তাঁর মুখ জো জন্য স্বয়ং সর্দারজীকে ওড়না তুলে কাকুতিমিনতি করতে হল। একবার চায় তিনি হ্যাণ্ডিল মারার ভয়ও দেখিয়ে- শেষটায় কোন সর্তে রফারফি হল, তার আমরা পাইনি বটে, কিন্তু হরেকরকম জে থেকে আন্দেজ পেলুম বিবিজান শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন।

জলালাবাদ পৌঁছবার কয়েক মাইলে তাঁর কোমরবন্ধ অথবা নীবিবন্ধ, কিম্বা— যাই বলুন ছিঁড়ে দু'টুকরো হল। তবর পেলুম সর্দারজীও রাতকাণা। যার কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোনবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, কার মত আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত। কাল সকালে সাতটায় আমরা আবার প্রস্থত হব।' আমিও ভাবলুম, যখন কবিগুরুই বলেছেন,

'নীবিবন্ধ খসিছে তোমার স্ফুরিছে'

তখন আর বাড়াবাড়ি করতে দেওয়া নয়। গাড়িসুদ্ধ সকলেই মুসলমান—পরমানি বটে।

আধ মাইলটাক দূরে আফগানসরাই বেতার সাহেব ও আমি আস্তে আস্তে দিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকী অনেকে হৈ-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল। বুঝলুম, এদেশেও বাস-চড়ার পর সাদা কালিতে কাবিন-নামার লিখে দিতে হয়, 'বিবিজানের খুশীগমীতে তাহাকে স্বহস্তে স্বস্কন্ধে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে রাজি

চালিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।'

সরাই তো নয়, ভীষণ দুশমনের মত দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। কর্মঅন্তে নিভৃত পান্থশালাতে বলতে আমাদের চোখে যে স্নিগ্ধতার ছবি ফুটে ওঠে এর সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই। ত্রিশ ফুট উঁচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা—তার ভেতর দিয়ে উট, বাস, ডবল ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভেতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরুতে হবে না।

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কত শত শতাব্দীর উট-খচ্চর-গাধা-ঘোড়ার পুঞ্জীভূত মলমূত্রের দুর্গন্ধ আমাকে ধাক্কা মেরেছিল বলতে পারিনে, কিন্তু মনে হল আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পেছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কি বুঝতে অবশ্য বেশী সময় লাগল না। এলাকাটা মৌসুমী হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না—যথেষ্ট উঁচু নয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা ঝরণা নেই বলে ধোওয়ামোছার জন্য জলের বাজে খরচার কথাও ওঠে না। অতএব সিকন্দর-শাহী বাদশাহীরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যে সব অবদান রেখে গিয়েছে, তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব; ইচ্ছে করলে চামচ দিয়ে কুরে কুরে তোলা যায়। চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল, মাত্র একদিকে একখানা দরজা, বাইরের হাওয়া তারি সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়, অন্যদিকে বেরুবার পথ নেই দেখে ঐ জালিয়ান-ওয়ালাবাগে আর ঢোকে না। সূচীভেদ্য অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সূচীভেদ্য দুর্গন্ধ শুঁকলুম।

দুর্গপ্রাকারকে পেছনের দেয়ালস্বরূপ

বন্ধ—সামনের চত্বরের দিক খো ওয়ালা সরাইয়ের মালিকের সঙ্গে করে আমাদের জন্য একটা খোপ আমার জন্য একখানা দড়ির চার করা হল। খোপের সামনের বারান্দা, চারপাই সেখানে পাতা ভিতর একবার এক লহমার তরে মানুষের কত কুবুদ্ধিই না হয়। স্মেলিং সল্টে যার ভিরমি কাটে মিনিট সেখানে রাখলে আর দেখ

কেরোসিন কুপির ক্ষীণ আ আপন আপন জানোয়ারের তদার যদি তাড়া খেয়ে পিছু হটতে তবে খচ্চরের পাল চীৎকার করে বারান্দায় ওঠে আর কি। মোট লাইট জ্বালিয়ে রাবিবোসের স্থান করে, তবে বাদবাকি জানোয়ার ভর দিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করে আবার চীৎকার করে আপন আ খুঁজতে বেরোয়। বিচুলি রুটির দোকানে দর-কষাকষি, মো হাতুড়ি পেটা, মোরগ জবাইয়ের পাশের খোপের বারান্দায় খান ডাকানি। তাঁর নাসিকা আর মাঝখানে তফাৎ ছয় ইঞ্চি। শিথ উপায় নেই—পা তাহলে পশ্চিম মুখ উটের লেজের চামর বাজন উট যদি পিছু হটতে আরম্ভ হয় না হয় বলা কিছু কঠিন নয় মত পবিত্র জিনিসেও প্রপাতস্ন নেই।

তবে একথা ঠিক, দুর্গন্ধ ও করে কেউ যদি সরাইয়ে জ্ঞান আড্ডার সন্ধানে একটা চক্কর লাগ নিরাশ হতে হবে না। ফিরিস্তিমাফিক সব জাত সব তার উপরে গুটিকয়েক সাধুসজ্জ হজ-যাত্রী—পায়ে চলে মক্কা পৌঁছ ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়েছেন। মুখে কোন ক্লান্তির চিহ্ন নেই; চলেন অতি মন্দগতিতে এবং গা বাঁচাবার কায়দাটা এরা ফ্রন্টিয়া নিয়েছেন। সম্বল-সামর্থ্য এ নেই—উপরে আল্লার মর্জি ও এই দুইই তাদের নির্ভর।

অনৈসর্গিক পাপের আড আছে—কিন্তু সেগুলো ফিরিস্তি জিম্মাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সেই সাত সকালে পেশাওয়ারে খেয়ে বেরিয়েছিলুম, তারপর পে

নিয়েছিল। কিন্তু চতুর্দিকের নোংরামিতে এমনি গা ঘিন ঘিন করছিল যে, কোন কিছু গিলবার আর প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের আধিক্যেতায় নিজের উপর বিরক্তিও ধরছিল; 'আরে বাপু, আর পাঁচজন যখন দিব্য নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমুচ্ছে, তখন তুমিই বা এমন কোন নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি যে, তোমার স্নান না হলে চলে না, মাত্র দু'হাজার বছরের জমানো গন্ধে তুমি ভিরমি যাও। তবু তো জানোয়ার গুলো ছাড়রে, তুমি বারান্দায় শুয়ে! মা জননী মেরী সরাইয়েও জায়গা পান নি বলে শেষটায় গাধা-খচ্চরের মাঝখানে প্রভু যীশুর জন্ম দেন নি? ছবিতে অবশ্য সায়েবসুবোরা যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে সব কিছু এঁকেছেন, কিন্তু শাকে ঢাকা পড়ে কটা মাছ?

বেৎলেহেমের সরাইয়ে আর আফগানিস্থানের সরাইয়ে কি তফাৎ? বেৎলেহেমেও বৃষ্টি হয় তিন ফোঁটা আর বরফ পড়ে আড়াই তোলা। কে বললে তোমায় ইহুদি আফগানের চেয়ে পরিষ্কার? আফগানিস্থানের গন্ধে তোমার গা বিড়োচ্ছে, কিন্তু ইহুদির গায়ের গন্ধে বোকা পাঁঠা পর্যন্ত লাফ দিয়ে দরমা ফুটো করে প্রাণ বাঁচায়।

এসব হল তত্ত্বজ্ঞানের কথা। কিন্তু মানুষের মনের ভেতর যে রকম গীতাপাঠ হয়, সে রকম বেয়াড়া দুর্যোধনও সেখানে বসে। তার শুধু এক উত্তর, 'জানামি ধর্মং, ন চ প্রবৃত্তির্মে' অর্থাৎ 'তত্ত্ব কথা আর নূতন শোনাচ্ছ কি, কিন্তু ও সবে আমার প্রবৃত্তি নেই।' তার উপর আমার বেয়াড়া মনের হাতে আরেকখানা খাসা উত্তরও ছিল। 'সর্দারজী ও বনেটবাসিনীতে যদি সাঁঝের ঝোঁকে চলাচলি আরম্ভ না হ'ত, তবে অনেকখানি আগেই জলালাবাদের সরকারী ডাক-বাঙলোয় পৌঁছে সেখানে তোমাতে-আমাতে স্নানাহার করে এতক্ষণে নরগিস ফুলের বিছানায়, চিনার গাছের দোদুল হাওয়ায় মনের হারিয়ে নিদ্রে যেতুম না?'

বেয়াড়া মন কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান রাখে—না হলে বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে এক ঘরে সারাজীবন কাটায় কি করে? ফিস ফিস করে তর্কও জুড়ে দিয়ে বলল,

'মা মেরী ও যীশুর যে গল্প বললে সে হ'ল বাইবেলি কেচ্ছা। মুসলমান শাস্ত্রে আছে, বিবি মরিয়ম (মেরী) খেজুর গাছের তলায় ইসা-মসীহকে প্রসব করেছিলেন।'

বিবেকবুদ্ধি—'সে কি কথা! ডিসেম্বরের শীতে মা মেরী গেলেন গাছতলায়?'

বেয়াড়া মন—'কেন বাপু, তোমার বাইবেলেই তো রয়েছে, প্রভু জন্মগ্রহণ করলে পর দেব-দূতেরা সেই সুসমাচার মাঠের মাঝখানে গিয়ে রাখাল ছেলেদের জানালেন। গয়লার ছেলে যদি শীতের রাত মাঠে কাটাতে পারে, তবে ছুতোরের বউই পারবে না কেন, শুনি? তার উপর গর্ভযন্ত্রণা—সর্বাঙ্গে তখন গল গল করে ঘাম ছোটে।'

ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি আমি আদপেই পছন্দ করিনে। দুজনকে দুই ধমক দিয়ে চোখ বন্ধ করলুম।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে চল্লিশ পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা প্রহরী শিখর ছিল। সেখান থেকে হঠাৎ এক হুঙ্কার ধ্বনি নির্গত হয়ে আমার তন্দ্রাভঙ্গ করল। শিখরের চূড়া থেকে সরাই-ওয়ালা চেঁচিয়ে বলছিল, সরাই যদি রাত্রিকালে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে হে যাত্রিদল, আপন আপন মাল-জান বাঁচাবার জিম্মাদারী তোমাদের নিজের।'

ঐটুকুই বাকি ছিল। সরাইয়ের সব কষ্ট চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিয়েছিলুম ঐ জান-টুকু বাঁচাবার আশায়। সরাইওয়ালা সেই জিম্মাদারীটুকুও আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ায় যখন আর কোনো ভরসা কোনো দিকে রইল না তখন আমার মনে এক অদ্ভুত শান্তি আর সাহস দেখা দিল। উর্দুতে বলে, 'নঙ্গেসে খুদাভী ডরতে হ্যায়' অর্থাৎ 'উলঙ্গকে ভগবান পর্যন্ত সমঝে চলেন। সোজা বাঙলায় প্রবাদটা সামান্য অন্যরূপ নিয়ে অল্প একটু গীতিরসে ভেজা হয়ে বেরিয়েছে, 'সমুদ্রে শয়ন যার কি ভয় শিশিরে।'

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার মনে তখন আরো একটু খটকা লাগল। রেডিয়োওয়ালার চোস্ত ফার্সী জানার কথা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম,

ঐ যে সরাইওয়ালা বলল মাল-জানের তদারক আপন আপন কাঁধে এ কথাটা আমার কানে কেমনতরো নূতন ঠেকলো। সমাসটা কি জান-মাল নয়?'

অন্ধকারে রেডিয়োওয়ালার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই তার অনেকটা বেতারবার্তার মত কানে এসে পৌঁছল। বল্লেন,

'ইরানদেশের ফার্সীতে বলে, 'জান-মাল' কিন্তু আফগানিস্থানে জান সস্তা, মালের দাম ঢের বেশী। তাই বলে মাল-জান।'

আমি বললুম, 'তাই বোধ করি হবে। ভারতবর্ষেও প্রাণ বেজায় সস্তা—তাই আমরাও বলি, 'ধন প্রাণে মেরো না।' 'প্রাণে-ধনে মেরোনা' কথাটা কখনো শুনিনি।'

আমাতে বেতারওয়ালাতে তখন একটা ছোটখাটো "রেনট্রাণ্ট" বানিয়ে বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'ফ্রণ্টিয়ারের ওপারে তো শুনেছি জীবন পদে পদে বিশেষ বিপন্ন হয় না। তবে আপনার মুখে এরকম কথা কেন?'

আমি বললুম, 'বুলেট ছাড়া অন্য নানা-কায়দায়ও তো মানুষ মরতে পারে। জ্বর আছে, কলেরা আছে, সান্নিপাতিক আছে, আর না খেয়ে মরার রাজকীয় পন্থা তো বারমাসই খোলা সে পথ ধরলে দু-দণ্ড জিরোবার ...নুন, আর হাসপাতালই বলুন ... ...লাই নেই।'

...বাণী হ'ল, 'না খেয়ে মরতে ... আমাদ... ...ভূমির এক অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। অজরাম... করে রাখার নিঃস্বার্থ প্র... নামান্তর "হোয়াইটমেনস বার্ডেন।" ... আফগানরা প্রাচ্যভূমির ছোটজাত বলে ... মোট নিজেই বইবার চেষ্টা করে। সাধা... এই মোট নিয়ে প্রথম কাড়াকাড়ি লাগায় ... প্রা' মিশনরীরা, তাই আফগানিস্থানে ... ঢোকা কড়া বারণ। কোনো অবস্থাতেই ... মিশনরীকে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না। ... ...র পরে আসে ইংরেজ। তাদেরো ... ...তপক্ষে ঢুকতে দিই না ব্রিটিশ রাজ... ...দের জন্য যে ক'জন ইংরেজের নি... ...য়োজন তাদেরি আমরা বড় অনিচ্ছায় বর... ...ছি।'

এই দুটি খবর আমার কর্ণকুহরে ম... ...লিখিত দুই সুসমাচারের ন্যায় মধু... ...ল। গুলিস্তান, বোস্তানের খুশবাই ...র দুর্গন্ধ মেরে ফেলে আমার চোখে গো... ...র মোলায়েম তন্দ্রা এনে দিল।

...জিন্দাবাদ আফগানিস্থান!' না হয় থা... ...ক লাফ ছারপোকা সে দেশের চারপা... ...র সঙ্গে জিন্দা হয়ে।

( ১০ )

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল আজান শুনে। ... ...জান মুয়াজ্জিন এক পুস্তীন ...দ ...র আরবী উচ্চারণ শুনে বিস্ময় মা... ...গানিস্থানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে ...বির। বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা ক... ...বললেন, "আপনি নিজেই জি... করুন।" আমি বললুম, কিছু ...ন... কা" আমার এই সঙ্কোচে তিনি ... আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস ... দেশেচেনা অজানা লোককে যে কোনো ... জিজ্ঞেস করতে বাধা নেই। পরে জানলুম ...বরান্দেশে কৌতূহল দেখানো হয় সে ... ...ভদ্রতাই হয়।

...রে বসে তারি খেই তুলে নিয়ে অ... রাত্রের অভিজ্ঞতার জমা খরচ নিতে লাগ...

...'ইষ্টার্ণ' পান্থশালা, আফগানসরা... পান্থ। সরাইয়ের আরাম ধ্যারাম তো ... হলো 'ইষ্টার্ণ', গ্র্যাণ্ডেরও খবর কিছু ... জানা চ।

...স না পড়েও চোখে পড়ে যে ... গরীবাটেল ধনী। কিন্তু প্রশ্ন তাই দি... সব প্রকার অর্থ করা যায়? সরাইয়েও অ্যাণ্টোমন সদাগর ছিলেন যারা অন... গ্রেট ইস্টার্নের সুইট নিতে পারেন। ... সঙ্গে দাপাচারী হয়েছে। গ্রেট ইস্ট... বড় সুন্দরও কিছু কিছু চিনি।

কিন্তু আচার ব্যবহারে কি ভয়ঙ্কর তফাৎ। এই আটজন ধনী সদাগর ইচ্ছে করলেই একত্র হয়ে উত্তম খানা পিনা জুয়োয় দুশো চারশো টাকা এদিক ওদিকে ছড়িয়ে দিয়ে রাত কাটাতে পারতেন। চাকর-বাকর সন্ত্রস্ত হয়ে হুজুরদের হুকুম তামিল করত—সরাইয়ের ভিখিরি ফকিরদের তো ঠেকিয়ে রাখতই সাধুসজ্জনদের সঙ্গেও এঁদের কোনো যোগাযোগ হত না।

পৃথক হয়ে আপন আপন দ্বিরদরদস্তম্ভে এঁরা তো বসে থাকলেনই না—আটজনে মিলে "খানদানী" গোশও এঁরা পাকালেন না। নিজ নিজ পণ্যবাহিনীর ধনী গরীব আর পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের দহরমমহরম আগের থেকে তো ছিলই, তার উপরে সরাইয়ে আসন পেতে জিরিয়ে জুরিয়ে নেওয়ার পর আরো পাঁচজনের তত্ত্বতাবাশ করতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে হরেক রকমের আড্ডা জমে উঠল; ধনী গরীবের পার্থক্য জামা কাপড়ে টিকে থাকল বটে; কিন্তু কথাবার্তায় সে সব তফাৎ রইল না। দু চারটে মো-সাহেব ইয়েসমেন ছিল সন্দেহ নেই, তা সে গরীব আড্ডা সর্দারেরও থাকে। ব্যবসা বাণিজ্য, তত্ত্বকথা, দেশ বিদেশের রাস্তাঘাট গিরিসঙ্কট ইংরেজ রুশের মন কষাকষি পাগলা উট কামড়ালে তার দাওয়াই, সর্দারজীর মাথার ছিট সব জিনিস নিয়েই আলোচনা হল। গরীব ধনী সকলেরই সকল রকম সমস্যা আড্ডার দয়ে মজে কখনো ডুবল কখন ভাসল; কিন্তু বাকচতুর গরীব ও ধনীর পোলাও কালিয়ার আশায় বেশরম নাঙ্গানাচ নাচল না।

ঝগড়া-কাজিয়াও আড্ডার চোখের সামনের চাতালে হচ্ছে। কথাবার্তার খোঁচাখুঁচিতে যতক্ষণ উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট ততক্ষণ আড্ডা সে সব দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না কিন্তু মারামারির পূর্বাভাস দেখা দিলেই কেউ না কেউ মধ্যস্থ হয়ে বখেড়া ফৈসালা করে দেয়। মনে পড়ল বায়স্কোপের ছবিঃ সেখানে দুই সায়েবে ঝগড়া লাগে, আর পাঁচজন হর্টোগিয়ে জায়গা করে দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ায়। দুইসায়েব তখন কোটখুলে ছুঁড়ে ফেলেন, আর সকলের দয়ার শরীর কোটটাকে ধুলোয় গড়াতে দেন না, লুফে নেন। তারপর শুরু হয় ঘুষোঘুষি, রক্তারক্তি। পাঁচজন বিনাটিকেটে তামাশা দেখে আর সমস্ত বর্বরতাটাকে অন্য লোকের নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নাম দিয়ে ক্ষীণ বিবেক দংশনে প্রলেপ লাগায়।

সরাইয়ে কারো কোনো নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নেই।' তাই পার্সোনাল ইডিয়সিংক্রসি, বা খেয়ালখুশির ছিট" নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না। অথবা বলতে পারেন সকলেই যে যার খুশী মত কাজ করে যাচ্ছে, আপনি আপত্তি জানাতে পারবেন না, আর আপনিও আপনার পছন্দমত যা খুশি করে যাবেন, কেউ বাধা দেবে না। হাতাহাতি না হলেই হল।

তাতে করে ভালো মন্দ দুইই হয়। একদিকে যেমন গরমধুলোক্ষা সত্ত্বেও মানুষ একে অন্যকে প্রচুর বরদাস্ত করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সকলেই সরাইয়ের কুটুরির চত্বর নির্মমভাবে নোংরা করে।

একদিকে নিবিড় সামাজিক জীবনযাত্রা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিকাশ। অর্থাৎ কম্যুনিটিসেন্স আছে কিন্তু সিভিকসেন্স নেই।

ভাবতে ভাবতে দেখি সরাইয়ে এক রাত্রি বাস করেই আমি আফগান তুর্কোমান সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছি। হুঁশিয়ার হয়ে ভিতরের দিকে তাকানো বন্ধ করলুম। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখব আর কি? সেই আগের দিনকার জনপদ বা জনশূন্য শিলাপর্বত।

সর্দারজীকে বললুম, রাত্রে যখন গা বিড়োচ্ছিল তখন একটু সুপারি পেলে বড় উপকার হত। কিন্তু সরাইয়ে পানের দোকান তো দেখলুম না।'

সর্দারজী বললেন, "পান কোথায় পাবেন, বাবু সাহেব। পেশাওয়ারেই শেষ পানের দোকান। তার পশ্চিমে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাকের কোথাও পান দেখিনি—পল্টনে ড্রাইভারি করার সময় এসব দেশ আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। পাঠানও তো পান খায় না। পেশাওয়ারের পানের দোকানের গাহক সব পাঞ্জাবী।"

তাই তো, মনে পড়ল
স্ট্রীটে হোটেলের গাড়ী
কাবুলীরা শহর রাঙ
আরো মনে পড়ল, দক্ষিণ
এমন কি খাসিয়া পাহাড়ে
হয়—যদিও এদের কেউই
তরিবৎ করে জিনিসটার
জানে না। তবে কি পান
কথাটা তো আর্য—কর্ণ
পান। তবে সুপারি? উঁহ
নয়। লক্ষ্ণৌয়ে বলে
সেগুলোও তো সংস্কৃত
পূর্ববঙ্গে গুয়া কথাটার
একটা সংস্কৃত রূপ আছে
তো কিছু সমাধান হয় না,
এসব উন্নাসিক আর্যভূ
গুবাক হঠাৎ পূর্ববঙ্গে
আশ্রয় নেবেন কেন? আ
মুসলমান সব মাঙ্গলিকেই
কিন্তু গৃহ্যসূত্রের
গুবাক? নাঃ। মনে তো
নিতান্তই অনার্যজনসুলভ
থেকে উড়িয়ে উড়িয়ে
পৌঁচেছে? সাধে বলি,
সভ্যতার মিলনভূমি।

ডিমোক্রেসি ডিমোক্রেসী
বেশী চেঁচামেচি করাতে
সাধক বলেছিলেন, তাহলে
ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষে
সবাই সমান। সেই গর
সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করল
কঠিন আসন ক্ষুধা তৃষ্ণা
ও আমার দুজনেরই ঘুম
তাঁর মাথা আমার কাঁধে ঢ
তখন শক্ত হয়ে বসে তাঁব
তারপর হঠাৎ এক জোর
নড়িয়ে জেগে উঠে তিনি
হয়ে বসছিলেন। তখন আ
সত্ত্বেও ভদ্রতার বেড়াভেঙে
কাঁধে জিরিয়ে নিচ্ছিল।

## সময়ের গান

**প্রভাকর সেন**

অগণ্য বিহ্বল চোখে ইতস্ততঃ ধূমল আগুনে
মৃত্যুর মুখের ছায়া হিমধূসরতা গেলে বুনে
রক্তের কলঙ্কক্লান্ত অসংখ্য ভাঙা তলোয়ার
পড়ে থাকে অন্ধকারে। সময়ের স্বাধীন জোয়ার

সেই অবসরে কোন আবছানীল পাহাড়ের পথে
অগ্নিমেঘে জেগে ওঠে, কিংবা কোন মোহন আলোতে
বিজন ঝর্ণার জলে হরিণের পাল নিয়ে আসে,
উত্তেজিত বাঘ চায় বাঘিনীরে, মহুয়া বাতাসে।

হয়তো সংস্কারমুক্ত সময়ের সেই অবস
নীলাকাশ আশ্বিনের আমন্ত্রণে বন্দরে
দিগ্বিজয়ী জাহাজেরা কমলারঙের পাল
জমায় অজ্ঞাত পাড়ি সিংহরঙা সমুদ্রে

রক্তের কলঙ্কক্লান্ত এখানের ম্লান অপ
হয়তো বা অন্য কোথা রামধনু মায়াব

(উপন্যাস)

( বারো )

সংসারের টুকিটাকি কাজকর্ম সেরে অনেক রাত্রে সন্ধ্যা যখন বিছানায় শুতে এলো তিনকড়ি তখন জেগে রয়েছে। চোখে-মুখে একটা বিরক্তির ভাব। সন্ধ্যার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে রূদ্ধ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,—

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'কোথায় আবার যাবো? দরকার ছিল!' সন্ধ্যা জবাব দিল।

'পাশের ঘরের লোকের সঙ্গে কি তোমার দরকার এত রাত্রে?'

'থাকতে পারে ত কত দরকার, প্রয়োজন আমার নয়, তোমার!'

'টাকা ধার করতে গিয়েছিলে? ওর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?'

'কিছুই না; পাশাপাশি থাকি, পরিচয় হয়েছে, এই পর্যন্ত!'

'ওর কথা আমায় ত কোনদিন বলনি!'

'বলার কোন কারণ ঘটেনি!'

'রাত্রে যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি—তখন তুমি যাও ওর ঘরে!'

'না।'

'আজ ত গিয়েছিলে—আমার ঘুম দেখে, অন্যান্য দিনও তুমি গিয়েছো, মিথ্যেবাদী' তিনকড়ি গলা চড়াল, 'এই কারণেই আজকাল তোমার চোখে মুখে খুশি উপচে পড়ছে, আমি যখন রোগে ভুগছি তখন তুমি অভিসারে যাও; তাই ইদানিং তোমার পয়সার অভাব নেই, টের পেয়েছি আমি কে তোমার সেই আত্মীয়, যে তোমাকে কাজ যোগাড় করে দিয়েছে!' তিনকড়ি হাঁফাচ্ছে! 'তোমার সঙ্গে বাজারের মেয়ের কি তফাৎ? পথে গিয়ে দাঁড়ালেই ত পার! রূপ আছে, যৌবন আছে, বিস্তর রোজগার করতে পারবে; বিশ্বাসঘাতক! বেশ্যা!'

দরজার খিল লাগিয়ে সন্ধ্যা শুয়ে পড়ল; হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা দিল নিবিয়ে। ঘুমন্ত টুনির গায়ের ওপর সযত্নে কাঁথাটা টেনে দিল। মাথার কাছে জানলাটা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, বাইরে হাওয়া থাকলে ঘরেও আসে প্রচুর; জানলা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছে। যেদিন হাওয়াটা বন্ধ থাকে—সেদিন মশার উৎপাতে ঘুমানো মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। কোন একদিন সন্ধ্যার একটা মশারি ছিল, অজস্র তালি লাগিয়ে লাগিয়ে সেটা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ঘুমিয়ে পড়ল।

তিনকড়ি জেগে রইল, ঘুম আসছে না তার; সমস্ত শরীরে মৃত্যুর মত অবসাদ ঘনিয়ে আসছে! যেন পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতা পর্যন্ত তার লোপ পেয়েছে; কি হয়েছে তার? সন্ধ্যাকে আর একবার জিজ্ঞেস করবার তার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওর প্রতি একটা অসহ্য ঘৃণা আর ঈর্ষা তার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। সাধ্য থাকলে প্রতিশোধ নিতে সে ছাড়ত না কোন রকমেই; তার অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যা যে ব্যভিচারে অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ে তিনকড়ির কোন সন্দেহ রইল না। তিনকড়ি পাশের ঘরের ঐ চরিত্রহীন লোকটির আলিঙ্গনে সন্ধ্যাকে কল্পনা করে যতই অস্থির হয়ে উঠল, ততই নিজেকে বিশেষ করে অসুস্থ বোধ করতে লাগল। হয়ত অতদূর অগ্রসর হয়নি এখনও, মনকে সে প্রবোধ দিল, হিন্দু ভদ্র মেয়ের পক্ষে এতখানি সাহস কি হবে? সন্ধ্যা অবশ্য কোন দিন তার অভাব আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়নি, সে যে অসুখী ছিল এটা কোন দিন প্রকাশ পায়নি তার কথায় বা ব্যবহারে, বিনা কারণে সে কি তাকে ত্যাগ করতে পারে? পারে না, হয়ত পারে, কেনই বা পারবে না? যে মেয়েকে তুমি জীবনে দিতে পারলে না স্বাচ্ছন্দ্য, উপযুক্ত আহার, ভদ্রোচিত বাসযোগ্য স্থান তোমার প্রতি তার অনুরাগ যদি আজীবন অটুট না থাকে, তুমি তাকে কেমন করে দায়ী করতে পার? নিজের দারিদ্র্য এবং অক্ষমতাকে সে ধিক্কার না দিয়ে পারল না, কিন্তু সন্ধ্যা তাকে নিজের কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ দিল কই? সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী-কন্যার দায়িত্ব সে ত নিয়েছিল অম্লান বদনে, কোন দিন সে ত তাদের অবহেলা বা অযত্ন করেনি। সন্ধ্যাকে সে ত ভালবেসেছিল। কেন সে তার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে লোকটার এমন কি অর্থ বা আকর্ষণ থাকতে পারে—যার তুলনায় তাদের এতদিনের সাংসারিক জীবনযাত্রা ব্যর্থ হয়ে

বাস্তবিক সন্ধ্যার হয়ত কোন অপরাধ
তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে লোকটা
ভুলিয়াছে। ওকে সে চেনে, দেখেছেও ব
কিন্তু কোন দিন সন্দেহের অবকাশ ঘ
কখন যে তার সঙ্গে সন্ধ্যার পরিচয়
ঘনিষ্ঠতা হল এটা সে ঘুণাক্ষরেও টের প
বাস্তবিকই যদি সাধারণ আলাপের মধ্যে
পাপ না থাকে, তা হলে সন্ধ্যা বে
লোকটির কথা তাকে বলেনি কেন? ইচ্ছে
তিনকড়ির কাছে সে এটা গোপন রেখেছে

তিনকড়ি সন্ধ্যার গভীর নিঃশ্বাস প
শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে! পরম নিশ্চি
না হলে এমন করে কেউ ঘুমোতে পা
হয়ত সেই সুদর্শন যুবকের কঠিন আ
সন্ধ্যা পরম তৃপ্তি লাভ করেছে; যা কে
তিনকড়ির কাছে সে পায়নি। নিঃশব্দে
ওর আদর উপভোগ করছে, তিনকড়ির ম
দুটি স্ত্রী-পুরুষের নিবিড় প্রণয়ের ছবি
হয়ে উঠল। বেদনা এবং ঈর্ষায় তার
মধ্যে মোচড়াতে লাগল। এই সময়েই কি
অসুস্থ হয়ে পড়ল। যদি সে কোনরকমে
পারত বিছানা ছেড়ে!

ভোরের দিকে ক্লান্তিতে তার উ
কতক শান্ত হয়ে এল, ঘুমিয়ে পড়ল সে

সন্ধ্যার যখন ঘুম ভাঙল রীতিমত
হয়ে গেছে! এক প্রহর রাত থাকতে না
পারলে নানা রকম অসুবিধে, কলতলায়
থাকে ভিড়, স্নান সারবার সুবিধে পা
উনুনে আঁচ একটু দেরী করে দিলেই চ
কেননা, তিনকড়ির অফিসে বেরোবার
নেই। তাকাল সে শায়িত তিনকড়ির
ঘুমোচ্ছে! কে জানে! হয়ত উঠে বসবে;
অন্যে লাগাবে তাড়া; গত রাত্রির
কাহিনীটা হয়ত উপন্যাসের উত্তেজক
পরিচ্ছেদ মাত্র!

স্নান সেরে সে পড়তে বসল; যদি
কয়েকটা মাস আগে সে পড়াটা আরম্ভ
তা হলে এ বছরেই পরীক্ষাটা দিয়ে
পারত! সুরমার কাছে প্রতিদিন পাঠ
সে উপদেশ নেয়। দ্রুতগতিতে এগিয়ে
সন্ধ্যা,—পাখী যেমন স্বচ্ছন্দগতিতে
যায় আকাশে, পাখী ভুলে যায় তা
সন্ধ্যাকে ভুললে চলবে না। ভাববার সময়
একদিন আসবে!

তিনকড়ি চোখ মেলে তাকাল তার
নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে, বিবর্ণ তার মুখ। ম
কখন সে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে!

সন্ধ্যা বই বন্ধ করে এগিয়ে এল
শয্যাপার্শ্বে। মশারি খুলে গুটিয়ে রাখল
দিয়ে বিছানার চাদরটা দিল টান

বালিশটা ঠিক করে দিল। 'জল নিয়ে আসি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তুলে দাও!' বলল তিনকড়ি।

'পারবে?'

জানাল সে পারবে।

সন্ধ্যা তাকে আস্তে আস্তে তুলে দিল, পা নামিয়ে দিল নীচে।

তিনকড়ি চেষ্টা করল, দাঁড়াতে পারল না। কপালে তার ঘাম দেখা দিল।

সন্ধ্যা বিছানায় পা তুলে দিয়ে বলল, ওঠবার কি দরকার? তুমি চুপ করে শুয়ে থাক, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো!'

আপত্তি করে লাভ নেই, শুয়ে পড়ল সে। তারপর যে রমণীকে সে ভয়ংকর ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে—তারই সযত্ন এবং সন্তর্পণ পরিচর্যার ওপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিল।

অনেক কষ্টে সে গত রাত্রে একটি গোয়ালার সন্ধান করে আধ সের দুধ রোজ করেছে। তাই একবাটি গরম করে সন্ধ্যা যখন নিয়ে এল তিনকড়ি জিজ্ঞেস করল, 'দুধ কোত্থেকে?'

'কোত্থেকে আবার?' একটা গোয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি।'

'পয়সা?'

'পয়সা ত এখন দিতে হচ্ছে না, সেই মাস কাবারে!'

'পাবে কোথায়?'

'এখন ভেবে লাভ নেই,' সন্ধ্যা বলল, 'তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে ডাক্তার বলেছে দুধ প্রয়োজন।'

তর্ক করা বৃথা, তিনকড়ি জানে সন্ধ্যা ধরা দেবে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পরের পয়সায় তাকে দুধও খেতে হবে স্বাস্থ্যের জন্যে।

'অন্যের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে দুধ আমায় না-ই খাওয়ালে।' না বলে তিনকড়ি পারল না।

'অন্যের পয়সা মানে? কার পয়সা এত সস্তা যে আমার সংসার চালাবে?'

'মেয়েদের পয়সা দিতে কোন পুরুষের আটকায় না, বিশেষ করে সে-মেয়ে যদি সতীত্বের ধার না ধারে!'

'কি বকছ পাগলের মত?' সন্ধ্যা তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমার মাথাও শেষকালে খারাপ হল নাকি?'

'না হয়নি এখনও, তবে শিগ্গিরই হবে, তা হলে তুমি ত বেঁচে যাও!'

ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে বাস্তবিক সন্দিহান হল। বলল, 'তুমি ত এমন কোনদিন ছিলে না; আমাদের মধ্যে কি এমন ঘটল যার জন্যে প্রতি মুহূর্তে তুমি আমায় সন্দেহ না করে পারছ না?'

'ওসব মন ভোলানো কথা মেয়েরা খুব বলতে পারে—এটা কি আমি জানিনা? আমি অপদার্থ, অকর্মণ্য, পঙ্গু; আমাকে দিয়ে তোমার কোন প্রয়োজনই ত মিটবে না। তোমারও বয়স অল্প, কারুর ওপর যদি তোমার মন পড়ে, আমার কি করবার আছে? তোমাকে বেঁধে রাখবার আমার সামর্থ্য নেই, ছেলেমানুষ নয় যে শাসন করব!'

কিন্তু কি আমি সন্দেহের কাজ করেছি তাই বল না?' সন্ধ্যা শেষবার চেষ্টা করল।

'ঘরের বৌ এর চাইতে বেশি কি আর করতে পারে? চোখে না দেখলেও বুঝতে পারি না এমন বোকা যদি আমায় ভেবে থাক ত ভুল করেছো। তোমার চালচলন বহুদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করছিলাম, কিন্তু কাল রাত্রের পর তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আর আমার কোন ভুল নেই।

'কিন্তু আমি যদি বলি অন্যায় আমি কিছুই করিনি, তা হলে তুমি বিশ্বাস কর?'

'না।'

দুধের বাটিটা নামিয়ে রেখে সন্ধ্যা রান্নার যোগাড়ে গেল।

তিনকড়ি অফিস থেকে ফেরবার পথে বাজারটা নিয়ে আসত, কাল আনতে পারেনি; একটা দিন কোনরকমে যাবে চলে, কিন্তু কাল থেকে কি ব্যবস্থা হবে সেটা সন্ধ্যা এখনও স্থির করতে পারেনি। কি হবে? তাই ত! টুনি আর একটু বড় হলে তাকে পাঠানো চলত! তাকে বাজারটাই বা চিনিয়ে দেবে কে? সুবিনয়ের বাসন মাজে কে? সে নিজে নিশ্চয়ই নয়। ক্ষিপ্র পায়ে সে ওর খোঁজে গেল। সুবিনয় তখন দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, হাতে এক তাড়া কাগজপত্র!

'বলুন' সুবিনয় হাসিমুখে তাকাল তার দিকে।

'আপনি একটা ঝি রেখেছেন না?'

'তা রেখেছি, কিন্তু সে যে কখন আসে, তা ত জানি না। এসে দেখি রান্নার কাজটাও রেখে সেরে; আপত্তি করেছিলাম, ও শোনে নি। লোকটি ভারি ভাল, আপনার কাজের জন্য দরকার?'

'দরকার, যা দিতে হবে আমি দিয়ে দেবো। কখন আসে।'

'তা ত জানি না, আপনি দেখেন নি তাকে একদিনও?'

'না ত।'

'আশ্চর্য!'

সন্ধ্যা নিশ্চিন্ত বোধ করল।

সুবিনয় নিষ্ক্রান্ত হল।

মাঝে মাঝে সে বাইরে এসে দেখে ঝি এল কিনা।

অবশেষে পাওয়া গেল তাকে।

ব্যবস্থা করে ফেলল সন্ধ্যা। মাইনে সে যা দেবে তাতেই রাজি।

এমন ভোলা-মন সন্ধ্যা, তিনকড়ির মাইনের টাকাটার একটা ব্যবস্থা করবার বলতে হবে। হয়ত আস কিংবা একেবারে জেলে। এ নেই, সন্ধ্যা ভাবল, কেননা দে বেসেছে, দেশই সর্বস্ব।

বালতি করে জল নিয়ে এ জামাটা খুলে দিই, স্নান কর

'বিছানায় শুয়ে কি স্নান তিনকড়ি জিজ্ঞেস করল।

'উপায় কি বল? যতদিন ততদিন শুয়েই ত স্নান করতে তোল ত—জামাটা খুলে দিই বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল, এসেছে সে, খোলা চুল থেকে তিনকড়ির নাকে এল, চোখ বুজে পারত তার উষ্ণ দেহের স্পর্শ। গায় জামা দেয় না। আজও সম্ভব আঁচলটা সে জড়িয়ে রাখে বিশেষ করে যেন দেখতে পে দেহ, অনাবৃত বাহু, পরিপূর্ণ কখন তিনকড়ির জামাটা খুলে বুঝতে পারেনি, তার আচ্ছন্ন আসতে কয়েক মুহূর্ত লাগল সে সরিয়ে নিল সুকৌশলে। ফুটে উঠল একাগ্রতা, আর ম সে উপভোগ করল সন্ধ্যার পরি

ঘুমন্ত বেদনা তার গহন করে মোচড় দিয়ে উঠল। দ এক নিমেষে উঠল সচেতন হয়ে করল সে স্পর্শের মাদকতা, আকর্ষণ। এমন কিছু একট পৃথিবীতে সন্ধ্যার মত লক্ষ লা যারা রুগ্ন স্বামীর সেবা করে; কিছু নেই, বিশেষ কিছু নেই

স্নানের পর সন্ধ্যা ওর বস্ত্র দিল, তিনকড়ির একবার ইচ্ছে কিন্তু যেন স্পর্শটুকুর লোভ পারল না—যদিও সন্ধ্যার সম্প তাকে পীড়া দিল ভীষণভাবে।

খাবার নিয়ে এসে সে 'খাইয়ে দিই?'

'না, আমি পারব।'

চেষ্টা করল তিনকড়ি; খা সে ফেলল বিছানায়।

আবার চেষ্টা করল, এবারে মুখ ফিরিয়ে রইল তিনকড়ি। করতে লাগল নিঃশব্দে।

কয়েক মিনিট পরে সে য সন্ধ্যা দেখল তার চোখে জল।

'অসুখ করলে সুস্থ ক অপেক্ষা করতে হয়, এত অস্থি কেমন করে?'

প্রকৃত স্কার্ভিরোগ সকল ক্ষেত্রে না হলেও ভিটামিন সি-র অভাবহেতু শরীরের আরো অনেক রকমের হানি ঘটতে পারে। এ ধরণের হানি সকল রকম প্রাণীর হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে দেহ গঠনের কোষগুলিকে পরস্পর গায়ে গায়ে সংলগ্ন রাখার জন্য এই ভিটামিনের প্রয়োজন। সুতরাং কেবল মানুষ নয় ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সকল রকম জীবের শরীরেই এই ভিটামিনের প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ জীবের পক্ষেই এই সুবিধা আছে যে খাদ্যের ভিতর দিয়ে তাদের এই ভিটামিন সংগ্রহ করবার কোনো প্রয়োজন হয়না, তারা আপন শরীরের মধ্যেই এই ভিটামিন রাসায়নিক সংশ্লেষণের দ্বারা প্রস্তুত করে নিতে পারে। ইঁদুর কুকুর মুরগি হাঁস পাখিপক্ষী এবং কীটপতঙ্গ কারোই খাদ্যের সঙ্গে এই ভিটামিন গ্রহণ করবার আরো প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের শরীরের মধ্যে তা আপনা থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। খাদ্যের মারফতে এটি সংগ্রহ করে নেবার প্রয়োজন মাত্র তিন জাতীয় প্রাণীর—গিনিপিগ, বাঁদর, এবং মানুষের। খুব শৈশব অবস্থায় এরাও এই ভিটামিনটি কিছুদিনের জন্য নিজেদের দেহের মধ্যে প্রস্তুত করে নিতে পারে, কিন্তু তার পরে আর পারে না। মানবের শিশুর খাদ্যে ৫ মাস বয়স পর্যন্ত এই ভিটামিনের কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু ষষ্ঠ মাসে পড়বার পর থেকেই তাদের এই বস্তু খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করবার প্রয়োজন শুরু হয়ে যায়। অবশ্য মায়ের দুধেই কিছু সি ভিটামিন তারা পায়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সেটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট নাও হতে পারে।

শৈশবকালে অর্থাৎ ছয় মাস বয়স থেকে এই ভিটামিন খাদ্যের মধ্যে উপযুক্ত মাত্রাতে না পেলে শিশুদের দাঁতের স্বাভাবিক গঠনে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রথমত দাঁত উঠতে বিলম্ব হয় এবং উঠলেও তা স্বাভাবিক মতো সুগঠিত হয় না। বিশেষত দাঁতের এনামেল খুব শক্ত হয় না এবং ছেলেবেলাকার এই দোষটি পরে আর সংশোধিত না হয়ে চিরকালের জন্যই দাঁতগুলিতে তার চিহ্ন থেকে যায়। ভবিষ্যতে সেই সব দাঁত অকালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়।

শরীরে ভিটামিন সি-র ঘাটতি হলে মানুষের স্বাস্থ্যের নানারকম হানি ঘটে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রোগপ্রবণতা, যা আজকাল অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। বাস্তব পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এতে রক্তের সহজাত প্রতিরোধশক্তি অনেক কমে যায়। সুতরাং যে কোন সংক্রামক ব্যাধি অনায়াসেই তখন প্রবলভাবে আক্রমণ করতে পারে। বিশেষ করে চার রকম বয়সে চারটি নির্দিষ্ট প্রকারের রোগে এই কারণে আক্রান্ত হবার তখন খুবই সম্ভাবনা থাকে। তার মধ্যে একটি হলো ডিফথীরিয়া। এটি খুব অল্প বয়সের রোগ। অনুসন্ধান নিয়ে দেখা গেছে যে, ভিটামিন সির অভাবে যাদেরই শরীরে স্কার্ভির মতো কিছু কিছু লক্ষণ আছে, তাদের মধ্যেই প্রায় হয়ে থাকে ডিফথীরিয়া। আর যারাই খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর ভিটামিন সি খেতে পাচ্ছে তারাই সচরাচর এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। দ্বিতীয় রোগটি হলো রিউম্যাটিক ফিভার। এটিও সাধারণত অল্প বয়সের রোগ। ভিটামিন সি-র অভাব যাদের শরীরে আছে তাদের এই রোগের সংক্রমণ খুব সহজে ধরে। তৃতীয় রোগটি নিউমোনিয়া। এ কথা এখনকার চিকিৎসকেরাও বলেন যে, এই রোগ থেকে সহজে সেরে উঠতে ভিটামিন সি-র প্রয়োজন খুব বেশী। আর চতুর্থ রোগটি যক্ষ্মা। এই রোগে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন সি, দুই বস্তুরই অভাব ঘটতে দেখা যায়। সেই জন্য চিকিৎসকেরা এই রোগে আজকাল এই ভিটামিনটি খুবই প্রয়োগ করে থাকেন। এর দ্বারা রোগী আপন রোগটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার কিছু স্বাভাবিক শক্তি অর্জন করে। ভিটামিন সির অভাব প্রত্যক্ষভাবে এই রোগগুলির জন্য দায়ী না হলেও পরোক্ষভাবে তা এই সকল রোগের অনায়াস আক্রমণের সাহায্য করে। আর রোগ মাত্রেরই আক্রমণে শরীরস্থ ভিটামিন সি শীঘ্র শীঘ্র অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, সুতরাং তখন আরো অধিক মাত্রাতে ভিটামিন সি যোগান দেবার দরকার হয়। সেইজন্যই চিকিৎসকেরা নানা রকমের জ্বরে কমলালেবু ও অন্যান্য ফলের রস বেশি পরিমাণে খাবার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

ভিটামিন সির অল্প মাত্রই অভাব যদি হয়, তবে তাতেও মানুষের শরীরে তার কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাতে অকারণে দুর্বল বোধ হয়, স্বাভাবিক স্ফূর্তি কমে যায়, যখন তখন মাথা ধরে, মাংসপেশীতে অস্থিরতা দেখা দেয়, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে যায়, শরীরের ওজন কমতে থাকে। এ ছাড়া দাঁত খারাপ হয়, গাঁটে ব্যথা হয় এবং পড়ে গিয়ে হাড় ভেঙে গেলে সহজে তা জুড়তে চায় না।

আমাদের শরীর রক্ষার জন্য কতখানি ভিটামিন সি-র দৈনিক প্রয়োজন? এ-কথা বলতে গেলে আগে কতকগুলি বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে। এর প্রয়োজন সকল সময়ে আর সকল বয়সের পক্ষে সমান নয়। আর খাদ্যাদির সঙ্গে এই পদার্থটির যতটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ততটাই যে কাজে লাগে তাও নয়। তার খানিকটা প্রাত্যহিক পুষ্টির কাজে লাগে, খানিকটা অব্যবহারে মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, আর খানিকটা রক্ত রসাদির মধ্যে সঞ্চিত থেকে যায়। তার মধ্যে যেটুকু প্রকৃত কাজে লাগে, সেটুকু শীঘ্রই ফুরিয়ে যায়, তখন আবার নতুন সরবরাহ না হলেই সঞ্চয় থেকে টান পড়তে থাকে। এই নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা করেও দেখা হয়েছে। কয়েকজন সুস্থ স্ত্রীলোককে তাদের খাদ্যাদির মধ্যে খুব কম পরিমাণে অর্থাৎ মাত্র ৩০ মিলিগ্রাম করে ভিটামিন সি খেতে দেওয়া হয়েছিল। এই ধরণের খাদ্য খেতে খেতে চার সপ্তাহ পরেই দেখা গেল যে, তাদের দাঁতের গোড়া ফুলছে এবং শরীরে স্কার্ভির মতো কালশিটে পড়া প্রভৃতি বিশিষ্ট লক্ষণগুলি প্রকাশ পাচ্ছে। তখন অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড প্রয়োগ করাতে তাদের সেই সকল লক্ষণ দূর হলো।

সাধারণ সুস্থ মানুষের রক্তে প্রতি আউন্সে প্রায় অর্ধ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকার কথা এবং শরীরের অন্যান্য অংশে তারও অনেক বেশি পরিমাণে থাকার কথা। এর চেয়েও কম হলে তখন স্কার্ভির লক্ষণ দেখা দেবে। কিন্তু একমাত্র স্কার্ভি নিবারণ করাই স্বাস্থ্যরক্ষার আসল আদর্শ নয়। শরীরে এতটাই ভিটামিন সি থাকা দরকার যাতে আকস্মিক কোন রোগ-বালাই ঘটলেও সেটাকে তা সহ্য করে নিতে পারবে। প্রত্যহ ২৫ থেকে ৩০ মিলিগ্রাম করে খেতে পেলেই হয়তো স্কার্ভির সম্ভাবনা নিবারিত হয়ে যায়। কিন্তু বেশি পরিশ্রম করলে কিংবা শরীর কিছু অসুস্থ হলে কিংবা কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তখন এটি আরো অনেক বেশি দরকার। এইজন্য সকলেরই অন্ততপক্ষে দৈনিক ৫০ মিলিগ্রাম করে ভিটামিন সি গ্রহণ করা উচিত। এই ভিটামিন কম পরিমাণে খেলেই ক্ষতি, কিন্তু বেশি পরিমাণে খেলে কোন ক্ষতি নেই। যেটুকু বেশি হয়, সেটুকু নিয়মমতো মূত্রের সঙ্গে নির্গত হয়ে যায়। রোগের চিকিৎসাতে এর ৫০০ থেকে ৭০০ মিলিগ্রাম পর্যন্তও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

শিশুদের ও বালকবালিকাদের দাঁত ও হাড় গঠনের সময় কিছু বেশি দরকার। সুতরাং তাদের পক্ষে অন্তত ৩০ মিলিগ্রাম করে পাওয়া চাই। গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রীদের জন্য এই ভিটামিন সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। গর্ভবতীদের জন্য ৭৫ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত এবং স্তন্যদাত্রীদের জন্য ১০০ থেকে ১৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত সরবরাহের কথা বৈজ্ঞানিকেরা বলেন। অধিক বয়সেও এই ভিটামিন কিছু বেশি মাত্রাতে প্রয়োজন, নতুবা তাড়াতাড়ি বার্ধক্যের লক্ষণগুলি এসে পড়ে। এক মিলিগ্রাম অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডে মোট

কুড়ি ইউনিটের কাজ করে। অতএব এর সাধারণ মাত্রা যদি ৫০ মিলিগ্রাম হয়, তবে ইউনিট হিসাবে আমাদের প্রত্যহ খাওয়া উচিত ১০০০ ইউনিট। এক ফোঁটা তাজা লেবুর রসে যতটুকু ভিটামিন সি থাকে তাই হলো এক ইউনিটের সমান। এই বুঝে আন্দাজ করা যেতে পারে ১০০০ ইউনিটে কতটা দরকার।

ভিটামিন সি বা অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডের প্রকৃত স্বরূপ কি? এটি সাদা গুঁড়ার মতো একরূপ পদার্থ, জলে দ্রবনীয়, কিন্তু তেলে নয়। বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক খাদ্যের মধ্যেও এই ভিটামিন থাকে, আবার একপ্রকার চিনি থেকেও এটি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা যায়। এটি কিছু অম্লগুণবিশিষ্ট। অক্সিজেনের সংস্পর্শে ঘনিষ্ঠভাবে এলে এই ভিটামিন শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। সাক্ষাৎ অগ্নির উত্তাপ লাগিয়ে রন্ধনাদি করাতে সেইজন্যই ভিটামিন সি সহজে নষ্ট হয়। কিন্তু বাতাস বা অক্সিজেনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না এনে কোন বন্ধ পাত্রের মধ্যে কুকারে রান্নার মতো যদি বাষ্পের উত্তাপে খাদ্যাদি রান্না করা যায়, তাহলে কোন খাদ্যবস্তু থেকে এই ভিটামিন বিশেষ কিছুই নষ্ট হয় না। বাতাস সংস্পর্শ বাঁচিয়ে যদি একে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে রাখা যায় তাহলেও এর গুণ নষ্ট হয় না। বায়ুশূন্য করে কোন টিনের মধ্যে যদি এই ভিটামিনযুক্ত কোন খাদ্য উত্তমরূপে এঁটে রাখা যায়, তবে তাতেও এর গুণ নষ্ট হয় না। কিন্তু তামার পাত্রে রাঁধলে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। অল্ট্রা ভায়োলেট আলো অথবা রোদ লাগলেও এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি দুধের বোতলের গায়ে যদি রোদ লাগে, তবে সেই দুধের ভিটামিনটুকুও শীঘ্রই একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সকল প্রকারের ভিটামিনের মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা সহজে ক্ষয়শীল। প্রাণরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হলেও এর নিজস্ব প্রাণটুকু সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কোন্ প্রকার খাদ্যের মধ্যে স্বাভাবিক ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়? সাধারণত সকল রকমের শাকসব্জি ও ফলাদির মধ্যেই এই ভিটামিন অল্পবিস্তর পরিমাণে থাকে। কিন্তু তা কেবল সদ্য আহৃত উদ্ভিজ্জগুলির তাজা অবস্থায়। ঐ সকল জিনিস একটু বাসি হলেই তার ভিটামিনটুকু নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ভিটামিনকে যে খাদ্যপ্রাণ বলা হয়, এইখানেই তার সার্থকতা। টাটকা জিনিসেরই প্রাণ থাকে, বাসি জিনিসের নয়। শাকসব্জি প্রভৃতি যত টাটকা হয়, ততই তার মধ্যে এই খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ বেশী, যত বাসি হয়, ততই কম। এমন কি ছায়াতে রেখে বাতাস লেগেও যদি তা শুকিয়ে যায়, তবে তাতেওএই প্রাণটুকু বিনষ্ট হয়ে ভিটামিনের পরিমাণ কমে যায়। রন্ধন করলে তো সব নষ্ট হয়ে যাবেই। এই কথাটি আমাদের বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে। শাকসব্জি ও ফলাদি ছাড়া ভাত রুটি মাছ মাংস প্রভৃতি আর যা কিছু খাদ্য আমরা খাই, তার থেকে অন্যান্য সব রকমের পুষ্টি পেলেও ভিটামিন সি প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না, কেবল জীবজন্তুর মেটুলিতে ছাড়া। এটিও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

বিভিন্ন রকমের শাকসব্জি এবং ফলাদির মধ্যে ভিটামিন সি থাকলেও তার পরিমাণের অনেক তারতম্য আছে। কোনোটিতে বা থাকে বেশী, কোনোটিতে বা কম। সুতরাং কোন্ কোন্ বস্তুতে এই ভিটামিন বেশী পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে, সে কথাও আমাদের বেছে বেছে জেনে নিতে হবে।

ফলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভিটামিন সি থাকে লেবুতে। এই কথাই সকল দেশের বৈজ্ঞানিকরা বলে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশের একটি খুব সাধারণ ফলের মধ্যে লেবুর চেয়েও বেশী ভিটামিন সি আছে। সেটি আমলকী।

ভিটামিন সি অধিক মাত্রাতে এবং স্থায়ীভাবে ধারণ করা সম্বন্ধে আমলকীর গুণ অদ্বিতীয়। এর এই গুণটি অনুমানে উপলব্ধি করেই হয়তো বহু প্রাচীন কাল থেকে আমলকী আমাদের দেশের পৌরাণিক গ্রন্থে দেবতাদের প্রিয় ফল বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বনবাসী মুনিঋষিদের মধ্যে এই ফলটির নিত্য ব্যবহার ছিল। কথিত আছে যে, পার্বতী দেবীর অমল আনন্দাশ্রু থেকেই এর উৎপত্তি। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার ঔষধ এবং অনুপানরূপেও এর খুব ব্যবহার আছে। এখনকার দিনে যদিও এর তেমন আদর নেই, কিন্তু এর আশ্চর্য গুণের কথা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে যত বেশী পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, এমন আর বোধ হয় কোনো কিছুতেই নেই। কমলালেবুর চেয়েও এর ঐ ভিটামিন সম্পদ প্রায় কুড়ি গুণ বেশী। দুটি বড় বড় কমলালেবুর মধ্যে ভিটামিন সি যতটা আছে, একটি মাত্র সামান্য আমলকী ফলের মধ্যে প্রায় ততটাই থাকে। শুধু তাই নয়, এর তীব্র অম্লত্ব সেটিকে শীঘ্র নষ্ট হতে দেয় না। তা ছাড়া এর মধ্যে এমন রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থ আছে, যাতে আগুনের আঁচে সিদ্ধ হওয়া বা রোদে শুকিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এর ভিতরকার এই ভিটামিনটিকে অনেকটা অবিকৃত অবস্থাতেই রক্ষা করতে পারে। অথচ এমন অমূল্য জিনিস বনেবাদাড়ে অনাদরে যত্রতত্র রাশি রাশি ফলে, খুব সহজে আর খুব সস্তায় পাওয়া গেলেও কেউ এর সদ্ব্যবহার করতে জানে না। আমলকী যে কাঁচাই খেতে হবে, তার কোনো মানে নেই; একে শুকিয়ে ঘরে রেখেও ইচ্ছামতো অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। কেটে কেটে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখলে তাতেও এর গুণ বজায় থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এক তোলা ওজনের শুকনো আমলকী গুঁড়োর মধ্যে ১২০ মিলিগ্রাম থেকে ২০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন সি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কয়েক মাস পর্যন্ত ঘরে ফেলে রাখলেও তা নষ্ট হয় না। কাঁচা আমলকী গরম জলে একবার ধুয়ে নিয়ে যদি নুনের জলে ডুবিয়ে জারক করে রাখা যায়, তবে তা খেতেও মুখরোচক হয়, আর তার ভিটামিনটুকু প্রায় সমস্তই বজায় থাকে। লেবুকেও আমরা অমনিভাবে নুনে ডুবিয়ে জারক করে ব্যবহার করি। কিন্তু জলে বহুক্ষণ সিদ্ধ করে রসে ফুটিয়ে যদি আমলকীর মোরব্বা করা যায়, কিংবা তেলে পাক করে মশলা দিয়ে আচার তৈরি করা যায়, তাতে ওর ভিটামিনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। যুদ্ধের সময় আমলকীর গুঁড়ো জমিয়ে বড়ি প্রস্তুত করে এ দেশে কোনো কোনো সৈনদের খেতে দেওয়া হয়েছিল। তাদের জন্য তাজা শাকসব্জি বা ফলমূল জোটানোর অসুবিধা হওয়াতে যখন এই ব্যবস্থাই করা হয়েছিল, তখন তাদের স্বাস্থ্যের কোনো হানি হতে পারেনি আর স্কার্ভি হবারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি। হিসার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় যখন অনেকের শরীরে স্কার্ভির লক্ষণ দেখা যেতে লাগলো তখন এই আমলকীর বড়ি খেতে দিয়েই তা নিবারিত হলো। যাদের শরীরে ভিটামিন সি-র অভাব তাদের পক্ষে আমলকী উপকারী। আমলকী শীতের কয়েক মাসই ফলে। এর পরেই অবশ্য লেবু। কমলালেবুর চেয়ে পাতি লেবুতে ভিটামিন সি-র পরিমাণ আরো কিছু বেশী থাকে। কমলালেবু সুস্বাদু বলেই নানা প্রকার লেবুর মধ্যে এর আদর সব চেয়ে বেশী। কমলালেবু কেবল শীতের কয়েক মাসই পাওয়া যায়। পাতি লেবু বারো মাসই পাওয়া যায়, কিন্তু তা অতিরিক্ত টক বলে শখ করে একটু আধটু ছাড়া তেমন বেশী পরিমাণে খাওয়া যায় না। কিন্তু লেবু জাতীয় ফলগুলি টক হয় বলেই তাতে ভিটামিন সি পাওয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। অম্লত্বের গুণেই এই যে তা ভিটামিন সি-কে সহজে নষ্ট হতে দেয় না। বস্তুত যে ফল টক তাতে ভিটামিন সি কিছু নিশ্চই আছে। আমরা কামরাঙা, আমড়া প্রভৃতি ফলকে বিপজ্জনক মনে করে থাকি, এবং অসুস্থতার সময় ঐগুলি খেতে নিষেধ করি কিন্তু সেটা ভুল, ঐ সব টক ফলে প্রকৃত অনিষ্ট কিছু হয় না। তবে ঐ সব জিনিস নিত্য নিত্য

বেশী পরিমাণে খাওয়া যায় না। সি ভিটামিন-যুক্ত খাদ্যের মধ্যে কমলালেবু খাওয়াটাই নানা কারণে প্রশস্ত। যতদিন পাওয়া যায় ততদিন প্রত্যহ অন্তত দুটি করে কমলা লেবু সকলের খাওয়া উচিত। দুটি কমলা লেবুতে প্রায় তিন আউন্স পরিমাণ রস হতে পারে। তিন আউন্স কমলা লেবুর রসে প্রায় ৫০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়। আমাদের দৈনিক প্রয়োজন তাতেই মিটে যায়। কিন্তু স্তন্যদাত্রী নারীদের আরো বেশী পরিমাণে দেওয়া উচিত। শিশুদের পক্ষে অন্তত আড়াই চামচ করে কমলা লেবুর রস দেওয়া উচিত, তাতে তারা প্রায় ৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পেতে পারে। কমলা লেবু চিবিয়ে খাওয়ার চেয়ে রস করে খাওয়াই ভালো। কারণ একটু টক্ লাগলেই অনেকে ভালো করে না চিবিয়ে কোয়াগুলি ফেলে দেন, তাতে অনেকটা রস অনর্থক নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু রস করে খেলে তা আর ফেলবার উপায় থাকে না। বেশী টক্ হলে একটু চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে তাকে মিষ্টি করে নেওয়া যায়। কমলা লেবুর রস ছাড়া বাতাবি লেবুর রসও ভালো, টাইফয়েডের রোগীকে পর্যন্ত তা দেওয়া যায়। বর্ষার পর থেকে কয়েক মাস বাতাবি লেবু সস্তা দরেই পাওয়া যায়, যখন কমলা লেবু মেলে না। বাতাবিতে ভিটামিন সি-র পরিমাণ কমলা লেবুর চেয়ে প্রায় সিকিভাগ কম।

লেবু ছাড়া আম, আনারস, পেঁপে প্রভৃতির মধ্যেও যথেষ্ট ভিটামিন সি আছে। সবই রস করে খাওয়া যায়, এবং শিশুদের দেওয়া চলে, ও তাদের জননীদের পক্ষেও উপকারী। অন্যান্য সকল রকমের ফলেই কিছু না কিছু ভিটামিন সি নিশ্চয়ই আছে, তবে মাত্রায় কম। তন্মধ্যে স্ট্রবেরি, টেপারি, পীচ, আপেল, কুল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

এর পরে টোমাটোর কথা। এটিও ভিটামিন সি-র একটি অন্যতম বিশিষ্ট আধার। উদ্ভিদ্-তত্ত্ব অনুসারে টোমাটো ফল পর্যায়েরই অন্তর্গত, কিন্তু আমরা এটিকে তরকারিরূপেই ব্যবহার করে থাকি। ব্যঞ্জনের মধ্যে নিক্ষেপ না করে যদি টোমাটোর রস স্বতন্ত্রভাবে কাঁচাই খাওয়া যায়, তবে কমলা লেবুর তুলনায় তার অন্তত অর্ধেক পরিমাণ ভিটামিন সি এর থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকেই হয়তো তেমনভাবে খাওয়া পছন্দ করেন না। তবে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাতে এর উপকারিতা যে কিছুই পাওয়া যায় না এমন নয়। আগুনের তাপে খুব বেশিক্ষণ সিদ্ধ না করলে এর ভিটামিন সি কিছু কিছু বজায় থাকে। দেখা গেছে যে, যদি একঘণ্টা পর্যন্ত সিদ্ধ করা যায় তবুও টোমাটোর ভিটামিন অর্ধেকটা নষ্ট হয়ে গিয়ে অর্ধেকটা অবশিষ্ট থেকে যায়। আগুনের আঁচের তেজের উপরে এ বিষয়ে অনেকটাই নির্ভর করে। অল্প আঁচে সিদ্ধ করলে এর ভিটামিন সি অনেকক্ষণ পর্যন্ত অটুট থাকে, কিন্তু খুব বেশি আঁচ লাগলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং টোমাটোর গুণটুকু পেতে হলে তাতে বেশি আঁচ লাগানোও উচিত নয়, আর এক ঘণ্টার বেশি সিদ্ধ করাও উচিত নয়। এ ছাড়া টোমাটোর ব্যঞ্জনে সোডা প্রভৃতি ক্ষারীয় পদার্থ মোটেই দেওয়া উচিত নয়। আঁচ লাগা সত্ত্বেও টোমাটোর মধ্যে যে ভিটামিন সি বজায় থাকে সে তার অম্লত্বেরই কারণে। সেটুকু নষ্ট করে দিলেই তার ভিটামিন সি-টুকুও নষ্ট হয়ে যায়। অল্প আঁচে টোমাটোর চাটনি রেঁধে খাওয়াই উত্তম।

কন্দ ও মূল জাতীয় কাঁচা তরকারির মধ্যে উল্লেখ করতে হয় গাজর, শালগম, আলু এবং পেঁয়াজের কথা। টাটকা গাজর রন্ধন করলেও তার সবটুকু ভিটামিন সি নষ্ট হয় না। শালগম কাঁচা খেলেই উপকারী, কিন্তু আমাদের দেশে কেউই তা খায় না। আলুতে ভিটামিন সি কমলা লেবু প্রভৃতির তুলনায় খুব কম পরিমাণেই আছে বটে, কিন্তু অনেকেই আলু এমন বেশি মাত্রাতে খেয়ে থাকে যাতে মোটের উপর খানিকটা অভাব এর দ্বারাই পূরিয়ে যায়। অনেক পরীক্ষক পরীক্ষা করে বলেছেন যে, আলুর ভিটামিন রন্ধনের দ্বারা খুব বেশি নষ্ট হয় না। পেঁয়াজের ভিটামিন কাঁচা অবস্থায় ভালই থাকে, রন্ধন করলে তার খানিকটা নষ্ট হয়ে যায়। সীম, শুঁটি এবং ধানের মধ্যেও ভিটামিন সি আছে। তবে রন্ধন করলে অধিকাংশই তার নষ্ট হয়। বাষ্পের তাপে সিদ্ধ করলে সেটুকু বজায় থাকে।

টাটকা শাকসব্জির মধ্যে সবগুলিতেই ভিটামিন সি আছে, বিশেষ করে বাঁধাকপি, পালংশাক, লেটুস প্রভৃতির মধ্যে। ডাঁটায় নয়, পাতার এবং কচি শীষেই এই ভিটামিন থাকে। তার সমস্ত ভিটামিনটুকু পেতে হলে এইসব কচি পাতা, কাঁচা পেঁয়াজ, শসা, কাঁচা লঙ্কা এবং লেবুর রস প্রভৃতি একত্রে মিশিয়ে স্যালাড প্রস্তুত করে খাওয়াই শ্রেয়। কাঁচা লংকাতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। শাকসবজি অল্প আঁচে স্টু তৈরি করে খেলেও এই ভিটামিন তাতে অনেকটাই পাওয়া যায়। ভিটামিন সি জলে দ্রবনীয়, সুতরাং জল ঢেলে যখন তরকারির ঝোল রান্না করা হয় তখন সেই ঝোলের মধ্যে ঐ ভিটামিন প্রায় সবটুকুই চলে যায়। তরকারির ঝোলটি ফেলে দেওয়া তাই কিছুতেই উচিত নয়। এমন অনেক গরিব দেশের কথা শোনা গেছে যেখানে নানারকমের শাক ও গাছের পাতা সিদ্ধ করে তারই ঝোল খেয়ে লোকের ভিটামিন সি-র অভাব মিটে গেছে এবং স্কার্ভি নিবারিত হয়েছে।

কাঁচা পাতার রসে যে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে এ কথা সর্ববাদিসম্মত। কবিরাজী চিকিৎসাতে যে তুলসীপাতা, বেলপাতা দূর্বা-ঘাস প্রভৃতির রস অনুপান হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, তার থেকে বোধ হয় এই উপকার-টুকু পাওয়া যায়। দূর্বাঘাসে উপকারী খাদ্যো-পাদান থাকলেও তা এমনি খাওয়া চলে না, তবে অনুপান হিসাবে চলে। আমরা যে পান খেয়ে থাকি তার দ্বারাও এই কাজই পাই। পানের তাজা পাতায় যথেষ্ট ভিটামিন সি থাকে এবং আরো অনেক খাদ্যোপাদান থাকে। এই-জন্যই হয়তো যারা অনেক বেশি পান খায় তারা অল্প খোরাকে একবেলা খেয়েও স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে। অন্যপক্ষে আমাদের দেশে যে স্কার্ভি হয় না, পান খাওয়া তার একটা বিশেষ কারণ।

ভিটামিন সি অর্থাৎ অ্যাস্করবিক অ্যাসিড নানাবিধ আভ্যন্তরিক রক্তপাতে, নফ্রাইটিস এবং টাইফয়েড নিউমোনিয়া প্রভৃতি কঠিন সংক্রামক রোগে অনেক অধিক মাত্রাতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এমন কি ৫০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত এক এক মাত্রাতে দেওয়ার নিয়ম আছে।

অনুবাদ সাহিত্য

# শরৎ সন্ধ্যা

**ম্যাক্সিম গার্কি**

(এটি বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক ম্যাক্সিম গার্কির **An Autumn evening** গল্পের অনুবাদ। লেখকের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।)

শহরটায় কয়েকদিনমাত্র এসেছি। না আছে টাকাকড়ির সম্বল, না আছে বন্ধুবান্ধব, এমন কি মাথা গোঁজবার একটা জায়গা অবধি নেই। তখন শরৎকালের প্রায় শেষাশেষি, একদিন সন্ধ্যেবেলা এক বিপদে পড়ে বেশ বিব্রত হয়েছিলুম।

সামান্য কখানা আটপৌরে কাপড় রেখে আর বাকি সব পোষাকপরিচ্ছদ পেটের দায়ে প্রথম কদিনের মধ্যেই বিক্রী করে দিয়েছিলুম। তারপর একদিন চলে এলুম সেই শহরের উপকণ্ঠে উক অঞ্চলে। জাহাজের কাজ যখন চলে তখন এই জায়গাটি লোকজনে গম গম করে—চারদিক কর্মব্যস্ত, কিন্তু আমি যখন এসে হাজির হলুম, তখন অক্টোবর মাস। কাজেই জায়গাটা একেবারে জনশূন্য—নিস্তব্ধ।

আমি কিছু ভুক্তাবশিষ্টের আশায় রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, আর ভাবছি পেটভরে খাবার আনন্দের কথা। অন্যমনস্কভাবে কতক্ষণ যে হেঁটেছিলুম বলতে পারি না, হঠাৎ দেখলুম, আমি কতকগুলি খালি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার মনে হয় বর্তমান অর্থনৈতিক সভ্যতার কবলে পেটের খিদের চেয়ে মনের খিদে মেটানো ঢের বেশ সহজ। রাস্তায় হাঁটো, চারিদিকে কত সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর। তেমনি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, স্থাপত্য এবং সেইরকম আরও কত প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা তোমার মগজের মধ্যে ঘুরতে থাকবে। কত ফিটফাট সৌখিন বাবু দেখবে—তাদের দেখতে বেশ লাগে, কিন্তু তারা তোমাকে দেখেও দেখতে চাইবে না। তারা তোমার এই অস্বস্তিকর অস্তিত্বটা এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে। একথা অবিশ্যি খুবই ঠিক যে, ক্ষুধার্ত লোকের আত্মা ভোজনবিলাসীদের চেয়ে বলিষ্ঠতর ও অনেক সুস্থ আর অনশনের স্বপক্ষে এটা একটা অকাট্য যুক্তি।

সন্ধ্যে হয় হয়, বৃষ্টি পড়ছে, উত্তুরে হাওয়াটা বেশ জোরেই বইছে। খালি বাড়ির মধ্যে থেকে হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে—বন্ধ জানলার খড়খড়িগুলো খটখট্ করে উঠছে। হাওয়ার চোটে নদী উঠেছে ফুলে, ঢেউগুলো তাদের শাদা চূড়ো নিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে আছড়ে পড়ছে পারের বালির ওপর আবার অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। শীতকাল যে আসছে সে খবর নদীটাও যেন পেয়ে গেছে। উত্তুরে হাওয়া পাছে তাকে রাতারাতি জমিয়ে বরফ করে দেয়, সেই ভয়ে সে কোথাও পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায়। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে। আমি হাঁটছি। আমার পাশে দুটি ঝাউ গাছ আর কাছেই একটি নৌকো উল্টিয়ে রয়েছে। নৌকোর তলাটা ভাঙা, আর গাছ দুটি শীতের বাতাসে জীর্ণ, দীর্ণ। সব কিছুরই দৈন্যদশা—প্রকৃতির কি শোকাবহ মূর্তি! কোথাও যেন জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। প্রকৃতিদেবীও ওই তাঁর অশ্রুরোধ করে রাখতে পারছেন না। আমার চারিদিকে একটা ভীষণ নির্জীবতা। সেই ভয়াল মৃত্যুর রাজ্যে আমিই একমাত্র জীবিত প্রাণী—আমার মনে হচ্ছিল আমিও যেন আর বেশীক্ষণ বেঁচে থাকবো না।

তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো—জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়ই বলা চলে, সেই ভিজে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। খিদের নাড়ী চনচন্ করছে। ঠাণ্ডার চোটে দাঁত লেগে খটখট শব্দ হতে লাগলো।

এইভাবে কতক্ষণ যে আমার খাদ্যান্বেষণের পালা চলতো জানি না। হঠাৎ একটা ছোট দোকানঘর দেখতে পেলুম, আর দেখলুম ঠিক তার পাশেই স্ত্রীলোকের পোষাকপরা কেউ ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে। তার কাপড় ভিজে সপসপ করছে। আমি চুপি চুপি তার পিছনে গিয়ে উঁচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম। দেখি কি, যেখান থেকে দোকানদার জিনিস বিক্রী করে, ঠিক তার তলায় সে হাত দিয়ে বালি খুঁড়ছে। তার পাশে বসে পড়ে বলে উঠলুম—তুমি কি করছো?

অস্ফুট শব্দ করে সে লাফিয়ে উঠলো। সে যখন উঠে দাঁড়িয়ে তার কটা চোখ দুটি বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়েছিল, তখন দেখলুম সে আমারই বয়সী একটি মেয়ে। কিন্তু তার সুন্দর মুখখানিতে তিনটি ভীষণ কাটার দাগ—দুই চোখের কোলে ঠিক একই রকম দুটি, আর নাকের ওপরে ঠিক কপালের মধ্যে একটু বড় আর একটি। তার মুখের সৌন্দর্য এই কাটা দাগের জন্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই তিনটি দাগের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখে অবাক হতে হয়। কোন নিপুণ শিল্পী ছাড়া এমন নিখুঁতভাবে কাটা অসম্ভব। সেই শিল্পী সৌন্দর্য নষ্ট করতে অদ্বিতীয়।

মেয়েটির ভয় তৎক্ষণাৎ ভেঙে গেছে—সে হাতের বালি ঝেড়ে ফেলে মাথার রুমালটা ঠিক করে নিল, তারপর কাঁধ দুটিতে একটা ঈষৎ ঝাঁকি দিয়ে বললে—আমার মনে হয় তুমিও খাবার চাও। বেশ, তাহলে খুঁড়তে থাকো। আমার হাত ধরে গেছে। দোকানের দিকে ঘাড় হেলিয়ে বললো—এখানে এখনও খাবার বিক্রী হয় কি না।'

দ্বিগুণ উৎসাহে আমি খুঁড়তে আরম্ভ করলুম। আর ও আমাকে ভাল করে দেখতে লাগলো। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো আমায় সাহায্য করতে।

আমরা চুপ করে কাজ করে যেতে লাগলুম। সাম্য, আইন, নীতি, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি কথা সব সময়েই লোকের মনে থাকা উচিত। সে সব কথা তখন আমার একবারও মনে হয়েছিল কি না, এখন আমি বলতে পারি না। সত্যের খাতিরে একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, ঐ কাজে তখন আমি এত ব্যস্ত আর ভেতরে কি পাওয়া যেতে পারে, তার কল্পনায় আমি এত মশগুল যে, অন্য কিছুর স্থান আমার মনে একেবারেই ছিল না।

যত রাত হতে লাগলো, তত ঠাণ্ডা বাড়তে লাগলো। অন্ধকারও আরও ভীষণ হয়ে উঠলো। ঢেউয়ের শব্দটা কিছু কমলেও বৃষ্টির আওয়াজ দোকানের গায়ে লেগে আরও বেড়ে উঠলো। দূরে পাহারাওলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

কি ভেতরে আছে না নেই? আমার সাহায্যকারী জিজ্ঞেস করলো। ওর কথা বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলুম। কোন জবাব দিলুম না।

আমি বলছিলুম, এই দোকানঘরের কি একটা শক্ত মেঝে আছে নাকি? তা যদি থাকে, তবে আমরা মিছিমিছি খেটে মরছি। ধরো অনেকটা খুঁড়ে আমরা দেখলুম যে, ওপরে ভারীভারী তক্তা দেওয়া। তখন? সেগুলো আলগা করবো বা সরাবো কি করে? এর চেয়ে এসো আমরা তালাটা ভেঙে ফেলি। এ তালাটা এমন কিছু মজবুত নয়।

সত্যিকারের কাজের ফন্দি মেয়েদের মাথায় বড় একটা আসতে দেখা যায় না। কিন্তু এর বেলায় তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। আমি সব সময়েই প্রকৃষ্টতর উপায়কে মেনে নিয়েছি। আর

নিজের সুবিধেমত সেটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি।

তালাটা ধরে আমি মুচড়ে ভেঙে ফেললুম। তক্ষুনি আমার সঙ্গী সেই চৌখুনীর মত খোলা জায়গাটা দিয়ে সাপের মত বুকে হেঁটে ভেতরে চলে গেল। তারপর ভেতর থেকে ভেসে এল—খাসা হয়েছে।

কোনো কথাশিল্পী পুরুষের সুললিত প্রশস্তির চেয়ে যে-কোনো মেয়ের মুখের সামান্য প্রশংসার দাম আমার কাছে অনেক বেশী। কিন্তু তখন এ সব অনুভব করবার ক্ষমতা আমার কম। মেয়েটির কথায় কান না দিয়ে ব্যস্তভাবে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলুম—কিছু আছে টাছে?

একঘেয়ে সুরে মেয়েটি তার আবিষ্কারের ফিরিস্তি দিয়ে যেতে লাগলো—এক ঝুড়ি শিশি বোতল......কয়েকটা খালি থলি......একটা ছাতা.....একটা লোহার বাসতি......

এর একটাকেও বিশেষ সুখাদ্য হিসেবে গণ্য করা চলে না। আমি বেশ হতাশ হয়ে পড়েছি এমন সময় হঠাৎ তার চিৎকার শুনলুম—এই তো, এই যে।

কি? আমি ব্যস্ত ভাবে বললুম।

রুটি, পাঁউরুটি...একটু ভিজে গেছে...নাও ধরো।

একটা রুটি আমার পায়ের সামনে এসে পড়লো আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলো সেই মেয়েটি। আমি ততক্ষণে সেই রুটিটা ছিঁড়ে এক টুকরো মুখে পুরে চিবোতে অরম্ভ করেছি।

এই, আমাকে খানিকটা দাও। এইবার এখান থেকে আমাদের পালিয়ে যাওয়া দরকার। আমরা এখন কোথায় যাই? এই বলে সে অন্ধকারের মধ্যে চারিদিকে তাকাতে লাগলো।

ওই দিকে একটা নৌকো উল্টিয়ে রয়েছে—এই কাছেই। তোমার আপত্তি না থাকলে আমরা ওখানে যেতে পারি।

বেশ, চল।

আমাদের হাতে সদ্য চুরি করা রুটির টুকরো তাই ছিঁড়ে চিবেতে চিবোতে আমরা এগিয়ে চললুম। নদী তখন গজরাচ্ছে, বৃষ্টির জোর আরো বেড়েছে। দূর থেকে একখানা ভেঁপুর আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে, এক বিরাট দৈত্য ওই রকম বিকট আওয়াজ করে এই বিশ্রী দুর্যোগের রাতকে, আমাদের দু'জনকে—পার্থিব সব কিছুকেই ভেংচাচ্ছে। সেই শব্দে আমার গা ছমছম করতে লাগলো। কিন্তু আমি লোভী পেটুকের মতো খেয়ে চললুম আমার বাঁ দিকে মেয়েটিও ঠিক তাই।

কিছু না ভেবে চিন্তেই আমি জিজ্ঞেস করলুম—তোমার নাম।

নাতাশা—বলেই সে আবার রুটি চিবোতে লাগলো।

আমি একবার ওর দিকে তাকালুম আর বেদনায় আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। আমার মনে হোলো ভাগ্যদেবী যেন অমার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসছেন। সে হাসি ব্যঙ্গের, তাতে আন্তরিকতার আভাস মাত্র নেই। অতীব কুটিল সেই হাসি!

চটপট শব্দ করে নৌকোর ওপর বৃষ্টি পড়ছে, আমার মনটা নানা ভাবনায় ভরপুর। ভাঙা নৌকোর একটা ফুটো দিয়ে শোঁ শোঁ করে হাওয়া ঢুকছে, একটা কাঠের চোকলা সেই হাওয়াতে কেঁপে কেঁপে একটা করুণ সুর বাজাচ্ছে। ঢেউ-এর শব্দটাতেও এক চরম হতাশা। এই চরম একঘেঁয়েমির হাত থেকে পালাবার জন্য ঢেউগুলো বৃথা চেষ্টা করছে, কিন্তু নিষ্ফল বেদনা প্রতিটি ঢেউএর আওয়াজে মূর্ত হয়ে উঠছে। গ্রীষ্ম আর শীত, বছরের পর বছর এরা আসছে যাচ্ছে: রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শীতে জমে পৃথিবী আজ শ্রান্ত, ক্লান্ত। সে যেন তার বহু দিনের রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস জলের ছপছপ শব্দ আর নৌকোর গায়ের বৃষ্টির আওয়াজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আজ ত্যাগ করছে। নদীর তীরে ঝোড়ো বাতাসেও সেই বিষণ্ণতা।

নৌকোর তলায় আমরা দুটি প্রাণী। কষ্টের অবধি নেই। জলের ঝাপটায় ভিজে নেয়ে গেছি। দমকা হাওয়ায় শরীর জমে যাচ্ছে। বসে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। আমি ঘুমোতে চাইছিলুম। নাতাশা নৌকোর এক-পাশে হেলান দিয়ে বসে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। তার বিষণ্ণ মুখ আর কাটা দাগগুলোর মধ্যে চোখগুলো অসম্ভব বড় লাগছিল। সে একেবারে চুপচাপ—তার এই নিস্তব্ধতায় আমার কেমন যেন করতে লাগলো। আমি ওর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছিলুম কিন্তু কি ভাবে যে আরম্ভ করা যায়, তা ভেবে উঠতে পারছিলুম না। সেই প্রথম কথা বললো।

কি দুর্বিষহ এই জীবন—সে পরিষ্কার ভাবে, ভেবে চিন্তে, দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলো। এটা তার কোনো অভিযোগ নয়, কারণ সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে সে এই কটি কথা বললো।

বর্তমান অবস্থায় এই কথার প্রতিবাদ করার কোনো যুক্তিই আমি খুঁজে পেলুম না। সে আগেকার মত একই ভাবে চুপ করে বসে রইল।

এর চেয়ে যদি মরে যেতাম—ও আবার সেই নির্লিপ্ত ভাবে আরম্ভ করলো। ও যেন খুব ভাল করে ভেবে দেখেছে যে, এই কঠোর জীবনযাত্রার হাত থেকে মুক্তি পাবার 'মরে যাওয়াই' একমাত্র উপায়।

মেয়েটির কথাবার্তার ধরণে আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে হচ্ছিল আর কিছুক্ষণ যদি এই রকম চুপ করে বসে থাকি, তবে আমি নিশ্চয়ই কেঁদে ফেলবো। আর কোনো মেয়ের সামনে ডুকরে কেঁদে ওঠা সে একটা কেলেঙ্কারীর একশেষ: বিশেষতঃ মেয়েটি যখন ওই একই পরিস্থিতিতে স্থির এবং শান্ত হয়ে রয়েছে। আমি ঠিক করলুম কথা বলতেই হবে। বলবার বিশেষ কিছু খুঁজে না পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলুম—এমন ভাবে কে তোমায় মারলো?

সে বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল—এ সব পাশ্‌কার কীর্তি।

সে কে?

আমার প্রেমাস্পদ—এক রুটিওলা।

সে প্রায়ই তোমাকে মারধর করে না কি?

হ্যাঁ, মদের ঝোঁকে থাকলেই। তারপর হঠাৎ আমার কাছ ঘেঁষে বসে সে তার নিজের বৃত্তান্ত, তার সঙ্গে পাশ্‌কার সম্পর্ক সব বলতে আরম্ভ করলো। সে নিজে পতিতা। আর সেই রুটিওলা বেশ সুপুরুষ, ভাল বাজিয়ে, তার এক একটা কোর্টের নাম পকেটো রুবল; তা ছাড়া সে ভাল 'সু' জুতো পারে। কাজেই নাতাশা তাকে ভালবেসেছিল। সেই ছিল তার একমাত্র প্রণয়ী। প্রথম কয়েকদিন পাশ্‌কা তার দখলটা কায়েমী করে নিল, তারপর সে তার নিজ মূর্তি ধারণ করলো। অন্য লোকে নাতাশাকে যা পয়সা দিত, পাশ্‌কা সে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে মদ খেতো তার পর শুরু হতো অত্যাচার আর প্রহার। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ এই যে, সে নাতাশার চোখের ওপরই অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে আরম্ভ করলো, তাদের পেছন পেছন ঘুরতেও শুরু করলো। সে বলে চললো—এতে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় না? আমিও তো মানুষ। এই নচ্ছারটা আমাকে যাচ্ছে তোলাই বানাচ্ছে! গত পরশুদিন আমি বাড়িউলীর অনুমতি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। ওর বাড়ি গেলুম। গিয়ে দেখি, সে আর দুল্‌কা দুজনে বসে বসে মদ গিলছে। ওকে দেখেই আমি চিৎকার করে উঠলুম—মাতাল জোচ্চোর কোথাকার। তারপর শুরু হলো আমার নির্যাতন। চুল ধরে টেনে লাথি মেরেও তার আশ মিটলো না। এতেও হয়তো আমি কিছু মনে করতুম না। তারপর সে আমার সমস্ত নতুন জামা-কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো আমার মাথা থেকে রুমালটা অবধি টেনে খুলে দিল। এখন আমি কি করে বাড়ি-উলীর কাছে মুখ দেখাবো? তারপর ধরা গলায় বলে উঠলো, হায় ভগবান! এখন আমার কি উপায় হবে!

বাতাস তখনও গজরাচ্ছে, বাতাসের বেগ আর ঠাণ্ডা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। আবার

আমার দাঁতে দাঁত লেগে ঠক্ ঠক্ শব্দ হতে লাগলো, নাতাশাও তখন কাঁপছে। সে আমার আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। তার চোখের তারা জ্বলছে আমি অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি।

আবার ও আরম্ভ করলো—তোমরা পুরুষেরা কি পশুপ্রকৃতির? আমি চাই তোমাদের সব বিষয়ে ছোট করতে। এমন কি, কোনো পুরুষ মরবার সময় আমার সহানুভূতি তো পাবেই না; পাবে ঘৃণা। নীচ নোংরা জীব যত খোসামুদে ঠক্ সব! কাজ হাসিল করার আগে অবধি তোমরা পোষা কুকুরের মতো লেজ নড়তে থাকো। আমরা যদি ভুলক্রমে একবার আত্মসমর্পণ করে বসি? তা হলেই ব্যস, আমাদের শেষ। তোমরা তখন আমাদের মাড়িয়ে চলে যাও। যতসব হতভাগা অকর্মার দল!

সে অজস্র গালাগালি দিল, কিন্তু ঝাঁঝ বলে কোনো পদার্থ তাতে ছিল না। এই "হতভাগা অকর্মার দল"এর ওপর তার কোনো রকম রাগ বা ঘৃণা প্রকাশ পেলনা। তার কথার সুর গালাগালির সঙ্গে তাল রেখে তো চলেই নি, বরঞ্চ সে যেন খুব বেশী ধীর স্থিরভাবেই কথা ক'টি বললো।

আমি নিরাশাবাদ সম্পর্কে বই পড়েছি বিস্তর—উপদেশ শুনেছি গাদাগুচ্ছের, কিন্তু এই কথাগুলির সুরে যে রকম বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম, সে রকম আর কখনও হয়নি। তার কারণ, মৃত্যুযন্ত্রণা চোখে দেখা, বিভীষিকাপূর্ণ মৃত্যুর সত্য বিবরণের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে সত্য ও কষ্টদায়ক।

আমার ভয়ী বিচ্ছিরী লাগছিল। নাতাশার কথার জন্য ততটা নয়, বাইরের ঠাণ্ডার জন্যে যতটা। • জোর ক'রে ঠোঁট চেপে রেখেও বোধ হয় অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তেই টের পেলুম দুটি কনকনে ঠাণ্ডা হাত আমার গায়ে রয়েছে। একটি আমার ঘাড়ে আর অন্যটি আমার মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে স্নেহপূর্ণ মৃদু কণ্ঠস্বর শুনলুম—কি হয়েছে?

আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলুম না যে, নাতাশা আমাকে এই প্রশ্ন করছে। ও যে এইমাত্র সমস্ত পুরুষ জাতির বাপান্ত করছিল। এখন তার গলার স্বর উদ্বেগাকুল।

কি? কি হয়েছে? খুব ঠাণ্ডা লাগছে, না? তুমি কি জমে যাচ্ছ? কি অদ্ভুত লোক তুমি! আমাকে এতক্ষণ বলো নি কেন যে, শীতে তোমার কষ্ট হচ্ছে? এসো, শুয়ে পড়ো, গা হাত মেলে দাও। আমিও শুচ্ছি। আমায় এবার জড়িয়ে ধরো......আরো জোরে...... হ্যাঁ, এইবার তোমার বেশ গরম লাগবে......এইভাবে আমরা সারারাত পাশাপাশি শুয়ে থাকবো......তাহলে রাতটা কোনো রকমে কেটে যাবে......। তুমি মদ খাও নাকি......তোমার চাকরী গেছে বুঝি......ও কিছু নয়।

একটানা এইভাবে সে কথা বলে গেল। নাতাশা আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছে ও আমাকে আশা দিতে চায়।

এর চেয়ে আমার মরণ হলে ভাল হতো। এটা আমার পক্ষে যে কী ভীষণ, তা কি করে বোঝাবো। ভেবে দেখুন, আমি সে সময় সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যস্ত। আমি তখন রাজনৈতিক বিপ্লব আর সমাজতন্ত্র সংস্কারের স্বপ্ন দেখছি। যত রাজ্যের উদ্ভট বই—লেখকরা নিজেরাই যার মানে বুঝতে হিমসিম্ খেয়ে যায়—সবই আমি পড়ে ফেলেছি। যত রকমভাবে পারা যায়, আমি নিজেকে "একটি কার্যক্ষম বলশালী শক্তি" তৈরী করবার চেষ্টায় আছি।

আর আমাকে কি না এক পতিতা তার শরীর দিয়ে গরম রাখবার চেষ্টা করছে।

বিশ্বাস করতে রাজী ছিলুম যে, একটা অদ্ভুত স্বপ্ন আমি দেখছি। কিন্তু তা তো বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ, বৃষ্টির ছাঁট্ আমার গায়ে এসে লাগছে, আমার বুকের ওপর একটি নারীবক্ষ—আলিঙ্গনাবদ্ধ; আমার গালের ওপর ওর মৃদু শ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করছি। ওর নিঃশ্বাসে একটু দেশী মদের গন্ধ—ভালই লাগছিল। বাইরের ঢেউয়ের আওয়াজ, নৌকার গায়ে বৃষ্টির শব্দ, আমরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছি, প্রচণ্ড কাঁপুনি—এর সবগুলিই অতি নিষ্ঠুরভাবে সত্য। তবে আমি একথা হলফ্ ক'রে বলতে পারি যে, এ রকম বিভীষিকাময়ী স্বপ্নও কেউ কোনো দিন দেখেনি।

নাতাশার নারীসুলভ কোমল ও স্নিগ্ধস্বরে আমার মনটার কোথা থেকে কি যেন একটা ভার নেমে গেল। আমি ঝর্‌ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললুম। আমার মনের যত ময়লা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। নাতাশা আমার সান্ত্বনা দিতে লাগলো—লক্ষ্মীটি, আর নয়, আর কেঁদো না। ভগবানের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আবার কাজ পাবে।

তারপর আমায় সে অসংখ্য চুম্বনে অভিষিক্ত করে দিল। আমার জীবনে নারীর চুম্বন সেই প্রথম। কিন্তু সেইগুলিই সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ পরেরগুলি হয়েছে প্রচুর ব্যয়সাধ্য আর তার বিনিময়ে আমি কিছু পাইনি বললেই চলে।

কী অদ্ভুত লোক তুমি, চুপ করো না। তোমার যদি অন্য কোথায়ও থাকার জায়গা না থাকে, আমি কাল তোমায় সাহায্য করবো—আমি যেন এক স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে থেকে তার সান্ত্বনা বাণী শুনতে পেলুম।

সারারাত আমরা এইভাবেই কাটালুম। সকালবেলা আমরা গঁড়িদের নৌকোর ভেতর থেকে বেরোলুম। তারপর রওনা হলুম শহরের দিকে। শহরের কাছাকাছি এসে দুজনে বিদায় সম্ভাষণ আদানপ্রদান করে যে যার কাজে চলে গেলুম।

যার সঙ্গে এই ভীষণ দুর্যোগের রাত কাটিয়েছিলুম, সেই নাতাশার সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হয়নি। যদিও আমি পুরো ছ'মাস ধ'রে প্রতিটি পতিতালয় তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।

যদি সে মারা গিয়ে থাকে—তার পক্ষে এটাই অবশ্য ভাল—তবে তার আত্মা চির-শান্তিতে বিশ্রাম লাভ করুক। যদি বেঁচে থাকে—তবে সে শান্তি পাক। আর কখনও যেন এই দুর্ভাগ্যময় ঘৃণিত জীবনের কথা তার মনে না আসে, কারণ তাতে তার মিছিমিছি কষ্টই হবে, আর এতে তার জীবন-যাত্রার কোনো সুবিধেই হবে না।

অনুবাদক : রণজিৎ রায়

# ভারতের আর্থিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

শ্রীসিতাংশুকুমার দাশগুপ্ত

এশিয়া মহাদেশের এমন একটি জায়গায় ভারতবর্ষ অবস্থিত যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সমর পরিস্থিতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্যটি যে কোনও পরিকল্পনার পক্ষে অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষের প্রায় তিনদিকেই সমুদ্র, তার উপকূলভাগ সুবিস্তীর্ণ। এই দীর্ঘ ৫০০০ মাইল উপকূল রক্ষা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর ও বাণিজ্য বহর তার প্রয়োজন। ভারত ইংলণ্ডের মত বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল নয় আবার যুক্তরাজ্যের মতও সমর পরিস্থিতি হতে বহুদূরবর্তীও নয়, এই দ্বিবিধ তথ্যই তার নৌবিভাগীয় সম্প্রসারণকে পরিচালিত করবে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও আমাদের নৌবহরের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল না, বাণিজ্যপোত তো যথেষ্টই ছিল। সাম্রাজ্যবাদের চক্রে সে শিল্প আজ লুপ্ত। সে শিল্প পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা নানাভাবে এড়ানো হয়েছে। ১৯২২ সালের ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি বিতর্কের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। (১৯২২ সালের কার্য বিবরণী, Vol. 3, পৃঃ ১—৯)। স্যার শিবস্বামী আয়ার প্রস্তাব করেন বাণিজ্যবহরের সম্প্রসারণ করা হোক। বিলটি উত্থাপন করে তিনি বলেন, ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞগণ হয়তো বলতে পারেন, ভারতবর্ষ যতদিন না কয়লা ও ইস্পাত শিল্পে অগ্রবর্তী হবে ততদিন জাহাজ নির্মাণ শিল্প সম্ভব হবে না। ভারতবর্ষ সে কথা স্বীকার করে না। জাপানে রাষ্ট্রের সাহায্যে বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে ১৫০০০ টন থেকে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ২৩ লক্ষ ৮২ হাজারে পৌঁছেছে।

ভারত গভর্নমেণ্টের তদানীন্তন সদস্য মিঃ ইনেস তদন্ত কমিশন বসাতে রাজী হলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন পথে বিঘ্ন অনেক, ইঞ্জিন নাই, বয়লার নাই, কৌশলী নিপুণ কারিগর নাই, এমন কি কারিগর তৈরীর উপযুক্ত শিক্ষায়তনও নাই। ইংলণ্ডে বন্দরে বন্দরে এসব শিক্ষার পাকা বন্দোবস্ত আছে, তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকও আছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে draftsmen, foremen, managers তৈরী টাকা ও সময় সাপেক্ষ। জাপান দ্বীপময় দেশ, এ তার প্রয়োজন। ভারতবর্ষ তা নয়, "এবং সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকায়—এবং যতদিন সে থাকবে—ততদিন নৌবহর রাখবার বিপুল খরচার হাত থেকে সে বাঁচবে। ব্রিটিশ নৌবহর বৎসরে ১ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে এ কাজটি করে দিচ্ছে।"

১৯২২ আর ১৯৪৭। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা কি তাই দেখাচ্ছিঃ—

| দেশ | | মোট বাণিজ্য | বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ইংলণ্ড | ... | ১৪৫ কোটি পাউণ্ড | ১·৪ কোটি টন (১৯৩৮) |
| যুক্তরাজ্য | ... | ৮৯৮ কোটি ডলার | ১·৩ কোটি টন (১৯৪১) ১লা জানুয়ারী |
| জাপান | ... | ৫৯৫ কোটি ইয়েন | ৫৬ লক্ষ টন (১৯৩৯) |
| ভারতবর্ষ | ... | ৩৮৪ কোটি টাকা | ৮৮ হাজার টন (১৯৩৯-৪০) |

| | আয়তন ১০০০ বর্গ মাইল হিসাবে | রেলপথ প্রতি ১০০০ বর্গমাইলে | [illegible] প্রতি ১০০০ বর্গমাইলে |
|---|---|---|---|
| ইংলণ্ড | ৮৯ | ১৯১ মাইল | ২০০০ মাইল |
| যুক্তরাজ্য | ২৯৭০ | ৭৫ " | ১০০০ " |
| জাপান | ১৪৭ | ১০০ " | ৬০০০ " |
| ভারতবর্ষ | ১৫০০ | ২৬ " | ১৮০ " |

গত যুদ্ধে ভারতবর্ষে তৈরী হয়েছে ১ লক্ষ টনের মত, খোয়া গিয়েছে ২৮০০০ টনের মত। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯৭ লক্ষ টনের বাণিজ্য জাহাজ ভারতীয় বন্দরে এসেছে, আর মাল নিয়ে ৯৬ লক্ষ টনের জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গেছে। এই চলাচলের ভাড়াটা ভারতবর্ষ পাচ্ছে না।

আধুনিক সমর প্রস্তুতির জন্য অস্ত্রশস্ত্র, বিমানবহর, নৌবহর, সামরিক সংগঠন প্রভৃতির তুলনামূলক হিসাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আদর্শ হিসাবে ভারতবর্ষ অহিংসায় এবং আত্মশক্তির উদ্বোধনে বিশ্বাসী। অস্ত্রশক্তিতে সে বিশ্বাসী নয়। তথাপি বিশ্বপরিস্থিতির রূঢ় বাস্তব অপরিণতিকে স্বীকার করে চলতেই হবে। বিরাট জনবল তার সহায়, মনোবল উদ্বোধন তার কাম্য কিন্তু অস্ত্রবলও প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতবর্ষের সে দায়িত্ব নিতেই হবে। বিশেষ যখন দ্বিখণ্ডিত ভারতের সীমান্ত আজ সমতল ভূভাগেই বিস্তৃত। সমর প্রস্তুতির এ পরিকল্পনা ভারতের বহির্বাণিজ্যে ও আভ্যন্তরীণ শিল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেই।

অন্তর্বাণিজ্যের ব্যাপারেও ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় অসুবিধা তার রেলপথ, রাস্তাঘাট ও জলযানের অনুন্নত অবস্থা। দেশের আভ্যন্তরিক শৃংখলা বজায় রাখতে, দেশরক্ষার কাজেও এই রেলপথ, রাস্তাঘাট ও জলযানের উন্নতি অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষের ভূভাগ ১৫·৮ লক্ষ বর্গমাইল। আর তার অধিবাসী সংখ্যাও ৩৮.৯ কোটি (১৯৪১এর সেন্সাস)। অথচ এই বিস্তীর্ণ দেশের বিরাট জনসংখ্যার জন্য রেলপথ ও রাস্তাঘাটের পরিমাণ কত তা নীচের তুলনামূলক তথ্যেই প্রকাশ:

ভারতবর্ষের রেলপথ মাত্র ৪১,০০০ মাইল। এরই ১৯৩৯-৪০ সালে [illegible] কোটি যাত্রী, ১ কোটি [illegible] মাল, [illegible]। যুক্তরাজ্যে ১৯৩০-৩৪ সালে রেলপথ ছিল ২ লক্ষ ৭৫ হাজার মাইল, ১৯৩৭-এ [illegible] ১ লক্ষ ৩৬ হাজার মাইলের [illegible], আর যাত্রী সংখ্যা ছিল [illegible] কোটি আর চলাচল করেছিল ৯৫১ কোটি টন।

শুধু মাইল বাড়ানোর পরিকল্পনা যথেষ্ট হওয়া উচিত নয়, চওড়া গেজ, মিটারগেজ [illegible] বিভিন্নতা, মাল ও [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] সমস্যার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ জন্যেই, অতীতকালে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ছোটবড় নানাশ্রেণীর লাইনের জন্যে, ফলে যাত্রীদের নানান দুর্ভোগ, সময় ও অর্থের অপব্যয়, ইঞ্জিনের অতিরিক্ত কয়লা পোড়ানো, এবং মাল চলাচলে অসুবিধা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। অতিরিক্ত চাপের সময়ে এ প্রথায় যে কি অসুবিধা ঘটেছে যুদ্ধের সময়ই তা হাড়ে হাড়ে বোঝা গেছে।

দ্রুত ও সস্তায় মাল চলাচল ও যাতায়াত ভারতবর্ষের সভ্যতা বিকাশের পক্ষে এক অপরিহার্য অঙ্গ। লর্ড ওয়াভেল একদা বলেছিলেন

Transport is civilization. গ্রাম উন্নয়ন কদাপি এদেশে সম্ভব হবে না, যদি না এখানে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত থাকে। বস্তুতঃ ভারতের বহু ভাষাভাষী, বহু রীতিনীতিসম্পন্ন, সহস্রধা বিভক্ত অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান সুগম না হলে এক স্বাদেশিক চেতনা ও কৃষ্টির অভ্যুদয়ের পক্ষেও অসুবিধা ঘটবে।

অথচ যদি এদেশেই ইঞ্জিন বয়লার প্রভৃতির উৎপাদনের ব্যবস্থা না হয় তবে পরমুখাপেক্ষী থেকে এপথে উন্নতি হবে অসম্পূর্ণ।

ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতিও ঠিক এই কারণেই বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ প্রসার লাভে সমর্থ হয়নি। প্রতিটি কলকব্জার জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। প্রথম মহাযুদ্ধে যখন শিল্পোন্নতির একটি পরম সুযোগ আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিল, তখন শিল্পের উন্নতি এই কলকব্জার দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ব্যাঘাত পেয়েছিল। আজও দ্বিতীয় মহাসমরে শিল্পের বহু উন্নতি দেখা দিলেও, সমাক [illegible] সফল হয়নি কলকব্জা তৈরীর [illegible] না থাকায়। এই [illegible] [illegible]

[illegible]

১৯৫১—৫৬

[illegible]

১৯৫৮—৫৯ : ১৯০

[illegible]

বিদ্যুৎ শক্তি

[illegible]

শিল্প উন্নয়নে শক্তি সরবরাহ হিসাবে—কয়লা ও বিদ্যুতের স্থান সর্বাগ্রে। বিদ্যুৎশক্তির উন্নতি আধুনিককালের। এতকাল পৃথিবীর বড় বড় শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলি কয়লাখনি অঞ্চলের আশেপাশেই গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে কয়লা কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। শিল্প উন্নয়নের পক্ষে এ এক বাধাস্বরূপ। এই কারণেই যানবাহনের খরচা কমানো, বিদ্যুত শক্তির প্রসার ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে আছে। পৃথিবীর কয়লাসম্পদ প্রয়োজনের তাগিদে যে হারে নিঃশেষিত হচ্ছে, বিশেষজ্ঞগণের মতে, যদি নূতনতর খনির সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে আর শত বৎসর হবে তার পরমায়ু। এই কারণে আজ দেশে-বিদেশে বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন বাড়িয়ে—অবশ্য অপেক্ষাকৃত সস্তা হবে না—কয়লার সংরক্ষণের চেষ্টা চলেছে। এই বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারে এদেশেও বহু শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হবে।

ভারতবর্ষের জলশক্তি থেকে ২৫০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যেতে পারে। পাঞ্জাব, বম্বে, দক্ষিণ ভারতে, এ উৎপাদন নানাভাবে আজ কাজে লাগছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বর্তমান জাতীয় সরকার জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের তিনটি বিরাট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, যা সফল হলে, এদেশের পুনর্গঠনের ধারাও দ্রুত যাবে। এ [illegible] পরিকল্পনায় প্রায় [illegible] লক্ষ একর জমিতে উপযুক্ত সেচ, বাৎসরিক [illegible] কোটি টাকা [illegible] খাদ্যের উৎপাদন ও ১৫ লক্ষ কিলোওয়াটের বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে। একটি পরিকল্পনায় মহানদী নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিরোধ, জল সংরক্ষণ ও সেচের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। [illegible] বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত [illegible] হয়েছে, ২৮ কোটি টাকা [illegible], ৫ লক্ষ একর জমিতে সেচ, বাৎসরিক ২ কোটি টাকার খাদ্যশস্য উৎপাদন ও ৩০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি এতে সম্ভবপর হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় [illegible] বাঁধ নির্মাণ করে ৮ লক্ষ একর [illegible] ও লক্ষ কিলোওয়াটের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। এতে [illegible] কোটি টাকা। ১৫ থেকে ২০ [illegible] শেষ হবে। তৃতীয় পরিকল্পনাটি [illegible] নদীতে ৫৫০ ফিট উঁচু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। বাঁধ নির্মাণে [illegible] ও বিহারে [illegible] লক্ষ একর জমিতে সেচের [illegible], ১০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি আর ৫ কোটি টাকার খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে।

### খনি সম্পদ

কয়লার পরেই আসে লৌহ শিল্পের কথা। ভারতবর্ষে লৌহখনি কয়লাখনির পাশেই বিস্তৃত, আর পাশেই আছে ম্যাগনেসিয়াম ও ডলোমাইট যা এই শিল্পের পক্ষে smelting-এর জন্য প্রয়োজন। লৌহখনিও উঁচু স্তরের—অর্থাৎ মিশ্রণ হারে কম। টাটা লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আজ পৃথিবীর বৃহত্তম কারখানাগুলির মধ্যে অন্যতম, এশিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ আর ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যোগাতে প্রায় সমর্থ।

লৌহসম্পদের পরেই আসে ম্যাঙ্গানীজের কথা। ম্যাঙ্গানীজ (দক্ষিণ ভারতে) মাইকা বা অভ্র (বিহারে) এই দুই খনিসম্পদে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থানীয়। অভ্র বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে প্রয়োজনীয় উপাদান। 'মোনাজাইট' খনিজ সম্পদে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী। পৃথিবীর চাহিদার ৮৮ ভাগই ত্রিবাঙ্কুর মেটায়। টিটানিয়াম আর একটি প্রয়োজনীয় ধাতু, টিটানিয়াম ডায়কসাইড উন্নত শ্রেণীর পেণ্ট ও বার্নিসের পক্ষে দরকার। এলুমিনিয়মের জন্য বকসাইটও ভারতবর্ষে যথেষ্ট; যদিও তা বিদ্যুৎ-শক্তির সরবরাহের দুর্মূল্যতায় আশানুরূপ কাজে আসে না। অন্যদিকে ভারতের খনিজ তৈলসম্পদ এদেশের চাহিদার শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র মেটাতে সক্ষম। ভরসার কথা, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী খনিজ তৈলসম্পদের অবস্থান ভারতের অতি নিকটেই—পারস্য উপসাগরে। গড়ে হতে এলয়েজ না স্পিরিট তৈরীর এদেশে প্রচুর সম্ভাবনা। কিন্তু এই বিপুল খনিজসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার আমাদের দেশে কিভাবে অবহেলিত তা ভারত গভর্নমেন্টের খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে পরামর্শদাতা অধ্যাপক ওয়াদিয়ার বক্তৃতা (১৯৪৬, ৫ই ডিসেম্বর) পরিস্ফুট:—

> বিস্তৃতির পরিপ্রেক্ষিতেও খনিজ সম্পদ ও যুক্তিসম্মত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসারে সে সম্পদের ব্যবহারে সরকার অথবা জনসাধারণ মনোযোগ দেন নাই। একমাত্র টাটার দূরদর্শিতা ও উদ্যোগের ফলে জামসেদপুরে বিরাট টাটার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ছাড়া ভারতবর্ষে খনি সম্পদ নিয়ে যা কিছু হয়েছে সবই ব্রিটিশ ও ইউরোপীয়দের চেষ্টায়। কোনও প্রাদেশিক সরকার স্ব স্ব প্রদেশের খনিজ সম্পদের উন্নতির ব্যাপারে চেষ্টা করেন নাই। বিহারই ধরুন, এই প্রদেশটি খনিজসম্পদে ঐশ্বর্যশালী, কিন্তু এখানে এমন কোনও প্রতিষ্ঠান নাই, এমন কোনও পরিকল্পনা নাই যাতে এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব। এক অভারতীয় খনিজ তৈল কোম্পানী ছাড়া ভূতত্ত্ব পর্যালোচনার আর কেউ অগ্রসর হয়নি। উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ ভূভাগ, আসামের পার্বত্যময় প্রদেশ আজো এ ভূতত্ত্ব পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। যদিও ভবিষ্যতের কোনও অসম্পূর্ণ ছবি এখন কল্পনা করা ঠিক হবে না, তবুও ভূতত্ত্ব বিষয়ক আধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দ্বারা অনাবিষ্কৃত তৈলখনি আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে। ...এই ধরণের পর্যালোচনায় আমেরিকা অগ্রণী হয়ে টেক্সাসে, পারস্য উপসাগরে, সৌদী আরবে খনিজ তৈল আবিষ্কার করে যে সফলতা অর্জন করেছে ভারতবর্ষ কি তা নির্বাক দর্শকের মতই দেখবে?

আজ ভারতের খনিজ সম্পদে এক অস্বাস্থ্যকর ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা চলেছে। কয়লা ও লৌহখনি বাদে আর অন্যান্য খনিজ সম্পদ কাঁচামাল হিসাবে রপ্তানি হয়ে যায়। ম্যাঙ্গানীজ, মাইকা, ক্রোমাইট এবং আরও পাঁচ সাতটি খনিজ পদার্থ একমাত্র বিদেশের জন্যই আহৃত হচ্ছে। ......অথচ এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ভারতের শিল্প উন্নয়নের প্রধান উপাদান হতে পারে।

গত ৪০ বৎসরে ৩২ কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ খুবই সস্তা দরে বাইরে চালান হয়ে গেছে। ...

টিটানীয়াম রপ্তানিতেও ভারত শীর্ষস্থানীয় (বৎসরে ২২ লক্ষ টন)। অতি দ্রুত এ নিঃশেষিত হচ্ছে। এই রপ্তানির দর টন প্রতি ১৫ শিলিং মাত্র অথচ টিটানীয়াম ডায়াক্সাইডের দর টন প্রতি ১০০ পাউন্ড।"

### রাসায়নিক পদার্থ

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক পদার্থ হচ্ছে সালফিউরিক এসিড। যদিও গন্ধক আমাদের দেশে প্রয়োজনানুযায়ী উৎপন্ন হয়, তবুও গন্ধক পদার্থ—যা থেকে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়—পৃথিবীতে প্রচুর পাওয়া যায় আর তা সস্তাও। ভারতবর্ষেও এই এসিড তৈরী হবার বিরাট কারখানা রয়েছে, কিন্তু কোলটার প্রভৃতি যে মূল্যবান bye product পাওয়া যায় তার উৎপাদনের আজও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। আর একটি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ কষ্টিক সোডা, এদেশে তৈরী হলেও, বিদেশ থেকে যুদ্ধপূর্বে ৩ বৎসরে গড়ে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ হন্দর আমদানী হয়েছে। ক্লোরিণ নামক bye product-এর ব্যবহারে সক্ষম নয় বলেই এদেশে কষ্টিক সোডা তৈরী হওয়ার পক্ষে একটি বাধাস্বরূপ।

কিন্তু কৃষির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক পদার্থ হচ্ছে এমোনিয়াম সালফেট।

ভারতবর্ষের জমিতে নাইট্রোজেনের ভাগ কম। ফসফোরাসের অভাব তার পরেই। নাইট্রোজেন সারের জন্য যত রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে যেমন সালফেট অব এমোনিয়া, নাইট্রেট অব সোডা, এমোনিয়াম নাইট্রেট, সায়ানামাইড, ইউরিয়া প্রভৃতি; তার মধ্যে সালফেট অব এমোনিয়াই প্রধান। বিলাতের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষি-বিশেষজ্ঞ স্যার জন রাসেলের মতে এক মণ (৮০ পাউন্ড) এমোনিয়াম সালফেট সাধারণ সারের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে প্রতি একরে ৪২ মণ ধান, ৩ মণ গম, ১৫ মণ আলু বেশী পাওয়া যাবেই। ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃষি-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বার্নসের মতে, ১০ সের নাইট্রোজেন এক একরে দিতে পারলে ফসল শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ১৯৪৩ সালে এদেশে ৬৫০০০ টন এ পদার্থটি আমদানী হয়েছিল, স্বদেশে মিলেছে ১৫০০০ টন। এর মধ্যে মাত্র ১৫৫০০ টন ধানের জন্য ব্যয় হয়েছে আর বাকীটা ব্যয় হয়েছে চা (২৮০০০ টন), ইক্ষু (২৪,৬৮০ টন), আলু ও তরীতরকারী (১১,২০০ টন) কফি ও রবার গাছ উৎপাদনে (১১২০ টন)। রাশিয়ায় যুদ্ধ-পূর্বে ১০ বৎসরে শূন্য থেকে সুরু করে বৎসরে ৪০ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার হয়েছিল। জাপান ১ কোটি ৬০ লক্ষ একরের জন্য ৪০ লক্ষ টন সার দিয়ে ভারতবর্ষের চেয়েও ৩ গুণ শস্য উৎপাদনে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য এই রাসায়নিক পদার্থটি ব্যবহারের জন্য জমিতে উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা থাকা উচিত। খাদ্যশস্য উৎপাদনে এ ধরণের জমির পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি একর (৪২ কোটি একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত আর ৪২ কোটি একর জমি রয়েছে উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে।)

আমাদের দেশের খাদ্যশস্যের ঘাটতির একটি হিসাব, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রচারিত এক পুস্তিকায় এইভাবে দেওয়া হয়েছেঃ—

বর্তমান (১৯৪৫) লোকসংখ্যা—৪০ কোটি
আট বৎসর পরে (১৯৫৩) „ —৪৫ কোটি
বর্তমান উৎপাদন—৬ কোটি টন খাদ্যশস্য
আট বৎসর পরে, বর্তমান খোরাকীর
হারে প্রয়োজন—৬·৭৫ কোটি টন
শতকরা ১০ ভাগ খোরাকী
বৃদ্ধির জন্য—·৬৭৫ „

মোট প্রয়োজন ৭·৪২৫ „
ঘাটতি—১ কোটি ৪০ লক্ষ টন

এই পুস্তিকার বিশেষজ্ঞগণের মতে স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনায় (অর্থাৎ ৮ বৎসরের মধ্যে) এই ঘাটতির পূরণ হতে পারে যদি এই ৯ কোটি একর জমিতে উপযুক্ত (ডাঃ বার্নসের হিসাব মতে) পরিমাণ এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগে জমির উৎপাদন বাড়ানো যায়। ভারত সরকার ধানবাদের নিকট সিন্দ্রিতে একটি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যুদ্ধ থামলেই।

### যান্ত্রিক শিক্ষা

জাহাজ নির্মাণ ও যানবাহনের উন্নতি, আধুনিক সমর প্রস্তুতি, শিল্প প্রসারের জন্য, খনিজ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য, রাসায়নিক পদার্থ নির্মাণের জন্য যে সব পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মূলে রয়েছে যান্ত্রিক শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা। এ শিক্ষার ওপর এখনো আমাদের দেশের লোকের 'এ হবার নয়' গোছের একটা হতাশার ভাব বর্তমান। বহুদিনকার অনভ্যাসে চিন্তার জড়তাই এর কারণ। পরাধীনতার পক্ষাঘাতে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অচেতন ভাব আজো আমাদের ঘিরে রেখেছে, ভুলে গেছি, আচার্য পি সি রায় দেখিয়েছেন যে, একদা এই ভারতের গৌরবময় যুগে এদেশে ধাতব বিদ্যার প্রভূত অনুশীলন হয়েছিল যা সেদিন বিদেশীয়ের ছিল বিস্ময়।

এইখানেই আসে স্বাধীনতার ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা যা মানুষকে স্বকীয় শক্তি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, যখন সতেজ সবল হয়ে উঠবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় দুর্গম পথও হয়ে ওঠে সহজ।

কিন্তু এই স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার মধ্যে মনোবল ও বৈজ্ঞানিক বল দুয়েরই প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক বল সম্পর্কে ডাঃ মেঘনাদ সাহা ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে একটি প্রবন্ধে ইতিহাসের প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ এবং লৌহ যুগের উল্লেখ করে বলেছেন—

ইতিহাসের নৈতিক শিক্ষা এই যে, যদি কোনও জাতি শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করতে অক্ষম হয়, ততোধিক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমৃদ্ধিশালী জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে জাতি আপন স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে কোনও ক্রমেই সক্ষম হবে না।

দার্শনিক হয়তো বলবেন এ দৌড়ের শেষ নেই; বিজ্ঞানের অনুশীলনে হয়তো তার সীমারই শেষ নেই, কিন্তু ডাঃ মেঘনাদ সাহার এ উক্তি অতি কঠোর ঐতিহাসিক সত্য।

আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিল্প-ক্ষেত্রে কতখানি বিকেন্দ্রীকরণের অনুকূল তা অতি সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবনীয়।

### এ দেশের কৃষি

শিল্পায়নের বিপুল সম্ভাবনা ও এদেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে তার অপরিহার্যতা স্বীকার করে নিলেও একটি প্রশ্ন বাকী থাকে, প্রত্যেক শ্রমক্ষম ব্যক্তিকে কি তা কাজ দিতে সক্ষম? এ দেশের পক্ষে কি এই বিপুল শিল্প সম্প্রসারণ বর্তমানে সাধ্যায়ত্ত?

বর্তমানে আমাদের দেশে কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে কোন্ কাজে কতজন নিযুক্ত এর একটা হিসাব করা হয়েছিল। সে হিসাবটি এইঃ

| | কর্মীসংখ্যা | কৃষিতে | খনিতে | শিল্পে | যানবাহনে | ব্যবসায় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভারত | ১৫.৪ কোটি | ১০·২ কোটি | ৩ লক্ষ | ১½ কোটি | ২৩ লক্ষ | ৭৯ লক্ষ |
| যুক্তরাজ্য | ৪½ কোটি | ৮৪লক্ষ | ৯লক্ষ | ১ কোটি ৫ লক্ষ | ৩১ লক্ষ | ৭৫ লক্ষ |

| | সৈন্য বিভাগে | পুলিশে | শাসনব্যবস্থায় | ডাক্তার, পুরোহিত ও উকিল প্রভৃতি | গৃহকর্মে |
|---|---|---|---|---|---|
| ভারত | ৩ লক্ষ | ৫ লক্ষ | ১০লক্ষ | ২৩ লক্ষ | ১ কোটি ৯ লক্ষ |
| যুক্তরাজ্য | | | ১৭লক্ষ | ৩৩ লক্ষ | ৪০ লক্ষ |

১৫·৪ কোটি কর্মী লোকের মধ্যে ১০·২ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৬৬ জন লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল, অন্য দিকে যুক্তরাজ্যে, যা আয়তনে ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ সেখানে মাত্র ১৬ জন লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষির ওপর জনসংখ্যার এই বিপুল চাপ ভারতবর্ষের আর্থিক পরিস্থিতির এক বিশেষত্ব। অথচ একদিকে জমির ওপর এই অত্যধিক চাপ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাহীনতা, ধন বণ্টনের বিপুল অসমতা, অন্য দিকে এ দেশের কৃষি অনুন্নত, অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ এক ব্যবসা।

সারের অভাবে, সেচের অভাবে উর্বরাশক্তির [illegible] বার্ষিকী বৃষ্টিপাতের ভরসায় সনাতনী যন্ত্রের শক্তিতে চালিত হওয়ায় কৃষি শুধু দুর্বল নয়, জমির স্বত্বহীনতার অনিশ্চিত অবস্থায় উপস্বত্বভোগীদের খাজনা [illegible] ফলে [illegible] হ্রাস [illegible] কুটিরশিল্প ও ছোটখাট শিল্পের নিষ্পেষিত কৃষকের অবস্থা আজ শোচনীয়। [illegible] হ্রাস [illegible] আয় [illegible] কর্তিত ফসলের দিকেও নানা খাজনা ও দেনার দায় মেটাতে কৃষককে হাত [illegible]। যুক্তরাজ্যে এই কারণেই [illegible] ফসল মজুদ রাখা আর কর্তিত [illegible] সেই মজুদ ফসলের সাহায্যে সমতা রাখার চেষ্টা হয়েছে, তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের দেশের কৃষি বারিপাতের ওপর এত নির্ভরশীল যে দেশের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে তাল না রেখে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই কারণেই কৃষির মূল্য মান ঠিক রাখা মজুদের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, এ দেশের সে ক্ষমতা সর্বনিম্ন।

জমির স্বত্বহীনতা উৎপাদনের পক্ষে এক পরম বিঘ্নস্বরূপ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্বের ফলে কৃষকের খাজনার হার ও দায় বৃদ্ধি পায়। অথচ তার এতই দুর্ভাগ্য যে খাজনা সে মধ্যস্বত্বভোগীদের জোগান দেয় হয়তো তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র জমির উন্নয়নে বা দাতব্য চিকিৎসালয় বা শিক্ষায়তনের মারফৎ তার সম্পদ বৃদ্ধি করে।

শিল্প উন্নয়ন যদি আশানুরূপও বৃদ্ধি পায় তবু এ দেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য যথোপযুক্ত সংখ্যক কাজের সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। গান্ধী-প্ল্যান শিল্প-উন্নয়নের এ দুর্বলতার উল্লেখ করেছে। বোম্বের পরিকল্পনাকারীরাও তা স্বীকার করেছেন। তাই তাঁরা শিল্পোন্নয়নে জমির চাপ কিছু কমবে এইটে দেখিয়ে সুপারিশ করেছেন, কুটিরশিল্প, ও যত দূর সম্ভব শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে।

### শিল্প প্রসারের সম্ভবপরতা

অন্য দিকে, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা তদুপযোগী গবেষণা ও বহু শিক্ষা রাতারাতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়, অন্তত পক্ষে দুই তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লাগবে, রাষ্ট্রের ও জনশক্তির সহায়ে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে যদি তা সম্ভব হয়। আর এই শিল্প উন্নয়নের প্রভূত মূলধন, দেশ রক্ষার খরচ যোগান দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে দুরূহ হবে যদি না শতকরা ৮০ জন অধিবাসীর আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধির ফলে এই অর্জিত অর্থে জীবন ধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খরচগুলি বহন করেও বেশ কিছু জমাতে পারে। এই দরিদ্র দেশের সরকারী তহবিলের হিসাবও অন্যান্য দেশের তুলনায় খাটো। যথাঃ—

ভারতবর্ষ ১৯৩৯-৪০

| | কেন্দ্রীয় | প্রাদেশিক |
|---|---|---|
| আয় | ১২৬ কোটি টাকা | ৮৯ কোটি টাকা |
| ব্যয় | ১২৬ ,, | ৮৮·৬ ,, |
| মাথাপিছু ব্যয় | ৭ টাকা | |

যুক্তরাজ্য ১৯৩৯

| | | |
|---|---|---|
| আয় | ৫৬৪·৪ কোটি ডলার | ৫৫৭ কোটি ডলার |
| ব্যয় | ৮৭৬·৫ ,, | ৪৪৭ ,, |
| মাথাপিছু ব্যয় | ১০১ ডলার | |

গ্রেটব্রিটেন
১৯৩৯
১০০·৬ কোটি পাউণ্ড
১০১·৮ ,,
২২½ পাউণ্ড

অস্ট্রেলিয়া
১৯৩৯-৪০
১১·১ কোটি পাউণ্ড
১৪ ,,
২১ পাউণ্ড

ভারতবর্ষ মার্কিন নয় যে কোটি কোটি ডলার ব্যয়ের ক্ষমতা তার করায়ত্ত; গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ভারতবর্ষ রাশিয়াও নয় যে, সর্ববিধ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে হবে সঞ্চিত। ভারতবর্ষের বাজেট সে তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন, তার আর্থিক ইতিহাস ঘাটতিরই, তার অর্থ মন্ত্রীর অনুসন্ধান রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কর বসাবার উপযুক্ত ক্ষেত্রের জন্যে!

যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের বৈদেশিক দেনার দায় আজ নাই, বরঞ্চ বিপুল স্টার্লিং ব্যালেন্স তার জমার খাতায়! কিন্তু এ স্টার্লিং ব্যালেন্স হাতে পাওয়াটা নির্ভর করছে ইংলণ্ডের সঙ্গে চুক্তির ওপর, ইংলণ্ডের এ টাকা পরিশোধ করবার ক্ষমতার ওপর। আর্থিক পরিকল্পনায়, অবশ্যই এ স্টার্লিং ব্যালেন্স প্রভূত সহায়তা করবে, কিন্তু সর্বোপরি পরিকল্পনার বিপুল সাফল্য নির্ভর করবে জাতির উদ্বৃত্ত অর্থের ওপর। বর্তমানে জাতির উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই অনুমান করা হয়, কারণ ব্যাঙ্কে, সমবায় সমিতিতে, ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে, গভর্নমেণ্ট সেভিংস একাউণ্টসে আমানতের (ডিপোজিটের) পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক পরিকল্পনা অবশ্যই মূলধন [illegible] জন্য আয় বৃদ্ধি করবে। এই কারণে এই উদ্বৃত্ত অর্থ—বা ডিপোজিট হিসাবে রয়েছে সরকার গ্রহণ করেও এই পরিকল্পনার ব্যয়ভার চালাতে পারেন। কিন্তু যে পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী সে পরিকল্পনায় এইভাবে মূলধন নিয়োজিত হলে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি—বৃহত্তম জনসাধারণেরই মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির ওপরই তা নির্ভর করবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন ভারতের বৃহত্তম জনসাধারণের অবস্থা আজও এমনিতর অবস্থায় উন্নীত হয় নাই যে, তাদের খরচ পুষিয়ে আয় উদ্বৃত্ত হয়। যদি বা হয় তাদের জমা টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা থাকলেও ব্যাঙ্কে খাটাবার মত অর্থ উদ্বৃত্ত হয়নি। এমনি অবস্থায় ঋণ আসবে তাদেরই কাছ থেকে যারা [illegible], উদ্বৃত্ত অর্থ [illegible]। এ ঋণের সুদ বছরে বছরে বাড়তেই পারে। যদি সে সুদ তাদের ওপর প্রত্যক্ষ কর বসিয়ে আদায় করা হয় তবে বলবার কিছু নেই। অথবা যদি সে ঋণের টাকায় বৃহত্তম জনসাধারণকে পর্যাপ্ত কাজ দিয়ে তাদের আয়কে যথোপযুক্ত বাড়িয়ে তোলা হয় তবেও তা ভালই। অন্যথায় এ অবস্থায় আয়ের অসমতা আরও বৃদ্ধি হতে পারে কারণ ঋণের দায় বহন করবে তখন সমগ্র জাতি। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে উদ্যোগে কাজ শুরু করলে রাষ্ট্রের পক্ষে এ ঝুঁকি নিতে হয়।

অন্যদিকে, শিল্পক্ষেত্রে ভারতের প্রতিযোগী দেশসমূহের শক্তি সামর্থ্য প্রভূত। ভারতের

শিল্প বিস্তার তাদের চেয়ে অনেক দেরীতে আরম্ভ হচ্ছে। এ অবস্থায় ভারতের শিল্প উন্নয়নের যে বাজার তার ক্ষেত্র তো ভারতবর্ষকেই হতে হবে। ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যেই হবে সে শিল্পের চাহিদা। চাহিদা আধুনিক অর্থ-নীতির পরিভাষায় effective demand. সে চাহিদার পশ্চাতে সামর্থ্য থাকে। ভারতবর্ষে আজ জিনিসের বিস্তর প্রয়োজন আছে, কিন্তু কতখানি effective demand বা চাহিদা আছে তা নির্ণয় করা শক্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ পর্যন্ত যে ভারতের শিল্প প্রসারণ আশানুরূপ হয়নি তার অন্যতম কারণ ভারতবর্ষের জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব। যুদ্ধের আমলে মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলের ক্রয় অধিকার বেড়েছে সত্য, কিন্তু তা ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ অংশেই হয়েছে। তা ছাড়া কতখানি ব্যবসাদার মজুদদার, মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে কতখানি কৃষক মজুরের হাতে এসে পেঁৗছেছে তা বলা শক্ত (যদিও এ সম্বন্ধে এ দেশে তথ্য সংগ্রহের কোনও উপায় নেই)। যেখানে তথ্যের এত অভাব সেখানে অনুমান অথবা উদ্দেশ্য অনুযায়ী অর্থ বানানো সহজেই চলে। ইনফ্রেশন কথাটির ভূত আমাদের স্কন্ধে আজো এমনি বিদ্যমান যে, আমরা শহর অঞ্চলের ধনস্ফীতি দেখে পল্লী অঞ্চল সম্পর্কেও একটা ধারণা করে নিই। অথচ সমাজের স্তরবিভাগের ফলে, যানবাহনের দুর্মূল্যতায়, শহর পল্লী অঞ্চল বিচ্ছিন্নতায়, এই মুদ্রাস্ফীতির ফল গড়াতে গড়তে কতখানি কোথায় যে প্রভাব বিস্তার করেছে, সে সম্বন্ধে হঠাৎ সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে যদি বা কিছু হাতে এসে পেঁৗছায়, পূর্বেকার বিপুল দেনার দায় পরিশোধে, অনাদায়ী ও দেয় খাজনার পরিশোধে সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরই প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির ফলে তার মোটা অংশও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। মোট কথা ভারতের কৃষকের জীবনযাত্রার মান, আয়ের পরিমাণ আজও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে এত নিম্ন যে, সর্বাগ্রে তাদের অবস্থার পরিবর্তন না হলে শিল্পোন্নয়ন ও দেশরক্ষার বিপুল খরচ যোগানের কোনও পরিকল্পনাই কার্যকরী হয়ে উঠবে না। (একদা লেনিনও এমনিতর অবস্থায় তার কম্যুনিজম থেকে এক পা পশ্চাতে হটেছিলেন)।

### পরিশেষ

মূলতঃ, অর্থিক পরিকল্পনা আজ জাতির জীবনের প্রশ্ন। আজ কোনও একদিকের সমস্যার সমাধান নয়, সমগ্র জীবনের, সমস্ত বিভাগের নানা সমস্যার সমাধানই আজ কাম্য। একের সঙ্গে আর এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত যে, একমুখীন চিন্তাধারা আজ পরিবর্জনীয়। পৃথিবীর নানা দ্বন্দ্ব, বাদ-বিসংবাদএর মধ্যে জাতি আজ স্বীয় ক্ষমতার সার্বভৌম অধিকার ফিরে পেয়েছে। সে জাতির পক্ষে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল সমস্যাই আজ চিন্তনীয়। এই কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা কৃষি শিল্প দেশরক্ষা সবই আজ রাষ্ট্রের পক্ষে মূল্যবান, প্রতি ক্ষেত্রেই আজ একযোগে উন্নতির আহ্বান। বাস্তবের পটভূমিকায় কৃষি ও শিল্পের বিরোধ তাই নিরর্থক।

সমস্যা আজ জাতির সব রকম সম্পদের (ভূমি, বন, নদী, খনি, বুদ্ধি ও শ্রম) যথাযথ পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার আর তারই সঞ্জাত আয় বৃদ্ধির এমনভাবে বণ্টন যা সেই ব্যবহারের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয় না, বরং সাহায্যকারী হয়ে সেই আয়কেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ শ্রম ও বুদ্ধি সম্পদের অধিকারী কাউকেই বঞ্চিত করতে চায় না, আবার এক যে অপরকে বঞ্চনা করবে তাও সহ্য করবে না। এই উভয়ই সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের পক্ষে মারাত্মক, অধিকারবাদ (owner-ship) এই নীতি দ্বারাই এ দেশে চালিত হবে। এ নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল, বলা বাহুল্য, বিত্তের অসমান ব্যবস্থা দূরীকরণে, অকেজো সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনে, শ্রেণীগত প্রভাব বিস্তারের বিলুপ্তিতে, জনসাধারণের শুধু জীবনযাত্রার নিম্নতম মান সংরক্ষণে নয়, তাদের আয়ের দ্রুত সম্প্রসারণে। জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ আজ ভূমির ওপর নির্ভরশীল। তাদের আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি হবে উন্নতির প্রধান ও প্রথম ধাপ।

তাদের সংগঠন—বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠনে তাদের উৎপাদন প্রণালীর উন্নতিতে—বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনে—তাদেরই জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দতর করবার জন্যে—শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ সরবরাহে, পথঘাট উন্নয়নে, যানবাহন বৃদ্ধিতে, উন্নত গৃহ নির্মাণে ও সজ্জায় তাদেরই আয় বৃদ্ধিতে (মধ্যবর্তী লোপ, মধ্যস্বত্ব বিলোপে; মূল্যমানের সমতা রাখায়)—যা কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তনে ও বলিষ্ঠ দ্রুততায় তাই সম্পাদন করাই পরিকল্পনার সর্বাগ্রগণ্য কাজ। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন দেশের দেশরক্ষা ও বাণিজ্য-পোত নির্মাণ, আধুনিক শস্ত্র নির্মাণ, বিমানপোত সংগ্রহ, যানবাহন নির্মাণ অতি দরকারী। এর জন্যেই চাই শিল্পের প্রসারতা, লৌহ ইস্পাত, কয়লা বিদ্যুতের উৎপাদন ও পূর্ণ ব্যবহার, যান্ত্রিক শিক্ষা ও গবেষণা, খনিজ পদার্থের যুক্তিসম্মত ব্যবহার! পরিকল্পনার এ ধাপের পরে ধাপ, স্তরের পরে স্তরের রেখাঙ্কিত গতি পথ।

স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে যে জনশক্তি সহসা আত্মসচেতন হয়ে অধীর কর্তব্যের প্রেরণায় পথ খুঁজে বেড়ায় সে জনশক্তিই জাতির অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে সর্বাধিক শক্তিমান। পরিকল্পনার সাফল্যের পক্ষে তাই যেমন জনগণের আগ্রহ ও অধীরতা থাকা চাই, তেমনি তাদের কর্ম প্রেরণাকে সুসংবদ্ধ করার জন্যেই চাই জনগণের সঙ্গে পরিকল্পনার যোগাযোগ। পরিকল্পনার সাফল্য তো তাদেরই বুদ্ধি, কর্ম ক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে। রাশিয়ায় তাই পরিকল্পনা শুধু মন্ত্রিসভার পরিকল্পনা সংসদই রচনা করতেন না, যারা কর্মী তারাও এই রচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। পত্রিকায় পত্রিকায়, নানা পুস্তিকার মারফতে তা হতো প্রচারিত আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে; জনগণও তাই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে সাফল্যের পক্ষে তা কতদূর! আবার পত্রিকার মারফৎ তার সাফল্যের পরিমাণের অঙ্ক সময়ে সময়ে দেশে ছড়িয়ে দেয়া হোত। সাফল্যের অঙ্ক যেখানে নির্দিষ্ট, পিছিয়ে পড়লে জনশক্তি, রাষ্ট্রশক্তি সচেতন, সক্রিয় হয়ে তা শুধরে নেবার চেষ্টা করে। পরিকল্পনার সাফল্যের পক্ষে তা একান্ত প্রয়োজনীয়।

# হিন্দুসমাজ ও তাহার ইতিহাস

শ্রীনির্মলকুমার বসু

কবিরপন্থী ভগৎ—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রায়পুর এবং বিলাসপুর জেলা হইতে কবির সম্প্রদায়ের প্রভাব রাঁচি জেলায় প্রবেশলাভ করে। সম্বলপুর জেলায় যেমন কবিরপন্থীদের প্রাদুর্ভাব আছে, তেমনই গাংপুর এবং রাঁচি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে সিমডেগা অঞ্চলের উরাওঁগণ ঐ আন্দোলনে কিছু পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

কবিরপন্থিগণ অতিশয় শুদ্ধাচারী। সেইজন্য তাহারা প্রাচীনপন্থী উরাওঁ পরিবারে কন্যার বিবাহ দিলেও কন্যাকে আর বাপের বাড়িতে বাপ মায়ের জন্য ভাত বা ডাল রাঁধিতে বা পরিবেশন করিতে দেয় না। এমনকি খাইবার সময়ে তাহাকে এক পংক্তিতে বসিতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না।

উরাওঁ জাতির মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম যথেষ্ট প্রবেশলাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু মুণ্ডাদের বেলায় যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনই অখৃষ্টান উরাওঁগণ তাহাদের প্রভাবে বিশেষ বদলায় নাই। সম্ভবত শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, দেশে যখন অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থা হয়, সেই সময়ে খৃষ্টান হইবার হিড়িক পড়িয়া যায়। কিন্তু সুদিন ফিরিয়া আসিলে দুই একজন পুনরায় প্রাচীন পথে ফিরিয়া আসে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রভাব স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। হিন্দুর তরফ হইতে ধর্মপ্রচারের উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা হয় না অথচ উরাওঁগণ স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, কেহ বা বেশি, কেহ কম অনুসরণ করে। ইহার মাত্রা যে কতদূর প্রবল হইতে পারে তাহা টানা ভগৎ বা কুড়ুখ-ধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তারের আলোচনা হইতে বোঝা যায়।

**টানা ভগৎ আন্দোলন**

গুমলা মহকুমার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার অধীন বেপারিনওয়াটোলি গ্রামে যাত্রা উরাওঁ নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। ১৯১৪ সালে তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। সে ব্যক্তি ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে প্রচার করে যে উরাওঁ জাতির সর্বপ্রধান দেবতা **ধর্মেস** তাহাকে প্রত্যাদেশ দিয়াছেন যে, ভূতপ্রেতের পূজা এবং ঝাড়ফুঁকের বিদ্যা পরিহার করিতে হইবে, সর্বপ্রকার পশুবলি, মাংসাহার, মদ্যপান বিলাস প্রভৃতি হইতে বিরত থাকিতে হইবে। চাষবাস করাও চলিবে না; কারণ চাষের দ্বারা দারিদ্র্য ঘোচে না, দুর্ভিক্ষ নিবারণ হয় না, উপরন্তু গো-জাতিকে অকারণ কষ্ট দেওয়া হয়। উরাওঁগণের পক্ষে অন্য জাতির নিকট কুলিমজুরের কাজ করাও চলিবে না। শীঘ্রই সুদিন আসিতেছে, তখন উরাওঁদিগকে ইহলোকে বা পরলোকে আর কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। উপরন্তু ভগবান যাত্রাকে এমন কতকগুলি সঙ্গীত বা মন্ত্র দিয়াছেন যাহার ফলে জ্বর-জ্বালা, চোখওঠা ও অন্যান্য রোগ সহজে সারিয়া যাইবে। প্রায় ঐ সময়ে ঘাঘরা থানার বাটকুরি গ্রামে এক উরাওঁ স্ত্রীলোক পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া একদিন অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং মুখে অহরহ বোম্ বোম্ শব্দ করিতে থাকে। জ্ঞান হইলে সেও যাত্রার মত এক ধর্মনীতির কথা প্রচার করে। দেখিতে দেখিতে সমগ্র রাঁচি জেলায় উরাওঁ জাতির মধ্যে আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে এবং স্থানে স্থানে যাত্রার মত নূতন নূতন গুরুর আবির্ভাব হইতে থাকে। অবশেষে ইহা রাঁচি জেলার সীমানা ছাড়াইয়া পশ্চিমে পালামৌ এবং উত্তরে হাজারিবাগ জেলার উরাওঁগণের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নূতন ধর্মের নাম হইল **কুড়ুখ ধরম**, কারণ উরাওঁ জাতির অপর নাম কুড়ুখ।

উরাওঁদের বিশ্বাস, মুণ্ডা জাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে তাহাদের মধ্যে যে শুদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত ছিল, ইহা সেই ধর্ম। কুড়ুখ ধর্ম আশ্রয় করিয়া ভক্তগণ অতিশয় শুদ্ধাচারী হইয়া উঠিল। এমনকি স্থানবিশেষে চাষ ছাড়িয়া দিয়া তাহারা জমিদারের নিকট জমির ইস্তফা দিল। ইহাতে স্বভাবত জমিদার এবং মহাজন-শ্রেণী আতঙ্কিত হইয়া পুলিশের সহায়তায় আন্দোলনকে দমন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু টানা ভগৎগণ কাহারও সহিত বিরোধে লিপ্ত হইত না। প্রতি গ্রামে, স্বীয় সমাজে, যাহা কিছু অশুদ্ধ বা অকল্যাণের বলিয়া মনে হইত, তাহা 'টানিয়া' ফেলিয়া দিবার জন্য সমবেতভাবে কীর্তন করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। এইজন্য কুড়ুখ ধর্মাবলম্বীদের নাম **টানা ভগৎ** হয়।

টানা ভগৎ আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস শরৎচন্দ্রের উরাওঁ ধর্ম ও আচার সম্পর্কে লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায়। অমঙ্গল দূর করিবার জন্য কি ধরণের কীর্তন করা হইত তাহার একটি উদাহরণ, অনুবাদসহ নীচে দেওয়া হইল। কীর্তনটি স্থানীয় হিন্দী ভাষায় রচিত।

**টানা বাবা টানা ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**টানা বাবা টানা কোণা-কুচি ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**টানা বাবা টানা লুকাল ছাপল ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**টানা বাবা টানা গাড়া ঢিপা ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**টানা বাবা টানা পেসল পাসল ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**টানা বাবা টানা ডাইনি ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**চন্দ্র বাবা সুরজ বাবা**
**ধরতি বাবা তারেগণ বাবা**
**নামসে অরজি মাংগাতে হঁয়**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**ডাইনিকে নাসল থাপল ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**বাপাকে মানল দেওয়া ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**আজা পর আজা মানল দেওয়া ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**মুরগি-খাইয়া ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**কাড়া-খাইয়া ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**ভেড়া-খাইয়া ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**
**আদমি-খাইয়া ভূতানিকে টানা**
**টানা বাবা টানা টান টোন টানা**

অনুবাদ,

টানো বাবা টানো ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো কোণা-ঘুঁজির ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো লুকিয়ে চুরিয়ে যে সব ভূত আছে তাদের টানো টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো গাড়া ঢিপিং ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো খুনকরা লোকেদের ভূতকে টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো ডাইনীদের (অধীন) ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। চন্দ্র বাবা, সূর্য বাবা, ধরিত্রী বাবা, তারাগণ বাবা, নাম ধরিয়া নিবেদন করিতেছি—টানো বাবা টানো টান টোন টানো। ডাইনীরা যে সব ভূতকে (নষ্ট বা স্থাপিত করিয়াছে) তাহাদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। (আমাদের) বাপেরা যে সব ভূতের কাছে মানত করিত তাদের টানো। টানো বাবা টানো টান টোন টানো। ঠাকুরদাদা এবং পোঠাকুরদাদা যে সব ভূতের কাছে

মানত করিত তাদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। মুরগি-খেকো (যে সব দেবতার কাছে মোরগ বলি দেওয়া হয়) ভূতদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। মহিষ-খেকো ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। ভেড়া-খেকো ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। মানুষ-খেকো ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো।

১৯১৪-১৫ সালে প্রথম মহাসমর চলিতেছিল বলিয়া চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে মাঝে মাঝে জার্মান বাবার নিকটেও উরাওঁদের প্রার্থনা পেঁ‌ৗছিত। তেমনই আবার ভূতপ্রেতের মত অপর যে সকল বস্তুকে উরাওঁগণ জাতির পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করিত, সেগুলিকে উৎখাত করিবার জন্যও তাহাদের নিবেদনের অন্ত ছিল না। এইরূপে কয়েকটি পদ নিম্নে উধৃত হইল—

**টানা বাবা টানা অগ্নিবোটকে টানা**
**টানা বাবা টানা রেলগাড়িকে টানা**
**টানা বাবা টানা বাইসিকিলকে টানা**
**টানা বা টানা**

জাতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দুদের চোখে যাহা কিছু হেয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহাই উৎপাটনের জন্য টানারা চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা, নাচ, গান, উৎসব আনন্দ, রঙিন কাপড় পরা, কাপড়ের পাড়ে কাজ করা, ইত্যাদির উপরে আক্রোশ ভূতপ্রেতের উপর আক্রোশের মতই ধাবিত হইল। এই বিষয়ে উরাওঁ ভাষায় রচিত শিক্ষামালার এক দীর্ঘ অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল। পাঠক বহুস্থানে পুনরুক্তি দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু উরাওঁ জাতির চিন্তাধারা কেমন তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়ার জন্য কিছু ধৈর্যের প্রয়োজন। অনুবাদটি পড়িলে উরাওঁ সংস্কৃতির প্রাচীন বা প্রচলিত রূপের সম্বন্ধেও যথেষ্ট ধারণা জন্মিবে। উরাওঁ টানা ভগৎগণের বিশ্বাস যে নিম্নের কথোপকথন বা পূর্বোধৃত সঙ্গীতের মধ্যে কিছুই মানুষের রচনা নয়, ঈশ্বর প্রেরিত শব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতা, বল প্রাণীহত্যা করিব কিনা?—না। মাংস, মাছ, কাঁকড়া খাইব কিনা?—না। পাখীর মাংস, মোরগ, শূকর, ছাগী বা ছাগের মাংস খাইব কিনা?—না। তবে জীবহত্যা একেবারে বারণ; জ্ঞানত জীবহত্যা একেবারে বারণ। হে বাবা, ভূতপ্রেত থাকিবে কিনা?—থাকিবে না, পলাইয়া গিয়াছে। হে বাবা, ডাইন ডাইনী থাকিবে কিনা?—থাকিবে না, পলাইয়া গিয়াছে। হে বাবা, ওঝার বিদ্যা থাকিবে কিনা?—না, পলাইয়া গিয়াছে। হে বাবা, পচুই ও মদ খাইবে কিনা?—না, খাইলে 'নরককুণ্ডে' যাইবে। হে বাবা, আখড়া (=গ্রামে নাচের জায়গা) ও ঝাকড়া (=গ্রামের পুরানো বৃক্ষ সমষ্টি, যেখানে গ্রাম-দেবতার অধিষ্ঠান=মুণ্ডাদের সারনা) থাকিবে কিনা?—না, শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হে বাবা, কোনও পরব থাকিবে কিনা?—না, থাকিবে না, চলিয়া গিয়াছে। হে বাবা, যাত্রানাচ ও শিকারের উৎসব থাকিবে কিনা?—না, থাকিবে না, শেষ হইয়া গিয়াছে।

করম, জিতিয়া, দশহরা, সোহরাই, দেওথান, জাদুরা, ফাগুয়া, খাদ্দি পরব; সব রকম নাচ; বাজনা বাজানো, যথা মাদল, নাগরা, ঝাঁঝ; চামর, টোটা, টুররা, মাথায় পাগড়ি, রঙিন নেঙটি, কোমরবন্ধ; গহনার মধ্যে চাঁদোয়া, পুঁথি, হাঁসুলি, বালা, সোইঙ্কো, ঘুঙুর; ছেলে বা মেয়েদের ধুমকুড়িয়াতে (=মুণ্ডাদের গিতি-ওড়া) শয়ন, যুবকযুবতীর অবাধ মেলামেশা, পরস্পরকে ধরা, হাত ধরাধরি করা, অন্যায় সহবাস; (কাপড়ের) পাড়ে কাজ করা, হাতের বালা, কসৌটি বালা, হাত বা পায়ের আঙুলে আংটি পরা, কানের দুল, উল্কি পরা, কান বিঁধানো, কানে বড় মাকড়ি পরা বা নাকে গহনা পরা, কানের ফুটাতে কাঠি গোঁজা, ঝিকা-চিল্পি ও মুদ্রি নামে গহনা পরা; সেঙ্গাৎ বা মিতালি পাতানো; কলিযুগে যেরূপ বিবাহরীতির চলন আছে; মদ তৈয়ারি করা; পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জলতর্পণ করা। বিবাহের ভোজে মোরগ বা শূকর মারা, মদ খাওয়া শূকরের মাংস রাঁধা, মদ ছাঁকা, মদ অপরকে খাইতে দেওয়া; বিবাহ-অনুষ্ঠানে দুই বৈবাহিকের পরস্পরকে চুম্বন, পরস্পরে কাঁধে চড়া, পরস্পরকে আলিঙ্গন করা, উভয়ে একত্র পচুই-এর তলানি ভাতের ডেলা খাওয়া; শূকরের মাংস পরিবেষণ করা, বিবাহে চুলি নিয়োগ করা, বিবাহে গান গাওয়া বা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রন্দন করা, সিঁদুর দেওয়া, বিবাহে দাণ্ডা-কাট্টা অনুষ্ঠান—এই সমস্ত খারাপ রীতি নিষিদ্ধ হইল।

বল বাবা, এই সকল খারাপ রীতি নিষিদ্ধ হইল কিনা?—হাঁ নিষিদ্ধ হইল। বল, পুরাতন রীতি অনুযায়ী আখড়া এবং ঝাকড়া থাকিবে কিনা; আমরা করম, জিতিয়া, দসহরা, সোহরাই উৎসবে; পূর্বের মত বিবাহ উপলক্ষে অথবা জাদুর, সরপুল, ফাগুয়া এবং খাড়িয়া নাচ করিতে পারিব কিনা?—না, থাকিবে না। করম নাচ থাকিবে কিনা?—না। আখড়া যাওয়া চলিবে কিনা?—না। অনিয়মিত সহবাস চলিবে কিনা?—না। যুবকযুবতীর অবাধ মেলামেশা চলিবে কিনা?—না। মাদল, নাগরা, ঢাক বাজানো চলিবে কিনা?—না।

গোবর কুড়ানো, মাছ ও কাঁকড়া ধরা, (এখনকার মত) অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ইঁদুর ধরা, ইঁদুর মাছ পাখী পোড়াইয়া খাওয়া বারণ। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করা বারণ। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন মাসে গোবর কুড়াইতে গিয়া উঁচু নীচু জমির আড়ালে (চালছোলা) ভাজা লইয়া যুবকযুবতীতে লুকাইয়া যেমনভাবে শয়ন করে, তাহা বারণ। বালকবালিকার পক্ষে 'সভাপতি' (নামক) ভূত বা অন্য ভূতের পূজা বারণ। মৃতের নামে জল উৎসর্গ বারণ। মুঞা নাকেচ, দারহা, দেশওয়ালি ভূতের নামে পূজাপাঠ বারণ। মোরগ বলি, বলি দেওয়ার জন্য ছুরিতে শান দেওয়া; মহিষ বলি, শূকর বলি, বলি দেওয়ার জন্য টাঙ্গীতে শান দেওয়া; ভেড়া বা ষাঁড়কে মারিতে মারিতে বলি দেওয়া; মৃতের নাম স্মরণ করা; মদ খাওয়া, পচুই খাওয়া, পচুই-এর জন্য বাখর তৈয়ারি করা, বাখর কেনা, মদ চোলাই করা, মদের দোকানে যাওয়া, পচুই খাওয়া, মদ খাওয়া; কোন মানুষের সঙ্গে বিবাদ করা, অপরের দ্রব্যে লোভ করা—সব বারণ।

আগে উরাওঁ সমাজে যে সকল উৎসব হইত, যেমন পৌষ পরব , মাঘ পরব, ফাগ্নু পরব, চৈত পরব, জাদ্নুরা নাচ, মাঘ পূর্ণিমার নাচ, (মাঘ পূর্ণিমায় ধুমকুড়িয়ার প্রধান নির্বাচনের জন্য) কান্তিপূজোয় পাথর চালানো, গাঁয়ের মাহাতো এবং নায়েগা নির্বাচনের জন্য ঝাকড়া-বাসী দেবীর নামে পাথর চালানো; পূজার জন্য চাল রাখা বারণ; মোরগকে বলি দিবার পূর্বে খাওয়ানো বারণ; জোওখ চাণ্ডী ও পাবগী চাণ্ডী বারণ; শিকার করা বারণ, দাণ্ডা-কাট্টা বারণ, সিঁদুর দান বারণ, (ছেলে-দের নামকরণের সময়ে) আন-খারনা অনুষ্ঠান বারণ, বন্ধুবকমধ্যে সেংগাৎ বা মিতালি বারণ; মোরগ ও ছাগবলি বারণ; সুরি করা (ভাত ও মাংস একত্র রাঁধিয়া পূজার নৈবেদ্য) বারণ, সুরি পরিবেষণ করা বারণ।

নাচের জায়গা সাজানো বারণ; স্ত্রী-পুরুষের নাচ বারণ।

টানা ভগৎগণের কীর্তন বা প্রার্থনা কিন্তু শুধু নৈতিমূলক নহে; কোন কোন গানে উচ্চাশের ভাবও পাওয়া যায়। সেইরূপ একটি গানের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

এসো, বাবা ঈশ্বর, আমাদের আঙিনায় এসো, আমাদের দুয়ারে এসো। হে ভাই, 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া তোমরা ডাক, কিন্তু বাবা আমাদের কায়ার মধ্যে, আমাদের জিয়ার (হৃদয়ের) মধ্যে। হে ভাই, কারুর সঙ্গে কলহ করিও না, (কারণ) বাবা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আছেন। 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া চিৎকার কর (বৃথা), (কেননা) বাবা আছেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। পথে কাহাকেও গালি দিও না, (কেননা) বাবা আছেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। বাবা আমাদের কায়ার মধ্যে বাস করেন, পরস্পরকে পথে বা গলিতে গালি দিও না। বাবার প্রিয় হইয়া, মায়ের প্রিয় হইয়া, হাতে ছোট ঝুড়ি ধরিয়া (…) পরস্পরের সঙ্গে (প্রেমে) সংযুক্ত হও। কাকার প্রিয় হইয়া, কাকীর প্রিয় হইয়া, হাতের ছোট ঝুড়ি ধরিয়া পরস্পরের সঙ্গে (প্রেমে) এক হও।

টানা ধর্মের মত নীতিপ্রধান ও শুচিবায়ুগ্রস্ত ধর্ম উরাওঁ জাতির মধ্যে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করার ফলে তাহাদের জাতীয় জীবনে বহুবিধ পরিবর্তন দেখা দেয়। টানা ভগৎগণ সামাজিক সমস্ত সংস্কারগুলিকে পরিবর্তিত ও শোধিত করিয়া লয়। অপর জাতির, অর্থাৎ প্রধানত জমিদার এবং মহাজনের শোষণ হইতেও তাহারা বাঁচিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এক সময়ে শিবু ভগৎ নামে এক ব্যক্তি (১৯২০ সালে) বহু টানা ভগৎকে লইয়া চাষের হাল বলদ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া হাজারিবাগ জেলায় সাতপাহাড়ী পর্বতমালার অভিমুখে রওনা হয়। তাহার বিশ্বাস ছিল, সেখানে মুক্তিদাতা ঈশ্বরের দেখা মিলিবে এবং তাহার পর উরাওঁ জীবনে আর কোনও দুঃখ থাকিবে না।

শরৎচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে টানা ভগৎ আন্দোলন আপাতত ধর্মমূলক মনে হইলেও ইহার গোড়ায় ছিল উরাওঁদের দুর্বহ দারিদ্র্যবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করার ফলে যখন সে মুক্তির আস্বাদ মিলিল না, তখন কুড়ুখ-ধর্মের প্রভাবও দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)
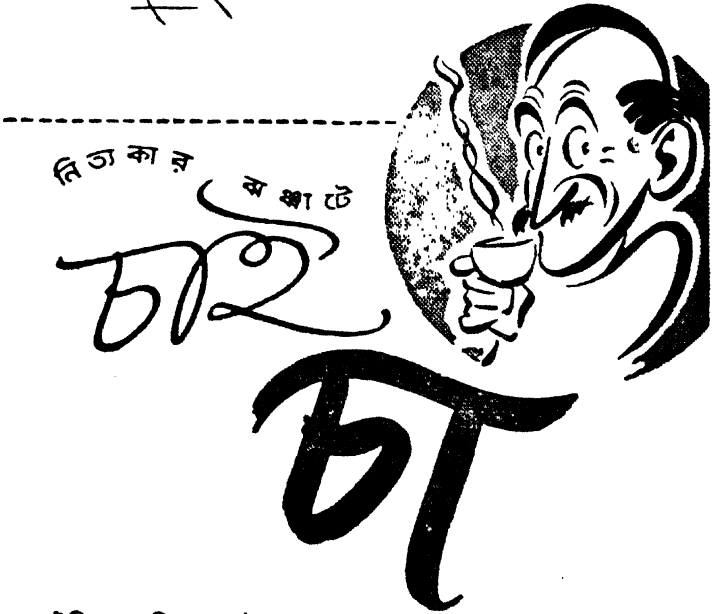
# হে মোর দুর্ভাগা দেশ—

……… শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ……

**আচার্যদেব** আসিয়াছেন। শিষ্যমহলে আনন্দের হিল্লোল জাগিয়াছে। বিদ্বান্ বহুদর্শী বহুজনবন্দিত আমাদের এই আচার্য-দেব। ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁহার গতি। সর্বত্র তাঁহার অভ্যর্থনা। সম্প্রতি পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের নানাস্থান ঘুরিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী শুনিবার জন্য উৎসুক। কখন সন্ধ্যা হইবে, কখন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহার সরস কৌতূহলোদ্দীপক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব—তাহার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি।

যথাসময়ে তিনি আমাদের ডাকিলেন। আমরা আনন্দিতচিত্তে উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিতে লাগিলেনঃ—

বাবা, এবার পূর্ববঙ্গের এক নারীর মুখে বড় আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়া আসিলাম। কাহিনীটি যেমন করুণ তেমনি মর্মস্পর্শী। সেই হইতে উহা আমার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

আমি তখন সুফী সম্প্রদায়ের এক সাধুর সন্ধানে ঘুরিতেছিলাম। ভারতের সাধক সমাজে অসামান্য তাঁহার খ্যাতি। অথচ পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত স্থানে তাঁহার জীবন কাটিল।

গ্রাম হইতে দূরে, নির্জনে এক নদীর তীরে তাঁহার সাধনপীঠ। বহু কষ্টে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত সেদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

সেখান হইতে ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। অন্ধকার রাত্রি, অজ্ঞাত স্থান, কোথায় আশ্রয় লইব ভাবিতেছি—এমন সময় এক কৃষকের সহিত দেখা হইল। সে আমাকে তাহার গ্রামে লইয়া গেল। গ্রামটি মুসলমানের। তাহারা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া এক সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে উপস্থিত করিল। আমার অব-স্থানের ব্যবস্থা সহজেই হইল। কিন্তু আহারের ব্যবস্থা লইয়া তাহারা বেশ চিন্তিত হইয়া পড়িল। সহসা তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"আরে! আমাদের পুরুত ঠাকরুন রয়েছেন যে! তাঁর কথা যে আমরা ভুলেই গেছি।" সকলে উল্লাসে কোলাহল করিয়া উঠিল—"হাঁ, হাঁ! আমাদের পুরুত ঠাকরুন রয়েছেন। তিনিই ওঁর আহারের ব্যবস্থা করবেন।"

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আমি খুব আশ্চর্য হইলাম। মুসলমানের গ্রাম, একঘরও হিন্দু নাই। এইজন্য এই একটু আগেই ইহারা আমার আহারের জন্য এতটা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল—আবার ইহারই মধ্যে এক পুরুত ঠাকরুন আসিল কি করিয়া? যাহা হউক, আমি মুখে কিছু বলিলাম না। তৎক্ষণাৎ তাহারা আমাকে পুরুত ঠাকরুনের কাছে লইয়া গেল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তকতকে একটি ঘর। উঠানে তুলসীমঞ্চ। সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঘরের ভিতর হইতে এক প্রৌঢ়া বাহির হইয়া আসিলেন। নিরাভরণা, শুভ্র বস্ত্রাবৃতা এক হিন্দু বিধবা!

তোমাদের নিকট ইহা বোধ হয় আরব্যোপন্যাসের ন্যায় মনে হইতেছে কিন্তু আমার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত! আমি স্তম্ভিতের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিলাম। তিনি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"বোস বাবা বোস! আগে একটু জল খাও, আহার কর। তারপর তোমার কতূহল দূর করব।"

অতিযত্নে পরমশ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত তিনি আমার আহারের ব্যবস্থা করিলেন। আতপান্ন, মুগের ডাল ও বেগুন ভাজা। প্রচুর পরিমাণ গব্যঘৃতের সহিত পরমতৃপ্তিভরে তাহা আহার করিলাম।

আহারের পর বাহিরে আসিয়া বসিলাম। তিনিও আমার নিকট বসিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে তিনি বলিতে লাগিলেনঃ—

"এক আচার নিষ্ঠ বিদ্বান ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম। আমার পিতা ছিলেন সর্বশাস্ত্র-বিশারদ অশূদ্রযাজী পুরোহিত। আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা। পুত্র না থাকায় তিনি আমায় পুত্রের ন্যায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। বেশিদিন অবশ্য শিক্ষার সুযোগ পাই নাই, কেননা, বার বছর বয়সেই আমার বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহও এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ পন্ডিতের গৃহেই হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য আমার ভাল ছিল না। স্বামী আমাকে ভালবাসিতেন। শ্বশুর আমাকে স্নেহ করিতেন। কিন্তু শ্বশ্রূ আমাকে নির্যাতন করিতেন। অবশেষে তাহা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল। আমি গোপনে শ্বশুরের বাড়ী হইতে পলায়ন করিলাম।

বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি হইতে ক্রোশ তিনেক দূরে। ভাবিলাম সহজেই আমি পথ চিনিয়া সেখানে পৌঁছাইতে পারিব। কিন্তু তাহা পারিলাম না। আমি পথ হারাইলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমি যে কোথায় আসিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমার বয়স তেরর বেশি হইবে না। ভয়ে ও উদ্বেগে আমি উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম।

এক বৃদ্ধ মুসলমান সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ক্রন্দন শুনিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। আমাদের গ্রাম তিনি চিনিতেন। আমার পিতার নামও তিনি শুনিয়াছিলেন। আমাকে তিনি আমার পিতৃগৃহে লইয়া চলিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আমরা সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমাদের আহ্বানে পিতা বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। আমি তখন ছুটিয়া ঘরে ঢুকিতে যাইতেছি, তিনি আমাকে নিবৃত্ত করিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"থাম! ঘরে ঢুকিও না! এঘরে আর তোমার স্থান নাই!"

শুনিয়া আমি হতভম্বের ন্যায় বসিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"সেকি! সেখানে নির্যাতন সহিতে না পারিয়া, পলাইয়া আসিয়াছে। আপনি স্থান না দিলে এ যাইবে কোথায়?"

পিতা উত্তর দিলেন—"যে-কন্যা মুসলমানের সঙ্গে আসিয়াছে, হিন্দুগৃহে তাহার স্থান নাই।"

পিতার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কানে আঙুল দিলেন। তিনি আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ছি ছি! এমন কথা উচ্চারণ করিতে নাই। এই বালিকা আমার কন্যার বয়সী। আপনার অপেক্ষাও আমি বৃদ্ধ; আমার সহিত আপনার কন্যা আসিয়াছে, ইহাও কি দোষের হইল!"

পিতা কঠোরস্বরে বলিলেন—"উহার জাতি গিয়াছে, উহাকে গ্রহণ করা অসম্ভব।"

শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় আমি পিতৃচরণে লুন্ঠিত হইলাম। চকিতে তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমার স্পর্শও তাঁহাকে অপবিত্র করিবে! আমি আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলাম।

মা আমার ঘরে বসিয়া সমস্ত শুনিতে-ছিলেন। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি আমাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কিন্তু পিতার বজ্র কঠোরহস্ত তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল। তিনি জোর করিয়া মাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমাদের উভয়ের কাতর মিনতি, আমার করুণ ক্রন্দন, কোনো কিছুতেই সেই রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল না!

বৃদ্ধের চক্ষুও জলে ভরিয়া গিয়াছিল। তিনি

আমাকে বলিলেন—"মা, এখন আমি আর কি করিব! তবে তুমি যদি তোমার শ্বশুরের গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাও, আমি তোমাকে সেখানে পেঁছাইয়া দিতে পারি।"

অগত্যা উভয়ে আমার শ্বশুর বাড়ির দিকেই রওনা হইলাম। প্রায় ভোরের দিকে সেখানে পেঁছিলাম। সেখানেও তাঁহারা আমাকে গ্রহণ করিলেন না। জন্মদাতা পিতা যেখানে বালিকা কন্যাকে পরিত্যাগ করে, শ্বশুর বা স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিবে, হিন্দুসমাজ এমন নহে। আমাকে অকুলপাথারে নিক্ষেপ করা হইল। আমার মত নিদারুণ অবস্থায় কেহ পড়িয়াছে কি?

বৃদ্ধ তখন আমাকে লইয়া যে কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি আমাকে তাঁহার জানা শোনা, বহু হিন্দুর গৃহে লইয়া গেলেন। আমার কাহিনী তাঁহাদের শোনাইলেন। কাহারও দয়া হইল না। কেহই আমাকে গ্রহণ করিলেন না।

তখন নিরুপায় আমি তাঁহারই শরণ লইলাম। অগত্যা তিনি আমাকে তাঁহার গৃহে আনিলেন। তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ। ধনে ধান্যে, পুত্রকন্যায় গৃহ তাঁহার পূর্ণ। পুত্রদের ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, ইনি তোমাদের বহিন। বহিনের মত ইঁহাকে তোমরা সম্মান করিবে। বহিনের মত ইঁহাকে রক্ষা করিবে।"

সেই সাধুচরিত্র বৃদ্ধের কথা আমি আর কী বলিব। তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আমার পৃথক বাস। পৃথক পাকের বন্দোবস্ত এবং পৃথক পূজা অর্চনার সর্বপ্রকার সামগ্রী তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও পিতার ন্যায় সর্বপ্রকারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

যৌবন আমার কী বিপদের মধ্য দিয়াই না কাটিয়াছে। সেকথা ভাবিলে আজও শিহরিয়া উঠি। সমাজে লম্পটের অভাব নাই। নিতান্ত বৃদ্ধা ব্যতীত যে কোনো বয়সের স্ত্রীলোকের প্রতি তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি, বিশেষ যদি আবার সুন্দরী ও যুবতী হয়। অভাগীকে ভগবান রূপ কম দেন নাই। তাহা কিন্তু তাহার বিপদ ভিন্ন সম্পদ আনিল না। রূপ যদি আমার না থাকিত। আমি যদি কুৎসিত কুরূপা হইতাম, তাহা হইলেও অনেকটা রক্ষা হইত।

স্ত্রীলোক মাত্রই রূপ আকাঙ্ক্ষা করে। কুরূপাও নিজেকে রূপসী করিতে চাহে। অথচ আমি চাহিতাম তাহার বিপরীত। কী ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে পড়িলে মানুষ এমন বিপরীত কামনা করে, ভাব দেখি।

সমাজে বৃদ্ধের প্রতিষ্ঠা ছিল অসামান্য, প্রভাব ছিল অদ্ভুত। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মৌলবী। তাঁহার আশ্রিতার উপর অত্যাচার করিবে, এত দুঃসাহস কাহারও ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধের অবর্তমানে কি হইবে? ছেলেদেরও তেমন প্রতিষ্ঠা নাই। তাহাদের কথা মানিবে কে? অন্তিমকালে বৃদ্ধের ইহাই একমাত্র চিন্তা ছিল। আমার ভবিষ্যৎ ভাবনাই তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে।

মৃত্যুর কিছু পূর্বে একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, আমার দিন ফুরাইয়াছে। শীঘ্রই তোমাদের ছাড়িয়া যাইব। কিন্তু তোমার কথা ভাবিয়া আমার শান্তি নাই। এতদিন তোমাকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়াছি। আমার অবর্তমানে তোমাকে রক্ষা করিবে কে?"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি কি বলিব? নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ বলিলেন—'মা, স্ত্রীলোককে রক্ষা করে তাঁহার স্বামী। তোমার স্বামী থাকিয়াও নাই। আমার পরামর্শ যদি শোনো তুমি আবার বিবাহ করিও। তাহা না হইলে দুর্বৃত্তদের মধ্যে তোমার নির্যাতনের অন্ত থাকিবে না।'

নীরবে বৃদ্ধের কথা শ্রবণ করিলাম। কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিলাম না। হিন্দু নারী হইয়া দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণ করিব কেমন করিয়া? বিশেষ পতি যখন জীবিত আছেন।

বৃদ্ধের মৃত্যু হইল। অমনি আমার উপর অত্যাচার শুরু হইল। দুর্বৃত্তগণ যেন এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিয়াছিল। আমার তখন পূর্ণ যৌবন। সমস্ত লম্পট সমাজের তখন আমার এই দেহটার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি। রাত্রে আমার নিদ্রা হইত না। সর্বদা নির্যাতনের আশঙ্কায় আশঙ্কিত রহিতাম।

কতবার দ্বার ভগ্ন করিয়া গুণ্ডার দল আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। আমার উপর অত্যাচারের উপক্রম করিয়াছে। আমি চীৎকার করিয়া উঠিয়াছি। বৃদ্ধের পুত্রগণ আমার ধর্ম-ভাইগণ ছুটিয়া আসিয়া আমায় রক্ষা করিয়াছেন।

কিন্তু এমনভাবে কতদিন চলিতে পারে। এমনি আমাদের সমাজ, যাহার স্বামী নাই, সে স্ত্রীলোক যেন বেওয়ারিশ—! যেন সকলেরই তাহার উপর অধিকার আছে। লম্পটগণ তাহাকে ভোগ করিবেই করিবে! তাহার যেন নিজের ইচ্ছা বলিয়া কিছু নাই।

নিরুপায় অসহায় আমি এইভাবে যখন চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতেছি তখন আমার সেই প্রাতঃস্মরণীয় বৃদ্ধ পালকপিতার কথা মনে পড়িল—'তুমি আবার বিবাহ করিও, তাহা না হইলে দুর্বৃত্তদের মধ্যে তোমার নির্যাতনের অন্ত থাকিবে না।'

স্ত্রীলোকের রক্ষার আর কোনো উপায় নাই। ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক আত্মরক্ষার জন্যই তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। দশের নির্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একের নির্যাতনকে বরণ করিতে হইবে। এই তো আমাদের সমাজ।

আমাকেও পুনর্বার বিবাহ করিতে হইল। সবল, সাহসী এক পুরুষকে আমি পতি অর্থাৎ রক্ষক রূপে গ্রহণ করিলাম। কত অনিচ্ছায়, কত দুঃখ ও ঘৃণার সহিত আমি এই কাজ করি তাহা এক অন্তর্যামী জানেন! হায়! ইহার পূর্বে কেন আমার মৃত্যু হইল না।

ইহা হইতে উদ্ধারের আর একমাত্র উপায় ছিল আত্মহত্যা! কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাণী শুনিয়াছি, শিশুকাল হইতে শুনিয়াছি, 'আত্মহত্যা মহাপাপ' কিছুতেই আত্মহত্যা করিতে পারি নাই।

এখন বুঝিয়াছি আত্মহত্যা করিলেই আমার ভাল ছিল। আত্মহত্যা করিলেই আমি যথার্থ আত্মহত্যা হইতে পরিত্রাণ পাইতাম। নিজের

ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মবিক্রয় কি আত্মহত্যা নহে ? হায়, কেন আমি ইহা করিলাম !

দুর্বৃত্ত লম্পটদের বাহ্যিক নির্যাতন হইতে রক্ষা পাইলাম।। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। যাহাকে ভালবাসি না, যাহার সঙ্গ আমার নিকট অশুচি, তাহারই সহিত ভালবাসার অভিনয় করিতে হইত। তাহাকেই বক্ষে ধারণ করিতাম।

অবশেষে তাহারই সন্তানকে আমি গর্ভে ধারণ করিলাম। সমস্ত শরীর আমার ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল।

এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কিন্তু আমি হিন্দু আচার হইতে ভ্রষ্ট হই নাই। নিজের পাক আমি নিজে করিয়াছি। নিজের পানীয় জল নিজে আনিয়াছি। সেদিক হইতে আমি আচারনিষ্ঠ হিন্দু।

মোগল অন্তঃপুরের রাজপুত রমণীগণ এইভাবে হিন্দু আচার পালন করিতেন, পিতার নিকট ছেলেবেলায় ইহা শুনিয়াছিলাম। তখন কে জানিত আমাকেও একদিন সেই অবস্থায় পড়িতে হইবে।

আজ আমার স্বামী নাই, কিন্তু পুত্র-কন্যা, নাতি নাতনি রহিয়াছে। তাহারা থাকিয়াও নাই। আমি যেমন তাহাদিগকে আপন ভাবিতে পারি নাই, তাহারাও তেমনি আমার আপনার জন হইতে পারে নাই। এই রক্তমাংসে তাহাদের জন্ম, তাহারা আমার কত নিকট কিন্তু তবু তাহারা আমা হইতে কত দূরে। তাহাদের স্পর্শ আমার নিকট অশুচি অপবিত্র ! অথচ তাহারা আমার নিজের সন্তান ! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য বিষয় আর কিছু আছে কি ?

আমি রোজ রামায়ণ পড়ি, অশোক বনে সীতার কাহিনী পড়িতে পড়িতে বক্ষ আমার জলে ভাসিয়া যায়। এ যেন আমি আমার নিজের কাহিনী পড়িতেছি। অশোকবনের সেই কারাগার হইতে একদিন তাঁহার উদ্ধার হইয়াছিল। অসীম নির্যাতনের পর একদিন তিনি আত্মীয়স্বজন আপনজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমার কি উদ্ধার হইবে না? আমি কি আমার আপনজনের নিকট কোনোদিন ফিরিয়া যাইব না?'

এই কাহিনী বলিতে বলিতে অশ্রুধারে তাঁহার নয়নযুগল প্লাবিত হইয়া উঠিল। প্রাণপণে তিনি নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখ তাঁহার সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি আর পারিলেন না। সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি কি বলিব ? কি বলিয়া আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিব? তাঁহার কাহিনী করুণমর্মস্পর্শী উহা আমাকে বেদনায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল ! বলিলাম 'মা' আপনি শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী! আপনাকে আমি বুঝাইব কি বলিয়া ? আপনি ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মের মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই ! কেবল আচার নিষ্ঠা ধর্ম নহে! আচার নিষ্ঠাই যদি ধর্ম হইত, তবে আপনার পিতা, শ্বশুর এবং স্বামীর চেয়ে আর ধার্মিক কে আছে? মা, আপনি কি তাহাদিগকে ধার্মিক বলিবেন? ধার্মিক কি নিজের নির্দোষ সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারে ? ধার্মিক কি নিজের পুত্রবধূকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে ? ধার্মিক কি নিজের পত্নীকে অকূলপাথারে বিসর্জন দেয় ?

আপনার পালক পিতা ঐ বৃদ্ধ মুসলমান যে সত্যকারের ধার্মিক ব্যক্তি, মা, সে কথা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন ?

যে আচারকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আপনার পিতা, পতি ও পতির পিতা আপনার প্রতি অধর্ম আচরণ করিলেন, মা আপনি কিনা সেই আচারকেই আঁকড়িয়া ধরিলেন ?

যে ধর্মের অনুপ্রেরণায় আপনার পালক-পিতা, আপনাকে আশ্রয় দিলেন, আপনার মুসলমান পতি আপনাকে রক্ষা করিলেন—সেই ধর্মই শাশ্বত ধর্ম। মা, সেই ধর্মকে আপনি ভুলিবেন না।

আচারের উপর জোর দিয়া আমরা ধর্মকে ভুলিয়াছিলাম, তাই হিন্দু সমাজে আপনাদের মত রমণীরত্নের স্থান হয় নাই। কিন্তু মা, সময়ের পরিবর্তন হইতেছে। হিন্দু, নারী জাতির উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে নারীজাতির অভিশাপে হিন্দু-সমাজ রসাতলে যাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু বহুবার অত্যাচার সহ্য করিয়া হিন্দুর আজ চেতনা আসিয়াছে।

আজ সে বুঝিতে পারিয়াছে যে নারীকে নির্যাতন করিয়া সে মুসলমান সমাজে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল তাহার সন্তানগণই আজ তাহার মাতার অপমানের প্রতিশোধ লইতে হিন্দুর প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছে। তাই নির্যাতিতাকে হিন্দু আজ গৃহে ফিরাইয়া লইতেছে পতিতাকেও সে আজ পরিত্যাগ করিতেছে না। আজ তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে।"

প্রৌঢ়া অতি মনোযোগ অতি আগ্রহের সহিত আমার কথা নীরবে শুনিয়া গেলেন। বুঝিলাম কথাগুলি তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। সহসা বিহঙ্গকুলের কাকলী ধ্বনিতে আমরা চমকিত হইয়া উঠিলাম। আমাদের বাক্যালাপের মধ্যে রাত্রি কখন শেষ হইয়াছে জানিতে পারি নাই !

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরবে নিস্পন্দভাবে তাঁহার এই অপূর্ব কাহিনী শ্রবণ করিলাম। কিছুক্ষণ কাহারো বাক্য স্ফূর্তি হইল না। সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আচার্য বলিয়া উঠিলেন—

"ধর্মকে রক্ষা করিলে রক্ষা পাওয়া যায়। ধর্মকে ধ্বংস করিলে, ধ্বংস হইতে হয়।" ইহা ঋষির উক্তি। আজ নীরবে বসিয়া হিন্দু নিজেই নিজ উক্তির সারবত্ত প্রমাণ করিতেছে।

# উত্তরণ

দেবদাস পাঠক

তারার আকাশে সীমানা টেনেছি; এখন দিন।
স্বপ্ননীলিম ছায়া-ম্লান মেঘ দূরে বিলীন।
শিথিল স্নায়ুতে সূর্যের অকরুণ প্রহার
কি জ্বালা এনেছে পাড়িয়ে অলস মেঘপাথার!

রাত্রি কখনও অপরূপ ছিল; তুমি ছিলে;
আমার দুচোখে কি সম্মোহন ছোঁয়া দিলে!
প্রহরেরা সব কেটেছে সে যেন ঝরেছে ফুল;

চুলের এলোমেলো ছোঁয়া লেগে আকুল
আমার স্নায়ুরা; গিয়েছে সে রাত কেটে।
ভয়ে খরা-ঝরা দিনে এসেছি হেঁটে।
তবে এসো অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে,
হাতে হাত রেখো জনতার ভীড়ে।

পৃথিবী রোদ-জ্বলা ধূ-ধূ রুক্ষ মাঠ;
তোমার জন্যে রেখেছি খুলে কপাট।

# ভারতের আদিবাসী

সুবোধ ঘোষ

### বহির্ভূত অঞ্চলের ইতিহাস

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন (অর্থাৎ Indian Statutory Commission) ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা তদন্ত করে নতুন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারতে আসেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট নিজ নিজ প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস, পূর্ব-প্রচলিত শাসন-সংস্কারের পরিণাম ও কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সম্বন্ধে কমিশনের নিকট মেমোর‍্যাণ্ডাম বা স্মারকলিপি পেশ করেন। আশ্চর্যের বিষয়, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেন্টের মেমোর‍্যাণ্ডামে আদিবাসীদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। এই তিন প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের প্রদত্ত বিবরণ পড়ে মনে হবে যে, তাঁদের প্রদেশে আদিবাসী সমস্যা বলে কোন সমস্যাই নেই। অথচ এসব প্রদেশের মধ্যে যথেষ্ট প্রচুর সংখ্যায় আদিবাসী [illegible] [illegible] গভর্নমেন্টের মেমোর‍্যাণ্ডামে আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে [illegible] করা হয়। একমাত্র বিহার গভর্নমেন্টের মেমোর‍্যাণ্ডামে আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিবরণ ও আলোচনা করা হয়। বিহার গভর্নমেন্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আদিবাসীদের জন্য বিশেষ একটা শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই শাসনব্যবস্থার সীমা এবং প্রকার কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কোন প্রস্তাব করেন নি। সাইমন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অনগ্রসর অঞ্চল (Backward Tract) কথাটি বদলে দিয়ে 'বহির্ভূত অঞ্চল' (Excluded Area) আখ্যা দেওয়া হয়।

কমিশন আদিবাসীদের সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য, প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেগুলির মধ্যে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী নীতির একেবারে নিরাবরণ আত্মপ্রকাশ।

কমিশনের সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া যায় : অনগ্রসর অঞ্চলগুলির মধ্যে দু' একটা অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকী সবগুলিকেই সাধারণ শাসনতন্ত্রের বাইরে রাখা উচিত। অনগ্রসর অঞ্চলের আদিবাসীরা যোগ্যতার ক্ষেত্রে যে স্তরে পৌঁছাতে পেরেছে, তাতে তারা সাধারণ শাসনতন্ত্রের মধ্যে থাকবার যোগ্য নয় বলেই কমিশন মনে করেন। আদিবাসীকে তার পূর্বপুরুষের অনুসৃত পদ্ধতিতে জীবনযাপন করবার (Traditional methods of livelihood) স্বাধীনতা দিতে হবে এবং জমির স্বত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতে হবে।

কমিশন আরও বলেন : "শুধু রাজনৈতিক উন্নতির ওপর আদিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে না। অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সহায়তায় সরকার যদি তাদের ওপর নজর দিলেই তারা সুখী হতে পারবে। আদিবাসীকে সুখী করবার আর একটা উপায় হলো তাকে তার প্রতিবেশীর কাছে অর্থনৈতিক অধীনতা থেকে রক্ষা করা।"

কমিশন সুপারিশ করেন—সম্পূর্ণভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি (Wholly Excluded Area) সর্বাধিনায়ক গভর্নর-জেনারেলের অধীনে তাঁর এজেন্টদের (অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্নরদের) মারফত শাসিত হবে। কিন্তু আংশিকভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি (Partially Excluded Areas) প্রাদেশিক আইনসভার এক্তিয়ারে থাকবে এবং প্রাদেশিক গভর্নর সর্বাধিনায়ক গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট হিসাবে মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করবেন। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল থেকে রাজস্ব সমস্ত রাজস্ব ঐ অঞ্চলের জন্য ব্যয় করা হবে, উপরন্তু কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কাছ থেকেও অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হবে।

দেখা যাচ্ছে যে, সম্পূর্ণ বহির্ভূত ও আংশিক বহির্ভূত—এই দুই অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক নীতির মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। উভয় ক্ষেত্রেই চরম ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের এজেন্ট গভর্নরদের হাতে। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে গভর্নর মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করবার সৌজন্যটুকু শুধু দেখাবেন, পরামর্শ গ্রহণ করা না-করা তাঁরই ইচ্ছা ও অধিকার।

কমিশনের মন্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে অভিসন্ধি বলে যা মনে হয়, সেটা হলো আদিবাসীকে সন্দেহে পূর্বপুরুষের অনুসৃত জীবনযাত্রার প্রাচীন পদ্ধতির জেলে বন্দিরূপে চিরদিনের জন্য বন্দী করে রাখবার সংকল্প। এই পলিসিকেই সাম্রাজ্যবাদী পলিসির চরম বলে মনে করবার কারণ আছে, প্রসঙ্গক্রমে তারই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। বৃটিশ শাসনের পূর্ব অধ্যায়েও এই নীতি ছিল, কিন্তু কমিশনের মন্তব্য থেকে মনে হয়, সেই নীতিকে আরও ভাল করে সফল করবার জন্যেই ১৯২৯ সালে আর একটা নতুন উদ্যোগের সংকল্প করা হয়। কমিশনের মন্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হলো প্রতিবেশী হিন্দুর সংস্পর্শ। হিন্দুরাই আদিবাসীকে অর্থনৈতিক পরাধীনতায় ফেলে রেখেছে, হিন্দুর দ্বারাই আদিবাসীর ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে ইত্যাদি। সুতরাং বৃটিশের কূটনৈতিক অভিপ্রায়টি অতি সহজেই ধরা পড়ে যায়, আদিবাসী অঞ্চলকে বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য বস্তুত হিন্দু সমাজের প্রভাব থেকে বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য। কমিশন নিজেই নির্লজ্জভাবে বলেছেন যে, রাজনৈতিক উন্নতির ওপর আদিবাসীদের সুখ-সম্পদ নির্ভর করে না। সুতরাং বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য বস্তুত রাজনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্র থেকেই বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কি হতে পারে? কমিশনের মতামত ভাল করে বিশ্লেষণ করে এই তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে যে, হিন্দু প্রভাব থেকে বহির্ভূত করা আর রাজনৈতিক উন্নতি থেকে বহির্ভূত করা একই কথা এবং বলা বাহুল্য, এটাই বিশেষভাবে সত্য।

কমিশনের রিপোর্ট বৃটিশ গভর্নমেন্টের নিকট দাখিল হওয়ার পর নতুন ভারত গভর্নমেন্ট বিল আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। এই বিলের ৯১নং ধারার সাথে বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা দেওয়া হয়। তালিকাটি এই—

(ক) সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল—(১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (সদিয়া, বালিপাড়া ও লখিমপুর) অঞ্চল; (২) নাগা পাহাড় জিলা; (৩) লুসাই পাহাড়; (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম।

(খ) আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল—(১) উত্তর কাছাড় পাহাড়; (২) গারো পাহাড় জিলা; (৩) মিকির পাহাড় (নওগাঁ এবং শিবসাগর জিলার অন্তর্ভুক্ত অংশ); (৪) খসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের বৃটিশ অংশ (শিলং ক্যান্টনমেন্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা বাদে); (৫) অঙ্গুল জিলা; (৬) ছোটনাগপুর বিভাগ; (৭) সম্বলপুর জিলা (৮) সাঁওতাল পরগণা জিলা; (৯) দার্জিলিং জিলা; (১০) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ (মিনিকয় সমেত); (১১) গঞ্জাম, ভিজগাপট্টম ও গোদাবরী এজেন্সী।

উল্লিখিত তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পূর্ব-প্রচলিত 'অনগ্রসর অঞ্চলের' তালিকা থেকে কয়েকটি অঞ্চলের নাম বাদ দিয়ে এই নতুন বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা করা হয়েছে। স্পিতি ও লাহৌলের নাম এই তালিকায় নেই, এই দুই অঞ্চলকে সাধারণ শাসিত অঞ্চলের মধ্যে দাখিল করে দেওয়া হয়েছে।

ভারত গভর্নমেণ্ট বিলের সঙ্গে সংযুক্ত বহির্ভূত অঞ্চলের এই তালিকা সম্পর্কে কমন্স সভার কমিটিতে যে আলোচনা হয়, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জি এস ঘুরের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হলো। (১) বক্তাদের অভিমতগুলি বস্তুত বহু সাম্রাজ্যবাদী রহস্যের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছে।

কর্নেল ওয়েজউডের অভিমত:—কোন কোন হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতে আদিবাসীদের সংখ্যা ৪ কোটি ৩০ লক্ষ। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট বিলে যে বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৩০ লক্ষ। এই ব্যবস্থা ভাল নয়। আরও বেশী সংখ্যায় আদিবাসীকে রক্ষিত শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে। শিক্ষিত ভারতীয়েরা চাইছে যে, আদিবাসীদের ওপর শাসন-ব্যবস্থা ভারতীদের দ্বারাই পরিচালিত হোক। আদিবাসীকে সস্তায় মজুর করার জন্যই শিক্ষিত ভারতীয়েরা এই মতলব করেছে। অনগ্রসর আদিবাসীর উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে ভরসার আশ্রয় হলো খৃষ্টান মিশনারী সমাজ। আদিবাসীদের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে, তাকে রক্ষা করা এবং উন্নত করাই যাঁদের একমাত্র কাম্য, সেই সব নৃতত্ত্ববিদ্ এবং আর যাঁরা আছেন, তাঁদের দিয়ে (ইংরেজ অফিসার ও খৃষ্টান মিশনারী)। আরও বিশ-ত্রিশ বছর আদিবাসীদের ওপর শাসন চালাতে হবে। যে সভ্যতার আক্রমণে আদিবাসীরা ধ্বংস হতে চলেছে, সেই সভ্যতার (হিন্দু?) আক্রমণ থেকে তাদের বাঁচাতে হবে। প্রাদেশিক গভর্নরদের দিয়েও বহির্ভূত অঞ্চল শাসন করানো উচিত নয়, কারণ তার ফলে প্রাদেশিক প্রভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি ভারতের সাধারণ অঞ্চলগুলির মতন অবস্থায় এসে পড়বে। আমি চাই, অনগ্রসর আদিবাসীকে খাস বৃটিশ পরিচালনায় রাখার ব্যবস্থা করা হোক।

ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর:—গভর্নমেণ্ট জানেন যে, ভারতের সভ্য সম্প্রদায়ের জন্য রচিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধানগুলি অনগ্রসর আদিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দিলে বিপদ আছে।

কমিশনের সদস্য, মিঃ এডওয়ার্ড ক্যাডোগান (Mr. Edward Cadogan) বহির্ভূত অঞ্চলের একটি সংশোধিত তালিকা উপস্থিত করেন। এই তালিকাটি বৃহৎ। মিঃ ক্যাডোগান তালিকা নির্দিষ্ট অনেকগুলি আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকার সঙ্গে যুক্ত করেন। তাছাড়া প্রদেশের সাধারণ শাসিত অঞ্চল থেকে কতগুলি নতুন অংশকেও সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকাভুক্ত করেন। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের যে সংশোধিত তালিকা মিঃ ক্যাডোগান প্রস্তুত করেন, সেটা সবই সাধারণ অঞ্চলের অংশ নিয়ে তৈরী এবং সংখ্যায় অনেক। মিঃ ক্যাডোগান যেসব অঞ্চলকে আংশিক বহির্ভূত বলে তালিকাভুক্ত করতে চাইলেন, সেগুলি পূর্বে কোনকালে অনগ্রসর অঞ্চল বলে অথবা তপশীলভুক্ত অঞ্চল বলে ঘোষিত হয়নি। মেজর এ্যাটলি (ইনিও কমিশনের সদস্য ছিলেন) এই বৃহৎ সংশোধিত তালিকা সমর্থন করেন:

"যদি আমাদের কোন ভুল করতে হয়, তবে যত বেশী সম্ভব অঞ্চলকে তালিকাভুক্ত করেই সে-ভুল হোক, কিন্তু তালিকা থেকে অঞ্চলের নাম বাদ দিয়ে বা কমিয়ে দিয়ে যেন সে-ভুল না করি।"

উইং কম্যাণ্ডার জেম্‌স সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন "ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের থেকে আদিবাসীরা বিশিষ্টভাবে ভিন্ন একটি জাতি। যত বেশী সংখ্যায় আদিবাসীকে বহির্ভূত অঞ্চলের গণ্ডির মধ্যে আনতে পারা যায়, ততই ভাল। এই সব অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে হয় ইউরোপীয়ানদের দ্বারাই শাসন করাতে হবে, অথবা ইউরোপীয়ানদের পরিচালনাধীনে ভারতীয়ের দ্বারা।"

এইবার আর একদল বিশেষজ্ঞের অভিমত বিবৃত করা যাক, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী হয়েও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান না হারিয়ে ঐতিহাসিক সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই মন্তব্য পেশ করেন।

স্যার রেজিনাল্ড ক্র্যাডক (Sir Reginald Craddock)—"সম্বলপুরের মত ছোট একটা জিলাকে বহির্ভূত অঞ্চলে যুক্ত করার কোন অর্থ হয় না।"

লর্ড পার্সি (Lord Percy):—এইসব অনগ্রসর অঞ্চল বা বহির্ভূত অঞ্চলগুলি যেন এক-একটা উপেক্ষিত উদ্যানের মত। যেসব অঞ্চলগুলিতে ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে, সেই অঞ্চলের কোন অংশকে বহির্ভূত অঞ্চলে যুক্ত করা উচিত নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, এমন কতগুলি অঞ্চলকে 'আংশিক বহির্ভূত' অঞ্চলে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে শতকরা পঁচিশ থেকে আরম্ভ করে শতকরা ষাট পর্যন্ত সাধারণ অধিবাসী রয়েছে, যারা আদিবাসী নয়। সমস্যাটা খুবই কঠিন, আপনাদের পরিষ্কার ভাবে নীতি ঠিক করে নিতে হবে। আদিবাসী সমাজকে পুরাতন কাসুন্দির (Cold Storage) মত পরিবর্তনহীন করে রাখা, অথবা চারিদিকের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সমন্বিত (Assimilation) হবার জন্য পথ দেখিয়ে দেওয়া—এই দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনটা কতখানি আপনারা করতে চান?"

মিঃ বাটলার (Mr. Butler Under Secretary of State for India):—"যদি এই সময়ে আমরা বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখার নীতি (Ring Fence Policy) গ্রহণ করি এবং বেশী করে নতুন নতুন অঞ্চলকে 'বহির্ভূত অঞ্চলে' সরিয়ে নিয়ে আসি, তাহলে ফল ভাল হবে না। ভবিষ্যৎ ভারতের সাধারণ রাষ্ট্রতন্ত্রে আদিবাসীদের পক্ষে অন্য সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা দূরে সরে যাবে। আদিবাসীকে ব্যাপকভাবে সরিয়ে রাখার (Segregation) নীতি আদিবাসীর পক্ষে ক্ষতিকর হবে।"

আর্ল উইণ্টারটন (Earl Winterton)—"বিচ্ছিন্নতার (Isolation) চেয়ে সংমিশ্রণের (Assimilation) নীতিতেই আমি বেশী বিশ্বাসী। আমার মনে হয়, আপনারা এটা চাইবেন না যে, আদিবাসী অঞ্চলগুলি এক-একটা আধুনিক হুইপস্নেড (Whipsnade) হয়ে উঠুক, যেখানে গিয়ে আপনারা মনের সুখে বলবেন এই যে এখানে কেমন বিচিত্র একটা নরগোষ্ঠী রয়েছে, যারা ভারতবর্ষের অন্যান্য সমাজ থেকে হাজার বছরের ব্যবধানে পড়ে। আমি মনে করি, তালিকাভুক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়া অন্য নতুন কোন অঞ্চলকে বহির্ভূত বলা উচিত হবে না।"

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত [illegible] কমিটির অভিমতই স্বীকার করেন। ভারত গভর্নমেণ্ট [illegible] তালিকাটি প্রস্তুত হয় এবং প্রস্তাব করা হয় যে, পার্লামেণ্টের কাছে যেসব তথ্য উপস্থিত করা হবে, তার ওপর ভিত্তি করে নতুনভাবে সম্পূর্ণ বহির্ভূত ও আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

ভারত গভর্নমেণ্ট নতুন করে বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা তৈরীর উদ্যোগ করেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে পেশ করার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত যে তালিকা প্রস্তুত করেন, সেটা এই দাঁড়ায়—

(ক) সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল: (১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল; (২) নাগা পাহাড় জিলা; (৩) লুসাই পাহাড় জিলা; (৪) উত্তর কাছাড় পাহাড়; (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম; (৬) স্পিতি ও লাহৌল (কাশ্মীর); (৭) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ (মিনিকয় সমেত) ও আমিন দিভি দ্বীপ; (৮) হাজারা জিলার উচ্চ (upper) টানাওয়াল।

(খ) আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল: (১) গারো পাহাড় জিলা; (২) মিকির পাহাড়; (৩) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের বৃটিশ অংশ (শিলং মিউনিসিপ্যালিটি ও ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা বাদে); (৪) দার্জিলিং জিলা; (৫) ময়মনসিংহের শেরপুর ও সুসঙ্গ পরগণা; (৬) দেরাদুন জিলার জৌনসার বাওয়ার পরগণা; (৭) মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত কাইমুর গিরিমালার দক্ষিণ অংশ;

---

The Aborigines and their future—G. S. Ghurye.

উন্নতির জন্য বিহিত ব্যবস্থা করাবেন এবং তাকে সেবিষয়ে পরামর্শ দেবেন।" (Instrument of Instructions, Paragraph XV)।

গভর্নরের এই প্রভূত বিশেষ ক্ষমতার বহর দেখে মনে প্রশ্ন ওঠে, যখন প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীর ওপরে এতটা বিশেষ ক্ষমতা গভর্নরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন কতগুলি আদিবাসী অঞ্চলকে বহির্ভূত করার কি এমন প্রয়োজন ছিল। বহির্ভূত না করেও তো গভর্নর বিশেষ ক্ষমতার বলে আদিবাসী সমাজকে সস্নেহে শাসন করতে পারতেন। এত সতর্কতার মূল রহস্য হলো, আদিবাসীকে ব্রিটিশ গভর্নর কখনো একলা ছেড়ে দিতে পারবেন না; যদি হিন্দুরা তাদের বাগিয়ে ফেলে অথবা হিন্দুর প্রভাবে তারা বাগিত হয়ে যায়? আদিবাসীদের প্রতি ব্রিটিশ রক্ষাব্যবস্থার সমস্ত নীতিটারই রহস্য এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—আদিবাসীকে তার স্বদেশবাসী উন্নততর হিন্দুসমাজের প্রভাব থেকে সরিয়ে রাখাই এই সকল তথাকথিত রক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতি ও উদ্দেশ্য।

আদিবাসীদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের রক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান সোপান হলো বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি করে খাস গভর্নরী বিবেচনা অনুযায়ী শাসন করা। এই ব্যবস্থা করবার সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একটা দিক ভেবে দেখেননি, অথবা ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করে গেছেন। এইসব বহির্ভূত অঞ্চলে হাজার হাজার এমন সব শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অধিবাসী রয়েছে যারা আদিবাসী নয়, যারা ভারতের সাধারণ জাতি—সাধারণতঃ হিন্দু। আদিবাসীরা সম-অঞ্চলবাসী এই অ-আদিবাসীদের সঙ্গে নানা সম্পর্কের সূত্রে যুক্ত এবং তারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। গভর্নমেণ্ট বহির্ভূত অঞ্চলে বিশেষ রক্ষামূলক শাসন চালাবার সময় স্থানীয় অ-আদিবাসীর কথাটা আদৌ ভেবে দেখেননি।

সম্পূর্ণ বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে অ-আদিবাসীর (Non-Aboriginal) অর্থাৎ সাধারণ জাতির সংখ্যা কিরূপ তার কতগুলি হিসাব দেওয়া যাক্ :

| অঞ্চল | | সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে আদিবাসীরা শতকরা কত সংখ্যক? |
|---|---|---|
| সাঁওতাল পরগণা | ... | ৪৫ |
| সিংভূম | ... | ৭৬ |
| মানভূম | ... | ৩২ |
| পালামৌ | ... | ৪৯ |
| রাঁচী | ... | ৮০ |
| হাজারিবাগ | ... | ৩৪ |
| সম্বলপুর | ... | ৩২ |
| অঙ্গুল | ... | ১৮ |
| দক্ষিণ মির্জাপুর | ... | ৬২ |
| বিলাসপুর জমিদারী | ... | ৩৭ |
| ইবহার তহশীল | ... | ৫৫·৮ |
| মান্দলা তহশীল | ... | ৫১·২ |
| চিন্দোয়ারা জমিদারী | ... | ৬৬·২ |
| নন্দুরবার (পশ্চিম খান্দেশ) | | ৩০·২ |
| শাহাদা ( „ ) | ... | ৩১·৭ |
| গড়চিরোলি তহশীল | ... | ৩৬·২ |
| কল্যাণ তালুক | ... | ৪৮·৮ |
| সাহাপুর (থানা জিলা) | ... | ২৭·৯ |
| ডাহানু ( „ ) | ... | ৪৭·৯ |
| উম্বেরগাঁও পেটা | ... | ৬৩·৭ |
| মোখডা পেটা | ... | ৮৩·৬ |
| পেইণ্ট পেটা (নাসিক) | ... | ৯৮* |

ওপরের হিসাব থেকে ধারণা হয় যে, এমন অনেক বহির্ভূত অঞ্চল আছে, যেখানে সাধারণ (অ-আদিবাসী) জাতিরাই আদিবাসীদের চেয়ে সংখ্যাধিক। অন্যান্য কতগুলি বহির্ভূত অঞ্চলে সাধারণ জাতির লোকেরা সংখ্যায় আদিবাসীদের চেয়ে কম হলেও, নেহাৎ নগণ্য সংখ্যক নয়। বাকী যে যে অঞ্চলে আদিবাসীরা খুবই সংখ্যাধিক (শতকরা ৮০।৯০), সে অঞ্চল সম্বন্ধে অবশ্য আলোচ্য সমস্যার কথা ওঠে না।

আদিবাসী অধ্যুষিত এইসব বহির্ভূত অঞ্চলে প্রাদেশিক ভারতের সাধারণ জাতির লোকেরা (হিন্দু) শুধু শোষক হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং তারা সকলেই শোষক হিসাবে আজও রয়েছে, একথা সত্য নয়। অনেকক্ষেত্রে আদিবাসীরাই অ-আদিবাসীকে ডেকে এনে তাদের অঞ্চলে স্থান দিয়েছে। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা সর্দারেরা ১৭ শতকের শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে বহু হিন্দু পরিবারকে আহ্বান করে এনে নিজ অঞ্চলে বসতি করিয়েছে (১) মান্দলা জিলাতেও বর্তমানে যেসব হিন্দু জমিদার রয়েছে তারা ১৭ শতাব্দীতে স্থানীয় আদিবাসী সর্দারদের কাছ থেকেই জমি লাভ করেছিলেন। মাদ্রাজের খন্দ অঞ্চলে পাহাড়ী সর্দারেরা জাতিতে উড়িয়া, নয়দশ পুরুষ আগে এদের পূর্বপুরুষেরা খন্দ অঞ্চলে গিয়েছিল। এটাও অনুমান করা যায় যে, তারা খন্দদের গোষ্ঠীগত বিবাদ নিষ্পত্তি করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েই সেখানে গিয়েছিল। (২) খন্দমালে কৃষির উন্নতির জন্য স্থানীয় সর্দারেরা কোলটাদের (হিন্দু কৃষক-মহাজন) ডেকে এনে স্থান দিয়েছিল। এমন কি 'বহির্ভূত' তত্ত্ববাদী বৃটিশ গভর্নমেণ্টও স্বয়ং আদিবাসী অঞ্চলে অ-আদিবাসী জনসাধারণকে বসতি করাবার জন্য প্রথম দিকে উদ্যোগ করেছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কোল্হান অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর উক্ত অঞ্চলে সাধারণ ভারতীয়কে বসতি করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বহির্ভূত অঞ্চলে কৃষি ও আবাদ সফল করতে হ'লে হিন্দুকৃষকের সাহায্য অপরিহার্য, একথা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও বুঝতেন।

বহির্ভূত অঞ্চলে এইভাবে বহু হিন্দু বাস করে আসছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বসতি দু'শ বছরেরও ওপর এবং কোন ক্ষেত্রে ৫০ বছর ধরে চলে আসছে। এটা সত্য যে, বহির্ভূত অঞ্চলের ঔপনিবেশিক এই হিন্দুদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ আদিবাসীকে নানাভাবে শোষণ করেছে। কিন্তু এটা মন্দের দিক মাত্র। ভাল দিকও আছে এবং সেটার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। হিন্দুরা যে অঞ্চলে আদিবাসীর প্রতিবেশী হয়ে থাকতে পেরেছে, সেখানে মোটামুটিভাবে একটা সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সমগ্রভাবে উন্নতিমূলক না হলেও এই পরিবর্তনটাই আদিবাসীদের একটা বড় লাভ। ব্রিটিশ সরকারী নীতির ফলে আদিবাসীদের পক্ষে অচল অনড় [illegible] সামগ্রী হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু হিন্দু সম্পর্ক সেই [illegible] অনেক [illegible] আদিবাসীকে [illegible] করেছে।

বহির্ভূত অঞ্চলে যেসব সাধারণ [illegible] বাস করে, তাদের [illegible] অধিকাংশ হলো সাধারণ প্রাদেশিক অঞ্চলের আদিবাসী যারা [illegible] মধ্যে বাস করে। কিন্তু [illegible] বহির্ভূত অঞ্চলে থেকে [illegible] অধিকারী [illegible] হচ্ছে। এই সুযোগের [illegible] অনগ্রসর আদিবাসীকেই দেখা হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের [illegible] নীতির অনুযায়ী এই [illegible] আদিবাসী সমাজকে [illegible] 'রিং ফেন্স' (Ring Fence Policies) সামর্থ্য তাদের নেই। নিজেদের [illegible] অ-আদিবাসীকে আদিবাসীর কাছে নিয়ে যেতে গভর্নমেণ্ট বাধ্য হয়েছেন, তবে আদিবাসীকে সরিয়ে রাখবার (Segregate) নীতিকেই তাঁরা আঁকড়ে রয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারের পেছনে যেন একটা কূটনীতি কাজ করছে। যেক্ষেত্রে সীমানারেখার [illegible] বেড়া তৈরী সম্ভব হয়নি, সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তৈরী বেড়া দিয়ে নীতি সাধন করা হয়েছে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ এবং নেতা বরাবর থেকেই গভর্নমেণ্টের আদিবাসীর পলিসি বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে আসছেন, বহির্ভূ

*The Aborigines and their future—G. S. Ghurye

(1) S. C. Roy Journal of B & O Reserved Society, 1931.

(2) Manual of Administration of the Madras Presidency.

গত ২৩শে জানুয়ারী প্রধান মন্ত্রীর পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীবিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এখন কার্যভার গ্রহণের পরে তিনি দেখিতেছেন, সেই ৩টি সমস্যার সমাধান করিতে আরও অনেক সমস্যার সমাধান করিতে হয়। সেই সকল সমস্যার বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি তাঁহার ৪ জন সচিবকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে গিয়াছিলেন। দিল্লীতে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, সে সকল সম্বন্ধে আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছে এবং আভাস যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই অনেকে চিন্তিত হইবেন।

র‍্যাডক্লিফ যেভাবে বাংলা হিন্দুস্থানে ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিবার জন্য রায় দিয়াছেন, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের উপর কিরূপ অন্যায় করা হইয়াছে, তাহা এইটুকু বুঝিলেই দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের দুই অংশের মধ্যে যোগ রাখা হয় নাই—এক অংশ হইতে অপর অংশে যাইতে হইলে পাকিস্থানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এদিকে কলিকাতা হইতে জলপাইগুড়ি যাইতে হইলে দীর্ঘ পথ পাকিস্থানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হয়; ওদিকে জলপাইগুড়ি হইতে বিহারে যাইতে হইলেও পাকিস্থানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। অথচ দেশের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য সুগঠিত পথের কত প্রয়োজন, তাহা ফ্রান্সে দেখা গিয়াছে। ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের সময় ফ্রান্স সেই প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং জর্মানী যেমন জয়ী হইয়াও আশঙ্কা হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য সেনাপতি মলকের পরামর্শে সীমান্তে বহু দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ফ্রান্স তেমনই পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য সুগঠিত রাজপথের বিস্তারসাধন করিয়াছিল। সেই সকল পথে সেনা ও সমর-সরঞ্জাম প্রেরণের সুবিধা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্সকে জয়ী হইতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে সুগঠিত রাজপথের একান্ত অভাব—গত যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সকল পথ নির্মিত হইয়াছিল যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির অধিকাংশ সংস্কারাভাবে দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। এখন যানে ও রেলপথের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের সকল অংশে সংযোগ—ভারত রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাহা অনিবার্য। এখনই আসাম-বেঙ্গল রেলপথে হিন্দু যাত্রীদিগকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে এবং জলপাইগুড়ি হইতে বিহারে যাইবার পথে—পাকিস্থানে—বাস-যাত্রীরা যেভাবে লাঞ্ছিত ও লুণ্ঠিত হইতেছে, তাহাতেই অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে অনুমান করিতে পারা যায়।

জলপথের দুর্গতিও অসাধারণ। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদী মজিয়া গিয়াছে বা মজিয়া যাইতেছে। তাহাই যে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশার মূল কারণ তাহা স্বাস্থ্যের দিক হইতে যেমন ডক্টর বেণ্টলী দেখাইয়া গিয়াছেন, উর্বরতার দিক হইতে তেমনই স্যর উইলিয়ম উইলকক্স দেখাইয়া গিয়াছেন। স্যর উইলিয়াম বর্তমান যুগে প্রান্তরবাহী নদীর উন্নতিসাধন-বিশেষজ্ঞদিগের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মিশরে যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাংলায় আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের জলপথের উন্নতিসাধন করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে শস্য-শ্যামলা করিবার পথ-নির্দেশ করিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। তুরস্ক সরকার ইরাকের মরুভূমি শস্যসম্পদসম্পন্ন করিবার জন্য স্যার উইলিয়ামের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন স্যার উইলিয়াম সেই অসাধ্য সাধন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে তুরস্ক সরকার সেই পরামর্শানুসারে কাজ করিতে পারেন নাই—কাজের আনুমানিক হিসাব হইয়াছিল ৫০ কোটি টাকা। বাঙলা সরকার অজ্ঞানতাহেতু তখন তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। এখন গঙ্গার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া বাঁধ ও সেতু নির্মিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের দুই অংশে যোগসাধন ও পশ্চিমবঙ্গের শস্য-সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহার অধিবাসীদিগের জন্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। তাহার উপর পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু আসিতেছেন—খাদ্য-দৈন্য আরও তীব্র হইবে।

যে পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহাতে গঙ্গার জলস্রোত নিয়ন্ত্রিত করিবার, বাঁধের ও সেতুর জন্য ষাট কোটি টাকা এবং পথ নির্মাণের জন্য ব্যয় চার কোটি টাকা পড়িবে। বর্তমানে কেন্দ্রী সরকার বর্ধমান হইতে মুর্শিদাবাদ জিলায় তিলডাঙ্গা পর্যন্ত পথ নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন। সেই পথ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পথ যাইবে। সে পরের কথা।

বলা বাহুল্য, এই ষাট কোটি টাকা ও এই চার কোটি টাকা যে ভারত সরকারই দিবেন, এমন মনে করা যায় না। যে পথের জন্য চার কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে, তাহার ২ শত ৫০ মাইল পশ্চিমবঙ্গে ও ৫৬ মাইল বিহারে। বিহার সরকার ইহার ব্যয়ের অংশ দিতে সম্মত হইবেন কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ শুনা যাইতেছে, কয়খানি গ্রাম হইতে সাঁওতাল অধিবাসীদিগকে উদ্বাস্তু করিতে হইবে বলিয়া বিহার সরকার ময়ূরাক্ষীর স্রোত নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনায় আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন!

কেন্দ্রী সরকারেরও যে অর্থের স্বচ্ছলতা নাই, তাহা তাঁহাদিগের বাজেটেই সপ্রকাশ। আর তাঁহারা যদি পশ্চিমবঙ্গকে অধিক অর্থ-সাহায্য করেন, তবে যে বিহার হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত বহু প্রদেশ তাহাতে আপত্তি করিবেন, তাহা তাঁহাদিগের পূর্ব-ব্যবহারের অভিজ্ঞতা হইতেই অনুমান করা যায়। যদিও সেচ সম্বন্ধে বাঙলা পূর্ব হইতে বিশেষ উপেক্ষিত এবং বাঙলায় কোন উল্লেখযোগ্য সেচের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয় নাই, তথাপি আমরা অন্যান্য প্রদেশের আপত্তির আশঙ্কা না করিয়া পারি না।

পশ্চিমবঙ্গের সেচের ব্যবস্থা কেবল গঙ্গার জল নিয়ন্ত্রিত করিলেই হইবে না; সঙ্গে সঙ্গে অনেক নদী ও খালের সংস্কারও করিতে হইবে। তাহা যে সহজসাধ্য এমনও বলা যায় না। কিছুদিন পূর্বে "নদীয়া ডিভিশন" সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছিল, অনেক নদীর তলের ভূমি গঙ্গার তলভূমি অপেক্ষা উচ্চ হইয়া গিয়াছে; সংস্কার ব্যতীত সে সকল নদী আর সহজ-সাধ্য হইবে না।

কিন্তু স্যর উইলিয়াম উইলকক্স বলিয়াছিলেন, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের নদীগুলি আবার পূর্বের মত করা সম্ভব। তিনি মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনকালে বলিয়াছিলেন, অতীতের মত আবার কৃষক বাঙালীরা সেইরূপ খাল কাটিয়া সর্বত্র গঙ্গার জল প্রবাহিত করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। তিনি ডক্টর বেণ্টলীকে বলিয়াছিলেন—

"We too shall be like them. We shall see these things again, and western and central Bengal shall again enjoy such health and wealth as God called 'very good' when He created the earth."

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহার পর কুড়ি বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সেই কথা যেন অরণ্যে রোদন হইয়াছে। তাহার পূর্বেই তিনি নীল নদের জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া মিশর ম্যালেরিয়াশূন্য করিয়াছিলেন। আমরা মনে করি, এই সকল অতি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন; অথচ—

(১) কেন্দ্রী সরকার যে সব টাকা দিবেন, এমন মনে করা যায় না;

(২) পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ প্রজা আর নূতন কর দিতে পারে না।

সেই অবস্থায় সরকারের বহু ব্যয়সাধ্য শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ করা কর্তব্য। দুঃখের বিষয়, বর্তমান বাজেটে আমরা তাহার কোন লক্ষণই লক্ষ্য করিতে পারি নাই। বাঙলার সরকারী ব্যয় যে হ্রাস করা যায়, তাহা ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন নিযুক্ত (স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কমিটির রিপোর্টে যেমন, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল গঠিত (মিস্টার সোয়ানের সভাপতিত্বে) কমিটির রিপোর্টে তেমনই দেখা গিয়াছে। প্রথম কমিটি দেখাইয়া দিয়াছিলেন—বাংলা সরকারের বার্ষিক ব্যয় এক কোটি ৯০ লক্ষ ২৫ হাজার ৯ শত ১০ টাকা হ্রাস করা যায়।

একান্ত পরিতাপের বিষয় সেই দুইটি কমিটির পরামর্শ গৃহীত হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র প্রদেশ। এখনও তাহার দপ্তরখানার জন্য লালদীঘির ধারের গৃহটি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না? এখনও কি [illegible] এডওয়ার্ডস [illegible] কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমে সেই দিকে মনোযোগ প্রদান করুন। অনেক ব্যয়-সঙ্কোচ সম্ভব হইবে।

ব্যয় সঙ্কোচ যে দূরের কথা এখনও বহু চাকরীয়ার [illegible] সিভিল সার্ভিসে চাকুরিয়া-দিগের [illegible] বেতন [illegible] অপব্যয় [illegible] আর কিছুই [illegible] হয় না। সরকার ভাতার পরিমাণ হ্রাসের প্রস্তাব [illegible] আমরা ইতঃপূর্বে [illegible] করিয়াছি।

আমরা বিধানবাবুর মন্ত্রিমণ্ডলকে এই সকল বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। [illegible] নিযুক্ত [illegible] পুলিশের যে দুর্নীতির বিষয় পুলিশ কমিশনের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা অদ্যও সে সকল কথা ভুলি নাই। এখনও যে-সামরিক সর-বরাহ বিভাগ [illegible] বলিয়াছেন যাহারা [illegible] উপর ছাপা মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিতেছে, তাহাদিগের দণ্ড [illegible] পুলিসকে [illegible] দিয়াছেন কি? অথচ সকলে বলিতেছে প্রকাশ্যভাবে যে সেই দুর্নীতি প্রবল, তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা না উভয়ই সরকারের পুলিশের নাই। চোরাবাজার সমানভাবেই চলিতেছে বলিলে অপলাপ হয় না।

চোরাবাজারে যদি চাউলের অভাব না হয়—তবে কিরূপে বলা যায়, চাউলের অভাব আছে? তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের অভাব সম্পর্কে সরকারের হিসাব কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা যায়? কাপড়ও যে [illegible] যথেষ্ট আছে, তাহা বলা বাহুল্য। সরকার সূতার বাজারে চোরাকারবার দমন করিতে না পারায় যে তাঁতশিল্প কৃষির পরেই দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের অবলম্বন সেই শিল্প নিহত হইতেছে। তাহাতে কাহা-দিগের অর্থ বৃদ্ধি হইতেছে। তাহা যে বিধানবাবুর মত বুদ্ধিমান লোকের বুঝিতে বিলম্ব হয়, এমন মনে করিলে তাঁহার সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহাকে রোলাণ্ডস কমিটির নির্ধারণ স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি—লোকের ও সরকারী কর্মচারীদিগের দুর্নীতি এত প্রবল হইয়াছে যে, দৃঢ়তা সহকারে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে তাহার উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হইবে না। কিন্তু গত ৯ মাসে কয়জন বড় ব্যবসায়ী দুর্নীতির জন্য দণ্ড ভোগ করিয়াছেন? কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকারের আগ্রহের কি পরিচয় লোক পাইতেছে?

অবস্থা যদি এইরূপই থাকে, তবে যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

সর্বত্রই যেন দুর্নীতি দমনে হতাশা ক্রমে নিরাশায় পরিণতি লাভ করিতেছে। ইহার পরিণাম কি তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এদেশে বিদেশী শাসনে সরকারের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদিগের বেতনের সহিত দেশের জনসাধারণের আয়ের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। সেইজন্য উচ্চপদস্থ চাকরীয়াদিগের বিলাস-ব্যবস্থাও অসাধারণ ছিল। ব্রাইট লিখিয়া-ছিলেন—

"It is a perpetual astonishment to travellers to note the scale of living of every Englishman employed in India."

যে সকল পদ পূর্বে ইংরেজদিগের প্রায় একচেটিয়া অধিকারে ছিল, এখন সে সকলে ভারতবাসিগণ অধিষ্ঠিত বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রয়োজন হ্রাস এখনও করা হয় নাই। লী কমিশনে সকল [illegible] সিভিল সার্ভিসে ইংরেজ চাকুরীয়ারা বলিয়াছেন, ইহারা অত্যধিক [illegible] গ্রহণ, কারণ তাঁহাদিগকে ৩টি সংসারের ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়—(১) তাঁহারা এদেশে থাকেন; (২) স্ত্রীকে প্রতিবৎসর পার্বত্য শহরে পাঠাইতে হয়; (৩) ছেলেমেয়েরা বিলাতে শিক্ষালাভ করে। সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় চাকুরীয়ারাও য়ুরোপীয়দিগের বেতনের মত বেতন পাইতেন—এখনও সেই বেতনের হার রহিয়াছে। তাহার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিম্ন বেতনের কর্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধির যে প্রতিশ্রুতি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষিত হয় নাই বটে এবং কেবল দুর্মূল্যতার জন্য ভাতা বৃদ্ধির যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহার সকল কথা নির্ভরযোগ্য নহে বটে—কিন্তু তবুও সরকারের বার্ষিক ব্যয় ঐ বাবদে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। উচ্চপদস্থ-দিগের পদের সংখ্যা [illegible] কম হওয়ায় কমাইলেও সেই সকল পদস্থদিগের বেতন হ্রাস করিলে বহু টাকা ব্যয়-সঙ্কোচ হইতে পারে।

চাকুরীয়াদিগের সংখ্যা যেমন কমান হইতেছে না—তেমনই বেতনের হার কমাইবার কোন চেষ্টাও হইতেছে না।

যদি মন্ত্রিমণ্ডল উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে কোন পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, তবে কি তাঁহারা তাহা লোককে জানাইয়া দিবেন? জানাইয়া দিলে—যেমন সে সকলের আলোচনায় ও সমালোচনায় উপকার হইতে পারে, তেমনই লোক ধৈর্যাবলম্বন করিতেও পারে।

চারিদিকেই অসন্তোষ। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল কর্মচারী কলিকাতায় চাকরী করেন, তাঁহারা ধর্মঘট করিয়াছেন। এই ধর্মঘট সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয়—প্রধান মন্ত্রী হইয়াই যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীদিগকে ধর্মঘট বর্জন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখনই সেই অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল—আর আজ তাঁহারই সরকারের কর্মচারীরা তাঁহার ও প্রাদেশিক গভর্নরের আহ্বান না শুনিয়া এবং কোন কোন উর্দ্ধতন কর্মচারীর রূঢ় ব্যবহার ও ভীতিপ্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া ধর্মঘটে অবিচলিত আছেন। ধর্মঘটকারীদিগের মধ্যে নারীরাও আছেন। গত ৮ই মার্চ কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিয়াছেন—যেসকল মহিলা ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দমদম ও কলিকাতার জেলে প্রথম শ্রেণীর বন্দীর মত ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে বুঝিতে হয়—গ্রেপ্তারের দিন হইতে ঐ নির্দেশদানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদিগকে সে ব্যবহারেও বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইহা কি মন্ত্রীর পক্ষে লজ্জার কথা নহে? বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী বলিয়াছেন—এখন পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য পরিমাণ "রেশনে" বাড়ান অসম্ভব বলিয়া আসিয়াই কলিকাতায় ঘোষণা করিয়াছেন—"রেশনে" খাদ্যশস্যের পরিমাণ কিছু বর্ধিত করা হইয়াছে। অবশ্য বর্ধিত খাদ্যশস্যও যথেষ্ট নহে।

কিন্তু লোক সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিবে—খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কি পরিকল্পনা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য খাদ্যশস্যের মূল্য-হ্রাস না হইলে বেতনের ও পারিশ্রমিকের হার হ্রাস করা সম্ভব হইবে না। কবে ভাগীরথীর জলধারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, কবে দামোদরের জলে সিঞ্চিত ও সরস হইয়া বর্ধমান অঞ্চলের ভূমিতে "শস্যশীর্ষে কম্পিত কাঞ্চন" লক্ষিত হইবে, কতদিনে বিহার সরকারের আপত্তি অতিক্রম করিয়া ময়ূরাক্ষীর জলে বীরভূম ও বাঁকুড়ার ঊষর ভূমি উর্বর হইবে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া তাহার পূর্বেই "পতিত" জমী "উঠিত" এবং ক্ষেত্রে ফসলের ফলন বৃদ্ধির উপায় করিতেই হইবে।

পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে আরও ২টি বিষয় উল্লেখযোগ্য—

(১) পূর্ব পাকিস্থান ব্যবস্থা পরিষদে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তথা হইতে হিন্দুদিগের পশ্চিমবঙ্গে গমনের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের পূর্ববঙ্গ ত্যাগের কারণ এই যে, হিন্দুপ্রধান ভারত রাষ্ট্রের প্রতি স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের আকর্ষণ আছে, কাশ্মীরের ও অন্যান্য সমস্যার সুযোগ লইয়া কংগ্রেসের ও হিন্দু মহাসভার প্রচারকগণ ইচ্ছা করিয়া প্রচার করিতেছেন, ভারত রাষ্ট্রের সহিত পাকিস্থানের যুদ্ধ অনিবার্য।

কাশ্মীরের ও হায়দরাবাদের ব্যাপার যে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন, হায়দরাবাদের সমস্যা বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে—ভারত সরকারকে কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। কিন্তু কংগ্রেস যে যুদ্ধ চাহেন না এবং পাকিস্থানের সহিত সদ্ভাব রক্ষার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকারও করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন। হিন্দু মহাসভা যে রাজনীতিক কাজ করিতে বিরত হইয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তবে খাজা নাজিমুদ্দীন হিন্দুদিগের পাকিস্থান ত্যাগের আরও কাল্পনিক কারণ আবিষ্কার করিয়া ভারত রাষ্ট্রকে ও হিন্দু সাধারণকে দোষী করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ—

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের রাষ্ট্রত্যাগের আর এক কারণ—ভারত সরকার শুল্ক ঘটিত যে সকল বিধিনিষেধ রচনা করিয়াছেন, সে সকলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু ব্যবসায়ীদিগের অসুবিধা ঘটায় তাঁহারা পাকিস্থান ত্যাগ করিতেছেন।

কোন্ রাষ্ট্র বিধিনিষেধ ও যথেচ্ছাচারের দ্বারা হিন্দু ব্যবসায়ীদিগের অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছেন—তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? পশ্চিমবঙ্গের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও উপস্থাপিত হইয়াছে যে, সেই বিভাগ পূর্ব পাকিস্থানে মাল পাঠাইবার সুবিধাজনক ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছেন এবং ব্যবসায়ী হইতেও হিন্দুস্থানের শৈথিল্য বহু সম্পত্তি পাকিস্থানে প্রেরিত হইতেছে।

খাজা নাজিমুদ্দীন ইহার পরে বলিয়াছেনঃ

পশ্চিমবঙ্গের ভূমির [illegible] কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের লোকেরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের মনে সন্দেহ উদ্রেকের চেষ্টা করিতেছে কারণ, ঐ হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে যাইলে তাহারা লাভবান হইবে। ঐ সকল লোক অভিসন্ধি ঘটাইয়া বিবরণ রটাইতেছে।

কিন্তু গত ৮ই এপ্রিল দিল্লীর চুক্তির পর গত ৬ মাস কাল হিন্দুদের সম্পর্কে, তাঁহাদিগকে অস্থাবর সম্পত্তি [illegible] হইতেছে এবং মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড প্রভৃতির ব্যবহারে মনে হইতেছে, হিন্দুরা রাজ্যকে অর্থনীতিক [illegible] করিয়া নিঃস্ব করাই পাকিস্থানের অভিপ্রেত।

## নীড়

জগন্নাথ বিশ্বাস

আমার প্রাণের শান্তি!
প্রাণে মনে দিলে যে কতনা
অপূর্ব সান্ত্বনা!
আমার আত্মার তৃপ্তি!
ভরে দিলে অন্তর নিভৃতে
কতনা সংগীতে!

আকাশে, দিগন্তে তুমি কত ব্যাপ্তি রেখেছো ছড়ায়ে;
উত্তরে বনের ছায়ে, সম্মুখের তালের বীথিতে
গভীর আবেগ বন্দী, প্রশান্তের আনন্দিত চিতে।

এই মাটি, রুক্ষ লাল,
চেতনায় ভরে দিলো আশ্চর্য সকাল,
নিরুক্ত রক্তের রঙে, ভাষাহীন আশার আশ্বাসে।
আকাশে বাতাসে,
গাছে গাছে সংগীতের সুরের উচ্ছ্বাস,
প্রকৃতির সুরভিত আনন্দ নিঃশ্বাস
মাধুরী ছড়ালো যেন অশ্রান্ত গানের।

এইখানে অপরূপ বিকাশ প্রাণের।
আমার প্রাণের শান্তি খোঁজে নীড় একান্ত আপন।
এখানেই চিরশান্তি, আনন্দের নিত্যনিকেতন।

# শিল্পের মুক্তি

**শ্রীপ্রমথনাথ বিশী**

এই জামসেদপুর শহর আর এখানকার সমাজের সহিত পরিচিত হবার ইচ্ছা আমার দীর্ঘকালের। জামসেদপুরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অধিকাংশ শহরের মূলগত পার্থক্য এই যে, এই শহরটি মানুষের জীবনের একটি নূতন অধ্যায়ের প্রতীক। সেই অধ্যায়টিকে বলা যায় যন্ত্রবাদ। মানুষ এক সময়ে ছিল যাযাবর, তার পরে হয়েছে কৃষক, তার পরে হয়েছে সে যন্ত্রশিল্পী। যাযাবরের শিকারের ধনুক বা এখনও যন্ত্র কৃষকদের লাঙল বা ঢেঁকি বা চরকাও যন্ত্র। কিন্তু যন্ত্রযুগের যন্ত্র ওদের থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভিন্ন। এই তফাৎটা কোথায় বুদ্ধির চেয়ে অনুভূতি তা সহজে বুঝতে পারে। আর বুঝতে না পারলেও সাহিত্য- [illegible] কেউ নয়। এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, যন্ত্র মানুষের জীবনে একটা [illegible] নূতন ছন্দ প্রবেশ করেছে। [illegible] সম্বন্ধে আমার মত [illegible] পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। [illegible] আমার একটা হেতু।

[illegible] রক্তকরবীর অভিনয় হবে। অভিনয়ের উপলক্ষ্যে সকলেরই আমন্ত্রণ ছিল। [illegible] এই নাটক থাকবে, [illegible] অভিনয়ের জন্য [illegible] নির্বাচন করেছিলেন [illegible] আর কোন কারণ আছে বলে মনে হয়। [illegible] এই নাটকের বর্ণিত নিয়মের সঙ্গে এখানকার জীবনযাত্রার কোন প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য [illegible] মনে পড়েছিল। একটি বিষয় [illegible] লক্ষ্য করেছেন যে, রক্তকরবীতে কারো অবসর নেই। ওখানকার জীবনযাত্রার মান [illegible] এমন [illegible] নিয়ন্ত্রিত যে, কাজের [illegible] সকলের সময়কে এমন করে [illegible] নিয়েছে যে, [illegible] এইটুকু অবসরের মধ্যে [illegible] দিতে পারেনি। যন্ত্রযুগের পক্ষে অবসর বড় বালাই। অবসর মানুষকে চিন্তা করায়, চিন্তা মানুষের মনকে বিদ্রোহী করে তোলে, সে বিদ্রোহ যক্ষপুরীর যন্ত্রযুগের বিরুদ্ধে যেতে পারে। [illegible] বড়সর্দার, মেজোসর্দার, ছোটসর্দার প্রভৃতি মিলে ওখানকার মানুষের জীবন থেকে অবসরকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। একমাত্র আগন্তুক নন্দিনীর ওখানে অন্তহীন অবসর। এই অবসর-সরোবর-বিলাসিনী রাজহংসী কোন্ অপরিচিত দৌত্যের পত্র বহন করে যক্ষপুরীতে এসে উপস্থিত। নন্দিনীর অতর্কিত অবসরের হিসাব মেলাতে না পারাতে যক্ষপুরীতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। ওখানকার আর একটি লোকের জীবনে অবসর ছিল। বিশু পাগল। এই অবসরটুকু পাওয়ার জন্যে তাকে পাগল হ'তে হয়েছে। আর সকলেরই জীবন কাজ আর নেশা দিয়ে ঠাসা।

বর্তমান যুগের সমস্ত শহরগুলোই অল্পাধিকতর পরিমাণে যক্ষপুরী; কলকারখানার শহরগুলো তো নিশ্চয়ই। মানুষের প্রকৃতিগত শক্তির উদারতা জটিলীকৃত জীবনের জালের আড়ালে প্রচ্ছন্ন, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, সেটুকু মানুষ-ছাঁটা জালা, তার নাম মকররাজ। আর যক্ষপুরীর আমরা সকলে খোদাই করা সংখ্যা মাত্র, ৬৯ঙ, ৪৭ফ, ৭১ট, আমরা [illegible] পাড়ায়।

এই কাজে ঠাসা যক্ষপুরীতে অবকাশ-বিলাসিনী নন্দিনী হচ্ছে শিল্পকলা লক্ষ্মী। সে [illegible] ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাড়া দেবার মতো কারো অবকাশ নেই। এক একবার দেখে চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে—কিন্তু অমনি সর্দারদের চোখ মনে পড়ে—কেউ একবার বলে উঠি, "আমরা নিরবকাশ পাতালের সৈন্য, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি নীল সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি দেখাতে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে।" কিন্তু ঐ পর্যন্তই—যক্ষপুরীর জীবন-জাল ছিন্ন করবার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছি। রক্তকরবী নাটকের শেষ পর্যন্ত নন্দিনীর জয় হয়েছিল বটে, কিন্তু রঞ্জনকে হারাবার মূল্যে; মকররাজ শেষ পর্যন্ত জালটাকে ছিন্ন করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু নিজের কীর্তিকে ধ্বংস করবার মূল্যে। বস্তুতঃ যক্ষপুরীতে মানুষের মুক্তির সেই লগ্ন আজও আসেনি, কবে আসবে জানি না; কিন্তু ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি, শিল্পলক্ষ্মী নন্দিনী দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পথে বাধা বিস্তর। নন্দিনীর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য রচনার এই সভায় তার পথের বাধা সম্বন্ধেই আলোচনা করবো।

বর্তমান যুগে এবং বর্তমান পৃথিবীতে শুধু বাঙলাদেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব দেশে মহৎ শিল্প-সৃষ্টির পথে প্রধান অন্তরায় তিনটি—অনবসর, প্রাদেশিকতা আর দলীয়তাবাদ।

## ২

সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত এক কথায় যাকে আমরা শিল্প বলি, সে সমস্তই হচ্ছে অবসরের ফসল। মানব জমিন আবাদ করতে জানলে যে ফসল জন্মায়, শিল্প হচ্ছে তাই। মহাপুরুষদের জীবনও শিল্প, সব শিল্পের সেরা; মানব জমিন আবাদের প্রত্যক্ষ ফসল। পৃথিবীর বর্তমান শিল্পের অবস্থার দিকে তাকালে স্বীকার করতেই হবে যে, শিল্প-মন্দাকিনীতে ভাটার টান বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তার কারণ, প্রধান কারণ মানুষের জীবন থেকে অবসরের সত্য যুগ গতপ্রায়। যন্ত্রযুগের প্রারম্ভে মানুষ ভেবেছিল যে, যন্ত্র তার কাজের ভার লঘু ক'রে দিয়ে তাকে এমন মুক্তি দেবে যাতে মানুষ অবসরের প্রাচুর্যকে উদারতর ভাবে পাবে। কিন্তু বস্তুত দেখছি, তা ঘটে ওঠেনি যন্ত্রের প্রশ্রয়ে যারা ধন পুঞ্জিত করেছে, তাদের অনেকের জীবনে সময়ের প্রাচুর্য ঘটেছে বটে, কিন্তু সেই অবসরকে কি তারা আবাদ করতে জানে? তাদের জীবনের প্রচুর অবসর যেন পতিত জমি তাতে হল-রেখা মনঃপ্রকর্ষের চিহ্ন অঙ্কিত করে না, তাতে কেবল আগাছা জন্মে, প্রতিবেশীর স্বাস্থ্য নষ্ট করে। আর এ যুগের অধিকাংশ লোক, যার যন্ত্রপীড়িত রক্তকরবীর কবি যাদের বলেছেন 'কাজের এঁটো', তাদের জীবনে অবসর কোথায়? কেবল শিল্পীর জীবনে অবসরের প্রাচুর্য থাকলে চলবে না; পাঠকের জীবনে, শ্রোতার জীবনে দর্শকের জীবনে—সমগ্র সমাজের জীবনে অবসর চাই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটা বাড়ীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর থাকা সম্ভব নয়। অবসরের দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত সমাজে একজন লোকের অবসর কোনো কাজের নয়। লেখকের সহিত পাঠকের, শ্রোতার সহিত বক্তার, নটের সহিত দর্শকের যোগের মাধ্যম হচ্ছে অবসর, আকাশটা ফাঁকা বলেই সূর্যকিরণ তাতে রামধনুকের তুলি চালাতে পারে। আর মানুষের জীবনের অবসরাকাশলোক যে কাজের বস্তুপুঞ্জ দিয়ে ঠাসা, কল-কারখানার ধোঁয়ার তুলি ছাড়া আর কোন রং তাতে ধরে না। এখন যেটুকু অবসর আমরা পাই, তাকে উপভোগ করবার জন্য শিল্পচর্চা করিনে, কোন রকমে তাকে উত্তীর্ণ হবার জন্যই বই নিয়ে বসি। বলি, দাও তো হে একখানা বই, সময় কাটছে না। অনভ্যাসে এমনি অবস্থা হয়েছে যে, হাতে একটু সময় পড়লে তাকে নিয়ে কি করবো ভেবে পাইনে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কেবল একজন মহাকবির মৃত্যু ঘটেনি, খুব সম্ভব পৃথিবীর শেষ মহাকবি অন্তর্হিত হয়েছেন। আজকার পৃথিবীতে বার্নার্ড শ'কে বাদ দিলে আর কোন মহালেখক আছেন কি? আর শ' তো এ যুগের লোক নন। যন্ত্রযুগের প্রায় প্রারম্ভে তাঁর জন্ম, যন্ত্রযুগের মূর্তি প্রকট হবার আগেই তাঁর জীবন উপাদান সংগ্রহ করেছিল। খুব সম্ভব এর পরে আর কোন বিশ্বজিৎ মহালেখক হবেন না, সবাই হবে অল্প-বিস্তর local সাহিত্যিক; কারণ যন্ত্রবাদ কেবল আমাদের অবসরকেই হরণ করেনি, অনাবশ্যকভাবে আমাদের জীবনকে জটিল করে তুলেছে। এই জটিলতাকে আত্মসাৎ করে রস বার করতে পারে, সর্ব মানবগ্রাহ্য রস, মানুষের জীবন পরিধিকে সর্বানুভূতির বাহু বেষ্টনে আলিঙ্গন করে ধরতে পারে—এমন বেদব্যাস শিল্পজগতে আর জন্মাবেন কি না, নিতান্ত সংশয়ের বিষয়।

শিল্পের ভাটা আজও হয়তো সকলের চোখে প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েনি, তার কারণ আমরা যন্ত্র-যুগের সূত্রপাত সীমায় এখনো আছি। অবসরের যুগ এখনও বহুদূর গত নয়। মানুষের পরিজ্ঞাত ইতিহাসের পাঁচ হাজার বৎসরের শিল্পসৃষ্টি এখনও খুব দূরে গিয়ে পড়েনি, এখনও আমরা তার রসের ভাগ পাচ্ছি। কিন্তু এখন যন্ত্রযুগের

তো কেবল শুরু, আরও দুশো বছর যাক্‌, ইতিহাসের শিল্প-সঞ্চয় আরও দুশো বছর পিছিয়ে পড়ুক, জীবনের অবসর আরও সংকীর্ণ হ'য়ে উঠুক, নূতন মহৎ শিল্প আর মনকে সরস করতে না থাকুক—তখনকার অবস্থা একবার কল্পনা করুন। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, তখন আমি থাকবো না এবং খুব সম্ভব আপনারাও থাকবেন না। কিন্তু মানুষ তো থাকবে। কি অবস্থায় থাকবে! খুব সম্ভব মহৎ শিল্পের স্বাদ সে ভুলে যাবে; রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র, কালিদাস, গ্যেটে তার কাছে অপাচ্য লাগবে, কোন এক উৎকট ধরণের থ্রিলার ছাড়া আর কিছুতেই তার অসাড় মনকে নাড়া দিতে সমর্থ হবে না।

এই অনবসর শীতের হাওয়া ইতিমধ্যেই কি বাঙলা সাহিত্যের বনে প্রবেশ করেনি? তার স্পর্শে তরুলতার পুষ্পপল্লব কি ঝরে পড়ে অরণ্যের কঙ্কালটা ক্রমে অধিকতর প্রকট ক'রে তুলবে না? বাঙলা সাহিত্যে প্রতি বৎসর কত বই বেরুচ্ছে, সে হিসাব ক'রে লাভ নেই; কারণ, বই এখন ব্যবসার অন্তর্ভূত। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, থ্রিলার—এই পর্যায় যদি স্বীকার করা যায়, তবে সংখ্যার বিচারে থ্রিলার সর্বোচ্চে, গুণের কথা নাই ধরলাম। কারণ ওখানে নানা প্রকার মতভেদ দেখা দেবে। মানুষের জীবনের অসাড়তা বৃদ্ধির সঙ্গে থ্রিলারের সংখ্যা বৃদ্ধি কার্যকারণ সূত্রে জড়িত। ইংরাজি বইয়ের বাজারের কথাটা একবার স্মরণ করে দেখুন। এ সমস্তের মূলে আছে অবসরহীন অভিশাপ। সাহিত্য তথা মহৎ শিল্প সৃষ্টির এইটে প্রথম অন্তরায়। এ সমস্যা বাঙলা সাহিত্যের যেমন, পৃথিবীর সাহিত্যেও তেমনি—স্বতন্ত্র করে ভেবে লাভ নেই, আজকার দিনে একটিই সমস্যা আছে, জগৎ সমস্যা।

৩

বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির দ্বিতীয় অন্তরায় প্রাদেশিকতা।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে আজ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশকে প্রাদেশিকতা বুদ্ধির ভূতে পেয়ে বসেছে, বাঙলা দেশকেও পেয়েছে। বাঙলা দেশের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ বিস্ময়কর, কারণ গত শতাব্দীতে সর্বভারতীয়ত্ব বোধের উন্মেষ প্রথমে বাঙলা দেশেই দেখা গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, অন্যান্য অনেক মহৎ ভাবের মতোই সর্বভারতীয়তাবোধেরও উদ্ভব রামমোহনের চিত্তে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ভাবনায়কেরা সকলেই এবং পরবর্তী কালের বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ভারত সত্তাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই উপাদানে তাঁদের রচনা, অভিমত ও জীবন গঠন করে তুলেছিলেন। সেকালের সমস্ত সভাই ছিল ভারত সভা, সমস্ত সংগীতই ছিল ভারত সংগীত। নূতন বাঙলা সাহিত্য যে অচিরে পরিণতি লাভ করেছিল তার কারণ সে সাহিত্য ছিল ভারতরসে পুষ্ট, আর সেই জন্যেই অনায়াসে সমস্ত ভারতবর্ষের মনোহরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। 'বঙ্গ' কথা তখনো সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করেনি। আমি অন্য প্রসঙ্গে অনেকবার বলেছি সোনার বাঙলার মারাত্মক আরও পরবর্তী কালের ডেপুটি সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। ভারতীয়ত্ববোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই তখনকার বাঙলা সাহিত্য ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও Urbanity গুণে পৌঁছতে পেরেছিল। এখনকার বাঙলা সাহিত্য বৈদেশিক তত্ত্ব ও বৈদেশিক প্রভাবের যতই বড়াই করুক না কেন, পূর্বতন Urbanity গুণ তাতে বিরল, বড় জোর তাকে Sub-Urban বলা যেতে পারে।

এমনতরো পরিবর্তনের কারণ কি? কতকগুলো বাহ্য কারণ আছে। যতদিন কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, নানা বিচিত্র পথিকের আনাগোনা তখন এদেশে ছিল। আবার বাঙলা দেশেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা প্রথমে ঘটেছিল—এই দুটি বাহ্য কারণ বাঙলা দেশকে স্বভাবতই ভারত-চেতন করে তুলেছিল। তারপরে এক সময়ে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে অপসারিত হ'ল, তার কিছু আগে এলো বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। আপনারা জানেন এ দুটো ঘটনার মধ্যে কার্যকারণের একটা সূত্র আছে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে বঙ্গ শব্দটার উপরে অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দেওয়া হ'ল। তখনকার সব জাতীয় সঙ্গীতই বঙ্গ সঙ্গীত আগেকার মতো আর ভারত সঙ্গীত নয়। প্রাকৃত জনের চিত্তে একটা ভাবের অনুপাতে বৈষম্য ঘটে গেল, প্রদেশ দেশের চেয়ে বড় হয়ে উঠল। অবশেষে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হ'ল বটে, কিন্তু মনে মনে ভারত-ভঙ্গ ঘটে গেল। আমি জানি বাঙলা দেশে এমন শিক্ষিত লোক যথেষ্ট আছে ভারত কথাটা যাঁদের কাছে নিরর্থক, ভারতীয়তাবোধ তাঁদের বিবমিষা জাগ্রত করে দেয়—বাঙলা দেশ ছাড়া আর কোন সত্তা তাঁরা সহ্য করতে পারেন না বলে। অস্তিত্বের গণ্ডীকে একবার ছোট করতে আরম্ভ করলে তার পরিণাম কোন্‌ অকল্প্য প্রায় বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবে কে বলতে পারে? এই প্রক্রিয়ার ফলে আমাদের জীবনপরিধি সংকীর্ণতর হচ্ছে, আর তারই সঙ্গে তাল রেখে আমাদের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রও সংকীর্ণ হচ্ছে। কোন্‌ বইখানায় কতগুলো তত্ত্ব, কতগুলো বাস্তব বা অবাস্তব 'Ism' আছে, তা দিয়ে বইখানার বিচার চল্‌তে পারে না। বইখানার পিছনে যে লেখক আছেন তাঁর মনের উদারতা, শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা—এইগুলোই হচ্ছে গ্রন্থের আসল পটভূমি। লেখকের মনের গুণ লেখায় সঞ্চারিত হবেই। আজকার দিনের বাঙলা সাহিত্যের অধিকাংশ বই লেখকের মনের দীনতার ছাপ বহন করছে। ধার-করা রাজ-পোষাকে ভিখারি রাজা হয় না, ধারকরা তত্ত্বে, ভাড়া-করা টেকনিকে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ কালের পাঁচালি ও কবিগান যেমন নিতান্ত গ্রাম্য রচনা ছিল—বর্তমান কালে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে গদ্য এবং পদ্য দুই-ই, তাতেও সেই গ্রাম্যতার লক্ষণ ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিচ্ছে। গ্রামে রচিত রচনাই গ্রাম্য নয়। গ্রামে রচিত অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী সর্বজনগ্রাহ্য। গ্রামে রচিত ময়মনসিংহ গীতিকার অধিকাংশও সর্বজনগ্রাহ্য। শহরে রচিত হলেও সাহিত্যের গ্রাম্য হতে বাধা নেই। সেকালের কবি-গানের অনেক পালাই তৎকালীন কলকাতা শহরে রচিত, তৎসত্ত্বেও সে সমস্তই নিতান্ত গ্রাম্য। একালের কলকাতায় রচিত অধিকাংশ রচনাও গ্রাম্য। কোন কোন আধুনিক কবির কবিতায় Rythm-এ, ছন্দ স্পন্দে দাশরথির ছন্দ ধ্বনিত, দাশরথির টেকনিকও স্পষ্টপ্রায়। দুই কবির কবিতা আবৃত্তি ক'রে দেখিয়ে দেওয়া কঠিন নয়, কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ হবে মনে ক'রেই সে কাজে নিরস্ত থাকলাম। আসল কথা গ্রাম্যতা দোষের সৃষ্টি শহরেও নয়, গ্রামেও নয়, মনের মধ্যে। প্রাদেশিকতাবোধের সংকীর্ণতর রূপ গ্রাম্যতা দোষ। আমাদের বর্তমান সাহিত্যের গ্রাম্যতাই প্রমাণ ক'রে আমাদের সাহিত্যে প্রাদেশিকতাবোধ কতখানি মজ্জাগত হ'য়ে পড়েছে—এই অল্প সময়ের মধ্যে। অনেকে বলবেন, প্রাদেশিক সংকীর্ণতা-বুদ্ধি শুধু বাঙলাদেশকে পেয়ে বসেনি, অন্যান্য প্রদেশগুলোকেও পেয়ে বসেছে। অবশ্যই পেয়ে বসেছে। তারাও ভুগবে কিন্তু তাতে ক'রে আমাদের দুর্ভোগ বাঁচে কি ভাবে? প্রাদেশিক-বুদ্ধি যে সর্বত্র দেখা দিচ্ছে, তার কারণ সর্বভারতীয়তাবোধ সুদৃঢ় বনিয়াদ পায়নি, ভিতরে ভিতরে কাঁচা ছিল। ইংরেজ শাসনের বন্ধন আর ইংরেজ তাড়ানোর উৎসাহ এই দুই সূত্রে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলো এতকাল গ্রথিত ছিল। এখন ইংরেজ ও ইংরেজ-শাসন দুই-ই অপসৃত। সেই সঙ্গে যে সূত্রে প্রদেশগুলো বাঁধা ছিল, সেই সূত্রও অপসৃত। অন্তরের যোগে যা যুক্ত হয়নি, বাইরের বাঁধন খুলতেই তা খণ্ড খণ্ড হ'য়ে পড়ে গেল। এইতো আমাদের অবস্থা।

প্রাদেশিকতাবোধের রেষারেষি রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রমে উগ্র হ'য়ে উঠছে। রাজনীতিকেরা বলেন, রেষারেষিতেই নাকি রাজনীতির স্বাস্থ্য! হবেও বা! কিন্তু সাহিত্যের স্বাস্থ্য বলে যদি কিছু কল্পনা করা যায়, তবে রেষারেষিতে তা ভঙ্গ হবারই আশঙ্কা। বাঙলা সাহিত্যের স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'তে আরম্ভ হয়েছে।—এর প্রতিকারের উপায় কি? উপায় তো আবিষ্কার করতেই হবে; নতুবা বাঙলা সাহিত্যের গ্রাম্যতা দোষের পথ রুদ্ধ হবে কিভাবে? এই হ'ল গিয়ে বাঙলা সাহিত্যের দ্বিতীয় সমস্যা।

৪

বাঙলা সাহিত্যের তৃতীয়তম, নূতনতম এবং কঠিনতম সমস্যা হ'ল দলীয়তাবাদ। দলীয়তাবাদ কথাটা কানে নূতন ঠেকলেও শব্দটা প্রায় দলাদলির মতোই পুরাতন। বর্তমান যুগের একটা টান আন্তর্জাতিকতা, সর্বজাতিকত্ব প্রতিষ্ঠা তার আদর্শ। তারই প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছে ছোট বড় দল উপদলের ফাটল-ধরানো তত্ত্ব। মানুষ যখন তক্তপোষে শুয়ে সর্বজাতিকত্বের স্বপ্ন দেখছে, তখন যে ধীরে ধীরে তার তক্তপোষের কাঠগুলো আলাদা হ'য়ে যাচ্ছে—আর এক মুহূর্ত পরেই সে ধরাশায়ী হবে, তা কি সে ভাবতে পারছে? দলাদলি সব সময়েই ছিল, আর রাজনীতি মানেই বোধ করি দলাদলি, কাজেই দলাদলি তার অস্তিত্বের পুরানো দলিলখানা দেখিয়ে সমালোচককে নীরব ক'রে দিতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুগের রাজনৈতিক দলাদলি আর রাজনীতি মাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, মানুষের সমগ্র জীবনকে সে আক্রমণ করেছে। এমন কি সাহিত্য, শিল্প, ধর্মের মতো সর্বজনীন, সর্বকালীন বস্তুকেও সে নিজের সীমার বহির্গত মনে করে না। বস্তুতঃ সর্বজনীন, সর্বকালীন শাশ্বতকেই সে মানে না। মানলেই যে বিপদ। যখন যেমন সুবিধা, তখন তেমন কর্মপদ্ধতি—এই

নীতি অবলম্বন ক'রে যারা দলীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছে, কোন কিছু নিত্য বা ধ্রুব — একথা তারা স্বীকার করবে কেমন ক'রে? তাতে যে দলের ভিত্তিটাই ধ্বসে যায়। ধর্মকে দলীয়তাবাদ অস্বীকার করে না, কেবল নিজের দৃষ্টি দিয়ে তার এমন ব্যাখ্যা করে, যাতে দলীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা বাড়ে। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিকেও তারা দলীয় ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিয়েছে। অর্থাৎ দলীয় ব্যাখ্যার হাতে পড়ে সাহিত্য প্রচারপত্রে ও জর্নালিজমে পরিণত হয়েছে। অবশ্য দলীয়তাবাদ বলে যে, মানুষের কল্যাণই তার কাম্য। কিন্তু মানুষের কল্যাণ কার কাম্য নয়? যে অসভ্য নরখাদক জাতি বংশের বৃদ্ধগণকে বা পরাজিত শত্রুগণকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলে, তারাও মানব কল্যাণের আদর্শ নিয়েই এই কাজটি করে। কাজেই মানব কল্যাণের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। শিল্পের লক্ষ্য মানুষ, দলীয়তাবাদের লক্ষ্য দলীয় মানুষ, শিল্পের আদর্শ মানুষের প্রতিষ্ঠা, দলীয়তাবাদের আদর্শ দলের প্রতিষ্ঠা, শিল্প শাশ্বত বলে একটা নিত্যবস্তু স্বীকার করে, দলীয়তাবাদ বলে মানুষের ইতিহাস মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে—নিত্য কিছু নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিল্প ও দলীয়তাবাদের ভিত্তিই ভিন্ন। তৎসত্ত্বেও যদি দেখতাম যে, দলীয়তাবাদের ফলে কোন মহৎ শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, তবু তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য দল-উপদলগুলো বলবে যে, মহৎ শিল্পের অভাব কি? প্রত্যেক দলই যে মহৎ শিল্প ও শিল্পীর দাবী রাখে। প্রত্যেক দলই বলে যে, আমার দলের বা আমার দলের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন অমুক লেখক—লেখকের সেরা। এই ভাবে দলের প্রচারযন্ত্র সেই লেখকের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে লেগে যায়। নিরীহ পাঠকের পক্ষে কতক্ষণ আর মাথা ঠিক রাখা সম্ভব। ক্রমে সে দলের প্রচারকার্যকে স্বীকার ক'রে নেয়, দল তাকে যায়, আর একটি পাঠক পরোক্ষে আমার hegemony বা সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার ক'রে নিল। বিদেশে দলীয়তাবাদ বেশ কায়েম ক'রে বসেছে। সে-দেশের অনেক স্থানেই রাজনৈতিক দল বা গভর্নমেণ্ট জাতির জীবনকে এমনভাবে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে, যাতে শিল্পীরাও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। কালক্রমে শিল্পের স্বাধীনতার নাম পর্যন্ত যখন লোকে বিস্মৃত হবে, তখন ওই পরাধীনতাকেই স্বাধীনতা ব'লে মনে করতে থাকবে।

বিদেশের এই ঢেউ এ-দেশে এসে পৌঁচেছে; বাঙলাদেশেও পৌঁচেছে। বাঙলাদেশে রাজনৈতিক দলের অভাব কোনকালেই ছিল না। কিন্তু তখন তারা শিল্পকে control করবার স্বপ্ন দেখেনি। কিন্তু এখনকার কথা স্বতন্ত্র। এখনকার প্রত্যেক রাজনৈতিক দল মানুষের জীবনকে সর্বাত্মকভাবে আয়ত্ত করতে চায়। বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্য ও রাজনীতির দিকে তাকালে আমার উক্তির সমর্থন পাবেন ব'লেই বিশ্বাস করি। সার্কাসের দল যেমন সগর্বে ঘোষণা করে যে, তার দলে কটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার, হাতী, ভাল্লুক প্রভৃতি আছে, আর তাই দিয়েই তার কৌলীন্যের বিচার হয়, রাজনৈতিক দলগুলোও তেমনি ঘোষণা করে যে, তার দলে কোন্ কোন্ সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী প্রভৃতি আছেন।

একক সাধনার যুগ বর্তমান কাল নয়। দল পাকিয়ে শক্তিমান হওয়া এ-কালের লক্ষণ। দলের হাতেই ধন-মানের দাক্ষিণ্য থাকাতে সাহিত্যিকগণও একে একে এ-দলে ও-দলে ভিড়ে পড়ছেন। যাঁরা এখনো দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা দেখছেন, যেখানে হরিরলুটের বাতাসা ভাগ হচ্ছে, সেখানে তাঁদের স্থান নেই, তাঁদের কেউ বড় গ্রাহ্য করছে না। তখন তাঁরাও হয়তো দলীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। এই প্রক্রিয়া বাঙলাদেশে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের মূল আদর্শ বিস্মৃত হয়ে গিয়ে শিল্পীরা ধর্মচ্যুত হ'য়ে পড়ছে। ভারতবর্ষের দীর্ঘকাল স্থায়ী পরাধীনতার মধ্যেও বাঙলাদেশ তার সাহিত্যের জানালাটা খুলে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, তাতেই সমস্ত দেশ বেঁচে গিয়েছে। আজ দেখছি, সেই জানালা বন্ধ করবার ষড়যন্ত্র চলছে। মানুষ যে বৃহৎ পৃথিবীর বাতাসকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে দলীয়তাবাদ তা সহ্য করতে পারে না, তার নিজস্ব Oxygen Cylinder-এর বাক্সের পরিমাপিত নিঃশ্বাস মানুষ গ্রহণ করুক, প্রত্যেক প্রশ্বাসে তার জয়ধ্বনি নিঃসৃত হোক—এই তার কাম্য।

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ রাষ্ট্রের নিকটে আত্মসমর্পণ করবার ফলেই আণবিক বোমার ন্যায় সর্বনাশের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে—এখন শিল্পীরা যদি দল বা রাষ্ট্রের নিকটে আত্মসমর্পণ করে বসে, তবেই চমৎকার। যুদ্ধকালীন অবস্থায় পড়ে অনেক রকম কন্ট্রোলই দেখলাম, এখন শিল্পের কন্ট্রোল দেখা বাকী আছে। এই ব্যাপারও শীঘ্রই স্বচক্ষে দেখতে হবে, কিম্বা আংশিকভাবে দেখেছি বলাই উচিত। শিল্পের বন্ধনের আশঙ্কা সর্বত্র দেখা দিয়েছে—বাঙলা-সাহিত্যেও দেখা দিয়েছে। এইটি বাঙলা-সাহিত্যের পক্ষে সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কারণ। যক্ষপুরীর মধ্যে স্থানেও নন্দিনীকে কেউ বাঁধতে পারেনি। আর এখানে নন্দিনীকে নাগপাশের সঙ্গে জুড়ে সর্দারদের মালখানাতে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলছে। এ-দৃশ্যও কি রঞ্জনকে দেখতে হবে? মানুষ মাত্রেই রঞ্জন। যক্ষপুরীর রঞ্জনের সৌভাগ্য যে সে মরে বেঁচেছিল। আমাদের রঞ্জনকে বেঁচে মরতে হবে, তাকে দেখতে হবে যে, তার প্রেয়সী শিল্পকলা নন্দিনী যেন খোঁজার পরে সর্দারদের দৃষ্টি শাসনের তালে তালে দলীয়তাবাদের জয়ধ্বনি গানের ঘুঙুর বাজিয়ে আসর মাত করছে! এই শোচনীয় কাণ্ড যাতে না ঘটতে পারে, শিল্পী ও শিল্পরসিকদের এখনই সে বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত আবশ্যক।

## ৫

এই তো আমাদের অবস্থা। এখন কর্তব্য কি? প্রতিকারের উপায় কি? জানি না। আর ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি যে মানুষ কখনো দেখে শেখে না, ঠেকে শেখাই তার অভ্যাস। কোন একটা দুর্গতি চরম পর্যন্ত না গিয়ে থামে না। বাঙলা সাহিত্যের দুর্গতিও চরম পর্যন্ত যাবে আর সে জন্যেই আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো। তবে সাধারণভাবে দু'একটা কথা বলা যেতে পারে। মুখে আমরা যাই বলি না কেন মন আমাদের এখনও পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন পশ্চিম দিক থেকে নিজের দিকে মুখ ফেরাবার সময় এসেছে—তারই আর এক নাম আত্মস্থ হওয়া। পশ্চিম এক সময়ে আমাদের নবজাগরণে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ পশ্চিম আমাদের মনের খাদ্য জোগাতে পারবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়। বরঞ্চ দেখছি অনেক বিদেশী শক্তিমান লেখক ভারতের উপনিষদে ও যোগশাস্ত্রে জীবনের পাথেয় সন্ধান করতে আরম্ভ করেছেন। বিদেশ থেকে এখন আমরা একটা Steam engine বা এই জাতীয় দু'একটা যন্ত্রপাতি নিতে পারি; কিন্তু তার বেশী পাশ্চাত্য দেশ আর কিছু আজ আমাদের জোগাতে অক্ষম। যে-দেশের মাটিতে এখনো গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব, মনে রাখতে হবে তার সম্ভাবনার অন্ত নেই। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের জন্মের ফলে ভারতবর্ষ সমস্ত জগতের আধ্যাত্মিক উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। এ দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী যখন কাঙালের বেশে ইউরোপের কাছে হাত পেতে তখন লজ্জা অধিক হয়, কি দুঃখ অধিক হয় বলা কঠিন। তখন বুঝতে পারি শিল্পীর নির্বুদ্ধিতা থেকে এরা বঞ্চিত নতুবা ঘরের সম্পদের সন্ধান জানবে না কেন? উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষ ভারত আজ উপনিবেশে পরিণত, এই সত্যটা এখনো আমাদের বুঝতে বাকি আছে।

বাঙলা সাহিত্যিকগণ যদি কিছু সংস্কৃত শেখেন, তবে তাঁদের আত্মস্থ হবার সাহায্য হবে, তাঁদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দূরকালের দিকে প্রসারিত হবার সুযোগ পাবে। আর সেই সঙ্গে তাঁরা যদি কিছু হিন্দী শেখেন তবে তাঁদের দৃষ্টি বিস্তৃত ভারতবর্ষের দিকে আপনি বিস্ফারিত হয়ে যাবে। সংস্কৃত এবং হিন্দি দেশে কালে বিস্তৃত ভারতীয় জীবনকে জানতে সাহায্য করবে।

বর্তমান কঠিন জীবনের অন্ধকারের অন্তরালে যক্ষপুরীর নাগপাশ মুক্তির জন্য আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, এখন কে তাকে মুক্তির পথ দেখাবে? এই যক্ষপুরীতে আছে এক নন্দিনী, সে তার কোমল নীলকণ্ঠ পাখির পালক দিতে প্রস্তুত। শিল্পলক্ষ্মীর মানুষকে বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে শোচনীয় লক্ষণ এই যে, মানুষ আজ তাকেও বাঁধবার ষড়যন্ত্র করতে উদ্যত। মানুষ যখন বিরূপ হয়, তখন সারাদেশের বন্দীদের মুক্তিশালা বলে মনে হয়, আর মুক্তিদাতাকে বাঁধবার ইচ্ছা মনের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। বিশাল সমাজে সেই ইচ্ছা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে, সর্বনাশ চরমে পৌঁছবার আগেই যক্ষপুরী থেকে বেরিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, শিল্পলক্ষ্মী নন্দিনী এই বিপ্লবের সহচরী, যেখানে তার নীল আকাশের আশীর্বাদের মতো নীলকণ্ঠ পাখির পালক, মণিবন্ধে তার অনুরাগের রক্ত দীপ্ত রক্তকরবীর গুচ্ছ! শিল্প ও মানুষ একসঙ্গে বাঁচবে, কিম্বা এক সর্বনাশের তলে তলিয়ে যাবে সেই পরীক্ষার পরম মুহূর্ত আজ সমাগত। তাই আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আর একবার বলে নিই—জয় হোক নন্দিনীর জয় হোক। *

---

* জামসেদপুর চলন্তিকা সাহিত্য সভার সভাপতির অভিভাষণ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা করদাতাদিগকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন, জলসরবরাহ, নর্দমা পরিষ্কার, রাস্তাঘাট মেরামত প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁদের কোন অভিযোগ থাকিলে তাঁরা যেন তা কর্তৃপক্ষের গোচর করেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, একমাসের মধ্যে করদাতাদের নিকট হইতে তিনি মাত্র একশত উনত্রিশটি অভিযোগ পাইয়াছেন।

সংবাদটা শুনিয়া বিশুখুড়োকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তবে কি এসব ব্যাপারে কোলকাতা শহরের অবস্থার সত্যিই উন্নতি হয়েছে? খুড়ো বলিলেন—'তা জানিনে, তবে করদাতাদের বুদ্ধির যে অনেকখানি উন্নতি হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়. বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র একশত উনত্রিশ জন!

* * " * *

বাংলার আইন পরিষদ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তার কারণ সম্বন্ধে নানা মহলে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। আমরা ট্রাম-বাসের সাধারণ যাত্রী এ সব উচ্চাঙ্গের কথা বুঝি না এবং বুঝিতেও চাই না। তবু নেহাৎ বোকা বনিয়া যাইব ভয়েই আমাদের টীকাকার বিশু খুড়োর শরণ নিতে হয়। তিনি বলেন,—"কর্পোরেশনের ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের খবরদারির প্রসঙ্গে স্যার বি. এল বলেছেন,—"A years time may be too brief to clean up the mess"—হয়ত আইন ফেলে তাই তাঁরা জঞ্জাল সাফের কাজে লেগে গেছেন।"

আমাদের শ্যাম বলিল,—"তা নয়. শুনেছি গরমের তিনমাস ভারি বোঝাই মোষের গাড়ির চলাচল নাকি আইনতঃ নিষিদ্ধ। মোষের প্রতি যাঁদের এত দরদ সেই আইনের মালিকদের এত গরমে গুরুভার বহন করাও সমীচীন নয়।" কথা শুনিয়া খুড়ো শ্যামের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"বাহবা, সেণ্ট পার্সেণ্ট মার্ক!"

* * " * *

কতদিন আগের একটি খবরে শুনিয়াছিলাম, মেডিকাল এসোসিয়েশন নাকি আইন দ্বারা আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বন্ধের সুপারিশ করিয়াছেন। "আইন দ্বারা মানৎ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শঙ্কার কোন কারণ [illegible] আধি ব্যধির জন্য মানৎ ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসাই আমাদের জন্য নয়—মন্তব্য বলা বাহুল্য বিশু খুড়োর।

* * " * *

"Donkeys with wheat seized"—একটি সংবাদের শিরোনামা। নিশ্চয়ই এটা এমন কিছু জোর খবর নয়। Donkeyর বদলে Monkey হইলে আমরা খবরটা সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে পারিতাম।

* * " * *

বোম্বাই এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে নাকি খাদ্য রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন সহযোগী বলিতেছেন,—এই ব্যবস্থায় বাঙলার পক্ষে একটু ঈর্ষান্বিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মন্তব্যটি বিশু খুড়োর গোচর করানো হইলে তিনি বলিলেন,—"মোটেই নয়, আমাদেরও সান্ত্বনা আছে—What Bengal ate yesterday India is eating to-day!"

* * " * *

প্রসংগত অন্য একটি সংবাদ মনে পড়িয়া গেল। শুনিলাম, ভারতের মিউজিয়ামের জন্য নাকি তেরশত বৎসরের পুরাতন কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি সংগ্রহ করা হইয়াছে। সংস্কৃতির দিক হইতে হয়ত এর মূল্য আছে.

কিন্তু আপাততঃ হাঁড়িকুড়িতে রান্না করার জন্য অন্ততঃ তের দিনের খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিলেও আমরা বাঁচিয়া যাই। খুড়ো বলিলেন—"তা যা বলেছ, আপনি বাঁচলে সংস্কৃতির নাম!"

* * " * *

আমাদের প্রতিবেশী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ অভিযোগ করিয়াছেন, বাঙ্গালীরা নাকি তাদের পর পর ভাবে। এই মনোভাব দূর করিতে হইলে তাদের বাংলা ভাষা শিক্ষা করা উচিত বলিয়া রাজাজী নির্দেশ দিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন,—"সত্যিই তাতে ফল হবে বলেই মনে করি এবং হলে আমরা খুশিই হব। তবে অভিযোগটা সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। পর পর আমরা ভেবেছি বটে, কিন্তু কুটুম্বিতের জন্য তাঁরাও যে আগ্রহশীল ছিলেন তা বলা যায় না, সম্বোধন তাঁরা করেছেন Bloody বলে কিন্তু এ-টাতে নিশ্চয়ই শোণিত সম্বন্ধ বোঝায় না!"

* * " * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, কাশ্মীরে আজন ঢাকা ঘোড়দৌড়ের মাঠে যখন খেলা দিতেছিলেন, তখন কাশ্মীরের সাহায্যের জন্য

নাকি হিন্দুদের নিকট চেক করিয়া ঘোড়া বিক্রয় করা হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন,—ঘোড় দৌড়ের মাঠে এমন ব্যাপার হওয়া হয়েই থাকে।"

* * " * *

অন্য একটি মজার খবরে প্রকাশ, বিলাতে নাকি কেহ কেহ Luckএর জন্য চার্চিল সাহেবকে স্পর্শ করিয়া আসিতেছেন।

কতকদিন আগে জিন্নাজীর বিলাত যাওয়া কথা ছিল। উক্ত সংবাদটার সঙ্গে তাঁ বিলাত গমনের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ত বোঝা গেল না।

### পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা

বিগত বিশ্বযুদ্ধের শেষ মুহূর্তে জাপানের হিরোসিমার উপর মার্কিন অ্যাটম্ বোমা পড়ার পর থেকেই আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে বিশ্বের পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চলছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে প্রয়াস সফল হয় নি। এতদিন পর্যন্ত সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের আওতায় বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের মারফৎ তবু যে চেষ্টা চলেছিল বর্তমানে বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের পারস্পরিক ক্ষমতার লড়াই-এর দরুণ সে চেষ্টাও পরিত্যক্ত হতে চলেছে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্বের স্থায়ী শান্তির পক্ষে এটা আদৌ আশার কথা নয়। আবার যদি পৃথিবীতে তৃতীয় যুদ্ধ বাধে এবং সে যুদ্ধে যদি পরমাণবিক শক্তি প্রযুক্ত হয়, তবে বিশ্বসভ্যতা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাবে—এ বিষয়ে প্রায় বিশ্বের কোন শক্তিরই সন্দেহ নেই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তবু তারা বিশ্বের স্থায়ী শান্তির জন্যে কোন পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হচ্ছে না। বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই অ্যাটম বোমা তৈরী করতে জানে—এই আত্ম-সন্তুষ্টিতেই মার্কিন রাজনীতিবিদরা মশগুল এবং তাঁরা খোলা স্বরে সেই কথাই প্রচার করছেন। অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ায় এ সম্বন্ধে কি বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে না চলছে লৌহ-পর্দার দরুণ সে খবর পাওয়া দুষ্কর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়াকে বিশ্বাস করে না এবং সোভিয়েট রাশিয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাস করে না—এই পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফলেই আজ পর্যন্ত পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কোন মতৈক্য সৃষ্টি হতে পারে নি।

পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্যে গত দু'বৎসর ধরে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে বহু প্রয়াস হয়েছে। এই উপলক্ষে এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানটির আওতায় দুটো স্বতন্ত্র কমিটিও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন; তাঁদের একটির নাম অ্যাটম কন্ট্রোল কমিটি এবং অপরটির নাম অ্যাটমিক এনার্জি ওয়ার্কিং কমিটি (টেকনিক্যাল)। এই দুটো কমিটির আলাপ-আলোচনাতেই বর্তমানে এমন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে এই কমিটি দুটি ভেঙে যাবারই সমূহ আশঙ্কা। পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রুশ পক্ষ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বানুসারী অন্য পক্ষের কোনই মতদ্বৈধ নেই। মতদ্বৈধ আছে শুধু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে এবং তার কারণ যে মূলতঃ রাজনৈতিক মতবিরোধ সে কথা বিশদভাবে না বললেও চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন

প্রভৃতি দেশ চায় পরমাণবিক শক্তি উৎপাদন ঘটিত সমস্ত বিষয়টিকেই আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে আনতে। তাদের মতে এ বিষয়ে স্বস্তিপরিষদের কোন বক্তব্য বা দায়িত্ব থাকবে না—সামগ্রিকভাবে সম্মিলিত রাষ্ট্র-পুঞ্জের নির্দেশক্রমেই এ ব্যবস্থা চলবে। অর্থাৎ এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটিতে সকল রকম সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ভোটাধিক্যে এবং সকল দেশকে সেই সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে। রাশিয়া এই প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নিতে রাজী নয়। তার মতে এই ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে। তা ছাড়া এ বিষয়ে তার আর একটি ভয়ের কারণও আছে। পৃথিবী বর্তমানে দুটো সুস্পষ্ট ব্লকে বিভক্ত হয়েছে এবং রাশিয়ার ধারণা যে, গণতান্ত্রিক ভোটে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে তার কোন প্রস্তাব গৃহীত হবার কোন সম্ভাবনা নেই—বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ দেশের সিদ্ধান্ত মেনেই তাকে চলতে হবে। তাই রাশিয়া পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী হলেও সে চায় যে এই কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে স্বস্তিপরিষদের আওতায়। স্বস্তিপরিষদে রাশিয়ার ভেটোর ক্ষমতা আছে এবং এই ক্ষমতার দ্বারা সে অন্যান্য রাষ্ট্রের যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারে। পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও এই ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগ করতে চায় সোভিয়েট রাশিয়া। তা ছাড়া, এই রকম আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হবার সময় যে সব দেশের হাতে পরমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রাদি আছে সে সব দেশকে এই সব অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করে ফেলতে হবে এটাও সোভিয়েটের দাবী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা বৃটেন এই ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী নয়। তারা বলে যে অন্যান্য দেশ গোপনে পরমাণবিক অস্ত্রাদি নির্মাণ করলে তা বন্ধ করার কোন কার্যকরী উপায় যখন রুশ পরিকল্পনায় নেই তখন যাদের হাতে পরমাণবিক অস্ত্রাদি আছে তাদের সে সব ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়াও বৃথা।

রুশ পরিকল্পনাটি বিগত জুন মাসে উপস্থাপিত করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক অ্যাটমিক এনার্জি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে। গত ১১ মাসের আলাপ-আলোচনার পরও এ সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কোন মতৈক্য সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সম্মতিক্রমে বৃটেন, ফ্রান্স, ক্যানাডা ও চীনের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, রুশ পরিকল্পনাটি নাকচ করে দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবের পক্ষে আরও চারটি দেশের সমর্থন পাওয়া গেছে। ফলে ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের দৃঢ় বিশ্বাস। ইতিমধ্যে ভোটও হয়ত গৃহীত হয়ে গেছে, শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখার জন্যে সময় চেয়েছেন বলে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত আছে। আন্তর্জাতিক অ্যাটম কন্ট্রোল কমিটির আলোচনাতেও সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্যে আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি বোর্ড গঠন করে তোলাই এ কমিটির কাজ। কিন্তু উভয় পক্ষের মতবিরোধ এমন তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, কমিটির চেয়ারম্যান অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আলোচনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, এই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন রুশ প্রতিনিধি অধ্যাপক স্কোবেল্ট্‌সিন্ এবং আলোচনা স্থগিত রাখার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে আলাপ-আলোচনার অচল অবস্থা ব্যর্থতারই নামান্তর এবং শীঘ্রই সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কাছে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন এই মর্মে রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য হবেন যে তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। জনকল্যাণের জন্যে মূলগত প্রশ্নে উভয় পক্ষের মতৈক্য সৃষ্টি হবে—এ আশা করা বর্তমানে বৃথা।

### আন্তরামেরিকান্ সম্মেলন

কলম্বিয়ার ৯০০০ ফিট উচ্চ অ্যাণ্ডিস্ পাহাড়ের উপর অবস্থিত সুন্দর সহর বগোটাতে গত ৩০শে মার্চ থেকে আন্ত-রামেরিকান বা প্যান-আমেরিকান সম্মেলন বসেছে। গত বৎসর রায়ো ডি জেনেরোতে আন্তরামেরিকান সম্মেলনে যে পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি হয়ে গেছে এ সম্মেলন হল তারই প্রত্যক্ষ ফল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ছোট বড় মোট ২১টি রিপাব্লিকের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়েছেন এই সম্মেলনে। এই সম্মেলনের পিছনে প্রধান উদ্যোক্তা ও হোতা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আপাতদৃষ্টিতে এই সম্মেলনটিকে একটা নিছক আঞ্চলিক ব্যাপার মনে হলেও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর থেকে এ সম্মেলন বিচ্যুত নয় কিংবা এই সম্মেলনের প্রভাব আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উপর পড়বে না—এমন কথাও জোর করে বলা চলে না। এই সম্মেলনের বেশ কিছুটা গুরুত্ব না থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-

সচিব মার্শাল স্বয়ং একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদলের নেতা হয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিতে যেতেন না। বিশেষ করে বর্তমান মুহূর্তে যখন তাঁরই ইউরোপীয় সাহায্য পরিকল্পনা মার্কিন পরিষদে গৃহীত হয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের স্বাক্ষর পর্যন্ত পেয়েছে এবং তদনুযায়ী কাজও কিছু কিছু পরিমাণে আরম্ভ হয়েছে। তার উপরে আছে প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আকস্মিক নীতি পরিবর্তনের সমস্যা এবং বৃটিশ ম্যান্ডেটের অবসানে প্যালেস্টাইনের ভাবী শাসন-ব্যবস্থার সমস্যা। মিঃ মার্শালের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য যাঁরা বগোটা সম্মেলনে যোগ দিতে গেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অর্থ সচিব মিঃ স্নিডার, বাণিজ্য সচিব মিঃ হ্যারিম্যান প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই মার্কিন গবর্ণমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন এরূপ একটি শক্তিশালী দল নিয়ে মার্শাল সাহেব নিশ্চয়ই খেলা দেখতে কিংবা খেলা দেখাতে যান নি।

বগোটা সম্মেলনের প্রধান দুটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হবে আমেরিকায় বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপনিবেশ সংরক্ষণের প্রশ্ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সাহায্যে সমগ্র আমেরিকার বিভিন্ন দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন। এ দুটি প্রশ্নের একটিও যে উপেক্ষার বিষয় নয়—তা সহজেই অনুমেয়। কিছুকাল পূর্বে বৃটিশ অধিকৃত ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ ও কুমেরু অঞ্চলে চিলি ও আর্জেণ্টিনার দাবী এবং বৃটিশ হণ্ডুরাসে গুয়েটেমালার দাবী নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে এই প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেবে বলে মনে হয়। প্রায় দেড় মাসকাল ধরে এই সম্মেলনের কাজ চলবে বলে প্রকাশ। তবে ১৬ই এপ্রিলের পরে এই সম্মেলনে নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচিত হবে বলে মনে হয় না। তার কারণ এই তারিখে প্যালেস্টাইনের নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্যে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহূত হয়েছে এবং সে অধিবেশনে যোগদানের জন্যে মিঃ মার্শাল নিশ্চয়ই বগোটা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হবেন। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে প্যান-আমেরিকান সম্মেলনে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে না—এই হল ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আর্জেণ্টিনাই এই সম্মেলনে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবে এরূপ মনে করার হেতু আছে। যে সব দেশ আমেরিকা থেকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ দাবী করছে আর্জেণ্টিনা নিয়েছে তাদেরই নেতৃত্ব। এর মধ্যে গুয়েটেমালা, ভেনিজুয়েলা সবচেয়ে বেশী মুখর। গুয়েটেমালা সম্মেলনে যে দুটি প্রস্তাব আনবে বলে স্থির করেছে তার মধ্যে একটি হল আমেরিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের নিন্দাসূচক এবং অপরটিতে আমেরিকা থেকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নির্বাসন দাবী করা হবে। এই দাবীর পিছনে সর্বশুদ্ধ দশটি দেশের সমর্থন আছে বলে মনে হয়। সে দশটি দেশ হল আর্জেণ্টিনা, গুয়েটেমালা, ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, মেক্সিকো, পানামা, চিলি, প্যারাগুয়ে এবং পেরু। অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আমেরিকা থেকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে তাড়ানোর পক্ষপাতী নয়। তার কারণ ইউরোপে সোভিয়েট অগ্রগতির ফলে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ আজ বিপন্ন এবং তাদের সাহায্যের জন্যেই মার্শাল পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলা হচ্ছে। এ অবস্থায় স্থিতাবস্থাকে নাড়া দিলে মার্শাল পরিকল্পনার উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব কিছু রয়ে সয়ে করারই পক্ষপাতী। অথচ আমেরিকার ২১টি দেশের মধ্যে দশটির দাবীকে একেবারে উপেক্ষা করাও চলে না। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে এই জটিল ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্বন্ধে তথ্যাদি নির্ধারণের জন্যে ২১টি জাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশগুলির মতই সংখ্যাধিক্য থাক, শেষ পর্যন্ত মার্কিন কূটনীতিরই বিজয়ী হবে বলে মনে হয়। তার কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আছে ডলার সাহায্যের বড় অস্ত্র। আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিপাব্লিকগুলির পক্ষে ডলারের লোভ ত্যাগ করা সম্ভব হবে না এবং আমেরিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বও কিছুদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে।

### ইংগ-ট্রান্সজোর্ডান চুক্তি

আরব জগতে হাসেমী রাজবংশ শাসিত ইরাক ও ট্রান্সজোর্ডানের বৃটিশ প্রীতি সুবিদিত। তার কারণও অবশ্য আছে। প্রধান কারণ হল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যের মধ্য থেকে এই দুইটি নতুন আরব রাজ্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল বৃটিশদেরই প্রচেষ্টায়। তদবধি বৃটিশরা নামে না হলেও কার্যতঃ এই দুইটি দেশের উপর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কর্তৃত্ব চালিয়ে আসছিল। এই দুইটি দেশের সঙ্গে বৃটেনের যে চুক্তি ছিল তাকে কোন ক্রমেই এই দুইটি দেশের সার্বভৌমত্বের পরিপোষক বলে ধরা যেতে পারে না। আজ যুগ পরিবর্তনের ফলে সমগ্র আরব জগৎ বৈদেশিক শক্তি-বিরোধী জাতীয়তার নব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। বিশেষ করে আরব যুবশক্তির মধ্যে একটা তীব্র স্বাজাত্যবোধ এনে দিয়েছে। ফলে আরবরা আজ আর কোন বৈদেশিক শক্তির হাতের পুতুল হয়ে থাকতে চায় না। তারা দাবী করছে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। হাসেমী রাজবংশের বৃটিশ প্রীতি তাই আরব জাতীয়তাবাদীদের চক্ষুশূল। ইরাক ও ট্রান্সজোর্ডানের শাসক মহলে প্রভূত বৃটিশ প্রীতি থাকলেও প্রগতিশীল জনসমাজ ক্রমশঃই অতিমাত্রায় বৃটিশ বিরোধী হয়ে উঠেছে। তার প্রথম প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম গত জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে স্বাক্ষরিত ইংগ-ইরাক চুক্তি ইরাকী জনমতের চাপে বাতিল হয়ে যাওয়ায়। যে মন্ত্রিমণ্ডল বৃটেনের সঙ্গে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন জনমতের চাপে পড়ে সে মন্ত্রিমণ্ডলকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল এবং নতুন ইরাকী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়েছিল এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বৃটেনের পক্ষে নতুন কোন চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে আরবদের এই বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া গেছে ট্রান্সজোর্ডানে। ট্রান্সজোর্ডানের রাজধানী আম্মানে মাসখানেক পূর্বে একটি ইংগ-ট্রান্সজোর্ডান চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। অথচ এই বৎসরের জানুয়ারী মাসেই ট্রান্সজোর্ডানে প্রথম গণতন্ত্রসম্মত পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছে। কিন্তু ট্রান্সজোর্ডানের রাজা আবদুল্লার গভর্নমেন্ট জনগণের প্রতিনিধিদের কোন সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই এই চুক্তি সম্পন্ন করে বসেছেন। তার ফলে চুক্তির [illegible] এই রাজ্যটিতে প্রবল গণবিক্ষোভ ও শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দিয়েছে। জাতীয়তাবাদী জনগণ দাবী জানাচ্ছে এ চুক্তি বাতিল করে দিতে হবে। ট্রান্সজোর্ডানের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে এই বলে রাজা আবদুল্লার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হচ্ছে যে, তিনি [illegible] বৃটিশদের সমস্ত নির্দেশ মেনে ট্রান্সজোর্ডানের পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ়তর করে দিচ্ছেন।

এই জাতীয় চুক্তির বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের প্রধান হেতু হল সংশ্লিষ্ট দেশে বৃটিশদের সামরিক ঘাঁটি ও সেনাবাহিনী রাখবার সর্তের অস্তিত্ব। বৃটিশদের পক্ষেই বা চুক্তিতে এই ধরণের সর্ত না রেখে উপায় কি? আরব জগতে প্যালেস্টাইন বৃটিশদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। ১৫ই মের পর বৃটিশরা প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট ত্যাগ করলে এই দেশটির উপর আর তাদের বিশেষ কোন অধিকার থাকবে না। মিশরেও বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র। সুদানের জটিল প্রশ্নের দরূণ আজ পর্যন্ত ১৯৩৬ সালের ইংগ-মিশর চুক্তি সংশোধন করে মিশরের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি করা বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আরব জগতে অন্যান্য যেসব দেশ আছে, তারা হয় উগ্র ধরণের জাতীয়তা-

ঘাঁটি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। অথচ আরব জগতের মত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বৃটেনের রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র ভরসা হল ইরাক, ট্রান্স-জোর্ডান ইয়েমেন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি। কিন্তু সে সব দেশেও জাতীয়তাবাদের কুগ্রহ দেখা দিয়েছে। ট্রান্সজোর্ডানের সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ট্রান্সজোর্ডানে যে গণবিক্ষোভ ও শ্রমিক ধর্মঘট হয়ে গেছে তার সঙ্গে ইঙ্গ-ট্রান্সজোর্ডান চুক্তির কোন সংযোগ নেই। তবু ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, ট্রান্স-জোর্ডানে রাজা আবদুল্লার গভর্নমেন্টের বিরোধী একটি শক্তিশালী দল আছে। এই দলের নাম ফ্রী ট্রান্সজোর্ডান পার্টি এবং এই দলের নেতা দামাস্কাসে নির্বাসিত ডাঃ আবদু খলিল। এই দলটি সর্বপ্রকারে ইঙ্গ-ট্রান্সজোর্ডান চুক্তি বাতিল করার চেষ্টায় আছে। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যে ট্রান্সজোর্ডানে ইরাকের মত চুক্তি বিরোধী তীব্র গণবিক্ষোভ দেখা দেওয়া আদৌ বিস্ময়কর নয়। ১০।৪।৪৮

# নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে ১৩ই ও ১৪ই নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে উদয়শংকর কলাকেন্দ্রের ছাত্র ও ছাত্রীদের দ্বারা 'ডান্সেস অফ ইণ্ডিয়া' নৃত্যানুষ্ঠান হবে।

* * * *

বাঙলা ছবি বলতে এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করবে রূপবাণীতে এম পি পিকচার্সের 'বিশ বছর আগে' যার কাহিনীটি গ্রহণ করা হয়েছে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত ঐ নাটকেই নাট্যকাহিনী থেকে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন অংশে অভিনয় করেছেন দেবী, ছায়া, পদ্মা, মিহির, অনুভা, আর্টিষ্ট, মনোরঞ্জন, কানু, অমর, ভূপেন ও জহর; আর কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন আলোকচিত্রে প্রভাস দাস, শব্দগ্রহণে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, সুরযোজনায় সুবল মুখোপাধ্যায় শিল্পনির্দেশে সত্যেন মুখোপাধ্যায়।

* * * *

হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করবে মিনার্ভায় 'ঘর ঘর কী কাহানী'। শ্রেষ্ঠাংশে লীলা চীটনীস ও মদন ব্যানার্জী; রক্সী-ভবানী-নাথমল ফিল্মিস্তানের 'শেহনাই', শ্রেষ্ঠাংশে নসীম, রেহানা ও শাহ নওয়াজ এবং প্যারাডাইসে প্রকাশ পিকচার্সের 'বিক্রমাদিত্য' শ্রেষ্ঠাংশে পৃথ্বীরাজ, প্রেম অদীব ও রত্নমালা প্রভৃতি।

* * *

আগামী আকর্ষণের মধ্যে বসুশ্রীতে আসছে তারাশংকরের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'রাত্রী দেবতা'; পরিচালনায় কালীপ্রসাদ ঘোষ ও ভূমিকায় ছায়া, অজিত, ছবি প্রভৃতি; চিত্রা ও পূর্ণতে ২৮শে থেকে সুনন্দা প্রডাকসন্সের 'প্রতিদান', পরিচালক নীতিন বসু, ভূমিকায় সুনন্দা, ছবি বিশ্বাস, অসিত, কৃষ্ণচন্দ্র, বিমান এবং সুরযোজনায় তিমিরবরণ। সৌকত আর্ট প্রডাকসন্সের 'জুগনু', শ্রেষ্ঠাংশে নূরজাহাঁ ও গোলাম মহম্মদ; কনু দেশাই প্রডাকসন্সের 'গীত গোবিন্দ', ভূমিকায় প্রেম অদীব, লীলা দেশাই, সুলোচনা, ডেভিড; এবং ফেমাস

পিকচার্সের 'আজ-কী-রাত' ভূমিকায় সুরৈয়া, ইয়াকুব, মতিলাল ও শাহ নওয়াজ—কখানি ছবিই আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ করবার সম্ভাবনা আছে।

### স্টুডিও সংবাদ

প্রখ্যাত অভিনয়শিল্পী ছায়া দেবী শ্রীশংকর কলাচিত্র নামে একটি চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান খুলেছেন এবং গত সপ্তাহ থেকে তাঁর প্রথম ছবি 'মেজদিদি'র চিত্রগ্রহণ বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছেন। কাহিনীর রচয়িতা বিধায়ক ভট্টাচার্যই ছবিখানি পরিচালনা করবেন এবং বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করছেন ছায়া দেবী নিজে, কমল মিত্র, পরেশ ব্যানার্জী, বিপিন মুখার্জী প্রভৃতি।

* * * *

বহু পরিচালকের সঙ্গে দীর্ঘকাল সহকারীরূপে কাজ করার পর অমিয়নাথ মিত্র এবার নিজেই একখানি ছবি পরিচালনার ভার নিয়েছেন। ছবিখানি হচ্ছে বিজয় সিণ্ডিকেটের প্রথম অবদান 'স্বর্ণ শৃঙ্খল'—ছবিখানির তোলা হচ্ছে কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে।

* * * *

পশুপতি কুণ্ডুর পরিচালনায় ইষ্টার্ণ টকীজের 'বনফুলের সংসার' তোলা সমাপ্তপ্রায়; এদের পরবর্তী ছবি 'পরশপাথর'-এর চিত্রগ্রহণ সুকুমার সরকারের পরিচালনায় আরম্ভ হয়েছে।

* * *

মিত্রা প্রডিউসার্সের দ্বিতীয় অবদান 'মায়ের ডাক'-এর চিত্রগ্রহণ সুকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমাপ্তপ্রায়। ছবিখানিতে অভিনয় করেছেন অনুভা, উমা, ফণি রায়, কুমার, কানু, ডাঃ হরেন, মঙ্গল, অভী ভট্টাচার্য, প্রশান্ত প্রভৃতি। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন রামপদ সেন, শব্দগ্রহণ ক্ষমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরযোজনা নরেন্দ্র চৌধুরী এবং শিল্পনির্দেশ হরিপদ ভট্টাচার্য।

* * * *

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র চিত্রগ্রহণ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাচ্ছে; এর প্রধান কটি ভূমিকায় অভিনয় করছেন নীলিমা, অমিত, গৌতম, কালীপ্রসাদ, ভূপেন, রেবা দেবব্রত প্রভৃতি।

* * * *

সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আখ্যান 'দেবী চৌধুরাণী'র চিত্ররূপদান দ্রুতভাবেই অগ্রসর হচ্ছে।

* * * * *

ভারত আর্ট প্রডাকসন্সের প্রথম হিন্দি ছবির কাজ বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। পরিচালনা করছেন কমল বসাক। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন গৌর গোস্বামী ও সুজন পাল। প্রস্তুতির ভার নিয়েছেন কল্যাণ গুপ্ত। একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অজিত সেনকে দেখা যাইবে।

* * * * *

নীতিন বসু বম্বে টকীজের হয়ে যে ছবিখানি আরম্ভ করেছেন তার কাহিনী নেবেন বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস থেকে এবং প্রধান ভূমিকায় অবতরণ করবেন অশোককুমার। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীতে অবতীর্ণ অশোককুমার!

* * * * *

সেদিন কেন্দ্রীয় সভায় পণ্ডিত নেহরু বর্তমান সেন্সর বোর্ডগুলিকে নতুন করে গড়ে তোলবার আশ্বাস দিয়েছেন। নতুন ব্যবস্থায় কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজের সেন্সর বোর্ড তুলে দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড রাখার ব্যবস্থা তিনি করছেন।

* * * * *

পাকিস্তানে ভারতীয় ছবির ফুট পিছু দুআনা কর ধার্য করার ব্যবস্থা হচ্ছে, অর্থাৎ এখনকার এগারো হাজার ফিটের একখানি ছবি পাকিস্তানের কোথাও দেখাতে গেলে স্থানীয় প্রমোদ-কর ছাড়া ১৩৭৫, টাকা অতিরিক্ত কর দিতে হবে।

# দেশী সংবাদ

**৫ই এপ্রিল**—ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হরিলাল কানিয়া অদ্য আসাম হাইকোর্টের উদ্বোধন করিয়াছেন। গবর্নর স্যার আকবর হায়দরী আসামের প্রধান বিচারপতি মিঃ আর এফ লজকে শপথ গ্রহণ করান।

ফ্লাইট লেফটেনান্ট এস ডি গুপ্ত (ফণি) গত ২৩শে মার্চ জম্মু রণাঙ্গনে তাঁহার বিমান বহর পরিচালনার সময় নিহত হইয়াছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে বোম্বাই প্রদেশের গোধরা সহরে হাঙ্গামা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, হাঙ্গামার ফলে ১৬ জন হত এবং ২৫ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

**৬ই এপ্রিল**—ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে ভারত সরকারের শিল্প-নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে যে, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ উৎপাদন, আণবিক শক্তি উৎপাদন ও রেলপথ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে। কয়লা, লৌহ-ইস্পাত, বিমানপোত নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারের যন্ত্রপাতি নির্মাণ (রেডিও রিসিভিং সেট বাদ দিয়া) ও খনিজ তৈলের নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই থাকিবে। গবর্নমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠান এ সকল কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আগামী দশ বৎসর উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হইবে।

ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উত্থাপিত আণবিক শক্তির উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি বিল গৃহীত হয়।

পণ্ডিত নেহরু নয়াদিল্লীতে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের ফলে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, উহার আশু সমাধান প্রয়োজন।

**৭ই এপ্রিল**—হায়দরাবাদ অস্ত্র সংগ্রহ সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিনের সভাপতি মিঃ কাসিম রেজভি বলেন, "ইসলামিক কর্তৃত্ব সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত হায়দরাবাদের মুসলমানদের উন্মুক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করা চলিবে না।" তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, রাজাকরেরা সম্পূর্ণ সশস্ত্র, যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত।

বিহারে গান্ধী জাতীয় ভাণ্ডারে ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সমগ্র ভারতে ১৪০ কোটি টাকা সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

অদ্য ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে ভারত গবর্নমেণ্টের শিল্পনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্থান আশ্রয়প্রার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে আগমনের হিড়িকের ফলে যে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট প্রথম দফায় প্রায় ৮ কোটি টাকা ঋণ চাহিয়াছেন। ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ঐ অর্থ ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন।

পূর্ববঙ্গ সরকারের অর্থসচিব কর্তৃক রচিত ১৯৪৮ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব বিলটি অদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

**৮ই এপ্রিল**—ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিং অদ্য ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে অনতিবিলম্বে একটি স্বদেশরক্ষী সৈন্যবাহিনী গঠনের সংকল্প ঘোষণা করেন। প্রস্তাবিত স্বদেশরক্ষী বাহিনী প্রথমতঃ ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহা কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত হইবে। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশ ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত হইবে।

ভারত সরকার সূতা বণ্টনের উপর হইতে বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নোয়াখালি জেলায় মহাত্মা গান্ধীর পদব্রজে ঐতিহাসিক পল্লী পরিক্রমার যে প্রামাণ্য ফিল্ম গৃহীত হয়, গতকল্য রাত্রে নয়াদিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে তাহা তাঁহার বাস-ভবনে প্রদর্শন করা হইয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে উক্ত ফিল্ম গৃহীত হয়। উল্লিখিত পত্রিকাদ্বয়ের দুইজন ষ্টাফ ফটোগ্রাফার চিত্র গ্রহণ করেন।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন রণাঙ্গণে প্রায় ২০ হাজার হানাদার যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে।

**৯ই এপ্রিল**—ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ পার্লামেণ্টে বলেন যে, গত ৩১শে মার্চ তারিখে হায়দরাবাদে রাজাকরদের এক বিরাট সমাবেশে ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমিনের সভাপতি মিঃ কাসিম রেজভী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কেবল চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক নহে, পরন্তু উহা দ্বারা সরাসরিভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও নরহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একদিকে যেমন আশ্রয়প্রার্থীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন, অপরদিকে তেমনই ভারত গবর্ণমেণ্ট ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এমন কিছু করা উচিত হইবে না, যাহাতে জনসাধারণ চলিয়া আসিতে উৎসাহ পায়।

প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও উত্তরাংশ দুইটিকে গঙ্গায় এক সেতু ও একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া রেলপথ ও রাজপথ দিয়া সংযুক্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, পূর্ববঙ্গে ইংরেজীর স্থলে বাঙ্গলাকে সরকারী ভাষা করিতে হইবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার বাহন হিসাবে যতদূর সম্ভব বাঙ্গলা ভাষাকে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ছাত্রদের মাতৃভাষাকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

# বিদেশী সংবাদ

**৫ই এপ্রিল**—বার্লিনগামী বৃটিশ এয়ারওয়েজ কোরের যাত্রীবাহী বিমানের ভি কিং-এর সহিত বার্লিনের ৫ মাইল উত্তরে রুশ-অধিকৃত এলাকায় আকাশে একখানি রাশিয়ান জঙ্গী বিমানের সংঘর্ষের ফলে বৃটিশ বিমানপোতখানির ১৪ জন এবং রুশ জঙ্গী বিমানখানির আরোহিগণও নিহত হইয়াছে।

সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ আজ বার্লিনের বিমান দুর্ঘটনার জন্য সরকারীভাবে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, বার্লিন আগমনকালে আর কোন বৃটিশ বিমানকে বাধা দেওয়া হইবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অদ্য রিকনষ্ট্রাকশন ফাইন্যান্স কর্পোরেশনকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, ইউরোপীয় পুনর্গঠনের কার্যে অবিলম্বে যেন একশত কোটি ডলার দেওয়া হয়। গ্রীস, তুরস্ক, চীন ও ট্রিয়েস্টে সাহায্যদানের জন্য সাড়ে দশ কোটি ডলার মঞ্জুর করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষার জন্য ওয়াশিংটনে একটি উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে এক প্রস্তাব পেশ করা হইলে পর ঐ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য পরিষদ কর্তৃক তিনজন সদস্য লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে।

**৬ই এপ্রিল**—নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিনিধিদের এক বেসরকারী বৈঠকে আমেরিকা প্যালেস্টাইনের উপর সাময়িক অছিগিরি সম্পর্কে এক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, সমগ্র প্যালেস্টাইনে অছিগিরি প্যালেস্টাইনের শাসন কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

**৮ই এপ্রিল**—প্যালেস্টাইনে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য আরব ও ইহুদী প্রতিনিধিগণ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির সহিত কথাবার্তা চালাইতে রাজী হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্ম সৈন্য ও পুলিশ দল সমবেতভাবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্ম বিমান বাহিনী সৈন্য ও পুলিশদলকে সাহায্য করিতেছে।



শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
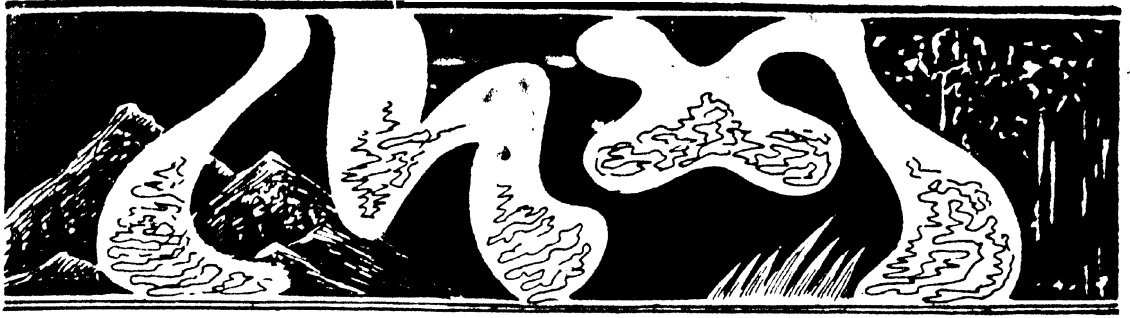
সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন                সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ ]    শনিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৩৫৫ সাল।    Saturday, 24th April, 1948.    [ ২৫শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

### ভারত-পাকিস্থান বৈঠক

কলিকাতায় ভারত-পাকিস্থান বৈঠকের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পাঁচদিন অধিবেশনের পর উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক আলোচনার প্রতিবেশে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, এ বৈঠকের ইহাই বিশেষত্ব। কারণ এ পর্যন্ত উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যত বৈঠক হইয়াছে, প্রায় সবগুলিতেই বাহিরের সালিশের উপর শেষটা নির্ভর করিতে হইয়াছে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোটামুটি সন্তোষজনক হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শুল্ক-প্রাচীর এবং সেজন্য যাত্রীদের গতিবিধির সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ব্যবস্থা এখনও করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অথচ একমাত্র শুল্ক-প্রাচীর রহিত করিলেই এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক মীমাংসা হয়। আমরা সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছি। বৈঠকের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যাই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। কারণ পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ই সমস্যার মধ্যে পতিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বহুবিধ কারণে নিরাপত্তা, জীবিকা ও মর্যাদার অভাব বোধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বা আসামে চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বা আসামের মুসলমান সম্প্রদায়ের সেই ভাবে বাস্তুত্যাগ করিয়া পাকিস্থানে যাইবার কোন প্রয়োজন ঘটে নাই। বরং পূর্ববঙ্গ হইতে বহুসংখ্যক মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে নিত্য আসিতেছেন এবং আসিয়া জীবিকা অবলম্বন করিয়া বসবাস করিতেছেন। এই একটি বিষয় বিবেচনা করিলেই বোঝা যাইবে, পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষভাবে একটি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যাহা ঘটে নাই। ইহা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজকে দেশের মাটিতে থাকিবার জন্য ভারতীয় সমাজ এবং ভারত গভর্নমেণ্ট অনুরোধ করিতেছেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি যদি সমধিক উদার না হয়, তবে বৈঠকে সাম্প্রতিক কতকগুলি সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনার ফলেই যে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সব সমস্যার স্থায়ীভাবে মীমাংসা হইয়া যাইবে ইহা আমাদের মনে হয় না। ফলতঃ পূর্ববঙ্গ সরকার যদি তত্রত্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালনে মৌলিক অধিকারের পথ নিষ্ঠাসম্মতভাবে উন্মুক্ত করিতে পারেন, অর্থাৎ পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের নীতির কুটচক্র হইতে যদি নিজেদের প্রাদেশিক নীতিকে তাঁহারা কতকটা মুক্ত করিতে সমর্থ হন, তবেই পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বর্তমান সমস্যার মীমাংসা হইবার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পূর্ব পাঞ্জাবের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সমস্যাকে এক করিয়া দেখিলে ভুল হইবে। বাঙলার সংস্কৃতির মূলীভূত বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধকে ভিত্তি করিলাই উভয় বঙ্গের ভিতরকার সমস্যাসমূহ সমাধানের চেষ্টা করিলে সেগুলি ক্রমেই সহজ হইয়া আসিবে। কারণ রাষ্ট্র হিসাবে বাঙলা দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও উভয় বঙ্গের সামাজিক এবং আর্থিক সম্পর্ক এখনও অনেকটা অবিচ্ছেদ্যই রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আজ নিজেদের অধিকার নিজেদেরই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ নিজেদেরই প্রতিকারসাধনে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। আমরা আশা করি, বৈঠকের সিদ্ধান্তকে তাঁহারা এই পথে সুসংগত রূপ দান করিবার জন্য আন্তরিকতার সহিত এবং সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইবেন।

### লীগের সংগঠন-কার্য

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠাই লীগের লক্ষ্য ছিল। বর্তমানে সে লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার নীতিতে জড়াইয়া লীগের নেতারা স্বার্থ-সুবিধার যে সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহা পরিত্যাগ করা সহজ হইতেছে না। মুসলিম লীগ সংগঠনে ঢাকায় আসিয়া চৌধুরী খালিকুজ্জমান পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পরও লীগকে বজায় রাখিবার পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু লীগ-নীতির মোহ ইহার মধ্যেই মুসলমান সমাজের পক্ষে কাটিয়া গিয়াছে। ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগ ইতিমধ্যেই এলাইয়া পড়িয়াছে এবং ভারতের মুসলমান সমাজ লীগের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রতি বিশেষভাবেই বিরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। পাকিস্থানের মুসলমানদের মধ্যেও এ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ফলে চৌধুরী সাহেব পূর্ববঙ্গে সফরে আসিয়া যে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, ইহা বেশ বোঝা যায়। লীগ-সমর্থক সহযোগীদের এ সম্বন্ধে নিরুৎসাহই সে পক্ষে বড় প্রমাণ। চৌধুরী

খালিকুজ্জমান সাহেবের প্রচারকার্যের সমালোচনা করিয়া সহযোগী 'ইত্তেহাদ' গত ২রা বৈশাখ মন্তব্য করিয়াছেন, 'কায়েদে আজম হইতে শুরু করিয়া পূর্ব-পাকিস্থানের লীগের সংগঠক মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব পর্যন্ত সবাই ইসলামী সমাজবাদের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। পাকিস্থানের শাসন-ক্ষমতা এখন মুসলিম লীগের হাতে। লীগ ইচ্ছা করিলেই উপরোক্ত সর্বসম্মত আদর্শটি প্রস্তাবাকারে গণ-পরিষদে পেশ করিতে পারে, এর জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার করিয়া সময় নষ্ট করার প্রয়োজন কি?' সহযোগী সহজ সত্যটি ধরিতে ভুল করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের আদর্শের জন্য লীগ নেতাদের কোন দিনের জনাই গরজ দেখা যায় নাই এবং এখনও তাঁহারা গণতন্ত্রবিরোধী মনোভাব লইয়াই চলিয়াছেন। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মুখরোচক কথাটি জুড়িয়া দিয়া কার্যত তাঁহারা ইসলামের নামে সাম্প্রদায়িক সংস্কারের প্রতিবেশ দৃঢ় করিয়া তোলাই নিজেদের পক্ষে পরম প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের এই সংকীর্ণ মনোভাবের ফলে পাকিস্থানের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বাস্তব সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে এবং লীগের সম্বন্ধে জনসাধারণের মতিগতি উত্তরোত্তর বিরূপ হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব-পাঞ্জাব হইতে যেসব মুসলমান লীগ-নীতির গণতান্ত্রিকতার সুখ আস্বাদ করিবার মোহে সিন্ধু দেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা দলে দলে ভারতীয় রাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিতেছেন; পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে মুসলমানদের পক্ষে বেহেস্তের সুখ করতলগত হইয়াছে, এই আশা করিয়া যেসব সরকারী কর্মচারী ভারত হইতে পাকিস্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় ভারত সরকারের কাজে ভর্তি হইতেছেন। এসব সত্য তো চাপা দিবার উপায় নাই। লীগের এই প্রগতিবিরোধী নীতির প্রতিক্রিয়া পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমাজ-জীবনকেও নাড়া দিয়াছে। নানাভাবেই আমরা সে পরিচয় পাইতেছি। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তরফ হইতে লীগ-নেতাদের কাছে আমরা শুধু এই কথাটাই নিবেদন করিতে চাই যে, তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি এতদিন যে করুণার ধারা বৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতেই তাহারা কৃতার্থ হইয়াছে, এখন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের খেদমত হইতে তাঁহারা বিশ্রাম গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নিজেদের পথ নিজেরাই দেখিয়া লইবে। তাহারা লীগওয়ালাদের করুণার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে না।

**বস্ত্র-সমস্যার সংকট**

ভারত গভর্নমেণ্ট বাহির হইতে পশ্চিমবঙ্গে সুতী বস্ত্র আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে অবাধে কাপড়ের চোরা কারবার চলিতেছে এবং দল বাঁধিয়া লাভখোরেরা পূর্ববঙ্গে কাপড় চালান দিতেছে; ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের মূলে এই সব কারণ আছে বলিয়া জানা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ সম্বন্ধে সত্যই যে ত্রুটি রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন কলিকাতার একটি সম্বর্ধনা সভায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। সেন মহাশয়ের মত এই যে, কাপড়ের চোরাবাজার ও অতিরিক্ত মুনাফার ব্যবসা বন্ধ করা পুলিশ এবং গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। মন্ত্রী মহাশয়ের যুক্তিতে একমাত্র প্রবল জনমত সৃষ্টি করিয়াই কাপড়ের চোরাবাজার এবং অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণ বন্ধ করা যাইতে পারে। এইভাবে মুনাফাখোর মত জনসাধারণের ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়াতে সুবিধা অবশ্য অনেক আছে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অ-সামরিক বিভাগের সচিব মহোদয়ের এই অভিমত শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনে শাসকদের যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। প্রকৃতপক্ষে কাপড়ের চোরাবাজার দমন এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গে কাপড়ের চোরাই রপ্তানি—এই দুইটি অন্যায় কাজ বন্ধ না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের অক্ষমতাই সূচিত হইয়াছে। কাপড়ের বাজারে মুনাফা গ্রহণ করিবার পক্ষে পুলিশের হাতে আপাতত পর্যাপ্ত অধিকার নাই, পুলিশ কমিশনার সম্প্রতি এই যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু কাপড়ের চোরাই রপ্তানি বন্ধ করিবার ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্ট বা পুলিশের হাতে আইন অনুসারে যে অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্পষ্টই বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ক্ষমতানুযায়ী প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই; যদি তাহাই হইত, তবে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ কাপড় পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করিতে পারিত না। গভর্নমেণ্টের এই অব্যবস্থাকে জনসাধারণের প্রতি উপদেশের দ্বারা যেমন ঢাকা যাইবে না, সেইরূপ শুধু মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে লাভখোরদিগকে লক্ষ করিয়া হুমকি দিলেই তাহারা সাধু হইবে না। সরকার যদি দুর্নীতি দমন করিবার জন্য তাঁহাদের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের ঐ ধরণের উপদেশ এবং বিবৃতি শেষটা অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িবে। বস্ত্রসংকট দেশে নিদারুণ আকার ধারণ করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট যদি ইহার প্রতিকারে প্রত্যক্ষভাবে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন, তবে অতঃপর বাঙলা দেশের দুর্দশার অন্ত থাকিবে না এবং মন্ত্রিমণ্ডলও জনসাধারণকে সস্তায় সদুপদেশ দিয়াই নিষ্কৃতি পাইবেন না। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-পরিচালিত গভর্নমেণ্টের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক মমত্ব এবং মর্যাদা-বুদ্ধি লইয়াই এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে হইল।

**জরুরী প্রশ্ন**

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধী স্মৃতিভাণ্ডার সম্পর্কিত কার্য উপলক্ষে কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। নববঙ্গ সমিতির পক্ষ হইতে এই সময় তাঁহার নিকট একটি জরুরী বিষয় উত্থাপিত করা হয়। সমিতির প্রতিনিধি দল বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার বহু বিলম্বিত প্রশ্নটি রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থিত করেন এবং এই প্রশ্নটির যাহাতে সত্বর সমাধান করা হয়, সেজন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রপতির মতে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের প্রধান মন্ত্রী ইঁহারা উভয়ে সম্মিলিত হইয়া আপোষ-আলোচনার পথে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিলেই সবচেয়ে ভাল হয়। যদি সে পথে মীমাংসা সম্ভব না হয়, তবে প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের নিকট উত্থাপন করা চলিবে। আমরা জানি, মহাত্মা গান্ধী প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে আপোষ-আলোচনার পথে এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বেও প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি এ প্রস্তাব করেন। নিখিল ভারত [illegible] প্রতি আমরা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বারবার আকৃষ্ট করিয়াছি; সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও ওয়ার্কিং কমিটির দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও এখনও ক্রমাগত বাঙলার এই দাবীর সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা বিলম্বিত করা হইয়াছে; অথচ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে এই প্রশ্নের মীমাংসা তাহার জীবন মরণের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে বলা যায়। ভারত বিভাগের নীতির পাকচক্রে পশ্চিমবঙ্গ এখন ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষুদ্রতম প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে ক্রমাগত আশ্রয়প্রার্থীদের আগমনে এই ক্ষুদ্রতম প্রদেশে জীবন-সমস্যা আজ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। জমির প্রশ্ন এখানে সবচেয়ে বড়। বিহারের বিরল বসতি বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল যদি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে পুনর্বসতির জটিল প্রশ্নের অনেকটা সমাধান হইতে পারে। বলা বাহুল্য, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার দৃষ্টি লইয়া বাঙালী দাবী কোন দিনই করে নাই এবং এখনও

দিক হইতে তাহারা এ দাবী করিতেছে না। দুঃখের বিষয় এই যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের এই প্রশ্নটি কয়টি প্রদেশে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে। বিহারের দায়িত্বসম্পন্ন জননায়ক এবং শাসন বিভাগের পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও এই মনোভাব সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। আসাম এবং উড়িষ্যাতেও বাঙালীদের সম্পর্কে প্রাদেশিকতার মনোভাব অনর্থকর প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতেছে। জাতির পক্ষে এ অবস্থা অত্যন্তই সংকটজনক। পণ্ডিত জওহরলাল এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বিস্মৃত হন নাই। গত ২৮শে মার্চ ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে পণ্ডিতজী বলেন, সাম্প্রদায়িকতার ন্যায় প্রাদেশিকতাও আমাদের পক্ষে আতঙ্কের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এক প্রদেশের লোকেরা অন্য প্রদেশের নরনারীকে বিদ্বেষ এবং সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখিতেছে। যদি অল্পদিনের মধ্যে আমরা এই পাপকে উৎখাত করিতে না পারি, তবে ভারতের ঐক্য শূন্যগর্ভ প্রলাপে পর্যবসিত হইবে এবং ভারতভূমি পরস্পর বিবদমান বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে প্রাদেশিকতার এই সংকটকে উপেক্ষা করিবার সময় আর নাই। কংগ্রেস-পরিকল্পিত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি যদি কার্যে পরিণত করা হয়, তবে বহুদিনের বিতর্কিত এই প্রশ্নের চিরন্তনভাবে সমাধান হইতে পারে। আমরা এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের গভর্নমেণ্টকে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

**রাম রাজ্য ও শরিয়তের শাসন**

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত একজন ত্যাগী পুরুষ। তাঁহার জীবন সেবাধর্মে নিষ্ঠিত এবং গান্ধীজীর আদর্শে তাঁহার কর্মসাধনা অনুপ্রাণিত। সম্প্রতি তিনি পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশ ত্যাগ হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়া কয়েকটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের মতের বিশেষ কোন বিরোধ নাই; তবে এই সম্পর্কে ধর্মকে না জড়াইলেই তিনি ভাল করিতেন বলিয়া আমরা মনে করি। অবশ্য ধর্ম বলিতে সর্বপ্রকার সম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত উদার অধ্যাত্মতত্ত্বই তিনি বুঝিয়াছেন; কিন্তু দশজনের বিচারে ধর্মের কথা উঠিলেই সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংস্কারই অনেকখানি জড়াইয়া আসে। রাম রাজ্য বলিলে ঈশ্বরের প্রভুত্ব সকলে বোঝে না, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের অধিকার-বৈষম্যের বিচারও সেখানে দেখা দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাহা কতকটা ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যেই কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ের রাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সেইরূপ শরিয়তের শাসন বলিতেও মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের মনে সাম্প্রদায়িক সংস্কার প্রভাবিত বিশিষ্ট আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াবহুল কতকগুলি শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দেয় এবং অপর সম্প্রদায়ের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির অবকাশ ঘটে। ইহার ফলে রাষ্ট্রের সর্বজনীন আদর্শ সংকুচিত হইয়া পড়ে। দেখা গিয়াছে, গণতান্ত্রিক শাসনের ক্ষেত্রে এই ধরণের ধর্ম-সংস্কারগত আবেগ লইয়া বাড়াবাড়ি করিলে কার্যত নানারূপ অনর্থেরই সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা রাম রাজ্যও চাহি না, ইসলামিক রাষ্ট্রও আমাদের কাম্য নয়। আমরা জনসাধারণের রাষ্ট্র চাই এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বশ্রেণীর জনগণের সমান অধিকার কামনা করি। ধর্ম-সংস্কারের মারপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়া পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়কগণ যদি এই সহজ সত্যটি স্বীকার করিয়া লন এবং রাষ্ট্রের সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করেন, তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ নিরোধ হইতে পারে।

**হায়দরাবাদের ভবিষ্যৎ**

নিজামের প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলীর সঙ্গে ভারত সরকারের শেষ আলোচনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ভারত সরকার এবার নাকি তাঁহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনাইয়া দিয়াছেন। এখন নিজামকে এক পথ ধরিতে হইবে। আমাদের পক্ষে আলোচনার এবংবিধ ব্যর্থতা একটু অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে হায়দরাবাদের শাসননীতিতে নিজামের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির স্থান এখন আর কিছুই নাই। তিনি গুণ্ডার দলের কবলে পড়িয়াছেন। ইত্তেহাদী গুণ্ডারা নিজামকে ক্রীড়নকের মত চালিত করিতেছে। এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষান্ধ বর্বরদের সঙ্গে কোন সভ্য গভর্নমেণ্টেরই আপোষ নিষ্পত্তিতে পৌঁছান সম্ভব হইতে পারে না। বস্তুত ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনাকে নানাভাবে বিলম্বিত করিয়া ইত্তেহাদী গুণ্ডার দল নিজেদের দৌরাত্ম্যের শক্তি দৃঢ় করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছে। বলা বাহুল্য, এ অবস্থাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আমাদের কথা এই যে, রেজভীর গুণ্ডার দলকে সংযত করিবার শক্তি যদি নিজামের না থাকে, তবে নিজামকেই হায়দরাবাদ হইতে সরিতে হইবে। প্রগতি-বিরোধী সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ গুণ্ডাদের ক্ষমতার দৌড় পরে দেখা যাইবে। সুখের বিষয় এই যে, মুসলমান সমাজ সমগ্রভাবে হায়দরাবাদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। গুণ্ডার দল উৎখাত হয়, ইহাই তাঁহারা চাহেন। আলীগড়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ হাবিবের উক্তি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাবিব সাহেব বলিয়াছেন, 'হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হউক যে, তথাকার রাজাকারদের আক্রমণ হইতে জনসাধারণকে রক্ষার জন্য যে পরিমাণ বলপ্রয়োগ আবশ্যক, তাহা করা হইবে।' বোম্বাইয়ের মুসলমান সমাজের নেতা মিঃ আলী বাহাদুর খাঁ লিখিয়াছেন—'আজ ইত্তেহাদীরা যে তরবারি আস্ফালন করিতেছে, কাল তাহা স্টেট কংগ্রেসের হাতে যাইবে। শুধু অর্থনৈতিক চাপের দ্বারাই নিজামের স্বেচ্ছাচার চূর্ণ করা যায়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যদি হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন, তবে ইত্তেহাদী দলের পাত্তা পাওয়া যাইবে না। নিজামকে হায়দরাবাদ হইতে পলাইয়া দূর দেশের হোটেলে আশ্রয় লইতে হইবে। ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

**ভারতে সামরিক শিক্ষা**

ভারতীয় জনসাধারণের সামরিক শিক্ষার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট একরূপ কার্যকরী উদ্যোগ অবলম্বন করিয়াছেন। বেসামরিক জনসাধারণের সামরিক শিক্ষার জন্য তাঁহাদের পরিকল্পনা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় ক্যাডেট কোর এবং আঞ্চলিক সেনাদল এই দুইটি ভাগে সে শিক্ষা-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। গত ৮ই এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেণ্টে জাতীয় ক্যাডেট কোর গঠনের পরিকল্পনাটি পাশ হইয়া গিয়াছে। ছাত্র সমাজের মধ্যে সামরিক শিক্ষার যোগ্যতা সৃষ্টি করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই কোরে শিক্ষা লাভ করিয়া তরুণেরা স্থায়ী বাহিনীতে যোগদান করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। জাতীয় ক্যাডেট কোর শুধু ছাত্র সমাজের জন্য; কিন্তু আঞ্চলিক কোর দেশের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রের যোগদানের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। পশ্চিম বাংলার জন্য ২০ হাজার জুনিয়র ক্যাডেট বরাদ্দ করা হইয়াছে। ছাত্র সমাজের সামরিক শিক্ষার এই পরিকল্পনা বিশেষ ব্যাপক নয়, ইহা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। বাস্তবিক পক্ষে আমরা দেশের প্রত্যেকটি যুবককে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত দেখিতে চাই। আমরা আশা করি, ক্রমে এই ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক করা হইবে। আপাততঃ বাঙলার ছাত্র ও যুবকদিগকে আমরা উৎসাহের সঙ্গে সামরিক শিক্ষার এই সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা বাঙলার ক্ষাত্র শক্তিকে সুগঠিত এবং সংহত করিয়া তুলুন। রাষ্ট্রের শত্রুদের অন্তরে সে শক্তি শঙ্কা সৃষ্টি করুক, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

## কলম্বিয়ায় বিদ্রোহ

গত সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য খবর হল দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া নামক ক্ষুদ্র রিপাব্লিকে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ-বহ্নি আপাতত স্তিমিত হলেও একেবারে নিভে গেছে বলা চলে না। এই বিদ্রোহ বিশ্ববাসীদের আরও চমকিত করেছে এই জন্যে যে, বিদ্রোহটির প্রধান উৎসস্থল হল কলম্বিয়ার রজধানী বগোটা শহর এবং এই বগোটাতেই বর্তমানে প্যান-আমেরিকান সম্মেলনের বৈঠক চলছে। আমেরিকায় অবশ্য এমন অনেক ক্ষুদ্র রিপাব্লিক আছে, যেখানে স্থায়ী গভর্নমেন্ট বলে কিছু নেই—বিদ্রোহ এবং বিপ্লব সেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। সুখের বিষয় কলম্বিয়া সে দলে পড়ে না। রাষ্ট্র হিসাবে কলম্বিয়ার কিছুটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে এবং বহু প্রতিষ্ঠাবান রাষ্ট্রনেতাও এ পর্যন্ত কলম্বিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই কলম্বিয়ার এ আকস্মিক বিপ্লব বিশ্ববাসীদের অনেকটা চমকিত করে দিয়েছে। তা ছাড়া প্যান-আমেরিকান সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন চলার সময় এ বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় অনেকে এর পিছনে গভীর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁদের ধারণা যে সফল্যপূর্ণ প্যান-আমেরিকান সম্মেলনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ না পায়, সেই উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন পণ্ড করার জন্যে কম্যুনিস্টরাই এ বিদ্রোহ ঘটিয়েছে।

কিভাবে এবং কেন এই বিদ্রোহ ঘটেছে, তা এখনও অনেকটা রহস্যাচ্ছন্ন। সংবাদ পরিবেশন সম্বন্ধে কলম্বিয়া গভর্নমেন্ট যে কড়া সেন্সর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন, তার দরুণ বাইরের জগতে খুব বেশী সঠিক সংবাদ আসছে না। এই ধরণের একটা বিদ্রোহের জন্যে যে আয়োজন চলছিল, তারও কোন আভাস পাওয়া গেছে বলে শোনা যায় নি। বিদ্রোহের প্রধান কারণরূপে দেখা যায়, লিবারেল দলের নেতা ডাঃ গাইটনের আকস্মিক হত্যাকাণ্ড। এই হত্যার থেকেই লিবারেল দলের সমর্থকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয় এবং তারা নির্বিবাদে লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি চালাতে থাকে। তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় সুযোগসন্ধানী কম্যুনিস্টরা। গত ৯ই এপ্রিল শুক্রবার এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়। কম্যুনিস্ট-নেতা সিনর ভায়োরিরা গোপন রেডিও থেকে ঘোষণা করেন যে, কম্যুনিস্টরা রক্ষণশীল কলম্বিয়া গভর্নমেন্টকে গদিচ্যুত করতে সর্বতোভাবে লিবারেল পার্টির সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, কম্যুনিস্টরা যে এ বিদ্রোহে প্রধান সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। কলম্বিয়া গভর্নমেন্ট অবশ্য একাধিক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্রোহের প্রধান দায়িত্ব নিক্ষেপ করেছেন কম্যুনিস্টদের ঘাড়ে। অবশ্য কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন সঠিক প্রমাণ উপস্থাপিত করা সম্ভব হয় নি। তবু বিদ্রোহের পিছনে তাদের যে একটা বড় হাত আছে, বৈপ্লবিক ঘটনাবলী দেখে তা অস্বীকার করা চলে না। কম্যুনিস্টরা যদি এর পিছনে না থাকে, তবে লিবারেল নেতা ডাঃ গাইটানকে হত্যা করল কে? নিশ্চয়ই তাঁর দলভুক্ত সদস্যরা নন কিংবা রক্ষণশীল গভর্নমেন্ট যে এ কাজ করিয়েছেন, তা-ও বিশ্বাস হয় না। অথচ কম্যুনিস্টদের পক্ষে এই জাতীয় একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দেশে বিপ্লব বাধিয়ে দেওয়া আদৌ বিস্ময়কর নয়। দেশে এই ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখল করাই সকল দেশের কম্যুনিস্ট রীতি। এর থেকেই স্পষ্ট মনে হয় যে, এর পিছনে কম্যুনিস্ট কারসাজি যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। বগোটা সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতা রাষ্ট্রসচিব মিঃ মার্শাল বিপ্লবের সময় নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি দিয়েছেন, তার মধ্যে আছে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ। শুধু তাই নয়—তিনি এর পিছনে দেখেছেন আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের হস্তক্ষেপ।

তবে যে উদ্দেশ্যেই কম্যুনিস্টরা বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালিয়ে থাকুক, তাদের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয় নি—একথা নিঃসংকোচে বলা চলে। এই বিপ্লবের দরুণ কিছু নরনারী প্রাণ হারিয়েছে—কলম্বিয়ার জাতীয় ক্ষতিও হয়েছে প্রায় এক কোটি ডলার তবু কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করতে পারে নি। প্রথম অবস্থায় মনে হয়েছিল যে, কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ প্যারেজকে হয়তো পদত্যাগই করতে হবে। এজন্যে তাঁর উপর চাপও কম পড়েনি। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান রাষ্ট্রনেতার মতন অল্প সময়ের মধ্যেই বিপ্লবী দলে ভাঙন ধরিয়ে দিতে পেরেছেন। তিনি লিবারেল পার্টির সহযোগিতায় তাঁর রক্ষণশীল গভর্নমেন্টকে কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে পরিণত করেছেন। মন্ত্রিসভায় লিবারেল দলকে রক্ষণশীল দলের সমসংখ্যক আসন দেওয়া হয়েছে। ফলে লিবারেল দল শুধু বিপ্লব থেকে সরেই পড়ে নি—বরং বিদ্রোহ দমনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি একা পড়ে গেছে এবং তাদের বিপ্লব প্রয়াস সফল হতে পারে নি। সাময়িকভাবে স্থগিত থাকলেও পুনরায় বগোটা সম্মেলনের কার্যারম্ভ হয়েছে। তবে কলম্বিয়ার কোন কোন পল্লীঅঞ্চলে হয়তো এখন পর্যন্ত বিপ্লব প্রয়াস চলেছে। ১৪ই এপ্রিল কলম্বিয়া থেকে যে খবর এসেছে, তাতে দেখা যায় যে, বগোটা থেকে ১৫০ মাইল দূরবর্তী মেডেলিন শহরের নিরাপত্তা কম্যুনিস্টদের হাতে বিপন্ন। অপর দিকে কলম্বিয়ার এই ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণ আমেরিকার অন্য একটি ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র কোস্টারিকাতেও বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। কোস্টারিকাতে বামপন্থী গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সেনর জোসে সিগারেসের অধীন চরম দক্ষিণপন্থীরা। এখানে কম্যুনিস্টরা আবার বিদ্রোহ দমনে গভর্নমেন্টের সহযোগিতা করছে। ১৪ই এপ্রিলের সংবাদে দেখা যায় যে, বিদ্রোহীরা রাজধানী সান জোসের বার মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। উপায়ান্তর না দেখে কোস্টারিকা গভর্নমেন্টের পররাষ্ট্রসচিব সেনর আলভারো বেনিয়া রাজধানী রক্ষার জন্যে বৈদেশিক কূটনীতিবিদদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট পিকাডোও অনুরূপ আবেদন জানিয়েছেন। তার ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উভয়পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রসচিব মিঃ লভেটের মতে যুদ্ধবিরতি কার্যকরও হয়েছে।

এই দুটি বিদ্রোহের ফলে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিপাব্লিকগুলির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা পুনরায় বিশ্বের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্যান-আমেরিকান সম্মেলনে এদের কেউ কেউ দাবী জানিয়েছে যে, আমেরিকা থেকে সর্বপ্রকার বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে হবে। দুই আমেরিকায় অবস্থিত এইসব দেশের দাবীর বহর দেখে যদি ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, পর্তুগাল প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি হাসে, তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এর আর একটি প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া এই হবে যে যত শীঘ্র সম্ভব প্যান আমেরিকান সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে আত্মরক্ষার ব্যাপারে আমেরিকা অন্যান্য দেশের সামরিক সাহায্য প্রদান সম্পর্কে আর্জেন্টিনা আপত্তি তুলেছিল। কলম্বিয়া কোস্টারিকা বিদ্রোহের তিক্ত অভিজ্ঞতার প আর্জেন্টিনা আর অনুরূপ আপত্তি করবে না বলেই মনে হয়।

**প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ বিরতি**—প্যালেস্টাই বিভাগ পরিকল্পনা স্থগিত রেখে প্যালেস্টাইনকে আপাতত অছির শাসনাধীনে রাখার প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছে, র বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বস্তি পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং এ সম্ব ইতিকর্তব্য পুনর্নির্ধারণের জন্যে সম্মিলি রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি জরুরী সাধারণ অধিবেশ আহূত হয়েছে। গত ১৬ই এপ্রিল থেকে এ সাধারণ অধিবেশনের কার্যারম্ভ হয়েছে

ইত্যবসরে স্বস্তি পরিষদের পক্ষ থেকে প্যালেস্টাইনে শান্তি স্থাপনের জন্যে আরব ও ইহুদী—উভয়পক্ষের কাছেই আবেদন জানানো হয়েছে। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এ আবেদন জানিয়েছেন এবং প্যালেস্টাইনের বৃটিশ হাই-কমিশনার স্যার অ্যালান কানিংহামও অনুরূপ আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে কাজ বিশেষ কিছুই হচ্ছে না। বরং উভয়পক্ষের বিবাদের বহরটাই যেন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। তার একাধিক কারণও অবশ্য আছে। উভয়েরই ধারণা যে বিবাদ বন্ধ করে শান্তি স্থাপিত হলে তাদের রাজনৈতিক দাবীর জোরও কমে যাবে। আরবেরা চায় প্যালেস্টাইনে অখণ্ড আরব রাষ্ট্র গঠন করতে এবং ইহুদীরা চায় প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করে ইহুদীপ্রধান অঞ্চলে ইহুদী রাষ্ট্র সংগঠন করতে। এই পারস্পরিক বিরোধী দাবীর মধ্যে আপোষের কোন নতুন সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এদের বিবাদ বন্ধ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। সেই সঙ্গে আছে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বৃটিশদের অসামর্থ্য। ফলে উভয়পক্ষের লড়াই পূর্ণোদ্যমে চলেছে এবং ইতিমধ্যে কয়েকটি ভয়ানক হত্যাকাণ্ডও অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্যালেস্টাইনের পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলি থেকে সশস্ত্র আরবেরা যেমন জেহাদের জন্য প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করছে, তেমনই বাইরে থেকে ইহুদীরাও আসছে প্যালেস্টাইনে। এই অনাহূত অনুপ্রবেশ বন্ধ করার মত শক্তিও বৃটিশদের নেই এবং চেষ্টাও তারা করছে না। আগামী ১৫ই মে তারিখে তারা প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট ত্যাগ করছে তারই আয়োজন নিয়ে তারা ব্যস্ত। বৃটিশ নাগরিকদের অপসারিত করা হচ্ছে, প্যালেস্টাইনের শাসনভার ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ১৫ই মের পরে যে সব বৃটিশ সৈন্য থাকবে, তারা শান্তিরক্ষার কোন দায়িত্বই নেবে না। ১লা আগস্টের মধ্যে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য অপসারিত করার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তদনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন বৃটিশ সৈন্যরা ততটুকু শক্তি প্রয়োগই শুধু করবে। এ হল বৃটিশ পক্ষের যুক্তি। কিন্তু সকলেরই ধারণা যে প্যালেস্টাইন বিভাগ পরিকল্পনা বৃটিশদের মনঃপূত হয় নি বলে তারা প্রথম থেকেই প্যালেস্টাইনে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। তারা দিন থেকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে আজ এই ক্ষুদ্র দেশটিতে এরূপ নৈরাশ্যের সৃষ্টি হত না। এ যুক্তি যে একেবারে অমূলক নয় তার প্রমাণ মিলেছে সম্প্রতি প্যালেস্টাইন কমিশনের রিপোর্টে। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে, বৃটিশদের অসহযোগিতামূলক নীতির জন্যেই কমিশন সফল হতে পারেন নি।

যাই হোক, অদূর ভবিষ্যতে প্যালেস্টাইনে আরব বনাম ইহুদি সংগ্রামের বিরতি হবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা নয়। অবশ্য শান্তির জন্যে উভয় পক্ষের মধ্যেই আগ্রহের অভাব নেই। কিন্তু উভয়েই শান্তি চায় নিজেদের বিশেষ সর্তে। তাই মনে হয় যে, বৃটিশদের ম্যাণ্ডেট ত্যাগের পর প্যালেস্টাইনে আরও গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি হবে। উভয় পক্ষের রণসজ্জা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে এবং ইহুদী অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণের জন্যে একটি স্বতন্ত্র ইহুদী গভর্ণমেণ্ট গঠনের পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে ইহুদী সঙ্ঘ প্রচার করেছেন। আরব উচ্চতর কমিটিও তাঁদের যুদ্ধ পরিকল্পনার গতি অব্যাহত রেখেছেন। ১৫ই মের পরে প্যালেস্টাইনে বিবদমান এই দুই পক্ষের মধ্যে কি ভাবে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে তাই হল বড় সমস্যা। শুধু আরব বা ইহুদী বাহিনী সংগঠন করলেই একাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে না। এর জন্যে এই দুইটি স্থানীয় বাহিনী ছাড়াও একটা নিরপেক্ষ বাহিনীর অস্তিত্ব প্রয়োজন। প্যালেস্টাইন কমিশনের মতে এই নিরপেক্ষ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা অন্তত এক হাজার হওয়া উচিত। ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনের দুইশত ইংরেজ এইরূপ একটি বাহিনীতে কাজ করতে সম্মত হয়েছে বলে প্রকাশ। কিন্তু আরব ও ইহুদীরা যদি পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, তবে শান্তিরক্ষা সহজ ব্যাপার হবে না। সংগ্রাম বন্ধের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস। স্বস্তি পরিষদের যুদ্ধ-বিরতি আহ্বানে বলা হয়েছে যে, আরব ও ইহুদীদের ভাবী রাজনৈতিক ভাগ্যের উপর এর কোন প্রতিক্রিয়াই হবে না। কিন্তু আরব কিম্বা ইহুদীরা সন্দেহমুক্ত হতে পারছে না। আরবরা ভাবছে যে, তারা যদি শান্তি স্থাপন করে, তবে প্যালেস্টাইনে হয়ত আর কোন দিন স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গঠিত হবে না—প্যালেস্টাইন চিরদিনের মত থেকে যাবে অস্থির অধীনে। আর ইহুদীরা ভাবছে যে, তারা অস্ত্র ত্যাগ করলে তাদের ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা চিরদিন স্বপ্ন হয়েই থাকবে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা রাজনৈতিক আপোষ ছাড়া শান্তি স্থাপনের প্রয়াস অর্থহীন।

### ভিয়েৎনামে নতুন চাল

ফ্রান্স আজ পর্যন্ত ভিয়েৎনাম সমস্যার কোন সমাধান করে উঠতে পারেনি। তার কারণ ফরাসীরা ভিয়েৎনাম শাসনের প্রকৃত কর্তৃত্ব ভিয়েৎনামীদের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে রাজী নয়। অপর পক্ষে জাতীয়তাবাদী ভিয়েৎনামীরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে রাজী নয়। বৃটিশ কমনওয়েলথের ধরণে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা যে ফরাসী ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির স্বাধীনতা নেই। তাই ফরাসী ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদীরা ফরাসী ইউনিয়নে যোগ দিতে রাজী নয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা চাইছে জাতীয়তাবাদী ভিয়েৎনামীদের বাদ দিয়ে নরমপন্থী ভিয়েৎনামীদের সঙ্গে একটা আপোষ রফা করতে এবং তাদের সাহায্যে ফরাসী ইন্দোচীনের উপর নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে। এই উদ্দেশ্যে তারা আন্নামের ভূতপূর্ব সম্রাট বাও দাই-এর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা চায় বাও দাইকে কেন্দ্র ক'রে নরমপন্থীদের একটি নতুন গভর্নমেণ্ট গড়ে তুলতে এবং এইভাবে ডাঃ হো চি মিনের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদীদের শক্তি ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে। ডাঃ হো চি মিনের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালিয়ে ফরাসীরা বুঝেছে যে, তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। তাই বাও দাই-এর সঙ্গে এই নতুন আপোষের প্রয়াস।

বাও দাই ছিলেন আন্নামের সম্রাট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে নিজের রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন তাঁর প্রজাদের। বিশ্বের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এই ধরণের আত্মত্যাগের উদাহরণ দুর্লভ। তদবধি তিনি স্বেচ্ছা-নির্বাসনের জীবন বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে হংকং ও সায়গনে। ইন্দোচীনের ফরাসী হাইকমিশনার মঃ বোলেয়ারের আগ্রহাতিশয্যে ১৯৪৭এর শেষভাগে তিনি ইউরোপে গিয়েছিলেন এবং তখন ফরাসী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর একটা আপোষরফা হয়েছিল বলে প্রকাশ। তখন তিনি ফরাসীদের মনোমত একটি নতুন গভর্নমেণ্ট গঠনে সম্মত হয়েছিলেন এবং ফরাসীরা প্রতিদানে তাঁকে আন্নামের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি হংকং-এ ফিরে এসেছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত নতুন গভর্নমেণ্ট গঠনের পরিকল্পনা আদৌ অগ্রসর হয়নি। তার কারণ বাও দাই ফরাসী পরিকল্পনার ফাঁক ও ফাঁকি ধরে ফেলেছেন এবং তিনি পররাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে অধিকতর অধিকার দাবী করেছেন বলে প্রকাশ। সেই সঙ্গে আর একটি মতভেদের কারণও দেখা দিয়েছে। নতুন গভর্নমেণ্ট থেকে ফরাসীরা ডাঃ হো চি মিন্ ও তাঁর উগ্রপন্থী সমর্থকদের বাদ দিতে উন্মুখ। আর বাও দাই বলছেন যে, এঁদের বাদ দিয়ে ফরাসী ইন্দোচীনে কোন গভর্নমেণ্টই গঠিত হতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ফরাসীদের নতুন চালও ব্যর্থ হতে চলেছে। তবু তারা হাল ছাড়েনি। ফরাসী হাইকমিশনার মঃ বোলেয়ার পুনরায় বাও দাই-এর সঙ্গে আলোচনা চালাতে উৎসুক। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় শীঘ্রই এই ধরণের কোন নতুন আলোচনা হবে বলে মনে হয় না। এই ব্যর্থতার পরে ফরাসী ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভেদ সৃষ্টির জন্যে ফরাসীরা অন্য কোন নতুন চাল চালে তা লক্ষ্য করবার বিষয়।

১৭-৪-৪৮

**বর্ষফল** সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। শ্যাম বলিল—ফল আর কি হবে? ট্রামে ভীড় বাড়বে, চালে হয়ত আর কিছু কাঁকর বাড়বে। আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বিশুখুড়ো বাধা দিয়া বলিলেন—"ঐ সঙ্গে কিছু প্ল্যানিং আর বিবৃতি বৃদ্ধি এবং সচিব সংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কাও আছে।"

* * * * *

**একটি** সংবাদে জানিলাম যে, কলিকাতা হইতে নাকি কতকগুলি বাক্স চট্টগ্রামে চালান দেওয়া হইয়াছিল। বাক্সের গায়ের লেবেলে লেখা ছিল "পাকিস্থান সরকারের
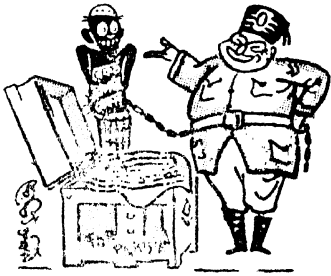
রেকর্ড"। সন্দেহক্রমে বাক্স খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে রহিয়াছে কতকগুলি চোরাই কাপড়ের বস্তা! বিশু খুড়ো হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন —"রেকর্ডই বটে!"

* * " * *

**হায়দরাবাদে** যারা সবাইকে রাজা করিয়া দেওয়ার সেবক প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন অর্থাৎ "রাজাকর" সঙ্ঘ; তাদের রাজা রাজভি বলিয়াছেন যে, অচিরেই নাকি বঙ্গোপসাগরের জল নিজাম বাহাদুরের চরণ-যুগল ধৌত করিবে। বিশুখুড়ো সংবাদটি শুনিয়া বলিলেন—"রাজভি সাহেব হয়ত অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণের কাহিনী জানেন না, এ কথাও তিনি নিশ্চয়ই জানেন না যে, অগস্ত্য একদিন ঐ দক্ষিণাপথেই চলে গিয়েছিলেন। হয়ত তিনি আজও সেখানেই আছেন এবং রাজাকরের আহ্বানে সমুদ্রের নতি স্বীকারের আগে অগস্ত্য আত্মগোপন করে থাকবেন বলেও তো মনে হয় না!"

রাজভি সাহেবের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন,—"কোন সুস্থ মস্তিষ্ক লোক এ রকম বক্তৃতা দিতে পারে তা ভাবা যায় না।" কিন্তু রাজভি সাহেবের মস্তিষ্কের সুস্থতার সংবাদই বা মৌলানা সাহেব কোথায় পাইলেন?

* * * *

**শুনিতেছি** পূর্ব পাকিস্থানেও নাকি অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইন প্রয়োগ করার কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। সম্প্রতি যেসব বিবরণ পাইয়াছি, তাহাতে এক কায়েদে আজম ছাড়া অন্য কোন অতিথি সমাগমের সংবাদ তো আমরা পাই নাই।

* * " * *

**আমরা** আরও শুনিতেছি কলিকাতা অল্‌ ইণ্ডিয়া এক্‌জিবিশানের স্টলগুলিতে নাকি শরণাগতদের আশ্রয় দেওয়া হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"এই এক্‌জিবিশানে"র সুনাম নিশ্চয়ই দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। পাকিস্থান মুখ্যতঃ এ রকম এক্‌জিবিশানের জন্য দায়ী বলে তারা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন!"

* * " * *

**বিনা** টিকিটে ভ্রমণের জন্য ডাঃ সিরিল জোয়াডের নাকি জরিমানা হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ

জোয়াডের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—

He became, during the war, Britains number one exponent of popular philosophy.

খুড়ো বলিলেন,—যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও এখনও যে তিনি popular philosophyরই সমর্থক তার প্রমাণ তাঁর বিনা টিকিটে ভ্রমণ!"

* * " * *

**বিগত** সপ্তাহে আমরা আমেরিকার বাঁদর-দের ব্যবসা এবং তাদের ধনিক মনোবৃত্তির সংবাদ দিয়াছি। এবারে শুনিলাম, —সোভিয়েট কর্মকর্তারা নাকি বাঁদরের ভাব শিক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। বিশুখুড়ো

বলিলেন,—"বাঁদরামো করে আমেরিকা কি যাবে এ-টা রাশানেরা কিছুতেই বরদাস্ত কর না, তারাও কোনো অংশে

* * " * *

**কলিকাতায়** নাকি সম্প্রতি একটি চো কারবারীর কোম্পানী খোলা হই ছিল। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"কত কোম্পানী শেয়ার বিক্রীর জন্য বড় বড় বিজ্ঞাপ কাগজে কাগজে ছাপা হয়, অথচ কোম্পানীর শেয়ার কিনলে মার খাওয়ার ভ নেই, তার বিজ্ঞাপনটিই আমাদের চোখে পড় না, গরীবের কপাল তো!"

* * " * *

**পুলিশের** প্রধান কর্মকর্তা বলিয়াছেন কলিকাতায় চুরি ডাকাতির সং অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবে মোটর বা ব দিয়ে মানুষ চাপা দেওয়ার অপরাধের সং অনেক বাড়িয়াছে। শ্যামলাল বলিল,—" হোক, টাকা পয়সা বেঁচে গেলে মানুষ ম যাওয়াটা আমরা নিশ্চয়ই সহ্য করব।"

* * " * *

**দিল্লীতে** সম্প্রতি "জল বাঁচাও সপ্ত পালন করা হইয়াছে। "কোলকাত ওরকম সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা যাতে না হ তার জন্যে এখানকার গয়লারা শু ইউনিয়ান গড়ছেন"—মন্তব্য খুড়োর।

ঋটা নিজের হাতে যাচাই করে নিতে পারবেন। যদি ভূগোল—অর্থনীতির সমন্বয়ে প্রমাণ করতে চান যে, তিন ফোঁটা নদীর জল কি করে নব নব মন্বন্তরের কারণ হতে পারে তা'হলে জলালাবাদে আস্তানা গেড়ে কাবুল নদীর উজানভাটা করুন। আর যদি গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন তবে তার রঙ্গভূমি তো জলালাবাদের কয়েক মাইল দূরে হাদ্দা গ্রামে। ধ্যানীবুদ্ধ, কঙ্কালসার বুদ্ধ, অমিতাভবুদ্ধ যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার শৈলীর যত উদাহরণ চান সব উপস্থিত। মাটির উপরে কিঞ্চিৎ, ভিতরে প্রচুর। টিপি-ঢাপা দেখামাত্র অজ্ঞ লোকেও বলতে পারে।

আর যদি আপনি পাণ্ডিত্যের বাজারে সত্যিকার দাঁও মারতে চান তবে দেখুন, সিন্ধুর পারে মোন-জো-দড়ো বেরুল, ইউফ্রেটিস টাইগ্রিসের পারে আসিরিয় বেবিলনিয় সভ্যতা বেরুলো, নাইলের পারে মিশরীয় সভ্যতা বেরুল—এর সব কটাই প্রাক আর্য পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা। শুনতে পাই নর্মদার পারে ঐরকম একটা দাঁও মারার জন্য এক পাল পণ্ডিত মাথায় গামছা বেঁধে শাবল নিয়ে লেগে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে বাজার ফেল-ঠাসা করতে পারবেন না, উল্টে দেউলে হবার সম্ভাবনাই বেশী। আর যদি নিতান্তই বরাত জোরে কিছু একটা পেয়ে যান তবে হবেন না হয় রাখাল দাস। এক পাল মার্শাল উড়োউড়ি করছে, ছোঁ মেরে আপনারি কাঁচা মাল বিলেত নিয়ে গিয়ে তিন ভলুমে চামড়ায় বেঁধে আপনারি মাথায় ছুঁড়ে মারবে। শোনেন নি, গুণী বলেছেন, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দুবার ঠকলে তোমার দোষ।' তাই বলি, জলালাবাদ যান, মোন-জো-দড়োর কনিষ্ঠ ভ্রাতার উদ্ধার করুন, তাতে ভারতের গর্ব বারো আনা, আফগানিস্থানের চার আনা। বিশেষতঃ যখন আফগানিস্থানে কাক চিল নেই—আপনার মেহন্নতের মাল নিয়ে তারা চুরি চামারি করবে না।

জানি, পণ্ডিত মাত্রেই সন্দেহ-পিশাচ। আপনিও বলবেন, 'না হয় মানলুম, জলালাবাদের জমির শুধু উপরে নয়, নিচেও বিস্তর সোনার ফসল আছে, কিন্তু প্রশ্ন, চতুর্দিক থেকে এতদিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলির পাল সেখানে ঝামেলা লাগায় নি কেন?'

তার কারণ তো বেতারবাণী বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন। ইংরেজ এবং অন্য হরেকরকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ করে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাণ্ডিত্যমন্দিরে উপস্থিত যে কয়টি পক্ষী উড্ডীয়মান তাদের সর্বাঙ্গে শ্বেত-কুষ্ঠ, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আপনার রঙ দিব্য বাদামী, আপনি প্রতিবেশী, আফগান আপনাকে বহু শতাব্দী ধরে চেনে—আপনি না হয় তাকে ভুলে গিয়েছেন, আপনারি জাতভাই বহু ভারতীয় আফগানিস্থানে ছোট-খাটো নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি এমন কি বসবাসও করে, আপনাকে আনাচে কানাচে ঘুরতে দেখলে কাবলীওয়ালা আর যা করে করুক, আঁৎকে উঠে কোঁৎকা খুঁজবে না।

তবু শুনবেন না? সাধে বলি, সব কিছু পণ্ড না হলে পণ্ডিত হয় না।

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌঁছবার আর কোনো ভরসাই রইল না।

পেশাওয়ার থেকে জলালাবাদ এক শ মাইল। জলালাবাদ থেকে কাবুল আরো একশ' মাইল শাস্ত্রে লেখে সকালে পেশাওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জলালাবাদ পৌঁছবে। পরদিন ভোরবেলা জলালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অল্প লোকেই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না।

জলালাবাদের আশপাশের গাঁয়ের ছেলেরা রাস্তায় খেলাধুলো করছে। তারি এক খেলা মোটরের জন্য রাস্তায় গোলক-ধাঁধা বানিয়ে দেওয়া। কায়দাটা বলছি। কাবুলীরা যে আস্তার মত শক্ত টুপির চতুর্দিকে পাগড়ী জড়ায় ছোঁড়ারা সেই টুপি এমনভাবে রাস্তায় সাজিয়ে রাখে যে, হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ী না চালালে দুটো চারটে থেঁৎলে দেবার সম্ভাবনা। দূর থেকে সেগুলো দেখতে পেলেই সর্দারজী দাড়ি-গোঁফের ভেতরে বিড়বিড় করে কি একটা গালাগাল দিয়ে মোটরের বেগ কমান। কয়েক বার এ রকম রক্ষা করার পর বললুম, 'দিন না দুটো চারটে থেঁৎলে। ছোঁড়াদের উচিত আক্কেল হয়।' সর্দারজী বললেন, 'খুদা বাঁচাও। এমন কর্ম করতে নেই। আর টায়ার ফাঁসাতে চাইনে।' আমি বুঝতে না পেরে বললুম, 'সে কি কথা, এই টুপিগুলো আপনার টায়ার ফাঁসা করে দেবে?' তিনি বললেন, 'আপনি খেলাটার আসল মর্মই ধরতে পারেননি। টুপির ভেতরে রয়েছে মাটিতে শক্ত করে পোঁতা মস্ত খোঁটা। যদি টুপি বাঁচিয়ে চলি তবে গাড়ী বাঁচানো হল, যদি টুপি থেঁৎলাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়োল মারা হল।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ ছোকরারা মোটর-ওয়ালাদের শেখাতে চায়, "পরের অপকার করিলে নিজের অপকার হয়।"'

সর্দারজী বললেন, 'ওঃ, আপনার কী পরিষ্কার মাথা!'

বেতার বাণী বললেন, 'কিন্তু প্রশ্ন, এই মহান শিক্ষা এল কোথা হতে?'

আমি নিবেদন করলুম, 'আপনিই বলুন।'

তিনি বললেন, 'ছোঁড়াদের খেলাতে রয়েছে বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শের ভগ্নাবশেষ। জানেন, এককালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রসার প্রতিপত্তি ছিল।'

আমি বললুম, 'তাই তো শুনেছি।'

তিনি বললেন, 'শুনেছি মানে? একটুখানি ডাইনে হটলেই পৌঁছবেন হাদ্দায়। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন কত বৌদ্ধ মূর্তি বেরিয়েছে মাটির তলা থেকে। আপনি কি ভাবছেন, সে আমলের লোক নানা রকম মূর্তি জড়ো করে যাদুঘর বানাত?'

এ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন, 'কনিষ্কের আমলে গান্ধারবাসীরা যাদুঘর নির্মাণ করিত কি না?'

ফেল করলুম। কিন্তু বাঙালী আর কিছু পারুক না পারুক, বাজে তর্কে খুব মজবুত। বললুম, 'কিন্তু কাল রাতের সরাইয়ে নিজের জান-মাল থুড়ি মাল জান সম্বন্ধে যে সতর্কতার হুশিয়ার শুনতে পেলুম তা থেকে তো মনে হয় না প্রভু তথাগতের সাম্যমৈত্রীর বাণী শুনেছি।'

বেতারবাণী বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে অহিংসা শিক্ষাদান ও [illegible] ধর্ম। পূর্ণ বয়স্ক, প্রাণবন্ত সুদৃঢ় পুরুষের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

সর্দারজী হাসিমুখে [illegible] বললেন, 'আমি তো [illegible] মানি কিন্তু একথা নাও স্বীকার করতে পারি যে, এই আধ ইসলাম [illegible] যদি [illegible] [illegible] যে ইসলাম।'

আমি তো [illegible] গেলুম। এইবার লাগে বুঝি [illegible] অর্থাৎ [illegible] না হয়। [illegible] বেতারবাণী [illegible] বৌদ্ধ [illegible] বললেন, 'আপনি নিজেকে এবং আমাদের সকলের [illegible] লোকজনের [illegible] এসেছেন, [illegible] উপর আপনি বলতে পারেন। আপনার এই [illegible] শুনে ভারি খুশী হলাম।'

আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে [illegible] গলা [illegible] সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করলুম, 'একি কাণ্ড? আপনি এঁর [illegible] আধ-ইসলাম বললেন আর ইনি খুশী হয়ে আপনার তসলিম করলেন!'

সর্দারজী আরো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ইনি চটবেন কেন? ইনি তো কাবুলী।'

আমি আরো সাত হাত জলে। শুধালুম, 'কাবুলী পাঠান নয়?'

সর্দারজী তখন আমার অজ্ঞতা ধরে পেরে বুঝিয়ে বললেন, 'আফগানিস্থানের অধিবাসী পাঠান। কিন্তু খাস কাবুলের লোক ইরাণ দেশ থেকে এসে সেখানে বাড়ী দোর বেঁধে শহর জমিয়েছে। তাদের মাতৃ

সঞ্চয় করেছিল, তাও টিঁকবে না বেশি দিন, দীর্ঘ দিন অব্যবহার্য অবস্থায় সাড়ির সুতো-গুলো পচে গেছে! বিলাসিতার ওপর কোনদিন তার মোহ ছিল না, আজও নেই, সাধারণ পরিচ্ছদ স্কুলের ভিড়ে চলে যায়; কিন্তু যেখানে সে একটি বিশেষ লোক, তারও কথা মনোযোগ দিয়ে শোনবার লোকের অভাব নেই, যেখানে পরিচ্ছদ রুচি এবং সভ্যতার মাপকাটি সেখানে জামা-কাপড় সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে উপায় নেই। এক সের চালের জন্যে সাড়ে চার ঘণ্টা দাঁড়াতে হয়, সে-চাল কেনবার পয়সা সে জামা-কাপড়ের অভাবে হারাতে পারে না!

স্কুলের সময় হয়ে গেছে।

তিনকড়ির সম্বন্ধে সব বন্দোবস্ত করে সন্ধ্যা বলল, 'গেলাম আমি!' তাকাল সে তিনকড়ির দিকে।

কোন উত্তর না পেয়ে সন্ধ্যা বলল পুনরায়, 'হয়ত একটু দেরি হবে, বসন্ত হওনা, আজ সেই নূতন ছাত্রীকে পড়াতে যাবে!' সন্ধ্যা তাকাল, উত্তর নেই।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে সে তিনকড়ির বিছানার কাছে সরে এল; ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'বিশ্বাস কর, তুমি যদি এমন মন খারাপ করে থাক—কোন কাজেই আমি একটুও উৎসাহ পাইনা!'

'আমার মন যেরূপই থাক না!' তিনকড়ি বলল এবার, 'তাতে তোমার ত কিছুই এসে যায় না!'

'এসে যায়, আমাকে অত নই ভাব, মন বলে আমার একটা বস্তু আছে এটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'যদি থাকত তাহলে এমন করে অবহেলা তুমি করতে না।'

'কোনদিনই অবজ্ঞা তোমায় করিনি, কেনই বা করব? আমি যা করেছি তার মধ্যে একটুকু অন্যায় নেই। স্কুলে যখন কাজের চেষ্টা করে-ছিলাম তখন তুমি আপত্তি করেছিলে, কেন না তোমার বিশ্বাস ঘরের বৌ বাইরে বেরোলে চরিত্র হারায়। চরিত্র হারাবার তেমন কোন মহত্তর কারণ ঘটেনি আজ পর্যন্ত!'

তিনকড়ি উত্তর দিল না; অস্পষ্ট চাপা গলায় সে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও!'

'স্কুলের দেরী হয়ে যাবে না?'

'পাঁচ মিনিট!' তিনকড়ি মিনতি করল।

দরজা বন্ধ করে শঙ্কিত হৃদয়ে সন্ধ্যা তিনকড়ির কাছে এসে দাঁড়াল, হাত বাড়াল তিনকড়ি, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সন্ধ্যা তার হাত ধরল, কিন্তু বাধা দিল তার আকর্ষণে; বলল 'তুমি অসুস্থ!'

তিনকড়ি তাকে টেনে আনল একেবারে নিজের বুকের ওপর, উত্তেজনায় তার পেশী শিথিল আর নিস্তেজ হয়ে গেছে। ওর অস্বাস্থ্যকর নিশ্বাসের স্পর্শ সন্ধ্যার অসহ্য মনে হল, মুখ সরিয়ে নিল সে। সাড়ির ভাঁজ বিন্যস্ত করে বেরিয়ে পড়ল, একবারও তাকাল না তিনকড়ির দিকে!

দূর থেকে সন্ধ্যা শুনতে পেল এগারোটার ঘণ্টা বাজছে!

এক সঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি সে ভাঙতে লাগল; রঘুবীর হাজিরা খাতা নিয়ে বারান্দা অতিক্রম করছিল। সন্ধ্যা একটি মেয়ের কাছ থেকে কলম চেয়ে রঘুনাথের হাত থেকে খাতা-খানা প্রায় ছিনিয়ে নিল।

কলমটা ফেরত দিয়ে মেয়েটিকে সে বলল, 'বাঃ চমৎকার তোমার কলমটি ত!'

তারপর ঝড়ের মত সময় কাটতে লাগল। পড়াতে ওর কোন অসুবিধে তার হয় না। আর তার সৌভাগ্য! মেয়েরা তাকে ভালবাসে। তার এই ছাত্রী প্রিয়তা অবশ্য সবাই সহ্য করতে পারে না! কাউকে কাউকে বলতেও শুনেছে—সে তার গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলছে, মেয়েদের সঙ্গে অত মেলামেশা করলে শেষকালে কেউ তাকে ভয় করবে না!

সুরুচি খাটো তিতো স্পষ্ট তাকে একদিন বলল, 'আপনি এমন করে লাই দিচ্ছেন মেয়েদের ওরা একদিন মাথায় উঠবে! একেবারে ভয় করবে না আপনাকে!'

'ভয় নাই বা করল!' সুরমা সন্ধ্যার হয়ে জবাব দিল, 'ভাল ত বাসবে!'

'ভালবাসা না বাসার কথা নয়, ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধ খেলা বা ইয়ার্কির সম্বন্ধ নয়, ভয় করবে, ভক্তি করবে ওরা!'

'কেন ভয় করবে?' সুরমা বলল, 'ওরা ত আসামী নয়, পড়তে এসে ওরা কোন অপরাধ করেনি। আর এটা বোধ হয় মানেন সুরুচিদি যে ভয় করতে শিখিয়ে ভালবাসা আদায় করা যায় না। অনর্থক চোখ রাঙিয়ে ওদের মনে জড়িয়ে থাকবে গোপন বিদ্বেষ আর আক্রোশ, যতদিন আমাদের কাছে পড়বে ততদিন তাদের মন আড়ষ্ট হয়ে থাকবে অস্বস্তিকর [illegible] এক চিন্তায়, স্কুলের পড়া ওরা একদিন শেষ করবে, কিন্তু আমাদের মানে শিক্ষয়িত্রীদের সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে ওরা যাবে তার পরিণাম দাঁড়াবে বিদ্রোহে আর শত্রুতায় পরবর্তী জীবনে দেখা দেবে প্রতিক্রিয়া! তা ছাড়া অল্পবয়স্কা বলে তাদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করলে ত চলবে না, বন্ধুর মত তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, আয়নার মত পরিষ্কার হয়ে ধরা দেবে তাদের আশা, নিরাশা, দ্বন্দ্ব, ভয় দুঃখ শিশু-মনের অসংখ্য জটিল সমস্যা। যদি তাদের মনই থাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—কেমন করে শিক্ষা দেবেন? কি আপনার ধারণা?'

'তোমার কথা আমি মানতে রাজি নই!' দুর্বল কণ্ঠে সুরুচি বলল। নিজেকে কিঞ্চিৎ অসহায় বোধ না করে সে পারল না, তাকাল অন্যান্য সহকারিণীর দিকে, কারুর চোখে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা গেল না।

'না মানলে', সুরমা বলল, 'কার আর কি ক্ষতি বলুন?'

সন্ধ্যা শীতকালেও ঘামছিল, কিন্তু সুরমার প্রতি কৃতজ্ঞতার তার অন্ত রইল না!

চমৎকার, পরিপাটি একটি ঘরে পড়াশুনোর ব্যবস্থা হয়েছে।

রেখা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে যখন চা এবং খাবারের প্লেট নিয়ে এল সন্ধ্যা বলল, 'তুমি চায়ে আমার অভ্যাস না করিয়ে ছাড়বে না দেখছি!'

'হলেই বা!' মিষ্টি হাসল রেখা।

'শুধু শুধু একটা অভ্যাস করে লাভ কি?'

'শুধু শুধু আপনি কিছু করেন [illegible] পাঁচখানাতে?' আপনি বুঝি চায়ের উপকারিতা পড়েননি কাগজে?'

'পড়েছি!' সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে নিল।

অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে গল্প চলে [illegible] ছিল; রেখা সাধারণত মিতভাষিণী, কিন্তু [illegible] মত লোকের সান্নিধ্যে কথার তার অন্ত থাকে না। অনেক [illegible] সন্ধ্যাকে জানাতে [illegible] অর্থ, সম্মান, পার্টি, টেনিস, [illegible] নিয়ে।

এক সময়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার মা [illegible] দেখছি না যে? [illegible] নেই বুঝি বাড়িতে?'

'না, মা গেছেন মেয়েদের একটা মিটিং হ[illegible] সেখানে।'

'মিটিং! কিসের মিটিং?' সন্ধ্যা বিস্মিত হল, 'কি হয় সেখানে?'

'চা, গল্প গুজব, বক্তৃতা, পার্টি, চাঁদার [illegible] কাপড়ের দাম, সব কিছু!' রেখা হাসল।

'হাসছ যে!'

'হাসবো না? [illegible] কি কি বলেন, কে কি করে সবই আমার জানা, হয় হবে! শুনেছি [illegible] বস্তিতে গিয়ে চরকা বিলির ভার নেবেন, [illegible] না হয়, অনেক [illegible] শেষকালে ফিরে যায় তারও ব্যবস্থা [illegible] করবেন!'

'তা এতে হাসবার কি আছে?' সন্ধ্যা বলল।

'হাসবার নেই?' রেখা হাসল আবার, 'শে[ষ] পর্যন্ত কিছুই হয় না, চা আর এক প্লেট খাবার খেয়ে যে যার বাড়ি! বস্তির [illegible] করবেন ওঁরা? ততক্ষণে খোস গল্প [illegible] সাড়ি আর ব্লাউজের আলোচনা ছাড়া কিছু গড়ায় না। মাকে ডাকতে এলে খবর পাঠা[illegible] শরীর খারাপ, অথচ সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরতে হয়ত!'

'চুপ! চুপ!' বিব্রত কণ্ঠে সন্ধ্যা বল[ল], 'এখুনি কেউ হয়ত শুনতে পাবে!'

'পেলেই বা!'

'না, ছিঃ গুরুজনের নিন্দে করতে নেই!'

(ক্রম[শঃ])

দুজন মক্কেলের দিকে তাকালো। যেন ওদের উপস্থিতির জন্যেই সে জবাব দিতে পারছে না। কিন্তু মক্কেল দুজনেই পুরুষ ছিল বলে হেড্-কেরাণী হেসে উঠলেন। বললেনঃ আমি জানি, তবে দিনে পাঁচবার একটু বেশীমাত্রাই বটে। যাক্, তোমাকে চালাক দেখাচ্ছে, এক্ষুণি গিয়ে ডিলাকোরের মোকদ্দমায় আমাদের চিঠিগুলো মিঃ আলেনের জন্যে এনে দাও।

সন্ধের সামনে এই কথাগুলো, দৌড়ে উপরে-ওঠা, তাড়াতাড়ি করে পোর্টারের গ্লাস খাওয়া, এইসব ভেবে সে যখন ডেস্কে বসলো কাজ করতে, তখন বুঝতে পারলো সাড়ে পাঁচটার আগে চুক্তিপত্রের নকল করে দেওয়ার আশাটা কত অলীক। অন্ধকার জমাট-বাঁধা রাত এগিয়ে আসছিলঃ সে চেয়েছিল এই রাতটা মদের 'বারে' কাটাতে, বন্ধুদের সঙ্গে গ্যাসের আলোর ঝলকানিতে, গ্লাসের ঝনঝনানিতে। ডিলাকোরের চিঠিগুলো নিয়ে অফিস থেকে উপরে গেলো। সে আশা করেছিল, দুটো চিঠি যে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা মিঃ আলেন ধরতে পারবেন না।

সেই মিষ্টি প্রসাধনী সৌরভ মিঃ আলেনের কামরা অবধি সমস্ত পথটায় ছড়িয়ে ছিল। মিস্ ডিলাকোর মধ্যবয়স্কা রমণী, চেহারাটা ইহুদীদের মতো। কানাঘুষো আছে, মিঃ আলেন নাকি তার উপর এবং তার টাকার উপর একটু সদয়। তিনি প্রায়ই অফিসে আসতেন এবং এসে অনেকক্ষণ থাকতেন। এখন তিনি তাঁর ডেস্কের পাশে একরাশ সুরভি ছড়িয়ে হাতের ছাতাটার হাতল বুলিয়ে ও মাথার টুপির দীর্ঘ কালো পালকটি দুলিয়ে বসেছিলেন। মিঃ আলেন চেয়ারটা ঘুরিয়ে, বাঁ-পায়ের উপর ডান পা রেখে তার মুখোমুখি বসেছিলেন। লোকটি এসে চিঠিগুলো ডেস্কের উপর রেখে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালো। কিন্তু মিঃ আলেন কিংবা মিস্ ডিলাকোর কেউ-ই তার অভিবাদন লক্ষ্য করলো না। মিঃ আলেন চিঠিগুলোর উপর আঙুল রেখে আবার ওটা ফিরিয়ে দিলেন। যেন বলতে চানঃ ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো।

লোকটি নীচের তলায় ফিরে এসে আবার ডেস্কের ধারে বসলো। সে ঐ অসম্পূর্ণ বাক্যটির দিকে ইচ্ছা করেই তাকিয়ে রইলোঃ "কোন ক্ষেত্রেই উক্ত বার্ণার্ড বড্‌লি" - সে ভাবতে লাগলো কেমন আশ্চর্য শেষের দুটো শব্দ একই অক্ষর দিয়ে আরম্ভ। হেড কেরাণী মিস্ পার্কারকে তাড়া দিতে লাগলেন-কখনই ডাকের আগে চিঠিগুলো টাইপ করে দিতে পারে না। লোকটি মেশিনের ক্লিক ক্লিক শব্দ কয়েক মিনিটের জন্য শুনতে লাগলো এবং তারপর তার নকল শেষ করে দিতে কাজ শুরু করলো। কিন্তু তার মাথা ঠিক ছিল না, তার মন পড়ে ছিলো পাব্লিক হাউসের ঝল-মলানি আর ঝনঝনানির মধ্যে। আজ হচ্ছে গরম লাঞ্চ খওয়ার রাত। সে তার নকল শুরু করলো প্রাণপণে, কিন্তু পাঁচটা বাজতে দেখা গেলো তার আরও চৌদ্দ পৃষ্ঠা বাকি। দুত্তোর এ সব! সে সময়মত তা শেষ করতে পারলো না। তার ইচ্ছা হলো উচ্চ স্বরে অভিশাপ দিতে, তার ইচ্ছা হলো কোন কিছুর উপর ভয়ানক ভাবে ঘুষি মারতে। সে এতো রেগে গিয়ে-ছিলো যে, 'বার্ণার্ড বড্‌লির পরিবর্তে' বার্ণার্ড বার্ণার্ড লিখে বসে আবার নতুন কাগজে নতুন করে লিখতে হয়েছিলো।

তার মনে হতে লাগলো ইচ্ছে করলে সমস্ত অফিসটাকে সে একা ভেঙে দিতে পারে। তার শরীর এখান থেকে ছুটে গিয়ে বেরিয়ে কোন হিংসাত্মক কাজ করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। জীবনের সমস্ত দুঃখদায়ক অপমান ও গ্লানি তাকে রাগান্বিত করে তুললো। সে কি ক্যাশিয়ারকে বলবে কিছু অগ্রিম দিতে? না, ক্যাশিয়ার লোকটা ভালো নয়, একেবারে নাছোড়ঃ সে কিছুতেই অগ্রিম দেবে না। সে জানতো কোথায় গেলে এখন তার বন্ধুদের, লিওনার্ড, ওহ্যালোরান ও নোসি ফ্লিনকে দেখা পাবে। তার আবেগের মাপকাঠি অস্থির হয়ে উঠে যেন বিকল হয়ে গেলো।

তার কল্পনা এতদূর অভিভূত করে দিয়েছিলো যে, তার নাম দুবার ডাকবার পর সে জবাব দেয়। মিঃ আলেন ও মিস্ ডিলাকোর কাউন্টারের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সমস্ত কেরাণীরাই তার দিকে তাকিয়েছিলো কোন একটা দৃশ্য দেখবার আশায়। সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। মিঃ আলেন তিরস্কারের সঙ্গে বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেনঃ দুটো চিঠি কেন পাওয়া যাচ্ছে না? সে বললো যে, এর কিছুই তার জানা নেই এবং সে বিশ্বস্ত ভাবে নকল করে দিয়েছে। তিরস্কার বর্ষণ চললো। সেগুলো এত তিক্ত ও কঠোর ছিলো যে, সে অতিকষ্টে তার হাতের মুঠোকে ঐ মানুষের মস্তকে ঘুষি মারা থেকে বিরত করেছিলো।

ঃ আমি ঐ দুটো চিঠি সম্পর্কে কিছুই জানি না। সে নির্লিপ্ত ভাবে বললো।

ঃ তুমি-কিছুই জানো না। হ্যাঁ, তুমি কিছু জানো না। মিঃ আলেন বললেন।

তারপর পাশের মহিলার দিকে সমর্থন লাভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বললেনঃ তুমি কি আমাকে বোকা পেয়েছো? তুমি কি মনে করো আমি একজন আস্ত বোকা?

লোকটি মহিলার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর ডিম্বাকৃতি মাথার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলো এবং নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত জিহ্বা মুখর হয়ে উঠলো।

সে বললোঃ আমি মনে করিনে স্যার, যে ঐ প্রশ্নটি আমাকে করা সঙ্গত হয়েছে।

সমস্ত কেরাণীদের নিশ্বাসও যেন থেমে গেলো। প্রত্যেকেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো (যে কথাগুলো অমন বুদ্ধিমানের মতো বলেছে সেও বাদ যায়নি) এবং মিস্ ডিলাকোর প্রশস্ত হাসি হাসলেন। মিঃ আলেনের মুখ বন গোলাপের মতো রক্তিম হয়ে গেলো ও তাঁর মুখ বামনের মতো ভঙ্গী করে উঠলো। তিনি লোকটির মুখের কাছে হাতের মুঠো ঘুরাতে লাগলেন, যেন কোন ইলেকট্রিক মেসিনের মতো। বললেনঃ উদ্ধত বদমাস! নচ্ছার গুণ্ডা! তোমার কাজ এক্ষুণি খতম্ হবে! তা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করো। তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্যে আমার কাছে মাপ চেয়ে, এই অফিস তোমাকে অবিলম্বে ছাড়তে হবে। অফিস তোমাকে ছাড়তে হবে, আমি বলে দিচ্ছি, আমার কাছে তোমার মাপ চাইতে হবে।

অফিসের বিপরীত দিকের বাড়ির দরজায় সে লক্ষ্য করবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলো কখন ক্যাশিয়ার একা বেরিয়ে আসবে। সমস্ত কেরাণীরা বেরিয়ে গেলো এবং সবার শেষে ক্যাশিয়ার একজন হেড কেরাণীর সঙ্গে। হেড কেরাণী যখন সঙ্গে আছে, তখন তাকে বলে কিছু লাভ নেই। সে বুঝতে পেরেছিলো তার অবস্থা কি সঙ্গীন। মিঃ আলেনের কাছে 'বেয়াদবি'র জন্য [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে এই উপদ্রবের জন্য কিন্তু সে জানে যে [illegible] সমস্ত [illegible] [illegible] কেমন মৌচাকের মতো [illegible] [illegible] উঠবে। তার মনে আছে কেমন করে মিঃ আলেন তাঁর [illegible] [illegible] নিজের চাকরীটা [illegible]। সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সমস্ত কিছুতেই এখন কি [illegible] [illegible] সে [illegible] হয়ে উঠলো। মিঃ আলেন [illegible] [illegible] এক মিনিটও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সে কি নিজেকে [illegible] [illegible] [illegible] পারলো না, [illegible] প্রথম থেকেই মিঃ আলেন ও সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে যেদিন মিঃ আলেন [illegible] [illegible] [illegible] সে [illegible] হিগিন্স আর মিস্ পার্কারের কাছে তাঁর উত্তর - আইরিশ কথা বলার ভঙ্গীকে ঠাট্টা করছে, সেদিন থেকেই এর শুরু। সে হিগিন্সের কাছে টাকা চাইতে পারতো, কিন্তু হিগিন্স দিতে পারবে না। একা দুটি সংসার চালায়, নিশ্চয়ই সে দিতে পারবে না।

তার বিরাট বপু পাব্লিক-হাউসের আরামের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কুয়াশায় সে কাঁপছিলো; ভাবলো ও'নিলের দোকানে প্যাটের কাছে যাওয়া যায় কি না। কিন্তু সেখানেও এক 'ববে'র বেশি নেওয়া যাবে না, এক 'ববে' কিই বা হবে? তবুও যে করেই হোক তাকে টাকা জোগাড় করতে হবে। তার শেষ পেনীটি গ্রিণ্ পোর্টারে খরচ হয়ে গেছে এবং আর বেশি দেরী

কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠলো ওয়েদার্সের মুখের রঙ লাল হয়ে গেলো। তাদের হাতগুলো কাঁপতে লাগলো। অনেকক্ষণ যুঝবার পর ওয়েদার্স তার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত নামিয়ে আনলো টেবিলের উপর। দর্শকরা প্রশংসার গুঞ্জন তুললো। যে বয়টা দাঁড়িয়েছিলো সে বিজয়ীর দিকে মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো ঃ ঐ তো জিতলো। ফারিংটন ভয়ানকভাবে তাকে ধমক দিয়ে উঠলো ঃ তুই এর কি জানিস? এখানে নাক ঢোকাতে আসিস কেন?

ঃ চুপ! চুপ ফারিংটনের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললো ওহ্যালোরান, সব ঠিক আছে। আর সামান্য কিছু খেয়ে আমরা উঠে পড়বো আজকের মতো।

একজন বিষাদক্লিষ্ট লোক দাঁড়িয়ে ছিলো ওকোনেল ব্রিজের কোণে ট্রামের অপেক্ষায়, বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে। তার ভেতরে প্রতিশোধ আর ক্রোধ বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিলো। সে অপমানিত ও অসন্তুষ্ট বোধ করছিলো। এমন কি সে মাতালও হয়নি মনে হচ্ছিলো তার। পকেটে ছিলো মাত্র দুই পেনী। সে ধিক্কার দিলো সবাইকে। অফিসের চাকরীটি গেছে, ঘড়িটি বন্ধক দেওয়া হয়েছে, সমস্ত টাকা খতম হয়ে গেছে এবং সে ভালো করে মাতালও হয়নি তার আবার তৃষ্ণা পেলো ইচ্ছা হচ্ছিলো আবার সেই পাবলিক হাউসে ফিরে যেতে। একটা ছেলের কাছে দুই দুইবার হেরে গিয়ে শক্তির গৌরবও সে হারিয়েছে। রাগে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো ঃ বিশেষ করে যখন তার মনে হচ্ছিলো সেই তরুণীটির কথা যে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে শুকনো গলায় বলেছিলো মাপ করবেন।

শেলবোর্ণ রোডে এসে ট্রাম থামলো। সে ব্যারেকের দেয়ালের ছায়া ঘেঁষে বিরাট দেহটি এগিয়ে নিচ্ছিলো। বাড়ী ফিরতেও তার বিরক্তি বোধ হচ্ছিলো। ঢুকতে ঢুকতে পাশের রান্নাঘরে দেখলো উনুন খালি এবং আগুনটাও প্রায় নেভানো। সে ডাকলোঃ অ্যাডা! অ্যাডা!

তার স্ত্রী ছিলো অত্যন্ত মুখরা। ভালো অবস্থায় স্বামীকেও ধমকাতো, মাতাল অবস্থায় ওকে ধমকাতো সে। তাদের ছেলেমেয়ে পাঁচটি। একটি বাচ্চা ছেলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেবে এলো।

ঃ ও কেরে? লোকটি ডাকলো অন্ধকারে।

ঃ আমি, বাবা।

ঃ কে তুই? চার্লি?

ঃ না বাবা, টম।

ঃ তোর মা কোথায়?

ঃ গীর্জায় গিয়েছে।

ঃ ঠিক আছে...সে কি আমার খাবার দিয়ে গিয়েছে?

ঃ হাঁ বাবা। আমি—

ঃ আলোটা জ্বাল। ঘরটা অন্ধকারে রেখে কি করছিস? অন্য ছেলেমেয়েরা কোথায়?

লোকটি একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো। বাচ্চা ছেলেটি আলো জ্বাললো। লোকটি তার ছেলের কথাগুলো নকল করে নিজে নিজেই যেন বলছিলো ঃ গীর্জায় গিয়েছে! গীর্জায় গিয়েছে! আলোটা জ্বলতেই টেবিলে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে সে চীৎকার করে বললো ঃ আমার খাবার কোথায়?

ঃ আমি তৈরী করতে যাচ্ছি বাবা। বাচ্চা ছেলেটি বললো। লোকটি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আগুনটা দেখিয়ে বললোঃ ঐ আগুনে! আগুনটা তুই নিভিয়েছিস আমি তোকে শেখাবো কি করে আগুন জ্বালাতে হয়।

সে দরজার পাশ থেকে বেড়াবার ছড়ি হাতে করে নিলো।

ঃ আমি তোকে আগুন জ্বালাতে শেখাবো—আস্তিন গুটোতে গুটোতে সে বললো।

ছেলেটি চীৎকার করে টেবিলের চারধারে ঘুরতে লাগলো। লোকটি তার কোট ধরে ফেললো। বাচ্চা ছেলেটি ব্যাকুলভাবে তার দিকে তাকালো, কিন্তু বাঁচবার কোন আশা নেই দেখে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লো।

ঃ আর কখনো আগুন নেভাবি। ছড়ি দিয়ে ভয়ানকভাবে আঘাত করতে করতে সে বললো ঃ বল বাচ্চা ছেলে, আর কখনও এমন করবি কিনা!

ছড়িটা ওর ঊরুতে লেগে [illegible] ছেলেটি করুণ আর্তনাদ করে উঠলো। সে [illegible] কাঁপতে কাঁপতে হাত দুটো জুড়ো করে উপরে তুলে ধরলো।

ঃ ও বাবারে! আমাকে মেরোনা, আর মেরোনা, ছেলেটি আর্তনাদ করে বলতে লাগলো ঃ আমি তোমার জন্য.....গীর্জায় মেরী মার কাছে প্রার্থনা করবো...আমি হেইল মেরী [illegible] যদি না মারো। আমি বলবো হেইল মেরী—আমি বলবো......

অনুবাদক : কৃষ্ণা ধর

# প্রত্যাশা

**সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত**

প্রত্যাসন্ন প্রভাতের তীরে
চঞ্চল নীরবে শিহরে।
স্থলে-জলে-আকাশের হৃদয়-গভীরে
সুরঞ্জ-মন্দিরা বাজে মৌন-ভৈরবীতে
একান্তে নিভৃতে।

অনেক প্রভাত আসে সময়ের মত প্রসারিত
স্বর্ণ-অলংকৃত।
বৃষ্টি-ভেজা প্রান্তরের স্বচ্ছ নিঃশ্বাসে
হৃদয় প্রত্যাশী হ'ল মৌন প্রার্থনায়,
স্বচ্ছ সত্যের মত সে-ও আজ কিছু দিতে চায়।

আকুতি কেঁপেছে থরো থরো
প্রথম প্রেমের আজ জয়ধ্বনি করো।

কুমারী হৃদয়ে
নম্রক নির্ভয়ে
অযুত সমুদ্র ঢেউয়ে সৃষ্টির জোয়ার।
সময়ের সন্ধিকালে অজস্র অনিবার,
উষা-গোধূলিতে—
দেখা দেয় পলকে চকিতে—
জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশ।
পরিপূর্ণ আনন্দের অঙ্গীকার নিয়েয়।

প্রত্যাসন্ন সম্ভাবনা বক্ষে গুরু গুরু
নিরবধি বাজায় ডম্বরু।
কৌতূহলী কুমারী হৃদয়
থরো থরো প্রত্যাশায় হল স্বপ্নময়—
আমৃত্যু স্পন্দিত হয় জীবনের জয়!

বাড়ী; করাতও শানাও, খরচাও দাও, মামা-বাড়ীর আব্দার আর কি!'

গলার মধ্যে স্বর বেধে আসে বিপন্নের; ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে সে ঃ 'কি হবে তবে সদার ভাই?'

—'হবে আর কি, খরচা করবে।'

—'কোত্থেকে করবো, মাসের মাঝামাঝি থেকেই যে দেনা আরম্ভ হ'য়ে যায়!'

—'তবে চুরি ডাকাতি করো।' বলতে বলতে উঠে পড়ে হারাণ, করাত কাঁধে নিয়ে ছোটে গদাই তরফদারের বাড়ী।

এখানে কাছাকাছি ঝালাই, বালিকাচা আর শান দেবার কাজ করে গদাই তরফদারই। টুক্‌টাক সাজপাট নিয়ে আছে, দু'পয়সা চার পয়সা ক'রে মন্দ আসে না হাতে। হেসে বলে ঃ 'হঠাৎ এমন সাঁঝসন্ধ্যায়?'

—'ছুটির ঘণ্টা বাজবে, তবে তো সময় করবো! দাও ভাই একটু হাত চালিয়ে তাড়াতাড়ি করে!' অনুনয়ের দৃষ্টি মেলে ধরে হারাণ।

—'কেন, জামাই আসবে নাকি বাড়ীতে?' ব'লে আর একবার হেসে নেয় গদাই। চিরদিনের স্বভাবসুলভ তার এই হাসি; এই হাসি দিয়েই সে খদ্দের ঠিক রেখেছে।

কিন্তু হাসতে পারে না হারাণ। গদাই'র ঠাট্টাটা হঠাৎ শক্ত ক'রে এসে বেঁধে তার বুকে। ঘরে জামাই কবে আসবে, ভগবানই জানেন, কিন্তু যাকে কেন্দ্র ক'রে জামাই আসবে, সে আজ বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। মেয়ের মুখখানি হঠাৎ দু'চোখে ভেসে উঠে ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে যায়। আট বছরের ছোট্ট মেয়ে দুলী। সংসার আলো ক'রে এসেছিল একদিন। ভগবতী সাজিয়ে পাঠ ক'রে তাকে সমস্ত শহরটা ঘুরিয়ে এনেছিল হারাণ। আজ প্রায় একমাস ধ'রে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে দুলী।

খানিকটা প্রকৃতিস্থ হ'তে চেষ্টা করে হারাণ। 'না, মেয়ে বড় হয় নাই, এখনি জামাই আনতে কি করে! মল্লিক বাবুদের অর্ডার বুঝিয়ে দিতে হবে কালই, চেড়াই কাঠের ব্যাপার। দাও ভাই একটু তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে যতটা হয়; কাল কাক না ডাকতেই ভোরে এসে আবার কাজে লাগতে হবে।'

—'সাঁঝসন্ধ্যায় 'বউনির' ব্যাপার ভাই, পয়সাটা নগদ দিচ্ছ তো?'—একইভাবে দাঁত বের ক'রে আবার খানিকটা হেসে নেয় গদাই।

হারাণ বলে ঃ 'কত পড়বে, বলো তো?'

গদাই বলে: 'তোমাদের সঙ্গে তো আর নতুন কারবার নয়, কতই বা আর পড়বে, দু'খানা মিলিয়ে সাত আর সাত চোদ্দ সিকে।'

—'এই কি কম কিছু?' বলতে গিয়ে মুখ শুকিয়ে আসে হারাণের।

আবার হাসতে থাকে গদাই।—'সঙ্গে না থাকে কিছু দিয়ে 'বউনি' ক'রে যাও, কাল এসে বাকীটা মিটিয়ে যেয়ো।'

গদাই'র হাসির সঙ্গে তর্ক চলে না। দামটা পুরোপুরিই বহাল থেকে যায়।

—এক সময় করাত নিয়ে ঘরে ফেরে হারাণ।

দুলী এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। বউ কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দুয়োরে বসে অপেক্ষা করছে।

হারাণ বলে ঃ 'দুলী কেমন আছে গো?'

যশোদার অভিমান হয় মনে মনে। লোকটা ক্রমশঃই যেন রাত করে আসা ধরেছে বাড়িতে। কথাটার তাই যথাযথ উত্তর না দিয়ে বলে ঃ 'বাড়ি ঘরদোরের কি আছে যে এলে, আচ্ছা মিনসে যা হোক!'

—'আচ্ছাই বটে!' বসে পড়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয় হারাণ।

পাশেই ঘরের মেঝেয় ঘুমোচ্ছে দুলী। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে কানে। কাছে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করতে গেলে পাছে জেগে ওঠে, তাই দুয়োরের চৌকাঠ ঘেঁষেই বসে বসে চাপা গলায় কথা বলতে চেষ্টা করে সে যশোদার সাথে।—'বাড়িঘর সত্যিই আর থাকলো না বউ; হয়রানির একশেষ করে ছাড়লো মালিকটা।'

—'করলো তো সেখানে গিয়েই থাকো না!' অভিমানের কথাগুলি ঠেলে ঠেলে আসে যশোদার কণ্ঠে।

হারাণের কাছে এ স্বর নতুন নয়, গত এগারো বছরের পরিচয় এ স্বরের সঙ্গে। তাই চটে না হারাণ, বলে: 'কি করবে বলো? অদৃষ্টে তো সে দোলনা সুখ লেখা নাই একেবারে, খেটেখুটে পেটের অন্ন জোটে। এতেও কি রেহাই আছে, তার উপরেও চরিত্রগত দোষ, এটা দাও, ওটা দাও। আর ইচ্ছে করে না যে, ওখানে গিয়ে আবার করাত হাতে নেই। তোমরা ভাতে মরবে, এই জন্যেই তো—'

হঠাৎ থেমে যায় হারাণ।

একটু একটু করে যেন অভিমান কাটতে থাকে যশোদার। স্বামীর পিঠের উপর দিয়ে বার কয়েক নরম হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে: 'আজ তোমার বড্ড খাটুনি গেছে, তাই না গো?'

জবাব দেয় না হারাণ, দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে স্ত্রীর আদর অনুভব করতে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর একসময় উঠে পড়ে খাবারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেয়।

ভোর-রাতে খানিকটা ভালো করে ঘুমিয়ে নেয় সে। সেই কোন্ সাত তাড়াতাড়ি ভোরে উঠে গিয়েই তো আবার করাত হাতে নেওয়া! ভালো লাগে না আর এই একঘেয়ে জীবন-যাত্রা। যশোদার বাহুপাশের মধ্যে নিজেকে নির্বিবাদে ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজতে চেষ্টা করে হারাণ।

কিন্তু বেশীক্ষণ বড় একটা কাটে না। পাশ থেকেই হঠাৎ একসময় ককিয়ে ওঠে দুলী। উঠে এসে মেয়ের শিয়রে বসে হারাণ, কপালের উপর দিয়ে মৃদুভাবে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে: 'ক্ষিদে পেয়েছে মা, একটু বার্লি খাও, কেমন?'

বার্লির কথা শুনলেই কান্না পায় দুলীর। বাপের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে আরও খানিকটা জোরে ককিয়ে ওঠে সে: 'না—না, খাবো না।'

বাপের হৃদয়। মেয়ের কষ্টটুকু বুঝতে দেরী হয় না হারাণের। সান্ত্বনা দিয়ে বলে: 'লক্ষ্মী মা আমার, সারা রাত ক্ষিদেয় শেষে কষ্ট পাবে; একটু খেয়ে ন্যাও, কেমন?'

কথা বলে না দুলী।

যশোদা উঠে গিয়ে বার্লি গরম করে তার সাথে খানিকটা লেবুর রস আর নুন মিশিয়ে আনে।

শরীরের অবসাদে আর বিরক্তিতে চেঁচিয়ে ওঠে দুলী: 'দাও, দাও, এক বাটিতে ভরে এনে দাও, খেয়ে তোমাদের প্রাণ জুড়াই। আমি না মরলে আর শান্তি নাই তোমাদের, না?'

কথা শুনে বুকের ভিতরটা সহসা কেঁপে ওঠে হারাণ আর যশোদার। 'বাট, বালাই, ও কথা মুখে আনতে নেই!'

—এমনি করেই রাত কাটে।

একটু একটু করে ফর্সা হ'তে থাকে বাইরে, একটু একটু করে আলো দেখা দিতে থাকে হারাণের মনে। আবার দিন, সেই সোনালি সকালের ছবি ভেসে ওঠে। টাকা পয়সা কামাই করা এত কঠিন দুনিয়াতে!

কলের মজুরের মতো চলতে চলতে ছাউনের পথে পা চালায় হারাণ। কারুর উপর নজরটা তার আর রাখতে পারে না সে।

দূর থেকে ট্রেনের হুইসেলের শব্দ কানে আসে। খানিকটা সময় নিয়েই ঠিকঠিক ভাবে গাড়ি দাঁড়ায় প্লাটফর্মে। ডেলিপ্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসে এই গাড়ি। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে সব চাইতে বেশী ভিড় হয় এ গাড়িতে, তা ছাড়া আর একটা ভিড় দেখা যায় বেলা দুটোয়। ডিউটির ফেরৎ প্যাসেঞ্জারদের তাড়াহুড়ো তখন।

—একদৃষ্টে চেয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগে হারাণের। মনে হয়—সেও অমনি মতো কোথাও থেকে ফিরে ঘরে আসে, ঘরে আসে যশোদা আর দুলীকে নিয়ে। পাশের বাড়ীর চরণদাস বলেছিল—হাওয়া পরিবর্তন করলে দুলী অল্পদিনেই ভালো হয়ে যাবে। হারাণই কি জানে না তা, জানে, কিন্তু জেনেই বা কি হবে, সাধ্য আছে কি তার ঘর ছেড়ে এক পা-ও কোথাও নড়তে! মাস গেলে সাতাশটি টাকা মাত্র হাতে আসে। তিনটি প্রাণীর জীবন নির্ভর করে ঐ সাতাশটি টাকার উপরে। সাতাশটি বেলাও তাতে কাটে না। হাওয়া

গালের মধ্যে পানটা এতক্ষণে নিঃশেষ হয়ে গেছে। মুখের মধ্যে জিভ্‌টাকে বার কয়েক নাড়াচাড়া করলো হারাণ। ইচ্ছে হলো আর এক খিলি পান খায়, কিন্তু পয়সা নেই, একটিও আর পয়সা নেই ট্যাঁকে। আরও খানিকটা দ্রুত পা চালালো হারাণ বাড়ির পথে।

দেউড়ীর একপাশে বসে কুপি নিয়ে একটা ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করছিল যশোদা। স্বামীর পায়ের শব্দ পেয়ে কিছুটা মুখ উঁচিয়ে বলেঃ 'ধন্যি মরদ যা হোক তুমি। মেয়েটা নেবু নেবু ক'রে কেঁদে শেষে ঘুমোলো, আর এলে তুমি এই এতক্ষণে?'

মনে মনে বড় অনুশোচনা হলো একবার হারাণের। চিন্তা করে দেখ্‌লো, হ্যাঁ—সত্যিই বড় দেরী হ'য়ে গেছে তার ফিরতে; কিন্তু যশোদার উপরও অভিমান হলো বড় কম নয়। যে পরিশ্রমটা আজ সারা শরীরের উপর দিয়ে গেছে তার, তা ব'লে বুঝোবার নয়। কিন্তু তা নিয়ে একটুও কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করলো না যশোদা!—নীরবে ঘরে ঢুকে গায়ের ছেঁড়া পিরানটা খুলে রেখে মাটির উপরেই টান্‌টান হয়ে শুয়ে পড়লো হারাণ। কোমর আর হাঁটু দুটো যে কতখানি অসাড় হয়ে গেছে, তা বুঝলো সে এই এতক্ষণে।

কিছুক্ষণ কেটে গেলে হাতের কাজ গুটিয়ে রেখে যশোদা এসে একসময় বলেঃ 'বলি, উঠে খেতে হবে না নাকি, এরপর তো মেয়েটা জেগে আবার সারা রাত ভ'রে চ্যাঁচাবে!'

হারাণ তর্ক করে না, বলেঃ 'আমি তো আর ঘুমোইনি, দ্যাও না ভাত!'

যশোদার আজ কি হয়েছে বলা শক্ত। মনে মনে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে বসে গিয়ে সে একসময়।

ক্রমে রাত বাড়ে। ঝিঁঝিঁ ডাকে এপাশে ওপাশে। হারাণ মনে মনে একবার মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করে শব্দটা : স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়ালে ইঞ্জিনের যে শব্দ হয়, ঝিঁঝিঁ'র এই অবিশ্রান্ত ডাকের সাথে তার সম্ভবতঃ একটা সূক্ষ্ম মিল আছে। নিশুতি নিস্তব্ধ চারপাশ। পাশের বাড়ির চরণ দাসেরা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে না হতেই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। মন্দ নেই লোকটা; রাত জেগে বাতিতে তেল পোড়াবার দায় নেই।

রাত বাড়ে। ঝিঁঝিঁ'র অবিশ্রান্ত শব্দ হচ্ছে শুধু এপাশে ওপাশে। ক্রমে গভীর হয় রাত।

যশোদার কথা মিথ্যে নয়। সত্যিই এক-সময় জেগে ওঠে দুলী, কঁকিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। পুরো একমাস ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে সে। যশোদাও আর পারে না। এই একমাস ধ'রে অনবরত কেবল কাঁথার পর কাঁথা পাল্টিয়ে দিয়েছে সে মেয়ের পিঠের নিচে। রাতের পর রাত জেগে জেগে চোখের কোলে কালি জ'মে উঠেছে যশোদারও। ঠেলে একবার সে উঠিয়ে দেয় হারাণকে : 'উঠে দেখ না দুলী

ঘুমের চোখেই উঠে কমলালেবু দু'টো মেয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে আদরের সুরে হারাণ বলে : 'কি মা, কি হয়েছে? এই যে তোমার কমলালেবু, খাও।'

কতকটা শান্ত হ'তে চেষ্টা করে দুলী।

নরমভাবে মেয়ের মুখের উপর দিয়ে, গলার উপর দিয়ে আর বুকের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে হারাণ। —'লক্ষ্মী আমার, মা আমার, এবারে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি সেরে উঠে মাগুরের ঝোল দিয়ে ভাত খাবে আমার মা।........

দুলীর গলার কাছে এসে হঠাৎ একসময় হাতখানি থেমে যায় হারাণের। অন্ধকারের মধ্যেই কি যেন একবার খুঁজতে চেষ্টা করে সে।

দুলী কঁকিয়ে ওঠেঃ 'কি খোঁজো বাবা?'

স্ত্রীর উদ্দেশ্যে হারাণ বলে : 'একবার কুপিটা জ্বালো তো বউ।'

আধো ঘুমের মধ্যে হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠতে শোনা যায় যশোদাকে : 'যতো মরণ আমার।'

কিন্তু তার চাইতেও বেশী মরণ হারাণের। বলে : 'মরো না হয় পরে; দুলীর গলা থেকে হারটা গেল কোথায়?'

এবারে কতকটা চেতনা হয় যশোদার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই হঠাৎ উঠে ব'সে পড়ে সেঃ 'কি বল্লে, দুলীর হার?'

তাড়াতাড়ি কুপিটা জ্বালিয়ে নেয় যশোদা।

—'বাইরে কখনো পায়খানা টায়খানায় যেতে গিয়ে তো পড়ে যায় নাই?'

—'ওমা, সে কি কথা গো, সারা দিনে যে বিছানা ছেড়ে একবারও ওঠেনি দুলী। সন্ধ্যার আগেও যে ওকে পথ্য দিতে এসে হার দেখেছি গলায়।' চোখ দু'টো কপালে উঠে যায় যশোদার।

—'দুলী ঘুমিয়েছিল, তুমি রাঁধতে গেছলে—এমন সময় তবে কি কোনো পাড়া-প্রতিবেশী এসে ঘুরে গিয়েছিল ঘর থেকে?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে গিয়ে চোখ দু'টো কেমন টাটিয়ে ওঠে হারাণের।

—'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।' যশোদা বলে : 'তোমার নাম করে কে একজন মরদ এসে দেখে গেছ্‌লো দুলীকে। তোমার সঙ্গেই নাকি কাজ করে! আমি তখন পুকুরে থালা মাজ্‌তে যাচ্ছি।'

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখ দু'টো সহসা অন্ধকারে ভরে ওঠে হারাণের। বুঝতে বাকী থাকে না—কার এই দুষ্কৃতি! বিল্টু বলছিল—হাটের পথে একবার ঘুরে দেখে যাবে দুলীকে। তাকে কাল চুরি ডাকাতি করতে বলেছিল হারাণ। কিন্তু এ কি, আজ তার নিজের ঘরে এসেই কি দুলীর ঘুমের মধ্যে তবে হাত সাফাই ক'রে পালালো সে? এই জন্যেই কি হাটে গিয়েও তার দেখা মেলেনি? সহকর্মী বিল্টু, একই আড়তে আজ তিন বছর ধ'রে সকাল বিকেল কাজ করছে তারা একসঙ্গে। তার বিরুদ্ধে এমন কথা ভাবতেও যে অনেক ধিক্কারে মন ভেঙে যায়। শেষটায় বিল্টুর তো এই কাজ, দলপাঁড়ের কথা সে এমন ক'রেই তবে রক্ষা করলো? সেও তো বলছিল—তার বউয়ের কালাজ্বর! দুলীর এই হার দিয়ে কি তবে ওর অসুখ সারাবে? কিন্তু কেমন করে বিল্টুকে চোর বলে ধরবে সে, আসলে যে বিশ্বাসই হয় না একথা ভাবতে! চিরকাল চাপা লোক বিল্টু, কথা বলে মেপে জোকে। যদি অস্বীকার করে উল্টো অপমান করে, যদি মারমুখো হ'য়ে ওঠে তার উপর, তবে?

আর ভাবতে পারে না হারাণ। চোখ দুটো একদিকে জলে ভিজে ওঠে, আর একদিকে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলতে থাকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখায়। তাকিয়ে দেখে—তখনো বিদ্যুতের মতো স্তব্ধভাবে বসে আছে যশোদা। ক্লান্তিতে আবার কখন চোখ বুজেছে দুলী।

জন্য নানাবিধ ডাল, কলাই, বাদাম এবং বিভিন্ন তৈলবীজের মধ্যে তিল, চীনাবাদাম, সরিষা, সুরগুজা, তিসী, নারিকেল, সয়াবীন প্রভৃতি বুনিয়া আসিতেছে। জান্তব খাদ্যের মধ্যেও গোরু বা মহিষের মাংসের পরিবর্তে তাহারা দুধ অথবা দুগ্ধজাত বিভিন্ন দ্রব্য এবং ছাগল, হাঁস, মুরগী, শূকর ও মাছের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়াছে। কারণ এই সকল জীবজন্তু সহজে বৃদ্ধি পায় অথবা সকলের জন্য সমান যত্নের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ যুদ্ধের চাপে জার্মানি যে পথ ধরিতে বাধ্য হইয়াছিল, এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ একই পথ বহুকাল পূর্বে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

**ভারতবর্ষে তেলের ব্যবহার এবং তেলী জাতির বিবরণ**

যাহাই হউক, উপরোক্ত খাদ্যোৎপাদনের ব্যবস্থা বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, ইহা বলাই আমার উদ্দেশ্য। যদি কোন শিল্প এক বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাপিয়া চলিতে থাকে, তবে কালবশে সেই দেশের বিভিন্ন অংশে শিল্পের সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের মধ্যে তেল বাহির করিবার যন্ত্রের মধ্যে এইরূপে কি কি প্রভেদ দেখা দিয়াছে সে বিষয়ে আলোচনা করিলে আমরা অনেক শিক্ষার বস্তু পাইব।

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম, বাঙলা, ওড়িশা, মাদ্রাজ, বোম্বাই অঞ্চলে তেলের ব্যবহার বেশি; কিন্তু স্থানভেদে বিভিন্ন তৈলের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কোথাও সরিষা, কোথাও তিল, কোথাও চীনাবাদাম, কোথাও নারিকেল, কোথাও বা তিসীর তেলের চলন আছে। বিহার প্রদেশ হইতে আমরা যত উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হই, ততই তেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাছেরও ব্যবহার দ্রুত কমিয়া আসে; তৎপরিবর্তে ঘি এবং দুধের চলন বৃদ্ধি পায়। একেবারে কাশ্মীর রাজ্যে পৌঁছিলে তবে আবার মাছ ও তিসীর তেলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে তেলের ব্যবহার তুলনা করিলে মনে হয়, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তরকালে যে সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে মাছ এবং তেলের ব্যবহার ছিল না। তেল বোধ হয় পূর্বতন ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ লক্ষণ ছিল, এবং সেই কারণে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশে ইহার ব্যাপক প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে সকল প্রদেশ তৈল প্রধান, সেখানে তৈল নিষ্কাশনের জন্য নানাবিধ কৌশল ও নানাপ্রকার যন্ত্রের ব্যবহার আছে। কোল-সংস্কৃতির আলোচনাকালে আমরা বাহির করার এক রীতির বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছিলাম। কোলদের মধ্যে ইহাও দেখা গিয়াছিল যে, ঘানির সাহায্যে তেল বাহির করিবার সময়ে নিকটে তেলী না থাকিলে তাহারা নিজেই ঘানি চালায় বটে, কিন্তু পাছে জাত যায়, এই ভয় ঘানিতে বলদ না জুতিয়া নিজেরাই ঘানি ঘুরাইয়া থাকে। তেলী জাতি হিন্দুসমাজে অজলচল ছোট জাতি বলিয়া গণ্য, সেই জন্য জাতিনাশের ভয়ে অথবা পতিত হইবার আশঙ্কায় অপরে তাহাদের বাড়ি কিছুতে গ্রহণ করিতে চায় না।

কিন্তু সামান্য অনুসন্ধান করিলেই টের পাওয়া যায় যে, বাঙলা, ওড়িশা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে তেলীদের সামাজিক পদ সর্বত্র সমান নহে। ওড়িশার উত্তরভাগে সরাইকলা নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। সেখানে পূর্বদিক হইতে বাঙলাভাষা, পশ্চিম দিক হইতে হিন্দী এবং দক্ষিণ দিক হইতে ওড়িয়াভাষা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। তৈল নিষ্কাশনের ঘানিও সরাইকলাতে তিন প্রকারের প্রচলিত রহিয়াছে।

১। দুইটি বলদে টানা, নালীহীন একখণ্ড কাঠের ঘানি;

২। এক বলদে টানা, নালিযুক্ত, একখণ্ড কাঠের ঘানি;

৩। এক বলদে টানা, নালিযুক্ত, কিন্তু দুইখণ্ড কাঠে নির্মিত পিড়ি [illegible] ঘানি।

১। প্রথম ঘানি গাছটি একখণ্ড শালকাঠে তৈয়ারি। ইহা ভূমির উপরে প্রায় দেড় হাত ও নীচে তিন চার হাত বা আরও বেশি পোঁতা থাকে। ঘানিগাছের মাথায় যে খোল কাটা থাকে, তাহা কতকটা কলসীর ভিতরের মত। ইহা তেলী স্বয়ং কাটিয়া লয়, ছুতারের সাহায্য গ্রহণ করে না। অনেকদিন ব্যবহৃত হইলে উপরের অংশ ক্ষয়ে যায়, তখন একটা কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন খোল নির্মাণ করিয়া লইতে হয়।

যন্ত্রের নাম **ঘনা**। যে দণ্ডের দ্বারা বীজ পেষা হয় তাহার নাম লাঠি। যে পাটায় বলদ দুইটি জোড়া থাকে তাহাকে **পাঁজার** বলে। পাঁজারির সহিত বাঁশপাতি নামক অপর একখণ্ড কাঠ জোড়া থাকে, তাহার বাঁকা মুখের নাম **মগরমুহি**। পাঁজারিতে **ইসের** সাহায্যে **জোয়াল** বাঁধা হয়। পাঁজারির উপরে খাড়া **মালকুম** দণ্ড, তাহাতে দুই তিনটি ছিদ্র থাকে। মালকুমের উপরিভাগের সহিত **বাঁকিয়া** নামে একটি বাঁকা কাঠ থাকে, তাহার মধ্যে একটি খোপে লাঠির উপরাংশ বসিয়া যায়। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে **শাবল**, ইহার মুখ ঈষৎ বাঁকা। তাই খইল কুরিয়া কুরিয়া তুলিবার সুবিধা হয়। আর **কাঠি** নামক এক খণ্ড কাঠে কিছু ময়লা ন্যাকড়া ফালির মত বাঁধা থাকে; তাহার সাহায্যে ঘানির গর্ভ হইতে তেল শুষিয়া বাহির করা হয়।

বীজগুলিতে প্রথমে ঈষৎ জল মাখাইয়া ঘানিতে দেওয়া হয়। পাঁজারির উপরে ভারি পাথর চাপানো হয়; যে চালায় সেও ইহার উপরে দাঁড়াইয়া বলদ হাঁকাইতে থাকে। কিছুক্ষণ পেষার পর তেল জমিলে, শাবলের সাহায্যে খইলের উপরাংশ ভাঙিয়া কাঠির ন্যাকড়ার সাহায্যে তুলিবার পর, সেই তেল একটি ভাঁড়ে সংগ্রহ করা হয়।

যে তেলীরা দুই বলদের ঘানি চালায়, তাহারা বলে যে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে তাহাদের জল গ্রহণ করে; কথাটা ঠিক নয় বলিয়াই আমার মনে হইয়াছে। যাহাই হউক, ইহাদের জাতির নাম তেলী, পদবী পাড়িহারি। ইহারা ঘানিতে কখনও এক বলদ জোতে না, বলদের চোখে ঠুলি দেয় না, ঘানিতেও কখনও ছিদ্র করে না।

২। ঘানিগাছ মাটির উপরে দেড় হাত [illegible] বাহির হইয়া থাকে, নীচে দুই হাত পোঁতা [illegible]। উপরে প্রথম ঘানির মত খোল কাটা থাকে, তাহার নীচের দিকে একটি গর্ত দিয়া নালি পথে তেল চুয়াইয়া বাহির হয়।

ঘানির নাম **ঘানা**। যে নালিপথে তেল বাহির হয় তাহার নাম **নেরিও**। নীচে **গাড়** থাকে। [illegible] নাম **লাঠিম**। [illegible] মাটি হইতে উপরে থাকে, ইহাকে **কাতের** [illegible] [illegible] [illegible] **ঢেঁকা**। [illegible] [illegible] **জোয়াল**। [illegible] **গাঁজ** [illegible]

[illegible]

(ক) দো-বলদিয়াদের লাঠি লম্বা, [illegible] বলদিয়াদের ছোট, মাত্র দুই হাত। [illegible] ইহারা ঘরের মধ্যে ঘানি চালাইতে [illegible] দো-বলদিয়ারা পারে না। দো-বলদিয়ারা [illegible] বলদের চোখে ঠুলি বাঁধে না, ইহারা [illegible]

(খ) যে পাটায় চালক চাপিয়া [illegible] হাঁকায় তাহা দো-বলদিয়াদের ক্ষেত্রে [illegible] প্রায় ঠেকিয়া থাকে, এক বলদিয়াদের [illegible] সম্ভব নয়, তাহা হইলে গাড়ু ভাঙিয়া যা[illegible]

(গ) উভয় জাতির মধ্যে **সাগা** অর্থাৎ [illegible] বিবাহ প্রচলিত আছে।

৩। তৃতীয় যন্ত্রটিও এক বলদে [illegible] যন্ত্রের নাম ঘানা। উপরে আলাদা কাঠে [illegible] জামবাটির আকারের এক বৃহৎ অংশ [illegible]

তাহার নাম **পিঁড়ি**। পেষণদণ্ডের নাম **জাঠ**। জাঠের উপরাংশে একটি সুদৃশ্য **বাঁকা** কাষ্ঠখণ্ড আটকানো থাকে, তাহার নাম **মার্কাড়ি**। মার্কাড়ির পিছনে ছিদ্র, তাহার ভিতর দিয়া দাঁড়ি গলাইয়া মথমখুঁটার সঙ্গে আটকানো আছে। মথমখুঁটা পাটার উপরে খাড়া দাঁড়াইয়া থাকে। পাটার যে প্রান্ত ঘানার গায়ে ঘষিয়া যায় সেখানে গোলোই নামে একটি কাঠের টুকরা জোড়া থাকে। ঘানার নীচে যে স্থান দিয়া তেল বাহির হয় তাহার নাম পাৎনালি। তলায় **ভাঁড়ে** তেল জমে। ঘানির মধ্যে বীজকে নাড়িয়া দিবার জন্য একটি কাঠি আটকানো থাকে, তাহাও ঘোরে। ইহার নাম **সাঁকনি**। গোরুর চোখে চামড়ার **ঠুলি** থাকে। গোরুকে জুতিবার জন্য **জোয়াল**। জোয়াল পাটার সঙ্গে একটি আড়াআড়িভাবে বাঁকা কাঠি দিয়া সংলগ্ন থাকে, তাহার নাম **কাইনুড়ি**।

তৃতীয় শ্রেণীর ঘানি যাহারা চালায়, সেই কলুদের মতে শালের চেয়ে অশ্বত্থ, বট বা নিম কাঠের ঘানিই ভাল। অথচ এদেশে শালকাঠ সহজলভ্য এবং অপর তেলী জাতি দুটি শালের ঘানিই করিয়া থাকে। হয়ত তৃতীয় শ্রেণীর কলুজাতি যে দেশ হইতে আসিয়াছিল, সেখানে শাল কাঠের অভাব থাকায় ইহাদের পছন্দ অন্য কাঠের উপরেই হইয়াছে।

নারাণপুর গ্রামে ঘাসিরাম গরাঁই এবং [illegible]শ্বর গরাঁই নামে দুইজন কলুর নিকট [illegible] তেলীদের গোরাঁইদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় নিম্নলিখিত সংবাদ পাওয়া গেল।

(ক) 'আমরা একাদশ তেলীর অন্তর্গত, [illegible] কলু। এই গ্রামে দ্বাদশ তেলীর অন্তর্গত লোকও আছে; তবে তাহারা তেল পেষে না; ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আমরা রাঢ়ী কলু অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর, কেননা আমাদের পূর্বপুরুষেরা দ্বিতীয় বিবাহ, অর্থাৎ বিধবা-বিবাহের চলন করিয়া গিয়াছিলেন।

(খ) 'মাণিকবাজারের দুই-বলদওলা তেলী এবং সুরতাডির এক-বলদওলা তেলীদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। উহারা উভয়েই উড়িষ্যা বিভাগের লোক। আমরা পূর্ববঙ্গের লোক [অর্থাৎ পূর্বদিকে অবস্থিত বঙ্গদেশের, বাংলার পূর্বাঞ্চলের না।] এখানে তিন-চার পুরুষ বসবাস করিতেছি। শিখরভূম হইতে আসিয়াছিলাম। [শিখরভূম মানভূম জেলায় বরাহভূমের পূর্বদিকে অবস্থিত।]

(গ) 'সুরতাডির উহাদের সহিত আমাদের [illegible] চলে না। উহারা কুঁকুড়া ও মদ খায়। উহারা বোধ হয় মগহিয়া।' [মগধ বা বিহার দেশের লোক।]

কয়েকদিন পরে পুনরায় সুরতাডি গ্রামে এক-বলদিয়া তেলীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নারাণপুরের কলুদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। তখন ধনু গোরাঁই বলিল, নারাণপুরের বাঙালী শাহীর [বাঙালী পাড়ার] উআরা শিখুরিয়া [শিখরভূমের অধিবাসী] বটে। উআদের ঘানিতে পিঁড়ি আছে, আমাদের নাই।'

## তেলীদের সম্বন্ধে আলোচনা

এইবার সড়ইকলাতে প্রচলিত তিন প্রকার ঘানি কোথা হইতে আসিল তাহার সন্ধান লওয়া যাক। দো-বলদিয়া এবং এক-বলদিয়া তেলীর মধ্যে বিধবা-বিবাহের চলন আছে। তন্মধ্যে মদ ও মুরগীর মাংস ব্যবহার করার জন্য এক-বলদিয়া গোরাঁই কিছু নিম্নশ্রেণীর। পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানির চালক কলুরা অজলচল হইলেও মগহিয়াদের চেয়ে নিজেদের বড় মনে করে, কেননা তাহাদের মধ্যে মদ ও মুরগীর চল নাই। তব তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথা বর্তমান থাকায় তাহারা রাঢ়ী শ্রেণীর তেলী এবং দ্বাদশ তেলী অপেক্ষা নিজেদের ছোট বলিয়া মনে করে।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রচলিত ঘানির বর্ণনা ও বিভিন্ন অংশের নাম পাওয়া যায় না। তবে গ্রিয়ার্সন সাহেব 'বিহার পেজ্যাণ্ট লাইফ' নামক গ্রন্থে সেই প্রদেশের ঘানির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার সহিত সড়ইকলার এক কাঠের, নালিযুক্ত ঘানির অনেক মিল আছে। এখানে যাহা ঘানা বিহারের তাহা **কোলহু**। বিহারে ঘানী না ঘান বলিতে ততখানি তৈলবীজকে বুঝায় যাহা এক চক্করে কোলহুর মধ্যে পেষার জন্য দেওয়া হয়। ঘান বলিতে বিহারী ভাষায় উদুখলে বা যাঁতায় একবারে যত শস্য ধরে, অথবা কড়াতে যতখানি জিনিস চাপানো হয়, তাহাকেও বুঝায়। সড়ইকলার নেরিও বিহারে **নিরোহ্ বা নারাহ**। কাতের বিহারে **কংরী** নামে পরিচিত। লাঠিম কিন্তু বাংলাদেশের মত **জাঠ** নাম ধরিয়াছে। এক-বলদিয়াদের ঢেঁকা বিহারে **ঢেকা বা ঢেকুআ**। গাড়ু কিন্তু **ছনা**। অর্থাৎ বিহারের সহিত তথাকথিত মগহিয়া তেলীদের ঘানির নাম অনেক মেলে, কিছু মেলে না।

শুনিয়াছি এককাঠে তৈয়ারি ঘানি পূর্ব-বঙ্গে নোয়াখালি অথবা শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলাতেও প্রচলিত আছে, তবে সেখানকার বিভিন্ন অংশের নাম সংগ্রহ করা হইয়া উঠে নাই।

দুই-বলদের ছিদ্রহীন ঘানি পুরী জেলার মফঃস্বলে, গঞ্জাম জেলায় চলতি আছে। হুগলীর আরামবাগ মহকুমায় নাকি এইরূপ দু-একটি খানি এখনও চলে। গুজরাটের ঘানি এই ধরণেরই।

নারাণপুরের কলুরা স্পষ্টই নিজেদের বাঙালী বলিয়া পরিচয় দেয়। নদীয়া জেলা বা চব্বিশ পরগণায় পিঁড়ি বিশিষ্ট ঘানিরই চলন। হুগলী, বর্ধমান, বীরভূমেও তাই। অন্যত্রও থাকিতে পারে, তবে সমগ্র ভারত-বর্ষের শিল্পসরঞ্জামের খুঁটিনাটি বর্ণনা কেহ হয়তো সংগ্রহ করেন নাই, তাই তুলনা বা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আহরণে আমাদিগকে পদে পদে অসুবিধায় পড়িতে হয়।

সড়ইকলার তেলীদের সম্বন্ধে সামান্য অনু-সন্ধানের ফলে দেখা গেল যে তেলী জাতি নানা শাখায় বিভক্ত। প্রত্যেকের ঘানিতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; তাহা ছাড়া খাওয়াদাওয়া, বৈবাহিক আচারের মধ্যে শাখায় শাখায়

তারতম্য লক্ষিত হয়। বিভিন্ন শাখার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কেহ ওড়িশাবাসী, কেহ বিহারের সহিত সম্পর্কিত, কেহবা বাঙলাদেশ হইতে আসিয়াছে। প্রত্যেকে শিল্প-কলার সম্বন্ধে স্বীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলে এবং পরস্পরের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। নিজের শাখার মধ্যে সর্ববিধ বৈবাহিক সম্পর্ক সংকুচিত করিয়া রাখা, প্রতি জাতি বা উপজাতির সাধারণ লক্ষণ।

অথচ দুইটি এক-বলদিয়া ঘানির মধ্যে যে খুব বেশী প্রভেদ আছে, তাহাও নয়। পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানি যদি পশ্চিমবঙ্গে আবদ্ধ থাকে এবং এক কাঠের ঘানি একদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং অপরদিকে বিহারে বা আরও পশ্চিমে বিস্তৃত থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, এক কাঠের ছিদ্রযুক্ত ঘানি অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং পিঁড়িযুক্ত ঘানি পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয় বলিয়া সর্বত্র তাহা এখনও ছড়াইয়া পড়ে নাই। দুই-বলদযুক্ত ছিদ্রহীন ঘানি এবং এক-বলদযুক্ত সছিদ্র ঘানি ভারতের ঠিক কোন্ কোন্ জেলায় প্রচলিত তাহা জানিতে পারিলে উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক কি ছিল, তাহা অনুমান করা সম্ভব হইবে।

যাহাই হউক, তেলীদের মধ্যে শিল্প-সরঞ্জামের রূপ ও ব্যবহার ভেদে এবং সামাজিক বা আহার সম্পর্কীয় প্রথার তারতম্য-হেতু যে কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়। হয়ত বিভিন্ন অঞ্চলে আবদ্ধ থাকার সময়ে শিল্পের উৎকর্ষ বা উচ্চ শ্রেণীর আহার বিহার বা সামাজিক প্রথা অনুকরণ হেতু এই সকল উপজাতি উদ্ভূত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। উরাওঁ এবং কোল সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণ্য শুদ্ধাচার গ্রহণ করার ফলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শাখার উদ্ভব ঘটিয়াছিল, কিন্তু যে সকল শাখার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যুত্র নাই; কেবল ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন টানা-ভগৎদের বেলায়, তাহার উপক্রম দেখা গিয়াছিল। তেলী শ্রেণীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে কিন্তু সেরূপ বিবাহ সম্পর্কের অভাব দেখা যায়।

অতএব ভারতবর্ষের সমাজে যাহারা জাতিভেদ মানিয়া চলে তাহাদের মধ্যে আহার-বিহার বা সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে কোনও নূতন প্রথার প্রবর্তন ঘটিলে, অথবা শিল্প-কৌশলে কোনও পরিবর্তন বা উৎকর্ষ সাধিত হইলে সংগে সংগে স্বতন্ত্র এক শাখার উৎপত্তি ঘটিতে পারে, আমরা জাতিতত্ত্বের সম্বন্ধে অন্তত এইটুকু শিখিলাম। কিন্তু জাতিতত্ত্বের ইহাই সবটুকু নয়।

(ক্রমশঃ)

ব্যবসা বাণিজ্য

# শিল্পের জাতীয়করণ

শ্রীঅচিন্ত্য রায়

বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার যে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রের ছিল তাহা বিংশ শতাব্দীর যুগে নিশ্চয়ই প্রসারিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্মশক্তি এই দুইটি বিশেষ দায়িত্ব ছাড়া অন্যান্য নানা বিষয়ের উপরও বিস্তার লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের যুগে কলা, সাহিত্য, শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষি, শিল্প পণ্যোৎপাদনের প্রায় ব্যাপক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। পণ্যোৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পুরোপুরি কর্তৃত্ব হউক—ইহা এই যুগের খুব স্বাভাবিক দাবী।

জাতীয়করণ বলিতে আমরা কি বুঝি? দেশের জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আনা। এক-কথায় পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে Private ownership ও Private Management-এর দাবীকে উপেক্ষা করা। বণ্টন-প্রণালীতে যে দারুণ বৈষম্য বর্তমানে সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই নির্মম অপব্যবস্থা হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টাই জাতীয়করণ নীতির মূল লক্ষ্য থাকে। তাহা ছাড়া শিল্পপতিরা তাহাদের বৃহৎ শিল্পের নানাবিধ সুখ-সুবিধা যাহাতে তাহাদের শ্রেণীগত স্বার্থে নিয়োজিত করিতে না পারেন, পক্ষান্তরে উহা দেশের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে, এই প্রকার উদ্দেশ্য জাতীয়করণনীতির লক্ষ্য থাকে। প্রধানত এই দুইটি বিশেষ যুক্তির উপর জাতীয়করণের সমর্থকগণ জাতির সমস্ত শিল্পের উপর রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকারের দাবী উপস্থাপিত করেন।

বর্তমানে প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল দেশগুলিই সমাজতন্ত্রী নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। এমনকি পুরাতন পন্থায় বিশ্বাসী বৃটেনও আজ জাতীয়করণের নীতিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং জাতির বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হইবার পর—কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ জাতীয়করণ তাহাদের অন্তিম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণায় ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের গঠন পরিকল্পনায় কংগ্রেসের চিরন্তন নীতি অর্থাৎ ভারতবর্ষে কৃষাণ-মজদুর রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতিই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু জাতীয়করণ প্রশ্নটির এই রাজনৈতিক পটভূমিকা বাদ দিলেও ইহার গুরুত্ব মোটেই কমে না। ভারতবর্ষের এই আর্থিক সংকটজনক মুহূর্তে জাতীয়করণ প্রশ্নটীর নিরপেক্ষ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমরা মনে করি এবং এই আলোচনায় আমরা সর্বপ্রকার ভাবালুতার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিব।

একথা অবিসংবাদীরূপে সত্য যে, পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বিশিষ্ট দেশগুলি হইতে এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষকে শিল্প প্রসারের যে চূড়ান্ত সুযোগ দিয়াছিল, ভারতবর্ষ তাহার চরম সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে পণ্যোৎপাদনের হার বাড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু স্থায়ীভাবে কোন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। যুদ্ধ সমাপ্তির পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দুই বৎসরে পণ্যোৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক আমরা গভীর আশংকার সহিত ইহার ক্রমাবনতিই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। 'দেশের' ১৭ই মাঘের সংখ্যায় শ্রীমনকুমার সেন এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা বর্তমানে গভীর আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়া চলিতেছি। পণ্যোৎপাদনের বিরাট উন্নতিই আমাদের এই সংকটের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "উৎপাদন কর নতুবা ধ্বংস অনিবার্য"। তাঁহার এই সতর্ক বাণী সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত। পণ্যোৎপাদনের এই গুরুতর দিকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াই জাতীয়করণ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তে গ্রহণ করিতে হইবে। শিল্প-পণ্যোৎপাদন বাড়াইতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রমিকদের বৃহত্তর স্বার্থ অর্থাৎ বিরাট মুনাফার সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টনের কথা অবহেলা করিবার নয়। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়া গেলে অন্যায় হইবে। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমাজবাদী নেতা এম আর মাসানীর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, উৎপাদনের পরিমাণ না বাড়াইয়া বণ্টন ব্যবস্থায় সুসামঞ্জস্য আনয়ন করার কোন অর্থই হয় না। ভারতবর্ষে বর্তমানে জাতীয় উপার্জনের (National Income) যে পরিমাণ তাহা যথাযথভাবে (equally) বণ্টিত হইলেও জনপ্রতি মাসিক এগার টাকার বেশী পড়ে না। এই প্রকার ন্যায়সম্মত বণ্টন ব্যবস্থাও আমাদের দুঃখ-দুর্দশার সুরাহা নিশ্চয়ই করিতে পারে না। সুতরাং সুবণ্টনের পূর্বে চাই উৎপাদনের হার বৃদ্ধি। আমাদের পণ্যোৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদের কোন্ নীতি অবলম্বন করা উচিত, তাহা এখন বিচার্য। আমাদের সামনে দুইটি দেশ দৃষ্টান্তস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে—আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাশিয়া।

সোভিয়েট রাশিয়াতে সর্বপ্রকার উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের পুরোপুরি কর্তৃত্ব আছে। আর আমেরিকাকেও আমরা ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থার (Private enterprise) আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। শিল্প প্রসার ও উৎপাদন হারের তুলনামূলক আলোচনা করিলে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক উপরে আমেরিকার স্থান। যুদ্ধোত্তর ইউরোপকে দারুণ আর্থিক সংকট হইতে রক্ষা করিবার গুরুদায়িত্বভার নিতে আমেরিকা আজ প্রস্তুত। অবশ্য এই কারণেই আমেরিকাকে আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। কিন্তু উপরোক্ত কথাগুলি আমাদের পথ-নির্দেশ করিতে সাহায্য করিতে পারে, তাই ইহার উল্লেখ করিলাম। অবশ্য শিল্পসমূহ রাষ্ট্রীয় অধিকারভুক্ত হইলে এবং রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উৎপাদন কার্য চালিত হইলেই যে উৎপাদন হার কমিয়া যাইবে এইরূপ আশংকার বিশেষ কোন কারণ নাই। তবু বর্তমান সময়ে শিল্পসমূহ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আসিলে পণ্যোৎপাদন কার্য যে কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হইবে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পণ্যোৎপাদনে প্রথম প্রয়োজন মূলধনের। বলাবাহুল্য ভারত ব্যবচ্ছেদের পর কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয়-সংকুল বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্যে জড়াইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব বাঙলা হইতে আগত অসংখ্য আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি কার্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। কাশ্মীরের সামরিক কার্যাবলীতেও কম অর্থ ব্যয়িত হইতেছে না। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে বিরাট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বৃহৎ স্টার্লিং জমার বৃহত্তর অংশ এখনও বন্দীদশায় আছে। উহার কিছু অংশ আমাদের ব্যবহারের অধিকারে আসিলেও শিল্প প্রসারের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রয়োজন, তাহা ক্রয়ের জন্যই নিঃশেষ হইবে। এ কথাও অনস্বীকার্য যে, সোভিয়েট রাশিয়ার মত রক্তাপ্লুত অভিযানের মধ্য দিয়া আমাদের দেশে শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ হইবে না এবং তাহা বাঞ্ছিতও নহে। দেশে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্পপতিদের অর্থে ও শ্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে ঐগুলি রাষ্ট্রভুক্ত করিতে হইলে

তীরের লোকেরা বলে "খা-ই" (খেয়েছি), "আ-ই" (আহি=আসি), দক্ষিণ তীরের লোকেরা বলে "খায়্", "আয়্"। সমগ্র চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের সাথে মুসলমানদের মেলামেশা বেশী বলেই বৌদ্ধ-সমাজে মুসলমানদের ব্যবহৃত অনেক শব্দ দৃষ্ট হয়; যথা,—"চাচা", "চ-অ-ত ভাই" (চাচাত ভাই=খুড়তুতো ভাই), "হাজন্যা," "হাঁজন্যা", "হাঁঝুন্" (সাঁঝ)। হিন্দু সমাজে এ সকল শব্দ দৃষ্ট হয় না; হিন্দুরা "কাকা", "খুড়া", "খো—ত ভাই", "হন্ধ্যা" (সন্ধ্যা) শব্দ-ই ব্যবহার করে। কর্ণফুলীর উত্তর তীরবর্তী স্থান মুসলমান-প্রধান হ'লেও হিন্দু এবং বৌদ্ধগণ তা'দের আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। বৌদ্ধদের কথায় হিন্দুদের প্রভাবও লক্ষিত হয়। কর্ণফুলী ও শঙ্খ-নদীর মধ্যস্থিত অঞ্চলের কিয়দংশ হিন্দু-প্রধান হওয়ায় ঐ অঞ্চলের বৌদ্ধদের কথা কিঞ্চিৎ হিন্দুভাবাপন্ন। শঙ্খ-নদীর দক্ষিণে নাফ্ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সাতকানিয়া, চকরিয়া, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, রামু প্রভৃতি স্থানের ভাষার সাথেও মধ্য অঞ্চলের ভাষার কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই অঞ্চলের বৌদ্ধদের সাথে মুসলমান ও আরাকানীদের মেলামেশাটা বেশী হওয়ায় তা'দের ভাবায় মুসলমান ও আরাকানীদের ভাষার প্রভাব রয়েছে। এই অঞ্চলের হিন্দুদের উচ্চারণেও সামান্য বৈশিষ্ট্য আছে। চট্টগ্রামের ভাষা সমগ্র চট্টগ্রাম জিলাবাসীদের ভাষা; কিন্তু নোয়াখালীর পার্শ্বস্থিত অঞ্চলের ভাষা নোয়াখালীর ভাষার-ই অঙ্গ-বিশেষ বলে তা'কে সাধারণতঃ চট্টগ্রামের ভাষা বলে না! এইখানে অবশ্য রয়েছে জনসাধারণের মানসিক সংকীর্ণতা। এই কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ঐ অঞ্চলের ভাষা চট্টগ্রামের ভাষার ইতিহাসের এবং বিবর্তনের পূর্ববর্তী স্তর।

চট্টগ্রামের ভাষা সম্বন্ধে লিখতে গেলে সম্প্রদায়-বিশেষের ব্যবহৃত ভাষাও লক্ষ্য করবার বিষয়। চট্টগ্রামে প্রধানতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান, এই তিন সম্প্রদায়ের বাস। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের আপন আপন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক-ই ভারতীয় আর্য-ভাবধারার (Indo-Aryan thought) উত্তরাধিকারী বলে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সম্প্রদায়। মুসলমানগণ সেমিটিক (Semitic) ভাবধারার উত্তরাধিকারী। তাই তা'দের সাথে হিন্দু ও বৌদ্ধদের পার্থক্য রয়েছে অনেক। আবার নানাকারণে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে মেলামেশা একটু বেশী; তাই বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান,—এই তিন সম্প্রদায়ের ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, হিন্দুদের কথা একটু মোলায়েম, মুসলমানদের কথা একটু রুক্ষ, আর বৌদ্ধদের কথা রুক্ষ-মোলায়েমের সমাবেশ; যথা, (হিন্দু)—"কডে য-অ-জ্জে" (কোথায় যাচ্ছ বা যাচ্ছিস যে); (মুসলমান)—"কন্ডে য-অ-দ্দে"; (বৌদ্ধ)—"কডে য-অ-দে" (কোথায় যাচ্ছ যে), কডে য-অ-দ্ধে (কোথায় যাচ্ছিস যে)। সম্প্রদায় হিসাবে ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করবার সময় দেখা যায়, মুসলমানদের ভাষায় ফারসী, আরবী ও উর্দুর প্রভাব বেশী। হিন্দু ও বৌদ্ধদের ভাষায় এ সকল ভাষার প্রভাব আছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের প্রভাব-ই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আবার বৌদ্ধদের ভাষায় বার্মার ও আরাকানের অনেক শব্দ আছে; যথা,—"ক্যাং" (Kyaung; বৌদ্ধ মন্দির), "থাগা" (দায়ক, Buddhist layman), "ফরা" (বুদ্ধ), "ফরাদাং" (বুদ্ধমূর্তির জন্য নির্মিত উচ্চ আসন)। বৌদ্ধদের কথায় এমন কতকগুলি ভারতীয় শব্দ আছে যা' অন্য কোন সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত হয় না; যথা,—"অমগধ" (non-Magadhan; বৌদ্ধদের কাছে এ'টা একটা তিরস্কার বিশেষ, কারণ তা'দের বিশ্বাস তা'রা মগধ দেশীয় বৌদ্ধ); "হাঁজোয়া" (আর্যমা, শাশুড়ী)। চট্টগ্রামের তিন দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের শতকরা ছিয়ানব্বই জনেরও বেশী লোক বৌদ্ধ। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ না থাকলেও ধর্মের ভিতর দিয়ে মিলনের যোগসূত্র থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের ব্যবহৃত কয়েকটা শব্দও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের কথায় দৃষ্ট হয়; তবে সংখ্যায় তা' খুব-ই কম। বলা বাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শ্রেণীর লোকদের ব্যবহৃত অনেক শব্দ চট্টগ্রামের তথা বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলীর বিকৃত রূপান্তর। চট্টগ্রামের হিন্দুদের কথায় অনেক শব্দ আছে, যা' মূলতঃ ভারতীয় হ'লেও বৌদ্ধদের কথায় সচরাচর দৃষ্ট হয় না; যথা,—"আহ্নিক", "হন্ধ্যাইল্যা" (সন্ধ্যাকালে), "পা-আ-লি" (প্রক্ষালি', প্রক্ষালিয়া), "মু'" (মুখ) "মুআন্" (মুখখান, মুখখানা)। বস্তুতঃ এর মূলে আছে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আচার ও ধর্মশাস্ত্রের ভাষার প্রভাব। চট্টগ্রামের হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানের ভাষায় আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে যা' দৈনন্দিন জীবনে সব সময়েই দৃষ্ট হয়; যথা, (হিন্দু) "বাজু" (জামা), (বৌদ্ধ ও মুসলমান)—"কোর্তা", "কোত্তা"; (হিন্দু)—"পী" (পিসি, 'প'-এর উচ্চারণ সামান্য (aspirated), (বৌদ্ধ)—"পিয়াই", (মুসলমান) — "ফু-উ" (ফুফু); (হিন্দু)—"মু-ই" (মাসী), (বৌদ্ধ)—"মই", (মুসলমান)—"খালা"। চট্টগ্রামের হিন্দুদের মধ্যে যা'রা কৈবর্ত শ্রেণীর লোক তা'দের উচ্চারণ লক্ষ্য করবার বিষয়। তা'ছাড়া তা'দের ব্যবহৃত শব্দেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যথা, —"টিয়া," "টি'য়া" (টাকা), "পুয়া" (পোলা)। আবার মুসলমানদের মধ্যে "কাহার" শ্রেণীর লোকদের কথায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা'নিয়ে চট্টগ্রামের লোকেরা অনেক সময় হাসি-তামাসাও করে।

চট্টগ্রাম বহুজাতির মিলন-স্থান। চট্টগ্রামের মাটির সাথে মিশে আছে মোগল, পাঠান, তুর্কী, বার্মিজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ইংরাজ। জ্ঞানের বর্তিকা, জলদস্যুর নির্মম অত্যাচার, বিজেতার রক্ত-রাঙ্গা অসি, বণিকের মানদণ্ডের রূজদণ্ডরূপ, কিছুই ভুলে নাই এই চট্টগ্রাম জেলা। তা'দের স্মৃতির কুসুম গাঁথা আছে চট্টগ্রামের শব্দ-মালায়। যথা,—

**ফারসীঃ**—"ছিবাই" (সিপাই), "দরবার", "তক্ত", "তোপ", "শিয়ার" (শিকার), "সরগার" (সরকার), "শ-অ-র" (শহর), "ম-অ-দ্দমা" "ম-অ-দ্দিমা" (মোকদ্দমা), "শা-আ-রিদ্" (শাগরেদ), "কারচু", "ক-অ-জ", "কা-য়-জ্" (কাগজ) ইত্যাদি।

**তুর্কীঃ**—"দারগা" (দারোগা), "বা-আ-দুর" (বাহাদুর), "ব-অ-চ্চী," "ব-অ-ন্তী" (বাবুর্চী), "লাশ" ইত্যাদি।

**পর্তুগীজঃ**—"নুনা" (নোনা), "বাল্‌টি" (বালতি), "মিস্তিরী" (মিস্ত্রী), "পাঁউর্‌টি", "পাঁউরুটি" ইত্যাদি।

**ফরাসীঃ**—"কাতুজ" (কার্তুজ), "কুপন" (কুপন) ইত্যাদি।

**ওলন্দাজঃ**—"তুরুক", "তুরুব" (তুরূপ), "হরতন্", "হরতন", "রুইতন", "রুইতন", "ইস্কাঅন" "চিড়িতন", "ইছকুরূপ", "ইস্কুপ" "ইস্কুপ" ইত্যাদি।

**ইংরেজীঃ**—ভারতবর্ষে ইংরাজদের দীর্ঘদিনের আধিপত্যের ফলে ইংরেজী শব্দ বিকৃত বা অবিকৃত রূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেকের মুখেই ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। চট্টগ্রামের ভাষায় বিকৃত বা অবিকৃত ইংরেজী শব্দ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়; যথা,—"পিলট্" (প্লেট), "সমন", "চেয়ার", "টেবিল", "সার্ট", "গলস্", "গ্লাস", "চেইন্", "বেলাউজ", "ব্লাউজ" ইত্যাদি।

**বার্মিজঃ**—"ভিন্‌জা" (গুণ্ডা), "নাফ্‌ফি" (চিংড়ি মাছ দিয়ে তৈরী এক রকমের তরকারীর মসলা), "ফুঙ্গী" (বৌদ্ধ ভিক্ষু) ইত্যাদি।

চট্টগ্রামের ভাষায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শব্দও দৃষ্ট হয়; যথা, "মাগাইয়ে" (হিন্দুস্থানী "মাঙা" হইতে), "হরতাল", "হর্তাল্", "হন্তাল" (গুজরাটি), "ছোট্টি" (চোট্টি,—তামিল), "মালুম" (হিন্দুস্থানী) ইত্যাদি।

এই সমস্ত বিদেশী শব্দ (ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক শব্দ সহ) চট্টগ্রামের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সকল সম্প্রদায়েই ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালা সাধুভাষার শব্দাবলীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়;—তৎসম, তদ্ভব ও দেশী। বাঙ্গালার বানানে অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ তৎসম শব্দ; এইখানে সংস্কৃত অর্থে আদি আর্য ভাষাই বুঝায়। আদি-আর্য-ভাষার শব্দ যখন লোকমুখে বিকৃত হয়ে প্রাকৃতের রূপ ধারণ করে তখন তাকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। আর্য শব্দের বিকৃত ও অবিকৃত রূপ ছাড়া যে সমস্ত অনার্য শব্দ পাওয়া যায় তাই দেশী শব্দ। বানানে অবিকৃত আদি-আর্য শব্দ বা তৎসম শব্দ যখন বিকৃত হয় তখন তাকে বলা হয় অর্ধ-তৎসম; যথা,—"কৃষ্ণ" তৎসম, "কেষ্ট" (চট্টগ্রামের ভাষায় "কিষ্ণ", "কিষ্ট") অর্ধ-তৎসম। এইগুলি ছাড়াও বাঙ্গালা ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়, যা' পূর্বোক্ত শ্রেণী সমূহের একটি শ্রেণীর শব্দের সাথে আর একটি শ্রেণীর শব্দের পারস্পরিক মিলনে অথবা ভারতীয় আর্য শব্দের সাথে দেশী কিম্বা বিদেশী শব্দের সংমিশ্রণে অথবা বিদেশী শব্দের সাথে বিদেশী শব্দের সংযোগে "মিশ্র" শব্দ বলে পরিচিত; যথা "হেড্+পণ্ডিত= হেডপণ্ডিত," "ডাক্তার+বাবু = ডাক্তারবাবু", "হিন্দু(বিদেশী শব্দ)+তৎসম প্রত্যয় 'ত্ব'= হিন্দুত্ব", ইত্যাদি। বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় চট্টগ্রামের ভাষার তৎসম শব্দের বহুল প্রচলন দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য স্থানে "সুরেন্দ্র", "নরেন্দ্র" প্রভৃতি শব্দ "সুরেন", "নরেন" ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়েছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের এই জেলাটিতে উপরোক্ত শব্দ সমূহ বিকৃতির মধ্যেও আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সেরূপ "মধ্যম" শব্দটি বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র "মেজ", "মেঝ", "মাইঝ", "মাইঝ্যা" প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হ'লেও চট্টগ্রামে তৎসম শব্দরূপে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়; যথা,—"মধ্যম দা'" (মধ্যম দাদা), "মধ্যম কা'" (মধ্যম কাকা)! চট্টগ্রামের ভাষায় অর্ধ-তৎসম শব্দ প্রচুর; যথা,—"চন্দর" (চন্দ্র), "নিয়ন্তরণ", "নিয়ন্তরণ" "নিমন্ত্রণ" (নিমন্ত্রণ) ইত্যাদি। চট্টগ্রামের ভাষায় প্রাকৃত-জ তদ্ভব শব্দ-ই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়; যথা—"হাঁঝ" (সাঝ = সঞ্ঝা = সন্ধ্যা), "চাঁন" (চাঁদ=চান্দ=চন্দ=চন্দ্র), "হাত" (হথ=হস্ত), ইত্যাদি। চট্টগ্রামের ভাষায় যে সকল দেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা' বাঙ্গালা দেশের অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় দৃষ্ট হয় না; যথা, "টেঁইয়া", "আইলদা", "উইথল" ইত্যাদি। মিশ্র শব্দের দৃষ্টান্ত চট্টগ্রামের ভাষায় বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়; যথা,—"পুলিশ সা-ব", "পুলিশ ছা-ব"(পুলিশ সাহেব), "বে+টাইম=বেটাইম", "মাষ্টার বা মাস্টর+প্রাকৃতজ প্রত্যয় 'ঈ'= মাষ্টারনী বা মাষ্টরী," "হেড্‌মৌলভী" ইত্যাদি।

ভারতীয় আর্য-ভাষাকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়;—আদি-আর্য-ভাষা, মধ্য আর্য-ভাষা ও নব-আর্য-ভাষা। নব-আর্য-ভাষারই একটি শাখা বাঙ্গালা ভাষা। প্রাকৃত মধ্য-আর্য-ভাষা। নব-আর্য-ভাষা হিসাবে প্রাকৃত থেকেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। বস্তুতঃ বাঙ্গালা ভাষার বিশ্লেষণে দেখা যায় বাঙ্গালা ভাষার প্রায় শব্দ-ই প্রাকৃত-জ; যথা,—সংস্কৃত "চক্ষু", প্রাকৃত "চক্‌ক্ষু", বাঙ্গালা "চোখ"। চট্টগ্রামের বেশীর ভাগ শব্দ-ই প্রাকৃত-জ; যথা,—"ভইন্", "বইন" (ভগ্নী), "হেয়াল", "হিয়াল" (শেয়াল, শিয়াল, শিগাল, শৃগাল), ইত্যাদি।

প্রাকৃতের মধ্যে মাগধী, সৌরসেনী এবং মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাগধী প্রাকৃতের 'র' স্থানে 'ল' চট্টগ্রামের ভাষাতেও দৃষ্ট হয়, যথা,—"লস্" (রস), "শরীল" (শরীর), "লুইত্" (রুইত=রোহিত, —মাছ)। সৌরসেনী প্রাকৃতে 'ট' ও 'ঠ' স্থানে যথাক্রমে 'ড' ও 'ঢ' হয়, যখন 'ট' ও 'ঠ' স্বরবর্ণের মধ্যে থাকে; চট্টগ্রামের ভাষায়ও তা' লক্ষ্য করবার বিষয়; যথা,—"কুডুম্ব" (কুটুম্ব), "ভাঁডা" (ভাঁটা), "ফডিক," (ফটিক, স্ফটিক), "লাঢি" (লাঠি)। সৌরসেনীর 'অউ' স্থানে 'ও' ব্যবহার চট্টগ্রামের ভাষায়ও দৃষ্ট হয়; যথা,—"কোমুদিনী" (কৌমুদিনী—"কুমুদিনী" এবং "কু-উদিনী"ও লক্ষিত হয়)। সৌরসেনীর মত চট্টগ্রামের ভাষায়ও 'ক্ষ' স্থানে 'খ' হয়; যথা,—"খতি" (ক্ষতি), খিতীশ (ক্ষিতীশ)। মহারাষ্ট্রী প্রকৃষ্ট প্রাকৃত; সংস্কৃত কাব্যের গীতি-কবিতার ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত; তবে চট্টগ্রামের ভাষায় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রভাব তেমন লক্ষিত হয় না। কিন্তু চট্টগ্রামের ভাষার সাথে যে প্রাকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রাকৃতের মত চট্টগ্রামের ভাষায় শব্দের মধ্যস্থিত 'ক,' 'গ,' 'চ,' 'জ,' 'ত,' 'দ' অনেক স্থানে লোপ পেয়েছে এবং 'খ,' 'ঘ,' 'ফ,' 'ভ,' 'থ,' 'ধ' 'হ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে; যথা,—"র-অ-মে" (রকমে), "কা-অ-জ" (কাগজ), "বি-হী-ষণ" (বিভীষণ; 'হ'-র উচ্চারণ 'অ') ইত্যাদি। প্রাকৃতের মত 'ক' স্থানে চট্টগ্রামের ভাষায়ও 'গ' হয়; যথা,—"সরগার" (সরকার)। প্রাকৃতের আদিরূপ পালি ভাষাতে। পালি ভাষার প্রভাবও চট্টগ্রামের ভাষায় লক্ষিত হয়। বহু পালি শব্দ চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের কথায় ব্যবহৃত হয়। পালি "ক্ষীর" শব্দের অর্থ দুধ; চট্টগ্রামেও দুধকে অনেক সময় "ক্ষীর" বলা হয়। চট্টগ্রামে প্রাচীনাদের মধ্যে কোন স্ত্রী স্বামীকে "দুধ খেয়ে যাও" বলে না, "ক্ষীর খেয়ে যাও" কথা-ই ব্যবহার করে।

চট্টগ্রামের লোকদের ব্যবহৃত শব্দাবলীর বেশীর ভাগ-ই বাঙ্গালা শব্দের বিকৃত রূপ। এই বিকৃত রূপের জন্য চট্টগ্রামবাসীদের দোষারোপ বা উপহাস করা যায় না। যে বিকৃতির ফলে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা "বাক্স"-কে "বাস্ক," "রিক্সা"কে "রিস্কা," "অবধি"-কে "অব্ধি" বা "অব্দি" বলে, সে বিকৃতির ফলেই চট্টগ্রামের ভাষা চট্টগ্রামের বাইরের লোকদের কাছে একেবারে অবোধ্য না হ'লেও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গে ভাগীরথীর তীরবর্তী স্থানের মৌখিক ভাষাকে যদি সমগ্র বাঙ্গালা দেশের মৌখিক ভাষা সমূহের মূল বলে গ্রহণ করা যায়, তা' হ'লে দেখা যায়, এই মৌখিক ভাষা যত পূর্বদিকের দূরত্বে ছড়িয়ে পড়েছে তত বিকৃতরূপ ধারণ করেছে। নদীয়া-শান্তিপুরের মৌখিক ভাষার সাথে খুলনা-যশোহরের মৌখিক ভাষার যতটা সাদৃশ্য আছে, বরিশাল-ফরিদপুরের মৌখিক ভাষার ততটা নাই; আবার বরিশাল-ফরিদপুরের যতটা আছে ঢাকা-ময়মনসিংহের ততটা নাই; তেমনি ঢাকা-ময়মনসিংহের যতটা আছে নোয়াখালী-ত্রিপুরার ততটা নাই; নোয়াখালী-ত্রিপুরায় কিছুটা থাকলেও চট্টগ্রামের মৌখিক ভাষায় তা' এমন বিকৃতরূপ ধারণ করেছে যে হঠাৎ চট্টগ্রামের শব্দের সাথে মূল মৌখিক শব্দের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শব্দের বিকৃত রূপ পরিগ্রহণের আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, একটি দেশের ভাষা অন্যদেশে প্রচারিত হ'লেও ঠিক মত সেখানে উচ্চারিত হয় না। ভারতবর্ষের লোকেরা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ হ'লেও ইংরাজদের মত যে ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আবার যে কোন ভারতীয় ভাষার উচ্চারণে ইংরাজদের অবস্থাও তাই। বাঙ্গালার মূল মৌখিক ভাষা চট্টগ্রামের লোকদের কাছে বিদেশী না হ'লেও দূরত্বহেতু দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ভাগীরথীর তীরবর্তী স্থানের শব্দাবলী যে বাঙ্গালার শেষ-প্রান্তে পৌঁছতে পৌঁছতেই বিকৃত হয়ে যাবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

শব্দের উচ্চারণে যে পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, তার চারটি কারণ;—Imitation, Analogy, Accent এবং Laziness; তন্মধ্যে শেষোক্ত কারণ-ই প্রধান। বিনাকষ্টে শব্দ উচ্চারণ করতেই প্রত্যেক মানুষ চায়। এই জন্যই "তাহা না হইলে"—এর পরিবর্তিত রূপ হয়েছে "তা' না হ'লে," "তা' ন' লে।" শব্দোচ্চারণে অলসতার দরুণ অনেক উপায়ে বিশুদ্ধ শব্দের বিকৃত রূপ হ'তে পারে; যথা,—Assimilation—বুধ+ত=বুদ্ধ, "চক্র" "চক্ক"; Dissimilation—"ললাট" থেকে "নলাট;" Prothesis—"ইস্ত্রী" (স্ত্রী); Anaptyxis—"অরহত্" (অর্হৎ); Meta-

thesis—"বেনারস," "বেনারেস" (বারাণসী), "বাস্ক" (বাক্স)। চট্টগ্রামের ভাষায় দেশী ব্যতীত অন্য যে সকল শব্দ দৃষ্ট হয় সেগুলির প্রত্যেকটিকে ভাষাতত্ত্বের নিয়মের মাপকাঠি দিয়ে যাচাই করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি শব্দ ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারেই বিকৃত হয়েছে; যথা,—"এস্টেশন" (স্টেশন,—prothesis), "ইস্কুল" (স্কুল,—prothesis), "ফাল" (লাফ, Metathesis), "রক্ত" (রক্ত,—Assimilation), "কিরিয়া" (ক্রিয়া,—Anaptyxis), ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষার প্রত্যেকটি বর্ণের সঠিক উচ্চারণ পূর্ববঙ্গের প্রায় স্থানেই হয় না। বাঙ্গালা বর্ণের উচ্চারণ পূর্বদিকে বিকৃত হ'তে হ'তে বাঙ্গালার শেষ-প্রান্ত চট্টগ্রামে পৌঁছে একটু বেশী রকম বিকৃত হয়েছে। এই বিকৃতি বিশেষ করে লক্ষিত হয় 'ক,' 'চ,' 'ছ' এবং 'প'-এর উচ্চারণে। চট্টগ্রামের ভাষায় অল্পপ্রাণ অঘোষ বর্ণ 'ক,' 'চ' এবং 'প' অনেকটা মহাপ্রাণ অঘোষ বর্ণ 'খ,' 'ছ' এবং 'ফ'-এর মত উচ্চারিত হয়; 'খ,' 'ছ' এবং 'ফ'—এর উচ্চারণ অনেকটা aspirated। পূর্ববঙ্গে 'ঘ,' 'ঝ,' 'ঢ,' 'ধ,' 'ভ,' ঠিকমত উচ্চারিত হয় না; সেগুলি অনেকটা 'গ,' 'জ,' 'ড,' 'দ,' 'ব'-এর মত উচ্চারিত হয়। চট্টগ্রামবাসীদের উচ্চারণও এই সকল দোষে দুষ্ট। চট্টগ্রামে 'ঠ' অনেক সময় 'ট'-এর মত উচ্চারিত হয়, যথা,—"পাট্শালা" (পাঠশালা) পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থানে 'ড়' যেমন 'র'-এর মত উচ্চারিত হয়, সেইরূপ চট্টগ্রামে, এমন কি সমগ্র পূর্ববঙ্গে, 'ড়'-এর প্রকৃত উচ্চারণ হয় না; যথা,— "পর," (পড়া), "ভারা" (ভাড়া)। পূর্ববঙ্গে 'স' অনেক সময় 'হ'-এর মত উচ্চারিত হয়; চট্টগ্রামেও এই বিকৃতি দৃষ্ট হয়; যথা,—"হাত্দিন," "হাদ্দিন" (সাতদিন)। পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় 'হ' অনেকটা 'অ'-এর মত উচ্চারিত হয়; চট্টগ্রামেও এই উচ্চারণ-দোষ লক্ষ্য করবার বিষয়; যথা,— "আৎ" (হাত)। শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেই 'ই,' 'উ'-কে আগে থেকেই উচ্চারণ করা বাঙ্গলা ভাষার, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের, একটা বৈশিষ্ট্য; চট্টগ্রামেও এই উচ্চারণ লক্ষ্য করবার বিষয়; যথা,—"আইজ্-কাইল্" (আজি-কালি), "দাউদ" দাদ্=দাদ্=দদ্দ্=দদ্রু)। বাঙ্গালা ভাষার 'শ,' 'ষ,' 'স'-এর উচ্চারণের পার্থক্য বাঙ্গালীর মুখে খুব কম-ই দৃষ্ট হয়; চট্টগ্রামেও এই পার্থক্য খুব কম দেখা যায়; যথা,—"সরীর" (শরীর)। চট্টগ্রামের ভাষায় বাঙ্গালার উচ্চারণের মত শব্দ-মধ্যে নাসিক্য ধ্বনি থাকলে নিকটবর্তী স্বর-ধ্বনিও অনুনাসিক ভাবগ্রস্ত হয়; যথা,—"মাঁ" (মা), "নাঁম" (নাম)। শব্দের মধ্যে সানুনাসিক অক্ষর থাকলে সানুনাসিকত্বের শ্বাসাঘাত-যুক্ত প্রথম অক্ষরে সঞ্চালিত হওয়া চট্টগ্রামের ভাষায়ও দৃষ্ট হয়; যথা,—"বাঁ" (বাম), "তুঁই" (তুমি)। বস্তুতঃ চট্টগ্রামের ভাষায় এই নাসিক্য-ধ্বনির প্রভাব বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়; এমন কি এই নাসিক্য-ধ্বনি যথেচ্ছরূপে ব্যবহৃত হ'তেও দেখা যায়; "চাঁ" (চা), "শাঁস" (শ্বাস), "ডীঁ" (দিঘী)। পশ্চিমবঙ্গে হসন্ত-বর্জিত বর্ণে হসন্ত-আরোপের প্রাচুর্য-দোষ থেকে চট্টগ্রামের তথা পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষা-সমূহ অনেকাংশে মুক্ত; যথা,—"বিষ-বৃক্ষ" (পশ্চিম বঙ্গে "বিষ্-বৃক্ষ"), "এতদিন" (পশ্চিম বঙ্গে "এত্দিন," "এদ্দিন")।

বাক্য-রীতিতেও চট্টগ্রামের ভাষায় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নাস্ত্যর্থক বাক্যে চট্টগ্রামের ভাষায় সংস্কৃত, পালি, ব্রজবুলী, গুজরাটী প্রভৃতির মত 'না' স্থানে 'ন' হয় এবং তা' ক্রিয়ার আগে বসে; যথা,—"আঁই ন যাইয়ুম্" (আমি যাব না)। চট্টগ্রামের ভাষায় বাক্য-রীতিতে "এবং," "ও" প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় দৃষ্ট হয় না; একমাত্র সংযোজক অব্যয় "আর" সর্বস্থানে ব্যবহৃত হয়। বিয়োজক অব্যয়ের মধ্যে "না হয়," "নইলে" (নহিলে), "নয়ত," "কিম্বা,"—এই চারিটিই ব্যবহৃত হয়। নিশ্চয়-সম্বন্ধীয় অব্যয় "বটে" চট্টগ্রামের ভাষায় নাই বললেও চলে। সংকোচক অব্যয়ের মধ্যে "কিন্তু," "অথচ" এবং "ত-অ" (তবুও) ব্যবহৃত হয়)। বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রামের ভাষার বাক্যরীতি বাঙ্গালা সাধু-ভাষার বাক্য-রীতির প্রভাব-পুষ্ট।

বিকৃত হ'লেও নানা জাতির সাথে মিশ্রণের ফলে চট্টগ্রামের ভাষা শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধশালিনী। বর্তমানে শিক্ষার প্রসার ও অন্যান্য জিলার লোকদের সাথে মেলামেশার ফলে চট্টগ্রামের শব্দ ও উচ্চারণ যে আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হ'তে চলেছে, তা' লক্ষ্য করবার বিষয়; যথা,—"গলাস্" ও "গেলাস্" স্থানে "গ্লাস," "হন্ধ্যা" স্থানে "সন্ধ্যা," "ন্হা" ও "নাঁ" স্থানে "না," 'ন্হা' ও 'নাঁ' স্থানে "না," ইত্যাদি।

যুগে যুগে দেশের উপর, জাতির উপর যে পরিবর্তন আসে ভাষার উপরও সে পরিবর্তনের ছাপ থেকে যায়। বাঙ্গালার তথা ভারতের যুগ-পরিবর্তনে সীমান্তের এই চট্টগ্রাম জিলার রহস্যময়ী ভাষার ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

# চরকা - সেকালে ও একালে

শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ

অন্ন ও বস্ত্রের সমস্যা মানুষের চিরন্তন—বিশেষ করিয়া মানুষ যেদিন হইতে সভ্যতার আবরণ অঙ্গে তুলিয়া লইয়াছে সেদিন হইতে এসম্বন্ধে তাহাকে আরও বেশি উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহার উন্নতিসাধনের জন্য ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; মানুষের ধারা ইহাই। মানুষ যত সভ্য হইবে, যত শিক্ষিত হইবে, তত প্রতিযোগিতা বাড়িয়া যাইবে এবং ফলে অন্ন ও বস্ত্রের সমস্যাও জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিবে, —অথচ ইহার মীমাংসাও মানুষেই করিবে। 'নাল্পে সুখমস্তি' মানুষের আজ সেই দশাই উপস্থিত। কোনদিন ইহার নির্বাণ হইবে কিনা জানিনা। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত কিছু হানাহানি, যত যুদ্ধ বিগ্রহ, লোকক্ষয়—সবারই মূলে ঐ একই সমস্যা—অন্ন ও বস্ত্র। কিন্তু মানুষ যখন অরণ্যচারী ছিল, তখন বল্কল পরিধান করিয়া, মৃত পশুপক্ষীর মাংস কাঁচা পোড়াইয়া পাথরের তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে উদরপূরণাদি কার্য করিত। তারপর সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সর্বক্ষেত্রে জটিল লক্ষণ প্রকট হইল, প্রতিযোগিতা দেখা দিল। এমনই এক প্রতিযোগিতার যুগসন্ধিক্ষণে চরকার জন্ম।

চরকার বয়স যে কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে এখনও গবেষণার প্রয়োজন আছে। হিন্দু সভ্যতার (অর্থাৎ Indo-Aryan Civilization) বয়স নির্ণয় সম্ভব হইলে চরকার সঠিক বয়স নিরূপণ সহজসাধ্য হয়। কেননা, প্রাচীন ভারতে আর্য হিন্দুগণ যে সভ্যজনোচিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ দিবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি। হিন্দুদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিমত দিয়াছেন। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে বয়নবিদ্যা এবং সুতাকাটা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। এমন কি "চরকায় সুতা প্রস্তুতকরণ, তাহাতে রং দেওয়া ও তাহার দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা সুধীদিগের কর্তব্য বলিয়া স্পষ্ট নির্ধারণ করিতেছেন। যাঁহারা বেদের ধর্ম অনুসরণ করেন ও যাহাতে গৌরব বোধ করেন তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্মের আদেশ বলিয়াই চরকাকে গ্রহণ করিতে পারেন' (১) এমন কথাও বেদ বলিতেছেন। তখন চরকা শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না অথবা স্ত্রীপুরুষের অধিকারের সমস্যা তখন ছিল না। মাতা আপন পুত্রের জন্য বস্ত্র বয়ন করিতেন, পত্নী পতির জন্য বস্ত্র বয়ন করিয়া দিতেন, ইহারও উল্লেখ আছে। তখনকার সমাজের বস্ত্রের সম্পূর্ণ চাহিদাই মিটাইতে হইত তৎকালীন সমাজকেই অথচ বড় বড় কলকারখানা, কাপড়ের কল ইত্যাদি প্রাচীন ভারতে ছিল না। তবে এ সরবরাহ কোথা হতে আসিত? স্বভাবতঃই ঘরে ঘরে চরকার সাহায্যে যে সুতা হইত এবং তাঁতে যে কাপড় বোনা হইত, তাহার দ্বারাই এ চাহিদা মিটানো হইত। তবে বয়নকার্যে পুরুষ এবং স্ত্রী এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে শ্রমবিভাগ ছিল। বয়নকার্য ছিল পুরুষের এবং তানা প্রস্তুতকরণ ছিল স্ত্রীলোকের কার্য। এই ব্যবস্থা তন্তুবায় শ্রেণীর মধ্যে আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে। পরবর্তীকালে বয়ন শিল্পের যে উন্নতিতে সারা পৃথিবীর চমক লাগিয়াছিল, তাহার বিবরণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক-পর্যটক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ যুগেও ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন ছিল, এ প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিলালিপিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহু পূর্ব হইতেই ভারতে প্রস্তুত বস্ত্র প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে সরবরাহ হইতেছিল এবং ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসিবৃন্দ ভারতীয় বস্ত্রকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। ঢাকার মসলিন এক সময় সারা পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিত। Dr. Watson মসলিনকে বলিয়াছেন—'woven-air of dacca' ইহার সূক্ষ্মতা বিবেচনায় রোমান সিনেটরগণ ইহাকে মহিলাগণের পরিধানের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন; কারণ, ইহাতে প্রতি অঙ্গ পরিস্ফুট হইত এবং এইজন্য

"The use of Dacca Muslim was stopped by law in ancient Rome. But the Roman maidens were so fond of it that they often transgressed the law and shocked the elders by wearing it." (1)

আমাদের দেশেও জাহানারা তাঁহার সম্রাট-পিতার সম্মুখে সাত-পর্দা মসলিন পরিয়া আসা সত্ত্বেও পিতাও অনুরূপভাবে 'shocked' হইয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও শিল্পের ইতিহাসে ইহা যে একটি গৌরবময় অধ্যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিতেছেন—'ভারতবর্ষে যেমন সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তেমন জগতের আর কোন স্থানের মনুষ্যের হাতে হইতে পারিত না।' তাই একথা বলা অন্যায় হয় না যে, 'ভারতবর্ষ যে এতকাল পর্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তন্তু ও বয়নকার্যে নিপুণতাই তাহার প্রধান কারণ। পণ্যের মধ্যে বস্ত্রই প্রধান ও অধিকতর সমৃদ্ধির হেতু। বর্তমান পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও অন্যান্য তন্তু-শিল্প-প্রধান দেশসমূহ প্রবেশ লাভ করিবার পূর্বে......ভারতবর্ষ জগতের বস্ত্র বাণিজ্যের প্রধান অধিকারী ছিল। চরকাই তাহাদের মূল সম্বল ছিল।' (২)

ভারত-ইতিহাসের এ অধ্যায়টির গৌরব যতই থাকুক না কেন, অগৌরবও কিছুমাত্র কম নয়। কেননা তখন হইতেই ধর্মের শাসনে বৃত্তিভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাতে ফল যাহা হইয়াছে তাহাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—'আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।' অন্যত্র বলিতেছেন—'রাজশাসনে যদি পাকা করা হত, তা হলেও তার মধ্যে মানুষের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনই থামত না। পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল, এক একটা জাতির এক একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।' (৩) কিন্তু এ ব্যবস্থা শক্ত করিবার জন্যই করা হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কলহ-বিবাদ-অসন্তোষ ইত্যাদির সমাধানে ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর কেহ তখনকার দিনে কল্পনা করিতে পারে নাই। ইহার পরবর্তী যুগে কিন্তু সমাজব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হয় অর্থাৎ তখন যাঁহারা ত্যাগ স্বীকার করিতেন, তাঁহাদিগকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখা হইত, তাঁহাদিগকে বলা হইত Cranks, তৎপরবর্তী যুগে দেখা যায়, জীবিকার জন্য

(১) প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩২, প্রাচীন ভারতে কার্পাস শিল্প ও চরকা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
(1) "Orient" Puja Number, 1943 —P. 43.

(২) প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩২, "প্রাচীন ভারতে কার্পাস শিল্প ও চরকা" প্রবন্ধ।
(৩) প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২, "শূদ্রধর্ম" প্রবন্ধ।

মানুষকে বাধ্য হইয়াই তাহার 'দৈবায়ত্ত কুলে'র বৃত্তিকেই গ্রহণ করিতে হইতেছে। যোগ্যতর ব্যক্তির অধিকার সংকোচ করা হইয়াছে—ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্বের জয়জয়কার। ইহাতে এই-কথাই স্পষ্ট বোঝা গিয়াছে যে, 'বংশানুক্রমে... দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়—বরং তাতে মন যতই মরে যায়, কাজ ততই সহজ হয়ে আসে।' (শূদ্রধর্ম—রবীন্দ্রনাথ)। যাহাই হউক, ইহা সত্ত্বেও যে চরকার ক্রমশঃ অবনতি হইতেছিল তাহার কারণ আর কিছুই নয়, তখন মন মরিয়া গিয়াছিল, চিত্ত ছিল না—'হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই।' (রবীন্দ্রনাথ) ক্রমাগত দাসত্ব করিতে থাকিলে—"মানুষ কেবল যন্ত্র হয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।' (রবীন্দ্রনাথ) তাই একথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, তখন এদেশে 'চরকাই ছিল, চেতনা ছিল না—বহু লক্ষ চরকার দ্বারা বহু লক্ষ লোকের মন তখন স্বরাজ-সাধনের ক্ষেত্রে একসূত্রে গ্রথিত হয় নাই। চরকার মধ্যে তখন সত্যের আহ্বান ছিল না, ত্যাগের প্রেরণা ছিল না, সেবার আকুতি ছিল না, প্রেমের সুর ছিল না, অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ছিল না। তাই, বহু লক্ষ চরকার আবর্তন অবশ্যম্ভাবী পতনের হাত হইতে তখন দেশকে বাঁচাইতে পারে নাই। (১) তাহার পর আর একটি কারণ এবং তখনই অচল অবস্থার উদ্ভব হয়—ভারতীয় জীবনের উপরে ইউরোপীয় জীবনের সংঘাত। 'ভারতীয় মন্ত্রের উপরে যখন ইউরোপীয় মন্ত্র আসিয়া পড়িল, এদেশীয় সমাজ চৈতন্যের উপরে যখন ইউরোপীয় ব্যক্তিচৈতন্য আসিয়া পড়িল, তখন দেখিতে দেখিতে এদেশের শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে শহরে-গ্রামে, ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে ফাটল চৌচির হইয়া দেখা দিল।' (২)

বর্তমান যুগে আমাদের দেশে চরকার স্থান বেশ একটি বৃহৎ স্থান জুড়িয়া আছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান দেশ; আমাদের দেশে বিশেষতঃ চরকা যে সময়োচিত সমস্যার সমাধান করিতে পারে, একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন। মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন—

"Every agricultural country requires a supplementary industry to enable the peasants to utilise the spare hours. Such industry for India has always been spinning." (3)

বর্তমান ভারতে চরকার স্থান কোথায়, 'গ্রামে ও পথে' পুস্তকে কয়েকটি ছত্রে অতিশয় সুস্পষ্ট মতামতের দ্বারা তাহা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। লেখক বলিতে-ছেন—'সাত লক্ষ বুভুক্ষু গ্রামে ভারতবর্ষের শোষণপীড়িত জীবন আজ কোনও মতে বাঁচিয়া আছে। চরকা তাহার বস্ত্রের সংস্থান করিবে, চরকা তাহাকে কাজ দিবে, তাহার আলস্য ঘুচাইবে, সাত লক্ষ দীন পল্লীতে চরকাকে কেন্দ্রে রাখিয়া লুপ্তপ্রায় পল্লীশিল্প পুনর্জীবন পাইবে,—পল্লীর ম্লানমুখে আবার হাসি ফুটিবে। চরকা দিয়া দেশকর্মী ভারতের জনগণের মনের রাস্তা খুঁজিয়া পাইবে, অসংখ্য কেন্দ্রে দেশকে আবার কর্মমুখর করিয়া তুলিবে। চরকা অর্থে দেশব্যাপী বিশাল একটা কার্যক্রম বুঝায় যাহাকে অবলম্বন করিয়া দেশ আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাইবে। চরকা দেশসেবার শক্তি দিবে, অহিংসার পথে নূতন আলোকপাত করিবে। চরকা অহিংসার প্রতীক, কারণ চরকা-প্রচেষ্টায় শোষণ কোথাও নাই, আর এই শোষণই হইল হিংসার গোড়ার কথা,—সভ্যতার মুখোস পরিয়া শোষণের শতপথেই হিংসা রাক্ষসীর আনাগোনা। শোষণের উদ্দেশ্যেই ব্যবসা বাণিজ্য, শোষণের জন্যই সাম্রাজ্য বিস্তার এবং তারই অনিবার্য পরিণতি হইল পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টা আজ সর্বত্র গৃধ্নুতা কলঙ্কিত। আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে চরকাই সরল, সুস্থ ও নির্লোভ জীবনের পথ নির্দেশ করে।" (১) এক কথায় বলিতে গেলে চরকা একালে মহাত্মা গান্ধীর উদ্ভাবিত সর্বপ্রকার Theory ও practice combined এবং এ উপায় বর্তমান সভ্যতাগর্বী পৃথিবীতে "কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ একটা অভিনব ব্যাপার।"

একালে চরকার উন্নতি অর্থেই গ্রামের উন্নতি, কেননা বড় বড় কাপড়ের কল ইত্যাদি যা কিছু সামান্য আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সব শহরেই। যেখানে শহরে Mill প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেখানে Mill-ই তাহার চতুষ্পার্শ্বে শহর সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে—এ-কথা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। Mill মুষ্টিমেয় কতক-গুলি লোককে চাকুরী দিয়াছে, ততোধিক লোককে নিঃস্ব করিয়াছে এবং তদপেক্ষাও বেশি লোকের মুখের গ্রাস নির্মম নিষ্ঠুর যন্ত্রহস্তে আপনার উদরসাৎ করিয়াছে। মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক অগণিত অর্থ-সম্ভার লাভ করিয়াছে অসংখ্য গৃহহারা, ক্ষুধার্ত, দারিদ্র্যনিপীড়িত, ক্লান্তদৃষ্টি জনগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে—চিরতরে হয়ত বা—কেহ তাহার সন্ধান পর্যন্ত দিতে পারে না। তবে কি এ-যুগে machine-machinery অচল হইবে? না, তা নয়। গান্ধীজি বলিতেছেন—

"Machinery has its place; it has come to stay. But it must not be allowed to displace necessary human labour. I would welcome every improvement in the cottage machine, but I know that it is criminal to displace hand-labour by the introduction of power driven spindles unless one is at the same time ready to give millions of farmers some other occupation in their home." (2)

কিন্তু এই সমস্ত machineryকে গ্রাম-অভিমুখী করিতে হইবে; অর্থাৎ Cottage Industries-এর উন্নতিতে যে সব machinery সাহায্য করিবে, যে সব machinery আমাদের দেশের সাত লক্ষ গ্রামবাসীকে মুখের গ্রাস হইতে বঞ্চিত করিবে না, সেই সমস্ত machinery'র প্রবর্তন সম্পর্কে গান্ধীজির আপত্তি নাই। কিছুদিন পূর্বে গান্ধীজি এক Engineer এর মারফৎ ভারতের সমস্ত Engineer দের প্রতি যে বাণী প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও এ স্থলে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—

"How useful it would be if the Engineers in India were to apply their ability to the perfecting of village tools and machines. This must not be beneath their dignity."

এখানে চরকাকে 'Village tools and machines' এর অন্তর্ভুক্ত করিলে পাঠক-পাঠিকারা অপরাধ লইবেন না আশা করি।

এ পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি এদেশ লাভ করিয়াছে চরকা কাটিয়া বা না কাটিয়াই—ততটুকুর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। 'Prelude to greater Suffering' এই নীতিই বর্তমানে এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া কার্যকরী করিবার চেষ্টা হইতেছে। তা ছাড়া ইহার অপর আর এক দিক আছে—ইহা সেবাবুদ্ধি সঞ্জাত শোষণহীন কর্মপ্রচেষ্টা। ইহা কাহারও শোষণ করে না; ইহা 'স্বয়ং-সম্পূর্ণ পল্লীশিল্প'। সুচিন্তিত অর্থনীতির উপর ভিত্তি স্থাপিত না হইলে কোন সমাজ দাঁড়াইতে পারে না—বিশেষ করিয়া যেখানে ধনী দরিদ্র শ্রেণীভেদ আছে। তাই এমন কাজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যে কাজের দ্বারা "মানুষের লোভ ও লুণ্ঠনবৃত্তি সংযত হইয়া তাহার প্রেম ও ন্যায়বুদ্ধি জাগে, তাহার ভিতরের পশুটা ঠিকমত শাসন ও সংযমের মধ্যে থাকিয়া উপরের মানুষ সাড়া দেয়। ...... চরকা দ্বারা এই কাজ সম্ভব। চরকা এবং চরকাকে কেন্দ্রে রাখিয়া শোষণহীন পল্লীশিল্প মানুষের জন্য এই ন্যায়ের আশ্রিত সামাজিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে।' (৩) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"Civilization is likely to destroy itself unless it gives up its imperialist and acquisitive tendencies and bases

(১) 'গ্রামে ও পথে'—পৃঃ ১২

(২) 'দেশ', ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২—পৃঃ ১৪৩

(2) Studies in Gandhism—P. 55.

(১) 'গ্রামে ও পথে'—পৃঃ ১০৯—১০

(2) 'Studies in Gandhism' P. 55

৩। "গ্রামে ও পথে"—পৃঃ ১২৬

itself on the peaceful co-operation of free nation and on the maintenance of the dignity of man."

এই Dignity of Man বজায় রাখিতে গেলে Decentralized Industry অর্থাৎ বিকেন্দ্র শিল্পের আশু প্রয়োজন,—ইহাতে মানুষের ব্যক্তিত্ব পিষ্ট এবং অস্বীকৃত হয় না; ইহাতে গ্রামে গ্রামে যে সহস্র জীবনকেন্দ্র স্বেচ্ছায় সম্বৃদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সৃষ্ট হইবে, তাহাকে ভাঙা সহজ নয়—ইহাতে জাতি হইবে বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত। জাতির এই বহু সহস্র জীবন-কেন্দ্র এবং শক্তিকেন্দ্র সহজে ভাঙিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। এই শোষণহীন বি-কেন্দ্র শিল্পের উপরে ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজ গঠিত হইয়া উঠিবে। চরকা হইল ইহার প্রতীক।" (১) গান্ধীজির মতও তাই—

"Multiplication of mills cannot solve the problem. They can only cause concentration of money and labour and thus make confusion worse confounded." (2)

তাহাই যদি হইত, তবে ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বেকার সমস্যার জটিলতা দিন দিন বর্ধিত হইত না।

চরকার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আন্দোলনের শক্তি নির্ণয় করিতে গিয়া জনৈক বৈদেশিক সাংবাদিক ইহাকে বলিয়াছেন—

"Slow but none the less sure."

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"It does not.....compel an empire instantly to yield though it hastens the offer of concessions........"

শ্রীঅরবিন্দের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায়—"Swaraj begins from village." অতি সত্য কথা। অর্থাৎ পল্লীকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে এদেশে অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। Industrialzation-এর উপর ইহা অনেকাংশে নির্ভর করে সত্য, কিন্তু এই Industrialization এর কতকগুলি factor আছে যাহা ভিন্ন এই পদ্ধতি (system) মোটেই টিকিতে পারে না। তাহা হইতেছে এই—

(১) শোষণ করিবার ক্ষমতা;

(২) বৈদেশিক বাজারের উপর অধিকার;

কিন্তু ভারতের কোনটিই নাই,—অধিকন্তু ভারতের বৈশিষ্ট্য শোষণ করিবার ক্ষমতাতে নহে, ত্যাগেই তাহার মহিমা, দানেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। অহিংসাবাদের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদ William James অহিংসবাদের প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য হন নাই। মহামুনি Tolstoy-ও এবিষয়ে কম চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তিনিও ইহাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্য-করী করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে, তদ্দেশীয় লোকের অহিংসা ভাবের প্রতি তত শ্রদ্ধা ছিল না অথবা এখনও নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে অহিংসার প্রতি যত শ্রদ্ধা তত আর পৃথিবীর কোন দেশে কখনও হয় নাই। তাই অহিংসা-ব্রতের একনিষ্ঠ প্রচারক রাজাধিরাজ অশোকের নাম আজ পর্যন্ত লোকের নিকট সমভাবে আদৃত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ জৈন ধর্মাচার্যগণ - শ্রমণ, সাধু, ফকিরগণ এ দেশেরই বৈশিষ্ট্য - এত সাধু সন্ন্যাসীর ভিড় অন্য কোন দেশে নাই। এদেশের গেরুয়া বসন তাই একদিন সারা পৃথিবীতে প্রেমের বান ডাকাইয়াছিল—বিদেশী বিদেশিনীকে ঘরছাড়া করিয়াছিল—সেই অবাধ, অনন্ত শ্রেয়ের সন্ধানে পথের নির্দেশ দিয়া এবং সে পথেরও পাথেয় ছিল—অহিংসা, প্রেম ও সত্যধর্ম। ভারতীয় মনের এই সংস্কৃতির ধারার উপরেই নূতন সমাজ গঠনের, নূতন কর্মব্যবস্থার ইমারত গড়িয়া উঠিবে এবং একালে তাহারই কেন্দ্রে রহিয়াছে চরকা।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকাংশের কর্মসংস্থান করিতে পারে না, সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন অবিলম্বে প্রয়োজন। আমাদের দেশে সমৃদ্ধি যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেইগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার হয় না। জনৈক সাংবাদিকের ভাষায়—"pure loss & criminal waste." ভারতবর্ষের এই দুর্দশায় তিনি বলিতেছেন—

"India, I felt, is wasting its resources ......It is short of everything labour can produce and yet it has many millions of unemployed. It has money in gold and silver and jewels that are unemployed. It has land that is under employed. It has brains that are underemployed."

অহিংসার ভিত্তিতে এই man-powerএর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে গেলে চরকাই সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান। অনেকে হয়ত ইহার সহিত Cotton Mill-এর তুলনা করিয়া ইহাকে উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন। কিন্তু আমাদের দেশে বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে গ্রাম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই চরকা অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজের মিঃ টি প্রকাশমের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। তিনি বলিয়াছেন—

"For a country like ours, growing plenty of cotton in its villages and with plenty of skill in regard to both hand spinning and handloom weaving, Khadi Development scheme is obviously the appropriate method of achieving self sufficiency in regard to clothing."

তাহা ভিন্ন আজকাল দুরারোগ্য রোগরূপে দেখা দিয়াছে প্রতি দিনের অঙ্গে ধর্মঘট। অবশ্য, ধর্মঘটীরা অধিকদিন ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে পারে না, তাহার কারণ তাহাদের অন্য কোন উপায় নাই দ্বিতীয় কোন জীবনধারণের ব্যবস্থার কথা জানা নাই, fund নাই; এ অবস্থায় যদি Supplementary Industry হিসাবেও তাহারা চরকাকে গ্রহণ করে, তবে তাহারাও লাভবান হইবে এবং একটি শিল্পের উন্নতি হইবে, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন জোগানের অংশ গ্রহণ করিতেছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদও অনুভব করিতে পারে—মানুষের সর্বোত্তম হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করিতে পারে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকাল অপেক্ষা একালে চরকার স্থান অনেক উচ্চে এবং একালে চরকা জাতীয় জীবনের একটি বৃহৎ অংশ জুড়িয়া আছে।

(১) 'গ্রামে ও পথে'—পৃঃ ১২৮

(2) 'Studies in Gandhism'—P. 54.

# প্র-না-বি-র এলবাম

## চিত্র-চরিত্র

## কালীপ্রসন্ন সিংহ

ইংরাজ শাসনের স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ ফল ভারতীয় চিত্তের পুনর্জাগরণ। এই পুনর্জাগরণের আবার শ্রেষ্ঠ ফল ভারতীয় সাহিত্যের উদ্দীপ্তি। ভারতীয় সাহিত্য বলিলাম বটে; কিন্তু বাঙলা সাহিত্য বলাই উচিত ছিল কিম্বা বাঙলা সাহিত্যকে ভারতীয় সাহিত্য বলা বোধ করি অন্যায় না, কারণ রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যকে বাদ দিলে পূর্ববর্তী বঙলা সাহিত্যের প্রাণরস ভারতীয়ত্ববোধ। সেই হিসাবে বাঙলা সাহিত্য মূলত ভারতীয় সাহিত্য। পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শনের সঙ্ঘাতে জাগ্রত ভারতীয় চিত্তের আত্মবিকাশের একটি মাত্র পন্থা ছিল—সে পথ সাহিত্যের পথ। অন্যান্য জাতির ইতিহাসে এই রকম সন্ধি সঙ্ঘাত ঘটিলে বিচিত্র পন্থায় তাহাদের আত্মবিকাশ ঘটিয়া থাকে। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমকালীন ইংরাজ সমাজ যেমন বেকন ও সেক্সপীয়র প্রদর্শিত চিন্তা ও অনুভূতির দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি ড্রেকের নৌ-পরিক্রমা পৃথিবী বেষ্টন করিয়াছিল, র‍্যালে নূতন জগতে নূতন জনপদ স্থাপন করিয়াছিল, ইংলণ্ডের পণ্যম ইউরোপের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছিল এবং সকলে মিলিয়া স্পেনের নাবিক শক্তিকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু পরাধীন ভারতের সম্মুখে এই সব বহির্মুখী পন্থা ছিল না, কেবল তাহার 'ভিতর কপাট-টি' খোলা ছিল। ভারতীয় চিত্তের, বাঙলী চিত্তের বলিলে অন্যায় হইবে না, সমস্ত শক্তি এই অন্তর্মুখী পথে প্রবাহিত হইল। অত্যল্প কালের মধ্যে সম্পদশালী বাঙলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। এ যেমন লাভ, তেমনি ক্ষতির খাতাতেও কিছু আছে। বহির্জগতের অভিজ্ঞতাহীন বাঙলা সাহিত্য প্রধানতঃ অন্তর্মুখী হওয়াতে সাহিত্য জন্ম—দুর্বলরূপে দেখা দিল। বাঙলা সাহিত্য এই কারণেই মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গৌরব সত্ত্বেও, খানিক পরিমাণে অবাস্তব, খানিক পরিমাণে পঙ্গু, এই সাহিত্যে যেমন তন্ময়তা, মন্ময়তা আছে, তেমন জগন্ময়তা নাই; এই কারণেই বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লিরিক, মন্ময়চিত্তের গান, বাঙলা সাহিত্যের নাটক উপন্যাস প্রভৃতিতে যে পরিমাণে মন্ময়তা আছে, সে পরিমাণে জগন্ময়তা নাই, এমন কি বাঙালীর রাজনীতিও মন্ময়ী।

কিন্তু ইতিহাসের রহস্য এই যে, পাশ্চাত্ত্য চিত্তের আঘাতে প্রথমে আমাদের সাহিত্য বোধ জাগ্রত হয় নাই, প্রথমে জাগিয়াছিল আমাদের কর্মোদ্যম। রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি সকলেই প্রধানতঃ কর্মী পুরুষ। রচনাতে ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, ব্রহ্ম সভা ও ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা, ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন, নূতন পাঠ্য পুস্তক রচনা প্রভৃতিতেই ইঁহাদের ব্যক্তিত্বের ও শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ও রামমোহনের গদ্য রচনা দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্ম ব্যাখ্যান, বিদ্যাসাগরের সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞান সমন্বিত সীতার বনবাস কোনটিই সাহিত্যের প্রেরণায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মপ্রকাশের তাগিদে রচিত নহে, ইহাদের জন্ম প্রয়োজনের তাগিদে; এই সব গ্রন্থ পূর্বোক্ত কর্মী পুরুষদের কর্মেরই সূক্ষ্ম রূপান্তর, এই সব গ্রন্থ তাঁহাদের কর্মেরই মন্ময় প্রক্ষেপ, ইহাদিগকে কর্মের মাপকাঠিতে বিচার করিতে হইবে, ইহাদের সাহিত্যিক গুণ আছে, কিন্তু ইহারা সাহিত্য নয়। কাছাকাছি আসিয়া মধুসূদন প্রথমে বিশুদ্ধ আত্মপ্রকাশের ইচ্ছায় শর্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমা লিখিলেন। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ—এখানিও বিশুদ্ধ আত্ম-প্রকাশের রচনা।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সমাজ নব-জাগ্রত কর্মোদ্যমের সহায়ে সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কর্মক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সার্থকতাও লাভ করিয়াছিল সহসা তাহার পন্থা পরিবর্তনের এমন কি কারণ ঘটিল? কর্মী সমাজ সাহিত্যিক সমাজ হইয়া উঠিতে গেল ইতিহাসের কোন্ দুর্বোধ বিধানে? জগন্ময়তায় যাহার সূচনা মন্ময়তায় তাহার অবসান কেন? আমার মনে হয় ইহার প্রধান কারণ এই যে, বাঙালী সমাজ এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতাতেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে পরাধীন, কর্মের পথে অধিক দূর অগ্রসর হইবার উপায় তাহার নাই, সে ইতিমধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছিল যে, ড্রেক, র‍্যালে, এসেক্স হইবার পথ পরাধীন জাতির পথ নয়, সে বুঝিয়াছিল যে, একমাত্র সাহিত্যের পথটাই তাহার সম্মুখে অবারিত, বুঝিয়া সে সাহিত্যের পথ ধরিল, একটা সমগ্র সমাজের আত্ম-প্রকাশের মোড় ঘুরিয়া গেল, আবার একটা সমগ্র সমাজের আত্মার প্রবাহ সাহিত্যের সংকীর্ণ খাতে আসিয়া পড়িয়া অনতিকাল মধ্যে তাহাকে দুস্তর করিয়া তুলিল। সংকীর্ণ খাল প্রবল নদনদী হইয়া উঠিয়া ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙলা সাহিত্যও অনুরূপ একটা ব্যাপার।

মধুসূদন-পূর্ববর্তী সমস্ত বাঙালী লেখককেই মূলতঃ কর্মী ধরিয়া লইয়া বিচার করিতে হইবে। কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রচুর সাহিত্যকীর্তি সত্ত্বেও মূলতঃ তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না। সুপাঠ্য, সুষম, শিল্পোত্তীর্ণ রচনা লিখিলেই সাহিত্যিক হয় না, তবে নেপোলিয়ান সাহিত্যিক বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার পত্রাবলীর স্টাইল বিজ্ঞ সমালোচকদের মতে ফরাসী সাহিত্যের একটি স্থায়ী বস্তু, তাহা এমন সুন্দর যে অননুকরণীয়। কিন্তু তবু যে নেপোলিয়ান সাহিত্যিক নহেন, তাহার কারণ তাঁহার পত্রাবলীর মূলে সাহিত্যিক প্রেরণা নাই। কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনার মূলেও সাহিত্যিক প্রেরণা নাই; আছে কর্মোদ্যম, আছে সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা। হুতোম পেঁচার নক্সা সাহিত্য কিন্তু হুতোম স্বয়ং সাহিত্যিক নহেন।

টেকচাঁদ ও হুতোম দুজনেই ব্যঙ্গ-লেখক, দুজনের সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত মন্তব্য খাটে, বস্তুতঃ সমস্ত ব্যঙ্গ-লেখক সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। ব্যঙ্গ-লেখকগণ মূলতঃ কর্মী। সুইফ্‌ট, ভল্‌টেয়ার রাবলে কর্মকুশলী ব্যক্তি ছিলেন; অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দেখিতে পাই যে, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পরশুরাম বিচিত্র-কর্মা পুরুষ। টেকচাঁদ ও হুতোমও মূলতঃ কর্মী-পুরুষ। তৎকালীন নব-জাগরণের কর্মোদ্যমের বিকার আলাল ও হুতোম পেঁচার নক্সা। একদিকে কর্মোদ্যম বিশুদ্ধ শিল্পোদ্যমের পথে মোড় ঘুরিতেছিল, অন্যদিকে টেকচাঁদ ও হুতোম উদ্দেশ্যের বিকার না ঘটাইয়া তাহাকে সাহিত্যের পথে চালিত করিতেছিলেন। ব্যঙ্গ-রচনা প্রচ্ছন্ন কর্মস্পৃহা, সে শিল্প জগতের বৃহন্নলা, নাচ শেখায় বটে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য কখনো বিস্মৃত হয় না, এমন কি উত্তর গো-গৃহের রণক্ষেত্রে সারথি মাত্র হইয়াও সে রথীর কাজ করিতে থাকে। জগন্ময়তা ও তন্ময়তাকে হাইফেনের দ্বারা যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে ব্যঙ্গ-শিল্প। মূলে সে কর্মী, ফলে সে সাহিত্যিক।

কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ১৮৪০ সালে, ত্রিশটি বৎসর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। হুতোম পেঁচার নক্সা ১ম খণ্ডের প্রকাশের কাল ১৮৬১। তখন লেখকের বয়স একুশ বৎসরের অধিক নয়, রচনার বয়স আরও কম হওয়াই সম্ভব। লেখকের বয়সের কথা মনে রাখিয়া তৎকালিক সাহিত্যের পারিপার্শ্বিকে যখন নক্সার বিচার করিতে বসি তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যদিচ হুতোম আলালের অনুকরণে লিখিত, লেখক নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, যদিচ আলালের গল্পের আকর্ষণ হুতোমে নাই, তবু হুতোমের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রবীণ টেকচাঁদ স্বোদ্ভাবিত পথে যেখানে অত্যন্ত

প্রাধানে পদক্ষেপ করিয়াছেন, তরুণ কালী-প্রসন্নের অকৃপণ আগ্রহ সেখানে আতিশয্য সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। হুতোমের চলতি ভাষায় আতিশয্য, বর্ণনায় আতিশয্য, Realism বা জগন্ময়তায় আতিশয্য, আতিশয্যের টানেই অবাঞ্ছিত, অনাবশ্যক অশ্লীলতা জোয়ারের মুখের আবর্জনার মতো নক্সার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আতিশয্য তরুণের ধর্ম, কেবল কালীপ্রসন্ন তরুণ ছিলেন না, তৎকালীন নব-জাগ্রত ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালী সমাজটাই তরুণ ছিল, নিজেদের তাহারা বলিত ইয়ং বেঙ্গল, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিধি সংকীর্ণ করিয়া ইয়ং ক্যালকাটাও বলিত। 'হুতোম পেঁচার নক্সায়' একখানি ছবি আছে—একটি ভূগোলকের পৃষ্ঠে বসিয়া, ঝুঁটি বাঁধা মনুষ্যা-কৃতি হুতোম নক্সা উড়াইতেছে, পাখাওয়ালা কতকগুলি নক্সা আকাশে উড্ডীন, একখানি হুতোমের হাতে উড়িবার মুখে। ছবিখানির নীচে লিখিত "হুতোম প্যাঁচা আশমানে বসে নক্সা উড়াচ্ছেন।" এই চিত্রখানির প্রকৃত মর্ম কি জানি না, তবে ছবিখানিতে কালীপ্রসন্নের মর্ম-কথা চিত্রিত হইয়াছে কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে না। কালীপ্রসন্ন এই বইখানিতে যে কেবল নক্সা উড়াইয়াছেন এমন মনে করা উচিত হইবে না, তাঁহার অধিকাংশ কাজই প্রচ্ছন্ন নক্সা ওড়ানো, তাহার একদিকে আন্তরিকতা একদিকে ব্যঙ্গ। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইবার পরে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন মধুসূদনকে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন। মানপত্র পাঠের পরে মধুসূদনকে তিনি একটি রূপার পানপাত্র উপহার দিয়া-ছিলেন। মধুসূদনকে পানপাত্র উপহার। ইহা কেবল হুতোমের মাথাতেই আসিতে পারিত। ইহা কি তাঁহার একটা নক্সা ওড়ানো নয়? তাঁহার সম্বন্ধে সত্যেন দত্তর যে কবিতাটি আছে তাহাতে উচিত মূল্য দিয়া ব্রাহ্মণগণের টিকি কাটিয়া প্রদর্শন ও রক্ষা করিবার উল্লেখ আছে। এ ঘটনা কতদূর সত্য জানি না। তবে হুতোমে দু'এক স্থলে ব্রাহ্মণের শিখা কর্তনের উল্লেখ দেখিতে পাই। ব্যাপারটা সত্য হইলে বিস্মিত না হইয়া মনে করা উচিত যে, ওটাও আর একটা নক্সা ওড়ানো। নানাভাবের নক্সা উড়াইতে উড়াইতে কালীপ্রসন্ন নিজের জীবন ও অর্থ দুই-ই উড়াইতেছিলেন, এক বাঙলা মহাভারত অনুবাদে, মুদ্রনে ও বিতরণেই প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নক্সা উড়াইবার খরচ বড় কম নয়। দেশহিতকর নানাবিধ কাজের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন, খরচ করিতেন, তাঁহার সেই সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার ইতিহাস আছে হুতোমের নক্সায়। হুতোম পেঁচার নক্সা শুধু কালীপ্রসন্ন সিংহের কর্মজীবনের ডায়রী নয়, বইখানা তৎকালীন কলিকাতার সামাজিক গেজেট। এমন মূল্যবান সমসাময়িক দলিল আর অধিক নাই। কালীপ্রসন্ন মূলতঃ কর্মী বলিয়াই নক্সা মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন, প্রধানতঃ সাহিত্যিক হইলে নক্সা মূলে নির্মিত অট্টালিকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

**মহাত্মার মহাপ্রয়াণে**—শ্রীঅমরেন্দ্র প্রামাণিক, বি এ, বি টি, এম [illegible], দক্ষিণ [illegible] ইসলামিয়া, [illegible]। প্রাপ্তিস্থান—দেশপ্রাণ [illegible], কলিকাতা। মূল্য [illegible] আনা।

[illegible] মহাপ্রয়াণে আলোচ্য পুস্তকে [illegible] শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে। [illegible] পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উক্তি, [illegible] বাণী সকলেই [illegible] মহাত্মার মহাত্মাজীর এমন [illegible] বহুল প্রচারিত হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

**দেবীযুদ্ধ**—শরৎচন্দ্র চৌধুরী, বি এ প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, শ্রীহট্ট অথবা চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

"দেবীযুদ্ধ" ১৩০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হইয়া স্বদেশী যুগে রাজরোষে পতিত ও বাজেয়াপ্ত হয়। উহাকে পুনঃ প্রকাশিত করিয়া প্রকাশক একটি লুপ্ত বস্তুর উদ্ধার সাধন করিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী অবলম্বনেই প্রধানতঃ এই কাব্যখানি রচিত; কিন্তু রচয়িতা পৌরাণিক কাহিনীর ছায়ামাত্র রাখিয়া, দেশকালোপযোগী পরিচ্ছদে উহাকে ভূষিত করিয়াছেন। তিনি চণ্ডী-উক্ত দেবাসুর সংগ্রামকে বিদেশী কর্তৃক এই দেশের স্বাধীনতা হরণ এবং উহার পুনঃ প্রাপ্তির সংগ্রামে পরিণত করিয়া গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে এক অভিনব রূপদান করিয়াছেন—ফলে গ্রন্থ মামুলি চণ্ডীমাত্র না হইয়া রূপ, রস ও দেশপ্রেমের ঐশ্বর্যে অভি-মণ্ডিত হইয়াছে। বিদেশী সরকারের অস্ত্র-নীতি এবং কংগ্রেস-নীতির মহত্ত্ব এই গ্রন্থমধ্যে পাঠক অতিশয় প্রোজ্জ্বল দেখিতে পাইবেন। 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের একটি পান্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা এই গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের ভূমিকাস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। ৬৬।৪৮

**গীতা ও হিন্দুধর্ম**—শ্রীরাজেশ্বর ঘোষ, এম এ, পি এইচ ডি প্রণীত। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানা গ্রন্থকারের এক বিরাট প্রচেষ্টা। উপস্থিত প্রথম খণ্ডে ডিমাই আকারের [illegible] পৃষ্ঠার মধ্যে [illegible] ভূমিকামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গীতা ও উপনিষদাদিকে ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞ গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য [illegible] আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানা পাঠ করিলে ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেই উপকৃত হইবেন। এমন কি, সাধারণ পাঠকগণও গ্রন্থকারের এই [illegible] পাঠ করিয়া হিন্দুধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ৬৫।৪৮

**সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বজবজ, ২৪ পরগণা। মূল্য তিন টাকা।

যোগশাস্ত্রোক্ত বহুবিধ আসন ও মুদ্রা এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকল ব্যায়াম অভ্যাসের দ্বারা যোগিগণ নিজ দেহকে সাধনার উপযোগী করিয়া তুলেন। গৃহীরাও এই ব্যায়ামাভ্যাস দ্বারা দেহকে রোগমুক্ত ও কর্মক্ষম রাখিতে সমর্থ হইবেন। গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যায়ামগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থ শেষে অনেক চিত্র স্থান পাইয়াছে, তাহাতে প্রথম শিক্ষার্থী-দের বিশেষ সুবিধা হইবে।

**মনঃশক্তি প্রভাব বা উইল-ফোর্স**—শ্রীমৎ রামানন্দ ঠাকুর প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মনঃশক্তি প্রভাবে অসাধ্য সাধিত হইয়া থাকে। ঐ শক্তি দ্বারা আশ্চর্যজনকভাবে কঠিন পীড়াদি আরোগ্য করিতে মহাপুরুষগণের জীবনে দেখা গিয়াছে। ঐ শক্তি লাভ করা বহু আয়াস ও সাধনা সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। শুধু পুস্তক পাঠে উহা লাভ করা যায় কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনে জিজ্ঞাসা রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা মনঃশক্তি লাভের উপায় নানারূপ উপদেশ দ্বারা দেখাইয়াছেন। পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ৭।৪৮

**'পথের দাবী'র শেষ কথা**—শ্রীরঘুনন্দন দাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—অমিয় লাইব্রেরী, ১৯, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

সব্যসাচী, শরৎচন্দ্রের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রটির চিত্রকার কথাসাহিত্যসম্রাট যেখানে শেষ করিয়াছেন, সেইখান হইতে উহাকে লইয়া আলোচ্য গ্রন্থের লেখক আর একখানি উপন্যাসের অবতারণা করিয়াছেন। সব্যসাচীর এই নূতন পরিণতি যেমন পাঠকগণ বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে অনুধাবন করিবেন, তেমনি 'পথের দাবী'র শেষ কথা লেখক কিভাবে বলিতে চাহিয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল সমভাবেই উদ্রিক্ত হইবে। সব্যসাচীর এই পরিণত জীবন চিত্রণে লেখকের যথেষ্ট দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। পাঠকগণ উহা পাঠে নূতন আলোকের সন্ধান পাইবেন। ২।৪৮

**স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা**—শ্রীরাখালদাস সোম প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা এবং উহার ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি গদ্য পদ্য রচনা উত্তম কাগজে ও রঙ্গীন কালিতে মুদ্রিত হইয়াছে। দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণের কয়েকখানি ছবি আছে। ৬৩।৪৮

# ইন্দ্রজিতের চিঠি

## বিলাত ফেরৎ বনাম জেল ফেরৎ

ইন্দ্রজিৎ লোকটা যে বেঁচে আছে, মরেনি সে কথাটা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই অনেকদিন পরে দুটো কথা লিখতে বসেছি। অবশ্যি লোকটা সত্যি সত্যি মরলে এতদিনে নিশ্চয় বাঙলা দেশের কোনো মহাকবি নব পর্যায় মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করে ফেলতেন। তা যখন হয়নি তখন বেঁচে যে আছি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। মাঝখানটায় সামান্য একটু খটকা লেগেছিল; কারণ প্র-না-বি তাঁর এ্যালবামের ভূমিকায় আমাকে প্রায় স্বর্গদ্বার অবধি পেঁছে দিয়েছিলেন। বাঙলা দেশে মৃত্যুর পূর্বে কেউ বড় একটা প্রশংসা লাভ করে না। অমর হতে হলে আগে মরতে হয়। প্র-না-বি'র কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি আগে ভাগেই আমার epitaph রচনা করে রেখেছেন।

আপনাদের পূর্বাহ্নেই বলে রেখেছিলাম যে, পুণ্যফলে আমার যদি কোনকালে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটে তবে আবার এই 'দেশে'তেই জন্মগ্রহণ করব। অর্থাৎ যদি লিখি তো 'দেশ'এর পাঠকদের জন্যই লিখব। তবে কিনা বৎসরকাল যাবৎ আপনাদের সঙ্গে আমার যে সাপ্তাহিক সম্বন্ধটি গড়ে উঠেছিল সেটি অবশ্যই বজায় রাখতে পারবো না। কারণ আমি নিয়মতান্ত্রিক মানুষ নই, নিয়মমাফিক কাজ করা আমার ধাতে সয় না। পুরোপুরি এক বছর সে কাজ করে আমি যে কি পরিমাণ হয়রান হয়েছি কি বলব। ঠিক করেছি এখন আমি খেয়াল খুসী মতো লিখব, সেটা মাসে একবার হতে পারে চাই কি বৎসরেও একবার হতে পারে।

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন আমার আগের কোন লেখায় আমি ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধার করেছি। আজকেও একটু ইতিহাসের চর্চা করব যদিচ সেটা ইস্কুল পাঠ্য কিম্বা কলেজ পাঠ্য ইতিহাস নয়। বাঙলা দেশে তথা ভারতবর্ষে এক যুগ গেছে যখন বিলেত ফেরৎদের নিয়ে সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কালো বরণ নিয়েও যাঁরা কালাপানি পার হতেন দেশে ফিরে এলে সমাজ তাঁদের সহজে রেহাই দিত না। গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তবে ছাড়ত। এঁরা যে স্বয়ং প্রমিথিয়ুসের মতো বিলিতি স্বর্গ থেকে বহ্নি-শিখা এনে তিমিরাচ্ছন্ন দেশে আলোক বিকিরণ করছেন সেকথা সমাজ স্বীকার করত না। প্রথম যুগে বন্দী প্রমিথিয়ুসের মতো এঁদেরকেও হিন্দু-সমাজ রীতিমতো কোণঠাসা করে রেখেছিল। তবে কিনা এঁরাও ছেড়ে কথা কননি। দলে ভারি হবার সঙ্গে সঙ্গে কালাপাহাড়ী তাণ্ডবে হিন্দু সমাজের ভিতশুদ্ধ নেড়ে দিয়েছিলেন। নিষিদ্ধ মাংস আধা সেদ্ধ করে খেয়েছেন, হাড় ছোবরা বামুন পণ্ডিতের বাড়িতে ছুঁড়ে ফেলেছেন, গঙ্গোদক ছেড়ে বিলিতি পানীয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। অবশ্যি এসব অ-হিন্দুয়ানির হাতেখড়ি হিন্দু কলেজেই সর্বপ্রথম হয়েছিল। তারপরে ধীরে ধীরে সময়ের গতির সঙ্গে সমাজের মতি বদলেছে। আমাদের গত একশো বছরের ইতিহাস প্রমিথিয়ুসের বন্ধনমুক্তির ইতিহাস। বিলাত ফেরতরা সমাজবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজও বহু সংস্কার থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। সে ইতিহাস ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্রে সমাজে ব্যবসায়ক্ষেত্রে চাকরীর বাজারে ক্রমে বিলাত ফেরৎদেরই প্রাধান্য হল। সমাজের ভাঙা গড়ার ইতিহাস বড় বিচিত্র। ভাবলে হাসি পায় সমাজ একদিন যাদের একঘরে করে রেখেছিল পরে তারাই সমাজপতির আসন দখল করেছে। এর সব চেয়ে হাস্যকর পরিণতি হচ্ছে বর্তমান হিন্দু মহাসভা। নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন হিন্দু মহাসভার উচ্চতন কর্মকর্তারা ভট্টপল্লীর ভট্চাজ বামুন নন্—অধিকাংশই বিলেত ফেরৎ সাহেব। তাও আবার যেমন তেমন বিলাত ফেরৎ নন—বিলাত ফেরৎদের মধ্যে সবচেয়ে যে ঝাঁঝালো সেই ব্যারিস্টার সম্প্রদায়ের লোক। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন—

> এ যে ভারি আশ্চায্যি
> বিলেত ফেরতা টানছেন তামাক
> সিগারেট খাচ্ছেন ভটচায্যি।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। সনাতন হিন্দুধর্ম সংরক্ষণীর ভার পড়েছে বিলাত ফেরৎদের ওপরে। তামাক টানা তো সামান্য ব্যাপার। টিকির ভেতরে এ্যাটমিক শক্তির ব্যাখ্যা এখন এঁরাই করবেন।

ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম পর্যায়ে যেমন বিলাত গমন, দ্বিতীয় পর্যায়ে তেমনি জেল গমন। সেটাও বন্ধনমুক্তিরই ইতিহাস—প্রথমটি সামাজিক বন্ধন থেকে, দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রিক বন্ধন থেকে। মহাত্মাজী ভদ্র এবং শিক্ষিত সমাজের কাছে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এর আগে কারো কারাবাস হলে তাকে সমাজে পতিত হতে হ'ত। এক্ষেত্রেও গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবার বিধি প্রচলিত ছিল। এমন কি কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে জেলে গেলেও জেলফেরতার মনে হিঁদুয়ানীর খুঁতখুঁতুনি থেকে যেত। গোরা উপন্যাস তার প্রমাণ। গোরা জেল থেকে এসে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। গান্ধী এসে সব ওলট পালট করে দিলেন। সমুদ্রযাত্রার মতো জেলে যাওয়ার ভীতিও সমাজ থেকে দূর হ'ল। এমনকি জেলে যাওয়াটাই ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেল। যারা গেল না তারা কৃপার পাত্র হয়ে রইল। বেশ মনে আছে আমাদের যে সব বন্ধুরা গোড়ার দিকে জেল ঘুরে এসেছিলেন তাঁরা আমাদের চোখে প্রায় 'হিরো' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিলেত ফেরৎ বন্ধুরা ওদেশের নীল-নয়নাদের সম্বন্ধে যেমন রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিতেন জেলফেরৎ বন্ধুর দল জেলের 'লপ্‌সি' সম্বন্ধেও প্রায় তদনুরূপ বর্ণনাই পেশ করতেন।

যাক্ প্রায়শ্চিত্ত তো দূরের কথা, এখন থেকে জেল ফেরৎটাই হ'ল সমাজে সব চেয়ে বড় কৌলিন্য। বিলিতিয়ানার সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত এইখানেই হল। গান্ধীজী দেশবাসীকে বিলিতিয়ানা ছেড়ে স্বদেশীয়ানায় দীক্ষা দিলেন। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে সে যুগের বিলাত ফেরৎদের নিয়েই তিনি নবযুগের সূচনা করেছিলেন। বিলাতি যুগের হোতাদেরই স্বদেশী যজ্ঞে সর্বপ্রথম আহুতি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ বিলাত ফেরৎরাই সর্বাগ্রে জেলে গিয়েছেন।

জেলখানা এ যুগের সবচেয়ে বড় তীর্থ। শ্রীঘর হয়েছে শ্রীক্ষেত্র। ধনী নির্ধন শিক্ষিত অশিক্ষিত ছোট বড় সবাই এক যায়গায় মিলিত হয়েছে। বহু মানবের মিলন ক্ষেত্রেই মহামানবের শিক্ষাকেন্দ্র। গত ত্রিশ বছরে ভারতবর্ষের জেলখানাগুলো যে শিক্ষা দিয়েছে দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় মিলেও সে শিক্ষা দিতে পারেনি। এইসব জেলখানায় ভারতবর্ষের সত্যিকারের সিভিল সার্ভেণ্ট তৈরী হয়েছে। রাউণ্ড টেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজী স্বয়ং এই জেলফেরৎ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সিভিল সার্ভেণ্ট আখ্যা দিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বিলেত ফেরতের যুগ গিয়েছে। তারপর থেকে জেল ফেরতের যুগ। রাষ্ট্রে সমাজে বিলাত ফেরতদের যে সম্মান প্রতিপত্তি ছিল সেটা এখন জেলফেরতে বর্তালো। চাক্‌রির বাজারে বিলিতি ডিগ্রীর যেমন বিশেষ মূল্য ছিল, জেল গমন কোন কোন মহলে অনুরূপ মূল্য পেতে লাগল। হ্যাট কোট নেকটাই ছাপিয়ে শুভ্র খদ্দরের মহিমা বাড়ল। বিলেত ফেরতরা আলাদা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের পোষাক আলাদা। ভাষা আলাদা, চালচলন আলাদা। তাঁদের বেলায় পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর। সুখের

বিষয় জেল ফেরতরা আলাদা সমাজ গড়েননি। ইংগবংগ তো দূরের কথা—এ'রা অংগ বংগ কলিংগ সব এক জায়গায় জড় করেছিলেন। এ'দের আপন পর বিভেদ ছিল না। ঘরকে বাহির করেননি বরং বাহিরকেই ঘর্ করেছেন।

অবশ্যি কালে কালে সব সমাজেই একটু স্নবারি এসে যায়। জেলফেরৎ সমাজ পুরো-পুরি স্নবারিমুক্ত এমন কথা বলতে পারিনে। বিলেত ফেরতরা যেমন মনে করতেন তাঁরাই দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক জেলফেরতরাও হয়তো ভেবে থাকবেন দেশ-প্রেমের একচেটিয়া অধিকারটা তাঁদেরই। অন্ততঃ ওরা ভাবুন আর নাই ভাবুন আমি মনেমনে নিজেকে সত্যি অন্ত্যজ মনে করতুম। বন্ধুবান্ধব মিলে প্রায়ই বলাবলি করতাম যে একবার কয়েক মাসের জন্য জেল ঘুরে এলে হোতো। যে দেশে ইনলুলু কিম্বা হন্ডুরাসের ডিগ্রীর প্রতিও মোহ রয়েছে সে দেশের স্বাধীন রাষ্ট্রে জেলফেরতের বাজার দর একটু বাড়বেই। কিন্তু ইংরেজ এমন তাড়াতাড়ি তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেল যে শেষপর্যন্ত জেলে যাবার অবসরই মিলল না। অবশ্যি এখন যা দেখছি তাতে দুঃখিত হবার তেমন কারণ নেই। এর চাইতে বরং ইংরেজের হাতে পায়ে ধরে একটা খেতাব টেতাব জুটিয়ে রাখলে হোতো। দেখা যাচ্ছে উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ করে দিলেই কংগ্রেসী দেবতাদের তুষ্ট করা যায়। মহাত্মাজী জেলফেরতা কংগ্রেস-সেবীদের বৃথাই সিভিল সার্ভেণ্ট আখ্যা দিয়েছিলেন। ইংরেজ আমলের সিভিল সার্ভেণ্টরা এখন আরো জাঁকিয়ে বসেছেন। কারণ কিনা এ'দের অভিজ্ঞতা আছে —চুরি জুয়োচুরি, ঘুষ ঘাষি ইত্যাদি অনেক-রকম অভিজ্ঞতা। আবার বিলেত ফেরতার দিন ফিরে আসছে। দেশ স্বাধীন হবার সংগে সংগে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক বিলেত যাচ্ছে—অর্ণবযানে নয় ব্যোমযানে—কালাপানি পার হবার আর তর সইছে না। ইংরেজের লোহার শেকলটি ছিঁড়েছে, কিন্তু স্বর্ণশৃংখলের এখনও অনেক বাকী। মোহ না ঘুচলে মুক্তি ঘটে না।

# স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ

## খাদ্য বিজ্ঞান ও তাহার সমস্যা

শ্রীশান্তিদাশংকর দাশগুপ্ত, এম এস-সি

মানুষের ইতিহাস বহু সহস্র বৎসরের হইলেও, খাদ্য সমস্যা ও তাহার বিজ্ঞান লইয়া সে মাত্র সম্প্রতি মাথা ঘামাইতে শুরু করিয়াছে। জমির পরিমাণ বাড়িতেছে না—বাড়িতেছে মানুষের সংখ্যা। সুতরাং খাদ্য বিজ্ঞানের নানাদিক আজ যেমন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, এমন আর কোন দিনই হয় নাই।

খাদ্যের যে এত দিক আছে, তাহাও আমরা পূর্বে জানিতাম না। খাদ্য হইলেই হইত। মুচিকর ও পেট ভরাইতে পারিলেই তাহা খাদ্য হিসাবে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা হইত। চাউল চাউলই; তাহা হাতে ছাটা, সিদ্ধ, না আতপ ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন ৬০।৭০ বৎসর আগে ছিল না। এ-বিষয়ে প্রথম প্রয়োজন শুরু হইল ১৮৯৭ সনে। জাপানী সৈন্যদের ভিতর সে-সময় এক নতুন অজানা রোগের আবির্ভাব হইল। Eejkman বলিয়া এক খাদ্য বৈজ্ঞানিক দেখাইলেন যে সৈন্যদের সহিত যে চাউল দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পালিসের দৌলতে উপরের পরদা হারাইয়া সুন্দর ও চকচকে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ভিতর যে খাদ্য-প্রাণ ছিল, (ভিটামিন), তাহা উপরের পরদার সহিত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং সেই খাদ্য প্রাণের অভাবেই সৈনারা ঐ নূতন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। এই রোগের বর্তমান নাম বেরিবেরি। ভিটামিন জগতের সহিত এই আমাদের প্রথম আলো আঁধারে পরিচয়। ইহার পর হইতে আঁধার কাটিয়া ক্রমে আলোর পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে—আর একটির পর একটি ভিটামিন বৈজ্ঞানিকের হাতে অবগুণ্ঠন মুক্ত হইয়া ধরা পড়িয়াছে। ধরা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু কি করিয়া যে এই ভিটামিনের দল তাহাদের কর্তব্য শরীরের ভিতর সমাধান করে তাহার রহস্য দুই একটি ক্ষেত্রে ছাড়া আজও বৈজ্ঞানিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ভিটামিন খাদ্য নহে, খাদ্য-প্রাণ। শুধু ভিটামিন খাইয়া আমরা বাঁচিতে পারি না, আবার ভিটামিন বর্জিত খাদ্য খাইয়াও সুস্থ থাকিবার উপায় নাই।

খাদ্য বৈজ্ঞানিকের কাজ হইল বিজ্ঞানের দিক হইতে এমন সব খাদ্য আমাদের জন্য সুপারিশ করা যাহা দ্বারা আমরা ঔষধ বা তথাকথিত টনিক না খাইয়া সুস্থ সবল থাকিতে পারি, একান্ত অসুখ হইলে রোগের বীজের বিরুদ্ধে লড়িয়া চিকিৎসকের সহায়তা করিতে পারি। ভিটামিন না হইলে চলে না জানি। কিন্তু কতো হইলে যে কোন ভিটামিনের প্রয়োজন-মাত্রা পুরিয়া যায়, তাহা আমাদের ভাল করিয়া জানা নাই। তবে এইটুকু জানা আছে যে গাদা গাদা ভিটামিন খাইবার কোন প্রয়োজন নাই। কৃত্রিম ভিটামিন আমাদের তখনই প্রয়োজন যখন খাদ্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন সংগ্রহ করা যাইতেছে না।

নানা রকম ভিটামিনের মত আমাদের সম-প্রয়োজন নানা রকম ধাতব পদার্থের। খাদ্য মাত্রই কিছু না কিছু ধাতব পদার্থ আমাদের শরীরকে দান করে। অপেক্ষাকৃত অল্প বিখ্যাত ধাতব পদার্থ ম্যাগনেসিয়াম না হইলে আমাদের সুস্থ থাকা অসম্ভব। অথচ আমরা ম্যাগনেসিয়ামের জন্য বিচলিত হই না, কারণ খাদ্য হইতে যেটুকু আমরা পাই, তাহা প্রায় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট।

ধাতব পদার্থের ভিতর ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ক্যালসিয়ামযুক্ত ঔষধে দোকান-দারের আলমারি ভর্তি, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতা পরিপূর্ণ। ইহা হইতেই ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন ও তাহার গুরুত্ব বোঝা যায়। রোগা ছেলের হাড় মোটা করিবার জন্য, যক্ষ্মা রোগীর ক্ষত কমাইবার জন্য ক্যালসিয়াম দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ক্যালসিয়াম শরীরে প্রবেশ করান এক জিনিস, আর তাহাকে শরীরের ভিতর ধরিয়া রাখিয়া শরীরস্থ করা আর এক জিনিস। অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়ামযুক্ত ঔষধ দেওয়া হইতেছে অথচ সব ক্যালসিয়ামই শরীর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। শরীরে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিলে ক্যালসিয়াম শরীরস্থ হয়, তাহা ঘটিতেছে না—অর্থাৎ Calcium Metabolismএ ছন্দ লাগিয়াছে। ক্যালসিয়ামকে শরীরস্থ করিতে হইলে ভিটামিন ডি-র একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা জানা থাকিলেও ভিটামিন ডি-র অণু সকল যে কি করিয়া ক্যালসিয়ামের অণুপরমাণু সকলকে রক্তস্রোত হইতে পাকড়াও করিয়া হাড়ের সহিত জুড়িয়া দিতেছে তাহার রহস্য অর্থাৎ mechanism of action, বৈজ্ঞানিক আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু বুঝিবার চেষ্টার বিরাম নাই।

ক্যালসিয়াম শরীরস্থ হওয়ার সহিত খাদ্যের ভিটামিন ডি ছাড়াও ফাইটিক এ্যাসিড (Phytic Acid) নামক একটি পদার্থের বিশেষ যোগ আছে। গমের লাল অংশের ভিতর ইহা থাকে। ফাইটিক এ্যাসিড শরীরের ক্যালসিয়ামের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাকে

অদ্রবণীয় অবস্থায় পরিণত করে। ফলে, শরীরে ক্যালসিয়ামএর মাত্রা কমিতে থাকে। যুদ্ধের সময় যখন গমের যে অংশ দ্বারা রুটি প্রস্তুত করা হয়, তাহার মাত্রা ইংলণ্ডে বাড়াইয়া ৮৫ ভাগ করা হইল; ইংলণ্ডের খাদ্য বৈজ্ঞানিক তখন নির্দেশ দিলেন যে রুটির আটার সহিত ক্যালসিয়ামযুক্ত পদার্থ এমন পরিমাণে মিশাইতে হইবে, যাহাতে ফাইটিক এ্যাসিডের দ্বারা কিছুটা ক্যালসিয়াম নষ্ট হইলেও শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম থাকিয়া যায়। ইংলণ্ডের দুর্দিনে তাহার খাদ্য বৈজ্ঞানিক দেশের স্বাস্থ্যকে অনেক বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে। আটার সহিত ক্যালসিয়াম মেশান একটি উদাহরণ মাত্র।

ক্যালসিয়ামের পরে আমাদের প্রয়োজন আয়রন বা লৌহের। ক্যালসিয়ামের, ম্যাগ্নেসিয়ামের যখন বাঙলা নাই তখন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় লৌহকে লৌহ না বলিয়া আয়রন বলাই ভাল। আয়রনের পরমাণু না হইলে লাল রক্ত কণিকার গঠন হয় না। এইজন্য রক্তাল্পতার অসুখে আয়রনঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা সাধারণতঃ খাদ্য, বিশেষ করিয়া শাকসব্জী হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় আয়রন গ্রহণ করিয়া থাকি।

ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি ছাড়াও আমাদের জিঙ্ক (Zinc), কপার ও ম্যাঙ্গানিজের * (Manganese) প্রয়োজন রহিয়াছে। এই সব ধাতুর প্রয়োজনীয় মাত্রা এত কম যে খাদ্য হইতে যে সামান্য পরিমাণ আমরা পাই তাহাতেই কাজ চলিয়া যায়।

অ-ধাতব পদার্থের ভিতর অপেক্ষাকৃত বেশী পরিচিত কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি ছাড়া, অতি সামান্য পরিমাণে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আইওডিন ও ফ্লোরিনের। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের জন্য আইওডিনের দরকার, আর ফ্লোরিন চাই দাঁতের জন্যে। দশ লক্ষ ভাগ পানীয় জলে দুই তিন ভাগ ফ্লোরিন থাকিলেও কাজ চলিয়া যায়। দাঁতের বিজ্ঞান ধীরে ধীরে বিশেষ করিয়া খাদ্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম যুদ্ধের আগে ধারণা ছিল যে মুখের ভিতরকার খাদ্য কণিকা সকল পচিয়া যত অনর্থ সৃষ্টি করে এবং ইহারই জন্যে দাঁতে ঘুন ধরিয়া যায়, পাইওরিয়ার সৃষ্টি হয়, মাড়ি ফুলিয়া ওঠে ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমানের বৈজ্ঞানিক বলেন যে, মুখের ভিতর পরিষ্কার রাখা নিশ্চয়ই উপকারী; কিন্তু দাঁত খারাপ হবার আসল কারণ শরীরে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি এবং ফ্লোরিনযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের অভাব। খাদ্য বিজ্ঞান না জানিয়াও আমাদের পিতামহ পিতামহীরা ভাল ও খাঁটি খাদ্য গ্রহণ করিতেন। এইজনাই অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা সে-যুগে ৯০ বৎসর বয়সেও দাঁতের জোরে মিশ্রি চিবাইয়া খাইতেন। প্রাচুর্যের ও সস্তার দিনে তাঁহারা যে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতেন; আজ দুর্মূল্যের বাজারে যদি খাদ্য বৈজ্ঞানিক গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় সেই সব খাদ্যের গুণাবলীসম্পন্ন একটি নতুন ও সস্তা খাদ্য তালিকা জনগণের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আজিকার খোকাখুকীরাও ৯০ বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার আশা করিতে পারে এবং সেই বয়সে দাঁত দিয়া তাল মিশ্রি ভাঙিবারও ভরসা রাখিতে পারে। ব্যবহারিক দিক দিয়া নূতন পরিবেশের ভিতর পুরাতনকে গ্রহণ করিবার পন্থা আবিষ্কারই আমাদের প্রধান সমস্যা।

বিগত ২৫ বৎসরের ভিতর খাদ্য বিজ্ঞান যে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু এই যে উন্নতি পৃথিবীময় ঘটিয়াছে, ইহা হইতে আমরা কি পাইলাম, আমাদের দেশের গরীব লোকেরা কি পাইল, কি তাহাদের ভাল হইল তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। হোটেলে হোটেলে যে খাদ্য বণ্টন করা হয়, স্কুল বোর্ডিংএ ছেলে-মেয়েদের যে আহার্য দেওয়া হয়, তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইতেছে কিনা, ইহা দেখিবার কোন বিভাগ আমাদের সরকারের তালিকায় নাই। অর্থাৎ সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন। খাদ্য বিজ্ঞানকে ব্যবহারে না আনিতে পারিলে, তাহার জ্ঞান আমাদের কলেজের বক্তৃতা ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, আসল কাজে আসিবে না। আসল কাজে যাহাতে আসে তাহার জন্য আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ করিয়া সচেতন হইতে হইবে। দেশ মানে দেশের মানুষ। সেই মানুষেরা যদি সুস্থ ও সবল হইয়া বাঁচিয়া না থাকিতে পারিল তবে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা অলীক ও অর্থহীন।

# ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনা

নববর্ষে উৎসব করার রেওয়াজ সব দেশ এবং সব জাতিতেই আছে। আমরাও প্রতি বৎসরই ক'রে থাকি। কিন্তু এবারকার উৎসবে একটু বিশেষত্ব থাকবার কথা; কারণ, স্বাধীন ভারতে এবার নববর্ষ। দু' শত বছর পরে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এই সংপ্রাপ্তির উপযুক্ত সমারোহ, কিন্তু বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হাওড়ার আজাদ হিন্দ সেবা সঙ্ঘের অনুষ্ঠানটিতে নববর্ষ উৎসবের একটা বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। সঙ্ঘের কর্মীরা সেবাপরায়ণ। এখানকার শান্তি সঙ্ঘের তরুণেরা স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁরা দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এঁদের উদ্যোগেই এ অনুষ্ঠানটি হচ্ছে। এঁরা নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে ষোড়শোপচারে ভারতমাতার পূজার আয়োজন করেছেন। এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। কালের হাওয়া যেদিকে বইছে, তাতে এ আয়োজন অনেকের কাছে কিছু বেখাপ্পা লাগবে। অনেকে হয়ত এই মনে করবেন, আবার মূর্তি পূজার এ আয়োজন কেন? ভারতের জন্য কাজ, ভারতের নরনারীর সেবা—এই তো ভারতের পূজা, এর জন্যে মূর্তি গড়ে এমন একটা আয়োজন করার কি দরকার ছিল? আমরা মূর্তিপূজক। আমাদের মনে সে প্রশ্ন জাগে নাই। কথাটা অনেকের কাছে আশ্চর্য ঠেকবে; কথাটা বলতে হচ্ছে। যাঁরা ঐ রকমের কথা বলছেন, মূলতঃ তাঁদের যুক্তি ঠিক; কিন্তু নিরিখটা আসবে কোথা থেকে? সেবা বললেই সেবা করা যায় না, তা দৃষ্টির উপর নির্ভর করে, নিরিখের উপর নির্ভর করে। দৃষ্টি বা নিরিখের প্রভাবে মনের বৃত্তি স্পষ্ট হয়ে দৃষ্টির প্রেরণা যখন আমাদের অন্তরে জাগে তখনই আমাদের তৃপ্তি হয়। সেবার মধ্যে এই তৃপ্তির ভাবই প্রধান এবং সেবা সর্বাঙ্গীনভাবে আত্মনিবেদনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেই তাকে পূজা বলা যেতে পারে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে পূজা জিনিসটা কি, এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে বিশ্ব সর্বদেবময়, এই অনুভূতিতে মনের বৃত্তি সব পরিস্ফূর্ত হয়ে তখন তাঁর জন্য সব নিবেদন করতে সাধককে অনুপ্রাণিত করে, সেই জিনিসকেই পূজা বলে। আত্মনিবেদনের এই যে প্রেরণা এটা অনুমান জানে না; এ বস্তু অনুধ্যানসাপেক্ষ। এ ভক্তির সাধনা, শুধু বিচারের নয়। ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্র আনন্দমঠে মাতৃসাধনার পথে এই তত্ত্বই মুখ্যতো নির্দেশ করে গেছেন। আমরা দেখতে পাই, চণ্ডীতেও এ প্রশ্নটি উঠেছিল। ঋষি বললেন, এ জগৎ-ই মায়ের মূর্তি। কিন্তু আমাদের মনোজগতে সে মূর্তি তো আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা জোগায় না। আমরা পাথর, গাছপালা, এগুলোই দেখতে পাই। বিশ্বজননীর সেবায় এসব দেখে আমাদের মনে একাগ্রতা জাগে কই? ঋষি একথা বুঝতে পেরে এই সত্যই ব্যক্ত করলেন যে, না, মায়ের একটি চিন্মূর্তিও আছে। মা জড় নন, তিনি তোমাকে যে স্নেহ দিয়ে সদানন্দে আদর করছেন। যখন মায়ের এ মূর্তি দেখতে পাবে, তখনই দেহ, মন ও প্রাণ দিয়ে তাঁকে পূজা করতে পারবে। ভক্তি তো তেমনই পূজা। অন্তরে ভক্তির স্পর্শ লাগলেই মা হ'য়ে খাড়া ধ'রে দুষ্কৃত দলনের জন্যে তোমার কাছে এসে দাঁড়াবেন। দেখতে পাবে মাকে—সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্র শৃঙ্গে মহীত কাঞ্চনে। কাঞ্চনশৃঙ্গে স্বর্ণ বর্ণে উজ্জ্বল ক'রে মা জাগবেন।

যাঁরা তত্ত্বদর্শী তাঁরা মাকে এমনই দেখেছেন। মায়ের পূজা করতে হ'লে তাঁদের কথা শুনতে হবে, তাঁদের নির্দেশ মানতে হবে, আচার্য-স্বরূপে তাঁদের স্বীকার করতে হবে এবং তাঁদের প্রদত্ত মন্ত্রবলে সাধনা করতে হবে। তবেই পূজা সার্থক হতে পারে। বাঙালীর বড় সৌভাগ্য এই যে, তারা নিজেদের মধ্যে মন্ত্রদ্রষ্টা এমন একজন ঋষিকে পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মায়ের চিন্মূর্তি দেখেছিলেন এবং সেই দর্শন তাঁর মনোমূলে চিন্ময় স্পন্দন জাগিয়ে মাতৃমন্ত্রের স্ফুরণ ক'রেছিল। 'বন্দে মাতরম্' এই মন্ত্র। মন্ত্রমাত্রেই শক্তিবীজ। সাধারণ কথা বা অক্ষর নয়। তার ভিতর দেবতার অনুধ্যান অস্পষ্ট আকারে থাকে, সাধনায় প্রাণ পূর্ণ বিভূতিতে পরিস্ফূর্ত হ'য়ে উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আগেও এ দেশের তত্ত্বদর্শী সাধকদের দৃষ্টিতে দেশমাতৃকার চিন্ময়ী মূর্তি জেগেছিল। আমরা সাধকদের সমাজ-বিধানের ধারাগুলো নিয়েই অনেক সময় নাড়াচাড়া করি, তাঁদের অনুভূতি আমাদের অন্তরে খুব কমই সাড়া দেয়। দেশকালের পরিবর্তন এবং বিপর্যয়ের ফলে দৃষ্টিতে এই খণ্ডতা বা পরিচ্ছিন্নতা এসে পড়েছে। পরাধীনতা এ দেশের সমাজ চেতনাকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছে, তাই আমাদের মনে হয়, দেশের সেবা বা পূজাটা শুধু বুঝি পলিটিক্স, এর সঙ্গে ভারতের ধর্ম বা অধ্যাত্ম-সাধনার কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের এ ধারণা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এ দেশের সমগ্র সমাজ-নীতি এবং আধ্যাত্মিকতা স্বদেশপ্রেমের উপর ভিত্তি ক'রে প্রতিষ্ঠিত। দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের ধর্মশাস্ত্রগুলো অনেকেই আমরা পড়ি না এবং সেগুলো বাজে হয়ে পড়েছে বলে মনে করি। আমাদের ধারণা এই যে, ওগুলোতে এ যুগের মানুষ আমরা, আমাদের জানবার বা শিখবার কিছু নাই। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে সেগুলো আলোচনা করলে দেখতে পাব, এ যুগেও আমাদের পক্ষে অনেক জানবার এবং শিখবার বিষয় সেগুলোতে রয়েছে। মানব জীবনের মৌলিক সত্যের নির্দেশ সেখানে আছে। প্রকৃতপক্ষে ঋষিরাও 'বন্দে মাতরম্' গেয়েছেন। অধিকাংশ পুরাণেই মায়ের নামকীর্তন করা হ'য়েছে। আমরা ভাগবতে দেখতে পাই, নারদ ঋষি বীণাযন্ত্র করে আমাদের মায়ের বন্দনা গান গেয়েছেন। আপনারা যদি সে গান শোনেন, তবে বুঝতে পারবেন, বহু যুগ কেটে গেলেও সে গানের সুর সমানই মধুর রয়েছে এবং কালচক্রের বিবর্তন সত্ত্বেও ঋষি নির্দেশিত সত্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। নারদ ভারতভূমির মহিমার কীর্তন করতে গিয়ে বলেছেন, ভারতবর্ষে যারা জন্মেছে তারা ধন্য। অন্য দেশের লোকেরা দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য জয় করুক, কিন্তু তাতে তারা শান্তিলাভ করতে পারবে না, কামনা বাসনার আগুনে তারা জ্বলবে, পুড়বে; কিন্তু ভারতবর্ষের নির্দেশিত প্রেমে যদি অন্তর একবার সিক্ত হয়, তবে সেবা ও আত্মনিবেদনের দ্বারা মানুষ তাদের জীবনে অভয়ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে।

ভদ্র মহোদয়গণ, ভারতবর্ষকে যারা উপ-মহাদেশ বলে ব্যাখ্যা করতে চান এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের সংবেদন এ দেশের সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনে কোনদিন ছিল না, এই কথা যাঁরা বলেন, আমরা বলব, ভারতবর্ষের প্রকৃত ঐতিহ্য তাঁরা মোটেই জানেন না। সে সম্বন্ধে তাঁরা অকাট মূর্খ। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সমগ্র সংহতি এবং সাধনা ভারতবর্ষের অখণ্ডতার অনু-ভূতিতে উদ্দীপ্ত হ'য়েই সত্য এবং স্থায়ী হ'য়েছে। আমাদের সংস্কৃতিকে যে দিক দিয়েই আমরা দেখতে যাই না কেন, ভারতের অখণ্ডতাকে বাদ দেবার উপায় নাই। আমাদের অধ্যাত্ম সাধনা তো এ অখণ্ডতার উপর ভিত্তি না করলে চলতেই পারে না। আমাদের দৈনন্দিন পূজাপার্বণ, আচার অনুষ্ঠান সব জড়িয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শের সংবেদন একটা সংহতিবোধকে সমাজ জীবনে সক্রিয় রেখেছে। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, এক সঙ্গে আমাদের চিন্তার মূলে জেগে অখণ্ড ভারতবর্ষের মাধুরীকে সঞ্চারী করে তুলেছে। তীর্থসলিল আমাদের সন্তর্পিত করে। উত্তরবঙ্গের করতোয়া করোদ্ভবা, ত্রিস্রোতাকেও বাদ দিতে পারি না। বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে পদ্মা প্রেম-প্রবাহিনী। এদেরও বন্দনা করতে হয়। অখণ্ড ভারতবর্ষ আমাদের মনোময়ী মায়ের প্রতিমা; আমাদের অনুধ্যানের বস্তু।

ভারতবর্ষ আজ বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক সূত্রে বিষয়ের স্তরে এ সাময়িক নাড়াচাড়া মাত্র। মায়ের চিন্ময়ী মূর্তি অপরিচ্ছিন্নই আছে এবং ভক্ত, সাধক এবং কর্মী তাদের অনুধ্যানে মায়ের সেই চিন্মূর্তিই জাগাবে। স্বার্থ এবং সংকীর্ণতার পাকে যারা জড়িয়ে পড়েছে তারাই ও বিচ্ছিন্নতা বা বিভাগকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইবে। কিন্তু স্বার্থসমাচ্ছন্ন তাদের দৃষ্টিতে দোষ ঘটেছে বলে, সত্যের কোন পরিবর্তন হবে না এবং রাজনীতিক সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতের এই যে, কৃত্রিম ব্যবচ্ছেদ, এ জিনিস কিছুতেই বেশীদিন টিকতে পারে না। যারা গায়ের জোরে এ ব্যবচ্ছেদকে জীইয়ে রাখতে চেষ্টা করছে, নৈসর্গিক প্রতিক্রিয়ার আঘাত তাদের উপর এসে পড়তে বেশীদিন দেরী হবে না বলেই আমাদের মনে হয়।

ভদ্রমহোদয়গণ, বিরোধ আমরা চাই না, বিদ্বেষ আমাদের কাম্য নয়। প্রকৃতপক্ষে শক্তির এবং দুর্বলের আত্মকেন্দ্রিকতাই বিরোধ এবং বিদ্বেষকে জাগিয়ে তোলে, আত্মসম্প্রসারণের উদার প্রভাবে ঐসব দুষ্প্রবৃত্তির কোন স্থান নাই। আমরা যদি মাতৃসেবার প্রতি নিষ্ঠিত থাকতে পারি, তবে দুর্বলতার পাকের মধ্যে আমরা পড়বো না। পক্ষান্তরে আমাদের সংস্কৃতির মজ্জীভূত আত্ম-সম্প্রসারণশীলতাই সব সংকীর্ণতার উপর আমাদের সাধনাকে জয়যুক্ত করবে। যারা বিপথে গিয়েছে, জোর করে বা ঘাড় ধরে তাদের ফিরাতে হবে না। তারা নিজেরাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে, আমাদের সখ্য এবং সহযোগিতা চাইবে, সুতরাং বর্তমান বিপর্যয়ে আমরা যেন চঞ্চল না হই এবং আমাদের আদর্শনিষ্ঠা ও সংস্কৃতির গৌরবকে কোনদিক থেকে ক্ষুণ্ণ না করি।

একথা সত্য যে, অপ্রত্যাশিত আঘাতে, অনেক সময় আমাদের মনের ঘাঁটি নেড়ে দেয়, আর মন এমন জিনিস যে, এর ঘাঁটি যদি একবার নড়ে উঠে তবে বুদ্ধিবিচারের দ্বারা একে আবার শক্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ ক্ষেত্রে সাধনার শক্তি যাদের আছে, তাদের এগিয়ে আসতে হবে। ত্যাগ

ও প্রাণবলের পরিচয়ে সমাজ-মনকে সুস্থির রাখতে হবে, আত্মীয়তার স্পর্শে বিপন্নকে সঞ্জীবিত করতে হবে। শুধু মুখের উপদেশে এ কাজ হবে না। দুঃখ এই যে, ত্যাগ ও সেবার মহিমায় নিষ্ঠিত এই শ্রেণীর কর্মীদের আদর্শ থেকে আমাদের সমাজ-জীবন বঞ্চিত হতে বসেছে। সবদিকেই মান যশের জন্য কাঙালপনা আরম্ভ হয়েছে। মন্ত্রিগিরি এবং শাসন পরিচালনার উচ্চ পদাধিকার না পেলেই আমাদের হাত পা যেন আর উঠে না। আমাদের মনে হয়, নৈতিক এই অধঃপতনই আমাদের সবচেয়ে বড় সংকট। নৈতিক দৃঢ়তা যদি থাকে, সংগ্রামে দুঃখ নাই। অভীষ্টসিদ্ধি আজ যা না হোল, সাধনাতেই জীবনের সংগতি রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে নৈতিক শক্তির অভাবেই আমাদের চারিদিক অন্ধকার করে তুলেছে। যাঁরা প্রকৃত দেশসেবক এবং যাঁরা কর্মী, এই দুর্গতি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্য তাঁদের এগিয়ে যেতে হবে এবং দেশসেবার নামে এই ধরণের স্বার্থগত দৈন্য ও দুর্বলতাকে উৎখাত করতে হবে। দশটা বড় বিবৃতি দেওয়ার চেয়ে একজন মানুষ কিংবা একটি নারীরও অশ্রু, যিনি মুছাতে পারেন তিনিই বড়। তিনিই আমাদের নমস্য, এই মর্যাদাবুদ্ধি সমস্ত জীবনে জাগাতে হবে। অর্থ এবং মান যশের দায়ে আমরা যেন মর্যাদা লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী না হই।

পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের প্রশ্ন এই সঙ্গে এসে পড়ে। সেখানকার বাস্তব জীবনে বর্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, আপনাদের নিকট আমাদের এই অনুরোধ আপনারা অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করুন। রাজনীতিক নেতারা এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে উঁচু ধাপে আলোচনা করবেন, তাঁরা তা করুন, আমাদের সাধারণ মানুষের দিক থেকে এই কথাই বলব যে, উপদেশ বৃষ্টির ফাঁকে আমাদের মনুষ্যত্বকে যেন একেত্রে বঞ্চিত করতে না বসি। নরনারীর সেবাই যেন আমাদের মুখ্য ব্রত হয় এবং সুবিধাবাদীদের শোষণ ও পীড়ন থেকে আমরা যেন দুর্গতদের রক্ষা করতে পারি। যে আশ্রয় চায়, তাকে যেন আমরা কথায় কথায় পথ দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে আরাম-কেদারায় অঙ্গ এলিয়ে না দেই।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় স্বদেশপ্রেমিক এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। পাকিস্থানকে তাদের নিজের দেশ মনে করা উচিত, এমন উপদেশ কেউ কেউ দিতে বসেছেন দেখছি, কিন্তু এ ধরণের উপদেশ তাঁদের দেওয়ার কোন প্রয়োজনই নাই। পাকিস্থানকে তাঁরা নিজেদের দেশ মনে করেই থাকেন। নাম বদলিয়াছে এজন্য বাস্তু বদলায় নাই। কিন্তু তাদের দেশের প্রতি এই স্বাভাবিক মমত্ববোধের মর্যাদাকে নানাভাবে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। তাঁরা অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের জন্য এতকাল সংগ্রাম করেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য বুকের রক্ত পাত করেছেন। আজ আর অখণ্ড নেই, কিন্তু পাকিস্থান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের মর্যাদা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যদি সমস্বার্থের ভিত্তি তাঁরা উপলব্ধি করতে সুবিধা পেতেন, তবে তাঁদের মানসিক বল জেগে উঠত। কিন্তু তা হচ্ছে না। মুসলমানেরা পাকিস্থানকে তাদের নিজেদের দেশ বলে মনে করছে, আর হিন্দুদের বিবেচনা করছে তাদের অধীন। পাকিস্থান রাষ্ট্রের নিয়ামকেরা মুসলিম রাষ্ট্রের জিগীর তুলে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বে সাম্প্রদায়িকতাকে দৃঢ় করে তুলছেন। তারা কথায় কথায় ইসলামের গণতান্ত্রিকতার দোহাই দিচ্ছেন। তারা খলিফায়ে রাশেদীনের ঐতিহ্য আওড়াচ্ছেন। কিন্তু এ সব অবান্তর এবং শুধু অবান্তর নয়; অভিসন্ধিমূলক বলেও মনে করবার কারণ আছে। ইসলাম ধর্মের মূলীভূত গণতান্ত্রিকতা এবং সাম্যবাদকে আমরা অস্বীকার করি না। হজরত মহম্মদের অনুবর্তী চারজন খলিফার উদার মহানুভবতা, উদারতা এসব কে অস্বীকার করবে? কিন্তু তাঁদের সেকালের গণতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে এখনকার আদর্শের পার্থক্য রয়েছে। এখনকার যে গণতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থাও পরিচালনায় অপর জাতির অধিকারকে কোন [illegible] হয় নাই। বস্তুতঃপক্ষে খলিফাদের শাসন ত্রিশ বত্রিশ বছরের বেশী চলে নাই। রাষ্ট্র পরিচালনায় সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার মত অবস্থা তখন হতে সেখানে ছিল না। খলিফাদের নীতি উদার এবং গণতান্ত্রিক ছিল সত্য। যাঁরা তাঁদের আদর্শের দোহাই দিচ্ছেন, যদি সত্যই তাঁরা আধুনিক যুগে তাঁদের আদর্শের মর্যাদা বজায় রাখতে চান, তবে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে উৎখাত করাই আগে তাঁদের উচিত। পাকিস্থানের মুসলমানেরা, সেখানকার হিন্দুদের রক্ষা করবে, সেখানকার রাষ্ট্র যখন ইসলামের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তখন রাষ্ট্রপরিচালকেরা হিন্দুদের উপর সদয় ব্যবহার করবেন, এ ধরণের উক্তি রাষ্ট্রনীতিক আদর্শের [illegible] ভারতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে বিরক্তি এবং বিক্ষোভেরই সৃষ্টি করে। তাদের মর্যাদায় এতে আঘাত লাগে। রাষ্ট্রের স্বাধীন প্রতিবেশীর মর্যাদা যদি তাঁরা পেতেন, তবে আর্থিক দুঃখ কষ্ট এবং অন্যান্য অসুবিধাকেও তাঁরা তুচ্ছ করতেন। দেশের দরদে তাঁরা সব ভুলে যেতেন। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্য ও শক্তি তাঁদের আছে। মর্যাদা পেলে মানুষ আর কিছুই চায় না—মর্যাদার জন্য মানুষ প্রাণ দেয়; কিন্তু এই মর্যাদাই তাঁদের থাকছে না। তাঁরা [illegible] স্বাধীনতার জন্য যত কিছু করেছেন, সব বাতিল করা হচ্ছে। তাঁদের ঐতিহ্য, তাঁদের সংস্কৃতিকে কৃত্রিম পরবশতায় অভিভূত করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরাও মানি, একটা জায়গায় চুরি, ডাকাতি তেমন বড় কথা নয়; কিন্তু রাষ্ট্রগত এই মর্যাদালুপ্তির প্রশ্নই পূর্ববঙ্গের সমাজ-জীবনে অশান্তি, উদ্বেগ ও অবাঞ্ছিত ভাব সৃষ্টি করেছে। স্বদেশপ্রেমের [illegible] চেতনা এলিয়ে পড়ছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সেখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত মুক্ত হতে না পারছে, ততদিন পর্যন্ত এ অবস্থা কাটবে না। দুই একজন নেতার মুখের কথায় এ অবস্থায় প্রতীকারের পক্ষে যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন বৈপ্লবিক চেতনার।

ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমাদের সামনে যে কর্তব্য এসেছে, তাকে জীবনে সত্য করে তুলবার জন্যে মায়ের পূজার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এ পূজার প্রতিবেশকে পবিত্র করুন, সাধক এবং কর্মসাধনী সন্তানেরা আজ আমাদের আশীর্বাদ করুন, [illegible] সন্তানদের মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুন। মায়ের কৃপা [illegible] আমাদের মনুষ্যত্বকে সঞ্জীবিত করুক। আমরা যেন মানুষের মত বাঁচতে পারি এবং মাতৃসেবার পরম প্রয়োজনে বীরের মত মরতে পারি। অখণ্ড ভারতের প্রাণময় সংস্কৃতি সার্থক [illegible] অন্ধকারের পথে আমাদের বর্তিকাস্বরূপ হোক।*

---

*হাওড়া, শিবপুরের আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।

# সাহিত্য-সংবাদ

**রচনা প্রতিযোগিতা**

**স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য**

(ক) প্রবন্ধঃ শরৎ সাহিত্যে শাশ্বত নারী ও পুরুষ।

(খ) গল্পঃ বর্তমান সমস্যার পটভূমিকায় রচিত কোন গল্প।

(গ) কবিতাঃ মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ।

**সাধারণের জন্য**

প্রবন্ধঃ নেতাজীর আদর্শ ও মার্ক্সবাদ।

প্রত্যেক বিষয়ে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীকে একটি করিয়া রৌপ্য কাপ দেওয়া হইবে এবং উপযুক্ত রচনা পাইলে বিশেষ পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

অভিজ্ঞ সাহিত্যিকদের দ্বারা রচনাগুলির বিচার করা হইবে।

**নিয়ম**

(১) প্রবন্ধ ও গল্প ফুলস্কেপ কাগজের ৫ পৃষ্ঠার অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। (২) যে-কোন ছাত্রছাত্রী একাধিক বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু একই বিষয়ে একাধিক রচনা গ্রাহ্য হইবে না। (৩) বিচারকদের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া মানিতে হইবে। (৪) কোন সাময়িক পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত রচনা কোন লেখক বা লেখিকা পুনরায় প্রতিযোগিতার জন্য পাঠাইতে পারিবেন না। (৫) কোন কিছুর উত্তর জানিতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে। (৬) বিদ্যাপীঠের নাম, শ্রেণীর নাম এবং রোল নং (সম্ভব হইলে) ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আগামী ৩১শে মে '৪৮, তারিখের মধ্যে রচনা সমিতির সাহিত্য সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। শ্রীদ্বারিকাদাস গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য সম্পাদক, আর্য সমিতি রোড, বেহালা, ২৪ পরগণা।

**গল্পদাদুর স্মৃতি বাসর**

আগামী ১২ই বৈশাখ রবিবার বৈকাল পাঁচটায় বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউটের ১৭১।২সি, রাসবিহারী এভিনিউ, ছোটদের বিভাগে গল্পদাদু স্মৃতি বাসরের সর্ব কলিকাতার আনন্দচক্রের উদ্বোধন করা হবে।

এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করবেন শিশু-সাহিত্য সম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের গল্পদাদুর আসরের পরিচালক শ্রীযুত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তা ছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ছোটদের প্রিয় বিভিন্ন আসরের পরিচালকগণ আর শিশু-সাহিত্যিকরা।

# বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আমাদিগের পঞ্জিকায় বৎসরে কত 'আড়া' বৃষ্টি হইবে, তাহার আনুমাণিক হিসাব থাকিলেও যেমন পঞ্জিকা আখ-মাড়াই কলে ফেলিয়া সবল বলদের সাহায্যে কল চালাইলেও তাহা হইতে একবিন্দু জল বাহির হয় না, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি যদি হীন স্বার্থই পরমার্থ বলিয়া গণ্য হয়, তবে আন্তর্রাষ্ট্রিক আলোচনা বৈঠকে কোন সুফল ফলিতে পারে না।

পাকিস্থানের সহিত ভারত-রাষ্ট্রের যে ছোট-বড় সংঘর্ষ নানা কারণে উদ্ভূত হইতেছে ও হইবার সম্ভাবনা সে সকল আলোচনার দ্বারা দূর করা যায় কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কলিকাতায় আন্তঃরাষ্ট্রিক বৈঠক বসিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদিগের অবস্থা সম্বন্ধে গত ৩০শে চৈত্র 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে' প্রকাশিত দুইটি সংবাদ নিম্নে প্রদান করা হইতেছে:—

(১) চট্টগ্রামে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকের দুরবস্থার বহু সংবাদ দিল্লীতে পাওয়া যাইতেছে। বর্তমান সময়ে সংঘবদ্ধ হিংসাত্মক অত্যাচার অনুষ্ঠিত না হইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে নানারূপ লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে। হিন্দুদিগের গৃহ অকারণে সরকার অধিকার করিতেছেন; হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে যেরূপ অত্যধিক কর দিতে বাধ্য করা হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা ব্যবসা বন্ধ করিয়া স্থান ত্যাগ করিতেছেন।

(২) বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে গুণ্ডাদিগের উপদ্রবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকরা গ্রাম ত্যাগ করিতেছেন। তাহারা দিবালোকেও লোকের গৃহের দ্বার, চালের টিন প্রভৃতি লইয়া যায়। পুলিশ অবস্থার কোন প্রতীকার করে না। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মুন্সীগঞ্জের উকীল। গত ১লা এপ্রিল রাত্রিতে তাঁহার আমতলীর (টঙ্গীবাড়ী থানা) বাড়িতে তাঁহার মাতা যখন নিদ্রিতা ছিলেন, তখন দুর্বৃত্তগণ গৃহে অগ্নিসংযোগ করায় তিনি পুড়িয়া মরিয়াছেন।

শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলে অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন—এখনও পুনর্বসতি বোর্ডের সভাপতি। তিনি বরিশাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন—মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন হিন্দুরা বরিশাল, ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

যশোহরে প্রায় তিন মাস যাঁহারা বিনা বিচারে আটক আছেন—কারাগারে তাঁহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করাও হয় নাই। মধ্যে শহীদ সুরাবর্দী তাঁহার 'শান্তি প্রচেষ্টায়' যশোহরে গমন করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন, বন্দীরা যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহারা পাকিস্থানে বাসকালে পাকিস্থান সরকারের অনুগত প্রজার মত ব্যবহার করিবেন, তবে তিনি পরদিনই তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবেন। কিন্তু পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, বন্দীদিগকে অপরাধ করিয়াছেন স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে ও বর্তমানে ত্রুটি স্বীকার করিতে হইবে।

যদিও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, এপর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে বোধ হয় দশ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন এবং বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের সংখ্যা পনের লক্ষ বলিয়াছেন, তথাপি মিস্টার জিন্না ও খাজা নাজিমুদ্দীন বলিতেছেন—দুই লক্ষের অধিক হিন্দু পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা পূর্ব পাকিস্থানে যেরূপ সুখে বাস করিতেছেন, ভারত রাষ্ট্রে মুসলমানরা সেরূপ সুখ সম্ভোগ করেন না। খাজা নাজিমুদ্দীন ঐ দুই লক্ষ হিন্দুর পাকিস্থান ত্যাগের বিস্ময়কর কারণ নির্দেশ করিয়া ভারত রাষ্ট্রকেই প্রধানতঃ সেজন্য দায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে কংগ্রেস সর্বপ্রযত্নে সাম্প্রদায়িকতা বর্জনের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, সেই কংগ্রেসকেও তিনি দায়ী করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই।।

পাকিস্থান সরকারের আশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কাপড়ের যে চোরাকারবার চলিতেছে—এতদিন পরে তাহার জন্য কেন্দ্রী সরকারও প্রতিকারোপায় হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে (ও পূর্ব-পঞ্জাবে) কাপড় বাহিরে দিবার ছাড় বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তারসাধন প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যদি বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত করিবার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হইত, তবে আমরা তাহা সংগত বিবেচনা করিতাম।

বাঙলা যখন বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া গঠিত ছিল, তখন—প্রধানতঃ বাঙালীর চেষ্টায়—শিক্ষাবিস্তার ফলে—বিহারীদিগের মধ্যে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহারা প্রদেশের শাসনকার্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনা পোষণ করেন। সেই আন্দোলনে মহেশবাবু অগ্রণী হয়েন। শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ তখন এলাহাবাদে ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি পাটনায় আসিয়া ঐ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বিহারী দীপনারায়ণ সিংহ সভাপতির অভিভাষণে বিহারে ঐ আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া বলেন—যদিও বাঙলার সহিত বিহারের বিচ্ছেদ সাধন বেদনাদায়ক হইবে এবং বিহারীরা সকলেই তাহার পক্ষপাতী এমনও নহে—তথাপি, তিনি মনে করেন, শিক্ষিত বিহারীরা অধিকাংশই তাহা চাহেন।—

"There is a strong Bihari movement started, and it is just within the bounds of possibility that your poor but proud sister province of Bihar may shortly declare her intention of taking her affairs in her own hands."

তিনি বলিয়াছিলেন, বিহারীরা যদি বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহেন, তবে সে বাঙলার সম্বন্ধে বিদ্বেষ হেতু নহে—বিহারীরা আপনাদিগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুসারে আপনাদিগকে জাতীয় উন্নতি সাধন করিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাঁহাদিগের উপযুক্ত ও সম্মানিত স্থান চাহেন বলিয়া।

তাহার পর যখন বাঙলায় আবার ভাঙ্গাগড়া হয়, তখন যে বাঙলার পক্ষ হইতে মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি বাঙলায় রক্ষার চেষ্টা হয় নাই, তাহার কারণ, বাঙলার তখন অভাব ছিল না এবং বিহার ও উড়িষ্যা তখন দরিদ্র প্রদেশ। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দেও বাঙলার তৎকালীন গভর্নর বলিয়াছিলেন—বাঙলার সরকার লোকপ্রতি যে ব্যয় করিতে পারেন, তাহা অল্প; কিন্তু বিহারের সেই ব্যয় আরও অল্প।

আজ বাঙলার অভাব অত্যন্ত অধিক। কারণ বাঙলা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে যে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ হিন্দু ধন-প্রাণ-মান রক্ষার চেষ্টায় বিব্রত ও বিপন্ন তাঁহাদিগকে স্থান দিতে হইবে। সেই জন্য আজ পশ্চিমবঙ্গ বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি চাহিতেছে। একান্ত পরিতাপের বিষয়—কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের হিন্দী ভাষা প্রচার প্রতিষ্ঠানকে বলিয়াছেন, তাঁহারা যে ঐ সকল জিলায় আজও হিন্দী প্রচলিত করেন নাই, সেই জন্যই বাঙলা আজ ঐগুলি দাবী করিতেছে। যেন বাঙলা অসংগত দাবী করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজও কলিকাতায় ও শিল্প কেন্দ্রাঞ্চলে লোককে আবশ্যক খাদ্য সংগ্রহের অধিকার দিতে পারিতেছেন না। ইহার ফল যে কিরূপ বিষময় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন। দামোদরের জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া বর্ধমান বিভাগের জিলাগুলির শস্যসম্পদ বাড়াইবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা কতদিনে ফলবতী হইবে তাহাও বলা যায় না। পৃথিবীর অবস্থা পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, যে-কোন মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। বারুদের স্তূপ রহিয়াছে—অগ্নি-স্ফুলিঙ্গপাতে সর্বনাশ ঘটা অনিবার্য। যদি তাহাই হয় তবে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে কলকব্জা পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

এ দেশে সে সকল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। কাজেই বৃহৎ পরিকল্পনাসমূহ কার্যে পরিণত করিতে অনির্দিষ্টকাল অতিবাহিত হইতে পারে। সেই অবস্থায় আমাদিগের পক্ষে কোন কোন উপায় অবলম্বনীয়, তাহাই এখন বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য। সে সম্বন্ধে কি হইতেছে আজ দেশের লোক তাহাই জানিতে চাহে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাদিগের কোন পরিকল্পনার পরিচয় প্রদান করেন নাই। আপাততঃ যখন দামোদর পরিকল্পনা কতদিনে কার্যকরী হইতে পারে তাহা বলা অসম্ভব, তখন আপাতঃ-কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত না হইলে উপায় নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগকে স্থানান্তরিত করিলেও যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব নিবারিত হইতে পারে, এ বিশ্বাস অনেকেই করিয়া থাকেন। কিরূপে তাহা হইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগ্রহের পরিচয় পাইলে লোক কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। র‍্যাডক্লিফের নির্ধারণ যাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাহার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত দায়িত্ব পালন করিতেই হইবে। সেজন্য যদি অধিবাসী বিনিময় ব্যতীত অন্য উপায় না থাকে, তবে তাহাই করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ বলিয়াছেন, ভারত-রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের বাহিরের অর্থাৎ পাকিস্তানের হিন্দুদিগের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বাঙলাকে বিভক্ত করিবার সময় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে সেই আশ্বাসই প্রদান করা হইয়াছিল। সে আশ্বাস যে অসাধুতা হেতু প্রদত্ত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। সেই জন্যই আমরা ভারত সরকারকে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে সেই আশ্বাস কার্যে পরিণত করিবার জন্য অবহিত হইতে বলি।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলে একবার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, আবার পরিবর্তনের নানা জনরব গুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার সর্বপ্রধান কারণ, এই মন্ত্রিমণ্ডলের চারজন মন্ত্রী এখন ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নহেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাদিগকে পদ গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি তাঁহাদিগের নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে হয়ত তাঁহারা পূর্বেই পদত্যাগ করিবেন। বর্তমানে মন্ত্রিমণ্ডলের স্থিতিকাল তিনমাস হইয়া গিয়াছে। আর তিন মাসের মধ্যে এই সকল মন্ত্রী নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। যদি এই দ্বিতীয় মন্ত্রিমণ্ডলের অবসান ঘটে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্বন্ধে সন্দেহ অনিবার্য হইবে।

এ দিকে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষও দূর না হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। অভাবই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ। দুর্নীতির জন্য নিয়ন্ত্রণ দূর হইলেও বস্ত্রের অভাব দূর হইতেছে না আর অন্নাভাবের ত কথাই নাই। লোক যাহাতে সংগত ব্যয়ে আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে সে ব্যবস্থা করিতে না পারা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভ্রমজনক নহে। সুতরাং সরকারকে আপনার স্থায়ী হইবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সে ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করিতে হইবে।

## অলিম্পিক
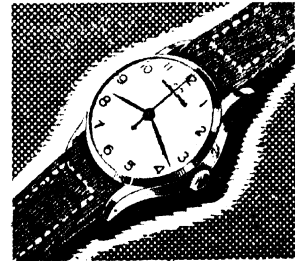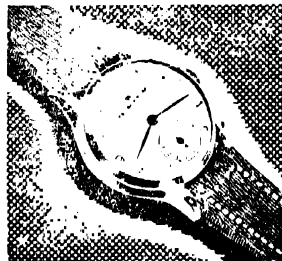
দীর্ঘ বারো বৎসর পরে বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজন লণ্ডনে হইয়াছে। আগামী জুলাই মাসে এই অনুষ্ঠান হইবে। সারা বিশ্বের ব্যায়াম উৎসাহিগণের ন্যায় ভারতের ব্যায়ামবীর, এ্যাথলীট, সাঁতারু, মল্লবীর, মুষ্টিযোদ্ধা, খেলোয়াড়গণ সকলেই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য উদ্যোগ-আয়োজনও হইতেছে। অনুষ্ঠানের সকল বিভাগে না হইলেও কয়েকটি বিভাগে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যে যোগদান করিবেন, তাহার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ইহা খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে দেখিতে হইবে, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রতিনিধি দল প্রত্যেক যোগদানকারী বিভাগে সাফল্যলাভ করিতে না পারিলেও দেশের সুনাম রক্ষা করিয়াছে। অতি সাধারণ শ্রেণীর যোগদানকারীর দল বলিয়া যেন পরিগণিত না হয়। সেইজন্যই যাঁহারা প্রতিনিধি নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের খুবই বিবেচনা করিয়া ধীর স্থিরভাবে নির্বাচনকার্য সমাধান করিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে অথবা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হইয়া নির্বাচন যেন তাঁহারা না করেন। ইহা ছাড়া আরও অনুরোধ করিব, যেন তাঁহারা স্ট্যাণ্ডার্ড খুব নিম্নস্তরের দেখিয়া নির্বাচন না করেন। এই কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না, যদি না দেখিতে পাইতাম যে, প্রাথমিক নির্বাচনের মধ্যে অনেক মারাত্মক ত্রুটি রহিয়াছে। প্রত্যেকটি বিভাগের প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় বিশ্বের স্ট্যাণ্ডার্ডের কথা যে স্মরণ ছিল না ইহা বলিতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ হইতেছে না।

### এত অর্থ আসিবে কোথা হইতে?

বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যে বিরাট দল প্রেরণের চেষ্টা হইতেছে, তাহার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে। এই লক্ষ লক্ষ টাকা কোথা হইতে আসিবে বুঝিতে পারি না। অলিম্পিক কমিটির কেন্দ্রে দপ্তর এক লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারও কয়েক হাজার টাকা দিবে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ঐ সমস্ত টাকা একত্র করিলেও ৫০ হাজারের অধিক হইবে না। অথচ ভারতীয় প্রতিনিধি দলের জন্য প্রায় ৩/৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। যাঁহারা এই আয়োজন করিতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন এক উপায় স্থির করিয়াছেন। সেই উপায় যদি সাধারণকে জানাইয়া দিতেন, খুবই ভাল হইত। কারণ ইতিমধ্যে অনেক ক্রীড়ামোদী বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন "ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন কেবলমাত্র এ্যাথলীট ও হকি দল প্রেরণ করিবে। এখন যে সকল দল প্রেরণের কথা বলিতেছে, উহা কেবল চালাকি।" আবার কেহ কেহ বলিতেছেন— "শেষ সময় বলিবে, যাওয়া হইবে না, টাকা জোগাড় করা সম্ভব হইল না।" হয়তো বা এই সকল উক্তির কোনটারই ভিত্তি নাই। তাহা হইলেও এখন পর্যন্ত ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন এই বিষয়ে কোন বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন না, এখনও এই সকল আলাপ-আলোচনা বন্ধ হইবে না।

### মল্লবীর দল প্রেরণের ব্যবস্থা

সাধারণের অজ্ঞাতে ঘরোয়া বৈঠকে অ-প্রতিনিধি-মূলক যে নূতন ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে মল্লবীর দল প্রেরণের জন্য খুব তোড়জোড় করিতেছেন। এই তোড়জোড় ও নির্বাচনের ব্যবস্থার কিছু কিছু আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। তাহাতে এইটুকু আমরা বলিতে পারি, যাহাদের প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাদের দ্বারা ভারতীয় কুস্তির সুনাম রক্ষিত হইবে না। ইহাদের কেহই বিশ্ব-স্ট্যাণ্ডার্ডের নাগাল ধরিতে পারিবেন না। প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডেই প্রত্যেকটি মল্লবীরকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। দীর্ঘকাল পূর্বে লণ্ডন এম্পায়ার স্পোর্টস্ অনুষ্ঠানে কয়েকজন ভারতীয় মল্লবীর প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা সাফল্যলাভ না করিলেও ভারতে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত লোক যে আছে, তাহা প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহাও হইবার সম্ভাবনা নাই। মল্লবীরদের সকলকেই মল্লক্ষেত্রে দেখিয়া মনে হইয়াছে যেন সবেমাত্র শিক্ষা করিয়াছেন। সেইজন্যই বলিতে হইতেছে কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া দুর্নামের বোঝা বহন করিবার জন্য এইরূপ মল্লবীর দল পাঠাইয়া লাভ কি?

### ফুটবল দল প্রেরণের যুক্তি কোথায়?

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন বিশ্ব-অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবল দল প্রেরণের জন্য। ইহারা কোন্ সাহসে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। দীর্ঘ দুই বৎসর ভারতের কোন স্থানেই নিয়মিত ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ফুটবল খেলোয়াড়গণ এই দুই বৎসর একরূপ বসিয়াই কাটাইয়াছেন। এই বৎসর ফুটবল মরসুম এখনও আরম্ভ হয় নাই। খেলোয়াড়গণ সবেমাত্র অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মে মাসের শেষে হয়তো বা ঠিক না হইলেও কিছুটা বুঝা যাইবে তাহারা এখনও প্রথম শ্রেণীর খেলায় যোগদান করিবার ক্ষমতা রাখেন। এই সকল পরিস্থিতি আলোচনা না করিয়া হঠাৎ কয়েকজন খেলোয়াড়কে একত্র করিয়া বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে প্রেরণের যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না! ইহা ছাড়া ইহা প্রত্যেক ক্রীড়ামোদীই স্বীকার করিবে যে, গত দুই বৎসর পূর্বেও ভারতের ফুটবল খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের হইয়াছে। ইহা যদি সত্যই হয় তবে নিম্নস্তরের ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী কতগুলি খেলোয়াড়কে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করা কি যুক্তিযুক্ত হইবে?

### ভারতীয় সাঁতারু দল

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় সাঁতারু দল প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হইবে বলিয়া কিন্তু আমরা ভরসা করি না। কারণ ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন ও ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশন শেষ পর্যন্ত মিলিয়া মিশিয়া সাঁতারু নির্বাচন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যেই তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা পাইয়াছি। ভারতের সন্তরণ স্ট্যাণ্ডার্ড খুবই উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল এবং এখনও পর্যন্ত সেই স্তরে আছে। তবে এই কথা ঠিক সুইডিস ও ডাচ সাঁতারুগণ যেরূপভাবে দিনের পর দিন পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিতেছেন ভারতীয় সাঁতারুগণের তাঁহাদের স্তরে পৌঁছিতে এখনও দেরী আছে। গত ১১ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সন্তরণ পরিচালনার অধিকার লইয়া যদি দুইটি প্রতিষ্ঠান মারামারি না করিত তাহা হইলেও সম্ভব ছিল। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মিলনের বাণী যতই প্রচার করুন না কেন এখনও পর্যন্ত তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারেন নাই। এইজন্যই আমরা আশঙ্কা করিতেছি ভারতীয় সাঁতারু দল প্রেরণ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত না বাতিল হইয়া যায়।

### মুষ্টিযুদ্ধে অভাবনীয় উন্নতি

গত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈনিকগণ ভারতে কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়া ভারতীয় মুষ্টিযুদ্ধের অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিয়াছেন। বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যদি ভারতীয় মুষ্টি-যোদ্ধা দল প্রেরণ করা হয় তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ভারতীয় হকি দলের ন্যায় বিশ্ব অনুষ্ঠানে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়া আসিবে। বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষগণ কয়েকজন মুষ্টিযোদ্ধাকে বিশ্ব অনুষ্ঠানে পাঠাইবেন বলিয়া কিছুদিন আগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞপ্তিতে কয়েকটি ট্রায়াল মুষ্টিযুদ্ধেরও উল্লেখ ছিল। এই পর্যন্ত কয়েকটি ট্রায়াল মুষ্টিযুদ্ধও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও কেন যেন আমাদের মনে হইতেছে যে, ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষগণ দল প্রেরণের জন্য পূর্বের ন্যায় আর যেন উৎসাহিত নহেন। কিসের যে বাধা তাঁহারাই জানেন। এইদিকে মুষ্টিযোদ্ধাগণ বিশ্ব অনুষ্ঠানে যাইবার সুযোগ লাভের জন্য নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিতেছেন। যদি দল প্রেরণ করা নাই হয় ফেডারেশনের উচিত তাহা এখনই জানাইয়া দেওয়া। শেষ সময়ে জানাইয়া মুষ্টিযোদ্ধাদের হতাশ করার কোন মানে হয় না।

### বিভিন্ন দলের ম্যানেজার নির্বাচন

বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতের যে কয়েকটা দল প্রেরিত হইবে বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছে তাহার পাকাপাকি ব্যবস্থা হইবার পূর্বেই বিভিন্ন দলের ম্যানেজার নির্বাচন পর্ব শেষ হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। যে সকল লোক এই সকল পদের অধিকারী হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের সম্পর্কে আমাদের বলিবার কিছু না থাকিলেও কয়েকজনের নির্বাচন আমরা কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারিতেছি না। এই সকল লোক স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইঁহারা দীর্ঘ ২৫ বৎসরের মধ্যে নিজ স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া দেশের বা জাতির উন্নতির জন্য কোনরূপ কিছুই করেন নাই। সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য হইতেছে, ইহাদের জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতায় মনোভাব প্রদর্শন। দেশের জনসাধারণ যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে মত্ত হইয়া বৃটিশের সকল কিছু অনুষ্ঠান উপেক্ষা করিতেছিল, তখন ইহারা বৃটিশের ধ্বজাধারী হিসাবে জাতীয় পতাকাকে উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ পতাকাই বহন করিয়াছেন। ইহার অকাট্য প্রমাণ প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যখন ইহারা বৃটিশ পতাকা মাথায় উঁচু করে সামনে চলিতেন। কত সময় কত এ্যাথলীট, কত খেলোয়াড়, কত সাঁতারু—ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া ইহাদের নিকট হইতে শুনিয়াছে—"এই সব মানতে হবে, নতুবা প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দেবো না।" খেলাধুলার মাঝে যে এত দলাদলি ইহার মূলেও ইহারাই আছেন। আজ হঠাৎ ইহারা দেশভক্ত হইয়া পড়িলেন আর দেশবাসী ইহাদের নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশে প্রেরণ করিতেছেন দেখিয়া সত্যই মনে হয় স্বপ্ন দেখিতেছি। আমাদের অভিযোগ যদি মিথ্যা বলিয়া কাহারও সন্দেহ থাকে এক অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হউক আমরা সর্বসাধারণের সম্মুখে ইহার হাজার হাজার প্রমাণ উপস্থিত করিতে সক্ষম হইব। ভারতীয় ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষগণকেও অনুরোধ করিব তাঁহারা যেন বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সকল নির্বাচন অনুমোদন করেন।

## দেশী সংবাদ

১২ই এপ্রিল—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য তিন মাইল দীর্ঘ হীরাকুড বাঁধের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সম্বলপুর হইতে তিন মাইল দূরে হীরাপুর দ্বীপে এই অনুষ্ঠান হয়।

কাশ্মীর রণাঙ্গনের ঝানগর অঞ্চলে আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া ভারতীয় সৈন্যগণ হানাদারগণ কর্তৃক অধিকৃত কতকগুলি পার্বত্য ঘাঁটি দখল করিয়াছে। নওশেরার উত্তর দিকস্থ চিংগাস হইতে হানাদারদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

ভারতের শ্রমসচিব শ্রীযুত জগজীবন রাম চান্দোয়ায় আহূত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আমি পাঁচ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে ধনিক সম্প্রদায় কর্তৃক জনগণের আর্থিক শোষণ ও অর্থনৈতিক লুণ্ঠন রোধ করিতে বদ্ধপরিকর।

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, হায়দরাবাদ সীমান্তের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতেছে। ওসমানাবাদ, শোলাপুর, নান্দেদ, রায়চুর এবং ওয়ারেংগল জেলার সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রাম হানাদারগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে। রাজ্য হইতে বহু লোক চলিয়া যাইতেছে।

হায়দরাবাদ সম্পর্কিত এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ভারতের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন যে, হায়দরাবাদ রাজ্য ও নিজামের স্বীয় স্বার্থের খাতিরে অচিরে যুগোপযোগী করিয়া রাজ্যের শাসন সংস্কার অবশ্য কর্তব্য। অনতিবিলম্বে উল্লিখিত নীতি অনুসৃত না হইলে অবস্থা অতি দ্রুত আয়ত্তের সীমা অতিক্রম করিবে।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট এক প্রেস নোটে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট হইতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে দাঙ্গায় যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, গভর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাড়ে ১৫ লক্ষ টাকা পুনর্বসতি সাহায্যস্বরূপ প্রদান করিবেন।

১৩ই এপ্রিল—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ প্রাতে ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার নূতন রাজধানীর ভিত্তি স্থাপন করেন।

বঙ্গ ভারতীর একনিষ্ঠ সেবক, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকারের চতুর্থ মৃত্যুতিথি দিবসে অদ্য মহাবোধি সোসাইটি হলে তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসিগণ এক সভায় সমবেত হইয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। তাঁহার স্মৃতি রক্ষাকল্পে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্য সভায় একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভায় পৌরোহিত্য করেন।

১৪ই এপ্রিল—কটকে লক্ষাধিক লোকের এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, হায়দরাবাদে শাসনকার্য যেভাবে চলিতেছে, তাহা সহ্য করা সম্ভব নহে এবং সেখানে বর্তমান স্বৈরতান্ত্রিক গভর্নমেণ্টের স্থলে জনসাধারণের গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় কয়েকটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধী স্মৃতি তহবিলে যথাসাধ্য অর্থদান করার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান।

১৫ই এপ্রিল—কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরখানায় ভারত ও পাকিস্থান প্রতিনিধিদের বৈঠক আরম্ভ হয় এবং প্রায় পাঁচ ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে। অধিবেশনে প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন।

আজ ভারতীয় ডোমিনিয়নের মধ্যে "হিমাচল প্রদেশ" নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। ২৪টি পাহাড়ী রাজ্য লইয়া এই নূতন প্রদেশ গঠিত হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গণভোট গ্রহণের দ্বারা ভারতের ফরাসী অধিকৃত রাজ্য পণ্ডিচেরী চন্দননগর ও মাহের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ সম্পর্কে ভারত সরকার ও ফরাসী প্রতিনিধিদের মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট যতশীঘ্র সম্ভব গণভোট গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

১৬ই এপ্রিল—বোম্বাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাবে সূতিবস্ত্র চালানের পারমিট বন্ধের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত অঞ্চল হইতে পাকিস্থানে কাপড়ের ব্যাপক চোরাকারবার বন্ধের জন্যই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বোম্বাই গোয়েন্দা পুলিশের বৈদেশিক বিভাগ প্রায় দেড় শত আরবকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, তাহারা হায়দরাবাদ রাজ্যে যাইতেছিল।

কৃষ্ণনগরের সংবাদে প্রকাশ, নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আকস্মিকভাবে ট্রেনে তল্লাসী চালাইয়া আসাম মেলের মেল-ভ্যানে, ডাকের সিলকরা থলি এবং মেল-ভ্যানের মেঝের নীচ হইতে বস্ত্র বাহির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে পাকিস্থানের দুইজন সর্টারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ কর্মচারিগণ ১৪ই এপ্রিল সমস্ত রাত্রি ও পরদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি ট্রেনে তল্লাসী চালাইয়া প্রায় ৫ লক্ষ টাকার বস্ত্র আটক করিয়াছেন।

১৭ই এপ্রিল—মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, হায়দরাবাদে রাজাকর এবং মিলিটারী পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের ফলে অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পারভানী জেলা হইতে আনুমানিক ৪ শত পরিবার অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে এবং সহস্র লোক নান্দেদ জেলা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। কয়েকটি স্থানে পুলিশ গুলী চালায়। ফলে ৪ জন নিহত এবং কয়েকজন লোক আহত হয়।

নয়াদিল্লীতে ভারত-হায়দরাবাদ মীমাংসা আলোচনা শেষ হইয়াছে। আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

১৮ই এপ্রিল—কলিকাতায় চারিদিনব্যাপী ভারত-পাকিস্থান আলোচনার পরিসমাপ্তি এক ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, "আমরা আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, সর্ববিষয়ে আমরা সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি বলিয়া মনে হয়।" সোমবার সকালে মীমাংসা সম্বলিত দলিলে উভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিবেন।

ব্যারাকপুরে হুগলী নদীতীরে পশ্চিম বাঙলার গভর্নর শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী প্রস্তাবিত গান্ধী ঘাটের ভিত্তিস্থাপন করেন।

উদয়পুরে এক সমারোহপূর্ণ পরিবেশে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পুনর্গঠিত রাজস্থান ইউনিয়নের উদ্বোধন করেন।

ভারত সরকার স্যার পুরুষোত্তম দাসকে সভাপতি করিয়া খাদ্যশস্য নীতি নির্ধারণ কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি দেশের খাদ্য অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক কোটি টন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির এক পরিকল্পনার সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কৃষ্ণনগরের এক সংবাদে প্রকাশ, কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত দৌলতপুর থানার প্রাগপুর গ্রামে একজন কংগ্রেস কর্মী গত ১২ই এপ্রিল সশস্ত্র পাকিস্থানী কনেস্টবলের গুলীতে নিহত হইয়াছেন।

নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুসারে রাণাঘাটে শিয়ালদহ হইতে আগত ট্রেন সমূহে তল্লাসী করা হইতেছে। পাকিস্থানে কাপড়ের চোরাকারবার নিবারণের জন্য নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

## বিদেশী সংবাদ

১২ই এপ্রিল—অদ্য কলম্বিয়া গভর্নমেণ্টের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, কলম্বিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

ভিয়েনার এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, অস্ট্রিয়ার বৃটিশ অধিকৃত এলাকা হইতে ভিয়েনা পর্যন্ত ১৩ মাইল দীর্ঘ [illegible] সোভিয়েট [illegible] বৃটিশ [illegible] করিয়াছে।

১৩ই এপ্রিল—তেল আবিবের সংবাদে প্রকাশ, আজ তেল আবিবে ইহুদী পরিষদ প্যালেস্টাইনের [illegible] ঘোষণা করিয়াছে। [illegible] ইহুদী [illegible] মন্ত্রিসভা [illegible] ১৫ই মে অর্থাৎ প্যালেস্টাইনে বৃটিশ শাসন শেষ হইবার পরদিন এই মন্ত্রিসভা প্যালেস্টাইনের ইহুদী রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

১৬ই এপ্রিল—[illegible] প্যান আমেরিকান [illegible] একটি [illegible] হইতে করাচী যাইবার পথে [illegible] বিমান [illegible] ভূপতিত ও বিধ্বস্ত হয়। ফলে ৩০ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে বোম্বাইয়ের [illegible] সাংবাদিক ও [illegible] আছেন।

১৭ই এপ্রিল—কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের বিরোধ সম্পর্কে পরিষদের সভাপতি ডাঃ আলফানসো লোপেজ ছয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া যে খসড়া প্রস্তাব রচনা করেন, অদ্য নিরাপত্তা পরিষদে সেই খসড়া প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবে কাশ্মীরে যুদ্ধ থামাইয়া রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকল্পে গণভোটের ব্যবস্থার জন্য অবিলম্বে কাশ্মীরে সম্মিলিত জাতি পরিষদের একটি সালিশ কমিশন পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অদ্য ২৫ বৎসর পর ইতালিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হয়।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন    সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ ]    শনিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৩৫৫ সাল।    Saturday, 1st May, 1948.    [ ২৬শ সংখ্যা

## নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি

গত ২৫শে এপ্রিল বোম্বাইয়ে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির দুইদিনব্যাপী অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সমিতির এই অধিবেশনের নানা দিক হইতে গুরুত্ব রহিয়াছে। এই অধিবেশনে স্বাধীনতা লাভের পর অবস্থানুযায়ী কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচী স্থিরীকৃত হইয়াছে। অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে গিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন, গান্ধীজীর নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষ শান্তির নূতন পথ উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে ভারতের ঐ উদ্যমের ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙলা দেশের সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় সমিতির এই অধিবেশনের সিদ্ধান্ত আর একটি দিক হইতে আমাদের বিশেষই চিন্তা এবং উদ্বেগ জাগাইয়াছে। সমিতি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অতঃপর আর অস্তিত্ব থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে সমিতির এই সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ববঙ্গই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। কারণ অন্য কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসের সত্তা ইহার পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিম পাঞ্জাব সম্পূর্ণরূপে পাকিস্থানে পরিণত হইয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সেখান হইতে অপসারিত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা যাইতে পারে। সিন্ধুর অবস্থাও প্রায় সেই রকম; প্রকৃতপক্ষে তথাকার কংগ্রেস-নিষ্ঠ সমাজের অধিকাংশই অন্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবস্থা সেরূপ নয়; তথাকার সংখ্যা- পূর্ববঙ্গের কর্মীরা কংগ্রেসের সেবায় আজীবন আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া তাঁহারা সুদীর্ঘকাল দেশের স্বাধীনতার জন্য অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন। ইহাদের দেশত্যাগও সঙ্গত নয়। আজ কংগ্রেসের আশ্রয় হইতে চ্যুত হইয়া তাঁহাদের অন্তরে যে বেদনার সঞ্চার হইবে, তাহা উচিত ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ বিভাগের ফলে বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষে এই পথ অবলম্বন করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসের কর্মনীতি একান্তভাবে রাজনীতির সম্পর্কবিহীন নয় কিংবা রাষ্ট্র বিশেষের সম্পর্কবিরহিত আন্তর্জাতিকতাও তাহার মুখ্য লক্ষ্য নহে। রাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব রহিয়াছে। ভারতবর্ষ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে কংগ্রেসের সে কর্তৃত্ব পরিচালনার অধিকার নাই; বস্তুত পাকিস্থানী শাসনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আনুগত্য স্বীকার করিলে সেখানে বৈদেশিক হইয়া পড়িতে হয়। পূর্ববঙ্গের নাগরিক জীবনের সঙ্গে যেমন নীতি খাপ খায় না; পক্ষান্তরে নানারূপ অসুবিধারই কারণ ঘটে। বস্তুত রাজনীতির দিক হইতে বিবেচনা করিয়া পূর্ববঙ্গের কংগ্রেসকর্মীদিগকে এক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে। সাক্ষাৎ-সম্পর্কে কংগ্রেস হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইলেন, ইহা সম্মুখে থাকিবে। গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্প্রসারণ, শোষকদের স্বেচ্ছাচার এবং সকল রকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সে আদর্শ তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। তাঁহারা যদি সে আদর্শে অটল থাকেন, তবে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে তাঁহারা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় দুর্বল নহেন। তাঁহাদের সংস্কৃতির তেজ আছে, সাধনার শক্তি আছে, সেই শক্তিতে তাঁহারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে নূতনের সহিত সংযোজন হইলে পথের বাধা সহজেই অপসারিত হইবে। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবেশগতির প্রতিকূলতা আপাতত যতই প্রবল বলিয়া মনে হোক না কেন, ত্যাগের শক্তি, মনুষ্যত্বের শক্তির কাছে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সুতরাং পূর্ববঙ্গের কংগ্রেসকর্মীদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। উন্নত সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্বের মর্যাদার আদর্শে যাঁহারা বলিষ্ঠ প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামে তাঁহারা ভীত হন না; পক্ষান্তরে তেমন সংগ্রামের ভিতর দিয়া প্রাণশক্তির প্রাচুর্য তাঁহাদের জীবনকে সার্থক করিবার দুর্নিবার সংকল্পে উদ্দীপ্তই করিয়া থাকে।

## আন্তঃ রাষ্ট্র চুক্তির ভবিষ্যৎ

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে আন্তঃ রাষ্ট্র চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এই চুক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে এখনও কিছু বলা চলে না, তবে দেখা যাইতেছে, চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পরও পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুত্যাগকারীদের আগমন বন্ধ হয় নাই। বস্তুত চুক্তি-

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে এখনও স্থায়ী আশ্বাস্তির সঞ্চার করিতে পারে নাই এবং চুক্তির সাফল্য সম্বন্ধে তাহাদের মনে এখনও সন্দেহের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার কারণও আছে। লীগ-প্রচারিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নীতি পূর্ববঙ্গের সমাজ-জীবনে রীতিমত একটা মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্বাস্তির প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে সাম্প্রদায়িকতার পথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মননের এই ধারার মোড় ঘুরাইয়া দিতে হইবে। আমরা শুনিতে পাইতেছি, পূর্ববঙ্গের গভর্নমেণ্ট চুক্তির সর্তসমূহ কার্যে প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং বিভিন্ন বিভাগে তদনুযায়ী নির্দেশও প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সব নির্দেশও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। নির্দেশসমূহ যাহাতে যথাযথভাবে শাসনের প্রত্যেক বিভাগে কার্যে পরিণত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই প্রথমে প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে শুধু উপরওয়ালাদের সদিচ্ছার দ্বারাই চুক্তির সর্তগুলি সমাজ জীবনে সত্য হইয়া উঠিবে না, কিংবা দৈনন্দিন ব্যাপারে বাস্তব আকার ধারণ করিবে না। রাজকর্মচারীদের আন্তরিকতার উপরই চুক্তির সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ববঙ্গের নিম্নতন রাজকর্মচারীদের অন্তরে সাম্প্রদায়িক উৎকর্ষাপকর্ষের একটা অন্ধ সংস্কার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের মনের অনেকটা অবচেতন স্তর হইতেই এই সংস্কার তাহাদের বিচার বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তাহারা নিরপেক্ষ ন্যায়ের মর্যাদা বজায় রাখিতে পারিতেছে না। এই শ্রেণীর নিম্নতন রাজকর্মচারীদের প্রশ্রয়ে তথাকার সমাজ জীবনে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের ভাব দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে সৌহার্দ্য ছিল, সেখানে ছোটবড় জ্ঞান ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে এবং কথায় কথায় মান-অপমানের প্রশ্ন উঠিতেছে। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অসহায়ত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ববঙ্গের গভর্নমেণ্ট নিম্নতন কর্মচারীদের কর্তব্যে অনবধানতাজনিত ত্রুটি সম্বন্ধে যদি সচেতন থাকেন এবং কর্তব্য লঙ্ঘনকারী কর্মচারীদিগকে কঠোরভাবে দণ্ডিত করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তৎপর হন, তবেই ক্রমে অবস্থার উন্নতি সাধিত হইতে পারে। বস্তুত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেণীর মধ্যে এই-[illegible] যদি জাগ্রত করা সম্ভব তাহা মনে হয় না। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে গতিবিধি স্বাচ্ছন্দ্য এবং শুল্ক নীতি নিয়ন্ত্রণে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থার প্রবর্তন পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে।

### মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙাগড়া

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে ছয় মাসকাল মন্ত্রিত্ব চালাইতে সময় দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে তিন মাস যাইতে না যাইতেই প্রধান মন্ত্রীর আসন হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। ডক্টর ঘোষের অপরাধ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণ যেরূপ অজ্ঞাত ছিল; এক্ষেত্রেও জনসাধারণের কাছে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত না করিয়াই উপদলীয় ঘোঁট চলিয়াছে। ডাক্তার রায় ২৩শে জানুয়ারী কার্যভার গ্রহণ করেন, ঐ সময় যাঁহারা তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তিন মাসের মধ্যেই তাঁহাদের মাথায় এই চিন্তা জাগিয়াছে যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভুল হইয়াছে; সুতরাং নূতন নেতা দরকার। শুনিতেছি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের উপর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের পাঁচজন কংগ্রেসী সদস্যের এবং নেকনজর পড়িয়াছে। ইহাই না কাহিনীর জন্য তাহা কে বলিবে? বাঙলাদেশের আর বিপদের অন্ত নাই। এইভাবে সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই যদি মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙিবার বাতিক চড়ে তবে দেশের কোন সমস্যারই সত্যকার সমাধান হইবে না, পক্ষান্তরে উপদলীয় রাজনীতির স্বার্থ এবং ঈর্ষার দুর্নীতির আবহাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রজীবন আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে। যাঁহারা এইরূপ স্বার্থ এবং ঈর্ষার জ্বালায় সমগ্র দেশের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে দুর্নীতিকে স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা দেশের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে যদি তাহাদের কোন অভিযোগ থাকে এবং সেজন্য মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাদের কাছে অনাস্থাভাজন হইয়া থাকেন, তবে দেশবাসীর বিশ্বস্ত প্রতিনিধিস্বরূপে দেশবাসীর কাছেই সেগুলি খোলাখুলি উপস্থিত করা প্রথমে তাঁহাদের কর্তব্য। রায় মন্ত্রিমণ্ডলের কোন দোষ-ত্রুটি নাই, এমন কথা আমরাও বলি না। কিন্তু পদাধিকারের তাড়নায় দেশবাসীকে প্রবঞ্চিত করিয়া ক্রমাগত বিভিন্ন মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্তের এই ইতরামী দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। সত্য কথা অধোগতি ঘটিবে ইহা কেহ কল্পনাও করে নাই। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল দিক হইতে আমরা এই প্রশ্নই শুনিতে পাইতেছি যে, এই উপদ্রব আর কতদিন চলিবে? আমরা উত্তর কিছু খুঁজিয়া পাইতেছি না। এরূপ অবস্থায় যে ২৫ জন সদস্য মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক লিপিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে, আমরা সাহসের সঙ্গে তাঁহাদিগকে দেশবাসীর কাছে অগ্রসর হইতে বলিতেছি। আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের নাম প্রকাশ করুন এবং কেন বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি তাঁহারা আস্থা হারাইয়াছেন, তাহা খুলিয়া বলুন। তাঁহারা এই সত্য [illegible] রাখুন যে, দেশের সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপদলীয় স্বার্থের এই অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন চলিবে না। [illegible] আর দুইদিন পরেই হউক, দেশবাসীর কাছে তাঁহাদিগকে আসিতে [illegible] হইবে [illegible] দেশবাসীকে [illegible] বাঙলাদেশের [illegible] এই ধরণের [illegible] [illegible] [illegible] এবং দেশের [illegible] নীতি ও [illegible] [illegible] বলা বাহুল্য [illegible] হইতে [illegible] মুক্ত [illegible] [illegible] হইয়া পড়িয়াছে [illegible] সর্বনাশ ঘটিবে।

### পরলোকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্বদেশীযুগের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক ও ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৮ই এপ্রিল কাশী ধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। বর্তমান সময়ের যুবক ও কর্মীরা হয়তো সতীশচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, মনীষা এবং তাঁহার ত্যাগনিষ্ঠ জীবনে স্বদেশসেবার অগ্নিময় অবদানের কথা বিশেষ ভাবে জানেন না; কিন্তু এই মনীষীর চিন্তা ও কর্মসাধনা বাঙলার নবজাগরণের মূলে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সতীশচন্দ্র এবং তাঁহার সহকর্মী দলের ত্যাগ ও সাধনার প্রভাবে বাঙলার চিন্তাজগতে জাতীয়তামূলক নবসৃষ্টির সূচনা হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ঐ সূত্রে বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এবং [illegible] সহিত তাঁহার [illegible]

# বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন

অধিবেশন মণ্ডপের প্রবেশদ্বার
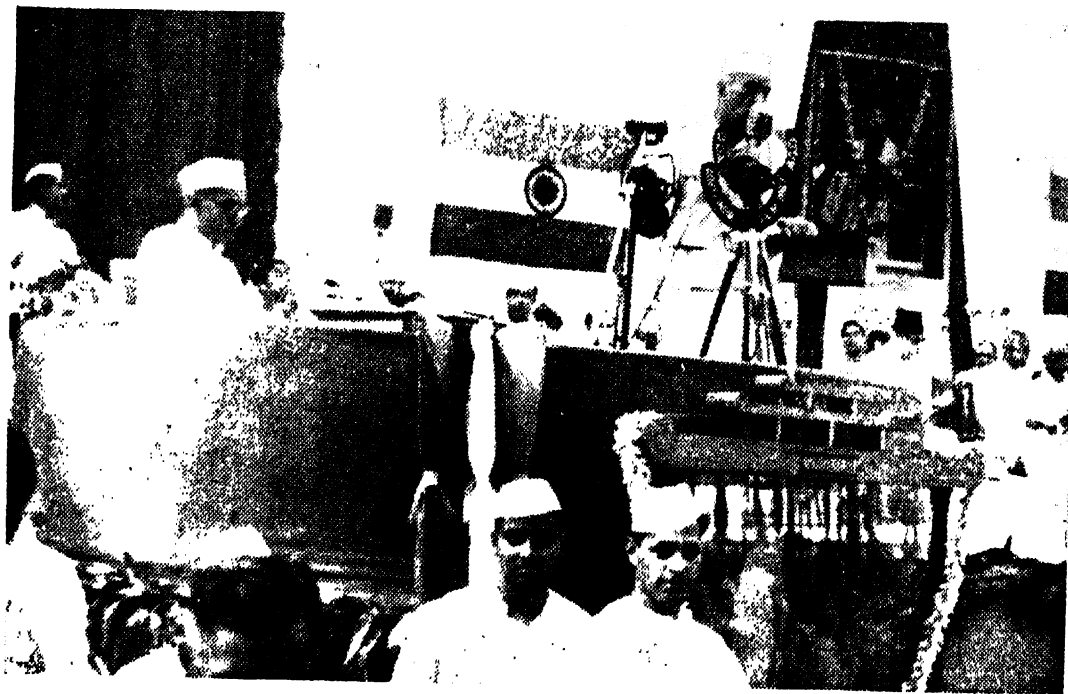
# 'খণ্ডগিরি'র চূড়ায় ৭ই এপ্রিল

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

'খণ্ডগিরি'র চূড়ায় উঠে
আকুল হয়ে চেপে ধরলে আমার দু'হাত:
"দেখো—দেখো!"
একটা খণ্ড পাথরে ছিটকে পড়েছে
প্রথম আলোর তীর।
কি দেখাতে চাইলে তুমি:
তুমিও কি তা জানতে?
শুধু পাখীর মত গান করে উঠলে আবার:
'দেখো—, দেখো—'।

*

—ভাঙা হাট,
জীর্ণ মন্দির,
[illegible] শত শত [illegible],
উঁচুনীচু পাথর টিলার গুহাময় খাঁজে খাঁজে
[illegible] —
এক মুহূর্তে [illegible] পড়ে যাচ্ছে নিস্তরঙ্গ!
লাফিয়ে উঠেই যেন জমে গেছে
একটি নিঃশ্বাস প্রাণের ঢেউ:
[illegible]।

[illegible] আমার দু'টি প্রদীপ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পৃথিবীকে:
উদার [illegible], উদার করে আকাশ
[illegible]!

[illegible] এই প্রস্তর মধ্যেও গান গেয়ে চলেছে অবিরাম।
[illegible] তা,
কান পাতলেই যেন শোনা যায়:
'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—
ধর্মং শরণং গচ্ছামি—।'
বড় উদার—
বড় ব্যাপ্ত!

আর,
সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে
আরেক বিচিত্র কাজের ঐক্যতান:
……ঠুং ঠুং……ঠুং ঠুং……
শিল্প-ভারত নাম লিখে চলেছে কালের বুকে।
তারপর, কখন এক সময় হুংকার ছেড়ে
দাঁড়িয়ে উঠলেন মহাকাল:
ক্ষান্ত হও—, থামো—।
—শৈবধর্মের নিষ্ঠুর পদপাত!

*

স্তব্ধ হয়ে থেমে আছে আমার প্রাণ।
চৈতন্যের প্রান্তর ভরে
কোন মঠ বিহারের নারঙ্গী রৌদ্রালোক!
হঠাৎ জড়িয়ে ধরলে আমায় আকুল হয়ে:
'দেখো—, দেখো—'
কি দেখাতে চাইছো তুমি বারংবার?
চমকে তাকালাম ফিরে—
আর, অমনি উচ্ছল করে উঠলো তোমার গলা:
'নাও—
এইবার একটা ছবি নাও আমার।'
পাখীর মত উড়ে গিয়ে বসলে আরেক পাথরের চূড়ায়।

—ক্যামেরা আনিনি।
ভুলেছিলাম আনতে।
আনলেও বা কী থাকতো তার দাম!
যা নেবার,
তা ত' তুলে নিয়েছে হৃদয় অনেকখন।
৭ই এপ্রিল উড়ে চলেছে গিরিচূড়ায়:
আমার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে তা আটকাবে না।
দুঃখ হলো শুধু তোমার পানে চেয়ে:
জলছবির নেশা ছুটলো না তোমার আজো!

**কলিকাতায়** প্লেগ দেখা দিয়াছে। যে প্লেগের বীজ বহন করে ছুঁচোজাতীয় জীবরা, সেই প্লেগ অবশ্য বহুদিন আগেই ব্যাপকভাবে লাগিয়াছে। এবারের প্লেগের বীজ বহন করিতেছে ইঁদুরেরা, সুতরাং শুধু বিবৃতিতে যে আর কাজ হইবে না, এ কথাটা নগরকর্তারা মনে রাখিবেন।

* * * *

**পানামার** নিকটবর্তী একটি দ্বীপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে—"Ants force nudists to wear clothes." আমরাও
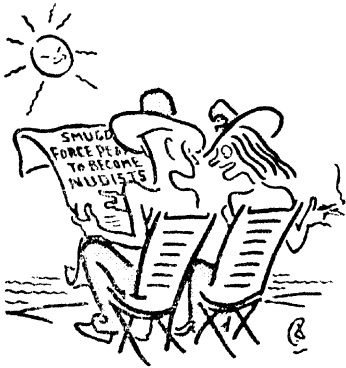
স্থানীয় সংবাদে পাঠ করিয়াছি—No more cloth for West Bengal. রয়টার এই সংবাদটা যদি পানামাতে পরিবেশন করেন—Smugglers force people to become nudists—তাহা হইলে nudists-রা তাদের সমাজের নীতি কোথাও কোথাও বলবৎ আছে জানিয়া বাধ্য হইয়া কাপড় পরিবার দুর্দৈবের মধ্যেও খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করিবেন!

* * * *

**এই** প্রসঙ্গের আলোচনাতেই বিশু খুড়ো বলিলেন—"এতে একদিকে যেমন আমাদের আর বাটপারের ভয় থাকল না, তেমনি অন্যদিকে সরকারের Administration Made Easy নীতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এই নীতির বলে খাদ্য বন্ধ করে দিলে খাদ্যে ভেজাল বন্ধ হতে বাধ্য; ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিলে বাছাধনরা আর বিনা টিকিটে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন না!"

* * * *

**কর্পোরেশনের** ব্যাপারে সরেজমিন তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আশা করছি, ফাইলগুলো সব উঁইতে খেয়ে যায়নি। কর্পোরেশনের উঁইদের আবার ফাইলের প্রতি ভয়ানক হ্যাংলামো আছে কি না!"

* * * *

**কর্পোরেশনের** গলদ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ গ্রাহ্য করা হইবে না, একথা গোড়াতেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশু খুড়ো দুই সপ্তাহ আগেই বলিয়াছিলেন যে একশত উনত্রিশ জন নাগরিক অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—মূর্খতার প্রমাণ দিয়াছেন তাঁরাই। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি বলিলেন—"সংখ্যাটা একশত ত্রিশ হয়ে গেল। কেননা অভিযোগ যিনি আহ্বান করেছিলেন—তিনিও এই দলেই ভিড়ে গেলেন!"

* * * *

**ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমিনের** জনৈক প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন—ভারত নাকি তিনটি ঘুমন্ত ব্যাঘ্রকে—হায়দরাবাদী বাঘ, কাশ্মীরী বাঘ, আর পূর্ব-পাকিস্থানী বাঘ—খোঁচাইয়া জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তারা যদি একবার জাগে, তাহা হইলে দিল্লী পর্যন্ত ধাওয়া করিতে পারে। খুড়ো বলিলেন—

"পণ্ডিত নেহরু দিল্লীতে সার্কাস পার্টি খোলার তালে আছেন, এ সংবাদ কিন্তু আমরা সত্যি পাইনি!"

* * * *

**সীমান্তের** মালেকরা কায়েদে আজমকে রাইফেল, রিভলবার, ছোরা, খড়ের চপ্পল অর্থাৎ পাঠানদের যুদ্ধসজ্জার সমস্ত উপকরণ উপহার দিয়াছেন। চট্টগ্রাম সফরে একটি রৌপ্যের জাহাজ মিলিয়াছিল বলিয়াও আমরা শুনিয়াছি। এবারে বিলাতে আর আমেরিকায় সফরে গিয়া যদি এরোপ্লেন আর এ্যাটম বোমা উপহার পাওয়া যায়, তাহা হইলেই হারে-রেরে-রেরে বলিয়া ধর্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়ার সুবিধা হয়!

* * * *

**একটি** সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডনের চিড়িয়াখানার জন্য ভারত হইতে নাকি নানারকম জন্তু-জানোয়ার রপ্তানি করা হইতেছে।

খুড়ো বলিলেন—"এবারে ভারতের চিড়িয়াখানার জন্য লণ্ডনের জন্তু-জানোয়ার আমদানী করলেই Exchange of Population-এর সমতা রক্ষা হয়।

* * * *

**গান্ধীঘাট** আমাদের জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি"—একটি উদ্ধৃতি। কিন্তু আপাতত আমরা রাণাঘাটেই জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; তাই কাস্টমসের শ্যেন দৃষ্টি পড়িয়াছে সেইখানেই!

* * * *

**বিখ্যাত** ক্রিকেট খেলোয়াড় Don Bradman ভারতীয় টিমের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন—

Indian cricket team is shining example of democracy. I hope business and political leaders will learn a lesson from the democracy of cricket."

কিন্তু খুড়ো বলেন—"Bradman Cricket-টাই জানেন, ব্যবসাদারদের তো জানেন না, ও'রা একবার মঠে নাবলে 'আউট' করা শক্ত, এমন কি, Body line-ও তখন কোন কাজে আসবে না।"

### পনেরো

পড়ানো শেষ করে সে উঠল; সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

অস্পষ্ট গ্যাসের আলোয় রাস্তার অন্ধকার আরও গভীর। বোধ হয় সাড়ে সাতটা বেজেছে, বাড়ি পৌঁছতে সাড়ে আটটা! যদিও ক্লান্তি লাগছে তার তথাপি মনটা খুবই শান্ত, অধিক পরিশ্রমের ফলে মনের চিন্তাশক্তি শিথিল হয়ে আসে, জীবনের জটিল সমস্যাগুলো মনকে আর তেমন করে আন্দোলিত করে না। গলিটার শেষ প্রান্তেই বড় রাস্তা।

বাসস্টপের কাছে দাঁড়াল সন্ধ্যা।

দূর থেকে একটা মোটরের হেডলাইটের আলো তার মুখে লাগতে সরে দাঁড়াল সন্ধ্যা। গাড়ীখানা তার খুব কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল।

দরজা খুলে যে ভদ্রলোকটি নামল তিনি সন্দীপ্তবাবু।

'হঠাৎ দেখে ফেললাম আপনাকে!' বলল সে, 'বাসের জন্যে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু এতক্ষণ পড়াবার ত আপনার কথা নয়। এক ঘণ্টাই ত যথেষ্ট!'

'প্রথম দিন, পড়া ছাড়াও নানা বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল!' সন্ধ্যা বলল, 'চমৎকার মেয়ে!'

'আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পর মনে হওয়া অসম্ভব নয় আপনি সবাইকে আপন ভাবতে পারেন। রেখা ত আপনাকে প্রায় ভালবেসে ফেলেছে!'

সন্ধ্যা হাসল। সন্দীপ্ত অন্ধকারে তার মুখের কোন রেখাই দেখতে পেল না।

'গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যাওয়াটা লজ্জাকর ব্যাপার! সন্দীপ্ত বলল, 'চলুন! পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে!'

'না, না!' সন্ধ্যা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, 'আমায় পৌঁছে দেবেন কি? সারাদিন অফিসের পরিশ্রমের পরে? আমি কি এ-দূরুকে থাকি?'

'নাই বা থাকলেন, আমিও ত আর হেঁটে যাবোনা! যদি বারণ করেন, আমার উপর অন্যায় আর অবিচার দুই-ই করা হবে! আপনার যদি কথা বলতে ভালো না লাগে একটি কথাও বলব না, যদি আমার দৃষ্টিকে আপনার ভয় করে তাকাবো না, বুঝতেই পারছেন কতখানি আমি সীরিয়স্।'

আশাতীরিক্ত, কিন্তু সন্ধ্যা নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। 'অনর্থক কেন কষ্ট করবেন?' বলল সে, 'এক দিনে আর কি এসে যাবে—যখন প্রতিদিন বাসের জন্যে এখানে আমায় দাঁড়াতে হবে।'

ছ'দিন কাজে বেরোতে হয় বলেই ত রবিবার এত ভালো লাগে। 'আসুন!' সন্দীপ্ত দরজা খুলে দাঁড়াল, বলল, 'আপনাকে পেছনে বসবার নিতান্ত অমায়িক ইঙ্গিত করতে পারি না। কেননা, নিশ্চয়ই আমাকে অনুভব করবার অধিকার দেবেন আপনার কষ্ট লাঘব করবার সৌভাগ্য অর্জন করছি!'

সন্ধ্যা উঠল, বাক্যব্যয় বৃথা!

এ্যাক্সিলেটরে পা দিয়ে সন্দীপ্ত নৈর্ব্যক্তিক উক্তি করল, 'বাঁচলাম!'

'কেন?'

'সহজে আপনার বিশ্বাসভাজন হতে পারবো আশা করিনি!'

'বিশ্বাসভাজনের বিশ্বাসটাই বা হঠাৎ হল কেমন করে?' গাড়ীর প্রচণ্ড বেগে সন্ধ্যার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। চুল আর শাসন মানে না!

'আপনার মুখ দেখে!' সন্দীপ্ত পথের উপর দৃষ্টি রেখে বলল।

'আপনি না বলেছিলেন মুখের দিকে তাকাবেন না!'

'তাকাইনি ত!'

'তবে দেখলেন কেমন করে?'

'দেখিনি, অনুভব করেছি!'

বাড়িঘর, গাছপালা, দোকানপাট পথচারী, গ্যাস পোস্ট সব ঝড়ের মত উড়ে চলেছে, স্পীডোমিটারের কাঁটা ঘুরে চলল।

ভয় কি? সন্ধ্যা শাসন করল নিজেকে!

ধাক্কাটা লাগল চৌরিঙ্গী অতিক্রম করবার সময়।

ঠিক সময়ে সন্দীপ্ত ব্রেকে পা দিয়েছিল নতুবা কি ঘটত বলা যায় না। হাল্কা গাড়ী, ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হল না উল্টে গেল।

ট্র্যাফিক কয়েক মিনিটের জন্য ... লোকের ভিড়, মোটারের হর্ন।

একটি বাঙালী যুবক কারের সাহায্যে নিজের গাড়ীতে তুলে সন্ ... দু'জনকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে এল

সন্দীপ্তের শরীরের কয়েক স্থানে ... করার প্রয়োজন হল। সন্ধ্যা প্রায় ... হাতে কাচের একটা আঁচড় লেগে ... গিয়েছিল। এ্যান্টিটিটেনাস্ ইনজে... সময় তার সম্পূর্ণ জ্ঞান হল। ... সে। একটি নার্স মৃদু কণ্ঠে বল... মিনিট শুয়ে থাকুন!'

সন্ধ্যা চোখ বুজে ভাবতে ... ব্যাপারটা!

সন্দীপ্তের জ্ঞান হতে খানিকটা সময় লাগল।

ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোকটি সন্দী... পরিচয়পত্র তার পকেট থেকে সংগ্রহ ক... বালীগঞ্জে সংবাদ দিতে।

গেটের কাছে গাড়ীর হর্ন শ... খালি পায়ে এগিয়ে এল।

ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নে... করলেন, 'এইটিই কি সন্দীপ্তবাবুর ...'

'হ্যাঁ, কেন বলুন ত?' নির্মলার ... দণ্ডে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

'মোটর এ্যাক্সিডেন্ট-এ তিনি আর ... স্ত্রী আহত হয়েছেন—অবশ্য ভয়ের কোন ক... নেই!'

নির্মলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

'সামান্য দু'একটা স্টিচিং, তাঁর স্ত্রী অবশ্য ভালই আছেন! এত জোরে কখনও গাড়ী চালায়—অন্ধকার রাত্রে?'

'আমাকে নিয়ে যাবেন হাসপাতালে?' নির্মলা বলল, 'আপনার কোন অসুবিধে হবে না?'

'বিন্দুমাত্র না।'

আবার গাড়ি ছুটল।

হাসপাতালে পৌঁছে শুনল মিনিট কয়েক আগে তারা চলে গেছে। দু'জনেই সুস্থ আছেন।

'মিছিমিছি আপনাকে এত কষ্ট দিলাম!'

'কিছু না, চলুন আপনাকে পৌঁছে দি।'

সে কি! আবার এতটা পথ যাবেন? আমি বাসে চলে যাচ্ছি!'

না, চলুন! আমি যাচ্ছি!'

'নির্মলাকে উঠতে হল গাড়িতে!'

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ ভদ্রলোকের মনে হল, পার্শ্ববর্তিনী কাঁদছেন।

'ব্যাপার কি?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'কিছুই না,' নির্মলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'আমিই তাঁর স্ত্রী!'

'ও মাপ চাইছি ভুলের জন্যে!'

'না, না, মাপ চাইবার কি আছে? বরং আমারই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। একদিন সময় ... আসবেন আমাদের বাড়ি! ভুলবেন না।'

'আচ্ছা, আসবো!'

ষোলো

...ট্যাক্সি থেকে সন্দীপ্ত সন্ধ্যাকে নামাল ...র।

...ত্য! আর কোন দিন মুখ দেখাতে ...না আপনার কাছে!' সন্দীপ্ত ক্লান্ত-...স্বর।

...আপনি ত কোন অপরাধ করেন... হাসল।

...অপরাধই করেছি, আপনাকে ...এর ব্যাপারে জড়াবার জন্যে আমিই ...য়! ধরুন গুরুতর যদি কিছু ঘটত ...এবং আমার দেবার থাকত?'

'কৈফিয়ৎ আবার কিসের? দুর্ঘটনার ওপর কারুর কি হাত আছে। আপনিও ত গুরুতর ...হত হতে পারতেন, সেইটাই ত বেশী ...র হত! আমার জীবনের আর মূল্য ...?'

...নাকি?' সন্দীপ্ত হাসল। 'যদি ...এর উত্তর একদিন দেবো। ...নিচ্ছি আজ!' সন্দীপ্ত ট্যাক্সিতে

...ড় ঢোকবার ঠিক আগের মুহূর্তেই খেয়াল হল পায়ে জুতো নেই। কৌতুক ...করল সে! চৌরিঙ্গীর ফুটপাতে ...দতে চটিজোড়ার কথা ভেবে সন্ধ্যার ...রূপই লাগল। কাল স্কুলে যাবার চিন্তাটা সে মন থেকে ঠেকিয়ে রাখল। কাল একটা নতুন দিন!

রান্না শেষ করে সিন্ধু অপেক্ষা করছিল তার জন্যে!

'সত্যি, ভাই, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার কর, কিন্তু আমি কি তার যোগ্য?' সন্ধ্যা বলল তাকে।

'কিন্তু কি এমন করেছি—যার জন্যে ও-কথা বলছেন?' সিন্ধু উত্তর দিল হাসি মুখে!

'করনি? আমার ত কোন দাবি নেই তোমার ওপর, এ-গুলো ত বাড়তি কাজ!'

'সুবিনয়বাবু যা বলেন—আপনিও ত তাই বলছেন দেখছি!'

সন্ধ্যা ঘরে ঢুকেই তিনকড়ির কাছে এগিয়ে গেল। ও জানে এখুনি বারুদ জ্বলে উঠবে। কিন্তু বিস্মিত হল সে—কোন কথাই তিনকড়ি জিজ্ঞেস করল না।

'তোমার খাবার আনবো? টুনি কোথায়?' সন্ধ্যা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করল।

'জানিনা।'

'তোমাকে বলে যায়নি?'

'বলে যাবে কেন? মায়ের মতই ত হবে।' টুনি বনমালীর কাছে গল্প শুনছিল, সন্ধ্যাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল খাওয়া হবে না আজ?' সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করল।

'গল্প শুনছিলাম মা!'

'আপনি কি রাগ করেছেন?' বনমালী বিনীত কণ্ঠে বলল, 'এমন শ্রোতা আমি আর কোনদিন পাইনি। মনে হচ্ছে সত্যিই আমি গল্প বলতে পারি! আচ্ছা আমি ওকে গান শেখাতে পারি?'

'কিন্তু আপনার ধৈর্য থাকবে ত?' সন্ধ্যা হাসল।

'থাকবে।'

'বেশ ত!'

কয়েক মুহূর্ত!

'ওঁর অফিসে আমি গিয়েছিলাম,' বনমালী বলল, 'পাঁচ তারিখে গেলে টাকাটা পাওয়া যাবে বলেছে ওরা!'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!'

'না, না, কিছু না।' ভদ্রতায় বনমালী বিগলিত হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা ফিরে এল টুনির হাত ধরে!

তিনকড়িকে খাবার নিয়ে বেশি অনুরোধ করতে হল না, মুখ দেখে মনে হল ও বিষ খাচ্ছে!

সন্ধ্যা যখন আহার শেষ করে শুতে এল তখন রাত্রি গভীর।

'শোন একটু!' তিনকড়ি ডাকল।

'এখন উঠতে পারবোনা, ঘুম পাচ্ছে বড্ড!' হাত পা ছড়িয়ে সন্ধ্যা বলল।

'জল খাবো!'

'হাত বাড়িয়ে নাও না, পাশেই ত রয়েছে!'

'কয়েকটি কথা আছে! দু'মিনিটের জন্যে আসতে পারোনা?'

'বলনা! শুয়ে শুয়ে শুনছি!'

'এসোনা একটু!'

ঘুম-জড়িত গলায় সন্ধ্যা বলল, 'আসছি!'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সন্ধ্যা।

পরদিন খালি পায়েই স্কুলে চলল সে, জুতো কেনবার পয়সাও ছিল না, সময়ও ছিল না।

বাস-স্ট্যান্ডে বনমালী দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'আজ একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন মনে হচ্ছে!'

'একটু কাজ আছে!' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল সন্ধ্যা!

সুবিনয় নেমে পড়ল বাস থেকে, হাতে একটা মাঝারি সুটকেস, রুক্ষ চুল, জুতোয় কাদার ছাপ।

'নমস্কার সন্ধ্যা দি, স্কুলের সময় হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, আপনার গ্রাম সফর শেষ হল।'

'না, এই ত আরম্ভ; খুব চমৎকার আমাদের কাজ আরম্ভ হয়েছে, কয়েক জন মেয়েকেও আমরা পেয়েছি, কাজের লোক আপনার সাহায্য পেলে ভাল হত!'

'সময় আসুক, আপাততঃ দু'টো খেয়ে বাঁচতে হবে ত? ঐ—বাস, এসে পড়ল। রাতে আছেন ত? - না আবার টো টো করতে বেরোবেন?'

'না, আছি! অনেক কথা আপনাকে বলবার আছে!'

বনমালী পেছনে দাঁড়িয়ে শুনছিল তাদের কথা, বাসটা এগিয়ে আসতে ও হাত দেখাল।

'আচ্ছা!' সন্ধ্যা সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলল।

সন্ধ্যার পাশের জায়গা খালি, বাস ছুটে চলেছে। বনমালী সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছে সেই জায়গাটুকুর দিকে সন্ধ্যা লক্ষ্য করল। তাকাক! ওর আর কাজে বেরোবার অন্য সময় নেই!

'বসুন না!' সন্ধ্যা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল।

বনমালী দণ্ডায়মান অপর কয়েকটি যাত্রির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্ধ্যার পাশে বসে পড়ল গা ঘেঁষে। সন্ধ্যা ওর অলক্ষ্যে একটু সরে বসল। বাসের ঝাঁকুনিতে কোমল দেহের উষ্ণ স্পর্শে বনমালীর রক্তে বান ডাকল। আর কত দিন, হে ঈশ্বর! আর কত দিন।

সে-ই দু'খানি টিকিট কিনল, শুনল না সন্ধ্যার আপত্তি। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে একবার বনমালী সন্ধ্যার হাঁটু স্পর্শ করল। একটু বিরত বোধ করল সে, কিন্তু কোন ভঙ্গি দ্বারাই আপত্তি জানাতে পারল না। উৎসাহিত বনমালী আঙ্গুল দিয়ে তার শরীর পীড়ন করতে লাগল। গতকালের দুর্ঘটনার কাহিনী ভাবতে লাগল সন্ধ্যা; বনমালীর মুখে অর্ধেক যুদ্ধ জয়ের গৌরব।

নামবার সময় বনমালী প্রায় তার কাঁধে হাত দিয়েই দাঁড়াল।

তারপর, 'আপনার কারখানা ত ঢাকুরিয়া, এখানে নামলেন কেন?' চলতে চলতে সন্ধ্যা প্রশ্ন করল।

বনমালী প্রস্তুত ছিল না, বলল, 'এখানে? ও—এখানে একটু দরকার থাকে!'

'রোজ?' সন্ধ্যা তাকাল তার দিকে।

'না, কোন কোন দিন!' অপ্রতিভ হাসি দেখা দিল তার মুখে।

'ও।'

আরও কয়েক মিনিট। সন্ধ্যার স্কুল দেখা যাচ্ছে!

'আপনি কি ভাবছেন—আমার কোন মতলব আছে?' বনমালী জিজ্ঞেস করল।

'মতলব? কি মতলব বলুন ত?' পাল্টা প্রশ্ন করল সন্ধ্যা।

'এই যে—আপনার সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়, আপনি হয়ত ভাবেন, আমি আপনার পিছু নি!'

'ভাবাটা অবশ্য স্বাভাবিক, কিন্তু আমি তা ভাবিনা!' সন্ধ্যা হাসল, 'পাশাপাশি এক সঙ্গে বাস করছি, বিপদে আপদে আপনার নিঃস্বার্থ সাহায্য পাই, এ কি কম কথা? আপনাকে আমি অভদ্র ভাবলে আপনার ওপর অন্যায় করা হবে, এতটা অকৃতজ্ঞ আমায় ভাববেন না।'

বনমালীর মুখে হাসি দেখা দিল, যাক, মেঘ বোধ হয় কাটল তা হলে। 'আচ্ছা—আসি!' বনমালী পাশের গলি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছাত্রীদের হট্টগোলে সমস্ত স্কুল-বাড়িটা গম গম করছে।

পড়াতে সন্ধ্যাকে হলনা, চাকরি খতমের সংবাদটা মালিনী রায় যথাসময়েই তাকে দিয়ে গেল, মালিনী নির্মলার বাল্য বন্ধু।

সন্ধ্যা বাড়ি ফিরে দেখল তিনকড়ি ঘুমোচ্ছে; অসহায়, করুণ ভংগিতে একটা পাশবিক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা! প্রতিবার নিঃশ্বাস পতনের সংগে ঠোঁট একটু ফাঁক হয়, যেটা সন্ধ্যা সহ্য করতে পারে না। পাতলা ভ্রু-র নীচে ছোট চোখ দুটির ক্ষুধার্ত দৃষ্টি সন্ধ্যা প্রতি মুহূর্তে তার শরীরের ওপরে সঞ্চারণ করতে দেখে সংকুচিত হয়ে গেছে। নোখের কোণায় ময়লা জমে কালো হয়ে গেছে! কেটে দিতে চেয়েছিল সন্ধ্যা, বলেছিল, তোমায় ত আচড়াচ্ছেনা, অত মাথা ব্যথা কিসের? হাঁটু দুমড়ে শুয়ে আছে তিনকড়ি। থুথু ফেলবার পাত্রে বোধ হয় ইচ্ছে করেই থুথু ফেলেনি। প্রতিদিন তাকে ঘর ধুতে হয়।

রান্নার আয়োজন করল সন্ধ্যা। সিন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই, সুবিনয়কে ভাত দিতে হবে তাড়াতাড়ি! খানিকটা মাটি সংগ্রহ করতে পারলে কয়লার গুঁড়ো দিয়ে কিছু গুল দিতে পারত! সিন্ধুকে আজ বললে! চাল ফুরিয়ে গেছে! চাল নাকি পাওয়াই যাচ্ছে না! সিন্ধুকে অনুরোধ করতে তার সংকোচ হয়, অতখানি কষ্ট করতে অনুরোধ করবার অধিকার তার আছে কি? তিনকড়ির সামান্য প্রাপ্য টাকাই আগামী দিনগুলির একমাত্র ভরসা, তারপর? সুরমাকে অবশ্য কাল আর একটা (যে কোন কাজের কথা) সে বলবে, সুবিনয়কে বললেও হতে পারে। যে-কোন কাজ তাকে করতেই হবে! আবার সেই অনুগ্রহ-প্রার্থনার পালা, সেই চুপ করে আদেশের জন্য অপেক্ষা করা! কিন্তু গত্যন্তর নেই, কি-ই বা সে করতে পারে? কিন্তু তিনকড়ি কোন দিন বুঝবে না তার এই কৃচ্ছ্রসাধন, বুঝতে চাইবে না তার এই অপমান।

খর্ব, স্তিমিত পুরুষত্ব নিয়ে জানাবে তার আবেদন, আর আবদার যার শেষ নেই, সমাধান নেই।

সন্ধ্যা রান্নাঘরে গেল; টুনিকে সে এসে অবধি দেখতে পায়নি, মেয়েটা যে কোথায় সারাদিন টো টো করে!

'সন্ধ্যা দি!'

সুবিনয়। হাতে তার নানারকম জিনিসপত্র!

'নিন, এগুলো কাজে লাগান, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!'

সুবিনয় ঝাঁকাটা নামিয়ে রাখল। রাজ্যের জিনিষ, আলু, ডিম, ডাল, মশলা, পেয়াজ চাল, নুন আরও হরেক রকম টুকিটাকি মাল। 'কয়েকটা দিন আর আছি,' সে বলল, 'আবার ত আমায় বেরুতে হবে। ভাবছি এ-কটা দিন আপনার অতিথি হয়ে যাবো! যদি আপত্তি থাকে হটুমন্দির ত আছেই!'

'না, আপত্তি নেই সানন্দে! কিন্তু—'

'আমি কি করব বলুন এ-সমস্ত নিয়ে? তা ছাড়া আজকাল খেতে কত লাগে খেয়াল আছে?'

'আছে, তাজমহল গড়তে যত লেগেছিল তা-ই!'

'বুঝলাম, শুনুন, আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি!'

'খাবেন না?'

'হাজির হব ঠিক খাবার সময়, ভাববেন না।'

## সতেরো

আজ তাড়াতাড়ি রান্না শেষ হল তার।

'তোমার খাবার নিয়ে আসবো?' জিজ্ঞেস করল সে তিনকড়িকে।

'অনেক কিছু আজ রেঁধেছ মনে হচ্ছে, শ্লেষ করল তিনকড়ি, 'সম্মানীয় অতিথি কেউ আছে নাকি?'

'থাকতে পারে না?'

'নিশ্চয়ই পারে, অতিথি একদিন গৃহ-স্বামিনীকে না অধিকার করে বসে!'

'শুয়ে শুয়ে বেশ চমৎকার কথা বলতে শিখেছো দেখছি; হাসিমুখে জবাব দিল সন্ধ্যা।

'চমৎকার কথা বলা তোমাদের একচেটিয়া নয়, কথা ছাড়া আর কিই বা সম্বল আছে তোমার?'

'আছে অনেক কিছু!' সন্ধ্যা অর্থপূর্ণ হাসল।

'আছে জানি, সে মূলধনেই তো অবস্থা প্রায় ফিরিয়ে এনেছো!'

'অবস্থা ফেরাতে কে না চায় বল?'

'বালীগঞ্জে একটা ফ্ল্যাট নিলেই পারো, অনেক সৌখিন কাপ্তান বাগাতে পারবে, চাই কি শেষকালে একখানা মোটর গাড়ি!'

'ভালোই ত! গাড়ি চড়ে বেড়াতে পারবে লেকের ধারে, তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে ত বিশুদ্ধ বাতাস দরকার!'

'তার আগে আমি যেন মরি!' তিনকড়ির কথা জোগাল না!

'আমাকে বিধবা করে আর লাভ কি?'

'তুমি আবার বিধবা হবে নাকি কোন দিন? দিব্যি নাম পাল্টে কুমারী হয়ে যাবে!'

'আইডিয়াটা অবশ্য মন্দ নয়!' সন্ধ্যা বাইরে গেল।

বনমালী বাইরেই অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল, সন্ধ্যাকে দেখে বলল, 'এই যে, টাকাটা আজ নিয়ে এলাম ও'র অফিস থেকে আপনার আদেশ মত।'

'কয়েকখানি ভাঁজ করা নোট সন্ধ্যার হাতে গুঁজে দিয়ে আবার বলল, 'দিতে চাচ্ছিল না, অনেক হাংগামা করে তবে উদ্ধার করেছি!'

'কিন্তু এত টাকা কি করে হবে?' বিস্মিত সন্ধ্যা নোট গুণতে গুণতে জিজ্ঞেস করল, 'মাত্র তেরো দিন ত কাজ করেছেন!'

'আমি কি আপনাকে নিজের পকেট থেকে দিচ্ছি ভাবছেন নাকি? অত বোকা যদি আমায় ভেবে থাকেন ত ভুল করেছেন। আজকাল ওয়ার এলাওয়েন্স দিচ্ছে ত সমস্ত যুদ্ধের অফিসে!'

'ও! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম! অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, বাস্তবিক কত কষ্ট যে আপনি আমাদের জন্যে স্বীকার করছেন তার আর কি বলব!'

'কি এমন করেছি যার জন্যে লজ্জা দিচ্ছেন?' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে, 'আপনি ত আমাকে এড়িয়েই চলেন, আপনার কাজ করতে যে আমার কত ভালো লাগে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না!'

'এড়িয়ে চলব কেন?' কিছু একটা বলা প্রয়োজন, 'এই যে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে আপনারই ত মনে হয় প্রথমে

'সেজন্যে আমি কম কৃতজ্ঞ নই!' বনমালী গদগদ কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা! রাত হয়ে গেছে, আপনাকে আর আটকে রাখবো না!' অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে!

এক মিনিটে সন্ধ্যা হিসেব করে ফেলল তিনকড়ির তেরো দিনের মাইনে কত হতে পারে।

পাশে খাবারটা সাজিয়ে রেখে সন্ধ্যা বলল, 'এই যে! হাতটা ধুয়ে নাও! হাত ধুয়ে তিনকড়ি নীরবে খেতে লাগল।

'তোমার তেরো দিনের মাইনেটা আজ আনিয়ে নিয়েছি, হাতে ত বলতে গেলে কিছুই ছিল না!'

'কে আনল!'

'বনমালী বাবুকে বলেছিলাম, তিনি অনুগ্রহ করে এনে দিয়েছেন।'

'চিঠি লিখল কে?'

'আমি। তোমার নামটা আমাকেই সই করে দিতে হল।'

'যদি ধরা পড় কোনদিন, ওরা যদি মেলায়!'

'কিসের জন্যে মেলাবে বল, তুমি ত আবার ওদের কাছে টাকা চাইছ না, কোন কারণ না ঘটলে কেনই বা ওরা সই মেলাতে যাবে!'

'কেন চাইব না, নিশ্চয়ই চাইব, এবং তখনি প্রকাশ পাবে তুমি আমার নাম জাল করেছো।'

'প্রমাণ কি ওটা আমার লেখা।'

'আমি সাক্ষী দেবো।'

'টি'কবে না!' তিনকড়ির রাগ দেখে ও হেসে ফেলল, 'আমি বলব তুমিই ও-চিঠি লিখে টাকা আনিয়েছো, দু'বার টাকা আদায় করবার এটা একটা চালাকি! ভেবে দেখ, আদালত কার কথা বিশ্বাস করবে। কৈ, টাকা কোথায়?'

'এই যে!'

'দাও আমায়।'

'তুমি বিছানায় শুয়ে টাকা নিয়ে কি করবে?'

'টাকাটা ত আমারই।'

'হলেই বা, আমার ওপরেই ত সংসার চালাবার ভার। তুমি শুয়ে শুয়ে টাকা নিয়ে কি করবে?'

'যাই করি না, তোমার তাতে কি?'

'এই ত রইল এই বাক্সে, তোমার দরকার হলেই পাবে! খেয়ে নাও!'

'না, খবো না।' তিনকড়ি ধাক্কা দিয়ে তরকারির বাটিটা ফেলে দিল মাটিতে।

সন্ধ্যা দৃকপাত করল না সেদিকে।

সুবিনয়ের ফেরবার সময় হল, ভাত বাড়তে আরম্ভ করল সে।

টুনি গান গাইছে বনমালীর ঘরে, ইচ্ছে করেই বনমালী দেরি করছে সন্ধ্যা যেন নিজে ডাকতে যায়।

সুবিনয় এসে পড়ল।

'এই যে সন্ধ্যাদি এসে পড়েছি।'

'প্রস্তুত?'

'হুঁ!'

'বসে যান, আসুন!' বনমালীবাবুর ঘরে মেয়েটা গান গাইছে, একবার ডেকে নিয়ে আসবেন?'

'যাচ্ছি!'

টুনিকে বলল সন্ধ্যা, 'কি রে! তোর খিদেও পায় না?'

'পেয়েছে, আমাকে আসতে দিচ্ছিল না!'

কাল থেকে দেরি করলে আর গান শিখতে দেবো না, মনে থাকে যেন, আয়!'

সুবিনয় একা খেতে আপত্তি জানাল।

অগত্যা সন্ধ্যাকেও বসতে হল সঙ্গে। যদিও সে আশঙ্কা করছিল তিনকড়ি যে কোন মুহূর্তেই হাঁক ডাক শুরু করতে পারে।

হৈ, চৈ করে খাওয়া শেষ করল সুবিনয়; কোন সঙ্কোচ নেই, অজস্র কথা বলল, প্রাণ খুলে হাসল; এক সময়ে বলল, 'কি মনে হল জানেন —মনে হল আজ অনেক দিন পরে পেট পুরে খেলাম তৃপ্তির সঙ্গে।'

'রোজই খাবেন!'

'তা আর বরাতে নেই, পরশু তল্পি গুটিয়ে ভেসে পড়তে হবে। দলপতির আদেশ! গুরুভার স্কন্ধে নিয়েছি!'

সন্ধ্যা চিন্তিত হয়ে পড়ল, নির্ভর করবার আর লোক কই? নিজেকে শুধু যে বাঁচতে হবে তা নয়, বাঁচাতেও হবে সংঘর্ষ থেকে, আকর্ষণ থেকে!

টুনি উঠে গেল খেয়ে।

যাবার সময় সুবিনয়ের উদ্দেশে বলল সন্ধ্যা, 'কাল আবার ভুলে যাবেন না যেন!'

'না, আর ভুলি কখনও?'

বাসন কটা সরিয়ে রেখে সন্ধ্যা ঘরে এল। তিনকড়ি ততক্ষণে বাসন ফেলে খাবার ছড়িয়ে জল ঢেলে একাকার করে বসেছে।

পরিষ্কার সে করত না, কিন্তু অত নোংরার মধ্যে তার ঘুম আসবে না।

তিনকড়ি তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'লোকটি কে?'

'হবে কোন সৌখিন কাপ্তান!'

'খুব ঘটা করে খাওয়ালে মনে হল!'

'ঘটা না হোক, অনেক কিছু রাঁধতে হয়েছিল বৈ কি!'

'কিন্তু কে জানতে পারি কি?'

'ভদ্রলোক একটি!'

'ভদ্রলোক না হলে তোমার সঙ্গে আলাপ হবে কি করে, কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি —বড্ড বেশি বাড়িয়ে তুলছো, বাইরে যা খুসি কর—দেখতে যাচ্ছি না, কিন্তু বাড়ির মধ্যে শেষকালে লোক নিয়ে এসে ফুর্তি করবে এটা আমি কিছুতেই সহ্য করব না জেনো।'

'ফুর্তি করবার অধিকার আমার নেই না কি?' সন্ধ্যা সহজ উত্তর দেবে ভেবেছিল, 'এক ঘেঁয়ে জীবনে একটু যদি আমোদ করা হয়— এমন কিছু একটা মহাভারত অশুদ্ধ হয় না নিশ্চয়! আমার কোন বন্ধু থাকতে পারে না— যাকে আমার ভালো লাগে?'

তিনকড়ি এ আঘাতের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, যন্ত্রণায় সে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। সন্ধ্যা বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, সে ক্ষিপ্র হাতে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল তার দিকে! গ্লাসটা সন্ধ্যার হাতের কনুই ঘেঁষে প্রচণ্ড শব্দে দরজায় গিয়ে লাগল।

সে-শব্দে টুনির ঘুম ভেঙে গেল, উঠে বসল সে।

'কিছু হয়নি মা,' সন্ধ্যা বলল তাকে, 'গ্লাসটা পড়ে গেছে হাত থেকে! ঘুমিয়ে পড়।'

বাসন ক'খানা রান্নাঘরে রেখে সে তিনকড়ির পাশে এসে দাঁড়াল, একটা পা চৌকির ওপর তুলে দিয়ে বলল, 'তুমি যে দিন দিন তোমার দৌরাত্ম্য বাড়িয়ে চলেছো, জানো তোমাকে ফেলে চলে যেতে এক মুহূর্তও আমাকে ভাবতে হবে না; নিজেকে আমি স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ করতে পারবো, একবারও ভেবে দেখেছো—চেঁচিয়ে গলার শির ছিঁড়ে ফেললেও এক ফোঁটা জল দেবার জন্যে কেউ এগিয়ে আসবে না।'

'যাও না চলে!' তিনকড়ি গর্জে উঠল, 'এখুনি বেরিয়ে যাও, ভারি ভয় দেখাচ্ছো!'

'তোমার মধ্যে গর্ব করবার কি আছে? ... বলে পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা হয়—তা জানো

'পরিচয় দেবার প্রয়োজন হবে না কোনদি... তোমার পরিচয়ে আমারও বুক দশ হাত ফু... যাবে না! চলে যেতে বলছ—মনে থাকবে। ব... যায় না কিছু, বহুদিন ধরে যে সংস্কার রক্তে... মধ্যে মিশে গেছে ঘটনাচক্রে সে সংস্কারের মো... ভেঙে যেতে এক মুহূর্তও লাগে না মানুষের... তুমি যদি বাস্তবিক জানতে তোমাকে ছে... যেতে আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ন... তা হলে আর বীরত্বের সঙ্গে আমাকে বেরিয়ে... যেতে বলতে না!'

তিনকড়ি উত্তর দিল না, উত্তেজনায় ... একটু মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যা শুতে গেল।

অভ্যাসমত সুবিনয় আহারের পর ঘুরতে... বেরিয়েছিল। যখন সে ফিরল তখন বেশ রা... হয়েছে।

চামেলীর ঘরের দরজা দিয়ে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছিল, অন্য দুটি ঘর অন্ধকার।

দরজায় টোকা মারল সুবিনয়।

চামেলীকে দেখা গেল; মৃদু কণ্ঠে সুবিনয়কে ভেতরে আসতে অনুরোধ করল সে।

বিছানার ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসে... সুবিনয়, নিঃসঙ্কোচে। বলল, 'যদি ঘুমিয়ে পড়ি?'

'পড়বেন। কিন্তু সকালে দরজা খুলে বেরোবার সাহস হবে সবাইর সামনে?'

'বা রে! আমি চোর নাকি? সাহসের কি আছে এখানে?'

কিছু পেটে না পড়লে উৎসব জমে না।

'জানিনা, বুঝি। পরশু দিন কলকাতা ছাড়ছি, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে? মেয়ে কর্মিরও আমাদের প্রয়োজন।'

'নেবেন আমায়? সত্যি আপনি মনে করেন —আমার দ্বারা কিছু কর্ম হবে?'

'মনে করি, কিন্তু সে বড় দুঃখের জীবন, কত কষ্ট যে সহ্য করতে হতে পারে তার ঠিক নেই! এমন পরিষ্কার কলের জল সেখানে নেই, নেই ট্রাম, বাস, ইলেকট্রিক আলো!'

'নাই থাকল!' উৎসাহিত গলায় উত্তর দিল চামেলী, 'কলের জল অনেক খেয়েছি, ট্রাম বাসের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট আছে—আর রেড়ির তেলের স্নিগ্ধ আলো মন্দ কি? যাবো আপনার সঙ্গে।'

'কতদিনে আমাদের কাজ শেষ হবে তার কিছু ঠিক নেই, দু'তিন বছরও লেগে যেতে পারে?'

'খেতে পরতে দেবেন ত?'

'খেতে পাবেন, কিন্তু সে চালে থাকবে কাঁকড় আর ধানের শীষ, আর এমন চমৎকার কাপড় গরীব দেশ কোথা থেকে আপনাকে দেবে?'

'বাঁচলাম!' বলল চামেলী।

(ক্রমশ)

# হিন্দুসমাজ ও তাহার ইতিহাস

শ্রীনির্মলকুমার বসু

### মগ-ব্রাহ্মণদের ইতিহাস

ভারতবর্ষে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মত এক সময়ে সূর্য উপাসক সৌরসম্প্রদায়েরও যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। ঐতিহাসিকগণ পৌরাণিক কাহিনীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে অনুমান করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অনার্যজাতীয়া সহধর্মিণীর পুত্র শাম্বের দ্বারাই উদীচ্য দেশীয় সূর্যমূর্তির পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়। হয়ত আফগানিস্থানের উত্তর এবং আরাল সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত অঞ্চল হইতে এক শ্রেণীর পুরোহিত সূর্যমূর্তি বা মিত্র দেবতার পূজা লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্রাচীনকালে মিত্র-উপাসক মাজি-সম্প্রদায় পারস্য দেশে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ছিল। কিন্তু হয়ত জরথুস্ত্রের অভ্যুদয় এবং ধর্মসংস্কারের ফলে তাঁহারা পারস্য হইতে নির্বাসিত হন। হয়ত তাঁহাদেরই কোনও শাখা শাকদ্বীপ হইতে, অর্থাৎ আফগানিস্থানের উত্তরস্থিত পূর্বোক্ত অঞ্চল হইতে অবশেষে ভারতবর্ষে আশ্রয়লাভ করেন।

এই শাকদ্বীপ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সেখানকার দ্বিজগণ মগনামধারী। তাঁহারা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সেই মগ-জাতীয় পুরোহিতগণ যখন ভারতীয় সমাজে স্থান পাইলেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে স্থান দেওয়া হইল। কেবল, তাঁহারা অপরাপর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী হইলেন।

এক জাতির মধ্যে কেমনভাবে উপজাতির সৃষ্টি হয় এবং এক বর্ণের মধ্যে কিভাবে ভিন্ন দেশ হইতে আগত জাতিও কৌলিক বৃত্তি অনুসারে স্থান পায়, ইহা আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। ক্ষত্রিয় বর্ণের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোলদেশে নাগবংশী রাজপরিবারের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা হয়ত কোলজাত হইতেই উদ্ভূত অথবা অন্তত তাঁহাদের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, ইহা ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। সেইরূপে ওড়িশায় কন্ধজাতীয় এবং মধ্যপ্রদেশে গণ্ডবংশীয় শাসকগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সম্মান এবং বৃত্তির দ্বারা তুষ্ট করিয়া এবং তৎসহ নিজেরা শুদ্ধ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আচারবিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়ের পদমর্যাদা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ ঘটনাও ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। ভারতীয় সমাজে বর্ণ-ব্যবস্থা এইরূপে বাহিরের জাতিকে নিজের কোলে স্থান দিয়া অথবা সমাজের মধ্যে শিল্পের উৎকর্ষ বা আচারশুদ্ধির ফলে নানাবিধ শাখাপ্রশাখা বিস্তারের ফলে জটিলতর হইতেছে, ইহা আমরা দেখিতে পাই।

### রামায়ণ এবং মহাভারত

শূদ্রবর্ণের মনুষ্যও যে দ্বিজাতির মত তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিত, রামায়ণের একটি কাহিনীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জনৈক ব্রাহ্মণের সন্তান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার জন্য রাজার কুশাসনই দায়ী এইরূপ বিবেচনা করিয়া শোকার্ত ব্রাহ্মণ রাজ সভায় অনশনে দেহত্যাগ করার সংকল্প করিলেন। ব্রহ্মহত্যার ভয়ে শ্রীরামচন্দ্র তখন ব্রাহ্মণকে সাময়িকভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাজ্যের কোথায় অনাচার ঘটিয়াছে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তরকাণ্ডের অষ্টাশীতি ও একোননবতিতম অধ্যায় হইতে তাহার পরের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

'অনন্তর রাজর্ষিনন্দন রাম দক্ষিণদিকে আগমন করিয়া বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তরপার্শ্বে সুমহৎ সরোবর সন্দর্শন করিলেন। শ্রীমান্ রঘুনন্দন সেই সরোবরতীরে অধোমুখে লম্বমান তপঃপরায়ণ তাপসকে অবলোকন করিলেন। মহারাজ রাঘব উৎকৃষ্ট তপোনিরত তপস্বীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে সুব্রত! আপনি ধন্য!! হে তপোবৃদ্ধ! আমি দাশরথি রাম, কৌতূহলবশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দৃঢ়বিক্রম! আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি যে অনার সুদুষ্কর তপস্যা আচরণ করিতেছেন, তাহার অভিলষিত বর কি? স্বর্গলাভ অথবা অন্য কোন বর আপনার প্রার্থনীয়? হে তাপস! আপনি যাহা অবলম্বন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে বাসনা করি। আপনি কি ব্রাহ্মণ? অথবা দুর্জয় ক্ষত্রিয়? কিংবা তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য? অথবা শূদ্র? আপনার মঙ্গল হইবে, অতএব সত্য বাক্য বলুন।

'অধোমুখস্থিত তপস্বী নরপতি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নরপুঙ্গব দাশরথিকে জাতি ও যে কারণে তপস্যায় রত হইয়াছেন, তাহা বলিলেন।

তাপস অক্লিষ্ট কর্মা রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোমুখ থাকিয়াই এই বলিলেন,—হে মহাযশস্বিন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে রাম! উগ্রতপস্যা অবলম্বনপূর্বক দেবলোকজয় বাসনায় সশরীরে দেবতা হইবার প্রার্থনা করি। হে রাম! আমি আপনাকে মিথ্যা বলিতেছি না। হে কাকুৎস্থ! আপনি আমাকে শম্বুক নামক শূদ্র বলিয়া বিদিত হউন। সেই শম্বুক এই কথা কহিতে কহিতেই রাম কোষ হইতে সুরুচিরপ্রভ বিমল খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ 'সাধু—সাধু' বলিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রশংসা করত মহতী পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।'

কোল অথবা উরাওঁগণের মধ্যে শুদ্ধাচারী হইয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার যে চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, তাহা যে প্রাচীনকাল হইতে শুধু শম্বুকের মত এক আধজন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া বহু জাতির মধ্যেও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত, মহাভারতে তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্ব কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানা নাই; তবে তাহা যে যথেষ্ট প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শান্তিপর্বের মধ্যে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে :

মান্ধাতা কহিলেন হে ভগবান সুরনাথ যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ ও কাম্বোজগণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন ইতরজাতি সকল এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ রাজ্য মধ্যে অবস্থান করিয়া কিরূপে ধর্ম আচরণ করিবে এবং আমার ন্যায় মনুষ্যগণ কিরূপে দস্যুগণকে ধর্মে সংস্থাপিত করিবে? আমি এই সকল আপনারই নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি, কারণ আপনিই মাদৃশ ক্ষত্রিয়গণের পরম বন্ধু।' ইন্দ্র কহিলেন, 'সমস্ত দস্যুগণেরই মাতা, পিতা, আচার্য, গুরু, আশ্রমবাসী এবং ভূপতিগণের সেবা করা কর্তব্য। বেদোক্ত ধর্মকর্ম সকল এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ শূদ্রেরও কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। তাহারা সময়ানুসারে নিয়তই দ্বিজগণকে কূপ, প্রপা, শয্যা এবং ইতরদান সকল প্রদান করিবে। দস্যুগণের নিয়ত অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, শৌচ ও অদ্রোহ বৃত্তি, দায় সকলের পালন এবং স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ এই সকল ধর্ম আচরণ করা কর্তব্য। সেই

ঐশ্বর্যাভিলাষী দস্যুগণের সকল প্রকার যজ্ঞ করিয়া শাস্ত্রোক্ত দক্ষিণা ও মহার্হ পাকযজ্ঞ করিয়া সর্বভূতে অন্ন প্রদান করা কর্তব্য। হে অনঘ মহারাজ! পূর্ব হইতে দস্যুবৃত্তিগণের পক্ষে এই সকল কর্মই বিহিত হইয়াছে এবং সকল লোকেরই এইরূপ আচরণ করা কর্তব্য।' মান্ধাতা কহিলেন, 'মনুষ্য লোকে আশ্রম চতুষ্টয়ে এবং সকল বর্ণেই লিঙ্গান্তরে বর্তমান দস্যু সকল নষ্ট হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? ইন্দ্র কহিলেন, 'হে অনঘ! দণ্ডনীতি বিনষ্ট এবং রাজধর্ম নিরাকৃত হইলে লোক সকল রাজদৌরাত্ম্যে সর্বতোভাবে প্রমোহিত হইয়া থাকে। মহারাজ! এই সত্য যুগ নিবৃত্ত হইলে আশ্রম সকলের বিকল্প উপস্থিত হইবে এবং পৃথিবীতে অসংখ্য জটাদি চিহ্নধারী ভিক্ষুক সকল বিচরণ করিবে। তাহারা কামক্রোধবশীভূত হইয়া পুরাতন ধর্ম সকলের পরম গতিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করত অসৎ পথ অবলম্বন করিবে। পরন্তু দণ্ডনীতি দ্বারা পাপনীতি নিবৃত্ত হইলে সেই মঙ্গলময়, পরম, শাশ্বত ধর্ম কখনই বিচলিত হয় না।'

অর্থাৎ অন্তত মহাভারতের যুগ হইতে আমরা নানা জাতিকে বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখি। রাজার শাসন শিথিল হওয়ার ফলে নানা দস্যুজাতি লিঙ্গান্তরে বর্ণে অবস্থান করে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণাদিষ্ট নীতি ও আচার ব্যবহার এবং যজ্ঞাদিধর্ম অনুসরণ করা কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

**বর্ণ ধর্মের লক্ষ্য কি?**

**শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থের বিচার**

উপরোক্ত প্রমাণ পাঠ করিলে আমাদের স্বতই মনে হয়, ভারতবর্ষে যে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য কি ছিল? এ সম্বন্ধে যদি আমাদের ধারণা স্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে চাতুর্বর্ণ্যের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সেই বিরাট পুরুষের 'ব্রাহ্মণ' মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহুস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার উরু বৈশ্য ছিলেন এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জাত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এগুলিকে বর্ণ বলা হইয়াছে, জাতি নহে। ঋগ্বেদের উক্তিখণ্ড মন্ত্রের সরল অর্থ করিলে মনে হয়, চারিটি বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং বিভিন্ন কর্মবিশিষ্ট বর্ণের সমন্বয়ের দ্বারা সমগ্র সমাজদেহ গঠিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন মাত্রার সংযোগের ফলে চারি বর্ণের মধ্যে গুণের তারতম্য দেখা যায়। বর্ণগুলি যে শুধু নরসমাজেই আবদ্ধ তাহা নয়, ভূমি অথবা মন্দিরের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বিভিন্ন শ্রেণীভেদ আছে, ইহা অনেকের নিকটেই হয়ত অজ্ঞাত নহে।

বস্তুত বর্ণ বিভাগকে মানব সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বর্গ বিভাগ করিবার একটি বিশেষ রীতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ যখনই বিভিন্ন জাতির সহিত পরিচিত হইয়াছে, তখন তাহাদের গুণ এবং কর্ম দেখিয়া কোন না কোন বর্ণের মধ্যে সেই জাতির স্থান দিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যদি কোন জাতির অভ্যস্ত কর্ম ঠিক ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের কোনটির সঙ্গেই হুবহু মিলিয়া না যায়, তাহাদিগকে মিশ্র গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়, তবে সেই জাতি কোন বর্ণে স্থান পাইবে? এই সমস্যা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম প্রভৃতি বিভিন্ন স্মৃতিকারগণকে যথেষ্ট আলোড়িত করিয়াছিল। তন্মধ্যে মনুসংহিতায় স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে :

মাতা-পিতার নাম নির্দেশপূর্বক এই সকল জাতি বলিলাম, যাহাদিগের মাতা পিতার নাম জানা যায় না, এমত গূঢ় কিম্বা প্রকাশ্য জাতির কর্ম দ্বারা জাতির নির্ণয় জানিবে। ১০।৪০

বর্ণ বহির্ভূত সঙ্করজাতি, কিন্তু কিরূপ সঙ্কর, বিশেষরূপে নিশ্চিত নহে, এমত ব্যক্তির বক্ষ্যমাণ নিন্দিত কর্মের অনুসারে জাতি নির্ণয় করিবে। ১০।৫৭

নিষ্ঠুরতা, পরুষভাষিত্ব, হিংস্রত্ব, বৈদকাদির অননুষ্ঠান, এই সকল কর্ম লোক ব্যক্তিদিগের নিন্দিত জাতি প্রকাশ করে। ১০।৫৮

যে নিন্দিত জাতি হয়, সে পিতার দুষ্ট স্বভাব অথবা জননীর নিন্দিত স্বভাব ভজনা করে বা পিতামাতার স্বভাবের অনুবর্তী হয়। নিন্দিত ব্যক্তি কখন পিতামাতার স্বভাবকে গোপন করিতে পারে না। ১০।৫৯

মহৎকুলে জাত ব্যক্তিরও যদি প্রচ্ছন্নরূপে মাতার ব্যভিচার দোষ থাকে, তবে সে অল্প বা বহুলভাবে জনকের স্বভাব আশ্রয় করে, গোপন করিতে পারে না। ১০।৬০

উষর ভূমিতে উৎসৃষ্ট বীজ অঙ্কুরিত হওয়া দূরে থাকুক, ঐ বীজ বিনষ্ট হয় এবং উত্তম ক্ষেত্র বীজ রহিত হইলে কেবল স্থণ্ডিল অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত দ্বারা সুবীজ ও সুক্ষেত্র, উভয়ের প্রাধান্য বলা হইল। ১০।৭১

যেহেতু বীজের মাহাত্ম্যে হরিণাদিজাত ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিরা মহর্ষি হইয়াছিলেন এবং সকলের পূজিত হইয়াছিলেন বেদজ্ঞানাদি দ্বারা প্রশস্ত অর্থাৎ সকল কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ১০।৭২

শূদ্র যদি দ্বিজাতি কর্মকারী হয় এবং দ্বিজাতি যদি শূদ্র কর্মকারী হয়, তবে ঐ উভয়ে সমানও নয়, অসমানও নয়, ব্রহ্মা ইহা করিয়াছেন শূদ্র দ্বিজাতির কর্ম করিলেও দ্বিজাতির সমান হয় না, কারণ শূদ্র দ্বিজাতির কর্মে অনধিকারী, কি প্রকারে দ্বিজাতিরা [illegible] হইতে [illegible] এবং দ্বিজাতি শূদ্রের সমান [illegible] [illegible] নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান [illegible] [illegible] হয় না। [illegible]

মনুসংহিতা পাঠ করিলে [illegible] [illegible] স্মৃতিকারগণের [illegible] [illegible] একটি বিশেষ নীতিতে [illegible] ছিল। সেই নীতি বা রীতি বা কর্মের [illegible] [illegible] শূদ্রের [illegible] স্মৃতিকারগণ সেই জাতির [illegible] বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন। কয়েকটি [illegible] উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা শূদ্রের [illegible] নিষাদ নামক সন্তান, অয়োগবী [illegible] [illegible] সৌকর্মজীবী মার্গব দাস নামক সন্তান উৎপন্ন করে, যাহাকে আর্যাবর্ত দেশবাসীরা কৈবর্ত জাতি বলে। ১০।৩৪

বৈদেহ, মৈত্রেয়, মার্গব নামক হীনজাতিরা মৃতদের পরিধান, অতিকদর্য, উচ্ছিষ্টভোজী আয়োগবী স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপন্ন করে [illegible] তিন জাতি হয়। [illegible]

নিষাদ হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে [illegible] [illegible] নামক [illegible] জাতি উৎপন্ন হয়, আর বৈদেহ [illegible] জাতি হইতে [illegible] জাতি উৎপন্ন হয় এবং নিষাদ স্ত্রীতে [illegible] জাতি [illegible] [illegible] করিবে। ১০।৩৬

নিষাদ জাতির মৎস্য বধ বৃত্তি, [illegible] জাতির [illegible] বৃত্তি, ব্রাহ্মণ হইতে [illegible] স্ত্রীতে জাত পুত্র [illegible] জাতি এবং [illegible] হইতে [illegible] উৎপন্ন মদ্গু, জাতির [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] হইতে [illegible] শূদ্রের [illegible] বধাদি [illegible] জানিবে। ১০।৪৮

সূত, উগ্র ও পুক্কস জাতির [illegible] গোধাদির বধ ও বন্ধনবৃত্তি হয়, [illegible] চর্ম নির্মাণ ও চর্মবিক্রয় বৃত্তি, বেণজাতির বংশজ ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যবৃত্তি জানিবে। ১০।৪৯

গ্রামাদির সমীপে যে প্রধান বৃক্ষ থাকে, উহার নাম চৈত্য, উহার মূলে বা শ্মশানে অথবা পর্বতের সমীপে উপবনের নিকট ইহারা বাস করিবে। ১০।৫০

চণ্ডাল এবং চণ্ডালবিশেষ যে শ্বপচজাতি, ইহাদিগের গ্রামের বাহিরে বাস হইবে। ইহাদিগকে জলপাত্রাদি রহিত করিবে, কুকুর ও গর্দভ ইহাদিগের ধন, ইহারা শবকম্বল পরিধান, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহের অলঙ্কার ধারণ করিবে, ইহারা সর্বদা ভ্রমণ করিবে, এক স্থানে থাকিবে না। ১০।৫১—৫২

সাধুরা যখন বৈধ কর্মাদির অনুষ্ঠান করিবেন, তখন ইহাদিগকে দর্শনাদি করিবেন

না, উঁহারা স্বজাতির নিকট ঋণাদানাদি ব্যবহার করিবে, অন্যলোকের সহিত ঋণাদানাদি ব্যবহার করিতে পারিবে না, ইঁহাদিগের বিবাহ স্বজাতি মধ্যেই হইবে। ১০।৫৩

সাধুগণ ইঁহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্ন প্রদান করিবেন না, ভৃত্য দ্বারা অন্ন ভগ্নপাত্রে দিবেন, রাত্রিতে ইঁহারা কি গ্রামে, কি নগর মধ্যে কদাচ গমনাগমন করিবে না। ১০।৫৪

ইঁহারা দিবসে কার্যাদি ব্যাপার, রাজার অনুমতিতে কোন চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া গমন করিবে এবং অনাথ শব গ্রাম হইতে বাহির করিবে। ১০।৫৫

রাজদণ্ডে যাহারা বধ্য হইবে উঁহারা উঁহাদিগকে শূলেরোপণাদি দ্বারা বধ করিবে এবং ঐ বধ্যের যে সকল বস্ত্র, শয্যা ও অলংকার তাহা গ্রহণ করিবে। ১০।৫৬

**শাস্ত্রালোচনার উপসংহার**

হিন্দুসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যে সকল শ্রেণীভেদ লক্ষিত হয় এবং শাস্ত্রকারগণ যে সকল ব্যবস্থা দ্বারা সমাজ পরিচালনের চেষ্টা করিতেন, এই উভয় বস্তুকে একত্র করিলে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের গঠন সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি সংহত চিত্র ফুটিয়া ওঠে। এইবার শাস্ত্রের অরণ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক।

হিন্দুসমাজ বহুদিন যাবৎ নানা জাতির সংহতির দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে কৃষি শিল্পাদি ব্যাপারেও নানাবিধ উৎকর্ষের পরিবর্তন হইয়াছে। প্রতি দেশে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে এক এক জাতি হয়ত বিশেষ কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। সে জাতি বা কুলের সর্বত্র একটি বৃত্তি অবলম্বন করিত, ব্রাহ্মণেরা নিজ সমাজের নিয়মানুসারে সেই বৃত্তিতে সেই কুলের বংশানুক্রমিক অধিকার দান করিয়া দিতেন।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে কতকগুলি বস্তুকে উচ্চ কতকগুলিকে অধম বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কুক্কুট, শূকর ইত্যাদি হেয় জন্তু, মৎস্যজীবী হেয় জাতি, পশুপালক হেয় জাতি; কিন্তু গোপালক, অশ্বপালক শুদ্ধ। চর্মজীবী অশুদ্ধ; রেশমী বস্ত্র শুদ্ধ, কিন্তু কার্পাসজাত বস্ত্র অপেক্ষাকৃত অশুদ্ধ। কেনই বা কোন বিশেষ বৃত্তিকে শুদ্ধ এবং অপর কোন বৃত্তিকে অশুদ্ধ বিবেচনা করা হইত, তাহা উপস্থিত আমাদের বিচারের বিষয় নহে। উপস্থিত শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির মানদণ্ড অনুসারে সমাজে বিভিন্ন জাতির পদ নির্ণয় করা হইত। হেয় জাতির মধ্যে কাহাকেও স্পর্শের অযোগ্য, কাহাকেও বা দর্শনের পর্যন্ত অযোগ্য মনে করা হইত।

এইরূপে মান্য এবং হেয় বহু জাতির সংহতির দ্বারা এক বৃহৎ হিন্দুসমাজ গঠিত হয়। কিন্তু সকল জাতিকেই মৌলিক চারি বর্ণের কোন না কোনটির মধ্যে স্থান দেওয়া হইত; কেননা মনুষ্যসমাজে চারি বর্ণের অতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণের স্থান ছিল না।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, প্রতি নিম্নবর্ণের জাতির মধ্যে উচ্চবর্ণের রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহার অনুকরণের প্রবৃত্তি ছিল। সম্মানিত ব্যক্তির নিকট সম্মান লাভ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? এবং সেজন্য সম্মানিত ব্যক্তির অনুকরণই ত সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। এইরূপ চেষ্টার ফলে হয়ত একই জাতির মধ্যে আচার পরিবর্তন, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বৃত্তির পরিবর্তনহেতু নূতন নূতন উপজাতির উদ্গম হইত। শেষে এইরূপ উপজাতি বিবাহ সম্বন্ধ একান্তভাবে নিজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে একটি স্বতন্ত্র জাতিতেই পরিণত হইত।

**দেশাচার ও লোকাচার**

বসন্তকালে উত্তর ভারতের সর্বত্র হোলি অথবা হোলাকা উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বাঙলাদেশে বসন্তকালে শুক্লা চতুর্দশীতে চাঁচর নামে একটি অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহার সূচনা হয়। কোথাও কোথাও চাঁচরকে মেড়া পোড়ানো বা বুড়ীর ঘর পোড়ানো বলে। খড় ও বাঁশ দিয়া একটি ছোট্ট ঘরের মত গড়িয়া তাহার মধ্যে স্থানবিশেষে পিটুলির তৈয়ারী একটি মানুষ বা ভেড়ার মূর্তি রাখার পর যথারীতি বিষ্ণুপূজা করিয়া সেই ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ওড়িশায় কিন্তু মূর্তির পরিবর্তে একটি জীবন্ত ভেড়াকে বধ করিবার রীতি আছে। কেওঁঝর রাজ্যে ঐ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরে ভেড়াটিকে বধ না করিয়া শুধু গায়ে একবার আগুন স্পর্শ করাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যুক্তপ্রদেশের মধ্যে মথুরাতে একজন মানুষকে আগুনের শিখার ভিতর দিয়া লাফাইয়া যাইতে হয়। গোরক্ষপুর জেলায় হোলি উপলক্ষে একটি বানরকে সংহার করিয়া গ্রামের সীমানায় তাহাকে রাখিয়া দেওয়া হয়। যুক্তপ্রদেশে কোন কোন স্থানে হোলির সময়ে গায়ে ফুল ও সর্ষের প্রলেপ মাখিয়া, সেই বস্তু পরে ঘষিয়া তুলিয়া আগুনে দিবার বিধি আছে; তৎসহ মানুষটি যত দীর্ঘ, তত দীর্ঘ একখণ্ড সূতা মাপিয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। বিহার প্রদেশে আগুনের সঙ্গে মানুষ বা ভেড়ার মূর্তির কোনও সম্বন্ধ নাই। সেখানে চতুর্দশীর পরিবর্তে পূর্ণিমার রাত্রে ছেলেরা চুরি-চামারি করিয়া কাঠ সংগ্রহ করে এবং তাহাতে আগুন ধরায়। সেই আগুনে ছোলাগাছ, তিসি, সুপারী, নারিকেল, পিঠা প্রভৃতি নিবেদন করার রীতি প্রচলিত আছে।

হোলি উপলক্ষে ভক্তিমূলক নানাবিধ গান ভিন্ন দরিদ্র বা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অশ্লীল গান গাওয়া হয়। পূর্বকালে কাঠের তৈয়ারী অশ্লীল মূর্তি অথবা বন্ধকাম লইয়া লোকে পথে পথে কোলাহল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; এখনও মধ্যভারতে ইন্দোর রাজ্যে নাকি ইহা সম্পূর্ণ উঠিয়া যায় নাই। স্ত্রীলোকগণ সম্মুখে পড়িলে নানাবিধ কামসূচক অঙ্গভঙ্গিসহকারে তাহাদের ব্যঙ্গ করা হয়, সেই ভয়ে হোলির দিনে স্ত্রীলোকেরা পারতপক্ষে পথে বাহির হয় না। মধ্যপ্রদেশে বণিক জাতির মধ্যে হোলির সময়ে খেলাচ্ছলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সংগ্রাম হয়, কিন্তু গণ্ডজাতির মধ্যে ইহা আরও উগ্র আকার ধারণ করে। মথুরার জাঠগণের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব নৃত্যের ছলে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাঙলাদেশে এক সময়ে আদিরসাত্মক গানের প্রচলন ছিল, কিন্তু আজকাল তাহা আর নাই; শুধু পরিবারের মধ্যে যাহাদের সহিত ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক আছে তাহাদের লইয়া দোলের সময়ে একটু বেশি আমোদপ্রমোদ করা হয়।

রাজসাহী, মৈমনসিংহ, বরিশাল, মেদিনীপুর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা, পশ্চিমে হাজারিবাগ, এমনকি সুদূর কুমায়ুন পর্যন্ত সর্বত্র হোলির পরে যে ছাই পড়িয়া থাকে, তাহাকে লোকে বিশেষ দৈবগুণসম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা করে। গঞ্জাম জেলায় সেই ছাই মাঠে ছড়াইলে দ্বিগুণ ফসল হইবে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। কোথাও বা শস্যে পোকা লাগিবে না এই ভরসায় ছাই গোলার মধ্যে রাখিয়া দেয়। হাজারিবাগ জেলায় হোলির পোড়া কাঠ কোন ফলগাছের উপর দিয়া ছুড়িয়া ফেলিলে দ্বিগুণ ফল ধরিবে বলিয়া লোকে মনে করে। মধ্যপ্রদেশে গণ্ডজাতি হোলির আগুনে তপ্ত লাঙলের ফাল দিয়া বৎসরে প্রথমবার ভূমি কর্ষণ সমাধা করে।

চাঁচর বা হোলি কবে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল সে সংবাদ সঠিক জানা নাই। জৈমিনিপ্রণীত পূর্বমীমাংসার শবরস্বামিকৃত ভাষ্যে হোলাকার উল্লেখ আছে। সেই ভাষ্য সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। শবরস্বামীর ভাষ্যে বলা হইয়াছে, হোলাকা প্রাচীনকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। হোলির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ অসংলগ্ন কাহিনী প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কিছু নাই।

হোলাকা উৎসবের সঙ্গে তথাকথিত হীন জাতির সম্পর্কের একটি প্রমাণ কোঙ্কণ প্রদেশে পাওয়া যায়। ঐ উৎসব উপলক্ষে কোঙ্কণের ব্রাহ্মণগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে তথাকথিত হীন জাতীয় কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে হয়, অথচ অপর সময়ে তাহাতে স্পর্শদোষ জন্মায়। বিহারে—হোলাকার অগ্নিসংযোগ সচরাচর ব্রাহ্মণ অথবা গ্রামের বৃদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইলেও ভাগলপুর জেলায় সে অধিকার শুধু ডোমজাতীয় লোকেদেরই আছে।

ডোমেরা সেখানে বাঙলা দেশের মতই অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হয়।

ভারতবর্ষের অরণ্যচারী জাতিবৃন্দের মধ্যে হোলাকার মত কোনও অনুষ্ঠান আছে কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে আমরা কয়েকটি অর্থপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাই। উড়িশার দক্ষিণভাগে কন্ধ জাতির মধ্যে কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত মেরিয়া নামক নরবলির প্রচলন ছিল। প্রায় শতবর্ষ হইতে কন্ধগণ বাধ্য হইয়া মানুষের পরিবর্তে মহিষ বলি দিয়া আসিতেছে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য একজন মানুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মাংস ক্ষেতের মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়ার রীতি ছিল। কোন কোন গ্রামে আবার সেই ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে দগ্ধ করিয়া ছাইগুলি মাঠে বা যে নদী হইতে সেচ দেওয়া হইত, সেই নদীর জলে মেশানো হইত। মানুষটিকে বলি দেওয়ার পরদিবস তাহার মাথা এবং দেহের অবশিষ্ট অংশ ও অস্থি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া একটি জীবন্ত ভেড়ার সঙ্গে একত্র দগ্ধ করা হইত। এই দিনের ছাই মাঠে ছড়ানো হইত অথবা জলে গুলিয়া ঘরে বা শস্যের গোলায় শস্য রক্ষা হইবে, এই আশায় লেপিয়া দেওয়া হইত।

কন্ধ জাতির মধ্যে মেরিয়া-সংহার উপলক্ষে অসম্ভব মদ্যপান এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যথেচ্ছ সংগমের রীতি ছিল। কন্ধদের ধারণা, ধরিত্রী দেবী শস্যের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যে প্রাণশক্তি বিতরণ করেন, আমরা নরবলি দিয়া সেই প্রাণশক্তি ধরিত্রীকে পুনরায় অর্পণ করি। ভূমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে অনুষ্ঠান, সে উপলক্ষে নর-সমাজের মধ্যেও অবাধ কামচেষ্টা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

কন্ধদের মধ্যে প্রচলিত অনুষ্ঠানটির সঙ্গে হোলির সাদৃশ্য আকস্মিক হইতে পারে না। হয়ত কোনও সময়ে সমগ্র উত্তর এবং মধ্য ভারতে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নরবলির প্রচলন ছিল। পরে ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি প্রসারের ফলে তাহা পরিবর্তিত অথবা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কেবল কন্ধদের মত অরণ্যাশ্রয়ী জাতির মধ্যে তাহা অপেক্ষাকৃত অবিকৃত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে কোথাও আগুনের মধ্য দিয়া মানুষকে লাফাইয়া যাইতে হয়, কোথাও বা পিটুলির মানুষকে দহন করিতে হয়। কোথাও জীবন্ত ভেড়া পোড়ানো হয়, কোথাও বা তাহার মূর্তি। বহু স্থানে দাহের পরে ছাই সংগ্রহ করিয়া শস্যের বা শস্যক্ষেত্রের উন্নতি বিধানের চেষ্টা দেখা যায়। নরবলির পরিবর্তে যেমন তাহার এক লঘু সংস্করণ প্রবর্তিত হইয়াছে, পূর্বের অবিমিশ্র কামচেষ্টার পরিবর্তে তেমনই কামভাবান্বিত ভঙ্গি অথবা গান কিংবা শুধু সামান্য ঠাট্টা-তামাশা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

হিন্দুধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণ করিলেও আমরা এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাই। কোথাও প্রাচীন কোন গ্রাম-দেবতার পূজা এখনও অ-জলচল জাতির অধিকারে রহিয়াছে, অথচ উচ্চবর্ণের সকল জাতি সেই দেবতার পূজায় অনার্যের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। কটক জেলায় বাঁকির নিকট বৈদোশ্বর এবং রামনাথ মহাদেবের মন্দিরের সেবক অ-জলচল মালি জাতের মানুষ। পুরীতে জগন্নাথ দেবের মূর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় কাজে শবর জাতির দৌহিত্র বংশজ দইতাপতিগণের কেবল অধিকার আছে। হিন্দুধর্মাবলম্বী বহু জাতির মধ্যে বিবাহের সময়ে প্রচলিত স্ত্রী-আচারের বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পূর্বে বিবাহের যে অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহা আজ স্ত্রী-আচারের আকারে পর্যবসিত হইয়াছে। এই সকল সামাজিক রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহার, দেশাচার এবং লোকাচার নামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের নিকট মর্যাদা লাভ করিত। নানা জাতি যখন ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিয়া বৃহত্তর হিন্দুসমাজ গঠন করিতে লাগিল, তখন কাহারও আচার-অনুষ্ঠানকে অকারণে নষ্ট করা হয় নাই। কেবল ব্রাহ্মণ্য নীতির পরিপন্থী কোনও আচার বা অনুষ্ঠান থাকিলে তাহাকে পরিমার্জিত ও শোধিত করিয়া লওয়া হইত। ইসলাম, খৃষ্টীয় অথবা ইহুদিগণের ধর্ম কিন্তু এ বিষয়ে স্বতন্ত্র। সেখানে কোন মানুষ অপর ধর্ম হইতে আসিয়া স্থান পাইলে তাহাকে পূর্ব সংস্কার প্রায় সর্বদা বিসর্জন দিয়া আসিতে হয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের ঔদার্যের ফলে হিন্দুসমাজের মধ্যে অঙ্গীভূত বিভিন্ন জাতিকে সেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিতে হয় না। ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে স্থান পাইবার পরেও অনেকের মধ্যে প্রাক্তন নাচ, গান, সামাজিক আচার বিচার বহুলাংশে অক্ষত অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় মুনি-ঋষিগণ স্বীকার করিতেন যে, সকল মানুষের মন সমান স্তরের নয়। অতএব সকলের পক্ষে মানসিক বিকাশের জন্য একই ভাবধারার আশ্রয় প্রয়োজন হয় না। সমাজে যখন নানা স্তরের মানুষ বাস করে, তখন ধর্মের মধ্যেও সকলের সুবিধার জন্য নানা পথ, নানা মতের স্থান থাকা উচিত। ফলত, হিন্দুসমাজ যেমন নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে, হিন্দুধর্মও তেমনই নানা মত ও পথের সংশ্লেষে বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। হিন্দুসমাজের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের ভিতর দ্বিজাতি এবং দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান যেমন সর্বোপরি; হিন্দুধর্মের মধ্যেও তেমনই নানা জাতির সংস্কৃতি স্থান পাইলেও বৈদিক সংস্কার এবং বৈদিক চিন্তাধারার স্থানও সর্বোপরি রক্ষিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু দেবতার স্থান থাকিলেও, নদীর গতি যেমন সর্বশেষে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, এক্ষেত্রেও তেমনই সকল দেবতার পূজা অবশেষে অবাঙ্‌মানসগোচর ব্রহ্মজ্ঞানে পর্যবসিত হয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বিষয়টি অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন।*

...যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধিসমন্বিত হইয়া থাকে, হে কৌন্তেয়, তাহারাও অ-বিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। এই স্থানে অ-বিধি শব্দের অর্থ অজ্ঞান অর্থাৎ তাহারা অজ্ঞানপূর্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। ৯।২৩

কেন এই কথা বলা হইল যে, তাহারা অবুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞ করিয়া থাকে? তাহার উত্তর এই যে—যে কারণে আমি বেদবিহিত ও ধর্মশাস্ত্রবিহিত সকল প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। আমি দেবতা রূপে যজ্ঞের ভোক্তা। 'অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র' এই শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা প্রভু। কারণ আমি যজ্ঞের স্বামী। [অন্য দেবতা ভক্তগণ] আমাকে যথার্থভাবে জানিতে পারে না, এই জন্যই তাহারা অবুদ্ধিপূর্বক উপাসনা করিয়াও উপাসনার সম্যক ফল হইতে প্রচ্যুত হইয়া থাকে। ৯।২৪

যাহারা ভক্তিমান অথচ অ-বিধিপূর্বক অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহাদেরও যাগ-ফল অবশ্যম্ভাবী। কেন? [এরূপ হয়?] তাহা বলা যাইতেছে যে—'দেবব্রত' দেবতাগণের প্রীতির উদ্দেশ্যে ব্রত-নিয়ম অর্থাৎ দেবতার প্রতি ভক্তি যাহারা করে, তাহাদিগকে 'দেবব্রত' বলা যায়; যাহারা দেবব্রত, তাহারা [নিজ নিজ ইষ্ট] দেবগণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা 'পিতৃব্রত' শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ, তাহারা অগ্নি-ষ্বাত্তাদি নামে প্রসিদ্ধ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যাহারা ভূতগণ (অর্থাৎ) বিনায়ক, মাতৃগণ ও চতুঃষষ্টি যোগিনী প্রভৃতিকে উপাসনা করে, তাহারাও ভূতগণকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগকেই 'বৈষ্ণব' বলে। [অন্য দেবতার পূজার জন্য যে প্রয়াস, আমার পূজাতে সেই প্রকারই প্রয়াস] প্রয়াস সমান হইলেও লোক অজ্ঞানবশতঃ আমাকে ভজনা করে না; সুতরাং তাহারা অল্প ফল লাভ করিয়া থাকে। ৯।২৫

কেবল যে আমার ভক্তগণের নির্বাণ রূপ অনন্ত ফললাভ হয়, তাহাই নহে; আমার উপাসনাও কিন্তু বড় সুলভ [ইহাই বলা যাইতেছে] পত্র পুষ্প ফল 'তোয়' জল [প্রভৃতি

* শঙ্কর ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ হইতে সংকলিত।

যাহা কিছু হউক না কেন] যে আমাকে ভক্তির সহিত অর্পণ করিবে, সেই 'প্রযতাত্মা' অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধির প্রদত্ত [সেই সকল পত্র প্রভৃতি] 'ভক্ত্যুপহৃত' ভক্তির সহিত উপহৃত [বস্তুগুলি] আমি 'ভক্ষণ'—গ্রহণ করিয়া থাকি। ৯।২৬

যে কারণ এইরূপ, সেই জন্য তুমি যাহা কর (অর্থাৎ) স্বতঃ (গমনাদি), যাহা ভক্ষণ কর, যে শ্রৌত অথবা স্মার্ত হোম কর, যে স্বর্ণ-অন্ন ঘৃতাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাক এবং যাহা কিছু তপস্যাচরণ কর, তাহা [সকলই] আমাতে সমর্পণ কর। ৯।২৭

এই প্রকার কর্ম করিতে করিতে তোমার কি হইবে, তাহা শুন। শুভ ও অশুভ (অর্থাৎ) ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল যাহাদের হয়, তাহাদের নাম 'শুভাশুভ ফল'। শুভাশুভ ফল বলিলে কর্মই বুঝায়। সেই কর্মই বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে এবং এই প্রকারে আমাতে কর্ম সমর্পণ করিয়া চলিলে সেই শুভাশুভ ফল কর্মবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করিবে। এই সেই সন্ন্যাস-যোগ অর্থাৎ ইহা সন্ন্যাস হইয়াও যোগ; কারণ আমাকে ফলার্পণ করিয়া কর্মানুষ্ঠানই ইহার স্বরূপ। সেই সন্ন্যাসযোগের সহিত যাহার 'আত্মা' অন্তঃকরণ যুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে 'সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা' কহা যায়; তুমি এইরূপ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা ও কর্মবন্ধন হইতে জীবিতাবস্থাতেই বিমুক্তি লাভ করিয়া, পরে এই দেহ পতিত হইলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে (অর্থাৎ) মদ্‌ভাবকে লাভ করিবে। ৯।২৮

অথবা

সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে অসম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত নিজ ধর্ম শ্রেয়ান্‌। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম [মরণের পরও নরকাদিলক্ষণ] ভয়ের হেতু। ৩।৩৫

অথবা

...স্বধর্ম বিগুণ হইলেও...সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে 'শ্রেয়ান' প্রশস্যতর। ...যেমন বিষজাত কৃমির পক্ষে বিষ দোষজনক নহে, সেইরূপ স্বভাবনিয়ত কর্ম করিলে মানব কিল্বিষ পাপ প্রাপ্ত হয় না ১৮।৪৭

হে কুন্তীনন্দন? স্বভাবজ কর্ম সদোষ হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না;. কারণ ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত হয়, সেই-রূপ সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। ১৮।৪৮

ক্রমশঃ

# ১৩৫৪ সাল ঃ ভারতবর্ষ

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

তেরশ' চুয়ান্ন সাল
ইতিহাসের পাতায় প্রতিষ্ঠা করেছে অক্ষয় আসন:
মহাকালের আদি-অন্ত-বিহীন যাত্রায়
স্মরণযোগ্য একটি বৎসর
তেরশ' চুয়ান্ন সাল
স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল, স্বকৃত কলুষে পঙ্কিল।

দ্বিচারিণী তেরশ' চুয়ান্ন!
তার প্রাণবন্যার এপিঠ ওপিঠে
দুই বিরোধী ভাবধারার অবাধ প্রাধান্য—
একদিকে
হিংসার পাশব উন্মত্ততায় অপঘাতের ক্রুর ঘূর্ণাবর্ত,
আত্মঘাতী মূঢ়তার ঘৃণ্য আস্ফালন,
পুঞ্জীভূত নীচতার হিংস্র আলোড়নে
বিভ্রান্ত মানুষের মন।

অন্যদিকে,
অহিংসা ও সত্যের ঐশী প্রভাবে
মৃত্যুঞ্জয়ী মানবশিশুর
স্বাধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রাম,
তেরশ' চুয়ান্ন সাল
প্রত্যক্ষ করেছে সাফল্যের গৌরবময় পরিণাম।
ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা স্মরণ করবে পরম শ্রদ্ধায়
তেরশ' চুয়ান্ন সালকে—
স্মরণ করবে
আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের
গৌরবময় ঐতিহ্যকে।
তারাই জানাবে চরম ঘৃণা
আমাদের আত্মঘাতী মূঢ়তাকে,
পিতৃঘাতী জাতিকে।

তেরশ চুয়ান্ন সাল নন্দিত ও ধিক্কৃত হবে
ভাবীকালের বিদগ্ধ চেতনায়।
বহুতত্ত্বের কষ্টিপাথরে
তারা বিচার ও বিশ্লেষণ করবে
তেরশ চুয়ান্ন সালের রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জে
বহু লালিত দুই বিরোধী ভাবধারার
প্রত্যক্ষ সংঘাত।

পরম সৌভাগ্য আমাদের—
সুখে দুঃখে হতাশায় গৌরবে
প্রত্যক্ষ করেছি প্রতিদিনের কার্য ও চিন্তায়
স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল পরিণতি,
এক মহানাট্যের শেষ যবনিকাপাত।
প্রত্যক্ষ করেছি—
পরম লজ্জা ও অনুশোচনায়
মহাগুরুর শোচনীয় অপঘাত !

কাল-বিজয়ী তেরশ' চুয়ান্ন—
হিংসার প্রেতনৃত্যে আর প্রেমের জয়বার্তায়
ইতিহাসে অনন্য ॥
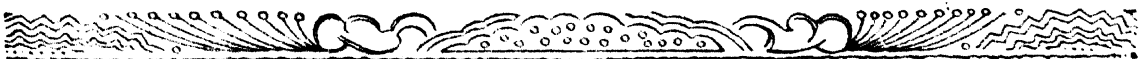
# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভোরের নমাজ শেষ হতেই সর্দারজী ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হল তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন আজ সন্ধ্যেয় যে করেই হোক কাবুলে পৌঁছবেন।

বেতার-সায়েবের দিলও খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সর্দারজীর সঙ্গে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন ও আমাকেও আফগানিস্থান সম্বন্ধে নানা কাজের খবর নানা রঙিন গুজব বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য, কতটা কল্পনা, কতটা ডাহা মিথ্যে বোঝার মত তথ্য আমার কাছে ছিল না; কাজেই এক তরফা গল্প জমে উঠল ভালই। তাবই একটা বলতে গিয়ে ভূমিকা দিলেন, "সামান্য জিনিসে মানুষের সমস্ত জীবনের ধারা কি রকম অন্য পথ নিয়ে ফেলতে পারে শুনুন।"

'প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই নিমলার বাগানেই জন চল্লিশ কয়েদী আর তাদের পাহারওয়ালারা রাত কাটিয়ে সকাল বেলা দেখে একজন কি করে পালিয়েছে। পাহারওয়ালাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। কাবুল থেকে হস্তগুনো কয়েদী নিয়ে বেরিয়েছিল জলালাবাদে যদি সেই সংখ্যা না দেখাতে পারে তবে তাদের যে কি শাস্তি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের আইনজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। কেউ বলল, ফাঁসী দেবে, কেউ বলল, গুলী করে মারবে, কেউ বলল, জ্যান্ত শরীর থেকে টেনে টেনে চামড়া তুলে ফেলবে। জেল যে হবে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না আর আফগান জেলের অবস্থা আর কেউ জানুক না জানুক তারা বিলক্ষণ জানত। একবার সে জেলে ঢুকলে সাধারণতঃ কেউ আর বেরিয়ে আসে না—যদি আসে তবে সে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে, অথবা অন্যের স্কন্ধের উপর সোয়ার হয়ে কফিনের ভেতর শুয়ে শুয়ে। আফগান জেল সম্বন্ধে তাই যেসব কথা শুনতে পাবেন তার বেশির ভাগই কল্পনা—মরা লোকে তো আর কথা কয় না।

'তা সে যাই হোক পাহারওয়ালারা তো ভয়ে আধমরা। শেষটায় একজন বুদ্ধি বাৎলালো যে রাস্তার যে-কোনো একটা লোককে ধরে নিয়ে হিসেবে গোঁজামিল দিতে।

'পাছে অন্য লোকে জানতে পেরে যায় তাই তারা সাত তাড়াতাড়ি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরল। চতুর্দিকে নজর, কাউকে যদি একাএকি পায় তবে তাকে দিয়ে কাজ হাঁসিল করবে। ভোরের অন্ধকার তখনো কাটেনি। এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার পাশে প্রয়োজনীয় কর্ম করতে এসেছিল—তাকে ধরে শিকলি পরিয়ে নিয়ে চলল আর সকলের সঙ্গে জলালাবাদের দিকে।

'সমস্ত রাস্তা ধরে তাকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের সকল রকম ভয় দেখিয়ে পাহার-ওয়ালারা শাসিয়ে বলল, জলালাবাদের জেলের তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যেন শুধু বলে, 'মা খু চিহ্ল্ ও পঞ্জম্ হস্তম্' অর্থাৎ আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।' ব্যস আর কিছু না।

'লোকটা হয় আকাট মূর্খ ছিল, না হয় ভয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল অথবা এও হতে পারে যে সে ভেবে নিয়েছিল যে যদি কোনো কয়েদী পালিয়ে যায়, তবে সকলের পয়লা রাস্তায় যে সামনে পড়ে তাকেই সরকারী নম্বর পুরিয়ে দিতে হয়। অথবা হয়ত ভেবে নিয়েছিল রাস্তার যে-কোনো লোককে রাজার হাতী যখন মাথায় তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারে তখন তাকে জেলখানায়ই বা নিয়ে যাবে না কেন?'

বেতার বাণী বললেন, 'গল্পটা আমি কম করে জন পাঁচেকের মুখে শুনেছি। ঘটনা-গুলোর বর্ণনায় বিশেষ ফেরফার হয় না কিন্তু ঐ হতভাগা কেন যে জলালাবাদের জেলারের সামনে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার চেষ্টা একবারও করল না সেই বিচিত্র।'

সর্দারজী শুধালেন, 'অন্য কয়েদীরাও চুপ করে রইল?'

বেতারওয়ালা বললেন, 'তাদের চুপ করে থাকার প্রচুর কারণ ছিল। সব কয়টা কয়েদীই ছিল একই ডাকাত দলের। তাদেরই একজন পালিয়েছে—অন্য সকলের ভরসা সে যদি বাইরে থেকে তাদের জন্য কিছু করতে পারে। তার পালানোতে অন্য সকলের যখন সড় ছিল তখন তারা কিছু বললে তো তাকে ধরিয়ে দেবারই সুবিধে করে দেওয়া হয়।

'তা সে যাই হোক। সেই হতভাগা তো জলালাবাদের জাহান্নমে গিয়ে ঢুকল। কিছুদিন যাওয়ার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারল কি বোকামিই সে করেছে; তখন একে ওকে বলে কয়ে আলা হজরত বাদশার কাছে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা করে সে দরখাস্ত পাঠাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জলালা-বাদের জেলের দরখাস্ত সহজে হুজুরের কাছে পৌঁছয় না। জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে, ভালো করে সনাক্ত না করে বেকসুর লোককে জেলে পোরার সাজাও হয়ত তার কপালে আছে। অথবা হয়ত ভেবেছে, সমস্তটাই গাঁজা, কিম্বা ভেবেছে, জেলের আর পাঁচজনের মত এরও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

'জলালাবাদের জেলের ভেতর কাগজ কলমের ছড়াছড়ি নয়। অনেক ঝুলোঝুলি করে সে দরখাস্ত লেখায়, তারপর সে দরখাস্তের কি গতি হয় তার খবর পর্যন্ত বেচারীর কানে গিয়ে পৌঁছয় না।

'বিশ্বাস করবে না, এই করে করে এক-মাস নয় দুমাস নয়, এক বৎসর নয় দু বৎসর নয়—ঝাড়া ষোলটি বৎসর কেটে গিয়েছে। তার তখন মনের অবস্থা কি হয়েছে বলা কঠিন তবে আন্দাজ করি বোধ করি অন্যায় নয় যে সে তখন দরখাস্ত পাঠানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে।

'এমন সময় তামাম আফগানিস্থান জুড়ে খুব বড় একটা খুশির জশন (পরব) উপস্থিত হল—মুঈন-উস-সুলতানের (যুবরাজের) শাদী অথবা তার প্রথম ছেলে জন্মেছে। আমীর হবিব উল্লা খুশির জোশে অনেক দান-খয়রাত করলেন ও সে খয়রাতির বরসাত রুখোসুখো জেলগুলোতেও পৌঁছল। শীতকাল; আমীর তখন জলালাবাদে। ফরমান বেরুল, জলালাবাদের জেলের যেন তাবৎ কয়েদীকে হুজুরের সামনে হাজির করে। হুজুর তাঁর বেহদ মেহেরবাণী ও মহব্বতের তোড়ে বে-এখতেয়ার হয়ে হুকুম দিয়ে ফেলেছেন যে খুদ তিনি হরেক কয়েদীর ফরিয়াদ-তকলিফের খানাতল্লাসী করবেন।

'কিন্তু কয়েদী খালাস পেল, তারো বেশী কয়েদীর মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া হল। করে করে শেষটায় নিমলার সেই হতভাগা হুজুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'হুজুর শুধালেন, 'তু কীস্তী' 'তুই কে?'

'সে বলল, 'মাখু চিহ্ল্ ও পঞ্জম হস্তম' অর্থাৎ আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।

'হুজুর যতই তার নামধাম কসুর সাজার কথা জিজ্ঞেস করেন সে ততই বলে সে শুধু প'য়তাল্লিশ নম্বরের। ঐ এক বুলি, এক জিগির। হুজুরের সন্দেহ হল, লোকটা বুঝি পাগল। ঠাহর করার জন্য অন্য নানা রকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল, সূর্য কোন দিকে ওঠে, কোন দিকে অস্ত যায়, মা ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, না ছেলে মাকে। সব কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু তার নিজের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'আমি তো প'য়তাল্লিশ নম্বরের'।

'ষোল বছর ঐ মন্ত্র জপ করে করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, তার নাম নেই ধাম নেই, সাকিন ঠিকানা নেই, তার পাপ নেই পুণ্য নেই, জেলের ভেতরের বন্ধন নেই, বাইরের মুক্তিও নেই—তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তার সর্বৈব সত্তা ঐ এক মন্ত্রে 'আমি প'য়তাল্লিশ নম্বরের'।

'শত দোষ থাকলেও আমীর হবিব উল্লার একটা গুণ ছিল; কোনো জিনিসের থেই ধরলে তিনি জট না ছাড়িয়ে সন্তুষ্ট হতেন না। শেষটায় সেই ডাকাতদের যে দু-একজন তখনো বেঁচেছিল তারাই রহস্যের সমাধান করে দিল।

'শুনতে পাই খালাস পাওয়ার পর বাকী জীবন সে ঐ প'য়তাল্লিশ নম্বরের ভানুমতী কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

গল্প শুনে আমার সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিপক্ব বৃদ্ধ সর্দারজীর মুখে শুধু 'আল্লা মালিক' খুদা বাঁচানেওয়ালা।'

ততক্ষণে চড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাবুল যেতে হলে যে সাত আট হাজার ফুট পাহাড় চড়তে হয় নিমলার কিছুক্ষণ পরেই তার আরম্ভ।

শিলেট থেকে যারা শিলঙ গিয়েছেন, দেরাদুন থেকে মসৌরী, কিম্বা মহাবলেশ্বরের কাছে পশ্চিম ঘাট উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের পক্ষে এ রকম রাস্তার চুলের কাঁটার বাঁক, হাঁসুলি চক্করের মোড় কিছু নূতন নয়—নূতনত্বটা হচ্ছে যে, এ রাস্তা কেউ মেরামত করে দেয় না, এখানে কেউ রেলিঙ বানিয়ে দেয় না, হরেক রকম সাইন বোর্ড দুদিকের পাহাড়ে সেঁটে দেয় না, বিশেষ সংকীর্ণ সংকট পেরুবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দুদিকের মোটর আটকানো হয় না। মাটি ধ্বসে রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ না জন আষ্টেক ড্রাইভার আটকা পড়ে আপন আপন শাবল দিয়ে রাস্তা সাফ করে নেয় ততক্ষণ পণ্ডিত মশায়ের 'রাধে গো ব্রজসুন্দরী, পার করো' বলা ছাড়া অন্য কিছু করবার নেই। যাঁরা শীতকালে এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে রাস্তার বরফও নিজেদের সাফ করতে হয়। অবশ্য বরফ সাফ করাতে আভিজাত্য আছে—শুনেছি স্বয়ং হুমায়ুন বাদশাহ নাকি শের শাহের তাড়া খেয়ে কাবুল না কান্দাহার যাবার পথে নিজ হাতে বরফ সাফ করেছিলেন।

শিলঙ-নৈনিতাল যাবার সময় গাড়ির ড্রাইভার অন্ততঃ এই সান্ত্বনা দেয় যে, দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। এখানে যদি কোনো ড্রাইভার এ রকম কথা বলে তবে আপনাকে শুধু দেখিয়ে দিতে হবে, রাস্তার যে-কোনো এক পাশে, হাজার ফুট গভীর খাদে দুর্ঘটনায় অপমৃত দুটো একটা মোটর গাড়ির কঙ্কাল। মনে পড়ছে কোন এক হিল স্টেশনের চড়াইয়ের মুখে দেখেছিলুম ড্রাইভারদের বুকে যমদূতের ভয় জাগাবার জন্য রাস্তার কর্তা ব্যক্তিরা একখানা ভাঙা মোটর ঝুলিয়ে রেখেছেন—নীচে বড় বড় হরপে লেখা, 'সাবধানে না চললে এই অবস্থা তোমারও হতে পারে।' কাবুলের রাস্তার মুখে সে রকম ব্যাপক কোনো বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয় না—চোখ খোলা রাখলে দুদিকে বিস্তর প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে চিত্তির যখন হঠাৎ বাঁক নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন আধ মাইল লম্বা উটের লাইন। একদিকে পাহাড়ের গা, আর একদিকে হাজার ফুট গভীর খাদ, মাঝখানে গাড়ি বাদ দিয়ে রাস্তার ক্লিয়ারিঙ এক হাত। তার ভেতর দিয়ে নড়বড়ে উট দূরের কথা, শান্ত গাধাও পেরুতে পারে না। চওড়া রাস্তার আশায় আধ মাইল লম্বা উটের সারিকে পিছু ঠেলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তখন গাড়িই ব্যাক করে করে চলে উল্টো দিকে। সে অবস্থায় পিছনের দিকে তাকাতে এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন স্নায়ুবিহীন 'দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা' স্থিতধী মুনিপ্রবর আমি কখনো দেখিনি। সবাই তখন চোখ বন্ধ করে কলমা পড়ে আর মোটর না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর চোখ খুলে যা দেখে সেও পিলে-চমকানিয়া। আস্তে আস্তে একটা একটা করে উট সেই ফাঁকা দিয়ে যাচ্ছে, তারপর বলা নেই কওয়া নেই, একটা উট হঠাৎ আধপাক নিয়ে ফাঁকাটুকু চওড়াচওড়ি বন্ধ করে দেয়। পেছনের উটগুলো সংগে সংগে না থেমে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ঝামেলা লাগায়—স্রোতের জলে বাঁধ দিলে যে রকম জল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে উটটা রাস্তা বন্ধ করেছে তাকে তখন সোজা করে ফের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জন পাঁচেক লোক সামনে থেকে টানাটানি করে, আর জন বিশেক পেছন থেকে চেঁচামেচি হৈ হল্লা লাগায়। অবস্থাটা তখন অনেকটা ছোট গলির ভিতর আনাড়ি ড্রাইভার মোটর ঘোরাতে গিয়ে আটকা পড়ে গেলে যে রকম হয়। পার্থক্য শুধু এই টুকু যে সেখানে হাজার ফুট গভীর খাদের ভয় নেই, আর আপনি হয়ত রকে বসে বিড়ি হাতে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করছেন।

এই অবস্থায় যদি পেছন থেকে আর এক সার উট এসে উপস্থিত হয় তবে দু'টার সম্পূর্ণ খোলতাই হয়। আধ মাইল ধরে, সমস্ত রাস্তা জুড়ে তখন ঢাকা দক্ষিণের মেলার গরুর হাট বসে যায়।

বোখারা-সমরকন্দ, শিরাজ-বদখশান সেই দ'য়ে মজে গিয়ে চীৎকার করে, গালাগাল দেয়, জট খোলে, ফের পাকায়, অস্ত্র সম্বরণ করে দুদণ্ড জিরিয়ে নেয়, ঢেলে সেজে ফের গোড়া থেকে ঔড্র কায়দায় আরম্ভ করে।

'ক' রে কনক লোচন শ্রীহরি
'খ' রে খগ আসনে মুরারি
'গ' রে গরুড়—

স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করাই যদি সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হয়, তবে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমি আজও সেই রাস্তার মাঝখানে মোটরের ভেতর কনুইয়ের উপর ভর করে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছি। জটপাকানো স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু সেটা কি করে খুলল, মোটর কি করে আবার চলল, একদম মনে নেই।

(১৩)

ফ্রান্সের বেতার বাণী আরম্ভ হয় 'ইসি পারি' অর্থাৎ 'হেথায় প্যারিস' দিয়ে। কাবুলে ইয়োরোপীয় কোনো জিনিস নকল করতে গেলে ফ্রান্সকে আদর্শরূপে মেনে নেয় বলে কাবুল দুই সন্ধ্যা আপন অভিজ্ঞান-বাণী প্রচারিত করে 'ইন জা কাবুল' অর্থাৎ 'এই কাবুল' বলে।

মোটরেও বেতার বাণী হল 'ইন জা কাবুল'। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বলে বেতারযোগে প্যারিস অথবা কাবুলের যতটা দেখবার সুবিধা হয়, আমার প্রায় ততটাই হল।

হেড লাইটের জোরে যে কিছু দেখব তারও উপায় ছিল না। পূর্বেই বলেছি বাসখানার মাত্র একটি চোখ—সাঁঝের পিদিম দেখাতে গিয়ে সর্দারজী তার উপর আবিষ্কার করলেন যে, সে চোখটিও খাইবারের রৌদ্রদাহনে গান্ধারীর চোখের মত কাণা হয়ে গিয়েছে। সর্দারজীর নিজের জন্য অবশ্য বাসের কোনো চোখেরই প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি রাতকাণা। কিন্তু রাস্তার প'য়তাল্লিশ নম্বরীদের উপকারের জন্য প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে একটা হ্যারিকেন জোগাড় করা হল। হ্যাণ্ডিম্যান সেইটে নিয়ে একটা মাড গার্ডের উপর বসল।

আমি সভয়ে সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করলুম, 'হ্যারিকেনের সামান্য আলোতে আপনার মোটর চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

সর্দারজী বললেন, 'হচ্ছে বই কি, আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওটা না থাকলে গাড়ি জোর চালাতে পারতুম।' মনে পড়ল, দেশের মাঝিরাও অন্ধকার রাত্রে নৌকার সম্মুখে আলো রাখতে দেয় না।

কিন্তু 'ভাগ্য-বিধাতা' অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তো কবি তারই হাতে গোটা দেশটার ভার ছেড়ে দিয়ে গেয়েছেন,

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথী তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিন-রাত্রি।

কিন্তু কবির তুলনায় দার্শনিক ঢের বেশি হুঁশিয়ার হয়। তাই বোধ হয় কবির হাতে রাষ্ট্রের কি দুরবস্থা হতে পারে, তারই কল্পনা করে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে ভালো মন্দ সব কবিকেই অবিচারে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

এ সব তত্ত্ব চিন্তা না করা ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায় ছিল না। যদিও কাবুল উপত্যকার সমতল ভূমি দিয়ে তখন গাড়ি চলেছে তবু দুটো একটা মোড় সব সময়েই থাকার কথা। সে সব মোড় নেবার সময় আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করছিলুম এবং সেই খবরটি সর্দারজীকে দেওয়াতে তিনি যা বললেন তাতে আমার সব ডর ভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, 'আম্মো চোখ বন্ধ করি।' শুনে যা আমি চোখ বন্ধ করলুম তার সঙ্গে গান্ধারীর চোখ বন্ধ করার তুলনা করা যায়।

সে যাত্রা যে কাবুলে পেঁাছতে পেরেছিলুম তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, রগরগে উপন্যাসের গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না—ভ্রমণ-কাহিনী লেখকের জীবনেও সেই সূত্র প্রযোজ্য।

'গুমরুক' বা কাস্টম হাউস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—বিছানাখানা পর্যন্ত ছাড়ল না। টাঙ্গা নিয়ে ফরাসী রাজদূতাবাসের দিকে রওয়ানা হলুম—কাবুল শহরে আমার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি সেখানেই থাকতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আমার ফার্সীর অধ্যাপক ছিলেন ও তখন ফরাসী রাজদূতাবাসে কর্ম করতেন।

টাঙ্গা তিন মিনিট চলার পরেই বুঝতে পারলুম মস্কো রেডিয়ো কোন্ ভরসায় তাবৎ দুনিয়ার প্রলেতারিয়াকে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ফতোয়া জারী করে। দেখলুম কাবুল শহরে আমার প্রথম পরিচয়ের প্রলেতারিয়ার প্রতীক টাঙ্গাওয়ালা আর কলকাতার গাড়িওয়ালায় কোনো তফাৎ নেই। আমাকে উজবুক পেয়ে সে তার কর্তব্য শেয়ালদার কাপ্তেনদের মত তখনি স্থির করে নিয়েছে।

বেতারওয়ালা তাকে পই পই করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়, সেও বার বার 'চশম', 'বসর ও চশম' অর্থাৎ 'আমার মাথার দিব্যি, আপনার তালিম এবং হুকুম আমার চোখের জ্যোতির ন্যায় মূল্যবান ইত্যাদি শপথ-কসম খেয়েছিল, কিন্তু কাজের বেলায় দু মিনিট যেতে না যেতেই সে গাড়ি দাঁড় করায়, বেছে বেছে কাবুল শহরের সবচেয়ে আকাট মূর্খকে জিজ্ঞাসা করে ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়।

অনেকে অনেক উপদেশ দিলেন, এক গুণী শেষটায় বললেন,—

'ফরাসী রাজ দূতাবাস? সে তো প্যারিসে যেতে হলে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'বোম্বাই গিয়ে জাহাজ ধরতে হয়। চল হে টাঙ্গাওয়ালা, পেশাওয়ার অথবা কান্দাহার—যেটা কাছে পড়ে। সেখান থেকে বোম্বাই।'

টাঙ্গাওয়ালা ঘড়েল। বুঝল,

'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা,
আমি ঢাকার বাঙাল নহি গো।'

তখন সে লব-ই-দরিয়া, দেহ-আফগানান, শহর—আরা হয়ে ফরাসী রাজদূতাবাস পেঁাছল। কাবুল শহর ছোট—কম করে তিনবার সে আমাকে ঐ রাস্তা দিয়ে আগেই নিয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে পাহাড়—এর চেয়ে প্যাচালো কেপ অব গুড হোপ চেষ্টা করলেও হয় না।

আমি কিছু বললে এতক্ষণ ধরে সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে আমার কাঁচা ফার্সী সে বুঝতে পারে না। এবার আমার পালা। ভাড়া দেবার সময় সে যতই নানা রকম যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করে আমি ততই বোকার মত তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই আর একঘেঁয়ে আলোচনায় নূতনত্ব আনবার জন্য তার খোলা হাত থেকে আমারই দেওয়া দু'চার আনা কমিয়ে নি। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাঙা ফার্সীকে একদম ক্ষুদ বানিয়ে দিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলি, বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি ইমানদার লোক, বিদেশী বলে না জেনে বেশি দিয়ে ফেলেছি, অত বেশি নিতে চাও না। মা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ করুন, তোমার বেটা-বেটির—'

পয়সা সরালেই সে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে, আয়া বসুলের দোহাই কাড়ে, আর ইমান-ইনসাফ সম্বন্ধে সাদী, রুমীর বয়েৎ আওড়ায়। এমন সময় প্রফেসর বগদানফ এসে সব কিছু রফারফি করে দিলেন।

যাবার সময় সে আমাকে আর এক দফা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিয়ে, অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় শুধাল, 'আপনার দেশ কোথায়?'

বুঝলুম, গয়ার পাণ্ডার মত। ভবিষ্যৎ সতর্কতার জন্য।

কে বলে বাঙালী হীন? আমরা হেলায় লঙ্কা করিনি জয়?

* * * *

রাতের বেলাই বগদানফ সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধা। সমস্ত রাত ধরে পড়াশোনা করেন, আর দিনের বেলা যতটা পারেন ঘুমিয়ে নেন। সেই কারণেই বোধ হয়, তিনি ভারতবর্ষের সব পাখীর মধ্যে পেঁচাকে পছন্দ করতেন বেশী। শান্তিনিকেতনে তিনি যে ঘরটায় ক্লাশ নিতেন, নন্দবাবু তারি দেয়ালে একটা পেঁচা এঁকে দিয়েছিলেন। বগদানফ সায়েব তাতে ভারী খুশী হয়ে নন্দবাবুর মেলা তারিফ করেছিলেন।

বগদানফ জাতে রুশ, মস্কোর বাসিন্দা ও কট্টর জারপন্থী। ১৯১৭-এর বিপ্লবের সময় মস্কো থেকে পালিয়ে আজারবাইজান হয়ে তেহরান পেঁাছান। সেখান থেকে ইরাকের বসরা হয়ে বোম্বাই এসে বাসা বাঁধেন। ভালো পেহলেভী বা পহ্লবী জানতেন বলে বোম্বায়ের জরথুস্ত্রী কামা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে দিয়ে সেখানে অনেক পুঁথিপত্রের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে রুশ পণ্ডিতদের দুরবস্থায় সাহায্য করবার জন্য এক আন্তর্জাতিক আহ্বানে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সাড়া দেন এবং বোম্বায়ে বগদানফের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বেই ফার্সীর অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন।

১৯১৭-এর পূর্বে বগদানফ রুশের পররাষ্ট্র বিভাগে কাজ করতেন ও সেই উপলক্ষ্যে তেহরানে আট বৎসর কাটিয়ে অতি

উৎকৃষ্ট ফারসী শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তীকালে ইরান যান, তখন সেখানে ফার্সীর জন্য অধ্যাপক অনুসন্ধান করলে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ফার্সী পড়াবার জন্য বগদানফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব। কাবুলের অন্য জহুরিদের মুখেও আমি শুনেছি যে, 'আধুনিক ফার্সী সাহিত্যে বগদানফের লিখন-শৈলী আপন বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বিদগ্ধ জনের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে।

ইয়োরোপীয় বহু ভাষা তো জানতেনই— তাছাড়া জগতাই, উসমানলী প্রভৃতি কতকগুলো অজানা অচেনা তুর্কী ভাষা উপ-ভাষায় 'জবরদস্ত মৌলবী'ও ছিলেন। কাবুলের মত জগাখিচুড়ি শহরের দেশী-বিদেশী সকলের সঙ্গেই তিনি তাঁদের মাতৃভাষায় দিব্য স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন।

একদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে কুসংস্কারে ভর্তি। বাঁদিকে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের চাঁদ দেখতে পেয়েছেন না তো গোখরার ফণায় যেন পা দিয়েছেন। সেই 'দুর্ঘটনার' তিন মাস পরেও যদি তার পেয়ারা নেবাল বমি করে, তবে ঐ বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে অপয়া চাঁদ দেখাই তার জন্য দায়ী। মইয়ের তলা দিয়ে গিয়েছ, হাত থেকে পড়ে আর্শী ভেঙে গিয়েছে, চাবির গুচ্ছ ভুলে মেজের উপর রেখেছিলে— আর যাবে কোথায়, সে রাত্রে বগদানফ সায়েব তোমার জন্য এক ঘণ্টা ধরে আইকনের সামনে বিড়বিড় করে নানা মন্ত্র পড়বেন, গ্রীক অর্থডক্স চার্চের আবং সেণ্টদের কাছে কান্নাকাটি করে ধন্না দেবেন, পরদিন ভোর বেলা আপনার চোখে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে তিন বৎসর ধরে অপেক্ষা করবেন আপনার কাছ থেকে কোন দুঃসংবাদ পাবার জন্য। তিন বছর দীর্ঘ মেয়াদ, কিছু না কিছু একটা ঘটবেই। তখন বাড়ি বয়ে এসে বগদানফ সায়েব আপনার সামনে মাথা নীচু করে জানুতে হাত রেখে বসবেন, মুখে ঐ এক কথা, 'বলিনি, তখনি বলিনি?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'বড় বড় সাধক মহাপুরুষ যেন এক একটা কাঠের গুঁড়ি হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। শত শত কাক তারি উপরে বসে বিনা মেহন্নতে ভবনদী পার হয়ে যায়।'

বগদানফের পাল্লায় পড়লে তিন দিনে দুনিয়ার কুল্লে কুসংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে, এক মাসের ভেতর সেগুলো মানতে আরম্ভ করবেন, দু মাসের ভেতর দেখতে পাবেন, বগদানফ-কাঠের গুঁড়িতে আপনি একা নন। আপনার এবং সায়েবের পরিচিত প্রায় সবাই তার উপরে বসে ঝিমুচ্ছেন। ঘোর বেলেল্লা দু-একটা নাস্তিকের কথা অবিশ্যি আলাদা। তারা প্রেম দিলেও কলসীর কানা মারে।

দয়ালু, বন্ধুবৎসল ও সদানন্দ পুরুষ। তাঁর মুক্ত হস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলেছিলেন, 'ইল আশেৎ দে মাশিন পুর ফের লে ক্রু দাঁ লে মাকারনি।' অর্থাৎ 'মাকারনি ফুটো করার জন্য তিনি মেশিন কেনেন। সোজা বাঙলায় কাকের ছানা কেনেন।

কাবুলের বিদেশী দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল ছিলেন বগদানফ সায়েব—একটি আস্ত প্রতিষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তার সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল। (ক্রমশ)
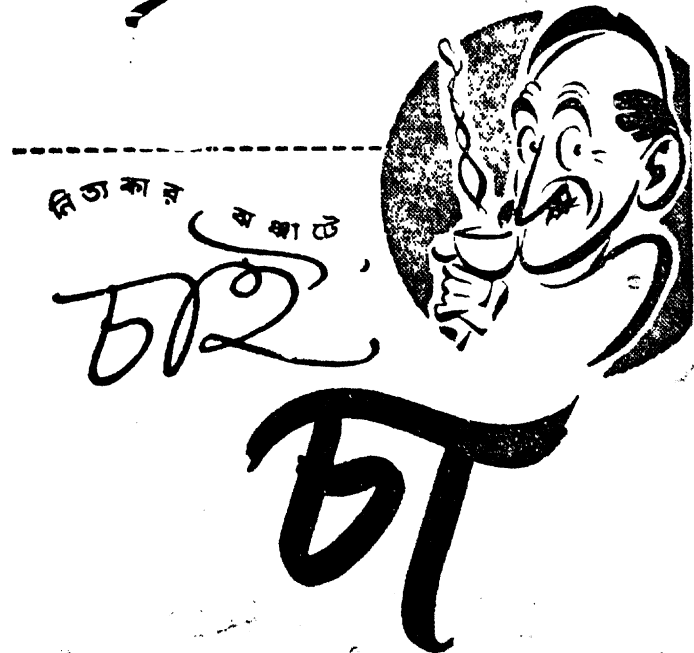
# মিছিল .....

## শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

চেয়ারের ভাঙা হাতল আর টিনের টুকরো-গুলো রমাপতিবাবু নিজের হাতে সরিয়ে রাখলেন সিঁড়ির নীচে। অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এ দিকটা। টানা দুটি ঘর, একটু আড়াল দিয়ে নিলে সিঁড়ির এ পাশটায় অনায়াসেই রান্নাবান্না চলতে পারে। আজকাল এই বা পাচ্ছে কে শহরে। গোয়ালঘরে পর্যন্ত লোক গিয়ে উঠছে। বেতের আধভাঙা মোড়াটা হাত দিয়ে উঠতে গিয়েই চোখাচোখি হয়ে গেলো সিঁড়িতে দাঁড়ানো সৌদামিনীর সঙ্গে।

কিগো, আশী টাকার আনন্দে নিজেই যে ঘর ঝাড়পোঁছ শুরু করে দিয়েছো?

উত্তরে রমাপতিবাবু হাত দুটো কোমরে রেখে টান হ'য়ে দাঁড়ালেন। দেখো দিকিনি কেমন বন্দোবস্ত হ'লো: লম্বালম্বি দু'খানা ঘর আর সিঁড়ির এপাশে রান্নাবান্না করতে কোন হাঙ্গামাই নেই। দুজন তো মোটে লোক, অনায়াসেই চলে যাবে কি বলো?

সৌদামিনী আরো দু-এক ধাপ নেমে আসলো সিঁড়ি বেয়েঃ কেবল স্বামী-স্ত্রী বুঝি? আসছে কোথা থেকে?

রমাপতি মাথা নাড়লেন? কি জানি অত খবর রাখি না। স্বামী-স্ত্রী, কি ভাইবোন, কি মা আর ছেলে ওসব জিজ্ঞাসা করি নি। অফিসে অনুকূল ধ'রে পড়লো। বড্ড বিপদে পড়েছে ঘরের অভাবে। ওর খুব জানাশোনা। যে রকম ক'রেই হোক বন্দোবস্ত একটা ক'রে দিতে হবে। আমিও ভাবলাম পড়েই তো রয়েছে ঘর দু'খানা আর ভাড়াও দেবে মন্দ নয়, কাজেই—

রমাপতিবাবুর কথা শেষ হবার আগেই, গালে হাত দিয়ে সৌদামিনী সিঁড়ির ওপরেই ব'সে পড়লো। গলা সপ্তমের কাছাকাছিঃ অন্য লোক যা হোক। জানা নেই, শোনা নেই, অমনি হুট ক'রে বাড়িতে ভাড়াটে বসালেই হ'লো। কি ধরণের লোক হবে তার ঠিক নেই। মাতাল, জুয়াড়ী না ছিঁচকে চোর। হৈ-হল্লায় পাড়া মাত ক'রবে। বেটাছেলের পাল এসে যদি ঢোকে, তোমার ঘরে সোমত্ত মেয়ে রয়েছে, সে খেয়াল আছে?

কেশবিরল মাথাটা রমাপতিবাবু চুলকে নিলেন একবার। হাসবার একটু চেষ্টা করলেন, তারপর বললেনঃ আরে না, না, সে রকম ভাড়াটের কথা অনুকূলই বা বলতে যাবে কেন? দু'টি মোটে লোক, মেয়েছেলে নিশ্চয় আছে সঙ্গে। আর সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিলে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটাই বা কি। উমার নীচে নামবার কোন দরকারই নেই।

ঃ কি জানি বাপু, আমি তো ভালো বুঝছি না ঃ সৌদামিনীর মুখে একটা হতাশার ভাব ঃ সে রকম ভাড়াটে যদি হয় তো একবার ঘরে ঢুকলে বের করবার তো আর রাস্তা নেই। পোড়া দেশের যা আইন। বাড়ি ভাড়া দিয়ে চোর হয়ে থাকতে হবে নিজেদের।

আরো কি বলতে গিয়ে আচমকা থেমে গেলো সৌদামিনী। সিঁড়ির চাতালে পিস-শাশুড়ী এসে দাঁড়িয়েছেন। দু-তিন ছেলের মা হলেও গুরুজন সম্পর্কিত লোকের সামনে উঁচুগলায় কথা বলার রেওয়াজ নেই এ বাড়িতে। ঘোমটা টেনে সৌদামিনী পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেলো।

পরের দিন ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ হতেই বাড়িশুদ্ধ বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে পড়লো।

কিন্তু এই নাকি মালপত্তর? গাড়ির ছাদে কয়েকটা টিনের তোরঙ্গ আর কাপড়ের পোঁটলা। বেতের ছোট-বড় ধামী, একটা ভাঙা আলনা, বাস—গোটা সংসারের জিনিস! কি রকম গৃহস্থ কে জানে!

গাড়ির দরজা খুলে প্রথমে নামলো বছর দশ এগারোর একটি ছেলে। পিছনে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। চোখে চশমা, রোগা, একহারা চেহারা। রাস্তায় নেমেই দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো রমাপতিবাবুকে। হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিয়ে ঘর খুলতে শুরু করলো।

অনেকক্ষণ ধরে উঁকিঝুঁকি দিলো সৌদামিনী তারপর পিস-শাশুড়ীর দিকে ফিরে বললোঃ হ্যাঁ পিসিমা, এত বড় ধাড়ি মেয়ে, কই সিঁথেয় সিঁদুর-টিঁদুর দেখলুম না তো। সঙ্গে আর বেটাছেলেই বা কোথায়। এরাই দুজন থাকবে নাকি শুধু!

উত্তরে চোখ দুটো তিনি একেবারে কপালের মাঝামাঝি তুলে আনলেনঃ হুঁ, রমাপতির যেমন কাণ্ড। জানা নেই, শোনা নেই, উটকো ধিঙ্গি মেয়ে এনে বাড়িতে তোলা। আজকালকার মেয়েদের আবার সিঁথেয় সিঁদুর, বিশেষতঃ এই সব মেয়েদের। যা ইচ্ছে করো বাছা। তোমাদের বাড়ি তোমরা ভাড়াটে বসাবে, আমার বলবার কি আছে। তবে খারাপ জিনিসটা চিরকাল দুচোখের বিষ, সইতে পারি না কিছুতে, তাই আমার বলা—গজ গজ করতে করতে পিসীমা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কিন্তু রমাপতিবাবু ওপরে উঠতেই সৌদামিনী মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালোঃ বলি, বুড়ো বয়সে তোমার কি ভীমরতি হয়েছে? সঙ্গে গিন্নীবান্নী গোছের কেউ নেই, ওই ধাড়ী মেয়ে আর পুঁচকে ছেলে একটা, ওদের সংসার চালাবেই বা কে আর ভাড়ার টাকাই বা জোটাবে কোথা থেকে?

রমাপতিবাবু মুচকে একটু হাসলেন। সৌদামিনীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বললেনঃ বাড়িতে এসে যখন উঠেছে, তখন চেষ্টাচরিত্র করে আমাকেই চালাতে হবে আর কি। ফেলে তো আর দিতে পারবো না।

শুকনো বারুদে যেন আগুনের ফুলকি পড়লো। সৌদামিনী খিঁচিয়ে উঠলো এবারেঃ কি ন্যাকামী করো ভালো লাগে না। বয়স যত হচ্ছে, ততই যেন ঢং বাড়ছে তোমার। অত বড় মেয়ে সিঁথেয় সিঁদুর নেই, সঙ্গে পুরুষ-মানুষ কেউ নেই। ব্যাপার আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।

দড়িতে টাঙানো গামছাটা রমাপতিবাবু হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেনঃ কি আশ্চর্য, বিয়ের আগেই সিঁথেয় সিঁদুর দেবে নাকি? ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ভাড়া ঠিক দিয়ে যাবে। ছ'মাসের ভাড়া তো আগামই দিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি মেয়ে স্কুলের টীচার, ভালো মাইনে পায়। ছেলেটি ওর ভাই। আর সংসারে কেউ নেই। নাও পথ ছাড়ো। অফিসের এমনিই বেলা হয়ে গেছে।

রমাপতিবাবু চলে যেতে বারান্দার দিকে আবার চোখ ফিরিয়েই সৌদামিনী চেঁচিয়ে উঠলোঃ হ্যালা উমি, ওখানে কি করছিস?

বিশেষ কিছুই করেনি উমা। সিঁড়ির চাতালে বসে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে নতুন ভাড়াটেদের দেখছিলো। এরই মধ্যে মেয়েটি আলনাটা কোণের দিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ভাই-বোনে ধরাধরি করে তোরঙ্গগুলো সাজিয়েছে এ দিকের দেয়াল ঘেঁষে। ভারি একটা বালতিতে জল ভরে মেয়েটি রোয়াকের ওপর টেনে তুলছে।

মার গলার আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে পড়লো উমাঃ কিছু করিনি মা, নতুন ভাড়াটেদের দেখছি।

ঃ কি দেখছো, ওরা জন্তু না জানোয়ার?

দেখবার কি আছে? গলার ঝাঁজটা এখনও বেশ উগ্র।

কোন উত্তর দিলো না উমা। উত্তর একটা অবশ্য ওর ঠোঁটের ডগায় এসেছিলো। জন্তু জানোয়ারই যদি নয় তো সকাল থেকে বাড়ি-শুদ্ধ লোক বারান্দায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কি দেখছিলে এত? এতো কথা কাটাকাটি আর তর্কাতর্কিই বা কিসের? মানুষের বাড়ি মানুষ এসেছে, এতে হৈ চৈ করার কি থাকতে পারে।

কিন্তু চৌদ্দ বছরের উমা সংসারের হালচাল বেশ কিছুটা জেনেছে বৈ কি। এ বাড়িতে এ ধরণের বেফাঁস কথা বলবার ফল কি হবে তাও জানে। তাই আস্তে আস্তে সোদামিনীর কাছে গিয়ে বললোঃ একটা কথা বলবো, মা!

কি?

ঃ আমাদের রামলোচনকে একবার নীচে পাঠিয়ে দিলে হয় না, ঘরদোরগুলো পরিষ্কার করে দিতো একটু। দেখো না ছোট ছেলেটা জল দিয়ে দিয়ে মুছছে জানলাগুলো।

সোদামিনী জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মেয়ের ওপরে। উমার হাতটা ধরে সজোরে তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসলোঃ হ্যাঁ, পাঠাচ্ছি এইবার। ঠাকুর, চাকর, ঝি সব পাঠিয়ে দেবো নীচে। যেমনি বাপ তার তেমনি মেয়ে। লোকের দুঃখে একবারে বুক ভেসে যাচ্ছে।

সেদিন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে সোদামিনী তরকারী কুটছিলো, কাছে বসেছিলো উমা। কাজে-কর্মে সাহায্য করছিলো মাকে। হঠাৎ সিঁড়িতে আওয়াজ হতেই মুখ তুললো দুজনে।

নীচের ভাড়াটে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির চাতালে। আলু থালু বেশ, কেমন একটা শুকনো ভাব।

ঃ দয়া করে থার্মোমিটারটা দেবেন একবার!

ঃ কার অসুখঃ কথাটা জিজ্ঞেস না করে পারলো না উমাঃ আপনার ভাইয়ের বুঝি?

হ্যাঁ, কাল থেকে খুব জ্বর। গায়ের যন্ত্রণায় ছটফট করেছে সারাটা রাত। সময়টাও বড় খারাপ, চারদিকে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। খুব বিব্রত মনে হলো মেয়েটিকে।

বঁটিটা কাত করে একপাশে সরিয়ে রাখলো সোদামিনী। মনে মনে বোধ হয় হিসাব করে নিলো একটু, দেওয়া চলতে পারে কিনা থার্মোমিটারটা। তারপর কি ভেবে উঠে দাঁড়িয়ে বললোঃ দাঁড়াও বাছা একটু, ছিলো তো থার্মোমিটার একটা, আছে কিনা দেখি।

সোদামিনী চলে যেতেই আরো এগিয়ে এলো মেয়েটি। একেবারে উমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

ঃ তুমি কোন্ স্কুলে পড়ো?

উমা মুস্কিলে পড়ে গেলো। যেখানে বাঘের ভয়, সন্ধ্যাও ঠিক সেখানেই ঘনিয়ে আসে। ওর স্কুলে যাওয়া নিয়ে বাড়িতে ছোট-খাটো একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরার সংগে সংগেই ও পাট বন্ধ হয়ে গেছে। ওর বাপের যাও বা একটু ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছিলো ঠাকুমা আর কিছুটা পরিমাণে মাও। ওসব খেস্টানী কান্ড চলবে না এ বাড়িতে। ধাড়ী মেয়ে নাচতে নাচতে ইস্কুলে যাবে কি! বিদ্যের জাহাজ হবে! যত সব অনাছিষ্টি ব্যাপার। তার চেয়ে এই বোশেখের মধ্যে যাতে মেয়ের একটা গতি করতে পারে সেই চেষ্টা করুক রমাপতি। মেয়ে কি বাপকে খাওয়াবে নাকি রোজগার করে!

এ নিয়ে আর বেশি কথা কাটাকাটি করেননি রমাপতিবাবু। করতে গেলেও সুবিধা হতো না বিশেষ। বৌ আর পিসীর কথার তোড়ে কোথায় ছিটকে যেতেন ঠিক আছে। কাজেই লেখাপড়ার পাট বন্ধ করে উমা ঘরেই বসে রইলো বোশেখের অপেক্ষায়। সেও আজ বছর দুয়েকের কথা।

উত্তর দিতে একটু দেরী করলো উমা। চট করে কিই বা উত্তর দেবে!

ঃ আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছি। বড়ো হয়েছি কি না!

খিল খিল করে মেয়েটি হেসে উঠলোঃ ইস্কুলের চেয়েও বড়ো হয়ে গেছো বুঝি? খুব বুড়ী হয়ে গেছো, না?

মাথাটা উমা আরও নীচু করে রইলো। আনাজের থালায় আলতো বুলাতে লাগলো হাতটা।

মেয়েটি আরও সরে এসে দাঁড়ালোঃ তোমার পড়তে খুব ইচ্ছা করে?

উমা সজোরে ঘাড় নাড়লো। হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করে। বই ছাড়া আর কিছু ভালোই লাগে না ওর। কিন্তু কেই বা এনে দেবে বই।

এ সব কথা বলা ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে উমার। মাস্টারনীর কাছে বলা যায় নাকি আসল কথা! বই খুললেই মাথার দুটো পাশ কেমন টনটন করতে থাকে অর জ্বর জ্বর লাগে সমস্ত শরীর। ইস্কুল ছাড়ার পর কয়েকদিন খুবেই কষ্ট হয়েছিলো ওর, এমন কি বালিশে মুখ গুজড়ে কেঁদেও ছিলো অনেকদিন ধরে,—সে অবশ্য লেখাপড়া ছাড়ার দুঃখে নয়, ইস্কুলের বন্ধু-বান্ধবদের জন্য। আশা, সুনীতি, প্রীতি, লীলাদি এদের জন্য। দোলায় চড়া, গুটি খেলা আর বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া আমের আচার সকলের সংগে ভাগ করে খাওয়া—এ সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুঃখ রাখার ঠাঁই ছিলো না উমার।

ঃ বেশ তো, আমার কাছে অনেক বই আছে। যখন তোমার ইচ্ছা হবে, আমার কাছ থেকে নিয়ে এসো কেমন?

মুখ তুলে ঘাড় নাড়তে গিয়েই উমা থেমে গেলো। সিঁড়ির মুখে ভিজে কাপড়ে ঠাকু[illegible] এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্য দিনের চেয়ে [illegible] একটু আগেই ফিরেছেন গঙ্গার ঘাট থেকে।

ঃ সরো বাছা একটু, ছুঁয়ে টুঁয়ে ফেলবে[illegible] যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও ডিঙ্গি মেরে এ[illegible] পাশ ঘেঁষে তিনি ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলে[illegible] তাঁর চলার গতি দেখে আর ঝনাৎ করে ঠা[illegible] ঘরের শিকল খোলার শব্দে বুকটা কেঁ[illegible] উঠলো উমার। খুবই রেগে গেছেন। বাড়ি[illegible] তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হবে একটু পরেই।

হলোও তাই। মেয়েটি থার্মোমিটার নি[illegible] নেমে যেতেই জপের মালা হাতে ঠাকুমা বেরি[illegible] এলেন।

ঃ উমি, উমি।

সোদামিনীর দিকে উমা একটু ঘেঁ[illegible] বসলোঃ কি ঠাকুমা?

ঃ ও মেয়েটা ওপরে এসেছিলো কেন?

ঃ থার্মোমিটার নিতে এসেছিলো। ভাইয়ে[illegible] অসুখ কি না।

ঃ ভাইয়ের অসুখ, তাই বুঝি দাঁড়ি[illegible] দাঁড়িয়ে হাসি-মস্কারা চলছিলো।

ঃ হাসি-মস্কারা আর কইঃ খুব ক্ষী[illegible] গলার আওয়াজ উমারঃ অনেক বই আছে ও[illegible] কাছে, তাই যেতে বললেন একদিন।

গালে হাত দিয়ে ঠাকুমা চৌকাঠের ওপরই বসে পড়লেনঃ ঠিক যা ভেবেছি। এমনি করেই তো মাথা খায় ওরা। ফুসলে ফাসলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নাটক নভেল পড়াবে, দলে টানার চেষ্টা করবে বৈ কি। যা ইচ্ছে করো, আজ-কালকার মেয়ে তোমরা, বুড়ো-হাবড়াদের কথা কি আর কানে যাবে তোমাদের। পই পই করে বারণ করেছি রমাপতিকে মেয়েকে ধিংগী করে রাখিসনি। যোগাড়যন্তর করে বিয়ে থা একটা দে। আমার যেমন মরণ। কে বা কানে তুলছে আমার কথা।

কিছুদিন পরে সুযোগ জুটে গেলো। দূর সম্পর্কীয়া এক আত্মীয়ার বিয়েতে দিন-কয়েকের জন্য ঠাকুমা বাইরে গেলেন। কি একটা ছুটির দিন। রমাপতিবাবু ভোর বেলা ছিপ হাতে বেরিয়েছেন বন্ধুদের সংগে। মাছের সংগে খোঁজ নেই, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসীম উৎসাহে সবাই বসে থাকে বিলের পাড়ে। উৎকট নেশা। সোদামিনী কাজ-কর্মের শেষে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে কোণের ঘরটায়। নইলে শরীর থাকবে কেন!

সিঁড়ি দিয়ে উমা আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলো। নিঃঝুম দুপুরে। পাখপাখালির সাড়াশব্দ নেই। পা টিপে টিপে জানলার ধারে এসে ডাকলোঃ প্রমীলাদি।

ঃ কে? জানলার কাছেই কি একটা বই হাতে নিয়ে বসেছিলো প্রমীলা। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিয়েই অবাক হয়ে গেলোঃ আরে কি ব্যাপার, উমা যে? পথ ভুলে নাকি?

এ কথা প্রমীলা বলতে পারে বৈ কি। আজ পাঁচ ছ মাসের ওপর ওরা এসেছে কিন্তু এ পর্যন্ত উমা একদিনের জন্যও আসেনি ওদের বাড়িতে। মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ অবশ্য হয়েছে। সিঁড়ির কোণে কিংবা বারান্দার চাতালে দাঁড়ান উমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসেছে প্রমীলা। উত্তরে এদিক ওদিক চেয়ে উমাও আলতো একটু হেসেছে।

ঃ বাড়িতে কেউ নেই বুঝিঃ কথাটা বলেই প্রমীলা হেসে ফেললো।

ঃ মা ঘুমোচ্ছে। ঠাকুমা বাইরে গেছেন।

প্রমীলার পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকলো উমা। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে দুটি ঘর। দেয়ালে টাঙানো গান্ধীজীর ছবিতে শুকনো মালা দুলছে। কাঠের তাকে বইয়ের সারি। আলনায় শাড়ী আর জামা পরিপাটি করে সাজানো। বিছানাটা গোটানো। পাশে একটা মাদুর পাতা। তার ওপরেই বসে প্রমীলা পড়ছিলো। ঘুরে ঘুরে উমা দেখতে লাগলো।

ঃ আপনার ভাই বাড়িতে নেই?

ঃ না, বাবলুর স্কুলে ম্যাচ আছে। দেখো না নির্ঘাৎ আজ আবার পা মুচকে ফিরবে।

প্রায়ই পা ভেঙে ফেরে বুঝি।

ঃ প্রায়ই। খেলবার সময় তো আর জ্ঞান থাকে না ওর। পা ভাঙুক আর না ভাঙুক, গোল একটা দিতে পারলেই ও খুব খুশি।

দুজনে মাদুরের ওপর বসলো।

একথা ওকথা অনেক কথা হলো ফিস ফিস করে। তারপর এক সময়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে উমা বললোঃ গান্ধীজীর ছবিতে আপনি রোজ মালা দেন বুঝি?

ঃ না ভাই, রোজ আর হয়ে ওঠে না। প্রতি শনিবারে দিই। তুমি ওঁকে দেখেছো কোনদিন?

না দেখেনি। উমা ঘাড় নাড়লো। ওদের বাড়ির কাছের ময়দানে একবার উনি এসেছিলেন কিন্তু অত ভীড়ে ওকে যেতে দেয়নি।

ঃ আপনি দেখেছেন ওঁকেঃ উমা পাল্টা প্রশ্ন করলো।

ঃ হ্যাঁ, জেল থেকে বেরিয়ে একবার ওঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম।

ঃ জেলে ছিলেন আপনি? খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো উমা।

প্রমীলা সজোরে হেসে উঠলোঃ তোমার বাড়িতে বলো না যেন এ কথা, তা হলে একেবারেই তোমাকে আসতে দেবেন না আমাদের ঘরেঃ হঠাৎ গলার আওয়াজ গাঢ় হয়ে আসলো প্রমীলারঃ না গিয়ে কিন্তু থাকতে পারিনি উমা। ওদের অত্যাচারের মাত্রা কুল ছাপিয়ে উঠেছিলো। নির্যাতনের যেন শেষ ছিলো না। দেশ আমাদের আর ওদের আইন, বিরোধ তো বাধবেই।

ঃ কারা করতো অত্যাচার? পুলিশের লোক বুঝি?

ঃ পুলিশের লোক তো নিমিত্ত মাত্র। কলকাঠি চালাতেন ইংরেজ প্রভুরা।

চোখ দুটো বড় বড় করে উমা চেয়ে রইলো। নতুন দেশের আজব কথা যেন শুনছে। প্রমীলাকে সত্যিই ওর খুব ভালো লাগলো। স্কুলের লীলাদি আর সুপ্রীতিদিদের সঙ্গে এঁর কোথাও যেন মিল নেই। চোখ দুটো সর্বদাই উদাস। মনে হয় যেন অনেক দূরের কিছু একটা দেখছেন।

হঠাৎ মার গলার আওয়াজে চমকে ওঠে পড়লো উমা। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলো বাসনের স্তূপ নিয়ে ঠিকে ঝি চৌবাচ্চার কাছে মাজতে বসে গেছে। বেলা পড়ে গেছে। এইবার উঠতে হবে।

ঃ আজ উঠি প্রমীলাদি, আর একদিন আসবো।

ঃ এসো উমা। উমার পিছন পিছন রোয়াক পর্যন্ত প্রমীলা এগিয়ে আসলো। চৌকাঠ পার হয়েই আসল কথাটা উমার মনে পড়ে গেলো।

ঃ আমায় একটা বই দেবেন প্রমীলাদি। সারা দুপুর বেলা এমন বিশ্রী লাগে।

ঃ কি রকম বই তোমার পছন্দ বলো তো?

একটু আমতা আমতা করলো উমা। ঠিক কি ধরণের বই পড়াটা প্রমীলাদি পছন্দ করবেন, সে কথাটাও উমার মনে উঁকি ঝুঁকি দিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললোঃ মোহনের বই আছে আপনার কাছে প্রমীলাদি?

দিনকয়েক আগে মোহনের একটা বই উমার হাতে পড়েছিলো। ওর মা কোথা থেকে জোগাড় করেছিলো বইটা। তাঁর বালিশের তলা থেকে বের করেছিলো উমা। কিন্তু সবটা পড়তে পারেনি। কিছুক্ষণ পরেই খোঁজ পড়েছিলো বইটার। ওর মাই খোঁজ করেছিলো। কাজেই কিছুটা পড়েই আবার বালিশের তলায় বইটা রেখে দিতে হয়েছিলো। কিন্তু কয়েকটা পাতাতেই চমক লেগেছিলো উমার। কি অসীম সাহস লোকটার। যেখানে বিপদের আশঙ্কা, সেখানেই নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নিজের জন্য তিলমাত্র চিন্তা নেই। যে-কোন রকমের খুন-ডাকাতির কুলকিনারা করবার জন্য সর্বদা উন্মুখ।

ঃ মোহনের বই? দাঁড়াও দিচ্ছিঃ প্রমীলা কাঠের তাকের সামনে ঝুঁকে পড়লো, তারপর হাত দিয়ে বইগুলো সরিয়ে সরিয়ে একটা বই টেনে বের করে উমার হাতে দিলোঃ নাও, মোহনের বই, নিশ্চয় ভালো লাগবে তোমার।

আর একবার সৌদামিনীর গলার শব্দ হতেই বইটা আঁচলে ঢাকা দিয়ে উমা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসলো।

সন্ধ্যার দিকে উমার অখণ্ড অবসর। রমাপতিবাবু নিত্যকার তাসের আড্ডায় চলে গেছেন। বাচ্চাদের নিয়ে পাশের ঘরে শুয়ে আছে সৌদামিনী। এখন অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েকের জন্য নিশ্চিন্ত। বাইরের ঘরে কৌচের ওপর হেলান দিয়ে উমা বইটা খুলে বসলো। কয়েক পাতা পড়েই কিন্তু কেমন মনে হলো। এ আবার কোন্ মোহন! খুন-ডাকাতির কোন ব্যাপারই নেই: গুজরাটের পোরবন্দরে এক মোহন জন্মেছিলো তারই কথা। পড়তে কিন্তু মন্দ লাগলো না। মলাট উল্টে দেখলো আর একবার। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আত্ম-জীবনী। একটানা অনেকখানি পড়ে গেলো। আগের মোহনের সঙ্গে বেশ কিন্তু মিল আছে এই মোহনের। নিজের জন্য তিলমাত্র ভাবনা নেই। যেখানে বিপদের সামান্য আশঙ্কা সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। খুন-ডাকাতির কথা নেই বটে, কিন্তু আফ্রিকার কাণ্ডকারখানা সে সবের চেয়ে কমই বা কিসে?

একটা কথা শুধু কিছুতেই উমা বুঝতে পারলো না। কালো লোকদের এমন চোখে কেন দেখে সাদা লোকেরা? মেলামেশা করবে না, বসবে না একসঙ্গে, এক গাড়িতেও যাবে না, পাশাপাশি বসে খাওয়ার কথা তো ওঠেই না। এত তফাৎ মানুষে মানুষে! এ কথার পাশা-পাশি আর একটা কথা ভেসে এলো উমার মনে। প্রমীলাদির সঙ্গে মেলামেশা ঠাকুমা কেন অপছন্দ করেন! ঠাকুরমার চালচলন, বাছ-বিচারের সঙ্গে মেলে না বলে এড়িয়ে যেতে হবে প্রমীলাদিদের? শুধু সাদা লোকদের দোষ দেখলেই তো হবে না, আমাদের নিজেদের মধ্যেই তো হাজার পাঁচিল আর হাজার আড়াল। এ সব তো আমাদেরই তৈরি।

কড়া নাড়ার শব্দে উমা বই মুড়ে বসলো। অনেক রাত হয়ে গেছে। সাড়ে দশটার আগে রমাপতিবাবু কোনদিনই বাড়ি ফেরেন না।

সেদিন দুপুর বেলা নীচে নেমেই উমা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দরজা ভেজানো। ভিতর থেকে অনেকগুলো মেয়ের গলার আওয়াজ ভেসে আসলো। কারা সব বুঝি এসেছে প্রমীলাদিদের বাড়ি। এ সময় হুট করে ঘরে না ঢোকাই ভালো। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে আসতে গিয়েই প্রমীলার নজরে পড়ে গেলো উমা। জানলা দিয়ে প্রমীলা ডাকলোঃ আরে উমা যে, এসো, এসো, পালিয়ে যাচ্ছো যে বড়ো?

ঘরের মধ্যে ঢুকেই উমা অবাক হয়ে গেলো। ওরই বয়সী গুটি পাঁচ ছয় মেয়ে মাদুরের ওপর জেঁকে বসেছে। মাঝখানে একটুখানি জায়গা খালি। প্রমীলাই বোধ হয় বসেছিলো সেখানে।

ঃ এরা সবাই আমাদের স্কুলের মেয়ে। গল্প শুনতে এসেছে। ক্লাশে গল্প শুনে আশ মেটে না, তাই বাড়ি অবধি ধাওয়া করেছে।

কিন্তু রোজ রোজ এত গল্প আমি পাই কোথায় বলো তো?

মেয়েদের মধ্যে সোরগোল উঠলো। হৈ চৈ চেঁচামেচি। গল্প না শুনে কিছুতেই তারা উঠবে না।' না খেয়ে, না দেয়ে সবাই বসে থাকবে এখানে।

ঃ সর্বনাশ, না, না, ওসব কিছু করো না, তার চেয়ে বরং গল্প বলারই চেষ্টা করছি আমি। বসো উমা।

উমা বসে পড়লো এক কোণে। গল্প শোনার নেশা ওরও কম নয় মোটেই। গল্প শুনতে শুনতে উমা বিভোর হয়ে গেলো। মেয়েদের মধ্যেও টু শব্দটি নেই। কি চমৎকার গল্প বলতে পারেন প্রমীলাদি। কিন্তু এ সব আবার হয় নাকি? ছোকরা বয়সের কজন মিলে এক রাত্রে আগুন ছুঁয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলো, তারপর মাঝরাতে গিয়ে লুট করলো সরকারের অস্ত্রাগার। টেলিফোনের তার আর রেলের লাইন উপড়ে ফেললো। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দাঁড়িয়ে সমানে গুলী ছুঁড়ে চললো সরকারের সেপাইদের সংগে। মান আর জানের মধ্যে সেদিন মানকেই তারা বেছে নিয়েছিলো বুঝি।

সারাটা বিকাল উমা ছটফট করে বেড়ালো। সেদিনের ছোট্ট ছেলেটির কথা কেবল মনে পড়তে লাগলো। বুকে গুলী এসে বিঁধতে দাদার পাশে সে ঢলে পড়েছিলো। আস্তে আস্তে বলেছিলো: আমি চললুম দাদা। তোমরা কিন্তু লড়ো শেষ পর্যন্ত। বন্দে মাতরম। দাদার কিন্তু তখন ভাইয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখবার অবকাশ ছিল না। বন্দুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিশানা করে চলেছিলো ঝোপের আড়ালে লুকোনো সেপাইদের দিকে।

খেতে বসে উমা বলেই ফেললো কথাটা।

ঃ জানো মা, প্রমীলাদি আজ কি সুন্দর একটা গল্প বললেন।

সৌদামিনী হাতের সেলাই থেকে মুখ তুলে বললো: কিসের গল্প? রাজপুত্তুরের আর গজমোতির তো? পাহাড়-পর্বত বন-বাদাড় পেরিয়ে কুমারের ঘোড়া ছুটেছে গজমোতির খোঁজে?

না, নাঃ উমা ঘাড় নাড়লো: ওসব গল্প নয়। তা ছাড়া ঠিক গল্প তো নয়, এ সব সত্যি ঘটনা।

একটু একটু করে সবটাই উমা বললো। কিন্তু প্রমীলাদির মতন অমন সুন্দর করে ও কি বলতে পারে নাকি? তবু বলবার সময় সারা গায়ে ওর কাঁটা দিয়ে উঠলো। গলাটা বারবার শুকিয়ে আসতে লাগলো।

চৌকাঠের কাছে বসে উমার ঠাকুমাও শুনলেন সমস্ত। মুখটা বেঁকিয়ে বললেন: পরের কাছে যা শোনো তাই তোমাদের আশ্চর্য লাগে বাছা। এতো তবু বন্দুক পিস্তল পেয়েছিলো ওরা। কেন আমাদের উনি একবার কি করেছিলেন? খাস গোবিন্দপুর থেকে বাড়ি ফেরবার সময় ডাকাতদের হাতে পড়েছিলেন। জনপঞ্চাশেক ডাকাত লাঠি সড়কি নিয়ে রে-রে করে একেবারে ওঁকে ঘিরে ফেলেছিলো। কিন্তু তাদের ঐ চীৎকারই সার হয়েছিলো। মালকোঁচা বেঁধে নিয়ে হাতের লাঠিটা বন্ বন্ করে ঘুরিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের মাঝখানে। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে তুমুল লড়াই। আওয়াজ শুনে আশেপাশের গাঁ থেকে লোকেরা এসে জড়ো হয়েছিলো, কিন্তু উনি ধমকে উঠলেন: খবর্দার, কেউ এগিয়ে এসো না। এ ক'টাকে আমি একলাই শায়েস্তা করছি। যে কথা, সেই কাজ।

একটানা এতগুলো কথা বলে ঠাকুমা হাঁপাতে লাগলেন। আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন: যেমনি চেহারা ছিলো, তেমনি ছিলো সাহস। তাঁকে তোর মনে পড়ে উমি। বারকয়েক এসেছিলেন এ-বাড়িতে, কিন্তু তুই তখন আর কতটুকু!

ঠাকুরদার কথা আবছা মনে পড়লো উমার। একবার না দুবার বুঝি তিনি এসেছিলেন। শীর্ণ, লম্বাটে চেহারা। ডান হাতে তাবিজের থোক। যে ক'দিন ছিলেন, লেপের তলাতেই বেশীর ভাগ সময় কেটেছিলো। ম্যালেরিয়া পালাজ্বরে উঠে কি আর বসতে দিতো তাঁকে। কিন্তু ঠাকুমার কথাগুলো মনে হতেই উমা খিক খিক করে হেসে উঠলো। তাবিজের স্তূপ ঝোলানো হাতে ঠাকুরদা বন্ বন্ করে লাঠি ঘুরিয়ে যাচ্ছেন, আর পঞ্চাশজন জোয়ান-মদ্দ তীরবেগে পিছু হটে যাচ্ছে। ঠাকুমার যত সব আজগুবি কথা।

অনেক কষ্টে হাসি চেপে উমা উঠে পড়লো।

*

উমা ভারি মুস্কিলে পড়ে গেলো। অনেকদিন ধরে দেখাই হচ্ছে না প্রমীলার সংগে। ছুটিছাটার দিনে সুযোগ-সুবিধা করে যখনই উমা নীচে গেলো, দেখলো ঘরবোঝাই লোক। খদ্দরের টুপ-পরা ছোকরার দল। মেয়েও রয়েছে কয়েকজন। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রমীলা হাত নেড়ে নেড়ে কিসব বোঝাচ্ছিলো। সমস্ত ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকলো উমার কাছে। কিসের এত তর্ক আর বাক্‌বিতণ্ডা। এদের জ্বালায় প্রমীলাদিকে একলা পাবার যো-ই নাই। সিঁড়ির চাতালে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উমা উঠে এলো।

একদিন সকালের দিকে প্রমীলাকে একলা পাওয়া গেলো। খুব ভোরে উঠে উমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো। বাড়ির কেউ ওঠেনি। এত ভোরে উমা কোনদিন ওঠে না। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলো।

রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই আনন্দে উমা চেঁচিয়ে উঠলো: প্রমীলাদি! বেড়ানো শেষ করে ভাইয়ের সংগে বাড়িতে ঢুকছিলো প্রমীলা। উমার আচমকা ডাকে মুখ তুলে চাইলো ওপরের দিকে তারপর বললো: আজ সূর্যের সৌভাগ্য বলতে হবে। উঠেই তোমার মুখ দেখতে পাবে।

উমা তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে প্রমীলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। খুব ভারি গলায় বললো: বাবাঃ! আজকাল দেখাই মেলে না আপনার। যখনি নীচে আসি, ঘর ভর্তি লোক।

প্রমীলা উমার কাঁধে আলতো একটা হাত রেখে হেসে উঠলো খিল খিল করে: তাই আমার ওপর রাগ করেছ বুঝি? সত্যি একটা ব্যাপারে ক'দিন একটু ব্যস্ত আছি।

ঃ কোন্ ব্যাপারে?

ঃ রাজবন্দীদের ব্যাপার। তাদের জেল থেকে ছাড়াবার একটা আন্দোলন চলছে কিনা। কাল আমাদের মিছিল বেরোবে।

রাজবন্দী কথাটার মানে উমার অজানা নয়। খবরের কাগজে অনেকবার পড়েছে তাদের কথা। কিন্তু মিছিল করে বেরোলেই কি তাদের ছেড়ে দেবে নাকি পুলিশে?

ঃ ছেড়ে দেবে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের কাজ আমরা করবো। দেশকে ভালবাসার অপরাধে তাদের আটকে রাখার অধিকার কে দিয়েছে ওদের! আলো-বাতাস আড়াল করে এভাবে অন্ধকূপ-হত্যা করা কিছুতেই চলবে না। তুমি তো জানো না উমা কি কষ্ট ওদের। কত জোয়ান ছেলেকে পংগু করে দেয়, কত সুখের সংসার চুরমার করে দেয়, মানুষের শরীরে সমস্ত রক্ত নিংড়ে নিয়ে শুকনো খোলাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় আমাদের মাঝখানে।

প্রমীলার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলো। ভোরের আলোতে থমথমে দেখালো সারা মুখ আর চোখের দুটো কোণে কিসের আভা!

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো উমা। কোন কথা বলতে পারলো না। এক সময়ে কিছু না ভেবেই হঠাৎ বলে ফেললো: আমাদের কিছু একটা করা উচিত, না প্রমীলাদি?

ঃ উচিত বৈকি। আমাদেরই ভাইবোন তো তারা। বিনা অপরাধে জেলের ভিতর তারা পচবে, আর নির্বিকার হয়ে আমরা বসে থাকবো—তা কি হয়?

ঃ কিন্তু কি করতে পারি আমরা—কোথায় যেন ছোট একটু সন্দেহ উমার মনে। সত্যি কি করতে পারবে এরা! এদের কথা শুনবেই বা কেন পুলিশে!

ঃ সবই করতে পারি ভাই: প্রমীলার গলার আওয়াজ খুব জোরালো: স্পষ্ট করে ওদের বলতে পারি, হয় ছেড়ে দাও সবাইকে, নয়ত আমাদেরও ওদের পাশে নিয়ে রাখো। যাই

কিছু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে আমাদের।

কথার মাঝখানেই উমা চমকে উঠলো। অনেক বছর আগেকার এক কথার প্রতিধ্বনি যেন ইথারে ভেসে আসলো। একই কথা তো বলছেন প্রমীলাদি। সেদিনের পাহাড়তলীতে লুটিয়ে-পড়া ছেলেটিরও তো এই ছিলো ভাষা।

ঃ শোনো, ঘরের মধ্যে বসে থেকো না কিন্তু। বারান্দায় এগিয়ে এসে দাঁড়িও। কাল তোমাদের সামনের রাস্তা দিয়েই আমরা যাবো।

প্রমীলার সব কথাগুলো উমার কানে গেলো না। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো।

পরর দিন ভোর থেকেই সব কিছুর কেমন একটু ব্যস্ত ভাব। সকালেই কোন রকমে দুটি মুখে দিয়ে রমাপতিবাবু অফিসে বেরিয়ে পড়েছেন। মিছিল একবার বের হলে হয়ত ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে। তার ওপর হাংগামা-হুজুগ আরম্ভ হলে তো কথাই নেই। আগে বেরিয়ে পড়াই ভালো।

সকলেরই কেমন একটা চনমনে ভাব। দূরে কোথাও আওয়াজ হলেই ছুটে আসছে বারান্দায়। ঝুঁকে দেখছে এদিক-ওদিক। মিছিল বের হওয়ার মানে কারুর অজানা নয়। এতো আর নতুন নয়। পুলিশে আটকাবে পথ। ছেলেমেয়েরাও বেপরোয়া। তারপর গুলীর ঝাঁক চলবে।

একটা আওয়াজ কানে যেতেই উমা ছুটে বারান্দায় চলে এলো। গলির মাথায় দেখা যাচ্ছে মিছিলের সামনেটা। অনেকখানি লম্বা, আধ মাইলের কম নয়।

মিছিল আরো এগিয়ে আসলো। উমাদের বাড়ির সামনা-সামনি। প্রথমে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের সার, তারপর নিশান হাতে বড় মেয়েরা, একেবারে পিছনে পুরুষের দল! মেয়েদের মাঝখানে প্রমীলাকে দেখা গেলো। সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো উমা। ওর ইচ্ছা, প্রমীলাদি একবার চেয়ে দেখুক, ও আজ ঘরের মধ্যে নেই, এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিছনের লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠলো—'রাজবন্দীদের'; তারপর সবাই মিলে চীৎকার করে উঠলোঃ মুক্তি চাই।

দুপাশে বারান্দায় ছাদে কাতার দিয়ে দাঁড়ালো লোক। নানান রকম মন্তব্য। উমার ঠাকুমার গলাই বেশী শোনা গেলো ঃ নমস্কার বাবা ধিংগী মেয়েদের পায়ে। একটু কিছু হলেই ওরা অমনি ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান। নিজেরা যা করছিস কর, কচি কচি ছেলেমেয়েগুলোর মাথা খাওয়া কেন? উঃ, একটু লজ্জাঘেন্না নেই। ওই যে বৌমা, তোমার ভাড়াটে ধাড়ি মেয়েটিও রয়েছেন। সরম-ভরম কিছু নেই। আবার দাঁত বার করে এদিকে চেয়ে হাসছে দেখোঃ কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ সোদামিনীর পিস-শাশুড়ী থেমে গেলেন। লাফিয়ে সিঁড়ির চাতালে এসে দাঁড়ালেনঃ উমি, উমি, তুই নামছিস যে, ওই দেখো গো বৌমা, তোমার মেয়ের কাণ্ড।

সোদামিনী যখন সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন ফটক পার হয়ে উমা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াতেই প্রমীলা এগিয়ে এলো ওর দিকে, হেসে হেসে কি একটা বললো তারপর নিজের হাতের নিশানটা ওর হাতে তুলে দিলো।

উমা, উমা—সোদামিনী সব কিছু ভুলে চেঁচাতে লাগলো। কিন্তু মিছিলের বিরাট চীৎকারের তলায় চাপা পড়ে গেলো ওর গলা।

মিছিল গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলো।
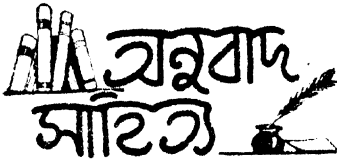
## নারী ও প্রজাপতি

এডিথ সিটওয়েল

বৃদ্ধ আমি
'ইক্‌সিয়ানে'র মতো বেঁকে পৃথিবীর ক্ষয়ে যাওয়া ভাঙা চাক দেখছি,
রাজ্যের ধুলো আর কাদায় সে চাকা জীর্ণ হয়ে গেছে।
আমি দেখতে পাচ্ছি একজন বৃদ্ধা
ধূসর পোষাক পরিহিতা হয়ে আমার পায়ের কাছে বসে,
তার বুকের ওপর রয়েছে পাষাণ ভার
তার বিশ্রামের একটুও সময় নেই।
একদিন তারও ধূসর প্রত্যুষ ছিলো এই পৃথিবীতে।

দেখতে পাচ্ছি যুবতী নারীরা প্রজাপতির পেছনে ছুটছে
গ্রীষ্মের শুকনো রাস্তা দিয়ে, যে রাস্তা গিয়েছে অজানা থেকে শূন্যে
সোনালী বাতাস দুর্বার গতির আবর্ত তুলে
সব কিছুকে সশব্দে ভেঙে ফেলছে—মৃত্যুর ছায়া বিস্তার করছে
সোনার মতো কচি কচি প্রাণে (যে প্রাণ ফুলের মতো উজ্জ্বল
নিষ্পাপ)
সেই ঝড়ো হাওয়ায় মৃত্যু অনাবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি ধরে টান মেরেছে।
একদিন হাসিমুখে যে সব বীর যোদ্ধারা মৃত্যুবরণ করেছিলো
জলস্রোতের মতো তারা আজ মিলিয়ে গেছে অনন্ততায়।
তাদের ছায়া দেখি নক্ষত্রজগতে!
সেইসব মৃত-ধূসর মানুষ প্রতীক্ষা করছে অজানা থেকে
শূন্যের পথে।

তরুণী নারীরা ছুটে চলেছে প্রজাপতির পেছন পেছন,
সুখী...ওরা সুখী...ওদের ওপর ধুলোর মতো কী
জমেছে যেন?
প্রেমিকের থেকে প্রেমিকের দূরত্ব নিয়ে ওরা কোথায় চলেছে?
ওরা কি মহাদেশের মতো দূরে চলে গেলো?
এশিয়া...আফ্রিকা...ক্যাথের মতো?
গ্রীষ্মকুঞ্জে স্তবকে স্তবকে আজ যে ফুল ফুটে উঠেছে
তারা কি আজকেই শুকিয়ে মরে যাবে?

অনুবাদক—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যা

# বিজ্ঞানের কথা

## নভোরশ্মি

অমরেন্দ্রকুমার সেন

প্রায়. পঞ্চাশ বৎসর আগে দুজন বৈজ্ঞানিক প্রায় একই সময়ে লক্ষ্য করেন যে, একটি তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্র যার ইংরেজি নাম ইলেকট্রোস্কোপ, সেটি তড়িৎযুক্ত করে রাখলেও ক্রমশঃ আপনা হতেই তার সঞ্চিত তড়িৎ শক্তি কমে যায়। এই দুজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একজন ইংরেজ, তাঁর নাম সি টি আর উইলসন আর অপরজন জার্মান, তাঁর নাম গাইটেল। তড়িৎশক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমন সব অদৃশ্য রশ্মি, যা তখন পর্যন্ত জানা ছিল, তা থেকে ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্রটিকে রক্ষা করবার জন্য তাকে সীসে অথবা জলপাত্র দ্বারা ঘিরে দেওয়া হ'ল, কিন্তু তথাপি সেই যন্ত্রের সঞ্চিত বিদ্যুৎশক্তি কমতে লাগল এবং এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'ল, যদিও ইলেকট্রোস্কোপটিকে সমুদ্রের মধ্যে অথবা খনির অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। রহস্য ভেদ করতে অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা সমর্থ হননি, তাঁরা অনুমান করেছিলেন যে, খুব শক্তিশালী কোন অদৃশ্য রশ্মি যা নাকি এক্স-রশ্মি অথবা অপর কোন রশ্মি অপেক্ষা শক্তিশালী তা এই ইলেকট্রোস্কোপের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সীসে অথবা জল সব অদৃশ্য রশ্মিকে রোধ করতে পারে, কিন্তু এই নতুন রশ্মিকে সীসে এবং জল রোধ করতে পারে না। যন্ত্রটিতে যে তড়িৎশক্তি সঞ্চিত থাকে, তার বিপরীত তড়িৎ শক্তি দ্বারা অর্থাৎ ঋণাত্মক কিংবা ধনাত্মক; যন্ত্রের মধ্যের বাতাসের অণুগুলি তড়িৎবিশিষ্ট অর্থাৎ আয়নিত (ionize) হয়। দুই বিপরীত তড়িৎধর্মের প্রতিক্রিয়ার ফলে যন্ত্রের সঞ্চিত বিদ্যুৎশক্তি কমতে থাকে। এই ঘটনাটি ঘটে ঐ অদৃশ্য রশ্মির প্রভাবের জন্য।

তারপর ১৯১২ সালে ভিয়েনার অধ্যাপক ভিক্টর হেস্ ঐ ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্রকে বেলুনের সাহায্যে ঊর্দ্ধ আকাশে প্রেরণ করেন। বেলুন যতই উঁচুতে ওঠে, ইলেকট্রোস্কোপের তড়িৎ-ক্ষয়ও তত বাড়তে থাকে। তখন অনুমান করা হ'ল যে, নতুন এই রশ্মির উৎস নিশ্চয় পৃথিবী নয়, কারণ ঐ বেলুন যত ওপরে ওঠে, যন্ত্রের তড়িৎ-ক্ষয়ের মাত্রাও তত বাড়তে থাকে, তাহলে এই রশ্মি নিশ্চয় পৃথিবীর বাইরে কোন দেশ থেকে আসে। হেসের এই অনুমান আবার একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক, কোলহোয়ের্স্টার সমর্থন করেন। তিনি ছয় মাইল ঊর্দ্ধে অধিকতর নির্ভরযোগ্য যন্ত্র বেলুন দ্বারা প্রেরণ করেছিলেন। আরও পরীক্ষা করে পৃথিবীর সর্বত্র জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে নতুন রশ্মির অবস্থিতি দেখা যেতে লাগল। বৈজ্ঞানিকগণ তখন স্থির করলেন যে, এই রশ্মি, সূর্য অথবা কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্র থেকে আসে না, আসে নভোদেশ থেকে। বিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক আর এ মিলিকান এই রশ্মিকে

ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে কসমিক রশ্মি সম্বন্ধে পরীক্ষারত কুমারী বিভা চৌধুরী

"কসমিক রে" অথবা নভোরশ্মি আখ্যা দিলেন এবং তিনি প্রমাণ করেন যে, নভোরশ্মির উৎপত্তি আকাশের যেখানেই হোক না কেন, বায়ুমণ্ডল নভোরশ্মির একটা মোটা অংশ শুষে নেয়।

বাড়ি যেমন ইঁট অথবা দেহ যেমন কোষ সমষ্টি দ্বারা গঠিত, সমস্ত পদার্থ সেইরকম পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত। এক এক পদার্থের পরমাণু এক একপ্রকার। পরমাণুগুলি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, চোখে তা দেখাই যায় না, সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জলবিন্দুর মধ্যে লক্ষ লক্ষ পরমাণু আছে। এত ছোট হলেও এক একটি পরমাণু যেন এক একটি সৌরজগৎ। পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে, যার নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট্ট একটি কণিকা, ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত, যার নাম ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে দুটি জিনিস। নিউট্রন ও প্রোটন। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কিন্তু নিউট্রনের কোন বৈদ্যুতিক শক্তি নেই। এই ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউক্লিয়াস, পরস্পরকে অত্যন্ত দৃঢ় শক্তি দ্বারা ধরে থাকে, পরমাণুকে ভাঙলে এই শক্তি নির্গত হয়। অ্যাটম বোমা বিস্ফোরিত হয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই শক্তি অতুলনীয়। পরমাণুকে ভাঙবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে কয়েকটি যন্ত্র নির্মিত হয়েছে, যথা—সাইক্লোট্রন ইত্যাদি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল আশান্বিত হয়ে উঠেছেন যে, নভোরশ্মি দ্বারা পরমাণুর কেন্দ্রকে ভেঙে তাতে নিহিত অতুলনীয় শক্তিকে নির্গত করা যাবে।
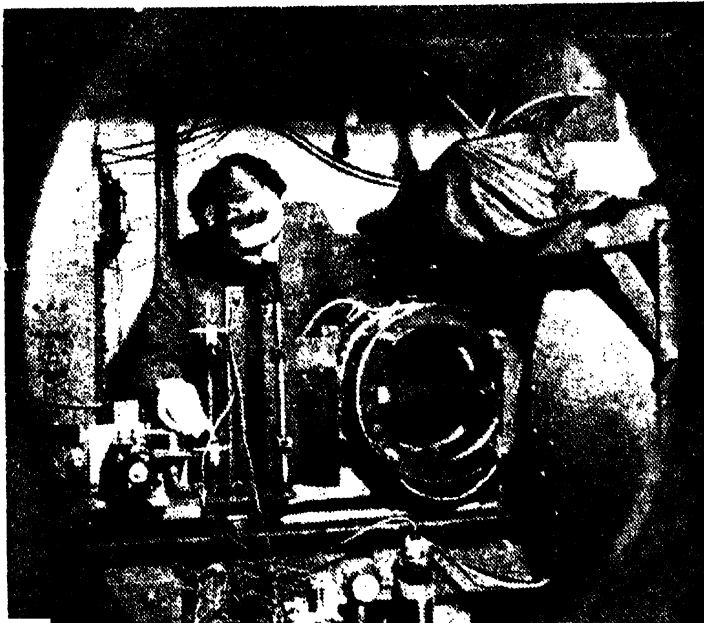
অতিভেদী কসমিক রশ্মি নিয়ে গবেষণারত বৈজ্ঞানিক

আমাদের পৃথিবী ও নিকটবর্তী
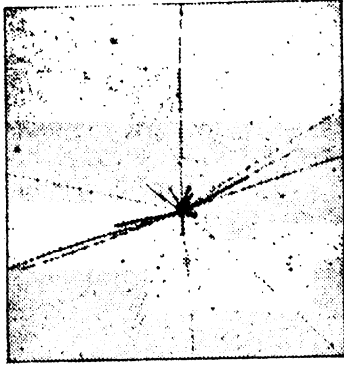
কসমিক রশ্মি দ্বারা একটি পরমাণু কেন্দ্র ভাঙা হচ্ছে—তারই আলোকচিত্র

ব্যতীত যে মহাজগৎ আছে, সেখান থেকে নিরন্তর পৃথিবীর ওপর নভোরশ্মির বৃষ্টি হচ্ছে। অসীম শক্তিশালী বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন কণিকাসম্বলিত এই নভোরশ্মি দুই প্রকারের আছে, একপ্রকার হ'ল অতিভেদী আর অপরপ্রকার কোমল। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অথবা সমুদ্রের অতল গহ্বরে যেখানেই সন্ধান করা গেছে, অতিভেদী নভোরশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে। অতিভেদী রশ্মির প্রধান কণিকা হ'ল মিসোট্রন অথবা মিসোন। আজকাল এই মিসোন নিয়ে খুব গবেষণা চলছে। মিসোন পরমাণুর মধ্যেও আছে, প্রোটন অপেক্ষা হাল্কা, কিন্তু ইলেকট্রন অপেক্ষা ১৭০ গুণ ভারী. ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত তবে ক্ষণজীবী। এই মিসোনকে একবার আয়ত্তে আনতে পারলে পরমাণু ভাঙার কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। জাপানী বৈজ্ঞানিক ইউকাওয়া মিসো-ট্রনের উপস্থিতি সন্দেহ করেন এবং মার্কিন বৈজ্ঞানিক অ্যান্ডারসন তার অস্তিত্ব নিরূপণ করেন এবং মিসোট্রন নাম দেন। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা সংক্ষেপে বলেন মিসোন।

মিসোনের শক্তি অসীম। এই শক্তি মাপা হয় 'মেভ্' নামক একক দ্বারা (MEV=Million Electron Volt)। ইউরেনিয়াম নামক ধাতুর পরমাণু কেন্দ্র ভাঙলে তা থেকে ২০০ মেভ শক্তি নির্গত হয় এবং আমরা জানি যে, এর সমতুল্য কোন শক্তি নেই; কিন্তু মিসোনের শক্তি এর তুলনায় অনেক বেশী, এক লক্ষ মেভ অপেক্ষাও বেশী। কোথায় দুশো আর কোথায় লক্ষ। এই মেসোনীয় শক্তি যা পরমাণু মধ্যস্থ প্রোটন ও নিউক্লিয়াসকে আবদ্ধ করে রাখে এবং যার উপস্থিতি নভো-রশ্মিতে স্থির করা গেছে তার দ্বারা কি অভূতপূর্ব সব কাজই না করানো যেতে পারে, যদি তাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। কলিকাতা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দেবেন্দ্রমোহন বসু ও তদীয় ছাত্রী করেছেন। কুমারী বিভা বর্তমানে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে নভোরশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা করছেন।

কসমিক রশ্মির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু কোনটাই এখনও প্রমাণিত হয় নি। এখন কসমিক রশ্মিকে সত্যই কোন কাজে লাগানো সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও কসমিক রশ্মির অনুশীলন যে পরমাণু জগতের অনেক অজানিত রহস্য উদ্ঘাটন করবে এবং পরমাণবিক শক্তিকে কি করে আরও ভালভাবে নিয়োজিত করা যাবে, সে বিষয়ে নির্দেশ পাওয়া যাবে।

কসমিক রশ্মির গবেষণায় ভারত পিছিয়ে নেই। বোম্বাইয়ে টাটা ইন্স্টিটিউট অফ ফান্ডামেণ্টাল রিসার্চের অধ্যাপক হোমী জে ভাবা কসমিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। ডক্টর ভাবার সঙ্গে আরও একজন বৈজ্ঞানিক যোগদান করেছেন, ইনি পিয়ারা সিং গিল, পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে তিনিও, পরিচিত হয়েছেন। তাঁর বয়স এখন ৩৭। পিয়ারা সিং গিল চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পেয়েছেন, তার পূর্বে তিনি বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক আর্থার কম্পটনের অধীনে গবেষণা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকা, হিমালয় এবং ভারতের নানাস্থানে তিনি কসমিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। তিনিও বর্তমানে টাটা ইনস্টিটিউটে কাজ করছেন, কিন্তু আরও গবেষণার জন্য টাটা ইনস্টিটিউট তাঁকে পুনরায় আমেরিকায় পাঠাচ্ছেন।

ডক্টর গিল পাঞ্জাবের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে হাজার টাকা ধার করে তিনি পানামা চলে যান, সেখান থেকে যান স্যান ফ্র্যান্সিস্কো। লেখাপড়া শেখবার জন্য সেখানে তিনি নানারকম কায়িক পরিশ্রম করেছেন, যথা—বাগানে ফল তোলা, বাড়ির মেঝে ঘষা, ডিস ধোয়া ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি পান এবং সেখানে বি-এ ও এম-এসসি পাশ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। তিনি আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির একজন সদস্য। ইঁর পূর্বে আর চারজন ভারতীয় এই গৌরব অর্জন করেছেন।

ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষারত দুইজন বৈজ্ঞানিক। এই ঘরে লর্ড রাদারফোর্ড কাজ

## ব্ল্যাক এঞ্জেল

গত মহাযুদ্ধের একজন নারী গুপ্তচরের নাম ব্ল্যাক এঞ্জেল।" অবশ্য এটি তার আসল নাম নয়, তার আসল নাম কার্মেন মোরিয়া মোরি। ১৯৩৮ সালে কার্মেন ধরা পড়ে, ফরাসী এলাকায় ম্যাজিনো লাইন অঞ্চলে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য; কিন্তু জার্মানরা ফরাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে দেবার পর কার্মেনকে উদ্ধার করে, কিন্তু কিছুদিন পরে প্রকাশ পায় যে, কার্মেন জার্মানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। তাকে র‍্যাভেনসব্রুকে পাঠানো হয়। র‍্যাভেনসব্রুকে সে কিছু কাজ দ্বারা নাৎসীদের বিশ্বাস পুনরায় অর্জন করতে সক্ষম হয়। জার্মানীর পরাজয়ের পর সে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের হয়ে কাজ করতে থাকে এবং

হামবুর্গের বিচারালয়ে নারী গুপ্তচর ব্ল্যাক এঞ্জেল

কতকগুলি নাৎসী-নায়ককে গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করে। তার কাজ সম্পূর্ণ হবার পরই তাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য পাঠানো হয়। হামবুর্গের বিচারালয়ে ৩রা ফেব্রুয়ারী তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এতদিনে হয়ত তার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গিয়েছে। তার বয়স ছিল ৪০। সে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিল। এখানে বিচারালয়ের দৃশ্যের একখানি ছবি দেওয়া হ'ল।

## জাপানের মহিলা মন্ত্রী

শ্রীমতী চিয়ো সাকাকিবারা জাপানের প্রথম মহিলা মন্ত্রী, একদা মহিলাদের কলেজে তিনি পিয়ানো শিক্ষক ছিলেন। পোল্যাণ্ডেরও প্রথম রাষ্ট্রপতি প্যাডেরউইস্কি একজন শ্রেষ্ঠ পিয়ানোবাদক ছিলেন।

## আবার বোরখা পর

পারস্যে ১৯৪৬ সালে রাজা ও রাণী বিনা বোরখায় কোন এক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই থেকে পারস্যের মহিলারা বোরখা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান ইমাম সাহেব ও মৌলবী সাহেবদের আন্দোলনের ফলে বর্তমানে বোরখা আবার ফিরে আসছে, প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। তেহরানে এমন অবস্থা হয়েছে যে, কোন বোরখা ও রক্ষী-বিহীনা মহিলাকে তারা জিনিস বিক্রয় করতে চায় না। তারা মূল্য নিতে জানে, দিতে জানে না, এমন কি রূপের।

## খুচরো খবর

লণ্ডনের ভালউইচ হাসপাতালে একজন তরুণ কানাডীয় চিকিৎসক একজন মহিলাকে সম্মোহিত করে প্রসব করিয়েছেন। অ্যানেস্থেটিক বা চেতনা-নাশকের কাজটা সম্মোহন সম্পাদিত করে। প্রসূতি মহিলাটিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্মোহিত হন। তিনি বলেন যে, প্রসব-বেদনা তিনি কিছুই টের পান নি। এই পদ্ধতির সফলতা দেখে অনেক অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলাই এখন সম্মোহিত হয়ে প্রসব হতে চাইছেন।

* * * *

ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটিতে বর্তমানে দুজন মহিলা সভ্য আছেন, দুজনেই ইংরেজ এবং দুজনেই জৈব-রাসায়নিক। একজন হলেন ডক্টর এস এম ম্যাণ্টন, কিংস কলেজের অধ্যাপিকা আর অপরজন ডক্টর ডি এম নীডহ্যাম, ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন।

* * * *

জাপানের প্রথম মহিলা মন্ত্রী কন্যাকে পিয়ানো শিক্ষা দিতেছেন

এবার লণ্ডনে যে অলিম্পিক খেলা হবে, ( একখানি দশ রীলে সম্পূর্ণ রঙীন চিত্র তে হবে। ছবিখানি দেখানো হবে প্রতিযোগি শেষ হবার দশ দিনের মধ্যেই। ছবিখ প্রযোজনা করবেন 'দি অলিম্পিক গেমস্ যি কম্পানী লিমিটেড। ১৯৩৬ সালে বার্লি যে অলিম্পিক খেলা হয়েছিল, ২৪ রী সম্পূর্ণ তার একখানি ছবি তোলা হয়েছিল

* * * *

লোকসংখ্যা অনুপাতে সাঁতারুর সং কোথায় সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন ? অস্ট্রেলিয়ায়।

* * * *

"কুইন মেরী" জাহাজ একবার আটলা সমুদ্র পার হতে পাঁচ হাজার টন তেল ব করে।

* * * *

মার্কিন মুলুকে বিচারকের সং সর্বাপেক্ষা বেশী, মোট একান্নজন, তার ম তিনজন হলেন সর্বোচ্চ বিচারালয়ের। নিউইয় স্টেটে দশজন ও ক্যালিফোর্নিয়া এ ম্যাসাচুসেটসে ছয়জন করে মহিলা বিচা আছেন।

# পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন
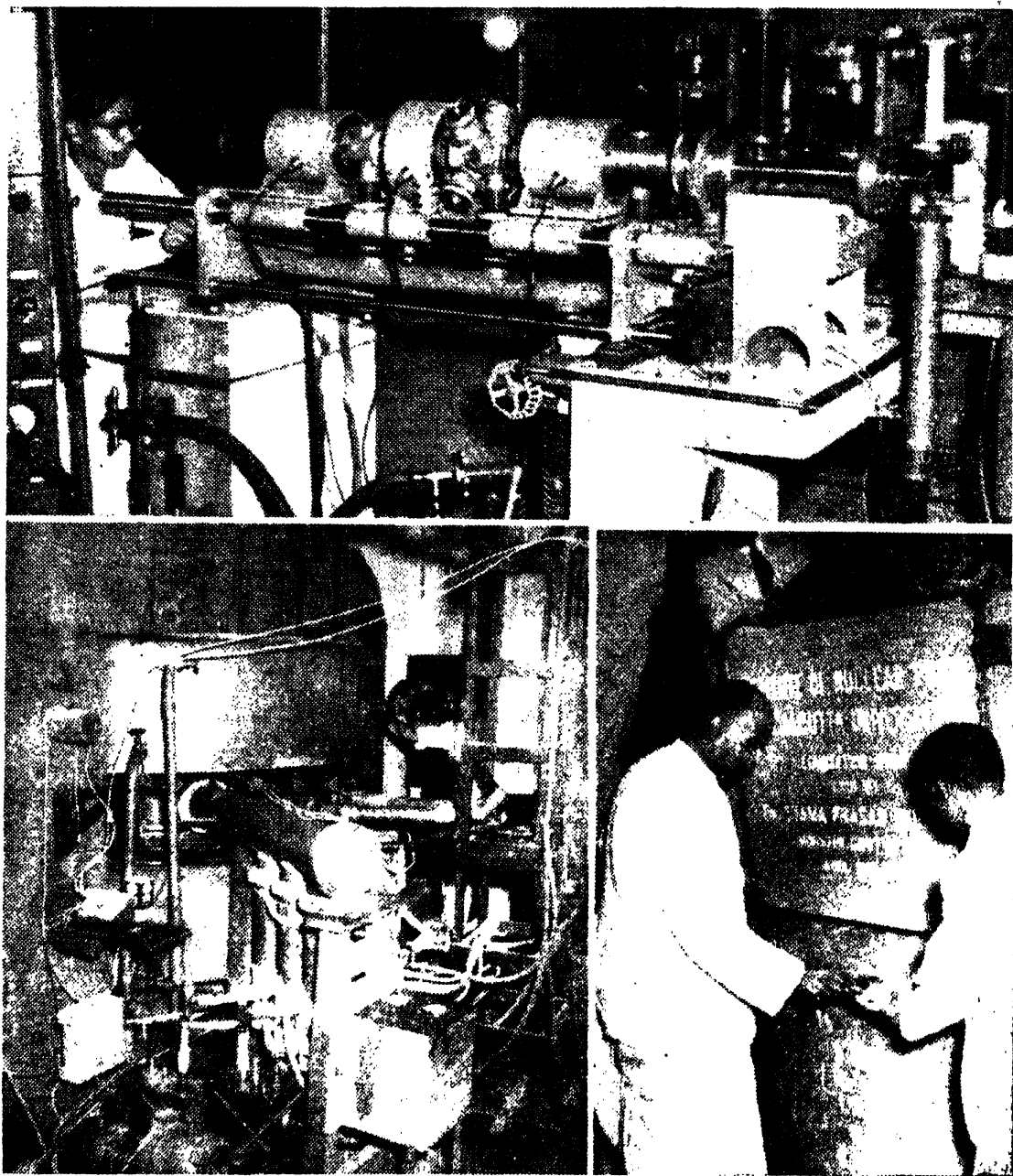
কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে সম্প্রতি পরমাণু পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন হইয়াছে।
উপরের ছবিতে—ইলেকট্রোণ মাইক্রোস্কোপ কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে বসান হইয়াছে।
নীচে, বাম দিকে—সাইক্লোট্রোণ মেসিন—ইহাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে বসান হইয়াছে।
নীচে, বামে—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিতেছেন।

# বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতায় কয়দিন ভারত-রাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদিগের বৈঠকে রাষ্ট্রগত সমস্যার আলোচনার পরে মীমাংসার যে সকল সর্তে উভয় পক্ষ সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান সচিব সানন্দে মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"এই বৈঠকে আমরা দেশে সাম্প্রদায়িক শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছি এবং দুইটি বিরাট লোকশ্রেণীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও পরস্পরের সম্বন্ধে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি।"

তাহাতে একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈঠকের কথা মনে পড়িতেছে। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে য়ুরোপের দেশ-সমূহের প্রতিনিধিদিগের এক বৈঠক হয়। য়ুরোপে তুরস্কের সুলতানের খৃষ্টান প্রজা-দিগের ভবিষ্যৎ স্থির করা সেই বৈঠকের উদ্দেশ্য। বৈঠকে যখন প্রস্তাব হইল, প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিকে বলিতে হইবে তাঁহার সরকার এ বিষয়ে কোন গোপন চুক্তি করেন নাই, ইংলণ্ডের প্রতিনিধি তাহাই বলিলেন বটে, কিন্তু প্রকাশ পাইল—তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। শেষে ফ্রান্সকে টিউনিস অধিকারের ও সিরিয়ায় ল্যাটিন খৃস্টানদিগের অভিভাবকত্ব করিবার ক্ষমতা দিতে সম্মত হইয়া অব্যাহতি লাভ করিয়া ইংলণ্ডের প্রতিনিধি লর্ড বিকন্সফিল্ড স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বলেন,—তিনি "Peace with honour" আনিয়াছেন।

চুক্তির সর্ত বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় ভারত-রাষ্ট্র ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, পাকিস্তান লাভবান হইয়াছে।

বলা হইয়াছে, যে লোকের বাস্তুত্যাগ উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই স্বার্থবিরোধী বলিয়া উভয়েই তাহা নিবারণ করিবে এবং যাহাতে গৃহত্যাগীরা যথাসম্ভব যে সত্বর পৈতৃক ভিটায় ফিরিয়া যাইতে পারেন সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিবেন। উভয় রাষ্ট্রের সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধনপ্রাণ রক্ষার ও তাঁহারা যাহাতে নাগরিক অধিকার সম্ভোগ করেন তাহার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

ইহাতে বিদেশের লোক স্বতঃই মনে করিবে যে, এই বিষয়ে ভারত সরকারেরও ত্রুটি আছে এবং ভারত-রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যা বিদ্যমান।

কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রে সে সমস্যা নাই এবং কোন মুসলমান ভয়ে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া গমন করে নাই। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর ধন-প্রাণ-মান নিরাপদ না থাকায় ইতো-মধ্যেই দশ লক্ষাধিক হিন্দু নরনারী পলাইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এ বিষয়ে পাকিস্তানের নায়ক মিস্টার জিন্না অনায়াসে বলিয়াছেন, এ পর্যন্ত ২ লক্ষের অধিক হিন্দু প্যাকিস্তান ত্যাগ করে নাই এবং যে খাজা নাজিমুদ্দীন হিন্দুদিগকে ঢাকায় জন্মাস্টমীর মিছিল যাত্রার ছাড় দিয়াও সেই মিছিল মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি সুর আর এক পর্দা চড়াইয়া বলিয়াছেন, কংগ্রেসের ও হিন্দু মহাসভার প্রচারকগণের মিথ্যা প্রচার ফলে ভয় পাইয়া প্রায় ২ লক্ষ হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়াছে। আর উভয়েই বলিয়াছেন,—হিন্দুরা পাকিস্তানে যেরূপ সুখে বাস করিতেছে, ভারত-রাষ্ট্রে অর্থাৎ হিন্দুস্থানে তাহা মুসলমানদিগের অজ্ঞাত!

ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন জাতি—Two Nation theory প্রত্যক্ষভাবে মানিয়া না লইলেও তাহাদিগকে Two great people বলিয়া পরোক্ষ ভাবে সেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

ভারত-রাষ্ট্রে যে সংখ্যালপ সমস্যা নাই সে কথার উল্লেখও না করা ভারত সরকারের পক্ষে সংগত হয় নাই।

চুক্তিতে ত্রুটি অনুভব করিয়াই ভারত সরকারের পক্ষ হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে, সংবাদপত্রসমূহ যেন চুক্তির সর্ত বিশেষভাবে সমালোচনা না করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে যে হিন্দু নারীর মান-মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের ব্যবস্থায় যে পুলিশরা নিষিদ্ধ দ্রব্যের সন্ধান করিবার ছলে হিন্দু নারীর গাত্রে হস্তার্পণও করিতেছে, তাহারও কোন উল্লেখ চুক্তিতে নাই।

উভয় সরকারই পাকিস্তানের সহিত ভারত-রাষ্ট্রের—পূর্ববঙ্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গের বা আসামের বা কুচবিহার রাজ্যের বা ত্রিপুরা রাজ্যের মিলনের জন্য প্রচারকার্যে বাধা দিবেন। ইহাতে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার সংকুচিত করাই হইবে। এরূপ মিলন সাধনের উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার প্রচারকার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

উভয় সরকারই লোকমত প্রকাশের প্রধান উপায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(১) কোন রাষ্ট্রের সংবাদপত্রে যেন অন্য রাষ্ট্রের বিরোধী প্রচারকার্য পরিচালিত না হয়।

(২) যেরূপ সংবাদে কোন রাষ্ট্রের লোক বা সম্প্রদায়বিশেষ উত্তেজিত বা ভীত হইতে পারে এমন অতিরঞ্জিত সংবাদ কোন রাষ্ট্রের সংবাদপত্রে যেন প্রকাশিত না হয়।

(৩) যেরূপ সংবাদাদি প্রকাশ এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাজ্যের যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধের অনিবার্যতা প্রচার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কোন রাষ্ট্রের সংবাদপত্রে যেন সে সংবাদাদি প্রকাশিত না হয়।

সংবাদপত্রাতঙ্ক কোন্ রাষ্ট্রে লক্ষিত হইতেছে, তাহা পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমবঙ্গের পত্র বার বার নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের সংবাদ গোপন করাই যে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রচারের কারণ, তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথায় লোককে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। সেই জন্যই যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রস্তাবে চুক্তিতে এই সর্তের উল্লেখ হইয়াছে, মনে করা অসংগত নহে। কিন্তু ভারত সরকার কি এই সর্তের অপব্যবহার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন? পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সহিত পূর্ববঙ্গের যোগের আকাঙ্ক্ষা যে অস্বাভাবিক নহে, তাহা অন্য প্রসঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দীনও স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি আজ সে বিষয়ের আলোচনা সংবাদপত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারিবে! জার্মানী যখন—ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পরে—ফ্রান্সের আলসেস ও লোরেন লাভ করিয়াছিল, তখন তাহাতে ফ্রান্সের লোকের বেদনা প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক দোদে তাঁহার একটি গল্পে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। গল্প আছে, তাহার বহুদিন পরে ফ্রান্সের কোন নর্তকী যখন জার্মানীর রাজধানীতে নৃত্যকলা দেখাইতে গিয়াছিল, তখন তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া জার্মান সম্রাট তাঁহার নৃত্য দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় সে তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য নৃত্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—সে ফ্রান্সের দুহিতা, আলসেস ও লোরেনের বেদনা বক্ষে লইয়া সে জার্মান সম্রাটের চিত্তবিনোদনের কারণ হইতে পারে না। তাহার সেই কার্য দেশপ্রেমের পরিচায়ক বলিয়া প্রশংসিতই হইয়া আসিয়াছে।

প্রতিশ্রুতি যদি রক্ষিত না হয়, তবে কি হইবে, চুক্তিতে তাহার উল্লেখ নাই।

ভারত-রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্র-দায়ের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহার কদর্থ করিতে লীগপন্থীদিগের অধিক সময় লাগিবে না। ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে ঐ প্রতিশ্রুতি প্রদানের কোন কারণই নাই। পাকিস্তানীরা বলিয়াছেন, পাকিস্তান মুসলমান রাষ্ট্র—তথায় হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। কিন্তু ভারত সরকার ভারত-রাষ্ট্র হিন্দু রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার না করিলেও এই চুক্তিতে তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছে, ভারত-রাষ্ট্রে মুসলমানগণ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। বাস্তবিক ভারত সরকার যে মুসল-মানরা পাকিস্থানে চাকরী লইয়া যাইলেও তাহাদিগকে ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক বলিয়া ভারত-

রাষ্ট্রের অধিবাসীর অধিকারে বঞ্চিত করেন না, তাহার প্রমাণ গত ২০শে এপ্রিল দিল্লী হইতে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদে পাওয়া যাইবে—

রেলের কর্মচারী বহু মুসলমান পাকিস্তান হইতে ভারত-রাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিতেছেন! ১৮ হাজার (মুসলমান) রেল কর্মচারী শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পূর্বে পাকিস্তানে যাইবেন বলিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা মত পরিবর্তন করিয়া ভারতে চাকরী করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ঐ ১৮ হাজারের মধ্যে যে ৬ হাজার চাকরিয়াকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে তিন হাজার পাকিস্থানে যাইয়া কিছুদিন কাজ করিবার পরে ফিরিয়া আসিয়া ভারতেই চাকরী করিতে চাহিয়াছেন। অবশিষ্ট ৩ হাজার পাকিস্তানে যাইয়া কার্যে যোগদান করেন নাই। আড়াই হাজার মত পরিবর্তনকারীকে চাকরী দিবার কি উপায় করা যায়, তাহা স্থির করিবার জন্য ভারত সরকার একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই ১৮ হাজার মুসলমান যে পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং তাঁহাদিগের মত পরিবর্তন যে দুরভিসন্ধিমূলক হইতে পারে না এমন নাও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যে পাকিস্তানের প্রয়োজনে 'পঞ্চম বাহিনীর' কাজ করিতে পারেন তাহাও মনে না করিয়া ভারত সরকার তাঁহাদিগকে আবার চাকরী দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাহাতে ১৮ হাজার ভারত-রাষ্ট্রের লোককে চাকরীতে বঞ্চিত করাও হইতেছে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, ভারত-রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যা সরকার স্বীকার করেন না। তথাপি কেন যে ভারত সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, বিদেশে পাকিস্তানের যে প্রচার কার্য পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে ভারত-রাষ্ট্রে মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার চিত্রে ও বর্ণনায় ব্যক্ত করা হইতেছে। আর মিঃ জিন্না যে বলিয়াছেন, পাকিস্তানে হিন্দুরা যেরূপ সুখে আছে, ভারত-রাষ্ট্রে তাহা মুসলমানদিগের কল্পনাতীত।

চুক্তিতে বলা হইয়াছে, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মাল চলাচলের বাধা যথাসম্ভব দূর করা হইবে। যেরূপ কারণে ভারতবর্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক কারণেও যদি পূর্ব পাকিস্তানের সম্বন্ধে economic sanction দৃঢ় করা না হয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণই ঘটিবে। পূর্ব পাকিস্তানই তথা হইতে স্বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাইকেল পর্যন্ত বাহিরে আনা নিষিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু কাপড়ের ও কয়লার ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে বিব্রত হইয়াই যখন পাকিস্তান মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে, তখন সেই সুযোগে পাকিস্তানে হিন্দুর সাধারণ নাগরিক অধিকার রক্ষার অনমনীয় ব্যবস্থা করিয়া লইলেই যে ভাল হইত, তাহা বলা বাহুল্য।

বৈঠকের শেষে খাজা নাজিমুদ্দীন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সংবাদ প্রকাশে আপত্তিই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলেন,—

"যে সকল সংবাদের ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উদ্ভূত হয়, সংবাদপত্রসমূহ যদি সে সকলের প্রকাশ পথ বন্ধ করিতে কৃতসংকল্প হন, আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে বৈঠকের উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং এক রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া লোকের অন্য রাষ্ট্রে গমন বন্ধ হইবে।"

ইহার নির্গলিতার্থ—এক সম্প্রদায়ের লোকের উপর অনাচার অনুষ্ঠিত হইলেও সেই সংবাদ—তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিসর্পিত হইতে পারে বলিয়া—গোপন করাই সংবাদপত্রের কর্তব্য। কলিকাতায় সংবাদপত্র পরিচালকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই উপদেশামৃত বর্ষণের উদ্দেশ্য কি তাহা বলা বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গ হইতে—এমন কি সমগ্র ভারত-রাষ্ট্র হইতে মুসলমানরা পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে না। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলেও সে সংবাদ পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রে প্রকাশে বিরত থাকা হউক—ইহাই খাজা নাজিমুদ্দীনের অভিপ্রায়। তাঁহার উক্তির উত্তরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' যথার্থই বলিয়াছেন:—

"সংবাদপত্র সংবাদ সৃষ্টি করে না, প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশ করে মাত্র এবং তাহাও করিয়া থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের গুরুত্বের প্রতি জনসাধারণের ও সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য।"

যে সকল কারণে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন, সে সকল কারণ সংবাদপত্রের সৃষ্ট নহে। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার যে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতেও দ্বিধানুভব করেন না, তাহার প্রমাণ যশোহর স্টেশনের ঘটনা সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবস্থা পরিষদের খাজা নাজিমুদ্দীনের উক্তিতেই পাওয়া গিয়াছে। সেরূপ স্থলে সত্য প্রচারের ভার সংবাদপত্রকে কর্তব্য হিসাবেই গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা স্থান ত্যাগের যে সকল কারণ বিবৃত করিতেছেন, সে সকল যদি কোথাও অতিরঞ্জিত হয়, তবে পূর্ববঙ্গ সরকার তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কোন সংবাদপত্র তাঁহাদিগের প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে আপত্তি করিবেন না।

আজ মনে পড়িতেছে, বাংলায় যখন মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন—ঢাকায় হাঙ্গামার সময় খাজা নাজিমুদ্দীন হিন্দু-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমান পরিচালিত একখানি পত্রে একটি চিত্র—মসজিদ পোড়ান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখাইয়া দিলে সে বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই।

আমাদিগের আশংকা হয়, অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতি সাবধান কর্মচারীর যেমন সংবাদ প্রকাশে অযথা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, পূর্ব পাকিস্তানের সরকার তেমনই অকারণে প্রকাশিত সংবাদ আপত্তিজনক বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানাইতে পারেন। এই দুই দিকের ব্যবহারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সে বিষয়ে পূর্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সংবাদপত্রের সাহায্য ব্যতীত তাঁহারা কিরূপে প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবেন? সংবাদপত্র সংবাদকের নিকট সংবাদ না পাইলে বটেনের পক্ষে সুয়েজ খাল হস্তগত করা সম্ভব হইত না।

কাশ্মীরের ব্যাপার এখন আন্তর্জাতিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হায়দরাবাদের সংবাদে আশংকার উদ্ভব অনিবার্য। সে সকল ব্যাপার সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশে বিরত থাকা যে সংবাদপত্রের পক্ষে কর্তব্যচ্যুতি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাকিস্তান সরকার কি চাহেন যে, ভারত-রাষ্ট্রের সংবাদপত্রে সে সকল সংবাদ অপ্রকাশিত থাকে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মীমাংসার মত অনুসারে কাজ করিতে যে তৎপরতা দেখাইতেছেন, তাহাতে আমাদিগের মনে হয় সাংবাদিকদিগের পক্ষে সতর্কতাবলম্বন করা এবং যাহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় কোনরূপ অসঙ্গত হস্তক্ষেপ না হয়, সে বিষয়ে অবহিত হইয়া একযোগে কাজ করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিদেশী শাসকের অধীনে যে সংবাদপত্র তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে সেই সংবাদপত্র আজ যেন মরীচিকার মোহে তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত না হয়। সময় থাকিতে বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকাই সঙ্গত। পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পাকিস্তানে কাপড় চালান বন্ধ করিতে অক্ষমতায় বা শৈথিল্যে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গে কাপড় চালানের ছাড় বন্ধ করিয়াছেন। ঐ কাপড় চালান সম্বন্ধে সংবাদপত্র বারংবার সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' রাণাঘাট হইতে চোরা চালানের বিস্তৃত সংবাদ দিয়াছেন, 'স্টেটসম্যান
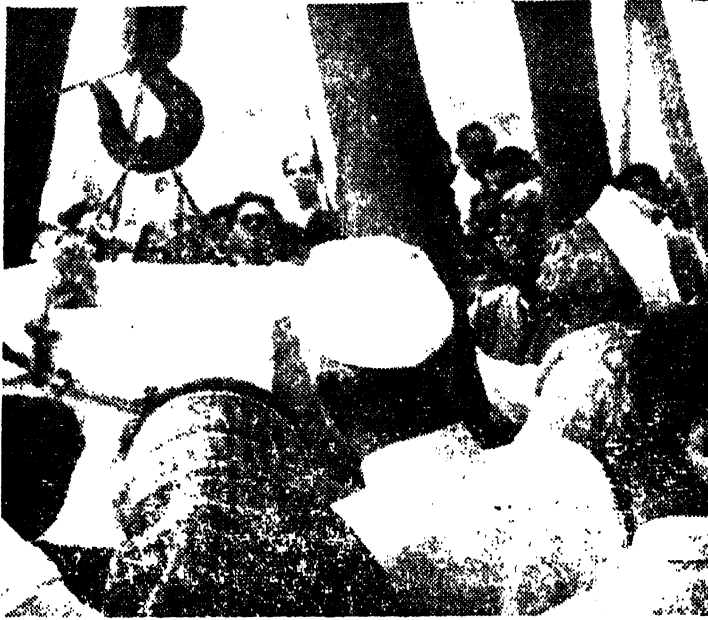
ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার নূতন রাজধানীর ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন

পণ্ডিত নেহরু উড়িষ্যার নূতন রাজধানী ভুবনেশ্বরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়া কটক যাইবার পথে খণ্ডগিরি গুহা পরিদর্শন করেন। ছবিতে, উড়িষ্যার গভর্নরের সহিত পণ্ডিত নেহরুকে দেখা যাইতেছে

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হীরাকুণ্ড বাঁধের প্রথম কংক্রীট স্তর স্থাপন করিতেছেন

পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি জলন্ধরে গান্ধীনগর আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করেন। আশ্রয়প্রার্থীরা তাহাদের প্রতি অত্যাচারের নির্মম কাহিনী পণ্ডিতজীকে জানায়। ছবিতে একটি আশ্রয়প্রার্থী বালিকার করুণ কাহিনী শ্রবণে পণ্ডিতজীকে অত্যন্ত বিষাদমগ্ন দেখা যাইতেছে

গত ১৯শে এপ্রিল নয়াদিল্লী হোটেল ইম্পিরিয়ালে ব্রহ্মের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ আউং সানের পত্নীকে ব্রহ্ম দূতাবাসের পক্ষ হইতে আপ্যায়ন করা হয়। ছবিতে লেডী মাউণ্টব্যাটেন, পণ্ডিত নেহরু ও মিসেস আউং সানকে দেখা যাইতেছে

# সমালোচনার ভবিষ্যৎ

শ্রীনেপালশঙ্কর সরকার

**সমালোচকদের** দুটি জাত আছে। এক জাতের সমালোচক সাহিত্যের বহিরঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এ'দের ধারণা, মানব মনের সকল বৃত্তির মত সৃজনী-প্রতিভাও কালধর্মী ও কালানুবর্তী। তাই এ'রা যুগধর্মের আলোয় সাহিত্যের অন্তঃসত্তাকে চিনে নেবার প্রয়াস পান। ম্যাথু আর্নল্ড যাকে সমালোচনার ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলেছেন, তারই অনুসরণ করে' এ'রা যুগধর্মের মানদণ্ডে সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্য নির্ণয় করেন। আর এক জাতের সমালোচক সাহিত্যের অন্তঃসত্তাকে মনে করেন কালাতীত। যা সাময়িক, একান্ত ধ্বংসশীল যা, তাকে বর্জন করে' যুগাতীত জীবন-সত্যকেই রসরূপে মূর্ত করে' তোলে সাহিত্য—এই এ'দের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এ'রা সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড-রূপে সাহিত্যের যুগাতীত হওয়াটাকেই গ্রহণ করেন।

এখানে বলে নেওয়া দরকার, আমরা শুধু সত্যিকারের সমালোচকদের কথাই বলছি—সাময়িক পত্রের স্তম্ভে যাঁরা বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটের প্রশস্তি গান, তাঁদের কথা নয়; কিংবা পি-এইচ ডি-লিপ্সা যাঁদের 'নব্যপর্তুগীজ সাহিত্যের ওপর স্ক্যান্দিনেভীয় প্রভাব'-জাতীয় বিষয় নিয়ে কোটেশন-কণ্টকিত থীসিস্ রচনা করতে প্রণোদিত করে, সেই সব 'দুঃসাধ্য সিদ্ধান্তকারী' 'দুর্দান্ত পণ্ডিতদের' কথাও নয়। আমরা তাঁদের কথাই বলছি, যাঁদের সমালোচনার মূলে থাকে সাহিত্য-প্রীতি ও রসবোধ, সাহিত্যকে যাঁরা পরিপূর্ণতার জন্য চিরন্তন মানবীয় সাধনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করেন।

যে দু' ধরণের সমালোচনার কথা বলা হল, তার মধ্যে কোনটি ঠিক, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু এ প্রশ্নের কোন সর্ববাদি-সম্মত জবাব আজও পাওয়া যায় নি, কারণ এর সঙ্গে সাহিত্যস্বরূপের বিতর্কসঙ্কুল সমস্যা রয়েছে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাহিত্য কি যুগানুবর্তী না যুগাতীত, এ নিয়ে সমালোচক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে বিতর্ক-বিসম্বাদের আর অবধি নেই। এ তর্কের মীমাংসার জন্য অপেক্ষা না করেও একথা আমরা মেনে নিতে পারি যে, সাহিত্য-রসপিপাসুর কাছে, দু'রকম সমালোচনারই মূল্য আছে। কোলরিজ, ডি কুইন্সি বা ব্র্যাডলির সমালোচনা শেক্সপীয়রীয় সাহিত্যের কালাতীত রস-সত্তার ওপর যে আলোক-সম্পাত করেছে, তা যেমন আমাদের রসানুভূতিকে তৃপ্তি দেয়, তেমনই ডাঃ হ্যারিসন যখন এলিজাবেথীয় যুগের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে শেক্সপীয়রীয় নাটকের উৎস নির্ণয় করেন বা গ্রানভিল বার্কার যখন এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে শেক্সপীয়রের সৃষ্টি-ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করেন, তাও কি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করে রসোপভোগকে পরিপূর্ণতর করে তোলে না? বস্তুত দু' ধরণের সমালোচকের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য যতই থাক না কেন, পাঠকের কাছে দু'রকম সমালোচনারই সার্থকতা আছে।

কেউ কেউ অবশ্য বলবেন, কোন সমালোচনারই সার্থকতা নেই সমালোচনা মাত্রেই নিতান্ত নিরর্থক। সাহিত্যিক ও পাঠক, রসস্রষ্টা ও রসবেত্তা—এ'দের হৃদয়ে-হৃদয়ে যে সংযোগ, তার মাঝখানে সমালোচক কেন এসে দাঁড়াবেন মূর্তিমান রসভঙ্গের মত? এ অভিযোগ যে নিতান্ত অমূলক, তা বলা যায় না। অযথা পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে সাহিত্যকে নীরস করে তোলবার, রসের সহজ ধারাকে তথ্যের মরুভূমিতে হারিয়ে ফেলবার প্রবৃত্তি যে অনেক সমালোচকেরই আছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। তাছাড়া নামকরা সমালোচকরাও যে অনেক সময় মারাত্মক ভুল করেন সাহিত্য বিচার করতে বসে, একথাও কারও অজানা নেই। তবে আশ্বাসের কথা, এরকম ভুলের দরুণ সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না—মহাকালের বিচারে সাহিত্যের সত্য মূল্যই শেষ পর্যন্ত নির্ণীত হয়; মাঝ থেকে পাণ্ডিত্যম্মন্য সমালোচকদের ভ্রান্তিবিলাসই হয়ে দাঁড়ায় হাস্যকর। কীটসের প্রথম কাব্যকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছিলেন যিনি, 'কোয়ার্টারলি রিভিয়্যুর' সেই সমালোচক আজ কোথায়? রবীন্দ্রনাথকে 'পেঁচা কবি' বলে যিনি অভিহিত করেছিলেন, 'কড়ি ও কোমলে' যিনি সিঁদকাঠি নিয়ে পদ্য লিখবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করেছিলেন, সেই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আর তাঁর 'মিঠেকড়া' কোন্ বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হয়েছে, কে দেবে তার সন্ধান? ডাঃ জনসনের দৃষ্টিতে আমরা আজ মিল্টনের কাব্য বিচার করিনে, আর 'গীতাঞ্জলি' পড়তে বসেও সুরেশ সমাজপতি মশায়ের মত মাথা ঘামাইনে এ নিয়ে যে, 'নয়নে নিদ নিল কেড়ে' লিখবার সময় রবীন্দ্রনাথ ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার জানতেন কি না!

কিন্তু জনসন বা সমাজপতির মত সমালোচকেরও ভুল হয়, এ যুক্তি দিয়ে সমালোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। গণতন্ত্রের যুগে অন্যত্র অধিকার-ভেদ না মানলেও রসবোধের ক্ষেত্রে সে ভেদ মানতেই হয়। সাহিত্যিকরা রসবেত্তার প্রয়োজন স্বীকার করেন, নিজেদের সকল প্রয়াসকে সার্থক মনে করেন মর্মজ্ঞের অভিনন্দন পেলে। কালিদাস তাই 'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং' শিল্পসৃষ্টিকে সার্থকতার মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না; ভবভূতি তাই নিজের সৃষ্টিকে নিরবধি কালের মধ্যে প্রতীক্ষমান করে রাখলেন নিজের সমানধর্মার প্রত্যাশায়। সাহিত্যকারের রসবেত্তা তিনিই, যিনি স্রষ্টার সমানধর্মা হতে পারেন। 'কবিঃ করোতি বেত্তি।' সাহিত্য-কীর্তির যথার্থ মূল্য তিনিই নির্দেশ করতে পারেন, যিনি সৃষ্টি-রহস্যের মর্মকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে পাণ্ডিত্যের চেয়ে সহজ রসবোধের প্রয়োজন বেশী, বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তির। সহজ রসবোধ যেটা কারও মনে এনে দিতে পারে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর মনস্তত্ত্বের পুঁথিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, প্রতিভাবান সমালোচকেরা আমাদের সুপ্ত রসবোধকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। অস্কার ওয়াইল্ড সমালোচককে শিল্পী বলেছেন। এই মতবাদের সমর্থক হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, শিল্প জীবনের অনুকৃতি নয়, জীবনই শিল্পের অনুকৃতি। ওয়াইল্ডের এ সিদ্ধান্ত মেনে না নিলেও সমালোচককে বিশেষ অর্থে শিল্পী বলে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। কবি যে অর্থে জীবন-দ্রষ্টা, সমালোচক সেই অর্থেই কাব্য-দ্রষ্টা। জীবনের ও জগতের যে রহস্য আমাদের কাছে আবৃত থাকে, অতি-পরিচয়ের আবরণে (Coleridge-এর ভাষায়, film of familiarity' দিয়ে)—সেই রহস্যকে আমাদের অনুভূতি গোচর করেন কবিরা ও শিল্পীরা। কবির ও শিল্পীর সৃষ্টিতে যেসব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা থাকে, তাকেও তো আবার পরিস্ফুট করে তোলেন নিপুণ সমালোচক তাঁর দীপ্ত বুদ্ধির আলোকসম্পাতে, সংবেদনশীল হৃদয়ের উত্তপ্ত আবেগে। শেক্সপীয়র সম্বন্ধে আজ আমাদের যে ধারণা, তা অনেকটাই কি আমরা পাইনি হ্যাজলিট ডাউডেন, ব্র্যাডলি ও বার্কার ও মিস

স্পার্জিঅনের সালোচনা থেকে? য়ুরোপীয় রেনেসাঁ যুগের সাহিত্য-প্রেরণা সম্বন্ধে এডমান্ড চেম্বার্সের রচনা থেকে আমাদের ধারণা যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ততটা স্পষ্ট কি হতে পারত যদি আমরা শুধু মোর, কোলেট, ইরেসমাস, বোকাচিওর রচনা পড়তুম? বাঙলা সাহিত্যেও এর দৃষ্টান্ত মেলে। বাঙলার রেনেসাঁ যুগ, ঊনবিংশ শতকের বাঙলার সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ তো অনেকেই করেছেন। কিন্তু সেই তথ্যরাশির ভেতর থেকে একটা জাতির ও একটা যুগের প্রাণধারাকে মোহিতলাল মজুমদার যেভাবে নিষ্কাশিত করেছেন, তা কি সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেয় নি? ফলত মর্মজ্ঞ সমালোচকের গভীরতর জ্ঞান ও সূক্ষ্মতর অনুভূতির সাহায্যে আমাদের অপেক্ষাকৃত পরিসীমিত জ্ঞান ও অনুভূতি যে পরিপূর্ণতর হয়ে ওঠে, একথার সাক্ষ্য দেবে প্রায় প্রত্যেক সাহিত্য-পিপাসুর অভিজ্ঞতা। সাহিত্য-তীর্থের রসবেত্তার সমালোচনা যে আলোকবর্তিকা জেলে দেয়, তার শিখা সন্ধানীর যাত্রাকে সহজতর করে তোলে, লাঘব করে তার পরিশ্রম।

কথাটাকে অন্য এক দিক থেকে দেখা যেতে পারে। সমালোচনা মানুষের সহজ ধর্ম। মানব-মনের বৃত্তিগুলি এমন অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত যে, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি আসতে পারে না। সৃজনী বৃত্তির সঙ্গে বিচারবৃত্তি আসবেই, রসবোধের সঙ্গে রুচিবিচার। বিশুদ্ধ অনুভূতি বা বিশুদ্ধ বুদ্ধির অস্তিত্ব মনোবিজ্ঞানীরা মানেন না। কথা উঠতে পারে, সমালোচনা যদি মানব-মনের স্বাভাবিক ধর্মই হয়, তবে তো সব মানুষই সমালোচক। তাহলে আলাদা এক শ্রেণীর সমালোচকের দরকার কি? সব মানুষই চিন্তা করে, কিন্তু সবার চিন্তাই নির্ভুল নয়; তাই সুষ্ঠু চিন্তার মান নির্দেশের জন্য নৈয়ায়িকের দরকার আছে। তেমনি প্রকৃত সমালোচনার মান নির্দেশের জন্য দরকার আছে সমালোচকের।

সমালোচকের প্রয়োজন মেনে নিয়ে আমরা এবার প্রশ্ন করতে পারি, কি ধরণের সমালোচক আমাদের এযুগে প্রয়োজন? সাধারণ পাঠকের রুচিই প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক যুগে সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয় করে। আবার সাধারণ পাঠকের রুচি গড়ে তোলবার দায়িত্ব সমালোচকের। তাই শেষ পর্যন্ত সমালোচকদের ওপরই নির্ভর করে সাহিত্যের আদর্শ, সমালোচনার ভবিষ্যতের ওপরই নির্ভর করে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

আমাদের এযুগে সাহিত্য-সমালোচনার অবনতি ঘটেছে, একথা আমরা যত্রতত্র শুনতে পাই। ভার্জিনিয়া উলফ্ তাঁর 'কমন রীডারে' এ সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে গেছেন। ডাঃ জনসন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মত এমন কোন সমালোচক বাস্তবিকই আজ আর নেই, সমসাময়িক সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে যাঁর মতামত সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে। সার্বভৌম সমালোচকদের যুগ চলে গেছে—কখনও যে আর ফিরে আসবে সে-যুগ, তাও মনে হয় না, কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনারও অবনতি কেন ঘটেছে? —এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে।

সাহিত্য-সৃষ্টির দিক দিয়ে আমাদের এযুগ তেমন প্রশংসনীয় নয়। এযুগের সাহিত্যে প্রাচুর্য আছে কিন্তু সে প্রাচুর্য মূলত পরিমাণের—প্রাণের নয়। এ-সাহিত্যের ব্যাধি কোথায়, কি তার নিদান—তা অবশ্য খুব জটিল সমস্যা। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে সে আলোচনা করা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। সংক্ষেপে বলা চলে, আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, এ-সাহিত্য আধুনিক নয়।

জানি, অনেক এ কথায় সেই সব অতি-আধুনিকমন্য সাহিত্যিকের দল অতিমাত্রায় উগ্র হয়ে উঠবেন, যাঁরা কথায় কথায় আধুনিকতার বুলি আওড়ান, আর সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠবেন সেই সব বুদ্ধিজীবী, যাঁরা তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যের জয়গান উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। কিন্তু কথাটা সত্য। বিজ্ঞানের অতি দ্রুত অগ্রগতিতে মানুষের মনোজগতে যে অভাবিতপূর্ব বিপ্লব এসেছে, তা সীমাবদ্ধ রয়েছে অতি অল্পসংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে। রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে বিপ্লব আজও কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। আসল কথা এযুগের চিন্তার সঙ্গে দৌড়ে সাহিত্যিকেরা পিছিয়ে পড়েছেন। বিংশ শতকের প্রারম্ভে যাঁরা এযুগকে জিজ্ঞাসার যুগ (Age of Interogations) বলে অভিহিত করেছিলেন, আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন এই ভেবে যে, ভিক্টোরীয় যুগের সহজ-বিশ্বাস-প্রবণতা থেকে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, তাঁরা হয়ত ভাবতে পারেন নি যে, অর্ধশতকেও জিজ্ঞাসার যুগ রূপ নেবে না উত্তরের যুগে—এমন কি, প্রশ্ন করবার আড়ম্বর করলেও সত্যিকারের প্রশ্নও আমরা করতে পারব না। ভিক্টোরীয় যুগের প্রতি উন্নাসিক অনুকম্পা প্রকাশ করবার আগে একথাটা মনে রাখা ভাল যে, সে-যুগের সাহিত্যে সমসাময়িক চিন্তা-বিপ্লব যতটা রূপ পেয়েছিল, এযুগে আমরা তার কাছাকাছিও যেতে পারিনি। ডারউইনের বিবর্তনবাদের যতখানি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিগত শতাব্দীর সাহিত্যে, সমসাময়িক বিজ্ঞান-দৃষ্টি কি তার অনুরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পেরেছে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রনীতিতে, সমাজবিধিতে ও অর্থনীতিক্ষেত্রে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, তার কতটা চিহ্ন রইল আমাদের সাহিত্যে? আজও চিরন্তন সাহিত্য-রূপ (Literary Types) আর চিরাভ্যস্ত ভঙ্গিকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছি আমরা। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। আধুনিক মনস্তত্ত্বের সাহায্যে উপন্যাসে নূতন ধারা প্রবর্তন করবার প্রয়াস আমরা দেখেছি ডরোথি রিচার্ডসন, ভার্জিনিয়া উলফ ও জেমস জয়েসের রচনায়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের বৃহত্তর অংশ যে আজও এযুগের চিন্তাধারার পেছনে পড়ে রয়েছে।

এখানেই সমালোচকের সত্যকারের কর্মক্ষেত্র। আধুনিক সাহিত্য আজও গড়ে ওঠে নি। গড়ে উঠবার জন্য চাই প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতিকে রূপ দেবার দায়িত্ব নিতে হবে সমালোচকদের। মানব-জীবনের সর্বকালীন সত্যের সঙ্গে এযুগের বিশিষ্ট চিন্তাধারার কি করে সংহতি হতে পারে, সেকথা ভাবতে হবে সমালোচকদের।

যে অদম্য আত্মপ্রত্যয়, যে কঠোর নিষ্ঠা নিয়ে নববিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে নূতন থেকে নূতনতর সত্যের পথে, সাহিত্য যাতে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সমালোচনার নূতন ধারা গড়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞানের বহুবিচিত্র তথ্য ও বহুমুখী আবিষ্কারকে সংহত করে তার ভিত্তিতে জীবন-সত্যকে উপলব্ধি-গোচর করবার দায়িত্ব অবশ্য দার্শনিকের। কিন্তু অনুভূতির ভেতর দিয়ে সেই সত্যকে উপলব্ধি করা, রস-সংবেদনের ভেতর দিয়ে সেই সত্যকে হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত করা—এ শুধু সাহিত্যই পারে। ভাবী সাহিত্যিকদের আজ এ পথের নির্দেশ দিতে হবে সমালোচকদের। সমালোচকেরা এতদিন মুখ্যত অতীতের দিকেই তাকিয়ে এসেছেন, কিন্তু এখন তাঁদের তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। অতীত ও অনাগতের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করতে হবে তাঁদের। এ-দায়িত্ব খুবই কঠোর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যের প্রাণধারাকে অবাধগতিতে প্রবাহিত রাখতে হলে এ দায়িত্ব সমালোচকদের নিতেই হবে। বৈজ্ঞানিকের বস্তুনিষ্ঠা, দার্শনিকের চিন্তাপ্রখরতা ও শিল্পীর রসানুভূতি—এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে নূতন যুগের সমালোচনা।

# সতীশ মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশনিষ্ঠা

লেখক—আপনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর তাঁর 'ডন সোসাইটি' সম্বন্ধে মাঝে মাঝে দু-এক কথা বলেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলবেন?

সরকার—সতীশ মুখোপাধ্যায় এখনও বেঁচে আছেন। কাশীতে থাকেন। মাস কয়েক হ'ল তাঁর সঙ্গে আমার কাশীতে দেখা হয়েছে। তাঁকে সার্বজনিক কাজকর্মে বোধ হয়, ১৯২১—২২ সালের গান্ধী যুগের পর কেউ বড় একটা দেখেনি, আজকাল তিনি প্রকারান্তরে "সত্যি সত্যিই কাশীবাসী।"

লেখক—ওঁর বয়স কত?

সরকার—বোধ হয় আশীর কাছাকাছি। সতীশবাবু, বিবেকানন্দ, ব্রজেন শীল ইত্যাদি মনীষীদের প্রায় সমান বয়সের লোক। এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বও তাঁর ছিল।

লেখক—আপনি তাঁকে প্রথম দেখেন কখন?

সরকার—১৯০২ সনে। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্র। সেই হিসাবে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের বাসিন্দা। একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে যাওয়া-আসা করতে দেখতুম। তখন বোধ হয় তাঁর বয়স বছর চল্লিশেক। শুনলাম তাঁর কারবার হচ্ছে ইস্কুল-কলেজের ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা।

লেখক—ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করার মানে কী?

সরকার—প্রথম প্রথম এই কথার মানে আমি বুঝেছিলাম কি না সন্দেহ। খবর পেয়েছিলাম তিনি হাইকোর্টের উকীল। কিন্তু উকিলি করেন না। উকিল হয়ে উকিলি ছেড়ে দেওয়া আমার অভিজ্ঞতায় একটা জবরদস্ত নতুন তত্ত্ব মনে হয়েছিল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ছাত্রদেরকে বাড়ীতে, মেসে, হোস্টেলে গিয়ে পড়ানো? তাই বা কী? শুনলাম—কাউকে ইংরেজিতে রচনা লিখতে সাহায্য করতেন। অবশ্য এটা বুঝতে কঠিন লাগেনি। কার সঙ্গে আবার দেশের কথা সম্বন্ধে তাঁর আলাপ হ'তো। ১৯০২ সনে 'দেশের কথা' জিনিসটা আমার কাছে অতি নতুন ঠেকেছিল।

লেখক—কেন? 'দেশের কথাটায় নূতনত্ব কী আছে?

সরকার—এই ত মজা। দেশ, দেশের কথা, স্বদেশ সেবা, দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি শব্দ আমি আগে কখনো শুনিনি। শুনলাম সতীশবাবুর সম্পর্কে। সুরেন ব্যানার্জ্জির বক্তৃতাও শুনেছিলাম। কিন্তু তবুও কংগ্রেসটাকে স্বদেশ সেবার কারখানা বলে মনে হয়নি। বস্তুত স্বদেশ-সেবা শব্দটা যেন শুনিনি। 'দেশ' আর 'স্বার্থ ত্যাগ' এই দুটো পারিভাষিক আমি সতীশবাবুর আবহাওয়ায় দখল করে নিলাম। স্বদেশনিষ্ঠা আর স্বার্থ ত্যাগ জীবন-দর্শনে ঠাঁই পেয়ে গেলাম। শুনলাম লোকটা টাকা রোজগার করে না। পারে ত গরীব ছেলেদের সাহায্যও করে। এই সেবা স্বার্থ ত্যাগের দুই দফা। স্বার্থ ত্যাগ শব্দ তাঁর মুখে বেরুতো অহরহ। তারপর শুনা গেল তিনি অবিবাহিত। বিয়ে না করাটাও আমার মাথায় একটা প্রকাণ্ড নতুন জিনিস মালুম হয়েছিল। স্বার্থ ত্যাগের তৃতীয় দফা হিসাবে এটা আমার মগজে ঘর করে বসল।

কিন্তু সতীশবাবুকে সন্ন্যাসী, ফকীর বা সাধু তা কল্পনা করব কী করে? লোকটা হাই-কোর্টের উকিল। জামা-জুতা, কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, স্মিথ-পেন্সার-শেক্সপীয়ার কার্লাইল ইত্যাদিতে তাঁর সঙ্গে অন্য কোন লিখিয়ে-পড়িয়ে বাঙালীর ফারাক কোথায়? সতীশবাবুকে মনে হ'ত যেন স্বার্থত্যাগী গৃহস্থ মাত্র।

সতীশবাবুর মজলিসে শুনতাম্ তাঁরই মুখে বিবেকানন্দ-কথা। ১৮৯৬—৯৭ সনের বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সতীশবাবু বলতেন—"বিবেকানন্দের বক্তৃতা সম্বন্ধে আমেরিকা হ'তে খবর আসতো। আর সে সব আমি যেখানে সেখানে বন্ধুবর্গের ভেতর পড়ে শুনাতাম।

লেখক—সেই সময়ে সতীশবাবুর কোনো বই আপনি পড়েছিলেন?

সরকার—১৯০২ সনে আমি সতীশবাবুর লেখা কোন বইয়ের খবর পাইনি। বস্তুতঃ আজ পর্যন্ত তিনি কোন বইয়ের গ্রন্থকার কি না জানি না।

তাহলে সে যুগে তাঁকে দেশের লোকেরা জানতো কী করে?

সরকার—শুনেছিলাম তিনি কেশবলী আর 'অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখতেন। তাঁর লেখাগুলো প্রায়ই বেনামী। সম্পাদকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ ইত্যাদি সম্পাদক ও রাষ্ট্রনেতারা তাঁর বন্ধুবর্গের অন্তর্গত ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর নিজের এক কাগজ ছিল, সেটা মাসিক। ইংরেজীতে প্রকাশিত হ'তো। নাম 'ডন'।

লেখক—'ডন' পত্রিকায় কী রকম লেখা বেরুত?

সরকার—১৯০২ সনে আমি 'ডন' প্রথম দেখি। তাতে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের একটা লেখা ছিল কার্লাইল সম্বন্ধে। প্রবন্ধটা ইউনিভার্সিটি ইন্সটি-টিউটে পড়া হয়েছিল। তখনও বোধ হয় 'ডন' সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় ছিল পত্রিকার প্রধানতম আলোচ্য বস্তু। বোধ হয় ১৮৯৩ সনে পত্রিকাটা প্রতিষ্ঠিত।

লেখক—এইবার ডন সোসাইটি সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—সতীশবাবু ১৯০২ সনের শেষ দিকে "ডন" পত্রিকার নামে একটি সংস্কৃতি শিক্ষালয় কায়েম করেন। তার নাম "ডন সোসাইটি"। প্রতিষ্ঠার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। মেট্রো-পলিটান ইনস্টিটিউশনের (এ কালের বিদ্যাসাগর কলেজের) দোতলায় সর্বজনীন সভা ডাকা হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন জজ গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়। কলেজের প্রিন্সিপাল নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে সতীশবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি 'ইন্ডিয়ান নেশন' নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করতেন।

লেখক—কী কী বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল?

সরকার—জাতীয় স্বার্থ সমূহের বিশ্লেষণ ছিল আসল কথা। ব্যক্তির চেয়ে জাতি বড় এই ছিল মন্দা কথা। পরিবারের চেয়েও দেশ বড় এই মন্তরই প্রচারিত হ'ত নানা আকারে। কোনদিন স্পেন্সারের বাণী, কোনদিন মিলের রয়েৎ, কোনদিন কার্লাইলের নুকোনি। কিন্তু যাই আলোচিত হ'ক না কেন—ডাইনে বাঁয়ে পাঁয়তারা করতে করতে সতীশবাবু এসে দাঁড়াতেন তাঁর স্বদেশনিষ্ঠায়। প্রত্যেক দিনই মুরোকিরে এসে হাজির হ'তাম স্বার্থ ত্যাগের দর্শনে। বুঝতে পারতাম—বিবেকানন্দ-বাণীর নবদ্যো ক্ষ্যাপামির জ্যান্ত প্রতিমূর্তি সতীশ মুখোপাধ্যায়। সতীশবাবুর আবহাওয়ায় পড়ে ছিলাম বলে জীবন ধন্য হয়েছে।

লেখক—ডন সোসাইটির সভ্যদের ভেতর আজ-কাল কে কোথায় কী করছেন বলতে পারেন?

সরকার—ডন সোসাইটি চলেছিল ১৯০২ হ'তে ১৯০৬ পর্যন্ত। ১৯০৫—০৬ সনে বঙ্গ-বিপ্লব শুরু হয়। সেই বঙ্গ বিপ্লবের অন্যতম [illegible] শক্তি ছিল ডন সোসাইটির চিন্তা ও কর্মরাশি। [illegible] আমি [illegible] সতীশ [illegible]। ১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কায়েম হয়। ডন সোসাইটির সতীশবাবু [illegible] এই শিক্ষা পরিষদের প্রধানতম মুরুব্বি কর্মকর্তা ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ডন সোসাইটির কাজ শেষ হয়ে যায়। পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হল আর ডন সোসাইটির [illegible] বলা যেতে পারে যে, সোসাইটি চলেছিল প্রায় সাড়ে তিন বা চার বৎসর। এই [illegible] শ দুয়েক যুবা সতীশবাবুর স্বদেশনিষ্ঠা ও স্বার্থ ত্যাগের বাণী শুনেছে।

লেখক—এই শ দুয়েকের কয়েকজনের নাম করতে পারেন?

সরকার—লেখক হিসাবে সবচেয়ে বড় ছিলেন হারাণচন্দ্র চাকলাদার। তিনি শেষ বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক হন। [illegible] হিসাবে পরবর্তী [illegible] ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। [illegible] হচ্ছেন সাহিত্যসেবী রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। তিনি রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল [illegible] কিশোরীমোহন গুপ্ত [illegible] ইনিও বেশ কিছু ওয়াকিবহাল। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের সঙ্গে মেলামেশার চালচলো ভাব। তিনি সতীশবাবু ও ডন সোসাইটি সম্বন্ধে খানিকটা লিখেছিলেন। তা আমি 'আর্থিক উন্নতিতে' উদ্ধৃতও করেছি। এ কালের সরকারী সচিব সত্যেন্দ্রকুমার বসুও ডন সোসাইটিতে সতীশবাবুর চেলা। বিহারের [illegible] নায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদও আমাদের গুরুভাই।

লেখক—বাঙলা দেশে আর কার নাম [illegible] পড়ছে না?

সরকার—মফঃস্বলে ও কলকাতার উকীল ডাক্তার, অধ্যাপক, ইস্কুল মাস্টার, ব্যবসাদার কেরানী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের ভেতর অনেকে ছেলেবেলায় ডন সোসাইটিতে ঢুঁ মেরে [illegible] সতীশবাবুর বাগানে বিচালি খেয়ে যুবক বাঙলার বহুসংখ্যক ছোকরা মানুষ হয়েছে। আগেই বলেছি,

বোধ হয়, শ' দু-তিনেক ছোকরা দু-চার-দশ সপ্তাহ অথবা বছর দু-তিন-চার সতীশবাবুর সাকরেতি করেছে। সতীশ মণ্ডলের দৌলতেই অনেকে স্বদেশ-সেবক হতে পেরেছে।

লেখক—আপনি বলছেন, সতীশবাবুর সাক্‌রেতেরা অনেকে স্বদেশ-সেবক হতে পেরেছে। তা হ'লে তারা কি স্বদেশ-সেবার কর্মকৌশল শিখ্‌বার উদ্দেশ্যে ডন সোসাইটিতে নাম লেখায় নি?

সরকার—কে বল্‌তে পারে? পরবর্তী জীবনে কেউ কেউ স্বদেশসেবক হয়েছে। ১৯০৫—০৬ সনের বঙ্গ বিপ্লব ডন সোসাইটির সভ্যদের উৎসাহে ও কর্মদক্ষতায় বেশ কিছু পুষ্ট হতে পেরেছে। কলকাতায় ও মফঃস্বলের স্বদেশী আন্দোলনের সফলতার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সতীশবাবুর চেলারাই দায়ী। আজ ১৯৪২ সনে বাঙলা দেশের জেলায় জেলায় নানা কর্মক্ষেত্রে নানা কর্মবীর মোতায়েন রয়েছে। তাদের কেহ কেহ ডন সোসাইটিতে আমাদের সুহৃদই ছিল। ডন সোসাইটিতে স্বদেশ-সেবার শিক্ষা পেয়েছিল সকলেই।

* * * *

লেখক—সতীশ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন কারা? তাঁর ডন সোসাইটির মুরুব্বিস্থানীয় অথবা সাহায্যকারী কে কে ছিলেন? তাঁর কাজে সহযোগিতা করেন কোন্ কোন্ মনীষী বা স্বদেশ সেবক?

সরকার—সতীশবাবুর বন্ধুবর্গ ছিল অসীম। হাইকোর্টের কোনো উকিল বা জজ তাঁর অচেনা ছিল না। ডাক্তার বন্ধুও ছিল বহুসংখ্যক। কলেজের অধ্যাপকদের ভেতর তাঁর সঙ্গে আনাগোনা ছিল না কার জানি না। সংবাদপত্রসেবীদের দলে তাঁর গতিবিধি ছিল ঘন ঘন। রাষ্ট্রিক জননায়কদের সঙ্গেও মাখামাখি ছিল তাঁর গভীর। মনে হ'ত যে, তাঁর অচেনা কেউ নয়, আর তাঁকে চিন্‌তে না এমনও কেহ নাই। ১৯০৫—০৬ সালেই এই অবস্থা। তার পরবর্তী যুগের বন্ধুসংখ্যা তো আরও বিশাল। তাঁর বন্ধুদের কাজকর্ম আমাদের সুপরিচিত ছিল। অনেকের সঙ্গে আলাপও ছিল।

লেখক—কেন? ১৯০৫এর পরবর্তী কালের সতীশবাবুর বন্ধুবর্গ সম্বন্ধে একথা বলছে কি বুঝায়? এই সময়ের বিশেষত্ব কী?

সরকার—১৯০৫এর আগষ্ট মাসে বিলাতী বয়কট চালু হ'ল কলকাতায়। তারপর হ'তে দেশ-শুদ্ধ হৈ-হৈ, রৈ-রৈ। তখন কে যে কাকে চেনে আর কে যে কাকে চেনে না ঠাওরাবার সাধ্য কার? দিন নাই, রাত নাই—চব্বিশ ঘণ্টা লোকের ভিড় সতীশবাবুর ঘরে। শুধু কি কলকাতার লোকই আসত? কোথায় চাটগাঁ-কুমিল্লা, কোথায় আসাম, কোথায় বরিশাল-ময়মনসিংহ, কোথায় মেদিনীপুর-বীরভূম, কোথায় দিনাজপুর-বগুড়া, কেউ যাবে জাপানে আমেরিকায় ছুটেন সতীশবাবুর কাছে। কেউ বসাবে স্বদেশীর কল, ছুটে সতীশবাবুর কাছে। কেউ করবে বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট, ছুটেন সতীশবাবুর কাছে। যত রাজ্যের ছোঁড়া বুড়ো, সব এসে হাজির হ'ত সতীশবাবুর নিকট হদিশ নিতে।

লেখক—১৯০৫—০৬ সনের যুগে কলকাতায় আর মফঃস্বলের আবহাওয়ায় বাস্তবিক একটা চাঞ্চল্য ও অশান্তি দেখা যেত কি?

সরকার—তাও বল্‌তে হবে? সে এক অপূর্ব ঘটনা। ঐ অভিজ্ঞতা জীবনে আর দ্বিতীয়বার হয় না। গোটা বাঙলা জগত ১৯০৫ সনে মাতাল হয়ে পড়েছিল সেই বিদেশীবর্জনবাঞ্ছিত এক বন্যা ক্ষ্যাপামিতে। বুঝবি কাকে বলে আন্দোলন? কেবল ছুটোছুটি, হন্দদ চলাফেরা, হালেশা দৌড় ঝাঁপ। বাঙালীর স্বদেশ-আত্মা কেটে চিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে এল। কোথা থেকে এল কে জানে? কোথায় যাবে কে জানে? বাঙলার নরনারী চলতে শুরু করল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'। দেশশুদ্ধ লোক "জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল-পারা।" সবাই দাবী করত অপর সবাকার সবারের উপর, মেহনতের উপর। কাজেই ১৯০৫এর পরবর্তী সতীশবাবুর জীবনে ঘর আর পর ফারাক করা সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য মামুলি হিসাবের ঘর তো সতীশবাবুর কোনো দিনই ছিল না।*

---

*"বিনয় সরকারের বৈঠকে" হইতে উদ্ধৃত।

**ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ** (প্রথম খণ্ড)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—চার টাকা আট আনা। সাইজ—ডবল ক্রাউন, পৃষ্ঠা সংখ্যা—২০৮।

ভারতের রাজনৈতিক জাগরণে শিক্ষিত বাঙালী, এদেশের সাময়িক সাহিত্যের মারফৎ যে সকল অবদান সম্পর্কিত [illegible] এবং আলোচনা বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে [illegible] করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা খুবই উপকৃত হইয়াছি। প্রবন্ধ [illegible] 'অমৃতবাজার পত্রিকার' [illegible] হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্র হইতে সংকলন [illegible] জাতির সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। এদেশেও এরূপ গ্রন্থ নূতন নয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্তের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হইতে সংকলিত Selection from writings of Harish Chandra Mukherjee এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [illegible] এই সংগ্রহ কেবল ঐতিহাসিক দিক হইতেই [illegible] অর্জন করিবে, ইহা নব-বাঙলার সমাজ এবং রাষ্ট্রজীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ কল্পনায় এই সংগ্রহ সরস এবং উপভোগ্য হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে পাঠক তৎকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার একটা পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। বাঙলার সাহিত্য সাধনার বিকাশ এবং রাজনীতিক জীবনের অভ্যুত্থানের মূলে এদেশের স্বদেশপ্রেমিক সাধকগণের সংগ্রাম এবং মনীষীদের চিন্তাশীলতার অবদান পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। [illegible] সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের [illegible] ইতিহাস রচনায় গ্রন্থখানি বিশেষভাবে সহায়তা করিবে। [illegible] বহুখানা [illegible] অনেক [illegible] পাইবেন। ছাপা এবং [illegible]।

**বাস্তুভিটা**—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২২।১ [illegible] হইতে পুস্তকালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য [illegible]।

বাঙলার পল্লীর প্রাণশক্তি [illegible] বিভূতিবাবুর লক্ষ্য করিয়া [illegible] আসিয়াছি। বাস্তুভিটায় তাঁহার সে শক্তি সর্বত্র [illegible] করিয়া [illegible] সম্প্রদায়ের যে সকল [illegible] দিয়াছে, [illegible] ভিত্তি করিয়া নাটকখানি লিখিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক [illegible] প্রচারের ফলে যে [illegible] হইতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাস্তুভিটার [illegible] বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] নিজেদের [illegible] রক্ত [illegible] ভাই ভাইকে কোলে টানিয়া লইয়াছে। বিভূতিবাবু বাঙলার এমন উদার [illegible] অন্তরের গভীর সংবেদনময় স্পর্শে এই গ্রন্থখানিতে আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাণধর্মে জীবন্ত এবং লেখা সরল সহজ এবং সাবলীল।

**দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন**—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকালয়, ২৯ রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য চার টাকা।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। পরাধীন ভারতে এইসব রাজার সামন্ততান্ত্রিক শাসনকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষপুটের আশ্রয়ে নিজেদের স্বেচ্ছাচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্বদা তৎপর ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলিতেও গণজাগরণের সূচনা হয়, গ্রন্থখানিতে তৎসম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ আলোচনা পাঠক সমাজের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করিবে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, মহীশূর, রাজকোট, লীম্বডি, ত্রিবাঙ্কুর, উদয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলনের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মে। রাজনৈতিক বিচারবোধ বিকাশের জন্য বাঙলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচারের প্রয়োজন রহিয়াছে। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সে অভাব দূরীকরণে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট সুন্দর।

**অভিবাদন**—শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র সম্পাদিত স্মরণপত্র। মূল্য ছয় আনা। কতকগুলি গদ্য পদ্য ও অনুবাদ রচনার সমষ্টি। অধিকাংশ রচনা গান্ধীজীর সম্পর্কে।

৭১।৪৮

**উত্তর কাল**—মাসিক পত্র। কার্যালয়—১৩-সি, ফর্ডাইস লেন, কলিকাতা। উত্তর কালের গান্ধী-স্মৃতি সংখ্যা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। গান্ধীজীর সম্বন্ধে রচনা প্রায় সব কয়টিই চিত্তস্পর্শী।

৬৭।৪৮

কাশ্মীর যুদ্ধের ছবি

চেনাব নদীর তীরে ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত স্যাপার্স ও মাইনার্সদিগকে কর্মরত দেখা যাইতেছে

উরি অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি : প্রবল তুষারপাতের মধ্যেও সৈন্যদের সতর্ক প্রহরা

**ইটালীর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল**

গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে ইটালীতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই নির্বাচনে বর্তমান প্রধান মন্ত্রী সিনর দ্য গ্যাস-পেরির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক দল কম্যুনিস্ট প্রধান পপুলার ফ্রন্টকে পরাজিত করে অপ্রত্যাশিত ধরণের বড় বিজয় লাভ করেছেন। ইউরোপের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশের দিক থেকে এই নির্বাচনের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল পরে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির প্রভাব-মুক্ত ইটালীতে এই সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন। শুধু তাই নয়—কিছুকাল পূর্বে ইটালীতে রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটেছে এবং ইটালী সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ নির্বাচনের গুরুত্ব আজ শুধু জাতীয় পটভূমিকাতেই নয়, এর পিছনে আছে একটা বিরাট আন্তর্জাতিক পটভূমিকা। তাই এ নির্বাচনের গতি বাইরের প্রভাবমুক্ত ছিল এমন কথা বলা চলে না। একাধারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সমান আগ্রহ এবং উদ্বেগ দেখেছি আমরা এ নির্বাচনে। এর কারণ কি? এর কারণ আবিষ্কার করতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ইটালীর গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থিতির দিকে, বিচার করে দেখতে হবে ইউরোপের বর্তমান রাজনীতি। ইটালীতে কম্যুনিস্ট দল বিজয়ী হবে, না দক্ষিণপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দল বিজয়ী হবে তা শুধু ইটালীর জনগণেরই বিচার্য ছিল না—সোভিয়েট পক্ষ থেকে এবং ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ থেকে এই বিচারকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল। সিনর পাগ্-লিয়ার্কি পরিচালিত কম্যুনিস্ট দল ও সিনর নেনি পরিচালিত উগ্র সোস্যালিস্ট দলের কোয়ালিশনে গঠিত বামপন্থী পপুলার ফ্রন্ট বিজয়ী হলে ইটালীর ভাগ্য গ্রথিত হয়ে যেত সোভিয়েট প্রভাবিত পূর্ব ইউরোপের স্লাভ ব্লকের সঙ্গে আর দক্ষিণপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দলের বিজয়ের ফলে ইটালীর রাজ-নৈতিক ভাগ্য এবার বিজড়িত হয়ে পড়ল ইঙ্গ-মার্কিন গণতন্ত্র প্রভাবিত পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে। সাধারণ নির্বাচনের বহু পূর্ব থেকেই ইটালীর বামপন্থী পপুলার ফ্রন্ট প্রচার করে আসছিল যে, নির্বাচনে তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ হয়ে উঠেছিল শংকিত; ইতালীতে কম্যুনিস্ট বিজয়ের অর্থই হতো সোভিয়েট পরিচালিত পূর্ব ইউরোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভৌগোলিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সোভিয়েট নৌশক্তির প্রসার, পশ্চিমে ফ্রান্স পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের উপর কম্যুনিজমের প্রভাব বৃদ্ধি এবং দক্ষিণে আফ্রিকাস্থিত ইতালীর পূর্ব সাম্রাজ্যের উপর তার তীব্র প্রতিক্রিয়া। এই সব বিবেচনা করে পশ্চিম ইউরোপের গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ইতালীর নির্বাচন সম্বন্ধে নির্বিকারত্ব বজায় রাখতে পারেনি। একাধারে ভীতিপ্রদর্শন ও উৎকোচ প্রদানের দ্বারা তারা সিনর দ্য গ্যাসপেরির দলকে ভোটদানে ইতালীর জনগণকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে। ভীতিপ্রদর্শনের প্রথম প্রয়াস আমরা দেখেছিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদপ্তরের মুখপাত্র মিঃ ম্যাককারসটের একটি উক্তিতে। নির্বাচনের বেশ কিছু দিন পূর্বেই তিনি ইতালীয় জনগণের উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে, কম্যুনিস্টরা নির্বাচনে বিজয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে ইতালীর আর কোন সাহায্য পাবার প্রশ্নই ওঠে না। ভীতিপ্রদর্শনের পরে নির্বাচনের প্রায় মুখে মুখে এল উৎকোচ প্রদানের ঘোষণা। বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একযোগে ঘোষণা করল যে, তারা তাদের শাসিত ট্রিয়েস্তেকে ইতালীয় শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত করেছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ইতি-মধ্যে কাজও শুরু হয়ে গেছে। ট্রিয়েস্তেকে ইতালীর মধ্যে দিয়ে দেবার সম্বন্ধে জাতীয়তা-বাদী ইতালীয়দের মধ্যে রীতিমত আগ্রহাধিক্য আছে। এই সব চালে সোভিয়েট রাশিয়া অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। তবে সেও তার সাধ্যানুসারে ইতালীয় জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে কম্যুনিস্ট নেতা সিনর পাগ্লিয়ার্কির সমর্থনে। নির্বাচনের মুখে সোভিয়েট রাশিয়া ইতালীর নৌবহর সম্বন্ধে তার দাবী ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করেছিল। বহির্জগতে এই ধরণের পরস্পরবিরোধী প্রভাবের মধ্যে ইতালীর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিনর দ্য গ্যাসপেরির নিঃসংশয় বিজয়ের ফলে আপাততঃ ইটালী সম্বন্ধে সকল শংকা ও সন্দেহের অবসান হল।

নির্বাচনে উভয় পক্ষের পরস্পরবিরোধী তোড়জোড়ের অভাব না থাকলেও অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই নির্বাচনকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। কম্যুনিস্টরা বরাবর বলে এসেছে যে তারা বিজয়ী হোক আর পরাজিতই হোক তারা নির্বাচনমণ্ডলীর অনুজ্ঞা শান্তচিত্তে মেনে নেবে। নির্বাচনে সিনর দ্য গ্যাসপেরির গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বলপ্রয়োগ বা অন্য কোন প্রকার দুর্নীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে এরূপ কোন অভিযোগও এতদিন কম্যুনিস্টদের মুখ থেকে শোনা যায়নি। তাদের পরাজয়ের সংবাদ ঘোষিত হবার পর তারা কিন্তু অন্য কথা বলতে শুরু করেছে। তারা দ্য গ্যাসপেরির গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ এনে বলেছে যে, সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি সোভিয়েট পক্ষ থেকেও ইটালীয় কম্যুনিস্টদের সমর্থনে ঘটা করে এই সংবাদই প্রচারিত হচ্ছে। এতে আমরা বিস্মিত হইনি। এই হল সর্বদেশের এবং সর্বকালের কম্যুনিস্ট কার্যক্রম। নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় হেরে গেলে কম্যুনিস্টরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই ধরণের দুর্নীতির অভিযোগই এনে থাকে।

ইটালীর সাধারণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র অনুসারে বর্তমানে দুটি ব্যবস্থা পরিষদ আছে। উর্ধতন ব্যবস্থা পরিষদের নাম হল সেনেট এবং নিম্নতম ব্যবস্থা পরিষদটি হল প্রতিনিধি পরিষদ। সেনেটের মোট সদস্য-সংখ্যা হল ৩৪৩ জন এবং প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫৭৪ জন। সেনেটের ৩৪৩ জন সদস্যের মধ্যে ১০৬ জনকে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁরা যুদ্ধকালে ফ্যাসিস্টবিরোধী কার্যকলাপের পুরস্কার হিসাবে আপনাআপনি এপদাধিকার অর্জন করবেন। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ২১ বৎসর বয়স্ক বা তদূর্ধ্ব বয়সের নরনারী প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। এই হিসাবে দুই কোটি ৪৯ লক্ষ নরনারীর ভোট দেবার কথা ছিল। সেনেটের নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার আছে পঁচিশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের নরনারীর। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। এরা সবাই যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল এমন নয়। তবে ভোট উপলক্ষে ইটালীর জাতীয় জীবনে অপূর্ব সাড়া জেগেছিল এবং শতকরা ৭০ জনের অধিক ভোটদাতা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আর একটা বিষয় থেকেও এই নির্বাচন জাতীয় উৎসাহের কিছুটা পরিমাপ পাওয়া যায়। এই নির্বাচনে মোট ৩৫৬টি রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে পদপ্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছিল। অবশ্য এই ৩৫৬টি দলের মধ্যে ১২টি দল মাত্র উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে আবার বিশেষ গুরুত্ব ছিল মাত্র চারটি দলের—সিনর দ্য গ্যাসপেরির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দল, সিনর সারাগাট ও লোম্বার্ডো পরিচালিত দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট ইউনিটি দল, সিনর পাগ্লিয়ার্কির কম্যুনিস্ট দল ও সিনর নেনি পরিচালিত বামপন্থী সোস্যালিস্ট দল। বারোটি রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে প্রতিনিধি পরিষদের ৫৭৪ জন সদস্যের জন্যে ৫৬১৪ জন পদপ্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছিল আর সেনেটের ২৩৭ জন সদস্যের জন্যে পদ-প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১১২৪ জন।

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নিম্নতম প্রতিনিধি পরিষদের সিনর দ্য গ্যাসপেরির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দল

অন্য দল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ৫৭৪ জন সদস্যের পরিষদে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দলের সংখ্যা শক্তি হল ৩০৭ জন। কিন্তু সেনেটে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অন্য দল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের নেই। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে তাদের মোট সংখ্যা শক্তি হল ১৪৮ জন। পপুলার ফ্রন্টের সংখ্যা শক্তি ১২৫ জন। ইটালীর বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেটে প্রায় সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট বলে সেনেটে কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে অন্য কোন দক্ষিণপন্থী দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করে অন্য দল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে সিনর দ্য গ্যাসপেরির পক্ষে স্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা সম্ভব হবে না। আর উর্ধ্বতন পরিষদে যাদের সঙ্গে কোয়ালিশন করা হবে, নিম্নতন প্রতিনিধি পরিষদেও হয়তো তাদের সঙ্গেই কোয়ালিশন করা হবে অবশ্যম্ভাবী। সিনর দ্য গ্যাসপেরি অবশ্য ইতিমধ্যেই একটা কম্যুনিস্ট বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের জন্যে সকল দক্ষিণপন্থী দলের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন। ইটালীর নতুন গভর্নমেণ্ট কি রূপ নেবে মে মাসের গোড়াতে নতুন প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেটের অধিবেশন আরম্ভ হলেই তা জানা যাবে বলে মনে হয়। তবে সিনর দ্য গ্যাসপেরির বিজয়ে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতই আনন্দিত হয়ে থাকুক, এ বিজয় যে ইটালীর দক্ষিণপন্থীদের গুরুদায়িত্বের সম্মুখীন করেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কম্যুনিস্টরা মাইনরিটি হলেও তাদের শক্তি নগণ্য নয়। ইটালীর প্রতি তিনজন নরনারীর মধ্যে একজন কম্যুনিস্টদের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ভূমিহীন কৃষক সমাজ ও শ্রমিক সমাজের উপর কম্যুনিস্টদের ব্যাপক প্রভাব অনস্বীকার্য। ইটালীতে বর্তমানে যে ব্যাপক দারিদ্র্য বেকার সমস্যা ও ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যা আছে সিনর দ্য গ্যাসপেরির গভর্নমেণ্ট বৈপ্লবিক কার্যক্রমের দ্বারা তার আংশিক সমাধানও যদি না করতে পারেন, তবে ইটালীতে কম্যুনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি পাবেই এবং তার ফলে ইটালীর রাজনৈতিক জীবনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হওয়াও বিস্ময়কর নয়। সিনর দ্য গ্যাসপেরির কার্যক্রমই শুধু ইটালীকে এ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

### প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইশেক

গত ১৯শে এপ্রিলের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মার্শাল চিয়াং কাইশেক চীনের নব সংগঠিত জাতীয় পরিষদ কর্তৃক চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জুডিসিয়াল ইয়ুয়ানের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ চু চেং। চিয়াং কাইশেকের পক্ষে ভোটের সংখ্যা হয়েছে ২৪৩০ আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে ভোটের সংখ্যা হয়েছে মাত্র ২৬৯। এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ দেখা দিয়েছিল কয়েকদিন পূর্বে যখন চিয়াং কাইশেক ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হবেন না। তিনি গণতান্ত্রিক চীনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হবেন না, প্রথম প্রধান মন্ত্রী হবেন ইতিপূর্বে তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলেছিল। কিন্তু তাঁর এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত সবাইকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কুওমিণ্টাং পার্টির নির্দেশ মেনে নিয়ে তাঁকে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হতে হয়েছিল এবং তিনি নির্বাচিতও হয়েছেন। তবে তাঁর এই প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণের সঙ্গে একটি সর্ত বিজড়িত আছে। সেটা হল এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ভূতপূর্ব চৈনিক রাষ্ট্র দূত ডাঃ হু শি কে তাঁর প্রধান মন্ত্রীরূপে নির্বাচিত করতে হবে।

চিয়াং কাইশেকের প্রেসিডেণ্ট পদগ্রহণে চীনে দীর্ঘকালীন একদলীয় শাসনের অবসান ঘটল। এতদিন পর্যন্ত চীনে গণতন্ত্র ছিল না —ছিল কার্যত একটি দলের ডিক্টেটরসিপ। সে দল হল চিয়াং কাইশেকের কুওমিণ্টাং দল এবং চিয়াংই ছিলেন সে দলের সর্বময় কর্তা। চীন সাধারণতন্ত্রের জনক ডাঃ সুন ইয়াৎ সেন চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থারূপে যে শিক্ষানবিশীর সময়ের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এতদিনে সেই শিক্ষানবিশীর সমাপ্তি ঘটল। অবশ্য এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শিক্ষানবিশীর সময়টা এত দীর্ঘ হয়েছে যে, সেটা বাঞ্ছনীয় ছিল না কিংবা সেটা ডাঃ সুন ইয়াৎ সেনের অভিপ্রেতও ছিল না। দ্বিতীয়ত আর একটা প্রশ্নও আছে। ডাঃ সুন ইয়াৎ সেন চীনকে যে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন চিয়াং-এর প্রদত্ত জাতীয় শাসনতন্ত্র চীনে সেই গণতন্ত্র আনবে কি না গভীর সন্দেহের বিষয়। এ সব ত্রুটি বিচ্যুতির অধিকাংশ দায়িত্ব অবশ্য এসে পড়ে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাইশেকের একরোখা এবং একচোখো নীতির উপর। তবে চিয়াং-এর তরফ থেকেও কিছু বলবার আছে বৈ কি। ডাঃ সুন ইয়াৎ সেন বেঁচে থাকলে চীনের রাষ্ট্রনীতি কি রূপ নিত বলা যায় না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ফলে চীনের জাতীয় জীবনের উপর দিয়ে একটা বিরাট দুর্দৈবের ঝড় বয়ে চলেছে বলা চলে। তারই মধ্য দিয়ে চিয়াং কাইশেককে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে মহাচীনকে। কুওমিণ্টাং এবং কম্যুনিস্টদের মধ্যে যে বিরোধ চলে এসেছে তা দীর্ঘস্থায়ী এবং বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। তবে যুদ্ধ শেষে পরিবর্তিত ঘটনাপুঞ্জের চাপে পড়ে এবং বিশেষ করে মার্কিন পরামর্শদাতাদের নির্দেশে চিয়াং কাইশেক একাধিকবার কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপোষ করার চেষ্টা করেছেন। দুঃখের বিষয় সে চেষ্টা সফল হয়নি। কুওমিণ্টাং-এর প্রতিনিধি চিয়াং কাইশেক এবং কম্যুনিস্ট চীনের প্রতিনিধি মাও সে তুংএর মধ্যে দীর্ঘ আপোষ আলোচনার পর ১৯৪৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে চুংকিং থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ায় মীমাংসার আশা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সে যুদ্ধ বিরতির সর্ত যথাযথ প্রতিপালিত হয়নি। তবু ভাবী শাসনতন্ত্র ও জাতীয় গভর্নমেণ্টের গঠন সম্বন্ধে ৩১শে জানুয়ারী তারিখে সর্বদলীয় একটা চুক্তি প্রকাশিত হওয়ায় জনমানসে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার পরিস্থিতির দরুণ ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকেই আবার নতুন করে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। কম্যুনিস্টরা যথারীতি চীনের উত্তর-পূর্ব প্রদেশগুলির উপর নিজেদের শাসন কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রেখে চলেছিল এবং চিয়াং গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বাধা দিচ্ছিল। মাঞ্চুরিয়ায় রুশ সৈন্যদলের ক্রমিক অবস্থিতিও আর একটা বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত রুশ-চীন চুক্তিতে স্থির হয়েছিল যে তিন মাসের মধ্যে রুশ সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করবে। সে সর্ত তারা মানে নি বরং খবর পাওয়া যাচ্ছিল যে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের নামে সোভিয়েট সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়া থেকে জাপানের কলকারখানা প্রভৃতি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থার মধ্যে নতুন করে কম্যুনিস্ট-কুওমিণ্টাং যুদ্ধের সূত্রপাত হল। আজও সমান তীব্রতার সঙ্গে সেই যুদ্ধ চলেছে।

এর পরেও কিছুকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রসচিব এবং তৎকালীন চীনস্থিত মার্কিন পরামর্শদাতা মিঃ মার্শালের মধ্যস্থতায় আপোষ-প্রয়াস চলেছিল। এই আলোচনায় এক পক্ষে চিয়াং কাইশেক ও অপর পক্ষে কম্যুনিস্ট প্রতিনিধি জেনারেল চু-এন লাই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এইরূপ দুর্বিপাক সত্ত্বেও যথাসময়ে চীনে নতুন গণতান্ত্রিক শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হল। কম্যুনিস্ট শাসিত চীন এর বাইরেই রয়ে গেছে। প্রথম প্রেসিডেণ্ট চিয়াং এর স্কন্ধে গুরুদায়িত্ব ভার এসে পড়ল বলে মনে হয়। তাঁকে হয় চীন থেকে কম্যুনিস্ট উপদ্রব উৎখাত করতে হবে নতুবা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে। তা নইলে চীনের গণতন্ত্র স্থায়ী হবে না। দ্বিতীয়তঃ মার্কিন ডলারের মোহ কাটিয়ে চীনকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা নইলে মার্কিন ডলারের প্রভাবে চীনের নবস্থাপিত গণতন্ত্র ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। এই দুটি কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে চিয়াং-এর প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণের কোন সার্থকতাই থাকবে না।

## ক্রিকেট

পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড মিঃ ডন ব্রাডম্যানের পরিচালনাধীনে ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে খেলিবার জন্য একটি ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। এই দল ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছে। এখনও পর্যন্ত কোন খেলায় যোগদান করে নাই। অথচ আশ্চর্য হইতে হয় এখন হইতেই ইংলণ্ডের বিভিন্ন সাংবাদিক ও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞগণ এই দলের বিষয়ে নানা প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন এই শক্তিশালী 'অস্ট্রেলিয়ান' দলের সহিত ইংলণ্ড কোন টেস্ট খেলায় জয়ী হইতে পারিবে না।" আবার কেহ বলিতেছেন "ইহারা দলের সহিত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছেন। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়গণ ভাল করিয়া খাইতে পান না—কিরূপে এই দলের সহিত পারিবে।" কেহ বলিতেছেন "অস্ট্রেলিয়ানরা কেবল খেলায় জয়লাভ করাটাই বিশেষ বড় বলিয়া মনে করেন—ঠিক খেলোয়াড় মনোবৃত্তি লইয়া খেলেন না।" কেহ বা বলিতেছেন "খেলা ভাল হইল কি না ইহারা দেখেন না যেনতেনপ্রকারেণ জয়ী হইলেই সুখী।" এই সকল উক্তি বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যানের মন বিচলিত করিয়াছে। তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিয়াছেন "আমরা খেলিতেই আসিয়াছি। ভাল খেলিতে পারিলেই সুখী হইব। আমাদের সঙ্গে প্রচুর খাদ্য আছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন আমরা উহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিব। কিন্তু আপনাদের জানাইয়া দিতে চাই এই দলের কোন খেলোয়াড় ঐ খাদ্য স্পর্শ করিবেন না। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়গণ যে খাদ্য খাইয়া খেলিবেন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়গণও তাহাই খাইবেন। যে খাদ্যসম্ভার আমাদের সহিত আসিয়াছে উহা ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে যাহাদের খুব প্রয়োজন আছে তাহাদের বিতরণ করা হইবে।"

অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক ডন ব্রাডম্যানের বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা খুবই প্রীত হইয়াছি। ইহার পর ইংলণ্ডের কোন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের বা সাংবাদিকের কোন মন্তব্য করিবার মত কিছু থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

যে দল ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে সত্যই খুব শক্তিশালী। ইংলণ্ডের পক্ষে কোন টেস্ট খেলায় জয়ী হওয়াও কঠিন। তবে আমাদের বিশ্বাস আছে ইংলণ্ড ইতিপূর্বেকার ভ্রমণের ন্যায় শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিবে না।

### ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ

আগামী শীতের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণ করিতে আসিবেন ইহা ঠিক হইয়া গিয়াছে। এমনকি কোন কোন স্থানে কোন কোন খেলায় যোগদান করিবেন তাহারও তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই দলের সহিত ভারতীয় দলের যে কয়েকটি টেস্ট ম্যাচ খেলা হইবে তাহাতে ভারতীয় দলের কে অধিনায়ক হইবেন ইহা এখনও ঠিক হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। সেইজন্য সম্প্রতি অমরনাথের একটি বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা একটু আশ্চর্যান্বিত হইলাম। অমরনাথ বলিয়াছেন "ভারতীয় দলের যে কেহ অধিনায়ক হউন না কেন আমি আমার সাধ্যমত ভারতীয় দলকে সাহায্য করিব।" অমরনাথ প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই, তবে হঠাৎ তাঁহার এইরূপ বিবৃতি প্রকাশের কি কারণ হইতে পারে আমরা কল্পনা করিতে পারিতেছি না। তবে মার্চেণ্ট অথবা মুস্তাক যদি দলের অধিনায়ক হইবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন খুবই সুখের বিষয় হইবে। ইহাদের সাহায্য ভারতীয় ক্রিকেট দল সকল সময়েই আশা করে বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা।

### টেনিস

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই ভারতীয় দল গ্রেট ব্রিটেন দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজয় বরণ করিয়াছে। এই ফলাফল দুঃখের সন্দেহ নাই, তবে আমাদের আশ্চর্য করে নাই। গত বৎসরের ডেভিস কাপের খেলায় ভারতীয় দল যেরূপ শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছিল এইবার তাহা করে নাই। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হইয়াছেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দিলীপ বসু ও সুমন্ত মিশ্র উভয়েই খেলায় অপূর্ব দক্ষতা ও উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ডাবলসের খেলায় ভারতীয় দল যেরূপ খেলিবে বলিয়া আমরা ধারণা করিয়াছিলাম সেইরূপ পারে নাই। এস এল আর সোহানী এককালে কৃতী ডাবলস খেলোয়াড় ছিলেন; কিন্তু বর্তমানে ইঁহার বয়স হইয়াছে। সেইজন্য খেলার সূচনায় যেরূপ তীব্রতার সহিত খেলিয়াছেন শেষের দিকে সেইরূপ পারেন নাই। ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার স্থলে যদি জিমি মেটাকে দলে নির্বাচিত করা হইত ফলাফল অন্যরূপ হইত বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। খেলোয়াড় নির্বাচন ঠিক হইলে ভারতীয় দল অনায়াসে গ্রেট ব্রিটেন দলকে পরাজিত করিতে পারিত। ভবিষ্যতে এই ত্রুটি পুনর্বার উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেন দলের বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

#### সিঙ্গলস

দিলীপ বসু (ভারতবর্ষ) ৬-৩, ৬-৩, ৬-২ গেমে হাউওয়ার্ড ওয়ালটনকে (গ্রেট ব্রিটেন) পরাজিত করেন। টনি মোট্রাম (গ্রেট ব্রিটেন) ৬-০, ৬-৩, ৭-৯, ৭-৫ গেমে সুমন্ত মিশ্রকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

টনি মোট্রাম (গ্রেট ব্রিটেন) ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ গেমে দিলীপ বসুকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

সুমন্ত মিশ্র (ভারতবর্ষ) ২-৬, ৮-৬, ৯-৭, ৬-২ গেমে হাউওয়ার্ড ওয়ালটনকে (গ্রেট ব্রিটেন) পরাজিত করেন।

#### ডাবলস

টনি মোট্রাম ও জি পেশ (গ্রেট ব্রিটেন) ৬-৩, ৭-৫, ৬-২ গেমে সুমন্ত মিশ্র ও এস এল আর সোহনীকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

### অলিম্পিক

লণ্ডনের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যে যাইবেন এইরূপ সংবাদ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ হইতে নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোসিয়েশনের একজন বিশিষ্ট সভ্য যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হয় প্রতিনিধিগণ যাইবেনই না। কিন্তু আমরা জনসাধারণকে সেইরূপ ধারণার বশবর্তী হইতে নিষেধ করি। কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি গত কয়েকদিন হইল কলিকাতায় বসিয়া নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ মৈনুল হক ভারতীয় প্রতিনিধিগণের প্রেরণ সম্পর্কে যাবতীয় ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন যে শুনিলে আশ্চর্য হইতে হইবে। ভারতীয় দলের জন্য যে রেশন লাগিবে তাহার খসড়াও তিনি শেষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারত হইতে মোট ৭০ জন যাইবেন। ইহার মধ্যে সাত জন ম্যানেজার আছেন। অর্থাৎ ফুটবল খেলোয়াড়, হকি খেলোয়াড়, ভারোত্তোলনকারী, এ্যাথলীট, মুষ্টিযোদ্ধা, সাঁতারু, কুস্তিগীর প্রভৃতি লইয়া মোট ৬৩ জন যাইবেন। কোন বিষয়ের কতজন যাইবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই সেইজন্য তিনি বলিতে পারেন না। মোট ৭০ জন যাইবেন এইরূপ ধারণা করিয়া তিনি অর্থ, খাদ্য, পোষাক প্রভৃতি জোগাড়ে ব্যাপৃত আছেন। অনুমতি প্রভৃতি লইয়া যে সকল গণ্ডগোল হইবে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই তাঁহার অভিমত। এইরূপ অবস্থায় ভারতীয় প্রতিনিধিগণ প্রেরিত হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ নাই।

#### হকি দল প্রেরণ

ভারতীয় হকি দল যে যাইবেনই ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য যে সকল ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা একরূপ স্থির হইয়াই গিয়াছে। কোন কোন খেলোয়াড় যাইবেন তাহা পরিচালকগণ প্রকাশ না করিলেও তাহাদের মনোভাব ও আলাপ আলোচনা হইতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। দল বেশ শক্তিশালীই হইবে ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

#### ফুটবল দল প্রেরণ

ফুটবল দল প্রেরণ সম্পর্কে খুব বেশী বাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ সম্পাদক নিজেই ফুটবল দল প্রেরণ বিষয়ে খুবই উৎসাহী। দল ভাল ফলাফল প্রদর্শন করিতে পারিবে না ইহা সম্প্রতি যাহারা মনোনীত খেলোয়াড়গণের খেলা দেখিয়াছেন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

#### সাঁতারু দল প্রেরণ

ভারতীয় সাঁতারু দল প্রেরণ ব্যবস্থা লইয়া যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা শেষ পর্যন্ত সফলকাম হইবেন এইরূপ ভরসা আমরা রাখি না। ইহাদের নিজেদের মধ্যেই বেশ কিছু দলাদলি বর্তমান আছে। কে দলের ম্যানেজার হইবেন এই সামান্য বিষয় লইয়াই বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ বেশ ব্যস্ত। বাঙলা না বোম্বাই, কোন প্রদেশ নিখিল ভারত অলিম্পিক ট্রায়াল সন্তরণ প্রতিযোগিতার ভার লইবে সেই সমস্যারই এখনও পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

#### এ্যাথলেটিক দল

ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে অধিকাংশ পাতিয়ালার এ্যাথলীট যাইবেন এই বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। এ সকল পাতিয়ালার প্রতিনিধি বিশ্ব অনুষ্ঠানে কিছুই করিতে পারিবেন না—অথচ যাইবার জন্য ভীষণ জিদ ধরিয়াছেন শুনিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। এই বিষয় ভারতের প্রতিনিধি হইয়া একমাত্র যাইতে পারেন মাদ্রাজের তরুণ এ্যাথলীট রেবেলো। ইহাকে দলের সহিত যাইতে দেখিলে সুখী হইব।

#### মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিনিধি

বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন শেষ পর্যন্ত মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিনিধিগণকে প্রেরণের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া খুবই আনন্দ হইয়াছে। প্রকৃতই ভারতের এমেচার মুষ্টিযোদ্ধাগণ উচ্চস্তরের নৈপুণ্যের অধিকারী। ইহারা মাত্র তিনজন প্রতিনিধি পাঠাইবেন। ট্রায়াল মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে এবং তাহার পর ভারতের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত করা হইবে।

## দেশী সংবাদ

১৯শে এপ্রিল—আজ কলিকাতায় ভারত-পাকিস্থান সম্মেলনের প্রতিনিধিগণের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীযুত কে সি নিয়োগী ভারতের পক্ষে এবং পাকিস্থান প্রতিনিধিবর্গের নেতা মিঃ গোলাম মহম্মদ পাকিস্থানের পক্ষ হইতে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। উভয় ডোমিনিয়নই এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠের ব্যাপক বাস্তুত্যাগ কোন ডোমিনিয়নেরই স্বার্থের অনুকূল নহে। উভয় ডোমিনিয়নই সংখ্যালঘিষ্ঠগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের বাস্তুত্যাগ রোধ ও বাস্তুত্যাগীদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই বিবিধ সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

জব্বলপুর শহর ও জেলায় প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৫ই এপ্রিল হইতে আজ পর্যন্ত ৭ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। জব্বলপুর শহরে প্লেগ আরম্ভের সময় হইতে এ পর্যন্ত ১১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বদেশী যুগে 'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গতকল্য তাঁহার বারাণসীস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল।

২০শে এপ্রিল—গত ১৭ই মার্চ হইতে এযাবৎ মধ্য কলিকাতার একটি অঞ্চলে ১১ জন লোককে প্লেগ রোগাক্রান্ত সন্দেহে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়; তন্মধ্যে এ পর্যন্ত ৩ জন মারা গিয়াছে। এই কারণে কলিকাতা কর্পোরেশন মধ্য কলিকাতার ঐ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে 'প্লেগ-রোগাক্রান্ত এলাকা' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কলিকাতা এবং শহরতলীতে কোন রাস্তা বা প্রকাশ্যস্থানে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনার গত ২৭শে মার্চ যে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

দেশ বিভাগের দরুণ যাতায়াতের কয়েকটি অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ভারত সরকার গঙ্গা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত বাঁধ দ্বারা কলিকাতা ও গঙ্গার মধ্যে সর্বঋতুতে সরাসরিভাবে যাতায়াতের জন্য একটি নৌপথ পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত উত্তর-পূর্ব ভারতে যে বহু অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে, তাহাও চাষযোগ্য হইবে। গঙ্গার বাঁধ পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি সার্ভে পার্টি নিযুক্ত হইয়াছে।

২১শে এপ্রিল—ভারত সরকারের শ্রম, শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আজ অপরাহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আণবিক শক্তি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা কার্য পরিচালনা করা উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের অনশন ধর্মঘটের তৃতীয় দিবসে গতকল্য ৯ জন অনশনকারী ছাত্রকে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, হায়দরাবাদ রাজ্যের ওসমানাবাদ জেলায় 'জেহাদ' আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ যে, সাতুর ও খোকীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহে রাজাকাররা ট্রেন থামাইয়া ক্রমাগত লুঠতরাজ করিতেছে এবং পুরুষ যাত্রীদিগকে হত্যা ও স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার করিতেছে।

২২শে এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন শেষ হইয়াছে। অদ্যকার অধিবেশনে কমিটি একটি শ্রমিক কমিটি গঠন করিয়াছে। শ্রমিকদের মধ্যে কিভাবে কাজ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কমিটি কংগ্রেসকে পরামর্শ দিবে। কমিটি কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সাব-কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্তভাবে আলোচনা করেন। কয়েকটি পরিবর্তন সাপেক্ষ উহা গ্রহণ করা হইয়াছে। নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে পূর্ব বাঙলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস কোন কাজ করিতে পারিবে না।

আজ মধ্যরাত্রি অবধি কলিকাতায় প্লেগ রোগাক্রান্ত সন্দেহে দশজন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২৩শে এপ্রিল—কলিকাতার সরকারী দপ্তরখানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নগরীতে প্লেগের আবির্ভাবে জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত না হইবার জন্য আবেদন জানান। ডাঃ রায় জানান যে, শুক্রবার (বক্তৃতার সময়) পর্যন্ত ২৭ জনকে প্লেগ রোগ সম্পর্কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়; তন্মধ্যে ২৪ জন প্লেগের রোগী ছিল—অপর তিনজন প্লেগের রোগী নহে। এই সকল রোগীর মধ্যে ৬।৭ জনের অবস্থা বেশ গুরুতর এবং অন্যান্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত মৃদু।

নয়াদিল্লীতে দেশীয় রাজ্য দপ্তরে গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার পর গোয়ালিয়র-ইন্দোর-মালব যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়।

২৪শে এপ্রিল—বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইহাই নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্বোধনী বক্তৃতার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের বৈদেশিক নীতি এবং কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্পর্কিত নীতির আভাষ দেন।

হায়দরাবাদ সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, হায়দরাবাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে—হয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান, না হয় যুদ্ধ।

২৫শে এপ্রিল—বোম্বাইয়ে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। এইদিন কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত প্রস্তাব ও নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অর্থনৈতিক সম্পর্কিত রিপোর্ট গৃহীত হয়। নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা কার্যে পরিণত করিবার উপায় নির্ধারণের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া নয়জন সদস্য লইয়া একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হয়। অধিবেশনের উপসংহার ভাষণ প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, নূতন গঠনতন্ত্র গৃহীত হওয়ায় কংগ্রেসের কার্যক্ষেত্র কেবল মাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইল। কংগ্রেস পূর্ববঙ্গ এবং পাকিস্থানের অপরাপর অঞ্চলের লোকদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন।

গতকল্য মধ্যরাত্র হইতে আজ মধ্যরাত পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা সময়ে কলিকাতায় ২৪ জনকে প্লেগ রোগে আক্রান্ত সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে পূর্বদিনের ভর্তির সংখ্যা ছিল ২৩। আগেকার একজন রোগী আজ মারা যায়; ইহা লইয়া ১৭ই মার্চ হইতে এযাবৎ প্লেগ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা হইল ৭।

সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী তাঁহার বহরমপুরস্থ বাসভবনে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

## বিদেশী সংবাদ

১৯শে এপ্রিল—জেনারেলিসিমো চিয়াং-কাইসেক আজ বিপুল ভোটাধিক্যে চীনের নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার অদ্য নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদে বলেন যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে সম্প্রতি যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, ভারতের পক্ষে তাহা মানিয়া লওয়া সম্ভবপর নহে।

অদ্য নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ অছিগিরি পরিকল্পনা দাখিল করেন।

২১শে এপ্রিল—অদ্য ইতালীর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দল (বর্তমান প্রধান মন্ত্রী দ্য গাস্পেরির দল) উভয় পরিষদে অধিক সংখ্যক আসন দখল করিয়াছে এবং পপুলার ফ্রণ্ট (কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য দলের সম্মিলিত পক্ষ) নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সেনেটে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দল ১৩০টি আসন এবং পপুলার ফ্রণ্ট ৭৪টি আসন লাভ করিয়াছে। চেম্বার অব ডেপুটিজের (নিম্ন পরিষদ) নির্বাচনে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দল শতকরা প্রায় ৮৮টি ভোট এবং পপুলার ফ্রণ্ট শতকরা প্রায় ৩০টি ভোট পাইয়াছে। এই দুই দলের তুলনায় অন্যান্য দল উভয় পরিষদের নির্বাচনেই অনেক কম ভোট পাইয়াছে।

২২শে এপ্রিল—আজ নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে যুক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাশ্মীর সংক্রান্ত যুক্ত প্রস্তাবের মূখবন্ধ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণকালে রুশিয়া ও ইউক্রেন ভোটদানে বিরত থাকে।

২৩শে এপ্রিল—প্যালেস্টাইনে হাইফা বন্দরে যুদ্ধরত আরব ও ইহুদীদের সৈন্যগণের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির জন্য বৃটিশ মধ্যস্থগণ আর একবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্ত আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হয়। সারারাত্রি যুদ্ধের পর ইহুদী বাহিনী হাইফা শহর দখল করে। ফলে সংখ্যাল্প আরবগণ সন্ধি স্থাপনের প্রার্থনা জানাইতে বাধ্য হয়। প্রকাশ, এই সংগ্রামে আরবদের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

২৩শে এপ্রিল—নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত যে গণভোট কমিশন কাশ্মীরে যাইবে, তাহাতে বেলজিয়াম ও কলোম্বিয়ার মনোনয়ন অদ্য পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

২৪শে এপ্রিল—ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য একটি প্রস্তাবের খসড়া রচনার উদ্দেশ্যে প্যারিসে ১৩টি দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়।

# বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

**১৪শ সংখ্যা হইতে ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত**

### ভ



### ম



### র



### শ



### স



### হ




শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুর্ব্যবহার ও মন্দির অপবিত্র করার সুস্পষ্ট অভিযোগ তিনি স্বয়ং শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশের উক্তিতে সত্যকার অবস্থা আগেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, জনগণের মনে বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের মনে আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা আসিয়াছে এবং তাঁহারা নানারকম উদ্বেগ বোধ করিতেছে। পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগ সমস্যার যদি সত্যই সমাধান করিতে হয়, পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতিসম্পন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বাস্তুত্যাগ না করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক প্রভাবের নৈতিক এবং মানসিক পীড়ন হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হইবে। এ সম্পর্কে যাঁহারা নিজেদের কিছু কর্তব্য আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা আগে সেই কাজ করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

## সংখ্যালঘু সম্পর্কে দায়িত্ব

ভারত-পাকিস্থান চুক্তিনামার সর্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘুদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জেলা ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের উপর নির্দেশনামা জারী করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টও অনতিবিলম্বে অনুরূপ বিধান অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই নির্দেশনামায় বলা হইয়াছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে কর্তব্যে ত্রুটি, বিশেষ করিয়া তাহাদের ধন-প্রাণ রক্ষা সম্বন্ধে কর্তব্য প্রতিপালনে কর্মচারীদের কোনরূপ শৈথিল্য লক্ষিত হইলে তাহা কিছুতেই সহ্য করা হইবে না। সে ক্ষেত্রে দোষী কর্মচারীদের উপর আদর্শ দণ্ডবিধান করা হইবে। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের এই নির্দেশনামায় নূতনত্ব কিছুই নাই। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির উপর সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রভাবও নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টের সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। সে গভর্নমেণ্ট লীগের দ্বারা পরিচালিত ও প্রভাবিত এবং লীগ সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং পারস্পরিক চুক্তির সর্তস্বরূপে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টকে নিজের দুস্তর বলিয়াই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রশ্নটি স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে; বস্তুতঃ পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টেরই এ সম্পর্কে সাক্ষাৎ সম্পর্কে দায়িত্ব রহিয়াছে। আমরা জানি, তাঁহারাও কর্মচারীদের প্রতি যথাযথ নির্দেশ দিবেন; কিন্তু শুধু নির্দেশ দিলেই তাঁহাদের কর্তব্য সম্পন্ন হইবে না। যাহাতে সেই সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়, সেজন্য তাঁহাদের সকল সময় সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কর্মচারীদের মধ্যে যদি কেহ সাম্প্রদায়িক সংস্কারান্ধ বৈষম্য দৃষ্টির দোষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য বা অবিচার প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়, তবে তাঁহার পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার কোন বিচার না করিয়া তাঁহাকে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর অবাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগের কারণ ঘটিয়াছে; রাষ্ট্রের ইজ্জৎ বা লীগের অপ্রাদেশিক সাম্প্রদায়িক আদর্শের দোহাই দিয়া সেগুলির গুরুত্ব লাঘব করিবার চেষ্টা এখন আর না হয়, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। অবিলম্বে মাইনরিটি বোর্ড গঠনের দ্বারা রাষ্ট্রের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংযোগ দৃঢ় করিবার সম্পর্কে দায়িত্ব পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টেরই সর্বাধিক। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র শাসনগত ব্যাপারের পরিচালনায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বর্তমানে কোন সুযোগই নাই। লীগের চক্রে লীগ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া তথায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রবেশের কোন অধিকার স্বীকৃত হয় না। এই সব দিক হইতে বিবেচনা করিলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কিরূপ অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে তাহা বোঝা যাইবে। আমরা আশা করি, পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্ট চুক্তির সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন।

## লীগ নেতাদের শঙ্কা

পাকিস্থান মুসলমানদের [illegible] স্বর্গ স্বরূপ হইবে এই ধারণায় যে সব মুসলমান ভারত হইতে পাকিস্থানে [illegible] করিয়াছিলেন, কয়েক মাস পাকিস্থানে বাস করিবার পরই তাঁহাদের সে ধারণা [illegible] গিয়াছে। তাঁহারা দলে দলে ভারতে ফিরিতেছেন। বিশ্বস্ত সাংবাদিক সূত্রে প্রকাশ, [illegible] লক্ষ বাস্তুত্যাগী মুসলমান কিছুদিনের মধ্যে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারত বিভক্ত হইবার পর ১৮ হাজার রেল কর্মচারী ভারত হইতে পাকিস্থানে চাকুরী করিতে গিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে ১২ হাজার পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং তাহাদের অধিকাংশকেই পুনরায় কাজে বহাল করা হইয়াছে। যাহারা স্বেচ্ছায় ভারতের চাকুরী ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে নূতনভাবে কাজে লওয়াতে অসুবিধা আছে, ইহা সহজেই বোঝা যায়; কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মুসলমান কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ সম্বন্ধে [illegible] দিয়াছেন। পূর্ব পাঞ্জাব হইতে [illegible] মুসলমান পশ্চিম পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন, পূর্ব পাঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডল তাহাদিগকে চাকুরী দিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা এ নীতি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। পাকিস্থানের শাসননীতি যেমনই হোক না কেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই [illegible] সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের [illegible] সংরক্ষণে ভারতের শাসকগণ সর্বদা সচেষ্ট [illegible] আদর্শের প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র উত্তরোত্তর সর্বদিক শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং [illegible] [illegible] [illegible]

## মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা

[illegible]

এই সমস্যা [illegible] স্বীকার করিয়া লইয়া [illegible] সম্বন্ধে সন্তোষজনক মীমাংসায় [illegible] সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ ট্রাইব্যুনালের [illegible] এক অস্থায়ী ব্যবস্থার জন্য উভয় রাষ্ট্রের [illegible] চিঠিপত্রের আদান-প্রদানে বর্তমানে [illegible] হারে তার মাশুলের ব্যবস্থা প্রচলিত [illegible] কিছুতেই কর্তব্য নহে। কারণ জনসাধারণের পক্ষে ইহা বহন করা একান্তভাবে ক্লেশকর হইয়া পড়িয়াছে।

আবির্ভাব
১২৬৮, ২৫শে বৈশাখ
১৮৬১, ৭ই মে

তিরোভাব
১৩৪৮, ২২শে শ্রাবণ
১৯৪১, ৭ই আগষ্ট

[অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে]

# ২৫শে বৈশাখ

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-দিবস। এদিন বাঙলার বড় গৌরবের দিন। এ-তিথি ভারতের পক্ষে পুণ্য তিথি; কিন্তু শুধু ভারতের কেন, এই দিবস বিশ্ববাসীর পক্ষে পুণ্যময়। কবি যিনি, তিনি কোন বিশেষ দেশ বা জাতির নহেন, তিনি জগতের সকলের। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি। বিশ্বজনের মনন-লোক তাঁহার অবদানে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার গানের সুর দূরকে নিকট করিয়াছে, অবারিত একত্বকে আমাদের জীবনে ছন্দায়িত করিয়া তুলিয়াছে।

এদেশের ঋষিরা বলিয়াছেন, দূরকে নিকট করিবার এবং ব্যবধানকে জয় করিবার এই যে শক্তি, এ-শক্তি আত্মারই আছে। প্রেমের পথেই ইহা সম্ভব হয়। শুধু তাহাই নয়, যাঁহারা এমন ক্ষমতার অধিকারী তাঁহারা অমর। শুধু দেশের ব্যবধানই নয়, কালের ব্যবধানকেও তাঁহারা অতিক্রম করেন। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের মধ্যে নিত্য, শাশ্বত জীবনে একান্ত করিয়া পাই।

মহামানবগণের আবির্ভাব তিথিতে তাঁহাদের এই লোকাতীত জীবনের মর্ম আমাদের জীবনে উদ্দীপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি। তিনি সেই হিসাবে সব দেশের, সব জাতির বন্দনীয়। কিন্তু আধুনিক বাঙালী জাতির তিনি স্রষ্টা, তিনি পিতা। তিনি আমাদের গুরু। জাতি হিসাবে আমাদের যাহা কিছু গর্ব করিবার আছে, সে সবের মূলেই রবীন্দ্রনাথের মনীষার প্রভাব রহিয়াছে। তাঁহার শক্তি বাঙালীকে পরিপুষ্ট করিয়াছে এবং শাশ্বত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন, বিশ্বের দৃষ্টিতে তাহাকে মর্যাদা দিয়াছেন। তিনি বাঙলার সংস্কৃতির মানে অপরাজেয় এবং ঐশ্বর্যে প্রচুর প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। এত বড় দাতা বাঙালী আর কোন দিন পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভৈশ্বর্যপূর্ণ বিরাট ব্যক্তিত্ব জগতে কোন জাতি বা সমাজে কোন দিন বিকশিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

২৫শে বৈশাখ আমাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে কবির চিরন্তন অবদানকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রজ্ঞান-মূর্তিতে আমাদের মানস-লোকে প্রত্যক্ষ হন। আমরা তাঁহাকে একান্ত করিয়া পাই। আমাদের শত ভুলের ভিতর দিয়া তাঁহার চরণমূলে আমরা প্রণত হইবার সুযোগ পাই। এই পুণ্যতিথির সূত্রে এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করি যে, রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভুলি নাই এবং ভুলিতে পারি না। যিনি প্রাণ দিয়া প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি পরিম্লান হইবার নয়। সমস্ত কালকে জয় করিয়া তাঁহার উদয় ঘটে। তাঁহার আবির্ভাবের পরম মহিমা সকল অভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

২৫শে বৈশাখের পুণ্যতিথিতে আমরা কবির এই নিত্য আবির্ভাবের অনুধ্যান করিতেছি। সে অনুধ্যান আমাদের অবিদ্যা ও অজ্ঞান হইতে উদ্ধার করুক। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি আমাদিগকে জ্যোতির্ময় আত্ম-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করুক। আমাদের প্রাণ যেন কবির কথা শুনিতে পায়, আমাদের মন যেন কবির প্রাণচঞ্চল স্পর্শে উদ্দীপ্ত হয়। আমাদের সব কর্ম-সাধনা যেন তাঁহার কল্যাণময় আলোকে প্রেরণা লাভ করে। ২৫শে বৈশাখের এ পুণ্যতিথি আমাদের এই বাঙলার মাটিতে কবির আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল; এই দেশের আকাশ বাতাস সেই দেবশিশুকে অভিনন্দন করিয়াছিল। বিশ্বকবির এই আবির্ভাব উৎসব আমাদের জীবনে সত্য হোক, বাংলার মাটী, বাংলার জল পুণ্য হোক, ধন্য হোক্ এই প্রার্থনা।

# পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে,
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা সুধায়েছিলে মোরে ডাকি'
পরিচয় কোনো আছে না কি,
যাবে কোন্‌খানে।
আমি শুধু বলেছি, কে জানে।

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি'
কুসুমিত তরুতলে তরুণ তরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, এ আমাদেরি লোক।
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তারপরে জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হোলো, সাঙ্গ হোলো তরঙ্গের খেলা,
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে;
কনকচাঁপার দল পড়ে ঝুরে,
ভেসে যায় দূরে,—
ফাল্গুনের উৎসব রাতির
নিমন্ত্রণ লিখন পাঁতির
ছিন্ন অংশ তা'রা
অর্থহারা।

ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতনকালের নব-যাত্রী ছেলেমেয়ে
সুধাইছে দূর হতে চেয়ে
সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণী কে।

সেতারেতে বাঁধিলাম তার
গাহিলাম আরবার—
—মোর নাম এই ব'লে খ্যাত হোক,—
আমি তোমাদেরি লোক।
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়॥

শিল্পী : শ্রীঅন্নদা মজুমদার

# 'ভারততীর্থে রবীন্দ্র-গান্ধী বাণীসঙ্গমে
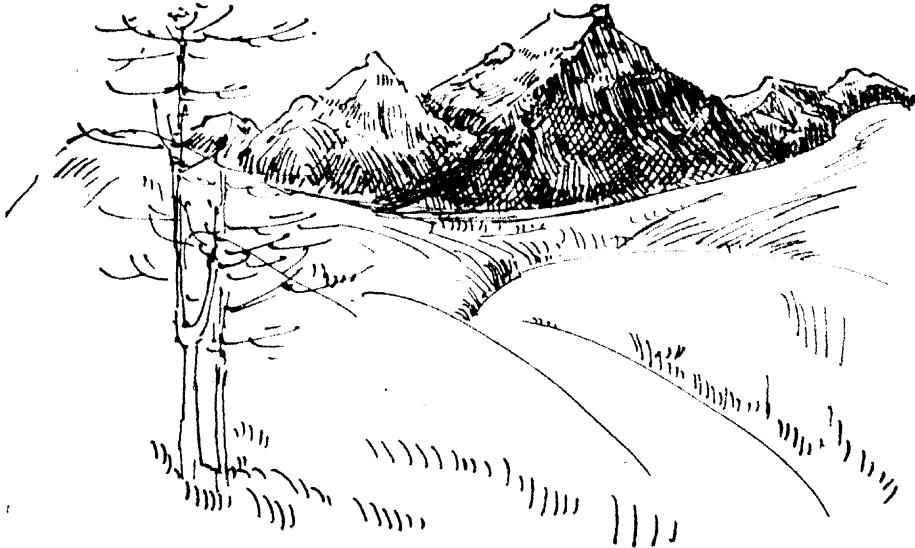
শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম এই রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গান্ধীজির মৃত্যুতে সে-আনন্দোৎসবের আকাশ এ বছর বৈশাখী মেঘচ্ছায়ায় ম্লান। আজ তাই উৎসব করব কিন্তু আনন্দের আতিশয্য করব না। মনে ভাবি, কেমন করে যাপন করি এবারের এই শুভদিনটিকে। ভারতের সেবায় উৎসৃষ্ট দুটি মহৎ জীবনের পরিচয় নেবার মধ্যে হয়তো বা সান্ত্বনার সন্ধান মিলতে পারে। মৃত্যুর নিকষে সোনা হয়ে ফুটে উঠেছে যে যুগল-মূর্তি ভারতবাসীর প্রাণে, তাঁদের সাধনার মিলিত-রূপটিকেই তো বলি 'স্বাধীন ভারতবর্ষ'। সেই ভারতের আহ্বান শুনতে যেন পাই আজকের এই পঁচিশে বৈশাখের শঙ্খরবে। চিরপুরাতন হয়েও সেই ভারতবর্ষই চিরনবীন, স্বপ্রতিষ্ঠিত ও স্বপ্রকাশ বলেই সে যুগে যুগে নিত্যপ্রকাশ-মান পৃথিবীর ইতিহাসে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—কত বিপরীত এই দুই মূর্তি, অথচ কোথায় যেন গভীর ঐক্য অনুভব করি উভয়ের মধ্যে। হয়তো সে-ঐক্য অপরিলক্ষ্য দ্যোতনা মাত্র, মনের আলোতেই তার প্রকাশ, তবু সাধ্য কী তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করি! একজনের শরীরের গঠনে অলৌকিক অতিমানবতা ছিল সুস্পষ্ট, শালপ্রাংশু গৌরব-ঋজু গৌরদেহে সৌন্দর্যের মানবকল্পনা যেন আকাশের সীমা স্পর্শ করেছিল। অন্যজন তাঁর বসনবিরল দৃঢ়সরল খর্বদেহের শ্যামলিমায় শ্যামা পৃথিবীর দীনতম দীনের স্বরূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রাণের অতি সহজ স্বাভাবিক প্রেরণায়। অথচ একবারমাত্রও যিনি এঁদের দুজনকে দেখেছেন তিনিই জীবনে ভুলতে পারেননি যে, তেজে ও বীর্যে কত পুরুষপ্রতীক এই উভয় মূর্তি, এবং মনে মনে অনুভব করেছেন, অত্যন্ত অসাধারণ ব'লেই বিপরীত হয়েও হয়তো তাই এরা পরস্পরের সগোত্র।

এহ বাহ্য, তা মানি। কিন্তু বাহিরের এই আপাতবিরুদ্ধ ঐক্যই এঁদের উভয়ের অন্তরের ঐক্যের প্রতি অলক্ষ্যে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। নবীন ভারতের বুকে শান্ত সংযত বীর্যের প্রেরণা, গভীরভাবে আত্মস্থ ও স্থিরলক্ষ্য হবার প্রেরণা এনে দিয়েছেন এই দুই মহাপ্রাণ, তাঁদের নানামুখী দানের মধ্যে সেকথা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ভারতের বিরাট আদর্শ ও বিচিত্র আকাঙ্খার সুদূরতম দুইপ্রান্তচুম্বী বিকাশ দেখতে পাই এঁদের ব্যক্তিত্বে। একপ্রান্তে গ্রহণের পরিপূর্ণতা, অন্যপ্রান্তে ত্যাগের সর্বরিক্ততা; একপ্রান্তে সুজলা সুফলা বাঙলা দেশের সুকুমার মাধুর্য, অন্যপ্রান্তে মরুপাণ্ডুর গুর্জরদেশের নিষ্করুণ কঠোর শ্রী। আমাদের নির্জীব নিরানন্দ জীবনে একজন আনলেন আনন্দ ও চিরসুন্দরের প্রেরণা, অন্যজন আনলেন মাভৈঃ বাণী আশা ও আশ্বাসের। প্রাণের পূর্ণ-উচ্ছ্বাস দিকে দিকে উচ্ছলিত প্রবাহিত হল; চোখের সামনে দেখলাম বৎসরে বৎসরে সরস ও সবুজ হয়ে উঠল আমাদের এতকালের আতঙ্কপাণ্ডুর মরুজীবন।

অতি সহজ একটি কথা আমরা প্রায়ই ভুলে থাকি যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কবিপ্রতিভা, গান্ধীজীর রাষ্ট্রনায়কের। একজনের 'বাণী'তেই তাঁর জীবনের বিকাশ, আর একজনের 'জীবন'ই তাঁর বাণী। এই একান্ত স্বভাবগত বিভেদই এঁদের উভয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিভেদ। কবির ভাষার সঙ্গে কর্মীর ভাষার পার্থক্য যেমন অনিবার্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষার সঙ্গে তেমনি অনিবার্য পার্থক্য গান্ধীজির ভাষার। তবে, ভারতের পরম সৌভাগ্য যে এঁরা কবি ও কর্মী অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে। ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রলাঁ এঁদের দার্শনিক (Philosopher) ও সত্যপ্রচারক (Apostle) ব'লে বর্ণনা করে সেই প্রভেদটুকু ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এঁরা দুজন তাঁর ভাষায়:

as fatally separated in their feeling as a philosopher can be from an apostle, a St. Paul from a Plato;

অর্থাৎ অনুভূতি ও মনের রাজ্যে এঁদের ব্যবধান দার্শনিকের সঙ্গে সত্যপ্রচারকের ব্যবধানের সমান, যেমন ব্যবধান ছিল প্লেটোর সঙ্গে সেণ্ট্ পল্-এর। র'লার দৃষ্টিতে:

On the one side we have the spirit of religious faith and charity seeking to found a new humanity. On the other we have intelligence, free-born, serene, and broad, seeking to unite aspirations of all humanity in sympathy and understanding.

অর্থাৎ একদিকে ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও মানবের প্রতি করুণা চাইছে বিশ্বে এক নূতন মানবতার প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে প্রশান্ত প্রসন্ন উদার এক ধীশক্তি সমগ্র মানবের আশা ও আকাঙ্খাকে পরম সৌহার্দ্যে মিলিত করতে আগ্রহান্বিত। বিশ্বকবি তাঁর মানসপটে মানব-চিত্তের সমগ্রতার স্বরূপটি তাঁর বিরাট কল্পনার ও উদার ধীশক্তির বলে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন; তাকে ভাষায় সঞ্জীবিত করে তুলেছেন তাঁর কাব্যে সংগীতে ও সাহিত্যে। বিশ্বকর্মী যিনি, সত্যের সমগ্রতার একেবারে কেন্দ্রে পৌঁছতে চেয়েছেন তিনি তিলে তিলে মানব-সেবার নানা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কর্ম-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, প্রাধান্যত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কর্মের সুনিয়ন্ত্রিত ধারা বেয়ে। একজন তাঁর জীবনে পরমসুন্দরের ধ্যানের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন পরমসত্যের প্রকাশ; আর একজনের সমগ্র জীবন আদি থেকেই সত্যের একা[ন্ত] পরীক্ষায় উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর ধ্যানে ও কর্মে তিনি ক্রমে উপলব্ধি করেছেন যে, নিত্যকালী[ন] সত্য যা তাই পূর্ণ সুন্দর, তাই ঈশ্বর। কিন্তু এই যে দুজনের বিভিন্নতা, এর মধ্যেও ভেদটাই কি সবচেয়ে বড়ো, কেন্দ্রগত ঐক্যের কোনোই স্থান নেই?

এমন দিনও ছিল যখন আমাদের এই ভেদবুদ্ধির দেশে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের বিভেদ নিয়ে ছেলেবুড়োয় কথা কাটাকাটির অন্ত ছিল না। এঁদের এ বিভেদের প্রায় বারো আনাই যে রীতিগত, নীতিগত নয়, কে তখন বিচার করে বা শোনে সে শুভবুদ্ধির কথা। বাঙলা দেশের কোনো কোনো পক্ককেশ প্রবীণকে এই সেদিন পর্যন্ত রোমন্থন করতে শুনেছি রবীন্দ্র-গান্ধী মতভেদের ইতিবৃত্ত যথেষ্ট উল্লাসের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন', চরকা সম্বন্ধীয় খণ্ডিত আলোচনা, বড়জোর 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধের শেষাংশ, আর কিছু পুরোনো খবরের কাগজের টুকরো-ছেঁড়া সংবাদ—এই হল তাঁদের বাক্‌যুদ্ধের যথাসর্বস্ব সম্বল। গান্ধীজির রচনার সন্ধান তাঁরা আরো কম রাখেন, হয়তো বা ইচ্ছা করেই। মনের রাজ্যে তাঁরা আজো অচলায়তনবাসী। সে পাষাণদুর্গ

দেয়ালে ফাটল কোথায়, যে ফাঁক দিয়ে দেশের ইতিহাসের চিরচলিষ্ণু রূপটি ধরা পড়বে তাঁদের দৃষ্টিতে! মানবজীবনের বিপুল অভিযান, রবীন্দ্রনাথ যাকে নাম দিয়েছিলেন 'কালের যাত্রা', মিথ্যা হয়েছে তা প্রতি পলেই তাঁদের জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজীর প্রতিপক্ষরূপে গৌরব দান করবার অন্ধ আগ্রহে তাঁকে কবিবর্ণিত ভগ্ন-দেউলের পাষাণ দেবতায় পরিণত করে তাঁরা তাঁর নিত্য-বিকাশমান প্রতিভার প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা নিক্ষেপ করেছেন। বাঙলার বাইরে রবীন্দ্ররচনার তথা রবীন্দ্রজীবনের অসম্পূর্ণ জ্ঞান বা অজ্ঞতাও ঠিক এরই বিপরীত বিকার যে কতদূরে সঞ্চার করেছে অনেক শিক্ষিত বিদগ্ধ চিত্তেও, তার পরিচয় জীবনে অনেকবারই পেয়েছি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতি তাঁদের অপরিসীম নিরুৎসাহ, সময় সময় এমন কি বিরূপ বাক্যপ্রয়োগ, গান্ধীজীর সত্যাদর্শে তাঁদের বিশ্বাসের দাবীটিকেই যে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে সেকথা তাঁরা কদাচিৎ উপলব্ধি করেন।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর দেশসেবার রীতি এবং সময় সময় নীতিতেও নানা তারতম্য দেখা গেছে তাঁদের সুদীর্ঘ জীবনে, সকলেই আমরা তা স্বীকার করি। কোনো জীবনধর্মী মানুষের পক্ষেই অন্যের বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব-রূপে হওয়া কখনো সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "আমি নিজের সম্বন্ধে একথা স্বীকার করব যে, মহাত্মাজীর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর মতো চরিত্রপ্রভাবসম্পন্ন মানুষ হতেম তাহলে অন্যরকম প্রণালীতে কাজ করতুম। কী সে প্রণালী আমার অনেক পুরাতন লেখায় তার বিবরণ দিয়েছি।" অতএব বিভেদটা মূলগত নয়, প্রণালীগত। কিন্তু এক জায়গায় তাঁরা দুজনে ভিন্ন বিভিন্ন অথচ খাঁটি ছিলেন বলেই এত আশ্চর্য, এত প্রাণস্পর্শী হয়েছিল তাঁদের সাধনার ও আদর্শের মূলগত ঐক্য। তাঁদের এই ঐক্য একাকারের নামান্তর নয় বলেই ভারতের জীবনে তাঁরা উভয়েই এত একান্তভাবে অপরিহরণীয়। ভারতের ভাগ্যে কবি রবীন্দ্রনাথকে লাভ করা ব্যর্থ হত যদি তাঁর আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই আমরা গান্ধীজিকে না পেতাম। কবির কল্পনার 'নৈবেদ্য' স্বপ্নের অবাস্তব লোকেই চিরদিন থেকে যেত যদি এই তপস্বী এসে কবিমানসের অন্তর্নিহিত এই আদর্শটিকে দেশজুড়ে বাস্তবে না রূপদানে করতেন। মানবসমাজ থেকে সকল সম্বন্ধ বিবর্জিত ধর্মতত্ত্বান্বেষী উদাসীনের মুক্তি কামনা নয় এই তপস্বীর। তাঁর সাধনার এই মানবমুখীনতায় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের ভাগ্যে যেন অবশেষে আশার আলো দেখতে পেলেন। পরম তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে কবি বললেন যে এই নবাগত তপস্বীমহাত্মা অকাতরে ঢেলে দিচ্ছেন নিজের জীবন, নিজের যথাসর্বস্ব সমগ্র ভারতবাসীকে সতেজ প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলবার জন্যে। 'লোকভয় রাজভয়' আদি 'সর্বতুচ্ছ ভয়' তাদের প্রাণ থেকে বিদূরিত করে তারিই এতকালের কল্পনার 'স্বর্গলোকে' এই তপস্বীই 'দুর্ভাগা' ভারতকে দিনের পর দিন 'জাগরিত' করতে লাগলেন কত অসাধ্য সাধনায়।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

গান্ধীজি শেষ যেবার শান্তিনিকেতনে আসেন রবীন্দ্রনাথ তখন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সেবারের আলাপ-আলোচনায় আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর আগ্রহ উদ্বেগ ও গভীর সমবেদনা রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর প্রতি। বারে বারেই তিনি বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে তাঁর নিজের আদর্শের যে-সব compromise বা কাটা-ছাঁটা করেছেন ও করবার অধিকারী ছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে সে concessions বা সুযোগ-সুবিধা নেবার অধিকার তাঁর অনুগামী আমাদের নেই। আমাদের দায় ও দায়িত্ব, তাঁর পরিপূর্ণ আদর্শটিকে এবার প্রাণপনে ফুটিয়ে তোলা, সজীব করে তোলা। কত কঠোর, কত গভীর, কত নির্মম দেখেছি সেবার তাঁর গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতি প্রীতি ও কর্তব্যবোধ।

বিদায় নেবার দিন বিশ্বভারতীর কর্মীদের নিয়ে উত্তরায়নে আলোচনায় বসে আমাদেরই এক নবীন সহকর্মীর ভীরু-দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজি খুব দৃঢ়কণ্ঠে এই কথাটি

বলেন যে, তাঁর নিজের কর্মজীবনের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতভেদের দিকটাই অনেক সময়ে তিনি বড়ো করে দেখেছেন, কিন্তু আজ জীবনের প্রান্তসীমায় পেঁৗছে তাঁর অন্তরে এই উপলব্ধিটিই ক্রমশ জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে যে, সাধনার রাজ্যে 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথ ও তিনি সম্পূর্ণ অবিযুক্ত। গান্ধীজীবনের পরিণামলগ্নের এই বাণী হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য ভারতবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির, বাঙালীর তো বটেই। এবং যতদিন আমরা তাঁর এই উক্তির নিগূঢ় অর্থটি হৃদয় ও মন দিয়ে গ্রহণ করতে না পারছি, রবীন্দ্রনাথকে ও স্বাধীন ভারতের পূর্ণতম আদর্শটিকে জানাও আমাদের ততদিন অসমাপ্ত থাকবে।

রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নবিলাসী কবি ও শুধুমাত্র নৃত্যগীত-উৎসবের প্রবর্তয়িতা বলে স্মরণ করলে তাঁর সাধনার মূলে আমরা স্বেচ্ছায় কুঠারাঘাত করব। সে আঘাত অব্যর্থ সন্ধানে এসে বাজবে সমগ্র জাতির ললাটে, আমরা সে সম্ভাবনার কথা স্মরণ রাখি আর নাই রাখি। সেই বিমূঢ় ভ্রান্তির হাতে, সমূল বিনাশের হাতে আমাদের সঁপে দিতে ব্যথা পেতেন যে-গান্ধীজি, তাঁরই দৃষ্টিতে যেন চিনে নিতে পারি বৎসরে বৎসরে আমরা রবীন্দ্রনাথকে, ইতিহাসের দুর্লভলগ্নে পাওয়া আমাদেরই 'কবিমনিষীকে'। শোনা যাক সেই কবির গভীর অন্তরের অভয়বাণী আজকের এই শুভদিনটিতে তাঁর জীবনের লীলা ও কর্মের যুক্তবেণী তীর্থে দাঁড়িয়ে, কবির হৃদয়যমুনা যেখানে গঙ্গাধারায় মিলিত হয়েছে সুদীর্ঘকালের অতি বিরাট তাঁর জীবন সাধনায়।—

**"এক সময়ে স্বভাবতই যে-সাধনাকে অবলম্বন করেছিলুম তার মধ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান—সংসার থেকে হৃদয়ের যে-তৃপ্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়নি সেইটেকেই অন্তরের মধ্যে মথন করে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম। কিছুদিন এই রসস্রোতে গা-ঢালান দিয়েছি। কিন্তু সত্য তো কেবলই রসোবৈ সঃ নন, তাই এক সময় আমার ধিক্কার এল—সেই নিমজ্জন দশা থেকে তীরে ওঠাকেই মুক্তি বলে বুঝলুম। ভাবের মধ্যে সম্ভোগ, কিন্তু কর্মের মধ্যে তপস্যা। এই তপস্যায় সেই মহাপুরুষের আহ্বান, যাকে ঋষি বলেছেন "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা"। কেবল তিনি বিশ্বরস এবং বিশ্বরূপ নন কিন্তু বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মে যোগ দিতে গেলেই বিশুদ্ধ হতে হয়, বীর্যবান হতে হয়, জ্ঞানী হতে হয়। বিশুদ্ধ কর্মে সত্য সর্বতোভাবে সপ্রমাণ হন—জ্ঞানে, রসে, তেজে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্যাদা সত্যকর্মে, বিশ্বকর্মে।"**

তাঁর সাধনার এই ক্রমবিকাশটিকে অন্য এক পত্রে আরো বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

**"আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পালায়নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছে শৈব,—ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশিও বাজে নটরাজের নৃত্যও হয়—যমুনায় নৌকা ভাসান দিয়ে শেষকালে পাড়ি দিয়ে সেই গঙ্গায় যে-গঙ্গা গৈরিক পরে চলেছেন সমুদ্রে।"**

কিন্তু এখানেও শেষ নয়:

**"যাই হোক এই লীলা সমুদ্রেই আরম্ভ হয়েছে আমার জীবনের আদি মহাযুগ—এইখানেই ধ্বনী এবং নৃত্য এবং বর্ণকাঞ্চন, এইখানেই নটরাজের আত্মবিস্মৃত তাণ্ডব। তারপরে নটরাজ এলেন তপস্বী-বেশে ভিক্ষুরূপে। দাবির আর শেষ নেই। ভিক্ষার ঝুলি ভরতে হবে—ত্যাগের সাধনা কঠিন সাধনা।"**

এই তপস্বী শিবের সাধনায় নিভৃতে নিরত যে-রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমরা আজো ভালো করে চিনি না বললেই হয়। এইখানেই ভারতের পূর্বপ্রান্তের কবির সঙ্গে পশ্চিমপ্রান্তের সাধক-তপস্বীর প্রাণের মিলন। বিশ্বকর্মের ক্ষেত্রে, ত্যাগ ও তপস্যার ক্ষেত্রে বৃহৎ আয়তনে কাজ শুরু রবীন্দ্রনাথ না করে থাকলেও তাঁর সাধ্য-মতো সমিধ্ সংগ্রহ ও অন্যান্য আয়োজন তিনি বহুকাল থেকেই আরম্ভ করেছিলেন তাঁর একার চেষ্টাতেই বাঙলার একপ্রান্তে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে। দেশবাসী অনেকেরই সে সংবাদ জানবার আগ্রহ সম্প্রতি অল্প কয়েক বছর মাত্র প্রকাশ পেয়েছে। গান্ধীজীর ভারত-সেবার আদিপর্বে রবীন্দ্রনাথ মানবসেবার এই 'ইতিসূচক' 'স্বদেশী সমাজ' স্বরূপটির দিকে বারে বারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রনীতির 'নেতিসূচক' আবর্তে গান্ধীজীর মতো দেশনায়ককেও পাছে আমাদের হারাতে হয় এই আশঙ্কাই তাঁকে অনেক সময় অধৈর্য করেছে।

কাব্যের মতো জীবনের ছন্দবোধও রবীন্দ্রনাথের চিরদিনই আশ্চর্য নিখুঁত। নিজের শক্তি সম্পর্কে সীমাবোধের ত্রুটি ঘটতেও দেখি না তাই তাঁর জীবনে। দেশকর্মে ব্যাপকভাবে নিজে না নামবার কারণস্বরূপ তিনি সর্বদাই বলেছেন,

**"আমার মননশক্তি যদি বা থাকে কিন্তু আমার প্রভাব নেই। এই প্রভাব আছে জগতে অল্প লোকেরই।"**

এবং সেই সঙ্গে বার বার একথাও বলেছেন,

**"দেশের সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ যদি সে-রকম শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয় তবে তাঁকে তাঁর পথ ছেড়ে দিতেই হবে, তাঁর কর্মধারাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারব না। সময় আসবে যখন ক্রমে অভাববৃত্তির মোচন হবে এবং সেই অভাব মোচনে আমরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছাকে আপন যোগ্যতা অনুসারে প্রবৃত্ত করতে পারব।"**

কে এই "শক্তিসম্পন্ন পুরুষ" তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আশ্চর্য হতে হয় কর্মের ক্ষেত্রে এই পুরুষটিরও সূক্ষ্ম ছন্দবোধ দেখে। তিনি নিজে হয়তো ছন্দ না বলে একে 'ডিসিপ্লিন্' বা 'নিয়ম শৃঙ্খলা' নাম দিতে চাইবেন। সংগঠন ও সংগ্রাম, সংগ্রাম ও সংগঠন—নিখুঁত এই পয়ার ছন্দে তাঁর পদ-চারণ ভারতের বিপুল বিস্তৃত বক্ষে গত বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরে। এই ছন্দেই লিখে গিয়েছেন তিনি এ যুগের নব-মহাভারত কোটি মানবের জীবনের স্বর্ণাক্ষরে। ভারতের ধর্মক্ষেত্রে বিদেশীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ধর্মযুদ্ধের অহিংস নব্য-নীতি প্রবর্তনের মধ্যে শুধু কেবল স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাই নয় সর্বমানবের প্রতি তাঁর অপরি-সীম সমবেদনা ও শ্রদ্ধা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বমিলনের যে বর্ণাঢ্য চিত্র কবির কল্পনায় রূপলাভ করেছিল এই একই সময়ে, তারও মূলে এই সর্বমানবে প্রীতি ও শ্রদ্ধা। উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা অনুসারে প্রকাশের পথ দুই বিপরীত দিক নির্বাচন করেছিল দুজনের জীবনে। আজ বহিঃসংগ্রামের অবসানে ওই দুই পথের মিলন ঘটবে না কি ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়ের জীবনে?

রবীন্দ্রনাথ শুধু কেবল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেতা বলে দেখেননি কোনদিন গান্ধীজীকে, তাহলে তাঁদের মধ্যে ঐক্যের তিল-মাত্র অবকাশ থাকত না। 'আন্দোলন' রীতির প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল রবীন্দ্রনাথের; দু-এক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে নিজে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা সত্বেও। তিনি ছিলেন দেশের জন-চিত্তের 'উদ্বোধনে'র অপেক্ষায়। অর্ধজাগ্রত সুষুপ্তির আলস্যজর্জর ঈষৎ আলোড়নমাত্র নয়, তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র মানবসত্তার পূর্ণতম জাগরণ। তাই পরম বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তিনি গান্ধীজীর ১৯২১ সালের আবির্ভাবকে সর্ব-সমক্ষে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন তাঁর [illegible] সমালোচিত তৎকালীন প্রবন্ধ 'সত্যের আহ্বানে':

**"মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যেক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। ... সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্তচিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।"**

তারো পূর্বে ১৯১৯ সালের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে এক পত্রে লেখেন:

And you come to your motherland in the time of her need to remind her of her mission, to lead her in the true path of conquest, to purge her present-day politics of that feebleness which imagines that it has gained its purpose when it struts in the borrowed feathers of diplomatic dishonesty.

এর সঙ্গে 'নৈবেদ্যে'র দুটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদও তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

এই পত্রে ভারতের কবি করেছেন শ্রদ্ধা নিবেদন নির্ভীক সত্যসন্ধানী ভারতীয় বীরের উদ্দেশে, যিনি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের [illegible] স্বদেশকে চালনা করেছেন তার স্বকীয় প্রতিভার পথে, বিজাতীয় কোনো বিশুদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক পন্থায় নয়। দুর্লভ এই সত্যের পথিকটিকে সর্বদা নিত্যসত্যের পথে অবিচল [illegible] নিয়োজিত দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ প্র[illegible] পণে; মাঝে মাঝে যে-সাবধানবাণী তিনি উচ্চারণ করেছেন, তার আন্তরিকতার মূল্য আমরা [illegible]

বুঝি, বুঝেছিলেন সেই পথিকতপস্বী। রবীন্দ্রনাথের বাণীর মধ্যে তিনি তাঁর বাত্যা-বিক্ষুব্ধ জীবনে ঝড়ের জাহাজের মতো দেখেছিলেন সুউচ্চ আলোকস্তম্ভের দীপ্ত আশ্বাস, তাই তিনি তাঁকে স্বতস্ফূর্ত শ্রদ্ধায় ডেকেছিলেন 'গুরুদেব' বলে, সংক্ষেপে তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে নাম দিয়েছিলেন The Great Sentinel, অর্থাৎ সমসাময়িক ভারতভূমির বাণী-রাজ্যে 'প্রহরীপ্রধান।' গান্ধীজীর ভাষায় রবীন্দ্রনাথ হলেন, 'The Bard of Santiniketan', সেই শান্তিনিকেতনের কবির 'সত্যের আহ্বান' সবরমতী তীরের সত্যসন্ধানী পথিক-বীরের জীবনে ব্যর্থ যে সেদিন হয়নি তার প্রমাণ গান্ধীজীর নিজের ভাষাতেই পাই :

I regard the Poet as a sentinel warning us against the approach of enemies called Bigotry, Lethargy, Intolerance, Ignorance, and other members of that brood.

দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু অন্ধতা, জড়তা, অসহিষ্ণুতা, অজ্ঞতা প্রভৃতি যেসব অদৃশ্য শত্রুর এইমাত্র নাম করা হল তাদের সমূলে উৎপাটিত আজো করা যায়নি। এদেরই কয়েকটির হাতে হারিয়েছি আমরা মহাত্মাজীর জীবন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সম্মিলিত সাবধানবাণী যেন আমাদের পথ দেখায় ও প্রেরণা সঞ্চার করে জাতির এই পরম দুর্দিনে যখন বাহিরের শত্রুর চেয়ে অন্তরের শত্রুরাই ক্রমশ প্রাবল্য লাভ করছে, এবং অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চতুর্দিকে। রবীন্দ্রজন্মোৎসব উদ্বুদ্ধ করুক আমাদের চিত্তশক্তিকে শুধু কেবল নৃত্যগীতমুখর আনন্দের লীলা-প্রাঙ্গণেই নয়, নিরলস কর্তব্যবোধের বেদনা-কঠোর তপঃক্ষেত্রেও।

# বাণী-বৈশাখ

শ্রীজগজ্জিত সরকার

প্রাচ্যের উদয়াচলে জ্যোতিষ্মান্ হে রুদ্র ভাস্কর,
দিয়েছিলে ডাক,
শম্পাগতি সময়ের দুর্নিবার প্রবাহে জাগিল
'পঁচিশে বৈশাখ।'
দুর্বার উন্মত্ত বেগে সে উদ্দাম প্রবাহ চলেছে
এই নিয়মেরে,
চাহিল সহসা ফিরে এ অপূর্ব সৃষ্টির প্রকাশে
নিষ্পলক নয়নে।
ঝলকি উঠিল বিশ্বে এ সুবর্ণ রশ্মির স্পন্দন
তরঙ্গ আঘাতে;
শিল্প কাব্য নৃত্য গীত ছন্দভরা আলোক-প্রবাহ
—কল্পনা প্রপাতে।
ভাব-ভাষা সুরুচির প্রগতির শাশ্বত সত্যের
এই মূর্ত ছবি

প্রাচ্যের উদয়প্রান্তে অমৃতের প্রতীকস্বরূপ
এ অনন্ত রবি।
'পঁচিশে বৈশাখ' লগ্নে অকস্মাৎ হ'ল অভ্যুদয়
মহাপুরুষের;
হোমাগ্নি শিখায় সে যে চিরদিন করিবে আরতি
পূর্ণ স্বরূপের!
'পঁচিশে বৈশাখ' যেন কী পবিত্র মঙ্গল প্রলেপ,
যেন মন্ত্রবাণী,
'পঁচিশে বৈশাখ' যেন কী উদাত্ত জাগার—আহ্বান,
কী ঝংকারধ্বনি!
'পঁচিশে বৈশাখ' যেন অন্যায়ের অবশ্য মৃত্যুর
নির্মম লগন,
'পঁচিশে বৈশাখ' যেন নিপীড়িত মানব-ভূমির
চির জাগরণ।

শিল্পী : শ্রীঅন্নদা মজুমদার

# হিন্দী গান ও রবীন্দ্রনাথ

শান্তিদেব ঘোষ ....

বাংলার একজন খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক তাঁর একটি বইয়ের ভূমিকায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকার নিজে একজন প্রতিষ্ঠাবান গায়ক সুতরাং গানে তাঁর মতামত অবহেলার বিষয় নয়। তিনি বলেছেনঃ—

**"যাকে আমি নাম দিয়েছি 'সুরবিহার' (improvisation) রবীন্দ্রনাথের সংগে এই নিয়ে বহু তর্ক আলোচনা ক'রে আমি বুঝতে পেরেছি যে ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশের পথ যে সুরবিহারের, এটি তিনি যে কারণেই হোক বুঝতে পারেন নি। তিনি এক্ষেত্রে চেয়েছিলেন হুবহু বিদেশী ভংগির আমদানী যেখানে সুরকারই (composer) হবেন সর্বেসর্বা, গায়ক তাঁর হুকুমদার মাত্র।"**

**"সুরকার যা করবেন গায়ককে পুরোপুরি তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করতে হবে ঠিক যেমন বিলেতি গায়করা করেন আর কি।"**

**"তাঁর গান বড় হতে পারলো না এই বিলেতি ভঙ্গির অনুকরণ করতে গিয়ে।"**

**"রবীন্দ্রনাথের পথে গেলে আমাদের সংগীতের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।"**

এ ছাড়া আরও কয়েকজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও হিন্দী গানের পাশকরা পণ্ডিত লিখেছেন যে,—

**"রবীন্দ্রনাথের সংগীত Anglo-Indian class-এর লোক ছাড়া কেহ appriciate করে না,......তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতকে (Traditional music) আমল দেন নাই, দিয়াছেন European cheap songs-কে। তাহারই অন্ধ অনুকরণে তিনি সংগীত নয় "গীত" রচনা করিয়াছেন। কথা অবশ্য বাংলা, সংগীতের ব্যাকরণ ইত্যাদি য়ুরোপীয়।"**

**"সংগীতে তাঁর সৃষ্টি সর্বাংগীন ও সুসম্পূর্ণ হয়নি।"**

**"স্বদেশী বা বিদেশী সংগীতের কোন সুষ্ঠু সংস্করণ তাঁর গানে খুঁজতে যাওয়া বৃথা।"**

গুরুদেবের গান নিয়ে এ ধরণের মতামত সত্যই একটু অভিনব। কিন্তু এই অভিযোগের সমর্থনে কেউই কোন যুক্তি খাড়া করেন নি। কেবলমাত্র মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। যাঁরা সংগীত সম্বন্ধে কিছুমাত্র আলোচনা করেন, তাঁরা এই মতবাদের সমর্থনে বিস্তারিত আলোচনা হলে খুসি হতেন। এই আলোচনা সে রকম তথ্যপূর্ণ নয় বলেই এই মন্তব্যের তাৎপর্য কি বুঝতে পারিনি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি তো মনে করি এ ধরণের মন্তব্য সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত।

অভিযোগগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগকরে এক একটি করে উত্তর দেবার চেষ্টা করবো। যেমন (১) "ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশের পথ সুরবিহারের বলতে কি বোঝায়, (২) রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন কি না, (৩) গায়কের স্বাধীনতা হরণের প্রথা কি কেবল বিলেতেই একমাত্র প্রচলিত? (৪) গুরুদেব সুরকার হিসেবে গায়কের স্বাধীনতা হরণের পক্ষপাতী কেন? (৫) সমগ্রভাবে ভারতীয় সংগীতে তাঁর গানের স্থান কোথায়, এবং (৬) রবীন্দ্র সংগীত ভারতীয় সংগীতের বিকাশের পথে বিঘ্নস্বরূপ কি না।

ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠবিকাশ বলতে ওস্তাদ মহলের মত হলো, "হিন্দু সংগীতে রাগ-রাগিনীর আলাপ করা সংগীত শিক্ষার চরম ফল। যিনি আলাপ করিতে শিখিয়াছেন, তিনি সংগীতে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।......হিন্দু সংগীতের সমস্ত বিদ্যা আলাপের উপর নির্ভর।" আর একজন বলেছেনঃ—

"Alap is the highest form of classical music, in which notes are used in their abstract form only and as such it emerges free from sectarian, social, communal or environmantal boands. Its additional freedom from the garb of poesy and the fetters of structural time enable it to be developed to metaphysical hights savouring almost of the cosmic rhythmic progress of universe, which cannot be produced by any other form of music."

এই বিষয়ে আরো মতামত উল্লেখ করার সম্ভবতঃ প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে গুরুদেবের কোন জ্ঞান ছিল কিনা, তা নিয়ে আলোচনার আগে তাঁর সংগীত জ্ঞানের ইতিহাস ও প্রভাবের বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। তাতে করে তাঁর সংগীত রচনায় কোন্ দেশের প্রভাব পড়েছে তার উত্তর হয়তো পাবো।

গুরুদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন কলকাতার ধনী সমাজে উচ্চসংগীতের প্রভাব কি রকম ছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা পাই তাঁরই একটি লেখাতে। তাতে আছে :—

**"বাংলাদেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভ, তখন আমি জন্মেছি। ......দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সংগীতবিদ্যায় অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হোতো। বর্তমান সমাজে ইংরেজী রচনায় বানান বা ব্যাকরণের স্খলনকে যেমন আমরা অশিক্ষার লজ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি হোত যদি দেখা যেত, সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় সমে মাথা নাড়ায় ভুল করেছে, কিম্বা ওস্তাদকে রাগ-রাগিণী ফরমাসের বেলায় রীতিরক্ষা করেনি।**

তাঁদের সেই বাল্যকালে ওস্তাদরা নিজে হাতে তানপুরো বেঁধে আলাপের ভূমিকা দিয়ে ধ্রুপদ গানে সভা মুখরিত করতেন :

**"দূর প্রদেশ থেকে আমন্ত্রিত গুণীদের সমাদর করে উচ্চ অংগে সংগীতের আসর রচনা করা সেকালে সম্পন্ন অবস্থার লোকের আত্মসম্মান রক্ষার অংগ ছিল।"**

কলকাতা তথা বাংগলা দেশে ওস্তাদী সংগীতের এইরূপ একটি আবহাওয়ার মূল কারণ হোল, কলকাতা তখন ভারতের রাজ-ধানী। লক্ষ্ণৌয়ের বন্দী নবাব ওয়াজিদ আলী শার সংগীত সভার প্রভাব ও যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাচীন সংগীতের পুনরুজ্জীবন ও প্রচারের প্রচণ্ড কার্যকরী প্রচেষ্টা।

সংগীতকে তখনকার ধনী সমাজে এইরূপ একটি সম্মানজনক বিদ্যা বলে গ্রহণ করার দরুণ তার চর্চারও বিশেষ আয়োজন তাঁরা বাড়ীতে রাখতেন। নিজ পরিবারের সংগীত চর্চার বর্ণনা করতে গিয়ে গুরুদেব বলছেন :—

**"বাংগালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীত-মুখরতা কোন বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মত উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদী গানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকাল সন্ধ্যায়, উৎসবে আমোদে, উপাসনার মন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে, আমার আত্মীয়রা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংলা ভাষায়।"**

বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন আদি সমাজের গায়ক ও গুরুদেবের পরিবারের সংগীত শিক্ষক। ইনি শিশুদেরও কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করিয়েছেন। কর্তাদের নির্দেশ মত বাংগলা ছড়ায় রাগরাগিণী বসিয়ে সহজভাবে গান শেখাতেন। এতে আরম্ভে সা রে গা মা ইত্যাদির নিরস অভ্যাসে গানের প্রতি শিশুদের মন বিমুখ হোত না। কিন্তু শিশুরা ঐ বয়সে ধ্রুপদ গানও গাইতো কারণ বাড়ীর নানা উৎসবের জন্য রচিত বাংগলা ধ্রুপদ গানে তাঁদের যোগ দিতে হোত। শিশু বয়সেই মাঘোৎসবে গুরুদেবও বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সংগে গান গাইতেন। এই ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্ম সংগীত তাঁদের সেই শিশু বয়সকে কত-খানি প্রভাবান্বিত করেছিল একটি ঘটনার উল্লেখে তা ধরা পড়ে। তিনি লিখেছেন :

**"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গই একেবারে অর্থহীন ছিল কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল-প্রেম আননে' গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।"**

গুরুদেবের দাদাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী উচ্চ সংগীতের বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

এ'রা সকলেই হিন্দী গানের বিশেষ চর্চা করেছেন। তবে এ'দের গানের গলা খুব উল্লেখযোগ্য ছিল বলে শোনা যায় না। গুরুদেব লিখেছেন :

**"বড়দাদা, সেজদাদারা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন, ছেলেমানুষ বলে আমাদের তথায় প্রবেশ ছিল না।"**

হেমেন্দ্রনাথ তানপুরা কাঁধে কিরকম ধৈর্যের সঙ্গে হিন্দী গান অভ্যাস করতেন, তার বর্ণনা করে বলেছেন—

**"সেজদাদা শিখতেন বটে, তিনি সুর ভাঁজছেন তো ভাঁজছেনই, গলা সাধছেন ত সাধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।"**

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজ বাড়িতে যেমন সংগীত চর্চা করেছেন, তেমনি বোম্বাই-বাসকালে সেখানকার এক মুসলমান সেতারীর কাছে দিল্লী "বাজের" সেতারের গৎ বাজাতে শিখেছিলেন ভালো করে। গুরুদেবের বড় ভগিনীপতি সারদাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পাকা সেতারী ছিলেন। তখনকার কালের নামকরা সেতারী জুয়ালাপ্রসাদ ছিলেন তাঁর সেতারের গুরু। এ'র বৈঠকে প্রায়ই বহু গায়ক ও বাদকের আসর বসত। তিনি নিজেও ধ্রুপদ গাইতেন।

গুরুদেবের পিতা দেবেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন বরাবরই উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীতের বিশেষ ভক্ত। তিনি মোটামুটিভাবে গাইতে পারতেন। হিন্দী গানে ভালমন্দ বোধ তাঁর বেশ পরিষ্কার ছিল। তাঁর রচিত প্রত্যেকটি বাংলা উপাসনা সংগীত হিন্দী উচ্চাঙ্গ সংগীতের চালে রচিত। উপাসনা ও উৎসবের গানে উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীতের ঢংকেই উপযুক্ত মনে করতেন বলে তিনি তাকেই বেশী প্রাধান্য দিতেন। তাঁরই ইচ্ছা ও প্রভাবে তাঁর পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীত ভেঙে বহু ব্রহ্ম-সংগীত রচনা করেছিলেন যার মধ্যে ধ্রুপদের সংখ্যাই অধিক। হিসাব করে দেখা যায় যে, গুরুদেব নিজে উপাসনার গান রচনায় হাত দেবার আগ পর্যন্ত তাঁর পিতা ও কেবল তাঁর দাদারা মিলে সব সমেত প্রায় ৬০টি ব্রহ্ম সংগীত রচনা করেছিলেন। এই সব গান রচনায় যে কয়জন বড় বড় ওস্তাদ তাঁদের সাহায্য করেছিলেন, তার মধ্যে গৃহ শিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের রাজচন্দ্র রায় ও যদু ভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া অন্যান্য নানা গায়কের ভাল গান সংগ্রহ করেও তাঁরা ব্রহ্ম সংগীত রচনা করতেন। উপরোক্ত বড় বড় গাইয়েরা সকলেই কোন না কোন সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর গায়ক হিসেবে আশ্রয় পেয়েছিলেন। তা ছাড়া বাংলা দেশের বাইরে ওস্তাদের মধ্যে বরোদার তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক মৌলা বক্সও তাঁদের বাড়ীতে কিছুদিন গায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। অযোধ্যা, গোয়ালিয়র ও মোরাদাবাদ থেকেও ওস্তাদেরা তাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

গুরুদেবের শিশু বয়সে যাঁরা বিশেষভাবে সংগীতের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গায়ক বিষ্ণুর কথা পূর্বেই বলেছি। এর পরে শ্রীকণ্ঠ সিংহ—এক অজানা গাইয়ে ও যদু ভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। এ'রা সকলেই ছিলেন হিন্দী গানের বিশেষ রসিক। গুরুদেব বলেছেন :

**"আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন।...তিনি তো গান শেখাতেন না গান দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। স্ফূর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতারে, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল্ জ্বল্ করত, গান ধরতেন—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী'—সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।"**

অজানা গায়ককে স্মরণ করে লিখেছেন;—

**"ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তার গান শুনতাম। নিয়মের শেখা যাদের নেই তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকালবেলার সুরে চলত—'বঙ্শী হমারিরে'।"**

যদু ভট্টের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাও ছিল গভীর। স্রষ্টা হিসেবে তার প্রতিভায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এই ওস্তাদের সম্বন্ধে গুরুদেব লিখেছেন :—

**"ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙ্গালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ-মর্যাদায় ছিল, কাণ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মত তাল ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনিই বিখ্যাত যদু ভট্ট। ...যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে; কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিনীর আলাপ। ...বাংলাদেশে এ রকম ওস্তাদ জন্মায়নি। তার প্রত্যেক গানে একটা Originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।"**

গানে তখনকার দিনের ধনী সমাজের সঙ্গে এযুগের ধনী সমাজের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই যে, সে যুগের বড়লোকেরা গানটাকে কেবলমাত্র সৌখীন আমোদের বিষয় বলে মনে করতেন না, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর সংগীতের দিক থেকে। তাঁরা মনে করতেন, ভালো গান শোনা বা ভালো গায়ককে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার ক্ষমতা তখুনি জন্মায় যখন সেইদিকে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা যায়। সেকালে বড় ওস্তাদেও সেই কারণে সমজদার ধনীর কাছে থাকতে উৎসাহিত হতেন। এযুগের বড় ধনী বা সাধারণ ধনী, কারুর মধ্যেই আগের দিনের মত উচ্চশ্রেণীর সংগীতের চর্চার প্রতি উৎসাহ দেখা যায় না। ইংরাজী উচ্চশিক্ষা ও ধনের জোরেই সমজদার হবার সহজ পন্থায় এখনকার বেশীর ভাগ ধনীর বিশেষ আগ্রহ।

সে যুগের ধনীরা অন্ততঃ এভাবে সমজদার বলে গণ্য হতে লজ্জা বোধ করতেন। তাঁরা সাধনা বা চর্চা করে তবে উপযুক্ত সমজদার বলে সম্মান পেতেন। সেই রকমই গুরুদেবের পরিবারে সংগীত-চর্চা বা সংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। বাড়ীর ছোট বড় সকলেই সংগীতকে গৌরবের সঙ্গে চর্চা করেছেন, বুঝেছেন ও আনন্দ পেয়েছেন। তাই বড় গুণিমণ্ডলী তাঁদের বাড়ীতে এসে গুণী সমজদার পেয়ে খুসি হতেন। ঐ বাড়ীতে শিশুদের সংগীত শিক্ষাও যে বড় লোকী শখ মেটানোর বিষয় ছিল না, তা আমরা জানতে পারি ঐযুগের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার বর্ণনা থেকে। দ্বিতীয় "বিদ্বজ্জন সমাগম" উৎসবের বর্ণনায় পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিল :

**"হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা নাম্নে অষ্ট বর্ষীয়া কন্যা ও তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক আর একটি বালক উভয়ে মিলিয়া সেতার বাজাইলেন।......পরে এই দুটি শিশু ৩।৪টি হিন্দী গান গাইলেন সে গান হার্মোনিয়ম, বেহালা ও তবলার সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছিল। তারপর প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবুর একটি গানে ঐ বালকটি তবলা সঙ্গত করিল পরে আর ৪।৫টি গানের সঙ্গে প্রতিভা তবলা সঙ্গত করিলেন।"**

প্রতিভা দেবী নিজেও ঐ সব দিনের কথা স্মরণ করে লিখেছেন;—

**"যখন আমার বয়স ৬।৭ বৎসর......সৌরীন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন উভয়েই আমাদের বাড়িতে আসিতেন। তখনকার কালে মেয়েদের গান বাজনা করিবার প্রথা ছিল না। আমার পিতাই কেবল তাহা মানেন নাই। আমাকে উৎসাহিত করিয়া শিখাইতেন। রাজা বাহাদুরেরা আমার পিতাকে এদিকে উৎসাহ দিতেন। সেদিনে বিষ্ণু চক্রবর্তী বাড়ির গায়ক। তাহার নিকট ছোট খেয়াল শিখিতাম। রামপ্রসাদ মিশ্র সেতার শিক্ষক। বাড়িতে তখন বিদ্বজ্জন সমাগম হইত। সৌরীন্দ্রমোহন ইত্যাদি আসিতেন। সে সময় আমি ও ভ্রাতা হিতেন্দ্র উভয়েই সকলের সামনে গাইতে বাধ্য হইতাম।**

**"জ্যোতি কাকার বাজনার সঙ্গে রবি কাকার গান, বড় পিসেমশায় 'সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বলাবাহুল্য বিষ্ণু চক্রবর্তী ইহাদের গান শুনিয়া সকলেই কি যে মোহিত হইতেন, তাহা বলিতে পারি না।"**

হেমেন্দ্রনাথ গুরুদেবের সেজদাদা, বয়সে ১৭ বৎসরের বড় ছিলেন। ইনিই বাড়ীর ছোটদের পড়াশুনার তদারক করতেন। প্রতিভা দেবী ছিলেন গুরুদেবের থেকে বয়সে ৫ বছরের ছোট। ইনিই বাল্মীকি প্রতিভায় পরে সরস্বতীর অভিনয় করে বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন। তবে একথা ঠিক যে বাড়ীর অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মত অতটা সচেষ্টভাবে গুরুদেব গান শেখবার চেষ্টা কখনও করেন নি। যদুভট্ট, তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয়ে জেদ ধরেছিলেন তাঁকে ওস্তাদী রীতিতে গান শেখাবেনই, সেইজন্যেই তাঁর ভাল করে গান শেখাই হোল না। তিনি শিখতেন গান লুকিয়ে চুরিয়ে। বিষ্ণুর কাছে গান শেখার কথায় বলেছেন, আনমনে ব্রহ্ম-সংগীত আওড়েছেন অনেক সময়, আবার যখন আপনা হতে মন লেগেছে তখন গান আদায় করেছেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে লিখেছেন :—

**"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত**

**করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতেই, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সঙ্গীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোন অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।"**

এছাড়া গানে সুর যোজনার শিক্ষায় তাঁর প্রধান সহায় ও পরিচালক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। গুরুদেবের বয়স যখন ১৪ তখন থেকেই তিনি, বয়সে অনেক বড় হয়েও, বন্ধুর মত সংগ দিয়ে নিজের রচিত সুরের খেলায় গুরুদেবকে কথা বসাতে বলতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে হিন্দী গানের নানাপ্রকার রাগিনীর গতকে নানা ছন্দে ও গতিতে খেলাতেন। গুরুদেবের কাজ ছিল সংগে সংগে সেই সুরে মিলিয়ে কথা রচনা করা। এইভাবে জ্যোতিবাবুর সাহায্যে গান রচনার শিক্ষা বাল্মীকি প্রতিভা রচনা পর্যন্ত তিনি পেয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রায় ১৪ বৎসর পর্যন্ত গান রচনায় শিক্ষানবীশীর যুগ। এই সময়েও দেখি, সুর যোজনায় নানাপ্রকার হিন্দী রাগ-রাগিনীই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তার কারণ জ্যোতিবাবুর মধ্যে হিন্দী রাগ-রাগিনীর প্রভাব ছিল অত্যন্ত অধিক, কিন্তু গোঁড়াপন্থী ওস্তাদের মত তাঁর স্বভাব ছিল না। প্রচলিত নিয়মভংগের চেষ্টা তাঁর সর্বদাই ছিল। রাগ সংগীতের উপপত্তিক জ্ঞানের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকার দরুণ সংগীতের ব্যাকরণেও তিনি ছিলেন পণ্ডিত।

এতক্ষণ আমি এই আলোচনার ভিতর দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করলাম যে কি রকমের একটা ঠাসা হিন্দুস্থানী সংগীতের আবহাওয়ায় গুরুদেব তাঁর শৈশব ও কৈশোরের জীবন অতিবাহিত করেন। লক্ষ্য করলে অনেকেই দেখবেন যে, বিলেত থেকে 'বাল্মীকি প্রতিভার" গান রচনার সময় পর্যন্ত গুরুদেবের কোন একটি গানে বাংগলা দেশের বাউল বা কীর্তন ইত্যাদি কোন গানের প্রভাব নেই। এমন কি "ভানু সিংহের পদাবলীর' গান, যে কটি সুরে প্রচলিত, তার সব কয়টি হিন্দী গানের সুরে রচিত। তখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে হিন্দী উচ্চ-সংগীতের প্রভাব একমাত্র হ'য়ে বিরাজ করছে। কয়েকটি মাত্র বিলেতি গানের সুর 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে আমরা ব্যবহার করতে দেখি। ঐযুগে তিনি বাংগলা দেশের যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী ও কীর্তন গান যে না শুনেছিলেন তা নয়। তাঁর বাড়ীতে এসব সর্বদাই হোত। পেশাদারী যাত্রা, নিজেদের আত্মীয়দের উৎসাহে শখের যাত্রা দলের অভিনয়ে গান শুনেছেন। কথকতা কীর্তনও শুনেছেন। কিন্তু তার থেকে কি পরিমাণ সুর সংগ্রহ করেছিলেন তা বিশেষ অনুশীলন ছাড়া বলা মুস্কিল। তখনকার দিনের যাত্রা, কথকতা ও পাঁচালী গানের সুরে হিন্দী গানের রাগরাগিণীর প্রভাব ছিল খুব। ঐসব দলের গাইয়েরা প্রচলিত হিন্দী-গানের নানা ঢংকে নানারূপে গানে গ্রহণ করেছিল। কীর্তনের নিজস্ব বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও বাড়ীর ওস্তাদী সংগীতের আবহাওয়া ভেদ করে ঐ বয়সে গুরুদেবের মনে তা গান রচনার প্রেরণা যোগাতে পারেনি।

কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে তিনি আর একজন বিখ্যাত বাংগালী গায়কের সংস্রবে এসেছিলেন তিনি হলেন রাধিকা গোঁসাই। ইনি ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা সংগীতে বাংগলা দেশে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এঁর গান গুরুদেব যেমন শুনেছেন, তেমনি এঁর কাছ থেকে নানা ঢংএর সুরও আদায় করেছেন নিজের গানের সুরসম্পদকে বৈচিত্র্য দেবার জন্যে।

এই রকম ওস্তাদী গানের আবহাওয়ায় জড়িত থাকার দরুণ তিনি ভারতীয় উচ্চ সংগীতকে যে বুঝতে পারেননি বলা চলে না। যদি তিনি এই আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতেন তা হলে এ কথার একটা হয়তো সমর্থন পাওয়া যেত। কিন্তু সংগীতে স্বাভাবিক দক্ষতা ও সুকণ্ঠের জন্য তিনি শিশুবয়সেই বাড়ীর যাবতীয় সংগীত ও অভিনয়ের অনুষ্ঠানে বিশেষ অংশ গ্রহণ করায় ও বড় বড় ওস্তাদদের সংস্রবে থেকে তাঁদের নানাপ্রকার গান শোনার দরুণ সেই সব গানের রস তাঁর মনে বসে গিয়েছিল বলেই তিনি বলেছেন--

**"ছেলেবেলায় যে সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল।......কালোয়াতি সংগীতের রূপ ও রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।......**

**......"ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানী গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে।......**

**......"অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে।"**

এখন দেখা যাক, ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সুরবিহার সে বিষয়ে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল কিনা। তার কতগুলি উক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি:—

**"বিষয় বস্তুহীন ছবির নিছক বিশুদ্ধরূপ আমার ভালোই লাগে, যেমন ভালো লাগে বাকাহারা সংগীতের আলাপ। বস্তুত আমার নিজের ঝোঁক ঐদিকে।"**

**"আপন মনে ভৈরবীর আলাপ করতে লাগলুম। ভৈরবীর সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়।"**

**"ভোরবেলায় সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে মনকে উতলা করে দেয়।"**

**"দূরের এক অদৃশ্য নৌকা থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথম পূরবী ও পরে ইমন কল্যাণে আলাপ শোনা গেল—সমস্ত নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।"**

**"নদীর দিকে চেয়ে গুণ গুণ স্বরে ভৈরবী টোড়ী রামকেলী মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণীর সৃজন করে আপন মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটি সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল।"**

গানের তানের বিষয়ে বলেছেন,—

**"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই, সঙ্গীতের সুর-বৈচিত্র্য তালালাপে কেমন কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি নয় কি?**

**"গানের মধ্যে আমরা তান দেখে থাকি।......যে ওস্তাদের মনে সমগ্র গানের রূপটি বিরাজ করছে মাঝে মাঝে সে লীলাচ্ছলে এক একটি ছোট ছোট তানে সেই সমগ্রের রূপটিকে ক্ষণেকের মধ্যে দেখিয়ে দেয়।"**

**"তান যতদূর পর্যন্ত যাক না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সংগে তার মূল যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেল বা—কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে।"**

তান আলাপ বিষয়ে গভীর অভিজ্ঞতা ছাড়া এত সুন্দরভাবে তাকে ব্যক্ত করা সহজ হোত কি না জানি না। এর পরে আসছে ধ্রুপদ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা, বলছেন:—

**"আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎসীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—একদিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।"**

"প্রাচীন ক্লাসিকাল অর্থাৎ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। তাতে দুর্বল রস মুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে।"

"জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানিনে বুঝিনে। আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগ-রাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে, সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানেনা তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানেনা।"

এখন কথা হচ্ছে যে, বিলেতে সুরকাররা গায়ক বা বাদককে যে স্বাধীনতা দেন না—সে প্রথা কি কেবলমাত্র তাঁদের দেশেই প্রচলিত? আমার তো মনে হয় সুরকাররা সবাই এক। সব দেশেই সুরকাররা চান তিনি গানের প্রেরণায় যে সুর বা গীতরূপ প্রকাশ করলেন, অনুকারক গায়কেরা সেইটিকে নির্বিচারে ধরে রাখুক। সুরকারদের মনের একটি অনির্বচনীয় আনন্দ-রসের বাহ্যপ্রকাশ হোলো গীতরূপ বা সুর-রূপ। মনের সেই একটি বিশেষ রসোপলব্ধি রচয়িতার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে যে গীতরূপ বা সুররূপের সাহায্যে তা প্রকাশ পেল, সেই রূপের বদল তাঁরা কখনো চান না। কারণ তাঁর রসোপলব্ধির সঙ্গে তা ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত। বাইরের রূপের বদল ঘটলেই সেই বিশেষ রূপটির বদল ঘটতে বাধ্য। সৃষ্টিমূলক রচনার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন কতগুলি নিয়ম মনের অগোচরে আপনা থেকেই রচনার সঙ্গে গড়ে ওঠে যাকে আমরা বাহ্যরূপের মূল কাঠামো বলি। **সেই কাঠামোর নিয়মটিকেই** ভিত্তিরূপে অনুকারক গায়করা **বের করে** নিয়ে **রচয়িতার রসটিকে পরিবেষণের চেষ্টা করেন।**

# রবীন্দ্রনাথের শিক্ষামন্দির

## (রবীন্দ্রনাথের আপন বিবৃতি)

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

**বিধাতার** ইচ্ছায় পূর্ব-পশ্চিমের অর্থাৎ য়ুরোপ ও ভারতের এই যুগে যখন **মিলন** হোলো তখন সকলেই আপন আপন **ধন-সম্পত্তি** লাভের কথাই ভাবতে লাগলেন। **ভগবান** যে-কোন বিরাট উদ্দেশ্যে প্রাচ্য **পাশ্চাত্যকে** এমন করে যুক্ত করলেন সে কথা কেউ একবার ভেবেও দেখলেন না। এই কথা যাঁর মনে প্রথমে দীপ্ত হয়ে উঠলো তিনি মহাত্মা **রাজা** রামমোহন রায়। তিনি তৎকালে বিলাতে দেহত্যাগ করলেন। ইহলোক হতে বিদায় নেবার আগে তিনি জনকয়েক বন্ধুকে তাঁর আলো দিয়ে জাগিয়ে রেখে গেলেন। তাঁদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির প্রবর্তক দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন।

দ্বারকানাথ ধনমানের সাধক হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান ও গুণের একজন সাচ্চা সমঝদার। কিন্তু তিনিও বিলাতে তৎকালে মারা গেলেন। তাঁরই পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথের বিরাট কারবার মহর্ষির সময়ে ফেল পড়লেও মহর্ষির জীবনেই ভারতীয় প্রাচীন সাধনা ও সংস্কৃতি আরও দীপ্যমান হয়ে উঠলো। কারবারের বিরাট দেনা, মহর্ষি প্রাণপণ চেষ্টায় ও অবিলম্বে হুড়মুড় করে সর্বস্ব বিক্রী করে সব কারবারের সব দেনা শোধ করে দিলেন। তাতে দ্বারকানাথের বিরাট সম্পত্তি নিঃশেষিতপ্রায় হলেও মহর্ষি আপন সুব্যবস্থার গুণে যেটুকু সম্পত্তি বাকি রইল তাই দিয়েই আপনার গৃহ ও সংসারকে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির তীর্থরূপে গড়ে তুললেন। এই পবিত্র ভূমিতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম। কাজেই এই বাড়ির মর্মকথা রবীন্দ্রনাথেরই ভাল করে জানবার কথা। তাই তাঁর ভাষাতেই মহর্ষির এই বাড়ির অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির পরিচয় দেওয়া যাক্।

যখন বিলাতের সংস্কৃতির প্লাবনে আমাদের দেশ ভেসে গেছে, যেন নোঙরের নৌকার মত এই পরিবারেই প্রাচীন বেশভূষা, প্রসাধন, গৃহসজ্জা, আসর মজলিস বজায় ছিল। এখানে কেউ কাউকে ইংরাজীতে চিঠি লিখতেন না। মেয়েদের শাড়ী পরার একালের ভঙ্গীও এই বাড়ীর।

১৯২৩ সালে আমেদাবাদে কবিগুরুকে একজন প্রশ্ন করলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে না পাঠিয়েও আপনার পিতা কেমন করে আপনাদের এমন জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন করে তুললেন?"

তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বল্লেন,—"পিতৃদেব মেজদাদা ছাড়া আর কাউকে বাইরে পড়তে পাঠাননি। তিনি আমাদের বাড়িটাকেই একটা যথার্থ বিদ্যালয় বানিয়ে তুললেন। যদিও দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য আমাদের পরিবারে আর রইল না, তবু পিতৃদেব সাংসারিক সব দায় যথাসম্ভব সংকুচিত করে জ্ঞানী ও গুণীদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে রাখলেন। নিত্য তাঁদের সমাগমে এই বাড়ির আবহাওয়া চিন্ময় হয়ে উঠলো। তাঁদের সৎকারে পিতৃদেব যেরূপ অকুণ্ঠিত ভাবে ব্যয় করেছেন, তেমন ভাবে ব্যয় করতে অনেক রাজা মহারাজাও পারেননি। এই আবহাওয়ার কাছেই আমাদের শিক্ষা।

তখনকার দিনে আমাদের খাওয়া-পরা খুব সাদাসিধা ছিল। গরমের দিনে ব্যবস্থা ছিল একটি সাদা জামা, শীতের দিনে তারই উপর আর একটা জামা উঠতো মাত্র। সেই জামাও বহুদিন পরেও রাখা হোতো না, তখন মনে মনে দুঃখ হোতো। একজোড়া চটি বরাদ্দ ছিল বটে, কিন্তু তার ব্যবহার দেখা যেত না। মোজার সঙ্গে ছেলেবেলায় কখনও পরিচয় ঘটেনি। দুধ ও মুড়ি ছিল তখন খাবার, দুটো একখানা লুচি হলে তো কথাই নেই। একালের ছেলেপিলেরা যেসব জিনিস তুচ্ছ করে তাও তখন আমাদের দুর্লভ ছিল, তাই যেটুকু জিনিস তখন পেতাম তার পুরো রস আদায় করে নিতাম।

আমাদের বাড়ি-ভরা লোক তখন গমগম করতো। আপন পর অতিথি অভ্যাগত সবারই সেখানে স্থান রয়েছে। সকলকে আমরা চিনিও না। অভ্যাগত মাত্রই দ্বারে এসে আতিথ্য পেতেন ও অনেকে দীর্ঘকাল সেখানে রয়েই যেতেন। তাঁদের জন্য পান, তামাক, দুই বেলা খাবার জলখাবার যথানিয়মেই হাজির হোতো। সমাজে আমরা কতকটা একঘরের মত ছিলাম। তাই লোকাচার ও সামাজিক শাসন আমাদের উপরে কম ছিল। সেই জন্য আমরা অনেকটা স্বাধীনভাবে চলতে পেরেছি।

শহর হলেও তখনও আমাদের বাড়িতে পুকুর ছিল। তাতেই সবার স্নান ও সাঁতার চলতো। জোয়ারে গঙ্গার জল নালা বেয়ে পুকুরে আসতো। **তাতে মাছের দল স্রোতের** উল্টা পথে চলতে থাকতো। শুনেছি আমাদের বাড়ির কাছে পর্যন্ত তখন খালে নৌকা আসতো। সেই খালের উপরে কাছাকাছি দুইটি কাঠের সাঁকো ছিল বলেই জায়গাটার নাম হয় জোড়াসাঁকো।

তখনও জলের কল হয়নি। একতলায় একটা অন্ধকার বড় ঘরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জালায় সারা বৎসরের পানীয় জল সঞ্চিত থাকতো। মাঘ-ফাল্গুনের গঙ্গার পরিষ্কার জল বেহারারা বাঁকে করে এনে জালাগুলি ভরে রাখতো। ঘরটা অন্ধকার, মনে হোত যেন ভূতের আড্ডা।

তখনও আমাদের বাড়িতে গোলাবাড়ি, ঢেঁকিশাল সবই ছিল। চারদিকে গাছপালাও ছিল। ঝি-চাকরেরা তাতে রাত্রে ভূত-পেত্নী ও ব্রহ্মদৈত্যের পরিচয় পেতো। উৎসুক হয়ে সেই সব গল্প তাদের কাছে শুনতাম। গল্প শুনতাম বল্লে ঠিক হয় না, গল্প গিলতাম। যদিও তাতে অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে কাটতো দিন, গাছপালা থাকায় বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুর পরিচয় তখনো আমরা পেতাম।

পাড়াগাঁয়ের মত বাড়ির হাল হলেও এই পুরনো আমলের ঐশ্বর্যের কিছু ভগ্নাবশেষ তখনও বজায় ছিল। পালকি আমাদের [illegible] ছাদের বিরাট পালকি দেউড়িতে পড়ে থাকতো। তার মধ্যে বসে দেশ বিদেশের স্বপ্ন দেখতাম। [illegible] আমি [illegible] এই পালকিতে বসে মনে মনে [illegible] কাঁধে চড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী [illegible] মত পার হয়ে কত [illegible], কত রাজপুরী, কত রাক্ষসপুরী, দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতাম। আমার কল্পনার বেহারারা আমাকে কত বনজঙ্গলে নিয়ে গেছে, কত নদী-পর্বত পার করেছে, কত তীর্থপুরীর মধ্যে পড়ে গেছি, সেসব কি আর এখন [illegible] মনে আছে? আমাদের বাড়িতে কোথাও [illegible] একটা রাজবাড়িও ছিল। তা চোখে দেখিনি কিন্তু তা কল্পনায় পেয়েছি।

তবে তখনো আমাদের দেউড়িতে দরোয়ান ছিল। তাদের কুস্তি ও লাঠিখেলার আখড়াও ছিল। দীন-দুঃখীরা তাদের প্রাপ্য বরাদ্দের জন্য দেউড়িতে বসে থাকতো। তখনকার দিনে বাড়ি এলে কেউ বঞ্চিত হোত না।

বড় বড় বিদ্বান ও পণ্ডিতেরা এসে পিতৃদেবের বৈঠকখানায় শাস্ত্র ও বিদ্যার আলোচনা করতেন। গাইয়ে-বাজিয়েরা এসে আপন গুণের পরিচয় দিতেন। তাঁরাই আমাদের বাড়িকে একটা জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয় করে রেখেছিলেন। এখানে পিতৃদেব কখনো কোন কার্পণ্য ঘটতে দেন নি।

গাইয়েদের সেরা ওস্তাদ **ছিলেন** যদু ভট্ট

নিঃশব্দ ধ্যানাসনে। তাঁর বৈঠকখানায় গুণীরা আসছেন, জ্ঞানীরা আসছেন, ভারতের অপূর্ব মনীষা ও অধ্যাত্ম সম্পদ নিয়ে। তাঁরা স্বাগত অভ্যর্থনা ও পুরস্কারে সংস্কৃত হচ্ছেন।

১৭ বছর বয়সে আমার বিলেত যাবার আগেই দেখে গেলাম আমাদের বাড়ির বিদ্বজ্জন সমাগম। তাতে খাওয়া, দাওয়া, গীতবাদ্য, কবিতা আবৃত্তি সবই হোতো। এই রকম এক সমাগমেই আমার বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনীত হয়। আমি হই বাল্মীকি, আমার ভাইঝি প্রতিভা হলেন সরস্বতী। তাই নাটকের নাম বাল্মীকি-প্রতিভা। প্রতিভার গানের তুলনা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের কথার উপসংহারে মাত্র দুই একটি কথা বলে আজ বক্তব্য সমাপ্ত করতে হবে। ওড়িষ্যায় কোনারক জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরে উত্তর ভারতেও নানা তীর্থে নানা দেবালয়ে দেখা যায় মন্দিরের চারিদিকে থাকে নানা মূর্তি ও সংসারলীলার ছবি, কিন্তু ভিতরে থাকে দেবতার স্তব্ধ বেদী। জোড়া-সাঁকোর বাড়ির চারিদিকে যদিও সর্বদাই চলেছিল শিল্পকলা সাহিত্যের সদা সচেষ্ট লীলা কিন্তু তার কেন্দ্রস্থলে ছিল সর্বরূপের অতীত রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য ধ্যানের স্তব্ধ সাধনাসন। রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক সংসার ছিল দেবমন্দিরের মত মহনীয়। সেই দেব-মন্দিরেই কবিগুরুর জ্ঞান-দীক্ষা। সারা জগৎ রবীন্দ্রনাথ যে আলোক দান করেছেন তার মূলেও এই গৃহেরই চিন্ময় সাধনা। এই গৃহেই রবীন্দ্রনাথ এক ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। এখনো প্রতি ২৫শে বৈশাখে এই দেবমন্দিরের কাছে আমাদের প্রণতি জানানো উচিত।

# পঁচিশে বৈশাখ

## সৌরস্বপ্না

ওরা বলে, আমিও-যে বলি বার বার,
—তুমি কবি সরস বর্ষার!
শ্যামল সুন্দর বর্ষা, বরদা প্রাণদা।—
(প্রলয় প্লাবনীমূর্তি প্রেম কি সর্বদা?)
কভু ঝঞ্ঝা, কভু বজ্রবিদ্যুতের জ্বালা,
সহস্র ধারায় তবু দিকে দিকে স্তন্যক্ষীর-ঢালা
সান্ত্বনা অজস্র যার—তুমি তাঁর কবি।
বর্ষামঙ্গলের তুমি পূর্ণপ্রাণ মাঙ্গলিক-ছবি।
আকাশের আশীর্বাদ পেয়েছি মাটির বক্ষে আমি,
বিশুষ্ক পাণ্ডুর প্রাণে গানে গানে এলে তুমি নামি।
রোমাঞ্চিত নবাঙ্কুরে বর্ষে বর্ষে করেছি প্রণাম,
স্বর্ণশীর্ষ অন্ন-গাথা
ওগো কবি, তোমার উদ্দেশে সঁপিলাম।
তুমি কবি অমোঘ বর্ষার—
অম্লান আশ্বাস তুমি অযাচিত জীবনে আমার।

তবে তুমি নহ বৈশাখের?
যে-রুদ্র বৈশাখী আসে অতন্দ্র প্রেমের
জ্বলন্ত বেদনা বহিয়া—তাঁর দীপ্ত শিখা;
গলায় অক্ষের মালা, ভালে ভস্মলিখা।
রৌদ্রস্রোতস্বিনী হতে যে রুদ্র আসন তার পাতে,
গোধূলি-গৈরিক আভা নভস্পর্শী যার তপস্যাতে।
—কেহ তুমি নহ তার। তার তপস্যার
তপোভঙ্গী কে সে কবি! কার মন্দিরার
মন্ত্রে নৃত্যপর হল মহেশ্বর রুদ্রবেশে।
তৃষাদীর্ণ নিদাঘশেষে, বলো কবি, কেন অবশেষে
নামিল গঙ্গার ধারা—বসুধরা সিক্ত হতবাক্‌!
রুদ্রাণী দানিল বর,
সেই বর পঁচিশে-বৈশাখ।
রুদ্র তপস্যার বরে
নব ছন্দে তুমি এলে কবি।
বর্ষায় বসন্তে গ্রীষ্মে ফিরে ফিরে
চলে সে-উৎসবই।

শিল্পী : শ্রীঅন্নদা মজুমদার

বর্তারা ও তাঁহাদিগের সঙ্গী প্রভৃতি তাঁহার রচিত সেই মন্দির—প্রস্তরের পর প্রস্তর খুলিয়া লইয়া—নষ্ট করিতেছেন।

"——loosen stone from
stone
All my fair work: and from the
ruin arose
The shriek and curse of trampled
Millions."

যাঁহারা এদেশে দেশাত্মবোধের সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা কত বেদনাদায়ক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে আপনার উপাধি বর্জন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে পত্র বৃটিশ সরকারের তৎকালীন প্রতিনিধিকে লিখিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবে বৃটিশ সরকার হিন্দু-মুসলমানকে নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের এক জাতি এক প্রাণ দেখিয়া ভয় পাইয়া অত্যাচারে রত হইয়াছিলেন। রামনবমীর দিন অমৃতসরে হিন্দু-মুসলমান মিলনের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়া ছিল, নব ভারতের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয়। অমৃতসরের গগন পবন সেদিন "হিন্দু-মুসলমান কি জয়" রবে পূর্ণ হইয়াছিল। ডাক্তার কীচলু স্বীকার করেন—এই উৎসব হিন্দু-মুসলমান মিলনের মহোৎসব হইয়াছিল।

"became a striking demonstration in furtherance of Hindu Muhammedan unity."

যখন ইংরাজ রাজকর্মচারীদিগের অত্যাচারের বিবরণ হিন্দু-মুসলমানের লাঞ্ছনার বিবরণ নিয়ম বন্ধ করিয়া রাখা চেষ্টা করিয়া ও ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিবাদ তৎকালীন বড়লাটকে জানান—

"আমাদের কল্যাণ কামনায় আমি এইটুকু মাত্র করিবার সংকল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা অন্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই অবসরে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অনাদর দিনে আমাদের অতিশয় সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি।"

জাতীয়তা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধক। সেই বিষয়টাই রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসী মাত্রকেই একজাতি বলিয়া মনে করিতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পার্সি ফিরোজ শা মেটা বলিয়াছিলেন যদি দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বাস করিয়া অ্যাংলো-স্যাক্সন ও ডেনরা ইংরেজ, এবং তদপেক্ষা অল্পকাল ভারতে বাস করিয়া মুসলমানরা ভারতীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীরও অধিককাল ভারতে থাকিয়া পার্সিরা কেন ভারতীয় না হইবেন?

"To my mind, a Parsi is a better and a truer Parsi, as a Mohamedan or a Hindu is a better and a truer Mahomedan or Hindu the more he is attached to the land which gave him birth, the more he is bound in broherly relations and affection to all the children of the soil, the more he recognises the fraternity of all the native communities of the country . . . . . ."

যতদিন আমাদিগের সমাজ আপনার সৌধে আপনি সঙ্কুচিত হয় নাই, ততদিন আমরা জাতীয়তাই আদরণীয় মনে করিয়া আসিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীরা সেই আদর্শই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

কেবল যে হিন্দু মুসলমানে নহে—অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে জাতি নির্ধারণের যে মত সাম্প্রদায়িক নীতি প্রচার করিয়া আসিয়াছেন তাহাতেই নহে। আমাদের আর এক সমস্যা আমরা সৃষ্টি করিয়াছিলাম। সেই সমস্যাই ইংরাজকে হিন্দুসমাজ বিভক্ত করিয়া "বর্ণ ও অনুন্নত" দুই সম্প্রদায়ে বিভিন্ন করিয়া দুর্বল করিবার সুযোগ দিয়াছিল।

সেই বিভাগের কারণ লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ বঙ্গাব্দে লিখিয়াছেন—

"এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন। যত দিন এই ভাব ঘটে নাই যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা হইল, সেইদিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল।... পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয় তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ উচ্চবর্ণ এবং নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর প্রভেদ জন্মিয়াছিল, এমন কোন দেশে হয় নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ করিব। তিনি বলিয়াছিলেন—"পাশ্চাত্যেরা একেবারে ভারতীয়দিগকে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ নীচজাতি, ইহারা অনার্য জাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!"

তিনি বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বিশ্বাস আমাদিগের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে বিঘ্ন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—"হে ভারত, পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষিতা এই দাসসুলভ দুর্বলতা। এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?......ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই......বল, মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।.....

রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালী'র 'দেবতার বিদায়' কবিতায় লিখিয়াছেন:—

"দেবতা-মন্দিরমাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে 'গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।'
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে—
'আরে আরে অপবিত্র দূর হয়ে যা রে।'
সে কহিল—'চলিলাম' চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, 'প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে!'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে!'"

[illegible]

"ভারতবর্ষে [illegible] ভারতবর্ষে তাহা প্রমাণিত থাকে।"

তিনি তখনই বলিয়াছিলেন:—

"ভারতবর্ষের এই একাকী থাকিয়া কাজ করিবার ব্রতকে যদি আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ

করি, তবে এবারকার নববর্ষ আশীষ-বর্ষণে ও কল্যাণ শস্যে পরিপূর্ণ হইবে। দল বাঁধিবার টাকা জুটাইবার ও সংকল্পকে স্ফীত করিবার জন্য সুচিরকাল অপেক্ষা না করিয়া যে যেখানে আপনার গ্রামে, প্রান্তরে, পল্লীতে, গৃহে, স্থির-শান্তচিত্তে ধৈর্যের সহিত—সন্তোষের সহিত পুণ্যকর্ম—মঙ্গলকার্য সাধন করিতে আরম্ভ করি; আড়ম্বরের অভাবে ক্ষুদ্র না হইয়া, দরিদ্র আয়োজনে কুণ্ঠিত না হইয়া, দেশীয়ভাবে লজ্জিত না হইয়া, কুটিরে থাকিয়া, মাটিতে বসিয়া, উত্তরীয় পরিয়া সহজভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হই; ধর্মের সহিত কর্মকে, কর্মের সহিত শান্তিকে জড়িত করিয়া রাখি;.........তবে ভারতবর্ষের ভিতরকার যথার্থ বলে আমরা বলী হইব। বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি, বল পাইতে পারি না; নিজের বল ছাড়া বল নাই। ভারতবর্ষ যেখানে নিজবলে প্রবল, সেই স্থানটি আমরা যদি আবিষ্কার ও অধিকার করিতে পারি, তবে মুহূর্তে আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইয়া যাইবে।"

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় দেখিয়াছিলেন, রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়করা নূতন অবস্থায় সমাজ গঠনের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইতে সমাজতন্ত্রবাদী য়ুরোপের ও ধনিকবাদী আমেরিকার শিখিবার অনেক সুযোগ আছে। কিন্তু সেখানেও তিনি ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যেই যে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'রাশিয়ার চিঠিতে' লিখিয়াছেন:—

"একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। এইরকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপনার ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত। সমাজ তার কাছ থেকে আনুকূল্য স্বীকার করেছে বলেই তাকে কৃতার্থ করেছে, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এর মধ্যে তা ছিল না। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই যেখানে ছিল নির্জন; সেই সমাজে আপন স্থান মর্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা পরোক্ষ আকারে বড়ো খাজনা দিতে হত। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, বৈদ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা পথঘাট, সমস্তই রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, রাজকর থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা এবং সমাজের ইচ্ছা দুই-ই মিলতে পেরেছে। যেহেতু এই আদান-প্রদান রাষ্ট্রীয় সহযোগে নয়, কিন্তু মানুষের ইচ্ছাবাহিত, সেইজন্যে এর মধ্যে ধর্মসাধনার ক্রিয়া চলত। অর্থাৎ এতে কেবলমাত্র আইনের চালনায় বাহ্য ফল ফলত না, অন্তরের দিকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন হত। এই ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয়।

"বণিক সম্প্রদায়, চিত্ত খাটিয়ে লাভ করাটাই যাদের মুখ্য ব্যবসায়, তারা সমাজে ছিল পতিত। যেহেতু তখন ধনের বিশেষ সম্মান ছিল না, এইজন্য ধন ও অধনের একটা মস্ত বিভেদ তখন ছিল অবর্তমান। ধন আপন বৃহৎ সঞ্চয়ের দ্বারা নয়, আপন মহৎ দায়িত্ব পূরণ ক'রে তবে সমাজে মর্যাদা লাভ করত; নইলে তার ছিল লজ্জা। অর্থাৎ সম্মান ছিল ধর্মের, ধনের নয়। এই সম্মান সমর্পণ করতে গিয়ে কারও আত্মসম্মানের হানি হত না। এখন সেদিন গেছে বলেই সমাজ-দায়িত্বহীন ধনের প্রতি একটা অসহিষ্ণুতার লক্ষণ নানা আকারে দেখা যাচ্ছে। কারণ, ধন এখন মানুষকে অর্ঘ্য দেয় না, তাকে অপমানিত করে।"

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ কেবল সময়োপযোগী কবিতা ও গান রচনা করিয়াই জাতিকে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই, পরন্তু যে সকল প্রবন্ধের দ্বারা লোকমত গঠিত করিবার কাজ করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে পল্লীসমাজ পরিকল্পনাও ছিল। তাঁহার পরিকল্পিত "পল্লীসমাজের" প্রথম উদ্দেশ্য—

"বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলির নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা।"

ইহাতেই সমাজে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় বুঝিতে পারা যায়।

কিসে আমরা একজাতি হইতে পারি, সে চিন্তা তিনি বহুদিনই করিয়া গিয়াছেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে তিনি "ছোটো ও বড়ো" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

"আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিত সাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।"

এই আশা সহজেই করা যায়। কারণ অন্যান্য দেশে—বিশেষ ইংলণ্ডে ও আয়ার্লণ্ডে—দেখা গিয়াছে, লোক যতই লোকসেবার কার্যে অগ্রসর হয়, রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে ধর্মগত বাদ-বিসম্বাদ ততই দূরে হইয়া যায়। কারণ, লোক-সেবার কার্য ধর্মমতনিরপেক্ষ। প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞতা ও পাপ ধর্মের সহিত সম্পর্কশূন্য। তখন লোক সেই সকল দূর করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হয়। তখন সকল ধর্মাবলম্বী একযোগে কাজ করিয়া থাকে। গার্নার তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকে বলিয়াছেন এককালে একধর্মমতাবলম্বিতা জাতীয়তার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত এবং জাতিগঠনে সাহায্যও করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে আর একধর্মমতাবলম্বিতা জাতীয়তার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয় না। তিনি বলিয়াছিলেন—

"It is the clevage between the religious of the Hindus and the Mohammedans in India that retards in large measure the progress of the nationalist movement in that country today."

কংগ্রেসের দ্বারা জাতিগঠন সাধিত হইতেছিল বটে, কিন্তু ইংরেজ তাহার শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভেদনীতির প্রবর্তন করায় সে কার্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। আর যখন তাহার ভারতত্যাগ অনিবার্য হইয়াছে, তখন সে সেই ভেদনীতির দ্বারা ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া তাহার ঐক্য নষ্ট করিয়া গিয়াছে। সেইজন্যই যে আশা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে। কাজ যে সহজসাধ্য নহে, তাহা রবীন্দ্রনাথ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে তাঁহার "ইংরাজ ও ভারতবাসী" প্রবন্ধে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি বলিয়াছিলেন:—

"শিখদিগের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া, নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য বেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে।"

কাজ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু "এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্যসাধনই তাঁহার ব্রত।"

সেই গুরু একজন হইয়া না আসিলেও বহুজনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁহাদিগের একজন—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তেমনই আর একজন। অরবিন্দ যখন নূতন শিক্ষা দিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে তাঁহার নমস্কার জানাইয়াছিলেন—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" "দেশের আত্মার বাণীমূর্তি তুমি।"

বারবার অসাফল্যের মধ্য দিয়াই যে সাফল্যের পথ রহিয়াছে তাহাও রবীন্দ্রনাথ ভুলেন নাই। তাই যখন মৃত্যুর ছায়া ঘনীভূত হইতেছে, তখন তিনি উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন:—

"আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার

জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যেই অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। * * মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে, আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

রবীন্দ্রনাথের এই আশা ব্যর্থ হইতে পারে না। তাহা সার্থক হইতে যে বিলম্ব তাহা আমাদিগের যোগ্যতার পরীক্ষা। কারণ পথ "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর" সেই পথে আমাদিগকে যাইতে হইবে। যিনি আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের আশাপূর্ণ করিবেন, তাঁহাকেই আমরা বলি :—

"অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত,
শুনি তব উদারবাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক
মুসলমান খৃস্টানী।"

দারুণ বিপ্লবের মধ্যে তাঁহারই শঙ্খ বাজে—ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে এই শঙ্খই পাঞ্চজন্যরূপে ধ্বনিত হইয়াছিল। সেই শঙ্খনাদই ঐক্যবিধায়ক—মঙ্গলময়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্যে বিশ্বাস করিতেন এবং তিনি মনে করিতেন—ভারতবর্ষই সে ঐক্যের পুণ্যভূমি। তাই তিনি গাহিয়াছিলেন :—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগোরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

এই ভারতবর্ষই নবদেবতার লীলাভূমি।

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

এই দেহই আমাদিগের ঐক্যবদ্ধ সমাজের দেহ। এখনও তাহার পুষ্টি চলিতেছে—

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

এই দেশের বৈশিষ্ট্য বিদেশীরাও ইহার আপন হইয়াছে। ইহার ঐন্দ্রজালিকদণ্ডের স্পর্শে

"রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি গিরিপথ মরুপ্রান্তর
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর।"

এই বৈশিষ্ট্যই ঐক্যের দ্যোতক। তাই ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষাদাতা কবি বলিয়াছেন :—

"এস হে আর্য, এস অনার্য
হিন্দু-মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃস্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এস হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্রকরা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের এই মন্ত্র উচ্চারণ করি—আশা করি, তাঁহার ঐক্যের সাধনা সফল হইবে।

# রবীন্দ্র-বৈশাখী

বেণু দত্তরায়

এই মাটি, এই মায়া : এর স্বাদ : মমতা-পরশ!
বারে বারে মধুবিন্দু হয়ে জমে মৃত্তিকার মনে :
রোমাঞ্চিত কম্পনের থরোথরো আবেশ অবশ—
নীল হয়ে জমা রয় গাঢ়তরো হিমার্ত-স্পন্দনে!

এই পাখী, এই আলো, এই নীল আকাশের চোখে,
এই যতো আশাতুরা স্বপনের মিঠে-মিতালিতে—
মনে হয় : সেই সুরে আঙুরের মতো থোকে-থোকে—
চেয়ে থাকে প্রাণ নিয়ে আপনারে স্নিগ্ধ করে নিতে!

বসুধারে মাঝে-মাঝে থেকে থেকে লাগে বড়ো ভালো;
মনে হয় : ছুটে যাই, লুটে নিই কামনার স্বাদ।
পশমের মতো নম্র বুক থেকে লুটে নিই আলো,
ভুলে যাই : প্রত্যহের সবকিছু দুঃখদৈন্য বেদনা-বিস্বাদ!

নিবিড় মাঠের প্রান্তে জলাবর্তে কলরব জাগে—
শিথিল চোখের গতি শ্লথ হয়ে নিভে নিভে আসে,
তবুও সংগীত শুনি : কান পেতে দীপ্ত অনুরাগে—
কোথাকার জয়ধ্বনি জেগে চায় আকাশে-বাতাসে!
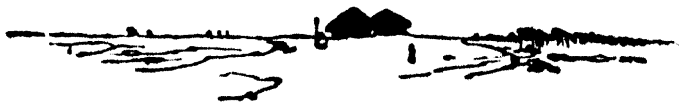
# রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ

.....প্রমথনাথ বিশী........

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ভারতবর্ষের আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের গৌরব তৎকালীন বাঙালী মনীষিগণ করিতে পারেন। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে এই আবিষ্কার উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত। আমেরিকা বলিতে একটি সুবৃহৎ ভূখণ্ড বোঝায়, কোন নূতন তত্ত্বকে বোঝায় না। আমেরিকা বৃহত্তর ইউরোপ—তাহার অধিক কিছু নয়। ইউরোপীয় জীবনতত্ত্ব আর আমেরিকীয় জীবনতত্ত্বে কোন প্রভেদ নাই—একটি আর একটির প্রক্ষেপ মাত্র। ইউরোপীয় জাতি ও সভ্যতাই আমেরিকার বিস্তৃততর ক্ষেত্রে গিয়া হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়াছে—এই যা প্রভেদ।

ভারতবর্ষ বলিতে একটি ভূখণ্ড বুঝি, অথচ ভারতবর্ষ বলিতে বিশেষ একটি জীবন-দৃষ্টি বুঝি। ভারতবর্ষের আবিষ্কার বলিতে বুঝি এই জীবনদৃষ্টির উদ্ধার। ইহা জাগতিক সত্য নয়, আন্তরিক বা তত্ত্বগত ব্যাপার। রেনেসাঁসের প্রেরণায় ইউরোপ বস্তুজগতের অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তার একটি প্রধান কারণ এই যে, বাহ্যজগতে অভিযান চালাইতে হইলে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবকাশ, ইউরোপের তাহার অভাব ছিল না, সেইজন্যই রেনেসাঁস পরবর্তী ইউরোপের দৃষ্টি জাগতিক সত্যের উদ্ধারে যেমন পড়িয়াছিল, আন্তরিক সত্যের প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কো-ডি-গামার পথে ভারতে আগমন, কিংবা পরবর্তীকালের কুকের পৃথিবী-পরিক্রমা আর গ্যালিলিওর দূরবীণ সহযোগে জ্যোতিষ্কলোকে অভিযান, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার সমস্তই মোটের একই পর্যায়ভুক্ত। সব ক্ষেত্রেই দৃষ্টিটা বহির্বিশ্বের রহস্যোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত।

উনবিংশ শতকের প্রথমে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে এদেশে যখন রেনেসাঁসের বিলম্বিত ঢেউ আসিয়া আঘাত করিল, তখন সদ্য-জাগ্রত ভারতীয় চিত্তেও একটা আভিযানিক ব্যাকুলতা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থাভেদে তাহার ফল ভিন্ন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র আশা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ সংস্পর্শ ভারতীয়-চিত্তকে লোকশিক্ষা, লোক-ব্যবহার ও জাগতিক সত্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে—কিন্তু তাঁহার সে আশা তেমন-ভাবে সফল হয় নাই। তার কারণ বহির্বিশ্বের দ্বার ভারতবর্ষের সম্মুখে অবারিত ছিল না—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না; বরঞ্চ ইহাই নিদারুণতর সত্য যে, ভারতবর্ষ পূর্বতন রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইল। বহির্জগৎ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল না বলিয়াই তাহার নবজাগ্রত চৈতন্য অন্তর্মুখী হইয়া গেল—অন্তর্মুখে যাত্রা করিয়া সে ভারত-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বসিল।

রেনেসাঁস ধর্মের দ্বারা উন্মেষিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকিলে খুব সম্ভব সে-ও অন্যান্য জাতির মতোই বাহিরের অভিযানে যাত্রা করিয়া বসিত, খুব সম্ভব তাহার নাবিকগণ ভারত মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিত, খুব সম্ভব তাহারা দক্ষিণ মেরুর তুষারস্তূপের উপরে আপন পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিত। কিন্তু এসব কিছুই ঘটিল না। এমন হওয়া যে অসম্ভব ছিল না, তার প্রমাণ আরও পরবর্তী কালে জাপান এই পথেই চলিয়াছিল। স্বাধীনতা হারাইবার পূর্বেই জগতে জাপান সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। রেনেসাঁসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃতিকেই সে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল—তাহারই প্রভাবে সে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল—জাপানের দৃষ্টি অন্তর্লোকে পড়িবার সুযোগ পায় নাই।

ভারতবর্ষ বলিতে একটি বিশেষ জীবনতত্ত্ব বা জীবন-দৃষ্টিকে বুঝায়—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই তত্ত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং পুরাণে, দর্শনে এবং কাব্যে তাহার অট্টালিকা, সৌধে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, চিত্রে এবং মন্দিরমালায় এবং সবচেয়ে জীবন্তভাবে তাহার মহাপুরুষগণের জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের অর্থবিপর্যয় ঘটিয়াছিল। অশোকের শিলালিপি অক্ষর পরিচয় বিস্মৃতিবশে যেমন থাকিয়াও ছিল না—ভারত-তত্ত্বেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। রামমোহন প্রমুখ মনীষিগণ সেই বিস্মৃত সত্যের পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহা সৃষ্টি নহে, আবিষ্কার মাত্র বলিয়া ইহার গৌরব লঘু করিয়া দেওয়া চলে না। আমেরিকাও তো কলম্বাসের সৃষ্টি নহে। তবে বিস্মৃত বা লুপ্ত সত্যের আবিষ্কার প্রায় সৃষ্টিরই সামিল। আবিষ্কারক সঙ্কীর্ণ স্রষ্টা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ শাসনের প্রথম ও প্রবল ঢেউটা বাঙলাদেশে আসিয়া লাগিয়াছিল। তাহার সুফল ও কুফল দুই-ই আমরা পাইয়াছি। সুফলের মধ্যে ভারত আবিষ্কার, কুফল এখন ভোগ করিতেছি; কিন্তু সে আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলাদেশে আসিয়া সবচেয়ে কায়েম হইয়া বসিলেও তাহার লুব্ধ দৃষ্টি গোটা ভারতবর্ষের প্রতি প্রসারিত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণী ও কমিসারিয়েটের চাকুরেগণ (ঈশ্বরদার স্বামী এবং গোরার তথাকথিত পিতার দল) কোম্পানীর তল্পি বহিয়া ভারতবর্ষে বাহির হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজধানী কলিকাতা কর্মময় ভারতের নাভিকেন্দ্রে পরিণত হইল। বহির্ব্যাপারে ভারতবর্ষ যে এক এই ধারণা অতিশয় অস্পষ্ট নীহারিকার আকারে তখন দেখা দিতে লাগিল। বস্তুগত এই ঐক্যটাই মনীষিগণের চিত্তে নূতন আকার ও অর্থলাভ করিল। বাঙালী মনীষিগণ ভারত-চৈতন্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিলেন। প্রথম জাগিলেন রামমোহন। তাঁহার বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠার মূলে ভারত-চৈতন্য নিহিত। আবার তিনি ইংরেজি শিক্ষা এবং ইউরোপীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রাদেশিকবোধের অনেক উচ্চতর স্তরের ব্যাপার। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতবাসী অখণ্ডত্ব বোধ করিতে শিখিবে, তিনি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, যুগধর্মোচিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই ভারতবাসীকে বিশ্বচিত্তের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে। অক্ষয় দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন; এদেশের নারী-সমাজের দুর্গতি স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষকে সম্বোধন করিয়া বিদ্যাসাগর খেদ করিয়াছেন; ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্থির করিয়াছিলেন যে, কেবল হিন্দী ভাষার মাধ্যমেই ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন সমাজ ঐক্যবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হইতে পারিবে; হিন্দু সভা, ভারত সভা ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ—সমস্তই ভারত চৈতন্যের চিহ্ন; সেকালে একা হেমচন্দ্র ভারত সঙ্গীত লেখেন নাই—ওইটাই সাধারণ নিয়ম ছিল—ভারতবর্ষকে স্মরণ করিয়াই সকলে শোক ও আনন্দপ্রকাশ করিত। বিবেকানন্দের ভারত-ভ্রমণ ভারতবর্ষকে নিবিড়তর ভাবে উপলব্ধির চেষ্টা। সবশেষে আসিলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি ভারততত্ত্বকে অমরবাণীরূপ দান করিয়াছেন। সেকালের বাঙালী মনীষিগণ মূলতঃ ভারতীয় ছিলেন, বাঙালীয়ানা তাঁহাদের মুখোস মাত্র। আর এ কালের ভারতীয় মনীষিগণের মুখোস খুলিয়া ফেলিলে মাত্র প্রাদেশিক সত্তা বাহির হইয়া পড়ে। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালী মনীষিগণ ভারততত্ত্বকে আবিষ্কার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।*

---

* মহাত্মাজী কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে ও দূরবর্তী ক্ষেত্রে থাকিয়া একই সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং স্বতন্ত্রভাবে একই পরিণামে ও মহত্তর সার্থকতায় উপনীত হইয়াছেন। বাঙালী মনীষীগণের হাতে যাহা ভাবরূপ মাত্র ছিল, গান্ধীজীর হাতে তাহা কর্মরূপ পাইয়াছে।

ভারতবর্ষ বা ভারততত্ত্ব বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ বলিতে যেসব আইডিয়ার সমষ্টিকে এখন আমরা বুঝি বহুলাংশে তাহা রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবনা। তাঁহার অমর বাণী এই ,ভাবমূর্তিকে ভাষা পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়াছে। ভারতবর্ষ বলিতে যে ধ্যানমগ্ন তাপসমূর্তিকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার চক্ষে দেখিতে পান—একবার তাহাকে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পান—"ঐ অবিচলিত শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে, যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ ঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে।"

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ সন্ন্যাসী। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, সন্ন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের চরমরূপ মনে করিতেন বা ভারতবর্ষ সন্ন্যাস সাধনা ব্যতীত আর কিছু করে নাই। সন্ন্যাসীর মধ্যে যে নির্বিকার নিরাসক্তি আছে, ভারতবর্ষ তাহাকেই জীবনধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সাধনা নিরাসক্তি যোগ। যথার্থ নিরাসক্তি ব্যতীত কোন মহৎ কার্য সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিই তো নিরাসক্তের দৃষ্টি। ব্যবসা-বাণিজ্যও কি অন্য কর্ম নিরাসক্ত না হইলে সম্ভব? ভারতবর্ষ এই নিরাসক্তি যোগকে তাহার লক্ষ্যের চরম পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে একেবারে জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। নিরাসক্তিকে সে জীবনের পরম নির্ভর করিয়াছিল বলিয়াই ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভালো-মন্দ খণ্ডচূর্ণ সমস্ত প্রকার বিরোধের মধ্যে, দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার কাজে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষের সাধনা সমন্বয়ের সাধনা—আর এই সাধনার পক্ষে নিরাসক্তি অত্যাবশ্যক।

"ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান সার্থকতা কি এই প্রশ্নের উত্তরদান উপলক্ষ্যে কবি বলিতেছেন,—"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—"ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব।......পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান ইউরোপের সাধনা unity, আর ভারতবর্ষের সাধনার বিষয় harmony। ইউরোপ বহুকে পিণ্ডীকৃত করিয়া এক করিয়া ভাবে এক হইল—unity স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষ বিচিত্রকে স্বীকার করিয়া, তাহাদের প্রকৃতি ভেদকে মানিয়া লইয়া স্বতন্ত্র করিয়াই রাখে—কিন্তু সমস্ত স্বাতন্ত্র্যকে একটি মহৎ ভাবের মধ্যে গ্রথিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে—ইহাই harmony। ইউরোপীয় জাতিসমূহ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কেপ কলোনি, আমেরিকা প্রভৃতি যে-সব অশ্বেতকায়-গণের দেশে গিয়াছে—সেখানকার অশ্বেত সমাজ উৎসাদিত হইয়াছে—তাহার কারণ আর কিছুই নয়—পরকে কি করিয়া আপন করিতে হয়, শ্বেত ও অশ্বেতের মধ্যে কিভাবে harmony স্থাপন করিতে হয়—সে রহস্য ইউরোপীয়গণের অজ্ঞাত। কিন্তু ভারতবর্ষের পন্থা ভিন্ন।

"পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে-প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।......ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।"

এই harmony স্থাপনকে ভারতবর্ষ কেবল সামাজিক বা রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে মাত্র প্রয়োগ করে নাই। ধর্মনীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিয়াছে। গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে এই harmony স্থাপনের প্রয়াসকেই দেখি—আর খুব সম্ভব এই কারণেই গীতা ভারতবাসীর ধর্মজীবনের পক্ষে ধ্রুব নক্ষত্রবৎ হইয়া বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে ভারতবর্ষের সমন্বয়বাদ পৃথিবীর সমক্ষে একটি মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিনি বলেন—"পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। একেকে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একেকে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা, নানা বাধা-বিপত্তি, দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"

মূলতঃ ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ বা ভারত-তত্ত্ব, এবং মূলতঃ ভারতবর্ষের এই রূপটি উনবিংশ শতকের রামমোহন প্রমুখ মনীষীর আবিষ্কার। তাঁহারা হয়তো কেহই রবীন্দ্রনাথের মতো অমরবাণীতে ইহাকে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকাশকে দেখিলে বলিয়া উঠিতেন—ইহাই আমাদের সাধ্য, ইহাই আমরা বলিতে চাহিতেছিলাম।

এখন এই ভারতবর্ষের, সমন্বয় যাহার ধর্ম, পৃথিবীর পক্ষে আজ একান্ত প্রয়োজন। যানবাহন রেল-রেডিও টেলিগ্রাফ-বিমানের সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সংস্কার ও স্বার্থ লইয়া একে অন্যের ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, সংঘর্ষের আর অন্ত নাই। এই সংঘর্ষ নিবারণের দুইটি উপায় আছে—এক উপায় ইউরোপীয় পন্থায় unity প্রতিষ্ঠা, আর এক উপায় ভারতীয় উপায়ে harmony প্রতিষ্ঠা। Unity স্থাপনের এক প্রকার চেষ্টা বৃটেনের দ্বারা হইয়াছে—সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, আর এক প্রকার চেষ্টা চলিতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বারা, বিভিন্ন জাতির গলায় অর্থনৈতিক ফাঁস আটকাইয়া দিয়া। পন্থায় কিছু ইতর বিশেষ থাকিতে পারে—কিন্তু পরিণাম একই। যাহা ঘটে তাহাকে unity না বলিয়া পিণ্ডীকরণ বলা উচিত। এই প্রকার চেষ্টায় 'বহু' এক হইতে পারে—কিন্তু গায়ের জোরে বিচিত্রকে এক করিয়া ফেলা [illegible] লক্ষ্য নয়, বিধাতার সেরূপ অভিপ্রায় হইলে তিনি বিচিত্রের সৃষ্টি না করিয়া একেবারে বহু গুণিত রূপ সৃষ্টি করিতেন। বহুর মধ্যে মিলন সাধনই সভ্যতার লক্ষ্য—বহুকে পিষিয়া এক করিয়া ফেলা কদাচ তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না। এই মিলন সাধনেরই নাম harmony—ইহা ভারতবর্ষের স্বভাবসম্পদ, ইহাই তাহার ধর্ম। সেই কারণেই আজ [illegible] সংঘর্ষপ্রবণ বিশ্বে ভারতবর্ষের একটি মহৎ মিশন আছে। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্ট [illegible] তপস্বী গান্ধীমূর্তিতে নূতন পাত্রে [illegible] সুধা বহন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বিধাতা বাঁধ দিয়াছেন আবার সেই সঙ্গে অমৃতেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিশ্বের পক্ষে ভারততত্ত্ব আজ অপরিহার্য ভাবে আবশ্যক। তাই বলিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষের আবিষ্কার আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে মহত্তর সম্ভাবনার স্থল।

# রবীন্দ্রনাথের ছবি

মুলক্‌রাজ আনন্দ

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা এক বিস্ময়ের বস্তু। এ শুধু বিশ্বকে বিস্মিত করে নি, বিস্মিত করেছিল স্বয়ং কবিকেও। অর্ধশতাব্দীকাল কাব্যলক্ষ্মীর একনিষ্ঠ চর্চার পর, কবির সত্তরোর্ধ্বে একদিন তারই ভিতর দিয়ে কলালক্ষ্মী আত্মপ্রকাশ করলো; কবিতার লাইনগুলোর কাটাকুটি আঁকজোক দিয়ে মেলাতে গিয়ে দেখলেন, তার মধ্যে এক-একটা অজানা ভাব চিত্র হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে, চোখের সামনে তুলে ধরছে এক রসঘন সত্তা। এসব চিত্র শিল্পজগতে এক নতুন রূপ নিয়ে এলো। প্রত্যেকের মনের মধ্যে বিশেষ ধরণের একেকজন শিল্পী বাস করে—তার নিজস্ব রূপ রস নিয়ে, চিত্তের নিভৃতি ভেদ করে কোনো এক সময়ে সে বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃজনীতে হয়েছে সেই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা।

কবির তুলির আঁচড়ে বেরুলো নতুন ছবি। সঙ্গে সঙ্গে বেরুলো সমালোচক। চোখে তাদের বিস্ময়। আরেক দল বেরুলো, চোখে বিভ্রান্তি। বললো, 'রবীন্দ্রনাথের ছবি—কিন্তু দেখতে তো কই ভালো লাগছে না এত যে সমাদর, এত যে প্রশংসা, লোকে করছে তা শুধু রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি এঁকেছেন বলেই।' সাধারণেরও হল দৃষ্টিভ্রম। মনে পড়ে এক বন্ধু আমাকে কবির কয়েকখানি ছবি দেখিয়ে বলেছিল, 'একে আপনারা ছবি বলেন? কি আছে এতে। পাঁচ বছরের ছেলেতেও এমন ছবি আঁকতে পারে।'

সমালোচকের কথা বাদ দিন; আমার আনাড়ী বন্ধুর অকপট উক্তিটি লক্ষ্য করুন। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যা সত্য, তার তাৎপর্যটুকু এ উক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কবি তাঁর বাহাত্তর বছরের বার্ধক্যে যা এঁকেছেন, এমনি ছবি পাঁচ বছরের ছেলেতে কখনো কখনো আঁকতে পারে বটে বা এঁকেছেও, একথা সত্যি। কিন্তু সেসব ছবিকেও তো বালকের চাপল্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলেই না, বরং তাতে ছন্দ ও ভাবের চমক এমনি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অনেক ঝানু শিল্পীর তুলি-রেখায়ও তা বিরল। যে-শিল্পী জীবনকে রেখায় রূপান্তরিত করতে আর্টের ইস্কুলে শিক্ষা করেছে, যে-শিল্পী ঠিক ফটোর মত নিখুঁত করে আঁকতে পারে বলে গর্ব করে, তার আত্মসচেতন চিত্রাঙ্কণেও কিন্তু ততখানি স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ ও ভাবের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট রূপ পেতে দেখা যায় না। ছেলেদের আঁকা কতকগুলো ড্রইং হাতে নিয়ে লক্ষ্য করলে বেশ বুঝতে পারবেন, কল্পনার উৎকর্ষের দিক দিয়ে, একাডেমিতে পোর্ট্রেট এঁকে হাত পাকিয়েছেন, এমন অনেক শিল্পীর থেকে সেগুলো উৎরে গেছে। কিন্তু যাঁরা প্রবীণ বলে গর্বে ফুলে আছেন, বালকের হাতের কাছে সৌন্দর্য বিকাশ পায়, এটা মেনে নিতে তাঁদের মর্মদাহ উপস্থিত হয়। ছন্দসৌষ্ঠব চিত্রের প্রধান স্থান জুড়ে আছে, তাকে ভাল করে বোঝে কজন? এই না বোঝার দরুণই শিল্পক্ষেত্রে যত মারামারি।

এখন দেখতে হবে ছন্দসৌষ্ঠব জিনিসটা আসলে কি। ছন্দ হচ্ছে এক রকম গতি, শিল্পী তাকে সাধারণ জীবন-বস্তু থেকে গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন ধরুন, নৃত্য—এখানে দেহের ছন্দসৌষ্ঠব যতটা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, প্লাস্টিক আর্টে ততটা পায় কি? চাষী ধান মাড়াই করছে কিংবা তাঁতি-বৌ সুতোর 'তানা' দিতে দিতে একবার এদিক একবার ওদিকে আসছে-যাচ্ছে; একে আমরা নৃত্য বলব না। তবু চাষা বা তাঁতি বৌ দুজনের কাজের মধ্যে একরকমের গতিছন্দ প্রকাশ পায়; নৃত্যশিল্পী এর থেকে তার নিজের জন্য গতিছন্দ বেছে নেয়, সেগুলোকে তার কল্পনার সাহায্যে রূপান্তরিত করে। তার ফলে, মূলে যেগুলো ছিল 'কাঁচা উপকরণ', তারই সমন্বয়ে হয় নূতন এক সৃষ্টির রূপায়ণ, যার মধ্যে প্রকাশ পায় নিজস্ব প্রাণসত্তা। অর্থাৎ চাষা বা তাঁতি-বৌর অমার্জিত প্রকাশ-ব্যঞ্জনাকে শিল্পী তার গঠনাকাঙ্ক্ষার জারক-রসে রসিয়ে এক নবতম

রূপ-সমন্বয় ঘটিয়েছে। হতে পারে, শিল্পীর অবচেতনায় , সংগুপ্ত কামনা তার শিল্প-সৃষ্টিকে শক্তি সঞ্চার করেছে, কিন্তু তার সৃষ্টি এখন সম্পূর্ণ নূতন এক সমগ্র বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছে—তার মধ্যে মূল বাস্তবের হদিস পেলেও বস্তু হিসেবে কত ভিন্ন! এইভাবে যখন প্রদর্শিত হয়, নৃত্যের কলা তখন দর্শকদের চোখে নূতন সৌন্দর্য, নূতন সৃষ্টি প্রতিভাত করে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-চরিতের সঙ্গে যাদের কিছু কিছু পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন, তিনি শৈশবেই নিজের মধ্যে এক ছন্দপ্রীতির আবিষ্কার করেছিলেন—ছন্দ সংগীতে, ছন্দ কথায়, ছন্দ চিন্তায়। পরিণত বয়সে নিজের লেখা শুদ্ধ করার সময় আঁচড়গুলোকে তাদের যথাভিলাষে চালিয়ে নেবার কালে আবিষ্কার করলেন আর এক ছন্দ—দেখলেন, তাঁর হাতে রেখার ছন্দও জেগে উঠেছে। তাঁর লেখার মধ্যে আগে যেসব কাটাকুটি তিনি করতেন, তাতে আঁচড়গুলো ডাইনে-বাঁয়ে বিসর্পিত হতো, সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অর্থাৎ কালো রেখার মাঝে মাঝে ভাসতো শাদা শাদা লাইন। এই শাদা-কালোয় মিশানো আবেষ্টনী লাইন টেনে জাগিয়ে তুলতেন একপ্রকার শৈল্পিক অলংকরণ। অনেক সময় পাতার উপর বেশ কয়টি লাইনে এই কাটাকুটি চলত। তখন এক লাইন থেকে আরেক লাইনে, তারপর আরেক লাইনে, নিবের উল্টো পিঠে, বুজানো আখরগুলোর উপর দিয়ে চলত রেখার পর রেখা। এই অবিচ্ছিন্ন রেখাগুলো সবাই মিলে ফুটিয়ে তুলত হয়ত একটা সাপের ছবি, গলায় তার ব্যাঙ আটকানো কিংবা একটা পাখী, ডানায় তার ওড়ার ছন্দ। অবশ্য ছাপাখানার যে-কোন একটা গেলি-প্রুফ দেখে বুঝতে পারবেন, তাতে যা কাটাকুটি হয়, সেগুলি আঁচড় টেনে বিভিন্ন দিকে বহিয়ে দিলে, ভিতরে শিল্পবোধ থাকলে, তার থেকেই নানান আকার আকৃতি বেরিয়ে পড়তে পারে। এ সমস্ত কাটাকুটির হিজিবিজি থেকেই আমাদের বৃদ্ধ, শিশুশিল্পী আরো জটিল অবয়বের রূপ দিয়ে চললেন। কখনো কখনো কালো কালি বয়ে চলেছে যেন শীতের পদ্মা, মাঝে মাঝে তার অসংখ্য শাদা বালুচর, অগণ্য নালা। আবার কখনো বয়ে চলেছে যেন হুগলীর গঙ্গার ভাঁটার স্রোত। এই প্রবহমান লাইনগুলি শীঘ্রই গহনতায় অবয়ব ধারণ করে—তৈলচিত্রশিল্পী যেমন মডেলের মুখের একদিক হালকা রেখে, অন্য পাশ গহীন করে তোলে, এও তেমনি। আবার,—কোনো একটা কেন্দ্র থেকে সেগুলো শাখাপত্র সমন্বিত হয়ে বিস্তৃত হয় এবং পরিশেষে চিত্রে পর্যবসিত হয়। বাঙলা দেশে আলপনার লতা যেভাবে আঁকে: একস্থান থেকে শুরু ক'রে শিল্পী-প্রেরণা যেদিকে তাকে টেনে নেয়, সেই দিকেই তা বিসর্পিত হয়। এভাবে, কোনো একস্থান থেকে যে গতি শুরু হল, বাধাহীন তার চলন, যখন শিল্পীর নিজের সমন্বয়-বোধ যেখানে নিয়ে ঠেকাবে, সেখানেই সে গতিছন্দের নির্বাণ। রবীন্দ্রনাথের জন্মলব্ধ ছন্দবোধ তাঁর লাইনগুলিতে প্রথম চেষ্টাতেই ভঙ্গীর স্বচ্ছতা এনে দিয়েছিল।

আদিম মানব শিশুর সহজ প্রেরণা নিয়ে চিত্রিত এই ছবিগুলির সঙ্গে কবির আত্ম-সচেতন কাব্য ও সাহিত্য সম্পর্ক একদম নেই বললে চলে। কবিতায় তিনি যে-সমস্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন, ছবিগুলি তার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আবার, কবিরূপে যখন তাঁর বিরাটত্বের সম্মুখীন হই, দেখি, তাঁর অন্তররাজ্যে রয়েছে এক ঐশিক প্রত্যাদেশ, তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রয়েছে এক মনোময় ছবি। কিন্তু শিল্পীরূপে এই বৃদ্ধের সম্বল মাত্র তাঁর হাতখানি। পূর্বকল্পিত ধারণা বা অভিপ্রায়—অঙ্কনের এসব মূলবস্তু সম্পূর্ণ পরিহার করে তিনি শুধু কলম চালিয়ে যান—যেদিকে সে যেতে চায় সেদিকেই যেতে দেন। এভাবে চলতে চলতে কলম আপনি এক প্রাণময় চিত্র এঁকে ফেলতে পারে। গার্চ্চরুড স্টেনের গদ্যরচনায় এর প্রমাণ মিলবে : তাতে কেবল হাতের জোরের অনুপ্রেরণায় অনেক শব্দ তৈরী হতে দেখা গেছে। তেমনি, কতকগুলি লাইনের সমষ্টি রবীন্দ্রনাথের অবাধ আঁকাবুকির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্র ফুটিয়ে তোলে, ধ্বনিত করে ছন্দময় রূপোচ্ছ্বাস। স্বপ্নচালিত ব্যক্তির বিপদঘন পথে পদচারণার মতই রবীন্দ্রনাথের তুলির পথচলা। এভাবে চলতে চলতেই সে পাতার 'পরে টানটোনের পশরা ভারী ক'রে ক'রে চিত্রের শেষ রূপসৃষ্টি সম্পন্ন করে। রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোক চোখে মেখে, যখন আমরা ঐ ছবি দেখি, মনে হয়, ঐ ছবি অনন্য, এ সৃষ্টি শুধু এই একটিই সম্ভব। অবশ্য সবগুলি লাইনের গতি যে ভ্রমরহিত তা নয়, অনেক লাইন হয়ত কোথাও গিয়ে পার পেলো না, তাকে তখন মধ্য পথে ছেড়ে দিতে হয়েছে। আবার, লাইনগুলি মিলে যে নমুনা তৈরী করল তাতে কোমলতার অভাবও লক্ষ্য করেছি: সে শুধু যখন কবি পরীক্ষামূলক-ভাবে আঁকছিলেন, তখন। তখনো কিন্তু লাইনগুলোর আলাদাভাবে এমন নমনীয়তা প্রকাশ পেতো, যার থেকে কবির শিল্প সাফল্যের পথে বিবর্তনের আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

কবির নিজের মধ্যে শিল্প-আবিষ্কারের যে বিশ্লেষণ আমরা করেছি, কবির নিজের কথাতেও তারই সত্যতা প্রতিধ্বনিত হবে। কবি মনোজ্ঞ ও রসাল ভাষায় তাঁর ছবি

আঁকার যে কৈফিয়ত দিয়েছেন, তা প্রণিধান করলে তাঁর শিল্পের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। তিনি এই মর্মে বলেছেন : 'আমি জেনেছিলুম, যে জিনিস নিজের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর, ছন্দ তাকে ক'রে তোলে বাস্তব। কাজেই, আমার পান্ডুলিপির মধ্যে আঁচড়গুলি যখন অপরাধী বন্দীর মত ছাড়া পাওয়ার জন্য কাঁদতো, আর তাদের দৈন্যদশা আমার নিজের চোখেও ঠেকত বিসদৃশ, আমি তখন নিজের কাজ রেখেও, বসে বসে সেগুলিকে ছন্দের অসীমে মুক্তি দিতুম।...এভাবে মুক্তি দিতে গিয়ে একটি জিনিস আবিষ্কার করলুম যে, গঠনের রাজ্যে সব সময়ে লাইনগুলো স্বভাবতই নিজের পথ বেছে নেয় এবং তাদের মধ্যে সেগুলি যোগ্যতম, যে গুলির নিজের মধ্যে ছন্দতৎপরতা আছে, সেগুলিই টিকে থাকে। বুঝলাম যদৃচ্ছাগামী এই ঘরছাড়াদের সুসম, সম্বিবদ্ধ, পূর্ণতার রূপ দেওয়াই হচ্ছে সৃষ্টি।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পকার্যের উপক্র-মণিকা স্বরূপ উপরে যা বললেন, তাতে যথেষ্ট সরলতা এবং মৃদুতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর এই সরল স্বীকারের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন মনে না করে যে, তাঁর শিল্পকলা মাত্র খেয়ালের খেলা। খেয়ালের বশে আঁকা অনেক চিত্র আমি সংগ্রহ করেছি, তার মধ্যে কতকগুলি আছে এইচ. জি. ওয়েলসের। ড্রইং করিতে তাঁর প্রতিভা এবং অনুপ্রেরণা দুইই আছে। সহজ খেয়ালের আঁকাবুকিরও অনেকগুলিতে কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট; ধারণার বিকাশ দেদীপ্যমান। ফটোগ্রাফ আর কমার্শিয়াল পোস্টার সাধারণ লোকের মনে রস সঞ্চার করে সত্য, কিন্তু এক ধরণের শিল্পীর মনে সেগুলি অনুভূতি জাগায় না—তাঁরা যা শিখেছেন তার থেকে স্বেচ্ছায় মুক্তি খোঁজেন তাঁদের অবচেতন জগতের সুস্পষ্ট আদিম এবং নির্মল অন্তর-সংবেদনকে প্রকাশ করার জন্য। রবীন্দ্রনাথের শিল্পবিকাশ অনেকটাই শেষোক্ত ধরণের।

বিভিন্ন কাটাকুটিকে যোগ ক'রে পাখীর ঠোঁট, উপদ্বীপ বা সাপের আকার দেওয়ার স্তর অতিক্রমের পর, মনে হয়, কবির অঙ্কন পৌঁছায় সাঙ্গীতিক স্তরে। কতকগুলি ছবিতে দেখেছি, লাইনগুলি যেন কোন এক অব্যক্ত সঙ্গীতের নেশায় নেশাতুর; তাই শুনতে তিনি তাদের ছেড়ে দিয়েছেন; ছবির বাঁকে বাঁকে যে আঁকাবাঁকাগুলি, পরস্পর জড়িয়ে আছে, তারা যেন সুরের তরঙ্গ। নিজের প্রভূত আত্মচেতনা সম্বন্ধে কবি কতখানি আত্ম-অচেতন যে ছিলেন, ভেবে আশ্চর্য হই। কতকগুলি চিত্র দেখে আমার কতিপয় বালকবন্ধু দৃষ্টিমাত্রই পিয়ানোর সুরে ধরতে পেরেছিলেন। প্রথম দিকে আঁকা অনেক ছবিতে কবি কোন নাম দেননি বলে তাদের বাইরের পরিচয়ার্থ খোঁজা নিরর্থক, এর অর্থ টানার অসারতা কবি স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন। সুচারু কারুর সবলতায় তাদের লাইনগুলি জীবন্ত এবং তারা স্বর্গলোকের বস্তুর মতই কোমল। তাদের নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে নিজের বাস্তব জগৎ—আবার তার চাইতেও তারা বড়।

এর অল্প পরেই কবি চিত্রে নাম সংযোগ করতে আরম্ভ করলেন। স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি এরও আগে আঙ্গিকের বিভিন্ন সূত্র সংগ্রহ শুরু করেছিলেন এবং বহিরঙ্গের সৌষ্ঠবসমন্বিত নক্সা করে চলেছিলেন। অবশ্য তারও শুরু হয়েছিল পান্ডুলিপি কাটকুটি শুরুর মতই। ছবিগুলোও ছিল আদিম প্রকৃতির। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর আঁকা শকুনি, কাক, পেলিকান পাখী, ঘুঘু, কিংবা মানুষের ছবি, ফুলের ছবি ধরুন। ছবিগুলি এসকলের ঠিক ঠিক প্রতিলিপি কোনক্রমেই নয়। কিন্তু তাঁর সৃজনী-বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া রূপান্তরিত হয়ে, তাঁর রেখাগুলি ছন্দমণ্ডিত রূপ পেয়ে এবং প্লাস্টিক ধরণ সম্বন্ধে তাঁর বোধশক্তির ব্যঞ্জনা নিয়ে সেগুলি উন্নত শিল্প হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। 'অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট' বা 'বিমূর্ত' কথাটি যদি নিন্দার্থে ব্যবহার না হত তা হলে আমি এখানে ছবিগুলিকে এই বিশেষণ দিতাম। তাতে অবশ্যই একথা বুঝত না যে, কবির অঙ্কন-মূর্তিগুলো বাস্তববোধের পরিচায়ক নয়। বরং আমার তো মনে হয়, সেগুলির বিষয় নির্বাচন ক্রমেই স্বপ্ন থেকে নেমে বাস্তবের মাটিতে পা রাখছে। তবে সব সময়েই সেগুলোতে থাকত তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রভূত প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে নিজের ভাবধারা থেকে অংকন শুরু করে, অঙ্গ-রূপের অনু-সংধানে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় শিল্পীদের থেকে সে সিদ্ধান্ত খুব তফাতের নয় বলে মনে হয়। (তাতে এই বোঝায় চিত্রে নাম-সংযোগ চিত্রের রস বোধে বা বিচারে অপরিহার্য নয়।) তফাতের যে নয়, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, কবির অংকিত একটি সুচারু বালিকার মস্তক আমেদিও মদীগলিয়ানীর আঁকা ডিম আকারের বালিকামস্তকগুলির প্রায় অনুরূপ। তাঁর কোন কোন ছবিতে রুশোর স্মৃতিচারিতের সৌরভ পাওয়া যায়। শিল্পের কোনো ঐতিহাসিক ধারা
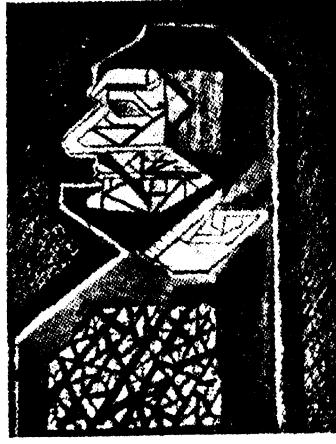
প্রবর্তন যা নানা দেশের শিল্পীমনে অজ্ঞাতে অবচেতনার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে, বাঙলা দেশের বোলপুর থেকে প্যারিস বা নিউইয়র্কের স্টুডিও পর্যন্ত দূর-দূরান্তরে তার পরিব্যাপ্তি ঘটতে পারে। শিল্পপ্রতিভার এই যে যোগাযোগ তা সকলের কাছে বিস্ময়ের বিষয় হলেও, যারা জানে তথাকথিত 'সভ্যতার' ভাওতায় এযুগের লোক কিভাবে বিভ্রান্ত হয়, সহজ, নির্মল তথাকথিত আদিম লোক-জনের পৌরাণিক কল্পনায় যাদের মন সাড়া দেয়, তারা জানে চিত্রের আঙ্গিকের এই রকম যোগাযোগে মোটেই বিস্মিত হবার কিছু নেই।

এখানে একটি অপূর্ব যোগাযোগের কথা বলছি। কবি রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা যে সময়ে পরিণত হচ্ছিল এবং তা মদীগলিয়ানীর স্টাইলের সমান হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে অন্য একজন কবি, তার নাম স্পানীয়ার্ড ফ্রেডারিকো গার্সিয়া লোরকা ছবি আঁকতে শুরু করলেন এবং তা শিল্পী সালভাদর দালীর চিত্রান্তর্গত ভাবধারণার প্রায় কাছা-কাছি পৌঁছে গিয়েছিল। তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতো স্বাধীন ভাবে স্বকীয় পন্থায় অঙ্কন শুরু করেছিলেন। এসকল শিল্পীর টেকনিকের যদিও গণ্ডী রয়েছে তবু, সে সৃষ্টি মহৎ। কেননা, তাদের প্রতিভার গোপন ঝরণা সহসা দ্বার খোলা পেয়ে বেরিয়ে আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়—শিখিয়ে দেয়, মানুষের সৃষ্টিশক্তি কতই ঐশ্বর্যবান, তার মনের অব্যক্ততায় সুযোগের সুযোগ ঘটনা মাত্রই সে আরও অনেক অনেক সৌন্দর্য আমাদের জন্য সৃষ্টি করতে পারে। আর, খুন যেমন একদিন বের হবেই বলে প্রবাদ আছে, তারই প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, মনের গোপনে যে অতলতা, তাতে স্পর্শ পাওয়া মাত্রই, চিত্রশিল্পও, কবিতার মত, সত্যের মত, বের হবেই।

# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

(১৪)
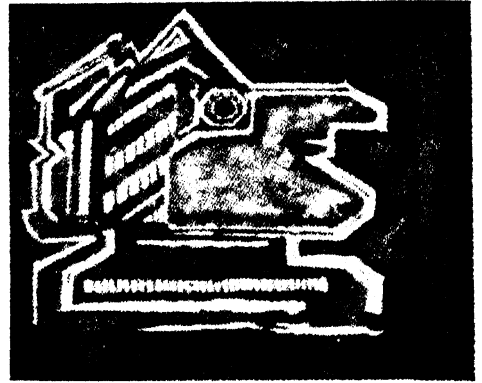
এক বৃদ্ধা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'পালা-পরবে নেমন্তন্ন পেলে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' তারপর বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'বাড়িতে যদি মেয়েকে রেখে যাও তাহলে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম না মন্দ করলুম-সঙ্গে যদি নিয়ে যাও তবে সকলের কাছ থেকে একই গালাগাল, এতদিন ধরে বিয়ে দাওনি কেন?'

দেশভ্রমণে দেখলুম একই অবস্থা। কোথাও পৌঁছেই প্রশ্ন দেশটার ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেব, কি দেব না। যদি না দাও তবে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম না মন্দ করলুম। যদি দাও তবে লোকের গালাগাল নিশ্চিত খেতে হবে। বিশেষ করে আফগানিস্থানের বেলা, কারণ, অরক্ষণীয়া কন্যার যে রকম বিয়ে হয়নি, আফগানিস্থানেরও ইতিহাস তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পোঁতা আছে সে দেশের মাটির তলায়, আর ভারতবর্ষের পুরাণ, মহাভারতে। আফগানিস্থান গরীব দেশ, ইতিহাস গড়ার জন্য মাটি ভাঙবার সৎসাহস আফগানের নেই, মাটি যদি সে নিতান্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলী মোন-জো-দড়ো বের করার জন্য নয়—কয়লার খনি পাবার আশায়। পুরাণ ঘাটাঘাটি করার মত পণ্ডিত কাবুলীর এখনো হয়নি—আমাদেরই কতটা হয়েছে কে জানে? পুরাণের কতটা সত্যিকার ইতিহাস আর কতটা ইতিহাস—পাগলাদের বোকা বানাবার জন্য পুরাণকারের নির্মম অট্টহাস তারি মীমাংসা করতে আর্ধেক জীবন কেটে যায়।

আফগানিস্থানের অর্বাচীন ইতিহাস নানা ফারসী পাণ্ডুলিপিতে এদেশে ওদেশে, অন্ততঃ চারখানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এদেশের মাল নিয়ে পণ্ডিতেরা নাড়াচাড়া করেছেন, মহম্মদ, বাবুরের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষের পাঠান-তুর্কী-মোগল যুগের ইতিহাস লেখার জন্য। কিন্তু বাবুরের আত্মজীবনী সঙ্গে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয়—আফগানের কথাই ওঠে না—পণ্ডিত কাবুল হিন্দুকুশ, বদখশান, বল্খ, মৈমানা হিরাতে ঘোরাঘুরি করেননি কারণ আফগান ইতিহাস লেখার শিরঃপীড়া নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনোও উদ্ব্যস্ত হননি। অথচ এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্থানের ইতিহাস না লিখে ভারত ইতিহাস লেখবার জো নেই, আফগান রাজনীতি না জেনে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ঠাণ্ডা রাখবার কোনো মধ্যমনারায়ণ নেই।

গোদের উপর আরেক বিষ-ফোঁড়—আফগানিস্থানের উত্তর ভাগ অর্থাৎ বল্খ-বদখশানের ইতিহাস তার সীমান্ত নদী আমু দরিয়ার (গ্রীক অক্সুস, সংস্কৃত বক্ষু) ওপারের তুর্কিস্থানের সঙ্গে, পশ্চিম ভাগ অর্থাৎ হিরাত অঞ্চল ইরানের সঙ্গে, পূর্বভাগ অর্থাৎ কাবুল-জলালাবাদ খাস ভারতবর্ষ ও কাশ্মীরের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা যুগে নানা রঙ ধরেছে। আফগানিস্থানের তুলনায় সুইটজারল্যাণ্ডের ইতিহাস লেখা ঢের সোজা—যদিও সেখানে তিনটে ভিন্ন জাত আর চারটে ভাষা নিয়ে কারবার।

আর শেষ বিপদ যে দু'চারখানা কেতাবপত্র আছে সেগুলো খুললেই দেখতে পাবেন, পণ্ডিতেরা সব রকমে উঁচিয়ে আছেন। 'গান্ধার' লিখেই সেই রকম—'?'—উঁচিয়েছেন, অর্থাৎ গান্ধার কোথায়? 'কাম্বোজ' বলেই সেই খড়্গ—'?'—অর্থাৎ 'কাম্বোজ' বলতে কি বোঝে? 'কম্বুকণ্ঠী' বা 'কম্বুগ্রীব' বলতে বোঝায় যার গলায় শাঁখের মতন তিনটে দাগ কাটা রয়েছে—যেমনতর বুদ্ধের গলায়। কম্বোজ দেশ কি তবে গিরি-উপত্যকার কণ্ঠী-ঝোলানো দেশ আফগানিস্থান, অথবা কম্বু যেখানে পাওয়া যায় অর্থাৎ সমুদ্রপারের দেশ বেলুচিস্থান? এমনকি দেশগুলোর নামের পর্যন্ত ঠিক ঠিক বানান নেই, যেমন ধরুন বল্খ—কখনো বল্খিকা কখনো বাহ্লিকা, কখনো বাহ্লীকা। সে কি তবে ফেরদৌসী উল্লিখিত বল্খ—যেখানে জরথুস্ত্র রাজা গোস্তাস্পকে আবেস্তা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন? সেখান থেকেই কি আজকের দিনের কাবুলীরা জাফরাণ আর হিং নিয়ে আসে? কারণ ঐ দুয়ের নামই তো সংস্কৃতে বাহ্লিকম্।

রাসেল বলেছেন, 'পণ্ডিতজন যেস্থলে মতানৈক্য প্রকাশ করেন মূর্খ যেন তথায় ভাবণ না করে।'

আমার ঠিক উল্টো বিশ্বাস—আমার মনে হয় ঠিক ঐ জায়গায়ই তার কিছু বলার সুযোগ—পণ্ডিতরা তখন একজোট হতে পারেন না বলে সে বারোয়ারি কিল থেকে নিষ্কৃতি পায়।

পণ্ডিতে মূর্খে মিলে আফগানিস্থান সম্বন্ধে যেসব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার মোটামুটি তত্ত্ব এই:—

আর্যজাতি আফগানিস্থান, খাইবার পাস হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—পামীর, দার্দিস্থান বা পিতৃভূমি কাশ্মীর হয়ে নয়। বোগাজ কোই বর্ণিত মিতানি রাজ্যের ধ্বংসের পরে যদি এসে থাকে তবে প্রচলিত আফগান কিংবদন্তী যে আফগানরা ইহুদীদের অন্যতম লুপ্ত উপজাতি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ কিংবদন্তী দেশ ঠিক রেখেছে কিন্তু পাত্র নিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে।

গান্ধারী কান্দাহার থেকে এসেছিলেন। পাঠান মেয়ের দৈর্ঘ প্রস্থ দেখেই বোধকরি মহাভারতকার তাকে শতপুত্রবতীরূপে কল্পনা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতবর্ষ—আফগানিস্থানের ইতিহাস স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। উত্তর ভারতের ষোড়শ রাজ্যের নিস্টেই গান্ধার ও কাম্বোজের উল্লেখ পাই। তাদের বিস্তৃতি প্রসার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে পণ্ডিতেরা সেই রামদা দেখান।

এ-যুগে এবং তারপরও বহুযুগ ধরে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে রকম কোনো সীমান্ত রেখা ছিল না, ঠিক তেমনি আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারশ্যের মধ্যে কোনো সীমান্ত ভূমি ছিল না। বক্ষু বা আমুদরিয়ার উভয় পারের দেশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের অংশরূপে ধরা হয়েছে, প্রাচীন ইরাণী সাহিত্যে তাকে আবার ইরাণের অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে।

তারপর ইরাণী রাজা কাইরাস (কুরুশ) সম্পূর্ণ আফগানিস্থান দখল করে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। সিকন্দর সাহেব সিন্ধুদেশ জয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ও পশ্চিম-সিন্ধু ইরাণের অধীনে থাকে।

সিকন্দর উত্তর আফগানিস্থান হয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেন কিন্তু তার প্রধান সৈন্যদল খাইবার পাস হয়ে পেশাওয়ারে পৌঁছায়।

খাইবার পেরোবার সময় সীমান্তের পার্বত্য জাতি পাহাড়ের চুড়াতে বসে সিকন্দরী সৈন্য দলকে এতই উদ্‌ব্যস্ত করেছিল যে গ্রীক সেনাপতি তাদের সহর গ্রাম জ্বালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সিকন্দারের সিন্ধুজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে রকম জোর দাগ কেটে গিয়েছে তেমনি গ্রীক অধিকারের ফলে আফগানিস্থান ও ভৌগোলিক আরিয়া, আরাখোসিয়া, গেদ্রোসিয়া, পারোপানিসোদাই ও দ্রাঙ্গিয়ানা অর্থাৎ হিরাত, বলখ, কাবুল, গজনী ও কান্দাহার প্রদেশে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপ নিতে আরম্ভ করে।

সিকন্দর সাহের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ দখল করে গ্রীকদের মুখোমুখি হন—ফলে হিন্দুকুশের উত্তরের বাহ্লিক প্রদেশ ছাড়া সমস্ত আফগানিস্থান তাঁর অধীনে আসে। মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অংশ হয়ে থাকে।

ভারতীয় আর্যদের চতুর্বেদ ও ইরাণি আর্যদের আবেস্তা একই সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু মৌর্যযুগে একদিকে যেমন বেদ-বিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয় অন্যদিকে তেমনি ইরাণি ও গ্রীক ভাস্কর শিল্প ভারতীয় কলাকে প্রায় সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। অশোকের বিজয়স্তম্ভের মসৃণতা ইরাণি ও তার রসবস্তু গ্রীক। সে যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় কলার যে-নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তার আকার রূঢ়, গতিপঙ্কিল কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বিকাশের আশায় পূর্ণগর্ভ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মধ্যন্তিক নামক শ্রমণকে আফগানিস্থানে পাঠান। সমস্ত দেশ বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করেছিল কি না বলবার উপায় নেই কিন্তু মনে হয় আফগানিস্থানের অনুর্বরতা বর্ণাশ্রমধর্মের অন্তরায় ছিল বলে আফগান জনসাধারণের পক্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। দুই শতাব্দীর ভেতরেই আফগানিস্থানের বহু গ্রীক সিথিয়ান ও তুর্ক বুদ্ধের শরণ নিয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বেদ—আবেস্তার ঐতিহ্য বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখে।

উত্তর আফগানিস্থানের বল্খ প্রদেশ মৌর্য সম্রাটদের যুগে গ্রীক সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। মৌর্য বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বল্খ অঞ্চলে গ্রীকদের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় ও বল্খের গ্রীকগণ হিন্দুকুশ অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকা দখল করে। তারপর পাঞ্জাবে ঢুকে গিয়ে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। এঁদের একজন রাজা মেনাণ্ডর (পালিধর্মগ্রন্থ 'মিলিন্দ—পঞ্হো'র রাজা মিলিন্দ) নাকি পূর্বে পাটলিপুত্র ও দক্ষিণে (অধুনা) করাচী পর্যন্ত আক্রমণ করেন।

মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্থান তথা পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজাদের কোনো ভালো বর্ণনা পাবার উপায় নেই। শুধু এক বিষয়ে ঐতিহাসিকের তৃষ্ণা তাঁরা মেটাতে জানেন। কাবুল থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বেগ্রাম উপত্যকায় এঁদের তৈরী হাজার হাজার মুদ্রা প্রতি বৎসর মাটির তলা থেকে বেরোয়। খৃঃ পূঃ ২৬০ থেকে খৃঃ পূঃ ১২০ রাজ্যকালের ভেতর অন্ততঃ উনত্রিশজন রাজা ও তিনজন রাণীর নামে চিহ্নিত মুদ্রা এ যাবৎ পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর উপরে গ্রীক ও খরোষ্ঠী এবং শেষের দিকের মুদ্রাগুলোর উপরে গ্রীক ও ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজারাণীর নাম পাওয়া যায়।

এ যুগে রাজায় রাজায় বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল কিন্তু আফগানিস্থান ও পশ্চিম ভারতের যোগসূত্র অটুট ছিল।

আবার দুর্যোগ উপস্থিত হল। আমু-দরিয়ার উত্তরের শক জাতি ইউয়ে-চিদের হাতে পরাজিত হয়ে আফগানিস্থান ছেয়ে ফেলল। কাবুল দখল করে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম দুদিকেই ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে তাদের বসতি পাকাপাকি হলে পর এই অঞ্চলের নাম সংস্কৃতে শকদ্বীপ ও ইরাণীতে সকস্তান হয়। বর্বর শকেরা ইরাণী, গ্রীক ও ভারতীয়দের সংস্রবে এসে কিছুটা সভ্য হয়েছিল বটে কিন্তু আফগানিস্থানের ইতিহাসে তারা কিছু দিয়ে যেতে পারেনি।

শকদের হারায় ইরান-পার্থিয়ানরা। এদের শেষ রাজা গন্দফারনেস নাকি যীশু খৃষ্টের শিষ্য সেন্ট টমাসের হাতে খৃষ্টান হন। কিন্তু এই সেন্ট টমাসের হাতেই নাকি আবিসিনিয়াবাসী হাবশীরা খৃষ্টান হয় ও এঁরই কাছে মালাবার ও তামিল নাডের হিন্দুরাও নাকি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মাদ্রাজের কয়েক মাইল দূরে এক পাহাড়ের সেন্ট টমাসের কবর দেখানো হয়। কাজেই আফগানিস্থানে খৃষ্টধর্ম প্রচার বোধকরি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কুষণ সম্রাটদের ইতিহাস তেমনি অজানা নয়। কুষণ বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম শক এবং ইরাণি পার্থিয়ানদের হারিয়ে আফগানিস্থান দখল করেন। কনিষ্ক পশ্চিমে ইরাণ সীমান্ত ও উত্তরে কাশগড়, খোটান, ইয়ারকন্দ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পেশাওয়ারের বাইরে কনিষ্ক যে স্তূপ নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধের দেহাস্থি রক্ষা করেন তার জন্য তিনি গ্রীক শিল্পী নিযুক্ত করেন। সে শিল্পী ভারতীয় গ্রীক না আফগান গ্রীক বলা কঠিন—দরকারও নেই—কারণ পশ্চিম ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে তখনো কৃষ্টিগত কোনো পার্থক্য ছিল না।

যে স্তূপে কণিষ্ক শেষ বৌদ্ধ অধিবেশনের প্রতিবেদন তাম্রফলকে খোদাই করে রেখেছিলেন তার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। জলালাবাদে যে অসংখ্য স্তূপ এখনো খোলা হয়নি তারি একটার ভিতরে যদি সে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তাহলে আফগান ঐতিহাসিকেরা (?) আশ্চর্য হবেন না। কণিষ্ককে যদি ভারতীয় রাজা বলা হয় তাঁকে তাহলে আফগান রাজা বলতেও কোনো আপত্তি নেই। ধর্মের কথা এখানে অবান্তর—কনিষ্ক বৌদ্ধ হওয়ার বহুপূর্বেই আফগানিস্থান তথাগতের শরণ নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে কুষণ রাজ্য পতনের পরও আফগানিস্থানে কিদার কুষণগণ দু'শ বছর রাজত্ব করেন।

এ যুগের সবচেয়ে মহৎ বাণী গান্ধার শিল্পে প্রকাশ পায়। ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে কলা বৌদ্ধধর্মকে রূপায়িত করে তার শেষ নিদর্শন দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তার যৌবন মধ্যাহ্ন আফগানিস্থান ও পূর্ব তুর্কীস্থানের ষষ্ঠ শতকের শিল্পে সপ্রকাশ। মথুরা শিল্প-প্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা ঋণী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। ভারতবর্ষের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কখনো কখনো গান্ধার শিল্পের নিন্দা করেছে—যেদিন বহুদূর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখব সেদিন জানব যে, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানকে পৃথক করে দেখা পরবর্তী যুগের কুসংস্কার। বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণায় ভারত [illegible] সার্বভৌমিক কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তী যুগে তা আর কখনো সম্ভবপর হয়নি। আফগানিস্থানের [illegible] থেকে যেদিন গান্ধার শিল্পের অবদান [illegible] সঙ্গে [illegible] সে দেশের চারুকলার ইতিহাস লেখা [illegible] ভারতবর্ষকে তার ঋণ স্বীকার করতে [illegible] করবে।

ভারতবর্ষে যখন গুপ্ত সম্রাটদের সংরক্ষণে সনাতনধর্ম হিন্দুরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল আফগানিস্থান তখনো বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেনি। মৌর্যদের মত গুপ্তেরা আফগানিস্থান জয় করার চেষ্টা করেননি, কিন্তু আফগানিস্থানের পরবর্তী যুগের শক শাসনকর্তাগণ [illegible] পঞ্চম শতকের চীন পর্যটক ফা হিয়েন কাবুল খাইবার হয়ে ভারতবর্ষে আসবার [illegible] করেননি, তবে সম্ভব আফগান সীমান্তের অরাজকতা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক দূরে অনেক কঠিন রাস্তা পাড়ি দিয়ে কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছেন।

তারপর বর্বর হূণ অভিযান ঠেকাতে গিয়ে ইরাণের রাজা ফিরোজ প্রাণ দেন। হূণ অভিযান আফগানিস্থানের বহু মঠ ধ্বংস করে ভারতবর্ষে পৌঁছয়—গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাদের যে-সব লড়াই হয় সেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে। এই হূণ এবং আফগানদের সংমিশ্রণের ফলে পরবর্তী যুগে রাজপুত বংশের সূত্রপাত।

সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ তাসখন্দ সমরকন্দ হয়ে, আমুদরিয়া অতিক্রম করে

কাবুলে পৌঁছান। কাবুলে তখন কিছু হিন্দু কিছু বৌদ্ধ। ততদিনে ভারতবর্ষে হিন্দু-ধর্মের নবজীবন লাভের স্পন্দন কাবুল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শান্ত ভারতবাসীই যখন বেশী-দিন বৌদ্ধধর্ম সইতে পারল না তখন দুর্ধর্ষ আফগানের পক্ষে যে জীবে দয়ার বাণী মেনে চলতে কষ্ট হয়েছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ করার কারণ নেই। হিউয়েন-সাঙ কান্দাহার, গজনী কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশরূপে গণ্য করেছেন।

এখন আরব ঐতিহাসিকদের যুগ। তাঁদের মতে আরবরা যখন প্রথম আফগানিস্থানে এসে পৌঁছয় তখন সে-দেশ কণিষ্কের বংশধর তুর্কী রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু পরে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে ব্রাহ্মণ্য রাজ্য স্থাপনা করেন। ৮৭১ সনে ইয়াকুব-বিন-লায়েস কাবুল দখল করেন। শাহিয়া বংশ তখন পাঞ্জাবে এসে আশ্রয় নেন—শেষ রাজা ত্রিলোচন পাল গজনীর সুলতান মাহমুদের হাতে ১০২১ সনে পরাজিত হন। আফগানিস্থানের শেষ হিন্দু রাজবংশের বাকি ইতিহাস কাশ্মীরে। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে তাঁদের বর্ণনা আছে।

এখানে এসে ভারতীয় পণ্ডিতগণ একে [illegible] ভুল করেন। আমি পণ্ডিত নই, আমার মনে হয় ভুল [illegible] কোনোই কারণ নেই। প্রথম আর্য অভিযানের সময় থেকে তারা [illegible] আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ নানা [illegible] নিয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একই ঐতিহ্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে [illegible] চেষ্টা করেছে। যদি [illegible] আফগানরা মুসলমান হয়ে গেল বলে [illegible] ইতিহাস [illegible], তারা এক-[illegible] অগ্নি-উপাসনা করেছিল, গ্রীক দেব-দেবীরও পূজা করেছিল, বোধিসত্ত্বের বৌদ্ধ-ধর্মও গ্রহণ করেছিল। তবুও যখন দুই দেশের ইতিহাস পৃথক করা যায় না, তখন তাদের মুসলমান হওয়াতেই হঠাৎ কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। কাবুলী বুদ্ধের শরণ নিয়ে [illegible] মগধবাসী হয়নি তেমন ইসলাম গ্রহণ করে [illegible] আরবও হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুসলিম আফগানিস্থান—বিশেষ করে কান্দাহার, গজনী, কাবুল, জালালাবাদ—বাদ দিলে ফ্রন্টিয়ার, বান্নু, কোহাট এমনকি পেশাওরও বাদ দিতে হয়।

পার্থক্য তবে কোথায়? যদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে সে শুধু এইটুকু যে, মাহমুদ গজনীর পূর্বে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস নেই, মাহমুদের পরে প্রতি যুগে [illegible] ভূগোল, নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের শক্ত জমি [illegible] উপর তো আর ইতিহাসের তাজ-মহল খাড়া করা হয় না।

মাহমুদের ইতিহাস নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল-বীরূনীর কথা বাদ দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল-বীরূনীর নাম করতে হয়। সংস্কৃত, আরবী অভিধান ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনো নেই), অল-বীরূনী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন মাধ্যমিক ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কি করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য অলঙ্কার, পদার্থবিদ্যা রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকীক-ই-হিন্দ' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিশ্বাস্য প্রহেলিকা।

একাদশ শতাব্দীতে অল-বীরূনী ভারত-বর্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন—প্রত্নাত্বের অন্ত পর্যন্ত কোন ভারতীয় আফগানিস্থান সম্বন্ধে পুস্তক লেখেন নি। এক দারাশিকোহ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আরবী ও সংস্কৃতে এরকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেন নি। এই বিংশ শতকেই কটি লোক সংস্কৃত আরবী দুই-ই জানেন আঙুলে গুণে বলা যায়।

ভারতবর্ষের পাঠান ও তুর্কী সম্রাটেরা আফগানিস্থানের দিকে ফিরেও তাকান নি, কিন্তু আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের কৃষ্টিগত সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আলাউদ্দীন খিলজীর সভাকবি আমীর খসরু ফার্সীতে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নাম ইরানে কেউ ভোলেন নি, কিন্তু কাবুল-কান্দাহারের [illegible] তাঁর প্রতিপত্তি হাফিজের চেয়ে কম নয়। [illegible] দেবলাদেবী ও খিজির খানের প্রেমের কাহিনী পড়েন নি, এমন শিক্ষিত মৌলবী আফগানিস্থানে আজও বিরল।

আফগানিস্থান [illegible] গজনীর [illegible] উত্তর ভারতবর্ষে ফার্সী ভাষা ও তার সাহিত্য-সম্পদ, [illegible]—[illegible]—[illegible] স্থাপত্য, ইতিহাস লিখন পদ্ধতি, ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞান, আরবী-ফারসী শব্দচর্চা ইত্যাদি প্রচলিত হয়, নূতন নূতন ধারা বয়ে নব নব বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। একদিন আফগানিস্থান গ্রীক ও ভারত-বাসীকে মিলিয়ে দিয়ে গান্ধার কলার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, পাঠান-তুর্কী যুগে সেই আফগানিস্থান আরব-ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হাত মিলিয়ে দিল।

তারপর তৈমুরের অভিযান।

তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ সমরকন্দ ও হিরাতে নূতন শিল্প-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানের হিরাত অতি সহজেই তুর্কীস্থানের সমরকন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৈমুরের পুত্র শাহ-রুখ চীন দেশ থেকে শিল্পী আনিয়ে ইরানিদের সঙ্গে মিলিয়ে হিরাতে নবীন চারু-কলার পত্তন করলেন। তৈমুরের পুত্রবধূ গৌহরশাদ শিক্ষাদীক্ষায় রাণী এলিজাবেথ, ক্যাথারিনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁর আপন অর্থে তৈরী মসজিদ, মাদ্রাসা দেখে তৈমুরের প্রপৌত্র বাবুর বাদশাহ চোখ ফেরাতে পারেন নি। এখনো আফগানিস্থানে যেটুকু দেখবার আছে, সে ঐ হিরাতে—যে কয়টি মিনার ইংরেজের বর্বরতা সত্ত্বেও এখনো দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো দেখে বোঝা যায় মধ্য-এশিয়ার সর্বকলাশিল্প কি আশ্চর্য প্রাণবলে সম্মিলিত হয়ে এই অনুর্বর দেশে কি অপূর্ব নন্দনবন সৃষ্টি করেছিল।

অল-বীরূনীর পর গৌহরশাদ—তারপর বাবুর বাদশাহ।

সেকালের পণ্ডিতের নির্লজ্জ জাতীভিমানের চূড়ান্ত প্রকাশ যখন সে বাবুরের আত্মজীবনী অপেক্ষা জুলিয়াস সীজারের আত্মজীবনীর বেশী প্রশংসা করে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবী থাক।

আফগানিস্থানে ভ্রমণ করবার সময় এক-খানা বই সঙ্গে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট—সে-বই বাবুরের আত্মজীবনী। বাবুর কান্দাহার গজনী কাবুল হিরাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আজকের আফগানিস্থানের বিশেষ তফাৎ নেই।

বাবুর ফরগণার রাজা নন, আফগানিস্থানের শাহিন শাহ নন, দিল্লীর সম্রাটও নন। আত্ম-জীবনীর অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পায়, বাবুর এদেরই মতই অত্যন্ত সাধারণ মাটির-গড়া মানুষ। হিন্দুস্থানের নব-বর্ষের প্রথম দিনে তিনি আনন্দে তরমুজ, জালালাবাদের আখ খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ—সেই আখ আপন দেশ ফরগণায় পৌঁছবার জন্য ঠিক করে হিন্দুকুশের চূড়ার দিকে তাকান করছেন, আর ঠিক তেমনি হিরাত থেকে গৌহর শাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা টেনে এনে দিল্লীতে পৌঁছে ভাবছেন এর ভবিষ্যৎ কি, এ-তরু মঞ্জরিত হবে তো?

হয়েছিল। তাজমহল।

বাবুর ভারতবর্ষ ভালোবাসেন নি। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে বুঝতে পেরে-ছিলেন, ফরগণা কাবুলের লোভে যে বিজয়ী তাঁর দিল্লীর তখ্‌ৎ ত্যাগ করে সে মূর্খ। দিল্লীতে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনা করলেন তিনি আপন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু দেহ কাবুলে পাঠাবার হুকুম দিলেন মরার সময়।

সমস্ত কাবুল শহরে যদি দেখবার মত কিছু থাকে, তবে সে বাবুরের কবর।

হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান আওরঙ্গজেব। নব মৌর্য সাম্রাজ্য।

নাদির উত্তর ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে ফেরার পথে আফগানিস্থানে নিহত হন। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য আফগান আহমদ শাহ আবদালীর (সাদদোজাই দুররানী) হস্তগত হয়। ১৭৪৭ সালে সমস্ত আফগানিস্থান নিয়ে সর্বপ্রথম নিজস্ব রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৬১ সালে পাণিপথ। ১৭৯৩ সালে শিখদের নবজীবন।

ইতোমধ্যে মহাকাল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ভারতবর্ষে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করেছেন। ভারত-আফগানের ইতিহাসে এই প্রথম এক-জাতের দেখা দিল যে, এই দুই দেশের কোন দেশকেই আপন বলে স্বীকার করল না। এযেন চিরস্থায়ী তৈমুর-নাদির।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে ইংরেজ হয় আফগানিস্থান জয় করে রাজ্য স্থাপনা করার চেষ্টা করেছে, নয় আফগান সিংহাসনে আপন পুতুল বসিয়ে রুশের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আফগানিস্থান জয় করা কঠিন না হলেও দখল করা অসম্ভব। বিশেষত, 'কাফির' ইংরেজের পক্ষে। আফগান মোল্লার অজ্ঞতা তার পাহাড়েরই মত উঁচু, কিন্তু ইংরেজকে সে বিলক্ষণ চেনে।

ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে, ১৮৫৭ সালে আমীর দোস্ত মুহম্মদ ইংরেজকে দোস্তী দেখিয়েছিলেন। তার চরম সৌভাগ্য যে, ১৯১৫ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমীর হবিবউল্লাকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করতে পারেন নি।

কিন্তু তিন বারের বার বেল টাকে পড়ল। আমানউল্লা ইংরেজকে সামান্য উত্তম-মধ্যম দিয়েই স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন। তাই বোধ হয় কাবুলীরা বলে 'খুদা-দাদ' আফগানিস্থান অর্থাৎ 'বিধিদত্ত আফগানিস্থান।'

জিন্দাবাদ খুদা-দাদ আফগানিস্থান!

(ক্রমশ)

# হিন্দুসমাজ ও তাহার ইতিহাস

## শ্রীনির্মলকুমার বসু

### নুলিয়া জাতি

হিন্দু সমাজে প্রতি জাতির বৃত্তিতে অথবা আচার অনুষ্ঠানে কোন না কোন বিশেষত্ব দেখা যায়। পুরী বা গঞ্জাম জেলায় নুলিয়া নামে পরিচিত এক জাতি বাস করে। তাহাদের মধ্যে সত্য সত্যই কিন্তু দুইটি জাতি বাস করে: এক জাতির নাম জালারি, অপরের নাম ওয়াডা-বালিজি। জালারিগণের কৌলিক বৃত্তি জালের সাহায্যে সমুদ্রে মাছ ধরা। কিন্তু ওয়াডা-বালিজিরা আগে জাহাজে মাঝি-মল্লার কাজ করিত; সে কাজ যাওয়ায় তাহারাও আজকাল মাছ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রবাদ আছে যে, জালারিগণ প্রথমে ইহাদিগকে জাল তৈয়ারির বিদ্যা কিছুতে শিখাইতে চায় নাই। এমন কি, পাছে রাত্রে তাহারা জাল চুরি করে এই ভয়ে প্রত্যহ কাজের পর জাল পোড়াইয়া ফেলা হইত, আবার ভোরের আগেই জাল তৈয়ারি করিয়া লইত। কিন্তু একদিন নাকি পোড়া জালের ছাই পরীক্ষা করিয়াই ওয়াডা-বালিজিগণ জাল নির্মাণের বিদ্যা শিখিয়া ফেলে এবং মাছ ধরার ব্যবসা আরম্ভ করে। ইহাদের উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নাই। জালারিগণ বলিয়া থাকে যে, সামাজিক পদ-মর্যাদায় তাহারাই বড়; ওয়াডা-বালিজিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেও আবার তাহারা তাই বলে। সামাজিক অনুষ্ঠানে উভয় জাতি একত্র আহার করে না। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উভয়ের মধ্যে আর্থিক অবস্থায় যেমন সামান্য তারতম্য আছে তেমনই আচার-ব্যবহার এবং পূজা-পার্বণের খুঁটিনাটি লইয়াও সামান্য ইতর-বিশেষ বর্তমান। তবে পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় জাতি তেলুগু ভাষায় কথা বলে এবং মোটের উপর একই ধরনের সংস্কৃতি পালন করিয়া থাকে। সেই সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পূর্বে অপরাপর হিন্দু জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্কের বিচার করিতে হয়।

পুরী অথবা গঞ্জাম জেলার নুলিয়াগণ সমুদ্রে মাছ ধরা, নৌকা চালানো, কিছু কিছু মুটে মজুরের কাজকর্ম লইয়াই থাকে। সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ অপর কোন জাতি করে না। নুলিয়ারা মাছ ধরিয়া আনে, অপর লোককে থাউকা অথবা খুচরা বিক্রয় করিয়া দেয়। তাহাতে যে পয়সা হয় সেই পয়সা দিয়া তাহারা হাট-বাজার করে, পোষাক-পরিচ্ছদ বা অলংকার কেনে এবং ঘরদুয়ার নির্মাণ করে। নুলিয়াদের নৌকা ওড়িয়া ছুতারে গড়ে না, এ কাজের জন্য নিজেদের ছুতার আছে। সুতা কিনিয়া ইহারা নিজে জাল বুনিয়া তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের কষ দিয়া পাকাইয়া লয়। বৃহত্তর হিন্দু সমাজে তাহাদের এইরূপ স্থান। ওড়িশা বা গঞ্জামের অধিবাসিগণ যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে, তাহার মধ্যে কেহ কেহ মাটির চাষ করিয়া ধান জন্মায়, কেহ সুতা বুনিয়া কাপড় করে, কেহ নদীর ধারে বা পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরে বা নৌকা চালনা করে, বনের মধ্যে কেহবা মধু, মোম, ধুনা, বৃক্ষের লতাপাতা নির্মিত দড়ি বা অপর সামগ্রী বিক্রয় করে; নুলিয়াদের উপরে সমুদ্র হইতে মাছ আহরণ করিবার ভার পড়িয়াছে। এইরূপ সকলে মিলিয়া শ্রম বিভাগের দ্বারা এবং স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃতির নিকট হইতে যাবতীয় বস্তু সংগ্রহ বা নির্মাণ করিয়া লয়; সকলের জীবন সুখে দুঃখে এক রকম করিয়া চলিতে থাকে।

### নুলিয়াদের ধর্ম

বৃহত্তর হিন্দু সমাজে স্থান পাওয়ার পরে নুলিয়াগণ কিরূপ আচার-ব্যবহার পালন করে তাহা এইবার পরীক্ষা করা যাক। নুলিয়াগণ হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে এবং তাহাদের সামাজিক সংস্কারে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের স্থান আছে। দেবদেবীর পূজা কিন্তু নুলিয়াগণ নিজেরাই করিয়া থাকে। পূজার ব্যাপারে অধিকার সর্বত্র হয় না, সে অধিকার পুরো শিক্ষাপরম্পরায় চলিয়া থাকে। কেবল গ্রাম দেবীর পূজার জন্য একটি নির্দিষ্ট বংশ আছে, দেবী নাকি সেই বংশেই কোন সময় আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অপরাপর দেবতাদের মধ্যে নৃসিংহ এবং মহাদেব প্রধান। ইহাদের নিজের বিশেষ কোন চাহিদা নাই, কিন্তু দেবতার অনুচরদিগকে সন্তুষ্ট করিতে নুলিয়াদের যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। অনুচর বর্গের নামও সংস্কৃত নহে, তেলুগু ভাষায় হয়। উদাহরণস্বরূপ অংক-পলাম্মা, এনেগী শক্তি, দইম্মা সম্বরদের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের খাঁই বড় বেশি। গ্রামে রোগ হইলে বুঝিতে হইবে পূজার প্রয়োজন হইয়াছে; বাড়িতে কোন উৎপাত হইলেও তাই। এ সকল ক্ষুদ্র দেবতার পূজায় মোরগ, শূকর প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।

একবার এইরূপ এক পূজায় উপস্থিত ছিলাম। এক গৃহস্থের বাড়িতে পর পর কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। গুণী লক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছিল যে, গৃহস্থের পিতার আত্মা শান্তি লাভ করে নাই; কারণ নরসিংহ প্রভৃতি দেবতার মধ্যে তাহা লীন না হইয়া এনেগী-শক্তির নিকটে তখনও আবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব

এনেগী-শক্তির নিকটে একটি মোরগ বলি দিতে হইবে এবং একটি মাটি বা কাঠের ঘোড়া উৎসর্গ করিতে হইবে। দেবতা পূজার দ্বারা শান্ত হইলে গৃহস্থের পিতার আত্মা সেই ঘোড়ায় আরোহণ করিবেন।

নুলিয়াটির বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, গুণী পুরুষ মানুষ হইলেও শাড়ী পরিয়াছে এবং চুলে বিনুনি বাঁধিয়া স্ত্রীলোকদের মত সাজ করিয়াছে। আর আট দশজন নুলিয়া তাহার চারিদিকে মোরগ, নৈবেদ্য, ছোট খেলনা ঘোড়া লইয়া ঘিরিয়া আছে।

গুণী নাচিতেছে। ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ নাচিবার পর সে বাহিরে আসিয়া পথের মধ্যে কাঠের তরোয়াল ঘুরাইয়া নানাবিধ অংগভংগি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, যতক্ষণ না গুণীর উপরে দেবতার ভর হয় ততক্ষণ নাচ চলিতে থাকে; ভর হইলেই নাচ ত্যাগ করিয়া সকলে গ্রামের প্রান্তে এনেগী-শক্তির মন্দিরে বলি দিতে যাইবে। কিছুক্ষণ নাচ চলিবার পরে গুণীর নৃত্যের বেগ খুব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই সময়ে অপর একজন লোক গান গাহিতে গাহিতে তাহার মুখের সম্মুখে একটি মুরগীর ডিম ধরিয়া জোরে দোলাইতে লাগিল। গুণী নাচিতে নাচিতে হঠাৎ সেই ডিমে এক কামড় দিল। তৎক্ষণাৎ বুঝা গেল যে, দেবী এতক্ষণে গুণীর উপরে ভর করিয়াছেন; এবং সকলে বাজনা এবং নাচ থামাইয়া তাড়াতাড়ি এনেগী-শক্তির মন্দিরে উপস্থিত হইল। এনেগী-শক্তির মন্দিরে পৌঁছিয়া মোরগটিকে বলি দেওয়া হইল। দেবীর সম্মুখে প্রথমে তাহাকে দাঁড় করাইয়া গুণী, যজমান ও সমবেত নৃত্যরত জন স্তুতি করিতে লাগিল, "দেবি, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। বহু যত্ন করিয়া পুষিয়া দিয়াছি, কেন লইতে দেবী বিলম্ব করিতেছ?" গুণী মাঝে মাঝে মোরগের গায়ে জল ছিটাইতেছিল। তাহাদের বিশ্বাস যে, মোরগ যতক্ষণ পর্যন্ত গা-ঝাড়া দিবে না ততক্ষণ দেবতা বা যজমানের পিতৃ-পুরুষ তাহাকে গ্রহণ করেন নাই। বর্তমান ক্ষেত্রে মোরগটি কয়েকবার শুধু মাথা বা ঘাড়ের পালক নাড়িয়া জল ঝাড়িয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়, অবশেষে প্রায় আধ ঘণ্টা কাকুতি-মিনতি করার পর সে একবার গা-ঝাড়া দিল; তখন তাহাকে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। মোরগটিকে বলি দেওয়ার রীতিও বিচিত্র। ইহার জন্য লোহার কোন অস্ত্র ব্যবহার করা চলিবে না। গা-ঝাড়া দেওয়া মাত্র গুণী মোরগটিকে তুলিয়া নিজের হাঁটুর উপরে তাহার পিঠ রাখিয়া দুই হাতে তাহার পা দুখানি ধরিয়া সজোরে টানিতে লাগিল। কিছু টানিবার পর পেটের উপরকার চামড়া টানের চোটে ছিঁড়িয়া ফাটিয়া গেল। তখন গুণী পেটের মধ্যে আঙুল ঢুকাইয়া নাড়ি-ভুঁড়ি ও কলিজা পর্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। সেই নাড়িগুলি মৃত মোরগটির গলায় পাকাইয়া কলিজাটিকে যতদূর সম্ভব তাহার মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া হইল এবং সেই অবস্থায় দেবীর সম্মুখে বলি নিবেদন করা হইল।

নুলিয়াদের যাবতীয় বলিদানের মধ্যেই এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা দেখা যায়। গ্রাম-দেবী অক্ক-পলাম্মার পূজাতেও এক কাঠের গাড়িতে বাঁশের শূলে দুইটি শূকর-শাবককে জীবিত অবস্থায় গাঁথিয়া দেওয়া হয়। শূকরগুলি তীব্র আর্তনাদ করিতে থাকে এবং গ্রামশুদ্ধ লোক মহা কোলাহল করিতে করিতে গাড়ি লইয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। নুলিয়াদের বলিদানের প্রথা নিষ্ঠুর বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তাহারা স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর প্রকৃতির। নুলিয়া জাতি অত্যন্ত ভদ্র ও সংস্বভাবসম্পন্ন। তবে তাহাদের বিশ্বাস, যে-দেবী স্বয়ং নিষ্ঠুর তাঁহার চাহিদাও নিষ্ঠুর হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টায় তাহারাও সাময়িক ভাবে নিষ্ঠুর আচরণ করে।

যেহেতু নুলিয়ারা যে নিষ্ঠুর আবহাওয়ার মধ্যে থাকে, সেখানে প্রকৃতির রুদ্রমূর্তিরই পরিচয় বেশী পায় বলিয়া নিজেদের মধ্যে নিষ্ঠুর রূপকেই তাহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। পুরী অথবা গোপালপুরে শীত ভিন্ন অপর সকল ঋতুতেই সমুদ্রের ঢেউ অত্যন্ত প্রবল বেগে বহিতে থাকে। তাহার ভিতর ছোট ছোট ভেলা ভাসাইয়া দিনের পর দিন নুলিয়ারা মাছ ধরে। কোন কোন দিন তরংগের প্রচণ্ড আঘাত ভেদ করিয়া ভেলা লইয়া যাওয়া সম্ভবই হয় না। তদুপরি সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়া বড় বড় হাঙর, শংকর মাছ প্রভৃতি জীবের আশংকা তো আছে। বহুদিন সমুদ্রের সহিত কারবার করিবার ফলে নুলিয়া জাতি যেমন একদিকে সাহসী হইয়াছে, অপর দিকে সমুদ্রের বিষয়ে নানাবিধ জ্ঞানও অর্জন করিয়াছে। ঢেউয়ের শব্দ শুনিয়া তাহারা বলিতে পারে, কি ভাবের স্রোত বহিতেছে। পাড়ের সমান্তরালভাবে না তির্যকভাবে, শুধু উপরের স্তরে না নীচের দিকে, মাছ আসিবে অথবা আসিবে না। শুধু ঢেউ দেখিয়া ও শব্দ শুনিয়া উহারা এ সকল অনুমান করিয়া লয়। এই জ্ঞানটুকু সম্বল করিয়া, ধৈর্য এবং সাহসে ভর দিয়া নুলিয়া জাতি জীবন-যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু এত সত্ত্বেও সব সময়ে তাহারা লাভবান হয় না। হয়ত সকল লক্ষণই ভাল, পরিশ্রমও যথেষ্ট করা হইল, তবু জালে যথেষ্ট মাছ উঠিল না; দৈব বলিয়াও তো কিছু আছে!

এরূপ অবস্থায় তাহারা প্রকৃতির মধ্যে আঘাত এবং অনিশ্চয়তাকে বড় করিয়া দেখিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সেই আঘাতকেই তাহারা দেবতার আসন দিয়াছে এবং নানাবিধ নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানের সাহায্যে তাহারই পূজা সম্পাদন করিয়া থাকে। নুলিয়া জাতি নরসিংহ, মহাদেব প্রভৃতি দেবতার শান্তমূর্তি পূজা করিলেও অধিকাংশ অর্ঘ্য নীচের স্তরের নিষ্ঠুর দেবদেবীর নিকটে নিবেদন করিয়া থাকে। দারিদ্র্য, অজ্ঞান এবং প্রকৃতির অনিশ্চয়তার বেড়াজাল, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা অতিক্রম করিতে পারিলে হয়ত তাহাদের মন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিবে এবং তাহাদের চরিত্রেরও সহজ বিকাশ সম্ভব হইবে।

## নুলিয়া সমাজ

নুলিয়াদের মধ্যে ওয়াডা-বালিজি জাতির সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইতেছেন গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত মাণ্ডাসা নামক জমিদারীর রাজা। বর্তমান রাজার নাম সাহীলিপিলি নারায়ণ স্বামী। তিনি ওয়াডা-বালিজি জাতির লোক এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সমস্ত প্রধান ওয়াডা-বালিজি গ্রামে উপস্থিত হইয়া কয়েক বৎসরের সঞ্চিত সামাজিক বিবাদ মিটাইয়া আসিতে হয়। সামাজিক ব্যাপারে ওয়াডা-বালিজিগণ মাণ্ডাসার রাজার নির্দেশ সর্বতোভাবে মানিয়া চলে।

ওয়াডা-বালিজিগণের মধ্যে একটি কুলের পদবী অক্ক; সেই বংশের লোকের নাম এইরূপ হয়, অক্ক কররাম্মা, অক্ক রামাইয়া ইত্যাদি। ওয়াডা-বালিজি গ্রামে অক্ক পলাম্মা নাম্নী এক দেবী প্রধান। সে দেবী অক্ক বংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ক-বংশের বিশেষ সম্মান আছে। পুরীর নুলিয়া বস্তির শাসন-ভার গ্রামের একজন প্রধানের হাতে ন্যস্ত আছে, তাহার পদবী উর-পেডা। উর শব্দের অর্থ গ্রাম এবং পেড্ডা শব্দের অর্থ প্রধান। উর-পেডার একজন কার্যাধ্যক্ষ অথবা কারিজি থাকে, তদুপরি একজন চাপ্রাশীর দরকার হয়, তাহাকে সাম্মিটোচু বলে। অক্কবংশীয় লোকেরা এক বিশেষ পরিবার হইতে উর-পেডাকে নির্বাচন করে। নির্বাচন সিদ্ধ হইলে উর-পেডা মাণ্ডাসার রাজার নিকট হইতে একখানি সম্মতিপত্র লাভ করে। অক্কবংশীয় লোকের পক্ষে যদি উর-পেডা নির্বাচন করা সম্ভব না হয়, তবে গ্রামের জনসাধারণ সেই নির্বাচনের ভার লয়। উর-পেডা যদি স্বীয় দায়িত্ব ঠিকমত পালন করিতে না পারে, তবে গ্রামের লোক তাহার পদে নূতন লোককেও বহাল করিতে পারে; কেবল সেই ব্যক্তি উর-পেডা যে বংশের, সেই বংশের হওয়া চাই। একবার পুরীতে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তৎপরে মাণ্ডাসার রাজা যখন সেখানে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার কাছে অনেক কাকুতি-মিনতির পর সাধারণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে তবে পুরাতন উর-পেডাকে স্বীয় পদে ফিরাইয়া আনা হয়।

উর-পেডার কাজ পূর্বে হয়ত অনেক বেশি ছিল। কিন্তু এখন দণ্ডের ভার গভর্নমেণ্টের হাতে চলিয়া যাওয়ায় তাহার কাজ কমিয়া গিয়াছে। বিবাহ বা সামাজিক ক্রিয়াকর্ম অথবা গ্রামের ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেওয়াই এখন তাহার প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উর-পেডা কারিজি এবং সাম্মিটেড়ুর পদ আজীবন থাকে। কেহ মারা গেলে তখন তাহার স্থলে নূতন লোক অভিষিক্ত হয়।

পুরীতে ওয়াডা-বালিজিদের গ্রামে প্রায় পাঁচশত ঘরের বাস। সাধারণ ব্যাপারে সকলে একত্র চলিলেও বিবাহের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সমগ্র গ্রামের মধ্যে এক বিচিত্র ভাগ দেখা যায়। নুলিয়াদের বাড়িগুলি ছোট আকারের, সচরাচর তাহাতে দুই-তিনটির বেশি ঘর থাকে না। এক ঘরে স্বামী-স্ত্রী এবং ছোট ছেলেমেয়েরা শোয়, অপর ঘরে সংসারের কাজকর্ম ও রান্নাবান্না হয়। আর একটি অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে দেবতা ও পিতৃপুরুষের আসনস্বরূপ একটি বেদী থাকে। তাহা ছাড়া জাল বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও রাখা হয়। বয়স্ক ছেলেরা বাড়ির বাহিরে রকে অর্থাৎ ঢাকা বারান্দায় শুইয়া থাকে। একটু বড় হইলেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায় বলিয়া তাহাদের ঘরের মধ্যেই শুইতে দেওয়া হয়। বিবাহ হইলে নূতন গৃহস্থকে স্বতন্ত্র ঘর করিতেই হয়। বাপ মারা গেলে সকল ভাই বাড়ির উপরে অধিকার পায় বটে, কিন্তু বাড়িগুলি ছোট হওয়ায় ভাগ করা সম্ভব হয় না। তখন বড় ভাই পৈত্রিক বাড়ি অধিকার করিয়া অপর ভাইদের জন্য অন্যত্র ঘর নির্মাণে করায় যথাসাধ্য সাহায্য করে।

পুরীর নুলিয়া বস্তিটি সামাজিক ক্রিয়াকর্মের জন্য তেরটি বিভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভাগকে **বিরিসি** বলে। বিরিসির নিয়ম হইল, বিরিসির মধ্যে যদি কোন ঘরে বিবাহ হয়, তখন বিরিসির সকল পরিবার আসিয়া সেই বাড়িতে খাটিয়া দিয়া যায়। বিবাহের কয়দিন সকলে সেই বাড়িতেই খায়-দায়, কাজ করে বা আনন্দ করে।

নুলিয়া সমাজে বিবাহ সচরাচর অল্প বয়সে হয়। বরের বয়স সতের-আঠার এবং কনের বার-তের; ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে কদাচিৎ পাঁচ-ছয় বছরের ছেলের সহিত তিন-চার বছরের মেয়ের বিবাহও ঘটিয়া থাকে। ঊর্ধ্বপক্ষে বরের আঠার-উনিশ এবং কনের পনের-ষোলর বেশি বয়স বাড়িতে দেওয়া হয় না। বরের পিতাই বিবাহের কথা পাড়েন। যদি কন্যাপক্ষ সম্মত হয়, তবে বাগ্‌দানের অনুষ্ঠান হয়। সেইদিন গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোককে লইয়া বরের পিতা কনেকে গহনা পরাইতে যায়। কনের বাড়িতে সকলে বসিবার পর কনের বাপ মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে যে, বিবাহে তাহার সম্মতি আছে কি না। মেয়ে যতই ছোট হউক না কেন, তাহার সম্মতি বিনা বাগ্‌দান নিষ্পন্ন হয় না। যদি সে রাজি না হয়, তখন কনের পিতা বরপক্ষের নিকটে মাফ চায়, আর একদিন আসিতে বলে এবং ইতিমধ্যে কনেকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া রাজি করিতে চেষ্টা করে। যদি অনুমতি ব্যতিক্রম করিয়া কোন পিতা বিবাহ দেয়, তবে সে বিবাহ প্রয়োজন হইলে ভাঙিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সেরূপ বিবাহকে সমাজে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয় না।

কন্যা রাজি হইলে সমবেত ভদ্রলোকদের সাক্ষী রাখিয়া বরের পিতা তাহাকে দানের যাবতীয় গহনা পরাইয়া দেয় এবং কনের মাতাও সমবেত সকলের হাত ও পা জল দিয়া ধুইয়া দেয়। ইহাই হইল বাগ্‌দান ও আশীর্বাদের পর্ব। বরকর্তা তখন সমবেত ভদ্রলোকদের তিন টাকা ও কন্যাকর্তা দুই টাকা করিয়া প্রণামী দেয়। তাহার পর বরকর্তা মেয়ে লওয়ার জন্য খেসারৎস্বরূপ কন্যার পিতাকে নয় টাকা দিয়া থাকে। বাড়ির একজন কাজের লোক কমিয়া যাইতেছে, ইহার খেসারৎস্বরূপ টাকা দেওয়া হয়; এ টাকাকে কন্যা-বিক্রয়ের মূল্য বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ নাই।

বাগ্‌দানের পর **নয়েক** অর্থাৎ জ্যোতিষীর সাহায্যে তিথি, লগ্ন ইত্যাদি গণিয়া বিবাহের দিন ধার্য হয়। বিবাহের তিনদিন বরের বাড়িতে বিরিসির সকল লোক এবং উর-পেডা কারিজি ও সাম্মিটেড়ুর পাত পড়ে। বিবাহ বরের বাড়িতে হয়, কনের বাড়িতে হয় না। কনের বাড়িতে তাহার বিরিসির লোকের জন্য মাত্র একদিন পাত পড়ে, তাহার বেশি নয়।

যে রাত্রে বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, সেইদিন উর-পেডা বরের কব্জিতে এক খণ্ড হলুদ এবং একটি পান সুতা দিয়া বাঁধিয়া দেয়। তাহার পরদিন বিরিসির কোন মেয়ে সঙ্গে হলুদ বাটা, হলুদে কাপড়, তিলের তেল, কুঙ্কুম নারিকেল, দর্পণ প্রভৃতি লইয়া সাম্মিটেড়ুকে সঙ্গে লইয়া কনেকে বাপের বাড়ি হইতে আনিতে যায়। কন্যা শ্বশুরবাড়ির হলুদ কাপড় পরিয়া, কুঙ্কুম ও গায়ে হলুদ মাখিয়া বরের বাড়ির দিকে যাত্রা করে। আসিবার সময়ে আঁচলে কিছু চাল এবং একটি আস্ত নারিকেল লইয়া আসে। সেই অবস্থায় সে বরের বাড়ির সদর দরজা দিয়া না ঢুকিয়া খিড়কি দরজা দিয়া অন্দরে প্রবেশ করে।

এইবার বর-কন্যার স্নানের জন্য মেয়েরা দূরে কোনও পুকুর বা কুয়া হইতে জল আনিতে যায়। জল আসিলে বর এবং কনেকে নারিকেল পাতায় ছাওয়া একটি ছাউনির তলায় পিঁড়িতে বসান হয় এবং নাপিত তাহাদের নখ কাটে। বর এবং কনের বিরিসির মেয়েরা উভয়ের গায়ে তেল, হলুদ এবং বিরি-কলাই বাটা মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। এই সময়ে বর-কনের সামনে ধান এবং উদূখল রাখা হয়, ভবিষ্যতে কনেকে ধান ভানিয়া সংসার চালাইতে হইবে, এখানে তাহার ইঙ্গিত করা হয়। তেলুগু দেশে যৌতুকের পরিবর্তে ধান-ভানার জন্য উদূখলের চলন আছে।

গায়ে হলুদের পর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আগমন হয়। নুলিয়াদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে শুধু এইখানে ব্রাহ্মণদের স্থান আছে। মন্ত্র[illegible] পরে বৈষ্ণব গোঁসাই আসেন, ব্রাহ্মণ [illegible] ব্রাহ্মণ বর ও কনেকে পাশাপাশি বসাইয়া একবার বরের হাত কনের হাতের উপরে রাখিয়া মন্ত্র পড়েন। আবার কনের হাত বরের হাতের উপরে রাখিয়া মন্ত্র পড়েন। তাহার পর উর-পেডা বরের মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া দেয় এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত বর ও কনে দুজনের গলায় দুগাছি পৈতা পরাইয়া দেয়। পৈতার পর পুরোহিত কুশ দিয়া উভয়ের হাত বাঁধিয়া দেন। সংকল্প ও পূজা শেষ হইলে বর-কনেকে [illegible] চড়াইয়া ঘোড়ার পিঠে সমগ্র গ্রাম ঘোরানো হয়। কনে সামনে বসে, বর পিছনে। কিন্তু [illegible] বেশি বয়সের হইলে সচরাচর বরের লোকের সঙ্গে হাঁটিয়া চলে। উভয়ে ঘুরিয়া আসিলে নারিকেল পাতার ছাউনির তলায় উভয়কে বসাইয়া গাঁটছড়া বাঁধা হয়। গাঁটছড়ার মধ্যে দুইটি সুপারী এবং দুইটি পয়সা থাকে। তাহার পর বর এবং কনে উভয়ে আঁচলে চাল লইয়া পরস্পরের মাথার উপরে ছড়াইয়া দেয়।

এইবার বর-কনেকে আশীর্বাদ করিবার পালা। উভয়পক্ষের আত্মীয়স্বজন বর-কনের মুখ দর্শন করিয়া এক টাকা, দুই টাকা বা দশ টাকা পর্যন্ত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকে। ইহাতে যত টাকা জমা হয়, সমস্ত বিবাহের খরচ [illegible] হইতেই খরচ হইয়া যায়। নুলিয়া সমাজের নিয়ম অনুসারে কে কত দিল, তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর সেই বাড়িতে [illegible] বিবাহের সময়ে ঠিক তত টাকা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিতে হয়। এইরূপে একজন লোক হয়ত দশ বাড়িতে দশ বৎসরে একশত টাকা দিয়া আসিয়াছে। তাহার সুবিধার মধ্যে, সে যখন নিজের বাড়িতে ছেলের বিবাহ দিবে, তখন সেই সমস্ত টাকা এবং হয়ত আরও কিছু বেশি টাকা আশীর্বাদস্বরূপ ফিরিয়া আসে। লৌকিকতার প্রথার ফলে বিবাহের খরচ নুলিয়াদের কোনদিন গায়ে লাগে না। বেশি দানসামগ্রীর খরচ বরপক্ষকে স্বতন্ত্রভাবে যোগাইতে হয়।

বিবাহের পরদিন খুব ঘটা করিয়া বর-কনেকে শহরে ঘোরানো হয়। যখন তাহারা ফিরিয়া আসে, তখন বরের ছোট ভাই, [illegible] এবং বৌদির পথ আগলাইয়া দাঁড়ায়। সে নানারকম আপত্তি জানায়, ঠাট্টা করে, শেষে দাদার নিকট বিবাহ দেওয়াইবার প্রতিশ্রুতি পাইলে দ্বার ছাড়িয়া দেয়। ঘরে ঢুকিবার পর বর-কনেকে একটি ঘড়ার ভিতর হইতে সোনা ও রূপার আংটি খুঁজিতে দেওয়া হয়। যে সোনার আংটি পায়, তাহার ভাগ্য ভাল, যে রূপার আংটি পায়, তাহার ভাগ্য

অপেক্ষাকৃত মন্দ বলিয়া নুলিয়াগণ বিশ্বাস করে। বিবাহের তিন দিন বাদ দিয়া একটি ভাল যোগ বা লগ্ন দেখিয়া বর শ্বশুরবাড়ীতে যায় এবং স্ত্রীকে রাখিয়া আসে। কিছুকাল পরে তাহার স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের সংস্কার হইলে অর্থাৎ সে ঋতুমতী হইলে তাহাকে স্বামীর ঘরে আনা হয়।

ইহাই হইল নুলিয়া জাতির মধ্যে বিবাহের সাধারণ বিধি। কিন্তু বিধবা অথবা ত্যক্তা স্ত্রীর সহিত যখন কাহারও বিবাহ হয়, তখন কোন ঘটা করা হয় না। শুধু কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া কুঙ্কুম, বস্ত্রাদি দিয়া বরকর্তা কন্যাকে পিত্রালয় হইতে লইয়া আসে; তার অতিরিক্ত কোন অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না।

নুলিয়া জাতির মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রচলন আছে। ইহার জন্য কোন পক্ষের দোষ প্রমাণিত হয় না, পরস্পরের মধ্যে মনের মিল হইল না, এমন কারণেও বিচ্ছেদ হইতে পারে। কিন্তু কোন পক্ষ বিচ্ছেদ চাহিলে পঞ্চায়েতে [illegible] টাকা দিতে হয় [illegible] বিচ্ছেদের [illegible] তাহাকে [illegible] পঞ্চায়েৎ [illegible] অপর পক্ষের [illegible] দিতে হয়। কিন্তু যদি পঞ্চায়েতের [illegible] বিচ্ছেদের [illegible] তাহা [illegible] হইতে পারে। [illegible] স্ত্রী স্বামীর [illegible] চাহিয়াছে। [illegible] পঞ্চায়েত [illegible] করিতে পারে। [illegible] টাকা [illegible] হয়। [illegible] এইরূপ [illegible] নুলিয়া [illegible] পাঁচটি করিয়া বিবাহ-[illegible] ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে নুলিয়াদের [illegible] জীবন যে অসুখী, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; বরং দাম্পত্য [illegible] সুখ অপরাপর হিন্দু জাতি অপেক্ষা [illegible] বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

নুলিয়া সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন [illegible]। বিধবা স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে [illegible] কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বামীর পরিবার [illegible] তাহাকে চলিয়া যাইতে হয়; সে কেবল [illegible] হইতে যে গহনা পাইয়াছিল, তাহা [illegible] যাইতে পারে। পুত্র স্বামীর, স্ত্রীর [illegible] অতএব স্বামী বর্তমানে যদি কোন [illegible] বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায়, তবে তাহাকেও [illegible] ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। শিশু [illegible] মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায় বটে [illegible] বড় হইলে স্বামীর ঘরে তাহাকে আবার [illegible] দিতে হয় এবং তখন সে যতদিন শিশুকে ভরণপোষণ করিয়াছে, তাহার জন্য ন্যায্য মূল্য পায়। বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিলে অথবা বিধবার বিবাহ হইলে স্বামীর সম্পত্তির উপরে তাহার আর কোন অধিকার থাকে না। বিধবা কিন্তু ইচ্ছা করিলে দেবরকে বিবাহ করিতে পারে। এরূপ বিবাহ সমাজে স্বীকৃত হইলেও খুব প্রচলন আছে বলিয়া মনে হয় না। বিধবা ভ্রাতৃবধূর উপরে দেবরেরও বিশেষ কোন অধিকার নাই; অপরের সহিত তাহার বিবাহের সময়ে দেবর কোন খেসারত পায় না।

বিধবা বিবাহের মত নুলিয়া সমাজে বহুবিবাহেরও প্রচলন আছে। প্রথম স্ত্রীর সন্তান না জন্মিলে আইনতঃ নুলিয়ারা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তৃতীয় স্ত্রী পারে না। তখন একজনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তবে সে অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। একসঙ্গে দুইজনের বেশী স্ত্রী থাকিতে পারে না, কিন্তু দুই স্ত্রীও [illegible] বলা যাইতে পারে। পুরীতে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা হইতে নুলিয়া সমাজের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঘটনাটি বেশী দিনের নয় এবং [illegible] নুলিয়া সকলেই জানিত [illegible] কাল্পনিক নাম দিয়া ঘটনাটি প্রকাশ করিতেছি। পদ্মম্মা নাম্নী কোনও নুলিয়া রমাইয়া নামক এক যুবকের প্রতি অনুরক্ত হয়। রমাইয়ার বিবাহ পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল এবং সে স্ত্রীকে লইয়া সুখে সংসার করিতেছিল। উভয় পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, এমন কি সম্ভবতঃ মনোমালিন্য ছিল বলা যায়। পদ্মম্মা সুন্দরী এবং অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের সন্তান; সুতরাং তাহার পাত্রের অভাব ঘটে নাই। কিন্তু সেই যে সে রমাইয়াকে বিবাহ করিবে বলিয়া ধরিয়া বসিল, তাহাকে আর কিছুতেই টলানো গেল না। তাহার পিতা কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, [illegible] করিলেন, শেষে মারধর আরম্ভ হইল; কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যার অসম্মতি সত্ত্বেও অন্যত্র বিবাহ দিলেন। পদ্মম্মাকে কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি পাঠানো গেল না। তখন পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিতে হইল এবং পদ্মম্মার পিতা বরপক্ষকে যাবতীয় দানসামগ্রী ফিরাইয়া দিলেন।

এদিকে পদ্মম্মা যাহাতে রমাইয়ার সঙ্গে দেখা করিতে না পারে, সেজন্য তাহার পিতা সতর্ক রহিলেন। কন্যাকে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সে রহিল না। তখন পদ্মম্মার পিতা রাগে, [illegible] করিয়া [illegible] বাড়ীর চারিদিকে লাঠি লইয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। এমনিভাবে কিছুদিন গেল। কিন্তু পদ্মম্মা রমাইয়ার নিকট সংবাদ পাঠাইল, সে যদি তাহাকে বিবাহ না করে, তবে পদ্মম্মা জোর করিয়া রমাইয়ার বাড়ি গিয়া বসবাস করিবে; লোকে যাই বলুক শুনিবে না। তখন লোকে সকলে মিলিয়া [illegible] বিবেচনা করিয়া রমাইয়ার পিতাকে বিবাহের প্রস্তাব করিতে সম্মত করাইল। পদ্মম্মার পিতা কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, উপরন্তু আগন্তুকদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

ইহাতেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। ইতিমধ্যে রমাইয়ার শ্বশুর জামাতার উপর বিরক্ত হইয়া কন্যাকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেন, আর পাঠাইলেন না। রমাইয়া বহু চেষ্টা সত্ত্বেও

স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া একদিন সবান্ধবে শ্বশুরবাড়ীতে উপস্থিত হইল। শ্বশুরের নিকট নির্দোষিতার প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও শ্বশুর কিন্তু পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব করিলেন। রামাইয়ার ইচ্ছা নাই, তাহার স্ত্রীরও সম্পূর্ণ আপত্তি; তবু শেষ পর্যন্ত পুরা টাকা নিয়া অনেক করিয়া রামাইয়ার মুখ দিয়া বাহির করা হইল যে, সে বিবাহ ভাঙিগয়া দিতে প্রস্তুত আছে। বিবাহ ভাঙিগয়া গেল, রামাইয়াও অনেক টাকা পাইল, কিন্তু তাহার কিছু না লইয়া স্ত্রীকে দান করিয়া চলিয়া গেল। পুরী ফিরিয়া যাইতেছে বলিয়া গেল বটে, কিন্তু এক বন্ধুর পরামর্শে পার্শ্ববর্তী গ্রামে কয়েক দিনের জন্য বসবাস করিতে লাগিল। সেখানে থাকিবার সময়ে গোপনে স্ত্রীর সহিত বড়যন্ত্র হইল। তাহার স্ত্রী পিতামাতার নিকটে শান্তশিষ্টভাবে কয়েকদিন থাকিবার পর ভিন্ন গ্রামে হাটে যাইবার অনুমতি চাহিল। হাটে অবশ্য গেল বটে, তাহার মা সঙ্গে গ্রামের আরও কয়েকটি মেয়েকেও পাঠাইলেন, কিন্তু রামাইয়ার স্ত্রী পাহারা কাটাইয়া স্বামীর সহিত পলাইয়া গেল এবং সেই হইতে আর পিত্রালয়ে ফেরে নাই।

রামাইয়ার স্ত্রী পলাম্মার বিষয় সবই জানিত; কিন্তু সে কিছুই বিচলিত হয় নাই। এদিকে পলাম্মার বিবাহের জিদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে বাস্তবিকই যখন সে একদিন রামাইয়ার বাড়ীতে উপস্থিত হইবে এইরূপ ভয় দেখাইল, তখন গ্রামের লোকজনের অনুরোধে পড়িয়া তাহার পিতা রামাইয়ার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। রামাইয়ার পিতা লোকজন যথারীতি পাঠাইয়া নূতন পুত্রবধূকে ঘরে আনিলেন এবং সেই হইতে রামাইয়া উভয় স্ত্রীকে লইয়া সুখে বসবাস করিতেছে। শুনিয়াছি যে, উভয়ের মধ্যে শুধু যে কোন কলহ নাই তাহা নহে, উভয়ের মধ্যে অসাধারণ সদ্ভাব বর্তমান।

এরূপ ঘটনা নুলিয়া সমাজে বিরল হইলেও উহা হইতে সমাজে নারীর স্থান কিরূপ তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পিতামাতা যেমন জোর করিয়া বিবাহ দিতে পারেন, নারীর পক্ষে সেই জোর ভাঙিগবার অধিকার আছে। সমাজে কুলমর্যাদা রক্ষার দিকে পিতামাতার যেমন দৃষ্টি থাকে, পঞ্চায়েতের পক্ষেও তেমনই মানুষকে সুখী করিবার, তাহার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিবার চেষ্টাও বর্তমান রহিয়াছে। ফলে নারী নুলিয়া সমাজে যে মর্যাদা লাভ করে, তাহার ফলে তাহার চরিত্রের স্বাভাবিক পুষ্টি এবং বিকাশ হওয়া সম্ভব হয়।

এরূপ অবস্থার সাক্ষাৎ কারণ আবিষ্কার করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। নুলিয়া পুরুষেরা মাছ ধরিয়া যাহা রোজগার করে, সে অর্থ মদ খাইতে সখের জিনিসপত্র খরিদ করিতে বা মহাজনের পাওনা মিটাইতে খরচ করিয়া ফেলে। বাস্তবিক সংসার চালায় মেয়েরা। তাহারা মজুরী করে, ইট বহিয়া, বালি বহিয়া যে পয়সা ঘরে আনে, সেই পয়সায় সংসারের খরচপত্র নির্বাহ হয়। অন্নের জন্য তাহারা স্বামীর উপরে নির্ভর করে না। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

**হিন্দু সমাজে নুলিয়া জাতির স্থান**

সমগ্র হিন্দু সমাজের মধ্যে নুলিয়া জাতি একটি অঙ্গস্বরূপ। অন্যান্য জাতির যেমন বৃত্তি স্থির করা আছে, নুলিয়াদের জাতীয় বৃত্তিও তেমনই স্থির করা আছে। ইহারা মাছ ধরে এবং হয়ত আচার-ব্যবহারে উচ্চবর্ণের হিন্দু হইতে যথেষ্ট পৃথক হওয়ার ফলে জলচল বলিয়া স্বীকৃত হয় না। পুরীর মন্দিরে ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার অধিকার ইহাদের নাই। অর্থাৎ নুলিয়াগণ হীন বলিয়াই সমাজে স্বীকৃত হয়। তথাপি স্বীয় জাতীয় পূজাপার্বণ, আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক স্বাধীনতা লইয়া নুলিয়া জাতি কেমন-ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাহা আমরা দেখিলাম। এই স্বাধীনতা বর্তমান থাকায় স্বীয় জাতীয় সংস্কৃতি লইয়া নুলিয়াগণ হিন্দুধর্ম এবং সমাজের বটবৃক্ষের তলে বসবাস করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা যে হিন্দু সমাজ রচিত হইল, তাহার পিছনে যে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলা হয়, এবার তাহার বিশ্লেষণ করা যাইবে।

—কৃষ্ণ

# আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

**Personality ও Nationalism**

জাপানে ও আমেরিকায় ১৯১৬ সালে কবি যে বক্তৃতাগুলি করেন, তাহা পার্সন্যালিটি (১৯১৭, মে) ও ন্যাশন্যালিজম (১৯১৭) গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থই উৎসর্গ করেন C. F. Andrewsকে। দুইখানি গ্রন্থের বক্তৃতা প্রায় একই কালে লিখিত, কিন্তু উভয়ের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক। পার্সনালিটির প্রবন্ধগুলিতে জীবন-শিল্পী কবি রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে; এক হিসাবে বলা যাইতে পারে সাধনার বক্তৃতার অনুক্রম সাপেক্ষতরভাবে এখানে ব্যাখ্যাত। আর ১৯১৩ সালে রচেস্টারে 'রেস কনফ্লিক্ট' নামে যে ভাষণ দান করেন তাহারই বৃহত্তর প্রয়োগ হইয়াছে ন্যাশনালিজম-এর বক্তৃতাগুলিতে। ১৯১২ সাল ও ১৯১৬ সালের ব্যবধান চারি বৎসরের মত; কিন্তু ১৯১৪ সালে যে মহাযুদ্ধে য়ুরোপ অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় পতিত হয়, তাহাতে সভ্য মানবের অনেক পুরাতন মত ও আদর্শ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার ভাষণগুলিতে জগতের এই ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন।

দুইখানি গ্রন্থে যথাক্রমে ব্যক্তি ও সমষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে; individual বা ব্যক্তির সহিত সমষ্টির বিরোধ চিরন্তন—অর্থাৎ বিরোধ পার্সনালিটির সহিত ন্যাশনালিটির তত্ত্বের। পার্সনালিটি ও ইন্ডিভিজুয়ালিটি যে এক জিনিস নয় তাহার বলাই নিষ্প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের অহং বোধ স্বীকৃত। পার্থক্যের মধ্যে ইন্ডি-ভিজুয়ালিটির ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাহার স্বার্থবোধ, তাহার বৃহত্ত্ববোধ উৎকট-ভাবে প্রবল—আর পার্সনালিটিতে তাহার মহত্তর প্রকৃতি, তাহার আত্মবোধ ও বিশ্ববোধ সুন্দরভাবে প্রকাশিত। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তি বস্তুজগতের প্রভু হইবার জন্য ব্যগ্র; শেষ ক্ষেত্রে সে জগতকে মিথ্যা বা মায়া না বলিয়া এই ধরিত্রীকে ভালবাসিবার জন্য আকুলিত, এবং জগতেরই ও জগৎ-পরিবেশের অন্তরের মধ্যে আপনাকে পাইবার জন্য উদগ্রীব। ইন্ডিভিজুয়ালিটির পরিবেশে সকল বিষয়ে ও সব ব্যাপারে lasse faire বা স্বার্থান্ধ সংগ্রহবাদ বা যাহাকে বলা হইয়াছে acquisitiveness। ইহা হইতেছে পুঁজিপতিদের দর্শন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সঙ্ঘ বাঁধিয়া নেশন-তন্ত্র হইয়াছে; আর পার্সনালিটির বিকাশে মানুষ তাহার মধ্যে আপনার সার্থকতাকে পাইয়াছে। একটিতে মানুষের বিশ্লেষণ ও অপরটিতে সংশ্লেষণ-এর মূর্তি ফুটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় মানুষের এই দুইটি দিকের কথা আলোচনা করিয়াছেন; পার্সনালিটি গ্রন্থের মধ্যে মানুষ কিভাবে তাহার মহত্তর আত্মবোধকে পরিপূর্ণ জীবন দর্শনের মধ্যে দেখিতে পায়, তাহারই কথা আলোচিত হইয়াছে। এই আত্মবোধ বা বিশ্ব-বোধের বিপরীত বা এন্টিথিসিস হইতেছে নেশন-বোধ বা ন্যাশনালিজম যেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ বা ইন্ডিভিজুয়ালিজম নেশনরূপ বৃহদায়তন দানব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। অপরের বিকাশে মানবের মহত্ত্ব ও প্রেমের প্রসারে তাহার বৃহত্ত্ব বা ভূমারূপ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিলেন তাহা তাহাদের জীবনের দুই কোটিকে স্পর্শ করিয়াছে; একটি হইতেছে তাহার ভাবাত্মক জীবনের আদর্শের কথা, অপরটি হইতেছে তাহার নঞাত্মক জীবনের ব্যর্থতার কথা। 'পার্সনালিটি' গ্রন্থের ভাষণগুলি এই ভাবাত্মক জীবনের গভীর বাণী,—আর ন্যাশনালিজম-এর বক্তৃতা-গুলি নৈর্ব্যক্তিক নেশনতন্ত্রের নিষ্পেষণ হইতে ব্যক্তি-আত্মাকে রক্ষার জন্য সতর্ক বাণী। সেই জন্য দুইখানি গ্রন্থকে পরস্পরের পরি-পূরক বলা যাইতে পারে।

ন্যাশনালিজম গ্রন্থে তিনটি মাত্র প্রবন্ধ আছে 'ন্যাশনালিজম ইন্ দি ওয়েস্ট', 'ন্যাশনা-লিজম ইন্ জাপান', 'ন্যাশনালিজম ইন্ ইন্ডিয়া'; এ ছাড়া আছে 'নৈবেদ্য' হইতে কবিতার অনুবাদ—দি সানসেট অব দি সেনচুরি, ইহার মধ্যে ন্যাশনালিজম ইন্ জাপান প্রবন্ধটি জাপানে প্রদত্ত দুইটি ভাষণ—দি স্পিরিট অব জাপান ও দি মেসেজ অব ইন্ডিয়ার পুনর্লিখিত রূপ।

কবি প্রথমে পশ্চিমের 'নেশন' লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কারণ 'নেশন'তন্ত্র পশ্চিমের আবিষ্কার। এশিয়ায় জাপানই সর্ব-প্রথম য়ুরোমেরিকার ন্যাশনালিজম মন্ত্র গ্রহণ ও তাহার পরীক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের সমকক্ষ হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় রত হয়। আর ভারতবর্ষ বহু জাতি, উপজাতি, বহু ভাষাভাষী অধিবাসীর বাসভূমি, নেশন-এর কল্পনা সে কখনো করে নাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে মানুষ বাস করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ ভারতও নেশন হইবার জন্য উৎকট চেষ্টা করিতেছে। কবি তিনটি প্রবন্ধে নেশনের তিনটি সুর দেখাইলেন: পশ্চিমের নেশন-দানবের নৃশংস মূর্তি কিভাবে য়ুরোপকে ছারেখারে দিতেছে এবং জাপান নেশনের নূতন অস্ত্র পাইয়া কিভাবে চীনের উপর তাহার ধার পরীক্ষা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে—উহাই হইতেছে প্রথম দুইটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষ কি ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়াছিল তাহাই হইতেছে শেষ ভাষণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ন্যাশনালিজম পশ্চিমে কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া স্বতই কবির মনে ভারতের কথা উদিত হইয়াছে...। ভারতে ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে জাতি-সমস্যা দেখা দিয়াছিল। ভারতের মনীষীগণ তাহাকে সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন; বিরুদ্ধতাকে নির্মম-ভাবে নিশ্চিহ্ন করেন নাই; তাঁহারা মানুষকে মহত্তর আধ্যাত্মিক ঐক্যের মধ্যে সর্বমানবকে দেখিবার জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজে সাময়িক সমস্যা সমূহকে নিরাকৃত করিতে গিয়া তাঁহারা মানুষে মানুষের মধ্যে যে সব বিধিনিষেধের প্রাচীর গড়িয়াছিলেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিতে গিয়াই তাঁহাদের ভুল হয়। কিন্তু তাহারই সঙ্গে মানুষের

মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের বোধকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা চলিয়াছিল বলিয়া এদেশে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার নিদারুণ জাতি সংঘাত দেখা দেয় নাই। ভারতের ইতিহাসে মানুষের এই জাতি সংঘাতের কথা চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার কোনো চেষ্টা হয় নাই—রাজা ও রাজ্যের ইতিহাস আমাদের কোনদিনই আকর্ষণের বিষয় ছিল না। আমাদের ইতিহাস হইতেছে মানব সমাজের ইতিহাস—অধ্যাত্ম আদর্শকে অনুভব করিবার ইতিহাস। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি যখন ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সমস্যার সম্পূর্ণ নূতন মূর্তি; ভারতের মধ্যে বিদেশী বারে বারে যোদ্ধৃবেশে প্রবেশ করিয়াছে—তাহাদের ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে—তাহাদের ভাষা ও আমাদের ভাষা মিলিয়া নূতন ভাষা হইয়াছে—যাহা উভয়েরই বোধগম্য। তাহাদের সংস্কৃতি ও আমাদের সংস্কৃতি মিলিয়া নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহা উভয়েরই শ্রদ্ধার জিনিস। কিন্তু শেষকালে যাহারা আসিল তাহারা 'নেশন'—ব্যক্তি নয়—যোদ্ধৃ নয়—তাহারা আসিয়া পড়িল এমন জাতির উপরে—যাহাদের কাছে 'নেশন' শব্দ অজ্ঞাত—

'We who are no nations ourselves' (Nationalism P. 8).

নেশন কি—একথার আলোচনা ঊনবিংশ শতকে বহু মনীষী করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যখন ন্যাশনাল ও নেশন শব্দের আমদানী হয়, তখন এদেশেও তাহার ব্যাখ্যানের বিস্তর চেষ্টা চলে—রবীন্দ্রনাথও সে আলোচনায় বহুবার যোগদান করেন।

নেশন শব্দের দ্বারা আজ যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সঙ্ঘ বুঝাইতেছে তাহা যন্ত্রীয়তার উদ্দেশ্যেই গঠিত—তাহাকে যন্ত্রযান বলা যাইতে পারে—

"Which a whole population assumes when organized for a mechanical purpose" (P. 9)

কিন্তু সমাজের (Society) সেরূপ কোনো উদ্দেশ্য নাই; সমাজ সমাজের লোকেরই জন্য। সেখানে লোকের সঙ্গে লোকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। কেহ কাহারও অপহারক নহে।

সমাজের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষার, নেশনের উদ্দেশ্য নৈর্ব্যক্তিক সঙ্ঘশক্তির সম্প্রসারণ। একটিতে Self preservation অপরটিতে *self-agrandisement ও self-assertion.* বিজ্ঞান ও ব্যবস্থার *(organization)* কল্যাণে নেশনের আজ আপনার মধ্যে নিবিষ্ট থাকা অসম্ভব; প্রতিবেশী সমাজ ও দেশ সমূহকে ঐহিক সুখের জন্য উত্তেজিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষানল জ্বালাইয়া তোলাই হইতেছে পাশ্চাত্য নেশনের ধর্ম। চারিদিকেই সমাজের স্বাভাবিক বন্ধনের মধ্যে শিথিলতার লক্ষণ সুস্পষ্ট ও তাহার স্থলে যন্ত্রীয় ব্যবস্থাবিধান প্রবর্তিত হইতেছে। এই যন্ত্রীয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে পাশ্চাত্য দেশে নরনারীর প্রকৃতিগত সম্বন্ধের মধ্যে বিরোধ। প্রকৃতি যেখানে নরনারীর মধ্যে সহকারিতা চায়, সভ্যতা সেখানে প্রতিযোগিতা আনিয়াছে। নরনারীর মনস্তত্ত্বের মধ্যে আজ যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে—তাহা আদিম বিবদমান যুগের মনস্তত্ত্ব—পরস্পরের প্রতি আত্মসমর্পনের দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভই যে মানবতার চরম সার্থকতা—তাহা আজ সভ্যমানব ভুলিয়াছে।

নরনারীর সম্বন্ধেও যেমন বিপ্লব ও বিরোধ দেখা দিয়াছে—সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভাঙনের লক্ষণ কম সুস্পষ্ট নহে। আজ একদল লোকে সুশৃঙ্খলিত শাসনকে অস্বীকার করিয়া আপনাদিগকে এনার্কিস্ট ঘোষণা করিতেছে—তাহার কারণ ইণ্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি আজ সমষ্টির নিকট অপমানিত—তাই এই প্রতিক্রিয়া। অর্থনীতিক্ষেত্রে ধর্মঘট বা ষ্ট্রাইক্ এই মনোভাবেরই প্রকাশ। মোটকথা সমাজের প্রত্যেক স্তরে অর্থ ও শক্তির জন্য সকলেই লালায়িত। এই যন্ত্রীয় ব্যবস্থাবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিসর্বস্ব সমাজকে কবি 'নেশন' বলিয়াছেন। যন্ত্রের একমাত্র সার্থকতা সফলতায়,—কিন্তু মানুষের চরম সার্থকতা মঙ্গলবিধানে। যখন এই যন্ত্র-দানব বৃহদাকার ধারণ করে তখন যন্ত্রী যন্ত্রের অংশমাত্র হইয়া যায়,—মানুষকে তখন আর দেখা যায় না—যন্ত্রের মানবাংশগুলি যন্ত্রের ন্যায় নির্মমভাবে পরস্পরকে দলন করিয়া চলিতে থাকে— কোথাও কাহারও মনে নীতি, ধর্ম মানবতার প্রশ্ন উঠে না।

এই অবিচ্ছিন্ন নেশন ইংরেজরূপে ভারতবর্ষকে শাসন করিয়াছে। কিন্তু মানুষ তো আর abstraction বা নিরবয়ব অবচ্ছিন্ন ভাব মাত্র নহে; প্রত্যেকটি মানুষই একটি ব্যক্তি—ইণ্ডিভিজুয়াল। বিদেশী গভর্নমেণ্ট শাসন ব্যাপারে নির্বিকার অ্যাবস্ট্রাক্শন বলিয়া—ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন—ভারতবাসী তাহাদের কাছে অ্যাবস্ট্রাক্শন মাত্র।

আজ ইতিহাস এমন স্থানে আসিয়া স্তব্ধ হইয়াছে যেখানে মানুষের মনের সকল প্রকার উদার ভাবনা, মানবতার অখণ্ডতা বোধ, ধর্মনীতি বোধ তাহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া গিয়াছে; সকলের মনই অর্থ ও শক্তির জন্য লালায়িত। তাই তিনি বলিলেন,—আজ প্রাচ্যদেশ সমূহ তাহাদের জীবনের মূলে পশ্চিমের হৃদয়হীন ব্যবস্থার লৌহ কবলের স্পর্শকে অনুভব করিতেছে; সেই জন্য মনুষ্যত্বকে রক্ষার জন্য তাহাকে খড়্গহস্তকে জগত সমক্ষে এই কথাই ঘোষণা করিতে হইবে যে জাতীয়তা পাপের নিষ্ঠুর মারীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া মানুষের জগতে বিচরণ করিতেছে ও তাহার নৈতিক প্রাণ-শক্তিকে নিঃশেষে রিক্ত করিতেছে, সুতরাং সকলেই সাবধান।—

"We have felt its (soulless organization) iron grip at the root of our life, and for the sake of humanity we must stand up and give warning to all that nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality". (P. 16)

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জাতি বা নেশনসমূহের কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষের বিচিত্র জাতি ও ধর্মের মধ্যে যে ঐক্যানুভূতি আজ হইতেছে, তাহার কারণ পাশ্চাত্য জাতির উপস্থিতি নহে, তাহা পশ্চিমের spirit বা বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ফল; আমরা বলি ওয়েস্টার্ণ কালচার—সিভিলিজেশন নহে। জাপান কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে নহে, পাশ্চাত্য নেশনত্বের সকল প্রকার উপকরণ আয়ত্ত করিয়াছে; চীন পুরাপুরি পাশ্চাত্য হইতে পারে নাই,—সে পশ্চিমের বিদ্যা ও বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলে শ্বেতাঙ্গ জগতের পক্ষে যে কি বিভীষিকা হইয়া উঠিবে তাহারই কল্পনায় একদল ইংরেজ লেখক এককালে খুব আতঙ্কিত হইয়াছিলেন—ইহার নাম দেন তাহারা 'ইয়েলো পেরিল'।

কবি বলেন ভারত পশ্চিমের স্পিরিট বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য নেশনের স্পিরিট বা সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টিকে বরণ করিবে তাহারই সংগ্রাম চলিতেছে। দুই শত বৎসর ইংরেজের শাসনাধীন থাকিয়া ভারতবর্ষ কোনরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই বলিয়া শাসকরাই আমাদের বিদ্রূপ করেন। অথচ জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়া পাশ্চাত্যবিদ্যা অতি অল্পকালের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইল। ভারতীয়দের চিত্ত যে সৃষ্টিবিষয়ে জাপানীদের হইতে নিকৃষ্ট একথা কবি স্বীকার করেন না; ভারত স্বাধীন নহে বলিয়া সে স্বাধীনভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে নাই— কারণ পদে পদে ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বাধা—যে বাধা দূর করিবার সাধ্য ছিল না ভারতীয়দের।—

"We cannot accept even from them whom it is dangerous for us to contradict"——(P. 21.)

আসল কথা পাশ্চাত্য জাতীয়তার মূলে ও কেন্দ্রে আছে বিরোধ ও বিজয়। অন্যের সহিত সে সর্বদাই বিরোধ বাধাইবার জন্য উৎসুক— সেই বিরোধের সুড়ঙ্গ হইতেছে তাহার নিজস্ব সেনার যাতাপথ। সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক

সহযোগনীতি তাহাদের দ্বারা উপেক্ষিত—অধ্যাত্মিক আদর্শবাদ তাহাদের কাছে বিদ্রূপিত। সেই জন্য, যে সব দেশে নেশনের বোধ জাগে নাই সেখানে পাশ্চাত্য নেশনরা পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রচার করিতে অত্যন্ত কৃপণ। পরাধীন জাতির মধ্যে নেশন বোধ তাহার স্বার্থের পরিপন্থী; কারণ, পাশ্চাত্য নেশনের সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত শক্তির উপর—সেই জন্য যে সব দেশ পাশ্চাত্য জাতির শোষণ ক্ষেত্র সেখানে এই শক্তিভাণ্ডারের সন্ধান তাহারা উন্মুক্ত করিতে অনিচ্ছুক। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি ভারতবর্ষ অসংখ্য জাতি ও ভাষার দ্বারা বিচ্ছিন্ন, তাহাদের মধ্যে মিলনের কোন সমক্ষেত্র নাই—এই কথাটাই তাঁহারা অবিশ্রাম প্রচার করিয়া একটা তত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নৈতিক বিধানে বিশ্বাসী। দাসশ্রমের দৌলতে যাহারা বৃহৎ হয় তাহারা আপনার ভারেই ধ্বংসের পথে চলে। যে সব নেশন দুর্বলকে বঞ্চিত করিতেছে তাহারা এই ধ্বংসপথের যাত্রী।

"Whenever power removes all checks from its path to make its career easy, it triumphantly rides into its ultimate crash of death" (P. 22.)

পাশ্চাত্য নেশন যে সব দেশে গিয়া বসিয়াছে সেখানে তাহারা law & order, শাসন ও শান্তি আনিয়াছে সত্য। কিন্তু এই শান্তি নঙর্থক—স্টীম রোলারের চাপে সমস্ত সমান হইয়া যাওয়ার মত বন্ধুরতার চিহ্ন থাকে না সত্য—কিন্তু সেই সঙ্গে জমির উর্বরতাও লোপ পায়। প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু আজকের ব্রিটিশের 'ভাল' ভয়াবহরূপে ভাল—কারণ তাহা অত্যন্ত কড়া। প্রাচীন যুগে মানুষ জানিত অন্যায়ের প্রতিকার তাহারই হাতে; অসম্ভবের আশা কখনই মানুষ ত্যাগ করিত না; কিন্তু আজ no-nation-এর দেশে প্রত্যেকটি ব্যক্তি একটি প্রকাণ্ড নেশনের মুষ্টির মধ্যে নিষ্পিষ্ট হইতেছে। বিরাট শাসন-যন্ত্রের অসংখ্য চক্ষুর কুৎসিত দৃষ্টি হইতে সে মুহূর্ত মাত্র মুক্ত নহে। এই অমানুষিক যন্ত্রের চাপে মানুষের কণ্ঠ আজ আর্তনাদ করিতেও শঙ্কিত। নিপীড়িত মানুষ আজ ত্রাসে মূক ও অসাড়;

"And this terror is the parent of all that is base in man's nature" (P. 29).

আজ নেশনও অমানুষ হইতে লজ্জা বোধ করে না, চতুর মিথ্যাকথাকে সে নিজের বুদ্ধিমত্তা বলিয়া গর্ব করে। ধর্মের নামে যে অঙ্গীকার সে করে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া সে উড়াইয়া দেয়।

**"The Nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for the Nation, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril". (P. 29-30).**

আজ পূর্ণ নেশনসমূহ 'অসভ্য' জাতিসমূহকে 'নেশন' হইবার উপদেশ দিবেন; কিন্তু সে কি যথার্থ মানুষের মত উপদেশ! যন্ত্রের বিরুদ্ধে যন্ত্র খাড়া করিতে থাকিলে কোথায় তাহার শেষ?

"That machine must be pitted against machine and nation against nation in an endless bull fight of politics?" (P. 31).

রাষ্ট্রনীতিকদের বিশ্বাস যে নেশনসমূহ পরস্পরের আত্মরক্ষার জন্য একটা মীমাংসায় উপনীত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে। ১৯১৬-র এই লেখা; তারপর প্রথম যুদ্ধ শেষ হইল, কত সভা-সমিতি বসিল, লীগ অব্ নেশনস্ গঠিত হইল। কিন্তু কি তাহার পরিণাম হইল? মিথ্যার দ্বারা কি মিথ্যাকে রোধ করা গেল? হিংসার দ্বারা কি হিংসা বন্ধ হইল?

**দুর্বলের প্রশ্ন**—যে সব হতভাগ্য অসভ্য নো-নেশন জগতে থাকিবে তাহাদের কে রক্ষা করিবে? নেশনসমূহ ক্রমে একত্র হইয়া যখন সর্বগ্রাসী লোভের মূর্তিরূপে বিশালকার হইবে তখন যে সব জাতি শান্তভাবে নম্রভাবে দিন কাটাইয়াছে তাহাদের কি হইবে? পশ্চিম তাহার উত্তর দিয়াছে—সে বলে, অযোগ্যদের স্থান জগতে নাই, তাহারা মরিবেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে পশ্চিমের মুক্তির জন্যই এই দীনতমেরা বাঁচিয়া থাকিবে—এই হইতেছে সত্য। তিনি বলিলেন, আমি জোর করিয়াই বলিতেছি যে মানুষের জগত ধর্ম-নীতির জগত—ইহাকে উপেক্ষা করিলে সমাজ ধ্বংস পাইবে। পশ্চিম ব্যক্তিগত মানুষের জীবনকে শুকাইয়া দিয়া ব্যক্তিগত জীবটিকেই বড় করিয়াছে—

**"The west has all along been starving the life of the personal man into that of the professional". (P. 33).**

কবির এই উক্তিটি গভীরভাবে চিন্তনীয়। য়ুরোপের মহাযুদ্ধে আমেরিকা তখনো যোগদান করে নাই—কবি য়ুরোপের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আজ জগত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতেছে—এই বৈভব, এই সভ্যতার মধ্যে এ কী নিদারুণ মৃত্যুলীলা! ইহার উত্তরে কবি বলিলেন—য়ুরোপের রাষ্ট্রনীতি মানুষের—মর্যাল নেচার—নীতিবোধ একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া, কর্মকুশলতার বিরাট অবচ্ছিন্নতাকে তাহার স্থানে বসাইয়াছিল। ইহাও তাহারই মূর্তি। মানুষের এই দক্ষতা বা কর্মকুশলতার অন্তরালে আছে তাহার বুদ্ধি (ইনটেলেক্ট); আমাদের জীবন, আমাদের অন্তঃকরণ আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু আমাদের মন সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে ভাবিতে ও চলিতে পারে। বুদ্ধিযোগে বিজ্ঞান হয়, ভাবযোগে আর্ট হয়। বুদ্ধির দ্বারা সাহিত্যের ভাষা আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু হৃদয় দিয়া সাহিত্যের ভাব অনুভব করা যায়। আজ মানুষ সেই বুদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া অসীম শক্তির অধীশ্বর। অশেষ মানুষের নৈতিক বল আজ তাহার বুদ্ধি ও

বস্তুভারের চাপে নিষ্পিষ্ট। পাশ্চাত্য জগতের নেশনসমূহ, ধর্মনীতির অভাবে পৃথিবীময় যে অনাচার ঘটিতেছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল; বস্তুজগতের বৃহত্ত্ব তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, নীতিজগতের মহত্ত্বের দিকে ফিরিবার অবকাশ তাহার ছিল না। ধনৈশ্বর্যের তলদেশে নৈতিক জগতের পরিপূর্ণ আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিপ্লবের ধূম্রাগ্নি জমিতেছে। মানুষের সার্থকতা শক্তিতে নহে—পূর্ণতায়; (man in his fulness is not powerful, but perfect'—P. 36) সেই পরিপূর্ণ মানুষ কখনই প্রতিবেশীর কণ্ঠচ্ছেদ করিতে পারে না। অথচ জগতময় বাণিজ্যে ও রাষ্ট্রনীতিতে মানুষকে অমানুষ করিবারই আয়োজন। ইহাই হইতেছে পশ্চিম দেশের 'নেশন'; মানুষে মানুষে অবিশ্বাস ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ হইতেছে ইহার মূলের কথা।

জাপান ত' পশ্চিমের অনুকরণে নেশন হইয়া উঠিয়াছে। সে 'নেশন' ছিলনা বলিয়াই ত' বিদেশীর নিকট একদিন লাঞ্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ যখন সে পরিপূর্ণ নেশনরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তখন পশ্চিমের খুশীই হওয়া উচিত ছিল! কিন্তু জাপানের শক্তিমত্তায় আজ পশ্চিমের জাতিসমূহের কী বিরক্তি, কী আতঙ্ক! জাপান বারবার ঘোষণা করিয়াছিল যে সে আমেরিকার নিকট তাহার আধুনিক উন্নতির জন্য ঋণী—তাহার ক্ষাত্রধর্ম বা বুশিদো সে ত্যাগ করিতে পারে না—সে আমেরিকার প্রতি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবে না! কিন্তু আমেরিকা ত' তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কারণ আধুনিক নেশনধর্মে পরস্পরকে সন্দেহ করাই হইতেছে রাষ্ট্রনীতির মূল কথা! 'Nation can only trust Nation where their interests coalesce, or at least do not conflict'. —P. 40)

রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের রাজনীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বলিলেন,

"Do you believe that evil can be permanently kept in check by competition with evil, and that Conference of prudence can keep the devil chained in the makeshift cage of mutual agreement'"—(P. 43)

অধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত শক্তি কখনই স্থায়ী হইতে পারে না; য়ুরোপের মহাযুদ্ধে নেশন-মানুষের স্বরূপটি দেখা দিয়াছে। ছিন্নভিন্ন খণ্ডিত মনুষ্যত্বের উপর 'নেশনে'র পাদপীঠ। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আজ নেশন যন্ত্রের পুতুল—কেহ বা রাষ্ট্রনীতিক, কেহ বা সৈনিক, কেহ বা ব্যবসায়ী, কেহ বা বুরোক্রেটিক অমলা। সকলেই নেশন-যন্ত্রের পুতুল নাচের খেলনা। নেশন তন্ত্রের শিক্ষায় ও শাসনে যে লোভ ও ঘৃণা, ভয় ও ভণ্ডামি, সন্দেহ ও অত্যাচার মথিত দানব সৃষ্ট হইয়াছে তাহা দেখিতে বৃহৎ—কিন্তু কোথায়ও তাহার সৌন্দর্যের সুষমা নাই।

কবির ভরসা যে ঐ মহাযুদ্ধে নেশনদানবের শেষকৃত্য করিবে—মানবের নবজন্ম হইবে—

"that man will have his new birth, in the freedom of his individuality, from the envelping vagueness of abstraction" —(P. 45).

কবির স্বপ্ন সফল হয় রুশের নবজন্মে। অবশ্য তখন সে কথা কেহই কল্পনা করে নাই। কবির বিশ্বাস যে একদিন নো-নেশনের দল ইতিহাসকে পবিত্র করিবে—নেশনের পদক্ষেপে রক্তাক্ত ধরণীর দেহ পবিত্রোদকে পরিচ্ছন্ন করিবে।

জাপান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আশংকা এই বক্তৃতায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। তিনি বলেন,—'জাপান পশ্চিম হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু জীবনীশক্তি সে সেখান হইতে আনে নাই। জাপান পশ্চিম হইতে বিজ্ঞানের যে সব উপকরণ আহরণ করিয়া আনিয়াছে, তাহার মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সে নিজেকে একটা ধার করা যন্ত্রে পরিণত করিতে পারিবে না।' কবির ভরসা যে জাপানের একটা আত্মা আছে এবং তাঁহার আশা যে সেই আত্মা তাহাকে সকল প্রয়োজনের উপর জয়ী করিবে। কবি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ঐকান্তিক আশা এই যে, জাপান যেন কদাচ তাহার বাহিরের সঞ্চয়ের জন্য নিজের আত্মাকে না হারাইয়া ফেলে। এইরূপ গর্ব বস্তুতঃই হেয়। এই হীনতা মানুষকে দারিদ্র্য ও দুর্বলতার মধ্যে লইয়া যায়।'

বর্তমান সভ্যতার হাত হইতে জাপান যে সুবিধা এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহা লইয়া সে কি করিবে তাহাই দেখিবার জন্য সমস্ত জগত উদগ্রীব হইয়া আছে। যদি তাহা পশ্চিমের অনুকরণ মাত্রেই পর্যবসিত হয়, তবে তার সম্বন্ধে বিশ্বমানব যে আশা করিয়া আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে। পশ্চিম বিশ্বের সম্মুখে অনেক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারে নাই। ব্যক্তির সহিত সমাজের, ধনী সহিত শ্রমিকের, পুরুষের সহিত নারী সংঘর্ষ সেখানে দিন দিন তীব্রতর হইয় উঠিতেছে। সেখানে ঐহিক সুখ লালসা সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের জাতিগত স্বার্থ পরতার সহিত মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শের রাজ্য বাণিজ্যের বিপুল ব্যবস্থার কার্য জটিলতার সহিত মানুষের অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষিত সরলতা, সুষমা এবং অবকাশ প্রবণতার যে বিরোধ বাধিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনাই এখন বিশ্বের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইয়া হইয়া উঠিয়াছে সকলেই জাপানের কাছ হইতে এই সমস্যার মীমাংসা প্রত্যাশা করিতেছে।

এই পশ্চিমের সভ্যতার অপরিমেয় সঞ্চয়ের ভারে আজ যে তাহার নিজেরই শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার লক্ষণ সেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে।......অতএব এই পশ্চিমের সভ্যতাকে নির্বিচারে একেবারে লঘুভাবে গ্রহণ করা কোন মতেই শ্রেয় হইতে পারে না। ইহার উদ্দেশ্য, ইহার উপায় এবং ইহার উপকরণকে আজ যদি আমরা অপরিহার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে বস্তুতঃই সাংঘাতিক ভুল করা হইবে।

যে রাজনৈতিক সভ্যতা য়ুরোপের মাটি হইতে উঠিয়া আজ সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, বর্জন ও সংহারই তাহার ভিত্তি। সে সকলকে দূরে রাখিতে অথবা নির্মূল করিতে উদ্যত। ইহা পরস্বাপহরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা দুর্বল তাহাদিগকে দুর্বলতার মধ্যে চিরদিনের জন্য বন্ধ করিয়া রাখিতে চায়। আজ যেন একটা প্রকাণ্ড হিংসা সমস্ত পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করিবার জন্য তাহার জঘন্য নখদন্তকে বিস্তার করিতেছে। ইহা স্বার্থের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বা মিথ্যার জাল বুনিতে লজ্জাবোধ করে না; ইহা লোভকে দেবতার আসনে বসাইয়া দেশভক্তির অঞ্জলি দিয়া তাহাকে পূজা করে। যাহাই হউক, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এরূপ ব্যাপার বরাবর চলিতেই পারে না'

এই দুইটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ জাপান সম্বন্ধে তাঁহার আশা ও আকাঙ্খার কথা খুবই স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

# রবীন্দ্রনাথের সহিত কয়েকটি দিন

কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ

কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় যখন গুরুদেবের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করে আমাকে আহ্বান করলেন, ওখানে থেকে তাঁকে সাহায্য করতে, তখন গর্বের সঙ্গে যথেষ্ট ভয় মেশান ছিলো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মণীষীর চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করবার গুরুতর দায়িত্ব চিকিৎসকের জীবনে আসে খুবই কম। কিন্তু সমস্ত আশঙ্কা ও ভয় চলে গেল যখন সদানন্দময় রহস্যপ্রিয় ভারতীয় ঋষির পাশে এসে দাঁড়ালুম।

৩রা জুলাই (১৯৪১) শান্তিনিকেতন উপস্থিত হলুম। সেদিন ছিল বাদ্‌লা, হঠাৎ সবটা আকাশ কালো হয়ে ঝপঝপ করে হল বৃষ্টি সুরু, আবার থেমে গিয়ে রোদ ঝলসে উঠল চারিদিকে, এমনিভাবে আষাঢ় দিনের লুকোচুরি চল্‌ছিল। গাড়ীর কামরাতে যতটা না অবসন্ন বোধ করেছিলাম তার চাইতে বেশী হোলো বোলপুরের বাদ্‌লায় ভাঙ্গা তরঙ্গায়িত লাল-সুরকীর সামান্য রাস্তাটুকু পার হতে। রাত্রি ৮টায় উদয়নে গুরুদেবের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম। খুব অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাঁর মুখচ্ছবি, ক্লান্তি ফুটে উঠেছিল মুখে, কিন্তু বিরক্তির লেশমাত্র ছিল না, সহজ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কবিরাজ বিমলানন্দ-দাদাকে বল্লেন "দেখ তোমার ঔষধ ও পথ্য নিয়ম করে খাচ্ছি, মন্দ আছি বলে মনে হচ্ছে না, ওঁরা বলছেন জ্বরটাও কিছু কমেছে।" আমি ওঁকে প্রণাম করলুম, তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন—কবিরাজ মহাশয় আমার পরিচয় দিয়ে বল্লেন, ইনিই আপনার কাছে সর্বদা থাকবেন, আপনার সমস্ত উপসর্গগুলো ওঁর কাছে বলবেন, ইনি প্রয়োজন মত আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন, তিনি সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে বল্লেন "বেশ ভাল।"

এভাবে আমার কাজে আমি বহাল হলুম—প্রতিদিন সকালে ও বিকালে গুরুদেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কোরে রিপোর্ট লিখে পাঠাতুম। আমার থাকবার ব্যবস্থা হোয়েছিল শ্যামলীতে উত্তরায়ণের মধ্যেই। প্রতিদিনের আসা-যাওয়ায় ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমার সঙ্কোচ অনেকখানি কমে এসেছিল, সব চাইতে বেশী হয়েছিল গুরুদেবের সহজ ব্যবহারে। এই অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর মানসিক ক্ষমতা নষ্ট হয়নি। তাঁর পরমাশ্চর্য জীবনের দৈনন্দিন পরিচয় এ সময় কিছুটা পাই। এই অসুস্থ অবস্থাতেও গুরুদেব আমার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজ-খবর নিতেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সবাই। ক্রমে শরীরের খুঁটিনাটি খবর নেবার ও ব্যবস্থা দেবার গণ্ডি থেকে আমার প্রবেশাধিকার এসে গেল গুরুদেবের দৈনন্দিন চিন্তাধারা ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে। যেদিন তিনি শুনলেন, এককালে বঙ্গীয় সরকারের রোষকবলিত হ'য়ে আমাকে ৫।৬ বৎসর বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছিল, তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বল্লেন, "তুমি ত বড় সাংঘাতিক লোক হে'। তাঁর কণ্ঠে চাপা রহস্যের ভাব, সঙ্গে সঙ্গে একটু উৎফুল্লতারও—"আমি আগে থেকে যদি জানতুম্ তাহোলে তোমাকে এখানে আস্‌তেই দিতুম না।" আমি নীরবে হাসছিলুম, এরপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় কোথায় ছিলুম এবং আমার বন্দিজীবন কিভাবে কেটেছিল। আমার কথা তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে সব শুনেছিলেন, বল্লেন—"তোমার অভিজ্ঞতাগুলো লিখে রাখতে কাজ হবে।" এ আলোচনার সময় শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবীশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হেসে বল্লেন, "আপনি বেশ বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছেন, ইনি এগুলো লিখুন, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ওঁকে নিয়ে জেলে পুরুক'। গুরুদেব সহাস্যে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ক্ষতি কি হে?" মুখে চোখে চাপা রহস্য ফুটে উঠেছে "দুবেলা খাবারটা জুটবে কোন ভাবনা নেই চিন্তা নেই।' সকলেই সমস্বরে হেসে উঠলুম। নানা কথায় একদিন ওঁর 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধে কথা উঠলো, তিনি একটু দুঃখের সঙ্গে বল্‌লেন, "তোমরা এই বইখানি গ্রহণ করনি।" আমি চুপ করে ছিলুম। তিনি বুঝলেন সেটা স্বীকার করে নিচ্ছি। পরে বল্লেন, "দেখ আমি কোনদিন তখনকার ঘটনার সংস্পর্শে আসিনি। শুনেছিলাম তখনকার দিনে স্বাদেশিকতার নাম দিয়ে আমাদের দেশের অনেক স্বার্থপর লোক, লোক ঠকাবার ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। দেশের লোক ওঁদের চিন্‌তে না পেরে নানা-ভাবে নির্যাতিত হয়েছে। আমার খুব আতঙ্ক হ'ল, বুঝলাম দেশবাসীকে সতর্ক করে তুলতে হবে।" তাঁর ভাষায় উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠ্‌লো, "সেজন্যই আমিও বইখানা লিখেছিলুম।" আমি বল্লুম, "আপনি যে সমস্ত ঘটনার সমাবেশ সেখানে করেছেন, সেগুলো অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে না খাটছে তা নয়; কিন্তু আপনার বইতে সেগুলোই বিপ্লব-পন্থীদের কর্মপন্থা হিসাবে ফুটে উঠেছে। ওদের কাজগুলোকে ভাল বা মন্দ কিছুই না বলে এটুকু বলা চলে, যে সব তরুণ-তরুণী এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকের চরিত্রে এমন নিষ্ঠা ও ত্যাগ ছিল যে, দেশবাসীর কাছে তারজন্য শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাঁরা আশা করতে পারেন। আপনার এই বইয়ে তাঁরা নিরাশ হয়েছেন নিশ্চয়ই।" তিনি বল্লেন "আমি সেটা নিশ্চয়ই মানি, আমার বইয়ে সেটা বাদ দিইনি, যদি তোমার মনে থেকে থাকে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে সেদিক থেকে তাঁদের পাওনা আমি দিয়েছি। আমি সেটা মেনে নিয়ে বললুম "তবুও সাধারণ পাঠক যাঁরা তাঁদের মনে অন্য দিকের ছাপটাই বড় হয়ে ফুটে উঠে, সেদিকটা অন্ধকারেই থেকে যায়।' তিনি মৌন হয়ে রইলেন। আমি বলে চললুম "বিশ্ববিদ্যালয়ের কত ছাত্রছাত্রী তাঁদের পড়াশোনাতে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। স্বেচ্ছায় কত লোক অবর্ণনীয় দারিদ্র্যকে বরণ করেছেন, অশিক্ষিতা কুলবধূ পর্যন্ত স্বামী ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীর লাঞ্ছনা সয়ে এঁদের সাহায্য করেছেন। মিছে করে হারিয়ে গেছে বলে নিজেদের বংসামান্য গহনা তাঁদের পলাতক জীবনের সাহায্যে উৎসর্গ করেছেন, এঁদের ইতিহাস কেউ লিখবে না, এঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনও কেউ করবে না।" তিনি মৌন-ভঙ্গ করে বললেন "তুমি আমার বদনাম গল্পটি পড়েছ?" আমি জানালুম পড়িনি। তিনি বললেন "আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে সেটা বেরিয়েছে, তুমি আজই পড়ে নেবে। এ সম্বন্ধে তোমার মতামত শুনবো সেদিন এই পর্যন্ত আলাপ রইল। চিকিৎসা সংক্রান্ত কর্তব্য সেরে "শ্যামলীতে" এলুম। এবং সেইদিনই 'বদনাম" গল্পটি পড়ে রাখলুম।

পরদিন গুরুদেবের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি শুনলেন তাঁর স্বজনরা তাঁর অপারেশন করার সিদ্ধান্ত করেছেন। অস্ত্রোপচারের সম্বন্ধে ওঁর খুব অনিচ্ছা ছিল। তিনি বল্‌লেন আমার যাবার বয়স ত হয়ে এল। কতদিন আর থাকব? একটা উপলক্ষ করে আমাকে ত যেতেই হবে। না হয় এ অসুখটা উপলক্ষ করেই গেলুম। এরজন্য আর অস্ত্রোপচার কেন? বারান্তরে বলেছিলেন, "আমার একাশি বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার গায়ে একটা ফোঁড়া ও খোস পর্যন্ত হয়নি, শেষ সময় একটা ক্ষত নিয়ে যাব"? ইত্যাদি। কিন্তু যখন সবার মতেই ওঁকে মত দিতে হোলো তখন তাঁর অস্বস্তি ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল, সে সঙ্গে কিছুটা উপসর্গও। এ সময় তিনি গল্পচ্ছলে একদিন বলেছিলেন "আমায় একবার বিছে কামড়েছিল, সেকি অসহ্য যন্ত্রণা—প্রলেপ দিলুম, কিছুতেই কমলো না। তখন হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল আর অমনি মনকে দেহ থেকে সরিয়ে নিয়ে এলুম দেখলুম, রবীন্দ্রনাথ অসহ্য যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছে-এর পরই আমার সমস্ত যন্ত্রণা কোথায় চলে গেল। এবারও (অস্ত্রোপচারের সময়) আমায় এই করতে হবে।"

আর একদিন নিয়মিত হাজিরা দিতে আমি এলুম। গুরুদেবকে জানালুম আমি 'বদনাম' গল্পখানা পড়েছি। তিনি খুব ঔৎসুক্য নিয়ে আমার দিকে তাকালেন বল্লেন 'কেমন লাগল।'

আমি বল্লাম 'খুব ভাল লেগেছে—আমি বিশ্বাস করি এ ধরণের ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকবে।" তিনি বল্লেন আরও অনেকে একথা বলেছেন, আপনি, যেগুলো কল্পনা থেকে লেখেন, সেগুলো অনেক সময় এমন বাস্তব যে বিশ্বাস হয় না আপনি না দেখে লিখেছেন। হবেও বা।' তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন "আমি একবার স্বদেশীতে খুব মেতেছিলুম। তোমরা জান কিনা জানি না সে সময় আমি নিজেকে পুরোপুরিভাবে নিয়োগ করেছিলুম—সভা সমিতি বক্তৃতাতে। কিন্তু এর পরই আমাকে সরে আসতে হ'ল। তখন দেখেছি নেতৃস্থানীয় লোকদের চরিত্রে কত আবর্জনা জড় হয়েছিল। আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপই বলব। নিজের স্বার্থ নিয়ে এমন বিশ্রী কাড়াকাড়িতে আমার মন হাঁপিয়ে উঠল—তারপর থেকে এখানেই এসে পড়েছি—লোকশিক্ষার আদর্শ নিয়ে। আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক নিষ্ঠার জন্য।' আমি বল্লুম "আপনার তখনকার কথা জানি—আপনার নাইটহুড প্রত্যাখ্যানের চিঠিখানা আমার খুব ভাল মনে আছে, জাতীয় আন্দোলনেএর প্রভাবও বিস্ময়ের। আপনার "সভ্যতার সংকট" ও মিস রাথবোনের নিকট লেখা চিঠি এর তুলনা নাই।" তিনি একটু কৌতুক করেই বল্লেন, "তবুও আমাকে গ্রেপ্তার করেনি। কেন বলত?" আমি বল্লুম "বোধ হয় সামলাতে পারবে না বলে তাদের মনে হয়েছিল।' তিনি সোৎসাহে বল্লেন "ঠিক বলেছ, শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে এর তুমুল প্রতিবাদ হত।"

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে ও'র একটু-খানি অভিমান ছিল এ ভাব ফুটে উঠত ও'র অনেক আলোচনার মাঝখানে। সমস্ত জগত যখন ও'কে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কল্লেন ও'র স্বদেশবাসীরা এলেন শুধু তখনই জয়মাল্য নিয়ে। এ গৌরবও নিরঙ্কুশ ভোগ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। "শোননি এখানে (শান্তি-নিকেতন) এলে ছেলেরা সব চালিয়াৎ হয়ে যায়?" একদিন কৌতুকোজ্জ্বল নেত্র বিস্ফারিত করে আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন। আমি হেসে বল্লুম "শুধু শুনেছি তা নয় অনেকদিন বিশ্বাসও করেছি. এ জন্যই এতদিন এখানে আসার কোনও প্রবল আকাঙ্ক্ষা কোনও দিন হয়নি। পুনরায় হেসে বল্লেন "এটাও শুনেছ, রবীন্দ্রনাথ খুব অত্যাচারী জমিদার?" আমি বল্লুম "হ্যাঁ শুনেছি, আপনার 'দুই বিঘা জমি'র পরিশিষ্ট হিসাবে।" "দেখ বাঙ্গালী আমাকে চিনেছে" বলে তিনি মৃদু হাসতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর হাসির পেছনে আসন্ন বিদায়ের দিনের আহত অভিমানের ছাপ পুরোপুরি চাপা পড়েনি, সমস্ত পৃথিবী মন্থন করে আহরণ করা গৌরবের সুধাপাত্রখানি একান্ত আপনার জনের মুখে প্রশান্তি ও গর্ব এনে দিতে পারেনি, এ বেদনা তাঁকে রেহাই দেয় নাই। আমি বল্লুম, "বাঙ্গালীর মনে আপনি যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছেন আপনার জীবন দিয়ে, বাঙ্গলা হয়ত এর উত্তরাধিকারিত্বের মর্যাদা রেখে চলতে পারবে। বাঙ্গালীর কালচার, বাঙ্গালীর শিক্ষা প্রতিভা এসব নিয়ে আপনি কি মনে করেন না বাঙ্গালী জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারবে?" গুরুদেব সেই মৃদু হাসিটিকে বজায় রেখে বল্লেন 'তোমার কথা ঠিক। বড় হবার সব উপকরণই বাঙ্গালীর আছে, কিন্তু আরও একটি উপকরণ আছে যার জন্য বাঙ্গালীর বড় হবার কোন আশা দেখি না—পরশ্রীকাতরতা, বাঙ্গালী এটা ছাড়তে পারবে বলে ভরসা হয় না।" খানিকক্ষণ চুপ থেকে বল্লেন, "দেখো বাঙ্গালী বড় হবে, তবে কারা জানো বাঙ্গলার মুসলমান। এই ব্যাধিটি (পরশ্রীকাতরতা) ওদের চরিত্রে নেই, অথচ প্রতিভা তাঁদের আছে।" এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। মুসলমান-সম্প্রদায় হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমান তাঁদের প্রতিভা গড়ে তুলবার একক পরিবেশ কখনো পেতে পারে এ কল্পনা তখনকার দিনে সুদূরপরাহত ছিল। আমায় একদিন গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাজ-নৈতিক বন্দী হিসাবে যে সমস্ত সরকারী কর্মচারীর সম্পর্কে আমরা এসেছি, তাঁরা কিরকম ব্যবহার করতেন আমাদের সঙ্গে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁকে জানিয়েছিলুম, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার আমরা পেয়েছিলুম তাঁদের যাঁদের প্রকৃত শত্রু ছিলুম আমরা—ইংরেজ জাতি। তাঁরা আমাদের সমকক্ষ হিসেবে দেখতেন। সবচেয়ে দুর্ব্যবহার পেয়েছি হিন্দু পুলিশ কর্মচারী থেকে—তাঁরাই ভাবতেন আমরা তাঁদের শত্রু। শুধু মুসলমান কর্মচারী-দের ব্যবহার ছিল খুব আন্তরিকতাপূর্ণ। এমন ঘটনাও ঘটেছে কোনও কোনও মুসলমান পুলিশ কর্মচারী চাকুরী বিপন্ন করেও আমাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সহানুভূতি দেখাতে ত্রুটি করেন নাই। হিন্দু কর্মচারী অনেকেই আমাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁদের চাকুরীর উন্নতির পথ প্রশস্ত কচ্ছিলেন। এ কাহিনী শুধু আমার জীবনে নয়, বাঙ্গলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে বহু-লোকের অভিজ্ঞতাও এর সাক্ষ্য দেয়। গুরুদেব সোৎসাহে বলেছিলেন 'তুমি এগুলো লিখো'। আজ ভারতের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের পট-ভূমিকায় মনে হয় সত্যদ্রষ্টা ভারতীয় ঋষির এই ভবিষ্যদ্বাণী হয়ত সাফল্যের বহু দূরে নেই। রাষ্ট্রবিপ্লবে বিধ্বস্ত দেশে ঘনতিমিররজনী-শেষে শান্ত ঊষায় বাঙ্গলার মুসলমান হয়ত নিজ প্রতিভায় স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে। আজ সমস্ত দেশ সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিষে সমাচ্ছন্ন। আজ মানবতা সাম্প্রদায়িকতার রুদ্ধদ্বারে প্রত্যাখ্যাত ভিখারী। যুগ যুগ সঞ্চিত মানব-সভ্যতা নগ্নতায় আজ আদিম সভ্যতার স্তরে এসে পড়েছে। কিন্তু ইতিহাসের রথচক্র নতুন অধ্যায়ের সূচনা আনবেই।

গুরুদেব ক্রমশঃই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর সদাপ্রফুল্ল মুখ মণ্ডলে অবসাদের ছায়া মাঝে মাঝে এসে পড়ছে। তবুও কৌতুক ও রঙ্গরস তাঁর সমানেই চলেছে। কাব্যালাপে তাঁর আনন্দ যেন উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠে। একদিন 'সোনার তরী' লেখাকালীন কয়েকটি কাহিনী তিনি বলে চলেছেন, শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবীশও সোৎসাহে যোগ দিচ্ছেন, গুরুদেব কথায় নিমগ্ন, আমি নির্বাক শ্রোতা, শুধু বসেছিলাম। হঠাৎ তাঁর নজর পড়্‌ল আমার উপর। কৃত্রিম বিরক্তির স্বরে চোখ দুটো কপালে তুলে শ্রীযুক্তা মহলানবীশকে বল্লেন, "ওকি কচ্ছো রাণী তোমার একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। একটি অকবির কাছে কাব্য করে চলেছে—একদম বেহুঁশ। কি বলহে, কোবরেজ?" আমি হেসে বল্লুম "এ ঠিক হোলো না গুরুদেব, আমি কবিরাজ আর আপনি বলছেন আমি অকবি?" সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। গুরুদেবও প্রবল হাসির সঙ্গে বল্লেন, "তাহলে কি হবে আমি তোমার চেয়েও এক ডিগ্রী উপরে। আমি কবিসম্রাট।"—আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে "লোকে তাই বলে।" হাসির দমক আবার বেড়ে উঠল। ও'র শারীরিক দুর্বলতার জন্যে কোনও সমস্যামূলক আলোচনা তিনি করেন আমরা সেটা পছন্দ করতুম না, যদিও ও'র কাছে থেকে অনেকিছু আলোচনা করবার বাসনা দুর্বার হয়ে পড়তো। সুতরাং শুধু মাঝে মাঝে ও'র প্রফুল্লতম মহূর্তে তিনি যখন যা বলতেন তাতেই খুসী থাকতুম। এতটুকু প্রবন্ধে সেগুলো লিখে ওঠা সম্ভব নয়। তাই আজ সেই লোভ সংবরণ করলুম। এই কয়েকটি দিনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আলোর মত, সঙ্গে সঙ্গে ও'র খণ্ড খণ্ড কথা ও পরিহাস অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মির মত মাধুর্য-মণ্ডিত ক্ষণগুলো। শ্রাবণ পূর্ণিমার ম্লান চাঁদের আলোতে গঙ্গার তীর থেকে যখন গন্ধপূত নশ্বর দেহাবসানের শ্বেত ধূম্রজাল আবর্তিত হয়ে ছুটেছিল তখনও মনে হয় নাই, যে ভাষা আজ শতাব্দী ধরে ভাষা জুগিয়েছে, যে কণ্ঠ সবার কণ্ঠে সঙ্গীত এনে দিয়েছে, সে ভাষা সে কণ্ঠ আজ স্তব্ধ হয়ে গেল কত যুগান্তরের জন্য কে জানে!

---

# রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি

আসাবরি—ঝাঁপতাল

**কথা ও সুর :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　**স্বরলিপি :** শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

দীর্ঘ জীবনপথ, কত　　দুঃখতাপ, কত শোকদহন—

গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।

খুলে রেখেছেন তাঁর　　অমৃতভবনদ্বার—

শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবসান ॥

অনন্তের পানে চাহি　　আনন্দের গান গাহি—

ক্ষুদ্র শোকতাপ নাহি নাহি রে।

অনন্ত আলয় যার　　কিসের ভাবনা তার—

নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব না রে ম্রিয়মাণ ॥

II [ণ]দা -া | পমা -জ্ঞমপা মা | পা পা | পা -া পা I পা দা | দাঃ -পঃ মা |

দী ০ র্ঘ০ ০০০ জী ব ন প ০ থ ক ত দুঃ ০ খ

| পা -দা | ণর্সণাঃ -দঃ -পা I পা পদা | মপা -দণা দপা | মা পা | [ম]জ্ঞা -া -ঋসা I

তা ০ প০০ ০ ০ ক ত০ শো০ ০০ ক০ দ হ ন ০ ০০

I সা সা | মা -গমপা মা | পা পা | পা -া দা I দা ঋর্ঁা | সর্ঋর্সা -ণদা পমপা I

গে য়ে চ ০০০ লি ত বু তাঁ ০ র ক রু ণা০০ ০০ র০০

| [ম]জ্ঞা -া | ঋা -া -সা II { [ণ]দা দা | দা -র্সা ণা | র্সা র্সা | র্সা -া -া I [ণ]দা দা |

গা ০ ন ০ ০ খু লে রে ০ খে ছে ন তাঁ ০ র্ অ মৃ

| ণা -র্সজ্ঞা জ্ঞা | র্মা জ্ঞা | ঋা -র্সা -া } I [ণ]দা -া | পা -দপা মা | [ম]দা -া | [দ]র্সা -া -া I

ত ০০ ভ ব ন দ্বা ০ র্ শ্রা ০ ন্তি ০০ ঘু চি ০ বে ০ ০

I পা -মা | [ণ]দা -পমা পা | [ম]জ্ঞা -া | ঋা -সা -া I সা জ্ঞা | জ্ঞা -া ঋর্সা |

অ ০ শ্রু ০০ মু ছি ০ বে ০ ০ এ প থে ০ র০

| [স]ণা ণদা | পা -া দণা I দপা -া | মজ্ঞা -া -মা | [ম]-জ্ঞা -া | -ঋা -সা -া II

হ বে০ অ ০ ব০ সা০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

II { সা সা | [স]দা -া দা | পা দা | [দ]পা -া পদা I মা পা | মপা -দণা দপা |

অ ন ন্তে ০ র পা নে চা ০ হি০ আ ন ন্দে০ ০০ র০

| মা পা | [ম]জ্ঞা -া জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞদা -পণা দপা | মপা মজ্ঞা | জ্ঞা -া [জ্ঞ]মা I

গা ন গা ০ হি ক্ষু দ্র শো০ ০০ ক০ তা০ প০ না ০ হি

I জ্ঞা -া | [জ্ঞ]ঋা -া -জ্ঞঋা | [ঋ]সা -া | -া -া -া } I { [ণ]দা দা | দা -র্সা ণা | র্সা র্সা |

না ০ হি ০ ০০ রে ০ ০ ০ ০ অ ন ন্ত ০ আ ল য়

| র্সা -া -া I [ণ]দা দা | ণা -র্সজ্ঞা জ্ঞা | র্মা জ্ঞা | ঋর্া -র্সা -া } I ণা দা | পা -দপা মা |

যা ০ র্ কি সে র ০০ ভা ব না তা ০ র্ নি মে ষে ০০ র

| [ম]দা দা | দা -র্সা র্সা I পা [প]ণা | [ণ]দা -া পা | মা পা | [ম]জ্ঞা -ঋসা সা IIII

তু চ্ছ ভা ০ রে হ ব না ০ রে ম্রি য় মা ০০ ন

# দেশী সংবাদ

**২৬শে এপ্রিল**—সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আইয়ুব খুরো শাসনকার্যে ত্রুটি, কর্তব্যকর্মে অবহেলা ও দুর্নীতি প্রভৃতির অভিযোগে পাকিস্থানের গবর্নর জেনারেল মিঃ জিন্নার নির্দেশে পদচ্যুত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ে জমিয়ৎ-উল-উলেমা-ই-হিন্দের ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। মৌলানা হোসেন আমেদ মদনী সভাপতির ভাষণে বলেন যে, ভারত গবর্নমেণ্ট সমর্থন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

বোম্বাইয়ে সাংবাদিক সমিতি কর্তৃক আহূত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, হায়দরাবাদের ব্যাপারে ভারত সরকারের ধৈর্য শেষ সীমায় পেঁাছিয়াছে।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদের এক সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতের ১৪টি কারিগরী বিদ্যালয়ে সকল প্রদেশের ছাত্রদের উচ্চ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। গবর্নমেণ্ট বিদ্যালয়গুলিকে অর্থসাহায্য প্রদান করিবেন।

**২৭শে এপ্রিল**—বাঙলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী মুন্সীগঞ্জে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলমানদের নিকট হিন্দুদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবার এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা পোষণ না করিবার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, অন্যথায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের বিশেষ অনিষ্ট করা হইবে।

হায়দরাবাদ ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় হায়দরাবাদের প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলী পুনরায় দৃঢ়তার সহিত হায়দরাবাদের স্বাধীন থাকিবার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

হায়দরাবাদ গবর্নমেণ্ট পূর্বাহ্নে তাঁহাদের নিকট হইতে গৃহীত আদেশ ব্যতিরেকে মাদ্রাজ পুলিশের তাঁহাদের রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আজ মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে পরিষদের নেতা শ্রীযুত বি গোপাল রেড্ডী এই তথ্য প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট এই আদেশ বাতিল করিবার জন্য নিজাম গবর্নমেণ্টকে চাপ দিতে ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন।

কলিকাতায় একটি ব্যাঙ্কের ভবানীপুরে শাখায় এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। উক্ত ঘটনায় ডাকাতগণ ষ্টেনগান, রিভলবার এবং ছোরা দেখাইয়া প্রায় ৪৭৫০০, টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্নমেণ্ট কর্তৃক বিক্রয় কর ধার্য করার প্রতিবাদে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

**২৮শে এপ্রিল**—নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্যসচিব সম্মেলন আরম্ভ হয়। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন বক্তৃতায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, দেশ এক চরম খাদ্যসঙ্কট এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই অবস্থায় কোনক্রমেই আমাদের চেষ্টাকে মন্দীভূত করা চলে না।

পাকিস্থানস্থিত ভারতের হাইকমিশনার শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ পূর্ববঙ্গের হিন্দু সংখ্যালঘুদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়াছিলেন। আজ তাঁহার ঢাকা সফর শেষ হইয়াছে।

গতকল্য ঢাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশের নিকট একখানি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। উহাতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের ব্যাপক বাস্তুত্যাগের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের বর্তমান অবস্থা মোটেই লোভনীয় নহে।

**২৯শে এপ্রিল**—শোলাপুরের সংবাদে প্রকাশ, হায়দরাবাদের রাজাকার ও গুণ্ডারা শোলাপুর জেলার অন্তর্গত বড়সী তালুকের অধীনে আলফপুর গ্রামে গুলী চালাইয়া তিনজন গ্রামবাসীকে নিহত ও অপর ৪ জনকে আহত করিয়াছে। আলফপুর গ্রামটি হায়দরাবাদ ও বোম্বাইর সীমান্তে অবস্থিত এবং উহা সরাসরি নিজাম রাজ্যের সংলগ্ন।

**৩০শে এপ্রিল**—নয়াদিল্লীতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

কালিকটের সংবাদে প্রকাশ, উত্তর মালাবারের ওনাচিয়াম-এ একদল পুলিশের সহিত একদল কম্যুনিস্টের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। ফলে ৭ জন লোক নিহত হয়।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন শেষ হইয়াছে। বিহারে জমিদারীর ক্ষতিপূরণের হার সম্পর্কে জমিদার ও বিহার গভর্নমেণ্টের মধ্যে যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে কমিটি সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। রাষ্ট্র কর্তৃক জমি দখল সংক্রান্ত বিলটি বিহার ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে উহা ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনাধীন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অদ্য পার্লামেণ্টারী বোর্ডও গঠন করিয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (সভাপতি), সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ; শ্রীশঙ্কর রাওদেও, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ উহার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

**২রা মে**—বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে পাকিস্থানে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বিলোপের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তদনুযায়ী কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পুনর্গঠন করিতে স্থির করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহ, কাছাড় ও শিলচরের অংশবিশেষ (এগুলি পূর্বে বাঙলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল) ও ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসী সদস্যগণ এবং ১৯৪৮ সালের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের লইয়া পশ্চিমবঙ্গে নূতন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইবে।

পণ্ডিচেরীর সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী ভারতকে আবলম্বে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যে প্রস্তাব করা হয়, তাহা গতকল্য ফরাসী-ভারত প্রতিনিধি পরিষদে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

# বিদেশী সংবাদ

**২৭শে এপ্রিল**—দামাস্কাসে সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গতকল্য রাত্রিতে ট্রান্সজর্ডান সরকার ইহুদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে[illegible] করিয়াছে। ট্রান্সজর্ডান সৈন্যদল জেরুজালেমের ১৫ মাইল উত্তর-পূর্বে ও প্যালেস্টাইন সীমান্ত হইতে পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত জেরিকো দখল করিয়াছে। প্রকাশ যে, ট্রান্সজর্ডানের রাজধানী আম্মনে, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান ও ইরাকের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, তিন দিক হইতে প্যালেস্টাইনে আক্রমণ শুরু করা হইবে এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রণক্ষেত্রে ৪০ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইবে।

**২৮শে এপ্রিল**—আজ কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ঘোষণা করেন। লণ্ডনে বিভিন্ন ডোমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রীদের এক সম্মেলনের অনুষ্ঠানের জন্য আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

তেলআবিবের সংবাদে প্রকাশ, আজ বৃটিশ বাহিনী জাফাস্থ আরব বন্দরের দুই সহস্র ইহুদী সৈন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

আম্মানের বৃটিশ মন্ত্রী ট্রান্সজর্ডানের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সরকারী রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা লণ্ডনে পেঁাছিয়াছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, উক্ত রিপোর্টে ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লা কর্তৃক ইহুদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার কথা অস্বীকার করা হইয়াছে।

বৃটিশ গবর্নমেণ্টের এক মুখপাত্র বলেন যে, ১৫ই মের পূর্বে প্যালেস্টাইনের প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলি হইতে কোন সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ হইলে বৃটিশ বাহিনী সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে।

জেরুজালেমের সংবাদে প্রকাশ, আম্মানে ট্রান্সজর্ডান গবর্নমেণ্টের মুখপাত্র অদ্য বলেন যে, আগামী দশ দিনের মধ্যেই আরব লেজিয়ন সৈন্য জেরুজালেমে প্রবেশ করিবে।

**২৯শে এপ্রিল**—প্যালেস্টাইন গবর্নমেণ্ট ইহুদী এজেন্সীকে সাবধান করিয়া দিবার পর আজ [illegible] জাফায় বৃটিশ সেনানায়ক অস্ত্র সংবরণের আদেশ দেন। সতর্কবাণী পাইবার পর ইহুদীরা যুদ্ধ-বিরতির জন্য প্রস্তাব করে। তদনুসারে ১৮ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ-বিরতি হয়।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসা[illegible] ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ ] শনিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ সাল। Saturday 15th May, 1948 [ ২৮শ [illegible]

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### দেশসেবার আহ্বান—

পশ্চিম বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের সমস্যার যবনিকাপাত হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতি পরিষদের কংগ্রেসী দলের আস্থা প্রমাণিত হইয়াছে। কংগ্রেস পরিষদের দলের সভায় মন্ত্রিমণ্ডল পুনর্গঠন-কামীরা তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন। ডাক্তার রায়ের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ইঁহারা শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন নাই, ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, যেমন প্রস্তাব লইয়া কংগ্রেসী পরিষদ দলের মধ্যে যদি একবার বিভেদ সুস্পষ্ট হইয়া পড়িত, তবে ক্রমাগত উপদলীয় চক্রান্তে তাহার তীব্রতা বাড়িয়া চলিত এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির আশা সুদূরপরাহত হইত। ডাক্তার রায়ের পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির বিরুদ্ধতায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দলের সদস্যদের ভিতর আপোষ আলোচনার পথে যাহাতে মীমাংসা ঘটে তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মতে এই পথ পূর্বে অবলম্বন করাই তাঁহাদের উচিত ছিল, তাহা হইলে ব্যাপার এতদূর গড়াইত না। মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া পশ্চিম বাঙলার ভাগ্য লইয়া এই-ভাবে দায়িত্ববিহীন পথ না ধরিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের দোষত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য পূর্ব হইতে ধীরতার সঙ্গে যদি তাঁহারা কাজ করিতেন, তবে বাঙলা দেশের রাজনীতি অনেকটা বর্তমান দুর্নাম হইতে মুক্ত থাকিত। আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারের সম্বন্ধে বাহিরে এমনভাবে লোক হাসিত না। আমরা আশা করি, অতঃপর পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেস দলের মধ্যে দেশের স্বার্থবোধ একান্ত হইয়া উঠিবে এবং তাঁহারা পরস্পরের ভিতরকার ভেদ-বিভেদ ভুলিয়া অতঃপর একযোগে পশ্চিম বাঙলার কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম বাঙলার সংকটের আজ অন্ত নাই। ভারতের মধ্যে এই প্রদেশ নানাকারণে সবচেয়ে সংকট সঙ্কুল স্থান হইয়া পড়িয়াছে। পরিষদের কংগ্রেস দলের উপরই পশ্চিম বাঙলার ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা যদি এই অবস্থায় উপদলীয় চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া কেবল মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গাগড়ার চেষ্টাতেই প্রমত্ত থাকেন তবে দেশের দুর্গতির অবধি থাকিবে না। পরিষদের দলকে আজ নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া চলিতে হইবে। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙলা দেশ-সেবাব্রতে যে ত্যাগ এবং যে নিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, সেই আদর্শ তাঁহাদিগকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিত্ব কে বা কাহারা পাইল কিংবা না পাইল ব্যক্তিগত বিচারের দিক হইতে তাহা বড় কথা নয়, মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি এবং কর্ম-পদ্ধতির সাহায্যে পশ্চিম বাঙলার সঙ্কট ও সমস্যাসমূহের কার্যকর পথে কতটা সমাধান হয়, তাহাই এক্ষেত্রে প্রধানতঃ বিবেচ্য। ডাক্তার রায়ের পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলের কোন দোষ বা ত্রুটি ছিল না, আমরা এমন কথা বলিব না। যাঁহারা ডাক্তার রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি এবং পদ্ধতিতে পরিবর্তন কামনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে অভিসন্ধির বশে চলিয়াছেন, এমন যুক্তিও আমরা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের মধ্যেও দেশসেবায় নিষ্ঠা-বুদ্ধি-সম্পন্ন কর্মী আছেন এবং তাঁহাদের সব অভিযোগ একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না। আমরা আশা করি, পশ্চিম বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিমণ্ডলের গঠন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং সকল দলের ঐক্য ও সংহতির সহায়ে মন্ত্রি-মণ্ডলীকে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইবেন। পশ্চিম বাঙলার পরিষদের কংগ্রেস দলের সদস্যদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ বিচারের সব দৈন্য এবং সংকীর্ণতা হইতে তাঁহারা তাঁহাদের দলের প্রতিবেশ মুক্ত করুন। উপ-দলীয় চক্রান্তের ফলে কংগ্রেসের আদর্শ মলিন হইতে বসিয়াছে। জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি হারাইতে বসিয়াছে। পশ্চিম বাঙলার ভবিষ্যতের পক্ষে এই অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ সাধনায় স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তার যে উজ্জ্বল আদর্শ এখানে জাগিয়াছিল, তাহার প্রেরণা হইতে জাতি যদি এইভাবে বঞ্চিত হয়, তবে পশ্চিম বাঙলার বাঁচিবার পথ থাকিবে না। সে অবস্থায় ভেদ-বিভেদ এবং দুর্নীতির চরম আঘাতে এখানকার সমাজ চেতনা একেবারে ভাঙিগয়া পড়িবে। পরিষদের কংগ্রেস দল এখনও এ সম্বন্ধে সতর্ক হউন এবং নিঃস্বার্থ সেবা-পরায়ণতার পথে জাতিকে গড়িয়া তুলুন।

**সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ—**

পশ্চিম বাঙলার সরকার সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগকারীদের নাম রেজেস্ট্রী করিবার জন্য তাঁহারা কলিকাতায় আরও তিনটি নূতন অফিস খুলিয়াছেন। বাস্তুত্যাগকারীদিগকে নাম রেজেস্ট্রী করিতে দারুণ দুর্ভোগ পোহাইতে হয়, আমরা এমন অভিযোগ অনেক পাইয়াছি। এই ব্যবস্থার ফলে সে দুর্ভোগ অনেকটা কমিবে আশা করা যায়; কিন্তু নাম রেজেস্ট্রী করাটাই এক্ষেত্রে বড় কথা নয়। পূর্ববঙ্গের আশ্রয়-প্রার্থীদের পুনর্বসতি বিধানের জন্য পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কতদূর কি ব্যবস্থা করিয়াছেন বা করিতেছেন, ইহাই প্রধান বিচার্য বিষয়। আমা-দিগকে নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই একথা বলিতে হইতেছে যে, এখনও এইসব অসহায় গৃহ-হারাদের আশ্রয় স্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। ইঁহাদের অনেককেই কর্তাদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়া ঘুরিতে হয় এবং মাথা রাখিবার আশ্রয় জুটে না। বাস্তুত্যাগ আমরা চাই না; কিন্তু অবস্থার ফেরে পড়িয়া যাঁহারা বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতেই হইবে। অথচ এ সম্বন্ধে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কতকটা ঔদাসীন্য বা দায়িত্বহীন লঘুতারই পরিচয় পাইতেছি। মুখে শুধু বড় বড় কথা বলিলেই চলিবে না; পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বাস্তব অবস্থাটা বুঝিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার মোহে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর যদি কোন অত্যাচার হয়, সরকার তাহা কঠোর হস্তে দমন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি এবং সভ্যতার নীতির মর্যাদা রাখিতে তৎপর থাকিবে এবং ধর্মান্ধ মধ্যযুগীয় বর্বরতা এখানে চলিবে না। পশ্চিম বাঙলার সরকার সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের এই নীতি ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই অনুসারে কাজ করিতেছেন। হাওড়ার অন্তর্গত পটুয়াপাড়ায় কিছুদিন আগে যে হাঙ্গামা ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবলম্বিত নীতিই এক্ষেত্রে প্রমাণ। এই ঘটনার বিবরণে জানা যায়, একজন মুসলমান প্রকাশ্যস্থানে গোবধ করিয়াছিল, ইহাতে কতক-গুলি অবাঙালী উত্তেজিত হইয়া হাঙ্গামা বাধায় এবং সেই হাঙ্গামার ফলে কয়জন লোক খুন হয়। প্রকাশ্যস্থানে গোবধ করা অবশ্য বে-আইনী কাজ; কিন্তু সে বে-আইনীর প্রতিকারের জন্য পুলিশ রহিয়াছে, আদালত রহিয়াছে। সে পথ না ধরিয়া হাঙ্গামা বাঁধাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ধর্মান্ধ উত্তেজনার ফলে চার-চারটা খুন হইবে, গভর্নমেণ্টও ইহা বরদাস্ত করিতে পারেন না। এই খুন এবং হাঙ্গামার জন্য যাহারা দায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা-দিগকে সাজা দিবার জন্য কঠোরতার সঙ্গে অগ্রসর হইয়াছেন এবং হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ও এইসঙ্গে জানাইয়া দিয়াছেন যে, এই ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই। অবাঙালীরাই এই হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। তাঁহারা অবাঙালীদের এই ধরণের উপদ্রব সহ্য করিবেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, পূর্ব-বঙ্গের শাসন-ব্যবস্থায় অসাম্প্রদায়িক সেই আদর্শ যদি কঠোরতার সঙ্গে প্রতিপালিত হইত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সব স্তরে অসাম্প্রদায়িক সমাজচেতনাবোধ জাগ্রত থাকিত, তবে সেখানে বাস্তুত্যাগের কোন প্রশ্ন দেখা দিত বলিয়া আমাদের মনে হয় না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাকিস্থানের মূল নীতির কর্ণধারগণ ইসলামিক রাষ্ট্রের ধুয়া কিছুতেই ছাড়িতেছেন না। পাকিস্থান রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ধর্মমত বা সাম্প্রদায়িক সংস্কারমুক্ত হইবে, সোজাসুজি তাঁহারা একথা বলিতেছেন না। ইসলামের গণতান্ত্রিক উদারতার দোহাই দিয়া রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাকে তাঁহারা জড়াইয়া রাখিতেছেন। তাঁহাদের এই নীতি রাষ্ট্রের সমাজ-জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতেছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অসহায়ত্ব এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা বাড়াইয়া চলিয়াছে। পাকিস্থানের শাসন-নীতি এই পাকচক্র হইতে মুক্ত না হইলে সেখানকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহাই আমাদের আশঙ্কা হয়। এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দান এবং তাহাদের পুনর্বসতি বিধানে তৎপর থাকিতে হইবে। তাঁহারা এ কর্তব্য উপেক্ষা করিতে পারেন না।

**আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় চুক্তি**

আগামী ১৫ই মে'র পর হইতে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ১লা এপ্রিলের পূর্বে ডাকমাশুলের যে হার ছিল, তাহাই পুনরায় প্রবর্তিত হইবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভিতরে চিঠিপত্র আদান-প্রদানে যে ডাকমাশুল দিতে হয়, এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ও সেই ডাকমাশুলে চলিবে। বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্তে সকলেই আনন্দিত হইবেন। পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে ডাক-মাশুলের অত্যধিক হার বাঙলাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি করিয়াছিল; কারণ পশ্চিম পাঞ্জাব কিংবা উত্তর-পশ্চিম ও সিন্ধু দেশের ন্যায় পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উভয় বঙ্গের মধ্যে চিঠিপত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্যগত সম্পর্ক এখনও অবিচ্ছেদ্য রহিয়াছে বলা যায়। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ডাক-মাশুলের হার কমিলেও টেলিগ্রামের হার অত্যধিকই আছে এবং এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় পেঁছা সম্ভব হয় নাই। আমরা আশা করি, পাকিস্থান ও ভারতের কর্তৃপক্ষ সত্বরই এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় পেঁছিতে সমর্থ হইবেন এবং সর্বসাধারণের এই গুরু করভার লাঘব করা সম্ভব হইবে। বস্তুত ডাকমাশুলের হার কমানোতেই উভয় রাষ্ট্রের ভিতরকার চিঠিপত্র আদান-প্রদান সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। আমরা দেখিতেছি, এই দীর্ঘ দিনের মধ্যেও পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভিতর চিঠিপত্র বিলি সম্বন্ধে স্বাভাবিক অবস্থা এখনও ফিরিয়া আসে নাই, আদান-প্রদানে এখনও বহু বিলম্ব ঘটিতেছে। এই অব্যবস্থা অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে এইসব ব্যবস্থা পাকা হইলে তবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির সার্থকতা সুনিশ্চিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছিলাম। পাকি-স্থান ও ভারত এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক আদান-প্রদান সম্পর্কিত অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কলিকাতায় উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সম্মেলনের পর অবস্থার কিছু উন্নতিও লক্ষিত হইতেছিল এবং পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনেও আস্থার ভাব ফিরিতেছিল। ডাকমাশুলের হার হ্রাস পাওয়াতে এই আশ্বস্তির ভাব আরও বাড়িত; কিন্তু ইহার মধ্যে নূতন এক অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। পাকিস্থান হইতে সোণা ও রূপা ভারতে লইয়া আসার উপর নিষেধবিধি আরোপ করিয়া কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট অবস্থার জটিলতা আবার বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। পাকিস্থানী ব্যবস্থার পাল্টা হিসাবে সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট ও ভারতবর্ষ হইতে সোণা ও রূপা বাহিরে লওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মেয়েদের চলাফেরায় আবার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। গহনার জন্য তাঁহাদের অঙ্গ তল্লাসীর অসভ্য উপদ্রবেরও ভয় দেখা দিবে। বস্তুত পাকিস্থান গভর্ন-মেণ্টই এক্ষেত্রে প্রথমে ভারত-পাকিস্থান আর্থিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের এমন কার্যের ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রের কোন কোন শ্রেণীর লোকের কিছু ক্ষতি হইলেও মোটামুটি-ভাবে পাকিস্থানের অর্থনীতির উপরই ইহার ফল শোচনীয় হইবে। বিশেষত আগামী ১লা জুলাই হইতে যখন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, তখন

ভারত রাষ্ট্রের সহিত এইরূপ অর্থনৈতিক সংগ্রামের পরিণাম কি হইবে, পাকিস্থানের শাসকবর্গের তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল।

**বাঙলার দাবী**

গত ২৪শে বৈশাখ কলিকাতার বাঙলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকে অবিলম্বে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য দাবী করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই আন্দোলন ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, দাবী নূতন নহে। বাঙালী বহুদিন হইতেই এই দাবী করিয়া আসিতেছে; কিন্তু বর্তমানে এই দাবী পরিপূরণের উপর বাঙালীর জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের আয়তন অবিভক্ত বাঙলার এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে। এই স্বল্পায়তন প্রদেশে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনতা পূর্বেই অত্যধিক ছিল। ইহার উপর পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তুগণ চলিয়া আসিতে বাধ্য হওয়ায় জনসংখ্যার চাপ আরও বাড়িয়াছে। এই সঙ্গে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত করিবার সংকল্প কংগ্রেস বহুপূর্বে ব্যক্ত করিয়াছে। স্বয়ং গান্ধীজী তাঁহার তিরোধানের অনেকদিন পূর্বেও সে সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কংগ্রেস-গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী প্রদেশসমূহের ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের নীতি আজ কার্যে পরিণত করা একান্তভাবেই উচিত। দেশের শাসন-ক্ষমতা এখন দেশবাসীর হাতে আসিয়াছে এবং কংগ্রেস স্বাধীন ভারতীয় গণতন্ত্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কার্যে ব্যাপৃত আছে, বাঙলা অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই এই আশা পোষণ করে যে, এইবার তাহার সম্বন্ধে এতদিন যে অবিচার চলিয়া আসিতেছিল, তাহার প্রতিকার হইবে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশসমূহ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য গণপরিষদ হইতে একটি সাব-কমিটি ইতিমধ্যেই গঠিত হইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি, কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পুনর্গঠন ব্যবস্থা অবিলম্বে অবলম্বিত হইবে এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই সীমানা নির্ধারণ করিয়া শাসন ব্যবস্থা বণ্টন করা হইবে। বস্তুত ভারতের নবগঠিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের অপেক্ষায় বিষয়টি বিলম্বিত করিবার পক্ষে কেহ কেহ যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারি না। সমস্যার জটিলতার কথা উত্থাপন করিয়া যাঁহারা এই বিষয় চাপা দিবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন, আমাদের মতে তাঁহাদের যুক্তি মানিয়া লইতে গেলে ভবিষ্যতের জটিলতাই বৃদ্ধি পাইবে। সমগ্র ভারতের ঐক্য এবং সংহতিকে কিছুতেই শিথিল হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। সমস্যার আশু সমাধান না হইলে সেরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

**কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ**

কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ, এই দুইটি প্রধান সমস্যার একটিরও এ পর্যন্ত সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। হায়দরাবাদে রাজাকার গুণ্ডাদের উপদ্রব, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, এবং নৃশংস বর্বরতায় হিন্দু-নিধন লীলা নির্বিবাদে চলিতেছে। ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিন দলের ধর্মান্ধ নেতা কাসিম রেজভীর অসি আস্ফালন সমানভাবেই অসহায় প্রজাবৃন্দের মনে শঙ্কা সৃষ্টি করিতেছে। নিজাম বাহাদুর সঙ্কট এড়াইবার জন্য বিদেশে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যে সাজগোজ করিতেছেন, মাঝে মাঝে বিদেশী সংবাদপত্রে এই ধরণের চমকপ্রদ সংবাদ বাহির হইতেছে; কিন্তু আমরা এই সব সংবাদে একটুও বিশ্বাস স্থাপন করি না। আমাদের মনে হয়, রেজভীর গুণ্ডার দলের আওতায় নিজাম সাহেব মধ্যযুগীয় সামন্ত-সুলভ নিশ্চিন্ততায় এখনও মশগুল রহিয়াছেন। ফলতঃ জাগ্রত জনশক্তির বৈপ্লবিক আঘাত না পাইলে তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। নিজামের এই স্বেচ্ছাচার হইতে দক্ষিণ ভারতের বিরাট অঞ্চলকে নিরাপদ করিবার প্রধান কর্তব্য এখন ভারত সরকারের উপরই আপতিত হইয়াছে। বস্তুত এ কণ্টক দূর করিতে না পারিলে ভারতীয় রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা উত্তরোত্তর বিপন্ন হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের জন্যও ভারত সরকারকে নূতন নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। বিশ্ব-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংসদে এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, ভারত গভর্নমেণ্ট এবং পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট উভয়েই তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট কাশ্মীর সম্পর্কে যে আবদার ধরিয়াছেন, কোন সভা-সমাজেই তাহা সমর্থিত হইতে পারে না; কিন্তু বিশ্ব-রাষ্ট্র সম্মেলনের নিরাপত্তা পরিষদ স্থূলভাবে না হইলেও মূলতঃ পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের যুক্তিকেই মানিয়া লইয়াছেন। পাকিস্থান হানাদার দস্যুদিগকে কাশ্মীরে পাঠাইয়া এবং নানাভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া সাক্ষাৎসম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিধিভঙ্গের জন্য যে অপরাধ করিয়াছে, নিরাপত্তা পরিষদ তাহা চাপা দিয়াছেন; অধিকন্তু বিচারপ্রার্থী ভারত গভর্নমেণ্টেরই ঘাড়ে নানারূপ সর্ত আরোপ করিয়া পরস্বাপহারী দস্যুদেরই প্রশ্রয় দিয়াছেন এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্নীতির অবতারণা করিয়াছেন। কাশ্মীর যদি স্বেচ্ছায় ভারতের বাহিরে যাইতে চায় তবে ভারত গভর্নমেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিবেন না, এ প্রতিশ্রুতি তাঁহারা বারবার দিয়াছেন এবং সেই প্রতিশ্রুতির আন্তরিকতাস্বরূপে গণ-ভোটের দ্বার তাঁহারা খোলা রাখিয়াছেন; কিন্তু সেই গণভোটের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ ভারত গভর্নমেণ্টের সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কাশ্মীরে উপদ্রব-সৃষ্টিকারী দস্যুদেরই এক্তিয়ার মান্য করিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য এ অবস্থা ভারত গভর্নমেণ্ট কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। কাশ্মীরে হানা দিয়া যাহারা উপদ্রব করিতেছে, তাহাদিগকে যদি সহজে নির্মূল না করা যায় এবং সেখানে অবিরত যুদ্ধই চালাইতে হয়, তাহাও ভাল; তথাপি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করিবার জন্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কূটচক্রীদের অপচেষ্টার ফাঁদে পা দেওয়া ভারত গভর্নমেণ্টের কর্তব্য নহে।

**ভারতের গভর্নর জেনারেলের পদে রাজাজী**

বাঙলার গভর্নর শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের স্থানে ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বাঙলা দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন। গত ৭ই মে রাজাজী জলপাইগুড়িতে বক্তৃতাকালে বাঙলা দেশকে প্রথম বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন বলা যায়। তাঁহার এই বক্তৃতায় বাঙলার সম্বন্ধে আশার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজাজী আশাবাদী পুরুষ। তাঁহার এই আশা সার্থক হোক, আমরা ইহাই কামনা করি। বাস্তবিক পক্ষে বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতি তাহার মূলে এখানকার মনস্বী এবং সাধক সন্তানগণের যে অপরিমেয় অবদান রহিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে বর্তমান দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবে, আমরাও এই আশাই অন্তরে পোষণ করি। রাজাজীর ন্যায় আমাদেরও বিশ্বাস এই যে, রাজনীতির দিক হইতে বর্তমানের এই ব্যবচ্ছেদ ইহা সাময়িক রাজ-নৈতিক চাল মাত্র। সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র বাঙলা একই সমাজবোধে সংহত হইবে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বাঙলায় গভর্নমেণ্ট দুইটি থাকিলেও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সব বিভেদ দূর হইবে। রাজাজী সমগ্র ভারতের সর্বোচ্চ শাসকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। এ সম্মানের তিনি যোগ্য অধিকারী। আমরা তাঁহাকে আমাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব : কবিগুরুর স্মৃতি-বিজড়িত জোড়াসাঁকো ভবনে নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের ৮৮তম জন্মোৎসবের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বক্তৃতা করিতেছেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন অনুষ্ঠানে স্বস্তিবচন পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বসুর বামপার্শ্বে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এবং দক্ষিণ পার্শ্বে নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে দেখা যাইতেছে।
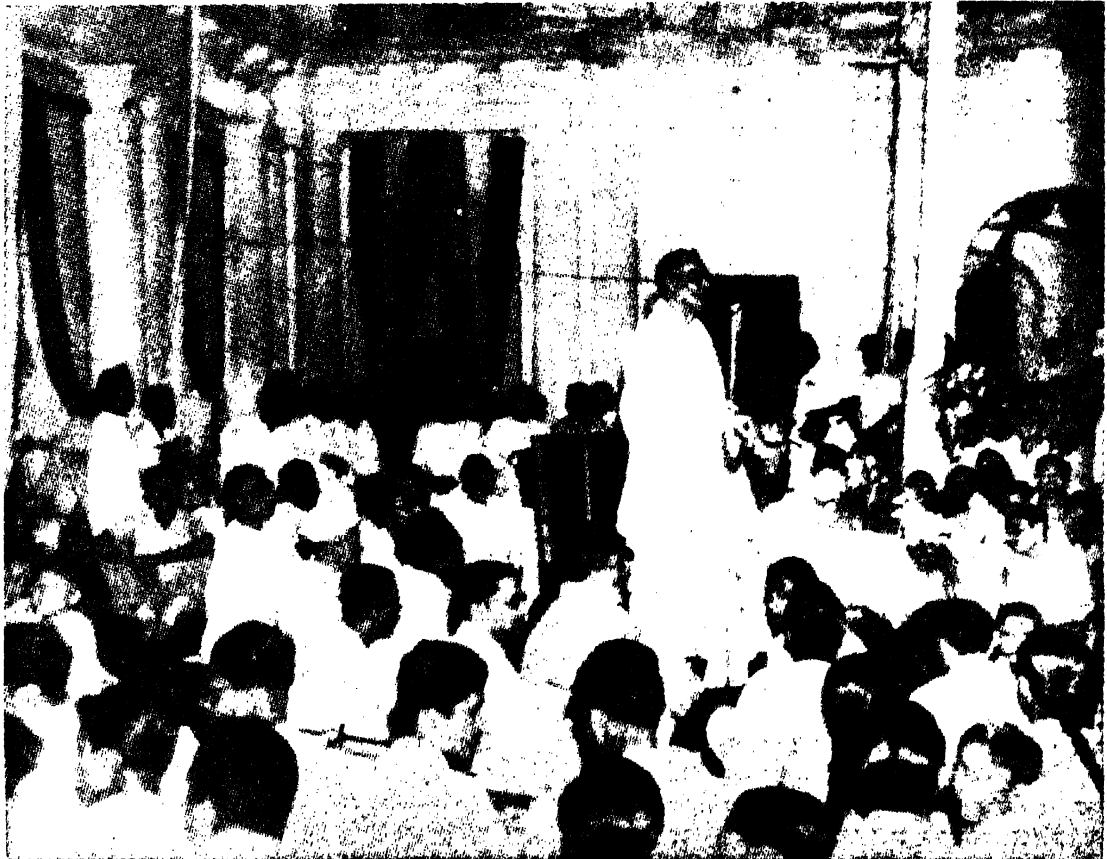
রবীন্দ্র ভারতী ও বিশ্বভারতীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মোৎসব সভার বৈকালিক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বক্তৃতা করিতেছেন।

# পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব

**শ্রীশান্তা দেবী**

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎপূর্তি উপলক্ষে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ই এই কবি সম্বর্ধনার প্রস্তাবে উদ্যোক্তাদের অগ্রণী ছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে এ বিষয়ে উৎসাহী করিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, কিন্তু অন্তরালে। কমিটিতে তাঁহার নাম ছিল। কিন্তু যাঁহাদের নামে উদ্যোগ সভার চিঠি বাহির হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে তিনি ছিলেন না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির নামে চিঠি-খানি প্রকাশিত হয়। প্রথম আয়োজনের কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ নাকি হাসিয়া বলিয়া-ছিলেন, "ওহে, দেখো যেন খরচটা আড়াল থেকে আমাকেই না দিতে হয়।" অবশ্য সে রকম অবস্থা হয় নাই, উদ্যোক্তাদের ধনভাণ্ডারে বহু ধনী অর্থ দিয়াছিলেন।

সভার দিন যথাসময়ের পূর্বেই টাউন হল লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। কবি যতীন্দ্র-মোহন বাগচী রচিত সঙ্গীত "বাণী বর জন্য আজি সরণের সজ্জা মাঝে" গাহিয়া কার্যারম্ভ হয়। দেশের কবি ও সাহিত্যিককে এরূপ সম্বর্ধনা আমাদের দেশে ইতিপূর্বে কখনও দেওয়া হয় নাই। টাউন হলে এমন দেশবরেণ্যদের সমাবেশও কখনও ইতিপূর্বে হয় নাই। ছোট-বড় উচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র কত লোকের এবং কত রকমের লোকেরই না ভীড়। টাউন হলের সভায় ইতিপূর্বে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ কখনও যাইতেন না। এবার সে অসম্ভবও সম্ভব হইল। অবশ্য কয়েকটি পরিবারের মহিলারা মাত্র গিয়াছিলেন। আমরা তখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলেজের ছাত্রী, সেইবার প্রথম টাউন হল দেখিলাম। আমরা শান্তিনিকেতনে সেইবার ২৫শে বৈশাখ উপস্থিত ছিলাম এবং কবির স্নেহের স্পর্শ পাইয়াছিলাম বলিয়া আমাদের ১৬ জন বালিকাকে সভাতে কবিকে পুষ্পাঞ্জলি দিবার অধিকার দেওয়া হয়। পরে অন্যান্য মহিলারাও অনেকে দেন। যে সকল গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে রাজারাজড়াও ছিলেন। আবার কবি, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, বিচারপতি, চিকিৎসক ও ব্যবসায়ীরাও ছিলেন। মহামান্য গোখলে মহাশয়ও কবি-সম্বর্ধনার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার আগমনের সময় এমন ঠেলাঠেলি ও করতালি ধ্বনি লাগিয়া গেল, সবাই দেখিবার জন্য এমন উদগ্রীব হইয়া উঠিল যে, আমরা মনে করিলাম রবীন্দ্রনাথ বুঝি আসিলেন। তাহাকেও হার মানাইয়া যখন করতালি ধ্বনি উঠিল তখন আসিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দর্শকের এত ভীড় যে, রবীন্দ্রনাথই মঞ্চে উঠিবার পথ পান না। শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও রাষ্ট্রনায়কে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল।

এতকাল পরে বেশি কথা সুস্পষ্ট মনে আসে না। কয়েকটি মানুষের মুখ এখনও চোখে ভাসে। তাহার ভিতর সদাহাস্য বিকশিত বদন ক্ষীণকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ ও আনন্দোজ্জ্বল মুখকান্তি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মুখ কখনও ভুলিব না। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্মিকী প্রতিভা নাটক অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং আশীর্বাদ করিয়া উপহার দিলেন। সাহিত্য পরিষদ-প্রদত্ত অভিনন্দন রামেন্দ্রসুন্দর পাঠ করেন। তাঁহার মেঘ নির্ঘোষের মত কণ্ঠস্বর ও তাঁহার হীরকদ্যুতির মত চোখের দৃষ্টি ভুলিবার নয়। "কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন," বলিয়া তিনি অভিভাষণ শেষ করিলেন। সভার কার্য শেষ হইবার পর আমরা পুষ্প অর্ঘ দিতে মঞ্চে গেলাম। আমাদের পর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। নাটোরের মহারাজা ঐকতান বাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনিও কবি-সম্বর্ধনার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। কবিবরের পঞ্চাশৎপূর্তি উপলক্ষেই সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তের—

"জগৎ কবি-সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব
বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি লইবে মানি
হে গুণী! তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব।"

কবিতাটি হস্তীদন্ত ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত আনন্দ সম্মিলনে কবিকে উপহার দেওয়া হয়।

এই উপলক্ষে কবি-সম্বর্ধনা সমিতির সম্পাদক হন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি আনন্দ সম্মিলনের জন্য তাঁহার নামে প্রকাশিত হয়:—

সবিনয় নিবেদন,

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে কবিবরকে আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন করিবার জন্য আগামী ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী, [illegible] সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে আনন্দ সম্মিল[illegible] হইবে। মহাশয় যথাসময়ে এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া সভার আনন্দবর্ধন করিবে[illegible] অনুগৃহীত হইব।

বশংবদ—
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
কবি-সম্বর্ধনা সমিতির সম্পাদক

এই সময়ে প্রবাসীতে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদ[illegible] লেখেন, "যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচি[illegible] অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের এ[illegible] বহু ভাষাভিজ্ঞ কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি[illegible] মত এই যে, তিনি বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যি[illegible] এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যে আ[illegible] পাইবার যোগ্য। ...তিনি বিশ্বসঙ্গীত শুনির[illegible] ছেন। তাঁহার গদ্য রচনায় এবং কবিতায় তাহার প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই। নয়নগো[illegible] রূপের জগৎ সৌন্দর্যের জগৎ অনেক কবি[illegible] অনেক বাঙালী কবি দেখিয়াছেন ও দেখাই[illegible] ছেন, তিনি এ বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা ব[illegible] শক্তিশালী নহেন; কিন্তু ধ্বনির জগতের র[illegible] তাঁহার মত করিয়া অনুভব করিতে [illegible] নিপুণতার সহিত অপরকে অনুভব করাই[illegible] অল্প লোকেই পারিয়াছে। শিক্ষা, সাধনা, [illegible] তাঁহাকে বিশ্বনাথের বাণী শুনি[illegible] সমর্থ করিয়াছে। ......মানব-প্রাণের নি[illegible] মর্মস্থলে পৌঁছিতে তাঁহার মত আর কে[illegible] বঙ্গীয় লেখক পারিয়াছেন? মানবের ব[illegible] আচরণের অন্তর্নিহিত কারণ কে এমন করি[illegible] বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন? তাঁহার হা[illegible] বহু কবিতা জাতীয় সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্র[illegible] করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের সমশ্রেণীস্থ হইয়া[illegible] বাঙলা ভাষায় যদি কেবল তাঁহার রচন[illegible] থাকিত, তাহা হইলেও উহা বিদেশীর শিখিবার যোগ্য হইত।" [রামানন্দ ও অ[illegible] শতাব্দীর বাংলা—পৃষ্ঠা ১৬২-৬৩ দ্রষ্টব্য]

আজ ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে, ৫৭ বৎস[illegible] আগে প্রবাসী সম্পাদককে বলিয়া দিতে হই[illegible] ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের সর্বশ্রে[illegible] সাহিত্যিক। তখনও বাঙলার তথাকথি[illegible] জহুরীরা রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ [illegible] বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। আর আ[illegible] রবীন্দ্রনাথই বাঙলা দেশের সাহিত্য [illegible] সংস্কৃতির মানদণ্ড। সেদিন আমরা ক[illegible] বালিকা রবীন্দ্রনাথকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জী[illegible] ধন্য মনে করিয়াছিলাম। আজ বাঙলার মে[illegible] বিদ্যালয়ে, ছাত্রাবাসে, সভায় সমিতিতে হাজা[illegible] হাজারে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া পুষ্প সম্ভা[illegible] ও কাব্যের অর্ঘ উপহার দিতেছে। তবু ব[illegible] এখনও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যোগ্য সম্মান [illegible] নাই দেশের কাছে। তাঁহার যোগ্য সম্মান অ[illegible] বা ইমারতে হইবে না, সভায় বা বক্তৃতায় হই[illegible] না। তাঁহার চিন্তাধারা, তাঁহার আদর্শ[illegible] সম্মানই তাঁহাকে সম্মান।

মেজর জেনারেল কুলবন্ত সিং কাশ্মীর বাহিনীর সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্যের উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারীদের সহিত আলোচনা করিতেছেন। বামে জম্মু ও কাশ্মীরের সহকারী প্রধান মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ।

কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ মহম্মদ আবদুল্লা এক বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন। কাশ্মীরের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিতেছেন।

আঠারো

যাবার দিন সুবিনয় বলল, 'সন্ধ্যাদি বড় কাজ আমার রয়ে গেল।'

'কি?'

'আপনাকে কোন সাহায্য করে যেতে পারলাম না; কোন কাজে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারলাম না—এর জন্যে আমার দুঃখের অন্ত নেই।'

'মিছে ভেবো না ভাই। কাজ আমার একটা [illegible] এসে পড়বেই। বসে থাকবার আমার [illegible] কি?'

'কিন্তু আপনি জানেন না—কাজ [illegible] যুদ্ধের সময় [illegible] দেশের [illegible] দুর্দশার কথা [illegible] ভবিষ্যত কি করে [illegible] অনিশ্চিত, [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সন্দেহ নেই।'

'[illegible] লাভ নেই।' সন্ধ্যা উত্তর দিল, 'এও [illegible] অভিজ্ঞতা; মন দিয়ে আমরা দেখে [illegible] পারলেই আমাদের [illegible] সৃষ্টি করেছে, [illegible] যদি আমাদের সে-সংস্কার [illegible] মুক্তি দেয় সে আমাদের পরম লাভ [illegible] জীবন থেকে সম্বন্ধে [illegible] একটা সুযোগ এসেছে [illegible] সেইটে বা কম কি?'

'[illegible] সব, তবু একখানি অনিশ্চয়তার মধ্যে আপনাকে ফেলে যাচ্ছি—এতে আমার শান্তি নেই। যুদ্ধের জন্য অভিজ্ঞতা চাই, অভিজ্ঞতা আপনার নেই বলে আরও [illegible]।'

'অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ সংসারে আসে না, [illegible] খেয়ে, আঘাত খেয়ে, ভেঙে-চুরে তবেই [illegible] নূতন জন্ম লাভ করে। মনকে ভাবনা [illegible] মুক্ত করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়, আমার [illegible] অসহায়, অনাথার দেশের আরও কত [illegible] তিল তিল করে নিজেদের হত্যা করছে, কে মাথা ঘামায় তাদের জন্যে?'

সুবিনয় জবাব দিল না, চুপ করে রইল। হঠাৎ সে পকেটে হাত দিয়ে বার করল কয়েকখানি নোট, বলল, 'অপরাধ নেবেন না! জানি, এ সামান্য অর্থে আপনার কোনই সাহায্য হবে না, তবু—এটা নিয়ে আপনি যদি অস্বীকার করেন, দুঃখ পাবো।'

'কিন্তু আপাতত আমার কাছে কিছু টাকা আছে— ওঁর মাইনে, হয়ত চলে যাবে কিছুদিন!'

'চলুক! আমি যখন নিঃসঙ্কোচে দিচ্ছি, তখন বিনা দ্বিধায় নিন আপনি!'

সন্ধ্যা রাখল টাকাটা।

সুবিনয় হাত তুলে নমস্কার করল।

প্রতি-নমস্কারের কথা সন্ধ্যার মনে এল না।

উনিশ

নূতন দিনের স্বপ্ন নিয়ে সন্ধ্যা প্রত্যেক দিন শয্যাগ্রহণ করে, ভোরের সোনালি আলোর দোলা দিয়ে যায় তার স্বপ্ন, নূতন সম্ভাবনার উদ্দীপ্ত সুর। চঞ্চল বিহঙ্গের মত আশা-নিরাশার তরঙ্গে ভেসে চলে তার অস্থিরতর মন। প্রাত্যহিক জীবনের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাববার চেষ্টা করে সে, মুক্ত পাখি আকাশে ডানা ঝাপটায়, হাওয়ায় মেলে দেয় তার অলস পাখা, মেঘের কিনারে কিনারে—অপরাহ্নের সময় উজ্জ্বল আলো-বিকীর্ণ নিঃসীম আকাশে।

সন্ধ্যা আরও কতক্ষণ শুয়ে রইল, বাইরে গাছের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। বাতাসে শীতের ধার, কয়েকদিন হল বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, কলকাতায় ভিড় বেড়েছে সে-জন্যে; সকালে কলের জলে সে প্রত্যহ স্নান করতে পারে। মনোমোহিনীকে দিয়ে টুপি এবং টিনকড়ির জন্যে দুটো গরম জামা আনিয়েছে। সে-ই একমাত্র ভরসা, সময়ে অসময়ে এসে খোঁজ-খবর নেয়। বলল, 'কৈ, আপনাকে ত গরম জামা গায়ে দিতে দেখি না! শীতকে জয় করেছেন নাকি?'

'খুব বেশী শীত কি? ঠাণ্ডা আমার একটু কম লাগে!'

সুরমার জন্যে অপেক্ষা করে রোজ সন্ধ্যা।

সুরমা এল না, বুঝি আসতে পারল না কাজের জন্যে, কত গুরুভার তার মাথার উপর।

তার পরিবর্তে এক অপরাহ্নে হাজির হল সুদীপ্ত!

সন্ধ্যা আশা করে নি।

অপরিসর বারান্দায় একখানি মাদুর পেতে দিল বসতে।

'এমন ভাবে বিনা অনুমতিতে আসার জন্যে প্রথমেই ক্ষমা চাচ্ছি!' চকমকি পাথর জ্বলে উঠল যেন।

'আমার কাছে আসবার অনুমতির প্রয়োজন কি? আমি এমন কিছু একটা স্বনামধন্য লোক নই।'

'নিজেকে অত মূল্যহীন ভাববেন না!'

'ভাববো না?' সন্ধ্যা প্রশ্ন করল।

উত্তর দিল না সুদীপ্ত, হাসল।

তারপর:

'সুরমার কাছে শুনেছিলাম আপনার স্বামী অসুস্থ কেমন আছেন তিনি?'

'কোন পরিবর্তন নেই। বোধ হয় সারবার কোন সম্ভাবনাও নেই।'

'বলেন কি?'

'কদিন থেকে তাই আমার মনে হচ্ছে তা ছাড়া উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব ত আছেই।'

কয়েক মিনিট।

'ছিঃ, আমার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই।' অনুতপ্ত গলায় সুদীপ্ত বলল, 'আমার জন্যেই আপনার কাজটা গেল, অথচ আমি জানি আপনার বিপদের শেষ নেই!'

'কিন্তু ওর জন্যে আর ভেবে লাভ কি বলুন! যা গেছে তা ত আর ফিরে আসবে না!'

'আসবে না ত জানি, এটাও জানি এমন ভাবে কারুর দিন চলতে পারে না।'

'ঘটনার ওপর হাত নেই মানুষের!' সন্ধ্যার গলায় আলোচনা শেষ করবার ইঙ্গিত।

'অদৃষ্ট বলেন নি—তার জন্যে ধন্যবাদ!'

'ঘটনাচক্র আর অদৃষ্ট এক নয় কি?'

'তর্ক করব না, কাজের কথা বলি। নানা ব্যাপারে অনেক টাকা খাটিয়েছি। সম্প্রতি চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটা হোটেল খুলেছি—খুব উঁচুদরের এবং সম্ভ্রান্ত। আমার একজন ম্যানেজার চাই, কাজ করবার জন্যে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি!'

'আপনি ক্ষেপেছেন নাকি?' সন্ধ্যা হেসে উঠল, হোটেলের ম্যানেজারি করব আমি?

'কেন? আপত্তি কিসের?'

'ওরে বাবা, ভয়ানক আপত্তি! এমনিতেই অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে আমার

করলাম—আপনি যাতে নিজেকে বিকাশ করতে পারেন সে-সুযোগ দেবার চেষ্টা করব! আমার পরম সৌভাগ্য আপনার সহযোগিতা পেয়েছি! আপনি যখন পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন—দরজার কাছ থেকে মনে হল—আপনাকে প্রথম দেখলাম আজ! নিজের ওপর বিশ্বাস দৃঢ় হল। দারিদ্র্য একটা অভিশাপ, তিল তিল করে আত্মাকে কলুষিত করে, ও নিয়ে গর্ব করবার কিছু নেই, সেই ত শেষ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাত জমির ওপর মানুষের শেষ সমাধি! কিন্তু তার আগে সুস্থ এবং সহজভাবে বাঁচতে আপত্তি কি? দেখুন না পৃথিবীর মুক্ত আলো হাওয়া আপনার মনকে বিস্তৃতি দেয় কিনা!'

'দেখা যাক!' সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরে আলোচনা-সমাপ্তির ইঙ্গিত, 'চলুন!' সুদীপ্ত দাঁড়াল।

চৌরিঙ্গীর "ক্যাসিনো"-তে একখানা টেবিলও খালি নেই। তকমা-আঁটা, পরিচ্ছন্ন পোষাক বয়গুলো ব্যস্ত অথচ নির্ভুল পায়ে যন্ত্রের মত ঘুরছে। এক পাশে কয়েকটি মার্কিণ সৈন্য অনুচ্চ কণ্ঠে গান ধরেছে, প্ল্যাটফরমের ওপর কয়েকটি ফিরিঙ্গি ছেলে-মেয়ে অর্কেস্ট্রা বাজাচ্ছে, তারই তালে তালে পা নাচাচ্ছে কয়েকটি গোরা। কাউণ্টার থেকে ক্যাস মেমো আর টাকা পয়সা প্রত্যেক এক ঘণ্টা অন্তর আসছে ম্যানেজারের ঘরে, দরজায় দামী পর্দা হাওয়ায় দুলছে। এক পাশে ইংরেজীতে লেখা: "ম্যানেজার", "প্রবেশ নিষেধ"।

সুদীপ্ত সন্ধ্যাকে কাজ শিখিয়ে দিচ্ছে!

বাইরে থেকে দরজায় টোকা মারল কেউ।

সন্ধ্যা বলল, 'Come in!'

ফিরিঙ্গি এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট স্পেন্সার কি একটা সংবাদ নিয়ে এসেছে! সন্ধ্যার চোখ-ঝলসানো পরিচ্ছদ আর রূপ তাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে, চোখ ফেরাতে পারে না সে! সন্ধ্যার কপালে ঘাম দেখা দিল।

সুদীপ্ত বলল, 'Yes! Mr. Spencer!'

চমকে উঠল স্পেন্সার। কয়েক মিনিটের মধ্যে কথা শেষ করে বেরিয়ে গেল।

দোতলাটাও সুদীপ্ত চড়া দামে ভাড়া নিয়েছে। গোটা কয়েক থাকবার ঘর, বাকি ঘরগুলো লাঞ্চ অথবা ডিনার খাবার জন্যে।

'স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি', বলল সুদীপ্ত, 'যদি কেউ ডিনারের জন্যে অথবা থাকবার জন্যে ঘর চায় টেলিফোনে, বলবেন এ্যাডভান্সের টাকা পাঠিয়ে দিতে!'

কাগজপত্র গুছিয়ে রাখল সন্ধ্যা! লোহার আলমারি বন্ধ করল। দরজায় চাবি লাগিয়ে স্পেন্সারকে উপদেশ দিয়ে তারা বাইরে এল। বাইরে একটাই পথ। চারধারে খানা চলছে, কয়েকজন সৈন্য একটি সুন্দরী ইংরেজ তরুণীর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত!

সন্ধ্যাকে দেখে বিমান-চালক চাপা কণ্ঠে [illegible] 'What a beauty!'

জাহাজের ছোঁড়াটা ঠেকা দিল, 'Must be a princess!' সুদীপ্তকে 'Lucky Dog!'

সন্ধ্যা যখন বাড়ি ফিরল তখন দশটা বাজে!

টুনির ঘুম।

তিনকড়ি মাসিক পত্রিকা পড়ছে ঘুমের আগে।

বুকের ওপর দাঁত দিয়ে আঁচলটা ধরে জামা খুলতে খুলতে সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করল, 'খেয়েছো?'

তার সুগঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে তিনকড়ি ঘাড় নাড়ল। আশ্চর্য। সন্ধ্যা যে এত সুন্দরী এটা আগে কোন দিন তার মনে হয়নি। কথার জালে আর কি সে কোন দিন ধরা দেবে? সন্ধ্যার অসংখ্য দোষ তার সন্দেহ-জনক চরিত্র সত্ত্বেও আজ সে সন্ধ্যাকে আলিঙ্গন করতে চায়, তার কঠিন বাহুবন্ধনে সে অনুভব করতে চায় সন্ধ্যা একান্তই তার! শারীরিক পীড়নে তিনকড়ি তাকে বোঝাতে চায় তার অস্তিত্বই তার অধিকার!

ব্যাগ থেকে এসেন্স-মাখানো রুমাল বার করে সন্ধ্যা আলগোছে বুলিয়ে নিল মুখের ওপর, সে-গন্ধে ঘরের বাতাস হল ভারাক্রান্ত! ওর অনাবৃত বাহু, উজ্জ্বল মুখের রং, ঈষৎ ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি, পাতলা সাড়ীর নিচে অস্পষ্ট দেহাকৃতি তিনকড়ির নির্জীব রক্তে উগ্র নেশার সৃষ্টি করল, মাথাটা তার ঝিম ঝিম করছে!

স্খলিত আঁচলটা বুকের ওপর তুলে দিয়ে সন্ধ্যা বলল, 'রাত হয়েছে, আর পড়ো না, শরীর খারাপ হবে। শুয়ে পড়! মশারিটা ফেলে দি!'

পত্রিকা সরিয়ে রেখে নিচু হয়ে ও চার পাশের মশারি গুঁজে দিল বিছানার নিচে। তিনকড়ির হৃৎপিণ্ডের গতি বুঝি স্তব্ধ হয়ে পড়বে! প্রায় তার বুকের ওপর ঝুঁকে চাদরটা সন্ধ্যা ঠিক করে দিল, সামান্য একটুকু উষ্ণ স্পর্শে তিনকড়ির চেতনা প্রায় লুপ্ত হয়ে আসছিল।

যখন সে চোখ মেলল তখন সন্ধ্যা মশারির বাইরে!

বাতিটা নিবিয়ে দিতে সমুদ্রের ঢেউর মত অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

'গেলাম! ঘুমিয়ে পড়!'

'শুনে যাও! একটা কথা!' ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকল তিনকড়ি!

সন্ধ্যা ফিরে দাঁড়াল, এগিয়ে এল কাছে!

'বাতিটা জ্বাল, তোমায় দেখতে পাচ্ছি না!'

বিস্মিত সন্ধ্যা বাতি জ্বালল, জিজ্ঞেস করল, 'শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

'না!' মশারি থেকে মুখ বার করল তিনকড়ি, 'খাওয়া শেষ করে আসবে একবারটি আমার কাছে?'

'বল না—কি বলবে, পরেই না হয় খাবো আমি!'

[illegible]

নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল, 'কতদিন তোমায় পাইনি! তুমি কি ভাব আমার ভালবাসা মরে গেছে? আসবে আজ?'

উত্তরের অপেক্ষায় তিনকড়ির সর্বাঙ্গ ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে রইল।

'ভালো হয়ে উঠতে হবে না তোমায়? রাত জাগা কি কোন রকম—'

'ওসব উপদেশ আমি অনেক শুনেছি সন্ধ্যা!' তিনকড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'শুধু একদিন তুমি দিতে পারো না নিজেকে? কি তোমার ক্ষতি বল?'

'ক্ষতির কথা নয়, তোমার স্বাস্থ্যের ওপর দৃষ্টি রাখা আমার কর্তব্য! কি ছেলেমানুষের মত আবদার করছ? ঘুমোও!'

'আমায় ভালো করা নয়, এ আমাকে মেরে ফেলা, যদি না আস আজ আমি মরে যাবো!'

'আচ্ছা আসবো, ঘুমিয়ে পড় তুমি—আমি জাগিয়ে তুলবো!'

'সত্যি?' তিনকড়ির চোখের কোণায় [illegible] দেখা দিল।

'হ্যাঁ, সত্যি!' বাতি নিবিয়ে দিল সে।

সন্ধ্যা ফিরে এল নিজের ঘরে, [illegible] ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাতি জেলে নিজেকে [illegible] দাঁড়িয়ে সে [illegible]। [illegible] অপেক্ষা করল, দেখল নিজেকে!

জানালা খুলে দিয়ে দাঁড়াল সে [illegible] হাওয়ায়। ঠিক তার [illegible]

বাথরুমে ঠান্ডা জলে গরম জল [illegible] ল্যাভেন্ডার সল্ট মিশিয়ে [illegible] অনেকক্ষণ স্নান করল।

খাওয়া শেষ করে ঘড়ির দিকে [illegible] দেখল, বারোটা।

নীচে কেউ দরজা বন্ধ করছে। [illegible] অন্ধকার সময় [illegible] সুদীপ্তের দেওয়া সিগারেট কেসটা [illegible] আছে! হাতে করে নিয়ে এল সেটা! [illegible] আসছে তার।

কোমল উষ্ণ শয্যায় হাত পা ছড়িয়ে [illegible] শুয়ে পড়ল।

* * * * *

ঘুম থেকে উঠেই সন্ধ্যা গেল তিনকড়ির ঘরের দিকে। চাকর তখন পেয়ালায় [illegible] দুধ নিয়ে এসেছে!

সকালে, দুপুরে তার অখণ্ড অবসর [illegible] কিছুই করবার নেই। বসে, [illegible] বেড়ায়, পিয়ানোয় গান গায়। সম্প্রতি সুদীপ্ত তাকে একটা সেতার কিনে দিয়ে গিয়েছে [illegible] সে বাজায়, হাত খুলেছে! দুপুরের [illegible] টুনিকে পড়ায় ঘণ্টা দুই। কখনও বা [illegible] নিয়ে বেরিয়ে আসে! কিন্তু কেনাকাটাও [illegible] নূতন জুতো পায়ে দিয়ে টুনি খট্ খট্ [illegible] ঘুরে বেড়ায় ঘরের মধ্যে, আনন্দে হাততালি [illegible]

# হিন্দুসমাজ ও তাহার ইতিহাস

শ্রীনির্মলকুমার বসু

## হিন্দু সমাজ গঠনের আদর্শ

(দ্বিতীয় পর্ব)

### রাজার কর্তব্য

নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা এবং কাল-ক্রমে শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে উৎকর্ষের ফলে নূতন উপজাতি গঠনের দ্বারা যে জটিল হিন্দু সমাজ কালক্রমে গড়িয়া উঠিল, প্রাচীনকাল হইতেই তাহার পরিচালন ভার রাজার উপরে ন্যস্ত ছিল। মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন ঃ

রাজন্! লোকশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচরণকারী ক্ষত্রিয়গণের বাহুদ্বারা লোক সকলকে আয়ত্ত করা কর্তব্য, কারণ বেদে এইরূপ শ্রুতি আছে যে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের ধর্ম ও উপধর্ম সকল রাজধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মহারাজ! যেরূপ ক্ষুদ্র জন্তু সকলের পদচিহ্ন সকল হস্তিপদ চিহ্ন মধ্যে লীন হয়, তদ্রূপ সর্বপ্রকার ধর্মই রাজধর্ম মধ্যে লীন বলিয়া জানিবে।......রাজগণ দণ্ডনীতিবিহীন হইলে, কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় ত্রয়ী নিমগ্ন হয়, সুতরাং সকল ধর্মই নষ্ট হয়।

হে পাণ্ডুনন্দন! লৌকিক, বৈদিক, চতুরাশ্রম্য এবং যতিধর্ম সকল রাজধর্মেই সমাহিত। হে ভরতসত্তম! সকল কর্মই ক্ষত্রধর্মের অধীন; সুতরাং ক্ষাত্রধর্ম অব্যবস্থিত হইলে জীবলোক সকল আশীর্বিহীন হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজার ধর্ম অথবা কর্তব্য সম্বন্ধে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বৃহস্পতি, কৌটিল্য, শুক্রাচার্য প্রভৃতি লেখকের নীতিশাস্ত্র আংশিকভাবে উদ্ধার করা হইয়াছে। শুক্রনীতি* গ্রন্থে সমাজ পরিচালনার সম্পর্কে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

নিজ নিজ জাতির জন্য যে ধর্ম কথিত হইয়াছে। যাহা চিরকাল পূর্বজগণের দ্বারা আচরিত হইয়াছে, সে জাতি তদ্রূপ আচরণই করিবে। অন্যথা নৃপতির নিকট দণ্ডনীয় হইবে। ...... ...

(রাজা) কারু এবং শিল্পিগণকে রাষ্ট্রের মধ্যে কার্যের প্রয়োগ অনুসারে রক্ষা করিবেন। (তাহাদের সংখ্যা প্রয়োজনের) অতিরিক্ত হইলে কৃষি বা ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করিবেন।

* * * * *

প্রতিদিবস দেশ এবং শাস্ত্রোক্ত হেতু সম্বন্ধে বিচার করিয়া জাতি, জনপদ, শ্রেণী এবং কুলের ধর্ম কি তাহা বিবেচনা করিয়া রাজা তদনুসারে (প্রজার বিচাররূপ) স্বধর্ম পালন করিবেন। যাহার যেরূপ ধর্ম তদনুসারে তাহার বিচার হইবে, অন্যথা প্রজাগণ ক্ষুব্ধ হইবে। দাক্ষিণাত্যে দ্বিজগণ মাতুল কন্যাকে বিবাহ করে।

মধ্যদেশে কারু এবং শিল্পিগণ (বিন অথবা গোমাংস?) ভক্ষণ করে এবং সকলেই (মৎস্য বা মাংস?) আহার করে; স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়।

উত্তর দেশের স্ত্রীজাতি মদ্যপান করে, পুরুষেরা রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করে, খশ জাতি ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃভার্যাকে গ্রহণ করে।

পূর্বোক্ত কর্মের জন্য ইহারা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ডের যোগ্য হয় না। যে যে কর্ম পরম্পরা অনুসারে প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা যাহা পূর্বজগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সে কর্মের দ্বারা দূষিত হয় না।

রাজার বিচারের সম্পর্কেও বলা হইয়াছে, কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই শ্রেণীর ধর্ম অনুসারেই রাজা বিবাদের নির্ণয় করিবেন ঃ

কিষাণ, কারু, শিল্পি, কুসীদজীবী, নর্তক, সন্ন্যাসী, তস্কর, ইহাদের বিচার সেই শ্রেণীর নিয়মানুসারে করিবেন...।

যে বিচার কুলের লোকেদের বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়, তাহা শ্রেণীর সভ্যগণ করিবেন। শ্রেণীর সভ্যগণ না পারিলে গণের সভ্যেরা করিবেন। গণেরও অসাধ্য হইলে রাজার দ্বারা নিযুক্ত অধিকারী পুরুষ সেই বিচার করিবেন।

মহাভারত এবং শুক্রনীতি হইতে উদ্ধৃত বচন পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সমাজে দণ্ডনীতি অথবা রাজাকে মেরুদণ্ড স্বরূপ বিবেচনা করা হইত। সেই দণ্ডনীতির অধীনে নানা জাতি স্বীয় কৌলিক ধর্ম, অর্থাৎ বৃত্তি এবং লৌকিক আচারাদি পালন করিয়া চলিত। রাজা প্রজাকুলকে উদ্বেজিত না করিয়া তাহাই

কিন্তু দেশের আর্থিক সংগঠনের আদর্শ কি ছিল? আদর্শ এবং বাস্তবে সর্বদাই একটি অন্তর পড়িয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবকে দূষিত হইলেও সমাজে যে আদর্শ অনুযায়ী সংগঠনের চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহা যথাসাধ্য বুঝিবার দরকার আছে। কালক্রমে আদর্শের পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে বহু শতাব্দী ধরিয়া একটি আদর্শের ক্রিয়া দেখা যায়। তাহার বর্ণনা করিয়া, আমরা পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে আদর্শের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিচার করিব। এখানে শুধু [illegible] মোটামুটি বর্ণনা করা হইবে।

#### গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা

এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে আবার শাস্ত্রকে পরিহার করিয়া গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত যে [illegible] তন্ত্র অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের গ্রামদেশে প্রবহমান ছিল, তাহা আজ [illegible] সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়াছে, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন [illegible] যোগ দিয়া তাহার একটা সমগ্র রূপ পুনর্গঠন করা একেবারে অসম্ভব নয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবীনকিশোর [illegible] নামে জনৈক সরকারী কর্মচারী পুরী জেলার ভূমিস্বত্বের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া গভর্নমেন্টের নিকট এক অতি মূল্যবান বিবরণ দাখিল করেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, মুসলমানী আমলের পূর্বে, [illegible] হিন্দু রাজত্বকালে, উড়িষ্যায় ভূমির মালিকানা স্বত্ব রাজার অধিকারে ছিল এবং প্রজাদের শুধু তাহা ভোগ করার অধিকার ছিল। পুরী জেলার মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেখিতে পান।

সমগ্র জেলার মধ্যে তখনও চাকরাণ জমির কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল। (১) ৬০১ জন ছুতারকে ৩৯৬ একর জমি ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে গ্রামের চাষীর [illegible] সংক্রান্ত কাঠের সরঞ্জাম গড়িয়া (এবং মেরামত) করিতে হইত। (২) ৫৬৯ জন কামার ঐরূপ কাজের জন্য ৩৬৬ একর জমি ভোগ করিতেছিল। (৩) গ্রামের জমিদারবাড়িতে এবং [illegible] সামন্ত যখন গ্রামের পথে যাতায়াত করে, তাহাদের রাঁধিবার জন্য হাঁড়িকুড়ি যোগাইবার জন্য ৩১ জন কুমোর ২৫ একর জমি ভোগ করিতেছিল। (৪) ১০৪১ জন ধোপা জমিদার এবং রায়তদের কাপড় কাচার জন্য ৬৬৩॥ একর জমি ভোগ করিতেছিল। (৫) জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের কাজ ধানারোপন অথবা বিবাহাদি শুভকর্মের জন্য গণনা করা। তেমন ৩৭৫ জন জ্যোতিষীর ভোগে ১৩৩ একর জমি ছিল। (৬) নাপিতের কাজ ক্ষৌর করা ও বিবাহাদি

---

* পণ্ডিত মিহিরচন্দ্রের শুক্রনীতি হিন্দী

জনের ভোগে ৭২৬ একর জমি ছিল। (৭) নদীর খেয়াঘাটে পারাপারের জন্য মাঝির সংখ্যা ৫৩; তাহাদের ৬৪॥ একর ভূমি বৃত্তি ছিল। (৮) খরেধার নিকটে জঙ্গল পাহারা দিবার জন্য একজনকে ২ একর জমি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। (৯) গ্রামের পথঘাট পরিষ্কার করা ও অন্যবিধ কাজের জন্য ১৭ জন মেথরকে ১১ একর জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১০) জমিদার-বাড়ীতে কাজকর্ম করার জন্য ১৩ জন বাউরির ভোগে ৫॥ একর জমি ছিল। (১১) উৎসবের দিন জমিদারের কাছারিতে বাজনা বাজাইবার জন্য ২৫ জন বাজনদারকে ১৮ একর জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১২) বিগ্রহের সামনে নৃত্যগীতের জন্য ৪টি নর্তকীকে ১ একর জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১৩) ৩ জন মালীকে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময়ে ফুল দিবার জন্য ২৯ পোল জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১৪) দেবোত্তরের রথ টানিবার জন্য ২ জন লোকের ভোগে ৯৮ একর জমি ছিল। (১৫) গ্রামের গরু চরাইবার জন্য একজনকে ২৯ পোল জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১৬) মাধিরা ব্রাহ্মণ নামে নিম্নশ্রেণীর ২ জন ব্রাহ্মণকে কোন কোন অনুষ্ঠানের জন্য ২ একর জমি দেওয়া হইয়াছিল।

গ্রামে সর্ববিধ কারিগরের বা কাজকর্ম করিবার জন্য লোক নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। সাধারণ এইরূপ চাকরিতে নিযুক্ত থাকিয়া, গ্রামবাসীদের নিকট [illegible] বাৎসরিক [illegible] পাইত। [illegible] এই রীতি [illegible] আছে, [illegible] জেলার মত [illegible] জমি হিসাবে [illegible] এবং প্রত্যেক [illegible] নির্দিষ্ট থাকিবার [illegible]।

মধ্যপ্রদেশে [illegible] দক্ষিণে ইসওয়াল নামে একটি জেলা আছে। সেখানে প্রতি গ্রামে বংশপরম্পরায় চাকরি করিবার জন্য যে কে[illegible] সকলকে গ্রামবাসীরা নিম্নলিখিত হারে বাৎসরিক বৃত্তি দেওয়া হয়। এই বৃত্তিকে [illegible] বলে, [illegible] ইহার নাম হয়। চাকুরিয়াদের মধ্যে কেহ কারিগর, কেহ [illegible] সংবাদ বহে, কেহ বা গরু চরায়, মেথরের কাজ ইত্যাদি করিয়া থাকে। সকল গ্রামে সব রকমের বৃত্তিধারী পাওয়া যায় না, তবে কামার, ছুতার, ধোপা, নাপিত ও মেথর বা কোটওয়াল প্রায় সকল গ্রামেই আছে। প্রতি হলের জন্য কামার বৎসরে ৩২ হইতে ৬৫ সের জোয়ারি পায়; এক খাতে ১৬ হইতে ২০ একর জমি চাষ হয়। ছুতারের প্রাপ্য প্রায় ঐরূপ। নাপিত ২৫ হইতে ৪০; ধোপা ১৩ হইতে ১৬; কোটোয়াল ২৫ হইতে ৩২ সের পাইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর চাকুরেরা যাহা পায় তাহা দ্বারা কোনও রকমে প্রাণ ধারণ করা যায়; কিন্তু কারিগর বা পুরোহিত যাহা পায় তাহাতে তাহাদের স্বচ্ছন্দে সংসার নির্বাহ হইয়া থাকে।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেন্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করা হয়, তাহাতে দেখা যায়, সে সময়েও মাদ্রাজ প্রদেশে গ্রামাঞ্চলে নিম্নলিখিত চাকুরিয়াদের বৃত্তি প্রচলিত ছিলঃ

(১) গ্রামের প্রধান, (২) হিসাবরক্ষক, (৩) চৌকিদার, (৪) সীমানা পরিদর্শক (৫) জলাশয় এবং জল সরবরাহ করিবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী, (৬) পুরোহিত, (৭) পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়, (৮) জ্যোতিষী, (৯) কামার, (১০) ছুতার, (১১) কুমোর, (১২) ধোপা, (১৩) নাপিত, (১৪) রাখাল, (১৫) বৈদ্য, (১৬) নর্তকী, (১৭) বাজনদার ও কবি।

পাঞ্জাব প্রদেশে গুজরাট জেলায় গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তিধারীকে শস্য দিবার ব্যবস্থা আছে। তিনগাছি খড় যত লম্বা হয়, ততখানি লম্বা দড়ি দিয়া যতখানি গম বা যবের গাছ বাঁধা যায়, তাহা এক গোছা বলিয়া গণ্য হয়। প্রত্যেকের জন্য এইরূপ গোছা বিভিন্ন সংখ্যায় নির্দিষ্ট আছে। গ্রামের কামার সকলের জন্য কাস্তে, কোদাল, লাঙলের ফাল মেরামত করে এবং নির্দিষ্ট বৃত্তি পায়। গৃহস্থকে লোহা দিতে হয়, কাঠকয়লা কামার নিজে সংগ্রহ করিয়া আনে। কিন্তু কোন গৃহস্থের গাছ কাটা হইলে সেই গাছের শিকড় ও ডালপালা কামারের প্রাপ্য হয়। গ্রামের বাহিরের কোন আগন্তুক যদি কামারকে দিয়া কাজ করাইতে চায়, তবে তাহাকে লোহা, কয়লা, মজুরি সব জিনিসের দাম ধরিয়া দিতে হয়।

যুক্তপ্রদেশে বস্তি জেলার ধেবরুয়া নামে এক গ্রামে অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে, প্রতি হাল পিছু নাপিত, ধোপা, কামার, ছুতার ও রাখালকে চার পসেরি ওজনের ধান বা গম দিতে হয়। তাহা ছাড়া ধান কাড়ার কাজ শেষ হইলে প্রত্যেকে কামারী বাবদ কিছু পায়। উপরোক্ত চাকরদের ছাড়া গ্রামের জ্যোতিষী পণ্ডিত, কয়াল, সোখা অর্থাৎ ওঝা কিছু কিছু পাইয়া থাকে। ভাগচাষী ও জমিদারের মধ্যে শস্যের ভাগ হইবার আগে এই সকল পাওনা মেটানো হয়। তাছাড়া গ্রামে আগন্তুক ব্রাহ্মণ বা ফকিরের জন্য দুই হাতে আঁচলা করিয়া যতটা ধরে, সেইরূপ পাঁচ আঁচলা শস্য তুলিয়া রাখা হয়। ভাগচাষীর স্ত্রীও যতটা পারে ততটা তুলিয়া লইলে তাহার পর জমিদারের সঙ্গে শেষ ভাগ হয়।

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলে এ ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। নাপিত গৃহস্থের কাছে মাথাপিছু এক মান বা চার সের ধান পায়, তাহাকে সম্বৎসর প্রত্যেকের চুল কাটিয়া ও দাড়ি কামাইয়া দিতে হয়। কামার হাল পিছু ১০।১২ মান অর্থাৎ প্রায় আধ মণ ধান পায়। তাহাকে কাস্তে, কোদাল মেরামত করিতে হয়; কিন্তু নূতন কিছু গড়িতে হইলে আলাদা মজুরি দিতে হয়। ছুতোর বা ধোপার পাওনা স্থির নাই; কাজ অনুসারে মজুরি পায়। কবিরাজ ঘর পিছু চার কুড়ি বা একশত পাঁচ সের ধান হইতে ছয় কুড়ি বা দেড়মণ ধান পান। ঔষধের দাম সচরাচর লওয়া হয় না। কিন্তু কঠিন রোগ হইলে ঠিকা বন্দোবস্ত করা হয়। যথা, বাতশ্লেষ্মা জ্বরের রোগীকে সারাইয়া তুলিবার জন্য হয়ত পাঁচ টাকার রফা হইল; তখন ঔষধ তিনিই দিয়া থাকেন, সেজন্য পৃথক দাম লাগে না।

## মেলা

গ্রামের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষে বসবাস করিত, তাহাদের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য উপরোক্ত উপায়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র বংশ পরম্পরায় চাকুরিয়া বা শিল্পীদের বাঁধিয়া রাখিবার নানাবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যাহা নিত্য প্রয়োজন হয় না, অথচ যাহার জন্য বিশিষ্ট কারিগরদের গ্রামে বাঁধিয়াও রাখা যায় না। যেমন, পিতল কাঁসার বাসনের কাজ। তাহা তো নিত্য খরিদ বা মেরামতের দরকার নাই; আর ছোটখাটো গ্রামের জন্য একজন করিয়া কাঁসারি পোষাও সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় দুই তিন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কাঁসারিগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভাঙ্গা বাসনপত্র মেরামত করিয়া দেয়, অথবা একেবারে অচল হইলে সেগুলির বদলে বাকি দাম লইয়া গৃহস্থকে নূতন বাসন বিক্রি করে। কোন কোন স্থলে কাঁসারি এক গ্রামে কিছুদিনের জন্য থাকিয়া যায়; এমন কি পুরাণো বাসন গলাইয়া হয়ত পিতলের ধান মাপিবার জন্য কুনকের মত জিনিস ঢালাই করিয়াও দেয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল আর একটি খরিদ-বিক্রীর ব্যবস্থা ভারতের সর্বত্র অদ্যও প্রচলিত রহিয়াছে।

চাষীর দেশে সকল সময় ক্ষেতে ভারি কাজ থাকে না। যে সময়ে ফসল কাটা শেষ হয়, বিক্রির পর চাষীর হাতে কিছু পয়সা আসে, সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মেলা বসে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নানা জায়গায়, হয়ত কোনও ঠাকুর দেবতার পূজাপার্বণ উপলক্ষে মেলা বসে। কোথাও বা দুই নদীর সঙ্গমস্থলে কোনও শুভ দিবসে স্নানের জন্য বহু মানুষের সমাগম হয়। এই সকল মেলার মধ্যে, সকল মেলায় না হইলেও অনেক মেলাতে বিস্তর কেনাবেচার কাজ হয়। বিশেষ বিশেষ মেলায় বিশেষ বিশেষ জিনিস খরিদ-বিক্রয়ের প্রথা হয়ত প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে গৃহস্থ সুবিধা বুঝিয়া নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য মেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে। সারা বৎসর কাজের পর সে যে কেবল মেলায় একটু আনন্দ উৎসব করিতে যায় তাহাই নহে, সঙ্গে

সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারও কিছু সারিয়া আসিতে পারে।

বরিশাল জেলার মধ্যে বাউফল থানার অন্তর্গত কালিশঙ্করীর মেলায় শুধু যে জেলার লোকই সমবেত হয় তাহা নহে, পার্শ্ববর্তী খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলা হইতেও বহু লোক আসে। মেলায় ঘোড়া, গরু, মহিষ বহু আমদানী হয়; তা ছাড়া, ছোট বড় নানা আকারের প্রায় দশ হাজার নৌকা বিক্রয়ের জন্য আসে। এই সকল নৌকার কারিগর ঢাকা জেলার ছুতার; তাহারা এক একজন দুই শ' পর্যন্ত নৌকা এক সঙ্গে বাঁধিয়া জলপথে লইয়া আসে। সারা বৎসর তাহারা এই মেলায় বিক্রয়ের জন্য নৌকা নির্মাণ করে, এবং কালিশঙ্করীর মেলায় আসিয়া বহু জেলার লোকের নিকটে তাহা বিক্রয় করিয়া যায়। তেমনই দিনাজপুর জেলায় নেকমর্দের মেলায় ও ঠাকুরগাঁর ওপারে জয়গঞ্জে কালির মেলায় বহু ঘোড়া, কুকুর, হাতী, দুম্বা, গরুবাছুর এবং উট বিক্রয়ের জন্য আসে। এত বড় মেলায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, ধুবড়ী প্রভৃতি জায়গা হইতে অসংখ্য খরিদ্দার আসিয়া উপস্থিত হয়।

হিমালয়ের মধ্যে আলমোড়া জেলায় সরযূ ও গোমতি নদীর সংগমস্থলে বাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সেখানে প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে স্নানের জন্য প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। কুমায়ুনী ও ভোটিয়া ভিন্ন যুক্তপ্রদেশের সমতলখণ্ডের বহু লোকও সেখানে উপস্থিত হয়। পাহাড়ী ভোটিয়াগণ সারা বৎসর নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া যে সকল কম্বল, শাল, গালচে প্রভৃতি তৈয়ারী করে তাহা বাগেশ্বরের মেলায় বেচিতে আসে। তাহাদের দেশে পাহাড়ের গায়ে ঘাস জন্মায় বলিয়া ভেড়া, ছাগল এবং পাহাড়ী ঘোড়া পোষার সুবিধা। এই সকল ঘোড়া পাহাড়ী পথে মাল লইয়া যাওয়া আসার পক্ষে খুব উপযোগী; বাগেশ্বরের মেলায় তাই পাহাড়ী জন্তুজানোয়ারের বিক্রয়ও যথেষ্ট হয়। ভোটিয়াগণ কম্বল এবং ভেড়াছাগল ভিন্ন তিব্বত হইতে সংগ্রহ করা কস্তুরী, নানাবিধ জন্তুর চামড়া, সোরা, মোম, তিব্বতী ঔষধপত্রও বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে, এমন কি, তাহাদের নিকট টিনে তৈয়ারী বাসন ও তিব্বতী কাঠের কাজও পাওয়া যায়। দানপুর অঞ্চলের লোকে বাগেশ্বরের মেলায় নানাবিধ ঝুড়ি, বাক্স, পেঁটরা ছাড়া চামড়া, লোহা, তামা ও মাটির বাসন লইয়া আসে। এদিকে আলমোড়া জেলার ব্যবসায়িগণ আবার পাহাড়ীদের কাছে বিক্রয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত জিনিসপত্র আমদানী করেঃ সূতী কাপড়, ছাতা, তৈল, নুন, চিনি, গুড়, শস্য; সাবান, আরসি, বোতাম, রুমাল, ঘড়ি, বাঁশি, তালা চাবি, তাস, রবার বা কাঁচকড়ার খেলনা, টিন ও এলুমিনিয়মের বাসন, টর্চ ইত্যাদি। পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষ নিজেদের জিনিস বেচিয়া যে পয়সা রোজগার করে, তাহার অনেক অংশ এই সকল খেলো মনোহারী জিনিসের পিছনে নষ্ট করিয়া ফেলে।

বাগেশ্বরের মেলা পাহাড় অঞ্চলে হয় বলিয়া তাহাতে মাত্র দশ বিশ হাজার লোক ধরে, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ মেলায় ইহা অপেক্ষা বেশি লোক বহু জায়গায় সমবেত হয়। এইরূপ কয়েকটি মেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। রাজপুতানায় আজমীর হইতে সাত মাইল দূরে পুষ্কর তীর্থে শীতের প্রথমাংশে সমগ্র রাজপুতানা হইতে অসংখ্য ঘোড়া বিক্রয়ের জন্য আনা হয় এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সে সময়ে খরিদ্দার সমবেত হয়। মহীশূর রাজ্যে কোলার জেলার অবনী নামে এক গ্রামে ফাল্গুন মাসে রামলিঙ্গেশ্বর মন্দিরের মেলা প্রায় দশদিন ব্যাপিয়া থাকে; সেখানে অন্তত বিশ হাজার গরুবাছুর বিক্রয় হয়। মধ্যপ্রদেশে অমরাবতী জেলায় বদনেরার নিকটে কুণ্ডিনপুরের মেলা শীতকালে প্রায় এক মাস ধরিয়া থাকে এবং সেখানে অন্তত ৬০,০০০ লোকের সমাগম হয়। সেখানে সব রকম জিনিসের কেনাবেচা হয়। বদনেরা হইতে ছয় মাইল দূরে ভিটুকে গ্রামে ও ৩০ মাইল দূরে উম্বরগোড়াতে যে মেলা বসে সেখানেও কুণ্ডিনপুরের মত প্রধানত গরু বাছুর ছাড়া, লোহার সরঞ্জাম, গরুর গাড়ি, পিতল কাঁসার বাসন, ছেলেদের খেলনা বিক্রয় হয়। আগ্রা হইতে বিশ ক্রোশ দূরে যমুনার ধারে বটেশ্বর মহাদেবের মেলা কার্তিক মাসের মাঝামাঝি আরম্ভ হইয়া প্রায় মাসখানেক থাকে; সেখানে অনুমান এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। মেলায় অসংখ্য ঘোড়া, উট, গরুবাছুর, মহিষ, হাতী, গরুর গাড়ি বিক্রয়ের জন্য আসে। দিল্লীর কিছু উত্তর-পশ্চিমে ভিওয়ানা নামক স্থানে যে মেলা বসে তাহা হরিয়ানা জাতের গরুবাছুর বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। পাঞ্জাবে রোহটাক জেলায় ঐরূপ একটি মেলায় অন্তত ৫০,০০০ গরুবাছুর বিক্রয় হয়। যুক্তপ্রদেশে বুদাউন জেলায় কাকোরা গ্রামে কার্তিক মাসে যে মেলা বসে তাহাতে অন্তত চার পাঁচ লক্ষ লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। মেলার ঘরের আসবাবপত্র, বাসনকোসন, জুতা, কাপড় চোপড় অপর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হয়; প্রত্যেক জিনিসের জন্য মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে। মাদ্রাজে গণ্টুর জেলায় কোটাপ্পাকোণ্ডা পর্বতে মাঘ মাসের মেলায় প্রায় ৬০,০০০ লোক আসে। নিকটে থাল্লামালাই পর্বত; এবং মেলায় পাহাড়ী অঞ্চল হইতে বাঁশ, কাঠের গুঁড়ি অসংখ্য পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য আমদানি হয়। যুক্তপ্রদেশে লখনৌ এবং ফৈজাবাদের মধ্যে রুদাউলিতে জোহ্‌রা বিবির দরগাতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মেলায় অন্তত ৬০,০০০ লোক আসে এবং সেখানে কাপড়-চোপড় ছাড়া নানাবিধ শস্যের যথেষ্ট বিক্রয় হয়।

### তীর্থস্থান

মেলায় যখন বহুলোকের সমাগম হয় তখন তাহা একটি ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়। কিন্তু শহর হইলেও ইহা অস্থায়ী। হয়তো এইরূপ মেলার কেন্দ্রে যদি অবিরত ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে থাকে তাহা ক্রমশ স্থায়ী শহরে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে অসংখ্য তীর্থস্থান আছে। হিন্দুধর্মের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি প্রতি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ তীর্থ আছে, মুসলমানদের তীর্থের সংখ্যাও তেমনই কম নয়। শৈবদের দ্বাদশ মহাতীর্থ, শাক্তগণের একান্ন পীঠস্থান, প্রাচীনকালে সৌর সম্প্রদায়ের সাতটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। এবং এই সকল তীর্থের বিশেষত্ব হইল, এগুলি ভারতবর্ষের কোনও একটি বিশেষ প্রান্তে সীমাবদ্ধ নয়, সকল প্রান্তে ছড়াইয়া আছে। কেহ যদি চার ধাম দর্শন করিতে চায় তবে তাহাকে উত্তরে বদরিকাশ্রমের নিকটে যোশীমঠ, পূর্বে শ্রীক্ষেত্র, পশ্চিমে গুজরাতে সারদাপীঠ এবং দক্ষিণে মহীশূর কাডুর জেলায় শৃঙ্গেরী মঠে যাইতে হইবে।

আর প্রায় সকল তীর্থেরই বিশেষত্ব হইল যে, সেখানে তীর্থযাত্রী ধনীই হউক আর দরিদ্রই হউক, তাহাকে কিছু না কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। পুরী বা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীরা জগন্নাথের পট, নানা পাথরের উপর খোদাই করা জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মূর্তি, কাঁসার বাসন, দক্ষিণী শাড়ী প্রভৃতি ক্রয় করে; কাশীতে পাথরের কাজ, দামী রেশমের কাপড়, কাঠের খেলনা, পিতল কাঁসার বাসন, ইত্যাদি পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে ছাপা কাপড়, বাসনপত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শুধু যে অবস্থা বিশেষে তীর্থযাত্রিগণ জিনিসপত্র ক্রয় করে তাহা নয়, তীর্থকৃত্য হিসাবেও এ বিষয়ে কতকগুলি বিধি আছে। গরীব হিন্দুস্থানী যাত্রীরা পুরী তীর্থে আসিয়া দু চার পয়সায় লাল রং করা বেতের ছড়ি লইয়া যায়; আবার সেই বেতের ছড়ি বৃন্দাবনে যমুনার ধারে মন্দিরে জমা দিবার বিধি আছে। যে সকল যাত্রী বদরিকাশ্রমে যায় তাহারাও মন্দিরের পতাকার ছিন্ন অংশ সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনের ঐ মন্দিরেই জমা দেয়। অর্থাৎ তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করিতে হইলে ভারতের নানা স্থান হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যেমন পরিচয় ঘটে, তেমনই সে সকল স্থানে নানাবিধ ছোট বড় শিল্প যাত্রীদের আশীর্বাদে বাঁচিয়া যায়।

প্রায় প্রতি তীর্থই এইরূপে কোন না কোন বিশেষ শিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। গ্রামে বসিয়া শিল্পী যত খরিদ্দার পাইবে, তাহা কখনও সংখ্যায় বেশি হইতে পারে না। কিন্তু তীর্থাশ্রয়ী শিল্পী বা কারিগরের খরিদ্দার

সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ছড়াইয়া থাকে। আর তীর্থস্থানে বার মাসে তের পার্বণ তো লাগিয়াই আছে; ফলে মেলায় বিক্রয়ার্থ কারু বা শিল্পীকে যেমন বছরের ভিতর অল্পদিনের জন্য খরিদ্দারের সঙ্গে যোগ হয়, তীর্থস্থান সেরূপ নহে। সেখানে বার মাস মেলা লাগিয়া থাকার ফলে বহু শিল্পী, বহু কারিগরের পক্ষে এক স্থানে ব্যবসায় চালানো সম্ভব হয়। কাশী বা পুরীর মত প্রাচীন ক্ষেত্রে শহরের এক এক পল্লী বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে; কোথাও পাথরের কাজ হয়, কোথায় কাপড়ে রং করা বা ছাপানোর কাজ হয়, কোথায় সোনা রূপা বা জরির তারের কাজ হয়, কোন পল্লীতে পটুয়া বা মাটির খেলনার কারিগরের বাস। এইরূপে মেলার মধ্যে আমরা অস্থায়ী আকারে যাহা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থকেন্দ্রগুলিতে তাহাই স্থায়ী আকার ধারণ করিয়াছে।

**ভারতের সংস্কৃতিগত ঐক্য**

তীর্থস্থানগুলিতে নানা প্রদেশ হইতে সমবেত হইয়া যাত্রিগণ যে শুধু কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া বাড়ি ফিরিত তাহা নয়, সেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অধীনে স্নান, তর্পণ, দান প্রভৃতি নানা ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাহারা পুণ্যার্জনেরও চেষ্টা করিত। বাঙালী তীর্থযাত্রী নর্মদার কূলেই হউক, অথবা গোদাবরী, কাবেরীর তটে হউক, কিংবা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম বা অলকানন্দা ভাগীরথীর সঙ্গমেই হউক, একই সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র, একই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ভারতের সকল ক্ষেত্রকেই আপন বলিয়া বিবেচনা করিতে শেখে। শুধু রাজার শাসন প্রভাবে নয় বরং অসংখ্য যাত্রী বহু যুগ ধরিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করার ফলে ভারতের সর্বত্র সংস্কৃতিগত ঐক্যের একটি ভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। একই রামায়ণ মহাভারত, একই পুরাণ কাহিনী ব্রাহ্মণশাসিত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দুধর্মের সহিত সন্ন্যাসাশ্রমের এক অঙ্গাঙ্গী যোগ বর্তমান রহিয়াছে। পূর্বে দ্বিজজাতীয় গৃহস্থ সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার পর বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিত। কিন্তু বুদ্ধদেব এবং শঙ্করাচার্যের পর হইতেই বোধ হয় সম্প্রদায় হিসাবের সন্ন্যাসীর উদয় হয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসীর সহিত পূর্বাশ্রমের সকল যোগ ছিন্ন হয়। অর্থাৎ তাঁহার নাম, গোত্র, গৃহাদি পরিচয় লুপ্ত হইয়া যায় এবং তিনি নিকেতনবিহীন, নামগোত্রহীন অবস্থায় উপনীত হন। হিন্দী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—**বহুতা পানি চলতা সাধু** শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ যে জল বহিয়া যায় সেই জল ভাল, যে সাধু কোথাও বাসা বাঁধেন না, তিনি শ্রেষ্ঠ। সাধু সন্ন্যাসী তীর্থে তীর্থে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, এক রাজার অধিকার অতিক্রম করিয়া অপর রাজার রাজ্যে যাতায়াত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃতিগত ঐক্য আংশিকভাবে স্থাপনা করিয়াছিলেন ইহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

**অর্থনৈতিক আদর্শের সম্বন্ধে একটি বিচার**

সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রামের আর্থিক জীবন জাতিগত কারিগর, শিল্পী, চাষী প্রভৃতির উপরে ন্যস্ত ছিল। গ্রামের প্রয়োজন অনুসারে সকলে উৎপাদন করিত। পরস্পরের মধ্যে প্রাপ্য অর্থ বা শস্যের সহায়তায় মেটানো হইত। সকলেই পরস্পরের উপরে নির্ভর করিয়া চলিত। এমনও দেখা গিয়াছে, যদি কোন কারিগরের সহিত এক গৃহস্থের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন গ্রামের আর পাঁচজন মিলিয়া সেই বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করে। আর্থিক ব্যাপারের জন্য ব্যবসা পরিবর্তন করিবার স্বাধীনতা যেমন স্বীকৃত হইত না, সকলকেই কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতে হইত, তেমনই আবার গ্রামের কোন কারিগর অন্নাভাবে কষ্ট না পায় ইহাও গ্রামের পাঁচজন দেখিবার চেষ্টা করিত।

ভারতীয় সমাজ গঠনের মধ্যে সমবায় বা সহযোগিতার এই আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেহ কেহ প্রাচীন ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলিত ছিল, এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক আদর্শের সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর করিবার জন্য এ বিষয়ে কিছু বিচারের প্রয়োজন আছে। তদুপরি পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে যখন ভারতীয় সমাজের বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে, তখন বর্তমান আলোচনার ফলে আমাদের পথ আরও সুগম হওয়া সম্ভব।

কোন এক গ্রন্থকার ভারতবর্ষের প্রাচীন যৌথ পরিবারকে আদর্শ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যৌথ পরিবারের আদর্শকে সমাজতন্ত্রবাদের ভারতীয় সংস্করণ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। হয়ত একটি পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বার্থ-সঙ্কোচের দ্বারা আর্থিক অধিকারে সাম্যের ভাব আনিতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা সমগ্র দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব তাহা বুঝা যায় না। রক্ত বা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে যাহা সম্ভব তাহা বহুর ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ত নাও হইতে পারে; অন্তত প্রাচীন ভারতে সেরূপ সাম্যের কোন আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কখনও দেখা যায় নাই। হিন্দুসমাজের মধ্যে কোন কালে কামার, কুমার, সাঁকরা, ব্যবসায়ী বা চাষী, শিক্ষক, অধ্যাপক সকলকে লইয়া সমতাসম্পন্ন যৌথ পরিবার সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে মনু-সংহিতা বা মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িলে একটি আশ্চর্য বিষয় পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণকে সমাজের মধ্যে অত্যুচ্চ সম্মান এবং অধিকার দিলেও তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিতে বলা হইত। তদ্ভিন্ন অপরাপর ধনীও যাহাতে সাধারণের উপকারে অর্থব্যয় করে, মন্দির, পথঘাট নির্মাণ করিয়া দেয় বা কূপতড়াগাদি খনন করায়, সেইজন্য এরূপ কাজকে বিশেষ পুণ্যের কাজ বলিয়া গণনা করা হইত। বর্তমান সময়ে ট্যাক্সের সাহায্যে ধনীর অধিকার হইতে টাকা আদায় করিয়া রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রের অধীন মিউনিসি-প্যালিটি যেভাবে সাধারণের প্রয়োজনীয় কাজে অর্থব্যয় করে, প্রাচীন ভারতবর্ষে সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তাহার পরিবর্তে স্বর্গের লোভ দেখাইয়া, অথবা সমাজে সম্মানের আকর্ষণের সাহায্যে ধনীদের সৎকাজে অর্থব্যয় করিবার প্ররোচনা দেওয়া হইত। অর্থাৎ আইনের বশে না ফেলিয়া বরং পুণ্যের আকর্ষণে ধনীলোকের দেয় কতকাংশে কর্তন হইত। কিন্তু যদি কেহ স্বীয় ধনসম্পদ সৎকার্যে ব্যয় করিতে না চাহিতেন, তাহা হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারিত না। নিজের আয়ের মালিক মানুষ নিজেই ছিল, তদুপরি ধনোৎপাদনের সরঞ্জামের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বও স্বীকৃত হইত। সেগুলিকে রাষ্ট্রের বা সর্বজনের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা, অথবা সকলের মধ্যে আর্থিক অধিকারে সমতা সম্পাদনের আদর্শ প্রাচীন ভারতে ছিল না। অতএব হিন্দু সমাজ-সংগঠনের ব্যাপারে সাম্য-বাদের আদর্শ বর্তমান ছিল, এরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসংগত কারণ নাই।

আর্থিক সাম্যের ভাব না থাকিলেও ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে গ্রামে কৃষি এবং শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া এবং সকল বৃত্তিতে যথাসম্ভব কৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া এমন এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক শাসনতন্ত্র রচনা করা হইয়াছিল যাহা বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং দুর্যোগের মধ্যেও বাঁচিয়া থাকিবার আশ্বাস দিয়াছে। বিভিন্ন জাতিবৃন্দের মধ্যে ও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মর্যাদার অসমতা থাকা সত্ত্বেও খাওয়াপরার সম্পর্কে সকলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকিত বলিয়া এবং স্বীয় লোকাচার, কুলাচার বা দেশাচার বিনা বাধায় পালন করিবার স্বাধীনতা ভোগ করিত বলিয়া মানুষ সমাজের উপরে ব্রাহ্মণত্বের নিকট নতিস্বীকারে আপত্তি করিত না। ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ লোকধর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করিত বলিয়া আগন্তুক জাতিবৃন্দ আনন্দচিত্তে হিন্দুসমাজে স্থান পাইত।

হিন্দুসমাজে কোল জুয়াঙদের সমাজ অপেক্ষা আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মূলত তাহার আকর্ষণে এবং স্বীয় লোকাচার সমূলে পরিহার করিতে হইবে না, এই আশ্বাসে কোল, জুয়াঙ, উরাঁও প্রভৃতি জাতিকে আমরা ধীরে ধীরে স্বীয়

বর্ণাশ্রয়ী স্বাধীনতা পরিহার করিয়া হিন্দু-সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখি।

হিন্দুসমাজদেহের মধ্যেও মর্যাদা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধার তারতম্য মোটের উপরে উপেক্ষা করিয়া সেই একই কারণে বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন বহু শতাব্দী ধরিয়া অক্ষত অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। রাজনৈতিক গগনে শাসকের পর শাসকের উদয় হইয়াছে, দেশে বিদ্রোহ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বারংবার দেখা দিয়াছে, তবু জীবনের ভারকেন্দ্র গ্রাম্য সমাজের অর্থনীতি ও সমাজ-নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মানুষ গ্রামের শাসন এবং কৌলিক বা জাতিগত আইনের শৃংখলার জোরে এই সকল আগন্তুক আঘাতকে বার বার উপেক্ষা করিয়া জীবনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। হয়ত বাহিরে আঘাতের সংখ্যাধিক্যে তাহাদের উন্নতি বা অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে, কিন্তু আগন্তুক আঘাত ভারতবর্ষের মানুষকে বর্বরতার পঙ্কে ঠেলিয়া নামাইতে পারে নাই। এই শক্তি ছিল বলিয়া অন্তরের বহুবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া ভারতের সংস্কৃতি আজও জীবন্ত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে, তাহার উন্নতি অথবা নবজন্মলাভের সম্ভাবনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন কোন দেশের সভ্যতার মত তিরোহিত হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

# বাদশাহী আমলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের একটি চিত্র

ডক্টর শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রায় সাড়ে ছয়'শ বছর আগেকার কথা বলছি, তখন ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের বনিয়াদ সবে মাত্র বেশ জোরালো হয়েছে এবং সংগে সংগে উহা বিস্তৃতিও লাভ করেছে প্রায় সমগ্র ভারতে--আমি সেই যুগের কথাই এখানে কিছু বলব। কেউ কেউ বলতে পারেন ভারতে মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এরও এক'শ বছরের উপরে এবং এই এক'শ বছরের মধ্যে এই দেশে মুসলমান রাজ্যের বনিয়াদ বেশ শক্ত হয়েছিল, তবে আমি কেন এত পরের কথায় বলছি 'সবে মাত্র' মুসলমান সাম্রাজ্যের বনিয়াদ জোরালো হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, ঐ একশ' বছরের মধ্যে উত্তর ভারতে-ও দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা তেমন সুদৃঢ় হয়নি, দাক্ষিণাত্যে আধিপত্যের কথা ত দূরের কথা: আর এর মাঝে মাঝে এমন এক একটি দমকা ঝড় ঝাপটার মত মহা সংকটের আবির্ভাব হত যাতে মনে হত যে, এই বুঝি সমস্ত রাজ্যই ভেংগে চুরমার হয়ে যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন আলাউদ্দীন খিলিজি: তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ কর্মবীর--যে কাজে তিনি হাত দিয়েছেন তাতেই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। উত্তর ভারতের যে সমস্ত স্থান তখন-পর্যন্ত দিল্লীশ্বরের অধীনে আনা সম্ভব হয়নি তা তিনি একে একে জয় করেন, শুধু তাই নয় দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানও তিনি স্বীয় রাজ্য-ভুক্ত করেন। এইরূপে একের পর এক তিনি যেমন রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে তুলছিলেন, নিজের বাহুবলে আবার অপরদিকে তেমনি-ভাবে নিজের উদম্য বীরত্বে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিহত করেছিলেন ভারতে মোঙ্গল আক্রমণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চেংগিস খাঁর সময় হতে আরম্ভ করে মোংগলেরা মাঝে মাঝেই প্রবল ঝটিকাবেগে ভারতের নানাস্থানে এসে এত দৌরাত্ম্য করত যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাব প্রভৃতির অধিবাসীদের ভয়ানক বিপদের মধ্যে বাস করতে হত। এই দেশের যে ক্ষতি মোংগলেরা প্রতি আক্রমণে করে যেত তা অবর্ণনীয়। আলাউদ্দীনের সময়েও পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণে তারা এখানকার কতকগুলি জায়গার অধিবাসীদের ভয়ানক উত্যক্ত করে তুলেছিল। আলাউদ্দীন কিছুমাত্র ভীত না হয়ে এমনভাবে তাদের প্রতিবার বাধা দিতে লাগলেন যে তাতে ভীষণ ঘাত প্রতিঘাতে বাধা হয়ে দুর্ধর্ষ মোংগলেরা ভারত আক্রমণে প্রতিনিবৃত্ত হল এবং এই-রূপে দেশেও শান্তি স্থাপিত হল।

একদিকে দেশের পর দেশ জয় করে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন এবং অপরদিকে নিজের সাম্রাজ্যকে বহিঃশত্রু হতে রক্ষা উভয় কার্যই তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সংগে সমাধা করেছেন। কিন্তু উভয় কার্যেই তাঁর অর্থব্যয় হয়েছে প্রচুর। তবে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে তিনি অগণিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি মাণিক্যের অধি-কারী হয়েছিলেন, তা হলেও তাঁর ব্যয়ের অংকও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল--এইরূপ হবার বিশেষ কারণ ছিল সামরিক বিভাগের অত্যধিক খরচ। সাম্রাজ্য-জয় অপেক্ষা উহার প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগকে রোগমুক্ত রাখা এবং কোথাও রোগের আক্রমণ হলে বা হবার উপক্রম হলে তাকে সময়মত প্রতিকার করা আরও কঠিন কাজ, আর তাতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হত সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সময়মত কাজে লাগান। সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি এবং তাতে হবে রাজকোষ অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত--যে বোঝা তার পক্ষে হবে অত্যন্ত কঠিন অথচ সৈনিকদের ঠিকমতন বেতন দিতে হবে যাতে তাদের ব্যয় নির্বাহে কোনপ্রকার কষ্ট না হয় ও তাদের রাজ্যের প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্যকর্মে ভক্তি সর্বদা অবিচলিত থাকে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে সম্রাট এক উপায় উদ্ভাবন করলেন--তিনি মনস্থ করলেন খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সকলেরই সাংসারিক ব্যয় বহুলাংশে কমে যাবে এবং তাতে অতি সহজেই সৈন্যদের কম বেতনে নিযুক্ত করা যাবে। যে অনুপাতে জিনিসপত্রের মূল্য কমান সম্ভব হবে সেই অনুপাতে সৈনিকদের বেতন কম দিলে কারো কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা হবে না এবং সরকারের সামরিক ব্যয় কম হবে। সহজভাবে বলতে গেলে আলাউদ্দীনের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যসংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক মতেই রেখে তারা যাতে সংসারব্যয় বিনা কষ্টে চালাতে পারে সেই অনুপাতে তাদের বেতন দেওয়া এবং ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ করে সরকারের ব্যয় হ্রাস করা। তখন কোন জিনিস-পত্রের অভাব ছিল না এবং সেগুলি সস্তাও ছিল, কিন্তু ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ করলে আরও কম মূল্যে জিনিস পাওয়া যেত--এইরকম সস্তা মূল্যে লোকে যাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পায় সেই দিকেই সম্রাটের দৃষ্টি ছিল।

সুতরাং বর্তমান যুগে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে আলাউদ্দীনের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য তার চেয়ে অনেকাংশে পৃথক। বর্তমান কালের নিয়ন্ত্রণের প্রধান কারণ হচ্ছে জিনিসপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা এবং সংগে সংগে তাদের মূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধি। চাহিদা অনুযায়ী এখনও অনেক স্থলে উৎপাদন কম এবং মোটামুটি জগতের খাদ্য পরিস্থিতি এখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে নাই--খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে সেই অবস্থা ফিরে আসতে এখনও কয়েক বৎসর লাগবে। কাজেই দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতিকে সাহায্য করাই এখনকার নিয়ন্ত্রণের প্রধান কাজ। খাদ্যের অভাবের জন্য আমাদের আহারের পরিমাণও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু আলাউদ্দীনের নিয়ন্ত্রণে * খাদ্য-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন

হয় নাই, সব জিনিসই তখন প্রচুর পাওয়া যেত। তখন একমাত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল মূল্যের উপরে। সেই সময়ের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এখনকার নিয়ন্ত্রণের একটি বিষয়ের মিল আছে—তখনও ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ করার জন্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এখনও অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ করতে হয়েছে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা। সস্তা দরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পেয়ে জনসাধারণ আলাউদ্দীন বাদসাহকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করত।

ঐ যুগের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্ণির লেখা হতে আমরা সেই সময়ের কতগুলি জিনিসের দাম জানতে পারি এবং তা থেকেই আমরা ধারণা করতে পারব কিরূপ দরে কোন কোন জিনিস বিক্রী হত। তখনকার মণ ছিল বর্তমান প্রায় সাড়ে চৌদ্দ সেরের সমান এবং এখনকার পয়সার মত তখন একপ্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল—তাকে বলা হত জিতল; এরূপ চৌষট্টি জিতলে হত এক টাকা।

| জিনিসের নাম | এখনকার প্রতি মণ (বর্তমান প্রায় সাড়ে চৌদ্দ সেরের সমান) | মূল্য |
|---|---|---|
| গম | " " | সাড়ে সাত জিতল |
| বার্লি | " " | চার জিতল |
| ধান | " " | পাঁচ " |
| মাস কলাই | " " | পাঁচ " |
| ছোলা | " " | পাঁচ " |
| মসুর | " " | তিন " |
| চিনি | এখনকার প্রতি সের (বর্তমান প্রায় পাঁচ ছটাক) | ১½ " |
| গুড় | " " " " | ½ " |
| মাখন | " ১½ সের (বর্তমান প্রায় ১২½ ছটাক) | ১ " |
| তিল তেল | " ৩ সের (বর্তমান প্রায় ১৫ ছটাক) | ১ " |
| লবণ | " ২½ মণ — — — | ৫ " |

ঘি, তেল এবং কাপড় প্রভৃতির দামও স্থির করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি, ঘোড়া ও গরু নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করতে হত এবং এই নিয়ন্ত্রণের ফলে এই সবের দাম বেশ কমে গিয়েছিল। সবচেয়ে ভাল ঘোড়া অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ঘোড়া এক-একটি বিক্রি হত একশত হতে একশত কুড়ি টাকার মধ্যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়া বিক্রি হত আশি হতে নব্বই টাকার মধ্যে এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেকটি ঘোড়ার দাম ছিল পঁয়ষট্টি হতে সত্তর টাকা; টাট্টু ঘোড়াগুলির দাম আরও সস্তা ছিল, সেগুলি দশ হতে শুরু করে পঁচিশ টাকার মধ্যেই পাওয়া যেত। একটি দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যেত তিন-চার টাকাতে এবং একটা ছাগলের দাম ছিল মাত্র দশ হতে চৌদ্দ জিতল।

সম্রাট খুব ভালভাবেই জানতেন, জিনিসের দাম বেঁধে দেবার কোন মূল্য নেই, যদি সকলে নির্দিষ্ট মূল্যে ঐগুলি কিনতে না পারে। তিনি প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন; যে কাজ তিনি একবার আরম্ভ করতেন তা যত কঠিনই হোক, ঠিক মতন সাধন না করে কখনও ক্ষান্ত হতেন না বা পশ্চাৎপদ হতেন না। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় নানাদিক হতে যে বাধাবিপত্তি আসতে পারে তা তিনি বুঝতেও পেরেছিলেন এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর বিধান অনুযায়ী দিল্লীর ও আশেপাশের হিন্দু এবং মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের নাম সরকারে রেজিস্ট্রি করতে হত এবং তাদের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হত। সেই সর্ত অনুযায়ী তাদের জিনিসপত্র দিল্লীর বদায়ুন দরজার ভিতরে একটি উন্মুক্ত জায়গায় বিক্রয়ের জন্য আনতে হত। অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুলতানি ব্যবসায়ীদের প্রচুর পরিমাণে জিনিস কেনার জন্য রাজকোষ হতে প্রয়োজনমত অগ্রিম টাকাও সম্রাট দিতেন। যারা বেশী মূল্যবান দ্রব্য কিনত, তাদের দেওয়ান এক রকম ছাড়পত্র (Permit) দিতেন তার বলে বণিকেরা উপযুক্ত মূল্যে দ্রব্যাদি কিনে নগণ্য লাভে সেই সব বিক্রয় করত। এতে একটা মস্ত উপকার হত এই যে, তারা কম দামে পণ্য ক্রয় করে খুশীমত বেশী দামে বিক্রয় করতে পারত না।

বাজার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল দুইজন কর্মচারীর উপরে—একজনকে বলা হত দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ এবং অপরজনকে বলা হত শাহনা-ই-মন্ডি। এই দুইজন কর্মচারী অত্যন্ত সততা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে কাজ করতেন। ইয়াকুব ছিলেন বাজারের শাহনা, যখনই তিনি টের পেতেন কেহ নিয়ন্ত্রণের আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন তখন তিনি তাঁর চাবুকের সদ্ব্যবহার করতেন। ইহার উপরে গুপ্তচর বাজারে ঘুরে বেড়াত বাজারের কার্যকলাপ দেখার জন্য এবং তাদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল সম্রাটের গোচরীভূত করত। ব্যবসায়ীরা নিরূপিত দামে দ্রব্যাদি বিক্রি করে কি না এবং ঠিক মতন ওজন দেয় কি না তা জানবার জন্য সম্রাট নিজেও নিজের চাকর-বাকরদের বাজারে পাঠাতেন কোন কোন জিনিস কিনে সঠিক ব্যাপার যাচাই করার জন্য। যদি দেখা যেত কেহ কোন জিনিস ওজনে কম দিয়েছে তাহলে বিক্রেতাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হত—যতটা ওজনে সে কম দিয়েছে ততটা ওজন মাংস তার নিতম্ব হতে কেটে ওজন পূরণ করা হত। অসদাচরণের জন্য মাঝে মাঝেই সংশ্লিষ্ট দোকানদারকে পদাঘাতে দোকান [illegible] কার্যকলাপের জন্য এইরূপ নানাপ্রকার কঠিন শাস্তির বিধান ছিল এবং তাতে ব্যবসায়ীরা এত ভীত ছিল যে অল্পদিনের মধ্যেই তারা বেশ হুঁশিয়ার ও আইনানুরাগী হয়েছিল। সাম্রাজ্যের সমস্ত বণিকদের নাম রেজিস্ট্রী করতে হত এবং নিয়ন্ত্রণের সমস্ত আইন কানুন তাদেরও মেনে চলতে হত। কাউকেই শস্যাদি জমিয়ে রাখতে দেওয়া হত না, সরকারী কর্মচারীরা এ বিষয়ে বিশেষ তৎপরতার সহিত কাজ করত,—অবশ্য তাদের উপরেই এ কার্যের সমস্ত ভার অর্পিত ছিল। কৃষকদের নিকট হতে খুব কড়াকড়িভাবে রাজস্ব আদায় করা হত এবং ক্ষেত হতেই তাদের নিকট হতে শস্যও কিনে নেওয়া হত। অধিক মূল্যে বিক্রি করার জন্য কৃষক বা বণিক কাহাকেও শস্যাদি কেবল জমাতে দেওয়া বন্ধ করা হয়েছিল তাই নয়, শস্যাদি কিনে উহা সেই বাজারে বা নিকটবর্তী বাজারে বা মেলায় পুনরায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করাই দণ্ডনীয় ছিল। অতিরিক্ত লাভের আশা তখন সকলকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

খালসা জমি হতে রাজস্ব আদায় হত শস্যে, নগদ টাকাকড়িতে নয়, এইরূপেও সরকার অনেক শস্য সংগ্রহ করতে সফল হয়েছিল। দিল্লীর সরকারী গোলাতে যে প্রচুর শস্য জমা হয়ে থাকত, তাতে অনাবৃষ্টির দরুণ ফলন কম হলেও খাদ্যের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্ণির মতে সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুব সাফল্যলাভ করেছিল এবং তাঁর মতে এই সাফল্যের কারণ ছিল কয়েকটি:—প্রথম কারণ, নিয়ন্ত্রণের কানুনগুলি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যে পরিণত করা হয়েছে, দ্বিতীয় কারণ, সম্রাটের ভয়ে সরকারী কর্মচারিগণ সততা ও উৎসাহের সঙ্গে পক্ষপাতিত্ববিহীন হয়ে কাজ করেছে, তৃতীয় কারণ দেশবাসীর নিকট প্রচলিত মুদ্রার অভাব এবং চতুর্থ কারণ, কড়াকড়িভাবে রাজস্ব আদায়।

সেই সময়ে একজন সৈনিক প্রতি মাসে মাহিনা পেত সাড়ে উনিশ টাকা। দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্যের যে তালিকা আমরা উপরে দেখেছি তা থেকে আমরা বুঝতে পারি ঐ টাকায় একজন সৈনিকের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে কোন অসুবিধা ত হতই না বরং তারা বেশ স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারত। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে সম্রাট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল—শুধু যে রাজকোষ কতকগুলি অতিরিক্ত ব্যয় হতে মুক্তিলাভ করেছিল ও সৈনিকেরা তাদের নির্দিষ্ট বেতনে অভাব মিটিয়ে ভালভাবে থাকতে পারত তাই নয়, সাধারণ জনগণও দ্রব্যাদি সস্তা মূল্যে পাওয়াতে অত্যন্ত উপকৃত

# কলকাতার গঙ্গা

## শ্রীপরিমল দত্ত

বন্দ্যমাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি পতিত পাবনী পুরাতনী'—এই সুরধুনী গঙ্গা কখনো আমার মনের চোখে ভেসে ওঠে না। কিংবা জগদীশচন্দ্র বসুর অপূর্ব ধ্বনিময় গদ্যের সেই ধুয়া—'গঙ্গা তুমি কি শিবের জটা হইতে নামিয়া আসিয়াছ'?—সে প্রশ্নও না। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এমার্সন ঘেঁষা ভাষায় কোথাও বলেছেন: আশুতোষকে মনে পড়িলে, বাঙলাদেশের নদীর কথা মনে পড়ে। কিন্তু কলকাতার গঙ্গা আমাকে যে দুটি মহামানবের কথা মনে করিয়ে দেয়, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ। আমার মনের গ্যালারি, গঙ্গার নানা যুগের নানা ঋতুচক্রের রকমারি ছবিতে ঠাসা। সেই পর্তুগীজ হার্মাদের ভয়, ধনপতির বাণিজ্য যাত্রা, সতেরো শতকের এক ভর দুপুর বেলায় গঙ্গা বেয়ে জব চার্ণকের হঠাৎ কলকাতা আগমন, গঙ্গা সাগর সঙ্গমে পরিত্যক্ত নবকুমার, ওয়ারেন হেস্টিংস ও মেরিয়ানের গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার, ইয়ার বক্সী পরিবৃত ঠাকুর বাড়ির খেয়ালীবাবুর ফরমাসে ঈশ্বরগুপ্ত কবিতা লেখায় ব্যস্ত—সৌখিন পিনিসে হাতি মার্কা নিশান পত্ পত্ করে উড়ছে আর দামামা বাজছে দকড় দকড় দকড়—এমনি ছবির পর ছবি। পৌরাণিক ভগীরথের কথা জানি না, পূর্ব ভাগীরথীর উদ্ভব মধ্যযুগে ঘটেছে—সম্ভবত রেনেলের ম্যাপে ধরা পড়ার শ'তিনেক বছর আগে। নদীমাতৃক বাঙলার নানান নদী আছে,—তার নামে কান ভরে ওঠে, রূপে চোখ জুড়োয়, কিন্তু ভাগীরথীর অদৃশ্য যোগ বাঙালির নাড়ীতে। বাঙালির আশা, বাঙালির ভাষা—সবই এ নদীর দান। 'যেদিকে সূর্য উঠে তা পূবদিক, যে ভাষায় আমরা কথা বলি তা পূর্ব ভাগীরথী তীরের ভদ্রলোকের কথা ভাষা।'

একদা লঘুপক্ষ কলেজের দিনে, স্টিমার পার্টি আর পিকনিকের হিড়িকে, গঙ্গার বুকে ভাসতে ভাসতে, সহপাঠিনীর বিনুনি আর মুখ, কেক কমলা আর চায়ের দুর্নিবার আকর্ষণ কাটিয়ে, গঙ্গার গৈরিক জলধারার দিকে বারে বারে ফিরে ফিরে চেয়েছি। কেবল চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে গঙ্গাকে দেখেছি, এমন কি মনে মনেও। দূরে গঙ্গা পারের দেশে, তুষারস্রাবী বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, অগ্নিস্থলীর ধারে গোল হয়ে বসে কলকাতার গঙ্গার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়েছে সংস্কৃত কবির কথা—দূরদেশে অনেক চাকর ধনরত্ন আর হাতির মালিক হয়ে, রাজগী করার চেয়ে, গঙ্গার ধারে গিরগিটি, টিকটিকি কিংবা কৃশকায় কুকুর হওয়াও বরং ভাল। আমার মানসপটে গঙ্গার যে ছবি গভীরভাবে মুদ্রিত, তা বর্ষার মেঘে ঢাকা গঙ্গা নয়, শরতের দিগন্তবিস্তৃত গঙ্গা আর হলুদ ঢালা রোদ্দুর। সেই আলস্য বিরাম বৈরাগ্য ও আবার আলস্যের ভূমিকায় একটি নিশ্চল গিরগিটি ও তার ছায়া যোগ করা যেতে পারে। গঙ্গা হ'ল আমার ভালবাসার নদী, তাকে বহুদিন ধরে ভালবেসে আসছি আর চিরদিন ভালবাসব।

ছেলেবেলায় হাওড়া পুলের উপর দিয়ে আসা যাওয়ার পথে অবাক বিস্ময়ে গঙ্গার দিকে বারে বারে চেয়েছি। এ যেন রূপকথার কোন যাদুকরের জানলা বা ম্যাজিকের স্ফটিক পাথর। মনে হ'ত আরব্য-উপন্যাসের উড়ন্ত গালচের মতো বিলাতে রপ্তানী করবার গঙ্গা যেন একটা উপায় মাত্র। তখন বয়েস বারো কি তেরো—কি করে জানি জীবনস্মৃতি আমার হাতে আসে। সত্যিকারের গঙ্গার সঙ্গে আমার নিবিড় নিকট পরিচয় রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে—সেই পেনিটির বাগান আর চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাঙলো থেকে।

**'গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার ভাটার আসা যাওয়া, কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গী, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অপসারণ সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণ বক্ষ সূর্যাস্ত কালের অজস্র স্বর্ণশোণিত-প্লাবন। এক-এক দিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে......।' (জীবনস্মৃতি)**

এবং

**'আবার সেই গঙ্গা। সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের কলধ্বনি-করুণ দিন রাত্রি এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেশন হইয়া থাকে আমার পক্ষে বাঙলা দেশের এই আকাশ-ভরা আলো, দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ—এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ঢালিয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।' (জীবনস্মৃতি)**

কবিগুরুর সুদীর্ঘ জীবনে প্রশংসাপত্র বিতরণের নিদারুণ বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছিল। কাউকে ব্যর্থ নমস্কারে প্রত্যাখ্যান করতে তাঁর সৌজন্য বোধে বাধত। কাজেই দরাজ হাতে প্রার্থীদের প্রশংসাবাণী বিতরণ করেছেন। কবির গঙ্গা-প্রীতি কিন্তু মামুলি প্রশংসাপত্রের অন্তর্গত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গঙ্গা-প্রীতির নামগন্ধ ছিল না, ছিল অকপট গঙ্গা ভক্তি ... বাড়াবাড়ি আর উচ্ছ্বাসের নিচে, ... দেখা যাবে হিন্দুর আজন্ম সংস্কার ... তোয়া ভাগীরথীর সঙ্গে আন-ভুবনের ... অধ্যাত্ম বন্ধন। মধু মধু হরির ... 'অন্তিমে গঙ্গা তরঙ্গ ভঙ্গার ভরঙ্গর ... এড়াবার জন্য, এ যেন 'গঙ্গা গঙ্গা' ... আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের গঙ্গা-প্রীতি ... শ্রদ্ধানন্দ নয়, নিছক sensuous ... প্রসূত। কবির উচ্চারিত কলকাতার ... সমান্তরাল গঙ্গা-প্রীতি উজান বেয়ে ... শিলাইদহের সবুজ নিসর্গের মধ্যে, ... যৌবনে পদ্মার সঙ্গে তাঁর মাখামাখি ... —সে তথ্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ... উঠেছে। তাঁর আবাল্যের ভালবাসা ... কলকাতার গঙ্গা। কবি কি নিজে বলেননি ... কখনো পশ্চিম বাঙলার গঙ্গায় নৌকা ... নিসর্গ শোভা দেখেনি, সে বাঙলার ... সৌন্দর্য দেখেনি বললেই চলে। ... যে লোকাতীত, শান্ত মধুর ও বিশ্রব্ধ ... নির্দেশ মেলে আর যা বহুলাংশে ... ওয়র্থধর্মী—তার সঙ্গে ভীষণ ভয়াল, ... ও হিংস্র পদ্মার সম্পর্ক কোথায়? ... লোচক বলেছেন, 'কবির প্রথম জীবন ... সোনারতরী যুগের প্রতীক হল পদ্মা, ... শেষ জীবনের প্রতীক হ'ল কোপাই। ... নিয়েও বলা চলে তাঁর চিরজীবনের ... আদর্শ ও সংযমের প্রতীক ও কষ্টি পাথর ... গঙ্গা। বিচিত্র বিস্তৃত বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্যে ... গানে, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে ... সশ্রদ্ধ প্রীতির সঙ্গে গঙ্গার নামোল্লেখ রবীন্দ্রনাথ বারে বারে করেছেন।

বন্যা-মিতার প্রেমের ইতিকথায় মানসী

দীপক মহল তোলার কথা ছিল। মনে রাখা দরকার সে অ-রচিত স্বপ্নপ্রাসাদ গঙ্গার কিনারায় 'ডায়মণ্ড হারবারের ঐ দিকটাতে' কবিকল্পনার 'ব্লুপ্রিণ্টে' সমাহিত। রোমান্সের পরমহংস অমিতের রোমাণ্টিক জবানীতেই শোনা যাক :

'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গঙ্গার ধার; পাড়ির নিচে তলা থেকে উঠেছে ঝুরিনামা অতি পুরোনো বট গাছ। বনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়ত এই বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওর দক্ষিণ ধারে শ্যাংলাপড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু ধসে যাওয়া সেই ঘাটে সবুজে সাদায় রঙ-করা আমাদের নৌকোখানি।......সন্ধ্যা তারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝির্‌ঝির্ করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদীঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ, তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়। ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধ্যাবেলার রঙটা কী।' (শেষের কবিতা)

কবি নিজেই কবুল করেছেন, তাঁর চন্দননগরের গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করে ভেসে যেত। আর সেই বৈঠকখানা ঘরের রঙিন কাঁচ বসানো শার্সির ছবি দুটি :

'একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা, সেই দোলায় রৌদ্রছায়া—খচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে; আর একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গ প্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসব বেশে সজ্জিত নরনারী কেহ-বা উঠিতেছে কেহ-বা নামিতেছে। শার্সির উপর আলো পড়িত এবং ছবিগুলি বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গা তীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূর দেশের কোন্ দূর-কালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝলমল করিয়া মেলিয়া দিত এবং কোথাকার কোন্ একটি চির-নিভৃত ছায়ায় যুগল দোলনের রসমাধুর্য নদী-তীরের বন শ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।' (জীবনস্মৃতি)

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ দুজনেই কলকাতার বনেদি বাসিন্দা, দুজনে কেবল কলকাতার গঙ্গার ভক্ত নন, নামকরা চ্যাম্পিয়নও। তবুও এই দুই অতিমানবের গঙ্গা সম্পৃক্ত দৃষ্টিভংগি ও প্রতিন্যাস এক নয়। একমাত্র অবনীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ব্যতীত কোনো পূর্বসূরী গঙ্গার জন্য কেবল গঙ্গাকে ভালবেসেছেন কিনা আমার জানা নেই। বিবেকানন্দ শৈশব ও ছাত্রজীবনে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের আর দশজন ছেলের মতো কলকাতা শহর চষে বেড়িয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মতো বাধা আর নিষেধের ডোরে, তাঁর বালককাল অতিবাহিত হয়নি। ঠিক এই কারণে বিবেকানন্দের গঙ্গাসম্পৃক্ত চিন্তা বাস্তবাশ্রয়ী; রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক;

'আমাদের কর্দমাবিলা, হরগাত্র বিঘর্ষণ শুভ্রা, সহস্র পোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গার কি এক টান আছে তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে একি সম্বন্ধ! কুসংস্কার কি? হবে—গঙ্গা গঙ্গা করে জন্ম কাটায়, গঙ্গা জলে মরে, দূর-দূরান্তের লোক গংগা জল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন করে রাখে, পালপার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থ ব্যয় করে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপরে নিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জিবর, মাডাগাস্কার, সুয়েজ, এডেন, মাল্টা—সঙ্গে গংগাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা-গঙ্গা—হিন্দুর হিন্দুয়ানি।' (পরিব্রাজক)

'আর আমাদের গঙ্গার কিনারা, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ একটু কালো মেশান ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ীঢালা আম লিচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পাতা আর দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে দুলচে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্থানি গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়—'। (পরিব্রাজক)

বিবেকানন্দের মতো 'আমাদের কর্দমাবিলা, হরগাত্র বিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গার কি এক টানে' রবীন্দ্রনাথ কখনো আটকা পড়েননি। অতীতের মুছে যাওয়া কলকাতা আর প্রাক-শিল্প যুগের কলকাতার গংগা ও গংগার ধার ইংরেজি বেনেতি সভ্যতার 'লাভ লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত' হয়ে 'তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রীজের বেড়ি' পরেনি এমন গংগা ও গঙ্গার ধার তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ছিল। আর কবি সত্যিই মনে করতেন 'নদী তখন বহুদূর হিমালয়ের নির্জন গিরি-শৃঙ্গ হইতে কলিকাতার ধুলিলিপ্ত বাস্ততার মাঝখানে শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিত।' (গোরা) বিবেকানন্দ কিন্তু কাকচক্ষু গঙ্গোত্রীর টলটলে জলের চেয়ে কলকাতার ঘোলা গংগার জল পছন্দ করেছেন, আর তার নাকি আকর্ষণ ভোলা মুশকিল।

কলকাতার গঙ্গার ধারের অবসর- ঘন ছায়া ও বিরাম, শোভা ও সৌন্দর্য, কলকারখানার দৌরাত্ম্যে দিন দিন নিঃশেষিত হয়ে একেবারে মুছে যেতে বসেছে— এ নিদারুণ দুঃখ রবীন্দ্রনাথকে নিরন্তর পীড়িত করত। পুরানো দিনের গঙ্গার সঙ্গে কবির ছিল আন্তরিক সৌহার্দ-বন্ধন। বল্ডুইন, (অবাঞ্ছিত জনতার লোলুপ-দৃষ্টি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে) হাইড পার্কের পাখি ও ডাউনিঙ স্ট্রিটের প্রধান মন্ত্রীর জন্য একদা sanctuary তুলতে চেয়েছিলেন। কবির হাতে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা থাক নিশ্চয়ই আইন গড়ে নিরস্ত করতেন, য করে দেশী ও বিদেশী মুনাফাখোর কলওয়া নাকতোলা চিমনি গঙ্গার পাখিডাকা, ছায়া আকাশকে কলঙ্কিত না করে তোলে।

'বিলাতি সওদাগারির ছোঁওয়া লেগে গঙ্গার তখনো জাত খোয়ায়নি। মুখড়ে বসানি তার ধারে পাখির বাসা, আকাশের আলোয় লোহার শুঁড়গুলো কষে দেয়নি কালো নিশ্বাস'।

(ছেলেবে

কিংবা

'প্রকৃতির সঙ্গে কলকাতার মিলনের বন্ধন ছিল গঙ্গা। ওই গঙ্গার ধারাই সু বার্তাকে সুদূর রহস্যের অভিমুখে বয়ে নিয়ে খোলা পথ ছিল। শহরের এই একটি জানলা যেখানে মুখ বাড়ালে বোঝা যেত, জগৎটা লোকালয়ের মধ্যেই বন্ধ নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক মাহাত্ম্য আর রইল না......'। (পথের

গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমার অপমৃত্যু সম্ একা রবীন্দ্রনাথ নন, বিবেকানন্দ অবনীন্দ্রনাথও সচেতন ছিলেন।

'বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি পারে আপনি মরে অনাহারে? হুঁ, বলি—এ গঙ্গামায়ের শোভা যা দেখবার দেখে নাও, একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য দানবের পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় ইঁটের পাঁজা, আর নাববেন ইঁটখোলার গর্ত

(পরি

অবনীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংক্ষেপে চমকলাগানো উপমার সাহায্যে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাকে আর তিনি পেলেন না, কোথায় গেল তার সেই রূপ

'মনে হ'ল কে যেন গঙ্গার ছ সেখানে বিচ্ছিরি একটা ছিটের কাপড় দিয়েছি'। (জোড়াসাঁকো

অবনীন্দ্রনাথ, জোড়াসাঁকোর ধারে তুলি আঁকা কলমে গঙ্গার আলোছায়া যে নিখুঁৎ রসনিষ্ঠ ছবি, এঁকেছেন, সাহিত্যে তার জুড়ি নেই। তাঁর স্টিমার ভ্রমণের অপূর্ব বিবরণ আর যাত্রী ক্লাবের জমাটি আসর, হৈ-হুল্লোড় গান নানাদিনের পিকনিকের সুরভিত ফিকে গন্ধের মতো মনকে বিমনা করে সে মন মাতানো আড্ডার সুরই আল আড্ডা সর্বজনীন হয়েও, আভিজাত্যিক।

'ছেলেবেলায় কোন্নগরের বাগানে দেখতুম—দুকূল ছাপিয়ে গঙ্গা ভরে উঠেছে কূল, ধ্বনিতে ভরে চলেছে; সে ধ্বনি শুনতে পেতুম। ঘাটের কাছে বসে আছি, শুনছি তার সুর, কুলকুল, ঝুপ, ঝুপ—আর চোখে দেখছি তার শোভা-শোভা, সেই ভরা গঙ্গার বুকে ভরা পালে জেলে নৌকো, ডিঙি নৌকো। রাত্তিরবেলা সারি নৌকোর নানারকম আলো পড়েছে জলের আলো ঝিলমিল করতে করতে আলোর সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলত। কোনো

নাচ গান হচ্ছে, কোনো নৌকোয় রান্নার কালো হাঁড়ি চেপেছে, দূরে থেকে দেখা যেত আগুনের শিখা।

(জোড়াসাঁকোর ধারে)

পরিণত বয়সে, শক্ত অসুখ থেকে ভুগে ওঠার পর অবনীন্দ্রনাথকে ডাক্তার হাওয়াবদলের জন্যে গঙ্গার হাওয়া খাবার ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। ভোর ছটায় জগন্নাথ ঘাট থেকে শিবতলা ঘাট হয়ে নটা সাড়ে নটায় বেড়িয়ে বাড়ি ফিরতেন। তাঁর সখের হাওয়াখোর ডেলি প্যাসেঞ্জারি একনাগাড়ে বহুদিন চলেছিল। গঙ্গার বারোমাসী রূপ আসপাশের নিসর্গ, লোকালয়, স্টিমারের যাত্রী, লোকজন—তাঁর ছবিলেখা মনের পাতায় অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে।

'সেই দেখেছি সেবারে গঙ্গার রূপ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত কোনো ঋতুই বাদ দিইনি; সব ঋতুতেই মা গঙ্গাকে দেখেছি। এই বর্ষাকালে দু কূল ছাপিয়ে জল উঠছে গঙ্গার—লাল টকটকে জলের রং......তার উপরে গোলাপী পালতোলা ইলিশ মাছের নৌকো এদিকে ওদিকে দলে দলে বেড়াচ্ছে, সে কি সুন্দর। তারপর শীতকালে বসেআছি ঢেকে গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে, উত্তুরে হাওয়া মুখের উপর দিয়ে কানের পাশ ঘেঁষে চলেছে হু হু করে। সামনে ঘন কুয়াশা, তাই ভেদ করে স্টিমার চলেছে একটানা। সামনে কিছুই দেখা যায় না। মনে হত যেন পুরাকালের ভিতর দিয়ে নতুন যুগ চলছে কোন্ রহস্য উদ্ঘাটন করতে। থেকে থেকে হঠাৎ একটি দুটি নৌকো সেই ঘন কুয়াশার ভিতর থেকে স্বপ্নের মত বেরিয়ে আসত।

'দেখেছি গঙ্গার অনেক রূপই দেখেছি। তাইতো বলি, আজকাল ভারতীয় শিল্পী বলে নিজেকে যারা পরিচয় দেয় ভারতীয় তারা কোন্-খানটায়? ভারতের আসল রূপটি তারা ধরল কই? তাদের শিল্পে ভারতস্থান পায়নি মোটেই। কারণ তারা ভারতকে দেখতে শেখেনি, দেখেনি। আমি অতি জোরের সঙ্গেই বলছি। আমি দেখেছি, নানা রূপে মা গঙ্গাকে দেখেছি। তাইতো ব্যথা বাজে, যখন দেখি কি জিনিস এরা হারায়। কত ভালো লাগত, কত আনন্দ পেয়েছি গঙ্গার বুকে। একদিনও বাদ দিইনি, আরো দেখবার, ভালো করে দেখবার এত প্রবল ইচ্ছে থাকত প্রাণে। গঙ্গার সে বয়সে কত হৈ চৈ না করতুম।......স্টিমার চলেছে খেয়া থেকে যাত্রী তুলে নিয়ে। সামনে চর যেন—এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মাঝখানে চর তার মাঝে বসে আছে শিবু সদাগর। ওপাশের ঘাটে একটি ডিঙি নৌকো। ছোট্ট গ্রামের ছায়া পড়েছে, ঘাটে ডিঙিনৌকোয় ছোট্টো একটি বউ লালচেলি পরে বসে—শ্বশুরবাড়ি যাবে......। সে যে কি সুন্দর দৃশ্য, কি বলব তোমায়। মনের ভিতর আঁকা হয়ে রইল সেদিনের সেই ছবি, আজও আছে ঠিক তেমনিটিই!' (জোড়াসাঁকোর ধারে)

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ আর অবনীন্দ্রনাথের বহুবিজ্ঞাপিত সাধের গঙ্গা আজও সারা বাঙলা আর কলকাতার বাঙালীর কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় নয়। ধার্মিক অন্ধ বিশ্বাসে পালপার্বণে গঙ্গায় ডুব দেওয়াটাই গঙ্গা প্রীতির চরম নমুনা নয়। সংস্কার মুক্ত হয়ে গঙ্গাকে ভালবাসতে আজও আমরা শিখিনি। ধূসর নাগরিকতার স্থূল হস্তাবলেপের ঊর্ধ্বে এই বিরাট জলপ্রবাহ—এর সঙ্গে কি সত্যিই আমরা যুক্ত? মানি স্বাধীনতা সর্বজ্বর হর, জানি সম্পূর্ণ আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা না এলে, দেশের লোকের মনের চোখ অলকার সৌন্দর্য-কমল আর রঙ্ছুট ময়ূরীর দিকে যাবে না। এলা বেলা রেবা কিংবা লিলির ভালবাসায় পড়ে একদা বিষম যৌবনকালে আমি আপনি কিম্বা আরো অনেকে সফল বিফল বা বানচাল হয়েছেন, কিন্তু কোনো মেয়ে কি কোনোদিন বলেছেঃ 'হমারা নারা জয়হিন্দ; হিন্দুস্থানের প্রতিটি লোকের অন্নসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রেম মুলতুবী রইল। রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি মরণ-বাঁচন নীতির সাংঘাতিক নাগপাশে সারা দেশটা বাঁধা, কাজের কাজ ছাড়া, আমাদের সাময়িকী আর সংবাদপত্রের জগতে অরাজনীতিক কোনো তথ্য বা তত্ত্ব একান্ত-করেই অনুপস্থিত; সেই কারণে গঙ্গার গৈরিক জলধারা, শরৎকালের রঙিন নক্সাকাটা মেঘ আর গঙ্গার চরের নবীন কাশের গুচ্ছের খবর কে দেবে? অথচ জনমত গঠনের চেয়ে, মানুষের সৌন্দর্যবুদ্ধি গঠন কোনো ক্রমেই নিচু কদরের কাজ নয়। বিলেতের 'টাইমস'এর চতুর্থ সম্পাদকীয় প্রতিদিন এইজাতীয় 'হ'ক ফুল হ'ক তাহা গান' মার্কা Informal বিষয় নিয়ে লেখা হয়। "ভারত বন্ধু" স্টেটস্ম্যানের দেশ-দ্রোহিতার লম্বা ফিরিস্তি অস্বীকার করি না, কিন্তু এ কথাও স্বীকার করা প্রয়োজন বাঙলার গাছপালা, ফুল ফল, মাছ পাখী আর বিশেষ করে কলকাতার নিসর্গ আর পুরোনো কলকাতার তুচ্ছ খবর সম্পর্কে সামান্য যা তাঁরা পরিবেশন করেছেন—ভারতীয় সাংবাদিকতায় তা আজও অনতিক্রান্ত।

আমরা ধর্ম কুড়তে যাই দক্ষিণেশ্বরে, যাই বোটানিক্সে পিক্নিক্ করতে, আর বোধকরি বেচারা মন ধর্ম, তাসপাশা, গানবাজনা আর পোলাও কালিয়াতে এমন ব্যস্ত থাকে, তার বাইরে সে কিছুই দেখতে চায় না বা পায় না। গল্পের কোনো বুড়ি দক্ষিণেশ্বরের ... দেখার পর টাকি-শ্রীপুরের কথা ভাষায় ... করেছিল : হ্যাদে রামকৃষ্ণ ক'নে? আমাদের অবস্থাও অনেকটা ঐ রকম। গঙ্গাকে ভাল-বাসতে হলে কেবল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নয়, সেকালের কলকাতা আর সেকালের ইংরেজ ও বাঙালীর ইতিহাস জানতে হবে। কর্পোরেশন ও স্থানীয় স্টিমার কোম্পানী ইচ্ছা করলে গঙ্গা ভ্রমণের সুবিধা ঘটিয়ে, নানারকমের সচিত্র পুস্তিকা ও লোভনীয় বিজ্ঞাপনীতে কলকাতার গঙ্গাকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারেন শহরের জনারণ্যে, পথের ধারে আলোকোজ্জ্বল কিয়স্কের গায় রমণীয়া গঙ্গার নয়নলোভন আলোকচিত্রের নীচে যদি লেখা থাকে : ছুটির একটি ঝলমলে দিন রাজগঞ্জে অতিবাহিত করুন। —যান বা না যান, কেবল বিজ্ঞাপন দেখে কি আপনার চোখ খুশির আলোয় ... ওঠে না? সূর্যমুখীর পিঠালয় ... পেনিটির ছাতুবাবুর বাগানবাড়ি, ... সাহেবের কুঠি চন্দননগর—সেই ... রাজকীয় রহস্য আর গঙ্গায় বিলাস ... একটি বিশাল সাম্রাজ্য পতনের মতই, ... বিষাদে, অনুশোচনায় হৃদয়গ্রাহী। গঙ্গার দুপারের আলালী স্মৃতিবহ 'ভদ্রকেলো' ... প্রমোদ ও বাচ খেলা, বারমাস আর ... পার্বণ, জলের ধারের বাসিন্দাদের সুখদুঃখের কাহিনী আর ভাবনা- কোনো বাঙালী চিত্রে নিপুণ তুলিতে কি কথা কয়ে উঠবে না? আঁকবে না কেউ সেই করুণ ও হাস্যকর নিরুপায় ঠকচাচার 'পুলিপোলাও' ... ছবি : মোর বড় ডর তেনা বি পোল্ট সাদি করে।

# প্রিয়া যবে পাশে

টমাস বার্ক

[ইংরেজ] লেখক টমাস বার্কের একটি গল্পের [অনুবাদ]। [তাঁ]র লেখার বিশেষত্ব অতি সহজ সাধারণ [ঘটনাকে] অসাধারণ রূপ দেবার কৌশলটি। মানব-[মনের] [অন্তর]লোকের স্বাভাবিক তত্ত্বটি এই সামান্য [গল্পে] [অস]ামান্য হয়ে উঠেছে।]

রা[স্তা]য় চলতে চলতে নজরে পড়ে সাধারণ একটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটা সাধারণ ও [ছ]বিও এবং সে চিত্রটিকে অসাধারণই বলা চলে। বিজ্ঞাপনটি কোনো একটা সিগারেট কোম্পানীর—আর ছবিটি কোনও অপরূপ [প্রা]চীন দেশের মেয়ে হয়তো।

লোকটি চেয়ে থাকে সেই দিকে, ভুলে যায় সিগারেট কেনার কথা। তাকিয়ে থাকে চোখ [মে]লে আর মন পেতে নিশ্চল, নিথর হয়ে। হঠাৎ খেয়াল হয় যে ছবিটি আঁকা নয়, সেটা [জীবন্ত] নারীর সজীব প্রতিকৃতি। জগতের [কোথাও] এ মেয়েটি নিশ্চয়ই নিজের রূপে [পৃথিবী] আলো করে আছে। লোকটি যুবক, [কিন্তু] [ভু]গে পেয়েছে বহুদিন জেলে থাকবার [ফলে] শরীর সুস্থ নয়, তাই কোনো জায়গায় [চাক]রি পেয়েছে না। তবু হপ্তায় একবার [থা]নায় [গিয়ে] হাজিরা দিয়ে আসতে হয়। [কারণ] সে এখন নজরবন্দী।

[সমাজের] ওপরও এখন সে শ্রদ্ধা হারিয়ে [ফেলেছে]। [ভাবতে] তার অবাক লাগে। নিজে [সে] [কোনো] কারণ খুঁজে পায় না। ঐ ছবিটার [মধ্যে] কি এক প্রাণের প্রাচুর্য রয়েছে, কি [এক] অজানা যাদু আছে যা তার নৈরাশ্যভরা [জীবনের] রিক্ততা সরিয়ে অগাধ বাসনার [জোয়ার] জাগিয়ে তোলে!

[সে] ভেবে পায় না। জগৎ যে এত মাধুর্য-[ময়], জীবন যে এত লোভনীয়, সৌন্দর্য যে এত [নিবিড়] [জা]নো হয় এটা এমন করে আর সে [আগে] নিই ভাবতে পারেনি। তার মলিন [জীবনের] [দিন]গুলোর ওপর কি যেন এক মহিমার [আলো] এসে পড়ে। তার নিরালম্ব একাকিত্ব [ভরে] ওঠে আশার রশ্মিতে।

[সে]দিনের ঘটনা। একখানি দৈনিক আর [একখা]নি সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতায় সেই [ছবি] [সমেত] বিজ্ঞাপনটি দেখতে পেয়ে ছবিটা [কেটে] [রাখে] সে দুখানি কাগজ থেকেই। [দেয়া]লে পিন দিয়ে এঁটে রেখে দেয় নিজের [ঘরের] [ভিত]রে চোখের সামনে, অনবরত যেখানে [আনাগো]না করতে হয় সেইখানে। মনে তার [জাগে] আনন্দের জোয়ার!

[ভাবতে] ভাবতে এক সময় নিজেকে বিশ্লেষণ [ক]রে সে দেখতে পায় ঐ লাবণ্যময়ী নারীর [কা]ম[না]ই তার সংগোপন মনের একান্ত কামনা। কিন্তু এ কামনা দুনিয়ার থেকে যে কি করে মিটতে পারে কি ভাবে যে ঐ অচেনা নাম না-জানা সুন্দরীর সামনা-সামনি গিয়ে পৌছনো যেতে পারে তা তার আচ্ছন্ন মনকে আন্দোলিত করে তুলল।

কল্পনার জাল বোনার মাঝখানে কখন সে হঠাৎ একটা পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে। সেই আবিষ্কারের পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে সে লিখলে একখানি চিঠি, সেই সিগারেট কোম্পানীর ঠিকানায়। তার মর্ম এই, তাঁদের বিজ্ঞাপনের ছবিটি দেখে মুগ্ধ হয়ে সে তার স্ত্রীর কয়েক-খানি ভালো ছবি তোলাতে চায় ঐ কোম্পানীর ফটোগ্রাফারকে দিয়ে। কাজেই যদি তাঁরা ঐ ভদ্রলোকটির ঠিকানাটা দয়া করে জানান, তবে সে বাধিত হয়......ইত্যাদি।

উত্তর এলো। তাতে লেখা, কোম্পানী তার চাওয়া ঠিকানা দিতে অনিচ্ছাকৃত ভাবেই অসমর্থ। কেননা তাঁরা এটা কিনেছিলেন নাম-করা বিজ্ঞাপন কোম্পানী স্লোগান এণ্ড এসোসিয়েটস এর কাছ থেকে। সেই ঠিকানায় চিঠি দিয়ে দেখবার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা, হয়তো সেই কোম্পানী তার চাওয়া আলোক-চিত্রশিল্পীর ঠিকানা জানাতে পারে।

এবারে চিঠি গেলো বিজ্ঞাপন কোম্পানীর কাছে। দীর্ঘ কোনো দিন নীরব থেকে তাঁরা উত্তরে জানালেন, আলোচ্য ছবিখানি ব্লাক ফ্রেয়ার্স রোড এর একজন সুদক্ষ চিত্র-শিল্পীর কাছ থেকে কেনা। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন সে গিয়ে হাজির হয় ব্লাক ফ্রেয়ার্স রোডে। খবর নিয়ে জানতে পারে, একজন গুণী শিল্পী সেখানে থাকতেন বটে আগে, তবে বর্তমানে তিনি খুব সম্ভবতঃ ক্যামডেন টাউনে বাস করছেন। আবার নতুন ঠিকানা খুঁজে যেতে যেতে সেদিন সন্ধ্যাটা কেটে যায়। চিত্রকর সুদক্ষই বটে, তিনি এক নামজাদা থিয়েটারে ছবি আঁকার কাজ করেন। নাম তাঁর ফ্রেডরিক। মুচকি হেসে তিনি বলে উঠলেন, এইবার দেখছি তুমি আমায় ফেলেছো গ্রীম। কোথায় খুঁজে পাবো তাকে? ওটা তুলেছিলুম বহুদিন আগে। আমার এক শহুরে বন্ধু মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এখন সে কোথায় তা কে জানে? তবে একটা ঠিকানা তোমায় দিতে পারি। যে সময়ের কথা তখন সে থাকত কেনসিংটনে—৮১নং প্রিমরোজ রোড-এ। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী রূপসী, ভারী চমৎকার! মুখখানাতে সব সময়ই যেন হাসিটি লেগে আছে। হয়ত এখনো ঐ ঠিকানাতেই আছে। দেখ, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! তার নাম আইরিশ লোন।

আশায় মেতে ওঠে সে। এতখানি এসে যেন সব মাটি হয়ে না যায়, তীরে এসে তরী না ডোবে! এই একটিমাত্র তার ভাবনা। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। মেয়েদের চেয়েও বেশি পোষাকের বাহুল্যে সর্বাঙ্গ মুড়ে সে আশায় আনন্দে যাত্রা শুরু করে। আপাদমস্তকে সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনের মুন্সিয়ানা ফুটে বেরুচ্ছে। নজরবন্দী জেল ফেরৎ বলে চিনে ফেলার জোটি নেই!

কেনসিংটনের ঠিকানায় পৌঁছে দরজায় ধাক্কা দিতেই বেরিয়ে এলেন একজন সৌম্য-দর্শনা যুবতী। মিস্ আইরিশ লোনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, তারা মায়ে-ঝিয়ে এখানেই থাকত বটে, কিন্তু বছরখানেক হল তারা উঠে গেছে এখান থেকে।

কোথায় গেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন যে সে সব খবর তিনি কিছু রাখেন না। অত্যধিক পীড়াপীড়ি করাতে শেষকালে বললেন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় আইরিশ লোনের নামে টাকা জমা আছে, কাজেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ত তাঁদের বর্তমান ঠিকানা বললেও বলতে পারেন। গ্রীমের সন্দেহ যায় না। তবে কি ইনিই মিস লোন, আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করছেন? সাত পাঁচ ভেবে সেদিনকার মত সে বিদায় নিলে।

ম্যানেজার ঠিকানা জানতেন কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে সে ঠিকানা জানানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এক কথায় জবাব।

আবার হানা দিতেই হোল কেনসিংটনে। ভদ্রতার খাতিরে এড়াতে না পেরে মহিলাটি ভয় ভয় করে হাতড়ে জানালেন, মিস লোন তাঁর সব কাঠকাঠরার জিনিসপত্তর চালান দিয়ে-ছিলেন কোন অজানা জায়গায়। যে কোম্পানী সেই চালান দেওয়ার কাজের ভার নিয়েছিলো তাদের খুঁজে পাওয়া যেতে পারে অলিম্পিয়ার কাছাকাছি কোনও একটা রাস্তায়। সেখানে গিয়ে গ্রীম পরিচয় দেয় নিজেকে লোন পরিবারের আত্মীয় বলে। তার অনুরোধে কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত লোকেরা কিন্তুর নথি-পত্তর ঘেঁটে ঘেঁটে মিনিট কুড়ি পরে সেই একান্ত দরকারী ঠিকানাটি টেনে বের করলেন। তাঁরা আরও জানালেন, লোন পরিবারের লোকেরা ঐ ঠিকানা থেকে কেনসিংটনে প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন।

—ঐ ঠিকানা মানে? কোনখানে? জিজ্ঞেস করে গ্রীম।

—এই যে এই ঠিকানা থেকে। বলে তাঁরা কাগজখানা তুলে ধরেন ওর চোখের সামনে।

আনন্দের আবেগে সে দেখতেই ভুলে যায় সেই কাগজখানা। চমক ভাঙতেই সে একটিবার দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, এ কি! ১৬ নম্বর জেসমিন টেরেস, পপলার! আরে আমার ঠিকানা যে ২২ নম্বর! এই বলেই হঠাৎ থেমে গিয়ে হা হা করে হাসির তুফান তুলে উদভ্রান্তের মত পথে নেমে পড়ে।

জানা গিয়েছিলো এর পর আর সে লোনের সৌন্দর্য বলে কিছু খুঁজে পায়নি। তাঁকে বিবাহ করার পর সারা জীবন সে বিজ্ঞাপনের ছবির দিকে আগের মতই অপলক-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। ছবির আকর্ষণ কিন্তু ঠিক আগের মতই অনির্বচনীয় হয়েছিলো তার কাছে।

অনুবাদক—শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

# এপার ওপার

### পাঞ্চেন লামা

তিব্বতে বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান গুরু হলেন দালাই লামা। তিনি রাজধানী লাসার নিকটে পোটালাতে বাস করেন। তিব্বত ব্যতীত মঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধদের ওপরও তিনি প্রভাব বিস্তার করেন। দালাই লামা ব্যতীত আরও

এগারো বৎসর বয়স্ক তিব্বতের পাঞ্চেন লামা (মধ্যে) এবং তাঁর বামে লো সাং ইয়ান-জেন।

একজন ধর্মাধিকরণ আছেন, তাঁকে বলা হয় তাসী অথবা পাঞ্চেন লামা। এঁর আবাস স্থান সাধারণত উত্তর পশ্চিম চীনে। এঁর নির্দিষ্ট এলাকায় এঁর ক্ষমতা দালাই লামার সমান। তবে দালাই লামার ক্ষমতাধীন এলাকা আরও বেশী। বর্তমান পাঞ্চেন লামার বয়স মাত্র এগারো, তিনি উত্তর-পশ্চিম চীনের কুমবুম মঠে বাস করেন। বর্তমানে কোনো কারণে তিনি নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। তাঁর একজন পরামর্শ-দাতা আছে, নাম লো সাং ইয়ান-জেন, ৭৩ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ।

### শিল্পী

উইনস্টন চার্চিল কি ছিলেন না? তিনি একদা সংবাদপত্রের রিপোর্টার ছিলেন, জেলের পাঁচীল টপকে সমুদ্রে সাঁতার কেটে জাহাজে উঠে পালিয়েছেন, বক্সিং লড়েছেন, কবে যেন ঘোড়দৌড়ের বাজীও মাৎ করেছেন, লেখক ত' বটেই এবং আর কি কি গুণ আছে কে জানে? দেখা যাচ্ছে তিনি বেঞ্জামীন ফ্রাঙ্কলীনের এক-জন প্রতিদ্বন্দ্বী। কিছুদিন পূর্বে বিলাতে রয়েল একাডেমীর অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে তাঁর অঙ্কিত তিনখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে এবং গত ২৩শে এপ্রিল তাঁকে রয়েল একাডেমীর বিশেষ সভ্য নির্বাচিত করে নেওয়া হয়েছে। এখানে তাঁর অঙ্কিত যে ছবিখানির প্রতিলিপি দেওয়া হ'ল সেটি বিখ্যাত ব্লেনহিমের যুদ্ধের একটি দৃশ্য। এই যুদ্ধ চার্চিল সাহেবের পূর্ব-পুরুষ ডিউক অফ মার্লবরো পরিচালনা করেছিলেন। ডিউক অফ মার্লবরোকে বলা হয় ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সৈনিক। চার্চিল সাহেব ডিউক অফ মার্লবরোর একখানি জীবনীও রচনা করেছেন।

উইনস্টন চার্চিল অঙ্কিত ছবির প্রতিলিপি, ব্লেনহিম যুদ্ধের দৃশ্য

### সর্বংসহা বালিকা

এক বৎসর বয়স্ক বালিকা বারবারা স্মিথের কোনো বেদনা বা ব্যথা অনুভূত হয় না। তার গায়ে ছুঁচ ফুটলেও সে বুঝতে পারে না। একদা সে গরম চুল্লীর ওপর হাত দিয়ে ফেলে-ছিল, কিন্তু তার মা বলেন যে, কেঁদে ওঠা

সর্বংসহা শিশু বারবারা ও তার নার্স

দূরের কথা বারবারা হাসতে থাকে। তখন থেকেই তার এই অদ্ভুত সহনশীলতার কথা জানতে পারা যায়। বর্তমানে সে একটি হাস-পাতালে পরীক্ষাধীন আছে। ডাক্তারেরা বলেন তার কোনো অসুখ নেই এবং তার এই অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মগত।

# ফাঁদ

## ..শ্রী প্রদ্যোৎ গুহ....

কলকাতার আকাশে চাঁদ উঠ্‌লো—জ্যামিতিক বৃত্তের মত নিখুঁত গোল চাঁদ। কেমন একটা ঝিরঝিরে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অপ্রাকৃত দেখাল বণিকপুরী।

জন-বিরল হয়ে এসেছে এদিকটা—এখন আর ঘন ঘন ট্রাম আসছে না। এ অফিস, সে অফিস করে সারাদিন ঘুরেছে অমর, আর পারা যাচ্ছে না। বসে পড়তে ইচ্ছে করছে কোথাও। খিদেয় পেট জ্বল্‌ছে।

গুণে গুণে ছ'টি পয়সা আছে পকেটে। দু'পয়সা দামের একটা সিগারেট ধরিয়ে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ে বসবে, না এক কাপ চা খেয়ে হেঁটে যাবে—কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না। উদ্দেশ্যহীনভাবে সারা ডালহৌসী স্কোয়ারটাকে একবার চক্কর দিল অমর।

এক কাপ চা খেয়ে নিলে খিদেটা চাপা পড়ে, কিন্তু তাহলে হাঁটতে হয় পাকা দেড় মাইল পথ। চা খেলে যখন হাঁটতে হয়, তখন খিদের প্রশ্নটা বাতিল করে দেওয়াই উচিত। একটা ট্রাম আসছে। এগিয়ে এলো অমর। কিন্তু না, কালীঘাটের ট্রাম।

নোটিশের বদলে এক মাসের মাইনে পেয়েছিল—তারপর দেড় মাস হতে চললো বেকার।

বাড়ি ফিরলেই মা এসে দাঁড়াবেন উদগ্র প্রত্যাশা নিয়ে। জিজ্ঞাসা করবেন: কিছু হল?

বোন গৌরীও এসে দাঁড়াবে। দিন দিন বেড়ে-ফুলে ধাড়ী হয়ে উঠছে মেয়েটা। দেখলেই গা জ্বলা করতে থাকে। গলা টিপে দিতে ইচ্ছে করে এক এক সময়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বলা হয় না—কেমন একটা অসহায় গরুর মত চোখ মেলে তাকায়, যে মায়া হয়। ওর চোখ দুটো যেন বলতে চায়—আমায় মের না দাদা, আমার কোন দোষ নেই। কিন্তু দোষ যে কারো একটা থাকা চাই!

কিন্তু ট্রাম আসছে না। খিদেটা যখন বাতিল করে দেওয়া গেছে, তখন হেঁটে গেলেই বা কেমন হয়। খিদেটা চনচনিয়ে উঠলে মনে করা যাবে ট্রামে চড়েছি, আর পা টন টন করলে মনে করা যাবে চা খেয়েছি—মনে মনে ভাবল অমর। কেমন খুশী হয়ে উঠলো অমর। ভাল বুদ্ধি বাৎলান গেছে। মাত্র ছ'টিই পয়সা আছে, আর তা খরচ করা উচিত নয়। মা'র কাছে আর হাত পাতা চলে না।

কই কিছুই ত খেলে না, মিষ্টি করে অনুযোগ দিল মিলি।

বারে এত অনেক খেলাম, বিপন্নভাবে বলে সুব্রত।

খুব খেয়েছ, একখানা সিঙ্গাড়া আর একটা চপের অর্ধেক। এ সব আমার নিজের হাতের তৈরী।

তাতো বুঝলাম, কিন্তু আমার পেটটা তো আগ্নেয়গিরি নয়।

আচ্ছা, ঐ সন্দেশটা খাও তাহলে—

কাঁদ কাঁদ মুখে অর্ধেকটা সন্দেশ ভেঙে মুখে পুরে দিল সুব্রত। তারপর এক-ঢোক জল খেয়ে বললো:

তোমার কথাও থাকল, আমার কথাও থাকল—এই অর্ধেকটা খেলাম। দোহাই তোমার, আর যেন পীড়াপীড়ি ক'র না। এবারে চল বেরোই।

কোন্‌দিকে যাবে?

চলই না।

দাঁড়াও, আসছি।

একটা ছন্দোময় ভংগীতে ভেতরে চলে এলো মিলি। লাইফ সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, শাড়ীর ভাঁজগুলো ঠিক করে নিল। ছোট্ট রুমালটি দিয়ে আলতো করে মুছে নিল কপালের ওপর জমে ওঠা মুক্তা-শুভ্র স্বেদ বিন্দু। তারপর পাউডারের পাফটা মুখে, গলায়, ঘাড়ে বুলিয়ে নিল একবার। রেডি।

ওদের নিউ মডেলের বুইকটা ছুটে চল্‌লো এসপ্লানেডের দিকে।

অনামনস্কভাবে হাঁটতে গিয়ে কার্জন পার্কে এসে পড়েছে অমর। সোজা বৌবাজার ধরলে হাঁটুনী বাঁচত। আকাশে চাঁদটাকে দেখাচ্ছে একটা অমলেটের মত। কেমন একটা ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নার ঝিলমিলি। এক ঝাঁক সাদা মৌসুমী ফুল ফুটে আছে একদিকে—যেন ভাল বালাম চালের একথালা ঝুরঝুরে ভাত। মনটা কেমন বিষিয়ে উঠছে। ইচ্ছে করছে সযত্নে রচিত সিজ্‌ন ফ্লাওয়ারের কেয়ারীগুলো লণ্ড-ভণ্ড করে দেয়।

কিন্তু ছ'টা পয়সা বাঁচিয়েই বা কি লাভ বড় জোর আর একদিন চল্‌বে, তারপর সেই মায়ের কাছেই ত' হাত পাততে হবে। চাল ফুরিয়েছে—রেশনও আনতে হবে। সুতরা টাকা ধার করতেই হবে। অতীন জানে চাকরী গেছে, ওর কাছে ধার পাওয়া যাবে না বিমল, রমেন, সুরেশও জানে, জানে না একমাত্র সুধাংশু। সুধাংশুর কাছেই হাত পাতা যেতে পারে। এখন সুধাংশুকে পাওয়া যাবে জগুবাবুর বাজার—পা চালিয়ে গেলে আর কতক্ষণ লাগবে। গৌরী সম্পর্কে একটু দুর্বলতা ছিল সুধাংশুর। বললেই হবে—গৌরীর খুব অসুখ। সুধাংশু বিমুখ করবে না নিশ্চয়ই। ছ'পয়সা নিয়ে বরং এক কাপ চা-ই খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ট্রামে গেলে তাড়াতাড়ি সুধাংশুর সঙ্গে কারবারট মিটিয়ে ফেলে আসবার সময় চা খেয়ে নেওয়া যাবে।

পেটের মধ্যাকার জ্বালাটা এতক্ষণে যেন একটু কম পড়েছে। চাঁদের ওপর এসে পড়েছে সাদা একখণ্ড মেঘ। হাসি পেল অমরের, এ নিয়ে নাকি লোকে কবিতা লেখে। silly fools।

একরাশ ফুল নিয়ে সম্রাজ্ঞীর মত নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এল মিলি। মুগ্ধদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সুব্রত।

কি দেখছো?

দেখছি কে বেশী সুন্দর, ফুলগুলি না মিলিরাণী!

যা কি যে বলো, গালে টোল ফেলে একটা অপরূপ ভংগীতে হাসল মিলি। তারপর চোখ পড়ল আকাশের দিকে। বাঃ কি চমৎকার চাঁদ উঠেছে দেখেছো?

সত্যি, অপরূপ। আমার সেই কবিতাটা মনে পড়ছে

Tender is the night
And happy the queen moon is on her throne.

আবেগে বুজে আসা গলায় মিলি বলল—চল রেডরোড ধরে চলে যাই যে দিকে খুশি

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে একটা পাক খেয়ে ময়দানের রাস্তা ধরল বুইকখানা।

সত্যি অপরূপ দেখাচ্ছে এসপ্লানেডকে। নীরব গ্যাসের আলোয় রচা কল্পলোক—মুগ্ধ হওয়া উচিত কিনা এক মুহূর্ত ভাবল অমর। চোখের সামনে দিয়ে একটা ট্রাম বেরিয়ে গেল। দূরে দেখা গেল একটি নারীমূর্তি। সামান্য একটা আটপৌড়ে শাড়ীতে রামধনু রঙা বিস্ময়। চলার ভংগীটা কেমন পরিচিত মনে হচ্ছে। সবিতা রায়, নীলিমা সান্যাল না লিলি মিত্র? সেই নাক উঁচু মেয়েটা? এগিয়ে আসছে এদিকে লিলি মিত্রই হবে।

কিন্তু এইবার গা ঢাকা দেওয়া দরকার। তখন চাকরী ছিল—লিলি মিত্রের নাক উ'চু পনাকে থোড়াই কেয়ার করত অমর। অবশ্য ভয়ও নেই বেশী। বদলী হওয়ার আগে অবধি একঘরে এক সংগে পাঁচ বছর কাজ করলো, তাই কোনদিন কথা বলোনি লিলি—আর আজতো অমর বেকার।

আরে, অমরবাবু না?

দেখে ফেলেছে লিলি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত অপ্রতিভ দেখায় অমরকে।

হ্যাঁ এইতো দাঁড়িয়ে আছি ট্রামের জন্য। তারপর আপনি কোথা থেকে?

এইতো বাড়ী ফিরবো আর কি। অল্প একটু হাসল লিলি। অপরূপ দেখাচ্ছে লিলি মিত্রকে। অমরের একেবারে গা ঘে'ষে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। ব্যাপার কি, লিলি যেন একটু প্রশ্রয় দিতে চাইছে অমরকে। তবে কি ওর সম্পর্কে একটু দুর্বলতা ছিল নাকি লিলি মিত্রের। যদি ওর কাছেই পাঁচটা টাকা ধার চাওয়া যায়?

ট্রাম আসছে না। শ্যামবাজারের ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলে অনবরত ভবানীপুরের ট্রাম আসবে, আর আজ ঠিক উল্টো।

কোন দিকে যাবেন? লিলি জিজ্ঞাসা করলো।

ভবানীপুর

তাহ'লে তো এক সংগেই যাওয়া যাবে।

লিলি মিত্রের হৃদয় দৌর্বল্য সম্পর্কে এতক্ষণে যেন নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে। টাকাটা এবার চেয়ে ফেললেই হয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করাটা বোধ হয় দৃষ্টিকটু দেখাবে। একটা ট্রাম আসছে। ট্রামে উঠেই পাড়া যাবে কথাটা।

আসুন, লেডীজ সীটের অর্ধাংশে অমরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল লিলি।

কণ্ডাক্টার এলে পয়সা বার করতে হবে—তাহ'লে ভদ্রতার খাতিরে লিলি নিশ্চয়ই পয়সাটা দিয়ে দেবে। পয়সা ক'টা বাঁচানই ভাল, কি জানি যদি ধার না পাওয়া যায়! ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার অব্দি হাঁটতে হবে তা হলে। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা ভাল দেখায় না। জ্যোৎস্না নিয়ে খানিকটা কাব্য করা যেতে পারে। তারপর আলাপটা একটু জমে উঠলে কোন এক ফাঁকে টাকার কথাটা পাড়া যাবে।

এক খণ্ড কালো মেঘে অর্ধেকটা চাঁদ ঢাকা পড়েছে।

তারপর কেমন আছেন? জিজ্ঞাসা করল লিলি। কতকাল পরে দেখা হল আপনার সংগে

এইত, কোন রকম, হাসি হাসি ভাব করল অমর।

স্পীডো মিটারেতে চল্লিশ থরো থরো—মিলির চূর্ণ কুন্তল এসে পড়ছে সুব্রতের চোখে মুখে। কেমন একটা বিহ্বল সুগন্ধ।

আজ আমার কি ইচ্ছে করছে জান?

কি? সুডৌল গ্রীবাটি বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল মিলি।

ইচ্ছে করছে মরে গিয়ে ম্যাগনোলিয়া হয়ে ফুটে উঠি।

যাও, কী যে বল।

কৃত্রিম ক্রোধে গম্ভীর দেখায় মিলিকে।

কোন রকমেই আলাপ এগোয় না। বারে বারে খেই হারিয়ে যায় কথার। কী একটা বলবে বলে যেন উস্‌খুস্‌ করে লিলি মিত্র।

ভারী চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে না?

এতক্ষণে ঠিক পথে আসছে আলোচনাটা—পুলকিত হয়ে ওঠে অমর। বলে: সত্যি চমৎকার

কিন্তু—কেমন ইতস্তত করছে লিলি। ততক্ষণ এলগিন রোড ছাড়িয়ে গেছে।

এইবার টাকার কথাটা বলে ফেলা দরকার মনে মনে ভাবল অমর। কিন্তু এখনও কথা শেষ করছে না লিলি। মেয়েগুলোর যে কি এক স্বভাব সাজিয়ে গুছিয়ে ছাড়া কোন কথা বলবে না। সোজা করে বললেই হয়—অমরবাবু, আপনাকে আমি ভালবাসি।

আমাদের মত লোকের কাব্য করা সাজে না—ততক্ষণে কীভাবে কথাটা বলবে ঠিক করে নিয়েছে লিলি মিত্র। এই ধরুণ মায়ের অসুখ—অথচ দুমাস চাকুরী নেই আমার।

এই কণ্ডাক্টার রোখো রোখো। হঠাৎ ব্যস্ত সমস্তভাবে উঠে পড়ল অমর—দেখেছেন কথায় কথায় স্টপেজটা পেরিয়ে এসেছি।

রাস্তায় নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অমর। আর একটু হলেই টাকা ধার চেয়ে ফেলেছিল মেয়েটা। সুধাংশুর বাড়ী যেতে এখনো হাঁটতে হবে কিছুটা। তা হোক।

আকাশে আধ বোজা চাঁদ ভেংচি কাটল।

# চোখ

**শ্রীকরুণাময় বসু**

মনে নেই কবে যেন দেখেছিনু কালো দুটি চোখ,
সে কোন সাগর দ্বীপে বহুদিন আগে, আহা তাই হোক।
যেখানে উঠেছে ঝড়, যেখানে বেজেছে বাঁশি,
যেখানে লতার ফুল কারে চেয়ে ওঠে নিশ্বাসি,—
সেখানে কি দেশ আছে, সেখানে কি আছে কোন দ্বীপ;
পথচেয়ে কারো চোখে জল আসে, আঁচলে কি ঢেকেছে প্রদীপ?
সেখানে ভ্রমর বুঝি চপল ডানায়
বনের মনের কথা গোপনে জানায়;

জলে ভেজা বনযূথী রেখে যায় বেদনা আভাস,
পথ বুঝি খুঁজে মরে পথভোলা পরদেশী হাঁস;
সে কোন সাগর পারে সেখানে কি আছে মোর ঘর?
পুবালী হাওয়ায় বুঝি ভেসে আসে নারিকেল বন-মর্মর।
চিকন ভুরুর নিচে দেখেছিনু কালো দুটি চোখ,
সে কোন সাগর দ্বীপে বহুদিন আগে, আহা তাই হোক।

তারপর গেছে কতো কাল,
তোমার আমার মাঝে ইতিহাস কুয়াশায় করেছে আড়াল;
তীরে বসে দেখেছিনু সাগরের ঢেউ উত্তাল,
তারপর গেছে কতো কাল।
পৃথিবীতে এলো গেলো কতো জয়, কতো পরাজয়,
হাওয়ায় উড়ায়ে দেয় ইতিহাস কালের বলয়।
মনে হয় তুমি আমি কেউ নই, মোরা শুধু খেলার পুতুল,
লতারে কে চেনে বলো, মানুষেরা চেনে শুধু ফুল,
তুমি আমি খেলার পুতুল।
সেদিন রবোনা মোরা, তবু এই চিরজীবী প্রেম
মানুষের জীবনে জীবনে চিরদিন রাখিয়া গেলেম।
বসন্ত আসে চিরদিন, কোথায় সে হয়েছে বিলীন সেকালের বসন্তসেনা,
স্মরণের মণিহারে প্রেম শুধু গাঁথা র'বে, তুমি রহিবে না।
মনে নেই কবে যেন দেখেছিনু কালো দুটি চোখ,
যেখানে উষার আলো করে ঝলমল,
পাহাড়িয়া বুনো পথে নেমে আসে গোধূলি আলোক।

# স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ

## ভিটামিন ডি

পশুপতি ভট্টাচার্য ডি-টি-এম

আমাদের সকলের নরম দেহের ভিতরকার হাড়গুলি এত শক্ত হয় কিসে? ক্যালসিয়ম আর ফসফরাস নামক দুটি বিশিষ্ট রকমের ধাতব উপাদানের দ্বারা। বিভিন্ন ধরণের খাদ্যবস্তু থেকে ঐ উপাদান দুটি সংগ্রহ ক'রে আমরা রক্তের মধ্যে তা রক্ষা ক'রে থাকি। কিন্তু রক্তের ভিতর থেকে সেগুলি সকল জায়গা ছেড়ে ঠিক হাড়েরই সংগঠনের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে হাজির হয় কেমন করে? বলা বাহুল্য শুধু হাড়ে নয়, হাড়ে দাঁতে। এই কাজটি সার্থকভাবে ঘটাতে পারে কেবল ভিটামিন ডি। এইটুকুই ওর বিশেষত্ব।

হঠাৎ ভুলক্রমে হয়তো অনেকের মনে হ'তে পারে যে, ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন ডি বুঝি কতকটা একই ধরণের জিনিস। কারণ দুই ভিটামিনই বিশেষ ক'রে তেলে দ্রবণীয়, জলে নয়। আর দুই ভিটামিনই কডলিভারের তৈল প্রভৃতি কয়েক রকমের নির্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রায় একত্রেই থাকে। কডলিভারের তেলে, হাঙরের তেলে ও হ্যালিবাটের তেলে এ ভিটামিনের সঙ্গে ডি-ভিটামিনও আছে। কিন্তু তবুও দুটি একেবারে স্বতন্ত্র পদার্থ। অর্থাৎ দুইএর রাসায়নিক সত্তাও স্বতন্ত্র, আর ক্রিয়াও স্বতন্ত্র। এ-ভিটামিন লাগে দেহের সময়োচিত পুষ্টির কাজে আর দৃষ্টিশক্তি অক্ষুন্ন রাখবার কাজে। ডি-ভিটামিন লাগে বিশেষ ক'রে অস্থিপুষ্টি ও দাঁতের পুষ্টির কাজে। দুইএর মধ্যে অনেক তফাৎ। ভিটামিন এ অপুষ্টি ও অন্ধত্ব নিবারণ করে, আর ভিটামিন ডি রিকেটস ও অস্টিওম্যালেসিয়া অর্থাৎ অস্থিবিকৃতি নিবারণ করে।

কাকেই বা বলে রিকেট্স অথবা অস্টিওম্যালেসিয়া, আর ডি-ভিটামিনই বা কোন বিশিষ্ট বস্তু? এ-কথা বুঝতে হ'লে আগে আমাদের কাঠামোর হাড়ের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। আমাদের হাতে-পায়ে যে লম্বা হাড়গুলি আছে সেগুলি দেখতে যেন এক একটি সম্পূর্ণ জিনিস, কিন্তু শিশু যখন জন্মায় তখন সেগুলি এমনভাবে সম্পূর্ণ আকারে থাকে না। তখন প্রত্যেকটি হাড়ের পাবগুলি থাকে আলাদা, আর গাঁটিগুলি থাকে আলাদা। প্রত্যেক পাব আর গাঁটের মাঝখানে থাকে খানিকটা ক'রে নরম কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঐ নরম কার্টিলেজ কঠিন হাড়ে পরিণত হ'তে হ'তে ক্রমে সমস্ত বিভিন্ন অংশগুলি জুড়ে এক হ'য়ে যায়। কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি নামক ঐ কঠি...

নরম জিনিসটি কঠিন হাড়ে পরিণত হ'তে পারে কেবল তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষগুলির অন্তরালবর্তী স্থানে পূর্বোক্ত ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসের অণু সকল এসে জমাট বেঁধে কঠিন স্তর প্রস্তুত করার দ্বারা। রক্তশিরাসমূহ তাই সেখানেই বিশেষ ক'রে অনবরত ক্যালসিয়ম ও ফসফরাস এনে হাজির করতে থাকে, আর তার দ্বারা প্রত্যেকটি কোষের অন্তরালে অন্তরালে সমস্ত ফাঁকা জায়গাগুলিকে ভরাট করতে থাকে। সুতরাং তখন ঐ দুটি উপাদানই রক্তের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হাজির থাকা চাই। শুধু তাই নয়, সেগুলিকে যথাযথভাবে হাড় গঠনের ঐ সকল নির্দিষ্ট স্থানে এনে হাজির করা চাই। ঐ দুটি উপাদানের অথবা ওর কোনো একটির যদি মাত্রায় অভাব ঘটে, কিম্বা রক্তের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে উপস্থিত থাকলেও কোনো কারণে যদি যথাস্থানে গিয়ে তা সময় মতো কাজে না লাগে তাহলেই হাড়গুলি অনেক দিন পরেও কঠিন না হয়ে নরম থেকে যায়। সেই নরম হাড়ের উপর ভর ক'রেই যদি কোনো শিশু উঠতে বসতে শুরু ক'রে দেয়, তাহলে তার শরীরের ভারে সোজা থাকতে না পেরে ক্রমশ হাড়গুলি নুয়ে হেলেবেঁকে যায়। কেবল তাই নয়, হাড়ের ছোটো ছোটো গাঁটিগুলি শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে কেবলই কোষবৃদ্ধির দ্বারা ক্রমশঃ আয়তনে বেড়ে যেতে থাকে। বলা বাহুল্য এতে সেই শিশুর দেহের গঠন স্বাভাবিক না হ'য়ে নানারকম অঙ্গবিকৃতি ঘটে। একেই বলে রিকেট্স। এতে শিশুদের হাত-পাগুলি দেখায় সরু সরু এবং আঁকাবাঁকা, গাঁটগুলি দেখায় অস্বাভাবিক রকমে মোটা, আর পেটটি দেখায় ডাগর। বুকের গঠনটা হয় সামনের দিকে উঁচু, আর পাঁজরার হাড়গুলিতে উঁচু উঁচু গাঁট জন্মে গাঁটের মালার মতো এক প্রকার আকার ধারণ করে। ফুসফুসের উপর এই সব গাঁটের চাপ পড়াতে প্রায়ই তাদের ফুসফুসের রোগও জন্মায়। এই সব বিকলাস্থি শিশু সহজে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না, গোড়া থেকে এর প্রতিকার করতে না পারলে তাদের চিরকালই কিছু কিছু অঙ্গ-বিকৃতি থেকে যায়। মানুষের পক্ষে এ বড়ো দুরবস্থা।

অস্টিওম্যালেসিয়াও এমনি ধরণের একটি পরিণত বয়সের রোগ; প্রধানত দেখা যায় গর্ভবতী ও সন্তানবতী স্ত্রীলোকদের মধ্যে। তারা হাড়ে হাড়ে ব্যথা অনুভব করে। তারপর ...

সঙ্গে ডি ভিটামিনের অভাব হওয়াতে তাদের শরীরের হাড়গুলি অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে চুরে যায়। অনেকদিন পর্যন্ত ভুগলে প্রায়ই তারা কুব্জ ও বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, আর এই অস্থিবিকৃতির জন্য তাদের সন্তান প্রসবেও নানারকমের বিঘ্ন ঘটে। উত্তর ভারতে পর্দানশীন নারীদের মধ্যে এ রোগ প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। গর্ভে সন্তান জন্মালেই তার দেহ গঠনের জন্য ক্যালসিয়ম প্রভৃতির খুব বেশি টান পড়াতে তাদের এই রোগ অকস্মাৎ এসে পড়ে এবং প্রসবের সময় বিপদ ঘটে। কোনোমতে প্রসব হ'য়ে গেলেই তারা তখনকার মতো কতকটা সেরে ওঠে, আবার নতুন গর্ভসঞ্চার হ'লেই রোগটি নতুন ক'রে দেখা দেয়।

দাঁতের সম্বন্ধেও অনেকটা একই রকমের ব্যাপার হয়। ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসের উপযুক্ত জোগান দেওয়ার অভাবে রিকেটসগ্রস্ত শিশুদের দাঁত উঠতেই বিলম্ব হ'তে থাকে। যেখানে নয় মাসের মধ্যেই দাঁত ওঠবার কথা, সেখানে এক বছর পার হ'য়ে গেলেও তাদের দাঁত উঠতে চায় না। আর যদিওবা দাঁত ওঠে, তার এনামেলগুলি হয় খুব পাতলা, আর স্থানে স্থানে ফাটল এবং খোঁদল করা। ঐ সমস্ত খোঁদল এবং ফাটলের মধ্যে খাদ্যের কুচি ঢুকে পচে উঠে পরবর্তীকালে দাঁতগুলিতে কেরীজ জন্মায়, যাকে আমরা চলিত কথায় পোকায় খাওয়া বলি। যে সকল শিশুর দুই বছর বয়সের মধ্যে অল্পবিস্তর রিকেটসএর অবস্থা ঘটে, তারাই বড়ো হ'য়ে পোকায় খাওয়া রোগে কষ্ট পায়। অতএব রিকেটস জাতীয় রোগটি কারোই শরীরে হ'তে দেওয়া উচিত নয় এবং হবার সম্ভাবনা দেখলেই তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করা দরকার।

কডলিভারের তেল খেতে দিলে এবং গায়ে মাখালে যে রিকেটস আরোগ্য হয়ে যেতে পারতো এ কথা এখন নয়, অনেকদিন থেকেই এটা জানা ছিল। আগেকার কালে সকলে বলতো যে কডলিভারের তেল রিকেট্স রোগের এক রহস্যময় মহৌষধ। রহস্যটি যে কি তা বহুকাল পর্যন্ত জানা যায় নি। নিম্নজাতীয় প্রাণীদের নিয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খাদ্যোপাদানের অভাব ঘটিয়ে রোগের সৃষ্টি করিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে তার কারণ খুঁজে না দেখা পর্যন্ত কোনো ভিটামিনের অস্তিত্বের কথাই ধরা পড়েনি। উদাহরণস্বরূপে বলা যেতে পারে, কডলিভারের তেলে রাতান্ধত্ব আরোগ্য হ'য়ে যায়, একথা সাধারণ লোকেও আগের থেকে

অনেক পরে। জাহাজের লস্করদের রেশনের পরিবর্তনের দ্বারা তাকাকি যদিও বেরিবেরি আরোগ্য করলেন, কিন্তু ভিটামিন বি আবিষ্কার হলো তার অনেক পরে। লেবুর রস খাইয়ে লিন্ড আরোগ্য করলেন স্কার্ভি, ভিটামিন সি আবিষ্কার হলো তার বহুকাল পরে। এই কড-লিভার তেলের ডি ভিটামিনও এমনিভাবেই অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রথমে ভাবা গিয়েছিল যে ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসের উপযুক্ত সরবরাহের অভাবেই শিশুদের রিকেটসএর মতো অবস্থা ঘটে। বস্তুত দুই প্রকারের রিকেটসও স্বতন্ত্ররূপে দেখা গেল। এক প্রকার দেখা গেল ক্যালসিয়ম যথেষ্ট থাকলেও ফসফরাসের অভাবে, আর এক প্রকার দেখা গেল ফস্‌ফরাস যথেষ্ট থাকলেও ক্যালসিয়মের অভাবে। কিন্তু যেখানে ঐ দুটির মধ্যে কোনোটিরই কিছুমাত্র অভাব নেই, সেখানেও যে রিকেটস হয় এমন আশ্চর্য ব্যাপার অনেক দেখা যেতে লাগলো। দুধের মধ্যে ক্যালসিয়ম ও ফসফরাস দুইই উপযুক্ত পরিমাণে থাকে। যে সকল শিশু প্রচুর দুধ খেতে পাচ্ছে তাদের মধ্যে তবে রিকেটস্ হয় কেন? দুধ থেকে যথেষ্ট ক্যালসিয়ম ও ফসফরাস পেলেও নিশ্চয় সেটা তাদের হাড় গঠনের কাজে না লেগে ব্যর্থ হয়ে যায়। দুধের সঙ্গে কেবল একটু কডলিভারের তেল মিশিয়ে খেতে দিলেই তখন কিন্তু তাদের সেই রিকেটস আরোগ্য হ'য়ে যায়। যখন তৈল-দ্রব্যে ভিটামিন-এর প্রথম আবিষ্কার হলো, তখন সকলে ভাবলে কডলিভার তেলের ঐ বিশিষ্ট ভিটামিনটির দ্বারাই হয় ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসের সমুচিত সদ্ব্যবহার হ'তে পারে, নতুবা তা হয় না। কিন্তু ফুটন্ত কডলিভারের তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ বাতাসের বুদ্বুদ প্রবেশ করিয়ে দিতে থাকলে তার ভিটামিন-এ সম্পূর্ণই নষ্ট করে দেওয়া যায়। সেই এ ভিটামিনবর্জিত কডলিভারের তেল খেতে দিয়ে দেখা গেল যে রিকেটস তাতেও বেশ আরোগ্য হয়ে যায়। তখন নিশ্চিত বোঝা গেল ওর মধ্যে ভিটামিন এ ছাড়া আরো একটা স্বতন্ত্র রিকেটস নিরোধী পদার্থ আছে। তারই নাম হলো ভিটামিন ডি।

কিন্তু সহজ অবস্থাতে কোনো শিশুকেই কখনো কডলিভারের তেল খাওয়ানো হয় না। অথচ মাত্র কোনো কোনো স্থানের কতকগুলি শিশুরই রিকেট্‌স্ হ'তে দেখা যায়, অধিকাংশের মধ্যে তা হয় না। কডলিভারের তেল না খেয়েও যারা সুস্থ থাকে, তারা ঐ অতি প্রয়োজনীয় ডি ভিটামিন পায় কোথা থেকে? কোনো কোনো চিকিৎসক অনেক আগের থেকেই বলতেন যে শীতের দেশে শহরের অন্ধকার কুঠুরের মধ্যে বাস করে শৈশবকালে যারা রোদ পায়না তাদেরই সহজে রিকেট্‌স্ হয়, আর গায়ে ভালো ক'রে রোদ লাগলেই সেটা সেরে যায়। এ কথায় তখন কেউই বিশেষ আমল দিতো না। সকলে বলতো যে রোদের অভাব নয়, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব আর অন্ধকার নোংরা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে বাস করাই রোগের আসল কারণ। কিন্তু জাপান চীন ভারতবর্ষ প্রভৃতি এসিয়ার অনেকগুলি রৌদ্রস্নাত দেশে সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে সেখানকার গরিব লোকেরা তাদের শিশুদের খুব পুষ্টিকর খাদ্যও দিতে পারে না আর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যেই তাদের বাস করা অভ্যাস, তথাপি তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তেমন বেশি রিকেটস হয় না, যেমন শীত প্রধান রৌদ্রবিহীন দেশগুলিতে দেখা যায়। এই উদাহরণ দেখে সকলেরই গায়ে রোদ লাগানোর দিকে নতুন আগ্রহ জন্মালো, এবং তাতেই রিকেটস আশ্চর্যরূপে নিবারিত হতে লাগলো।

আমাদের দেশের মতো এমন বারোমাস রোদ পাওয়া সকল দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। রোদের বদলে তাই কৃত্রিম আল্ট্রাভায়োলেট আলোর সৃষ্টি হলো। তখন দেখা গেল যে, পারদপূর্ণ কোয়ার্জ আলো থেকে কৃত্রিম আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি লাগিয়েও রিকেটস রোগটি নিবারিত এবং আরোগ্য করা যায়। এখন দুই দিক থেকে দুইতরফা সন্ধান পাওয়া গেল। প্রথমত জানা গেল যে কডলিভারের তেলে এক-রূপ স্বাভাবিক ভিটামিন ডি আছে, যা খেলে রিকেটস না হ'য়ে হাড় এবং দাঁতের সমুচিত পুষ্টি হয়। আর দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, আসল (অর্থাৎ স্বাভাবিক রোদের আলো) এবং সকল আল্ট্রাভায়োলেট আলোর এমন কোনো প্রভাব আছে যারদ্বারা ভিটামিন ডি পেটে না খেলেও তা খাওয়ার মতো কাজ হয়।

এই দ্বিতীয় পন্থাটির দ্বারা সে কাজ কেমন করে হয় তাও ক্রমে ক্রমে জানা গেল। সূর্যরশ্মি এবং আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির মধ্যে ডি ভিটামিন প্রস্তুত করবারই এক বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে। আরো পরীক্ষা করতে করতে দেখা গেল যে কতকগুলি নির্দিষ্ট রকমের খাদ্যবস্তুর উপর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি নিক্ষেপ করলে তখন সেগুলিও কোনো অদ্ভুত উপায়ে ডি ভিটামিনের দ্বারা সমৃদ্ধ হ'য়ে পড়ে, এবং সেই খাদ্যের দ্বারা রিকেটস আরোগ্য হতে পারে। কোথা থেকে তার মধ্যে আসে এই নতুন উপাদানটি? দেখা গেল যে ঐ সকল বিশিষ্ট খাদ্য-বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকটিতেই স্টেরল নামক এক-রূপ তৈলবৎ পদার্থ থাকে এবং সেই স্টেরলই রশ্মির দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়ে ডি ভিটামিনে রূপান্তরিত হয়। অতএব এই স্টেরল জাতীয় সকল পদার্থকে 'প্রোভিটামিন ডি' নামে অভি-হিত করা হলো। শুধু তাই নয়, আরো দেখা গেল যে আমাদের গায়ের চামড়ার উপরেও অনুরূপ 'প্রোভিটামিন ডি' আছে। আমাদের ঘর্মকূপ থেকে যে তৈলাক্ত স্রাব নির্গত হ'য়ে চামড়ার সঙ্গে লিপ্ত থেকে চামড়ার রুক্ষতা নিবারণ করে, তাও পড়ে স্টেরল পর্যায়ের মধ্যে। তার উপরে যখন স্বাভাবিক সূর্যরশ্মি কিংবা কৃত্রিম আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি নিক্ষিপ্ত হয় তখন সেটিও ডি ভিটামিনে পরিণত হয়। সেই নব-পরিণত পুষ্টিকারক বস্তুটি তখন লোম-কূপ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে শরীরের মধ্যে পুনঃ-প্রবেশ করে অন্যান্য খাদ্যেরই মতো সর্বত্র সঞ্চারিত হতে থাকে। সুতরাং ডি ভিটামিন পেটে খাওয়ার দ্বারা যে কাজ হয়, তা না খেলেও আমাদের প্রত্যেকের ঘর্মকূপের রোদ-লাগানো স্টেরলের দ্বারা ঠিক সেই কাজই হয়। রিকেটস নিবারণে এবং তার আরোগ্যবিধানে কডলিভারের তেল খেয়ে যে উপকার হতে পারে গায়ের চামড়াতে সূর্যরশ্মি বা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি লাগালে অন্যতম উপায়ে সেই একই উপকার হ'তে পারে। দুই প্রকার ব্যবস্থাই ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসের অণুগুলিকে শরীরের যথাস্থানে যথাযোগ্যরূপে যোজনা করে।

এখন হিসাবমতো বলতে হয় যে, ভিটামিন ডি থাকতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের। কডলিভারের তেলে বা হাঙরের তেলে বা হ্যালিবাটের তেলে যে পদার্থ আছে তাই হলো খাদ্যরূপে গ্রহণোপযোগী স্বাভাবিক ভিটামিন ডি। আর স্টেরলের উপর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি নিক্ষেপের দ্বারা যে পদার্থ প্রস্তুত হয় তা হলো রাসায়নিকভাবে প্রস্তুত স্বতন্ত্র রকমের ভিটামিন ডি। স্টেরল আছে নানা জাতীয়, সুতরাং তারও প্রত্যেকটি থেকেই ভিটামিন ডি প্রস্তুত হবে কিছু স্বতন্ত্র ধরণের এবং তার গুণেরও কিছু ইতরবিশেষ থাকবে। আজ পর্যন্ত এগারো রকমের পৃথক পৃথক স্টেরল আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরো অনেক হবার সম্ভাবনা আছে। তার মধ্যে দুই জাতীয় স্টেরলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। একটি হলো আর্গোস্টেরল। এটি থাকে আর্গট এবং ঈস্ট প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকার উদ্ভিজ্জ বস্তুতে। এই আর্গোস্টেরল থেকে যে ভিটামিন ডি প্রস্তুত হয়, তার নাম দেওয়া হয় ক্যাল্‌সিফেরল অথবা ভিটামিন ডি২। ঔষধরূপে এইটিই ভাইওস্টেরল প্রভৃতি নাম দিয়ে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিপ্রযুক্ত ঈস্ট গরুকে খাওয়ালে তার দুধেও এই ভিটামিন ডি২ পাওয়া যায়। এই ভিটামিনটি স্থায়ী গুণবিশিষ্ট একরূপ কেলাসিত পদার্থ, যথেষ্ট উত্তাপ লাগলে কিম্বা বহুকাল পর্যন্ত বাতাসের মধ্যে ফেলে রাখলেও এর গুণ নষ্ট হয় না। কিন্তু এর পুষ্টিগুণ অপেক্ষা তৃতীয় স্টেরলটির ভিটামিনের পুষ্টি গুণ আরো কিছু বেশি। সেটির নাম কোলেস্টেরল

(৭—ডিহাইড্রক্সিকোলেস্টেরল)। এই কোলেস্টেরল থেকে রশ্মির প্রভাবে যে ভিটামিনটি উৎপন্ন হয়, তার নাম দেওয়া হয় ভিটামিন ডি৩। আমাদের গায়ের চামড়াতে এবং অন্যান্য জীব জন্তুর পালকে ও পশমে যে স্টেরল থাকে তা এই কোলেস্টেরল জাতীয়। এর থেকে যে ভিটামিন ডি৩ প্রস্তুত হয় তারই অনুরূপ ভিটামিন ডি পাওয়া যায় ঘি মাখনে, ডিমে এবং জন্তুর লিভারে। সকলে বলে এইটিই সর্বোৎকৃষ্ট ভিটামিন ডি। এ ছাড়া একরূপ ভিটামিন ডি আছে, সেটি উৎপন্ন হয় কয়েকরূপ গাছগাছড়ার স্টেরল থেকে। তদ্ভিন্ন আরো অনেক রকমের হতে পারে। আর শুধু আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির দ্বারাই নয়, আজকাল কোলেস্টেরলের উপর ক্যাথোড রশ্মি প্রয়োগের দ্বারা এবং আর্গোস্টেরলের উপর রেডিয়ম রশ্মি প্রয়োগের দ্বারাও ভিটামিন ডি উৎপন্ন হচ্ছে।

এর উৎপত্তি সম্বন্ধে আরো অনেক নতুন রহস্যের কথা শোনা যাচ্ছে। কড লিভারের তেলে এবং হ্যাংগর প্রভৃতির তেলেই বা স্বাভাবিক ভিটামিন ডি আসে কোথা থেকে? সমুদ্রবক্ষে ভূরি ভূরি পরিমাণে যে সকল আণবিক প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভেসে বেড়ায়, তার নাম প্ল্যাঙ্কটন। তার উপর সূর্যরশ্মি পড়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাত্রায় ডি ভিটামিন উৎপন্ন হয়। তাই খেয়ে খেয়ে সামুদ্রিক মাছগুলি ডি ভিটামিন সমৃদ্ধ হয়। তারা আপনাপন লিভারের মধ্যে এই ভিটামিন সঞ্চয় ক'রে রাখে। শুধু কড মাছে বা হ্যাংগরে নয়, অনেক রকমের তৈলাক্ত সামুদ্রিক মাছেই এই ভিটামিন পাওয়া যায়। হেরিং এবং ঐ নামে যে সব ছোটো ছোটো সামুদ্রিক মাছ আছে, তাতে এই ভিটামিন কড লিভারের চেয়েও অনেক গুণে বেশি, কিন্তু আমাদের খাদ্যোপযোগী অন্য কোনো রকম শস্যাদি বা শাকসব্জীর মধ্যে এই ভিটামিন নেই।

কোন কোন খাদ্যের মধ্যে এই ভিটামিন কতো পরিমাণে স্বাভাবিকরূপে পাওয়া যেতে পারে? এই ভিটামিনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয় ইউনিটের দ্বারা। কড লিভারের তেলে এই ভিটামিন অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণেই থাকে। কিন্তু ঐ তেল আমাদের স্বাভাবিক খাদ্য নয়। দুধ আমাদের স্বাভাবিক খাদ্য। দুধের মতো খাদ্যেও এই পদার্থটি খুব কম পরিমাণেই থাকে। যে গরু সর্বদা রোদে এবং উন্মুক্ত স্থানে থাকে তার দুধে প্রতি সেরে ডি ভিটামিন থাকতে পারে মাত্র ১৫ ইউনিট, আর যে গরু সর্বদা অন্ধকার গোয়ালের মধ্যে থাকে তার দুধে ৫ ইউনিটের বেশি নয়। ঘি মাখনে কিছু বেশি থাকে, প্রতি ছটাকে প্রায় ৪০ ইউনিটের মতো। বধ্য জন্তুর মেটুলিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায় প্রতি ছটাকে প্রায় ৩০ ইউনিটের মতো। ডিমের হরিদ্রা অংশে এটি আরো কিছু বেশি মাত্রায় থাকতে পারে, প্রতিটি ডিমে প্রায় ৩০ ইউনিট। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে, পাঁচটি ডিম খেলে তবে ছোটো চামচের এক চামচ কড লিভারের তেল খাওয়ার কাজ হয়।

এই ভিটামিনটি আমাদের পক্ষে প্রাত্যহিক প্রয়োজন। অবশ্য একদিন বেশি মাত্রাতে পাওয়া গেলে কিছুকাল যাবত শরীরের মধ্যে তার সঞ্চয় থাকতে পারে। নিম্ন জাতীয় কোনো কোনো জন্তুদের এই ভিটামিন একবার মাত্র বেশি মাত্রাতে খাইয়ে তাদের লিভারে এবং রক্তের মধ্যে বারো সপ্তাহ পরেও এর অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কিন্তু তাই ব'লে খুব অধিক মাত্রাতে এটি খাওয়া সকলের পক্ষে নিরাপদ নয়, কারণ তাতে কারো কারো পক্ষে হানির আশংকা আছে। বেশি খেলে কখনো কখনো এর দ্বারা উদরাময়, বমনেচ্ছা, শিরঃপীড়া, অতিরিক্ত ঘর্ম সঞ্চার প্রভৃতি বিষদুষ্টির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সূর্যরশ্মিও খুব অত্যধিক মাত্রায় গায়ে লাগলে তার থেকে অনিষ্ট হতে পারে। কেউ বলেন এর থেকেই সর্দিগর্মির আক্রমণ হয়।

কতটা মাত্রাতে ভিটামিন ডি প্রত্যহ প্রয়োজন হ'তে পারে? বয়স হিসাবে এর তারতম্য আছে। তিন সপ্তাহ বয়সের পর থেকে শিশুকে দিতে হয় প্রায় ২০০ ইউনিট, অর্থাৎ আধ চামচ কড লিভারের তেলে যতটুকু পাওয়া যায়। কিছুকাল পর থেকেই তার প্রয়োজন হয় ৪০০ ইউনিট, অর্থাৎ এক চামচ কড লিভারের তেল। বারো বছর বয়স পর্যন্ত এই ৪০০ ইউনিট পেলেই স্বাভাবিক পুষ্টি সাধনের কাজ চলে যায়, কিন্তু গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রীদের পক্ষে ৪০০ থেকে ৮০০ ইউনিট নিশ্চয়ই পাওয়া দরকার। আর রিকেটস্ হ'লে তা আরোগ্য করতে প্রত্যহ ১০০০ থেকে ১৫০০ ইউনিট পর্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন হয়। শিশু এবং গর্ভবতী নারীদের ছাড়া অন্যদের সম্বন্ধে কোনো মাত্রার উল্লেখ নেই।

শিশু এবং সন্তানবতী নারীদের ছাড়া অন্য লোকদের ভিটামিন ডি-র অভাবে কি অনিষ্ট হয়? শারীরিক কর্মোদ্যমের সংগে এই ভিটামিনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এর অভাবে মানুষ স্বাভাবিক উদ্যমবিহীন হ'য়ে পড়ে এবং মাংসপেশীগুলিকে দুর্বল হ'য়ে পড়তে দেখা যায়। এর অভাবে আভ্যন্তরিক গণ্ডসমূহকেও আংশিকভাবে অকর্মণ্য হয়ে পড়তে দেখা যায়। সুতরাং প্রত্যেকেরই এই ভিটামিন কিছু কিছু মাত্রাতে পাওয়া দরকার।

এই ভিটামিনের একান্ত প্রয়োজনের যে ৪০০ ইউনিট মাত্রার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হলো, সে মাত্রা অবশ্য আমরা কোনো প্রচলিত খাদ্যের ভিতর থেকেই পাই না। দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও মাতৃস্তন্য থেকে এতটা মাত্রাতে তা পায় না। মায়ের দুধে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস যথেষ্ট থাকলেও এই ভিটামিন খুব কম পরিমাণেই থাকে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এর যতটুকু শরীরের পক্ষে প্রয়োজন তার বেশির ভাগ আমরা সূর্যরশ্মির সাহায্যে নিজেদের গায়ের চামড়া থেকেই সংগ্রহ ক'রে নিই। যার গায়ের চামড়ার যেমন ওজন, সেই অনুসারে তার শতকরা এক ভাগ পরিমাণ কোলেস্টেরল সেই চামড়ার উপরেই লেগে থাকে। এই স্টেরলটি চুলেও লেগে থাকে এবং তার থেকেও সূর্যরশ্মির দ্বারা ডি ভিটামিন জন্মায়। এই কারণে শিশুদের গায়ে তেল মাখিয়ে রোদে দেওয়া এবং অন্যান্য সকলের পক্ষেও নিজেদের দেহ অনাবৃত ক'রে রোদ লাগতে দেওয়া খুবই ভালো। আমরা গায়ের ময়লা দূর করবার জন্য সাবান ব্যবহার ক'রে থাকি। সেটা যদিও পরিষ্কারক এবং স্বাস্থ্যকর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাবানের অধিক ব্যবহার এইদিক থেকে অনিষ্টকর। অত্যধিক মাত্রায় সাবান ব্যবহার করলে স্বাভাবিক স্টেরলগুলি নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে এবং ডি ভিটামিনের তাতে অভাব ঘটতে পারে। শিশুদের গায়েও তাই খুব বেশি সাবান মাখানো উচিত নয়। বরং তেল মাখানোই ভালো, সেই তেল সদ্যোৎপন্ন ডি ভিটামিনের সঙ্গে মিশে চামড়া দিয়ে ভিতরে চলে যায়।

শুধু মানুষের বেলাতেই নয়, অন্যান্য জীবজন্তুদের পক্ষেও এই একই কথা। তাদের গায়ের রোঁয়াতে এক রকম চর্বি থাকে, তাতেও থাকে স্টেরল বা প্রোভিটামিন ডি। কুকুর, গরু, বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি অনেক জন্তু প্রায়ই জিভ দিয়ে নিজেদের গা চাটে, তাতে সূর্যরশ্মি প্রযুক্ত স্টেরলের সংগে অনেক রোঁয়াও তাদের পেটের মধ্যে চলে যায়। এমনিভাবেই তারা যখন তখন তাদের নিজেদের গায়ের রোঁয়া থেকে ডি ভিটামিন সংগ্রহ ক'রে নেয়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে খরগোশকে রোদে রাখলেই তাদের রোঁয়াতে উৎকৃষ্ট রকমের ডি ভিটামিন পাওয়া যায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছুদিন বন্ধ ক'রে রাখলে কিছুই আর পাওয়া যায় না। আরো দেখা গেছে যে খরগোশদের গায়ের রোঁয়া নিত্য নিত্য ইথার এবং সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে থাকলে শীঘ্রই তাদের শরীর অসুস্থ হ'য়ে রিকেট্‌স্ রোগটি এসে পড়ে। পাখিদের গায়ে প্রীণ গ্ল্যাণ্ড নামে এক প্রকার গণ্ড আছে, জলে ভেজা নিবারণ করবার জন্যে তারই মোমের মতো স্রাব তারা চঞ্চু দিয়ে নিজেদের পালকে মাখায়। ঐ স্রাবের মধ্যে থাকে স্টেরল বা প্রোভিটামিন, যা সূর্যরশ্মির দ্বারা ডি ভিটামিনে পরিণত হ'য়ে তাদের শরীরের ভিতরে গৃহীত হয়। ঘোড়ার চুলেও থাকে এই ধরণের প্রোভিটামিন। ঘোড়ার গা প্রত্যহ সাবান জল দিয়ে ধুয়ে দেখা গেছে যে এই প্রোভিটামিন নষ্ট হ'য়ে গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে যায়। নিজেদের গায়ের চুলগুলি

থেকেই তারা ভিটামিন ডি নিত্য পেয়ে থাকে।

এই ডি ভিটামিন উপযুক্ত পরিমাণে না খেলেও প্রকৃতির স্বহস্তে গড়া দানস্বরূপে আমরা নিত্যই তা পেয়ে থাকি। এর জন্য বিশেষ কোনো খাদ্যবিচারের দরকার হয় না, কোনো অর্থ ব্যয়ের দরকার হয় না, প্রকৃতি সূর্যরশ্মির মারফতে আমাদের প্রত্যেকের অঙ্গে এই জিনিসটি লেপন করে দিয়ে যায়। সেই সূর্য-রশ্মিকেও যদি আমরা বর্জন ক'রে চলি তবে সেটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। সর্বদা গায়ে কাপড় চাপিয়ে আর অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে নিজেরাই আমরা নিজেদেরকে এই খাদ্যগুণযুক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করি। যারা গায়ে রোদ লাগায় তাদের এই ভিটামিনের জন্য কডলিভার তেলের সাহায্য নেবার কোনোই দরকার হয় না।

সূর্যরশ্মির থেকে উৎপন্ন প্রাকৃতিক ডি ভিটামিন আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার দিক দিয়েই প্রয়োজন। কিন্তু কৃত্রিম আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে উৎপন্ন কৃত্রিম ডি ভিটামিনও রোগের চিকিৎসার দিক দিয়ে প্রয়োজন হয়। এই কৃত্রিম ভিটামিনের গুণও প্রাকৃতিকের সঙ্গে সর্বাংশে সমান, উপরন্তু একে ইচ্ছা মতো যেমনভাবে যত অধিক মাত্রাতে খুশি এককালীন ব্যবহার করা চলতে পারে। স্বাভাবিক জিনিসের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আজকাল রিকেট্‌স্‌ ছাড়াও বহুবিধ রোগের চিকিৎসায় এই ভিটামিন খুব অধিক মাত্রাতে প্রয়োগ ক'রে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। ছেলেদের একরূপ খেঁচুনি রোগ হ'তে দেখা যায়, তার নাম টেটানী। এতে ক্যালসি-ফেরল বা ভিটামিন ডি২ বিশেষ ফলদায়ক। অস্টিওম্যালেসিয়াতে এর দ্বারা খুবই উপকার হয়। আরথ্রাইটিস্‌ বা পুরানো গেঁটেবাত রোগে এই ভিটামিন দৈনিক দুই লাখ ইউনিট মাত্রায় পর্যন্ত প্রয়োগ ক'রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্চর্য উপকার পাওয়া গেছে। হাঁপানি রোগেও এই ভিটামিন অত্যধিক মাত্রাতে প্রয়োগের দ্বারা কারো কারো যথেষ্ট সুফল হ'তে দেখা গেছে। তা ছাড়া সোরায়সিস নামে একরূপ চর্মরোগ আছে, তাতেও এই চিকিৎসার দ্বারা বেশ উপকার হয়। অনেকে এখন বলছেন যে, ঘা শুকোবার পক্ষেও এই ভিটামিন অদ্বিতীয়, সেইজন্য কডলিভারের তেল ও ক্যালসিফেরল দিয়ে ঘা ড্রেস করবার পদ্ধতি আজকাল প্রচলিত হয়েছে। বুড়োদের এবং শিশুদের হাড় হঠাৎ ভেঙে গেলে তখন ভিটামিন ডি বেশি পরিমাণে খাওয়াতে থাকলে তা শীঘ্র জুড়ে যায়।

আরও দুটি নবাবিষ্কৃত ভিটামিনের কথা এখানে না বললে আমাদের প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

### ভিটামিন ই

একে বলা হয় সন্তানোৎপাদক বা বন্ধ্যাত্ব-নিবারক ভিটামিন। শরীরের অন্যবিধ পুষ্টির জন্য এর কোনো প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন কেবল উৎপাদিকা শক্তির জন্য। এটিও ভিটামিন এ এবং ডি-র মতো কেবল তেলেই দ্রবণীয়, জলে নয়। কিন্তু এর বিশেষত্ব এই যে, এটি থাকে কেবল উদ্ভিজ্জের তেলে, কোনো জান্তব পদার্থের তেলে নয়। গমের বীজের মধ্যে যে সামান্য কিছু তেল থাকে তাতেই এটি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তা ছাড়া ধানের বীজে, তুলোর বীজে, অন্যান্য শস্যের বীজে, গাজরে, টোমাটোতে এবং সবুজ শাকসবজিতে যতটুকু তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তার মধ্যেও এই ভিটামিন কিছু কিছু থাকে। এটি স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতেরই জীবদের বন্ধ্যাত্ব নিবারণ করে। যারা প্রায়ই মৃতবৎসা হয়, এই ভিটামিনের সমুচিত প্রয়োগে তারা জীবন্ত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করে এবং এর দ্বারা গর্ভপাতও নিবারিত হয়। এ ছাড়া পক্ষাঘাতজনিত মাংসপেশীর ক্ষয় এর দ্বারা নিবারিত হয়। এর এক ইউনিট এক মিলিগ্রাম মাত্রার সঙ্গে সমান।

### ভিটামিন কে

কে অর্থে কোঅ্যাগুলেশন। রক্তের কোঅ্যাগুলেশন অর্থাৎ জমাট বাঁধবার শক্তিবর্ধনকারী ব'লে এই কে অক্ষরটির দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে। এটিও তেলে দ্রবণীয় ভিটামিন, জলে নয়। এই ভিটামিন পাওয়া যায় মাছের লিভারের তেলে, সিম্বির বীজে, সোয়াবিনের তেলে, চালের ভুষিতে এবং নানারূপ শাক-সবজিতে। এর অভাবে রক্ত তরল হ'য়ে গিয়ে স্কার্ভির মতো নানা স্থানে কালশিটে পড়তে পারে এবং পেট থেকে ও শরীরের ভিতরকার বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তপাত ঘটতে পারে। এর সামান্য মাত্রার প্রভাবেই রক্ত স্বাভাবিকঘনত্বপূর্ণ অবস্থায় থাকে এবং আমাদের খাদ্যের ভিতর থেকে সেটুকু আমরা পেয়েই থাকি। কিন্তু কোনো কারণে পিত্তদোষ ঘটলে এবং যকৃতের স্থানে পিত্তের অভাব ঘটলে যখন তৈলাক্ত খাদ্য আদৌ হজম হয় না, তখন এই তৈলদ্রবণীয় ভিটামিনও হজম হয় না। সেইজন্যই অনেক কারো আকস্মিক রক্তপাত ঘটে। তেমন অবস্থায় এই ভিটামিনের ইনজেকশন প্রয়োগে খুব উপকার করে। এ ছাড়া সদ্যোজাত শিশুদের নাভি থেকে বা শরীরের অন্যান্য স্থান থেকে যে হঠাৎ অকারণ দারুণ রক্তপাত ঘটতে দেখা যায়, এর প্রয়োগের দ্বারা সেই রক্তপাত তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ অবস্থায় এই ভিটামিন স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করবার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে অকস্মাৎ শরীর থেকে রক্তপাত ঘটতে থাকলে তখন এর বিশেষ প্রয়োজন। এটিও এখন কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

## সঞ্চয়

**আশা রায়**

একদিন নিভৃতে গোপনে
আপনারে শুধাইনু,
আপনার মনে,
কি দিয়া ভরিলে তব
জীবনের ডালা?

কহে মোর মন,
নহে প্রেম, নহে প্রীতি,
নহে কোনো ধন,
শুধু অশ্রুমালা।

[একটি ফার্সী কবিতার ছায়াবলম্বনে]

## আমন্ত্রণ

**মৃণালকান্তি দাশ**

রাত্রির বিশাল স্তব্ধতায় শুনি
সেই সুদূর ধ্বনি,
আর মৃত্যুর মধুর নামে
তোমাকে ডাকি,
অন্ধকারের ছন্দে অপসৃত
আমার আকাশ—
এই অতল অন্তরঙ্গ মুহূর্তে
হে প্রেম, প্রাণের অমর গানে
তোমাকে জানাই আমন্ত্রণ।
তোমার মন্দির প্রাঙ্গণতলে রেখে যাই
শেষ প্রহরের প্রণাম,

# বক্ররেখা

## শ্রী অমর সান্যাল

হাতীগাঁওয়ের মেলায় সূর্যের সঙ্গে বিন্দুর দেখা। বিন্দুর পরনে ছিল লাল রঙের একখানা ডুরে শাড়ী, হাতে একটা মোটা দড়ি। পাশে দাঁড়িয়ে তার বাবা,—বিশাই মোড়ল। সামনে ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছিল সূর্য,—নেংটি-পরা, হাতে লাঠির সঙ্গে বাঁধা একগাছা দড়ি। দুপাশে কাতারে কাতারে লোক,—কৌতুক ও কৌতূহলে উদগ্রীব।

হাতীগাঁওয়ের মেলায় ম্যাড়ার লড়াই হচ্ছিল। মালিকরা কান মুচড়ে একটার পর একটা ম্যাড়া ছেড়ে দিচ্ছে, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের দিকে তেড়ে আসছে বায়ুবেগে, তাদের নিশ্বাসে ধুলো উড়ছে। তারপর একটা [illegible]—শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংঘাত। আগুনের ফুলকির মত একটুখানি আভা যেন বেরিয়ে আসে, জনতার একাংশ চীৎকার করে ওঠে,—হটে যাও, হঠে যাও! বিজয়ী পশু বিজিতকে জনতা ভেদ করে হটিয়ে দিয়েছে। উল্লাসে কলরব করে ওঠে বিজয়ীর মালিক, তাড়ির ভাঁড় উপুড় করে ঢেলে দেয় মুখগহ্বরে, আর নিজের ম্যাড়াকে আলিঙ্গন করে লুটিয়ে পড়ে ধুলোর উপর।

আট জোড়া ম্যাড়ার লড়াই শেষ হল। সবশেষের শেষে শুরু হল বিশাই মোড়লের মেয়ে বিন্দুর ম্যাড়া 'সোনা'র সঙ্গে সূর্য ডোমের ম্যাড়া 'ঝুমুরের' লড়াই। 'সোনা' ও 'ঝুমুর' যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। সাদা বলিষ্ঠ দেহে ঢেউ-খেলানো কোমল পশমের সমারোহ, তৈলাক্ত শৃঙ্গ বিকেলের পড়ন্ত রোদে চকচক করছে। তিনখানা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে এই ম্যাড়ার লড়াই ও মোড়লের মেয়ে বিন্দুকে দেখবার জন্য।

লড়াই আরম্ভ হল। সন্ত্রস্তে সরে দাঁড়াল জনতা, শ্বেতকায় দুটি বৃহৎ গোলক যেন পরস্পরের দিকে অতি বেগে গড়িয়ে আসছে। বিন্দু ও সূর্যর মুখে উদ্বেগ, চোখে আশার ঝিলিক। লড়াই কিন্তু এক মিনিটের বেশী স্থায়ী হল না। 'সোনা'র প্রবল শৃঙ্গাঘাতে 'ঝুমুর' শৃংখলিতপদে পশ্চাদপসরণ করল তার মালিকের দিকে, পরাজয়ের অপমানে সূর্যের মুখ কালো হয়ে গেল। সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল তিন গ্রামের জনতা। নিজেদের অজ্ঞাত-সারে মোড়লের মেয়ের দিকে তাকাল; গর্বের হাসি বিন্দুর মুখে, ঈষৎ অবনত হয়ে দড়ি বাঁধছে ম্যাড়ার গলায়।

মুরলীগাঁওয়ের মাতব্বর ব্যক্তি আশারি ছুটে গেল বিশাই মোড়লের কাছে, বিনয় করে বলল,—হুঁ, ম্যাড়া বটে তোমার বেটির, সুখ্যের দেমাক ভাঙ্গল এতদিনে।

উত্তর দিল বিন্দু। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলল—মাত্তর তিন বছর বয়েস আমার ম্যাড়ার, এরি মধ্যে শিঙএর বাহার দেখ!

এবার কথা বলল বিশাই,—ও কি আর তুমাদের এই পাহাড়ে ম্যাড়া! মুরলীগাঁওয়ের মেম ওকে দিয়েছে।

আশারি বোকার মত হাসতে লাগল। চোক চিপে বলল,—তা এবার বিয়েসাদী দাও মেয়ের, বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে।

বিদ্রূপের সুরে বিশাই বলল,—কেন, তুমার সঙ্গে নাকি!

বিন্দুর দিকে তাকাল আশারি, মেয়ের মুখেও বিদ্রূপ ও দম্ভের রেখা। মরিয়া হয়ে সে বলে উঠল,—মেয়ে না হয় তোমার মেমের ইস্কুলেই পড়েছে। লেখা পড়া আমারও কিছু জানা আছে হে মোড়ল। ক্ষেতখামার যা আছে তোমার মেয়ে কেন, তার নাতিপুতিও বসে খেতে পারবে। তোমার মেয়ের চেয়ে আমি কম কিসে?

আশারির উত্তরে বিশাই হল নিস্তব্ধ, কিন্তু বিন্দু হেসে গড়িয়ে পড়ল। বিশাইএর হাত ধরে বলল,—চ, ঘরকে চ, মাতব্বরের মাথা ঠিক নেই।

প্রস্থানের পূর্বে বিন্দু একবার তাকাল চারিদিকে। ঝুমুরের গলার দড়ি ধরে ধুলোর বসে আছে সূর্য, দৃষ্টি তার নিবদ্ধ বিন্দুর দিকে। জনতা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, বৃন্দাবনী পাহাড়ের ছায়া পড়েছে মেলার মাঠে। বিশাইএর হাত ধরে বিন্দু আবার বলল,—চ, ঘরকে চ।

হাতীগাঁওয়ের মাঠের শেষে বৃন্দাবনী পাহাড়। উচ্চতায় প্রায় দুশো ফুট, ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়ের গা। পাহাড়ের উপরে একটু আধটু পরিষ্কার জায়গা, জঙ্গল কেটে পাহাড়ীরা বাস করে সেখানে। নীচে একটি ডাকবাংলো। বৎসরান্তে সরকারী কর্মচারী একজন আসে জরীপ করতে, ডাকবাংলো দু'একদিনের জন্য মানুষের স্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাংলোর অবস্থানটি মনোরম। তরুবীথিকায় ছায়াচ্ছন্ন একটি পথ বাংলো থেকে বেরিয়ে চলে গেছে পাহাড়ের দিকে, অনতিদূরে ঘাসফুলে ঢাকা রেললাইন, চারিদিকে নীরব প্রশান্তি।

সেবার সরকারী ডাকবাংলোয় আবির্ভাব হল নতুন একজন অফিসারের। রোগা শুকনো চেহারা, বয়স চল্লিশের উপর। খবর পেয়ে আশারি এল দেখা করতে। বাংলোর চৌকিদারকে চুপিচুপি প্রশ্ন করল,—এ কোন্ সায়েব?

ভারী গলায় চৌকিদার উত্তর দিল,—দাশ সায়েব, জরীপে এয়েছে। যাওনা ভেতরে, সুবিধে হবে। চৌকিদার মুখ টিপে হাসল।

ন্যাকড়ায় জড়ান বোতলটি হাতে করে আশারি দাঁড়াল ঘরের ভিতর। হাত পা ছড়িয়ে ইজিচেয়ারে বসে ছিল দাশ সায়েব। প্রশ্ন করল—কে!

—এজ্ঞে আমি আশারি, মুরলীগাঁওয়ের মাতব্বর। হুজুরের সেবার লেগে এই এনেচি। আশারি বোতলটা দাশের পায়ের কাছে রাখল।

—তুমি ভুল করছ আশারি, ও-সব আমি খাইনে, তামাক পর্যন্ত না। সখ শুধু আছে শিকারের, তা এদিকে পাওয়া টাওয়া যায় কিছু?

—হুজুর একবার বিন্দাবনী পাহাড়ে চলুন, মেলা শিকার আছে ওখানে।

—আচ্ছা আর কিছু পাওয়া যায় তোমাদের এখানে? মানে—এই ধর—, দাশ একবার চোক চিপল।

উৎসাহের সঙ্গে আশারি বলল,—কিছু ভাববেন না হুজুর, সে আমি যোগাড় করে দেব। কাল সকালে দেখা করব।

বাংলোর বারান্দায় আশারির পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে দাশ সচেতন হয়ে উঠল। চৌকিদার কখন এক-খানা চিঠি রেখে গেছে তার সামনে। স্ত্রীর চিঠি, এতক্ষণে খুলবার অবসর হল দাশের। চিঠিতে সেই পুরাতন কথা,—তুমি কবে আসবে? ছেলেমেয়েরা ভাল আছে। বিরক্ত হয়ে চিঠিখানা সে টেবিলের উপর রেখে দিল।

স্ত্রীর উপর এই বিরাগ সম্পূর্ণ অহেতুক মনে হয় দাশের। ত্রিশ পেরিয়ে গেলেও মাধবীর চেহারায় যৌবনোচিত সৌন্দর্য ও চাপল্য বিদ্যমান। বিবাহ তাদের প্রেমজ, বছর-খানেক কোর্টশিপ চালাবার পর মাধবীকে নিয়ে সে ইলোপ করে। সেদিনের কথা মনে পড়ল দাশের,—শিরায় শিরায় চাঞ্চল্য, রক্ত কণিকায় পাগলকরা রিনিরিনি। কিন্তু এই অনুরাগ কবে কিভাবে বিরাগে পরিণত হল, দাশের সন্ধান মন টের পায়নি কোনদিন। জরীপের কাজে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে, তার একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের প্রথম স্খলন হিজল পাহাড়ে। তারপর কেটে গেল দশটি বৎসর, পাহাড়দেশে দাশ সংগ্রহ করল দশটি পাহাড়ী সঙ্গিনী।

এদিকে মাধবীও নিশ্চেষ্ট ছিল না। দাশ তখন রুপাই পাহাড়ে জরীপ করছে। খবর এল,—মাধবীর পতন হয়েছে। উল্লাসে লাফিয়ে

উঠল দাশ, তার অপরাধী মন থেকে ভারী বোঝা যেন একটা নেমে গেল।

তারপর অনেকবার মনকে প্রশ্ন করেছে দাশ,—কেন এরকম হল! সে ও মাধবী দুজনেই সুশিক্ষিত, সভ্য মানব মানবীর আভরণে ভূষিত। হৃদয়ের একনিষ্ঠতা তাদের কাছেই ত বেশী আশা করা যায়। দাশ চিন্তা করে দেখল —আহার বিহার, বেশভূষা ও যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বাইরে সে জীবনের একটি দিনও নষ্ট করেনি। মাধবীরও সে অবস্থা। মনুষ্য-জীবনের আর সব প্রেরণা তাদের মনে স্থান পায়নি। জীবনকে বিচিত্র বর্ণে বর্ণিত করার সুযোগ এসেছে, কিন্তু উপেক্ষাভরে তাদের দিয়েছে ফিরিয়ে।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাশ তাকাল পাহাড়ের দিকে। অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে পাহাড়কে, এত ঘন যে চোখে ধাঁধা লাগে। চোখ জ্বালা করতে লাগল দাশের, সে আবার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

ম্যাড়ার লড়াইএর দিন কয়েক পরে সূর্য গিয়ে হাজির বিশাই মোড়লের বাড়ি। সকাল-বেলা, দড়ির খাটিয়ায় বসে মোড়ল কাশছিল। এই সময়টা মোড়ল রোজই কাশে আর কাঁচা শালপাতায় মোড়া বিড়ি টানে। মোড়লের জীবনে একমাত্র বিলাসিতা এই কাশি, এ সম্বন্ধে কোন কথা শুনতে সে নারাজ।

খাটিয়ার উপর মোড়লের পায়ের কাছে একটা মুরগী ও এক ভাঁড় তাড়ি রেখে সূর্য বলল,—তুমার বিটির সংগে আমার বিয়া দাও।

—খাসা কথা বলেচ মুশয়, বলতে বলতে ঘরে ঢুকল বিন্দু স্বয়ং। পরনে তার সেই লাল-রঙের ডুরে শাড়ী।

দিয়েচ ত মোটে এক মুরগীর ছা আর তাড়ি ওতে কি আর শাদী হয়! এই ডুরে কাপড় সেদিন মুরলীগাঁওয়ের মাতবর আশারি দিয়ে গেছে।

অনেক কষ্টে কাশি থামিয়ে বিশাই বলল,—মেমেদের ইস্কুলে নেকাপড়া শিখেচে আমার মেয়ে, বিয়ে করে বৌ রাখবা কোথায়?

বিন্দুর অভিযোগ ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দিলেও মোড়লের কথাটা সূর্যকে আঘাত করল।

সে বলল,—কেন, আমার কি বাড়িঘর নেই নাকি?

—ঘর তো মোটে একখানা, বৌ নিয়ে গেলে তোমার শুয়োর মুরগী রাখবা কোথায়?

বিশাই-এর অভিযোগ এত সুস্পষ্ট যে, সূর্যর মুখে উত্তর যোগাল না।

বিন্দু হেসে বলল,—যাও গো মুশয়, শুয়োর চরাও গা।

মুরগী ও তাড়ির ভাঁড় নিয়ে আস্তে আস্তে সূর্য উঠে গেল। বিশাই বলল,—শাদী করতে হয় আশারিকে করে ফ্যাল। আজ না হয় মুরলী-গাঁওয়ে লোক পাঠাই।

বিন্দু উত্তর দিল না, কৌতূহলে তার দৃষ্টি যেন ফেটে পড়লে। অপলকনেত্রে সে তাকিয়ে আছে বৃন্দাবনী পাহাড়ের দিকে।

মোড়লের দৃষ্টি মেয়েকে অনুসরণ করল। বিরক্তির সুরে সে বলল,—কি হা করে চেয়ে আছিস ওদিকে বেহায়ার মত! মেমের ইস্কুলে পড়ে লাজসরম একটুও নেই তোর। ওই হল গিয়ে ডাকবাংলোর সায়েব, জরীপে এয়েচে, সংগে আশারিকেও দেখচি। ওই দ্যাখ ওরা ইদিকেই আসচে।

বিন্দুর মুখে কথাটি নেই। সে শুধু লক্ষ্য করছিল, আশারি জরীপের সায়েবকে আংগুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে, বোধ হয় তাকেই। কি একটা অব্যক্ত অনুভূতি তার শরীরের ভিতর যেন গুমরে উঠতে লাগল। তার ভাবনার অবকাশে সুবেশ এক অপরিচিত পুরুষের ছায়া কখন এসে পড়ল তাদের কুটীর প্রাংগণে।

বিশাই মোড়ল আগন্তুককে অভ্যর্থনা করবার জন্য ছুটে বেরিয়ে এল। পরিচয় দিল আশারি। বলল,—দাস সায়েব, জরীপে এয়েচে। বিকালবেলা যেও একবার ডাকবাংলোয়, তিনি গাঁয়ের মাতবরদের সংগে হুজুর আলাপ করবে। হাতীগাঁওয়ের তুমি, মুরলীগাঁওয়ের আমি, আর বলতে হবে বামুনগাঁওয়ের চাঁদাই মোড়লকে।

বিশাই বলল,—হুজুর যখন ডেকেচে নিশ্চয়ই যাব। তারপর আশারিকে একপাশে ডেকে চুপি চুপি বলল,—একটু পরামর্শ আছে হে তোমার সংগে।

মোড়লের কথায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ না করে আশারি বলল,—সে হবে পরে। ডাক-বাংলোয় দেখা ত হচ্ছেই, তারপর! ওই দ্যাখো, তোমার মেয়ে এরিমধ্যে আলাপ জমিয়েচে সাহেবের সংগে।

ঈষৎ চড়াগলায় বিশাই বলল,—তাতে তোমার কি হে মাতবর? মেমের ইস্কুলে পড়েচে আমার মেয়ে, তোমাদের ঘরের মেয়েদের মত নয়!

এই অপবাদের ইংগিতে আশারির কান ঝাঁ ঝাঁ করত লাগল। ঘরছাড়া এক পিসীর কথা মনে পড়ল তার। দাশ সাহেবকে প্রস্থানের ইংগিত করে সে পথে নেমে পড়ল।

হাতীগাঁও থেকে মুরলীগাঁও প্রায় দেড় ক্রোশ পথ। পথ চলতে চলতে একবার পিছন ফিরে তাকাল আশারি। ডাকবাংলোর পথের যাত্রী দাশ সায়েবও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে বিশাই মোড়লের কুটীরের দিকে। কুটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে বিন্দু, পরনে তার আশারির দেওয়া ডুরে শাড়ী।

কি একটা অস্বস্তিকর উচ্ছ্বাসে আশারি উন্মাদের মত হেসে উঠল। বিশাই মোড়ল বোধ হয় আর কোন দিন তার মেমের ইস্কুলে পড়া মেয়েকে নিয়ে গর্ব করার সুযোগ পাবে না।

তবুও কি একটা ব্যথা তার মনে কাঁটার মত খচখচ করতে লাগল। মুরলীগাঁওয়ের মিশন স্কুলে তাদের সমাজের পড়ুয়া মেয়ে হল বিন্দু। তিন গাঁয়ের ছেলেরা এক সময় ক্ষেপে উঠেছিল সমাজের এই আলোকপ্রাপ্তা মেয়েটির জন্য। কালক্রমে রণে ক্ষান্ত দিল সকলেই, শুধু আশারি ও সূর্য ছাড়া। আশারির বয়স একটু বেশী হলেও সকলেই জানে তার সংগে বিন্দুর বিয়ে একরকম ঠিক। মুরলীগাঁওয়ের বিশখানি কুটীরের মধ্যে আটখানির মালিক আশারি, মুরগী ও শুয়োর তার অগুনতি। সূর্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতেই পারে না আশারি; চাল নেই, চুলো নেই, সম্বলের মধ্যে এক মাড়া।

সেদিনকার সেই লড়াইএর পর থেকে আশারির চিন্তাক্ষেত্রে নতুন এক পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে। বাপ ও মেয়ের প্রস্থানের পর বামুনগাঁয়ের চাঁদাই মোড়ল তাকে চুপি চুপি বলল,—নেকাপড়া জানা মেয়ে সমাজে [illegible] আছে হে মাতবর! কাল চলনা একবার আমাদের গাঁয়ে, দেখিয়ে দেব এখন।

আশারি তারপর বামুনগাঁওয়ে মেয়ে দেখে এসেছে এবং পছন্দও হয়েছে। এইবার প্রতিশোধ নিতে হবে, বড় অপমান করেছে বিশাই মোড়ল আর তার মেয়ে! জরীপের সায়েবও [illegible] সুযোগ পাওয়া গেছে একেবারে হাতে হাতে।

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আশারির সমস্ত শরীর যেন কাঁপতে লাগল।

বেলা দুপুরে। চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ [illegible] বৃন্দাবনী পাহাড়ের বনে বনে আলোর ঝিলি মিলি। মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে দাশ পায়চারি করছে ঘরের ভিতর। তার স্বভাবগম্ভীর মুখে কুটীল হাসি। টেবিলের উপর খোলা [illegible] চিঠিখানা আর একবার সে চোখের সামনে ধরল।

—আমি চললাম, সংগী পেয়েছি।

মাধবী।

এইবার নিয়ে পাঁচবার চিঠিটা পড়া হল দাশের। থ্রি চিয়ার্স ফর মাধবী! দাশের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন এই চিঠিখানি বহুদিন ধরে কামনা করছিল। বেশ চিঠি লিখেছে মাধবী, কৃত্রিমতার নামগন্ধ নেই। স্বামীর শারীরিক কুশল জানবার জন্য ব্যগ্রতা নেই, ছেলেমেয়েদের কোন উল্লেখ নেই। ঠিক এই ধরণের চিঠি মাধবী লিখেছিল তার বাপমাকে যেদিন সে দাশের সংগে ইলোপ করে।

কিন্তু মাধবীকে না হয় বোঝা গেল। শহরের কৃত্রিম আবহাওয়া মানুষের মনে প্রতি-নিয়ত সৃষ্টি করে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত। প্রতিরোধ করা এ যুগের জড়বাদী মনের পক্ষে

সুকঠিন। যে নারী একবার নিছক যৌন আকর্ষণের জন্য সংসারের সকল মমতা বিচ্ছিন্ন করেছে, তার পক্ষে পুনরায় সেইরূপ করা একটুও আশ্চর্য নয়! সব মেয়েই কি সমান? বোধ হয় তাই, নইলে বিশাই মোড়লের মেয়েটা এত শীঘ্র তার প্রস্তাবে রাজী হল কেমন করে! শহর আর গ্রামে পার্থক্য কোথায়? সর্বত্র বিরাজ করছে জীবনধারার একই সুর।

দাশ মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগল। মেয়েদের মন সম্বন্ধে এই মূল্যবান গবেষণা তার নিজের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। মাধবী তাকে আইনসঙ্গত ভাবে মুক্তি দিয়ে গেছে; নীল আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মত তারা দুজনেই পাড়ি দিয়েছে অর্থহীন আনন্দের উদ্দেশে।

মুরলীগাঁওএর মিশনের ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দে দাশের চিন্তাস্রোতে ভাঁটা পড়ল। তিন গাঁয়ের মাতব্বরদের আসার সময় হয়েছে। একটু পরে ঘনিয়ে আসবে পাহাড়ের অন্ধকার, মোড়লদের বিদায় দিয়ে সে প্রস্তুত হবে নৈশ অভিসারের জন্য। বিন্দু প্রতীক্ষা করবে চন্দনবনী পাহাড়ের নীচে, যেখানে ডাক-বাংলোর ছায়াঘন পথ শেষ হয়েছে।

তিন গাঁয়ের মাতব্বরদের নিয়ে এই বৈকালিক সভা দাশের পরিকল্পনা। বিশাই মোড়লকে কোন রকমে দূরে সরিয়ে রাখা, বিন্দুকেও রাত্রির জন্য প্রস্তুত হতে হবে ত!

বারান্দায় অনেকগুলি পায়ের শব্দে দাশ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তিন গাঁর মাতব্বর সদলে উপস্থিত হয়েছে।

সকাল বেলা জরীপের সায়েবের হঠাৎ আগমনে কী এক দুষ্ট নেশায় বিন্দুর মন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই নেশার ঘোরেই সে তার বাপ ও আশারির অলক্ষ্যে সায়েবের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিল। আগন্তুকদের প্রস্থানের পর তার চমক ভাঙল। ডাকবাংলোর সায়েবদের বিশেষ সুখ্যাতি নেই তাদের এই পাহাড় দেশে। এমনি একজন সায়েবের সঙ্গে সেবার চলে গেল আশারির পিসি, আর ফিরে এল না।

বিন্দুর হঠাৎ মনে হল, এবারকার এই ব্যাপারে আশারির হাত আছে। ম্যাড়ার লড়াই-এর দিনকার অপমান সে ভুলতে পারেনি, তাই জরীপের সায়েবকে সেই নিয়ে এসেছে তার সর্বনাশের জন্য। নির্বোধের মত আশারির পিসির পথে সেও পা বাড়িয়েছে। চন্দনবনী পাহাড় ও হাতীগাঁওএর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হবে চিরদিনের জন্য। দুঃসহ শোকভারে বৃদ্ধ বিশাই মোড়লের নিশ্চিত মৃত্যু হবে। জরীপের সায়েবকে দেখলে নেশা লাগে, কিন্তু দূরে চলে গেলে নেশা কেটে যায়!

মেয়ের ভাবান্তর বিশাই লক্ষ্য করল, বলল,—সাবধান বেটি! আমার অপমান যেন না হয়!

রাগের সুরে বিন্দু বলল,—কেন, কি করলাম যে তোমার গায়ে লাগল?

—কিছু নয়, শুধু আশারির পিসির কথা মনে থাকে যেন। উত্তর না দিয়ে বিন্দু বেতের বড় ঝুড়িটা নিয়ে বামুনগাঁওএর হাটের পথে বেরিয়ে গেল।

পথে দেখা চাঁদাই মোড়লের সঙ্গে। মুরুব্বির সুরে চাঁদাই বলল,—কুথা গো!

—এই বামুনগাঁওয়ের হাটে: তুমি কুথা?

—মুরলীগাঁওয়ে, জামাই বাড়ি।

বিস্ময়ের সুরে বিন্দু বলল,—মেয়ের বিয়ে কবে দিলে গো মোড়ল, একবার জানতেও পেলাম না!

—শাদী এখনও হয়নি গো, মুরলীগাঁওএর আশারি মাতবরের সঙ্গে কথা ঠিক হয়ে আছে।

চাঁদাই আর অপেক্ষা করল না, একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে প্রস্থান করল।

বামুনগাঁওএর হাটে যেতে বিন্দুর আর পা সরল না। পাহাড়ের নীচে ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়েছে চন্দনবনী নদী, একটা বাঁকাল মহুয়া গাছ ঝুঁকে পড়েছে তার জলের উপর,—বিন্দু ধীরে ধীরে গিয়ে বসল নদীর কিনারায় গাছতলায়। নিজের মনে একবার বলল,—কী ভয়ানক লোক আশারি মাতবর!

পরনে তার আশারির দেওয়া লাল রঙের ডুরে শাড়ি। সেই দিকে তাকিয়ে বিন্দু মরমে মরে গেল। তার সমস্ত আক্রোশ ফেটে পড়ল শাড়িখানার উপর। বাঘিনীর মত কাপড়খানা নখ দিয়ে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলল সে, তারপর বেতের ঝুড়ি থেকে ছেঁড়া চটটা বার করে গায়ে জড়িয়ে অবসন্নের মত বসে পড়ল। চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার, নিজেকে বড় অসহায় মনে হল বিন্দুর।

সে মনে মনে জানত এবং বিশ্বাসও করত যে, শেষ পর্যন্ত আশারির সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। বাকী রইল শুধু সূর্য, যার বিবাহের প্রস্তাব সেদিন সকাল বেলা বিশাই মোড়ল প্রত্যাখ্যান করেছে। তার বাপের কৃত্রিম আভিজাত্য আর তার নিজের চাপল্যের এই পরিণতি! আশারির পিসির পথ অনুসরণ করা ছাড়া কি অন্য গতি তার নেই? কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রতি অভিমানে বিন্দুর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

চিন্তামগ্ন বিন্দুর খেয়াল ছিল না, বেলা কখন গড়িয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে রঙ সাগরের অতলে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিদায়ের রাগিনী। মহুয়া ফুলের মিষ্ট গন্ধে ঘুমপাড়ানি নেশা! বিন্দুর কোন দিকে লক্ষ্য নেই, সে শুধু অপেক্ষা করছে অন্ধকার হওয়ার জন্য, আত্মগোপন করে বাড়ি ফিরতে হবে।

সহসা সম্মুখে অস্পষ্ট ছায়া দেখে অস্ফুট চীৎকার করে বিন্দু তাকাল পিছন দিকে। দীর্ঘদেহ এক আগন্তুক এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। গোধূলির ফিকে আলোয় বিন্দু চিনতে পারল,—সূর্য ডোম, হাতে একটি পুঁটলি।

দুজনেই অবাক হয়ে চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে, যেন দীর্ঘকাল অদর্শনের পর দুজনের দেখা। নীরবতা ভঙ্গ করল সূর্য, বলল,—তুই!

উল্লাসের সুরে বিন্দু বলল,—হিঁ গো! তুমি কুথা থেকে?

—বামুনগাঁওয়ের হাট থেকে, সড়কের ওপর থেকে নজর গেল জলের দিকে, দেখি কে একজন বসে সাঁঝবেলায়। চেনা চেনা মনে হল, তাই ত ছুটে এলাম।

পরম নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল বিন্দু, তার মন যেন সারাক্ষণ এই লোকটির সান্নিধ্যই কামনা করছিল। তার বিদগ্ধ জীবনের মূলে অমৃতবারিহস্তে আবির্ভাব হয়েছে দেবতার।!

ঘনিষ্ঠভাবে সূর্য লক্ষ্য করছিল বিন্দুকে, বলল—চট পরেছিস বিন্দা! এই নে। সূর্য পুঁটলিটা বিন্দুর হাতে দিল।

পুঁটলি খুলে বিস্ময়ে এক পা পিছিয়ে গেল বিন্দু,—লাল রঙের ডুরে শাড়ি একখানা, ঠিক আশারি তাকে যেমনটি দিয়েছিল।

—এ যে অনেক দাম গো সুয্যি, রোজগার বাড়ল না কি?

—না, ম্যাড়াটা দিলাম বিক্রী করে, এই কাপড় নিয়ে আজ আর একবার যেতাম বিশাই মোড়লের কাছে।

বিন্দু চুপি চুপি বলল,—আর যেতে হবে না, আশারির দেওয়া কাপড় ওই দেখ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তুমার ম্যাড়া গেলেও আমারটি ত আছে, আর তা হলেই তুমার হল।

আবেগে বিন্দুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, নিঃশব্দে তার হাত ধরল সূর্য। আকাশে বাতাসে নীরব প্রশান্তি, মহুয়ার গন্ধ লেগেছে জলের হাওয়ায়, উৎসব-রজনী মুখরিত হয়ে উঠল জোনাকির আলোয়।
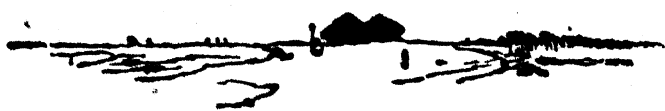
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হইয়া মন্ত্রিমণ্ডল রচনা করেন, তখন তিনি আপনার মনোমত কয়জনকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল দুর্নীতি দূর করিয়া নব-বিধান প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। অনভিজ্ঞতা যে অনেক সময় অক্ষমতার কারণ হয়, তাহা যেমন সত্য, দুর্নীতি তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সংক্রামকও হয়। অল্পদিনের মধ্যেই সেই মন্ত্রিমণ্ডলের সম্বন্ধে অসন্তোষ আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে এবং ৫ মাস পরেই তাহার পতন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় প্রধান মন্ত্রী হইয়া পূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলের কয়জনকে ও পূর্ব মন্ত্রিমণ্ডল হইতে বর্জিত কয়জনের সহিত কয়জন নূতন লোক লইয়া পশ্চিম-বঙ্গের মত ক্ষুদ্র প্রদেশের পক্ষে বিরাটকায় মন্ত্রিমণ্ডল লইয়া কাজ আরম্ভ করেন।

কিন্তু ২৪শে এপ্রিল জানা যায় পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের ২৫ জন সদস্য বিধানবাবুকে পত্র লিখিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে মন্ত্রিমণ্ডল পুনর্গঠিত করিবার প্রস্তাব জানাইয়াছেন।

দলাদলিতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহার যদি অবসান না ঘটে, তবে যে কোন মন্ত্রি-মণ্ডলের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালন করা সম্ভব হইতে পারে না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। সে বিষয়ে যে কংগ্রেসী দল আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই, ইহা অবশ্যই পরিতাপের বিষয়।

গত ৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে মন্ত্রিমণ্ডল পরিবর্তনের প্রস্তাব স্থগিত করা হইয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি মন্ত্রিমণ্ডল লোকমতের সমর্থন লাভ করিতেন, তবে পরিষদের ২২ জন সদস্যের পক্ষে তাঁহার বিরোধিতা করা সম্ভব হইত না এবং দেশের লোককেও দেখিয়া লজ্জিত হইতে হইত না যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রাদেশিক গভর্নরের পদ গ্রহণে অসম্মত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বিরোধিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—কংগ্রেসের সম্ভ্রম ধূলাবলুণ্ঠিত হইতেছে।

যদি জনমতের সমর্থন লাভ না হয়, তবে আরও মন্ত্রী গ্রহণে বা মন্ত্রী পরিবর্তনে যে লোকের অসন্তোষ দূর করা যাইবে, এমন মনে করা যায় না। জনমতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া জনমতের সমর্থন লাভের ব্যবস্থা ব্যতীত কোন গণতান্ত্রিক সরকার স্থায়ী হইতে পারে না।

এই সকল বিষয়ে অবহিত না হইলে পশ্চিমবঙ্গে কোনও মন্ত্রিমণ্ডল সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালন করিতে পারিবেন না।

গত ১৮ই এপ্রিল কলিকাতায় হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদিগের সম্মেলন শেষে হিন্দুস্থানের পক্ষে শ্রীক্ষিতীশ-চন্দ্র নিয়োগী ও পাকিস্থানের পক্ষে মিস্টার গোলাম মহম্মদ সানন্দে ঘোষণা করেন:—

"আমাদিগের আলোচনাফলে আমরা প্রীত হইয়াছি। সম্মেলন অত্যন্ত সফল হইয়াছে।"

কিন্তু মীমাংসার সর্ত লিখিত হইবার পরবর্তী কয়টি ঘটনা হইতে পাকিস্থানের অপরিবর্তিত মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় প্রকট হইবে:—

(১) ২৫শে এপ্রিল প্রায় একশত লোক নদীর অপর পারে পাকিস্থান এলাকা হইতে পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জিলায় রাণীনগর থানার এলাকায় আসিয়া কতকগুলি ক্ষেতে ফসল কাটিতে আরম্ভ করে। এই অনধিকার-প্রবেশকারীরা বর্শা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাহারা পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দলকে আক্রমণ করিলে পুলিশরা—সংখ্যায় মাত্র ১০ জন—আত্মরক্ষার্থে গুলী চালায়। ফলে ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী—এমন কি পুলিশের ইন্সপেক্টার-জেনারেল ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করিয়াছেন।"

২৫শে এপ্রিলের ঘটনা সম্বন্ধে ৩০শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিবৃতি দিয়া যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। পরিদর্শনের ফলে পূর্ব পাকিস্থানের অত্যাচারীরা অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত হইবে কি না তাহা জানা যায় নাই এবং পূর্ব পাকিস্থানের সরকার দুষ্কৃতকারীদিগের শাস্তির কোন ব্যবস্থা করিবেন কি না, তাহাও বলা যায় না।

(২) গত ৩রা মে মুর্শিদাবাদ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল—৬ জন সশস্ত্র কনস্টেবল ও পুলিশের একজন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরকে পাকিস্থানীরা লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ভারত রাষ্ট্র হইতে বে-আইনীভাবে কেরোসিন তেল চালান দেওয়া হইয়াছে—এইরূপ মিথ্যা সংবাদ দিয়া পুলিশ দলকে ধুলিয়ানের দিকে নদীর তীরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় নদীতে একখানি নৌকা রাখা হইয়াছিল। পুলিশের দল নৌকা আরোহণ করিবামাত্র নৌকা কোন অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

পুলিশদলকে এইরূপে অপসারিত করায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই। এই ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ প্রয়োজন।

(৩) শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] (নারায়ণগঞ্জ) সাব-পোস্ট মাস্টার ছিলেন। বদলী হইয়া গত ২৬শে এপ্রিল [illegible] আসিতেছিলেন। পথে পাকিস্থানে [illegible] স্টেশনে তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করা হয়। তাঁহার স্ত্রীর অঙ্গের অলঙ্কার ও নগদ টাকা—এমন কি শয্যা বাসন সবই কাড়িয়া লওয়া হয়। সরকারী কাগজপত্রও লুণ্ঠিত হয়।

রেল স্টেশনে এই ব্যাপার কি [illegible] লোকের অজ্ঞাতে হইতে পারে?

এই সঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গের [illegible] ২টি ঘটনার উল্লেখ করিব—

(১) মুর্শিদাবাদ জিলায় [illegible] এক মুসলমানের গৃহ হইতে সাবিত্রী নাম্নী ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা একটি [illegible] উদ্ধার করা হইয়াছে। [illegible] প্রকাশ, কলিকাতায় হাঙ্গামার সময় মুসল-মানরা তাহার পিতাকে হত্যা করিয়া [illegible] তাহাকে ও তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে [illegible] যায়। সাবিত্রীকে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিলে সে তাহার দুর্দশার বিবরণ বিবৃত করে।

হিন্দু বালকবালিকাদিগকে—বিশেষ বালিকা ও তরুণীদিগকে অপহরণ [illegible] মুসলমান অত্যাচারীদিগের অন্যতম [illegible] বাঙলার মুসলিম লীগ সরকারও এই [illegible] করিয়াছেন। যখন বাঙলা বিভক্ত হইতে [illegible] কলিকাতায় আশ্রয়কেন্দ্রে রক্ষিত বহু হিন্দু বালকবালিকাকে যে মুসলমান বলিয়া [illegible] স্থানে প্রেরণ করা হইতেছিল তাহা [illegible] জানেন। শিয়ালদহ ও দমদম রেল স্টেশন হইতে বহু হিন্দু বালকবালিকাকে উদ্ধার করা হইয়াছিল। কুমারী মুরিয়েল [illegible] লিখিয়াছেন, পূর্ববঙ্গে হিন্দুকে হত্যা করিয়া তাঁহার রোরুদ্যমানা বিধবাকে হত্যাকারীর সহিত বলপূর্বক বিবাহ দেওয়াও হইয়াছিল।

লালবাগের ঘটনার পরে এ কি মনে করা সম্ভব, মুসলিম লীগপন্থীদিগের মনোভাব পরিবর্তন হইয়াছে?

বিহারের প্রধান মন্ত্রী সেদিন বলিয়াছেন, এখনও বিহারে বহু মুসলমান পাকিস্থানকেই তাহাদিগের দেশ মনে করে এবং ভারত রাষ্ট্রের অনিষ্ট করিতে সর্বদাই প্রস্তুত।

(২) গত ৩রা মে কলিকাতার উপকণ্ঠে শিয়ালদহের নিকটে পটুয়াপাড়ায় এক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। কোন মুসলমানের গৃহে বিবাহ উপলক্ষে প্রকাশ্যস্থানে গোবধ করায় হাঙ্গামার উদ্ভব হয়।

প্রকাশ্যস্থানে গোবধ যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে এই মুসলমান পরিবার কি সাহসে সে কাজ করিয়াছিল? গত ঈদের সময় হিন্দুদিগের মনে পাছে সম্প্রীতি রক্ষিত না হয় সেইজন্য বিহারে মুসলমানগণ গোহত্যায় বিরত ছিলেন। সরকার হিন্দুকে যেমন মসজেদের সম্মুখে—পথে—বাদ্যসহ শোভাযাত্রার অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন, তেমনই মুসলমানদিগকে প্রকাশ্য স্থানে গোবধের অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন। সে অবস্থায় যদি কোন মুসলমান প্রকাশ্য স্থানে গোবধ করে, তবে সে দণ্ডার্হ কাজ করে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকল সম্প্রদায়ের লোকের স্বার্থরক্ষায় অবহিত থাকাই সরকারের কর্তব্য। সে কথার যে উল্লেখ করিতে হইতেছে, ইহাই দুঃখের বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে গত মাসে বলা হয়, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগকে যেরূপ সরকারী ও বে-সরকারী ব্যবহার ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুরা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সরকার কিভাবে আয়কর প্রভৃতি ধার্য করিবার সময় বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের গৃহ সরকারের অনুমোদনে অধিকৃত হইতেছে; মুসলমানের গোরস্থানে হিন্দুর জমি বলপূর্বক অধিকার করা হইতেছে; ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিয়াছেন, কলিকাতার ও উপকণ্ঠে সরকার বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে যাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন। তাঁহারা যে বাধ্য হইয়াই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য আসিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিধানবাবু বলিয়াছিলেন, তিনি বহুলোকের বাসত্যাগ সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু যাঁহারা পূর্ব পাকিস্থান হইতে সর্বস্বান্ত হইয়া—বহু লাঞ্ছনাভোগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কর্তব্য পালন করিতে হইবে। আজ লোক পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে সেই কর্তব্য পালনে তৎপর হইতেই বলিতেছে। সেই কর্তব্য পালনে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে তৎপরতা গত ৮ মাসে দেখাইতে পারেন নাই, তাহাই দুঃখের বিষয়। সমস্যার সমাধান যে সহজসাধ্য নহে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাহা হইলেও যাহা কর্তব্য, তাহা পালন করিতেই হইবে—লোক সরকারের নিকট এই মনোভাবের পরিচয়ই পাইবার দাবী করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানেন, আগন্তুকদিগের বাসের জমির অভাব হইবে না; যদি অভাব হয়, তবে সে চাষের জমির। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যদি দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আগমন করেন, তবে পশ্চিমবঙ্গের জমিতে বর্তমান অবস্থায় ও ব্যবস্থায় তাঁহাদিগের জন্য আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যাইবে না। সেইজন্য একদিকে যেমন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া বহুফলোৎপাদিকা কৃষির ও সেচের প্রবর্তন করিতে হইবে, তেমনই বিহারের যে সকল জিলায় বঙ্গভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সকল জিলা—কংগ্রেসের ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি পালনে অবহিত করিতে হইবে। বহুফলোৎপাদিকা কৃষির প্রবর্তন আর দুঃসাধ্য নহে—বিলাতে বৈজ্ঞানিক প্রিন্স ক্রপট্‌কিন তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

যে সকল বঙ্গভাষাভাষী জিলা বর্তমানে বিহারের অন্তর্ভুক্ত সেগুলি পশ্চিমবঙ্গকে দিতে কংগ্রেসের সভাপতি বিহারী বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনিচ্ছা যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সে দাবী দৃঢ়ভাবে করিতে বিরত রাখিয়াছে, তাহা আমরা পরিতাপের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি। সেই দৌর্বল্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার যে বাঙ্গালীর সম্বন্ধে কর্তব্য-শৈথিল্যের অপরাধ করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

আশার বিষয়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এতদিনে সে বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং শ্রীশরৎচন্দ্র বসু অগ্রণী হইয়া সে বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গৃহীত প্রস্তাবের পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে দাবী উপস্থাপিত করিবেন কিনা, দেখিবার বিষয়। কেহ কেহ বলিতেছেন, কেন্দ্রী সরকার এখন কাশ্মীরে হায়দরাবাদের ও পাঞ্জাবের অধিবাসী-বিনিময়ের সমস্যা লইয়া এতই বিব্রত যে, এ সময় এ দাবী উপস্থাপিত করা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইবার পূর্বেই এ বিষয়ে মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবল তাহাই নহে, কংগ্রেসী সরকার যদি কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করাই কর্তব্য বিবেচনা করেন, তবে এই বিষয়ের মীমাংসা অতি সহজেই হইতে পারে; কারণ পশ্চিমবঙ্গ যাহা চাহিতেছে, তাহা যেমন কংগ্রেসের—ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তেমনই বিহারেরও সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করা কর্তব্য বলিলে তাহা অসংগত হয় না। সে বিষয়ে সদিচ্ছা এবং কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ও মর্যাদা রক্ষায় আগ্রহ থাকিলে কেন্দ্রী সরকারকে কোনরূপে বিব্রত করিতে হয় না। কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কি কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ও মর্যাদা রক্ষা করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া এই ব্যাপারে মীমাংসার জন্য অগ্রসর হইবেন না?

## বে-পরোয়া

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

এখনো আমরা অনেকে রাতের তারা কুড়াই ঃ
তাই দিয়ে বুঝি লড়বো, গড়বো সূর্য ঠিক!
বুকের জোরেতে ফুঁ—দিয়ে দিয়ে—ধুলো উড়াই
আকাশের নীল ভাঙবো, ঢাকবো মেঘেতে দিক ঃ
পোড়ো-চাঁদ বুঝি আকাশের চোখে মিট্‌মিটে
[illegible]

চোখের আগুন জানিনা পোড়াবে কার ভিটে…
থাকবে কি ঠিক আস্ত মাথার অম্বরই ?
লক্ষ্য এখনো উপলক্ষ্য কি মাঝ রাতের ?
শ্বাস-রোধ-করা গহ্বরে আর্ড়ি পাতা কি যায় ?
জানিনা, পাঠাবো নিমন্ত্রণের লিপি কাদের

# প্র·না·বি·র এলবাম

## চিত্র-চরিত্র

### দুর্গামোহন দাস
### ও
### দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কিয়ৎপরিমাণে সমাজবহির্ভূত না হইলে সমাজকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। গাড়ির আরোহীরা গাড়িখানাকে টানে না, গাড়ি টানার ঘোড়া দুটা কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্টভাবেই গাড়ির সহিত যুক্ত। পূর্ববঙ্গের সমাজ কতক পরিমাণে বাঙালী সমাজের সামাজিক শাসনের বহির্ভূত। পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ নবদ্বীপ হইতে শুরু করিয়া কলিকাতা পর্যন্ত ভাগীরথীর দুই তীরে বাঙালীর যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহাই বাঙলার স্নায়ু কেন্দ্র। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে কলিকাতার সমাজই সব দিক দিয়া অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে, কলিকাতার সমাজ কেবল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক শাসনের ক্ষেত্রেও আপন অনুশাসন বাঙলা দেশের সর্বত্র প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কলিকাতা সমাজের যখন প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তখনও নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর সামাজিক শাসনের কেন্দ্র ছিল। পশ্চিমবঙ্গ এই সামাজিক শাসনকে নিষ্ঠার সহিত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে—কিন্তু পূর্ববঙ্গে তাহার প্রভাব তেমন ঘনিষ্ঠভাবে অনুভূত হয় নাই। পূর্ববঙ্গের সমাজ অক্ষরতঃ সমাজ-কেন্দ্রের শাসনকে স্বীকার করিয়াও কার্যত যে বিপুল স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তাহা কল্পনাতীত। সেই কারণেই বারংবার পূর্ববঙ্গ হইতে অভূতপূর্ব উন্মাদনার ঢেউ অপ্রত্যাশিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত স্থানু সমাজের উপরে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া দিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এই ঢেউ সমাজ-সংস্কার স্পৃহার আকারে আসিয়াছিল, বিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে আসিয়াছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের দুর্মদ ইচ্ছার আকারে। উদ্দেশ্যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু মূল প্রেরণাটা একই, আর এই মূল প্রেরণা যে সম্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ পূর্ববঙ্গ অনেকাংশে পূর্ব সংস্কারমুক্ত হওয়ায় স্বাধীন ছিল।

ইংরেজি শিক্ষার একটি বাস্তব ফল নারী জাগরণ ও নারীর অবরোধ-মোচন। প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁহার পত্নীর ক্ষেত্রে নারী-জাগৃতির নিয়মের আরোপ করিয়াছিলেন, সেকথা বলিয়াছি: সেকালে অভিজাত ঘরের বধূকে মারাঠী প্রথায় শাড়ী, সেমিজ পরাইয়া, গাড়িতে তুলিয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া জাহাজঘাটে লইয়া যাওয়া একপ্রকার অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল। বিশ্বাসের প্রবল জোর না থাকিলে এবং সেই সঙ্গে প্রথম সিভিলিয়ান হইবার অভাবিত সৌভাগ্য না [illegible]

বলা চলে না, ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত রুচি ও বিশ্বাসের ব্যাপার।

আন্দোলন হিসাবে নারী-জাগরণের ঢেউ যাঁহারা কলিকাতার সমাজে আনিলেন, তাঁহাদের নিবাস পূর্ববঙ্গ, তাঁহারা পূর্ববঙ্গেরই অধিবাসী। দুর্গামোহন দাস এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭০-এর কাছাকাছি স্থায়ীভাবে কলিকাতায় আসিলেন। শতাব্দীর এই চিহ্নটাকেই নারী-জাগরণ আন্দোলনের পূর্ব সীমা বলিয়া ধরা উচিত। দুর্গামোহন ও দ্বারকানাথ পূর্ববঙ্গবাসী হিসাবে অনেক পরিমাণে পূর্ব সংস্কারমুক্ত এবং সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি ছিলেন, কাজেই সমাজ-শকটে প্রবল টান দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। অবশ্য ইতিপূর্বে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরও নারী-সমাজের উন্নতির নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছেন। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সমাজেরই লোক। কিন্তু তাঁহারা বহু পূর্বকালে লিখিত শাস্ত্রের নজির স্বীকার করিয়া লইয়া, বহু পূর্বকালের সহিত একাত্মক হইয়া গিয়া প্রায় সমাজ-বহির্ভূত জীবে পরিণত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা কায়িক বিচারে সমাজ-বহির্ভূত না হইয়াও আত্মিক বিচারে সমাজ-বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বিদ্যাসাগর ও রামমোহন দুজনেই প্রতিভাধর মনীষী। প্রতিভাধর ব্যক্তি সর্বদেশে সর্বকালে কিয়ৎপরিমাণে সমাজ-বহির্ভূত। তাঁহারা সর্বদাই প্রকৃতিদত্ত প্রভূত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া থাকেন।

কিন্তু বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের সংস্কার সাধনের সহিত পরবর্তীকালের দুজনের কীর্তির তুলনা করা বোধ হয় সংগত হইল না। সতীদাহ নিবারণ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন দেশের আইনের ক্ষেত্রের ব্যাপার—ইহা যেন বহির্বাটীর বিষয়। দুর্গামোহন ও দ্বারকানাথ একেবারে অন্তঃপুরে গিয়া কাজ করিলেন—ইহা সত্য সত্যই অবরোধভঙ্গের ব্যাপার। নারী-সমাজে ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারণ উচিত কিনা কিংবা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাস্থলে মেয়েরা পর্দার আড়ালে বসিবে না পুরুষগণের সহিত একাসনে বসিবে, এ সব আইন সিদ্ধ হইবার বিষয় নহে, আর আইন দ্বারা সিদ্ধ হইবার নয় বলিয়াই ইহাদের গুরুত্ব অধিকতর। তাহা ছাড়া ইহাদের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় নজিরও সুলভ নহে। রাষ্ট্রের সহায়তায় [illegible]

বেগে সমাজের মোড় ঘুরাইয়া দেওয়াই যথার্থ সমাজ-সংস্কার।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা হইতে 'অবলাবান্ধব' সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতেন। কর্মের প্রশস্ততর ক্ষেত্র লাভের আশায় তিনি ১৮৭০ সালে অবলাবান্ধব কলিকাতায় তুলিয়া আনিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি যেমন কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাইলেন, তেমনি অনেক কাজের চাপও পড়িয়া গেল। এই সময় দুর্গামোহন দাশ হাইকোর্টে ওকালতি করিবার আশায় বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিলেন। তখন এই দুইজনের উদ্যমে কলিকাতার [illegible] সমাজের চিন্তাধারায় পরিবর্তন দেখা দিল।

প্রথমেই বিবাদ বাধিল ভারতবর্ষীয় [illegible] মন্দিরের উপাসনার আসন সংস্থান [illegible] "কেশববাবু ইঁহাদের অনুরোধে [illegible] বর্ষীয় ব্রাহ্ম-মন্দিরের মধ্যে [illegible] স্থানে মহিলাগণের বসিবার আসন [illegible] করিতে যখন বিলম্ব করিতে লাগিলেন, [illegible] একদিন দুর্গামোহন দাশ মহাশয় এবং [illegible] স্মরণ হয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর [illegible] স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্যাগণসহ [illegible] উপাসনাকালে পুরুষ উপাসকগণের [illegible] আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। [illegible] ব্রাহ্মদলের মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া [illegible] উপাসকমণ্ডলীর প্রাচীন সভাগণ ঘোর [illegible] উত্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন [illegible] বিপদে পড়িয়া গেলেন।" কিছুকাল [illegible] কেশব সেন ব্যক্তিগত অধিকারের সীমানা [illegible] দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিবাদ করিয়া [illegible] ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি [illegible] ছিলেন প্রগতিশীল। এখন তাঁহার [illegible] অধিকতর প্রগতিশীলগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিপদে পড়িবারই কথা। প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উপাসনা করিবার জন্য [illegible] করিল। মহর্ষি আসিয়া অগ্রহের [illegible] উপাসনা ও আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। [illegible] অসাধারণ ব্যক্তি না হইলে একপ্রকার প্রতিশোধ মূলক সূক্ষ্ম তৃপ্তি নিশ্চয় অনুভব করিতে পারিতেন।

নারীর সামাজিক অ[illegible]কার প্রতিষ্ঠার [illegible] অতঃপর দুর্গামোহন যে কাণ্ডটি করিলেন তাহাতে যেমন বুকের পাটার আবশ্যক, [illegible] আবশ্যক সঙ্কল্পের দৃঢ়তার এবং সঙ্গে [illegible] পরিমাণ 'কুইকসট-বৃত্তি'ও [illegible] দুর্গামোহন দাস তাঁহার বিধবা বিমাতার [illegible] দিয়া ফেলিলেন। কাজটি করা বড় সহজ [illegible] নাই। একদল কন্যাকে চুরি করিয়া [illegible] স্থানান্তর করিল, দুর্গামোহন আবার [illegible] উপর বাটপাড়ি করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিলেন এবং অবশেষে বিদ্যাসাগরের সাহায্যে বাঙলাদেশ তোলপাড় করিয়া [illegible]

# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

(১৫)

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে খাজামোল্লা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম।

অধ্যক্ষ জিরার জাতে ফরাসী। কাজেই কায়দা মাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এর নাম আব্দুর রহমান। আপনার সব কাজ করে দেবে,—জুতো বুরুশ থেকে বন-খারাবী। অর্থাৎ ইনি হরফন মৌলা বা সকল কাজের কাজী।'

জিরার সায়েব কাজের লোক,* অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনো না কোনো মন্ত্রীর দপ্তরে ধস্তা-ধস্তি করে কাটান। কাবুলে এরি নাম কাজ। 'ও রভোয়া, বিকেলে দেখা হবে' বলে চলে গেলেন।

কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আব্দুর রহমান—দ্বিতীয়টির কথা সময় এলে হবে।

পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম—ছফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসে আঙ্গুলগুলো দু কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হল, আমার বাবুর্চি আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমীর আবদুর রহমান হত, তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্থানের ভার বইতে পারত। এ কান ও কান জোড়া মুখ— হা করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো-খেবড়ো নাক—কপাল নেই। পাগড়ি থাকায় মাথার আকার-প্রকার ঠাহর হল না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি সাইজের হ্যাটও কান অবধি পৌঁছবে।

রঙ ফর্সা, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেড়ে গিয়ে আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে -কিন্তু কার এমন বুকের পাটা? রুজও তো মাখবার কথা নয়।

চোখ দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কার্পেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড় একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্থানেও নাকি এই ধরণের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ডাবরে যেন দুটো পান্তুয়া ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হল। এ লোকটা ভীমসেনের মত রান্না তো করবেই, বিপদ-আপদে ভীমসেনেরি মত আমার মুশকিল আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনো একটা হদিসের সন্ধানে মগজ আতিপাতি করে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে কুইনিন খেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? কুইনিন সারাবে কে?'

তিনি কুইনিন খাননি। কিন্তু আমি মুসলমান—হিন্দু যা করে, তার উল্টো করতে হয়। তদ্দণ্ডেই আবদুর রহমান আমার মেজর ডোমো, শেফ দ্য কুইজিন, ফাই-ফরমাস বরদার তিনেকার্তন হয়ে একরার-নামা পেয়ে বিড়বিড় করে যা বলল, তার অর্থ 'আমার চশম, শির ও জান দিয়ে হুজুরকে খুশ করার চেষ্টা করব।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'পূর্বে কোথায় কাজ করেছ?'

উত্তর দিল, 'কোথাও না, পল্টনে ছিলুম, মেসের চার্জে। এক মাস হল খালাস পেয়েছি।'

'রাইফেল চালাতে পার?'

একগাল হাসল।

'কি কি রাঁধতে জানো?'

'পোলাও, কুর্মা, কবাব, ফালুদা—।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফালুদা বানাতে বরফ লাগে। এখানে বরফ তৈরি করার কল

'কিসের কল?'

আমি বললুম, 'তাহলে বরফ আসে কোত্থেকে?'

বলল, 'কেন, ঐ পাগমানের পাহাড় থেকে।' বলে জানলা দিয়ে পাহাড়ের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল তবু সবচেয়ে উঁচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম 'বরফ আনতে ঐ উঁচুতে চড়তে হয়?'

বলল, 'না সায়েব, এর অনেক নীচে ব বড় গর্তে শীতকালের বরফ ভর্তি করে রাখ হয়। এখন তাই খুঁড়ে তুলে গাধা বোঝাই ক নিয়ে আসা হয়।

বুঝলুম, খবর-টবর ও রাখে। বললু 'তা আমার হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসন-কোসন বি কিছু নেই। বাজার থেকে সব কিছু কি নিয়ে এসো। রাত্তিরের রান্না আজ আর বো হয় হয়ে উঠবে না। কাল দুপুরের রান্না করো সকাল বেলা চা দিয়ো।'

টাকা নিয়ে চলে গেল।

বেলা থাকতেই কাবুল রওনা দিলুম আড়াই মাইল রাস্তা—দুদু মধুরে ঠাণ্ডা গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছব। পথে দেখি এ পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এত বড় বোঝ বইবার কি দরকার ছিল—একটা মুটে ভা করলেই তো হত।'

যা বলল, তার অর্থ এই, সে যে মো বইতে পারে না, সে মোট কাবুলে বইতে যা কে?

আমি বললুম, 'দুজনে ভাগাভাগি ক নিয়ে আসতে।'

ভাব দেখে বুঝলুম, অতটা তার মাথা খেলে নি, অথবা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি

বোঝাটা নিয়ে আসছিল জানের প্রকা খলেতে করে। তার ভেতরে তেল-নুন-লক সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আর করলে বলল, 'সায়েব রাত্রে বাড়িতেই খাবে যেভাবে বলল, 'তাতে অচিন দেশের নিজ রাস্তায় পাইপাই করা হুঁশিয়ারকে মনে করব না। 'হাঁ, হাঁ, হবে হবে' বলে কি হবে তা করে না ঘুরিয়ে হনহন করে কাবুলের দি চললুম।

খুব বেশি দূর যেতে হল না। দর-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পৌঁছ না পৌঁছতেই দেখি মসিয়ে জিরার টা হাঁকিয়ে টগবগাবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

অর্থাৎ কলেজের বড়কর্তা বসু হিসে আমাকে বেশ দু-এক প্রস্ত ধমক দিতে

যে তাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে দুটোর একটাও আমার নেই।'

বস্‌কে খুশি করার জন্য যার ঘটে ফন্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানির কাগজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যখন বসের উত্তমার্ধ তাঁরি পাশে বসে 'উই, সার্তেনমাঁ, এভিদামাঁ, অতি অবশ্য, সার্টেনলি, এভিডেণ্টলি' বলে তার কথায় সায় দেন। ইংলণ্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া এ্যালবার্ট আঁতাঁৎ হয়েছিল; শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিত্যি নিত্যি ঘরে ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবদুর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তম্বিতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে হুট করে বেরিয়ে গেল।

তখন রোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহ্‌রির সময় অর্থাৎ রাত দুটোয় খাবার জুটলে জুটতেও পারে।

তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। দেখি আবদুর রহমান মোগল তসবিরের গাড়ু-বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারাযন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে মুখ কিছুদিন ধরে ধুলে আমার মুখও আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের উঁচু-নীচুর টক্করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।

খানা টেবিলের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে, আগা আবদুর রহমান খান এককালে মিলিটারী মেসের চার্জে ছিলেন।

ডাবর নয়, ছোটোখাটো একটা গামলা ভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ ঘিয়ের ঘন ক্বাথে সের খানেক দুম্বার মাংস—তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফ্যুল বোম্বাই সাইজের শামী কবাব। বারকোশ-পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোপতা-পোলাও আর তার উপরে বসে আছে একটি আস্ত মুর্গী-রোস্ট।

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভয়বাণী দিল—রান্নাঘরে আরো আছে।

একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিন-জনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছ' জনের রান্না পরিবেষণ করে বলে রান্নাঘরে আরো আছে তখন আর কি করার থাকে? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

রান্না ভালো, আমার ক্ষুধাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে কিছু কম খাইনি। আবদুর রহমানও ডাক্তারী কলেজের ছাত্র যে রকম তন্ময় হয়ে মড়া কাটা দেখে, সেই রকম আমার খাওয়ার রকম-বহর দুই-ই ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম, 'ব্যস্! উৎকৃষ্ট রেঁধেছ আবদুর রহমান—।'

আবদুর রহমান অন্তর্ধান। ফিরে এল হাতে এক থালা ফালুদা নিয়ে। আমি সবিনয়ে জানালুম যে, আমি মিষ্টি পছন্দ করি না।

আবদুর রহমান পুনরপি অন্তর্ধান। আবার ফিরে এল এক ডাবর—পেঁজা বরফের গুঁড়োয় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞেস করলুম, 'এ আবার কি?'

আবদুর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নীচে আঙুর। মুখে বলল, 'বাগে-বালার বরকি আঙুর—তামাম আফগানিস্থানে মশহুর।' বলেই একখানা সসারে কিছু বরফ আর গোটা কয়েক আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণে এক-একটা করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘসে—মেয়েরা যে রকম আচারের জন্য কাগজী নেবু পাথরের শিলে ঘষেন। বুঝলুম, বরফ ঢাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মোলায়েম কায়দা। ওদিকে একটা আঙুর তালু আর জিবের মাঝখানে চাপ দিতেই আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিন করে উঠেছে। কিন্তু পাছে আব্দুর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলী তাই খাইবার পাসের হিম্মৎ বুকে সঞ্চয় করে গোটা আষ্টেক গিললুম। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, 'যথেষ্ট হয়েছে আব্দুর রহমান, এবারে তুমি গিয়ে ভালো করে খাও।'

কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। এবারে আব্দুর রহমান এলেন চায়ের সাজসরঞ্জাম নিয়ে। কাবুলী সবুজ চা। পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সে চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না। তারপর ঐ রকম তৃতীয় চতুর্থ—কাবুলীরা পেয়ালা ছয়েক খায়, অবিশ্যি পেয়ালা সাইজে খুব ছোট—কফির পাত্রের মত।

চা খাওয়া শেষ হলে আব্দুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। ভাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়ত দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আব্দুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ি। ধীরে সুস্থে ঘরের এক কোণে পা মুড়ে বসে বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল। দাঁড়াল। মাথা নীচু করে বলল, 'আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয়নি।'

'কে বলল, পছন্দ হয়নি?'

'তবে ভালো করে খেলেন না কেন?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কি আশ্চর্য, তোমার বপুটার সঙ্গে আমার তনুটা মিলিয়ে দেখো দিকিনি—তার থেকে আন্দাজ করতে পারো না, আমার পক্ষে কি পরিমাণ খাওয়া সম্ভবপর?'

আবব্দুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ফের সেই কোণে গিয়ে আখরোট বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল।

তারপর আপন মনে বলল, 'কাবুলের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। পানি তো পানি নয়, সে যেন গালানো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল তবে ভরসা হয় না কোনো দিন বেরুবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়—আতসবাজির হল্কা। মানুষের ক্ষুধা হবেই বা কি করে।'

আমার দিকে না তাকিয়েই তার পর জিজ্ঞেস করল,

'হুজুর কখনো পানশির গিয়েছেন?'

'সে আবার কোথায়?'

'উত্তর আফগানিস্থান। আমার দেশ—সে কী জায়গা! একটা আস্ত দুম্বা খেয়ে এক ঢোক পানি খান, আবার ক্ষিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তাজী ঘোড়ার সঙ্গে বাজী রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মানুষ তো পায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের উপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।

শীতকালে সে কি বরফ পড়ে! মাঠ, পথ, পাহাড়, নদী, গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে গেছে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরুনোর কথাই ওঠে না। আহা সে কি আরাম! লোহার বারকোসে অংগার জ্বালিয়ে তার উপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানলার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে—দু দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ—কি রকম বরফ পড়ে।'

আমি বললুম, 'সাত দিন ধরে জানলার কাছে বসে থাকব?'

আব্দুর রহমান এমন করুণ ভাবে তাকালো যে মনে হল এ রকম বেরসিকের পাল্লায় সে জীবনে আর কখনো এতটা অপদস্থ হয়নি। ম্লান হেসে বলল,

থুনে। পছন্দ না হয়, আব্দুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।'

খেই তুলে নিয়ে বলল, 'সে কত রকমের বরফ পড়ে। কখনো সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মত, তারি ফাঁকে ফাঁকে আসমান জমিন কিছু কিছু দেখা যায়। কখনো ঘোর-ঘুট্টি ঘন—চাদরের মত নেবে এসে চোখের সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনো বয় জোর বাতাস,—প্রচণ্ড ঝড়। বরফের পাঁজে যেন সে বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে বাঁয়ে উপর নীচে এলো-পাতাড়ি ছুটোছুটি লাগায়—হু হু করে কখনো একমুখো হয়ে তাজী ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে, তারপর সব ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু শুনতে পাবেন সোঁ—ওঁ—ও' —তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের ইঞ্জিনের শিটির শব্দ। সেই ঝড়ে ধরা পড়লে রক্ষে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, না হয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবেন বরফের বিছানায়, তারি উপর জমে উঠবে ছ'হাত উঁচু বরফের কম্বল—গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা। কিন্তু তখন সে বরফের পাঁজা দাঁতাকার কম্বলের মত ওম দেয়। তার তলায় মানুষকে দু'দিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।

'একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে—সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়—তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন তাতে একরত্তি ধুলো নেই, বালু নেই, ময়লা নেই। ছুরির মত ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া নাক, গলা, বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভেতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, ছাতি এক বিঘৎ ফুলে উঠবে—দম ফেলবেন এক বিঘৎ নেবে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক এক বছর আয়ু বাড়বে—এক একবার দম ফেলাতে একশটা বেমারী বেরিয়ে যাবে।

তখন ফিরে এসে, হুজুর, একটা আস্ত দুম্বা যদি না খেতে পারেন তবে আমি আমার গোঁপ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষুধার চোটে আমায় কতল করবেন।'

আমি বললুম, 'হাাঁ, আব্দুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

আব্দুর রহমান গদগদ হয়ে বলল, 'সে বড় খুশির বাত হবে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার খুশির জন্য নয়, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য।'

আব্দুর রহমান ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো।

আমি বুঝিয়ে বললুম, 'তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানলার পাশে বসে কাটাও তবে আমার রান্না করবে কে?'

(১৬)

শো' কেসে রবারের দস্তানা দেখে এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিল জিনিসটা কোন্ কাজে লাগে। দ্বিতীয় আইরিশম্যানও সেই রকম, বলল, 'জানিসনে, এ দস্তানা পরে হাত ধোয়ার ভারী সুবিধে—হাত জলে ভেজে না, অথচ হাত ধোওয়া হল।'

কুঁড়ে লোকের যদি কখনো সখ হয় যে সে ভ্রমণ করবে অথচ ভ্রমণ করার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ হয় তবে তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত পন্থা কাবুলের সঙ্কীর্ণ উপত্যকায়। কারণ কাবুলে দেখবার মত কোনো বালাই নেই।

তিন বছর কাবুলে কাটিয়ে দেশে ফেরার পর যদি কোনো সবজান্তা আপনাকে প্রশ্ন করেন, 'দেহ-আফগানানে যেখানে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মিশেছে তার পেছনের ভাঙা মসজিদের মেহরাবের বাঁ দিকে চেন-মতিফে ঝোলানো মেডালিয়োনেতে আপনি পদ্মফুলের প্রভাব দেখেছেন?' তা হলে আপনি অম্লান বদনে বলতে পারেন 'না' কারণ ও রকম পুরানো কোনো মসজিদ নেই।

তবু যদি সেই সবজান্তা ফের প্রশ্ন করেন, 'বুখারার আমীর পালিয়ে আসার সময় যে ইরানি তসবিরের বাণ্ডিল সঙ্গে এনেছিলেন, তাতে হিরাতের জরিন-কলম ওস্তাদ বিহজাদের আঁকা সমরকন্দের পোলো খেলার ছবি দেখেছেন?' আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন 'না' কারণ কাবুল শহরে ও রকম কোনো তসবিরের বাণ্ডিল নেই।

পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না। যে আস্তাবলে সিকন্দর শাহের ঘোড়া বাঁধা ছিল, সেখানে এখন হয়ত বেগুন ফলছে। পণ্ডিতেরা কম্পাস নিয়ে তার নিশানা লাগাতে 'পারলে আনন্দে বিহ্বল। কোথায় এক টুকরো পাথরে বুদ্ধের কোঁকড়া চুলের আড়াই গাছা ঘষে ক্ষয়ে প্রায় হাতের তেলোর মত পালিশ হয়ে গিয়েছে; তাই পেয়ে পণ্ডিত পঞ্চমুখ—পাড়া অতিষ্ঠ করে তোলেন। এঁদের কথা হচ্ছে না। আমি সাধারণ পাঁচজনের কথা বলছি, যারা দিল্লী আগ্রা সেকেন্দ্রার জেল্লাই দেখেছে। তাদের চোখে চটক, বুকে চমক লাগাবার মত রসবস্তু কাবুলে নেই।

কাজেই কাবুলে পৌঁছে কাউকে চর্কিবাজি খেতে হয় না। পাথর ফাটা রোদ্দুরে শুধু পায়ে ছ'ফার্লোঙ্গী শান বাঁধানো চত্বর ঘষ্টাতে হয় না, নাকে মুখে চামচিকে বাদুড়ের থাবড়া খেয়ে খেয়ে পচা বোটকা গন্ধ আধা অন্ধকারে হিঁচড়ে গিয়ে মিনার শিখর চড়তে হয় না।

আইরিশম্যানের মত দিব্যি হাত ধোওয়া হল, অথচ হাত ভিজল না।

তাই কাবুল মনোরম জায়গা। এবং সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে যে, যা কিছু দেখবার তা বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। বন্ধুবান্ধবের কেউ না কেউ কোনো একটা বাগানে সমস্ত দিন কাটাবার জন্য একদিন ধরে নিয়ে যাবেই।

গুলবাগ কাবুলের কাছেই—হেঁটে, টাঙ্গায় মোটরে যে কোনো কৌশলে যাওয়া যায়।

তিন দিকে উঁচু দেওয়াল, একদিকে কাবুল নদী; তাতে বাঁধ দিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা পুকুরের মত শান্ত স্বচ্ছ করা হয়েছে। বাগানে অজস্র আপেল-নাসপাতির গাছ, নরগিস ফুলের চারা, আর ঘন সবুজ ঘাস। কার্পেট বানাবার অনুপ্রেরণা মানুষ নিশ্চয় এই ঘাসের থেকেই পেয়েছে। সেই নরম তুলতুলে ঘাসের উপর ইয়ার-বক্সী ভালো ভালো কার্পেট পেতে গাব্দাগোব্দা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবেন পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বেন।

দীর্ঘ তন্বাংগী চিনারের ঘন-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন আস্বচ্ছ ফিরোজা আকাশ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবেন কাবুলে পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘের হুটোপুটি। কিম্বা দেখবেন হুটোপুটি নয়, এক পাল সাদা মেঘ যেন গৌরীশংকর জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কোমর বেঁধে প্ল্যানমাফিক একজন আরেকজনের পেছনে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চূড়ো পেরিয়ে ওদিকে চলে যাবার তাদের মতলব। ধীরেসুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটে চড়ার পর কোন অদৃশ্য নন্দীর ত্রিশূলে ঘা খেয়ে নেবে আসছে, আবার এগুচ্ছে, আবার ধাক্কা খাচ্ছে। তারপর আলাদা ট্যাকটিক চালাবার জন্য দু'তিনজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বিলকুল এক হয়ে গিয়ে নূতন করে পাহাড় বাইতে শুরু করবে। হঠাৎ কখন পাহাড়ের আড়াল থেকে অন্য আরেক দল মেঘ খানিকটে মাথা দেখিয়ে এদের যেন লজ্জা দিয়ে আড়ালে ডুব মারবে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিনারপল্লব, পাহাড় সব কিছু ছাড়িয়ে, ঊর্ধ্বে অতি ঊর্ধ্বে আপনারি মত নীল গালচের শুয়ে একখানা টুকরো মেঘ অতি-শান্ত নয়নে নীচের মেঘের গৌরীশংকর অভিযান দেখছে, আপনারি মত। ওকে 'মেঘদূত' করে হিন্দুস্থান পাঠাবার যো নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় যেন বাবুর-শাহের আমল থেকে সে ঐখানে শুয়ে আছে, আর কোথাও যাবার মতলব নেই। পানসিরের আব্দুর রহমান এরি কাছ থেকে চুপ করে বসে থাকার কায়দা রপ্ত করেছে।

নাকে আসবে নানা অজানা ফুলের মেশা গন্ধ। যদি গ্রীষ্মের অন্তিম নিশ্বাস হয়, তবে তাতে আরো মেশানো আছে পাকা আপেল, আপ্রিকোটের বাসি বাসি গন্ধ। তিন পাচিলের বন্ধ হাওয়াতে সে গন্ধ পচে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি নেশার আমেজ লাগায়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে—তখন শুনতে পাবেন উপরের হাওয়ার দোলে তরু পল্লবের মর্মর আর নাম-না-জানা পাখীর জান-হানা-দেওয়া ক্লান্ত কূজন।

সব গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ভেসে আসবে বাগানের এক কোণ থেকে কোর্মা-পোলাও রান্নার ভারী খুশবাই। চোখে তন্দ্রা, জিভে জল। দ্বন্দ্বের সমাধান হবে হঠাৎ গুড়ুম শব্দে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে মিনিট-খানেক ধরে তার প্রতিধ্বনি শুনে।

কাবুলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে বেলা বারোটার কামান দাগার শব্দ। সবাই আপন আপন ট্যাঁকঘড়ি খুলে দেখবেন—হাতঘড়ির রেওয়াজ কম—ঘড়ি ঠিক চলছে কি না। কাবুলে এ রেওয়ার অলঙ্ঘনীয়। ঘড়ি না বের করা স্নবের লক্ষণ, 'আহা যেন একমাত্র ও'য়ার ঘড়িরই চেকআপের দরকার নেই—'

যাঁদের ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায় বারোটা দেখালো না, তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। কাবুলের কামান নাকি ইহজন্মে কখনো ঠিক বারোটার সময় বাজে নি। কারো ঘড়ি যদি ঠিক বারোটা দেখাল, তার তবে রক্ষে নেই। সকলেই তখন নিঃসন্দেহ যে, সে ঘড়িটা দাগী-খুনী—ও'দের ঘড়ির মত বেনিফিট অব ডাউট পেতে না। গান্ধার শিল্পের বুদ্ধ-মূর্তির চোখে যে অপার তিতিক্ষা, তাই নিয়ে সবাই তখন ঘড়িটার দিকে করুণ নয়নে তাকাবেন।

(ক্রমশ)

# চায়ে-বাপে

বাংলাদেশের মন্ত্রীদের ভাগ্য বিপর্যয়েৎ সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছিল। এ ... সেই—"অপরাধী জানিল না কিবা অপরাধ

... বিচার হইয়া গেল" গোছের ব্যাপার। ... খুড়ো বলিলেন,—"তবে একটা গল্প ...। বহুদিন আগে একবার পাঁঠারা প্রজাপতি ... কাছে নালিশ জানিয়েছিল যে, নরলোকে ... বসবাস করার আর কোন উপায় নেই, ... দেখলেই মানুষের ক্ষুধার উদ্রেক হয় ... তারপর.........পাঁঠারা আর কথাটা শেষ ... পারল না, অশ্রুনীরে শ্মশ্রু ভেসে যেতে ...। প্রজাপতি বললেন,—"বাবা, এ ...দের অপরাধ নয়, অপরাধ তোমাদের এই ... কান্তির। তোমাদের দিকে তাকিয়ে ...ই"......প্রজাপতি কথাটা শেষ করতে ... না, রসনানীরে তারও শ্মশ্রু ভেসে ... লাগল। উপস্থিত ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই, ... তো মন্ত্রীদের অপরাধে হচ্ছে না, এ ... তাদের গদিটির, ওটির দিকে তাকিয়ে ... রিপুটিকে দমন করা সত্যিই শক্ত!

* * * * *

বোম্বাইর এক মহিলা সভার অভ্যর্থনায় পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন,—...দের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িক ...র ক্ষত চিকিৎসা একমাত্র মহিলারাই ... পারেন। শ্যামলাল বলিল,—"বুঝলাম ... চিকিৎসার জন্যে চাঁদসীর বদলে ...।

* * * * *

মুনাফাখোরদের অতি লোভে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় বৃটেনের গিন্নীরা ঠিক করিয়াছেন যে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া তাঁরা আর কিছুই কিনিবেন না। "আমাদের গিন্নীরা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর কিছু কিনবেন না ঠিক করে দেখছেন মুনাফাখোররা কতদূর যায়"—মন্তব্য বলা বাহুল্য বিশুখুড়োর।

* * * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্সের ভারতীয় ট্রেড কমিশনার নাকি ইউরোপে ভারতের আমকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা
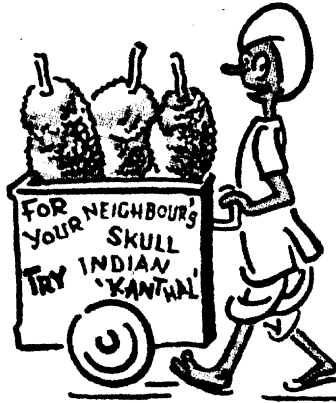
করিতেছেন। খুড়ো বলিলেন,—"আমের বদলে কাঁঠাল চালু করিবার চেষ্টা করলে কাজটা সহজ হোত। কাঁঠাল ইতিমধ্যেই ইউরোপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, কেননা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার বিদ্যেটা এঁরা বেশ ভালো করেই অর্জন করেছেন।"

* * *

ষষ্ঠকহলমএ একটি চার বৎসরের বালক নাকি রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ি চালাইবার অপরাধে ধৃত হইয়াছে। আমাদের এখানে অবশ্য এতটা ইঁচড়ে পাকা ড্রাইভার নাই, তবে সাবালকরা যে নাবালকের বায়নাক্কা নিয়া গাড়ি চালান—তার প্রমাণ পুলিশের রিপোর্টেই পাওয়া গিয়াছে।

* * * * *

রাশিয়ার সুরশিল্পে বুর্জোয়া সুরের ছাপ পড়িয়াছে বলিয়া নাকি কমিউনিস্টরা অভিযোগ করিয়াছেন। খুড়ো আমাদিগকে
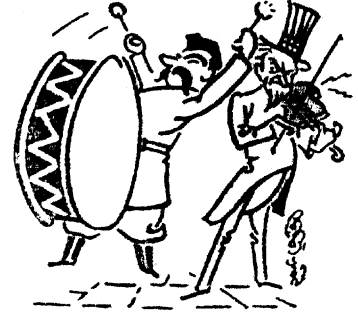
বুঝাইয়া বলিলেন,—অর্থাৎ আমেরিকা সাধিতেছে "সারেগা", রুশ তাই রোষাবিষ্ট হয়ে বলেছেন সারবে কে, আমরাও সাধব "মারেগা"।

* * * * *

শুনিলাম, সম্প্রতি নাকি আর একবার আণবিক বোমা নিক্ষেপের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারের ফলাফল কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। খুড়ো বলিলেন,—"তার কারণ আছে, আর বারের বিকিনি এ্যাটোলের পরীক্ষায়—ছাগল ছানাটি পর্যন্ত মরলো না শুনে নাকি স্ট্যালিন নুয়ে নুয়ে করেছিলেন—অবিশ্যি এ সংবাদটাও রয়টার সংগ্রহ করতে পারেননি।

* * * * *

প্রস্তরীভূত আম্বেদকার (তাঁর স্বকীয় স্বীকারোক্তি দ্রষ্টব্য) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি তৃতীয় দল গঠনের জন্য তপশীলী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশামৃত দান করিয়াছেন। অমৃতটা নেহাৎ প্রস্তর-নিষ্কাশিত বলিয়া তপশীলীরা তা গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছেন না।

* * * *

পাকিস্থানকে ধর্ম-প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রের দাবী"—একটি সংবাদের শিরোনামা। খুড়ো বলিলেন—"এ দাবী পাকিরা (পাপীরা নয়) সহজেই মানবেন, কেননা রাষ্ট্রকে অধর্মের প্রভাবযুক্ত করবার জন্য তাঁরা পা বাড়িয়েই আছেন।"

* * * *

ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চক্রবর্তী রাজাজী উপদেশ দিয়াছেন—ভারতবাসী যেন নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মত ঘর-সংসার গুছাইতে আরম্ভ করেন। বিশু-

খুড়ো রাজাজীর এই রসালো উপদেশটির উপর মন্তব্য করিয়া বলিলেন—"স্বামী-স্ত্রী ঘর-দোর গোছাতে প্রস্তুত হয়েই আছেন, কিন্তু বাদ সাধছেন যে ননদিনীরা।"

* * * *

কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের অর্থসচিব জানাইতেছেন যে, কায়েদে আজম জিন্না, জনাব এবং বেগম লিয়াকৎ আলি নাকি

পাকিস্তানে প্রস্তুত ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র পরিধান করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শ্যাম বলিল—"বিকল্পে, প্যাকিস্তানে পাচার-করা বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ চলবে কিনা, তা খোলাসা করে বলে দিলে ভালো করতেন।"

* * * *

কলিকাতাকে পরিচ্ছন্ন রাখার একটি আন্দোলনও ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"এতে অপরিচ্ছন্নদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে আবার পথে পথে ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদের জিগীর না উঠলে বাঁচি।"

* * * *

জাপানের ট্রেড কমিশন ভারত হইতে কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্যান্য কাঁচামালের মধ্যে চামড়ার উল্লেখও আছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—চামড়াটা গণ্ডারের হ'লে আমরা তা প্রচুর পরিমাণেই রপ্তানি করিতে পারি, আর তা ছাড়া বর্তমানে এই চামড়াটার চাহিদাই বুঝি জাপানে খুব বেশী।"

* * * *

যুক্তরাষ্ট্রের কোন সার্কাস কোম্পানীর এক প্রতিনিধি নাকি শীঘ্রই জন্তু-জানোয়ার সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। খুড়ো বলিলেন—"এই সঙ্গে রাশ্যার কিছু ভালুক সংগ্রহ করে নিলে সার্কাসটা জমতো ভালো, ছেলেরা হাততালি দিয়ে আওড়াতে পারত—বুলেবুলিটির মুখটি কালো, ভালুক জানে বাসতে ভালো।"

* * * *

কলিকাতায় ফুটবল মরসুম শুরু হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় একটা স্টেডিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন, এই বার্ষিক বিবৃতিটির ছাপা এখনও শুরু হয় নাই, হইলে

সেই বিবৃতিসম্বলিত কাগজখানা বগলে করিয়া আমরা রেম্পাটে গিয়া আসন গ্রহণ করিতে পারি।

## প্যালেস্টাইনে সংকট

আরব ও ইহুদীদের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ্য সংঘর্ষের ফলে প্যালেস্টাইন চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, একে সরাসরি যুদ্ধ আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হয় না। আইন ও শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই—যাকে আমরা নৈরাজ্য বলি ঠিক সেই অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছে এই ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে। আগামী ১৫ই মে'র মধ্যে বৃটেন ম্যাণ্ডেট ত্যাগ করছে—তাই এ কয়দিনের জন্যে প্যালেস্টাইনে শান্তিরক্ষার কোন চাড় নেই তার। সে তার অসামরিক অধিবাসীদের স্থানান্তরিতকরণ, সামরিক বাহিনী ও সমরোপকরণ অপসারণ নিয়েই ব্যস্ত। যুযুধান দুই পক্ষের মারামারিতে প্যালেস্টাইন রইল কি গেল তাতে তার বিশেষ কিছু যায় আসে না। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন স্পষ্ট করে আবার বিশ্ববাসীদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, ১৫ই মে'র পর বৃটেন আর কোন মতেই এই রাজ্যটির শাসনভার হাতে রাখবে না—১৫ই মে তারিখে তার ম্যাণ্ডেট ত্যাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়। হাউস অব কমন্সে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, মাত্র একটি সর্তে ১৫ই মে'র পরেও বৃটেন কিছুকালের জন্যে প্যালেস্টাইনের শাসনকার্য চালাতে রাজী—সে সর্ত হল এই যে, ইহুদী ও আরবদের মধ্যে আপোষরফা সম্পন্ন হওয়া। বর্তমানে আরব-ইহুদী বিদ্বেষ ও তাদের পারস্পরিক সংগ্রাম এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, বৃটেনের আরোপিত এ সর্ত পূরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ১৫ই মে তারিখে বৃটেনের প্যালেস্টাইন শাসন ত্যাগ এক রকম অবধারিত। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে যে বিল আনা হয়েছিল সে বিলও আইনে পরিণত হয়েছে।

প্যালেস্টাইন শাসনের দায়িত্ব এবার সরাসরি এসে পড়েছে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের উপর অর্থাৎ কার্যত আমেরিকার উপর। এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটির গত তিন মাসের দুর্বল নীতিই যে প্যালেস্টাইনের বর্তমান বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী, একথা না বললেও চলে। প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট কার্যক্রম স্থির করে যদি তাকে দৃঢ়ভাবে বাস্তবে রূপ দানের চেষ্টা করা হ'ত তবে আজ এ সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হত না। কিন্তু তার কোন চেষ্টাই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে করা হয়নি। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণই আরব-ইহুদী সংগ্রামের মূল কারণ। অথচ এই বিভাগ পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে কোন চেষ্টাই করা হয়নি। আজ বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসানে প্যালেস্টাইনে অছির শাসন প্রবর্তন সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে—কিন্তু সে বিষয়ে যথোচিত উদ্যোগ আয়োজনের কোন চিহ্ন নেই। বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের কর্তারা মিলিত হয়ে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে আপোষ স্থাপনের চেষ্টা করছেন—আর এদিকে প্যালেস্টাইনে আগুন জ্বলছে। একাধারে আরব, ইহুদী ও খৃস্টানের পবিত্রভূমি জেরুজালেমকে বাঁচানোর জন্যে উভয় পক্ষে একটা আপোষও হয়ে গেছে বলে প্রকাশ। কিন্তু তার সর্তের

**ক্রিকেট**

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংলণ্ড ভ্রমণ তালিকা অনুযায়ী খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। এই পর্যন্ত তিনটি খেলা শেষ হইয়াছে এবং তিনটিতেই অস্ট্রেলিয়ান দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল উরস্টার ও লিস্টার দলকে শোচনীয়ভাবে ইনিংসে পরাজিত করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ছাড়া উরস্টারের বিরুদ্ধে ব্রাডম্যান ও মোরিস শতাধিক রাণ করেন। কিথ মিলার লিস্টারের বিরুদ্ধে দ্বিশতাধিক রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল ইয়র্কসায়ার দলকে ৪ উইকেটে পরাজিত করিয়াছেন। তবে এই খেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া মাঠের অবস্থা খুবই খারাপ করে। শুষ্ক মাঠে খেলা হইলে ফলাফল পূর্বের দুইটির মতনই হইত বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হইবে না। পর পর তিনটি খেলায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়া অস্ট্রেলিয়ান দল দলীয় শক্তির অনেকখানি পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত প্রবন্ধাদি ইংলণ্ডের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ইংলণ্ডের সাংবাদিকগণ বিভিন্ন দলের এমন কি ইংলণ্ডের টেস্ট দলের সাফল্য সম্বন্ধে বেশ কিছু সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক নহে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহার পরবর্তী খেলাগুলিতেও একের পর এক করিয়া অস্ট্রেলিয়ান দল যদি শোচনীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে পরাজিত করে তখন ইংলণ্ডের ক্রিকেট পরিচালকগণের কি শোচনীয় অবস্থা হইবে, আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। সত্যই ইহাদের জন্য আমাদের দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।

**উরস্টার বনাম অস্ট্রেলিয়া**

এই খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংস ও ১৭ রানে উরস্টার দলকে পরাজিত করেন। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

উরস্টার প্রথম ইনিংস : ২৩৩ রান (পামার ৮৫, কুপার ৫১, হাউওয়ার্থ ৩৭ রানে নট আউট, জনসন ৫২ রানে ৩টি, টোসাক ৩৯ রানে ২টি, ম্যাককুল ৩৮ রানে ২টি ও লিন্ডওয়াল ৪১ রানে ২টি উইকেট পান)।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস : ৮ উইঃ ৪৬২ রান (ডিক্লেয়ার্ড), (বার্নেস ৪৪, মোরিস ১৩৮, ব্রাডম্যান ১০৭, মিলার নট আউট ৫০, হ্যাসেট ৩৫, জ্যাকসন ১৩৫ রানে ৬টি উইকেট পান)।

উরস্টার দ্বিতীয় ইনিংস : ২১২ রান (আউটস্নর্ন ৫৪, পামার ৩৪, কুপার ২২, ম্যাককুল ২৯ রানে ৪টি, জনসন ৭৫ রানে ৩টি উইকেট পান)।

**লিস্টার বনাম অস্ট্রেলিয়া**

এই খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংস ও ১৭১ রানে লিস্টার দলকে পরাজিত করে। খেলার ফলাফল :—

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস : ৪৪৮ রান (মিলার নট আউট ২০২ রান, ব্রাডম্যান ৮১, বার্নেস ৭৮, জ্যাকসন ৯১ রানে ৫টি উইকেট পান)।

লিস্টার প্রথম ইনিংস : ১৩০ রান (ওয়ালস ৩৩, রিং ৪৫ রানে ৫টি, জনসন ৫০ রানে ২টি উইকেট পান)।

লিস্টার দ্বিতীয় ইনিংস : ১৪৭ রান

**ইয়র্কশায়ার বনাম অস্ট্রেলিয়া**

এই খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল ৪ উইকেটে জয়লাভ করে। খেলায় কোন দলই অধিক রান সংগ্রহ করিতে পারে নাই। খেলার ফলাফল :—

ইয়র্কশায়ার প্রথম ইনিংস : ৭১ রান (মিলার ৪২ রানে ৬টি ও জনস্টন ২২ রানে ৪টি উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস : ১০১ রান (মিলার ৩৪, স্মেলস ৫২ রানে ৬টি উইকেট পান)।

ইয়র্কশায়ার দ্বিতীয় ইনিংস : ৮৯ রান (জনস্টন ১৮ রানে ৬টি ও মিলার ৪৯ রানে ৩টি উইকেট পান)।

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস : ৬ উইঃ ৬৩ রান (স্মেলস ৩২ রানে ৩টি ও ওয়ার্ডল ২৮ রানে ২টি উইকেট পান)।

**হকি**

বাঙলার খ্যাতনামা বেটন কাপ প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, ফাইনাল খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই। যুক্তপ্রদেশ ও পোর্ট কমিশনার্স দল এই খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছে। উভয় দল ১টি করিয়া গোল করে। অতিরিক্ত সময় খেলা হইয়াও কোন ফল হয় না। দ্বিতীয় দিন খেলা হওয়া অসম্ভব কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলকেই আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার জন্য পরের দিনই বোম্বাই যাত্রা করিতে হইবে। টসে জয় পরাজয়ের কল্পনা পরিচালকগণ করিতে পোর্ট দল প্রথম ছয় মাস কাপটি যুক্তপ্রদেশ দলকে দিবার জন্য অনুরোধ করেন। পরিচালকগণ তাহা অনুমোদন করেন। স্মরণ থাকিতে পারে ১৯৪১ সালেও এইভাবে ফাইনাল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছিল।

এই প্রতিযোগিতার সকল খেলা আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য না হইলেও অধিক সংখ্যক খেলাই আমরা দেখিয়াছি। ইহাতে আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে বাঙলার হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্ন স্তরের। ইহার উন্নতি করিতে হইলে নিয়মিত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

**কলিকাতা হকি লীগ**

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন পরিচালিত কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইয়াছে।

প্রথম ডিভিসনের খেলা সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করিব। কারণ ইহার উপর বাঙলার হকি খেলার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। অন্যান্য সকল ডিভিসনের খেলা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও অব্যবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে আমাদের কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইতেছে না। দুইটি দল মাঠে উপস্থিত, আম্পায়ার নাই, খেলা বন্ধ হইল এইরূপ ঘটনা প্রায় প্রত্যেক দিনই হইয়াছে।

প্রথম ডিভিসনের খেলা পরিচালনার অব্যবস্থা বিশেষভাবে চোখে পড়িয়াছে। অনেক আম্পায়ারের নির্দেশের মধ্যে আইনকানুনের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ আবার অনেক খেলায় ইচ্ছা করিয়া নির্দেশ দিয়া খেলা পণ্ড করিয়াছেন। ইহার জনাই অনেক দিনই মাঠে দর্শকগণকে খেলার শেষে পরিচালকগণকে ভর্ৎসনা করিতে দেখা হইলে যে পরিণাম হওয়া স্বাভাবিক তাহাই শেষ পর্যন্ত দেখিতে হইয়াছে। একদিন খেলার শেষে ভীষণ মারপিট হয়। পরিচালকগণ যে সেই অবস্থার মধ্যে নির্যাতনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। এই দিনের অপ্রীতিকর ঘটনা দেখিয়া সকল সময়েই মনে হইয়াছে "পরিচালনার সুব্যবস্থা কবে হইবে" হকি পরিচালকগণকে আমরা অনুরোধ করিব তাঁহারা যেন এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তির পথ রোধের ব্যবস্থা এখন হইতেই করেন।

**ফুটবল**

বাঙলার ফুটবল মরসুম সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। দীর্ঘ দুই বৎসর বাঙলার মাঠে ফুটবল খেলা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয় নাই। সেইজন্য খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুশীলনের অভাবে একেবারেই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এইদিকে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কতিপয় পরিচালক বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবল দল প্রেরণের জন্য খুবই তোড়জোড় করিতেছেন। ইহার ফলে বাঙলার অনেক বিশিষ্ট ফুটবল দলকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কারণ অনেকেই দলের কয়েকটি বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। ভারতের ফুটবল ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা বাঙলাতেই। সুতরাং সেই বাঙলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যখন খুবই নিম্নস্তরের তখন বিশ্ব অনুষ্ঠানে ভারতীয় দল প্রেরণের কি সার্থকতা আছে আমরা কল্পনা করিতে পারি না। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের প্রচেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয় তাহার জন্য ট্রায়াল খেলার ব্যবস্থা করেন। এই খেলা শিলংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের কয়েকটি প্রদেশের ফুটবল খেলোয়াড়গণ এই খেলার জন্য মনোনীত হন। এই মনোনীত খেলোয়াড়গণ শিলংয়ে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করেন। এই স্থানের খেলা দেখিয়াই অনেকে বলিতে আরম্ভ করেন "বিশ্ব অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবল দল প্রেরণ করিবার মতন খেলোয়াড় ইহাদের মধ্যে নাই।" এই আলাপ-আলোচনা শেষ হইতে না হইতেই দেখা গেল পরিচালকগণ কলিকাতায় এক প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই খেলা ৭০ মিনিটব্যাপী হয়। ৫০ মিনিট খেলিবার পর প্রত্যেকটি খেলোয়াড় এত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন যে, খেলার শেষদিকে দর্শকগণের মাঠে বসিয়া থাকাই একরূপ অসম্ভব হয়। ইহাদের বিরক্তির ফল স্বরূপ দেখা যায় এই প্রদর্শনী খেলা সম্পর্কে অধিকাংশ সাংবাদিক তীব্র কটূক্তি করিয়াছেন ও বলিয়াছেন এই প্রহসনের পালা আর দীর্ঘদিন স্থায়ী করিয়া কোনই ফল হইবে না। "বিশ্ব অনুষ্ঠানে যোগদানের মত খেলোয়াড় ভারতে নাই।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐ খেলার ঠিক পরের দিনই দেখা গেল ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল দল নির্বাচিত হইয়া গিয়াছে। এই দল নির্বাচনও যে কত ভাল হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ঐ নির্বাচিত দল প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের নিকট ২—১ গোলে পরাজিত হইল। এই খেলার পর নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে পর্যন্ত অনেককে বলিতে শোনা গিয়াছে "অনুষ্ঠানে গিয়া কিছুই করিতে পারিব না।" খেলোয়াড়গণ উপলব্ধি করিতেছেন তাহাদের অক্ষমতার কথা, কিন্তু পরিচালকগণ আছেন নির্বিকার। ইহারা যে কোন স্তরের লোক ধারণাই করিতে পারা যায় না। দেশের মানসম্মান লইয়া ইহারা এইভাবে ছিনিমিনি খেলিবেন অথচ দেশবাসী ইহার কোনই প্রতিবাদ করিবেন না? "ফুটবল দল যাইতে পারে না" এই রব সর্বসাধারণের

**বোরখা**—নেশাদ বানু। প্রকাশক—ফিনিক্স প্রেস লিমিটেড, ৫৬, বেণ্টিংক স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পরদার আড়ালে একটি মুসলিম মহিলার অবরুদ্ধ জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে লেখা মর্মস্পর্শী বাস্তবোপন্যাস। নায়িকা রোশেন তার বন্ধু সিতারার কাছে লেখা কয়েকখানা চিঠিতে তার ব্যর্থ বেদনাময় জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছে। লেখিকার ভাষার ওপর দখল, চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা, মননশীলতা এবং দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অসাধারণ। তাঁর রচনায় ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু শ্লেষের তিক্ততা নেই। উপন্যাসটির সমাপ্তি অত্যন্ত করুণ, মনে তার ছাপ থেকে যায়।

কাজী আবদুল ওদুদ উপন্যাসটির ভূমিকায় লেখিকার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তার সঙ্গে আমরা একমত। এটি লেখিকার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, কিন্তু এর পেছনে আছে অনেক-দিনের সাধনা এবং সম্ভবতঃ উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক। নিঃসংকোচে বলা যায়, মুসলিম সমাজের চিত্র নিয়ে রচিত এই অপরূপ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। এই উপন্যাসটি পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলে দিয়ে প্রকাশক সত্যিই আনন্দ ও গর্ববোধ করতে পারেন এবং লেখিকার পরবর্তী উপন্যাস "নূরজাহান"ও এঁরা প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছেন একথা "প্রকাশকের নিবেদন" মারফৎ জেনে আমরা "নূরজাহান"-এর জন্যও সাগ্রহ অপেক্ষায় রইলাম।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

**বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকা**—হৈমন্তিক সংখ্যা।

বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকার হৈমন্তিক সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়া সুখী হইলাম। ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের নানাবিষয়ক রচনাসম্ভারে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। অধিকাংশ রচনাই সুখপাঠ্য এবং শিক্ষনীয় বিষয়ে পূর্ণ। ৩।৪৮

**ইংগিত**—সম্পাদক—শ্রীনরেন্দ্র দে। কার্যালয়—দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২।

ইংগিত মাসিক পত্র। উহার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। সংখ্যাখানা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। নানা তথ্যপূর্ণ রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। ৩।৪৮

**মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযান**—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক—বঙ্গবাসী লিমিটেড, ২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

প্রবাদ বাক্যে বলে, তরবারিতে রাজ্য জয়, আর স্নেহে হৃদয় জয়। রাজ্য জয়ের নেশায় উন্মত্ত হইয়া এক একদল লোক নির্মম তরবারি চালাইয়াছে, দেশকে করিয়াছে ক্ষত বিক্ষত। তারপর আসিয়াছে, গান্ধীজীর, হৃদয় জয়ের পালা। নোয়াখালি, ত্রিপুরায়, বিহারে, কলিকাতায় ও দিল্লী শহরে স্নেহ ও অহিংসার অমোঘ শক্তি দেখাইয়া মহাত্মাজী অবশেষে শেষোক্ত শহরে বীরের মৃত্যুবরণ করেন। আলোচ্য পুস্তকে গান্ধীজীর এই সকল শান্তি অভিযানের আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বইটি বিয়োগান্ত গল্পের মতই মর্মস্পর্শী। কোন কোন স্থানে লেখক স্বয়ং গান্ধীজীর দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রন্থখানা যথেষ্ট প্রামাণ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। তদুপরি তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও মধুর বর্ণন-নৈপুণ্যে এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে গ্রন্থখানি সবিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ৭৩।৪৮

**ফরাসী বীরাঙ্গনা**—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ফরাসীর ধর্ম ও দেশ মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া জোয়ান অব আর্ক বীরত্ব ও ত্যাগের সুমহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এই পুণ্য শ্লোকা রমণীর ধারাবাহিক জীবনেতিহাস সংক্ষেপে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা ওজস্বিতাপূর্ণ এবং বর্ণিতব্য বিষয় পাদটিকাদির সাহায্যে সুপ্রামাণ্য হওয়ায় গ্রন্থখানা বিশেষ মূল্যবান। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ ছবি চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। কাজেই উহার জনপ্রিয়তা সুপ্রমাণিত। ৫৮।৪৮

**আলোর পথে**—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। দি কালচার পাবলিশার্স, ৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

মানুষকে ধর্মের পথে, মনুষ্যত্বের পথে, অধ্যাত্মের পথে এবং আলোকের পথে উন্নীত করিবার উপযোগী বহু জ্ঞানগর্ভ উক্তি বইটিতে স্থান পাইয়াছে। বইটি ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ মূল্যবান। আলোক সন্ধানী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা কর্তব্য। মনের অজ্ঞতা ও অন্ধকার দূরীকরণে এই সকল সৎ কথা মহাপুরুষের বাণীর মতই কার্যকরী। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। ১৪।৪৮

**১ ক্ষুদিরাম ২ ফাঁসীর সত্যেন ৩ কানাইলাল**—প্রণেতা—শ্রীব্রজবিহারী বর্মণ; প্রাপ্তিস্থান—বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ১৵৹, ১৷৹ ও ১, টাকা।

আলোচ্য তিনখানা গ্রন্থের লেখক এক সময়ে বাঙলার বিপ্লবী মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থত্রয়ের নায়কগণ যখন বিপ্লব প্রচেষ্টায় আত্মাহুতি দেন তখনই গ্রন্থগুলি রচিত ও প্রচারিত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই রাজরোষে পড়িয়া বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। বিপ্লবী কর্মীদের তরুণ মনে তখন শহীদবৃন্দের কাহিনী বিজড়িত এই গ্রন্থগুলি আশা ও উদ্দীপনার আগুন জ্বালাইয়া দিত। গোপনে সংগ্রহ করিয়া এ সকল বই লুকাইয়া না পড়িয়াছে, তখনকার ছাত্র মহলে এমন কেউ ছিল না বলিলেই চলে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ সকল শহীদের স্মরণ উপলক্ষে এ জাতীয় গ্রন্থ কয়েকখানা বাজারে বাহির হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তখনকার ভয়াবহ দুর্দিনের মধ্যে লেখক রাজরোষ উপেক্ষা করিয়াও শহীদ কাহিনী প্রচারের যে সাহসিকতা দেখাইয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না। এখন রাজরোষমুক্ত হইয়া বইগুলি পুনঃ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বইগুলির বিশেষত্ব এই যে, এগুলিতে শহীদদের জীবন কথা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছে এবং গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহেও যথেষ্ট যত্ন ও শ্রম স্বীকার করা হইয়াছে। এক সময়ে সহস্র সহস্র বিপ্লবপন্থী তরুণ চিত্তে এই সকল বই প্রেরণা [illegible] কাহিনী হইলেও বাঙলার তরুণদের মনে গৌরব বোধ জাগাইয়া তুলুক ইহাই কাম্য। লেখকের ভাষা মধুর, বর্ণনাভঙ্গী মনোরম। কাহিনীগুলি লেখার গুণে রূপকথা হইতেও সমধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাঁহার ওজস্বিতাপূর্ণ ভাষা ও বর্ণনা শহীদ-কথা শুনাইবার সর্বাংশে উপযোগী। বইগুলির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

**গল্পের ছলে**—প্রণেতা, বিমল সেন। প্রকাশক—বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা।

বইটিতে মোট এগারটি গল্প আছে। কিন্তু গল্প শোনানোই এগুলির উদ্দেশ্য নয়। গল্পের আবরণে নির্যাতিত মানবতার মর্মভেদী যাতনা ফুটিয়া উঠিয়াছে বইটির প্রত্যেকটি রচনায়। লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বেশী লেখেন নাই; কিন্তু তাঁর প্রত্যেক রচনায় একাধারে শিল্পনৈপুণ্য ও মানবতাবোধ স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ পাইয়াছে। নিতান্ত অকালে লোকান্তরিত না হইলে, বাঙলা সাহিত্য তাঁহার দানে পরিপুষ্টি লাভ করিত সন্দেহ নাই। আলোচ্য বইটি বহু পূর্বে লিখিত। অধুনা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। রাষ্ট্র ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে মানুষের হাতে মানুষের বন্দিত্ব, মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা, শোষণ, নিগ্রহ ধর্মের নামে, নীতির আবরণে মানুষের প্রতি মানুষের জুলুম অহরহ চলিয়াছে। লেখকের দরদ ভরা লেখনী মুখে তারই বোবা কান্না আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া গল্পের আর্ট ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বর্ণনা ভঙ্গীটিও মনোরম। এ রকম বই বাঙলার তরুণদের অবশ্য পাঠ্য।

**সংকলিতা**—শিল্পী সংঘের মুখপত্র। ১০বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড হইতে প্রকাশিত। একমাত্র সভ্যদের জন্য, মূল্য আট আনা।

সাময়িক পত্রে নিছক চিত্র সংকলন প্রচেষ্টা ইহাই বোধ হয় প্রথম। এই জন্য ইহার শিল্প-রসিক পরিচালকগণ প্রশংসার্হ। আলোচ্য সংখ্যাখানা সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে শ্রীনন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, দিনকর মাসোজি, রামকিঙ্কর বেজ, গোপাল ঘোষ প্রমুখ বাইশজন প্রবীণ ও নবীন শিল্পীর আঁকা ছবি সংকলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকখানা রঙগীন। শিল্পরসিকদের নিকট আশা করি ইহা সমাদৃত হইবে। ৯৫।৪৮

**নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা**—মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শৈলশ্রী, ১১।১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবনেতিহাস সংক্ষেপে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। লেখার গুণে অতি পরিচিত কাহিনীও বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ৭৬।৪৮

**বিশ্ববার্তা**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত। সাপ্তাহিক পত্র। মূল্য বার্ষিক ছয় টাকা, ষাণ্মাসিক সাড়ে তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। কার্যালয়—৪৪।৪, গরচা রোড, কলিকাতা।

নূতন সাপ্তাহিক পত্র 'বিশ্ববার্তার' প্রথম সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়া প্রীত হইলাম। কয়েকটি প্রবন্ধ গল্প কবিতা, কিছু ব্যঙ্গ রচনা, এবং দরকারী খবরাখবর প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রোপযোগী মালমসলায় এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। আমরা এই নূতন সহযোগীর [illegible]

## দেশী সংবাদ

৩রা মে—পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর শ্রীযুত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ভারতের বড়লাটপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী ২১শে জুন তিনি বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

পীর ইলাহি বক্সের নেতৃত্বে সিন্ধুতে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রীদের নাম—(১) পীর ইলাহিবক্স প্রধান মন্ত্রী, (২) মীর গোলামআলী, (৩) সৈয়দ মীরণ মহম্মদ শা, (৪) মিঃ মহম্মদ আজাম।

পাকিস্থানের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ এক বিবৃতিতে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্থানে বাস্তুত্যাগীরা যে স্থাবর সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য ১৭ শত কোটি টাকা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ববঙ্গের দেড় কোটি হিন্দুর স্থানত্যাগ বর্তমানে অসম্ভব ব্যাপার।

কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু কর্তৃক বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী উত্থাপিত হয়। সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান পার্টির উদ্যোগে সভার অনুষ্ঠান হয়।

৪ঠা মে—ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। ডাঃ তারাচাঁদের সভাপতিত্বে নয়াদিল্লীতে উহার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, 'ডিগ্রী' কোর্সে ভর্তি হইবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রকে বার বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গত বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গত ১লা মে দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ২৯ জনকে অন্তর্বর্তীকালের জন্য নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সদস্যরূপে কো-অপ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা কংগ্রেস প্রদেশসমূহের সদস্যগণের অনুরূপ অধিকার ভোগ করিবেন।

কাশ্মীর রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যদল পুঞ্চের সমস্ত পর্বত হইতে হানাদারদিগকে সরাইয়া দিয়াছে। এই সকল পর্বত অধিকার করায় পুঞ্চ অধিত্যকা বিপন্মুক্ত হইল।

নয়াদিল্লীতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অপহৃতা নারী ও শিশুদের উদ্ধার কার্যে বাহাওয়ালপুর রাজ্যের কর্তৃপক্ষের "শৈথিল্যের" প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা এবং সেবাগ্রাম আশ্রমবাসিনী মিস্ আমতুস সালাম বাহাওয়ালপুর রাজ্যের ডেরা নবাব সাহেবে আমরণ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

৫ই মে—পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলী পুনর্গঠনের এক রিকুইজিশান প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য আজ অপরাহ্ণে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের এক জরুরী সভায় রিকুইজিশনকারিগণ তাঁহাদের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লন এবং তৎপর দলের অধিকাংশ সদস্য এক বিবৃতিতে প্রধান মন্ত্রী ও দলপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন। সভায় উপস্থিত ৫৩ জন সদস্যের মধ্যে রিকুইজিশনকারীদের সংখ্যা ২২ জন;

অপরপক্ষে যে সব সদস্য ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করেন, তাঁহারা সংখ্যায় ৩০ জন ছিলেন। অবশিষ্ট একজন দলের নেতা ডাঃ রায় নিজে।

অদ্য পাতিয়ালা, কপুরতলা, ফরিদকোট, ঝিন্দ, নাভা, খালসিয়া, নালগড় ও মালের কোটলার শাসকগণ একটি ইউনিয়ন গঠনের জন্য নয়াদিল্লীতে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। নূতন ইউনিয়ন পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন নামে অভিহিত হইবে। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্বে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে ডাক মাশুল ছিল, উভয় গভর্নমেণ্ট ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে হইতে সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে তাহা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৬ই মে—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র দাখিল করার পরে প্রাদেশিক আইন সভার সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসাবে প্রাক্তন মন্ত্রী সভার সদস্যগণের মধ্যে নয়জন সদস্যকে লইয়া পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এইদিন লাটভবনে নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নূতন মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে:—(১) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, (২) শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, (৩) শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, (৪) রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, (৫) শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন, (৬) শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, (৭) শ্রীযুত কালিপদ মুখার্জি, (৮) শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ, (৯) শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, এবং (১০) শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা।

কলিকাতায় এই মর্মে এক সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, ভারত সরকার জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদের কাশ্মীর সম্পর্কিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বোম্বাই সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ২৯শে এপ্রিল নিজাম সরকারের প্রায় ১৫ জন পুলিশের একটি দল আমেদনগর জেলার অন্তর্গত ওপদাগাঁও-এ হানা দিয়া গ্রামবাসীদের উপর গুলী বর্ষণ করায় দুইব্যক্তি নিহত ও দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

৭ই মে—কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামীকল্য গভর্নমেণ্টের অফিসসমূহ এবং সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকিবে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। এই দিবস আদালতগুলিও বন্ধ থাকিবে।

ভারত সরকার অবিলম্বে ভারত হইতে পাকিস্থানে স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গত বুধবার কলিকাতা হইতে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বনগ্রাম থানা এলাকায় একদল চোরাই রপ্তানিকারকের সহিত পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পুলিশের এক সংঘর্ষ হয় ও উভয় পক্ষের মধ্যে গুলী চলে। ফলে তিন ব্যক্তি নিহত হয় এবং অপর তিনজন আহত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদল গঠন করিয়াছেন, আগামী ১৭ই মে হইতে কাঁচড়াপাড়ায় সরকারী শিক্ষা কেন্দ্রে তাহার প্রথম দ[লে] পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমান্তবর্তী ছয়টি জেলা[র] প্রায় এক হাজার গ্রামবাসীর শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হইবে।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বিহার, উড়িষ্যা [ও] আসামের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকে অবিলম্বে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী উত্থাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্য ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়।

৩রা মে—অদ্য প্রত্যূষে বালী থানার অধীন লিলুয়ার নিকট পাট্টয়াপাড়ার এক বাড়ীতে দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ১১ জন আহত হয়; তন্মধ্যে ৪ জন মারা গিয়াছে।

৮ই মে—ভারতের শাশ্বত বাণীমূর্তি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অষ্টাশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে অদ্য তাঁহার জোড়াসাঁকো ভবনে তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ প্রভাতে ও অপরাহ্ণে পৃথক পৃথক বিপুলায়তন অনুষ্ঠানে সমবেত হন এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও বিশ্ব সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁহার অপরিমেয় দানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

৯ই মে—পুনার তিলক মন্দিরে বসন্তকালীন বক্তৃতায় ভারতের দেশরক্ষা সচিব ঘোষণা করেন যে হানাদার দলের সর্বশেষ ব্যক্তি কাশ্মীর সীমানা হইতে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর ত্যাগ করিবে না।

আজ কাশ্মীরে স্বাধীনতা সপ্তাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

## বিদেশী সংবাদ

৩রা মে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য ও সামরিক সরবরাহ কানাডার মধ্যে দিয়া উত্তর মেরু অঞ্চলে আলাস্কায় পাঠান হইতেছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পর এত দ্রুত আর সৈন্য চলাচল হয় নাই।

৪ঠা মে—বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কমন্স সভায় দুইদিনব্যাপী এক বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া অদ্য রাত্রিতে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্নেস্ট বেভিন বলেন যে, ক্রেমলিন হইতে যদি আদর্শ পরিবর্তন করা না হয়, তবে বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে স্থায়ী মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা অল্প।

চীনের গৃহযুদ্ধে অদ্য দুইটি নূতন রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কম্যুনিস্ট বাহিনী হোনান প্রদেশের উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম আক্রমণ করে। হোনানের দক্ষিণ দিকস্থ কম্যুনিস্ট সৈন্যদল বিনাবাধায় কয়েকটি সহর দখল করিয়াছে।

বামপন্থীদের অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করিবার অপরাধে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে ১৫৩ লোককে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।
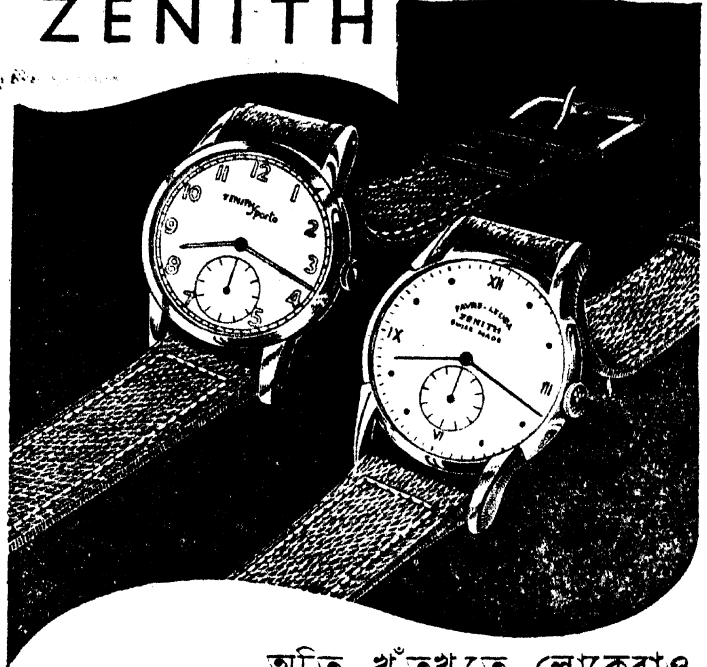
৬ই মে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের নিকট প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেটের মেয়াদ আরও দশ দিন বাড়াইবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছিল, বৃটেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

৭ই মে—জেরুজালেমে শান্তি স্থাপনের জন্য বৃটিশের চেষ্টায় আরব ও ইহুদীরা আগামীকল্য দ্বিপ্রহর হইতে শহরে যুদ্ধ বন্ধ করিতে স্বীকৃত হইয়া অদ্য রাত্রিতে এক চুক্তি করিয়াছে। জেরিকো হইতে এক বৃটিশ সরকারী ইস্তাহারে আরবদের চুক্তির কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

আজ নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে প্রেসিডেণ্ট ম'সিয়ে আলেকজান্ডার প্যারোডী ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে রাষ্ট্র সঙ্ঘের পক্ষ হইতে পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত কমিশন পূর্ণ করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সদস্য মনোনীত করা হইল। কাশ্মীর পাকিস্থানে অথবা ভারতে যোগ দিবে তাহা স্থির করিবার জন্য অনুষ্ঠিত গণভোট সম্পর্কিত ব্যবস্থা তদারক করিবার জন্য কমিশনকে কাশ্মীর যাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৮ই মে—অদ্য প্রাতে ইনসিন জেলে ব্রহ্মের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ৪৭ বৎসর বয়স্ক উ স'র ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

আজ হইতে এক সপ্তাহ পরে প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষণা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৯ই মে—দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রধান সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা অদ্য তীব্রতর আকার ধারণ করে। সর্বত্র নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি হিংসামূলক কার্য-কলাপ চলিতে থাকে। উহার ফলে ৩৯ জন নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।





শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

Saturday, 22nd May, 1948. [২৯শ সংখ্যা

পঞ্চদশ বর্ষ ] শনিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ সাল।

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**উভয় বঙ্গের মধ্যে সম্বন্ধ**

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বিধান-
চন্দ্র রায় সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে উভয়
বঙ্গের পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে
আপোষ-নিষ্পত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব
আরোপ করেন। ডাক্তার রায় বলেন, পূর্ব ও
পশ্চিম উভয় বঙ্গের গভর্নমেণ্টই বুঝিতে
পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক
এই অবিচ্ছেদ্য যে, শীঘ্র উভয়ের ভিতরকার
সমস্যাগুলির যদি সমাধান করা না যায়, তবে
শাসনকার্যে বড়ই অসুবিধা হইবে। ডাক্তার রায়
যে কথা বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টের পক্ষ
হইতেও আমরা অনুরূপ উক্তি শুনিতে
পাইয়াছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যাবতীয়
অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে
উভয় রাষ্ট্রই গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের পুলিশ
ও রাজ-কর্মচারীদিগকে সেই দায়িত্ব যথাযথ-
ভাবে পালনের জন্য নির্দেশও প্রদান করা
হইয়াছে। কিন্তু আদর্শ ঘোষণার দ্বারা
মানুষের মনে কিছুকালের জন্য আশা
সঞ্চার করা যায়, পরন্তু সেই আশাকে স্থায়ী
রূপ দিতে হইলে ঘোষণা অনুযায়ী কার্য-
পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। পূর্ব ও
পশ্চিম উভয় বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে
আলাপ-আলোচনা এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত
প্রকাশিত হইবার পর পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তু-
ত্যাগীদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া আমরা
শুনিতে পাইতেছি। পূর্বে যেখানে প্রত্যহ
এক হাজার করিয়া বাস্তুত্যাগী পশ্চিমবঙ্গে
আসিত, এখন সেখানে সংখ্যা দুই-তিনশতে
দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বস্তুত বাস্তুত্যাগ
একেবারে বন্ধ হয় নাই এবং পূর্ববঙ্গে বাস্তু-
ত্যাগীদের সংখ্যা সামান্যও নয়। সুতরাং
আতঙ্ক এবং ভবিষ্যতের সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার

ভাব পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে এখনও
কাজ করিতেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের
মনোভাবই প্রধানত সংখ্যালঘুদের মনের এমন
উপদ্রবের মূলে রহিয়াছে। গভর্নমেণ্টের
বিঘোষিত নীতির উপর পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু
সম্প্রদায় বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে
না। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা
বুঝিয়াছে যে, গভর্নমেণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ
সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর উপদ্রব হইতে তাহাদের
স্বার্থ এবং অধিকার নিরাপদ রাখিতে সমর্থ
হন নাই। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের
নীতিকে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে বিসর্জন
দিয়াছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের
ধর্মোন্মাদমূলক অন্যায় আবদারের কাছে
তাঁহাদের অধীন কর্মচারীদিগকে অসহায়ভাবে
আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন হইতে যদি এই ভাব
দূর হয় এবং তাহাদের মধ্যে এমন প্রত্যয় জাগে
যে, তাহাদের ন্যায়ানুমোদিত নাগরিক অধিকার
কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না; পক্ষান্তরে
কেহ তেমন চেষ্টা করিলে রাজশক্তি কখনও
তাহাকে ক্ষমা করিবে না, তবে অচিরেই তাহাদের
মধ্যে আস্থার ভাব ফিরিয়া আসিবে। প্রকৃতপক্ষে
নাগরিক অধিকারের এই প্রশ্নে সম্প্রদায়-
বিশেষের সদিচ্ছা বা কৃপার কথা উত্থাপন করা
আমরা একান্ত ধৃষ্ট ও অনর্থকর বলিয়াই মনে
করি; কারণ তাহার ফলে অভদ্র সাম্প্রদায়িক
মনোভাবকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং সম্প্রদায়-
বিশেষের উৎকর্ষ এবং অপরের অপকর্ষ জাগাই-

জীবনে ভেদবুদ্ধিকে প্রখর করিয়া তোলে।
পূর্ববঙ্গ পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত
প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে
লাহিড়ী সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে এই
এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুরা জিম্মী
ও মুসলমানেরা জিম্মাদার বলিয়া পূর্ববঙ্গের
কোন কোন স্থানে শান্তি প্রচারের সঙ্গে সুর
তোলা হইতেছে, শ্রীযুত লাহিড়ী ইহার নিন্দা
করেন। আমরাও সেই মতই সমর্থন করি।
পূর্ববঙ্গে যাঁহারা প্রকৃত শান্তি কামনা করেন,
তাঁহাদের এই সত্য উপলব্ধি করা উচিত যে,
পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন
সংস্কৃতি এবং সুতীব্র স্বদেশপ্রেমের অধিকারী।
তাঁহারা নিজেদের জন্মভূমিতে নিজেদের মর্যাদা
লইয়াই থাকিতে চাহেন, অপর কাহারও
কৃপার ভিখারীস্বরূপে জীবনধারণ করিতে
তাঁহারা ইচ্ছুক নহেন। সে প্রতিবেশ তাঁহাদের
পক্ষে আড়ষ্টকর। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ
সম্প্রদায়ের মন হইতে সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্বের
অভিমান যাহাতে অপসারিত হয়, সেখানকার
শাসনব্যবস্থা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া বিশেষ-
ভাবে প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রনীতিতে সংখ্যালঘু-
দিগকে সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য
আবশ্যক বিধিবিধান অবলম্বিত হওয়া উচিত।
এইভাবে উভয় বঙ্গের জনসাধারণের মনে
আস্থিতির ভাব ফিরিয়া আসিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের
ধারাও স্বাভাবিক পথে ফিরিয়া আসিবে। আমরা
দেখিয়া সুখী হইলাম, ভারত গভর্নমেণ্ট পূর্ব-
পাকিস্থানে ভারতের একজন যুগ্ম হাই-
কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।
শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ যেরূপ করাচীতে আছেন, ইনি
তাঁহার সম পদমর্যাদায় এবং সমান অধিকারসম্পন্ন
হইয়া সেইরূপ ঢাকাতে থাকিবেন। আরও সুখের
বিষয় এই যে, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে এই

হইয়াছে। ডক্টর ঘোষ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেরই জনপ্রিয় নেতা, বিশেষত, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই তিনি সমানভাবে আস্থাভাজন। সুতরাং যোগ্যতম ব্যক্তিকেই এক্ষেত্রে নির্বাচিত করা হইয়াছে। আমরা এজন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

**শহরের জনস্বাস্থ্য**

কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ খুবই হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ বারংবার এই সতর্কবাণী প্রচার করিতেছেন যে, আশঙ্কার কারণ এখনও দূর হয় নাই এবং শীতের প্রারম্ভে এই ব্যাধি পুনরায় মহামারীর আকারে দেখা দিতে পারে। সুতরাং প্লেগের টীকা লইতে এবং ঘরবাড়ি আবর্জনা মুক্ত রাখিয়া ইঁদুরের সংক্রমণ-সম্ভাব্যতা হইতে মুক্ত থাকিতে কেহ যেন শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন। প্লেগ অত্যন্ত দুরন্ত ব্যাধি। গ্রীষ্মের তাপে এই ব্যাধির প্রকোপের প্রাবল্য সাধারণত ঘটে না, শীতের সময় ইহার প্রকোপ প্রবল আকার ধারণ করে। শহরের মধ্যে এই ব্যাধি একবার যখন আসিয়া ঢুকিয়াছে, তখন একেবারে ইহা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়; কিন্তু প্লেগের চেয়ে কলেরার আতঙ্ক আপাতত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার প্রকোপ কিছুতেই কমিতেছে না। গভর্নমেণ্ট প্রতিকারের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গোড়ার ব্যাপারেই নিদারুণ ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে। কলেরা জলবাহিত ব্যাধি। শহরের জল-সরবরাহ পর্যাপ্ত নহে। অনেক ক্ষেত্রে ময়লা জলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। সহরের অনেক অঞ্চলে জলের এমনই অভাব যে, অন্য উপায় থাকে না। বর্তমান বৎসরে দুর্দৈব আরও পাকিয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন হইল আকস্মিকভাবে পরিস্রুত জলের সরবরাহ হ্রাস করা হইয়াছে। শহরের উপর কলেরার মত দুরন্ত মহামারীর প্রকোপ চলিতেছে; এই অবস্থায় এবং ঠিক এই সময়ই জল সরবরাহ হ্রাস করা জনসাধারণের পক্ষে কত বিপজ্জনক, সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। পৌর-জীবন-নিয়ামকদের এ সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা মামুলি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াই খালাস। শুনিতেছি, পলতার ট্যাঙ্কে শেওলা জন্মিয়াছে এবং গ্রীষ্মকালে প্রতি বৎসর সেখানে এইরূপ শৈবাল দল সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আর কি করিতে পারেন? তাঁহারা শেওলা পরিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে সেজন্য ধন্যবাদ দিয়া জলের অনটন সহিয়া যাওয়া ছাড়া শহরবাসীর আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, গ্রীষ্মকালে পলতার জলাধারে শেওলা জমে, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে সময় থাকিতে তাহার প্রতিকার করা হইল না কেন? বলা বাহুল্য, পূর্ব হইতে সতর্ক না হইয়া জল সরবরাহে এমন অনিষ্টকর বিঘ্ন সৃষ্টির প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কর্মকর্তারা এড়াইতে পারেন না। কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব বর্তমানে গভর্নমেণ্টের হাতে। এ বিষয়ে তাঁহারা কি করেন, আমরা তাহা দেখিবার অপেক্ষায় থাকিলাম। বলা বাহুল্য, পরিস্রুত জল সরবরাহের সংকট দূর করা না গেলে কলেরার প্রকোপ প্রশমিত করা কঠিন হইয়া পড়িবে। সেই সঙ্গে শহরের আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থাও অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন; এক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে পৌর জনোচিত দায়িত্ববোধ জাগাইতে হইলে যদি আইন করা দরকার হয়, গভর্নমেণ্টের তাহাতেও ইতস্তত করা কর্তব্য নহে বলিয়া আমরা মনে করি।

**দুরভিসন্ধি কাহাদের**

গত ২৪শে এপ্রিল ভারত গভর্নমেণ্টের গেজেটের এক ঘোষণায় সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক-গুলির তালিকা হইতে কলিকাতার 'ব্যাঙ্ক অব কমার্সে'র নাম খারিজ করা হইয়াছে। 'ব্যাঙ্ক অব কমার্সে'র সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের উল্লিখিতরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পর এক শ্রেণীর আমানতকারী কতকগুলি ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার জন্য আগ্রহপরায়ণ হইয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একটা গুজবও রটে যে, বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য ব্যাঙ্কের অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। পশ্চিম বঙ্গের সরকার এ-সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ গুজবের কোন ভিত্তি নাই এবং আতঙ্কগ্রস্ত, দায়িত্বহীন ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলের লোকেরাই এই সব গুজব প্রচার করিতেছে। তাঁহাদের মতে এই ধরণের গুজব চলিতে থাকিলে অদূরভবিষ্যতে পশ্চিম বঙ্গের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত স্বার্থহানি ঘটিবার এবং প্রদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য তাঁহারা সর্বসাধারণকে বিশেষ করিয়া স্থানীয় ব্যাঙ্কসমূহের আমানত-কারীদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব স্বার্থের খাতিরে এই সমস্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ও দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রচারিত গুজবে কর্ণপাত না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় পশ্চিম বঙ্গের সরকার আজ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে পূর্বেই তাহা অবলম্বন করা উচিত ছিল। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দায়িত্ব তাঁহাদেরই। তাঁহারা যদি সুস্পষ্ট-ভাবে এই কথা ঘোষণা করিতেন যে, পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেকটি সিডিউল ব্যাঙ্কের অবস্থাই সন্তোষজনক এবং আমানতকারীদের আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই, তাহা হইলে অনিষ্টকর গুজব রটিবার কোন অবসর ঘটিত না। আমরা এখনও এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তিকেও জনসাধারণকে গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া যাহারা বাঙালীর প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে অনিষ্টকর গুজব প্রচার করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ইহাও আমাদের জিজ্ঞাস্য। বাঙলা দেশের বুকের উপর বসিয়া যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর বুকে ছুরি দিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের প্রকৃতি ভাল করিয়া চিনিয়া রাখা দরকার।

**স্বাধীন কাশ্মীর**

সমগ্র কাশ্মীরে সপ্তাহ কালব্যাপী স্বাধীনতা উৎসব বিপুল সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণ এবং বৈদেশিক বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই উৎসবে যোগদান করেন। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাশ্মীরবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—সপ্তদশ বর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। পাকিস্থান বা অন্য কোন শক্তিকে আমরা আমাদের এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিব না। কাশ্মীরের স্বদেশ প্রেমিক সন্তানগণ সেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া এই সংকল্প প্রতিপন্ন বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়া আন্তরিকতা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ধর্মোন্মত্ত হানাদারদের অত্যাচার হইতে ভূস্বর্গ কাশ্মীর এখনও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় নাই। কাশ্মীরবাসীরা বীরত্ব সহকারে মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্লাবনকে প্রতিহত করিয়াছে ইহা সত্য। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের এই সংগ্রামে সঙ্ঘ সম্পর্কে রাজনীতিক হইলেও ইহার পশ্চাতে মানবতার এক সমুজ্জ্বল আদর্শের প্রেরণা রহিয়াছে। ভারতের বর্তমান সংকটপূর্ণ সমস্যা অন্ধকার পথে কাশ্মীর নূতন আশার আলো বিকীর্ণ করিয়াছে। স্বার্থলুব্ধ জগৎকে নূতন জীবনের বাণী শুনাইয়াছে। নব কাশ্মীরের বাণী—জনগণের অধিকারকে পদদলিত করিতে দিব না, অত্যাচারী যে, তাহাকে প্রাণ দিয়া প্রতিরোধ করিব। কংগ্রেস মুসলিম লীগের ভেদ বিদ্বেষমূলক আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে যে বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে, কাশ্মীরের সংগ্রাম-বীর্য তাহাকে উৎখাত করিবার চেতনা

জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এই দিক হইতে কাশ্মীরের সমস্যা, শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, সমগ্র ভারতের স্বার্থ এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে তাহা বিজড়িত রহিয়াছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা উৎসবে এজন্য সমগ্র ভারতের অভিনন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীনগরের দুর্গপ্রাকার হইতে সেদিন এই উপলক্ষে তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতের স্বদেশপ্রেমিক এবং মানবতার উচ্চ আদর্শে জাগ্রত জনগণের ধমনীতে নূতন রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতায় কাশ্মীরের এই স্বাধীনতা সত্য হোক্—নিত্য হোক্।

### ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে ট্রেন দুর্ঘটনা

গত ১৪ই মে শুক্রবার সন্ধ্যায় ধানবাদ হইতে ৯ মাইল দূরে ৯নং আপ দেরাদুন এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়া শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনার ফলে ট্রেনের ইঞ্জিন ও পরবর্তী একখানা বগী গাড়ী উল্টাইয়া চুরমার হইয়া যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বগী উল্টাইয়া যায় এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বগী লাইনচ্যুত হয়। এই নিদারুণ দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বিশের উপরে এবং আহতের সংখ্যা শতাধিক। আমরা এই দুর্ঘটনার সংবাদে স্তম্ভিত হইয়াছি। বস্তুত রেলদুর্ঘটনা কিছুদিন হইতে এত ঘন ঘন ঘটিতেছে যে, ইহাকে এখন আর আকস্মিক ব্যাপার বলা চলে না। গত ১৯৪৭ সালে এক বৎসরেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে অন্যূন বারটি স্থানে রেল দুর্ঘটনা ঘটে। এই সব দুর্ঘটনার যথারীতি তদন্ত হয় এবং প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বনের সুসংকল্পও কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। স্বাধীন ভারতে রেল ভ্রমণে সমধিক সতর্কতা অবলম্বিত হইবে ইহাই আশা করা গিয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রেলভ্রমণে সাধারণের সঙ্কট বাড়িয়াছে ছাড়া একটুও কমে নাই। যাত্রীদিগকে প্রাণের ঝুঁকি লইয়াই রেলপথে যাতায়াত করিতে হয় এবং ট্রেনের গতিবিধিতে পূর্বাপেক্ষা এখন আরও বেশী অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। ট্রেনে উঠিলে তাহার গতি কোথায় কি আকার ধারণ করিবে এবং কবে কোনস্থানে গিয়া কেমন অবস্থায় ঠেকিবে, ইহা কেহ জানে না। ইহার উপর যদি ঘন ঘন এই ধরণের ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকে, তবে জনসাধারণের জীবন দুর্বহ হইয়া পড়িবে। সাম্প্রতিক এই দুর্ঘটনার সম্বন্ধেও যথারীতি তদন্ত হইবে, আমরা ইহা জানি; কিন্তু সাফাইতে জীবন ফিরে না। বস্তুতঃ সরকারী মামুলী তদন্ত এবং সাফাইতে দেশবাসী আর সন্তুষ্ট নহে। তাহারা এইরূপ দায়িত্ববিহীন অব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিকার চায়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, রেল পরিচালন বিভাগে এমন কিছু গলদ ঢুকিয়াছে, যে জন্য এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে। এই সব ব্যাপার যেমন করিয়া হয় দূর করিতে হইবে এবং জনসাধারণের গতিবিধিতে নিরাপত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

### ধর্মীয় দলের শাসন

পাকিস্থান গণ-পরিষদের সদস্যস্বরূপে মিঃ শহীদ সুরাবর্দী সেদিন করাচীর সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে বলিয়াছেন, 'এমন একদিন আসিবে, যখন সমগ্র বিশ্ব পাকিস্থানে একধর্মীয় দলের শাসনের নিন্দা করিবে।' সুরাবর্দী সাহেবের নির্দেশিত এই দিন কবে আসিবে, জানি না; কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি, পাকিস্থান রাষ্ট্রনীতির কর্ণধারগণ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে একধর্মীয় দলের প্রাধান্যের নীতিকেই মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহারা মুখে গণতান্ত্রিকতার যত কথা বলিতেছেন, সব ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে। হায়দরাবাদের রাজাকার দলের নেতা সৈয়দ কাশিম রেজভী সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 'আমরা হায়দরাবাদে গণতান্ত্রিক শাসন কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হইতে দিব না। মুসলমানগণ রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় তাহা চিরস্থায়ী হইবে।' সৈয়দ রেজভী খোলাখুলি যে কথাটা বলিয়াছেন, পাকিস্থানের কর্ণধারগণ ততটা খোলাখুলি কথা বলিতেছেন না বটে; কিন্তু তাঁহাদের মনোবৃত্তি ও রাজাকার-নেতার মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়িকতান্ধতার মধ্যে কার্যত কোন পার্থক্য নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতাই যদি পাকিস্থানী মুসলমান নেতাদের কাম্য হইত, তবে মুসলিম লীগকে তাঁহারা এতদিন ভাঙিয়া দিতেন এবং অ-সাম্প্রদায়িক উদার আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-পরিচালনার প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইতেন। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থান রাষ্ট্রে মুসলমানদের স্বাধীনতা অর্থাৎ রাষ্ট্র-পরিচালনে সর্বতোময় প্রতিষ্ঠাকেই তাঁহারা বড় করিয়া দেখিতেছেন এবং তজ্জনিত গর্ববোধে পরিস্ফীত হইতেছেন। পক্ষান্তরে, সংখ্যালঘুদিগের তেমন মর্যাদা স্বীকার করিতে তাঁহাদের সমগ্র অন্তরাত্মা যেন সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে। সংস্কৃতিসম্পন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাকিস্থান রাষ্ট্রে অস্বস্তি এবং উদ্বেগের মূল কারণ এইখানেই রহিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতায় সংযমের বাঁধ অতিক্রম করিয়া দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যালঘুদের আত্মমর্যাদায় উত্তরোত্তর আঘাত সৃষ্টি করিতেছে। কতকটা জ্ঞানত এবং কতকটা অজ্ঞানত, সংখ্যাগরিষ্ঠদের শ্রেষ্ঠত্বের এই মনস্তাত্ত্বিকতা পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবন অব্যবস্থিত করিয়া ফেলিয়াছে। আন্তঃ-রাষ্ট্র সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ফলেও মনস্তাত্ত্বিক এই জটিলতার বিশেষ কোন সমাধান হয় নাই। ধর্মগত সংস্কারের উপর স্বদেশপ্রেম ভাব যতদিন পর্যন্ত বলিষ্ঠ হইয়া না উঠিবে, ততদিন পর্যন্ত তথাকার এই সমস্যার কোন প্রতিকার হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না! তরুণ সম্প্রদায় স্বভাবতঃই উদার এবং বলিষ্ঠ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তরুণদের মনে যেদিন মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক সংস্কারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রেরণার সঞ্চার হইবে, সেদিন সেখানকার রাষ্ট্র-জীবনে সর্বাঙ্গীন অভ্যুন্নতির প্রকৃত পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু সেদিন এখনও আসে নাই। দুঃখের বিষয়, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তরুণেরা মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার ঘোর এখনও ভাঙিয়া ফেলিতে পারিতেছে না।

### শক্তের প্রতি ভক্তি

সাক্ষাৎভাবে আলোচনার পর হায়দরাবাদের সমস্যা সমাধানের জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজাম সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মিঃ জনসনকে এক পত্র দিয়া নিজামের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্রে নিজামকে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে। শুনিতেছি, ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদের সমস্যা সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া যাইতে চাহেন। কিন্তু তিনি যে পথ ধরিয়াছেন, তাহা সফলতা লাভ করিবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষত, নিজামের এখন নিজের কোন ক্ষমতা নাই। তিনি ইত্তেহাদুল মুসলেমিন দল এবং তাহাদের ধর্মোন্মাদ নেতা সৈয়দ কাশিম রেজভীর দ্বারা বন্দী অবস্থায় আছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেজভীর গুণ্ডার দল যুক্তি মানিবে না। বস্তুত হায়দরাবাদ সম্পর্কে ক্রমাগত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে আপোষ-নিষ্পত্তির উপর জোর দেওয়াতে ভারত গভর্নমেণ্টের দুর্বলতাই তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে। শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এই গুণ্ডাদের ভক্তির পথে আনিতে হইবে। নিজামের দুয়ারে অনর্থক ধর্ণা না দিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট যত সত্বর হায়দরাবাদের গুণ্ডাদিগকে সোজাসুজি সায়েস্তা করিবার জন্য শক্ত নীতি অবলম্বন করেন, ততই মঙ্গল। প্রকৃতপক্ষে হায়দরাবাদ সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের দুর্বল নীতি ইতিমধ্যে যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটাইয়াছে এবং তাহা অনেকটা বিরক্তিজনক হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে সে নীতি ত্যাগ করা কর্তব্য।

**অর্ধগ্রাস** সূর্যগ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল লালদীঘিতে মুক্তিস্নান করিয়াছেন। এবার দরিদ্র দেশবাসীকে কিছু অন্নবস্ত্র দানের পুণ্য কর্ম সম্পাদন করিলেই আমরা তাঁদের অক্ষয়-দপ্তর কামনা করিতে পারি।

* * * * *

**রাজাজী** তাঁর এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"The Governor in the temple of Government is important though he has no active part in the administration."

—শ্যামলাল বলিল—'নিয়মতান্ত্রিকতার কথা জানিনে; নূতন পরিবেশে আমরা অন্যরকম ব্যবস্থাই আশা করেছিলাম কিন্তু দেখছি এখনো আমরা সেই ঠঁুটো জগন্নাথের দোরেই হাত পেতে আছি।

* * * *

**শুনিলাম**, ভারত সরকার নাকি গভীর জলের মাছ ধরার জন্য ছয়টি 'ট্রলারের' অর্ডার দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন,—শুকনো ডাঙগায় যেসব মাছ চলা ফেরা করে তাদের ধরার ব্যবস্থাটা আগে করতে না পারলে অবস্থার কিছু উন্নতি হবে বলে মনে হয় না।

* * * * *

**শুনিলাম** আসামের সীমান্তে একটি অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা জানিতাম এই প্রাণীটি কোটি

কোটি বৎসর আগে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। খুড়ো বুঝাইয়া বলিলেন—'ঠিক তা নয়, এরা শুধু বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল মাত্র। সম্প্রতি হালচাল দেখে এরা বুঝে নিয়েছে—পৃথিবী আবার প্রাগৈতিহাসিক-যুগে ফিরে যাবে, তাই এই বাস্তুত্যাগী জানোয়ারেরাও আবার যথাস্থানে ফিরে আসছে।

* * * *

**অন্য** এক সংবাদে প্রকাশ, কালিফোর্নিয়াতে একটা জলা জায়গা নিয়া একদল গাধা আর ভেড়ার মধ্যে নাকি যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে।

'শুনেছি ব্যাপারটা নাকি শিগ্‌গিরই স্বস্তি পরিষদের গোচরে আনা হবে'—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

* * * *

**কালিফোর্নিয়ারই** অন্য এক সংবাদে প্রকাশ যে, কবরখানায় যারা কাজ করেন তারা নাকি মাহিয়ানা বৃদ্ধির দাবী পেশ করিয়াছেন এবং এই সংগে এ কথাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর কোন সাব্ এডিটার যদি তাদের 'Grave diggers' বলেন তবে তারা আর সাব্ এডিটারদের কবর দেবেন না।

কবরখানার কর্মীদের মাহিয়ানা বৃদ্ধির দাবী যে যুগোপযোগী হইয়াছে সে কথা আমরা স্বীকার করি। আর সাব্ এডিটারদের প্রতিও আমাদের নিবেদন তাঁরা যেন অতঃপর 'Grave diggers'-এর বদলে 'পুষ্পশয্যা প্রস্তুতকারক' কথাটা ব্যবহার করেন!

* * * * *

**নাটালে** একটি নিষিদ্ধ সীমা অতিক্রম করার অপরাধে তিনটি ভারতীয়ের প্রতি ছয় ঘা বেত্রদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। হুকুমে বলা হইয়াছে—শাস্তি দিতে light cane ব্যবহার করা হইবে। খুড়ো বলিলেন—'তাই বল, মাত্র light cane; ভারতে light lathi charge হজম করে যারা অভ্যস্ত তাদের পক্ষে light cane তো ফুলের ঘা মাত্র!'

* * * *

**এই** প্রসংগেই একটি সংবাদে শুনিলাম আমস্টারডামে মিঃ চার্চিলের বক্তৃতার প্রাক্কালে জনৈক পাদ্রী নাকি তাঁকে প্রখ্যাত "V" চিহ্নটি দেখাইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন—এবারের "V" যুদ্ধজয়ের জন্য নয়, শান্তির জন্য। খুড়ো মন্তব্য করিলেন—'মিঃ চার্চিল শান্তির জন্য "V" চিহ্ন দেখালেন বটে তবে সেটা তর্জনী আর মধ্যমার সাহায্যে নয়, তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে!'

* * * *

**আই**, এফ্, এ কর্তৃপক্ষ নাকি আহত খেলোয়াড়দের পরিচর্যার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—'এইসংগে আহত রেফারী ও দর্শকদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করে দিলেই আমরা সব দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

* * * *

**ইউরোপের** আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা দেখিয়া ভেকেরা আবার মক্‌মক্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দীর্ঘদিন মৌনাবলম্বনের পর পশ্চিম

ইউরোপের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য মিঃ চার্চিলের আহ্বানে ভেকদের পুনরাবির্ভাবের কথাই মনে পড়িতেছে।

## দক্ষিণ কোরিয়ার নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত দক্ষিণ কোরিয়ায় কোরিয়াবাসীদের দ্বারা একটি অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভয়াবহ ধরণের মারামারি হয়ে গেছে। বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির মারামারির ফলে বহু লোক হতাহত হয়েছে বলে প্রকাশ। এশিয়ার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এই দেশটির রাজনৈতিক জীবনে এই বোধ হয় প্রথম নির্বাচন। বিভিন্ন সূত্র থেকে যে খবর পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় যে, এই মারামারির জন্যে কম্যুনিস্টরাই দায়ী। কিন্তু হতাহতের যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার থেকে মনে হয় যে, হতাহতদের দুই-তৃতীয়াংশই হ'ল কম্যুনিস্ট। তখনই স্বভাবত মনে সংশয় জাগে। তবে কোরিয়াবাসীরা যে আজও গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়নি—একথা মনে করার হেতু আছে। কোরিয়া নিয়ে যে ব্যাপারটা চলেছে, তার মূল রহস্য বুঝতে হলে এর ইতিহাস কিছুটা জানা প্রয়োজন।

পৃথিবীর অন্যত্র অনেক ব্যাপার নিয়ে যেমন রুশ-মার্কিন বিরোধ চলেছে কোরিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পর সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসরের জাপানী ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসানে কোরিয়া মুক্ত হয়। এই বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে এই রাজ্যটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরপেক্ষের বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের মধ্যে মস্কো চুক্তি বলে একটি চুক্তি হয়। ২ কোটি ৪০ লক্ষ নরনারীর দেশ কোরিয়া বিভক্ত হয়ে যায় দুটি সুস্পষ্ট ভাগে—যন্ত্রশিল্পে উন্নত উত্তর কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েট প্রভুত্ব আর কৃষিপ্রধান দক্ষিণ কোরিয়া থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে। মস্কো চুক্তি অনুসারে ভবিষ্যতে সম্মিলিত কোরিয়ায় অস্থায়ী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সর্ত থাকে। কিন্তু সুদীর্ঘ তিন বৎসরেও এ সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে কোন মিলিত কার্যক্রম স্থির করা সম্ভব হয়নি। সোভিয়েট রাশিয়া মস্কো চুক্তির একটা সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করছে বলেই কোরিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আজও কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারেনি। মস্কো চুক্তিতে আছে যে, কোরিয়ার রাজনৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই রাজ্যটির উপর সাময়িকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও চীনের মিলিত অছিগিরি শাসনের ব্যবস্থা থাকবে। যে-সব রাজনৈতিক দল মস্কো চুক্তি মানে না কিংবা যে সব রাজনৈতিক দল কোরিয়ায় পূর্ণ স্বাধীন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানায়, রাশিয়া মস্কো চুক্তির ধুয়া তুলে তাদের অস্বীকার করতে চায়। এ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার মতবিরোধ চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র চায় কোরিয়ায় অবিলম্বে দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। অপরপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া তাকে মস্কো চুক্তি অনুসারে অছির শাসনে রাখার পক্ষপাতী। একথা অনস্বীকার্য যে, কোরিয়ার রাজনৈতিক জীবন যথোচিতভাবে সংগঠিত নয় এবং বহুধা বিভক্ত। এটা কিছু পরিমাণে কোরিয়ার জনগণের রাজনৈতিক শিশুত্বের পরিচায়ক। জেনারেল ম্যাক আর্থার তাঁর কোরিয়া সম্পর্কিত রিপোর্টে বলেছেন যে, দক্ষিণ কোরিয়াতে কমপক্ষে ১০০টি রাজনৈতিক দল আছে এবং এর প্রতিটিই প্রধান মার্কিন সমরকেন্দ্র কর্তৃক স্বীকৃত। সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সৈন্য, পুলিশ ও সশস্ত্র কনস্টেবল প্রভৃতির মোট সংখ্যা ষাট হাজার আর উত্তর কোরিয়ায় শুধু কম্যুনিস্ট সৈন্যের সংখ্যাই দুই লক্ষ। রাশিয়া কোরিয়ার রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে চায় গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তার বিরোধী। কোরিয়ার জনগণের তরফ থেকে সম্প্রতি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জোর তাগিদ এসেছে। সেই তাগিদের মর্যাদা রক্ষা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় অবিলম্বে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কিছুকাল পূর্বে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী কে পি এস মেননের সভাপতিত্বে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের যে কমিশন কোরিয়ায় গিয়েছিল, সোভিয়েট রাশিয়া তার সঙ্গে সহযোগিতা করেনি।

এই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সোভিয়েট রাশিয়া অন্য একটি প্রস্তাব এনেছে—সেটা হল কোরিয়া থেকে সৈন্যাপসারণের প্রস্তাব। সোভিয়েট রাশিয়া বলছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে তার সৈন্যদল সরিয়ে নেয়, তবে সোভিয়েট রাশিয়াও উত্তর কোরিয়া থেকে তার সৈন্যদল সরিয়ে নিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু এই মৌখিক প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে এবং কোরিয়ায় কোন দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবে রাজী হবার সাহস পাচ্ছে না। উত্তরাঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলের সামরিক শক্তি নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই পারস্পরিক মতবিরোধের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোভিয়েট পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া বিভাগকে চিরস্থায়ী করতে চায় বলেই এই একতরফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ার বামপন্থী দলগুলিকে যে কোন প্রকারে এই নির্বাচ… বিরোধিতা করার নির্দেশও দিয়েছিলে… কোরিয়ায় নির্বাচনঘটিত গণ্ডগোলের ম… কারণ যে এইখানেই নিহিত, সেকথা বল… বাহুল্য।

## রুশ-মার্কিন বোঝাপড়া

পৃথিবীর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি… সোভিয়েট রাশিয়ার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম… একটা সুস্পষ্ট বোঝাপড়া না হলে বি… স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কোন সম্ভাব… নেই—একথাটা বিশ্ববাসীদের কাছে অজ্ঞা… নেই। দুঃখের বিষয় এই, দুটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে… যে এ বিষয়ে কোন চেতনা আছে, তার কো… আভাসই আমরা এতদিন পাইনি। বিশ… রাজনীতির রংগমঞ্চে এরা দুজনেই যার য… মত নিজের নিজের পথে এগিয়ে চলেছে এ… সে পথ কার্যত পরস্পরবিরোধী। সম্মিলি… রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে কিম্বা স্বস্তি পরিষদে এদে… কার্যক্রমের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ন… জার্মানী, জাপান, গ্রীস, কোরিয়া, প্যালেস্টাই… প্রভৃতি সর্বত্র এদের মতবিরোধ হয়ে উঠে… প্রকট। এই পরিস্থিতির মধ্যে গত ১১ই … তারিখে মস্কো রেডিও ঘোষণা করেছে যে, রু… মার্কিন বিরোধ মীমাংসার জন্যে মার্কি… যুক্তরাষ্ট্র তার মস্কোস্থিত রাষ্ট্রদূত মিঃ বেডে… স্মিথের মারফৎ একটি প্রস্তাব এনেছে এ… সোভিয়েট রাশিয়া সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে… এতে কোন কোন মহলে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চা… হলেও আমরা কিন্তু আশার কারণ খুঁজে পা… না। এই উপলক্ষে মার্কিন রাষ্ট্রদূ… মিঃ বেডেল স্মিথ ও রুশ পররাষ্ট্র সচি… মঃ মলোটভের পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই প… দুটি পড়ে আশার কারণ কমই দেখতে পাও… যায়। মার্কিন পক্ষ থেকে ৪ঠা মে তারি… সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে যে পত্র দেওয়া হয়েছে… তাতে সরাসরি সোভিয়েট রাশিয়াকে পার… স্পরিক আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়েছে… এমন কথা বলা যায় না। রুশ-মার্কিন বিরোধে… একটা মীমাংসা হওয়া উচিত, এই দৃষ্টিকো… থেকেই পত্রখানি লেখা এবং শেষে বলা হয়েছে… যে, এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্যে মার্কি… যুক্তরাষ্ট্রের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত আছে। মি… স্মিথের পত্রে যুক্তিজাল বিস্তার করে দেখানো… হয়েছে যে, রুশ-মার্কিন বোঝাপড়া যে হচ্ছে ন… তার জন্যে মূলত দায়ী সোভিয়েট রাশিয়া… মার্কিনবিরোধী কার্যক্রম। অপরপক্ষে সোভিয়ে… পক্ষ থেকে মলোটভ যে পত্রোত্তর দিয়েছেন… তারও ভাবার্থ এই যে, সোভিয়েট রাশিয়া মার্কি… যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি ও সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ… হয়েই বাস করতে চায়। তবু তার সে প্রয়া… যে সার্থক হচ্ছে না, তার একমাত্র হেতু হ… মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েটবিরোধী মনোভা… ও কার্যক্রম। দুই পক্ষই দাবী করেছে যে, তাদে… পিছনে আছে নিজেদের গভর্নমেণ্ট ও জন… গণের পরিপূর্ণ সমর্থন। মূল সমস্যা সম্বন্ধে

উভয় রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী যখন এত পরস্পর-বিরোধী, তখন অদূরভবিষ্যতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্ভাবনা কোথায়? তবু এ পত্র-বিনিময়ের মধ্যে উভয়েরই একটা উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। সে উদ্বেগ হল পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাদের পরস্পরবিরোধী কর্মনীতির ফলে বিশ্বের শান্তি যে ব্যাহত হতে চলেছে, এ স্বীকৃতি আছে উভয় রাষ্ট্রেরই পত্রে। এক-টুকু চেতনাও যদি তাদের এসে থাকে, তারই বা মূল্য কম কি?

সোভিয়েট রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে বিশেষ আলোচনার ইচ্ছা জ্ঞাপন সত্ত্বেও মার্কিন মহল থেকে কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ আলোচনার এই সোভিয়েট প্রস্তাব মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ মার্শাল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর এ প্রত্যাখ্যানের কারণও অবশ্য আছে। তিনি বলেছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার কার্যক্রমের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার পরিবর্তনের জন্যে বিশেষ করে রুশ-মার্কিন বোঝাপড়ার কোন প্রয়োজন নেই—বোঝাপড়া যদি করতেই হয়, তবে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের মারফতেই সে বোঝাপড়া হতে পারে। এ উক্তির পিছনে যথেষ্ট যুক্তির ভিত্তি আছে। রুশ বিরোধিতার ফলে এ পর্যন্ত সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে অনেক ব্যাপারে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে স্থায়ী শান্তির দিকে বিশ্বের অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া যদি একযোগে, একই ইচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে ভাল-ভাবে এবং এরই মধ্য দিয়ে তাদের সকল মত-বিরোধের অবসান ঘটাবার প্রয়াস পায়, তবেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। তা না করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বার্থ যেখানে বিজড়িত, সেখানে এই দুই রাষ্ট্র যদি অন্য-নিরপেক্ষভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালায়, তবে তাতে কোন কাজও হবে না, মাঝখান থেকে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সন্দেহ ও সংশয়ের উদ্রেক হবে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও তাই এ সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর দ্বারা বিশ্ব-শান্তির আশা আদৌ বেড়েছে বলে তিনি মনে করেন না। তবু মার্শাল স্টালিন যদি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে চান, তবে আগামী অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনে তিনি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আছেন—একথাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মনে হয় যে, ক্রমবর্ধমান বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যে নিজের সদুদ্দেশ্য ও শুভবুদ্ধির প্রমাণ দেবার জন্যেই সোভিয়েট রাশিয়া আগে থেকে এ প্রস্তাব করেছে—যাতে বিশ্ববাসীরা সোভিয়েট রাশিয়াকে কোন-ক্রমেই যুদ্ধকামী আখ্যা না দিতে পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাখ্যানে সোভিয়েট রাশিয়ার সে উদ্দেশ্য আপাতত ব্যর্থ হয়ে গেল। বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া কি হবে, তাই হল আপাতত ভবনার বিষয়। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, এই ঘটনার ফলে বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যবধান আরও বাড়বে বই কমবে না।

## প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র

প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ ও বৃটেনের কার্যক্রম দেখে যা সন্দেহ করা গিয়েছিল তাই ঘটেছে—অর্থাৎ বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসানে এই ক্ষুদ্র দেশটিতে কার্যত নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এরকম যে হবে, তা বৃটিশ কর্তৃপক্ষেরও অজানা ছিল না কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও অজানা ছিল না। তবু এরা উভয়েই প্যালে-স্টাইন সম্বন্ধে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগী হয়ে একবার সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে প্যালেস্টাইন বিভাগ পরিকল্পনা পাশ করিয়ে নিয়েছে, আবার সে নিজেই বিভাগ পরিকল্পনা নাকচ করে দিয়েছে। বিভাগ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলার কোন ব্যবস্থা যেমন সে করতে পারেনি, তেমনই বৃটেন ম্যাণ্ডেট ত্যাগ করলে প্যালেস্টাইনে অছির শাসন প্রবর্তনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে তোলার কোন ব্যবস্থাও সে করতে পারে নি। অপরপক্ষে বৃটেনও গোঁ ধরে ছিল যে, ১৫ই মে তারিখ সে আর প্যালেস্টাইনের শাসনভার কোনক্রমেই নিজ হাতে রাখবে না। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ অনুরোধে ২৫শে মে তারিখ পর্যন্তও প্যালেস্টাইনের শাসনভার সে নিজের হাতে রাখতে রাজী হয়নি। ইত্যবসরে গত ১৬ই এপ্রিল থেকে প্যালেস্টাইনের সমস্যা নিয়ে বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা চলেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন কার্যকরী শাসন-ব্যবস্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কোন প্রস্তাবই আরব এবং ইহুদীরা সমভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এদিকে চলেছে আপোস-আলোচনা, আর ওদিকে চলেছে আরব ও ইহুদী—উভয় পক্ষেরই সমরসজ্জা। প্যালেস্টাইনবাসী আরবদের তুলনায় ইহুদীরা ঢের বেশী সুসংবদ্ধ অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী এবং অর্থ-সামর্থ্যবান। অপরপক্ষে প্যালেস্টাইনের আরবদের পিছনে আছে আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত মিশর, ইরাক, সিরিয়া, ট্রান্সজর্ডন প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন। প্যালে-স্টাইনের আরবদের পক্ষ নিয়ে তারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেও প্রস্তুত। এই অবস্থার মধ্যে ১৪ই মে মধ্যরাত্রিতে বৃটেন প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট ত্যাগ করেছে। কিন্তু সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নতুন কোন গভর্নমেণ্ট গঠন করা সম্ভব হয়নি। বৃটিশদের ম্যাণ্ডেট ত্যাগের মুহূর্তে এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মিঃ হ্যারল্ড ইভ্যান্সকে জেরুজালেমের নিরপেক্ষ মিউনিসি-প্যাল কমিশনার নিযুক্ত করা হয়েছে। কার্যত মিঃ ইভ্যান্সেরও কোন শাসন-ক্ষমতা থাকবে বলে মনে হয় না। তার কারণ তাঁর পিছনে নেই কোন সেনাবাহিনীর সমর্থন। যুধ্যমান আরব ও ইহুদীদের মধ্যে মীমাংসা প্রয়াসই তার প্রধান কাজ হবে বলে মনে হয়।

বৃটেন প্যালেস্টাইন শাসন ত্যাগ করার প্রায় সংগে সংগে ইহুদীরা প্রচুর ঘটা করে তেল-আভিভে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র 'ইসরাইলের' প্রতিষ্ঠা করেছে। এ যে তারা করবে, একথা তারা কিছুদিন পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিল। আরব রাষ্ট্রগুলোও বসে নেই। মিশরে রাজা ফারুক সামরিক অবরোধ ঘোষণা করে সেনা-বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। প্রকাশ, মিশরীয় সেনারা প্যালেস্টাইন সীমান্ত অতিক্রম করেছে। ট্রান্সজর্ডনের রাজা আবদুল্লাও তাঁর আরব-লিজিয়ন নামক প্রসিদ্ধ বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত। এ অবস্থায় আগামী কয়েক দিনে প্যালেস্টাইনের অবস্থা যে কি হবে, তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্মিত করেছেন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রায় সংগে সংগে নবগঠিত স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে। তিনি যে আগামী নির্বাচনের খাতিরে ইহুদীদের চটাতে চান না—এ তারই প্রমাণ। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে ইহুদী ভোটের মূল্য কম নয়। এটা নির্বাচনী বৎসর সেকথা তো ভোলা যায় না। অপরদিকে আরব-দের চটিয়ে আরব-জগতে মার্কিন তৈলস্বার্থ বিপন্ন করে তোলাও যায় না। প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সমন্বিত নীতি অনুসরণ করে চলেছে, তার মূল রহস্য এইখানে। এই জন্যেই একবার ইহুদীদের অনুকূলে প্যালেস্টাইন বিভাগ পরিকল্পনা গৃহীত হয়, আবার আরবদের প্রতিরোধে সে পরিকল্পনা নাকচ হয়ে যায়। একথা অনস্বীকার্য যে, আজ দুর্বল মার্কিন কর্মনীতির ফলেই প্যালেস্টাইনে যুদ্ধের দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে। এই দুর্বল নীতির সুযোগেই স্থাপিত হয়েছে ইহুদী রাষ্ট্র এবং আরব রাষ্ট্রগুলো হয়ে উঠেছে মারমুখো। যা হয়ে গেছে, তাকে স্বীকার করে নিয়ে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান একদিকে ইহুদীদের মন রক্ষার যেমন চেষ্টা করছেন, তেমনই অপরদিকে আরবদের বোঝাতে চাইছেন যে, এ ব্যাপারে তাঁর হাত নেই। আমাদের বক্তব্য এই যে, সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অবিলম্বে প্যালেস্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে দৃঢ় কর্মনীতি অবলম্বন না করলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হবার আশঙ্কা আছে। যেভাবেই প্যালেস্টাইন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হোক, তার জন্যে চাই সুদৃঢ় কর্মনীতি। ১৫।৫।৪৮

## বাইশ

সন্ধ্যা বলল, 'অনর্থক বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই সুরমা, বল না তোমার নিজের কথা!'

'তার আগে আরও একটা জরুরী কথা আছে আমার।'

'বল।'

'সন্দীপ্তবাবুর সঙ্গে মেলামেশা আপনাকে ছাড়তে হবে, এটুকু স্বার্থত্যাগ আমি আপনার কাছে আশা করি।'

'তোমাকে ভালবাসি সুরমা, তাই তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। সন্দীপ্তবাবু সম্বন্ধে আমার কোনই স্বার্থ নেই যে, স্বার্থত্যাগের প্রশ্ন উঠতে পারে।'

'কিন্তু ওঁর সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা আছে।'

'সেটুকু না থাকলে নয়, সেটুকু। আমি রাহু নই যে, সন্দীপ্তবাবুকে গ্রাস করে ফেলেছি। সেটুকুই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সেটুকু কাজের। তিনি কোনদিন ঘনিষ্ঠ হতে চান নি, আমিও প্রয়োজন বোধ করি নি।'

'কিন্তু এর জন্যে তাঁদের সংসারে অশান্তির শেষ নেই। নির্মলাদি কতদিন কেঁদেছেন আমার কাছে।'

'উনি যদি অনর্থক কাঁদেন বুঝতে হবে হয় ওঁর হিস্টিরিয়া আছে, না হয় ছেলেবেলার খুকিদিনে স্বভাব এখনো ছাড়তে পারেন নি। ওঁর জন্যে আমি কাজ ছাড়তে পারি না, তুমি কি সেই অনুরোধই আমাকে জানাতে এসেছো?'

'না, তবে যদি কোন উপায় থাকে।' স্তিমিত গলায় সুরমা জানাল তার আবেদন, 'শুনলাম স্বামী কেড়ে নেবার অভিযোগে তিনি আদালতের আশ্রয় নেবেন। ভেবে দেখুন— কি বিশ্রী একটা ব্যাপার হবে।'

সন্ধ্যা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, 'স্বামী কেড়ে নেবার অপরাধ? তার জবানবন্দী আমায় দিতে হবে না, দেবেন সন্দীপ্তবাবু। তবু ত এখনও কেড়ে নিই নি।'

'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ত বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে।'

'আমি তার কি করব?' নিতান্ত নিস্পৃহ গলায় সন্ধ্যা উত্তর দিল, 'যে স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করতে পারে না, তার কোন দাবী নেই স্বামীর ওপর তা জান?'

'দাবী আছে বলেই অবিশ্বাস করতে পারে।'

'স্বীকার করি না। নির্মলা যদি স্বামীকে ধরে রাখতে না পারে—সেটা আমার অপরাধ নয়।'

'আপনি যদি ছিনিয়ে নেন, সেটাও নির্মলাদির অপরাধ নয়।'

'এর উত্তর আমি দিয়েছি সুরমা।'

সুরমা বলল না কিছু। স্কুলের সময় হচ্ছে, উঠে পড়ল সে।

সন্ধ্যা তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল, বলল, 'আবার কবে আসবে বল, রাগ করে যাচ্ছো ত?'

'না।'

সুরমা চলে গেল।

সন্ধ্যা টুথ-ব্রাস আর সাবান নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল।

## তেইশ

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সন্ধ্যা তিনকড়ির ঘরে ঢুকে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল, দেয়ালে বালিস ঠেস দিয়ে কোনরকমে উঠে বসেছে তিনকড়ি।

'কে তোমায় বসিয়ে দিলে?' সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করল।

'চেষ্টা করে বসেছি।'

'অন্যায় করেছো, হার্ট তোমার দুর্বল, তুমি জান না?'

'জানি, মরব না। তুমি অবশ্য তাই চাও।'

'তোমার মৃত্যু-কামনা করে আমার লাভ নেই। আমার আয়ু তাতে বাড়বে না।'

'আয়ু বাড়বে না, কিন্তু অনেক সুবিধে তাতে!' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল তিনকড়ি।

'এমন কিছু অসুবিধেয় আমি নেই, বোকো না।' সন্ধ্যা চলে গেল।

আজ একটু বেলা থাকতেই কাজে বেরুল সে, ট্যাক্সিটা যখন ক্যাসিনোর সামনে দাঁড়াল, তখন সবে পাঁচটা। চৌরিঙ্গীর ট্রাফিক আর লোক বাড়ছে।

একটা বয় দৌড়ে এসে ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়াল।

ভাড়া মিটিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল সে। স্পেন্সার নড করল, সন্ধ্যা জানাল প্রত্যভিবাদন। এখনও ভিড় কম, সন্ধ্যা হতে না হতেই লোকের কথায় সারা ঘরটা গম গম করবে।

সন্ধ্যা এক পেয়ালা কফি চেয়ে পাঠাল; কফির পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকল স্পেন্সার।

'একটা বয়কে বললেই ত পারতে। তুমি কেন কষ্ট করছ মিঃ স্পেন্সার?'

'কষ্ট কি? এ ত আনন্দ।' স্পেন্সার হেসে উত্তর দিল। 'তবু ত আপনার কাজ করবার একটা সুযোগ পেলাম।' পেয়ালাটা রাখল সে।

পাতলা গড়ন, বয়েস পঁয়ত্রিশ কি তার ওপরে। একটু খুঁড়িয়ে চলে, বিশেষ লক্ষ্য না করলে চোখে পড়বার কথা নয়।

'রোজই ত তুমি আমার আদেশে নানারকম কাজ কর।' সন্ধ্যা বলল।

'সেগুলো আপনার কাজ নয়, চাকরী বজায় রাখবার জন্যে।'

সন্ধ্যা কফির পেয়ালায় চুমুক দিল। স্পেন্সার আপাতত বাইরে যেতে পারে।

কিন্তু গেল না, সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করল।

স্পেন্সার ইতস্তত করল, তার মুখে চলকে গেল এক মুহূর্তের আরক্ত আভা, 'কিছু মনে করবেন না ত?'

'নিশ্চয়ই না।'

'আমি আপনাকে এ্যাড্‌মায়ার করি। অনেকের সঙ্গে মিশেছি, দেশী এবং বিদেশী কিন্তু আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না— আপনার মত এমন একজন প্রথম শ্রেণীর ভদ্র-মহিলা আমি জীবনে কোনদিন দেখি নি।'

'ওঃ ধন্যবাদ।'

'কিন্তু আমি জানি, আপনারা আমাদের ভালো চোখে দেখেন না, এমন কি বোধ হয় ঘৃণা করেন।'

'কেন এ প্রশ্ন?'

'আমার মনে হয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ওপর ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালীর একটা তীব্র বিদ্বেষ আছে।'

'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—কোন বিশেষ জাতির ওপর আমার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই।'

'সত্যি? আপনি তাহলে আমাকে ঘৃণা করেন না?'

'কাউকেই আমি ঘৃণা করি না।' শেষ চুমুক দিয়ে কফির পেয়ালাটা সন্ধ্যা নামিয়ে রাখল।

'আপনি মহৎ।' স্পেন্সার গলে গেল।

করে ভালবাসা আদায় করা যায় না এ কথা ভোলবার মত বয়েস আপনার নয়!

'এটা আমার শক্তি-প্রদর্শনের অভিব্যক্তি নয়। তোমাকে ভালবাসি। প্রকাশ করবার অজ্ঞতা স্বীকার করছি। কিন্তু দয়া করে আমায় অনুভব করতে দাও তোমার সান্নিধ্য। আমি তোমায় বিয়ে করব। হয়ত এ অসম্ভব। কিন্তু আমার ভালবাসার কাছে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে না?'

'না, পারে না। ভালবাসা নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য, যেমন আপনি আমি বাধ্য কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে, সামাজিক বলুন, প্রাকৃতিক বলুন, না মানলে বিপরীত শক্তির চাপে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো মাত্র।'

'তিল তিল করে মরার চাইতে একবার মৃত্যু শ্রেষ্ঠ। এ ভালবাসা যদি ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় ত যাক। তবু সান্ত্বনা থাকবে তোমায় পেলাম।'

'এতটা স্বার্থপর আপনাকে ভাবতে পারি না।' উত্তর দিল সন্ধ্যা, 'দুর্গম পথে পা বাড়াবার জন্যে প্রস্তুত আমি নাও থাকতে পারি! আপনার স্ত্রী, মেয়ে? আপনার সমাজ, সুনাম, সম্ভ্রম?'

'ওজন করে দেখেছি সন্ধ্যা! তোমাকে বাদ দিলে সবই নিরর্থক।'

'কিন্তু আমার ত স্বামী আছে; এটা আপনাকে ভুললে চলবে না—আমি একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী। আমার স্বামী অসুস্থ, অসহায়। আমার সন্তান আছে, এদের আমি ত্যাগ করব আপনার পাগলামির পাল্লায় পড়ে। এখন গভীর রাত, নির্জন পথ, পরিচিত অপরিচিত সকলের দৃষ্টির বাইরে, কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, এমন কি প্রয়োজন মনে না করলে নিজেকেও না; এ অবস্থায় একটু চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কাল দিনের আলোয় প্রাত্যহিক পরিবেশে আপনি লজ্জায় আমার দিকে চাইতে পারবেন না! ছেড়ে দিন।'

সুদীপ্ত ওকে আলিঙ্গনমুক্ত করে দিল।

সন্ধ্যা তার সাড়ি আর জামার ভাঁজ ঠিক করতে করতে বলল, 'চলুন ফেরা যাক।'

'চলুন!' চাবি ঘুরিয়ে সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু সত্যিই ভেবেছিলাম আর ফিরবো না কোনদিন; চেয়েছিলাম ঘর বাঁধবো, ভালবাসবো, স্বপ্ন-রচনা করব। সারা জীবন স্বপ্ন দেখবার অর্থ আমার ছিল, তবু—

'আপনি কি শেষ চেষ্টা করে দেখছেন?' সন্ধ্যার গলায় বিরক্তি প্রকাশ পেল না বিন্দু মাত্র!

'অপমান করবার অধিকার আপনার নেই, ভুলে যাবেন না!' গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সুদীপ্ত বলল।

'ভুলিনি! আপনারও মনে থাকা উচিত ছিল বক্তব্যই আসল নয়, অর্থটাই সব!'

'স্পষ্ট করে বলুন।' গাড়ি ঘুরল।

'অর্থাৎ! যেমন গানের ঝঙ্কারটাই প্রধান নয়, প্রধান হচ্ছে সুর!'

গাড়ি ছুটে চলল উল্কার মত, প্রতিমুহূর্তেই সন্ধ্যার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, চোখ খুলে তাকাবার সাধ্য কি?

'সত্যি সত্যিই আপনার আজকে ফেরবার মতলব নেই নাকি?' সন্ধ্যা হাসল।

'মরণকে অত ভয় কিসের?' সুদীপ্ত শ্লেষ করল।

'মরণকেই ত ভয়, আর ভয় কিসের বলুন পৃথিবীতে?'

'কেন সমাজের, সম্মানের, সুনামের? এদের কাছে প্রাণ ত তুচ্ছ' স্পীডোমিটারের কাঁটা ঘুরছে।

'অভিমান করে নিজেকে ছোট করবেন না!' সন্ধ্যা বলল।

'আপনার কাছে সম্মানীয় হয়ে থাকবার মূল্যই বা কি?'

'কিছুই নেই?'

'বিন্দুমাত্র না।'

চুপচাপ!

এঞ্জিনের একঘেঁয়ে শব্দ!

আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি সন্ধ্যার বাড়ির সামনে এসে থামল।

গাড়ি থেকে নেমে সন্ধ্যা বলল, 'আসুন না ভেতরে!,

'নাঃ প্রয়োজন কি?'

'প্রয়োজন ফুরল নাকি?'

'আজ থেকে!' গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সুদীপ্ত ফিরে গেল।

সন্ধ্যা আশ্চর্য হয়নি, বিস্মিত হল।

সুদীপ্ত লিখেছে কাল থেকে আর দরকার নেই তার, অন্য মেয়ে রেখেছে সে! প্রায় এক মাসের মাইনের একখানা চেকও পাঠিয়ে দিয়েছে! অপর আর একখানা চিঠিতে লিখেছে ভাড়া যদি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় তা হলে বাড়ি সে রাখতেও পারে; তবে অন্য বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত উঠে যেতে তাকে বলছে না সে

সন্ধ্যার পাতলা ঠোঁটে এক টুকরো হাসির বিদ্যুৎ চমকে গেল। চিঠিটা সরিয়ে রেখে চায়ের পেয়ালায় আস্তে একটা চুমুক দিল, খবরের কাগজটা মেলে ধরল। সরকারী ব্যবস্থায় লোকের অন্নকষ্টের এবার সমাধান হবে, চালের দাম কমে যাচ্ছে হু হু করে! অনাহারের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে একটি পরিবার কোন এক অখ্যাত গ্রামে।

কাগজ বন্ধ করে স্নান করতে গেল সন্ধ্যা।

স্নানের ঘর থেকে শুনতে পেল কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে! শিক্ষিত হাত, প্রথমে আস্তে —তারপর ঝড় উঠল যেন। মুগ্ধ হয়ে শুনল সন্ধ্যা! কে?

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিচে এল।

সুদীপ্ত!

শুনল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পেছন থেকেও বোঝা যায় ওর ঐকান্তিকতা!

কয়েক মিনিট পরে বাজনা শেষ করে তাকাল সে।

'আমি জানি আপনি আসবেন!' সুদীপ্ত বলল, 'কি সুন্দর আপনি! বসুন!'

সন্ধ্যা বসল, পিঠের ওপর ভিজে এক রাশি কালো চুল! ল্যাভেন্ডারের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠল।

'আবার ক্ষমা চাচ্ছি আপনার কাছে!' সুদীপ্ত সত্যিই হাত জোড় করল, 'চিঠিখানা ফিরিয়ে নিতে এসেছি! বুঝতে পারিনি এ নিজেরই অপমান!'

'যিনি দিতে পারেন, তাঁরই ফিরিয়ে নেবার অধিকার থাকে, অতএব নিজেকে আরও ছোট করবেন না! দয়ার দান গ্রহণ করবার লোভ আমার নেই, সে দীনতা কোন দিন যেন আমাকে স্পর্শ না করে! অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি অভাব, দারিদ্র্য কিছুই আমাকে নামাতে পারে না। জীবনকে দেখেছি, চিনেছি; শিখেছি যুদ্ধ করতে, এ যুদ্ধে জয়লাভ একদিন করবই সেদিনও আপনার সহৃদয়তার কথা আমি ভুলবো না! তা ছাড়া দাবি আমার কিছুই ছিল না আজও নেই, একথা আমার চাইতে বেশি কেউ জানে না! আপনার ওপর কিসের অধিকার আমি খাটাবো?'

'দাবি বা অধিকার নিয়ে কেউ জন্মায় না অন্তরের টানে অধিকার আসে, বন্ধুত্বের দাবি ত আপনি করতে পারেন।'

'স্ত্রী পুরুষের নিছক বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাস করি না, কেন না ওটা অসম্ভব। দেহকে কেন্দ্র করেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অশরীরী সন্ধ্যার কথা আপনি ভাবতে পারেন? আপনি আমাকে পেতে চান, অর্থাৎ পরিচ্ছদের অন্তরালে [illegible] দেহটাকে অধিকার করতে চান, তারই অনিবার্য আকর্ষণে গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, প্রীতি

ক্ষতি কি?

'আছে। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই!'

'আপনি আসছেন ত কাজে?' সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল।

'না, আসছি না! আপনার বাড়িতে তবু কয়েকটা দিন থাকতে দিতে হবে—অন্তত, উনি সেরে না ওঠা পর্যন্ত!'

'সত্যিই [illegible] এ শাস্তি আপনি দেবেন

'আপনি [illegible] অপরাধ করেননি—[illegible] জন্যে শাস্তি [illegible] উঠতে পারে?'

সুদীপ্ত [illegible] নাতে আঙুলে ঠুক লাগল। বুদ্ধি [illegible]

করে [illegible] সে বলল, 'হেরে গেল আপনার [illegible]!' [illegible] করে নিরর্থক হয়ে যা—এ [illegible] 'এটা [illegible]নি! আপনার সম

অভিযোগ আমি স্বীকার না করলেও কিছুই অবশ্য আপনার এসে যায় না। তবু অনুরোধ করছি, আর একবার অন্তত আমার উপস্থিতি বাদ দিয়ে ভেবে দেখুন! এমন করে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়াবেন না!'

'ভাববার কিছুই নেই, জীবন আমার কাছে একটি সরল রেখা, নিজেকে জানি, কৃতকাজের জন্যে অনুতাপ করব না, অনুতাপ করা পাপ। আপনার উপস্থিতি বাদ দিতে বলছেন! কেমন করে সম্ভব? এ বাড়ি আপনার, বসে আছি আপনার কেনা সোফায়, পরনের সাড়িখানি পর্যন্ত আপনার উপহার, আমার এই চুলের তেল! এখানে এই ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্রে আপনি জাজ্বল্যমান! তাই আমাকে দূরে যেতে হবে—ভোলবার উদ্দেশ্যে নয়, সংস্রব ত্যাগ করবার জন্যে!'

সন্দীপ্তের মুখে অপমান আর হতাশার কালো ছায়া দেখা দিল। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে সে উঠে পড়ল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে এসে পড়ল।

অনেক দিনের পুরনো একটা গানের কলি গুন গুন করে সন্ধ্যা ওপরে উঠে এল।

নিস্তব্ধ দুপুর!

নীল আকাশ, চিল ভেসে বেড়াচ্ছে অলস পাখায়।

সন্ধ্যা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। কিশোর বয়সের অভ্যাসটা নূতন করে দেখা দিয়েছে তার।

টুনি একটা গল্পের বই-এর ছবি দেখতে দেখতে ঘুমে আচ্ছন্ন।

বালিশের চার পাশে ছড়িয়ে পড়েছে সন্ধ্যার চুল। খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে।

শীতের শেষ। বাতাসে তাপের উষ্ণতা!

বসন্ত এল। গাছের শাখায় নূতন পাতার ইসারা! সন্ধ্যা তাকিয়ে থাকে! আশ্চর্য হয়, বিস্মিত হয়!

বই মুড়ে সে তিনকড়ির ঘরে এল। চুপ করে শুয়ে ছিল সে, ঘুমোয়নি!

'ঘুমোচ্ছ?' সস্নেহে জিজ্ঞেস করল সন্ধ্যা! বসল তার শিয়রে, চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল।

'বেশ ভালো লাগছে আজকাল, না?' আবার জিজ্ঞেস করল সন্ধ্যা!

'মন্দ না', জবাব দিল তিনকড়ি, 'এখানে পাশে এসে বোসো।'

সন্ধ্যা গা ঘে'ষে বসল। তিনকড়ি ওর একখানা হাত তুলে নিল নিজের হাতে! মুখের ওপর রাখল, ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল বার কয়েক! সন্ধ্যা তাকাল তার মুখের দিকে! ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বুকের আঁচলটা টেনে দিল ভালো করে!

তিনকড়ি মুখে এক টুকরো হাসি এনে বলল, 'বয়সের সঙ্গে তোমার লজ্জাটাও বাড়ছে দেখছি!'

'ভুলে যাচ্ছো!' স্নিগ্ধ গলায় সন্ধ্যা উত্তর দিল, 'কোনদিনই লজ্জা আমার কম ছিল না; দেখছো না—গায়ে জামা নেই!'

'নাই থাকল! কিন্তু রয়েছে ত দেখছি!'

'না। চুপ করে ঘুমিয়ে পড়, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি!' সন্ধ্যা হাত রাখল তিনকড়ির বুকের ওপর!

'এই চোখ বুজলাম! পালাবে না ত?'

'পালানো আমার স্বভাব নয়!'

সন্ধ্যা ওর বুকে হাত বুলোতে লাগল ধীরে ধীরে।

এক সময়ে তিনকড়ি বাঁ হাতে ওর বুকের আঁচলটা নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

'কি হচ্ছে? এই তোমার ঘুম?' সন্ধ্যা হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে বিফল হল।

তিনকড়ি নীমিলিত চোখেই বলল, 'বৃথা চেষ্টা করছ!

'ছাড়! আমি দিচ্ছি খুলে!'

তিনকড়ি হাত সরিয়ে নিল। চোখ বন্ধ করেই সে বুঝতে পারল সন্ধ্যা আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিচ্ছে গায়ে!

চুপ করে রইল তিনকড়ি, রক্তে অনুভব করছে সন্ধ্যার হাতের স্পর্শ! রৌদ্র-স্পর্শে শিশির-বিন্দুর মত গলে যাচ্ছে তার সমস্ত শরীর!

তিনকড়ির রক্তে ঝন ঝন করে উঠল ধারাল তলোয়ার। কোন দিন—কোন দিন সে পাবে না সন্ধ্যাকে। সে জানে তার আলিঙ্গনে কোন দিন ধরা পড়বে না সন্ধ্যার গৌর-তনু, শিরায় লাগবে না সন্ধ্যার হৃদয়-তরঙ্গ। ওর দেহের আগুন লেগে কখনও জ্বলবে না তিনকড়ির মত প্রদীপ।

আজ সে কামনার প্রদীপ জ্বালবে, জ্বালবে বাসনার ধূপ; সন্ধ্যার জীবন দিয়ে আনবে তার রক্তের বিশুদ্ধতা! এই শয্যায় তার উষ্ণ দেহ আজ তিনকড়ির কঠিন আলিঙ্গনে পান্ডুর করে দেবে। সন্ধ্যা! তোমার দেহের শেষ উত্তাপ মিলিয়ে যাবার আগে তুমি অনুভব করবে সে-পুরুষের কঠিন স্পর্শ যাকে তুমি তিল তিল করে বঞ্চিত করেছো। নিষ্প্রাণ, শীতল দেহ বহন করে নিয়ে যাবে তোমার স্বামীর রক্তের বীজ যা কোন দিন তোমার আত্মাকে মুক্তি দেবে না! তিনকড়ির ঘুমন্ত স্নায়ু জেগে উঠল ক্ষিপ্ত বেগে!

'ঘুমোলে?' অনুচ্চ গলায় প্রশ্ন করল সন্ধ্যা!

'না, ঘুম আসছে না ত!' চোখ খুলল তিনকড়ি, 'টুনি কোথায়?'

'কেন বলত? ঘুমোচ্ছে!'

হাত প্রসারিত করল তিনকড়ি, 'তোমার গলায় ওটা কিসের দাগ? দেখিনি ত?'

'কিসের দাগ?' সন্ধ্যা গলায় হাত দিয়ে বলল, 'কই?'

'এই যে! মুখটা একটু নামাও, এই যে—এখানে—' তিনকড়ি দুহাতে সন্ধ্যার গলা টিপে ধরল। কিছু সে বুঝতে পারার আগেই তার মুষ্টি কঠিন হয়ে সন্ধ্যার নরম মাংসের মধ্যে ডুবে গেল। ওর চোখের সামনে পৃথিবীর আলো ম্লান হয়ে আসছে, অস্পষ্ট হয়ে এল চেতনা। স্মৃতি আর অনুভূতির ওপর নামছে কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রির মত গাঢ় অন্ধকার!

জীবন আর মৃত্যুর চরম মুহূর্তে সন্ধ্যা তিনকড়ির হাত ছাড়বার প্রাণপণ চেষ্টা করল পারল না! তিনকড়ির চোখের ওপর ভেসে উঠল রূপসী সন্ধ্যার নগ্ন দেহ!

সন্ধ্যা—তার অবচেতন মনের শেষ বুদ্ধির সাহায্য নিল! সংহত শক্তিতে দুহাত বাড়িয়ে তিনকড়ির গলাটা সে টিপে ধরল শরীরের সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে। তার মাংসহীন গলায় সন্ধ্যার কয়েকটি ধারাল নখ বিদ্ধ হয়ে গেল এই আকস্মিকতা তিনকড়ির বুদ্ধির অতীত প্রস্তুত ছিল না সে। সন্ধ্যা তাকে চিন্তার অবসর দিল না, বলিষ্ঠ বাহু তাকে নিষ্পেষিত করতে লাগল অদ্ভুত, আশ্চর্য এক শক্তিতে এক নিমেষে সমস্ত চেতনা তার স্বাভাবিক হয়ে এল। তিনকড়ির মুষ্টি শিথিল হয়ে আসছে ফিরে এল সন্ধ্যার প্রখর অনুভূতি! পেশীর একাগ্রতা তীক্ষ্ম হয়ে এল। শরীরের সমস্ত ঐকান্তিকতা দিয়ে সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করতে লাগল।

তিনকড়ির শিথিল হাত হঠাৎ ঝুলে পড়ল যেন! ওর গলায় হাত রেখে সন্ধ্যা তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে আস্তে আস্তে হাত তুলে নিল। ওর নীমিলিত নিষ্প্রাণ চোখে পৃথিবীর শেষ আলো মুছে গেছে। সন্ধ্যা তার নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা করল, তিনকড়ির জীবনের ওপর পড়েছে কৃষ্ণ-যবনিকা।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সন্ধ্যা। দরজাটা বন্ধ করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল গলায় হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করল।

বাইরে অপরাহ্নের ছায়া নামছে! দীর্ঘ হচ্ছে গাছের ছায়া!

তিনকড়ির সার্টটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে বোতাম এ'টে দিল। আঁচল দিয়ে সাবধানে মুছে নিল রক্তের দাগ।

নিজের ঘরে এসে একখানা কাগজে সন্দীপ্তকে লিখল, সে যেন এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে একজন ডাক্তার নিয়ে আসে, ওর অসুখটা হঠাৎ বেড়ে গেছে।

দারোয়ান গেল সন্দীপ্তকে ডাকতে!

সন্ধ্যা ফিরে এল তিনকড়ির ঘরে। দেহের সমস্ত রক্তাভা মিলিয়ে গেছে। হাতের সরু আঙ্গুলগুলো এখনও তার হিংস্র, ভয়ঙ্কর

বোধ হচ্ছে, সন্ধ্যার মেরুদণ্ড শির শির করে উঠল! গলা স্পর্শ করল হাত দিয়ে!

তাকাল সে, মনে হল সমস্ত পরিচিতির বাইরে ঐ মুখ, ওর সম্বন্ধে কোন কথাই স্পষ্ট করে মনে করতে পারে না সে, তার সাত বছরের বিবাহিত জীবনের কোন ঘটনাই তার মনে রেখাপাত করেনি! কোনদিন বেঁচে ছিল না তিনকড়ি, মৃতদেহের প্রেতায়িত আলিঙ্গনে সে ধরা দিয়েছিল; আর কোনদিন সে অনুভব করবে না তার হিম স্পর্শ, মুখে লাগবে না ঠাণ্ডা, তুহীন নিশ্বাস!

হঠাৎ মনে হল তিনকড়ির চোখের পাতা নড়ছে! হাতের আঙ্গুলগুলো যেন কাঁপল। সন্ধ্যা ক্ষিপ্র পায়ে বিছানার কাছে সরে এল; নাঃ আর কোন দিন চোখ খুলবে না ও, চেতনা উজ্জীবিত করবে না প্রাণের স্পন্দন। তবু—তবু সে দাঁড়িয়ে রইল, চিত্রার্পিতের মত স্থির! সম্মোহিত মন তার যেন অনুভূতি হারাল কয়েক মুহূর্তের জন্যে! হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ে চাদরটা মুখ পর্যন্ত টেনে দিল; দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ফুটপাতে সে দেখেছে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে কত লোক ঘুমিয়ে থাকে! তিনকড়ি যেন গভীরভাবে নিদ্রিত; এখনি ঘুম ভেঙ্গে চাদর সরিয়ে সে উঠে বসবে নূতন শক্তি আর উদ্যম নিয়ে, জোর গলায় দাবি করবে প্রয়োজনীয় বস্তু, যা থেকে তাকে বঞ্চিত করবার অধিকার পৃথিবীতে কারুর নেই, সন্ধ্যার পায়ে পরাবে লৌহ-শৃঙ্খল—যে-বন্ধন থেকে তার নিস্তার নেই, মুক্তি নেই, কোন দিন পাবে না মুক্তি; প্রতিদিন সন্ধ্যাকে বুভুক্ষু তিনকড়ির যৌনক্ষুধার কাছে করতে হবে আত্মসমর্পণ, গ্লানি আর কুৎসিত অপমানের ভারে প্রতিদিন তার মৃত্যু হবে!

মনে হল তিনকড়ির শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, চাদরের উত্থান পতন সম্বন্ধে যেন আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না! ভয়ে ভয়ে কম্পিত হাতে সন্ধ্যা ওর মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিল, কোন পরিবর্তন নেই; স্তব্ধ হৃদপিণ্ডের গতি! নখগুলো কালো হয়ে এসেছে, মাথার চুল পর্যন্ত মৃত্যুর স্পর্শে যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে, সমস্ত মুখখানা পাণ্ডুর, বিকৃত! চোখ ফিরিয়ে নিল সন্ধ্যা! জানলা দিয়ে দেখল বাইরে দেবদারু গাছের শাখায় সোনালী রোদ চিক চিক করছে! আমগাছের তলায় অজস্র মুকুলের নিরর্থক নিঃসরণ; সন্ধ্যার মনকে মুক্ততর আকাশে বিস্তৃতি দিল। শয্যায় তিনকড়ি নেই, বাড়িতে তিনকড়ি নেই, এ-পৃথিবীতে কোথাও তার নেই কোন চিহ্ন! বিছানায় মরা মাটির মূর্তির দিকে তাকিয়ে লাভ নেই!

নিচে মোটারের শব্দ শোনা গেল; এখন—এই মুহূর্তে কি করা তার উচিত? মাথায় আঁচল তুলে সে তিনকড়ির পায়ের কাছে দাঁড়াল।

সুদীপ্ত ঢুকল, পেছনে তার ডাক্তার!

'কৈ? কি হয়েছে বলুন ত?' সন্ধ্যার দিকে তাকাল সুদীপ্ত, বিছানার কাছে এগিয়ে এল দ্রুত পায়ে!

সন্ধ্যা কোন উত্তর দিল না; আঁচলটা প্রায় কপালের ওপর টেনে দিল!

---

**আগামী সপ্তাহ হইতে শ্রীযুত সতীনাথ ভাদুড়ী লিখিত নূতন উপন্যাস "সটীক ঢোঁড়াইচরিতমানস" 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইবে।**

---

'দেখ ত হে! ডাক্তার! আমার ত ভালো মনে হচ্ছে না!'

ডাক্তার স্টেথেস্কোপ বার করবার প্রয়োজনই বোধ করলে না, বললেন, 'কি আর দেখবো? কিসে ভুগছিলেন?'

'প্যারালিসিস্! উত্তর দিল সুদীপ্ত।

'হঠাৎ এ-রকম হল কেন?'

'সকাল থেকে বলছিলেন শরীরটা খুব ভালো লাগছে না! মৃদু কণ্ঠে বলল সন্ধ্যা, 'বিকেলের দিকে বললেন একটু উঠিয়ে দিতে! রোজই ঘণ্টাখানেক বালিশে হেলান দিয়ে বসেন, কোন কষ্ট হয় না। আজকে আমি বারণ করলাম, শুনলেন না! অগত্যা কয়েকটা বালিশ খাড়া করে বসিয়ে দিলাম, দুধ আনতে গিয়ে হঠাৎ চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখলাম বালিশ সরিয়ে নিজেই তিনি শুয়ে পড়েছেন। বললেন, বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে, শিগ্গির জল দাও একটু! জলের গ্লাস মুখের কাছে ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গেলেন বিছানায়!' শেষের দিকে যেন সন্ধ্যার গলার স্বর ভারি হয়ে এল। এক মুহূর্ত পরে সন্ধ্যা অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'তারপর—' শেষ করল না সে! হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘটনা উপলব্ধি করতে সুদীপ্ত এবং ডাক্তারের কয়েক মিনিট লাগল!

ঘরের মধ্যে ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা!

মৃতদেহের সঙ্গে পার্থক্য আনবার জন্যেই বুঝি সুদীপ্ত বলল, 'তুমি আর কি করবে, একটা সার্টিফিকেট দিয়ে চলে যাও, তোমাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম ডাক্তার! ঝটপট সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে, আজকাল আবার সন্ধ্যার পর পোড়াতে দেয় না।'

সার্টিফিকেটটা সুদীপ্ত পকেটে রাখল।

ডাক্তারকে নামিয়ে দিয়ে সে গেল লোক ডাকতে; এঁদের আত্মীয়েরা থাকেন তালতলা না এনটালি,—সেখানেও খবরটা দিতে হবে। তারপর কিছু ফুল আর এসেন্স। সন্ধ্যার জন্যে সাদা থান।

সুদীপ্তের কামনা-পক্ষী চঞ্চল পাখায় ভর করে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

জোরে গাড়ি চালাল সে। রাত্রির আর দেরি নেই।

ঈষদুষ্ণ জলে সন্ধ্যা স্নান করল অনেকক্ষণ।

আয়নায় আর একবার মুখ দেখে বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল।

বাইরে—এখনও আকাশে নীলের আভা। জীবনের—তার যৌবনের আর একটি রৌদ্র-ঝলমল, সোণালী অপরাহ্ন: তীক্ষ্ণ প্রখর দিনের শেষ, স্মরণীয় বেলা। স্মৃতির ওপর জমেছে সময়ের ধুলো। মনের আকাশ ছুঁয়ে দিগন্তে ভেসে গেছে অনেক কালো মেঘ। কাল আবার আর একটি শাণিত, শব্দমুখর নূতন দিন। দুর্গম, দীর্ঘ রাত্রির অন্ধকার পথ বেয়ে পুনরায় দেখা দেবে নূতন সূর্য। মৃত দিবসের হিম-শীতল কবরের ওপর সূর্য জন্ম দেবে নূতন দিনের। কোলাহল আর কলরবধ্বনিতে মহাকালকে প্রণাম জানাবে এ-দিন। সন্ধ্যা চোখ বুজল।

বাইরে দেবদারু-শীর্ষে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। পাখী ডাকল। সূর্যের ম্লান আলোয় শেষ হল ভ্রমরের গুঞ্জন।

সন্ধ্যা ঘুমিয়ে পড়ল।

**শেষ**
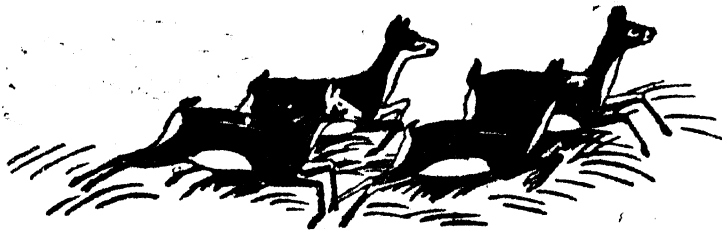
# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

মীর আসলম আরবী ছন্দে ফারসী বলতেন অর্থাৎ আমাদের দেশে ভটচাযরা যে রকম সংস্কৃতের তেলে ডোবানো সপসপে বাঙলা বলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'ভ্রাতঃ 'চহার-মগজ্-শিকন' কি বস্তু তস্য সন্ধান করিয়াছ কি?'

আমি বললুম 'চহার' মানে 'চার' আর 'মগজ্' মানে 'মগজ,' 'শিকস্তন' মানে টুকরো টুকরো করা।' অর্থাৎ যা দিয়ে চারটে মগজ ভাঙা যায়, এই আরবী ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কিছু হবে আর কি?'

মীর আসলম বললেন, 'চহার-মগজ' মানে চতুর্মস্তিষ্ক অতি অবশ্য সত্য, কিন্তু ভাবার্থে ঐ বস্তু আক্ষোট অথবা আখরোট। অতএব চহার-মগজ্-শিকন বলিতে শক্ত ...তার হাতুড়ি বোঝায়।' তারপর দাগী ঘড়িওয়ালা প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'আয় বরদারে আজীজে মন, হে আমার প্রিয় ভ্রাতঃ, অপরার্থে ঘটিকাযন্ত্র অথচ ধর্মত বর্জিত যে দ্রব্য চহার-মগজ্-শিকন সে বস্তু তুমি তোমার যাবনিক 'অঙ্গরক্ষার' আস্তরণ মধ্যে পরম প্রিয়তমার ন্যায় বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছ কেন? অপিচ পশ্য, পশ্য অদূরে উদ্যানপ্রান্তে পরিচারকবৃন্দ উপর্যুক্ত যন্ত্রাভাবে উপলখণ্ড দ্বারা অক্ষরোট ভগ্ন করিবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হইতেছে। তোমার হৃদয় কি ঐ উপলখণ্ডের ন্যায় কঠিন অথবা বজ্রাদপি কঠোর?'

দাগী ঘড়ি রাখা এমনি ভয়ংকর পাপ যে, প্যারিসফের্তা বাকচতুর সইফুল আলম পর্যন্ত একটা জুতসই উত্তর দিতে পারলেন না। মাথাটা কি একটা বিড় বিড় করলেন যার অর্থ, 'এক মাঘে শীত যায় না।'

মীর আসলম বললেন, 'ঐ সহস্র হস্ত উচ্চ পর্বত-শিখর হইতে তথাকথিত দ্বাদশ ঘটিকার সময় এক সনাতন কামান ধূম্র উদ্গীরণ করে—কখনো কখনো তজ্জনিত শব্দও কাবুল নাগরিকরাজির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শুনিয়াছি, একদা দ্বিপ্রহরে তোপচী লক্ষ্য করিল যে, বিস্ফোরক-চূর্ণের অনটন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আদেশ করিল সে যেন নগরপ্রান্তের অস্ত্রশালা হইতে প্রয়োজনীয় চূর্ণ আহরণ করিয়া লইয়া আইসে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই সহস্র হস্ত পরিমাণ পর্বত অবতরণ করিল, শ্রান্তি দূরার্থে বিপনি মধ্যে প্রবেশকরত অষ্টাধিক পত্র চৈনিক যূষ পান করিল, প্রয়োজনীয় ধূম্রচূর্ণ আহরণ-করত পুনরায় সহস্রাধিক হস্ত পর্বত শিখরে আরোহণ করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। স্বীকার করি অপ্রশস্ত দিবালোকেই সেইদিন নাগরিকবৃন্দ কামানধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতঃ, সইফুল আলম সেইদিনও কি তোমার চহার-মগজ্-শিকন কণ্টকে কণ্টকে দ্বাদশ ঘটিকার লাঞ্ছন অঙ্কন করিয়াছিল?'

আমি বললুম, 'এ রকম ঘড়ি আমাদের দেশেও আছে—তাকে বলা হয়, আব-পাড়ার ঘড়ি।'

সইফুল আলম আর মীর আসলম ছাড়া সবাই জিজ্ঞেস করলেন 'আব' কি? সইফুল আলম বোম্বাই হয়ে প্যারিস যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু মীর আসলম?

তিনিই বললেন, 'আম্র অতীব সুরসাল ভারতীয় ফলবিশেষ। দ্রাক্ষা আম্রের মধ্যে কাহাকে রাজমুকুট দিব সেই সমস্যা এ যাবৎ সমাধান করিতে পারি নাই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কিন্তু আপনি আম খেলেন কোথায়?'

মীর আসলম বললেন, 'চতুর্দশ বৎসর হিন্দুস্থানের দেওবন্দ রামপুরে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অদ্য তোমার নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিতে হইল। কিন্তু শোকাতুর হইব না, লক্ষ্য করিয়াছি তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা। শুভলগ্নে একদিন তোমাকে ভারত আফগানি-স্থানের কৃষ্টিগত যোগাযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিব। উপস্থিত পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে তোমার অনুগত ভৃত্য আব্দুর রহমান খান তোমার মুখারবিন্দ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া দণ্ডায়মান।'

কি আপদ, এ আবার জুটল কোত্থেকে?

দেখি হাতে লুঙ্গী তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলল, 'খানা তৈরী হতে দেরী নেই, যদি গোসল করে নেন।'

ইয়ারদোস্তের দুচারজন ততক্ষণে বাঁধে নেবেছেন। সবাই কাবুল-বাসিন্দা, সাঁতার জানেন না, জলে নাবলেই পাথরবাটি। মাত্র একজন চতুর্দিকে হাত-পা ছুঁড়ে বারিমন্থনে গোয়ালন্দী জাহাজকে হার মানিয়ে বিপুল কলরবে ওপারে পৌঁছে হাঁপাচ্ছেন। এপারে অফুরন্ত প্রশংসাধ্বনি, ওপারে বিরাট আত্ম-প্রসাদ। কাবুল নদী সেখানটায় চওড়ায় কুড়ি গজও হবে না।

কিন্তু সেদিন গুলবাগে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। কাবুলীরা কখনো ডুব সাঁতার দেখে নি।

ঐ একটিবারই এপার-ওপার সাঁতার কেটেছিলুম। ও রকম ঠাণ্ডা জল আমাদের দেশের শীতকালের রাতদুপুরে পানাঠাসা এঁদো-পুকুরেও হয় না। সেই দুমিনিট সাঁতার কাটার খেসারতি দিয়েছিলুম ঝাড়া এক ঘণ্টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁতে কত্তাল বাজিয়ে, সর্বাঙ্গে অশথ পাতার কাঁপন লাগিয়ে।

মীর আসলম অভয় দিয়ে বললেন, 'বরফ-গলা জলে নাইলে নিওমোনিয়ার ভয় নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মানস সরোবরে ডুব দিয়ে যখন মানুষ মরে না, তখন আর ভয় কিসের।' কিন্তু বুঝতে পারলুম বন্ধু বিনায়ক রাও মসোজী মানসে ডুব দেবার পর কেন তিন ঘণ্টা ধরে রোদ্দুরে ছুটোছুটি করেছিলেন মানস বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি, কাবুল সাত হাজারও হবে না।

কিন্তু সেদিন মীর আসলম আর সইফুল আলম ছাড়া সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে আমি মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় তখনো প্রাণের ভয়ে কাঁপছি। শেষটায় বিরক্ত হয়ে বললুম 'আবার না হয় ডুব-সাঁতার দেখাচ্ছি।'

সবাই হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি বলে ঠেকালেন। অপমৃত্যুর হাত থেকে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের জান বাঁচানো নাকি অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

তিন টুকরো পাথর, বাগান থেকেই কুড়োনো শুকনো ডাল-পাতা আর দুচারটে হাঁড়িবাসন নিয়ে উত্তম রান্না করার কায়দায় ভারতীয় আর কাবুলী রাঁধুনীতে কোন তফাৎ নেই। বিশেষ মীর আসলম ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা পণ্ডিত। অর্থাৎ গুরুগৃহে থাকার সময় ইনি রান্না করতে শিখেছিলেন। তাঁর তদারকিতে সেদিনের রান্না হয়েছিল যেন হাফিজের একখানা উৎকৃষ্ট গজল।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি সমস্ত

বাগান নাক ডাকাচ্ছে—একমাত্র হ্দকোটা ছাড়া। তা আমরা যতক্ষণ জেগেছিলুম, সে এক লহমার তরেও নাক ডাকানোতে কামাই দেয় নি। কিন্তু কাবুলী তামাক ভয়ঙ্কর তামাক—সাক্ষাৎ পেল্লাদ-মারা গুলী। প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের তলায়, পাহাড় থেকে ফেলে, পাষাণ চাপা দিয়ে মারা যায় নি, কিন্তু এ তামাকে তিনি দুটি দম দিলে আর দেখতে হত না। এ তামাক লোকে যত খায়, তার চেয়ে বেশী কাশে। ঠাণ্ডা দেশ বলে আফগানিস্থানের তামাক জাতে ভালো, কিন্তু সে তামাককে মোলায়েম করার জন্য চিটে-গুড়ের ব্যবহার তারা জানে না, আর মিষ্টি-গরম ধিকিধিকি আগুনের জন্য টিকে বানাবার কায়দা তারা এখনো আবিষ্কার করতে পারে নি।

পড়ন্ত রোদে দীর্ঘ-তরুর দীর্ঘতর ছায়া বাগান-জুড়ে ফালি ফালি দাগ কেটেছে। সবুজ কালোর ডোরাকাটা নাদুসনুদুস জেব্রার মত বাগানখানা নিশ্চিন্দি মনে ঘুমুচ্ছে। নরগিস ফুল-ফোটার তখনো অনেক দেরী, কিন্তু চারা-ক্ষেতে তাকিয়ে দেখি তারা যেন রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কল্পনা না সত্যি বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল যেন অল্প অল্প গন্ধ সেদিক থেকে ভেসে আসছে। রাত্তিরে যে খুশবাইয়ের মজলিস বসবে, তারি মোহড়ার সেতারে যেন অল্প অল্প পিড়িং পিড়িং মিঠা বোল ফুটে উঠছে। জলে-ছাওয়ায়, মিঠে হাওয়ায় সমস্ত বাগান সুধেশ্যামলিম, অথচ এই বাগানের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে হাজার ফুট উঁচু কালো ন্যাড়া পাথরের খাড়া পাহাড়। তাতে এক ফোঁটা জল নেই, এক মুঠো ঘাস নেই। বুকে একরত্তি দয়া-মায়ার চিহ্ন নেই—যেন উলঙ্গ সাধক মাথায় মেঘের জটা বেঁধে কোন এক মন্বন্তরব্যাপী কঠোর সাধনায় মগ্ন।

পদপ্রান্তে গুলবাগের সবুজপরী কেঁদে কেঁদে কাবুল নদী ভরে দিয়েছে।

ফকীরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাড়ি ফিরে কোন কাজে মন গেল না। বিছানায় শুয়ে আব্দুর রহমানকে বললুম, জানলা খুলে দিতে। দেখি পাহাড়ের চুড়ায় সপ্তর্ষি। "আঃ" বলে চোখ বন্ধ করলুম। সমস্তদিন দেখেছি অজানা ফুল, অজানা গাছ, আধাচেনা মানুষ, আর অচেনার চেয়েও পীড়াদায়ক অপ্রিয়-দর্শন শুষ্ক কঠিন পর্বত। হঠাৎ চেনা সপ্তর্ষি দেখে সমস্ত দেহ-মন জুড়ে দেশের চেনা ঘর-বাড়ির জন্য কি এক আকুল আগ্রহের আঁকুবাঁকু ছড়িয়ে পড়ল।

স্বপ্নে দেখলুম, মা এসার নামাজ পড়ে উত্তরের দাওয়ায় বসে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছেন।

(১৭)

কাবুলে দুই নম্বরের দ্রষ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশীর পুরোনোবাজার যাঁরা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সরু রাস্তা দুদিকে বুক-

উঁচু ছোট ছোট খোপ। পানের দোকানের দুই বা তিন ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাক্সের ঢাকনার মত এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটা দখল করেছে। কোন কোন দোকানে বাক্সেরই ডালার মত কব্জা লাগানো, রাত্রে তুলে দিয়ে দোকানের নীচের আধখানা বন্ধ করা যায়—অনেকটা ইংরিজিতে যাকে বলে পুটিঙ আপ দি শাটার।

বুকের নীচ থেকে রাস্তা অবধি কিম্বা তারো কিছু নীচে দোকানীর একতলা গুদাম-ঘর। অথবা মুচির দোকান। কাবুলের যে কোন বাজারে শতকরা ত্রিশটি দোকান মুচির। পেশাওয়ারের পাঠানরা যদি সস্তায় একদিন জুতোতে লোহা পোঁতায়, তবে কাবুলে তিন-দিন। বেশীরভাগের লোকেরই কাজ-কর্ম নেই—কোন একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে বসে দোকানির সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণে নীচের অথবা সামনের দোকানের একতলার মুচি পয়জারে গোটা কয়েক লোহা ঠুকে দেয়।

আপনি হয়ত ভাবছেন যে, দোকানে বসলে কিছু একটা কিনতে হয়। আদপেই না। জিনিসপত্র বেচার জন্য কাবুলি দোকানদার মোটেই ব্যস্ত নয়। কুইক টার্নওভার নামক পাগলা রেসের রেওয়াজ প্রাচ্যদেশীয় কোন দোকানে নেই। এমন কি কলকাতা থেকেও এই গদাইলস্করি চাল সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। চিৎপুরের শালওয়ালা, বড়বাজারের আতরওয়ালা এখনো এই আরামদায়ক ঐতিহ্যটি বজায় রেখেছে।

সুখ-দুঃখের নানা কথা হবে—কিন্তু পলিটিক্স ছাড়া। তাও হবে, তবে তার জন্য দোস্তী ভালো করে জমিয়ে নিতে হয়। কাবুলের বাজার ভয়ঙ্কর ধূর্ত—তিনদিন যেতে না যেতেই তামাম বাজার জেনে যাবে আপনি ব্রিটিশ লিগেশনে ঘন ঘন গতায়াত করেন কি না—ভারতবাসীর পক্ষে রাশিয়ান দূতাবাস অথবা আফগান ফরেন আপিসের গোয়েন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। যখন দোকানি জানতে পারবে যে, আপনি হাই-পলিটিক্স নিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় খেলাধুলো করেন না, তখন আপনাকে 'বাজার গপ্' বলতে তার আর বাধবে না। আর সে অপূর্ব গপ্—বলশেভিক তুর্কী-স্থানের স্ত্রী স্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে, পেশাওয়ারের জানকীবাইকে ছাড়িয়ে দিল্লীর বড়লাটের বিবিসায়েবের বিনে পয়সায় হীরা পান্না কেনা পর্যন্ত। সে সব গল্পের কতটা গাঁজা কতটা নীট ঠাহর হবে কিছুদিন পরে, যদি নাক-কান খোলা রাখেন। তখন বাদ দরকসর টাকায় বারো আনা, চোদ্দ আনা ঠিক ঠিক ধরতে পারবেন।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের পক্ষে এই বাজার গপ্ অতীব অপরিহার্য। মুগল ইতিহাসে পড়েছি, দিল্লীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র করে একদিকে সমস্ত ভারতবর্ষ এবং কি

ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তুর্কীস্থান ইরান পর্যন্ত ভারতীয় হৃৎপিণ্ডর তাঁবেতে ছিল গুণীদের মুখে শুনেছি বাঙলার রাজা জগৎশেঠের হুণ্ডি দেখলে বুখারার খান পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে কাঁচা টাকা ঢেলে দিতেন। কিন্তু এই বিরাট ব্যবসা চালু রাখার জন্য ভারতীয় বণিকদের আপন আপন ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত ছিল। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। হয়ত দিল্লীর শাহ-ইন-শাহ আহমদাবাদের সুবেদারের (গভর্নর) উপর বীতরাগ হয়ে তাকে ডিসমিসের ফরমান জারী করলেন—সে ফরমান আহমদাবাদ পৌঁছতে অন্তত দিন সাতেক লাগার কথা। ওদিকে সুবেদার হয়ত দুহাজার ঘোড়া কেনার জন্য আহমদাবাদী বেনেদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন—ফরমান পৌঁছলে সুবেদার পত্রপাঠ দিল্লী রওনা দেবেন। সে টাকাটা শোধ করতে বেনেদের তখন ভয়ঙ্কর বেগ পেতে হত—সুবেদার বাদশাহকে খুশী করে নূতন সুবা নিদেনপক্ষে নূতন জায়গীর না পেলে সে টাকাটা একেবারেই মারা যেত।

তাই যে সন্ধ্যায় বাদশা ফরমানে মোহর বসালেন, সেই সন্ধ্যায়ই বেনেদের দিল্লীর কোঠি থেকে আপন ডাকের ঘোড়সওয়ার ছুটত আহমদাবাদে। সেখানকার বিচক্ষণ বেনে বাদশাহী ফরমান পৌঁছবার পূর্বেই সুবেদারকে হিসেবে চ্যারা কেটে দিত—পাওনা টাকা যতটা পারত উশুল করত—নূতন ওভারড্রাফট কিছুতেই দিত না ও দরকার হলে দেনার দায় এড়াবার জন্য হঠাৎ পালিতনায় 'তীর্থভ্রমণে' চলে যেত। তিনদিন পর ফরমান পৌঁছলে পর সুবেদারের চোখ খুলত। তখন বুঝতে পারতেন বেনে হঠাৎ ধর্মানুরাগী হয়ে পালিতানার কোন তীর্থ করতে চলে গিয়েছিল।

আফগানিস্থানে এখনো সেই অবস্থা। বাদশা কাবুলে বসে কখন হিরাত অথবা বদখশান সুধার কোন কর্ণধারের কর্ণ কর্তন করলেন, তার খবর না জেনে বড় ব্যবসা করার উপায় নেই। তাই 'বাজার গপের' ধারা কখন কোনদিকে বয়ে চলে, তার দিকে কড়া নজর রাখতে হয়, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফিলটার যদি আপনার থাকে, তবে সেই ঘোলাটে 'গপ্' থেকে খাঁটি তত্ত্ব বের করে আর দশজনের চেয়ে বেশী মুনাফা করতে পারবেন।

আফগানিস্থানের ব্যাঙ্কিং এখনো বেশীর ভাগ ভারতীয় হিন্দুদের হাতে। ভারতীয় বলা হয়ত ভুল, কারণ এদের প্রায় সকলেই আফগানিস্থানের প্রজা। এদের জীবনধারণ প্রণালী, সামাজিক সংগঠন, পালাপরব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোন গবেষণা করেন নি।

আশ্চর্য বোধ হয়। বরা বোরোবোদুর নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়ে, একই ফোটোগ্রাফের বিশখানা হাজা ভোঁতা প্রিণ্ট দেখে দেখে সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়, কিন্তু এই জ্যান্ত ভারতীয় ঔপনিবেশ সম্বন্ধে 'বজ্রাহত ভাবুকের' পাণ্ডিত্যের

কোন অনুসন্ধিৎসা কোন আত্মীয়তাবোধ নেই। মৃত বোরবোদুর গোত্রভুক্ত, জীবন্ত ভারতীয় উপনিবেশ অপাংক্তেয়, ব্রাত্য। ভারতবর্ষের সধবারা তাজা মাছ না খেয়ে শুঁটকি মাছের কাঁটা দাঁতে লাগিয়ে একাদশীর দিনে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখেন।

কাবুলের বাজার পেশাওয়ারের চেয়ে অনেক গরীব, কিন্তু অনেক বেশী রঙীন। কম করে অন্তত পঁচিশটি জাতের লোক আপন আপন বেশভূষা চালচলন বজায় রেখে কাবুলের বাজারে বেচাকেনা করে। হাজারা, উজবেগ (বাঙলা উজবুক), কাফিরিস্থানী, কিজিলবাস (ভারতচন্দ্র কিজিলবাসের উল্লেখ আছে, আর টীকাকার তার অর্থ করেছেন 'একরকম পর্দা'!) মঙ্গল, এদের পাগড়ী, টুপী, পুস্তিনের জোব্বা, রাইডিং বুট দেখে কাবুলের দোকানদার এক মুহূর্তে এদের দেশ ব্যবসা, মুনাফার হার, কঞ্জুস না দরাজ হাত চট করে বলে দিতে পারে।

এই সব পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তারা নির্বিকার চিত্তে রাস্তা দিয়ে চলে। আমরা মারোয়াড়ী কিম্বা পাঞ্জাবীর সঙ্গে লেনদেন করার সময় কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, তারা বাঙালী নয়—দু'পয়সা লাভ করার পর তেমন কাউই অন্য পক্ষকে কেমত্তম বরে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, হোটেলে ডেকে চা খাওয়ার রেওয়াজ পর্যন্ত নেই। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংযোগ অঙ্গাঙ্গি-বিজড়িত।

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। খাস কাবুলের বাসিন্দারা চীৎকার করে, একে অন্যকে আল্লারসুলের ভয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশীরা খচ্চর গাধা ঘোড়ার পিঠে বসে ভাঙা ভাঙা ফার্সীতে দরকষাকষি করছে, বোখারার বড় কারবারী ধীরে গম্ভীরে দোকানে এমন একভাবে আসন নিচ্ছেন যে, মনে হয় বাকী দিনটা এখানেই বেচাকেনা, চা-তামাক-পান এবং আহারাদি করে রাত্রে সরাইয়ে ফিরবেন—পেছনে চাকর হুঁকো-কল্কি সঙ্গে নিয়ে আসছে। তারো পেছনে খচ্চরবোঝাই বিদেশী কার্পেট। আপনি উঠি উঠি করছিলেন, দোকানদার কিছুতেই ছাড়বে না। হয়ত মোটা দামের ব্যবসা হবে, খুদা মেহেরবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রসুলেরও আশীর্বাদ রয়েছে, আপনারো যখন ভয়ংকর তাড়া নেই, তখন চাওয়াতটা খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তায় অনেক আকেজো ছেলে-ছোকরা ঘোরাঘুরি করছে—তাদের একটাকে ডেকে বলবে, 'ও বাচ্চা, চাওলাকে বলতো আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে যেতে।'

তারপর সেই সব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ, কত চিত্র বিচিত্র নক্সা, কী মোলায়েম স্পর্শসুখ। কার্পেট-শাস্ত্র অগাধ-শাস্ত্র—তার কুল-কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অন্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রী হয়, তাদের আবার নিজের জাতের ভেতরে বহু গোত্র, বহু বর্ণ। জন্মভূমি, রঙ, নক্সা মিলিয়ে সরেস নিরেস মালের বাছ-বিচার হয়। বিশেষ রঙের নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট পশম দিয়ে তৈরী হয়—সে মালের সস্তা জিনিস হয় না। এককালে বেনারসী শাড়ীতে এই ঐতিহ্য ছিল—আড়িবেল শাড়ীর বিশেষ নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট রেশমেই হত—সে নক্সায় নিরেস মাল দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা ছিল না।

আজকের দিনের কাবুলের বাজারে কেনবার মত তিনটে ভালো জিনিস আছে—কার্পেট, পুস্তিন আর সিল্ক। ছোটখাটো জিনিসের ভেতর ধাতুর সামোভার আর জড়োয়া পাজোর। বাদ-বাকি বিলাতি আর জাপানি কলের তৈরী সস্তা মাল, ভারতবর্ষ হয়ে আফগানিস্থানে ঢুকেছে।

কাবুলের বাজার ক্রমেই গরীব হয়ে আসছে। তার প্রধান কারণ ইরান ও রুশের নবজাগরণ। আমুদরিয়ার ওপারের মালে বাঁধ দিয়ে রুশেরা তার স্রোত মস্কোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, ইরানীরা তাদের মাল সোজাসুজি ইংরেজ অথবা রুশকে বিক্রী করে। কাবুলের পয়সা কমে গিয়েছে বলে সে ভারতের মাল আর সে পরিমাণে কিনতে পারে না—আমাদের রেশম মলমল মসলিন শিল্পেরও কিছু মরমর, কাশ্মীর-ভাগ ইংরেজ সাত হাত মাটির নীচে কবর দিয়ে প্রাণধশান্তি করে চুকিয়ে দিয়েছে।

বাবুর বাদশা কাবুলের বাজার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু জাতের ভিড়ে কান পেতে যে সব ভাষা শুনেছিলেন, তার একটা ফিরিস্তিও তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন:

আরবী, ফারসী, তুর্কী, মোগলী, হিন্দী, আফগানী, পশাঈ, প্রাচী, গেবেরি, বেরেকি ও লাগমানি।

'প্রাচী' হল পূর্ব ভারতবর্ষের ভাষা, অযোধ্যা অঞ্চলের পুরবীয়া,—বাঙলা ভাষা তাঁর আওতায় পড়ে।

সে সব দিন গেছে, তামাম কাবুলে এখন যুক্তপ্রদেশের তিনজন লোকও আছে কিনা সন্দেহ।

তবু প্রাণ আছে, আনন্দ আছে। বাজারের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নমাজের পর সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য কাজকর্মে ইস্তিফা দিয়ে বেঁচে থাকার মূল চৈতন্যবোধকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে। মঙ্গোলরা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে, ভারী রাইডিং বুট পরে, বাবরী চুলে ঢেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সরাই চত্বরে নাচতে আরম্ভ করে। বুটের ধমক, তালে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুলের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত করে তীব্র কণ্ঠে আমুদরিয়ার পারের মঙ্গোল সঙ্গীত। থেকে থেকে নাচের তালের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নীচু করে দেয়, আর কানের দুপাশের বাবরী চুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু' দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে, আর দুহাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে মাথা পেছনের দিকে ঠেলে বাবরী চুল দিয়ে সবুজ জামা ঢেকে দে কখনো কোমরে দুভাঁজ করে নীচু হ বিলম্বিত তালে আস্তে আস্তে হাততা কখনো দুহাত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূ হাওয়ায় চর্কিবাজী। সমস্তক্ষণ চক্কর ঘু যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার এই সমস্ত হট্টগোল উপেক্ষা ক দেখবেন সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরা কানের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজন সঙ্গে হাফিজের গজল গাইছে। তার পাচি চোখ বন্ধ করে বুঁদ হয়ে সুর ইরানের গ বুলবুল আর নিঠুরা নিদয়া প্রিয়ার ছবি ম মনে এঁকে নিচ্ছে।

আরেক কোণে পীর-দরবেশ চা মজলিসের মাঝখানে দেশ-বিদেশের ভ্রম কাহিনী, মেশেদ-কারবালা, মক্কা-মদিন তীর্থের গল্প বলে যাচ্ছেন। কান পেতে সব শুনছে, বুড়োরা ভাবছে কবে তাদের উপ আল্লার করুণা হবে, মোল্লা কবে তাদ মদিনায় ডেকে নিয়ে যাবেন, প্রাণ তো ওষ্ঠাগ

জাবেঁ পর হৈ দম আব মুহম্মদ সমহালো,
মেরে মৌলা মুঝে মদিনা বোলো লো!
ঠোঁটের উপর দম এসে গেছে বাঁচাও মুহম্ম
হে প্রভু আমায় ডাকো মদিনায় ধরেছি
তোমার পদ।

পুস্তিন ব্যবসায়ীর কুঠুরীতে কবি মজলিস। অজাতশ্মশ্রু সুনীল পক্ষ্ম, কাজ চোখ, তরুণ কবি মোমবাতির সামনে হাঁ মুড়ে বসে তুলোট কাগজে লেখা কবিতা পা শুনচ্ছেন। তাঁর এক পদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তামাম মজলিস একসঙ্গে পদের পুনরাবৃ করছে—মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে মরহাব আফরীন, সাবাস বলে উচ্চ কণ্ঠে কবির তারি করছে।

চার সর্দারজীতে মিলে একটা পুরানো গ্রামোফোনে নেশার মত পালিস তিনখা রেকর্ড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজাচ্ছে।

হরদি বোতলাঁ
ভরদি বোতলাঁ
পাঞ্জাবী বোতলাঁ
লাল বোতলাঁ।

হায়, কাবুলে বোতল বারণ। কে জানত শ্রবণেও অর্ধপান। আর আসল মজলিস বসে কুহিস্থানের তাজিকদের আড্ডায়। হেড়ে-গলা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, দেয়াল-পাথর ফাটি কোরাস গান,

আয় ফতু, জানে মা—
ফতুজান,
ফতুজান,

বর তুশত্তম কুরবা—া—া—ন।

কুরবানের 'আ' দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব অবস্থা-ভেদে—সম মেলাবার জন্য। উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্টি নয়, তবু দরদ আছে,

ওগো ফতুজান
তু'হারি লাগিয়া দিল-জান দিয়া
হব আমি কুরবান!

উত্তরে ফতুজান যেন অবিশ্বাসের সুরে বলছেন,

—চেরা রফতী
হীচ নু গুফতী
দূর হিন্দুস্তান।

অর্থাৎ—

কেন গেলে
আমায় ফেলে
দূর হিন্দুস্থান?

সহস্রপাদ বৈষ্ণব পদাবলীতে যখন এ-প্রশ্নের উত্তর নেই, তখন তাজিক ছোকরার লোক-সংগীতে তার উত্তরের আশা করেন কোন্ অভিনব মম্মট? মথুরার সিংহাসন জয়, হিন্দুস্থানে রাইফেল ক্রয়, দুটোই বদখদ বেতালা উত্তর। হাজারো যুক্তি দিয়ে গীতা বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু মথুরা-জয়ের যুক্তির হাল যমুনায় পানি পাবে না বলেই তিনি সেটা ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধার দরবারে পেশ করেন নি।

বহুনীকের বল্লভও তাই নীরব।

(ক্রমশঃ)

# ভয়ের রাজত্বে

• • • • • শ্রী[illegible] বাগ •

ভয় যে কি তা' ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। ভয়ের সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত যে মুহূর্তকাল সে কথা ভাবলেই আমাদের দেহ মনের উপরে এর যে কত প্রভাব তা আর বুঝতে বাকি থাকে না। কোন একটা বিষয়কে জানার জন্যই সাধারণত তার আলোচনা করা হয়। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে এই প্রবন্ধের বিশেষ সার্থকতা থাকে না। তবে সাধারণভাবে জানার পরেও বিশেষভাবে জানার দরকার হয়। বিশেষভাবে জানার আগে সাধারণ জ্ঞান অবশ্যই দরকার। এবং ভয় সম্বন্ধে এই সাধারণ জ্ঞান আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু আছে বলেই বিজ্ঞানের দিক থেকে এ বিষয়ে আলোচনা করারও যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

শরীরের মধ্যে কিছু অসুখ হলে দেহের উপরে তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, দরকার বোধ করলে ছুটি ডাক্তার বদ্যির বাড়ী। ভয়ের চোটেও আমাদের নানা দৈহিক পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু তার জন্য আমরা তো কই সব সময় তত ব্যস্ত হই না। কারণ আমাদের ধারণা এতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। ভয়ের কোন কারণ নেই। কেমন যেন গোলমালে শোনাল। ভয়ের জন্যই এত কাণ্ড হচ্ছে, অথচ ভয়ের কোন কারণ নেই মনে করেই তার প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত হচ্ছি না। তাহলে যখন ডাক্তার বাড়ী ছুটি তখন ভয় করবার যথেষ্ট কারণ আছে মনে করেই ছুটি। সব কিছু বিবেচনা করে দেখলে যে বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন অবস্থায় কি মনে করি তাই। বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে আমাদের মন কিভাবে সাড়া দেয় সেইটাই হচ্ছে মুখ্য কারণ। মনের হদিস জানতে হলে যে বিজ্ঞানের প্রয়োজন তাই-ই হচ্ছে মনোবিজ্ঞান, [illegible] থেকে ভয়ের স্বরূপকে জানার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। অজানাকে জানলে অনেক সময় তার সম্বন্ধে ভয়ের কারণ ঘুচে যায়। ভয়কে জেনে আপনার ভয় কমবে কি না জানি না, তবে অজানাকে কিছু জানা যাবে বলেই বিশ্বাস।

"ও-দিকে ভয় আছে, বাবা! যেও না খোকা ধরে নেবে" ছোট দিদি তার ছোট্ট ভাইকে ভয় দেখালে, তা যদি মা'র কানে যায় তাহলে খুকির কপালে কিছু বকুনি খাওয়াটা আশ্চর্যের নয়। এর থেকে বোঝা যায় খোকাকে ভয় দেখানোটা যে অন্যায় সে সম্বন্ধে মায়েরা খুব সজাগ। কিন্তু এমনি মুস্কিল, যখন ঘর-সংসারের সৃষ্টির কাজ সব পড়ে রয়েছে, সে-গুলো না করলেই নয় অথচ খোকা না ঘুমুলে মা'র পক্ষে তা করা মোটেই সম্ভব নয়; কিন্তু এতো সোজা কথাটাও যখন খোকা না বুঝে তাড়াতাড়ি না ঘুমিয়ে কেবল দুষ্টুমি করার মতলবেই বালিশের উপরে মাথাটা এদিক ওদিক ওলোট-পালোট করতে থাকে তখন ঐ মাকেই বলতে শোনা যায়,—"ভয় তো রে বেড়াল," "ঐ হুলো আসছে, শিগ্গির ঘুমিয়ে পড় খোকা, এক্ষুণি হুলোটা ধরে নিয়ে যাবে" ইত্যাদি। বর্গীর ভয় যে শুধু ঠাকুরমারাই দেখাতেন তা নয়; আজকালকার শিক্ষিতা মায়েরাও কিছু কম যান না। তবে ঠাকুরমার ফোকলা মুখের নরম বর্গীর ছড়ার কাজটা আজকের মায়েরা তাঁদের কড়া বুলি দিয়ে মিটিয়ে নেন এই যা তফাৎ। দোষটা যে আসলে কার তার বিচার করতে গেলে শেষ পর্যন্ত হয়তো কোন বেচারী তৃতীয় ব্যক্তির ঘাড়েই যেয়ে পড়বে। সে-সব কথা থাক, তবে এর থেকে একটা কথা বেশ স্পষ্ট হল যে, ঐ ধরণের কথা যা শুনলে শিশু ভয় পায় সে-গুলো দিয়ে শিশুকে [illegible] মনকে আহত করে। এর কুফল সম্বন্ধে আমরা সচেতন থেকেও তাকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে পারি না।

আমার মনে হয় এড়িয়ে চলতে পারি না [illegible] ভুল। আসল কথাটা হচ্ছে এড়িয়ে চলার [illegible] চেষ্টা আমরা করি না। চেষ্টার অভাব থাক[illegible] কারণ আছে। শিশু মনে ভয়ের কুফল [illegible] ক্ষতিকর এবং ভবিষ্যৎ জীবনের উপরে[illegible] তার কত প্রভাব সে সম্বন্ধে আমাদের [illegible] উপলব্ধির অভাব। অবশ্য আমি এমন [illegible] বলছি না যে, আমরা সজাগ থাকলেই শিশু[illegible] মনে কোন ভয়ের সঞ্চার কখনো হবে না [illegible] একটু সাবধান থাকলেই যে অনেক ক্ষতি[illegible] থেকে শিশুকে রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে [illegible] সন্দেহ নেই।

শিশু নিজের দোলনায় শুয়ে শুয়ে [illegible] তার বীরত্ব দেখায় ততদিন তাকে নিয়ে [illegible] খুব বেশী সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু [illegible] দোলনা ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে স্থান পরিবর্তন[illegible] নেশায় তাকে পেয়েছে তখন থেকেই [illegible] আসল সমস্যা, যত বড় হতে থাকে ততই [illegible] বেড়ে চলে। শুরু হয়, "খোকা এটা [illegible] ওটা নিয়ো না।" ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা খোকা[illegible] একটা কিছু করতে আর মা তাকে আন্টি[illegible] বলেন 'না তুমি কোরো না।' এই না এবং [illegible] মধ্যে দিয়েই খোকার বড় হওয়া চলে [illegible] আমরা ভাবি এ 'হ্যাঁ' 'না'র ঝুঁকি কোন [illegible] ফল নেই। স্থায়ী ফল খুব আছে। শিশুর মন যতই সুকুমার হোক না কেন এই [illegible] 'হ্যাঁ'র মধ্যে থেকে তাকেও নিজ পথ বেছে [illegible] হয়। দুই বিপরীতধর্মী চাহিদার মধ্যে [illegible] মাঝামাঝি রফা করে নিয়ে শিশুর মন [illegible] চলে। এ কাজ দৈনন্দিন হরদম হয়ে চলে[illegible]। এই "হ্যাঁ—না"র বোঝাপড়া যে সব সময় [illegible] বাদে হয় তা নয়। শিশুর মন হাজার [illegible] হলেও তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। এই ইচ্ছা অনুযায়ী সে নিজের স্বাধীনতা সুযোগ [illegible] জাহির করার চেষ্টা করবে। সেটা [illegible] মনঃপূত না হলে তার গতিরোধ অনিবার্য। [illegible]

রয়েছে। তার দৃষ্টি এড়িয়ে চলা খুবই শক্ত। কিন্তু নবীন মনের তারল্য তা বোঝে না। সে ভাবে তার এই তরলতার সুযোগ নিয়েই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে প্রবীণকে পিছনে ফেলে। এই দুঃসাহসিকতার ফল প্রত্যহই আমরা দেখতে পাই। দিনের পর দিন কত নিগ্রহই না শিশুকে ভোগ করতে হয়। এই ভালমন্দ দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়েই শিশুর মন শক্ত সমর্থ হয়ে ওঠে।

প্রথমে শিশুর মন কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে। এই প্রবৃত্তিগুলির তাগিদ অনুযায়ী শিশু মনে বিভিন্ন ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই সাহজিক ইচ্ছার পূরণে শিশু-মন তৃপ্ত হয়, সে সন্তুষ্টি লাভ করে। ইতিমধ্যে ছোট বড় ভয় এসে এর গতিরোধ করে। ইচ্ছা পূরণে বাধা সৃষ্টি হয়। শিশুর গতিধর্মী মন এটা করে' আর মা মাসী, আত্মীয়স্বজনের নিষেধ তর্জনী তুলে বলছে না তুমি 'ওটা কোরো না,' 'ওরূপ করা উচিত নয়।' এই নিষেধের ভয়কে অতিক্রম করা খুব সহজ নয়, অথচ মনের ইচ্ছাকেও এক কথায় দমিয়ে দেওয়া যায় না। এই দুই বিপরীতধর্মী চাহিদার চাপে পড়ে শিশু মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভয়ের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হয়। কিন্তু তাই বলে ইচ্ছার শেষ এখানে হয় না, ভয়ের চোটে সে আত্মরক্ষার জন্য গা-ঢাকা দেয় মাত্র। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে আবার কখন তার তৃপ্তি সাধনের সময় আসে। ভয় থেকে এই যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি তার কুফল ছোটদের নানা আকারে বিভিন্ন রূপ ধরে নানাভাবে জীবনকে বিড়ম্বিত করে।

এ ধরণের সামান্য বাধা নিষেধ ছাড়া ভয় পাওয়ার আরো নানা কারণ আছে। সব তলিয়ে দেখতে গেলে মনে হয় বড়রা যেন শিশুদের বিরুদ্ধে সর্বদাই জেহাদ ঘোষণা করে চলেছে। মানসিকভাবে শারীরিক শাস্তির ভয় দেখানো ছাড়া সত্যিকারের দৈহিক পীড়ন হামেশাই দেখা যায়। সামান্য কানমলা থেকে শুরু করে বেত্রাঘাতের মর্মস্পর্শী দৃশ্য আজো সভ্য মানুষের সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কেবল বেত্রাঘাতের যন্ত্রণাই শারীরিক শাস্তির ভয়ের কারণ নয়। সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ভয়, পাছে সমাজের নিম্নস্তরের লোকের কাজ করতে হয় তার জন্য নয়, পাছে আমার সত্যিকারের অবস্থা কেউ জেনে ফেলে সে ভয়; এমন অনেক কিছু ভয় আমাদের চারিদিকে সব সময়েই ঘিরে রয়েছে। আমরা বড়রা অনেক সময়েই নিজেরা নানা ভয়ের কবলে পড়ে মাথা ঠিক না রাখতে পেরে ছোটদের উপর দৈহিক যন্ত্রণা যে দিই না তা নয়। ফলে চাপটার অনেক খানিই যেয়ে পড়ে ছোটদের মনের উপর। এমনি করে সংসারে সবচেয়ে আপন লোককেও শিশুরা ভয় না করে পারে না। শিশুর মন যদি এইভাবে সদাসর্বদা ভীত থাকে তাহলে তার ফল খুবই খারাপ হয়। শিশুর জীবনীশক্তি সর্বদা সঙ্কুচিত হতে থাকে; তার সহজ প্রকাশ সব সময় বাধা পেতে পেতে ভয়ের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। তখন সহজ-ভাবে শিশুর মানসিক বিকাশ না হয়ে তাকে অমানুষ করে তোলে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ভয়ের অনিশ্চয়তা যথেষ্ট থাকলেও তার হাত থেকে যেমন একেবারে নিস্তার পাওয়া যায় না, তেমনি শিশুকে একেবারে ভয়মুক্ত রাখাটাও তার মানসিক উন্নতি সাধনের পক্ষে অনুকূল নয়। ছেলে যাই করুক না কেন, কেউ তাকে কিছু বলার নেই, এ ধারণা থাকা ছেলের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর আবার কোন কিছু করতে গেলেই ভয়ে পিছিয়ে আসা তেমনিই ক্ষতিকর। দেহ ও মনকে সুস্থ সবল করে বাড়িয়ে তুলতে হলে চাই এই দুয়ের সমন্বয়। এ সমন্বয় যেখানে হয়েছে সেখানে ভয়ের মুখোশও গেছে খুলে। মুখোশ খুললে ভয় আর ভয় থাকে না। ভয়রূপে শত্রুতা করে যে গতির পথ বিকৃত করেছিল সেই-ই আলো রূপে সব বাধা সরিয়ে দিয়ে নবীন জীবনের এগিয়ে চলার সহজ গতিকে করবে ছন্দোমণ্ডিত।

এই ভয়ের বাধা মুক্ত করা, শত্রুকে মিত্র করা কঠিন কাজ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁদের হাতে এ ভার আছে চেষ্টা করাও তাঁদের দরকার। খুব সামান্য আকারের ভয়ের নমুনা গুলো আমাদের চোখ এড়িয়ে হামেশাই চলে যায়, কিন্তু প্রশ্রয় পেলে তারা হাতে হাতে স্বরূপ প্রকাশ করে যে বিপদের সৃষ্টি করে তার চাপ সামলাতে আমাদের প্রাণান্ত হতে হয়। অনেক সময় অহেতুক ভয় থেকে নানা দুর্ভোগও ভুগতে হয়। যেমন কোথাও কিছু নেই ঠাণ্ডা লেগে নাক দিয়ে জল ঝরতে লেগে গেল। কত লোক বসে আছে তার মধ্যে থেকে একজনকে হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা লেগে গেল কেমন করে। আর সব দিক দিয়েই সুস্থ সবল মানুষ অথচ একটু জোলো হাওয়া লাগতেই একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন! যিনি এই ভয়ে ভুগছেন তাঁর পক্ষ থেকে অনেক যুক্তি দেবার আছে, কিন্তু আর সকলেই জানেন, তাঁদের এই বন্ধুটির কেন এত চট্ করেই ঠাণ্ডা লাগে। একটু চেষ্টা করলেই স্মরণ হবে, কতবার তাঁরা তাঁদের এই বন্ধুটিকে খুঁতখুঁতে ধরণের লোক বলে অভিযোগ করেছেন। অতি খুঁতখুঁতে লোকদের ঠাণ্ডা লাগার ভয় থেকেই যে তাঁদের ঠাণ্ডা লাগে এবং সর্দি হয়, এ কথা বললে হয়তো তাঁরা চটতে পারেন; কিন্তু কারণটা অনেক ক্ষেত্রেই সত্যি। তেমনি অনেকের বাতিক আছে সর্দি হয়েছে এমন লোকের পাশে বসলেই তাঁর সর্দি করে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ বসে আছেন, কিন্তু যেমনি পাশের লোকটিকে হাঁচতে শুনেছেন অমনি তাঁর নাকের মধ্যে শুড়শুড়ি শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে সর্দি এসে হাজির। এ রকম লোক কম থাকতে পারে, কিন্ একেবারে বিরল নয়। তেমনি কেবলম বদহজমের ভয় থেকে কত লোকে যে অম্বলে অসুখে ভুগছে কে তার খবর রাখে।

ছোটদের লালনপালনের সময় আমাদে রোজকার জীবনের এই সব ছোটখ অভিজ্ঞতাগুলি যদি আমরা মনে রাখি এ যাতে তাদের মনে এই ধরণের কোন অহেতু ভয় বাসা না বাঁধতে পারে তার ব্যবস্থা করি তাহলে তাদের মনকে আমরা অনেক সবল ক তুলতে পারবো। ডাক্তারী মতামতের নজি দেখিয়ে অনেকে হয়তো বলবেন ভয় ছা আরো বৈজ্ঞানিক কারণ এখানে বর্তমা তাঁদের যুক্তিকে আমি অস্বীকার করছি ন সত্যই যদি সে রকম কিছু কারণ থাকে তাহ নিশ্চয়ই সেদিক থেকে সাবধান হতে হ কিন্তু তাই বলে ভিত্তিহীন সন্দেহ ক ছেলেদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়াটা মোে সাবধান হওয়ার বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নয়। আ বলি কি কোনখানে সন্দেহ হওয়ার কিছু কা থাকলেও শিশুকে সে বিষয়ে ভয় না দেখি অন্য উপায়ে তাকে দূরে সরিয়ে নেওয় ব্যবস্থা করা উচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় আমাদের নিজেদের মনের ভয়কে অজ্ঞাতে ন ভাবে আমরা ছেলেমেয়েদের মনে সংক্রা করে ফেলি। অনেক সময় আমরা এতো গো মেলে ভাবে নানা উপদেশ দিয়ে ছোটে সাবধান করতে শুরু করে দিই যে তাদের কা কোনটাই বেশ ভালভাবে বোধগম্য হয় না। ফ সবকিছু মিলিয়ে একটা ভয়ের ছাপ তা মনে থেকে যায়। কাজেই ছোটদের বে উপদেশ দেওয়ার বদলে সম্ভবমত যদি নিজে কাজে দেখিয়ে দিই, তাহলে এই বাড়তি ভ হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পেতে পা অতিথি এলে তাঁদের সঙ্গে কি ভাবে ব্যব করা উচিত সেটা, 'খোকা এটা কোরো 'অমনটি করতে নেই' ইত্যাদি কতকগু না তার মাথায় গুঁজে না দিয়ে কেমন আমরা ব্যবহার করি সেটা যদি দেখার সুযে তাদের করে দেওয়া যায়, তাহলে বহুগুণে ব হতে পারে। আরো একটা কথা, অতি সামনে কিছু একটা অশোভনীয় কাজ ক ফেললে তাকে সকলের সামনে ভর্ৎসনা না ক উচিত। দুঃখের বিষয় অনেক সংসারে শিক্ষিতা মায়েরা বাড়িতে কোন অতিথি এ তাঁদের সামনে ছেলেমেয়েদের সহবত শেখা মহড়া দেওয়াটা খুব একটা গর্বের বিষয় 'এরিস্টোক্রাসি'র পরিচয় বলে মনে কর শিশু-মনের পক্ষে এরূপভাবে অপরিচিত অল্প পরিচিত লোকের সামনে মা'র ম অভিযুক্ত হওয়া খুবই ক্ষতিকর। এ আরো বিস্তৃত ভাবে পরে আলোচিত হবে

অল্প একটুতেই ভয় পাওয়া যেমন নয়, তেমনি জোর করে ভয়কে সব সময় দা

ও ক্ষতিকর। এই ক্ষতির পরিমাণ হাতে হাতে সোজাসুজি পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এর ক্রিয়া গোপনে কাজ করে, পরিণাম অনেক সময় বিষময় করে তোলে। বাড়ির কাউকে যদি ছেলে বিশেষভাবে ভয় করে তাহলে অনেক সময় মা'র মুখে ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায়। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ছেলের দৌরাত্মির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াতে মনটা যে তাঁর খুশি থাকে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! মা, বাবা উভয়কেই যদি ছেলে ভয় করে চলে তাহলে পাড়ায় বা বাড়ির অন্যদের কাছে শান্ত ছেলে বলে সুনাম হয়। সব সময় মাথা নীচু করে নাড়ু গোপালটি হয়ে থাকলেও নম্র, বিনীত, লক্ষ্মী ছেলে বলে মা-মাসী, পাড়া-পড়শীদের কাছে সুখ্যাতির অন্ত থাকে না। এ দ্বারা ছেলেও ভয় করা সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করে। পরে এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এতে তার ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক স্ফুরণে বাধা পায়। ফলে হয় কি, বয়সে বেড়ে উঠলেও ছেলের নাবালকত্ব ঘুচতে অনেক দেরী লাগে। শুধু তাই নয়, পরবর্তী জীবনে এর প্রতিক্রিয়ার ফলে সামাজিক জীবন নানাভাবে বিড়ম্বিত হতে থাকে। জবরদস্ত মায়ের হাতে মেয়ে মানুষ হলে সে মেয়ে শাশুড়ির অবাধ্য হয়ে যা নিজের মেয়ের প্রতি কড়া শাসনের ব্যবস্থা করে তার ক্ষতি-পূরণ করে নেয়, এ কথা সর্বজনবিদিত। তেমনি কড়া শাশুড়ির শাসন মুখ বুজে যে বৌকে সহ্য করতে হয় তার যদি ভবিষ্যতে 'বৌ-কাটকী' শাশুড়ি বলে দুর্নাম রটে তাহলে দোষটা যে আসলে কার ঘাড়ে পড়া উচিত তা ভাববার কথা।

বড়দের মনে ভয়ের প্রতিক্রিয়া সহজেই খুব ক্ষতিকর হয় না। হলেও তার প্রতিকার অপেক্ষাকৃত সহজেই হতে পারে। কিন্তু ছোটদের বেলায় ঠিক তার উল্টো। অতি সহজেই তাদের মনে ভয়ের পাঁচ আঙুলের দাগ কেটে বসতে পারে, আর একবার সে দাগ বসলে তাকে ওঠানো খুবই শক্ত। ভয়ের আর একটা বিপদ হচ্ছে এ খুব গোপনে কাজ করে এবং এর ক্রিয়া খুব শ্লথগতিতে এগিয়ে যেতে যেতে শিশুর-মনকে ঝাঁঝরা করে ফেলে। এমন কি যখন এর কুফল দেহে-মনে পুরো-মাত্রায় কাজ করতে থাকে, তখন পর্যন্ত তার কারণ ধরা সহজ হয় না। ছোট ভাইটিকে বকাঝকা করলে মা-বাবা থেকে শুরু করে পাড়া-পড়শী বন্ধু-বান্ধবরা পর্যন্ত দুষ্টু মেয়ে বলে দুর্নাম দেয়; তেমনি আবার যদি ছোট ভাইটির নানা অন্যায় আবদার সহ্য করে সারাক্ষণ চলা যায়, তাহলে লক্ষ্মীমেয়ে বলে খুকির সুনাম পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মেয়ে হাজার ছোট হলেও এই প্রশংসা শুনলে খুশিতে তার মনটা ভরে ওঠা স্বাভাবিক। কাজেই সেই সুনাম রক্ষার জন্য খুকু তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, যাতে সে তার ভায়ের প্রতি রাগ তাপ না প্রকাশ করে শান্তভাবে তাকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে। ফলে যদিও খুকুর বড় সাধের সুন্দর খোকা পুতুলটির একটি পা ছোট্ট ভাইটি ভেঙে দিয়ে তাকে খোঁড়া করে দেয়, তথাপি দুর্নাম রটার ভয়ে বা শাস্তির ভয়ে সে মুখ বুজে তা সহ্য করে। এই যে ছোট ছোট ভাইয়ের অত্যাচার সহ্য করা এটা খুকুর মনের পক্ষে একটা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ছোট ভাইয়ের প্রতি নানা কারণে হিংসে হবে, তার সঙ্গে মতের অমিল হবে, তাতে সময়ে সময়ে তাদের মধ্যে কলহ মারা-মারিও এক-আধটু হবে, এই-ই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। নিজের সুনাম নষ্ট হওয়ার ভয়ে বা শাস্তির ভয়ে সব সময় ভাইটির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য খুকুকে সর্বদাই স্বাভাবিক নিয়মে প্রক্ষোভ প্রভৃতি যেসব মানসিক বৃত্তিগুলির উদয় হয়, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলতে হচ্ছে। এই নিরন্তর দোটানার মধ্যে পড়ে সব সময় একটা মানসিক দ্বন্দ্ব দিনে দিনে তার শক্তি সঞ্চয় করে খুকুর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে প্রতি মুহূর্তে প্রতিহত করছে। তার মনকে দুর্বল করে ফেলছে। এর ফলে, এমন একদিন আসে যখন মনের আদিম চাহিদাকে খুকু তার সজ্ঞান শক্তি দিয়ে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তার নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা পূরণের শক্তির কাছে তাকে হার মানতে হয়। তখন কোনও একটি সাধারণ ঘটনাকে আশ্রয় করে বহুদিনের সঞ্চিত প্রক্ষোভ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। তার গতিরোধ করা আর খুকুর সামর্থ্যে কুলোয় না। এই প্রক্ষোভ পুনঃ পুনঃ নানা ছলে প্রকাশ পেতে থাকে। খুকুর পূর্ব সুনাম হয়তো বা বজায় থাকে, কিন্তু সে আর সে-খুকু থাকে না। মর্মে সে মরে যায়। ধীরে ধীরে সে মা-বাবার পক্ষে একটা বড় সমস্যা হয়ে ওঠে।

আমাদের সারা মনকে জুড়ে ভয় রাজত্ব করছে। ছোট-বড় কেউই এর রাজ্যের এলাকার বাইরে পড়ে না। স্থান পাত্র হিসাবে এর বহিঃপ্রকাশের বিভিন্ন রূপ আছে। তার মধ্যে শিশুমনের উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিশু-শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা। সেই বিকাশ সাধনের উপরে ভয়ের যে কতখানি হাত রয়েছে তারই একটা দিক এখানে দেখাবার চেষ্টা করেছি। শিক্ষার দিক থেকে শিশুকে মানুষ করে তোলার দিক থেকে ভয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করার আরো অনেক দিক আছে। ইচ্ছা রইল বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা করবার।

## নমস্কার

### নির্মাল্য বসু

জীবন-বেদের নব অধ্যায় শুরু।
অরুণ দিশারী জেগেছে পূর্বাশার;
নব-জীবনের বহ্নি পূজার গুরু,
প্রাণ তীর্থের পথিক নমস্কার।

শুনেছি তোমার দৃপ্ত সে আহ্বান—
: রক্তে রক্তে নেচে নেচে ওঠে ঝড়;—
জীবনের স্রোতে ভরা জোয়ারের টান;
মর্মে তোমার আগুনের স্বাক্ষর :

ঘর ছাড়াদের মন্ত্র দিয়েছো কানে
সব হারাবার—সব হারাবার বাণী :

তুলিয়া ধরেছো ক্লান্ত আঁখির ধ্যানে
উদয়াচলের ঝলমল ছবিখানি।

জয়-যাত্রার হে তুমি অগ্রদূত!
যত দূরে চলি তত দূরে যায় দেখা—
তোমার আঁখির অপলক বিদ্যুৎ—
কাঁটার আঘাতে রক্তিম পদ রেখা।

সিংহ দুয়ারে গিয়েছো আঘাত হানি
'অমৃতলোকের দ্বার খোলো—
দ্বার খোলো'
ব্যর্থ হয়নি তোমার পরম বাণী—
সময় যে হলো, এবারে সময় হলো।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি সংকটের অবসান—এখন হইয়াছে। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় আবার প্রধান মন্ত্রী হইয়া মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত করিয়াছেন। পূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলের মন্ত্রীদিগের মধ্যে ২ জনকে বর্জন করিয়া আর সকলকেই মন্ত্রী রাখা হইয়াছে। সেই ২ জন—শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ও শ্রীমোহিনীমোহন বর্মণ।

মন্ত্রিমণ্ডল পুনর্গঠনের ফলে মন্ত্রীদিগের মধ্যে যে ৪ জন এখনও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নহেন, তাঁহারা নির্বাচিত হইবার জন্য ৬ মাস সময় পাইতে পারিবেন। যেরূপ ঘন ঘন মন্ত্রিমণ্ডল পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে ৬ মাস দীর্ঘকাল—৬ মাস পরে কি হইবে, সে—"হনোজ দিল্লী দূরস্ত"।

আর এই পরিবর্তনফলে কতকগুলি বিভাগের পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হইতে পারে। তাহাতে অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা।

যিনি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের প্রধান "হুইপ" ছিলেন, সেই শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ পদত্যাগ করিয়াছেন। বিধানবাবু যে তাঁহাকে পুনরায় মনোনীত করিবেন, এমন মনে হয় না। লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চার্চিল বিলাতে লর্ড স্যালিসবেরীর মন্ত্রিমণ্ডল হইতে পদত্যাগ করার পর যখন উত্তেজিত হইলে, বন্ধু চার্চিলকে পুনরায় মন্ত্রী করিবার অনুরোধ করেন, তখন লর্ড স্যালিসবেরী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনাদিগের কাহারও গ্রীবায় কি কার্বাঙ্কল হইয়াছে?" তাঁহারা "না" বলিলে তিনি বলেন—"আমার তাহা হইয়াছিল; আমি আর তাহা চাহি না।"

"[illegible] I have and I don't want [illegible]"

তবে বিধানবাবু যে নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিতে পারিবেন, এমনও মনে হয় না; কারণ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থায় [illegible] ও স্বার্থ যেন স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে একান্ত পরিতাপের বিষয়, তাহা বলা বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে বিধানবাবুকে আমরা একটি বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের যে সকল মন্ত্রী স্ব স্ব বিভাগে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই—বিশেষ যে সকল মন্ত্রীর অধীন বিভাগ সম্বন্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের বিষয়ে তাঁহার অবহিত হওয়া কর্তব্য।

আমরা সর্বাগ্রে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ বিভাগের কার্য [illegible] কাপড় পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে [illegible] ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গে কাপড় দিবার [illegible] বন্ধ করিয়াছেন। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের সম্বন্ধে কেন্দ্রী সরকারের তিরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে সম্মানজনক নহে। শুনা গিয়াছে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে কাপড় আসিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক ২৪ পরগণায় বিলি করা হইয়াছে। সীমান্ত জিলায় এত অধিক কাপড় কেন দেওয়া হইয়াছে, সে বিষয়ে কি আবশ্যক অনুসন্ধান করা বিধানবাবু প্রয়োজন ও কর্তব্য মনে করেন না? কেন্দ্রী সরকার সূতা নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করিবার পরেও পশ্চিমবঙ্গে তাহা রক্ষার কারণ কি তাহা কি লোক জানিতে পারে না? সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরেও যে আবশ্যক ব্যবস্থার অভাবে পশ্চিমবঙ্গ হইতে পাকিস্থানে লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ কি? নিশ্চয়ই তাহা সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। যদি তাহাই হয়, তবে কি সেই বিভাগের কার্যভার প্রদানব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করাই সংগত নহে?

কলিকাতায় যে চোরাকারবার চলিতেছে, তাহা কেহই অনবগত নহেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত চোরাকারবারের জন্য কত লোককে মামলা সোপর্দ করা হইয়াছে, তাহা কি মন্ত্রিমণ্ডল প্রকাশ করিবেন?

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত প্রদেশ। ইহার সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করা প্রয়োজন। কলিকাতা হইতে যে "লাইট" রেলপথ টাকী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহা যে প্রয়োজনে সামরিক কার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকাশ, ঐ অঞ্চলের পথগুলির উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু গত ৮ মাসেও যে ঐ রেলপথের উন্নতি সাধন করিয়া যাহাতে ঐ পথ অল্প সময়ে অতিবাহিত করা যায় সে ব্যবস্থা করা হয় নাই, ইহা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের বিষয়। সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ মনোযোগসাপেক্ষ তাহা ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের পরে জার্মাণী দেখাইয়াছিল। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের অন্ততঃ ২ জন মন্ত্রী ঐ অঞ্চলের বিষয় অবগত আছেন; ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষদিগের বাসগ্রাম এখন পাকিস্থানে—শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর বাসগ্রাম পশ্চিমবঙ্গে। অদূরে পাকিস্থানে প্রবেশের প্রধান জলপথ। এই রেলপথের উন্নতি সাধনে আর বিলম্ব করা সংগত হইবে না।

বিধানবাবু স্বীকার করিয়াছেন, বেআইনীভাবে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বস্ত্র চালান দেওয়া, বোধ হয়, কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির কারণ। সেই বে-আইনী কাজ বন্ধ করিবার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে কি?

জানা গিয়াছে, বিধানবাবুর চেষ্টায় ইন্দোনেশিয়া পশ্চিমবঙ্গকে চাউল দিতে সম্মত হইয়াছে। বাঙ্গলায় যখন দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় হইতেছিল, সেই সময়, সে সংবাদে ব্যথিত হইয়া, সুভাষচন্দ্র তাঁহার অস্থায়ী সরকারের পক্ষ হইতে চাউল দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার সে চাউল গ্রহণ করা অপেক্ষা বহুলোকের মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, এবার ভারত সরকার সেরূপ ব্যবহার করিবেন না এবং যে চাউল পাওয়া যাইবে ও তাহা যাহাতে পাকিস্থানে যাইতে না পারে, সে ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা বা পরমুখাপেক্ষিতার কখন স্থায়ী অভাব দূর হয় না। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই ব্যাপারে ইতঃপূর্বে বহু অর্থ চোরাবালুতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আর যেন তাহা না হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে যে এদিকে নানা উন্নতি সহজে সাধিত হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিল সেই ব্যবস্থা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধ্যয়ন করিয়া তাহার আবশ্যক পরিবর্তনাদি তাহা পশ্চিমবঙ্গে প্রযুক্ত করিতে পারেন না?

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যদ্রব্যোৎপাদন সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বপ্রধান প্রয়োজন—সেচের। বাঙ্গলায় সেচ-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা স্যার উইলিয়ম উইলকক্স বলিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে সেচ সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা হইতেছে। সেচ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল সম্বন্ধে ভোট দিবেন না বলিয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন—ভোটের পরে পুনর্গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলে তাঁহার স্থান পুনরায় পাইয়াছেন। সেচের জন্য যেমন খালের প্রয়োজন, তেমনই পুষ্করিণীর ও বাঁধেরও প্রয়োজন। খালের কাজ সময় সাপেক্ষ—পুষ্করিণীর ও বাঁধের সংস্কার অল্পকালে হয়। দুঃখের বিষয় পুষ্করিণীর ও বাঁধের সংস্কারকার্যে আশানুরূপ মনোযোগ প্রদত্ত হয় নাই। সেইজন্য সংস্কারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—এ বৎসর আর তাহা হইবে না। কৃষি বিভাগের এই ত্রুটিতে লোক কষ্টভোগ করিবে। মৎস্য বিভাগও বর্ষাকালে কাজ আরম্ভ না করিয়া এক বৎসর সময় নষ্ট করিয়াছেন। গত বৎসর কৃষি বিভাগের ত্রুটিতে এবার গোল আলুর ফসল ভাল হয় নাই।

এবার যে সরকার ঐ সকল ত্রুটি হইতে অব্যাহতিলাভের ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে কি?

হরিণঘাটায় যে বিরাট ব্যয় হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কি অপব্যয়ে পর্যবসিত হইবে? যে সকল বিশেষজ্ঞ এ পর্যন্ত বিশেষ অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বর্জন করিয়া কাজ করা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অসম্ভব বলিয়া মনে করেন? যাঁহারা সত্য সত্যই বিশেষজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার সুযোগ কি সাদরে সন্ধান করা ও গ্রহণ করা হইবে না? যোগ্যতা ও জ্ঞান দপ্তরখানার চতুঃসীমার মধ্যেই নিবদ্ধ এই ধারণার হস্ত হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতদিনে অব্যাহতিলাভ করিয়া অন্যান্য দেশের মত কাজ করিতে আরম্ভ করিবেন?

**শিল্প** বিভাগে আমরা সর্বাগ্রে হাতের তাঁত শিল্পের উল্লেখ করিব। সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের অব্যবস্থায় এই শিল্প নষ্ট হইতে বসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিধানবাবু যদি সামান্য চেষ্টা করেন, তবে জানিতে পারিবেন, কলিকাতায় বহু চতুর লোক একশত তাঁত খাটাইয়া রাখিয়া একশত তাঁতের জন্য আবশ্যক সূতা—কৌশলে—পায় এবং সেই সূতার অধিকাংশ চোরাবাজারে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। যাঁহারা সূতার ছাড় দেন তাঁহারা কি আবশ্যক সংবাদ রাখাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। একদিকে এই—আর একদিকে যাহাদিগের সূতা পাওয়া সঙ্গত, তাহারা সূতা পাইতেছেন না। কাজেই বলিতে হয়—এ

"কেমন মাধুরী
দিচ্ছ কারও গলায় মোতির মালা
কারও গলায় ছুরি।"

প্রধান মন্ত্রী কি এই বিষয়ে আবশ্যক সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন?

চোরাকারবার সম্বন্ধে অপরাধীকে ধরা দুষ্কর নহে। কোন কোন কাগজ ব্যবসায়ী কাগজের যে দামের জন্য রসিদ দেন তাহা "চেকে" লইলেও আর কিছু নগদ লইয়া থাকেন। এ কথা বাজারে বিদিত। যে সকল প্রতিষ্ঠান কাগজ, পুস্তক বা সংবাদপত্র ছাপিবার জন্য কিনিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের হিসাব পরীক্ষা করিলেই ইহা অনায়াসে ধরিতে পারা যায়। কিন্তু সরকার কি ধরিবার আগ্রহ অনুভব করেন? কতকগুলি চোরাকারবারীর কঠোর দণ্ড না হইলে এই পাপ দূর করা কখনই সম্ভব হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক আমানতকারীদিগকে চাহিলে টাকা দিতে না পারায় প্রদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটিয়াছে। আমানতকারী চাহিয়া টাকা না পাইলে তাঁহার যে অনেক অসুবিধা ঘটে, তাহাও যেমন সত্য, অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত টান ধরিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকা দেওয়া যে প্রায় অসম্ভব, তাহাও তেমনই সত্য। ভারতবর্ষ ও বাঙলা বিভাগের ফলে অনেক ব্যাঙ্কের ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া হিসাব পরীক্ষা করিয়া একটি ব্যাঙ্ককে "সিডিউলভুক্ত" রাখিতে অস্বীকার করায় ব্যাঙ্কটি আপাততঃ কার্যতঃ কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবশ্যক সতর্কতার ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা এবং আবশ্যক বিচার করিয়াছেন কিনা, তাহার আলোচনা করিয়া ফল নাই। বিশেষ ব্যাঙ্কের ব্যাপার এখন আদালতে বিবেচিত হইতেছে।

অপ্রত্যাশিত অবস্থায় যে সকল ব্যাঙ্ক বিপন্ন হইয়াছে, সে সকল সহানুভূতি লাভের উপযুক্ত।

বঙ্গভাষাভাষী যে সকল জেলা বিহারে রহিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে এখনও সেগুলি দাবী করিতেছেন না, ইহাতে লোক বিস্ময়ানুভব করিতেছে। খর্সোয়ান ও সেরাইকেল্লা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যদ্বয় বিহারে যাইবে কি উড়িষ্যায় যাইবে, তাহা এখন ভারত সরকারের বিবেচনাধীন। উভয় প্রদেশই ঐ ২টি রাজ্য দাবী করিয়াছেন। কিন্তু সেরাইকেল্লার অধিবাসিগণের মধ্যে বঙ্গভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবী করেন নাই। ইহার কারণ কি?

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াও বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী প্রচারে শৈথিল্যের জন্য হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনকে তিরস্কার করিয়াছেন। তাঁহার কথায় দাঁড়াইয়াছে—

'যারে মনিবে করে হেলা,
তারে চাকরে মারে ঢেলা।"

বিহারী সরকারী কর্মচারীরা স্থানে স্থানে হিন্দী প্রচারের নামে বাঙালীদিগের উপর অত্যাচার করিতেছেন, এমন সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। বিহার সরকার যে বঙ্গভাষা প্রচারকারীদিগের উপর পুলিসকে দৃষ্টি রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাও জানা গিয়াছে। সেই নির্দেশ যে মনোভাবের পরিচায়ক, তাহাই যদি কর্মচারীদিগের ব্যবহারে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বিহার আজ যে অনায়াসে এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি বিস্মৃত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে—রাজেন্দ্রবাবু যখন ২৮ বৎসরের যুবক তখন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ করায় বৃটেনের রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া কংগ্রেস প্রার্থনা করেন—প্রাদেশিক সীমা পুনরায় নির্ধারণকালে যেন বঙ্গভাষাভাষী জেলাগুলিকে একই শাসনাধীন করা হয়—

"That in readjusting the provincial boundaries, the Government will be pleased to place all the Bengali-speaking districts under one and the same administration."

এই প্রস্তাব ডক্টর তেজবাহাদুর সপ্রু উপস্থাপিত করেন। তিনি এ বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করার প্রয়োজন নাই, মনে করিয়াছিলেন। বাবু পরমেশ্বরলাল প্রস্তাব সমর্থন এবং বাঙলার ৩ জন প্রতিনিধি—আনন্দচন্দ্র রায় (ঢাকা), অনাথবন্ধু গুহ (মৈমনসিংহ) ও আশুতোষ চৌধুরী প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

আজ কংগ্রেসের পক্ষে সেই নীতি বর্জন করা অসঙ্গত। কিন্তু প্রস্তাবে বাঙলা সম্বন্ধে যে নীতি গৃহীত হইয়াছিল, পরে সমগ্র ভারতবর্ষের (তখনও কংগ্রেস পাকিস্তান সৃষ্টি সমর্থন স্বপ্নেরও অগোচর মনে করিতেন) সম্বন্ধে সেই নীতি গৃহীত হয়—কংগ্রেস ভাষা ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতি গ্রহণ করেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র প্রদেশে পরিণত হইয়া তাহার আর্থিক, সামরিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে কংগ্রেসকে সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে ভুক্ত করিতে বলিতেছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এ সব জেলা পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকার অর্থাৎ মন্ত্রিমণ্ডল সে কাজ করেন নাই। একজন মাত্র মন্ত্রী সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া একটি অনতিদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা মন্ত্রিমণ্ডলের মত বলা যায় না। সেইজন্য লোক আশা করিতেছে জনমতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট এই দাবী উপস্থাপিত করিবেন।

যাঁহারা বলেন, বর্তমান সময়ে ভারত সরকার কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের সমস্যা ... বিরুদ্ধ—পাকিস্তানের সহিত ভারতের ... সমস্যার সমাধান করিতে হইতেছে— ... অবস্থা হইয়াছে—এ সময় পশ্চিমবঙ্গের ... উপস্থাপিত করার পক্ষে অসময়, ... ঠিক যুক্তিসহ বলা যায় না। এই সব সামন্ত রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা ... কংগ্রেসের মত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ... হয়, তবে বিহারের সহিত পশ্চিমবঙ্গের আলোচনার ফলে অতি সহজেই পশ্চিমবঙ্গের দাবীর মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। ... বিহারের পক্ষে অসঙ্গত মনোভাব ... প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে বহু বিহারী জীবিকা ... করিয়া থাকে। বিহারের জনসাধারণ বাঙালীর প্রতি বিদ্বিষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ কলিকাতায় ও পূর্ববঙ্গে হিন্দু... মুসলমানের অত্যাচারে তাহারা প্রতি... হইয়াছিল। কিন্তু বিহারের শিক্ষিত ... বিশেষ বিহারী সরকার যদি বিহারে বাঙালীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, ... বঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়ায় অবাঞ্ছিত ...

উদ্ভব হইতে পারে। উড়িষ্যার পুরীতে বাঙালীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারে কলিকাতায় যে সেইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল, তাহা অল্প-দিনের ঘটনা। বিহারে বাঙালীদিগের প্রতি ব্যবহারে পশ্চিমবঙ্গে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছে, তাহা কেবল উভয় প্রদেশের পক্ষেই অনিষ্টকর নহে, পরন্তু তাহাতে পাকিস্তানের দিক হইতে বিপদের সম্ভাবনা যেমন ঘনীভূত হইতে পারে, তেমনই কংগ্রেসের সম্ভ্রমহানি ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বলক্ষয়ও হইতে পারে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের দাবী কেন্দ্রী সরকারকে জানাইয়া তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্য, তেমনই এই বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে মীমাংসা করাও ভারত সরকারের কর্তব্য।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যদি বুঝিয়া থাকেন, কংগ্রেসের সভাপতি থাকিয়া তাঁহার পক্ষে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনকে বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী-দিগকে হিন্দীভাষাভাষী করিতে বলা শোভন হয় নাই, তবে কি তিনি তাহা স্বীকার করিবেন?

এই বিষয়ে যে আন্দোলন বাড়িয়াছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার উভয় প্রদেশেই যে শান্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, তাহাও [illegible]।

পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর শ্রীরাজাগোপালাচারী [illegible] মন্দিরস্থিত দেবতার [illegible] করিয়াছেন। দেবতা স্বয়ং কোন [illegible] না বটে, কিন্তু দেবতার বিষয়ে যদি [illegible] হইতে [illegible] হয়, তবে মন্দিরের [illegible] আর পূর্বের [illegible] কাজ [illegible]। তিনি [illegible] বলিয়াছেন [illegible] বাঙলা বিভাগে যেমন ক্ষতি করিয়াছে, তেমনই [illegible] করিয়াছে। কারণ, বাঙলা যদি বিভক্ত না হইত, তবে বাঙলায় মুসলমান-প্রধান সরকারই থাকিত। কিন্তু তিনি একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন—বিহারের যে বঙ্গ-ভাষাভাষী জেলাগুলি বাঙলার অংশ সেগুলি বাঙলার সহিত সংযুক্ত হইলে আর বাঙলা মুসলমানপ্রধান থাকিত না। অনেকেই জানেন, যখন শহীদ সুরাবর্দী বৃহত্তর বাঙলার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, বৃহত্তর বাঙলা মুসলমান প্রাধান্য [illegible] না এবং সেই উক্তিতেই সুরাবর্দী নিরস্ত হইয়াছিলেন।

মুসলমানপ্রধান শাসন যে অনভিপ্রেত, তাহা কি রাজাগোপালাচারীর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" ও পরে [illegible] ব্যাপারের অভিজ্ঞতার ফল? কারণ ইতঃপূর্বে তিনিই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সমর্থনের জন্য পাঞ্জাব ও বাঙলা মুসলমান কবলিত করিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের জন্য স্বায়ত্তশাসন

পাইয়াছিলেন। অবশ্য লোক যে ক্রমশঃ বিজ্ঞতর হয়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাপদ্ধতির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন পরিবর্জন জন্য তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছেন। সহস্রাধিক লোক এই কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনে দীর্ঘ দেড়শত বৎসরেও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয় নাই—জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টাও হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জাপানের আদর্শ স্মরণ করিতে অনুরোধ করি—কোন গ্রামে যেন একটিও অশিক্ষিত পরিবার বা কোন পরিবারে একজনও অশিক্ষিত লোক না থাকেন। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে জাপানের অধিক কাল লাগে নাই। কারণ, রাজশক্তি জাপানে জাতীয় সরকারের ছিল। আজ যখন এদেশে সরকারের শক্তি দেশবাসীর হস্তগত হইয়াছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই আদর্শানুসারে কাজ করিতে বিলম্ব করিবার কোন কারণ নাই। যত শীঘ্র সেই আদর্শ কার্যে পরিণত হয় ততই ভাল। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে জাতীয় রূপ দিতে হইবে।

করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদে কংগ্রেসী দলের সেক্রেটারী শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তানে আগামী ১৫ই জুন নূতন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। এই প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করিবে এবং ইহার নূতন কর্মসূচী ও পৃথক পতাকা থাকিবে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মহাসভার চালক ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা রাজনীতি বর্জন করিয়াছেন—পূর্ব পাকিস্তানে কংগ্রেসও কি তাহাই করিবেন? স্বতন্ত্র পতাকা ব্যবহারের অনুমতি পাকিস্তান সরকার দিবেন কি না, তাঁহারাই বলিতে পারেন। কিন্তু পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষা কি divided loyalty হইবে না? এই কংগ্রেসের সহিত মূল কংগ্রেসের কি সম্বন্ধ থাকা সম্ভব? পাকিস্তানে কংগ্রেসের সার্থকতাই বা কি হইবে? সেক্সপীয়র বলিয়াছেন—নামে কি আসে যায়?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবার বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত করিবার কল্পনা করিতেছেন শুনা গিয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তবে পরিতাপের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। অন্য কোন প্রদেশে যে অব্যবস্থা হয় নাই, পশ্চিমবঙ্গে তাহা কেন হইয়াছে, বিধানবাবু কি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবেন? যে ব্যবস্থায় অবাধে পাকিস্তানে কাপড় গিয়াছে, তাহার জন্য যাঁহারা কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না। ইহাতে যে না করিয়া প্রদেশের লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করা দায়ী, তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত ও দণ্ডিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অতুল্য সম্পদ বিপন্নে পরিণত করা হয়, তাহা বলা বাহুল্য। পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত না করিয়া যে ব্যবস্থায় ক্ষতি হইয়াছে, সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন করাই কি প্রয়োজন নহে? আমরা বিধানবাবুকে এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

# হিন্দুসমাজ ও তাহার ইতিহাস

## শ্রীনির্মলকুমার বসু

### প্রাচীন কাল

বেদের রচনাকাল লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃতি পরিণত অবস্থায় পৌঁছিবার পর আর্যভাষা-ভাষী জাতিবৃন্দ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, অথবা সে পরিণতি ভারতবর্ষের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল; মূলে আর্যভাষী জাতি-সমূহের খাওয়া, সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি কিরূপ ছিল, এসকল বিষয়ে নানাদিক দিয়া পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু উপস্থিত তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বৈদিক কালে উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো কি আকার ধারণ করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে তাহার কেমন পরিণতি ঘটিয়াছিল ও সেই পরিণতির হেতুই বা কি, ইহার ইতিহাস আমাদিগকে যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের পরিমাণ নিতান্ত অল্প। ছিন্নভিন্ন পুস্তকের পাতা ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়া গেলে, তাহার অসংলগ্ন দুই চারিটি পাতা কুড়িয়া যেমন পুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা জন্মে, আমাদের চেষ্টার ফলও তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু হইবে না।

বৈদিক সাহিত্যে আর্য বা শিষ্টগণের সঙ্গে অরণ্যচারী জাতিবৃন্দের কিছু কিছু দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যে-সকল আদিম অধিবাসীর সঙ্গে আর্যগণের সংস্পর্শ ঘটিত, তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাহারা 'ঘোর' অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ; তাহারা 'অনাস'। হয়ত কৃষি ও গোপালনজীবী জাতি-বৃন্দের তুলনায় বনচারী ব্যাধ জাতি সমূহের নাসিকা খর্বকায়, অর্থাৎ লম্বার তুলনায় চওড়া বেশী বলিয়া এইরূপ মনে হইয়া থাকিবে। আর্যগণ অরণ্যচারী এই সকল জাতিকে ভয় করিতেন। তাহারা আসিয়া ঋষিগণের যজ্ঞভূমিতে উৎপাত করিত, এবং ঋষিগণও রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়গণের শরণাপন্ন হইতেন, আমরা রামায়ণের কাহিনী পাঠ করিয়া তাহা অবগত হইতে পারি।

কিন্তু আর্য সমাজের আভ্যন্তরীণ গঠন কেমন ছিল তাহা আমাদের অধিক জানা নাই। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৃত্তিগুলিকে যেমন একান্তভাবে কুলবিশেষ অথবা জাতিবিশেষের আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা দেখা যায়, এসময়ে তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বেদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন পুরোহিত-বংশের আয়ত্তাধীন করা হইয়াছিল, ইহা আমরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখিতে পাই। এই আদর্শের অনুকরণেই পরে শিল্প-বৃত্তি গুলিকেও কৌলিক বা জাতিগত করা হইল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন। যাহাই হউক, বৈদিক যুগে কিন্তু শিল্পবৃত্তি সম্পর্কে স্বাধীনতার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যথা ভৃগু ঋষি মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহারা রথনির্মাণে দক্ষ ছিলেন।

শ্রমবিভাগের ফলস্বরূপ সমাজের মধ্যে চাষী গোপালক বায় (অর্থাৎ তন্তুবায়) কামার ছুতার চামার নাপিত ভিষক বণিক প্রভৃতির নামও পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বৃত্তি কুলগত ছিল কিনা, অথবা বিভিন্ন শিল্পিগণের মধ্যে সামাজিক আসনের তারতম্য ছিল কিনা তাহা স্পষ্টত বলা যায় না।

একটি বিষয়ে কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে আর্থিক ব্যবস্থা বা ধনতন্ত্র বৈদিক কালে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে দেশের সকলের দারিদ্র্য অথবা দারিদ্র্যের সম্ভাবনা ঘোচে নাই। কেননা বৈদিক সাহিত্যে ভিক্ষুকের উল্লেখ আছে এবং মন্ত্রের মধ্যে ইন্দ্র অথবা আদিত্য-গণকে উদ্দেশ করিয়া এমন প্রার্থনাও রহিয়াছে যেন তাঁহারা সতত ভক্তগণকে দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করেন। অবশ্য দুর্ভিক্ষ যেমন সমাজব্যবস্থার দোষে ঘটিতে পারে, তেমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগের বশেও ঘটিতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঙ্গ-পালের অত্যাচারে শস্যনাশের কাহিনী আছে। ইহার ফলে চক্রায়ন নামে জনৈক ঋষি সস্ত্রীক দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই বেদের ব্রাহ্মণাংশের রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। তখন ভারতবর্ষে যথেষ্ট ঐশ্বর্য সংগৃহীত হইয়াছিল। বিদর্ভ কোশল কাম্পিল অসন্ধিবৎ পরিচক্র প্রভৃতি শহরের নাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া এক এক ঘনীভূত লোকালয়ে জমিয়া উঠিতেছিল, ইহা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এই সকল শহরের বিস্তার কিরূপ ছিল, কত লোকই বা সেখানে বসবাস করিত, সেগুলির সঙ্গে গ্রামের আর্থিক সম্বন্ধ কেমন ছিল, তাহা জানিবার উপায় উপস্থিত নাই। বৈদিক কালের কোনও নগরের ধ্বংসাবশেষ আজও নিঃসন্দিগ্ধরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি তেমন নগর পাওয়া যায়, এবং বৈজ্ঞানিক আদর্শে তাহার খননকার্য পরিচালিত হয় তবে আমরা হয়ত নূতন জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইব।

### মোহেন-জো-দড়ো

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু দেশে মোহেন-জো-দড়ো নামক স্থানে সর্ব প্রথম সিন্ধুসভ্যতার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। ভারত গভর্ণমেন্টের পুরাতত্ত্ব বিভাগ বহুদিনব্যাপী চেষ্টার ফলে ঐ সভ্যতার সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়াছেন। মোহেন-জো-দড়োতে যে-সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পাঠ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। সিন্ধু সভ্যতার কাল লইয়া এবং উত্তরভারতের [illegible] অপরাপর দেশের সহিত তাহার সম্বন্ধ সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই সভ্যতার সহিত আর্য বা বৈদিক সংস্কৃতির কোন যোগ ছিল কিনা; পরবর্তী কালের হিন্দু সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধই বা কি, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে। এমন অবস্থায় হিন্দু সমাজের ইতিহাস আলোচনাকালে সিন্ধু সভ্যতাকে বাদ দেওয়াই ভাল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা হইলে শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী প্রণীত বাঙলা পুস্তক বা ম্যাকে সাহেব সঙ্কলিত ইংরেজী পুস্তক পড়িয়া এই সম্বন্ধে যথেষ্ট জানিতে পারিবেন।

### বুদ্ধদেবের সময়ে

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধন-তন্ত্রের সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট আভাস দেওয়া গেল, পরবর্তী কালে, অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সময়ে আমরা তাহার আরও খুঁটিনাটি পরিচয় পাই। বুদ্ধদেব আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ধর্মের সনাতন [illegible] উপরে জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের কুলগত অধিকারের মর্যাদাভিক্ষার প্রতিবাদে তিনি বহু [illegible] করিয়াছিলেন। সেগুলি ধম্মপদগ্রন্থে [illegible] কালে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। [illegible] বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন:—

জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্র দ্বারা এবং জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যিনি …

আর্য সত্য ষোড়শ প্রকারে দর্শন করিয়াছেন ও নব লোকোত্তর ধর্ম পরিজ্ঞাত—তিনি শুচি এবং তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ২৬।১১

হে দুর্বুদ্ধে! তোমার জটাজুট, এবং মৃগ-চর্মে ফল কি? তোমার অভ্যন্তর (রাগাদি ক্লেশরূপ গহন দ্বারা) পরিপূর্ণ, তুমি বাহ্য-শরীর কেবল পরিমার্জিত করিতেছ। ২৬।১২

ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে কিংবা ব্রাহ্মণ-পত্নী-গর্ভজাত হইলে আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয়, তাহা হইলে কেবল ভোবাদী হইবে (অর্থাৎ হে মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ এইরূপ কথনশীল হইবে); কিন্তু (যিনি) আসক্তি-রহিত এবং নিষ্পাপ তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।১৪

যাঁহার কায় মন ও বাক্যে পাপ নাই, যিনি এই ত্রিস্থানে অতিশয় সংযমশীল, সেই লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।৯

যিনি কর্কশতা পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সত্য কথা বলেন ও সদুপদেশ দেন এবং কাহাকেও বৃথা বিষয়ে লিপ্ত করেন না, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।২৬

যিনি প্রগাঢ় জ্ঞানী, মেধাবী, সত্যাসত্য পথের সূক্ষ্মদর্শী এবং যিনি উত্তমপদ (নির্বাণ) লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।২১

বৈরীদিগের মধ্যে যিনি বৈরীশূন্য এবং দণ্ডবিধানকারীর মধ্যে যিনি শান্ত এবং সংসারাসক্তদিগের মধ্যে যিনি বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।২৪

এই জগতে যিনি তৃষ্ণালতা ছেদন করিয়া অনাগারিক হইয়া বিচরণ করেন, যিনি তৃষ্ণালতা ও ভবস্রোতকে ক্ষীণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।৩৪

যে নর পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় এবং সূচ্যগ্রে স্থিত সর্ষপের ন্যায় কামক্লেশে লিপ্ত নয়, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।১৯

ব্রাহ্মণের বৃত্তি এবং ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা ব্যক্তিগত চরিত্র গুণের উপরে নির্ভর না করিয়া জন্মগত হওয়ার কারণেই বুদ্ধদেবের উপরোক্ত প্রতিবাদ। কিন্তু তাঁহার সময়ে শিল্পবৃত্তি-গুলিও আংশিকভাবে কুলগত অধিকারে আসিয়া গিয়াছিল, ইহা অনুমান করিবার কারণ আছে। নিষাদ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ এবং দস্যুদের জন্য স্বতন্ত্র পল্লীর ব্যবস্থা ছিল। চণ্ডাল জাতিকে অতি হীন বলিয়া বিবেচনা করা হইত এবং পথের আবর্জনা পরিষ্কার করা ও রাত্রে গ্রাম পাহারা দেওয়া তাহাদের কৌলিক বৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। চণ্ডালের পাক করা খাদ্য দূরে থাক, তাহাকে ছুঁইলেও মানুষ অশুচি হইত। হীনশিল্পের মধ্যে নলকার, কুম্ভকার, চর্মকার এবং নাপিত গণ্য হইত। তবে শিল্প ব্যাপারে কৌলিক একাধিপত্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। কুশ-জাতকে এক রাজপুত্রের কাহিনী আছে, তিনি পর পর কুম্ভকার, মালাকার প্রভৃতির অধীনে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। এমন হইতেও পারে, রাজপুত্রের যে স্বাধীনতা ছিল, সাধারণ মানুষের তাহা ছিল না। অথবা সাধারণ স্তরেও তখন বৃত্তিতে কৌলিক আধিপত্য একান্ত বাঁধাবাঁধিভাবে তখনও স্থাপিত হয় নাই।

বুদ্ধদেবের সময়ে আরও একটি বিষয়ে আমরা নূতন ইঙ্গিত পাই। বারাণসীর নিকটে এক পল্লীতে পাঁচশ কুমার বাস করিত বলিয়া জানা যায়। অপর এক জাতকে এক হাজার কামারের দ্বারা অধ্যুষিত পল্লীর কথা আছে। এই সকল কর্মারগণের সমাজে একজন জ্যেষ্ঠক অথবা পমুকখ, অর্থাৎ মাতব্বরের বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল শিল্পী বা কারু স্বীয় কৌলিক বৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিত এবং ঐ বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত গণ, পূগ অথবা শ্রেণীর শাসন মানিয়া চলিত।

### ব্যবসায় ও শিল্পে উন্নত ভারতবর্ষ

বিভিন্ন শিল্পবৃত্তির উপরে কৌলিক অথবা জাতিগত একাধিকার স্বীকার করিয়া এবং গ্রাম, মেলা, নগর ও তীর্থস্থানসমূহকে আশ্রয় করিয়া সম্পদ উৎপাদন এবং বণ্টনের যে ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে সমসাময়িক অপর বহু দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। আজ ইংলণ্ড জার্মানী বা আমেরিকা শিল্পে অগ্রণী; পুরাতন কালে ভারতবর্ষ এবং চীন দেশও তেমনই অপর দেশের তুলনায় শিল্পে অগ্রস্থান অধিকার করিয়াছিল।

সেই উন্নত শিল্প ব্যবস্থার ফলে যাহা উৎপাদন হইত, তাহার কিয়দংশ বিদেশে রপ্তানি হইত। প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ একদিকে যবদ্বীপ, আনাম, চীন এবং অপর দিকে ব্যাবিলন ও রোমক সাম্রাজ্যের সহিতও বাণিজ্য-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কণিষ্ক যে সকল মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রীক, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি অঙ্কিত হইত। কণিষ্কের সাম্রাজ্য ভিন্ন ভারতের বাহিরেও নিশ্চয়ই সেই সকল মুদ্রার চলনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। "পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ন সী" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়, ভারতের বিভিন্ন বন্দর হইতে পশ্চিম দেশে নানাবিধ মশলা, কাপড়, হাতীর দাঁত, মুক্তা প্রভৃতি রপ্তানি হইত। গঙ্গাতীরবর্তী প্রদেশ হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতী কাপড়ও চালান যাইত। আর তাহার বিনিময়ে বাহির দেশ হইতে মদ, তামা রাং সীসা কাঁচ সোনা ও রূপার মুদ্রা, এমন কি সুন্দরী যুবতী এবং সঙ্গীতকুশল বালকদেরও আমদানী হইত।

পেরিপ্লাস আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা হয়।

শিল্প ও বাণিজ্যে ভারতের উন্নতির যে প্রমাণ আমরা এই ভাবে প্রাপ্ত হই, তাহার প্রভাবে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরেও যে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। খৃষ্টীয় ১ম হইতে প্রায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ বহু লিপি নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাসিক, জুন্নার, বসার ইন্দোর মান্দাসোর এবং ভট্টস্বামী মন্দিরস্থিত লিপিমালা পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তখন বিভিন্ন ব্যবসায়ী বা শিল্পিকুলের মধ্যে পূগ, গণ, শ্রেণী প্রভৃতি নামে নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এক এক বৃত্তি অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ স্বীয় প্রতিষ্ঠানের শাসনাধীনে সমবেতভাবে চলিবার চেষ্টা করিত। যে সকল বৃত্তির মধ্যে এইরূপে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে। শস্য ব্যবসায়ী, তেজারৎকারী, তৈলকার, গণৎকার, পুরোহিত, গায়ক, যোদ্ধা, মালি, মালাকর ইত্যাদি।

বৌদ্ধকাল হইতেই আরও একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্যের ফলে ব্যবসায়লিপ্ত ব্যক্তিগণ প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন। তাঁহাদের ঘরে বিপুল শস্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত হইত এবং শিল্পিকুলকে নিয়োজিত করিয়া তাঁহারা যে সকল দ্রব্য উৎপাদন করাইতেন, আবার তাহারই ব্যবসায়ের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইতেন। নগরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃত্তশালী বলিতে শ্রেষ্ঠীগণকেই বুঝাইত; এবং রাজার উপরে, এমন কি, রাজ্য পরিচালন ব্যাপারে, তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেন। ক্রমে বাহির হইতে আনীত স্বর্ণ ও স্বদেশে উৎপন্ন পণ্য-সম্ভারে ভারতবর্ষ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল; কেননা ধনসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অসম বণ্টনের অশুভ ফলস্বরূপ কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, ধনীকুল দানের আদর্শ গ্রহণ করিয়াও আর্থিক অসমতা রোগ হইতে দেশকে নিরাময় করিতে পারেন নাই। চণ্ডালাদি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অবস্থা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূল কখনও ছিল না।

### নাগরক জীবনের আদর্শ

সেই সময়ে সাধারণ নাগরিকের জীবনে ভোগের আদর্শ কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমাদের অনুধাবন করিবার প্রয়োজন আছে। পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্র বা পুরাণাদির প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হই। যে কালের কথা বলা

হইতেছে, তখন ভারতীয় দর্শনের উচ্চ শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার জন্য নানা পুরাণ গ্রন্থ লেখা হইয়াছে বা হইতেছে। মুখে মুখে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ঘটিতেছিল বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভোগের প্রলোভন এবং আদর্শও যেভাবে সুখী সংসারীর চরিত্রে খানিক শৈথিল্য আনিয়া দেশকে দুর্বল করিয়া দিতেছিল এবং পরবর্তীকালে মুসলমান সভ্যতার আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম করিয়া দিতেছিল, তাহাও অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে আমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে।

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার—Social life in Ancient India: Studies in Vatsyayana's Kamasutra নামে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, বাৎস্যায়ন মুনি খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন এবং সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে বসবাস করিতেন। যে সময়ে কামসূত্র সংকলিত হয় সে সময়ে ঐশ্বর্যভারাক্রান্ত ইহলোকসর্বস্ব জীবন-দর্শনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কামসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে এইরূপ মতের উল্লেখ করিয়া বাৎস্যায়ন তাহা খণ্ডনের পর ধর্মের মর্যাদা স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

'ধর্মাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ তাহার ফল ইহজন্মে পাওয়া যায় না এবং যজ্ঞাদি সাধিত হইলেও ফল হইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহও আছে। ১।২১

'আগামীকল্যকার ময়ূর লাভ অপেক্ষা অদ্যকার পারাবত লাভ মন্দের মধ্যে ভাল। ১।২৩

'সংশয়সঙ্কুল হেমশত লাভ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে এক কার্ষাপণ লাভও মন্দের ভাল।—এই কথা লোকায়তিকগণ বলিয়া থাকেন। ১।২৪

বাৎস্যায়ন সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের সহায়তায় এই মতকে খণ্ডন করিলেও তাঁহার গ্রন্থে সাংসারিক জীবন এবং ভোগবিলাসের যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে। নিম্নের উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইলেও পাঠকগণকে ইহা ধৈর্য ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে বলি; কারণ ইহাতে তাঁহারা প্রায় দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন ভারতীয় সমাজের একটি বাস্তব চিত্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

'বিদ্যাগ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয় বিজয়, বৈশ্য ক্রয় ও শূদ্র নির্বেশ (ভৃতি চাকরী) দ্বারা অধিগত অর্থে বা পিতৃপিতামহাগত উপায় ও পূর্বে কথিত উপায়, এই উভয়বিধ উপায় দ্বারা অর্জিত অর্থে নাগরকবৃত্তের অনুবর্তন করিবে। ৪।১

'নগরে, পত্তনে (রাজধানীতে), খর্বটে (দুইশত ক্ষুদ্র গ্রাম যে স্থানে অবস্থান করে), অথবা মহৎ সজ্জনাশ্রয় যেখানে, সেখানে অবস্থান করিবে। কিংবা যেখানে থাকিলে শরীর যাত্রা নির্বাহ হয়। ৪।২

'সে স্থানে গৃহ করিবে। নিকটে জল থাকে। যে দিকে জল থাকিবে, সে স্থানে বৃক্ষবাটিকা থাকা আবশ্যক। গৃহের কর্মানুসারে এক একটি কক্ষ বিভাগ করিবে। বাস-গৃহদ্বয় করিবে বা করাইবে। ৪।৩

'বাহিরের বাসগৃহেও অতি সুন্দর দুইটি বালিশ ও তাহার মধ্যে অতি শুভ্র চাদর পাতা শয্যা থাকিবে। আর তাহার নিকটে সেইরূপই কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকার আর একটি শয্যা থাকিবে। তাহার শিরোভাগে তৈলচিত্রযুক্ত কূর্চাসন (ব্রাকেট) স্থাপন কর্তব্য এবং তাহার পাদদেশে একটি বেদিকা কাষ্ঠময়ী (টেবিল) থাকিবে। সেখানে রাত্রের উপভোগযোগ্য অনুলেপন, মালা, সিক্থকরণ্ডক (মোম দ্বারা রঞ্জিত পেটরা), সৌগন্ধিকপুটিকা, গন্ধের কৌটা, শিশি ইত্যাদি রাখিবার পেটরা), মাতুলুঙ্গত্বক (দাড়িম্ব বা টেবা বা নারিঙ্গ লেবুর ছাল), এবং পান থাকিবে। ভূমিপ্রদেশে পতদ্গ্রহ (পিকদানী), হস্তিদন্তাবসক্ত বীণা, চিত্র ফলক, বর্তিকাসমুদ্গক (চিত্র কর্মোপযোগী তুলিকা রঙ প্রভৃতি), যে কোনও পুস্তক, কুরণ্টক (পীতঝাঁটী ফুল) মালা, শয্যার নিকটেই ভূমিতে সমস্তক বৃত্তাস্তরণ (চেয়ার), আকর্ষ-ফলক ও দ্যূতফলক (খেলিবার ছক), তাহার বাহিরে ক্রীড়াপক্ষীর পঞ্জর সকল (খেলার পাখীর খাঁচা সকল)। একটি নির্জন প্রদেশে নৃত্যগীতাদির স্থান করিবে এবং তথায় অন্যান্য স্ত্রীর ক্রীড়ার স্থানও করিবে। ভালরূপে আস্তরণ পাতা (চিত্র-বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত) সুরভিচ্ছায়াসম্পন্ন প্রেঙ্খাদোলা (দোল খাইবার দোলা) বৃক্ষবাটিকার মধ্যেই করিতে হইবে। সেই গৃহোদ্যান মধ্যেই কুসুমিত লতামণ্ডপের নিম্নে চত্বর (চৌতারা) যুক্ত স্থণ্ডিলময়ী পরিষ্কৃত ভূমিতে পীঠিকা (বেদিকা) একটি করিতে হইবে। এইরূপে ভবনে আবশ্যকীয় দ্রব্যের বিন্যাস করিবে। ৪।৪

'নায়ক প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্য ক্রিয়া করিবে। পরে দন্তধাবনপূর্বক কিছু অনুলেপন ধূপ ও মাল্য গ্রহণ করিয়া, (ওষ্ঠে) অলক্তক দিয়া, পান খাইয়া, সিক্থক নিয়া (ঈষদার্দ্র অলক্তকপিণ্ডী ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া পান খাইয়া মোমের গুলিদ্বারা ঘষিবে), আদর্শে (আয়নায়) মুখ দেখিয়া, মুখবাস ও তাম্বূল-পাত্র গ্রহণ করিয়া কার্যানুষ্ঠান করিবে। ৪।৫

'প্রত্যহ স্নান; দ্বিতীয় দিনে উৎসাদন—উদ্বর্তন, অর্থাৎ তৈল-চন্দনাদি দ্বারা পরিষ্করণ, তৃতীয় দিনে ফেনক, অর্থাৎ ফেনকারী স্নেহময়দ্রব্য দ্বারা গাত্র ঘর্ষণ, চতুর্থক আয়ুষ্য ক্ষৌরীকর্ম, পঞ্চমক ও দশমক প্রত্যায়ুষ্য; স্নানাদিপঞ্চক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। সর্বদার জন্য সংবৃত (গুপ্ত) গৃহে ঘর্মাপনোদন কর্তব্য। পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নে ভোজন করিবে। চারায়ণের মতে পূর্বাহ্নে ও সায়াহ্নে ভোজন কর্তব্য। পূর্বাহ্নে ভোজনান্তর শুক-সারিকাকে পড়ান ব্যাপার, লাবক, কুক্কুট ও মেষের যুদ্ধ, আর সেই সেই কলাক্রীড়া এবং পীঠমর্দ বীট-বিদূষকাদির সহিত সন্ধি-বিগ্রহাদির ও দিবাশয়ন কার্য। নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কেশ প্রসাধন-পূর্বক বৈকাল বেলায় বিহার বেশে গোষ্ঠীতে সভা-সমিতিতে বিহার। সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত। সংগীতের পর বাহিরের বাসগৃহ পুষ্পাদি দ্বারা প্রসাধিত হইলে এবং সুরভি ধূপ দ্বারা সুবাসিত হইলে সহায়ের (সহচরের) সহিত শয্যায় অভিসারিকার প্রতীক্ষা করিবে। না আসিলে দূতী পাঠাইবে। মান করিয়া না আসিলে স্বয়ং যাইবে। আসিলে পরে মনোজ্ঞ আলাপ ও মনোহর উপহার দ্বারা সহায়কারিগণের সহিত মনস্তুষ্টি করিতে উপক্রম করিবে। দুর্দিনে—অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিনে অভিসারকারিণীর বৃষ্টিপাত দ্বারা বেশভূষার বিপর্যয় ঘটিলে স্বয়ংই আবার সেইরূপে বেশভূষা করিয়া দিবে। অথবা পরিচারক দ্বারা পরিচর্যা করাইবে। এই অহোরাত্র সাধ্য ব্যাপার। ৪।৬

'যাত্রার ব্যবস্থাপন, গোষ্ঠীতে সমবায় সকলে মিলিয়া পান ব্যবস্থা, উদ্যানে গমন, সমস্যা ক্রীড়াও প্রবর্তিত করিবে। পক্ষে মাসে কোন একটি বিজ্ঞাত দিনে সরস্বতী ... নিযুক্তগণের নিত্য সমাজ। আগন্তুক ... নর্তক-নর্তকীরা তাহাদিগকে নৃত্য-গীত ... প্রদর্শন করাইবে। দ্বিতীয় দিনে তাহাদিগের নিকটে নিয়ত পূজা লাভ করিবে। তাহার ... শ্রদ্ধা থাকিলে ইহাদিগের নৃত্যাদি ... করিতে পারে বা বিদায় দিতে পারে। কোনরূপ ব্যসন, ব্যাধি বা শোকাদি উপস্থিত হই... বা উৎসবে প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগের ... কার্যকারিতা থাকা আবশ্যক। যে ... আগন্তুকের সেস্থলে মেলন হইবে, তাহাদি... পূজা ও বাসনের সময় উপকারাদি ... সাহায্য করিবে। এই হইল গণধর্ম। ইহা ... সেই সেই দেবতাবিশেষের উদ্দেশে যে ... করা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার ... ব্যাখ্যাত বা কথিত হইল। ৪।৭

[গোষ্ঠী সমবায় কি, তাহা বলিতেছেন]

'বেশ্যার বাটীতে বা সভায় অথবা অন্য নাগরকের বাটীতে বেশ্যাদিগের সহিত সম-বিদ্যা, সমান-বুদ্ধি, সম-স্বভাব, সমধন সমবয়স্কগণের অনুরূপ আলাপের সহিত যে একাসনে অবস্থান, তাহার নাম গোষ্ঠী। তথায় ইহাদিগের কার্য কাব্যচর্চা বা ... কলার চর্চা। সেই গোষ্ঠীতে লোক-মধ্যে কলার নাগরকের পূজা কর্তব্য এবং প্রী...

অনুরূপ তাহাদিগের পরিচারিকা দ্বারা সেবা-শুশ্রূষাও কার্য। ৪।৮

[সমাপান কি, তাহা বলিতেছেন,—]

'পরস্পরের বাটীতে আপনেক কার্য। ৪।৯

[আপনেক বিষয়ে বিধান করিতেছেন,—]

'তাহাতে মধু, মৈরেয়, সুরা, আসব এবং বিবিধ লবণ, ফল, হরিৎ, শাক, তিক্ত, কটু, অম্ল ও উপদংশ বেশ্যাদিগকে পান করাইবে ও পরে পান করিবে। ইহা দ্বারা উদ্যান-গমন ব্যাখ্যাত হইল। ৪।১০

[উদ্যান-গমন বিষয়ে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা বলিতেছেন,—]

'পূর্বাহ্নেই সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া ঘোটকপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া বেশ্যাদিগের সহিত পরিচারকগণকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। সেখানে দৈনিক যাত্রার উপভোগ করিয়া কুক্কুট-যুদ্ধ ও দ্যূত (দাবা খেলা প্রভৃতি) ক্রীড়া ও নট-নর্তকের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করিয়া যাহার যেমন চেষ্টা, সেইরূপে চেষ্টার পূরণ দ্বারা কাল অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নে সেই উদ্যানের চিহ্ন (পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্যাদি) গ্রহণ করিয়া সেইরূপেই চলিয়া আসিবে। ইহা দ্বারা কুম্ভীরাদিরহিত রচিত জলাশয়ে (দীর্ঘিকাবাপী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে) গ্রীষ্মকালে জলক্রীড়া-গমন ব্যাখ্যাত হইল। ৪।১১

'ইহা দ্বারা যে একচারী, সে নিজের বলের অনুসারে গণিকা ও নায়িকার স্থানে সখী ও নাগরকের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, ইহা ব্যাখ্যাত হইল। ৪।১৪

'যাহার কিছুমাত্র বিভব নাই ও পুত্র-কলত্রাদিও নাই, শরীর মাত্র সহায়, মল্লিকা, ফেনক ও কষায় মাত্র পরিচ্ছদধারী, পূজ্য দেশ হইতে আগত ও কলায় কুশল, সে ব্যক্তি নাগরক গোষ্ঠীতে কলার উপদেশ করিয়া বেশ্যা-জনোচিত বৃত্তে আপনাকে সিদ্ধ করিবে। ইহাকে পীঠমর্দ বলে। ৪।১৫

'যে সমস্ত বিভব ভোগ করিয়া (খোয়াইয়া) বসিয়াছে, গুণবান এবং দার-পরিজনসমন্বিত। বেশ্যাজনোচিত বেশে ও গোষ্ঠীতে (নাগরক-গণের) বহু মত প্রকাশ করিতে সমর্থ এবং বেশ্যাজন ও নাগরকজনকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে বীট বলা যায়। ৪।১৬

'গ্রামবাসী ব্যক্তি স্বজাতীয় বিচক্ষণ কৌতূহলপরায়ণ ব্যক্তিগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া নাগরক জনের বৃত্ত বর্ণনা করিয়া শ্রদ্ধা জন্মাইয়া তাহার অনুকরণ করিবে। গোষ্ঠীর প্রবৃত্তি করিবে। সঙ্গতি থাকিলে জনের অনুরঞ্জন করিবে। প্রত্যেক কর্মে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবে। যথাসম্ভব উপকারও করিবে। —এই নাগরক বৃত্ত কথিত হইল। ৪।১৯

'কেবল সংস্কৃত বা কেবল দেশভাষার সাহায্য লইয়া গোষ্ঠীতে কথা না বলিলে লোকে বহুমত হইবে। যে গোষ্ঠীর উপর লোকের বিদ্বেষ আছে বা যেটি স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত বা যথায় কেবল পরহিংসা, পরচর্চাই হইয়া থাকে, বুধ-ব্যক্তি তাদৃশ গোষ্ঠীর অবতারণা করিবে না। লোকের চিত্তানুবর্তিনী লোক চিত্তরঞ্জনকারিণী, ক্রীড়ামাত্রই যাহার একটি মুখ্য কার্য, তাদৃশ গোষ্ঠীর সহচর হইলে বিদ্বান লোকে—সংসার ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪।২০

### অবনতির অপর এক দিক

দেশে সম্পদ বৃদ্ধির অপর একটি কুফলও প্রাচীন ভারতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে শাসকবর্গের মধ্যে বিবাদ কলহ দ্বন্দ্ব সদা-সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। তাঁহারা জাতি অথবা বংশগত মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন; সৎ রাজা হইলে তিনি প্রজার কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত থাকিতেন; কিন্তু সৎ না হইলে প্রজার আর ভরসা করিবার মত কিছু থাকিত না। তাহারা গ্রামে স্বীয় কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যথাসাধ্য চলিবার চেষ্টা করিত; সেই বৃত্তি অনুসরণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে মজুরি অথবা চাষের চেষ্টা করিত। রাজনৈতিক গগনে যুদ্ধবিগ্রহ তাহাদিগকে আঘাত করিলেও সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারিত না।

ঐশ্বর্য সংগ্রহের অপর একটি ফল ব্রাহ্মণ বর্ণের আচরণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাভ্যাস এবং বিদ্যাদানের বৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। —দান, প্রতিগ্রহাদি তাঁহারা যথাসম্ভব কম স্বীকার করিতেন। যাহাও লইতেন, তাহার অধিকাংশ ছাত্রগণের ভরণপোষণে ব্যয়িত হইত। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের ধনী সত্যসত্যই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনীদের আসন গ্রহণ করিলেন, রাজকুল যখন ধনীদের সহিত পাল্লা দিয়া যজ্ঞের জাঁকজমক বৃদ্ধির দিকে মন দিলেন, তখন ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেও কিছু অবনতি ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। পরবর্তীকাল মহমুদ গজনি যখন সোমনাথ নগরকোট প্রভৃতি মন্দির লুণ্ঠন করেন, তখন প্রতি ক্ষেত্রে তিনি যে পরিমাণ সোনা এবং মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়। এই সম্পদ-ভারক্লান্ত ব্রাহ্মণ কুলের মধ্যে কিছু লোক পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া লোকশিক্ষার জন্য চেষ্টিত থাকিলেও এক বৃহৎ অংশ স্বার্থ-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া অতিরঞ্জিত ভাষায় রাজন্যবর্গের প্রশস্তি রচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, ইহা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই।

অর্থাৎ ঐশ্বর্যভারের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে ধর্মচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। (ক্রমশ)

## দিনান্ত

**অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়**

রূপালী ভোরের প্রথম আভাসে কবে
আকাশের নীলে কী যে ছিল কানাকানি,
দীপ্ত দিনের আলোর মহোৎসবে
ঘুম-ভাঙা-পাখী! ছেড়ে ছিলে নীড় খানি।

সূর্যের তৃষা জেগেছে তোমার বুকে,
কল্পলোকের পথ খুঁজে দুটি পাখা
ঊর্ধ্বে উঠেছে দূরের স্বপ্ন-সুখে—
বহু কামনায় অন্তর ছিল ঢাকা!

কোথায় আকাশ? কোথায় কল্পলোক?
দূরে যায়—সে যে সরে যায় আরও দূরে,
মেঘের করুণ রঙে শুধু ভরে চোখ—
ক্লান্ত পাখাটি মরে শুধু পথ ঘুরে!

মাটির পাখীরে আকাশ দেয়না ধরা—
আকাশের খেলা নিমেষেই সারা হ'লো,
সন্ধ্যার পাখী! এবার মৃত্যুভরা
আঁধার-নিরালা-নীড় পানে ফিরে চলো!

# 'প্র-না-বি-র এলবাম'
### চিত্র-চরিত্র

## যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম মুছিবার নয়। সাহিত্যিক হিসাবে নয়, সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকরূপেই তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যতীন্দ্রমোহনের সময়োচিত উৎসাহ ও আহ্বান না পাইলে মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর রচনায় আত্মনিয়োগ করিতেন কিনা সন্দেহ।

"তখন বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় রত্নাবলী নাটকের রিহার্সাল চলিতেছে, সেই সময় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মধুসূদনের মধ্যে হঠাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দের দোষ-গুণ লইয়া তর্ক বাধিয়া উঠিল। মধুসূদন বলিলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ যতদিন না বাঙলায় প্রবর্তিত হবে, ততদিন বাঙলা নাটকের উন্নতির সম্ভাবনা দেখি না।

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, বাঙলাতে অমিত্র-ছন্দ প্রবর্তনের বাধা এ-ভাষার স্বভাবের মধ্যেই আছে, কাজেই কখনো হবে বলে মনে হয় না।

বাধা শুনিয়া মধুসূদনের সমস্ত ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠিল—তিনি বলিলেন, এ পর্যন্ত চেষ্টা হয়নি বলেই সম্ভব হয়নি।

—দেখুন না কেন, ফরাসী সাহিত্য বাঙলার চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ, যতদূর জানি, তাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাই।

—সে কথা ঠিক, সাহেব মাইকেল বলিলেন, কিন্তু মনে রাখবেন, সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বঙ্গভাষা, তার পক্ষে কোন কাজই দুঃসাধ্য নয়।

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন—আপনি মনে রাখবেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষরকে ঠাট্টা করে লিখেছেন—

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভ'রে খাই।

মধুসূদন হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—বুড়ো ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষর লিখতে পারেনি বলেই আর কেউ পারবে না, তার কি মানে আছে?

ঈশ্বর গুপ্ত তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

মাইকেল ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিলেন—আচ্ছা কেউ না লেখে, আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখবো।

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, বেশ! আপনি যদি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখতে পারেন, আমি তা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে দেবো।

ইহা শুনিয়া মধুসূদন আনন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তাহলে ক'দিনের মধ্যেই আমার কাছ থেকে অমিত্রাক্ষরের নমুনাস্বরূপ খানিকটা কাব্যের অংশ পাবেন।

ক'দিনের মধ্যেই তিনি তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের কিয়দংশ লিখিয়া যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, যতীন্দ্রমোহন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া নিজের খরচে তিলোত্তমা-সম্ভবের প্রথম সংস্করণ ছাপাইয়া দিয়াছিলেন।"

মাইকেল তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনের নিকটেই বোধ করি সবিশেষ ঋণী ছিলেন। মেঘনাদ-বধ কাব্যের পাণ্ডুলিপি তিনি যতীন্দ্রমোহনকে উপহার দিয়াছিলেন, উপহার দিবার সময়কার একটি আলোক-চিত্র গৃহীত হইয়াছিল।

মাইকেলের কাব্য-জীবন অপরের স্পর্ধিত আহ্বানের বেগে বারংবার অভাবিতভাবে মোড় ফিরিয়া গিয়াছে, সময়োচিত উত্তেজনা না পাইলে মাইকেল আদৌ বাঙলা সাহিত্য রচনায় মনো-নিবেশ করিতেন কিনা সন্দেহ। এই সব আহ্বানের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আহ্বানকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, কারণ এই সূত্রেই অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি। যতীন্দ্রমোহনের গৌরব এই যে, মানসিক উত্তেজনার দ্বারা মধুসূদনের মনে যে কাব্যাগ্রহ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, যথাসময়ে তাহাকে বাস্তব আশ্রয় দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। মাইকেল বারংবার যতীন্দ্রমোহনের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। তখন কবি হয়তো পৃষ্ঠপোষকের বদান্যতা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন—

'রাজেন্দ্র সংগমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'

আর আজ বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিপরীত অর্থে ওই এক কথাই বলিতেছে—

'রাজেন্দ্র সংগমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'

ধনী যতীন্দ্রমোহন আজ কবি মধুসূদনের অনুগ্রহেই 'পশিয়াছে যশের মন্দিরে।' সেদিনের পৃষ্ঠপোষিত কবিই আজ সত্যকার পৃষ্ঠপোষক। আজ মাইকেলের প্রসঙ্গ ব্যতীত যতীন্দ্র-মোহনের স্মরণীয়তার আর কি দাবী আছে। সম্রাট বিক্রমাদিত্য যে আজ সভাসদ কালিদাসের অনুগ্রহেই জীবিত। ইতিহাসের ঘোড়া উল্টারথ টানিতে বড়ই আনন্দ পাইয়া থাকে।

২

প্রাচীনকালে সব দেশেই ধনী ব্যক্তি সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রাচীন বাঙালী কবিগণ সকলেই কোন-না-কোন ধনী ব্যক্তির আশ্রিত ছিলেন। উদরান্নের জন্য সাধারণ লোকের উপর তাঁহাদের নির্ভর করিতে হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা লোক-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল লোক-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে শিকড় বসাইবার পরে সমাজের অবস্থার দ্রুত বদল হইতে লাগিল। পুরাতন ধনাঢ্যগণ লোপ পাইতে লাগিল—কে আর তেমনভাবে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিবে? এই সময়কার অধিকাংশ পাঁচালীকার ও 'কবি'গণ ধনাঢ্যের পৃষ্ঠ-পোষকতার আশা ত্যাগ করিয়া সরাসরি লোকাশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, আর সেই কারণেই তাঁহারা যে বস্তু সৃষ্টি করিলেন, তাহা লোক-সাহিত্য হইল না। লোক-সাহিত্য কি নয়, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দাশরথির পাঁচালী।

এই সময়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাঙলা সাহিত্যের ভাগীরথীতে বাহির সমুদ্রের জোয়ার দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং দেশের সৌভাগ্যবশত কয়েকজন শিক্ষিত মার্জিতরুচি ধনী ব্যক্তি এই অপ্রত্যাশিত উচ্ছ্বাসকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাইকপাড়ার ঈশ্বর চন্দ্র ও প্রতাপ চন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি ঐশ্বর্যবানগণ বাঙলা সাহিত্যের ভাগীরথীর তীরে স্ফটিকের ঘাট বাঁধিয়া না দিলে পরবর্তী-কালের পাঠকগণের পক্ষে কাদা ভাঙিয়া স্রোতস্বিনী পর্যন্ত পৌঁছানো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিত! মাইকেলের কথাই ধরা যাক। বাঙলা কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র কুহু ও কেকা তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল, অবশ্য দাঁড়কাকের আওয়াজেরও অভাব ছিল না। তৎসত্ত্বেও একথা সত্য যে, তাঁহার কাব্যের অর্থাগমে মূল্য বিশেষ কিছু ছিল না। সমস্ত পুস্তক নিজেকে খরচ করিয়া ছাপিতে হইলে আদৌ ছাপিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। এরকম ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য। তাঁহার আর যাহারই অভাব হোক, পৃষ্ঠ-পোষকের অভাব হয় নাই। বদান্য পৃষ্ঠপোষক না থাকিলে মাইকেলের গ্রন্থাবলী হয়তো পাণ্ডুলিপি আকারে পরবর্তীকালের হাতে আসিত। দাশরথি রায় যে-সমাজের উপরে নির্ভর করিতেন, মাইকেলের পাঠক-সমাজ তাহা হইতে স্বতন্ত্র, বস্তুত তাঁহার জীবনকালে তাঁহার কাব্যের পাঠক ছিল, কিন্তু পাঠক-সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ করি, প্রথম বাঙালী লেখক, যিনি নিজের সাহিত্যের প্রেরণায় লিখিয়াছেন—অথচ পাঠকের সমাজের অভাব অনুভব করেন নাই এবং তিনিই বোধ করি প্রথম বাঙালী লেখক, যাঁহার পৃষ্ঠপোষকের আবশ্যক হয় নাই। যে-সমাজের সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্র, সেই সমাজই পাঠক-সমাজরূপে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের কাজ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের আগের বাঙলা সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকের সাহিত্য। বঙ্কিম-চন্দ্রই প্রথম দেখাইলেন যে, ধনীর আশ্রয় স্বীকার না করিয়াও এমন সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, যাহার অর্থাগমের পথ অপ্রশস্ত নহে।

কিন্তু একথাও বোধ করি সর্বাংশে সত্য নয়, কারণ পূর্বতন পৃষ্ঠপোষকের স্থান এখন সরকারী চাকুরি গ্রহণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, নবীন সেন প্রভৃতি সেকালের অধিকাংশ সাহিত্যিকই সরকারী চাকুরে। তাঁহারা আসরের শ্রোতার পরাধীনতা হইতে মুক্তি পাইলেন—কিন্তু আর এক প্রকার পরাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার ফল ভালো হইল কি মন্দ হইল কে বলিবে? হয়তো ভালোয় মন্দয় মিশিয়া ফলোদয় হইয়াছে। ইহা কম সৌভাগ্য নয়।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের রসগ্রাহীরা ছিলেন শ্রোতা, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে তাঁহারা হইয়া দাঁড়াইলেন পাঠক, মাইকেলের সময়টা মাঝামাঝি—এই অরাজকতার পর্বটায় কয়েকজন বদান্য পৃষ্ঠপোষক অগ্রসর হইয়া আসাতে বাঙলা সাহিত্য অনেক দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিল।

# সমদর্শন ও মহাত্মা

## শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বশেষ আদর্শের অভাব নাই; কিন্তু আদর্শের অনুসরণ ভিন্ন কথা। বর্তমানে সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এ কথা বোধ হয় বলা যায় যে, আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি কোনও মতভেদ নাই। সমস্ত সভ্য জাতিই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। সত্য, মঙ্গল, অহিংসা প্রভৃতি মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য—এ বিষয়ে সভ্য সমাজে বোধ হয় কোথায়ও মতভেদ নাই। কিন্তু আদর্শ সম্বন্ধে জনমতের মধ্যে অনৈক্য না থাকিলেও, ব্যবহারে কোনওরূপ ঐক্য দেখা যায় না। শুধু এক বিষয়ে হয়ত ঐক্য স্বীকার করা যাইতে পারে—তাহা হইতেছে এই যে, আদর্শ সম্বন্ধে আমরা কণ্ঠস্বর যতই উচ্চগ্রামে চড়াইয়া বক্তৃতা করি না কেন, উহার বিপরীত ব্যবহার করিতেই আমরা অভ্যস্ত। যাঁহারা আদর্শকে কিয়দংশেও জীবনে বিকসিত করিয়া তুলিতে চান, তাঁহাদিগকে সাধারণত আদর্শবাদী বলা হয়। আদর্শবাদী বলিতে যেন কেমন একটু উপেক্ষার ভাব বুঝা যায়। বাস্তবের সঙ্গে সংস্রব অল্প এমন লোককেই আমরা আদর্শবাদী বলিয়া গণনা হইতে বাদ দিয়া থাকি। যাহারা আদর্শ মানে না, বা আদর্শ অনুসারে কার্য করে না, তাহাদিগকে কি সংজ্ঞা দেওয়া হয়, আমার জানা নাই।

গীতার একটি আদর্শের কথা বলি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমদর্শনের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

৫ম অধ্যায়

যাঁহারা বিদ্যা বিনয় প্রভৃতি গুণে ভূষিত ব্রাহ্মণ, গোরু, হস্তী, এমন কি কুকুর ও চণ্ডালে—যাঁহাদের ভেদবুদ্ধি নাই, তাঁহারাই পণ্ডিত।

সংসারে যত কলহ, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা তাহার অধিকাংশই এই বৈষম্যবুদ্ধি হইতে জাত। হিন্দুদের একটি সর্বাপেক্ষা গ্লানিজনক অপবাদ এই যে, হিন্দু সমাজে এক শ্রেণীর লোক হেয়, নীচ এবং অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে সকলেই যে ঐ অপরাধে অপরাধী, তাহা না হইতে পারে; কিন্তু ঐ পাপ যে, আমাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজে এখনও এমন লোক আছেন, যাঁহারা এই জঘন্য নীতির সমর্থনে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতেও ছাড়েন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, চারিটি বর্ণই ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আমাদের মুনি-ঋষি জ্ঞানী মহাজনগণ চিরদিন সমদর্শনের উপদেশই দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সমদর্শনের প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহার ব্যবহার ও উপদেশে। কিন্তু কে শুনে কাহার কথা? আদর্শ আমরা মানি বটে; কিন্তু কাজের বেলায় অন্যরূপ ঘটে।

গীতা বলিতেছেন, যাঁহারা সমদর্শী তাঁহারাই সংসার জয় করিতে পারেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তি তাঁহাদের পক্ষেই সুলভ, অন্যের পক্ষে নহে।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

কেননা ভগবান ভেদবুদ্ধিমুক্ত, নির্দোষ। সেইজন্যই একবার ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিলেই চিত্ত ভগবানে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মনি তে স্থিতাঃ।

কথাটি ভাবিয়া দেখা উচিত। যে মানুষকে অপমান করিতে পরাঙ্মুখ নয়, যে উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, বিদ্বান্ মূর্খ প্রভৃতির বৈষম্যমূলক আচরণে অভ্যস্ত, অহঙ্কার, দর্প স্বার্থ বুদ্ধি ও হিংসার দ্বারা তাহার অন্তঃকরণ কলুষিত; সে আবার ভগবানকে ভজনা করিবে কি? ভগবানকে পাইতে হইলে ভগবদ্-ভাবে ভাবিত হইতে হইবে। 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'—ভগবানের ন্যায় ভেদবিচার শূন্য, শুদ্ধবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইতে পারিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। স্বার্থের সন্ধান যতক্ষণ থাকে, যতক্ষণ আকাঙ্ক্ষা থাকে, লোভ থাকে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি যাইতে চাহে না। আমি উচ্চ জাতি, আমি ধনী, আমি রূপবান, আমি বিদ্বান্—এইরূপ অভিমান থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি প্রভুত্ব কামনা করি, যশের আকাঙ্ক্ষা করি; ধনের লোভ করি। ইহার জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, ইহারই জন্য মানুষের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হইতে হয়, অপমান লাঞ্ছনা প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা অপরকে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্তি হয়। তাই ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন,

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।

প্রিয়বস্তু না পাইলে, হৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, অপ্রিয় কিছু ঘটিলেও উদ্বিগ্ন হইতে নাই, এইরূপ স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং ব্রহ্মে চিত্ত লগ্ন করিতে পারেন।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মনি স্থিতঃ।

ভগবানের প্রতি এইরূপ সমদর্শনসম্পন্ন চিত্ত অর্পণ করিলে কি হয়, তাহাও গীতা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন অষ্টাদশ অধ্যায়ে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

ভগবানে যাঁহার চিত্ত স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার আত্মা সর্বদা প্রসন্ন বা নির্মল থাকে, তিনি নষ্ট দ্রব্যের জন্য দুঃখগ্রস্ত হন না, বা অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্বভূতে সমভাববিশিষ্ট এই সকল ব্যক্তি পরমাভক্তি লাভ করেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ মদ্ভক্তি বলিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, বলিলেন 'পরাভক্তি'। বৈষম্যবুদ্ধি থাকিতে পরাভক্তি লাভ করিবার আশা সুদূর পরাহত। ফলের আশা ত্যাগ করিতে বলিবার উদ্দেশ্যও ইহাই। সন্ন্যাসী হইয়া সংসার হইতে পলায়ন করিতে পার, কিন্তু তোমার প্রবৃত্তি নিচয় তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। দেহধারী জীবের পক্ষে কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।

ইহাই গীতার অভিপ্রেত বৈরাগ্য; এই বৈরাগ্য হইতেই বৈষম্যবুদ্ধির লয় এবং ইহা হইতেই পরমাভক্তি লভ্য হয়। যুগে যুগে মানব এই মহা আদর্শের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে; কিন্তু সে স্বীকারের মধ্যে নাই আত্মার সমর্থন। সাম্যের কথা বলিতে বলিতে আমরা বৈষম্যকে, ভেদকেই বাড়াইয়াই তুলিতেছি; নয় কি?

কথায় ও কাজে কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে, তাহা আমরা দেখিয়াও শিখি নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে অনেক যুগযুগান্ত গত হইয়াছে—আমরা সেদিনমাত্র দেখিলাম গীতার আদর্শ কি সুন্দরভাবে মানুষের জীবনে প্রতি-ফলিত হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী এই সমত্বের উপাসক ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্রে তিনি কখনও পৃথক করিতেন না। সকলের জন্যই তাঁহার হৃদয় সর্বদা উন্মুক্ত ছিল—বিশেষতঃ যাহারা ঘৃণিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, তাহাদের জন্য মহাত্মার সহানুভূতির অন্ত ছিল না। সমদর্শনের এই ঋষি সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি বর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শত্রু মিত্র তাঁহার বিশ্বপ্রেমে গলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ জীবনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু কিছুই ছিল না। তিনি ক্রোধ লোভ মান ভয় জয় করিয়াছিলেন। 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ'—সংসারকে তিনি এই-জন্য জয় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দুঃখে বিচলিত হইতেন না, মর্মন্তুদ শোকেও মুহ্য-মান হইয়া পড়িতেন না, বিপদে তিনি ধৈর্য হারাইতেন না, নিন্দা ভীতিপ্রদর্শনেও তাঁহাকে কিছুমাত্র টলাইতে পারিত না। তাহার কারণ ভগবানে তাঁহার চিত্ত অর্পিত হইয়াছিল—ব্রহ্মেতে তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছিল। তাহা না হইলে নোয়াখালির নৃশংস অত্যাচারের মধ্যে, বীভৎস পরিস্থিতির মধ্যে এই কর্ম-যোগী দিনের পর দিন করতালি দিয়া রামনাম করিয়া বেড়াইতে পারিতেন না।

রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতা রাম॥

এই রামনাম জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। আততায়ীর হস্তে গুলিবিদ্ধ হইয়া তিনি একমাত্র 'রাম' নামই করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ইচ্ছামৃত্যু, কতবার তিনি মৃত্যুবরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সুতরাং মৃত্যু তাঁহার নিকট কোনও বিভীষিকা লইয়া আসিতে পারে নাই। আমাদের এই লজ্জা, এই দুরন্ত অভিশাপ যে আমরা তাঁহার আদর্শকে বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ করিতেন না, এই সমত্ববুদ্ধির অপরাধে আমাদেরই একজন তাঁহার প্রাণ হরণ করিল।

**নিতাই সুন্দর**—কাঙ্গাল পঞ্চানন বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান রেলি ব্রাদার্স লিমিটেড, ১৬নং হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট অথবা শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

'নিতাই সুন্দর', 'শ্রীরাধা' ও 'শ্রীরাম সীতা' এই তিনখানি নাটিকা এবং 'গীতিপুষ্পাঞ্জলি' শীর্ষক কতকগুলি গীতি কবিতা এক সঙ্গে সংগ্রথিত। নাটিকাগুলি গীতি প্রধান। রচয়িতার প্রাণের আবেগ ও ভক্তিরস গীতগুলিকে মধুসিক্ত করিয়াছে। নাটিকাগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও উহাদের মাধুর্যে পাঠকগণের চিত্ত দ্রবীভূত করে। নাটিকাগুলি নবদ্বীপ মাধুরী সঙ্ঘ কর্তৃক অভিনয়ের জন্য রচিত ও উহাদের সাফল্য দৃষ্টে প্রকাশিত হয়। অভিনয়ে যে এগুলি দর্শকদিগকে অধিকতর আনন্দ দিতে সক্ষম হইবে একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থের বাঁধাই উত্তম। গৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক কয়েকখানি সুদৃশ্য ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চিত্র এবং নবদ্বীপ মাধুরী সঙ্ঘের কয়েকখানি আলোক চিত্র গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্ধিত করিয়াছে। ৭৪।৪৮

**যুগে যুগে**—শ্রীসিতাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এইচ চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য বারো আনা।

'যুগে যুগে' একখানি তিন অঙ্কের সংক্ষিপ্ত নাটিকা। প্রথম অঙ্কে সক্রেটিশ, দ্বিতীয় অঙ্কে যীশু খৃষ্ট এবং তৃতীয় অঙ্কে মহাত্মা গান্ধী—পৃথিবীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ তিনজন শহীদের আত্ম-বলিদানের কাহিনী সংলাপের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সংলাপের মধ্যে তাঁহাদের জীবন-বাণীও বেশ নিপুণভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। মলাটের ছবিখানা সুন্দর। ৯৭।৪৮

**সহজ যৌগিক ব্যায়াম**—শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—"উমাচল শাস্ত্র প্রকাশনী" ৬৮।১।১।১-কে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, [illegible]

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী সংসারী মানুষের উপকারার্থে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ভারতের মুনিঋষি সাধু সন্যাসীবৃন্দ যোগবলে অলৌকিক ও অচিন্তনীয় কার্যাদি সাধন করিয়া গিয়াছেন। দেহকে সাধন পথের উপযোগী করিবার জন্য তাঁহাদের নির্দেশিত বহু আসন মুদ্রাদি প্রচলিত আছে। এগুলি স্বভাবতঃই কষ্টসাধ্য এবং উপযুক্ত গুরুর নিকটে শিক্ষা সাপেক্ষ। ব্রহ্মচারী জীবনে এগুলি অবশ্যকরণীয়। অধুনা সংসার ধর্মী লোকের নিকটও বাঞ্ছনীয় বোধে এগুলির প্রচার হইতেছে। বিশেষ করিয়া তরুণদের দেহ কর্মঠ ও শক্ত সমর্থ করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য তাঁহাদের নিকট এগুলি সহজভাবে ব্যক্ত করার বিশেষ প্রয়োজন বর্তমান। আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষ যত্ন সহকারে সেই চেষ্টাই করা হইয়াছে। আসন ও মুদ্রার প্রায় সব কয়টিই চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উহাদের অনুশীলন সহজসাধ্য হইবে। এ সকল ছাড়াও যৌগিক শারীর তত্ত্ব এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশে বইটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বইখানা স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ কাজে আসিবে। ৭২।৪৮

**কাড়াকাড়ি**—শ্রীধীরেন বল প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

"কাড়াকাড়ি" চারিটি গল্পের সমষ্টি; 'মজার দেশে মানু', 'ভোলার ভেঁপু', 'মিমি' এবং 'ভাই ভাই।' প্রথম গল্পে স্বপনযোগে মানুর এক মজার দেশে প্রয়াণ ও সেখানকার রূপকথা রাজ্যে [illegible] গল্পে ভেঁপু আনিতে গিয়া ভোলার এক ছেলে-ধরার হাতে বন্দীত্ব ও মুক্তি এবং তৃতীয় গল্পে বিড়ালছানা হারাইয়া মিনুর বুক জোড়া বেদনাকে লেখক নিপুণভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তৃতীয় গল্পটি উপভোগ্য। তৃতীয় গল্পের প্রয়োজনে [illegible] দুই ভাই বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কান্না [illegible] করিল। শেষে তাহাদিগকে মিলিতে দেখিয়া তৃতীয় পক্ষ চম্পট দিল, ইহাই গল্পটির বিষয়বস্তু। ধীরেন বল সুপরিচিত শিল্পী। গল্পগুলিকে তিনি প্রাণ ভরিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। প্রতি পৃষ্ঠায় গল্পের কথা ও চিত্র একই সঙ্গে চলিয়াছে; পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন একখানা এলবাম দেখিয়া চলিয়াছি। বইটি আগাগোড়া দুই রঙা কালিতে ছাপা। রঙীন প্রচ্ছদ পট বেশ সুদৃশ্য। ইহা ছেলেদের বিশেষ লোভনীয় সামগ্রী হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। ৭৮।৪৮

**অগ্রণী**—সম্পাদক—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রফুল্ল রায়। কার্যালয়—১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য বার্ষিক ছয় টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা।

অগ্রণীর নব পর্যায় ১ম বর্ষ ১ম খণ্ডের ১ম (বৈশাখ) সংখ্যা আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। নানাবিধ গল্প ও কবিতায় সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। গল্পগুলি সুনির্বাচিত। কবিতাগুলি অত্যাধুনিক। প্রবন্ধ একেবারেই বর্জন করা হইয়াছে। ১০২।৪৮

**আগমনী**—শ্রীসুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত। কার্যালয়, ৫২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা দুই আনা।

'আগমনী' ছোটদের মাসিক পত্র। কেবলমাত্র ছোটদের লেখাই ইহাতে প্রকাশিত হয়। সুলভ মূল্যে শিশুদের মধ্যে সাহিত্য প্রচার এবং তাহাদিগকে সাহিত্য রচনায় আহ্বানই পত্রখানার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইল। এ উদ্দেশ্যের সাফল্য [illegible]

১০৭।৪৮

# মহতী বিনষ্টি

## শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ' নামে প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কৃতি আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ। প্রায় শতবর্ষকাল ধরিয়া বাঙালী মনীষিগণ কিভাবে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন তাহার আলোচনা হইয়াছে। বহির্জগতে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তাহার উত্তরাধিকারী বৃটিশ গভর্নমেণ্ট খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একটা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুরূপ একটা প্রক্রিয়া চলিতেছিল অন্তর্লোকে। বৃটিশ শাসক ও বাঙালী মনীষিগণ পরস্পরের পরিপূরকভাবে কাজ করিতেছিলেন।

এসব কথা এখন প্রাচীন ইতিহাসের না হইলেও পুরাতন অধ্যায়ের বিষয়, কারণ ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙা টুকরাগুলি সাজাইয়া একটা অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবী বৃটেন করিতে থাকে, করিতে পারে। অন্তত বস্তুটি যে দুর্লভ সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ সেই বস্তু ছাড়িয়া বৃটেন অপসৃত। এখন আমাদের হাতে আসিয়া ইহার কি পরিণাম হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। দুইটি সম্ভাবনা আছে। বৈদেশিক শাসকের বাহ্য চাপে যে অখণ্ডতা গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের আন্তরিক আগ্রহের স্পর্শে তাহা দৃঢ়তালাভ করিতে পারে। ইংরেজ ইঁটের পাঁজা মাত্র গড়িয়া দিয়াছে—একটা ইঁটের সহিত অপর ইষ্টক খণ্ডের অনিবার্য যোগস্থাপন করিতে পারে নাই, তবুও তাহার স্তূপীকৃত অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের হাতে পড়িয়া ইঁটের সহিত ইঁট আন্তরিকতার মশলায় গ্রথিত হইয়া সুখদুঃখের বাসযোগ্য সুদৃঢ় অট্টালিকায় পরিণত হইতে পারে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, আমাদের সংকীর্ণ দর্শনের ফলে পাঁজার ইঁটগুলি আবার মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়া ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অষ্টাদশ শতকের পুরাতন পালার পুনরভিনয় ঘটাইতে পারে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস এ দুয়ের কোন পথ অবলম্বন করিবে কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। এ যেমন গেল বাহিরের অখণ্ডতা, তেমনি ভিতরের অখণ্ডতা, যাহাকে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের চিন্ময় রূপ বলিয়াছি, তাহার সম্বন্ধেও চিন্তার সময় আসিয়াছে। বস্তুত বাহ্যরূপ ও অন্তরস্বরূপ দুটিই এক সূত্রে গ্রথিত কিম্বা একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। একটিতে ভাঙন ধরিলে অপরটির ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। বাঁচিলে দুটিই এক সঙ্গে বাঁচিবে, নতুবা দুটিরই এক সঙ্গে বিনষ্টি। দেশের সম্মিলিত মনীষা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার চরম পরীক্ষার ফলস্বরূপ সুফল বা কুফল সকলে ভোগ করিবে। সেই পরীক্ষার কাল আসন্ন। আর দেশের ভাবগতিকে আশঙ্কা হইতেছে, দুরদৃষ্টের প্রেরণায় আমরা একটা অবাঞ্ছনীয় পরিণামের মুখে ক্রমবর্ধিত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছি।

২

এবারে ভারতবর্ষের ভূগোলের ও ইতিহাসের কয়েকটি স্থূল তথ্যকে স্মরণ করাইয়া নিয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। সমুদ্র এবং পর্বতমালার দ্বারা পরিবেষ্টিত সুনির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড ভারতবর্ষ—একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ইহার পরিপূরক তথ্যটা সম্বন্ধে আমরা সব সময়ে সচেতন নই। সমুদ্র এবং পর্বত যেমন এদেশের কাঠামোটাকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তেমনি দেশাভ্যন্তরে গিরিমালা ও নদীপ্রবাহ ইহাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বিন্ধ্য গিরিমালা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। উত্তরাপথের ও দক্ষিণাপথের ভূগোল ও ইতিহাস স্বতন্ত্র। সিন্ধুনদ ও তাহার আনুষঙ্গিক নদীগুলি পাঞ্জাবকে একটি বিশেষ নদীময় উপত্যকায় পরিণত করিয়াছে। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী স্থান গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকা প্রদেশকে একটি বিশিষ্ট অংশ বলা যায়। আর সর্বশেষে রহিয়াছে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার (বস্তুত গঙ্গার) পলিপ্রবাহে সৃষ্ট নদীমাতৃক বঙ্গদেশ অঞ্চল। মোটের উপরে ভারতবর্ষের এই চারটিই প্রধান স্বতন্ত্র অংশ। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক অংশকে আবার নদীপ্রবাহের খেয়াল অনুসারে, যেখানে পাহাড় আছে তাহার অবস্থান অনুসারে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত বলিয়া দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই—ইহাতেই আমাদের কাজ চলিবে। এই ভাগ প্রকৃতিকৃত ভাগ, মানুষের হাত নাই। বরঞ্চ বলা চলে যে, প্রকৃতিকৃত এই ভাগের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই মানুষ তাহার ইতিহাস রচনা করিয়া তুলিয়াছে। ভূগোলের ক্ষেত্রে দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ সং ভারতবর্ষে সন্নিহিত। একটি পৃথিবী অন্যান্য দেশ হইতে বিশেষভাবে পৃথগীকৃ একটি ভূখণ্ড ভারতবর্ষ। দ্বিতীয়টি, এ সুবৃহৎ দেশটিও আবার নদী ও গিরিমাল খেয়ালে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত

এখন এই দুইটি ভৌগোলিক সত্যে প্রেরণায় এদেশের ইতিহাসও যেন দ্বৈতগতি যেন পরস্পর-বিরুদ্ধ গতি লাভ করিয়াছে পৌরাণিককাল হইতে এদেশের সমুদয় অংশে সংহত, সংযুক্ত করিয়া 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠা প্রয়াস যেমন চলিয়া আসিতেছে, তেমনি আব সেই প্রয়াস দুর্বল হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া যাইবার প্রেরণাও দেখা দিয়াছে। ভারত বর্ষের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য তাহার এ দ্বৈতগতি, একদিকে অখণ্ডতা সৃষ্টি, অপরদিকে ভঙ্গুর-প্রবণতা। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি টানাটানির ফলাফল—ভারতবর্ষের ইতিহাস।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের শিক্ষা আমাদে বলিয়া দেয় যে, অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এদেশের শান্তি বহুবার মহৎ সার্থকতালা করিয়াছে। সেই ইতিহাস আরও বলে ভারতবর্ষের অংশসমূহের ভঙ্গুর-প্রবণতা ভঙ্গুরতেই এদেশের সর্বপ্রকার সর্বনাশের মূ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ নানা নামের মে দেখাইয়া, নজির উত্থাপন করিয়া, না অজুহাতে এদেশকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি চাহিয়াছে, অনেক সময়েই পারিয়াছে—অ যত প্রকার দুঃখ দুর্দশা সমস্তই সেই ভাঙনে ফাটলে আমাদের ইতিহাসে প্রবেশ করিয়াছে ইতিহাসের এই শিক্ষা যদি সত্য হয়, তবে দে যাহাতে খণ্ড না হইয়া পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

এবারে ইতিহাসের মূল তথ্য কয়েক দেখা যাক। ঐতিহাসিককালে এদেশে কতব সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তির দেশব্যাপী শাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথমবার বলা যাইতে পারে মৌর্য সম্রাটে আমলে। তারপরে গুপ্ত সম্রাটগণের পর হর্ষবর্ধনের শাসনকে পূর্বোক্ত দুই পর্বের মত শক্তিশালী ও বহুব্যাপক বলা চলে কি সন্দেহ। তারপরে পাঠানদের আমল। শাহের প্রচুর পরিমাণে উচ্চাঙ্গের শাসন প্রতি ছিল বটে—কিন্তু তাহা ব্যাপক বাস্তব স্থায়ীরূপ লাভ করিতে পারে নাই। মোগ সম্রাটগণের সময়ে অর্থাৎ আকবরের স হইতে আলমগীরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত দে ব্যাপী সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি বলিতে পারা যায়। তারপরেই আবার ভাঙ শুরু। যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাঙি পড়িল। আলমগীরের মৃত্যু ১৭০৭ সা

পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ সাল। এ দুই ঘটনার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের দূরত্ব। পলাশীর যুদ্ধের কামান গর্জন মোগল সাম্রাজ্যের সমাধির ঘণ্টাধ্বনি, আবার তাহা কেন্দ্রীয় শাসনের পতনের শব্দও বটে। এবারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল আরম্ভ হইল। ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষ যেমন একচ্ছত্র হইল—এমন খুব সম্ভব পূর্বে আর হয় নাই। অবশ্য এ যুগের রেল টেলিগ্রাফ প্রভৃতি শাসনকর্তাদের যে সুবিধা দিয়াছিল আগেকার শাসকগণ তেমন পান নাই। কিন্তু এই একচ্ছত্র শাসনের আয়ুষ্কালের পরিমাণ কত? ১৮৫৭ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ধরা উচিত। মাত্র নব্বই বৎসর।

ইংরাজ বিদায়ে একটা যুগ শেষ হইল—কেন্দ্রীয় শাসনের, অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার যুগ। এবারে যে যুগ আসন্ন তাহার বিশেষ ধর্ম কি? প্রত্যেক কেন্দ্রীয় শাসনের অবসানে একটা সুদীর্ঘকাল স্থায়ী ভঙ্গুরতার যুগ আসিয়াছে—এবারে কি আসিবে? ভঙ্গুরতার যুগ দেশের সর্বনাশের কারণ হইয়াছে। এবারেও কি তাহাই ঘটিবে? ভঙ্গুরতার যুগে বহিরাক্রমণ ঘটিয়াছে—এবারে কি তাহার ব্যতিক্রম হইবে? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে কিম্বা ঐতিহাসিকগণ পুনরাবৃত্তি করিয়া মরেন, কোনটা সত্য? অথবা ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের সতর্ক করিয়া দিবে, আমরা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দিব না, ইংরাজ কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান ঘটিয়াছে বলিয়াই ভঙ্গুরতার যুগ আরম্ভ হইবে না, সুদৃঢ়তর, ব্যাপকতর, কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে—ইহাই আশা করা যাক্। আশা করিতে ক্ষতি কি? আশা বাস্তবের জননী।

৩

আশা করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু আশার লক্ষণ বড় দেখিতে পাইতেছি না, বরঞ্চ বিপরীত লক্ষণগুলিই অত্যন্ত অশোভনভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতেছি যে, মানুষের মন প্রাদেশিক সত্তা সম্বন্ধে যেমন সচেতন, ভারত সত্তার প্রতি তেমনি অবজ্ঞাপূর্ণ, দেখিতেছি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্বন্ধে সে একান্ত উদাসীন। ভারতবাসী যেন রাতারাতি প্রদেশবাসী হইয়া পড়িয়াছে। প্রাদেশিকতার ভূত অল্পবিস্তর সমস্ত প্রদেশকেই পাইয়া বসিয়াছে, কেহই সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। প্রদেশগুলির পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-প্রত্যাভিযোগের আর অন্ত নাই।

বাঙলাদেশ বিহারান্তর্গত বাঙলার অংশগুলিকে ফিরিয়া চাহিলে বিহার বলে, বাঙালী বড়ই প্রাদেশিক। কিন্তু সেই বিহার যখন উড়িষ্যার অন্তর্গত সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান নিজের ভাগে টানিয়া লইতে চায় তখন প্রাদেশিকতার গ্লানি আর সে অনুভব করে না। আসামের ইচ্ছা কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয় তাহার সীমানার অন্তর্ভুক্ত হোক। প্রত্যেক প্রদেশের দাবীর খতিয়ান খুলিলে দেখা যাইবে দাবী অনন্ত। আর সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কথা এই যে, প্রত্যেক প্রদেশ নিজেকে ভারত-নিরপেক্ষভাবে কল্পনা করিতে শুরু করিয়াছে।

কেন এমন হইল? প্রথম কারণ এই যে, ভারত-চৈতন্য আমাদের মজ্জাগত হইবার অবসর পায় নাই। ইংরাজ রাজত্ব বাহির হইতে একটা ঐক্যের কাঠামো সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাহ্য ঐক্য অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিতে যে-সময়ের প্রয়োজন সে-সময় পাওয়া যায় নাই। বৃটিশ শাসিত ভারতীয় ঐক্যের স্থায়িত্ব মাত্র নব্বই বৎসর। ইহার তুলনায় মোগল শাসিত ভারতীয় ঐক্যের স্থায়িত্বকাল অনেক বেশি, কম করিয়া দেড়শত বৎসর হইবে। ইংরেজ বিদ্বেষ এবং ইংরেজ তাড়াইবার উৎসাহে এতকাল প্রদেশগুলি পরস্পর সংযুক্ত ছিল—ইংরেজ চলিয়া যাওয়া মাত্র, বাহিরের বন্ধন সূত্র ছিন্ন হওয়া মাত্র, ছিন্নসূত্র তোড়ার মতো ফুলগুলি আলাদা হইয়া খুলিয়া পড়িয়াছে।

বাঙালী যেমন সর্বভারতীয়তা বোধের সার, তেমনি বাঙালীই আবার নূতন প্রাদেশিকতা বোধেরও গুরু। ইংরাজি শিক্ষার সুফল এবং কুফল দুইয়েরই চরম বাঙলাদেশে ফলিয়াছে। ইতিপূর্বে সর্বভারতীয়তাবোধের উল্লেখ কিভাবে হইল সে কথা বলিয়াছি—এবার সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে কিভাবে প্রাদেশিকতাবোধের সূচনা দেখা দিল।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে একটা মোড় ঘুরিবার স্থান। তৎপূর্বে আমাদের চিন্তার মাধ্যম ছিল ভারতবর্ষ। কিন্তু ভাঙা বাঙলাকে জোড়া লাগাইবার কর্মসূচী গ্রহণ করিবার পরে কখন্ অগোচরে আমাদের চিন্তার মাধ্যম হইয়া দাঁড়াইল বাঙলা দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ। কার্জনের এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ভাঙা বাঙলা আবার জোড়া লাগিল—কিন্তু আর এক উপায়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে কার্জনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, ভারতবোধে ফাটল দেখা দিল। এই সময় হইতেই প্রাদেশিকতা বোধের সূচনা।

অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতাবোধ স্থায়ীভাবে মাথা তুলিল ১৯৩৫ সালের শাসন-তন্ত্র অনুসারে প্রদেশ শাসনের সময় হইতে। ওই ব্যাপারটার নামই যে 'Provincial Autonomy', 'প্রাদেশিক আত্মপ্রতিষ্ঠা।' এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশের ব্যক্তিগত মর্যাদাকে আচ্ছা করিয়া উস্কাইয়া দেওয়া হইল। সকলেই স্ব স্ব তন্ত্র এবং স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল। প্রাদেশিকতাবোধের ক্ষেত্রেও বাঙলাদেশ অন্যান্য প্রদেশ হইতে ত্রিশ বৎসর আগাইয়া আছে। 'বাঙলাদেশ আজ যাহা চিন্তা করে—বাকি ভারতবর্ষ আগামীকাল তাহা চিন্তা করিবে।' এই বাণী আজকার নূতন পরিস্থিতিতেও সত্য।

এখন নূতন শাসনতন্ত্রে Residuary Power যদি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে তবেই রক্ষা, আর যদি সেই অনির্দিষ্ট এবং অপরিমিত ক্ষমতা বিবদমান, পরশ্রীকাতর প্রদেশগুলির হাতে পড়ে তবেই চমৎকার! ভাব-ভারতবর্ষ ও বাস্তব ভারতবর্ষ দুইই একসঙ্গে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। যাহা গড়িয়া তুলিতে এক শতাব্দী লাগিয়াছিল সামান্য কয়েক বৎসরেই তাহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। তারপর? তারপর বৈদেশিক আক্রমণ! প্রদেশগুলির মধ্যে হানাহানি, এবং নূতন পরাধীনতা! এইসব কথা স্মরণ করিয়াই গান্ধীজী বলিয়াছিলেন সকলেই যদি স্ব স্ব প্রদেশের পক্ষে হয়, তবে ভারতবর্ষের পক্ষে কে? —কেহই নয়। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—এইভাবে চলিতে থাকিলে বৈদেশিক নূতন করিয়া এদেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে!

আমরা কোন্ পথে চলিয়াছি? চক্ষু অন্ধ তাই ভয় পাইতেছি না বটে—কিন্তু সেইজন্যই যে ভয়ের কারণ আরও বেশি! রাজনৈতিক ভারতবর্ষের অখণ্ড মূর্তি এবং ভাব-ভারতবর্ষ দুই-ই আজ ভাঙিয়া পড়িবার মুখে! আর আমরা অন্তরে বাহিরে অন্ধ। একথা কাহাকে বুঝাইব? কে বুঝিবে? সকলেই যে আজ মন্ত্রী বা কনসাল হইবার জন্য ব্যগ্র। ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করিবার সময় আজ কোথায়? কিন্তু কেহই আজ বুঝিতে পারিতেছে না, যে ডাল-খানায় সে উপবিষ্ট তাহাই আজ সে ছেদন করিতেছে। ভারতের সংহতি নষ্ট হইলে, ভারতবর্ষ দুর্বল হইয়া পড়িলে কেবল বাঙালী বলিয়া, অথবা বিহারী বা গুজরাটী বলিয়া আমরা পৃথিবীতে কখনই প্রতিষ্ঠা পাইব না। আর ভারতবর্ষ যদি অবহেলিত হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায় তবে পৃথিবীর সম্মুখে কোন্ সম্পদ হাতে লইয়া দাঁড়াইবে? ঘরে বাহিরে আমাদের মাথা হেট হইয়া পড়িবার আয়োজন শুরু হইয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর কীর্তিকে ধূলিসাৎ করিয়া নিজের আগ্রহে আধুনিক বাঙালী মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলাদেশে এখন উল্টো রথের পালা। উল্টো রথের দিনে সোজা কথাটাকেই বাঁকা লাগে—কাজেই এসব কথা, এখন কাহারো ভালো লাগিবার নয়। যে দু'চারজন এই পন্থায় চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিস্তেজ তটস্থ হইয়া তাঁহারা সমস্ত লক্ষ্য করিতেছেন আর ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্নতর হইয়া উঠিতেছিল—তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, আমাদের সম্মুখে একটিমাত্র পরিণাম, সে পরিণাম—মহতী বিনষ্টি।

# আদিম

## শ্রীধ্রুব চট্টোপাধ্যায়

আগুনের ফুলকির মত ছড়িয়ে পড়লো খবরটা। জমিদার বাড়ির বাবুরা দশ-বছর পরে গাঁয়ে এসেছেন। তখন বারোয়ারী পুজোর মেলায় সরগরম হয়ে আছে আবহাওয়া। আশেপাশের গাঁ উজোড় করে ঝেঁটিয়ে লোক এসেছে। মেলায় হরেক রকম খেলনা আসে, ময়ূরের দোকান বসে, বঁটি-কাটারীর দোকান বসে, অঢেল সবুজ ডাবের স্তূপ দেখা যায়, গাছের তলায়। সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়ো সবই আসে, আরও আসে তারা যাদের মেলা জমে দিনের পাট বন্ধ হলে। কিন্তু এবারের মেলার সবচেয়ে মুখরোচক আলোচনা চৌধুরী-পরিবার। বড়বাবুর বড়ছেলের বৌ শ্রীজাতা একলাই ছোট্ট গ্রামখানাকে তোলপাড় করে দিয়েছে। ডায়োসেসান থেকে ডিস্‌টিংসন নিয়ে পাশ করা মেয়ে, একেবারে উগ্র আধুনিকা, চোখ ঝলসানো রূপ। গাঁয়ের প্রত্যেকের বাড়িতে একবার কোরে পদধূলি দিয়েছে, অর্থ দিয়ে অনর্থ ঘটিয়ে অনেককে বেসামাল কোরেছে, প্রেম-বন্তী উন্নয়নের জন্য পাকা স্কীম তৈরী কোরেছে, বারোয়ারী-তলায় মাটির চণ্ডীমণ্ডপ বাঁধিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শ্রীজাতা গায়ে গা ঠেকিয়ে কথা বলে, যাত্রা-পার্টীর মহড়া দেখতে যায়, পার্ট দেখিয়ে দেয়। গ্রাম দুলে উঠলো মেলা উঠলো ফুলে।

বাড়ির সামনের মাঠে ইজিচেয়ারে বসে রাইফেল পরিষ্কার কোরছিলো অবিজিৎ। পাশে ছোট্ট একটা কাঁচের মাথাওয়ালা পেগ্‌ টেবিল। ওপরে সিগারেটের একটা টিন, এক বোতল ক্যানাডিয়ান হুইস্কি, ছোট একটা গ্লাস। ককটেল স্পেশালিস্ট নেপালী ভৃত্য মানবাহাদুর কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে নরম স্পর্শ অনুভব করলো অবিজিৎ। চোখ তুলে তাকায়। বুনোপাড়ার মহীন্দরের মেয়ে কাজরী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

'তুমি কে?'—অবিজিৎ প্রশ্ন করে।

—'তোমার প্রজা মহীন্দরের বেটী, আমি কাজরী।'

—'হুঁ'—রাইফেলটা পাশে কাৎ কোরে নামিয়ে রাখে অবিজিৎ, বলে—'তা কি দরকার তোর?'

—'মেলায় এসেছিলাম, তাই......' কাজরী ঘাসের ওপর বসে পড়ে......'বাবুদের আমি কখনও দেখিনি—।' কিছুক্ষণ চুপ কোরে থাকে অবিজিৎ। একটা সিগারেট ধরিয়ে পা তুলে দেয় ছোট্ট টেবিলটার ওপর।

'তোমরা শিকারে যাবে?' কাজরী প্রশ্ন করে, বলে—'কাঁটাবাগানে বাঘ বেরিয়েছে, মস্ত কুঁদো বাঘ, দুটো জোয়ানকে ঘায়েল করেছে,'—কাজরীর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে।

—'ম্যান-ইটার?' টেবিল থেকে পা নাবিয়ে সোজা হয়ে বসে অবিজিৎ, বলে, 'তোদের বশোর জেলায় মানুষ খেকো বাঘ আছে নাকি?'

—'না, চিতে, মানুষকে ঘায়েল কোরেছে কিন্তু! শিকারে যাবে?'

—'তুই কি সাঁওতাল?' অবিজিৎ প্রশ্ন করে।

—'জানি না'—ঠোঁট উল্টে কাজরী উত্তর দেয়, বলে—'আমরা বাঙ্গালী হয়ে গেছি। —কই বলো?' —অবিজিতের পা দুটো ধরে নাড়া দেয় সে। বোতল গ্লাস গুছিয়ে মান-বাহাদুর বাড়ির ভেতর চলে গেল। বোঝে কোন সময়ে তার অনুপস্থিতিই প্রভুর কাম্য। অবিজিৎ স্থির দৃষ্টিতে কাজরীর দিকে তাকায়। কালো কষ্টিপাথরে গড়া দেহ, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরা নদীর মত টলমল কোরেছে, অসংলগ্ন সঙ্গীতের রহস্যময় আকর্ষণ।

—'তোর বিয়ে হয়েছে?'—অবিজিৎ প্রশ্ন করে।

—'বিহা?' —ঘাসের ওপর লুটোপুটি খায় কাজরী,—উত্তর দেয়, 'আমাকে বিহা করবার মতো জোয়ান কই?'

*  *  *  *

পদ্মপুকুর হলেও যৌবনে সরোবর ছিল, পদ্ম না ফুটলেও আপাততঃ শালুক ফোটে অজস্র। পুকুরের চারটে পাড় আম-জাম-খেজুর গাছে ভর্তি। খণ্ড খণ্ড বনেদীআনার ভাঙ্গা-চোরা প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়। ইঁট-বের-করা ঘাট দুটো ঘোষণা কোরছে এর স্বাস্থ্যের কথা। ভুবন্তে-বোম্বাই আমগাছে লটকানো আছে বিবর্ণ রঙ্গের একটা নোটিশ। মাত্র কয়েকটা কথা পড়া যায়।—'দায়রায় সোপর্দ করা হইবে'—ইত্যাদি। অনুমানে বোঝা যায় মালিক পুকুরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে আইনের ভয় দেখিয়ে সাধারণকে সাবধান করেছিলেন। আপাততঃ স্কুলপাঠ্য পুস্তকের' গ্রামের পুষ্করিণীর অবস্থার মত রূপ ধারণ করেছে। বেশ ঠাণ্ডা, নির্জন, কবিমনের উপযুক্ত স্থান। কয়েকটি গ্রামাবধূ জল নিতে এসে ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে সঞ্জয়কে সুযোগ দিয়ে সরে পড়েছে। অবিজিতের বন্ধু সঞ্জয় শ্রীজাতাকে নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে তথা শিকারে বেরিয়েছিলো। পেতনির-বিলে একটা জোঁক তাদের তীব্রভাবে আক্রমণ করায় সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করে ওরা এসে উঠেছে এই পুকুরের ধারে। কার্টিজের থলেটা মাথার দিয়ে শ্রীজাতা শ্যাওলা-ধরা রানার ওপর শুয়েছিল, পাশে বসে সঞ্জয়।

—'আমার উত্তরটা কিন্তু এখনও পেলাম না শ্রী'—সীতারামের সুরে সঞ্জয় বলে।

—'তুমি আমায় ভালবাসো, এইতো?' চোখ বুজে শ্রীজাতা উত্তর দেয়—'বেশতো বাসো না, আমার আপত্তি নেই।'

—'কিন্তু এইখান থেকেই যে আমার বক্তব্য শুরু,—' সঞ্জয় বলে 'ভাল কথা একটা টফিও তুমি খেলে না। খাবে?'

—'দাও।' ছোট্ট হাঁ করে শ্রীজাতা। চার চৌকো কোকোর টুকরো ধন্য হোল। সঞ্জয় বলে—'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমাদের দেশে ভালবাসি বলার পরেই প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে, হয় পাকাপাকি নয় ছাড়াছাড়ি; কিন্তু ওদের দেশে এই ভালবাসি বলার পরেই মূল নাটক আরম্ভ হয়।'

—'বুঝলাম তুমি ওদেশের লোক অথবা ওদের অনুসরণ করো—' শ্রীজাতা উত্তর দেয়, বলে, 'এখন তোমার প্রেমের আল্টিমেট এমটা কি তাই বলো।' শ্রীজাতা চোখ খুলে সোজা দৃষ্টিতে তাকায় সঞ্জয়ের মুখের দিকে। মুহূর্তের জন্য সঞ্জয় থেমে যায়, একটু হেসে ওঠে। হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে শ্রীজাতা, বলে—'চাইনিজ ডাক্‌! শিগ্‌গির একটা চারনম্বর কাইনক দাওতো!' ব্রীজ দুমড়ে গুলী ভরলো শ্রীজাতা। হাতের টিপ ভালো। নারকেল গাছের ওপর থেকে সবুজ রঙের পাখীটা সশব্দে জলের ওপর পড়লো। সঞ্জয়ের হাতে বন্দুকটা দিয়ে জলকাদা ভেঙে ছুটে যায় শ্রীজাতা। কার্টিজের খোলটা বার করে সঞ্জয়। একরাশ ধোঁয়া জমা হয় চোখের সামনে।

*  *  *  *  *

ইতিমধ্যে ওদের আলাপ বেশ জমে উঠেছে। কাজরী অকপটে স্বীকার কোরেছে অবিজিৎকে তার খুব ভাল লাগে। দূর থেকে শ্রীজাতার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সোমালি-ল্যাণ্ডের তরুণ মেষপালককে সুর করে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছে। তেঁতুলগাছের তলায় ওদের দুজনকে দেখা যায়। একটু তফাতে সরে বসে কাজরী। হো হো করে হেসে ওঠে অবিজিৎ।

—'শিকারটা দেখো—।' অবিজিতের চোখের ওপর রক্তাক্ত পাখীটাকে তুলে ধরে শ্রীজাতা, বলে, 'চার্মিং! না?' মানবাহাদুর এসে দাঁড়িয়েছিলো, তার বুকের ওপর মরা ঘুঘুটাকে ছুঁড়ে দেয়।

—'তুই কেরে?' পাশের চেয়ারটায় বসে কাজরীকে প্রশ্ন করে শ্রীজাতা।

—'আমি কাজরী। মহীন্দরের বেটী—' একটু নড়ে চড়ে বসে উত্তর দেয় সে।

—'প্রিটি!' সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে চোখ নাচায় শ্রীজাতা, অবিজিতের দিকে চেয়ে বলে, 'তোমার তাহলে সময়টা ভালই কাটলো—কি বলো?'

—'কই আর কাটলো?' হাই তুলে অবিজিৎ জবাব দেয়—'তোমরা বড় অসময়ে ফিরে এলে।'

—'এই—' কাজরীর গায়ে পা ঠেকিয়ে শ্রীজাতা বলে—'বাবুকে তোর পছন্দ হয়?'

বুনো মেয়ে লজ্জা পেয়ে নখ দিয়ে মাটিতে আঁচর কাটে।

—'তুই কি জন্য এসেছিস্?'

—'ও একজন বিটার।' অবিজিৎ উত্তর দেয়, বলে,—'কাঁটা-বাগানে বাঘ বেরিয়েছে, উৎপাত করছে, ও তাই জানতে এসেছে আমাদের বন্দুকে বাঘ মারা যায় কি না।'

—'হ্যাঁ'—অবিজিৎকে সমর্থন করে কাজরী বলে ওঠে—'ওবারে দুজন বাবু এসেছিলো, তাদের বন্দুকে কাদাখোঁচা মরে।'

—'বেশতো চলো না—' শ্রীজাতা সায় দিয়ে বলে 'বিগ্-গেমের সৌভাগ্য কখনও হয়নি। আমি কিন্তু নূতন স্যাভেজ রাইফেলটা চালাবো।'

—'তোমার হাতে বেমানান হবে না—' অবিজিৎ উত্তর দেয়। শ্রীজাতা চটে ওঠে, দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে, বলে—'তার মানে?'

—'মানে খাঁটি পুরুষ-নারী সবাই স্যাভেজ—' গভীর গলায় অবিজিৎ উত্তর দেয়।

—'শ্রীজাতা রাইফেলের কথা বলছে—' সঞ্জয় অবিজিৎকে সচেতন করে দেয়। তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসে অবিজিৎ, বলে—'যারা রাইফেল চালায় আমি তাদের কথা বলছি।' শিকারের কথা পাকা হয়ে গেল। কাজরী উঠে দাঁড়ায়, কথা দিয়ে যায় আগামী পরশুর মধ্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু বন্দোবস্ত করে রাখবে। এক ধামা ফলমূল নিয়ে অর্ধ-নগ্ন দেহে গাঁয়ের এক ব্রাহ্মণ সন্তান সামনে এসে দাঁড়ায়।

—"আপনি?"—অবিজিৎ প্রশ্ন করে।

—'আজ্ঞে আমি গাঁয়ের পুরুত উমাপদ ভশ্চায্যি' সবিনয়ে লোকটি বলে 'আপনার পিতা নীলাদ্রি চৌধুরী আমাকে চিনতেন।'

—'বটে?' সামনের দিকে মাথাটা খানিকটা ঝুঁকিয়ে অবিজিৎ বলে, 'তা ওগুলো কি?'—ধামার দিকে আঙুল দেখায় সে।

—'আজ্ঞে ও আমার বাগানের সামান্য ফলমূল' ভশ্চায্যি উত্তর দেয় 'আপনারা জমিদার মানুষ......।'

—"তবে—" শ্রীজাতা বলে ওঠে "এ জমিদারীকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ—" উমাপদ শ্রীজাতার কথা টেনে বলে, "এ জমিদারীতে আপনাদের অনেক কিছু আছে। কেউ আসেন না, সবই পাঁচ ভূতে খাচ্ছে।......"

—"মানুষ না খেলেই হোল—কি বলো শ্রীজাতা?"—হেসে বলে অবিজিৎ।

—"আপনারা কি বাঘ শিকারে যাবেন?" উমাপদ প্রশ্ন করে।

—"মশাই কি অন্তর্যামী নাকি?" সঞ্জয় টিপ্পনী কাটে।

—"কাজরীর কাছে শুনলাম—" ভশ্চায্যি উত্তর দেয়।

—"আচ্ছা, ওরা কি জাত বলুন তো?" অবিজিৎ প্রশ্ন করে।

—"জাতে ওরা সাঁওতাল। তবে একশ' বছরের বেশী এই বাঙলায় থেকে পাকা বাঙালী হয়ে গেছে"—ভশ্চায্যি উত্তর দেয়।

—"তা ছাড়া, জাত নিয়েই বা কি হবে?" শ্রীজাতা বিদ্রূপের সুরে বলে—"After all she is a girl!"

—"তুমি তাহলে ঠিক বোঝ দেখছি একমাত্র কোন কারণে নারীকে প্রয়োজন"—তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে অবিজিৎ।

—"নারীর চেয়ে পুরুষকেই আমি বেশী বুঝি"—ঝাঁঝালো স্বরে শ্রীজাতা উত্তর দেয়।

—"বুঝবে বইকি"—হেসে অবিজিৎ বলে—"পুরুষকে নিয়েই তো তোমার experiment!" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে, উমাপদকে বলে—"আপনি তাহলে এখন আসুন।" লজ্জিত ব্যস্তভাবে উমাপদ বলে—"আমার কাজ হয়ে গেছে। তবে একটা অনুরোধ ছিল।"—......জিজ্ঞাসু নেত্রে অবিজিৎ তাকায়।—উমাপদ বলে, "সন্ধ্যার পর মেলায় আসবেন কিন্তু! গাঁয়ের পুরোনো মেলা—তাছাড়া যুদ্ধের পর এবার বেশ ভালই হয়েছে—।"

—"মানুষের মেলা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে"—শ্রীজাতা বলে ওঠে—"আমি যাব,—আপনি আসবেন।"

—"আমিও যাব।"—সঞ্জয় বলে।

"তা মন্দ নয়—" অবিজিৎ সায় দিয়ে ওঠে, "নির্ভেজাল! খাঁটি শিকারও মিলতে পারে,—কি বলো সঞ্জয়?" সশব্দে হেসে ওঠে সে।

*　　*　　*　　*

সত্যই মেলাটা ভালো হয়েছে এবার। ঘুরে ঘুরে ওরা সব কিছু দেখলো। সবচেয়ে আশ্চর্য সমস্ত গ্রামকে বিস্মিত করে দিয়ে, বিক্রেতাকে ধন্য কোরে শ্রীজাতা চার পয়সার ফুলুরি খেয়ে ফেললো। Grand Indian Circus-এর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তাঁবু পড়েছে বাগদী-পাড়ার মাঠে। গেটের মুখেই বাঁশ দিয়ে বাঁধা একটা মাচা, দুটো পাশ বালিসের খোল পড়ে, মাথায় রঙিন রুমাল বেঁধে ম্যাজিক দেখাচ্ছিলো সার্কাসের একটা ক্লাউন। শ্রীজাতা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে!

—"আইয়ে মেমসাব — আইয়ে, — আসলি সিংহী আছে, বাঘ আছে—" দাঁত বের কোরে আহ্বান জানায় ক্লাউনটা।

—"যাবে—?" শ্রীজাতা জিজ্ঞাসা করে অবিজিৎকে।

—"চলো—।"—পাঁচ আনার 'ক্লাস-কেলাসে' বসে ওরা অনেকক্ষণ ধরে সার্কাস দেখলো। কয়েকটা কুৎসিৎ যুবতী-মেয়ে, আঁট-সাঁট পোষাক পরে, সর্বাঙ্গে রঙ-মেখে দড়ির ওপর নাচছিল তখন। কিন্তু সবাই দেখছিলো শ্রীজাতাকে। তার উচ্ছৃঙ্খল ধারালো হাসির শব্দে আফিংখোর বাঘটা বারকয়েক হাঁক ছেড়েছিলো, ফলে ভীড়টা অভাবনীয় ভাবে বেড়ে যায়। সার্কাস দেখে বেরিয়ে পড়ে ওরা,—বাড়ির পথে পা বাড়ায়। উমাপদ ভশ্চায্যি সঙ্গেই ছিলেন, জিজ্ঞাসা করেন—"এবার তাহলে ফিরবেন?"

—"ওদিকটা তো দেখা হোল না?"—হাত তুলে বাঁ দিকের অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গাটা দেখায় অবিজিৎ। খানকয়েক নতুন ঘর বাঁধা হয়েছে সেখানে। ঘর মানে মাটির মেঝে আর খড়ের চালা, দেওয়ালের বালাই নেই। কয়েকটি জীব ওদের এদিকে আসতে দেখে কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। তারপর কি মনে করে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়। ওরা আরও একটু এগিয়ে আসে।

—"মনে হচ্ছে, এদের সার্কাস আরও পরে আরম্ভ হবে—" সঞ্জয় মন্তব্য করে। ঘরের মধ্যে বিচুলির গাদার ওপরে ছেঁড়া সতরঞ্চি পাতা, আলোর বালাই নেই, আব্রুর প্রয়োজন নেই, অন্ধকারই এদের পর্দা।

—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" সঞ্জয় প্রশ্ন করে। অবিজিৎ যেন একটু চমকে ওঠে, বলে —"না, ভাবছিলাম, আমার বোধ হয় এখন বাড়ি যাওয়া হবে না।—একটু কাজ আছে।" শ্রীজাতা ঠোঁট টিপে তাকায় স্বামীর দিকে। সঞ্জয়ের হাত ধরে টেনে বলে "চলো এসো"। ওরা এগিয়ে যায়। অবিজিৎ উমাপদকে জিজ্ঞাসা করে, "বুনোপাড়াটা কোন দিকে হবে?"

—"এত রাত্রে সেখানে যাবেন—?"

—"হ্যাঁ—কোন দিকে হবে—?"—পথটা দেখিয়ে দেয় উমাপদ। অন্ধকারের বুক চিরে অবিজিতের হাতের হান্টিং টর্চটা জ্বলে উঠলো। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে যায়।

*　　*　　*　　*　　*

সমস্ত গাঁয়ে যেন ঢেঁড়া পেটানো হোলো। অবিজিৎ কাল সারারাত বুনোপাড়ায় কাটিয়েছে। ছোকরারা শ্রীজাতার সৌন্দর্যের কথা [illegible] বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা। শ্রীজাতা অবিশ্যি জানে, অবিজিৎ শেষ রাত্রে [illegible] ফিরেছে—তবে একটু অসংযতভাবে,—একটু উত্তেজিত হয়ে। ক্ষতি নেই। সে মনে [illegible] খাঁটি বাঙালী নয়—এসব কথায় কান দেয় না। সঞ্জয় যখন বলতে এসেছিল, উত্তর দিয়েছে "এটা আমার কাছে নতুন খবর নয় সঞ্জয়, [illegible] অভ্যস্ত, শুধু অভ্যস্ত নয়—বুদ্ধিমান।" [illegible] সঞ্জয়ের একটা কথা তাকে কিছুটা উত্তেজিত কোরেছিলো, মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্য [illegible]

মনটা নড়ে উঠেছিলো। কাজরী নাকি শ্রীজাতাকে হারিয়ে দিয়েছিলো। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মনকে সংযত করেছিল, কাজরীর সম্বন্ধে বেশী ভেবে তাকে প্রাধান্য দেয়নি আর।

সন্ধ্যাবেলায় বাইরের ঘরে ক্যাম্প-খাটের ওপর শুয়ে বাতি জেবলে ইংরাজী উপন্যাস পড়ছিলো অবিজিৎ। শ্রীজাতা ঘরে এসে ঢোকে। ধপ কোরে অবিজিতের মাথার কাছে বসে পড়ে। দেহের ওজনের আপেক্ষিক আধিক্যে খাটটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করে ওঠে। চমকে ওঠে অবিজিৎ।

—"কি পড়ছো?" স্বামীর মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে শ্রীজাতা জিজ্ঞাসা করে।

—"এমনি একটা সাধারণ উপন্যাস—"—অবিজিৎ উত্তর দেয়।

—"শুতে যাবে না?" অবিজিতের কপালের ওপর মাথা রেখে শ্রীজাতা জড়ান স্বরে বলে।

—"একটু পরে—"—অবিজিৎ উত্তর দেয়—বলে,—"হুইস্কিটা একটু পাঞ্চ কোরে দাও না।"

—"না"—মাথা না তুলে শ্রীজাতা উত্তর দেয়, বলে,—"রাতদিন ওসব আমার ভাল লাগে না।" অবিজিৎ চমকে উঠলো। হাতের ওপর ভর দিয়ে দেহটা তুলে বলে,—"তোমার মুখে একথা?"—

"এক-ঘেয়েমি আমি ভালবাসি না—" শ্রীজাতা উত্তর দেয়।

—"বেশ তাহলে এবার গাঁজাই ধরবো।"—অবিজিৎ ঠাট্টা করে।

—"না—কথা নয়—শুতে চলো—" এক ফুঁয়ে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অবিজিতের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে শ্রীজাতা। গভীর আবেশে স্বামীর দেহটা জড়িয়ে ধরে।

—"কিন্তু একজনের যে আসবার কথা আছে?" গম্ভীর গলায় অবিজিৎ বলে। শঙ্কর মাছের চাবুক পড়লো শ্রীজাতার পিঠে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়—বলে—"আমি দুঃখিত, জানতাম না—" তার চটির শব্দ সিঁড়ির ধাপে ধাপে ওপরে উঠে যায়। একটু হেসে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় অবিজিৎ বইটা টেনে নেয়।

* * *

সন্ধ্যের কিছু আগেই ওরা কাটাবাগানে এসে পৌঁছলো। শ্রীজাতার উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। পরনে লেডিস জারকিন আর স্ল্যাকস্, পিঠে স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা নতুন স্যাভেজ রাইফেলটা। চলেছে সবার আগে। কাজরী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে, দেহ বেঁকিয়ে প্রণাম জানায়। শ্রীজাতা বলে, "তুই বাঘ তাড়িয়ে আনতে পারবি?" কুমড়োর বীচির মত দাঁত বার কোরে মহীন্দর উত্তর দেয়, "ও আমার খুব সাহসী মেয়ে মা! হাতে সড়কী থাকলে কাজরী বাঘের সাথে লড়াই করতে পারে।" হাত দিয়ে রাইফেলটাকে স্পর্শ করে শ্রীজাতা। এটাকে লোড করেই বেরিয়েছে সে। বনে ঢুকতেই দিনের আলো নিভে গেল। টর্চ জেবলে ওরা এগিয়ে চলে। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটা জায়গায়, দুটো বড় গাছের ওপর তক্তা ফেলে দুটো মাচা তৈরী হয়েছে। বীটাররা বাঘটাকে এই পথেই তাড়িয়ে আনবে। অল্প একটু দূরে একটা পচা ডোবা, ভ্যাপ্‌সা একটা গন্ধ বেরোচ্ছে।—"ইস্ কি বিচ্ছিরি জায়গা!"—নাকে রুমাল চাপা দেয় শ্রীজাতা। অবিজিৎ হেসে ওঠে, বলে—"এ তোমার পাখী শিকার নয়, কষ্ট করতে হবে।" ওদের মাচায় উঠিয়ে বীটাররা জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। একটায় মানবাহাদুর আর অবিজিৎ আর একটায় শ্রীজাতা আর সঞ্জয়। কয়েকটা সজাগ, সতর্ক ঘণ্টা কেটে গেল তারপর। বাইরের অন্ধকার জঙ্গলে এসে ঢুকেছে। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মাঝে জোনাকী জ্বলছে টিপ্-টিপ্ করে, আর জ্বলছে অবিজিতের হাতের সিগারেট। রাতের জঙ্গল নীরব নয়, মুখর, চঞ্চল! পাতায় পাতায় ফিস্‌ফিস্ কথা, আন্দোলিত শাখায় শাখায় মৃদু সঙ্ঘর্ষের সঙ্গীত; নরম, ভিজে মাটির বুকে জন্তু জানোয়ারের লঘু, সন্ত্রস্ত পদধ্বনি; অভিসারিকার সচকিত মনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চারিপাশে শিকারের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। জঙ্গলের নেশায় শিকারীরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে,—আকণ্ঠ পান করছে রহস্যময় আরণ্যক সঙ্গীতকে, অন্ধকারের তরল সৌন্দর্যকে। শ্রীজাতার লক্ষ্য ছিল অবিজিতের মাচার দিকে। রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে—রাত দেড়টা। হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে সে। নিঃশব্দে রাইফেলটা টেনে নেয়। একটা জানোয়ার হামাগুড়ি দিয়ে অবিজিতের মাচার দিকে এগোচ্ছে। খট কোরে একটা শব্দ হয়, হাতের ওপর রাইফেলটাকে তুলে নিলে শ্রীজাতা।

—"বাঘ?"—অস্পষ্ট স্বরে সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করে।

—"চুপ—" লক্ষ্য ঠিক করে শ্রীজাতা। হঠাৎ চারপাশে দপ্ দপ্ কোরে কয়েকটা মশাল জ্বলে উঠলো,—কেরোসিনের টিন পেটানোর আওয়াজ, উত্তেজিত চিৎকার "বাঘ—বাঘ বেরিয়েছে—ওইদিকে—ওইদিকে...।" জঙ্গলের মূর্ছিত সম্বিত চমকে উঠলো—শ্রীজাতার হাতের রাইফেল গর্জে ওঠে। সবকিছু ছাপিয়ে শোনা যায় মর্মভেদী মানুষিক চিৎকার।

* * * *

বেশী খুঁজতে হয়নি। জানোয়ারটাকে পাওয়া গেল না,—পাওয়া গেল অবিজিতের মাচার নিচে পড়ে থাকা কাজরীর রক্তাক্ত মৃতদেহটা। পরনে তাঁতের নতুন ডুরে সাড়ী, গলায় জবাফুলের মালা, হাতে সড়কী ছিল না ছিল নাম না জানা বনফুলের তোড়া।

—"পাকা হাতের টিপ—" অবিজিৎ মন্তব্য করে,—বলে—"কে ফায়ার করেছিলো?"—চোখ তুলে তাকায় সবার দিকে।

হাল্কা সুরে শ্রীজাতা উত্তর দেয়—"স্যাভেজ!"

## সাহিত্য-সংবাদ

**গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা**

(ক) ছোটদের জন্যঃ—'হাসির গল্প' অথবা 'রোমাঞ্চকর কাহিনী।'

(খ) বড়দের জন্যঃ—'শিশুদের চলচ্চিত্র।'

প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ (ইং ১৪।৬।৪৮)। অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় জানিবার এবং গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানাঃ—পরিচালক, সুকুমার সাহিত্য পীঠ, ১৪নং কৃত্তিদাস পাল লেন, কলিকাতা—৬।

**রচনা প্রতিযোগিতা**

নাগরী নবীন সংঘ পরিচালিত

বিষয়ঃ—পল্লী সংস্কার

প্রথম তিনটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। কোনও প্রকার প্রবেশ ফি লাগিবে না। লেখা ফুলস্কেপ কাগজের চার পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া চাই। আগামী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে লেখা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হবে। শ্রীপ্রবোধকুমার ধর, সম্পাদক, রচনা প্রতিযোগিতা পরিচালন সমিতি, C/o. নাগরী নবীন সংঘ, গ্রাম—নাগরী বেজেপাড়া, পোঃ—বাটানগর।

# কাশ্মীরে স্বাধীনতা উৎসব ঃ নেহরুজী ও অন্যান্য নেতৃবর্গের সমাগম

কাশ্মীরে সম্প্রতি বিশেষ আড়ম্বরের সহিত স্বাধীনতা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৮ই মে তারিখে আরম্ভ হইয়া এই উৎসব এক সপ্তাহ পর্যন্ত চলিয়াছিল। হানাদারদের আক্রমণে ও ধ্বংসকার্যে বিপর্যস্ত কাশ্মীরের জনসাধারণ আজ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় বহুলাংশে বিপন্মুক্ত। তাই, বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে তাহারা এই জাতীয় উৎসব পালন করিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ এই উৎসবে যোগদান করেন। কাশ্মীরবাসীরা তাহাদের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সহিত পণ্ডিতজীকে সম্বর্ধিত করে। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ আবদুল্লার সর্বপ্রযত্ন চেষ্টায় উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। আমাদের প্রতিনিধি এই উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া কয়েকখানা আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। চিত্রগুলি এখানে মুদ্রিত হইল। উৎসবে কাশ্মীরবাসীদের আনন্দোল্লাস এবং পণ্ডিতজীর প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনের কিঞ্চিৎ পরিচয় এই ছবিগুলিতে পাওয়া যাইবে।

পণ্ডিত নেহরুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কাশ্মীর অধিবাসিগণের বিপুল জনতা উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে
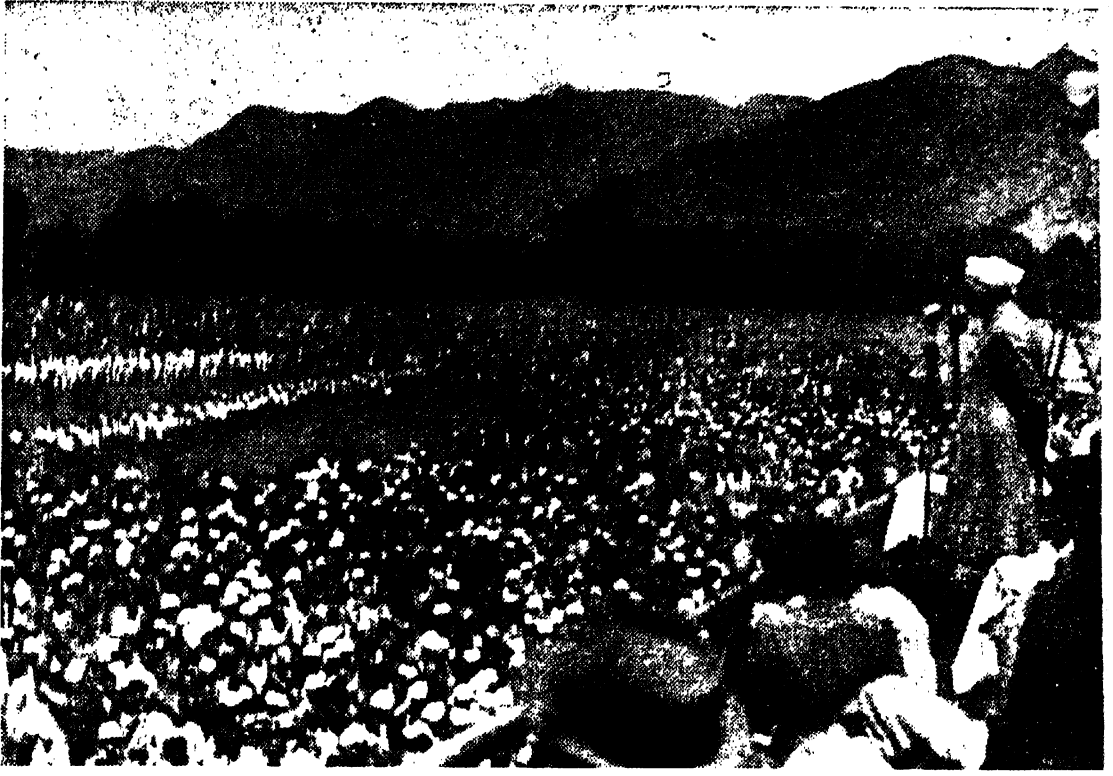
কাশ্মীরের উরি রণাঙ্গন পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তনের পর পণ্ডিতজী পোলো ময়দানে কাশ্মীরী রক্ষীবাহিনী, শান্তিবাহিনী এবং নারীবাহিনীর সমাবেশে বক্তৃতা করিতেছেন

কাশ্মীর আর্ট এম্পোরিয়ামে পণ্ডিতজীর সম্মানার্থে ভোজসভা। পণ্ডিতজীর ডানদিকে কাশ্মীরের মহারাজা ও বেগম আবদুল্লাকে দেখা যাইতেছে
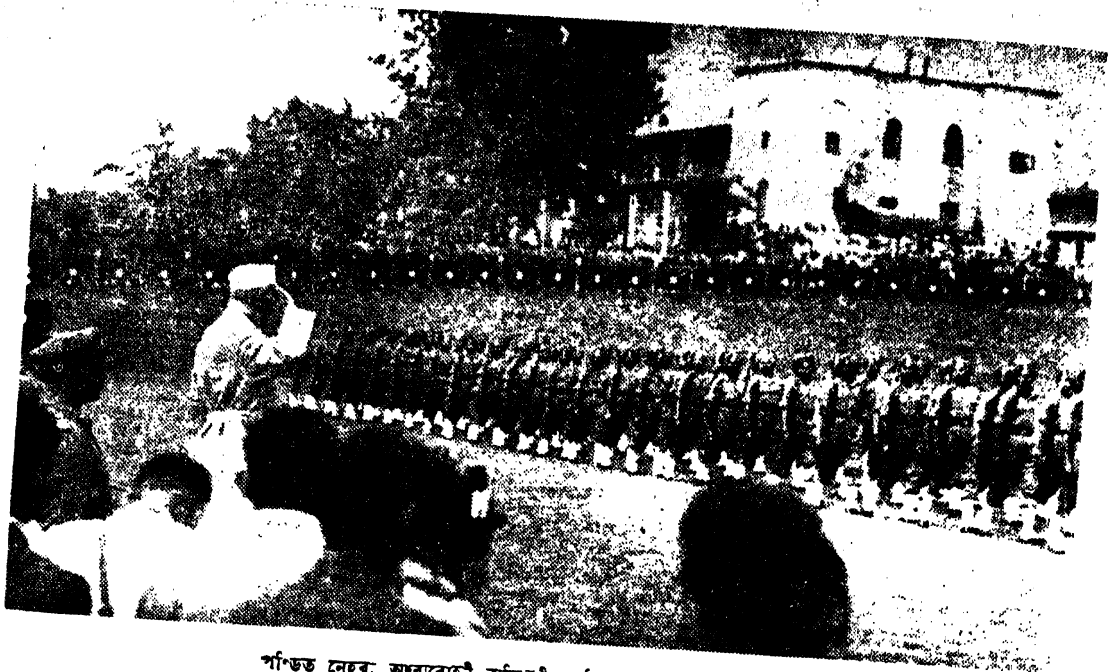
পণ্ডিত নেহরু অশ্বারোহী বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন

কাশ্মীর নারীবাহিনীর সশস্ত্র মহিলাবৃন্দ পোলো ময়দানে কুচকাওয়াজ করিতেছেন

কাশ্মীর স্বাধীনতা উৎসবে নেতৃবর্গ : ডান দিক হইতে—শেখ মহম্মদ আবদুল্লা, গোপালস্বামী আয়েংগার, রফি আহমদ কিদোয়াই ও জেনারেল থিমায়া

পোলো ময়দানে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ আবদুল্লা পণ্ডিতজীকে অভ্যর্থিত করিতেছেন

ডাল হ্রদে নৌকা-বাইচ্ পরিদর্শনের পর ভূমিতে অবতরণোদ্যত পণ্ডিত নেহরু

১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকদের লইয়া গঠিত জাতীয় রক্ষিদল

কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের শয্যাপার্শ্বে পণ্ডিত নেহরু

## অনুবাদ সাহিত্য

# বাতাস

**চুন্-চ্যান্ ইয়ে**

[চুন্-চ্যান্ ইয়ে আধুনিক চৈনিক ছোট গল্প-লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সাধারণতঃ ইংরেজী ভাষাতেই লিখে থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডেই সর্বপ্রথম তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। সে সময় তিনি চীন গভর্নমেণ্টের তরফে ইংল্যাণ্ডে কর্মনিরত ছিলেন। তাঁর রচনাদি ইংল্যাণ্ডের নামকরা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের প্রশংসা পেয়েছে। ইংরেজী ভাষায় তাঁর প্রথম ছোট গল্পের বইও যথেষ্ট জন-সমাদৃত হয়েছে।]

ইতিহাসের ক্লাসে বসে বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রাচীন চীনের ইতিহাস সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনতে শুনতে চিনের মনে হল যে তার হৃৎপিণ্ডে রণদামামার মত শব্দ হচ্ছে। সে এর কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। সে ক্লাসে আসতে দেরী করেছে বলে বৃদ্ধ অধ্যাপক কি তার উপর রাগ করেছেন? নিশ্চয়ই নয়। তিনি খুব ভাল মানুষ অথচ বোকা, একদিন যে শিল্পপ্রিয় শান্তিপ্রিয় চীন ছিল তারই কথা নিয়ে তিনি সর্বদা আবেগ-মুখর। তা ছাড়া, জাপানী অধিকারের আমলেও প্রাচীন রাজধানী পিকিংএ যেসব তরুণ এখনও পড়াশুনো করছে তাদের প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ। তবে কি গ্রামে তার বৃদ্ধা মাতা জাপানীদের হাতে নিহত হয়েছেন? তাও তো সম্ভব মনে হয় না, কেননা মাত্র দুদিন আগে সে তার একখানা চিঠি পেয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন যে, তিনি ভাল আছেন, সুখে আছেন, সে কবে বি-এ ডিগ্রী নিয়ে কোন চাকুরী নেবে তিনি তারই প্রতীক্ষায় আছেন। তবে তার হৃৎপিণ্ডে এরূপ তোলপাড় হচ্ছে কেন?

সে এইভাবে বসে বসে ভাবছিল আর মনে মনে যুক্তিতর্ক করছিল। এমন সময় লম্বা পাইপ মুখে নিয়ে টেনে টেনে ক্লাস ঘরে ঢুকল বৃদ্ধ দারোয়ানটি। এ বুড়ো সব সময়ই এক ধরণের, চঞ্চলতারহিত, কর্তব্যপরায়ণ এবং অধ্যাপকের মর্যাদা সম্বন্ধে উদাসীন। সে চিনের কাছে গেল এবং বয়স্ক পিতৃব্যের মত তার কানে কানে বলল: 'বাছা, ক্লাসের দরজার বাইরে এক ভদ্র-লোক তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' সঙ্গে সঙ্গে সে দরজার বাইরের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। চিন কালো পোষাক পরা খাটো মোটা একটি লোকের গোলাকার পশ্চাদ্ভাগ দেখতে পেল। অকস্মাৎ তার হৃদয়ের স্পন্দন গেল থেমে। সেইদিন সকালে সে যখন স্কুলে আসছিল তখন পথে এই লোকটাকেই তাকে অনুসরণ করতে দেখেছিল। সে নিঃশব্দে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল, তার সহপাঠীদের কিংবা অধ্যাপককে আদৌ সে বিব্রত করল না। বেচারী অধ্যাপক তখন তাঁর সুপ্রাচীন জন্মভূমির নিজস্ব বর্ণনাতেই মশগুল ছিলেন। তিনি চীনের বদলে তাঁর জন্মভূমির নামকরণ করেছিলেন স্বর্গীয় সাম্রাজ্য।

কালো পোষাকপরা লোকটি ফিরে দাঁড়িয়ে সাপের মত দাঁত বের করে চিনের দিকে তাকাল। সেই সঙ্গে জ্যাকেটটা সরিয়ে কোমরে দু'হাত দিয়ে সে এমন করে দাঁড়াল যে তার কোমরে ঝুলানো ব্রাউনিং রিভলবারটা দেখা গেল। চমৎকার পিস্তলটি, হাতলটা চকচকে। চিন নিজের মনে ভাবল যে, এই শুয়োরের বাচ্চা নিশ্চয়ই বহুবার আমার দেশবাসীদের উপর এই অস্ত্রটি প্রয়োগ করেছে। কালো পোষাক পরা লোকটি বলল: 'এবার বেশ চটপট করে নীরবে আমাকে অনুসরণ করো তো!'

চিন সহজ গলায় বলল: 'বেশ।' অন্তরে সে অনুভব করল আত্মনিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এক দৈবশক্তির প্রভাব। কিন্তু যাবার পূর্বে সে বৃদ্ধ দারোয়ানের দিকে ফিরে বলল: 'বিদায়, খুড়ো মশাই, নিজের দিকে একটু নজর দিও।' বৃদ্ধ উত্তর দিল না। সে এই বয়সে এরকম কত যুবককেই না নিঃশব্দে অন্তর্ধান করতে দেখেছে। তার চোখ দুটি ইতিমধ্যেই বাষ্পায়িত হয়ে উঠেছিল। 'তোমার কল্যাণ হোক,' একথা যে বলবে এরূপ বয়স ও শক্তি তার ছিল না।

চিনকে নিয়ে যাওয়া হল জাপানী সৈন্যদের আস্তানায়। পথে কালো পোষাক পরা লোকটি কয়েকবার তাকে বুট দিয়ে লাথি মেরে-ছিল। একটা ছোট ঘরে ছোট টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ারে বিরলশ্মশ্রু একটি কুৎসিৎ লোকের মুখোমুখী একটা কাঠের চেয়ারে বসার সময় চিন অনুভব করল যে তার পশ্চাদ্দেশ ব্যথায় টনটন করছে। ঘরের দরজা বন্ধ করা ছিল। দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল অপর একটি জাপানী, মোটা এবং লোমশ, তার চোখের ভ্রূযুগল ঝুরুশের মতো।

গোঁফওয়ালা জাপানীটি তার রক্তচক্ষু চিনের প্রতি নিবদ্ধ করে বলল: 'এইবার তোমার প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের কথা বল। আমরা বহুদিন থেকে তোমার পিছনে লেগে আছি। মিছে কথা বলে লাভ নেই।'

দস্যুর মতো দেখতে তার প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে মাথা তুলে চিন বলল: 'আপনি কি বলছেন? আমি ছাত্র। আমি কোন প্রতিষ্ঠানের খবর জানি না।'

'কিছুই জানো না?' জাপানীটি নারীসুলভ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। তার গলার স্বর অনেকটা শিকাররত পেঁচার চীৎকারের মতো শোনাল। 'এইটে দেখ!' এই বলে সে একটি প্রচারপত্র তুলে ধরল। সেই প্রচারপত্রটির শিরোনামায় লেখা ছিল: 'দেশবাসী ভ্রাতা ভগ্নীগণ, আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করুন।' সেই প্রচার-পত্রে সই ছিল 'নিখিল চীন স্বদেশপ্রেমিক যুব সঙ্ঘের পিকিং শাখা'র।

চিন নীরবে কথা না বলে তার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল। তার নির্দোষ মুখভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে, সে এ সবের কিছুই বোঝে না। কিন্তু সে জানত যে, তার প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী লিলির একাজ। সে ভাবল, কি চমৎকার চালাক মেয়ে, প্রাচীন ক্যাথের শিল্পপ্রাণ শান্তিপ্রধান প্রাচীন ভাষাকে জাতীয় মুক্তির জন্যে কি ভয়া-বহ অস্ত্রেই না সে পরিণত করেছে। সে নিজেই এ পাঠটি অনুমোদন করেছিল এবং লিলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী যে সামরিক ভাব এর মধ্যে প্রতিফলিত তার সঙ্গে সে প্রায় প্রেমে পড়ে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল তাকে কেন ধরা হয়েছে। গতকাল বিকেলে সে যখন স্কুল থেকে ট্রামে বাসায় ফিরছিল তখনই এ দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। সে কণ্ডাক্টরকে টিকিটের পয়সা দেবার জন্যে যখন পকেট হাতড়াচ্ছিল, তখন প্রচারপত্রটির একাংশ পকেট থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। একজন সহযাত্রী সেটা দেখে অনু-সন্ধিৎসু চোখে তার দিকে চেয়েছিল। সে সন্দেহের হাত এড়ানোর জন্যে কাগজটাকে কুচিকুচি করে ট্রামের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিল—যেন ওটা নেহাৎই একটুকরো বাজে কাগজ। স্পষ্টতই সে অনুসন্ধিৎসু লোকটি পরে সেটা কুড়িয়ে নিয়েছিল। চিনের মনে তখনই একটা পূর্বাভাষের মত জেগেছিল। তার বন্ধুবান্ধবরা প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করে বলে চিন গত রাতে বোর্ডিং হাউসে ফিরে যায়নি। সে একটা হোটেলে রাত কাটিয়েছিল।

'কে লিখেছে এটা? তোমার নিশ্চয় এখনও মনে আছে,' সেই নারীসুলভকণ্ঠে জাপানীটি আবার বলল। চিনের প্রায় নাকের নীচে টেবিলের উপর জাপানীটির তর্জনী দিয়ে প্রচারপত্রটি চাপা দেওয়া। কি ছোট, মোটা আর কুৎসিৎ তার আঙুলটি! হঠাৎ জাপানীটি তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর নরম করে বলল: 'আমাকে সত্য কথা বল। আমি জানি, বৎস, তুমি নির্দোষ, তুমি শুধু অন্ধ অনুগামী। কে এটা লিখেছে আমাকে বল—আমি তোমাকে বাড়ি চলে যেতে দিচ্ছি।'

'আমি জানি না,' চিন বলল। সে জানত যে শত্রুর কাছ থেকে দয়া ভিক্ষা করে কোন লাভ নেই।

জাপানীটি এবার রেগে গিয়ে চীৎকার আরম্ভ করল: 'জানো না? আমি তোমাদের নেতাকে গ্রেপ্তার করেছি। সে আমাদের সব বলে দিয়েছে।'

চিন প্রায় হাসিতে ফেটে পড়ছিল—সে কষ্টে আত্মসংবরণ করল। জাপানীটা বাজে মিথ্যা কথা বলছিল—কারণ সে নিজেই ছিল নেতা। কিন্তু সে একথা শুনে সুখী হল। এর অর্থ হল এই যে, জাপানীরা তাকে ছাড়া তার আর কোন বন্ধুকে ধরতে পারেনি। কাজেই সে শান্তভাবে বলল : 'আমি জানি না।'

জাপানীটি দরজায় দাঁড়ানো লোমশ লোকটিকে ডাকল : 'স্যাব্রো! এর পেট থেকে কি করে কথা বের করতে হবে তা তো তুমি জানো।'

খাটো মোটা লোমশ লোকটিকে জুজুৎসুর ওস্তাদ বলে মনে হচ্ছিল—সে নধর দেহ একটি হাঁসের মতো ধীর পায়ে এগিয়ে এল চিনের কাছে। সে এক মুহূর্তের জন্যে যুবকের সামনে দাঁড়িয়ে রইল এবং তার দিকে এমন করে তাকাল যে, সে তাকে চিনতে পারছিল না। তারপর তার বড় বড় দাঁত কড়মড় করে চিনের অনাবৃত মস্তকে অনবরত ঘুষি চালাতে লাগল—যেন সে হাতুড়ি দিয়ে গির্জার ঘণ্টা পেটাচ্ছিল। অবশেষে যুবকটি মূর্ছিত হয়ে মাটির উপর পড়ে গেল। সেইখানে সে মৃত কুকুরের মত কুঁকড়ে পড়ে রইল। তারপর জাপানীটি তার কাঁটাওয়ালা বুট দিয়ে চিনের পাঁজরায় এত জোরে লাথি দিতে লাগল যে তার নিজেরই গায়ে ঘাম দেখা দিল।

অবশেষে একসময় জুজুৎসুর ওস্তাদ হাস্যরত গোঁফওয়ালা জাপানীটিকে বলল : 'এখনকার মতো এই যথেষ্ট।' তারপরে সে ঘরের কোণে রাখা বরফের বাক্সটার কাছে গিয়ে একপাত্র ঠাণ্ডা জল বের করে আনল। সে পরম যত্ন ও আদরের সঙ্গে চিনের দেহে জল ছিটিয়ে দিল—তরল পদার্থটি ছাত্রটির পোষাক শুষে নিল এবং ফলে একটা পুকুরে ডোবা কুকুরকে ডাঙ্গায় টেনে তুললে যেমন দেখায় চিনের দেহও তেমনই দেখাতে লাগল। চিন ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরে পেল এবং চোখ মেলেই তার দৃষ্টি বিনিময় হল লোমশদেহ লোকটির সঙ্গে।

মুখে আত্মসন্তুষ্টির হাসি নিয়ে গোঁফওয়ালা জাপানীটি বলল : 'যুবক, এবার আমাকে সত্য কথা বলো দেখি।'

সে কি বলছিল তা না বুঝেই চিন অন্ধের মত বিড়বিড় করে বলল : 'আমি কিছু জানি না।'

'বেশ........' বলে জাপানীটি লোমশদেহ লোকটির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নীরব হয়ে রইল।

জুজুৎসুর ওস্তাদ তখন পরম সুগন্ধি এক গোছা ধূপকাঠি জেলে চিনের নাকের নীচে ধরল এবং ফুঁ দিয়ে সেই ধূপের ধোঁয়া দিতে লাগল তার নাসারন্ধ্রের মধ্যে। এত সস্নেহে সে এই কাজ করছিল যেন পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁর বহু যত্নে মাটিতে গড়া মানুষের দেহে [illegible] করেছিলেন। প্রথমে চিন খুব জোরে জোরেই হাঁচল—যেন সে সত্যই নতুন জীবন পেয়েছে। তারপর সে নীরব ও স্তব্ধ হয়ে মর্মর মতো শুয়ে রইল।........মনে হল যে, তার আত্মা যেন এক অস্পষ্ট শব্দবিহীন নতুন জগতে উঠে গেছে। সেখানে মানুষ নেই, নিষ্ঠুরতা নেই—কেবল আছে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ, গাছ ও স্ফটিকস্বচ্ছ পুকুর। পুকুরের জলে মাছেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। চিন লিলিকে বাঁশের ঝাড় থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। তার সেই শৈশবের সঙ্গিনী লিলি যার সঙ্গে সে একই হাইস্কুলে পড়েছে। চমৎকার মেয়ে! তার মুখে সব সময়ই হাসি। মানুষের দুঃখের কিছুই সে জানে না।

লিলি তার হাত ধরে বলল : 'চিন, আজ আমাদের ছুটি। অঙ্কের অধ্যাপক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাদের ক্লাসেও যেতে হবে না আর ঐ নীরস সমীকরণ অঙ্কও করতে হবে না ওহো, সকালের সূর্যের দিকে তাকাও!' লিলি আনন্দে প্রভাত-সূর্যের দিকে তাকিয়ে ঘাসে ঢাকা মাঠ দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। পূর্ব-দিগন্তে সবে সূর্যোদয় হচ্ছিল—প্রথমে দেখালো লাল অর্ধবৃত্তের মত, তারপর সেটা অগ্নি-গোলকের আকার ধারণ করে পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলল, কুয়াশা বিদূরিত করল এবং সকল পদার্থকে পুনরুজ্জীবিত করল। একটা সবুজ ঝোপ থেকে একটি হরিণ ছুটে বেরিয়ে এল। মাছগুলি জলের মধ্যে লাফাতে লাগল। একটি ভরত পক্ষী গান গেয়ে উঠল। 'এস চিন, আমরাও নাচি আর গান গাই। কেন চিন, তুমি কাঁদছ কেন? আজ আমাদের ছুটি। আজ আমাদের ঐসব নীরস সমীকরণ করতে হবে না।' লিলি একটা পাতলা নীল রঙের নক্সা আঁকা রুমাল বের করে চিনের গণ্ডদেশে প্রবহমান অশ্রুধারা মুছে দিল।

তারপর হঠাৎ চিনের জ্ঞান ফিরে এল। সত্যই তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। কিন্তু সেতো কোন উদ্যানে নেই—সে আছে একটি ভূগর্ভস্থ অন্ধ কক্ষে—যার ছাদে একটি মাত্র ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা বিরাট দেয়ালঘেরা প্রাঙ্গণ—বন্য, ভুতুড়ে এবং ভীতিপ্রদ। সে ঠাণ্ডা কঠিন সিমেণ্ট করা মেঝেয় খড়ের গাদার উপর শুয়ে ছিল। তার পাঁজরা-গুলোতে ব্যথা; পাঁজরার হাড়গুলো কঠিন অথচ শিথিল—এত শিথিল যে মনে হচ্ছিল সেগুলোকে ভেঙে পুনরায় পাতলা এক পরত চামড়া মাত্র দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। তার হৃৎপিণ্ডও যেন বাতাস-ভরা রবারের বলের মত শক্ত হয়ে গেছিল—যে কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে। আর নাসারন্ধ্র দুটি শুকনো এবং রক্ত মাখানো। সে নড়তে চাইছিল কিন্তু তার সে শক্তি ছিল না। নিজেকে তার খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হল।

চতুর্দিক নীরব—শুধু করিডরে ঘুরে বেড়ানো জাপানী রক্ষীটির পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল। করিডরের দিকে মুখ করা অনেকগুলি অন্ধ প্রকোষ্ঠ ছিল। কোন বন্দীরই কণ্ঠে শব্দ ছিল না—অদ্ভুত মানুষ সব। এই অন্ধকূপে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা যেন তাদের কণ্ঠস্বর ফেলেছিল হারিয়ে। চিন কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। এমন কি হারানো শৈশবের মতো লিলির মূর্তিও গেছিল হারিয়ে। ছাদের ছোট ফুটোটা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের একাংশের একঘেয়ে ছবি। সামনে লোহার শিকগুলোকে মনে হচ্ছিল শক্ত, ঠাণ্ডা ও সবল।

হঠাৎ চিনের মনে ভীতির উদ্রেক [illegible] এ জায়গাটার অর্থ কি সে তা বুঝতে পারল। এইখানেই হাজার হাজার স্বদেশপ্রেমিক যুবকের জীবনের সমাধি হয়েছে—উবে গেছে তাদের দেশ ও জনগণের প্রতি ভালবাসা, মানবতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের মনের অস্পষ্ট [illegible] সুন্দর আদর্শ। এইখানে তারও জীবনের সমাধি হতে চলেছে। তবু সবে তার জীবনের শুরু হয়েছে, সবেমাত্র সে বেঁচে থাকার উষ্ণতা ও শক্তি অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। তবে, কি [illegible] এ জায়গাটা। হাঁ, তার সামনে হয়তো একটি [illegible] পথ; স্বদেশবাসীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং জাপানীদের কাছে তার [illegible] বিকিয়ে দেওয়া। তবে জীবনের আর কি [illegible] থাকে? তবে সে কিসের জন্যে বেঁচে [illegible] ভয়াহীন কালো শিকগুলোর দিকে [illegible] জীবনে এই সে প্রথম অনুভব করল [illegible] হৃদয় ভারী হয়ে উঠেছে এবং তার চোখ [illegible] ভরে গেছে।

তার মনে পড়ল তার পিতার শেষ [illegible] এই কথা সে তার ছোট বয়সে মার মুখ থেকে শুনেছে। এই বৃদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক তাঁর সমস্ত যৌবন নিয়োজিত করেছিলেন চীন সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়; তিনি মাঞ্চু [illegible] জীবনের সবচেয়ে বেশী সৃষ্টিশীল অংশ [illegible] মুক্তি পাবার পরে পরেই মারা যান। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি তাঁর মায়ের হাত ধরে অস্পষ্ট [illegible] বলেছিলেন : "আমি মরে যাচ্ছি কিন্তু [illegible] অনেকে আমার জীবনকে বাঁচিয়ে [illegible] সহসা সে যেন একটা নতুন সত্য [illegible] করেছে এমনইভাবে চিন ভাবল, হাঁ [illegible] সৃষ্টিরই ধারাবাহিক অনুসরণ; [illegible] জীবনের দিক থেকে আমি একটা ছোট [illegible] কোষ মাত্র এবং আমি সর্বপ্রযত্নে আমার [illegible] করে যাচ্ছি। তার প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী [illegible] এই সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুন্ন রাখবে। [illegible] বন্ধুরা নিশ্চয়ই তাকে কার্য পরিচালনার [illegible] নির্বাচিত করবে। কি কর্মনিপুণা মেয়ে [illegible] সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে লাগল তার [illegible] স্বভাব, কর্মক্ষমতা, শত্রুর উপরে তীক্ষ্ণ [illegible] বন্ধুদের প্রতি তার সহৃদয়তা এবং সর্বোপরি নির্যাতিত জনগণের জন্যে তার দরদ [illegible] কর্মোৎসাহের কথা। আনন্দের মুহূর্তে [illegible]

## দেশী সংবাদ

১০ই মে—কলিকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের ...র্থ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া ...চম বঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় ...ন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের উদ্দেশ্যে ...ঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ...ছেন ভারতবর্ষের বাণীমূর্তি। সমগ্র ভারত-...র আত্মাকে তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া তিনি ...শিত করিয়াছেন। শ্রীযুত কেশবচন্দ্র গুপ্ত ...লনে সভাপতিত্ব করেন।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ...দরাবাদের নিজামকে দিল্লী পরিদর্শনের জন্য যে ...ত্রণ করিয়াছিলেন, নিজাম তাহা গ্রহণে অসম্মত ...ছেন।

করাচীতে পাকিস্থান পিপলস পার্টির ...বেশন শেষ হইয়াছে। খান আব্দুল গফুর ... উক্ত পার্টির অস্থায়ী চেয়ারম্যান নির্বাচিত ...ছেন। পার্টির গঠনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ...তের সার্বভৌম অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে ...স্থানকে ইউনিয়ন অব সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিকে ...ত করাই দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

১১ই মে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ভারতের ...দূত মিঃ আসফ আলী আজ দিল্লীতে পৌঁছিয়া-... তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সাংবাদিক-... এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আসফ আলী বলেন, ...তের নামে জনসেবাই আমার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম।" ...চ্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, মধ্য-... অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ...য়াছে এবং সেখানে যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ... পারে।

১২ই মে—কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ ...দুল্লা শ্রীনগরে এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা ... ভারত অথবা অন্য কোন দেশ আমাদের ... করুন বা না করুন আমরা পাকিস্থানী ...ক্রমণকারীদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আমাদের ...জ স্বাধীনতা রক্ষা করিব।

মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা মিস আমতুস সালাম ...দুরা নারী উদ্ধার প্রচেষ্টায় বাহাওয়ালপুরের ... মন্ত্রীর আশ্বাস পাইয়া গতকল্য রাত্রে অনশন ... করিয়াছেন।

১৩ই মে—কলিকাতায় সম্প্রতি ভারত-...স্থান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত ...মেণ্ট পাকিস্থানে বিনা লাইসেন্সে স্থলপথে ...তরকারী, দুগ্ধ, মাছ ডিম প্রভৃতি চালানের ...মতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

...র্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত পারাপারকালে ...দের অযথা হয়রাণি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ... ও পাকিস্থান ডোমিনিয়ন দুইটির সংযোগ-... অফিসারগণকে স্থাপন করিবার জন্য উভয় ... ১৫টি স্থল শুল্ক ঘাঁটি নির্বাচন করা ... বলিয়া জানা গিয়াছে।

...চিস্থানের আঞ্জুমান-ই-ওয়াতান-এর সভাপতি ...দুস সামাদ খাঁ কোয়েটা জেলে দুই মাস ... থাকার পর অদ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

১৪ই মে—মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষের ... মহাত্মা গান্ধীর হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ...রাম বিনায়ক গডসে এবং শ্রীবিনায়ক দামোদর ...রকর সহ অপর আট ব্যক্তির বিরুদ্ধে দিল্লীর ...কেল্লায় মামলা সুরু হইবে। আসামীদের ...দ্ধে ষড়যন্ত্র, নরহত্যা এবং অস্ত্র আইন ভঙ্গের ...যোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পাকিস্থানে ভারতের জয়েণ্ট হাই-কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি পূর্ব পাকিস্থানে থাকিবেন এবং ঢাকাতে তাঁহার কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৮তম জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তাহব্যাপী উৎসবের পঞ্চম দিন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। সভানেত্রী বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া সাধারণ নারীকে মহীয়সী নারীতে পরিণত করিয়া ভারতীয় মেয়েকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

১৫ই মে—গতকল্য রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় ধানবাদ হইতে প্রায় ৯ মাইল দূরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে ছোট আমবোনা ও প্রধান খণ্ডা ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে ৯নং আপ দেরাদুন এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হইয়াছে। উহার ফলে ৩১ জন মারা গিয়াছে এবং শতাধিক লোক আহত হইয়াছে।

কলিকাতায় মহম্মদ আলী পার্কে পশ্চিম বঙ্গ জমিয়ৎ-উল-উলেমা হিন্দের সম্মেলন আরম্ভ হয়। সৈয়দ হোসেন আমেদ মদনী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মোলানা সাহেব ভারতীয় মুসলমানদিগকে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিধান এবং দেশের সমৃদ্ধিকল্পে ঐকান্তিকতার সহিত কাজ করিবার জন্য আবেদন জানান।

১৬ই মে—হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুত কাশীনাথ রাও বৈদ্য নিজামের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া এই মর্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, গত দুই মাসে অগ্নিসংযোগের ফলে বিদর জেলার প্রায় ১৪০টি গ্রাম ভস্মীভূত হইয়াছে। মুচলম্বি গ্রামে হত্যাকাণ্ডের ফলে প্রায় ১২৫ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

আজ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষ দিবসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ফাল্গুনী ও নৃত্যনাট্য শ্যামা অভিনীত হয়। নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীযুত মজুমদার বলেন যে, সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রবীন্দ্রনাথ শুধু পথের নির্দেশ দেন নাই, চিরন্তন আদর্শেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, শুধু জাতীয় স্বার্থের জন্যই নয়, শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থের জন্যও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন।

## বিদেশী সংবাদ

১২ই মে—বৃটিশ সরকারী ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৪ই মে মধ্যরাত্রি হইতে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শাসনের অবসান হইবে। ঐ দিন জেরুজালেমস্থিত বৃটিশ সৈন্যদল হাইফা যাত্রা করিবে।

১৪ই মে—ইহুদী জাতীয় পরিষদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, অদ্য প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট অবসানের দিনে সেখানে 'ইসরাইল' নামে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। প্যালেষ্টাইনের বৃটিশ হাই-কমিশনার স্যার এলান কানিংহাম অদ্য প্রত্যূষে প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করিয়াছেন। বৃটেনের ২৫ বৎসরব্যাপী শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নবগঠিত ইহুদী রাষ্ট্রে অভিযান চালাইবার জন্য মিশরীয় ও অন্যান্য আরব বাহিনী প্রস্তুত রহিয়াছে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, দুই ব্যাটেলিয়ান মিশরীয় সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিয়াছে।

মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোক্রাশী পাশা অদ্য মধ্যরাত্রে কায়রো রেডিও হইতে ঘোষণা করেন যে, প্যালেষ্টাইনে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদের হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র মিশরীয় বাহিনীকে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আজ ঘোষণা করেন যে, প্যালেষ্টাইনে নূতন ইহুদী রাষ্ট্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

১৫ই মে—অদ্য আরব সৈন্যগণ তিন দিক হইতে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিলে নবগঠিত ইহুদী রাষ্ট্রকে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তিনটি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে হয়। ইহুদী রাষ্ট্রের রাজধানী তেল-আভিভে চারিবার বিমান হানা হয়।

১৬ই মে—বিমান বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট হস্ত-সজ্জিত ইরাকী সৈন্যদল প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিয়াছে।

তেল-আভিভ হইতে হাগানা কর্তৃপক্ষের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে গতকল্য লেবানন সীমান্তবর্তী মালকিয়া রণাঙ্গনে অন্যূন ২০০ আরব নিহত হইয়াছে। লেবানন সীমান্তবর্তী রণক্ষেত্রে ইহুদীরা প্যারাসুট বাহিনী প্রেরণ করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করে।
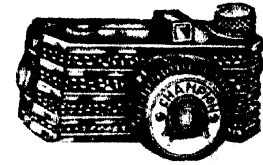
## ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল ইংলণ্ড ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া পর পর তিনটি খেলায় যেরূপ কৃতিত্বপূর্ণ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন পরবর্তী দুইটি খেলাতেও তাহার কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। উপরন্তু এই ধারণাই বদ্ধমূল হইতেছে যে, কোন খেলাতেই ইংলণ্ডের খেলোয়াড়গণ অস্ট্রেলিয়ানদের বিজয়ীর সম্মান হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সকল বিভাগেই অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়গণ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। টেস্ট খেলার জন্য ইংলণ্ডের পরিচালকগণ যত শক্তিশালী করিয়া দল গঠন করুন না কেন অস্ট্রেলিয়ান দলের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

অস্ট্রেলিয়া দল, ভ্রমণের চতুর্থ খেলায় সারে দলকে ও পঞ্চম খেলায় কেম্ব্রিজ দলকে ইনিংসে পরাজিত করিয়াছেন। পাঁচটি খেলার মধ্যে চারিটিতে ইনিংসে বিজয়ী হওয়া সত্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক। আমরা অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়গণকে অভিনন্দিত করিতেছি।

### সারে বনাম অস্ট্রেলিয়া

সারে বনাম অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল এক ইনিংস ও ২৬৯ রানে বিজয়ী হইয়াছেন। এই খেলায় উল্লেখযোগ্য এই যে, মোরিস, ব্রাডম্যান ও হ্যাসেট পর পর তিনজন খেলোয়াড় শতাধিক রান করেন। বোলার জনসন উভয় ইনিংসে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন। নিম্নে খেলার ফলাফলঃ—

অস্ট্রেলিয়ান প্রথম ইনিংসঃ—৬৩২ রান (মোরিস ১৭৬, ব্রাডম্যান ১৪৬, হ্যাসেট ১১০, ট্যালন নট আউট ৫০, বেডসার ১০৪ রানে ৪টি ও ম্যাকমোহন ২১০ রানে ৪টি উইকেট পান।)

**সারে প্রথম ইনিংস—১৪১** রান (ফিশলক নট আউট ৮১, জনসন ৫৩ রানে ৫টি ও রিং ৩৪ রানে ৩টি উইকেট পান।)

**সারে দ্বিতীয় ইনিংস—১২৫** রান (স্কয়ার্স ৫৪, জনস্টন ৪০ রানে ৪টি ও জনসন ৪০ রানে ৩টি উইকেট পান।)

### কেম্ব্রিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের তিনদিনব্যাপী খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল এক ইনিংস ও ৫১ রানে জয়ী হইয়াছেন। এই

খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলের ব্রাউন দ্বিশতাধিক রান করেন। ইহা ছাড়া ম্যাককুল ও মিলার বোলিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। খেলার ফলাফলঃ

**কেম্ব্রিজ প্রথম ইনিংস—১৬৭** রান (ডেগার্ড ৩৩, ইনসোল ৩৩, মিলার ৪৬ রানে ৫টি, টোসাক ৩২ রানে ১টি উইকেট পান।)

**অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস—৪ উইঃ ৪১৪** রান (ডিক্লেয়ার্ড), (ব্রাউন ২০০, হেমেন্স ৯২, হার্ভে ৬১, গ্রিফিথস ১৩৮ রানে ২টি উইকেট পান।)।

**কেম্ব্রিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৯৬** রান (ডিউয়েস ৪০, বেলী নট আউট ৬৬, মিলার ২৯ রানে ২টি ও ম্যাককুল ৭৮ রানে ৭টি উইকেট পান।)

## হকি

ভারতীয় হকি ফেডারেশন লণ্ডনের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে হকি খেলায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ১৬ জন খেলোয়াড়কে মনোনীত করিয়াছেন। আরও একজন খেলোয়াড় মনোনীত হইবেন। মনোনীত খেলোয়াড়গণ ১লা জুন হইতে বোম্বাইতে সমবেত হইবেন ও বিভিন্ন প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিবেন। ইঁহাদিগকে জুলাই মাসের প্রথমে বিমানযোগে লণ্ডন প্রেরণ করা হইবে। ভারতের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ ৭ই জুন জাহাজযোগে যাত্রা করিতেছেন। হকি খেলোয়াড়দের কেবল অনুশীলন করিবার উপযুক্ত শক্তি লাভের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই কয়েকদিন পরে প্রেরণ করা হইতেছে। বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় হকি দল প্রেরণের যোড়জোড় প্রায় এক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে অথচ ইহার মধ্যে একত্রে অনুশীলন ও খেলিবার ব্যবস্থা হইল না, ইহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।

নিম্নে নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল—

কিষেণ (বোম্বাই), অধিনায়ক, ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ), এল পিন্টো (বোম্বাই), ত্রিলোচন সিং (ফরিদকোট), আখতার হোসেন (ভূপাল), ওয়াল্টার ডিসুজা (বোম্বাই), ক্লডিয়াস (বাঙ্গলা), কেশব (বোম্বাই), রণধীর সিং (দিল্লী), ম্যাক্সি ভাজ (বোম্বাই), বাবু (যুক্তপ্রদেশ), আর রড্রিগ্স (বোম্বাই), জানসেন (বাঙ্গলা), লতিফ (ভূপাল), এন ফার্ণাণ্ডেজ (বোম্বাই) ও জি এস নন্দী (বাঙ্গলা)।

## মুষ্টিযুদ্ধ

বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের প্রচেষ্টায় এইবার সর্বপ্রথম ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা দল বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা খুবই সুখের ও আনন্দের বিষয়। তবে সকল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠান ইহাদের এই চেষ্টায় সহযোগিতা করিলেন না দেখিয়া দুঃখ হইল। ব্যক্তিগত স্বার্থ কি এতই বড় যে দেশের গৌরব বৃদ্ধির সুযোগে বাধা সৃষ্টি করিতে হইবে? যাঁহারা বিশিষ্ট ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাদের অলিম্পিক ট্রায়াল মুষ্টিযুদ্ধে যোগদান করিতে দেন নাই তাঁহাদেরই আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করি। ইঁহাদের জন্যই ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা দল আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হইল না। আমরা এই মনোবৃত্তি কোনদিন সমর্থন করিতে পারি না। নিম্নে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মনোনীত মুষ্টিযোদ্ধাদের নাম প্রদত্ত হইল—

বেবী এরাটুন (বাঙ্গলা), ম্যাক জোয়াকিম (বাঙ্গলা), জিনি রেমণ্ড (বোম্বাই), বাবুলাল (বাঙ্গলা), বি বসু (বাঙ্গলা) ও রবীন চট্ট (বাঙ্গলা)।

বাঙ্গলার মুষ্টিযোদ্ধাদের ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে, মনোনীত ৭জনের মধ্যে ৬জনই বাঙ্গলার মুষ্টিযোদ্ধা।

## সন্তরণ

ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন ও ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশনের প্রতিনিধিগণ মিলিতভাবে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য ভারতীয় সাঁতারু দল মনোনীত করিয়াছেন। দল আরও শক্তিশালী হইতে পারিত কেবল মাত্র বোম্বাইর কতকগুলি স্বার্থান্বেষী সন্তরণ পরিচালকগণের জন্য অলিম্পিক ট্রায়ালে অনেক সাঁতারু যোগদান করিতে পারে নাই। নিম্নে নির্বাচিত সাঁতারুদের নাম প্রদত্ত হইল—

কামিনী দাস (বাঙ্গলা) অধিনায়ক, শচীন নাগ (বাঙ্গলা), আইজাক মনসুর (বোম্বাই), গোপাল শীল (বাঙ্গলা), ডি মুরারজী (বোম্বাই), মনু চ্যাটার্জি (বাঙ্গলা), জহর আহির (বাঙ্গলা), কালি সাহ (বোম্বাই), দিলীপ মিত্র (বাঙ্গলা), প্রফুল্ল মল্লিক (বাঙ্গলা), দুর্গা দাস (বাঙ্গলা)

ইণ্টার স্কুল ও ইণ্টার কলেজিয়েট বক্সিং প্রতিযোগী ও পরিচালকবর্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ও প্রধান মন্ত্রীকে ছবিতে দেখা যাইতেছে


শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫ নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
[illegible] পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক: শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন  সহকারী সম্পাদক: শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ ]  শনিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ সাল।  Saturday, 29th May, 1948.  [ ৩০শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

## পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবী

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি কলিকাতার সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে জানাইয়াছেন যে, মন্ত্রিসভার নির্দেশক্রমে তিনি বিহারের অন্তর্গত বাঙলার অংশসমূহ ধলভূম, মানভূম এবং পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। বাঙলার জনমত এ বিষয়ে বহুদিন হইতেই জাগ্রত হইয়াছে; সেদিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহুদিন পূর্বেই এই দাবী উপস্থিত করা উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেরাইকেল্লা এবং খরশোয়ান এই দুইটি রাজ্য বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবীর যৌক্তিকতা সম্পূর্ণই ছিল, তথাপি তাঁহারা একটি কথাও বলেন নাই। মাত্র কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বিহারের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির সম্বন্ধে বাঙলার দাবী সমর্থন করিতে প্রকাশ্য বক্তৃতা-মঞ্চে অবতীর্ণ হন। অবশেষে, বিলম্বে হইলেও ডাক্তার রায় আজ পশ্চিমবঙ্গের দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু দাবীটা আরও জোরের সঙ্গে করা উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী দাবীটা উপস্থিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে দাবীর পিছনে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের দৃঢ়তা কিংবা আন্তরিকতা পরিস্ফুট হয় নাই। বিশেষত ডাক্তার রায়ের বিবৃতিতে সাঁওতাল পরগণার দাবীকৃত অংশের উল্লেখ পর্যন্ত নাই। বিষয়টি সকলেরই চোখে পড়িবে। ইহার কারণ কি? পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হইয়া এত বড় একটা ভুল করা তাঁহার উচিত ছিল না। আমরা আশা করি, তিনি অচিরে এই ভ্রমের সংশোধন করিবেন। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি আজ যুক্তভাবে এই দাবী লইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং এই দাবী এমন সমীচীন এবং যুক্তিসহ যে, এজন্য বিশেষ যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, ১৯১১ সাল পর্যন্ত এই সব অঞ্চল বাঙলাদেশেরই অন্তর্গত ছিল। তারপরে ইংরেজের শাসন স্বার্থের খাতিরে এবং তজ্জন্য বাঙলার জাতীয়তাবাদের শক্তিকে দুর্বল করিবার প্রয়োজনে এগুলিকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস স্থায়ীভাবে বৃটিশ শাসকদের এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ১৯১১ সাল হইতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের সীমা নির্ধারণ নীতি কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইয়াছে এবং ১৯৪৫ সালের ১১ই ডিসেম্বরের নির্বাচনী ইস্তাহারেও তাহা সমর্থিত হইয়াছে। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের এই নীতি আগাগোড়া সমর্থন করিয়া আসিয়াছে এবং কংগ্রেস-নেতৃগণ ইহার যৌক্তিকতা এখনও সমভাবেই মানিয়া চলিতেছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতায় দেখা যায়, মার্চ মাসে ভিজাগাপত্তন পরিদর্শনকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের আন্দোলনে শুভেচ্ছা প্রকাশ করেন এবং গত ১৭ই মে তারিখে বোম্বাইতে মহারাষ্ট্র বণিক সভায় বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত শঙ্কর-রাও দেও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন ব্যাপারে অনুরূপভাবে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, কেরল, কর্নাটক—এই কয়েকটি নূতন প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উ[ল্লেখ] করেন। এইরূপভাবে যে নীতি সর্বত্র স্বী[কৃত] হইয়াছে এবং অন্যত্র কার্যত গৃহীতও হই[বার] আশ্বাস লাভ করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের বে[লায়] তাহার ব্যতিক্রম হইবার কি কারণ থাকি[তে] পারে? বাঙলার দাবীকে পক্ষপাতদু[ষ্ট] দৃষ্টিতে এবং অভিসন্ধিপূর্ণভাবে উপে[ক্ষা] করিবার মনোবৃত্তির পরিচয় আমরা ঊর্ধ্ব[তন] কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশিষ্ট কাহা[রো] কাহারো কার্যে পাইতেছি। আমাদিগ[কে] নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে এই কথা বলি[তে] হইতেছে। আমাদের মনে আছে, কি[ছু] দিন পূর্বে বোম্বাইয়ের প্রধান ম[ন্ত্রী] শ্রীযুক্ত খের একটি বিবৃতিতে প্র[কাশ] করেন যে, রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্র[সাদ] ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সব প্রদে[শের] প্রধান মন্ত্রীদের কাছে প্রদেশসমূহ ভা[ষার] ভিত্তিতে পুনর্গঠন করিবার নিমিত্ত যে কমি[টি] গঠিত হইয়াছে, তাহাতে নিজেদের এক[জন] করিয়া প্রতিনিধি মনোনীত করিবার [জন্য] অনুরোধ করিয়া চিঠি দিয়াছেন। শ্রীযুত [খের] নিশ্চয়ই এমন চিঠি পাইয়াছেন; কিন্তু পশ্চি[ম]বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে দেখা যায়, তি[নি] ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে তেমন [কোন] চিঠি পান নাই। এ রহস্য উদ্ঘাটিত হ[ওয়া] প্রয়োজন। নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া বিবে[চনা] করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বাঙলার দাবীর মূলে প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্ন ন[াই]। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-পুনর্গঠনের নী[তি] অনুসরে পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে র‍্যাডা[ক্লিফ] সিদ্ধান্ত অনুসারে জলপাইগুড়ি এবং পশ্চি[ম]বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ-বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে যে রাষ্ট্রীয় অব্যব[স্থা] ঘটিয়াছে, তাহা দূর হইবে; পক্ষান্তরে বিহা[র]

বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চল যদি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতির প্রশ্নের সমাধান সহজ হইয়া আসিবে। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ হিসাবে সবল এবং স্বাবলম্বী হইলে সমগ্র ভারত রাষ্ট্রই লাভবান হইবে। বাঙলাদেশের উক্ত অঞ্চলগুলি এতকাল বিহারের নিকট গচ্ছিত ছিল বলিয়াই বিহারবাসীর মনে করা উচিত এবং সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া গচ্ছিত ধন সৌভ্রাত্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে প্রত্যর্পণ করা তাঁহাদের কর্তব্য। ইহার ফলে বাঙলা এবং বিহারের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইবে।

**প্রাদেশিকতার পরিণতি**

প্রাদেশিক মনোবৃত্তি কিরূপ শোচনীয় অনর্থ সৃষ্টি করে, গৌহাটিতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আসাম সরকারের একটি ইস্তাহারে দেখা যায়, গত ১০ই মে গৌহাটিতে রেলকর্মচারী ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। রেলওয়ে কলোনীতে অগ্নি প্রদানের চেষ্টা হয়। ক্ষিপ্ত জনতা বিতাড়নের জন্য পুলিস গুলীবর্ষণ করে, তাহাতে ৮।১০ জন আহত হয়। গুলীবর্ষণের পর জনতা কয়েকটি দোকানে হানা দিয়া তাহা চুরমার করে। এই হাঙ্গামার পর ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল; পরে সশস্ত্র পুলিসের পাহারায় ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়। ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে, গৌহাটি এবং পাণ্ডুতে ১৪৪ ধারা জারী করিতে হয়। লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, আসাম সরকারের প্রচার বিভাগ গৌহাটি এবং পাণ্ডুর এই হাঙ্গামাকে সামান্য ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি সেরূপ সামান্য নয়। আসাম গভর্নমেন্ট তাঁহাদের বিজ্ঞপ্তিতে এই হাঙ্গামার কারণ কি, সে প্রসঙ্গ একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন। ভিতরের কথা তাঁহারা বাহির করিতে চাহেন না বলিয়াই মনে হয়; কারণ ভিতরের কথা প্রকাশ পাইলে 'বঙাল-খেদা' আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও ঐতিহ্য উন্মুক্ত হইবে; আসামের নেতাদের সে ইচ্ছা নয়। কয়েক বৎসর ধরিয়া আসামের দায়িত্ব-সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এমন কি, মন্ত্রি-মণ্ডলের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 'বঙাল-খেদা' আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন। গৌহাটি ও পাণ্ডুর হাঙ্গামা তাহারই পরিণতি এবং আসামের প্রাদেশিক বিদ্বেষে উত্তেজিত একদল যুবক এবং ছাত্রেরাই ইহার মূলে রহিয়াছে। আমরা জানি, গৌহাটি ও পাণ্ডুর রেলকর্মচারীদের অধিকাংশই নূতন ব্যবস্থাধীনে অন্যান্য স্থান হইতে বদলী হইয়া আসামে গিয়াছেন। তাঁহাদের উপরই এই হীন আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আসামে এই ধরণের বাঙালী বিদ্বেষমূলক ব্যাপার আগেও ঘটিয়াছে এবং তাহাতে আসাম হইতে বাঙালী বিতাড়নের অশোভন ও উগ্র মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙলা ভাষায় লিখিত সাইন বোর্ড অপসারণের ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; ইহা ছাড়া ডুমডুমায় বেঙ্গলী স্কুল স্থাপনের দলবদ্ধ বিরোধিতাও বিস্মৃত হইবার নয়। কামাখ্যা পীঠে এবং উমানন্দের মন্দিরে বাঙালী তীর্থযাত্রী মহিলাদের প্রতি অশিষ্ট আচরণের যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহাও গৌহাটির এই ঘটনার সহিত বিবেচনার যোগ্য। আসামের দায়িত্বসম্পন্ন নেতাদের কতদিনে জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইবে এবং তাঁহারা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতামূলক মনোবৃত্তির অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিবেন, আমরা জানি না; আপাতত উপদ্রুত রেল-কর্মচারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিবার জন্য ভারত গভর্নমেন্টের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত। প্রাদেশিকতার এই হীনতা প্রশ্রয় পাইলে ভারতীয় রাষ্ট্রের সর্বনাশ ঘটিবে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনীতি ইহার প্রতিকারে অবিলম্বে প্রযুক্ত হওয়া দরকার।

**বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা**

সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির সম্পাদক সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবলম্বিত নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ব-বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। তাঁহারা মাঝে মাঝে নাম রেজেষ্ট্রী করিবার কতকগুলি কেন্দ্র খোলা এবং আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রদের জন্য কিছু কিছু অর্থসাহায্য করা ছাড়া আশ্রয়-প্রার্থীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করেন নাই। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম হইতেই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, একবার যদি আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য করা হয়, তবে পূর্ববঙ্গের সমগ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস্তুত্যাগ করিয়া আসিবে। আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এইরূপ ধারণার ফলেই আশ্রয়প্রার্থীদের সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করা হইতেছে না।' সমিতির সম্পাদক যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত কারণ আছে বলিয়া আমরাও স্বীকার করি। বস্তুত পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবলম্বিত নীতিতে একান্ত আন্তরিকতা-হীনতা এবং উপেক্ষা ও ঔদাস্যের ভাব নানা দিক হইতে প্রকাশ পায়। ভারত গভর্নমেন্ট দিল্লীতে বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতির জন্য যেভাবে কাজে অগ্রসর হইতেছেন, তাহার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মনীতির রীতি ও গতির তুলনা করিলে এ সম্পর্কে উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে। ভারত গভর্নমেন্ট দিল্লীতে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বর্তমান বৎসরের মধ্যে সেখানে অন্ততঃ ৬ হাজার নূতন বাড়ী নির্মিত হইবে এবং তাহাতে ৩০ হাজার বাস্তুত্যাগীর আশ্রয় মিলিবে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে ৪ মাসের মধ্যে সেখানে ৩২ শত খানা বাড়ী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু পরিকল্পনার ফাঁকা কথাই আমাদিগকে শুনাইতেছেন, কার্যতঃ বাস্তু-ত্যাগীদের জন্য তাঁহারা এপর্যন্ত একখানা কুটীরও তাঁহারা নির্মাণ করেন নাই; কিংবা এক ছটাক জমিও সংগ্রহ করেন নাই, এমন কি মূল্য লইয়া বাস্তুত্যাগীদিগকে জমি দিবার কোন একটা বন্দোবস্তও তাঁহারা এপর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনও নিজেদের পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া আসেন, আমরা ইহা চাই না; কিন্তু যাঁহারা অবস্থার চাপে পড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় দান এবং পুনর্বসতি বিধানের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমরা একথা বলিবই। পাকিস্থান ছাড়িয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ তাড়াহুড়া পড়িয়া গিয়াছে দেখিতেছি, ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষে প্রত্যাগত মুসলমানের সে ভিড়ের ঝক্কি ও ঝামেলা সামলাইয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান বাস্তুত্যাগীদের পাকিস্থানের মোহ অল্পদিনের অভিজ্ঞতাতেই ভাঙিয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগীয় সরিয়তী সাম্প্রদায়িক শাসন-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে অব্যবস্থিত পূর্ব পাকিস্থানের প্রতিবেশ তথাকার বাস্তুত্যাগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে তেমন আকর্ষণীয় হয় নাই এবং হইতেও পারে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এসত্য উপলব্ধি করিয়া বাস্তু-ত্যাগীদের পুনর্বসতি বিধানে আগ্রহের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

**পশ্চিমবঙ্গের সরকারী পরিভাষা**

পশ্চিম বাঙলা গভর্নমেন্টের নিযুক্ত পরিভাষা সংসদ পরিভাষা রচনার প্রথম স্তবক প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আগ্রহ সহকারে ইহা পাঠ করিয়াছি। বাঙলাদেশের কয়েকজন প্রথিতযশা পণ্ডিত এবং শব্দশাস্ত্রীকে লইয়া এই সংসদ গঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের যোগ্যতা এবং কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রশ্ন করিবার নাই। তাঁহাদের দ্বারা স্থিরীকৃত পরিভাষাগুলির যাথার্থ্য এবং সঙ্গতিও আমরা স্বীকার করি। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে সংস্কৃত হইতেই মুখ্যভাবে শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। সে কথা

তাঁহারা নিজেরাও স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের সংকলিত ও রচিত পরিভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে যে আপাত-দুর্বোধ্য এবং শ্রুতিকটু মনে হইতে পারে, ইহাও তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের রচিত এবং সংকলিত কতকগুলি পরিভাষা সত্যই দুর্বোধ্য ও শ্রুতিকটু হইয়াছে; কিন্তু প্রচলিত হইলে সেগুলি যে জনসাধারণের পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে, ইহাও সত্য। সংস্কৃতের শব্দ-মঞ্জুষা সব ভাষার চেয়ে সমৃদ্ধ। সংস্কৃতের প্রতি স্বাভাবিক টান আমাদেরও আছে, এবং সংস্কৃত শব্দমূলক পরিভাষার একটি বিশেষ গুরুত্ব এই যে, সর্বভারতের সংস্কৃতিতে সেগুলি মর্যাদা-লাভ করিবে। সেদিক হইতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু এমন কতকগুলি পরি-ভাষা এদেশে প্রচলিত আছে, যেগুলি সংস্কৃত না হইলেও সকলের পক্ষে সহজবোধ্য এবং সর্বভারতীয় ভিত্তি সেগুলির বর্তিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সব জীবন্ত ও শক্তিশালী ভাষা এবং সাহিত্যই বিদেশী ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া থাকে। বাঙলা ভাষাও সেইভাবে সহজ এবং সবল গতিতে পূর্ণাংগতা লাভের দিকে চলিয়াছে। প্রত্যেক ভাষারই যুগোচিত এমন একটা স্বাভাবিক গতি বা ধারা থাকে এবং মৌলিকতা রক্ষা বা পরিশুদ্ধির নামে তাহাকে গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া ফেলা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, বাঙলা ভাষাকেও সেই-রূপ সংস্কৃতমূলক পরিভাষায় বাঁধিয়া বিক্রমাদিত্য কিংবা বৌদ্ধ জাতকের যুগে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে এবং প্রাণশক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। সংসদ এইদিকে সমধিক দৃষ্টিদান করিলে তাঁহাদের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসিত। আমাদের মতে যে সব শব্দ ইতি-মধ্যেই চালু হইয়া গিয়াছে এবং যেগুলি দৈনন্দিন জীবনে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, শুধু বিদেশী ভাষা ইংরেজী, ফারসী, আরবী বলিয়া, সেগুলি পরিবর্তন করা উচিত হইবে না। বস্তুত সরকারী পরিভাষাকে জনসাধারণের সংস্রব হইতে পাণ্ডিত্যের পরিমণ্ডলের মধ্যে লইয়া গেলে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন দুর্বল হইয়া পড়িবে।

### রাষ্ট্র-সাধনায় বৈপ্লবিক প্রেরণা

গত রবিবার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ছায়াচিত্রের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী বাঙলার রাষ্ট্রনীতিতে বৈপ্লবিক আদর্শের প্রেরণার প্রয়োজনীয়তার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতে আমরা মুক্ত হইলেও আমাদের দুর্দশার এখনও অবসান ঘটে নাই। অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, ব্যাধি এবং মহামারীর পীড়ন জাতিকে পিষ্ট করিয়া চলিয়াছে। এই দুর্গতির মধ্যে সব চেয়ে বড় দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র জীবন স্বদেশপ্রেমমূলক বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক আদর্শের প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বর্তমানে নানা মতবাদ জাতির চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহার ফলে কোন গঠনমূলক কর্মপ্রেরণা দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বঙালী জাতি দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতির হোম শিখা জ্বালাইয়া তোলে এবং প্রবল সাম্রাজ্যবাদীদের সকল প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হয়। আজ তাহাদের সম্মুখে কোন উদার এবং বলিষ্ঠ আদর্শ নাই, তাহাদের চিত্তবৃত্তিকে উন্মথিত করিয়া তুলিবার মত কোন বৃহৎ আদর্শের উজ্জ্বল আকর্ষণ নাই। পক্ষান্তরে নানাবিধ অনুদার ও সংকীর্ণতার পাকচক্রে পড়িয়া জাতির কর্মশক্তির অপচয় ঘটিতেছে। এই আবহাওয়ার মধ্যে যত রকমের পাপাচার প্রশ্রয় পাইতেছে এবং গৃধ্নু রাক্ষসের দল দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়া সাধুতার মুখোস পরিয়া নাচিতেছে। বাঙলা দেশ আজ নেতৃহীন। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অবিলম্বে যদি ইহার প্রতীকার না হয়, তবে বাঙালী জাতি হিসাবে বিলুপ্ত হইবে এবং বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাধনা ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত-দের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িবে। বাক্‌সর্বস্ব এবং বিবেকহীন যাহারা, যাহারা নিজের আর উপদলের স্বার্থকেই বড় বোঝে, ইহাই তাহাদের বিধাতৃ-নির্দিষ্ট পরিণতি।

### দুর্বলতাই বড় পাপ

হায়দরাবাদের সমস্যা সমাধানের জন্য এখনও সুস্পষ্ট কোন নীতি ভারত সরকার অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের বারংবার অনুরোধ দস্তুরমত তাচ্ছিল্যের সংগে উপেক্ষিত হইয়াছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে, হায়দরাবাদের নিজামের সংগে ভারত সরকারের সুদীর্ঘ আলোচনায় আপোষ-নিষ্পত্তির যে কিছু সামান্য সম্ভাবনা ছিল, সব নষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে সাম্প্র-দায়িকতান্ধ রাজাকর দলের বাহ্বাস্ফোট সেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি উগ্রতর হইয়া দারুণ অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। সর্বশেষ খবরে দেখা যাইতেছে, পণ্ডিত নেহরুর জরুরী আমন্ত্রণে হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলী দিল্লীতে গমন করেন। সুতরাং আলোচনার আর এক পর্ব আরম্ভ হইল; কিন্তু ইহাতেও সুফল কিছু লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে হায়দরাবাদের শাসন-নীতি বর্তমানে রাজাকার দল এবং তাহাদের নেতা সৈয়দ কাজিম রেজভীর করতলগত হইয়া পড়িয়াছে। নিজামের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার শাসন পরিষদ ভারত সরকারের সংগে আপোষ-নিষ্পত্তির আবেষ্টন দিয়া রেজভীর দলের গুণ্ডা নীতিকেই সম্প্রসারিত হইবার সুবিধা দিতেছেন। হায়দরাবাদের এই অশান্তিতে ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষেও উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তি সহজে নষ্ট হয় না। রেজভীর দল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, তাহার স্ফুলিঙ্গ যে কোন স্থানে ছুটিয়া পড়িয়া ব্যাপক অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে। এই সম্পর্কে এ সত্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, লীগের নেতৃবর্গ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-ভাবে এখনও মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার ধারাই বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল স্বরূপে স্বয়ং মিঃ জিন্না বারংবার স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে সেই সাম্প্রদায়িকতার উপরই জোর দিতেছেন। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামমূলক যে বর্বর বিদ্বেষ প্রচারের ফলে ৪০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পাকিস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা দূর হয় নাই। এমন কি, সেদিনও পাকিস্থানস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনারের উক্তিতে দেখা যায় যে, তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও সিন্ধুনদে গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জন দিবার ব্যবস্থাটি পর্যন্ত করিতে পারেন নাই। এরূপ অবস্থায় মধ্য-যুগীয় সাম্প্রদায়িকতার উৎসরূপে হায়দ্রাবাদকে কাজ করিতে দেওয়া কিছুতেই ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে কর্তব্য হইবে না। বস্তুতঃ রেজভীর ধর্মান্ধ গুণ্ডার দল বল-প্রয়োগের পথ ছাড়া অন্য কোন নীতি মানিয়া লইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের আর ইতস্ততের মধ্যে থাকা ঠিক হইবে না। তাঁহাদিগকে সাহসের সঙ্গে এই দানবীয় দৌরাত্ম্য উৎখাত করিবার সব ঝুঁকি লইতে হইবে। তাঁহাদের তেমন কঠোর নীতি অবলম্বনের ফলে রেজভীর চেলা-চামুণ্ডার দল—তাহারা প্রকাশ্য কিংবা গুপ্ত-ভাবে যে যেখানে আছে, যাহা সাধ্য থাকে করুক, সেজন্য সকল দ্বিধা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি সাধু নীতি নয়, এবং তাহা ভীরুতারই পরিচায়ক। ভারতের শাসন-নীতিকে আমরা এইরূপ দুর্বলতা এবং ভীরুতা হইতে মুক্ত দেখিতে চাই।

## বৃটিশ শ্রমিকদলের সম্মেলন

১৭ই মে থেকে ২১শে মে পর্যন্ত স্কারবরোতে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদলের বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল। সম্প্রতি পররাষ্ট্র নীতি ও অন্যান্য ব্যাপারে দেখা গেছে যে, ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদলভুক্ত পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে। শ্রমিকদলের সদস্যদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা তাঁদের কার্যকলাপের দরুণ চরমপন্থী নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁরা প্রায়ই শ্রমিক গভর্নমেণ্টের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে এঁদের একাধিকবার সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে দেখা গেছে। সম্প্রতি ইটালীর কম্যুনিস্ট দলের সমর্থক বামপন্থী সোস্যালিস্ট নেতা সিনর নেনিকে নির্বাচনে সাফল্য কামনা করে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এঁদেরই একাংশ সরাসরি শ্রমিক গভর্নমেণ্ট ও শ্রমিকদলের জাতীয় কর্মসংসদের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে জাতীয় কর্মসংসদ নেনি টেলিগ্রাম প্রেরণের উদ্যোক্তা পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ প্ল্যাটস্-মিলসকে পার্টি থেকে বিতাড়িত করেছেন। মিড্লস্‌বরো থেকে নির্বাচিত পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ অ্যালফ্রেড এডোয়ার্ডস্ কিছুদিন হ'ল শ্রমিক গভর্নমেণ্টের জাতীয়করণ নীতির কঠোর সমালোচক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধেও ব্যবস্থাবলম্বন হয়ে পড়েছিল জরুরী ব্যাপার। বিশ্বরাজনীতি ক্রমশ যেরূপ জটিল হয়ে উঠছে তাতে মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও নতুন করে পার্টির অনুমোদন নেওয়া ছিল অত্যাবশ্যক। একদিকে শ্রমিকদলের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ও অপরদিকে ১৯৫০ সালের সাধারণ নির্বাচন—এই দুটি প্রসঙ্গের পটভূমিকায় বিচার করলে শ্রমিকদলের এই বার্ষিক সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ১৯৪৬ সালে বোর্নমাউথে নির্বাচনী বিজয়োৎসবের মধ্যে শ্রমিকদলের বার্ষিক সম্মেলন হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে মারগেটে যখন বার্ষিক সম্মেলন হয়েছিল তখন শ্রমিকদল দৃঢ়ভাবে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত এবং তাদের প্রবর্তিত প্রগতিশীল আইন কানুনের দ্বারা বৃটেনের জনমত তখন বহুলাংশে প্রভাবিত। আজ পরিস্থিতি বহুলাংশে বদলে গেছে। আর এক বৎসর পরে বার্ষিক সম্মেলনে শ্রমিকদলকে ১৯৫০ সালের নির্বাচনের জন্যে উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রায় তারা যদি বৈপ্লবিক পরিবর্তন না আনতে পারে তবে নির্বাচনে মিঃ চার্চিলের রক্ষণশীল দল বেশী প্রভাব অর্জন করবে বলে মনে হয়। রক্ষণশীল দলকে আগামী নির্বাচনেও পরাজিত করতে হলে আগে শ্রমিকদলের মধ্যে পূর্ণ সংহতি ফিরিয়ে আনতে হবে এবং জনকল্যাণমূলক আইন-কানুন পাশ করার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

শ্রমিকদল প্রথম থেকেই ইংল্যাণ্ডের মূলগত শিল্পে জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করলেও এ নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে তারা ভিতর ও বাইরে থেকে বাধা পেয়েছে। ফলে তাদের জাতীয়করণের নীতি বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে কয়লাখনির উপর জাতীয় কর্তৃত্ব সংস্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি গ্যাস সরবরাহকেও জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয়করণের ফলে ইংল্যাণ্ডের কয়লা উৎপাদন বাড়ছে না কিংবা উৎপাদনের খরচও কমছে না। এর কারণ নির্ধারণের জন্যে সম্প্রতি একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রতিবাদে জাতীয় কয়লা বোর্ডের অন্যতম ডিরেক্টর স্যার চার্লস রিড্ পদত্যাগ করেছেন। তাঁর মতে জাতীয়করণের নীতি সর্বথা প্রশংসনীয় কিন্তু ইংল্যাণ্ডে জাতীয়করণ ব্যবস্থা ভ্রান্তভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রী মিঃ সিন্‌ওয়েল পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, নিছক জাতীয়করণের ব্যবস্থা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না, তার জন্যে চাই উপযুক্ত সংগঠন। ইংল্যাণ্ডে আছে এই সংগঠনের অভাব। নতুন নীতিতে পুরোনো সংগঠনের দ্বারা কাজ চালাতে গিয়েই ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়েছে। ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত রক্ষণশীল দল তো প্রাণপণে জাতীয়করণকে বাধা দেবার চেষ্টা করছেই—তার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চাপ দিতে আরম্ভ করেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদপ্তর থেকে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, ইংল্যাণ্ডে দ্রুতগতিতে জাতীয়করণ নীতির কাজ চলতে থাকলে ইংল্যাণ্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল সাহায্য নাও দিতে পারে। একদিকে এই অবস্থা, অপরদিকে আছে হাউস অব লর্ডসের বাধা। হাউস্ অব লর্ডসের ক্ষমতা সংকোচের জন্যে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট যে বিল এনেছেন তা আজও কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। মূল শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রকর্তৃত্বে আনতে না পারলে ইংল্যাণ্ডের জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার কোন উপায় নেই এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আগামী নির্বাচনে শ্রমিকদলকে বিপদে পড়তে হবে। এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েই স্কারবরো সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাই বলুক, জাতীয়করণের কাজ চলবেই এবং হাউস্ অব লর্ডস্ যাতে এ কাজে অনাবশ্যক বাধার সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্যে যথাসম্ভব শীঘ্র তার ক্ষমতা সংকোচ করতে হবে।* যথাসম্ভব শীঘ্র ইংল্যাণ্ডের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উপর জাতীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রস্তাবও ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে।

মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্রনীতিও বিপুল ভোটাধিক্যে পার্টির অনুমোদনলাভ করেছে। চরমপন্থী শ্রমিক সদস্যদের পক্ষ থেকে মিঃ বেভিনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তাঁর পররাষ্ট্রনীতি দক্ষিণপন্থা-ঘেঁষা হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের কোন বোঝাপড়া হতে পারছে না। ভোটাধিক্যে এ অভিযোগ টিঁকতে পারেনি। বার্ষিক শ্রমিক সম্মেলনে মোটামুটি শ্রমিক গভর্নমেণ্টের অনুসৃত নীতিই বিজয়ী হয়েছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে এটলী গভর্নমেণ্টের কোন বড় ধরণের নীতিগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। জাতীয় কর্মসংসদ নেনি টেলিগ্রামের উদ্যোক্তা মিঃ প্ল্যাটস্ মিলসকে দল থেকে তাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন বার্ষিক সম্মেলনে তা অনুমোদিত হয়েছে। শ্রমিক গভর্নমেণ্টের সমালোচক মিঃ আলফ্রেড এডোয়ার্ডসকেও দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শ্রমিকদলের ২৩ জন পার্লামেণ্ট সদস্য নীতিবহির্ভূতভাবে মিঃ চার্চিলের সাম্প্রতিক হেগ সম্মেলনে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধে জাতীয় কর্মসংসদ একটি কথাও বলেননি। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদল যে বেশ কিছুটা দক্ষিণপন্থী হয়ে পড়েছে এটা কি তার বড় প্রমাণ নয়? শ্রমিকদলের একটা অংশ যে ক্রমশ চরমপন্থী হয়ে উঠছে এবং দলের ভাঙন রোধ করতে গেলে যে শুধু তাদের তাড়িয়ে দিলেই চলবে না, এ সত্যও হয়তো শ্রমিকদল কিছু পরিমাণে বুঝতে পেরেছে। তা নইলে গ্রীক গভর্নমেণ্টের সন্ত্রাসবাদী নীতির বিরুদ্ধে সরকারীভাবে প্রতিবাদ জানানো হল কেন? এটা কি চরমপন্থীদের কিয়দংশে সন্তুষ্ট করে দলীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখারই প্রয়াস-সঞ্জাত নয়?

## পরমাণবিক কমিশনের অপমৃত্যু

বিশ্বের পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রায় ২২ মাসকাল ব্যর্থ শ্রম করার পর সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের পরমাণবিক কমিশনের অপমৃত্যু ঘটেছে। ১৭ই মের নিউইয়র্কের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, এই কমিশনের মোট ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে দেবার পক্ষে ভোট দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ও ইউক্রেন ছিল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কিছুকাল থেকে রুশ-মার্কিন বিরোধিতার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিচালনায় এমন একটা অচল

অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, কমিশনের পক্ষে আত্মবিনাশ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মূলগত প্রশ্ন সম্বন্ধে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে মতানৈক্য সেখানে প্রতিষ্ঠানের কাজ চলতে পারে কিভাবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভোটের জোর থাকলেও সোভিয়েটের 'ভেটো'কে অস্বীকার করে তার এগিয়ে যাবার কোন উপায় ছিল না। বিরোধের মূল কারণ ছিল নিম্নোক্তরূপ। নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল না কারও। কিন্তু উভয়েরই পদ্ধতি ভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে যে, বিশ্বশান্তির খাতিরে পরমাণবিক শক্তি উৎপাদন ও বর্ধনের উপর পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়া উচিত। জাতিবিশেষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্যে পরমাণবিক শক্তির উৎপাদন ও পরিবর্ধন সমর্থন করা চলে না। অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার বিশ্বাস যে, অধিকাংশ সদস্য সমর্থিত মার্কিন প্রস্তাব গৃহীত হলে অন্য জাতির সার্বভৌমত্বের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। দ্বিতীয়ত আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব সংস্থাপনের পূর্বে সকল জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, তারা তাদের দেশে পরমাণবিক বোমা প্রভৃতি অস্ত্রাদি নির্মাণ নিষিদ্ধ করে দেবে এবং তাদের যদি এই জাতীয় অস্ত্রাদি মজুত থাকে তবে তার বিনাশ সাধন করতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া—এই উভয় রাষ্ট্রের প্রস্তাবের মধ্যেই আংশিক সত্য আছে বলে মনে হয়। বিশ্বের শান্তি-রক্ষার জন্যে পরমাণবিক শক্তির উপর আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব স্থাপন অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই কর্তৃত্ব স্থাপন বহুলাংশে ব্যর্থ হবে যদি না সকল দেশের বর্তমান পরমাণবিক অস্ত্রাদি ধ্বংস করা হয়। শোনা যায় যে, বর্তমানে একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই বহু পরিমাণে নানা ধরণের পরমাণবিক অস্ত্রাদির মালিক। হিরোসিমায় পরমাণবিক বোমা ফেলার পর থেকে দুই বৎসরকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সম্বন্ধে ঘটা করে প্রচার চালিয়ে আসছে এবং বলা বাহুল্য যে, এই প্রশ্নটি কেন্দ্র করে মার্কিন-রুশ বিরোধ আর এক দফা বেড়ে গেছে। পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্যে একদিকে চলেছে আন্তর্জাতিক কমিশনের কাজ, অপর-দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোপনে উন্নততর ধরণের পরমাণবিক অস্ত্রাদি নির্মাণের চেষ্টা করে চলেছে। এই সেদিনও মার্শাল দ্বীপ-পুঞ্জের এনিওয়েটক অ্যাটল্-এ উন্নততর ধরণের পরমাণবিক অস্ত্রাদির সাফল্যপূর্ণ পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে প্রকাশ। পরমাণবিক কমিশনের অপমৃত্যুর ফলে এইবার প্রত্যেক দেশ গোপনে পরমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের জন্যে অধিকতর চেষ্টা করবে বলে আশঙ্কা করার কারণ আছে। পরমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হলে এই শক্তিকে জনকল্যাণকর যন্ত্রশিল্পের উন্নতি বিধানে নিয়োগ করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পরমাণবিক কমিশনের ব্যর্থতার ফলে এই শক্তি ধ্বংসাত্মক কর্মপ্রচেষ্টাতেই শুধু নিয়োজিত হবে। পরমাণবিক শক্তির প্রয়োগে ভাবী যুদ্ধ যে কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে তা বলা যায় না। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলির পরস্পর-বিরোধী কর্মনীতির ফলে বিশ্বশান্তি সুদূর-পরাহত হয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধই যে এগিয়ে আসছে পরমাণবিক কমিশনের শোচনীয় ব্যর্থতা তারই পরিচায়ক। আজ হোক, কাল হোক, সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানেরও যে শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি ঘটবে—একি তারই পূর্বাভাষ?

## ডাচ-ইন্দোনেশীয় বিরোধ

ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির ফলে আজ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কোন স্থায়ী মীমাংসা হতে পারেনি। রেনভিল্ চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটেছে সেই জানুয়ারী মাসে। কিন্তু ডাচরা এখনও কোন-না-কোন প্রকারে ইন্দো-নেশিয়ায় তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাতে উৎসুক বলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরী করতেও শৈথিল্য দেখিয়েছে। প্রধানত তাদেরই অযৌক্তিক দাবীদাওয়ার ফলে রেনভিল চুক্তিতে উভয় পক্ষের মধ্যে যে বারো দফা রাজনৈতিক আপোষরফার কথা আছে সেটাও বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি। স্বস্তি পরিষদ উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ-রফা ঘটানোর জন্যে যে সদিচ্ছা কমিটি নিয়োগ করেছেন তাঁরা চেষ্টা করেও বিরোধ মীমাংসার কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। সম্প্রতি আলাপ-আলোচনা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল যে, অচল অবস্থা সৃষ্টি হবার সুস্পষ্ট আশংকা দেখা দিয়েছিল। সদিচ্ছা কমিটি পুনরায় চেষ্টা চরিত্র করে উভয় পক্ষের আপোষ আলোচনা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সদিচ্ছা কমিটির মধ্যস্থতায় ব্যাটাভিয়ায় উভয় পক্ষের আপোষ আলোচনা চলছিল। কথা ছিল যে, ২৫শে মের পর আপোষ আলোচনাকারীরা রিপাব্লিকের রাজধানী যোগজাকার্তার অদূরবর্তী পার্বত্য শহর কালিউরাং-এ যাবেন এবং সেখানে আপোষ আলোচনা চলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাচ প্রতিনিধিদল এ প্রস্তাবে অসম্মত হন। এই পরিস্থিতির মধ্যে অকস্মাৎ ২০শে মে তারিখে এই পর্যায়ের আলাপ-আলোচনার ব্যর্থ পরিণতি ঘটে। ওয়াকিবহাল মহল এই ব্যর্থ পরিণতির মধ্যে একটা আসন্ন ঝটিকার পূর্বাভাষ দেখতে পাচ্ছেন। তাঁদের দৃঢ় ধারণা যে, আগামী ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে আপোষ আলোচনায় একটা বড় ধরণের সঙ্কট সৃষ্টি হবে।

সঙ্কট সৃষ্টির মূল কারণ একাধিক। অন্তর্বর্তী ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠনের ব্যাপারে ডাচরা কিভাবে ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিকের দাবী উপেক্ষা করেছে তা আজ কারও অজ্ঞাত নয়। প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারেও ত অহেতুক কালক্ষেপের নীতি গ্রহণ করে। তারা বলছে যে, চুক্তি অনুযায়ী সম্মিলিত ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্র গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিককে ডাচ সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হবে। যে মন্থর গতিতে আপোষ আলোচনা এগিয়ে চলেছে তাতে কবে যে সম্মিলিত ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্র সংগঠন সম্ভব হবে—এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা চলে না। তাই রিপাব্লিক ডাচদের এ দাবী মেনে নিতে রাজী নয়। গত ২০শে মে তারিখে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ৪০তম বার্ষিকী সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়েছে। ঠিক ৪০ বৎসর পূর্বে ইন্দোনেশীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান "বুদি উতমো"র গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে "যদি ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন না হয়, তবে ডাচ অধিকৃত অঞ্চলে—বিশেষ করে পূর্ব ইন্দোনেশিয়া ও বোর্নিওতে বিরাট বিপ্লবের সম্মুখে সব কিছু ভেসে যাবে।" ইত্যবসরে পশ্চিম জাভার বান্ডোয়েং শহরে ২৭শে মে তারিখে বিভিন্ন দলের একটি সম্মেলন আহূত হয়েছে। এই সম্মেলনের প্রধান হোতা ডাচ গভর্নর জেনারেল ডাঃ ভ্যানমুক্। রিপাব্লিকানদের ইচ্ছা করে এই সম্মেলন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সম্মিলিত ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্র কি রূপ নেবে সে সম্বন্ধে আলোচনাই হবে সম্মেলনের প্রধান কাজ। ডাচ অধিকৃত অঞ্চলের রিপাব্লিক সমর্থকরা ব্যাটাভিয়ায় এর একটি পাল্টা সম্মেলন আহ্বান করেছিল। কিন্তু ডাচ কর্তৃপক্ষ শান্তিভঙ্গের ধুয়া তুলে সে সম্মেলন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

ডাচ-ইন্দোনেশীয় বিরোধের অনেকগুলি মূল কারণের মধ্যে একটি হল ডাচ-অধিকৃত রিপাব্লিকের অঞ্চলগুলিতে গণভোট গ্রহণের প্রশ্ন। এ ছাড়া আছে অন্তর্বর্তী ফেডারেল গভর্নমেণ্টে রিপাব্লিকের অংশগ্রহণের প্রশ্ন, রিপাব্লিকের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রশ্ন এবং রিপাব্লিকের বাহিনী সংরক্ষণের প্রশ্ন। এসব প্রশ্ন মূলগত। এদের সম্বন্ধে আজও উভয় পক্ষের সন্তোষজনক কোন মীমাংসা হয়নি। ডাচরা তাদের মূল দৃষ্টি-ভঙ্গী না পাল্টালে এ সম্বন্ধে কোন সন্তোষ-জনক মীমাংসা হওয়াও আমরা সম্ভব মনে করি না। স্বস্তি পরিষদের সদিচ্ছা কমিটি উভয় পক্ষের আপোষ-আলোচনা ঘটানোতে অহেতুক কালক্ষেপ না করে যদি ডাচদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উপর বেশী জোর দেন তবে কিছুটা কাজ হলেও হতে পারে। তা নইলে আজ হোক, কাল হোক ইন্দোনেশিয়ায় বিপ্লব-বহ্নি জ্বলে উঠবেই।

২২-৫-৪৮

ভারত সরকার—পাকিস্থানে খাঁটি দুধ, তাজা ফল ও শাকসব্জী চালানের উপর হইতে বিধিনিষেধ উঠাইয়া নিয়াছেন।—"পাকিস্থান সরকার জলো দুধ, পচা ফল ও বাসি শাকসব্জী ভারতে যাতে অবাধে চালান দে'য়া যায়—সে সম্বন্ধে বিবেচনা করছেন"—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

*   *   *   *

খাজা নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন—বাংলার মসনদে আসীন থাকা কালীন লীগ গরীব দুঃখীদের জন্য যাহা করিয়াছেন

অপর কোন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশুখুড়ো বলিলেন—"খাজা সাহেব নিজেদের প্রশংসা নিজেরা না করলেও পারতেন, দুর্ভিক্ষের দৃশ্য যারা দেখেছেন তারা সবাই লীগের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের কথা অবগত আছেন!"

*   *   *   *

টেরিফ বোর্ডের সমক্ষে তাঁর সাক্ষ্যে শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম আয়েংগার বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের নির্লজ্জ মুনাফাবাজির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।—"এই বারে এতদিন পর আমাদের লজ্জা নিবারণের একটা সুরাহা হলো"—বলিল আমাদের শ্যামলাল।

*   *   *   *

"Education as Calcutta University subject"—একটি সংবাদের শিরোনামা। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এ্যাদ্দিন পর শিক্ষায়তনে যখন "শিক্ষাকে" স্বীকার করা হয়েছে, আশা করি এবার শিক্ষকদের

World's best fish museum at Florida—অন্য এক সংবাদের শিরোনামা। এ ব্যাপারেও বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন—"ফ্লোরিডা এই গৌরবের দাবী আর বেশী দিন করতে পারবে না, আমাদের মিউজিয়মে মাছের কাঁটাগুলো একবার সংগ্রহ করে আনার অপেক্ষা মাত্র।"

*   *   *   *

একটি সংবাদে শুনিলাম বোম্বাইয়ে নাকি একটি "স্বভাব-চিকিৎসা" শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। "কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই স্বভাব যায়না ম'লে প্রবাদটির সঙ্গে পরিচিত নন"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

*   *   *   *

কলিকাতার নগর কোতোয়াল প্রধান আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এখানে নাকি অপরাধের মাত্রার হ্রাস হইয়াছে। অপরাধের যে ফিরিস্তি তিনি দিয়াছেন তাহাতে দেখিলাম চোরাকারবারের উল্লেখ নাই। বুঝিলাম ইহা অপরাধের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

*   *   *   *

শুনিলাম সোভিয়েট সমাজে নারী আজ প্রত্যেক ব্যাপারে পুরুষের সঙ্গে সমান আসনে অধিষ্ঠিতা। "আমাদের

এখানেও তাই, বাদে ঐ ট্রামের সীট্"—মন্তব্য বিশু খুড়োর।

*   *   *

ট্রান্সভালে একটি কুমীর ধরা পড়িয়াছে আর তার পেটে নাকি পাওয়া গিয়াছে — — — দাঁত আর মল। সংবাদে বলা আদি অধিবাসীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কুমীরটি কোন্ দেশী সেই কথার উল্লেখ সংবাদে নাই। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সেটি অন্ততঃ ট্রান্সভালের আদি অধিবাসী নয়"।

*   *   *   *

কতদিন আগে একটি সংবাদে শুনিয়াছিলাম—"No extra ration for Australian cricketers"—ভাবিয়াছিলাম জাঁদরেল "ডনের" টিমকে কাবু করিতে বৃটেন তার পররাষ্ট্র নীতিটি আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু পর পর প্রথম

কয়টি খেলার ফল দেখিয়া বুঝিলাম—ভাতে মারিবার নীতিতে অস্ট্রেলিয়া ঘায়েল হইবে না।

*   *   *   *

অলিম্পিক ফুটবল টিম সম্বন্ধে খুড়োর মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"অলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রটা মা কালীর এলাকার বাইরে—সুতরাং মানৎ আর হে মা কালী'তে কাজ হবে না একথাটা ভেবে টিম পাঠাবার ব্যবস্থা করলে কর্তৃপক্ষ ভালো করবেন।"

*   *   *   *

"BRITAIN is a country of coupons and queues and America is a country of cards cameras, and comforts"—

বলিয়াছেন মিঃ আসফ আলি। প্রসঙ্গতঃ হঠাৎ একটি সংবাদ মনে পড়িয়া গেল—আমেরিকা নাকি বছরে প্রায় সাত শত পঞ্চাশ কোটি টাকা মদ্যপানে ব্যয় করেন। Coupon আর queueর দেশের অধিবাসীরা ইহা শুনিয়া নিশ্চয় বলিতেছেন—

"তোমার ঐ মাধুরী সরোবরের নাই যে কোথাও তল

# অষ্ট্রিয়ার আর্ট-সংগ্রহ

শ্রীমতিলাল দাশ

১৯৩৬ সালে গিয়েছিলাম য়ুরোপ। সে য়ুরোপ আজ নেই—মাত্র দশ বৎসরে তার পরিপ্রেক্ষিত একেবারে বদলে গেছে। কিন্তু জীবনের চির-চঞ্চল গতির মাঝে শিল্পকলা তার চিরন্তন আবেদন নিয়ে মানুষের কাছে যে মূল্য পায়, তার পরিবর্তন হয় না। তাই এতদিন পরেও ভিয়েনায় শিল্পকলার যে অতুলনীয় সম্পদ দেখবার সুযোগ হয়েছিল, আজ এই প্রবন্ধে তার কিছু পরিচয় দেব।

চারুশিল্পের প্রত্যেক বিভাগেই তার দান অসামান্য—ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংগীত,

ত্রিদেব আরাধনা

শিল্পী : ডুরার

অভিনয় সব বিষয়েই ভিয়েনা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেছে। ভিয়েনার যাদুঘরগুলি সত্যই যাদুঘর। দেশ-দেশান্তর থেকে তাতে সঞ্চিত হয়েছে কত বিচিত্র উপকরণ। এর সম্ভব হয়েছিল Haboburg dynasty নামক রাজবংশের অপরিমিত অধ্যবসায় ও উৎসাহে।

রাজকীয় কলাভবন ছাড়া, সম্ভ্রান্ত নরনারীদের নিজেদের ব্যক্তিগত নিজস্ব চিত্রসংগ্রহ প্রশংসার্হ। রুচিবোধ এমন এক সম্পদ যা পরিশীলনে ও পরিবেশে বৃদ্ধি পায়। ভিয়েনায় এই রসবোধ বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ ছিল। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই—হয়ত তেমনই আজ ভিয়েনা হৃতসর্বস্ব। তার শিল্পকলার সংগ্রহগুলি অক্ষত ও সম্পূর্ণ আছে কিনা জানি না—তবে না থাকলে মানুষের একান্ত ক্ষতি হবে।

অস্ট্রিয়ার রাজবংশই ছিল Holy Roman Empire নামক কাল্পনিক সাম্রাজ্যের কাল্পনিক রাজ-মুকুটের অধিকারী। বার্গান্ডির ডিউকগণ পঞ্চদশ শতাব্দী ও তার পূর্বে যে সমস্ত শিল্পকলার অধিকারী ছিলেন—অস্ট্রিয়ার রাজারাই তার অধিকারী হয়ে পড়েন।

যাদুঘর গড়ার কল্পনা অতি পুরাতন নয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মাত্র এই মনোভাব য়ুরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, আর এই সময়েই অস্ট্রিয়ায় রাজবংশের ক্ষমতা তার গৌরব-শিখরের চূড়ায় অবস্থিত ছিল।

তাই ভিয়েনার যাদুঘরে আছে কেবল অস্ট্রিয়ার সম্পদ নয়, আছে দেশ-দেশান্তরের সৌন্দর্যসম্ভার। যেখানে যা আহরণীয় ছিল, তা সংগ্রহ করে এনে এই সব কলাভবনকে সমৃদ্ধ করবার অপ্রাণ চেষ্টা হয়েছিল।

এই চেষ্টার একটি মন্দ দিক আছে। সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর চরণে মানুষের যেসব অবদান, তা নিষ্প্রয়োজন হয়নি। হয়ত কোথাও ধর্ম দিয়েছে তার উদ্দীপনা, কোথাও প্রেম দিয়েছে অনুপ্রেরণা—শিল্পকলার সেই নিজস্ব পরিবেশ থেকে তাদের ছিনিয়ে আনা অতিশয় অন্যায়। কিন্তু এই অন্যায়-বোধ মানুষকে নিরস্ত করেনি। সুরভিত সুন্দর পুষ্প শাখায় হয়ত অধিক সুন্দর, কিন্তু তবু মানুষ তাকে তুলে এনে গাঁথে মালা ও স্তবক।

Kunsthiterische Museum ভিয়েনায় সবচেয়ে বড় যাদুঘর—এর সংগ্রহ যেমন বিপুল—এর সংগ্রহের ইতিহাসও তেমনই কৌতুককর। অস্ট্রিয়া-রাজ ফার্দিনান্দের পৌত্র রুডলফ অনেক চমৎকার ছবি সংগ্রহ করেছিলেন—সেগুলি সবই এখন এই যাদুঘরে এসেছে। প্রথম লিওপোল্ডের কাকা যে চিত্র সংগ্রহ করেছিলেন—সেগুলি লিওপোল্ডই পান এবং তাই নিয়েই Vienna Picture Gallery নামক চিত্রশালার উদ্বোধন হয়।

The Gallery of the Academy of fine Arts নামক চিত্রশালাটি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কাউন্ট ল্যাম্বার্গ যে সংগ্রহ দান করেন, তার উপর ভিত্তি স্থাপন করেই এই চিত্রশালা স্থাপিত হয়। এখানে রুবেনস ও অন্যান্য ডাচ চিত্রকরদের ছবির বিশেষ সুন্দর সংগ্রহ আছে।

আধুনিক চিত্রশালা (Modern Gallery) উনবিংশ শতাব্দীর শেষে অস্ট্রিয়ার নিজস্ব চিত্রকরদের ছবির সংগ্রহের জন্য স্থাপিত হয়। ভিয়েনার চিত্র সংগ্রহ হতে সতেরোখানি ছবির প্রতিকৃতি এই সঙ্গে দেওয়া হল। এর থেকে এই সব যাদুঘরের বৈচিত্র্য ও রুচিবোধ আমরা বুঝতে পারব। চিত্রগুলি প্রত্যেকখানিই যেমন বিষয় নির্বাচনে তেমনই তুলিকাসম্পাতে অপূর্ব।

এই সংগ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি র‍্যাফেলের ম্যাডোনা। ইতালীয়েরা ভদ্রমহিলাকে ম্যাডোনা বলে সম্বোধন করত—বর্তমানে বলে সিনোরা—কিন্তু চিত্রকরদের কল্যাণে বর্তমানে ম্যাডোনা বলতে বুঝায় জননী মেরীকে। র‍্যাফেল নানা গির্জার জন্য মেরী মাতার নানা ছবি এঁকে-

মানুষের পতন

শিল্পী : ভ্যানডার গোজ

ছিলেন, তাদের বুঝাবার জন্য প্রত্যেক ছবির একটা বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে। এখানকার ছবিটি উপ-বনবিহারিণী ম্যাডোনার ছবি। মাতৃত্বের গৌরবোজ্জ্বল শান্ত মুখচ্ছবি—প্রসন্ন হাসির বিদ্যুৎ ঝলক—ক্রীড়ারত শিশু দুইটির চঞ্চলতা কেবল র‍্যাফেলের মত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতেই ফুটতে পারে। ম্যাডোনার ছবি ভক্ত খৃষ্টানের অন্তরে নানা ভক্তির আবেগ, ভাব ও রস জাগরিত করে—তাই ম্যাডোনাকে নিয়ে নানা কাব্য, গীতি ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

ছবিতে আমরা শিল্পীর প্রথম চেষ্টার রূপ দেখি। যে বাস্তব পটভূমিকার উপর শিল্পী রচনা করতেন তার চেহারা দেখে

ম্যাডোনা শিল্পী : টিসিয়ান

তিনজন দার্শনিক শিল্পী : জর্জিয়োন

আমরা শিল্পীর সৃজন-প্রতিভা ও চাতুর্যের পরিচয় পাই।

শিশু-দেবতা যীশুকে কেন্দ্র করে শিল্পীরা বর্ণ ও রেখার সম্পাতে এক নব রসলোক সৃষ্টি করেছেন। তার আগমন চেয়ে যুগ-যুগান্তর মানুষ বন্দনা গেয়ে চলেছে—হঠাৎ এলেন তিনি, আলোকে ও পুলকে জগৎ মেতে উঠল। সুসমাচারের যীশুর শৈশব নিয়ে যে রসচিত্র আমরা পাই, তা থেকে অনেক শিল্পীরা অনেক ছবি এঁকেছেন। টিসিয়ানের ম্যাডোনা ছবিতে দেখি—মা মেরী ফল হাতে রয়েছেন। শিশু লোলুপদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মায়ের স্নেহবিহ্বল ভাবালুতা এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে যে, ছবিটিকে জীবন্ত বলেই মনে হবে।

ছবিখানি জীবনের জয়গানে ভরা—মায়ের ও শিশুর নিটোল স্বাস্থ্য, কমনীয়তা ও লাবণ্য পরিপূর্ণতার উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত। আনন্দের যে প্লাবনে শিল্পীর অন্তর প্লাবিত তার অনেকখানিই তিনি দর্শকের জন্যও দিতে পেরেছেন, এইখানেই এই পরমগুণীর কৃতিত্ব পরিস্ফুট। শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য—তিনের সমবায়ে ছবিটিতে এক অপরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা বিকশিত হয়েছে।

এই ভিনিশীয় শিল্পীর বর্ণরাগসমুজ্জ্বল চিত্রমালার আর একখানি মাত্র এই সংগ্রহে আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, টারকুইনিয়াস লুক্রেসিয়াকে হত্যা করতে উদ্যত। তিনি তার প্রতিভার কিরণ সম্পাতে এই ছবিখানিকে অমরত্বের গৌরবে দীপ্ত করে তুলেছেন। হত্যাকারীর মুখে বিষাদ, ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দৃঢ়, পেশল হস্তের জিদ আর বিপন্না নারীর বিষাদকাতর মুখমণ্ডল দর্শকের মনে যে ভাব সঞ্চার করে, তা সহজে ভুলবার নয়।

করেজিওর একখানি মাত্র ছবি আছে। করেজিও উত্তর ইতালীর করেজিও শহরে জন্মগ্রহণ করেন—গ্রামের নামেই তিনি পরিচিত। সুন্দর এবং ভাবপূর্ণ পরিবেশের উপর শিল্পী আপন চিত্রটি পরিস্থাপিত করেছেন—রেখাঙ্কনে শিল্পীর শারীরতত্ত্বের জ্ঞান সুপরিস্ফুট। ছায়া ও আলোর পরিপ্রেক্ষিতে করেজিও ছিলেন ওস্তাদ—একেই ইংরেজিতে বলে Chiaroscuro—পটভূমিকার কালো মেঘমালার সহিত জোর শারীর সৌন্দর্য যেন দর্শকের চোখে প্রত্যক্ষভাবে খুলে ধরা হয়েছে। শিল্পীর এই অসাধারণ শিল্প-চাতুর্য তাকে অমর আসন দিয়েছে।

পারমেজিয়ানিও তার মকরকেতনের ছবি নিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রীক পুরাণের গল্পে আমরা পাই আফ্রোদিতে ভেনাস এবং তাঁর সুকুমার পুত্র কিউপিড মানুষের হৃদয়ে প্রেম জাগরূক করেন। মকরকেতনের কাজ ছিল পুষ্পশর ক্ষেপণ। শিল্পী প্রেমের এই সুকুমার চঞ্চল দেবতার চোখে যে ধূর্ত চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা ভুলবার নয়। রেখা ও রঙের অপূর্ব সমন্বয়ে চিত্রখানি শিল্পজগতে অনন্য স্থানলাভ করেছে।

ম্যাডোনা শিল্পী : র‍্যাফেল

ফ্লেমিশ ও ডাচ শিল্পকলার অপূর্ব সংগ্রহের মধ্যে রেমব্রাণ্ড, রুবেনস ও ভান ডাইকের কতকগুলি ছবি আমরা পাই। রেমব্রাণ্ড নিজের অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন। শিল্পকলায় ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা—একই 'মডেল' নিয়ে বারংবার তিনি রূপ ফুটাবার চেষ্টা করতেন—বিচিত্র ভঙ্গিমায় এবং বিচিত্র রূপ এবং বিচিত্র ব্যঞ্জনায় তিনি একেকে বহু করে উপভোগ করতেন তার পরে অপূর্ব প্রতিভায় মনোমত কোনও রূপকে তিনি অমরত্ব দিতেন। নিজের ছবি নিয়ে এ-কাজ করা সবচেয়ে সহজ ছিল—আয়নার সম্মুখে বসে তিনি স্বয়ং যে কোনও ভাবে এবং যে কোনও ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করতে পারতেন এবং চিত্রশিল্পের সুরে তাকে সুরময় করে তুলতেন।

এই সংগ্রহের মধ্যে রেমব্রাণ্ডের নিজের প্রতিকৃতি আছে। নিজের এই ছবিখানি ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের আঁকা—তখন তাঁর চিত্ত শোকে ও দুঃখে উদ্বেল। নিষ্ঠুর ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি ক্লান্ত। সে অবসাদ ছবিখানিতে আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। প্রাণপ্রিয়া পত্নী তার গৃহকে আলো করে নেই—তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার চোখে। শিল্পীর পিছনে যে সরস সবু

ভক্তি নিবেদন                                                            শিল্পী : রুবেন্স

...সুর মানুষ, সেটি যেন বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভ্যানডাইক একজন এন্টোয়ার্প বণিকের পুত্র। তার শিল্পানুরাগ বিকাশের নানা সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। জীবনে কীর্তি-গৌরবও অজস্র এসেছিল ইতালী, ফ্লান্ডারস, ইংলণ্ড যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই সকলে তার শিল্পকে সমাদর করেছে। সফলতা ও সুযশ তার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। ভ্যান-ডাইক তার পূর্বগ রুবেন্সের নিকট নানা দিক থেকে ঋণী। তাঁরই উপদেশে ভ্যানডাইক ইতালীয় শিল্পাচার্যদের অমর চিত্রকলা অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করেন।

সবচেয়ে বেশী ছবি রয়েছে রুবেন্সের। এন্টোয়ার্প শহর বাণিজ্য এবং কল-কারখানার জন্য বিখ্যাত—কিন্তু এখানে শিল্প ও কলারও বেশ এক সুন্দর কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে ফ্লেমিশ চিত্রকরদের যুগ্ম-নক্ষত্র ভ্যানডাইক ও পিটার রুবেন্স বাস করতেন। ফ্লেমিশ জাতি শিল্পনিপুণ—তারা গালিচা, লেস, কাচ এবং পোর্সিলেনের উপর যেমন কারুকার্য করত জগতে তার তুলনা নেই। এখানে প্লান্টিনের চিত্রশালা ও বিদ্যালয় ছিল। প্রতিভাশালী যুবকেরা চিত্রবিদ্যা শিখতে এখানে উৎসাহ ও সম্বর্ধনা পেত।

রুবেন্সের হেলেনের ছবি সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর চরণে শিল্পীর পূজার শতদল। এটি কাল্পনিক নয়—হেলেন ফোরমেণ্টের প্রতিকৃতি। তথাপি শিল্পী তার মাঝে আপন প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং ছায়া রেখে গিয়েছেন। এ যেন অচঞ্চল যৌবনের রূপক; উর্বশীর মত সে অনন্যা—তাকে দেখেই বলা যায়, মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গা দেয় পদে তপস্যার ফল। উর্বশী কবিতায় যে অদৃশ্যলোকের প্রতি ইঙ্গিত আছে, এই ছবিতে তেমন কোনও অবিনশ্বর ভাব নেই—তথাপি ছবিখানি প্রত্যেক বিদগ্ধ দর্শকের মন ভোলায়। আলো-ছায়ার সঙ্গতি—ভাবের সাবলীল গতি এবং নিপুণতায় ছবিখানি অনুপম।

সন্ত জাস্টিনা                                        শিল্পী : মরেত্তো

তাঁর "ভক্তি-নিবেদনে"র ছবিগুলিতে রয়েছে পূজার দীনতা ও নম্রতা। মঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় জীবনে যে পারমার্থিক ক্ষুধায় কাতর ছবিগুলিতে সেই আধ্যাত্মিকতার আকুতি ফোটাবার চেষ্টা করেছে।

রুবেন্সের নিজের প্রতিকৃতিখানি চিত্র-শিল্পের এক অনবদ্য উপহার। মুখে রূপকারের অন্তর যেন ভাবে ও রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সুবৃহৎ কপোল, স্বপ্নাতুর চোখ এবং বেদনাবিগলিত মুখচ্ছবি দর্শককে তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, লোকটি কবি নয়, চিত্র-শিল্পী। সর্বোপরি রয়েছে এক সুদৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস—খানিকটা দর্পের ভাব—খানিকটা উপেক্ষার ভাব। বালিকার ছবিটি হাস্যদীপ্ত। শিশু-মনের বিচিত্র ভাবাবেগ তুলিকায় এক আশ্চর্য রূপ নিয়েছে। তার দৃষ্টি তার একান্ত নিজস্ব—স্বচ্ছ, উদার ও তন্ময়। নির্লিপ্ত ও উদাসীন শিশুর যেন অন্তরে রয়েছে ঐশ্বর্য—সেই অন্তরের অমৃত যেন চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রথম জেমসের ছবিখানির মর্মনিহিত সত্য উপলব্ধি করতে হলে ইংলন্ডের ইতিহাস জানা দরকার। স্টুয়ার্ট-যুগ রাজা ও প্রজার বিদ্রোহের যুগ। অন্তর্বিপ্লব ও গৃহবিবাদের কারণ ছিল জেমসের অদ্ভুত মতবাদ। রাজা জেমস মনে করতেন, তিনি ভগবানের প্রতিভূ, তিনি আইন করবেন—লোকে তাই মানবে—কিন্তু তিনি নিজে আইনের অতীত। এই ছবিতে জেমসের নিজেকে দেবতায় উন্নয়নের প্রয়াস রূপকে ও ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করা হয়েছে।

পরিচারিকা চিত্রটি সারল্য ও শক্তির পরিচায়ক। রাণী ইজাবেলার সঙ্গিনীর ছবিতে শিল্পী আপন সহজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

এই সংগ্রহে লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির এক-

ম্যাডোনা শিল্পী : ক্যারাভাজিও

খানি ছবি আছে। গিনিভেরা ছবিটি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আঁকা। তার কুঞ্চিত অলকদামের পিছনে পত্রল বনছায়াটি বেশ মনোজ্ঞ হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী তরুণীর মুখচ্ছবি প্রাণারাম। তার উদ্ভিন্ন যৌবনের লাবণ্য, তার সহজ মোহময় মাধুর্য যে কোনও পরিবেশে লোককে ভুলাবে, কিন্তু শিল্পীর প্রতিভার সেই স্বাভাবিক জ্যোতি দীপ্ততর হয়ে উঠেছে। তার মুখের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে—তার সজীব সৌন্দর্যে, তার চিবুকের উজ্জ্বল প্রকাশে এবং মুখমণ্ডলের পরিপূর্ণ প্রসাদের ভঙ্গিমায়। মুখের অবয়বের সরস ব্যঞ্জনাটি দক্ষিণ দেশের বসন্তচ্ছবির সমস্ত সৌন্দর্যকে যেন এক আপন ভাবালুতায় প্রকাশ করে দিয়েছে। ছবিখানি যেন উদ্বেল যৌবন মদিরায় কাণায় কাণায় ভরা।

নিজের ছবি রেমব্রাণ্ড

'শিল্পীর সাধনা' ছবিটির জগৎজোড়া নাম। এই ছবিখানি Czernie গ্যালারিতে আছে—চিত্রকর—ভারমিয়ার। সপ্তদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ বা সপ্তম দশকে আঁকা। শিল্পীর ভাবতন্ময়তা এবং রূপসী তরুণীর গরিমাবোধ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। স্থান, কাল ও পরিবেশ সকলই সুনিপুণ পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত। বৈভব ও সমারোহ না থাকলেও দ্যুতি ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ এই ছবিটিকে কেউ ভাল না বলে থাকতে পারবেন না।

স্থানাভাবে এ সকল চিত্র এখানে দেওয়া সম্ভব হলো না।

ভ্যাণ্ডার গোজের ক্ষুদ্র ছবিটি অতিশয় সুন্দর। গল্পটি বাইবেলের আদম ও ইভের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে অধঃপতনের কাহিনী।

আত্মপ্রতিকৃতি রুবেন্স

চিত্রকর চিত্রে আদম, ইভ ও জ্ঞানবৃক্ষকে চিত্রিত করেছেন, সর্পরূপী শয়তানকে বেশ মনোজ্ঞ ভাবে অঙ্কিত করেছেন। ইভের মনের আগ্রহ এবং আদমের বারণ না মেনে জ্ঞানবৃক্ষের ফল আহরণকে বেশ অনিন্দ্যভাবে দর্শকের চোখের সম্মুখে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

এলডোরফারের খৃষ্টের পুনরুত্থান ছবিটি বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক। স্বপ্ন পরিবেশে খৃষ্টধর্মের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে চিত্রকর বেশ ক্ষমতার সংগে পরিস্ফুট করলেন। নিসর্গ চিত্রের মাঝে এক অসীম আনন্দের আভাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—সেই আনন্দ ও প্রেমের সুর খৃষ্টের জ্যোতির্দীপ্ত মুখমণ্ডলে যেন গান গেয়ে উঠেছে। পৃথিবীর দুঃখ ও বেদনার ভার শেষ করতে এসেছিলেন যে দেবদূত—মৃত্যু ও শোকের বিনিময়ে তিনি

শিল্পীর প্রিয়া শিল্পী : ওয়াল্ড মুলার

মানুষের জন্য এনেছেন অমর প্রাণ—এই ছবি নিপুণ ভাবে অভিব্যঞ্জিত করছে।

জর্জিয়োনির তিনজন দার্শনিকের চরিত্র পার্থক্য ফুটাতে শিল্পী বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। একজনের সংশয়, অপরের দৃঢ়তা এবং তৃতীয়ের কৌতূহল বেশ চমৎকার হয়ে ফুটে উঠেছে। ইহার স্বাভাবিকতায় চিত্রখানির সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছে।

মরেটোর সন্ন্যাসিনী জাষ্টিনার ছবি তপস্বিনী নারীর ছবি। তপস্যা তাকে শুষ্ক করেনি—তার পরিপূর্ণ জীবন-স্বপ্ন তপস্যার মাঝেও প্রতিবিম্বিত। জাষ্টিনার এ মাধুর্য পরিকল্পনায় শিল্পীর বেশ মৌলিকতা আছে। বেদনার সংগে কোন সম্পৃক্তি নেই—তাই ছবিটি কোথাও শোকে আড়ষ্ট হয়ে ওঠেনি।

ম্যাডোনা যুরোপীয় শিল্পীদের সকলের মনে নানা ভাব জাগিয়েছে। সকলেই তাঁকে

লুক্রেশিয়া শিল্পী : টিশিয়ান

দিয়ে এই অফুরন্ত ভাবের উৎসটিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ক্যারাভাজ্জিও ম্যাডোনাকে জপমালা পরিয়ে ধ্যানরতা করে দেখিয়েছেন। মায়ের ও শিশুর উভয়ের মুখে শিল্পী এক অলৌকিক ভাব সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছেন।

মাকার্টের আরিডেনের জয়গৌরব গ্রীক কাহিনীর পৌরাণিক রসে অভিসিঞ্চিত।

ওয়াল্ডমুলারের শিল্পীর প্রিয়া আপন প্রিয়তমার আলেখ্য। সহজ ও স্বাভাবিক অথচ তাতে এক মধুরতার মোহ আনতে পেরেছেন বলেই এই ছবিটি আমাদের খুব ভাল লাগে। শিল্পীর প্রিয়া যেন অমৃতের আস্বাদ পেয়েছেন এবং গেয়ে উঠেছেন—

আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে
জ্যোৎস্না রাতের নিদ্রাবিহীন শশী।

এই চিত্রমালায় আনন্দোপভোগের সঙ্গে এ কথাই স্বতঃই মনে হয় শিল্পী কি ভাবে আমাদের হৃদয় জয় করেন। তিনি যখন আঁকেন মনে হয় তা এসেছে অবলীলাক্রমে তার হৃদয়ের আনন্দে উজ্জীবিত হয়ে। কিন্তু তার পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের সাধনা ও কঠোর অধ্যবসায়। চিত্রকলাকে পরিপূর্ণভাবে সম্ভোগ করতে হলে শিল্পীর এই সাধনা ও আনন্দদ্যুতি—এই দুইকেই বুঝতে হবে।

নানা দেশের ও নানা কালের এই মহার্ঘ রত্নমালার সংগ্রহ ছিল ভিয়েনায়, তাই ভিয়েনাকে বড় ভাল লেগেছিল আমার। জানি না, নীলা দানিয়ুবের তীরে ভিয়েনা তেমনই আনন্দ-কলরবে মত্ত কি না। কিন্তু ওর বর্তমান যতই

বালিকা শিল্পী : রুবেন্স

দুঃখের হোক—তাতে শোকের কারণ নে
কারণ য়ুরোপ জানে পুনরুজ্জীবনের মন্
অন্ধকার রাত্রিতে সে বসে কান্নাকাটি করে
—নবারুণের অভ্যুদয়ের জন্য সে সাগ্রহে চে
থাকে।

গিনিভেরা শিল্পী : লিওনার্ড

জয়গৌরব শিল্পী মাকার্ট

## “বনফুল”

তোমার চিঠি পেলাম। বেকার সমস্যাটাই তো আজকালকার দিনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্য দেশেও। একটা জিনিস ভেবে দেখেছ কি কখনও? অন্যান্য অনেক অস্বাভাবিক সমস্যার মতো বেকার সমস্যাটাও মানুষদেরই একচেটে। পশু-জগতে বেকার নেই। পশু-জগতে বেকার সমস্যার উদ্ভব হয় হয়তো সাময়িক ভাবে, কিন্তু প্রকৃতি অনতিবিলম্বে তার সমাধান করে দেন। সে সমাধানের নাম মৃত্যু। মনুষ্যেতর পশু-সমাজে বেকাররা আন্দোলন করে সমস্যা সৃষ্টি করবার সুযোগ পায় না। মানুষদের মধ্যেও যারা পশু-স্তরের কাছাকাছি বাস করে তারাও বেকার হলে মুখ বুজে নীরবে মারা যায়। আন্দোলনকারী বেকাররা ঠিক বেকার নয়, তারা খেতে পরতে পায়। আন্দোলন করা তাদের পেশা। বুভুক্ষু বেকারদের দুরবস্থা নিয়ে আলোচনা করা কি উচিত নয়, তুমি প্রশ্ন করবে হয়তো। নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু একটা মহৎ কার্যকে পেশাতে পরিণত করলে তার মহত্ত্ব বেশি দিন উজ্জ্বল থাকে না। নানা রকম গ্লানি স্পর্শ করে তাতে ক্রমশ। ডাক্তারী, মাস্টারী, সাহিত্য, শিল্প পেশার পেষণে যে কি কদাকার হয়ে উঠেছে তা দেখতেই পাচ্ছ। পরের দুঃখে বিচলিত হওয়াটাকেই যাঁরা পেশায় পরিণত করেছেন তাঁদের পরোপকার চিকীর্ষা তাই আনন্দজনক না হয়ে আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে। তাই বেকার সমস্যা নামক যে আন্দোলনের আলোড়নে আমরা মুহুর্মুহু সচকিত হয়ে উঠি সে আন্দোলনের ধুয়া (Slogan) যদিও দরিদ্র জনসাধারণ, কিন্তু তার ফলভোগ করেন ওই মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারীরা। দরিদ্র জনসাধারণ দারিদ্র্যের চাপে আগেও যেমন মারা যেতেন এখনও তেমনি যাচ্ছেন। তাঁরা বক্তৃতা শুনছেন, উত্তেজিত হচ্ছেন এবং নিয়মিত ভাবে মারা যাচ্ছেন। যে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেশব্যাপী দারিদ্র্যের কারণ তা দূর করতে হলে যে আন্দোলনের প্রয়োজন নেই তা নয়—প্রয়োজন খুবই আছে—কিন্তু আন্দোলনটাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখাই যদি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তো বড় ভয়ানক কথা। হচ্ছেও তো তাই দেখছি। দুঃখ-দারিদ্র্য কমছে না, আন্দোলন বেড়ে যাচ্ছে। একেবারে দীন-দুঃখী বেকারদের কথা ছেড়ে তোমাদের মতো বেকারের কথা ভাবলে একটা কথাই আমার মনে হয়, তোমরা বেকার নও তোমরা বাবু। প্রকৃত বেকার হলে আন্দোলন করবার সুযোগ পেতে না তোমরা। হয় বেকারত্ব ঘোচাবার জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে, না হয় মারা যেতে। যেমন করেই হোক মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তোমরা করেছ. কিন্তু তাতে তোমরা সুখী নও, তাই চেঁচামেচি করছ। তোমরা বিয়ে কর না, কোনও রকম সামাজিক দায়িত্ব বহন করতে চাও না, এমন কি যে বাড়িতে থাক খাও সে বাড়িরও নাড়ির সঙ্গে তোমাদের সত্যিকার যোগ নেই, বেশি ফাইফরমাস করলেও বিরক্ত হও। ছিমছাম থাক, নিজেদের মনোমত গোষ্ঠীতে বিচরণ কর, সিনেমা দেখ, কাগজ পড় এবং মুখে রাজা-উজির মেরে এমন একটা কাণ্ড কর যে যারা তোমাদের চেনে না তারা অবাক হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে যারা সামান্য কিছু রোজকার করতে পার তারা আবার মেসে গিয়েও থাকো দেখেছি, অন্য কোনও কারণে নয়, বাড়ির আওতা থেকে বাঁচবার জন্যে।

আসল কথা তোমরা সুখী নও। তোমরা নিজেদের সুখী মনে কর না, অসুখী হওয়ার সেইটে একটা প্রধান কারণ। কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না, সুখী হতে হয়। কি করে সুখী হওয়া যায়? এ প্রশ্নের উত্তর হাজার লোক হাজার রকমে দিয়েছে। হাতের কাছে যা জুটেছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা সুখী হবার একটা মস্ত উপায়। সারাজীবন ‘হায় হায়’ করে ‘আরো আরো’ করে ছুটে মরছে যারা, তাদের মধ্যে অধিকাংশই অসুখী। আমার সুখ যদি বাইরের বস্তু-সম্ভারের উপর নির্ভর করে এবং আমি যদি ক্রমাগত তা বাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, তা হলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি, যে সুখের সন্ধানে ছুটোছুটি করছিলাম, সেই সুখটাই অন্তর্ধান করেছে। নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যে মানুষ কি তাহলে চেষ্টা করবে না? নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু তা করতে গিয়ে আত্মবিক্রয় করবে না। সে যে মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, এ বোধটা তার সর্বদা জাগ্রত থাকা চাই। নিছক পশুত্ব চর্চা করে' পশু হয়তো আনন্দ পায়, মানুষ পেতে পারে না। তার সুখ-বোধটা এমন একটা জটিল জিনিস যে ঐশ্বর্যের স্তূপের উপর বসে থাকলেও সে সুখী হয় না।

আর একটা কথাও ভেবে দেখবার মতো। যে জনসাধারণের দারিদ্র্যের অজুহাতে তোমরা বিদ্রোহের ‘ঝাণ্ডা’ উড়িয়েছ, সেই দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছ কি ভাল করে? করলে একটা জিনিস দেখতে পেতে—তারা আমাদের চেয়ে সুখী, আমাদের বিত্তাম্বিত, কিন্তু তবু তারা সুখী, কারণ তারা অলস নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যতটুকু পারে ততটুকুই উপার্জন করে এবং ততটুকুই সানন্দে ভোগ করে সপরিবারে। তাদের মধ্যে অবিবাহিত যুবক নেই বললেই হয়—তাদের দাম্পত্য জীবন আমাদের অধিকাংশ লোকের দাম্পত্য জীবনের মতোই কলহ-প্রণয়-সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত। তাদের স্ত্রীরা একটু নোংরা, নভেল-সিনেমা-রেডিওর সংস্কৃতিও তাদের নেই, কিন্তু তবু তারাই দেশের মেরুদণ্ড নির্মাণ করছে সন্তানের জননী হয়ে। আমাদের মতো গা বাঁচিয়ে নাক সিঁটকে দূরে বসে বিলাস মরীচিকার স্বপ্ন দেখছে না। তারা যদিও দারিদ্র্যজীর্ণ তবু তারা সুখে আছে। তাদের মধ্যে অসুখের বীজ আমরাই বপন করছি পরশ্রীকাতরতার বিষ ছড়িয়ে।

মনে কোরো না যে আমি পুঁজিবাদ সমর্থন করি। দরিদ্র জনসাধারণ অভাবমুক্ত হোক এ আমি সর্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু সর্বপ্রথম চাই মনুষ্যত্ব, তার বিনিময়ে আর কোনও জিনিসই চাই না। আধুনিকতাই তো কাম্য, কিন্তু জীবনের জয়-যাত্রায় অগ্রগতিই হবে সে আধুনিকতার মাপকাঠি। বলা বাহুল্য, সে অগ্রগতি মানে এরোপ্লেন-বাহিত গতি নয়, মানসিক অগ্রগতি। আধুনিকতা নিয়ে আমরা মাতামাতি করি বটে, কিন্তু আধুনিকতা আমরা বরদাস্ত করতে পারি কি? এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ব্যক্তিকে আমরা তো সেদিন খুন করে ফেললাম। একটা উন্মাদের কাজ বলে এটাকে উড়িয়ে দিতে পারছি না, কারণ তার কাজকে প্রকাশ্যে সমর্থন করবার সাহস না থাকলেও, ভিতরে ভিতরে সমর্থন করছেন এ রকম লোক প্রচুর ঘুরে বেড়াচ্ছেন সমাজে এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ‘শিক্ষিত’। অধিকাংশ কেন, সবাই। অশিক্ষিত লোকেরাই মহাত্মাজীর মাহাত্ম্যকে অনুভব করেছে প্রাণের মধ্যে। শিক্ষিত আধুনিকতা-অভিমানীরা পারেনি।

বেকার প্রসঙ্গ নিয়ে চিঠিতে অনেক কথা লিখেছ তাই উত্তরে আমিও দু'চার কথা লিখলাম। দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় সত্য, গবর্ণমেণ্টেরও অনেক গলদ আছে, কিন্তু নিজেদের দিকেও তাকিয়ে দেখ। গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার জন্যে কাজের অভাব নেই দেশে। একটা রিক্সাওয়ালার কাছে খোঁজ নিও সে দৈনিক কত রোজগার করে। কিন্তু সে কাজ তুমি পারবে না, কারণ তুমি শিক্ষিত। তাই তুমি কাজ না করে বেকার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ। তোমার বেকারত্বের আসল কারণ কাজের অভাব নয়, আত্মসম্মানের অভাব।

রাগ কোরো না। অকপট অভিমত চেয়েছিলে বলেই এত কথা লিখলাম এবং এটাও সম্ভব যে, আমার যুক্তি নিখুঁত নয়। তবু যা মনে হল লিখলাম এবং আর যাই হোক তা অকপট।

# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

( ১৮ )

কাবুলের সামাজিক জীবন তিন হিস্যায় বিভক্ত। তিন শরিকে মুখ দেখাদেখি নেই।

পয়লা শরিক খাস কাবুলী; সে-ও আবার দুভাগে বিভক্ত—জনানা, মর্দানা। কাবুলী মেয়েরা কট্টর পর্দার আড়ালে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে নিকট আত্মীয় ছাড়া, দেশী-বিদেশী কারো আলাপ হওয়ার যো নেই। পুরুষের ভিতরে আবার দুভাগ। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের মোল্লা সম্প্রদায়, আর অন্যদিকে প্যারিস-বার্লিন-মস্কো ফের্তা এবং তাদের ইয়ারবক্সীতে মেশানো ইউরোপীয় ঐতিহ্যে পুষ্ট তরুণ সম্প্রদায়। একে অন্যকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু মুখ দেখাদেখি বন্ধ নয়। কারণ অনেক পরিবারেরই বাপ মশাই, বেটা প্যারিসিয়া।

দুসরা শরিক ভারতীয় অর্থাৎ পাঞ্জাব, ফ্রন্টিয়ারের মুসলমান ও ১৯২১ সনের খেলাফৎ আন্দোলনের ভারতত্যাগী মুহাজিরিন-গণ। এদের কেউ কেউ কাবুলী মেয়ে বিয়ে করেছেন বলে শ্বশুরবাড়ির সমাজের সঙ্গে কিছু কিছু যোগাযোগ বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিসরা শরিক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, রুশ ইত্যাদি রাজদূতাবাস। আফগানিস্থান হদ্দে গরীব দেশ। সেখানে এতগুলো রাজদূতের ভিড় লাগাবার কোন অর্থনৈতিক কারণ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক কারণ বিস্তর। ফরাসী জর্মন, ইতালি, তুর্ক সব সরকারের দৃঢ়বিশ্বাস, ইংরেজ-রুশের মোষের লড়াই একদিন না একদিন হয় খাইবার পাসে, নয় হিন্দুকুশে লাগবেই লাগবে। তাই দু দলের পায়তারা কষার খবর সরজমিনে রাখার জন্য একগাদা রাজদূতাবাস।

তবু পয়লা শরিক আর দুসরা শরিকে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়। দুসরা শরিকের অধিকাংশই হয় কারবারি, নয় মাস্টার, প্রফেসর। দু দলের সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু পয়লা ও তেসরা ও দুসরা-তেসরাতে কখখনো কোন অবস্থাতেই যোগাযোগ হতে পারে না।

যদি কেউ করার চেষ্টা করে, তবে সে স্পাই।

মাত্র একটি লোক নির্ভয়ে কাবুলের সব সমাজে অবাধে গতায়াত করতেন। বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম দোস্ত মুহম্মদ খান—জাতে খাস পাঠান।

প্রথম দিনের পরিচয়ে শেকহ্যান্ড করে ইংরিজি কায়দায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হাও ডু ইউ ডু?'

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রাস্তায়। দূরের থেকে কাবুলী কায়দায় সেই প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন, 'খুব হাস্তী, জোর হাস্তী ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?'

তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁর বাড়িরই সামনে। আমাকে দেখা মাত্র চীৎকার করে বললেন, 'বফরমাইদ, বফরমাইদ (আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক) কদমে তান মবারক (আপনার পদদ্বয় পুতপবিত্র হোক), চশমে তান রওশন (আপনার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বলতর হোক), শানায়ে তান দরাজ (আপনার বক্ষস্কন্ধ বিশালতর হোক)——'

তারপর আমার জন্য যা প্রার্থনা করলেন সেটা ছাপালে এদেশের পুলিস আমাকে জেলে দেবে।

আমি একটু থতমত খেয়ে বললুম, 'কি যা তা সব বলছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ চোখ পাকিয়ে তম্বী লাগালেন, 'কেন বলব না, আলবৎ বলব, একশ' বার বলব। আমি কি কাবুলের ইরাণি যে ভদ্রতা করে সব কিছু বলব, সত্যি কথাটি ছাড়া? আমি পাঠান—আমার ঘোড়ার লাগাম নেই, আমার জিভেরও লাগাম নেই।'

ঘরে বসিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বল্লেন, বাড়িঘরদোর গুছিয়ে নিয়েছেন তো? চাকর বাকর? রুটী গোস্ত? কিছু যদি দরকার হয় আমাকে বলবেন। সব জোগাড় করে দিতে পারি—কাবুলের তখতটী ছাড়া। তাও পারি—কিন্তু মাত্র একটা কিনা, খোঁজ খোঁজ পড়ে যাবে। কিন্তু ওটায় নজর দিয়ে কোনো লাভ নেই। বড্ড শক্ত; আমি বসে দেখেছি।'

আমি বললুম, 'কাবুলের সিংহাসনে বসা যে শক্ত, সেতো আর গোপন কথা নয়।'

দোস্ত মুহম্মদ আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয় পেয়ে ভাবলুম বোধহয় বেফাঁস রসিকতা করে ফেলেছি। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদের উত্তর শুনে অভয় পেলুম। বললেন,

'আহা-হা-হা। বাঁচালে দাদা। তোমার তাহলে রসকষ আছে। তোমার দেশের লোক-গুলোর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, বড্ড বেহুদ্দোড়, বেআড্ডা, বেরসিক। কী গম্ভীর মুখ! দেখে মনে হয় হিন্দুস্থান স্বাধীন করার দুর্ভাবনা যেন একমাত্র ওদেরি ঘাড়ে।'

অদ্ভুত লোক! অশ্লীল কথা বললেন রাস্তায় চেঁচিয়ে, চাকরবাকর বন্দোবস্ত খুঁজে দেবেন বললেন ঘরের ভেতর বসিয়ে ফিসফিস করে; রসিকতা শুনে যখন খুশী তখন মুখ হল গম্ভীর। ভাবলুম এবার যদি দুটো একটা কটুবাক্য বলি তবে বোধহয় অট্টহাস্য করে উঠবেন।

ততক্ষণে তিনি একটা কুশনে মাথা দিয়ে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়েছেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, 'কি খাবে? চা রুটি, পোলাও গোস্ত, আঙুর নাসপাতি? যা খুসী। বাজারে সব পাওয়া যায়। বাড়িতে কিছু নেই।'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'না, না, আছে, আছে। সিগারেট আছে। দাঁড়াও।'

বলে দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে গভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে সোফার পেছনে হাঁটুগেড়ে সোফা আর দেয়ালের মাঝখানের কার্পেট তুলে এক প্যাকেট সিগরেট বের করলেন।

আমি তো অবাক। সামান্য সিগরেট; মদের বোতল নয়, প্যারিসের ছবি নয়, যে এত লুকিয়ে রাখবেন, আর কার কাছ থেকেই বা এত লুকোনো?

শুনি দোস্ত মুহম্মদ করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠেছেন—'ওরে ও হারামজাদা আগা আহমদ, তোকে আমি আজ খুন করব। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে আয় ব্যাটা। ওরে নেমকহারাম, তোকে খুন করে আজ আমি গাজী হব, ফাঁসী গিয়ে শহীদ হব।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঃ! কী পাষণ্ড। দরজা বন্ধ করে, হুড়কো মেরে সিগরেট বের করি, লুকিয়ে রাখি যেন আলাউদ্দীনের পিদিম। তবু ব্যাটা সন্ধান পেয়েছে। আর কী

বেহায়া বেশরম। দশটা সিগরেটই মেরে দিয়েছে। ওঃ!'

ততক্ষণে আগা আহমদ দরজা খুলে ঢুকেছে। কারো দিকে না তাকিয়ে, দোস্ত মুহম্মদের কোনো কথার সাড়া না দিয়ে সোজা সোফার পেছনে গিয়ে কার্পেটের তলায় আরো বেশীদূর হাত চালিয়ে আরেক প্যাকেট পুরো সিগরেট বের করে আমার হাতে দিল।

বেরুবার সময় দোরের গোড়ায় একবার দাঁড়াল। এক ঝলকের তরে, দোস্ত মুহম্মদের দিকে তাকিয়ে বলল,—'খালি প্যাকেটটা আমার। লুকিয়ে রেখেছিলুম।'

দোস্ত মুহম্মদের চোখের পাতা পড়ছে না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'কী অসম্ভব বদমায়েস! আর আমাকে বেকুব বানাবার কায়দাটা দেখলেন গর্ভস্রাবটার! শুধু তাই, নিত্যি নিত্যি আমাকে বেকুব বানায়।'

তারপর মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আপন মনেই বল্লেন, 'কিন্তু দাঁড়াও বাচ্চা, স্যাকরার ঠুকঠাক আমারের এক ঘা।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর পাঁচ বছরের মাইনে তিন শ' টাকা আমার কাছে জমা আছে। সেই টাকাটা লোপাট মেরে রাইফেল কাঁধে করে একদিন পাহাড়ে উধাও হয়ে যাব; তখন যাদু টেরটি পাবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কলেজ যাবার সময় ঘরে তালা লাগান?'

তিনি বললেন, একদিন লাগিয়েছিলুম। কলেজ থেকে ফিরে দেখি সে তালা নেই, আরেকটা পর্বতপ্রমাণ তালা তার জায়গায় লাগানো। ভাঙবার চেষ্টা করে হার মানলুম।

ততক্ষণে পাড়ার লোক জমে গিয়েছে—আগা আহমদের দর্শন নেই। কি আর করি, বসে রইলুম। হী হী শীতে বারান্দায়। হেলে দুলে আগা আহমদ এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। পাষণ্ড কি বলল জানো? 'ও তালাটা ভালো নয় বলে একটা ভালো দেখে তালা লাগিয়েছি।' আমি যখন মার মার করে ছুটে গেলুম তখন শুধু বললো, 'কারো উপকার করতে গেলেই মার খেতে হয়।'

আমি বললুম 'তালা তা হলে আর লাগাচ্ছেন না বলুন।'

'কি হবে? আগা আহমদ আফ্রিদী ওরা সব তালা খুলতে পারে। জানো, এক আফ্রিদী বাজি ফেলে আমীর হবীবুল্লার নীচের থেকে বিছনার চাদর চুরি করেছিল।'

আমি বললুম, 'তালা যদি না লাগান তবে একদিন দেখবেন আগা আহমদ আপনার দামী রাইফেল নিয়ে পালিয়েছে।'

দোস্ত মুহম্মদ খুশী হয়ে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি অত কাঁচা ছেলে নই। আগা আহমদের দাদা আমাকে আর বছরে ছ'শ টাকা দিয়েছিল ওর জন্য দাঁও মত একটা ভালো রাইফেল কেনার জন্য। এটা সেই টাকায় কেনা কিন্তু আগা আহমদ জানে না। ও যদি রাইফেল নিয়ে উবে যায় তবে আমি তার ভাইকে তখখুনি লিখে পাঠাব, 'তোমার ভ্রাতৃহস্তে রাইফেল পাঠাইলাম; প্রাপ্তি সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবা। তরপর দুই ভাইয়েতে—'

আমি বললুম, 'সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই।'

দোস্ত মুহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাইফেলের জন্য তারা লড়েছিল?'

আমি বললুম, 'না, সুন্দরীর জন্য।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তওবা স্ত্রীলোকের জন্য কখনো জব্বর লড়াই হয়? মোক্ষম লড়াই হয় রাইফেলের জন্য। রাইফেল থাকলে সুন্দরীর স্বামীকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করা যায়। উত্তম বন্দোবস্ত। সে বেহেস্তে গিয়ে হুরী পেল, তুমিও সুন্দরী পেলে।'

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ভেবো না লক্ষ্য করিনি যে, তুমি আমাকে 'আপনি' বলছো, আর আমি 'তুমি' বলে যাচ্ছি। কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারবে না। সমস্ত আফগানিস্থানে আমাকে কেউ 'আপনি' বলে না, ইস্তেক আগা আহমদ পর্যন্ত না।'

টাঙ্গায় চড়বার সময় বললেন, 'দাঁড়াও' বলে ছুটে গিয়ে একখানা বই নিয়ে এসে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'ভালো বই, কর্সিকায় আর আফগানিস্থানে একই রকম প্রতিশোধের ব্যবস্থা।' চেয়ে দেখি, 'কলবা'। *

১৯

দিন দশেক পরে একদিন জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দোস্ত মুহম্মদ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কাবুলী কায়দায় 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো' বলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, দোস্ত মুহম্মদ কোন সাড়া-শব্দ না দিয়ে আপন মনে কি সব বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছেন। কাছে এসে কান পেতে যা শুনলুম, তাতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। বলছেন, 'কমরত ব শিকনছ, খুদা তোরা কোর সাজদ, ব পুন্দী, ব তরকী ইত্যাদি'

সরল বাঙলায় তর্জমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'তোর কোমর ভেঙ্গে দু-টুকরো হোক, খুদা তোর দুচোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা।'

আমি কোনগতিকে সামলে নিয়ে বললুম, 'দোস্ত মুহম্মদ, কি সব আবোল-তাবোল বকছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ আমাকে আলিঙ্গন করে দুগালে দুটো বমশেল চুমো লাগালেন। বললেন, 'আমি কখখনো আবোল-তাবোল বকিনে।'

আমি বল্লুম, 'তবে এসব কি?'

বললেন, 'এসব তোর বালাই কাটাবার জন্য। লক্ষ্য করিসনি, এদেশে বাচ্চাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে কপালের একপাশে খানিকটে ভুসো মাখিয়ে দেয়। তোর কপালে তো আর ভুসো মাখাতে পারিনে—তাই কথা দিয়ে সেরে নিলুম। যাকে এত গালাগাল দিচ্ছি, যম তাকে নেবে কেন? পরমায়ু বেড়ে যাবে বুঝলি?

লক্ষ্য করলুম, গেল বারে দোস্ত মুহম্মদ আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করেছিলেন, এবারে সেটা 'তুই'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফার্শী ভাষায় 'আপনি, তুমি, তুই' তিন বাক্য নেই—আছে শুধু 'সোমা' আর তো। কিন্তু ঐ 'তো' দিয়ে 'তুমি, তুই' দুই-ই বোঝানো যায়— যেরকম ইংরিজিতে যখন বলি, 'ড্যাম ইউ', তখন তার অর্থ 'আপনি চুলোয় যান' নয়, অর্থ তখন 'তুই চুলোয় যা।' খাঁটি পাঠান আবার 'সোমা' কথাটাও ব্যবহার করে না, ইংরেজের মত শুধু ঐ এক 'ইউই' জানে। বেদুইনের আরবীতেও মাত্র এক 'আনতা।' বোধ হয় পাঠান, ইংরেজ, বেদুইনের ডিমোক্রাসি তার সম্বোধনের সমতায় প্রকাশ পেয়েছে।

দোস্ত মুহম্মদ স্মরণ করিয়ে দিলেন পারিসফের্তা সইফুল আলমের ছোট ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন। সইফুল আলম তাঁকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। গাড়ি তৈরি।

সিগরেট দিয়ে বললুম, 'খান।'

বললেন, 'না। আব্দুর রহমানকে বলো তামাক দিতে।'

আমি বললুম, 'আব্দুর রহমানকে চেনেন তাহলে।'

বললেন, 'তোমাকে কে চেনে বাপু, তুমি তো দু দিনের চিড়িয়া। আমাকে কে চেনে বাপু আমিও তিন দিনের পাখী—যে-পাহাড় থেকে নেবে এসেছি, সে-পাহাড়ের গর্তে আবার ঢুকে যাব, আগা আহম্মদের টাকাটা মেরে। আমি কে? মকতবে আমানিয়ার অধ্যাপক। অবশ্য বটে। কিন্তু কটা লোকে জানে? অথচ বাজারে গিয়ে পোছো, দেখবে সবাই জানে, আমি হচ্ছি সেই মূর্খ, যার কাঁধে বন্দুক রেখে আগা আহম্মদ শিকার করে; অর্থাৎ আগা আহম্মদের মনিব। তুমি কে? যার কাঁধে আব্দুর রহমান বন্দুক রেখেছে—শিকার করে কি না করে পরে দেখা যাবে। চাকর দিয়ে মুনিব চিনতে হয়।

আমি বললুম, 'বেশক, বেশক।' তারপর বাঙলায় বললুম, 'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

বললেন, 'বুঝিয়ে বল।'

তর্জমা শুনে দোস্ত মুহম্মদ আনন্দে আত্মহারা। শুধু বলেন, 'আফরীন, আফরীন,

* আগনের ফুলকি নাম দিয়ে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

... উমদা ...

সাবাস, সাবাস, ... তারপর মুখে মুখে সেক্সপীয়ারের লাইনের একটা অনুবাদও করে ফেললেন,

মনে বুদ্বুদ, তনে বুদ্বুদ, বুদ্বুদ সমাজদার।

তারপর বললেন, 'আমি আরবী, ফারসী, আর তুর্কী নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু ভালো রসিকতা কোথাও বিশেষ পাইনি। পদ্যে তো প্রায় নেই-ই। বাঙলায় বুঝি এরকম অনেক মাল আছে?'

আমি বললুম, 'না, মাত্র দুখানা কি আড়াইখানা বই।'

দোস্ত মুহম্মদ নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আর বাঙলা শিখে কি হবে!'

পেশোয়ারের আহম্মদ আলী আর কাবুলের দোস্ত মুহম্মদ একটা মিল দেখতে পেলুম— দুজনেই অল্প রসিকতায় খুব মুগ্ধ হন। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, আহমদ আলীর জীবনের ধারা বয়ে চলেছে আর পাঁচজনের মত, আর দোস্ত মুহম্মদের জীবন যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, যেখানে রসিকতার সূর্য কিরণ পড়লেই সাতরঙের রঙ মেখে নিচ্ছে। দু-একবার মামুলি বুককেসের কথা বলতে গিয়ে দেখলুম, সেসব কথা তাঁর কানে যেন পৌঁচচ্ছেই না। বিলাস-ব্যসনেও শখ নেই। তিনি যেন সমস্তক্ষণ রূপকথার সন্ধানে যেখানে রাজার পিসি ... পেরেক ঠোকেন, যেখানে পণ্ডিতেরা ... উপর ডাকের টিকিট আঁটেন।

তাই যখন আমরা বিয়ের মজলিসে গিয়ে ... শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝখানে ... পেলুম, তখন দোস্ত মুহম্মদের জন্য ... হল। খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি চোখ ... করে বিড় বিড় করে কি যেন আপন মনে ... যাচ্ছেন। তার দিকে একটু ঝুঁকতেই ... লেন,

'ফয়েজ মুহম্মদের গুণে শিক্ষামন্ত্রীর নাম, না শিক্ষামন্ত্রীর পদের জোরে ফয়েজ মুহম্মদের নাম—মুহম্মদ উজীর গুণে বিদেশী সচিবের নাম, না বিদেশী সচিবের পদের জোরে মুহম্মদ উজীর নাম? বাঙালী কবি লাখ কথায় এক কথা বলেছে,

'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

আমি বললুম, 'চুপ, মন্ত্রীরা সব আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন, শুনতে পেলে আপনাকে ... পুঁতে ফেলবে।'

বললেন, 'হ্যাঁ তা বটে, বিশেষ করে ঐ ফয়েজটা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফয়েজ মুহম্মদ ..., মিনিস্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন?'

উত্তর দিলেন, 'না, মিনিস্টর অব পাবলিক ডেস্ট্রাকশন। কত ছেলের মগজ ডেসট্রয় করছে। আমাকে মারবে তার আর নূতন কি?'

... সায়েবদের 'জ্ঞানগর্ভ' কথাবার্তায় কান দেবার চেষ্টা করলুম।

দোস্ত মুহম্মদকে দোষ দেওয়া অন্যায়। অনেক ভেবেও কূল কিনারা পাওয়া যায় না যে, এঁরা সব কোন্ গুণে মন্ত্রী হয়েছেন। লেখা-পড়ায় এক-একজন যেন বিদ্যাসাগর। দুনিয়ার কোন খবর রাখার চাড়ও কারো নেই। বেশীর ভাগই একবার দুবার ইয়োরোপ হয়ে এসেছেন, কিন্তু সেখান থেকে দু-একটা শক্ত ব্যাধি ছাড়া যে কিছু সঙ্গে এনেছেন, তা তো কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে না। ছোকরাদের মধ্যে যারা গালগপ্পে যোগ দিল, তারা তবু দু-একটা পাস দিয়ে এসেছে, বুড়োদের যাঁরা অবজ্ঞা-অবহেলা সত্ত্বেও মুখ খুললেন, তাঁদের কথা-বার্তা থেকে ধরা পড়ে যে, আর কিছু না হোক তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এই উজীরদের দল না পারে উড়তে, না পারে সাঁতার কাটতে, চলন যেন ব্যাঙের মত, এলোপাথারি থপথপ। কাবুলের বহু জিনিস, বহু প্রতিষ্ঠান দেখে মনে দুঃখ হয়, কিন্তু এই মন্ত্রিমণ্ডলীকে দেখে কনফুৎসিয়সের মত বলতে হয়,

'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র, সংসারে প্রণিপাত।'

সইফুল আলম এসে কানে কানে বললেন, 'একটু বাদে দক্ষিণের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন; আমি দোরের গোড়ায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।' দোস্ত মুহম্মদ না শুনেও মাথা নাড়িয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনিও আসছেন।

মজলিস থেকে বেরিয়ে যেন দম ফেলে বাঁচলুম। দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, গরসর শুদম—আমার ফাঁসী হয়ে গিয়েছে।'

সত্যিকার বিয়ের মজলিসে তখন প্রবেশ পেলুম। সেখানে দেখি, জন বিশেক ছোকরা, কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে আড্ডা জমাচ্ছে। একজন গামছা দিয়ে গ্রামো-ফোনটার মুখ গুঁজে সাউন্ড বক্সের পাশে কান পেতে গান শুনছে। জনতিনেক তাস খেলছে। বিদগ্ধ মোল্লা মীর আসলম এক কোণে কি একখানা বই পড়ছেন। আরেক কোণে এক বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন অথবা ঘুমুচ্ছেন—মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, বরফের মত সাদা দাড়ি, কালো মিশমিশে জোব্বা। শান্ত মুখচ্ছবি—একপাশে ছোট একখানা সেতার। সব ছেলে-ছোকরার পাল, ঐ মীর আসলম আর সেতারওয়ালা বৃদ্ধ ছাড়া। মজলিসে আসবাবপত্র কিছু নেই, শুধু দামী গালচে আর রঙীন তাকিয়া।

কেউ কেউ বফার সহিদ, আসতে আজ্ঞা হোক' বলে অভ্যর্থনা করলেন।

আমি দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এইখানে সোজা এলেই তো হত।'

তিনি বললেন, 'সেটি হবার জো নেই, আসল মজলিসে বসে ন্যাভিস্নান না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্রোমোশন নদারদ। তা তুমি তো বাপু বেশ চাঁদপানা মুখ করে বসেছিলে। তোমাকে সেখানে উসখুস না করে বসে থাকতে দেখে আমার মনে তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় ভয় জেগেছে। এদেশে উজীর হবার আসল গুণ তোমার আছে—

to sit among bores without being bored.

কিন্তু খবরদার সাবধানে পা ফেলে চলো দাদা, নইলে রক্ষে নেই—দেখবে একদিন বলা নেই কওয়া নেই কাঁক করে ধরে নিয়ে উজীর বানিয়ে দিয়েছে।

সইফুল আলম আমাকে আদর করে বসালেন।

তরুণদের আড্ডা যে ওজিরদের মজলিসের চেয়ে অনেক বেশী মনোরঞ্জক, তা নয়, তবে এখানে লৌকিকতার তর্জনী নেই বলে যা খুশি করার অনুমতি আছে। এরা নির্ভয়ে পলিটিক্স পর্যন্ত আলোচনা করে এবং যৌবনের প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে কারো মুখে আর কোন লাগাম থাকে না। কথাবার্তায় ভারতীয় তরুণদের সঙ্গে এদের আসল তফাৎ এই যে, এদের জীবনে নৈরাশ্যের কোন চিহ্ন নেই, বর্তমান থেকে পালিয়ে গিয়ে অতীতে আশ্রয় তো খোঁজেই না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা আশা-ভরসা, তাও স্বপ্নেগড়া পরীস্থান নয়। শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে অচেতন এরকম জোয়ান আমি আর কোথাও দেখিনি। এদেরি একজন আর বসন্তে কি করে ট্রান্সফার হয়ে বদখশান থেকে হিন্দুকুশ পার হয়ে এসেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছিল। সমস্ত দিন হেঁটে তিন মাইল মাত্র রাস্তা এগুতে পেরেছিল, কারণ একই নদীকে ছবার পার হতে হয়েছিল, কিছুটা সাঁতরে কিছুটা পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে। দুটো খচ্চর ভেসে গেল জলের তোড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল খাবার-দাবার সর্বকিছু। দলের সাতজনের মধ্যে দুজন অনাহারে মারা যান।

এসব বর্ণনা আমি যে জীবনে প্রথম শুনলুম তা নয়, কিন্তু এর বর্ণনাতে কোনো রোমান্স মাখানো ছিল না, পর্যটকদের গতানুগতিক দম্ভ ছিল না আর আফগান সরকারের নিরর্থক অসময়ে ট্রান্সফার করার বাতিকের বিরুদ্ধে কণামাত্র নালিশ ফরিয়াদ ছিল না। ভাবখানা অনেকটা, 'ছাতা ছিল না তাই বিষ্টিতে ভিজে বাড়ী ফিরলুম। কাল আবার বেরুতে পারি দরকার হলে—ছাতা যে সঙ্গে নেবোই সে রকম কথাও দিচ্ছি নে।' অর্থাৎ আগামী বসন্তে যদি তাকে ফের বদখশান যেতে হয় তবে সে আপত্তি জানাবে না।

অথচ যখন বার্লিনে পড়াশুনো করত তখন তিন বছর ধরে মাসে চার শ' মার্ক খর্চা করে আরামে দিন কাটিয়েছে।

অনেক রাতে খাবার ডাক পড়ল। গরম বাঙলা দেশেই যখন বিয়ের রান্না ঠাণ্ডা হয় তখন ঠাণ্ডা কাবুলে যে বেশীর ভাগ জিনিসই হিম হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

মীর আসলম তাই খানিকটে মাংস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিঞ্চিৎ শূল্যপক্ক অজ মাংস ভক্ষণ কর। অভ্যন্তরীণ ঔষ্ণের জন্য ইহাই প্রশস্ততম।'

তারপর দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো জিনিসের অপ্রাচুর্য হয়নি তো? দোস্ত মুহম্মদ বললেন,

'তাব গুল্লুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে—গরসরা গুদম—আমার ফাঁসী হয়ে গেছে।'

কোন জিনিস আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার এই হল ফার্সী সংস্করণ।

আফগান বিয়ের ভোজে যে বিস্তর লোক প্রচুর পরিমাণে খাবে, সে কথা কাবুলে না এসেও বলা যায়, কিন্তু তারো চেয়ে বড় তত্ত্ব কথা এই যে, যত খাবে তার চেয়ে বেশী ফেলবে, বাঙলা দেশের এই সুসভ্য বর্বরতার সন্ধান তারা এখনো পায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গালগল্প জমলো ভালো করে। শুধু দোস্ত মুহম্মদ কাউকে কিছু না বলে তিনটে কুশনে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাড়ি ফেরার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আবহাওয়া থেকে অনুমান করলুম যে, রেওয়াজ হচ্ছে হয় মজলিসের পাঁচজনের সঙ্গে গুষ্ঠি-সুখ অনুভব করা, নয় নির্বিকারচিত্তে অকাতর ঘুমিয়ে পড়া। বিয়ে বাড়ির হৈ-হল্লা, কড়া বিজলি বাতি আফগানের ঘুমের কোন ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন-একজন করে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সই-ফুল আলম আমাদের আরেকপ্রস্ত চা দিয়ে গেলেন। মীর আসলমের ভাষা বিদগ্ধ হতে বিদগ্ধতর হয়ে যখন প্রায় যজ্ঞভস্মের মত পূত-পবিত্র হবার উপক্রম করেছে, তখন তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। চেয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেতার খানা কোলে তুলে নিয়েছেন।

মীর আসলম আমাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার অদৃষ্ট অদ্য রজনীর তৃতীয় যামে সুপ্রসন্ন হল।'

সমস্ত সন্ধ্যা বৃদ্ধ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। 'পিড়িং করে প্রথম আওয়াজ বেরুতেই মনে হল, এঁর কিন্তু বলবার মত অনেক কিছু আছে।

প্রথম মৃদু টঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মুহম্মদ সোজা হয়ে উঠে বসলেন যেন এতক্ষণ তাঁরি অপেক্ষায় শুয়ে শুয়ে প্রহর গুণছিলেন।

সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পূর্বেই বুড়ার গলা থেকে গুঞ্জরণ ধ্বনি বেরুল—কিন্তু ভুল বললুম—গলা থেকে নয়, বুক-কলিজা থেকে তার প্রতি লোমকূপ ছিন্ন করে যেন সে শব্দ বেরোল। সেতার বাঁধা হয়েছিল কোন্ সন্ধ্যায় জানিনে, কিন্তু তার গলার আওয়াজ শুনে মনে হল, এঁর সর্বশরীর যেন আর কোন ওস্তাদের ওস্তাদ বহুকাল ধরে বেঁধে বেঁধে আজ যামিনীর শেষযামে এই প্রথম পরিপূর্ণতায় পৌঁছালেন।

ওস্তাদী বাজনা নয়—বুড়ার গলা থেকে যে পরী হঠাৎ ডানা মেলে বেরুলো, সেতারের আওয়াজ যেন তারি ছায়া হয়ে গিয়ে তারি নাচে যোগ দিল।

ফার্সী গজল। বুড়ার চোখ বন্ধ, শান্ত—প্রশান্ত মুখছবি, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপছে না, ওষ্ঠ অধরের মৃদু স্ফুরণের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গম্ভীর নিষ্কম্প গুঞ্জরণ। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আওয়াজ যেন বন্ধনমুক্ত আতরের মত সভাস্থল ভরে দিল।

গানের কথা শুনব কি, সেতারের গলায় মিশে গিয়েছে যেন সন্ধ্যা বেলাকার নীল আকাশ সূর্যাস্তের লাল আবীর মেখে নিয়ে ঘন বেগুনি থেকে আস্তে আস্তে গোলাপীর দিকে এগিয়ে চলেছে। আর পাঁচজনের কথা বলতে পারিনে—এরকমের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। জন্মান্ধ যেন চোখ মেলল সূর্যাস্তের মাঝখানে। আমি তখন রঙের মাঝখানে ডুবে গিয়েছি—সমুদ্র, বেলাভূমি, তরু-পল্লব কিছুই চোখে পড়ছে না।

ধ্বনির ইন্দ্রজালে মোহাচ্ছন্ন করে বৃদ্ধ যেন একমাত্র আমারি কানে কানে তার গোপন মন্ত্র পড়তে লাগলেন,

'শবি আগর, শবি আগর, শবি আগর—'
'যদি এক রাত্রের তরে, মাত্র এক রাত্রের তরে,
একবারের তরে—'

আমি যেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, 'কি? কি? কি?' 'এক রাতের তরে, এক-বারের তরে, কি?' কিন্তু বলার উপায় নেই—দরকারও নেই, গুণী কি জানেন না?

'আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্'
'প্রিয়ার অধর থেকে একটি চুম্বন পাই'

প্রথমবার বললেন অতি শান্তকণ্ঠে, কিন্তু যেন নৈরাশ্য-ভরা সুরে, তারপর নৈরাশ্য যেন কেটে যেতে লাগল, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল, সাহস বাড়তে লাগল, সবশেষে রইল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাবা, পাবোই পাবো, নিশ্চয় পাব।'

গুণী গাইছেন 'লবে ইয়ার প্রিয়ার অধর আর আমার বন্ধ চোখের সামনে কালোর মাঝ-খানে ফুটে উঠে টকটকে লাল দুটি ঠোঁট, যখন শুনি 'বোসয়ে তলবম্', 'যদি একটি চুম্বন পাই', তখন চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যায়, বুকের মাঝখানে যেন তখন শুনতে পাই সেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, আতুর হিয়ার আকুলি-বিকুলি, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় প্রত্যয়।

হুঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'জোয়ান শওম'

'তাহলে আমি জোয়ান হব—একটি মাত্র চুম্বন পেলে লুপ্ত যৌবন ফিরে পাব।'

সভাস্থল যেন তাণ্ডব নৃত্যে ভরে উঠল—দেখি শঙ্কর যেন তপস্যা শেষে পার্বতীকে নিয়ে উন্মত্ত নৃত্যে মেতে উঠেছেন। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার—'জোয়ান শওম', 'জোয়ান শওম'। কোথায় বৃদ্ধ সেতারের ওস্তাদ—দেখি সেই জোয়ান মঙ্গল। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু-পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটছে, আর দু-হাত মেলে বুক চেতিয়ে মাথা পেছনে ছুঁড়ে কালো বাবরী চুলের আবর্তের ঘূর্ণি লাগিয়েছে।

দেখি তাজমহলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন শাহজাহান আর মমতাজ। হাত ধরাধরি করে। নবীন প্রাণ, নূতন যৌবন ফিরে পেয়েছেন, শতাব্দীর বিচ্ছেদ শেষ হয়েছে।

শুনি সঙ্গীত তরঙ্গের কল-কল্লোলে জাহ্নবী। সগররাজের সহস্র সন্তান নবীন প্রাণ নবীন যৌবন ফিরে পেয়ে উল্লাস ধ্বনি করে উঠছে।

কিন্তু গুণী যৌবন পেয়েছে, প্রিয়ার প্রসাদ পেয়েছে, চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে—অথচ কবিতার পদ যে এখনো অগ্রগামী—

শবি আগর, আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্
জওয়ান শওম — — — — — —

আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই জোয়ান হইব—

তারপর, তারপর কি?

শুনি অবিচল দৃঢ়কণ্ঠে অদ্ভুত শপথ গ্রহণ,—

'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম

'এই জীবন তাহলে আবার দোহরাতে দুবার করতে রাজী আছি। একটি চুম্বন দা[ও] তাহলে আবার সেই অসীম বিরহের [দী]র্ঘ দৃষ্টি অন্তর্বিহীন পথ ক্ষতবিক্ষত রক্তা[ক্ত] পদে অতিক্রম করবার শক্তি পাব। আসুক আবার সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদ, তোমার অবহে[লার] কঠোর কঠিন দাহ!

আমি প্রস্তুত, আমি শপথ করছি,
—'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম!'
'গোড়া হতে তবে এ-জীবন দোহরাই',

আমি মনে মনে মাথা নীচু করে বল[লুম] 'ক্ষমা করো গুণী, ক্ষমা করো কবি। শি[খরে] পৌঁছে উদ্ধত প্রশ্ন করেছিলুম, পদ এ[খনো] অগ্রগামী, যাবো কোথায়। তুমি যে [...] সেখান থেকে শূন্যে তুলে নিতে পারো, [...] গানের পরী যে আমাকেও নীলাম্বরে [...] করে নিয়ে যেতে পারে, তার কল্পনাও করতে পারিনি।

বারে বারে ঘুরে ফিরে গুণীর আ[...] কাকুতি 'শবি আগর' 'যদি এক রাতের [...] আর সেই দৃঢ় শপথ 'জিন্দেগী দুবারা [...] 'এ-জীবন দোহরাই'—গানের বাদ বাকি

দুই বাক্যেই বারে বারে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে সপ্রকাশ হচ্ছে। কখনো শুনি 'শাবি আগর' কখনো শুধু 'দুবারা কুনম'—'শাবি আগর' দুবারা কুনম।'

পশ্চিমের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও পূবের আকাশ অনেকক্ষণ ধরে লাল রঙ ছাড়ে না—কখন গান বন্ধ হয়েছিল বলতে পারিনে। হঠাৎ ভোরের আজান কানে গেল, 'আল্লাহু আকবর,' 'খুদাতালা মহান' মাভৈ, মাভৈ, ভয় নেই, ভয় নেই, তোমার সব কামনা পূর্ণ হবে।

'ওয়া লাল আখিরাতু খাইরুন লাকা
মিনাল্‌উলা,
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো,
হবে তো ভবিষ্যৎ।'

চোখ মেলে দেখি কবি নেই। মোল্লা মীর আসলম পাথরের মত বসে আছেন, আর দোস্ত মুহম্মদ দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছেন।

(ক্রমশ)

# চিঠি

**কোমৎ দ্য কেলাস**
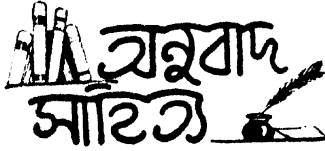
[প্যারিসদের কয়েকটি সংঘ ছিল,—তার বৈঠক হ'ত সাধারণতঃ কোন সরাইখানায় বা কোন অভিজাতের বাড়িতে। রূপসী ম্যাদাময়জেল কুইনাল্ড ডায়েন্সনের বাড়িতে এইরূপ একটি বিশিষ্ট সংঘের বৈঠক প্রায়ই হ'ত,—এই সংঘটির সভাপতি ছিলেন—বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত কোমৎ দ্য কেলাস (১৬৯২-১৭৬৩)। সভ্যদের বেশির ভাগ সময় কাটত ছোট গল্প রচনায়। সংঘের সভ্যদের রচিত গল্পগুলি সভাপতি দশখণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এর মাঝে অবশ্য স্বয়ং কেলাসের রচিত গল্পও অনেক আছে, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি অত্যন্ত আদিরসাত্মক। প্যারীর বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ান ছিল কেলাসের বাতিক,—তাই তাঁর স্বরচিত গল্পগুলিতে ওখানকার বস্তি-জীবনের ছবি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'চিঠি' বলে যে গল্পটি এইখানে অনুবাদিত হ'ল,—এর লেখক বোধ হয় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সংঘের অন্য কোন সভ্য,—এবং এই সভ্যটিই যে সত্যি সত্যি কে—তাও বলা কঠিন : হয়ত ক্রেবিলন,-হয়ত ডই-সনন হতে পারে দুক্লস অথবা নাম-না-জানা অন্য কেউ। লেখক যে-ই হ'ন কেলাসের কাছেই আমরা এই চমৎকার গল্পটার জন্যে বিশেষভাবে ঋণী,—কারণ, তাঁর চেষ্টা ব্যতিরেকে এ গল্প পড়বার সুযোগই আমরা পেতাম না।]

ভদ্রে,—যা-তা কথা রটিয়ে বেড়িয়ে যারা আনন্দ পায়—সে ধরণের লোক আমি একেবারেই নই,—কোন সংবাদ নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা হলে—সামরিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে,—কারণ এই সব ব্যাপারের মাঝে তবুও কিছু সারবস্তু আছে—বুদ্ধ শহরের ঘটনা এবং কাহিনী কিছু আপনাকে শোনাব বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—তাই রাখতেই আমি চিঠিখানি লিখছি। যে কাহিনীটা আজ আমি আপনাকে শুনাতে যাচ্ছি তা শুনে আপনার মনে কি হল তা আমার জানবার দরকার নেই, শুধু এইটুকুই আপনাকে জানানো প্রয়োজন যে—যে ঘটনা আপনাকে আজ শুনাচ্ছি তা সত্য।

গ্যালাসিদোর আর আমার মাঝে কি রকম বন্ধুত্ব—সে কথা অবশ্য আপনার জানা আছে, সুতরাং সে যদি বিশ্বাস করে তার মনের গোপন কথা আমায় কিছু বলে থাকে তাতে নিশ্চয়ই আপনি কিছুমাত্র বিস্মিত হবেন না। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলাম আমি যেদিন সে তার ঈর্ষার কথা আমায় খুলে বললে। সত্যি—তার মনেও যে ঈর্ষা জাগতে পারে—এ কথা আমি ভাবতেও পারিনি। এমন স্ফূর্তিবাজ লোক,—এমন খামখেয়ালী,—সংসারের সব কিছু সে এত বেশি বোঝে—তবুও ঈর্ষার জ্বালায় সে এমন কাতর হয়ে পড়ল,—বড়ই আশ্চর্য—আমি ভাবতাম এ সব ব্যাপারে আমার চেয়ে সে বুঝি অনেক বেশী টনকো। কিন্তু তা ত নয়!—কিন্তু তাকে তবুও তারিফ করি আমি—ঈর্ষার জ্বালায় মনে কাতর হলেও বাইরে খেলো লোকের মত কোন কিছু সে করেনি।

কাহিনী শুরু করবার আগেই গ্যালাসিদোর আমায় বলে রাখলে,—মামুলি কথা বলে আমায় কিন্তু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করো না,—ও সব মামুলি কথা—আমার মত অবস্থার অনেক স্বামীকে আমি নিজেও বলেছি কি না, তাই ও সব কথার কত কি মূল্য তা আমার বেশ জানা। আমার কথা শুধু তুমি শুনে যাবে,—বাধা দিয়ে আমার স্ত্রীর অবস্থা সম্বন্ধে আমার মনোভাব হালকা করতে চেষ্টা করো না।

আমি নীরবে তার কথা শুনে যাব প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সে বলতে লাগল—

স্ত্রীর প্রেমে হাবুডুবু খাবার মত মনের অবস্থা আর আমার নেই,—সে কথা আমি নিজেই স্বীকার করছি, কিন্তু তার প্রতি গভীর অনুরাগের ভাব পোষণ না করলেও তাকে কিছুটা শ্রদ্ধার চোখে যে আমি না দেখতাম তা নয়! আমি স্তম্ভিত হয়েছি তার রুচি দেখে,—খুঁজে খুঁজে বেছে নিলে শেষে এমন পুরুষকে! চব্বিশ বছরের একটি তরুণী মেয়ে—আমি স্বামী, যখন তাকে আর ভালবাসা দিতে পারছি না,—তখন সে যদি অন্য কোন পুরুষের কাছ থেকে তা পেতে চায়,—তাতে বাধা দেব—এত বড় মূর্খ আমি নই,—না, মানুষের উপর এত বড় অবিচার আমি কিছুতেই করতে পারি না। আমার আপত্তি হচ্ছে তার নির্বাচনে,—এতদিন তার যে রুচি আর বুদ্ধিশুদ্ধি আমি দেখে এসেছি তাতে মনে হয়েছিল নির্বাচন করবে—একজন সত্যিকার ভদ্রশ্রেণীর লোককে,—যাকে অন্তত আমি আদর আপ্যায়ন করে ঘরে বসাতে পারি। বুঝতেই পারছ স্বামী হলেও অবিবেচক আমি একটুও নই।

আমি উত্তর দিলাম,—তা' ত বুঝতেই পারছি,—কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে, তোমার স্ত্রী যদি কোন রকমে একবার নির্বাচন করে ফেলেই থাকেন,—তারপর তোমার রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন করে আবার নির্বাচন করা তার পক্ষেও ত সম্ভব না হতে পারে।

সে কথা ঠিক,—গ্যালাসিদোর উত্তর দিলে,—কিন্তু সত্যি বলতে কি আমার স্ত্রী যে শীভ্যালিয়ারকে মনোনয়ন করেছে—রাগ আমার তাতে নয়,—রাগ হয় আমার ঐ লোকটার হাবভাব দেখে, ও যে ঢঙে আমার সামনেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তা দেখে মনে হয় আমায় আঘাত দেওয়াই যেন ওর মতলব, ওর ঐ ঢং দেখেই আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আসলে ব্যাপারটা এত চরমে উঠেছে যে, ঐ সব চোখে দেখে মেজাজ ঠিক রাখা আমার রীতিমত কষ্ট হয়ে ওঠে,—কেবলি ভয় হয় এই বুঝি একটা কাণ্ড করে বসলাম,—কোন রকমে নিজেকে সামলাই। আমার স্ত্রীর হাবভাব দেখে মনে হয় —আমার মানসিক উত্তেজনার ভাব সে-ও লক্ষ্য করেছে তবুও তার মাঝে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখতে পাইনে আমি। আসলে এমনি নেশায় পড়েছে সে যে আমার সুখদুঃখের কথা ভাববার তার ফুরসৎ নেই।

বন্ধু প্রথমেই আমাকে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিল—তাই কোন কিছু বলতে পারছিলাম না আমি। আপনি ত জানেনই—কি রকম উদ্ভট অসামাজিক লোক ঐ শীভ্যালিয়ারটা,—বন্ধুর স্ত্রী ওঁকেই শেষে বেছে নিয়েছেন দেখে সত্যিই কেমন যেন লাগছিল আমার—এবং সেই কথাই বন্ধুকে জানাতে চাইছিলাম আমি। কিন্তু তা ত একেবারেই হবার উপায় নেই: বলতে গেলে বন্ধুর কষ্ট বাড়বে ছাড়া কমবে না। গ্যালাসিদোরও আমার অবস্থা দেখে আমার মনের কথা বুঝতে

পেরে বললে,—দোহাই তোমার,—কোন কিছু বলতে চেও না আমায়,—কারো কাছ থেকে কোন উপদেশের প্রত্যাশী আমি নই;—মনের দুঃখ কারো কাছে বলে এর ভারটা একটু লাঘব করতে চাই শুধু আমি—আর এই ধরণের কথা শুনাবার মত তোমার চেয়ে ভাল লোক আর আমার নেই। সত্যি কি বিশ্রী অবস্থায়ই যে পড়েছি আমি ভাই,—তা তোমায় কি বলব! ঐ নির্বোধ শীভ্যালিয়ারটাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই যেন অপমানকর—ওকে দেখলেই যেন আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে,—এ আত্ম-সম্মান মানে—সাধারণ লোকের আত্মসম্মানের কথা বলছি না আমি,—মার্জিতরুচি শিক্ষিত মেয়েদের সাথে মেশা সম্বন্ধে উদারনীতি পোষণ-কারী ভদ্রলোকের আত্মসম্মানেই আঘাত লেগে যায় ওকে দেখলে।

প্রথম দিন তার কাছ থেকে এই সব শুনে সত্যি আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করা যায়। কথা হচ্ছিল আমাদের পথেই, নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে কথা বলবার জন্যে হাঁটাতে হাঁটাতে সে আমায় 'য়্যাল্লিঃ দু রুয়েলে' নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে অনেক ভেবে চিন্তে আমি ঠিক করলাম ওর স্ত্রীর সাথে একবার দেখা করা আমার দরকার। যে সব ব্যাপার আমি জানলাম তা কিছু কিছু তাঁকে জানিয়ে তাঁকে সাবধান করে দিতে হবে,—তাঁর স্বামীর প্রতি এবং সংগে সংগে তাঁর নিজের প্রতিও তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁকে একটু সচেতন করে তুলতে হবে। ঠিক করলাম বটে,—কিন্তু এ সব বলবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। তার স্ত্রীর সংগে যদিও আমার সাক্ষাৎ হয়,—য়্যালসিদোর তখন বসে থাকে সেই ঘরে,—কিছুতেই নড়বে না সে—সে ঘর থেকে। তার সাক্ষাতে কানে কানে বলার মত করেও বলা যায় না তার স্ত্রীকে: য়্যালসিদোর সন্দেহ করবে আমায়।

য়্যালসিদোর শীভ্যালিয়ারের আচরণ সম্বন্ধে যা বলেছিল তা কিন্তু আমি নিজের চোখেই দেখতে লাগলাম: সে সব সময়ই বসে থাকে ওর স্ত্রীর পাশে,—একবারটিও নড়বে না,—অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলে, তা ছাড়া মহিলাটির দিকে তাকায় এমন ভঙ্গীতে যার কিছুতেই কোন সমর্থন করা যায় না। য়্যালসিদোরের কাছ থেকে ব্যাপার সব আগেই আমি শুনেছি,—তাই আমার প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল এই বুঝি সে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে, আর চোখের সামনে নিজেই আমি যা দেখলাম তা দেখলে স্বামী ত ভাল—যে কোন লোকের ধৈর্যচ্যুতি হবার সম্ভাবনা। ওদের বাড়ি থেকে আমি বুঝে এলাম য়্যালসিদোরের অভিযোগ একটুও মিথ্যে নয়। বন্ধুর সহ্যগুণ দেখে আমি আশ্চর্য হলাম, আর তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হলাম ঐ দুটির অবিবেচনা দেখে, বুদ্ধিশুদ্ধি ওদের একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। এই দেখে শুনে আমার কেবলি মনে হতে লাগলো বন্ধুপত্নীর সংগে শীগ্গির একবার দেখা করা আমার একান্ত দরকার। গত পরশুদিন দুপুরে তার সংগে দেখা করতে যাবার উদ্যোগ করছিলাম—কারণ—ভেবেছিলাম এই সময়ে তাকে একা পাওয়া যেতে পারে। রওনা হব এমন সময় আমার চাকর বন্ধু য়্যালসিদোরকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বন্ধু যে চেহারা নিয়ে ঘরে ঢুকলো তা দেখে আমি একেবারে ভড়কে গেলাম; চোখে মুখে তার একসংগে যেন নিদারুণ দুঃখ, ভয় ও বিজয়ের ভাব ফুটে উঠেছিল।

চাকরটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সংগে সংগে য়্যালসিদোরকে বললাম,—কি ব্যাপার বলত, তোমার চোখে মুখের অবস্থা দেখে'ত আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেছি!

বিষাদাচ্ছন্ন অদ্ভুত এক পরিতৃপ্তির সুরে বন্ধু উত্তর করলে,—আর, ভাই কোন সন্দেহ নেই,—আমার কথাই ঠিক, সব কিছু জলের মত পরিস্কার হয়ে গেছে, ঐ শীভ্যালিয়ারই জয়লাভ করলে শেষে। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম ব্যাপারটা এমন কিছু বেশীদূর গড়ায় নি,—কারণ আমার ধারনা ছিল—যে মেয়ের একটুও কাণ্ডজ্ঞান আছে সে কখনও অমন পুরুষের সঙ্গ বেশীদিন বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারনা ভুল, ঐ শীভ্যালিয়ারই জিতলে, এবং আমার স্ত্রীকে এর জন্য অশেষ দুঃখ পেতে হবে শেষে। এরূপ ব্যাপারে কোন রকম সুফল ত হয়ই না,—শেষে হয় একরকম মহামারী কাণ্ড।

এরপর একখানা চিঠি সে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—এই নাও—পড়ে দেখ,—আর তাকিয়ে দেখ এর ঠিকানাটা!

তাকিয়ে দেখলাম চিঠির উপর লেখা রয়েছে—শীভ্যালীয়ারের নাম আর ঠিকানা,—কোন কিছু গোপন রখবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই।

একরকম চীৎকার করেই আমি বলে উঠলাম, এ কি,—কি করেছ তুমি?—এ চিঠি তোমার হাতে এল কি করে?

—বলবার সংগে সংগেই আমার মনে হল বন্ধু বোধ হয় তার স্ত্রী অথবা শীভ্যালিয়ারকে খুন করে এসেছে।

বন্ধু অতি ধীর শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে,—ব্যস্ত হয়ো না,—বলছি।......চিঠিটা ঘটনাচক্রে আমার হাতে এসে পড়েছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে একটা বিশেষ কাজে কাছেই এক ভদ্র-লোকের বাড়িতে আমি যাচ্ছিলাম। বাড়িটা কাছেই তাই গাড়ীতে না চড়ে হেঁটেই যাচ্ছিলাম আমি,—আজকের আবহাওয়াটা সুন্দর বলে তার মাঝে মনের সাধে নানা কিছু ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সামনে দেখি এক স্যাভয়বাসী—হাতে তার একখানা চিঠি। লোকটা আমায় দেখে বললে, দেখুন ত, মশিয়ে—এ ঠিকানাটা,—জায়গাটা কোথায় বলতে পারেন?......বুঝে দেখ,—এ হাতের লেখা আমার স্ত্রীর এ কথা বুঝতে পেরে আমার মনের কি অবস্থা তখন হয়েছে!......স্যাভয়-বাসীকে আমার অনুসরণ করতে বলে আমি এক কাফিখানায় গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে লিখবার সরঞ্জাম সব কিছুই যোগাড় ছিল।

বললাম,—তারপর?

বন্ধু বলতে লাগল,—ভগবানই জানেন এই চিঠি নকল করতে গিয়ে কি কষ্ট আমি পেয়েছি,—আর কোন মেয়ের এত আবেগভরা চিঠিও কোনদিন আমি দেখিনি। আর দেখ প্রেমে পড়ে কি রকম মাথা খারাপ হয়েছে তার দেখ,—নইলে চোখের সামনে যে ভিখারী পড়ে তারই হাতে এমন চিঠি পাঠাতে চেষ্টা করে কেউ!......মাত্র কাল ঐ শীভ্যালিয়ার ওর মন একেবারে জয় করে নিয়েছে,—চিঠি পড়,—পড়লেই বুঝতে পারবে।—আর দেখ—আমার উপর কেমন ঈর্ষা প্রকাশ করেছে দেখ,—আমার নিজের বাড়িতে ঢুকে ওদের প্রেমালাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি—এই আমার অপরাধ।......কিন্তু আমি কেমন করে ওদের কিসের ব্যাঘাত করলাম বুঝছি না,—আমি যখন বাড়িতে ঢুকলাম তখন ওরা দুজনে কথা বলছিল বটে,—কিন্তু সে ত কোন গোপনীয় প্রেমালাপ বলে মনে হল না,—অতি সাধারণ একঘেয়ে বাজে কথাই তারা বলছিল বলেই ত মনে হল।......যাক এই সাংঘাতিক চিঠির সবটুকু অবিকল নকল করে,—আসলখানা রেখে—স্যাভয়বাসী ভিখারীকে কিছু অর্থ পুরস্কার দিয়ে তারই হাতে নকল চিঠিখানা যথাস্থানে পাঠিয়েছি। এখনও কি তুমি বলতে চাও আমার অভিযোগ ভিত্তিহীন?

এরপর ঐ সাংঘাতিক চিঠিখানা পড়ে দেখলাম আমি। চিঠিটায় এমন সব কথা লেখা রয়েছে যার প্রত্যেকটায় যে কোন স্বামীকে শুধু মর্মাহত নয়—একেবারে পাগল করে দিতে পারে। চিঠিখানা অবশ্য বন্ধুকে আর আমি ফেরত দিলাম না,—আর বন্ধুর যে রকম অবস্থা তাতে তাকে একা ছেড়ে দেওয়াও আমি সমীচীন বোধ করলাম না। সুতরাং তাকে সংগে করই আমি তার স্ত্রীর সংগে দেখা করতে গেলাম। আমার নিজের অবস্থা কি তখন—একবার ভেবে দেখুন!......সৌভাগ্যক্রমে ভদ্র-মহিলা বাড়িতেই ছিলেন,—আমাকে তার স্বামীর সংগে আসতে দেখে তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট হাসি দিয়ে প্রফুল্লচিত্তে আমাদের সম্বর্ধনা করলেন। কিন্তু এই প্রফুল্লতা তাঁর আর বেশি-ক্ষণ রাখা সম্ভব হল না,—কারণ তাঁর উত্তেজিত স্বামী প্রায় তখনই তাঁকে যথেচ্ছ ভাষায় তিরস্কার করতে শুরু করলেন। ভদ্রমহিলা—সেই দোষাবহ তিরস্কারে মর্মাহত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন,—স্বামীর নিদারুণ কটূক্তি শুনে বেদনায় তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন,—চোখে তার এক ফোঁটা জল ছিল না। তিনি অনেক দোষে দোষী হলেও তাঁর এই অবস্থা দেখে আমার কেমন অনুকম্পা বোধ হতে লাগল,—

আমি তাঁকে তুলে সান্ত্বনা দিতে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম।

মহিলাটি আমাকে কাছে পেয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে অনুযোগের সুরে বললেন,—আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার এই অপমান সহ্য করছেন আপনি? আমি কোথায়? আপনাকে কি আমি বন্ধু বলে দাবী করতে পারি না?

এ্যালসিদোরও সংগে সংগে সমান উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল,—হ্যাঁ, ঐ আমাদের দুইজনের বিচার করুক!

এই বিশ্রী ব্যাপারের যাতে অবসান ঘটে দুইজনের মাঝে এইরূপ একটা আপোষ করবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম, এবং আমার চেষ্টায় কিছুটা ফল হল বলেও মনে হচ্ছিল,—কিন্তু ক্রুদ্ধ য়্যালসিদোরকে থামানো দায়—তার স্ত্রীর অপরাধের যে প্রমাণ পেয়েছে সে,—তাই নিয়ে বার বার অভিযোগ আনতে কিছুতে ছাড়বে না,—এদিকে তার স্ত্রীও কিছুতেই দোষ স্বীকার করবেন না,—তাঁর এই দৃঢ়তা দেখে সত্যিই আমি অবাক হচ্ছিলাম: চিঠির কথা উল্লেখ করা হলেও তিনি জোর গলায় বলেন তিনি নির্দোষ। এই সব দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছিল,—নিতান্ত কঠিন হলেও এই মুস্কিল থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় ঠাউরেছেন তিনি। অবশেষে য়্যালসিদোরের বারবার পীড়াপীড়িতে—চিঠিখানা বের করে দেখালাম তাঁকে।

বন্ধুপত্নী চিঠিখানার দিকে একবার তাকিয়েই দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমার চিঠি এ নয়,—য়্যালসিদোর এমন কথা ভাবতে পারলে কি করে সেই আশ্চর্য!

এ্যালসিদোর কিন্তু স্ত্রীর এ উত্তর শুনে একটুও বিস্মিত হল না,—সে বরং মনে করল—তার স্ত্রীর পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আর কিছু না। আমার নিজেরও ঠিক এই কথাই মনে হল,—তবু মতান্তর না দেখে আমি তার স্ত্রীর উক্তির উপর জোর দিয়েই কথাবার্তা বলতে গেলাম;—কিন্তু বেশি কিছু বলা আর আমার হল না,—বন্ধুপত্নী তখনই আমাকে বাধা দিয়ে আমাদের দুজনকে শুনানোর জন্যেই বলতে লাগলেন:

আমার স্বামীকে আমি চিরকালই ভালবাসি। কিন্তু ওর কাছ থেকে আমি আগেকার সেই ভালবাসা পাচ্ছি না,—বহুদিন। এর জন্য আমার মনোকষ্টের সীমা নেই কিন্তু উনি কখনও বলতে পারবেন না—যে এ অবহেলার জন্য আমি কোনদিন ওঁকে দোষারোপ করেছি! কেন করব?—আমি জানতাম এতে কোন ফল হবে না। আমি [illegible] দোষ করেছি ওঁর মনে ঈর্ষার উদ্রেক [illegible] ওঁর ভালবাসা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা [illegible] পথে বিপদ আছে সে কথা জেনেও। [illegible] কথা ভেবেই এমন লোককে আমি [illegible] য়োজন সিদ্ধির জন্যে নির্বাচন করে [illegible] যে, যারা আমায় বেশ ভাল করে জানেন—তাদের কেউই এরূপ লোকের দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট হতে পারে—এ কথা ভাবতে পারবেন না। ঐ ভদ্রলোক নিজেও সহজেই আমার পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু ও'র সংগে মেশাতে য়্যালসিদোর কি রকম কষ্ট পাচ্ছে—কাল যখন আমি তা নিজের চোখে দেখলাম,—তখন কালই আমি আমার চাকরবাকরদের হুকুম দিয়ে দিলাম—শীভ্যালীয়ার যদি আমার সংগে দেখা করতে আসেন তবে বলবে আমার সংগে দেখা হবে না। আর এ হুকুম শীভ্যালিয়ারের সামনেই আমি দিয়েছি,—যাতে তিনিও আমার মনোগত ভাব না জানার ভাণ না করতে পারেন। চাকরবাকরদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তারা যদি এ কথা অস্বীকার করে—তা হলে বরং আমি শুনতে রাজী আছি—এ রকম জঘন্য চিঠি আমার দ্বারা লেখা সম্ভব। হ্যাঁ, তবে এ হাতের লেখাটা যে আমার লেখারই মত,—সে কথা আমি মানতে রাজী আছি—।

তারপর মহিলাটি তাঁর স্বামীর দিকে নিরতিশয় কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন,—কিন্তু তোমার,—আমার হাতের লেখা আর এই লেখার মাঝে যে পার্থক্যটুকু রয়ে গেছে,—তা ত তোমার চোখে এড়িয়ে যাবার কথা নয়!......এখনও কি বলতে চাও তুমি—এ আমার হাতের লেখা?

সহসা য়্যালসিদোর বলে উঠলে,—ও ভগবান!—এখন বুঝতে পারছি। না, তোমার লেখা এ নয়।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ,—তারপর য়্যালসিদোর হঠাৎ উঠে তার স্ত্রীর পায়ে গড়িয়ে পড়ে মিনতির সুরে ক্ষমা চাইতে লাগল।—দেখে আমি ত একেবারে হতভম্ব। বন্ধুপত্নী অবশ্য অতি সহজ মধুরভাবে তাঁর যথাকর্তব্য পালন করলেন। এরপর আমি তাদের কাছে বিদায় চাইলে য়্যালসিদোর আরও কিছুক্ষণ তাঁর স্ত্রীর কাছে আমায় থেকে যেতে বললে।

বন্ধুপত্নী আমার দিকে মৃদু হেসে বললেন,—ব্যাপার কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। সব খুলে বলছি আপনাকে—

এই কথা শুনবার সংগে সংগে য়্যালসিদোর বিশেষ উত্তেজনা নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল,—এইবার নির্বাধে সকল কথা শুনতে পারা যাবে বুঝে আমিও বন্ধুপত্নীকে সব কিছু খুটিয়ে বলবার জন্য অনুরোধ করলাম।

বন্ধুপত্নী তখন বললেন,—যে কথা আজ আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি সে কথা একমাত্র আপনাকে ছাড়া কিন্তু অন্য কাউকে আমি বলতে পারি না। কথাটা হচ্ছে—চিঠিটা যে আমি লিখিনি সে কথা জানবার আগে য়্যালসিদোর যেমন মনোকষ্ট পাচ্ছিল,—এখনও কিন্তু তেমনি মনোকষ্টই সে পাচ্ছে।

ঠিক বুঝতে পারলাম না,—উত্তর দিলাম আমি।

খুলে না বললে বুঝবেন কি করে?—ব্যাপারটা হচ্ছে—য়্যালসিদোর ভীষণভাবে চেফিসের প্রেমে পড়েছে। আর এই মেয়েটি যে কি ধরণের তা নিশ্চয়ই আপনার জানা। বুঝলেন,—সেই মেয়েটির লেখা এই চিঠি। আমাদের দুইজনের হাতের লেখা প্রায়ই একরকম,—পার্থক্য শুধু একটুখানি,—আমার স্বামীর চোখে এই পার্থক্য ধরা পড়েনি—সে শুধু ঈর্ষায় তাঁর চোখে ধাঁধাঁ লেগে গিয়েছিল—তাই। হাতের লেখার এই মিল,—উপরে শীভ্যালিয়ারের ঠিকানা লেখা, তার উপর মনের এই ঈর্ষা সব কিছু মিলে আমার কথাই তাঁ[illegible] মনে করিয়ে দিয়েছিল,—চেফিসের কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি,—অথচ এসব কীর্তি তার।

এখন বুঝলাম আমি,—আমি উত্তর দিলাম।

মহিলাটি বললেন,—না, বুঝতে এখনও অনেক বাকী আছে। এর মাঝে আরও ব্যাপার রয়েছে। সে ব্যাপার হচ্ছে শীভ্যালীয়ার ভীষণভাবে চেফিসের প্রেমে পড়েছেন। বাইরে যে তিনি আমার প্রতি অনুরাগ দেখানোর ভাণ করেছে সে কেবল নিজের প্রেমাস্পদের কাছ থেকে য়্যালসিদোরকে সরিয়ে আনবার জন্যে। এবং এ জন্যেই আমিও তাঁর সঙ্গে মিশবার ভা[illegible] করতাম। এখন আমার অনুরোধ আপ[illegible] আমাদের এখানে কিছুদিন থাকুন,—কার[illegible] কোন পুরুষ যখন কোন নারীর বিশ্বাস[illegible] ঘাতকতার দ্বারা আহত হন তখন একজ[illegible] সত্যিকার বন্ধুর সাহচর্য তাঁর একান্ত প্রয়োজন[illegible] একদিক দিয়ে এ্যালসিদোর এখন শান্ত হ[illegible] পেরেছে বটে,—কিন্তু অর একজনের সম্বন্ধে যে কথা সে জানতে পেরেছে—তাতে সেদি[illegible] দিয়ে সে মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।

এমনি করে বন্ধুপত্নীর সংগে নানা ক[illegible] বলতে বলতেই য়্যালসিদোর ফিরে এল,—[illegible] এসেই বললে,—চেফিসের কাছ থেকে আস[illegible] আমি,—তার চিঠি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে ত[illegible] সংগে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে এলাম আমি[illegible] ......আরে ভাই, বলব কি, ওর বাড়িতে আমা[illegible] ঢুকতে দিতেই চায় না—ওর চাকরবাক[illegible] চেফিস বাড়িতেই রয়েছে,—শীভ্যালিয়ারে[illegible] গাড়ীটাও দেখলাম রয়েছে বাইরে। আমার মন[illegible] চিঠিটা পেয়ে ও হয়ত ভয় পেয়ে ছুটে এসে[illegible]—চেফিসকে সাবধান করে দিতে,—অথবা বি[illegible] পরামর্শ দিতে।

আমি বললাম,—ওদের কার্যকলাপে অ[illegible] কিন্তু খুব খুশি হয়েছি। ওরা তোমার স[illegible] আর দেখা করবে না। এ তোমার মহা সৌভাগ্যের কথা।

য়্যালসিদোর একটু আগে যে আঘাত পে[illegible] ফিরে এল তাতে সে আমার কথার যৌক্তিকতা তখনি উপলব্ধি করবে তা অবশ্য আশা [illegible] যায় না,—তবুও মাঝেমাঝে সে এমন [illegible]

দেখাতে লাগল—যে ওদের কোন কিছু সে আর গ্রাহ্য করে না। আর আমি চেষ্টা করতে লাগলাম—চৌফিসের প্রতি তার মনে যে ঘৃণার ভাব তখন জেগেছে তাকে ঔদাসীন্যে রূপান্তরিত করা। কারণ য়্যালসিদোরের ঘৃণা পাবার যোগ্যতাও চৌফিসের নেই। অথচ তার স্ত্রীর তুলনা হয় না। স্বামীর উপর অযথা প্রাধান্য করবার ইচ্ছা তাঁর কোন কালেই নেই,—আর স্বামী—এ যে তাঁকে অবহেলা করে তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ করতে যাচ্ছিলেন—এর জন্য স্বামীর প্রতি বিন্দুমাত্র রাগ দেখাননি তিনি। মন থেকে এ সব ব্যাপার একেবারে মুছে ফেলেছেন তিনি। আমি তাঁকে প্রশংসা না করে পারি না, তাঁর স্বামীকে দিই শুধু আমি সান্ত্বনা।

ভদ্রে,—নাগরিক জীবনের কোন একটা ব্যাপার যে আমার কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন আপনি,—তাই আমার এ চিঠি লেখা, আশা করি আপনি একে একটা শোনানোর মত কথা বলেই মনে করবেন। আর এই ব্যাপার নিয়েই আমি এতদিন ব্যস্ত ছিলাম।

অনুবাদক—শ্রীতারাপদ রাহা

# পুস্তক পরিচয়

**মায়াপুরী**—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭ পণ্ডিতিয়া রোড।

"মায়াপুরী" একখানি রঙ্গ-নাটিকা। রক্ষোপুরীর এক ঘুমন্ত রাজকন্যাকে কেন্দ্র করিয়া পর পর ভরত, কন্‌ফুসিয়াস, কবি কালিদাস, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং প্রগতি নামক সিনেমা-রসিক এক আধুনিক যুবকের কথোপকথনের মধ্যে দিয়া নাটিকার বিষয়বস্তু পরিণতি লাভ করিয়াছে। সংলাপে শাণিত বিদ্রূপ ও হাস্যরস আছে। কলালক্ষ্মীর বিবর্তন দেখানোই বোধ হয় রচয়িতার উদ্দেশ্য। নাটিকায় দেখান হইয়াছে যে, ভরত, কন্‌ফুসিয়াস, কালিদাস এবং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সকলেই রাক্ষসীর ভয়ে রাজকন্যার নিকট হার মানিয়া সরিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সিনেমা-রসিক নব্য-যুবক প্রগতি অবশেষে তাহাকে লাভ করিয়াছে। রাজকন্যার কয়েকখানি গান এবং পরিশিষ্টে সেগুলির স্বরলিপি আছে।

৯৩।৪৮

**ছায়াপথ**—শ্রীপ্রবোধ সরকার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ভারতী ভবন, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বৃদ্ধির মহৎ উদ্দেশ্যই সম্ভবত লেখককে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা করিতে না পারার দরুণ শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়া হইয়াছে। এককালে মুসলমান লেখকগণ তাঁহাদের উপন্যাসগুলিতে হিন্দু সমাজ হইতে নায়িকা গ্রহণ করিতেন এবং মুসলমান নায়কের সহিত তাহার বিবাহ ঘটাইতেন। তাঁহারাই আবার দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি গালি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মহৎ সৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকা যে-কোন ধর্ম বা যে-কোন সমাজ হইতেই গ্রহণ করা হোক না কেন, চরিত্র সৃষ্টির মহত্বের নিকট সে প্রশ্ন একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া যায়। নায়ক-নায়িকার উদারতা, ত্যাগ, সেবাধর্ম প্রভৃতি সুমহান আদর্শগুলিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিতে আমরা তাহা পাইয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত অনুদার মুসলমান সাহিত্যিকগণ গুণগ্রাহিতার পরিচয় না দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পাল্টা জবাব হিসাবেই তাহাদের উপন্যাসে হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে মুসলমান পুরুষের মিলন ঘটাইতেন। পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজ সে সব উপন্যাসের কোন খোঁজ না রাখিলেও মুসলমান যুবকেরা তাহা হইতে যে অনেক অশিক্ষা লাভ করিত এবং তদ্দরুণ যে নারীহরণাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত, একথা অস্বীকার করা চলে না। হিন্দু ঔপন্যাসিকেরা এ পর্যন্ত মুসলমান নরনারীকে উপন্যাসে গ্রহণ যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিয়াছেন; কখনো কখনো গ্রহণ করিলেও, তাহাদিগকে যৌন-ব্যাপারের কাছে ঘেঁষিতে দেন নাই নানা অনর্থের আশঙ্কায়। কিন্তু শ্রীপ্রবোধ সরকার বিনা দ্বিধায় সে কার্য করিয়াছেন। হিন্দুর মেয়ে শ্যামলী ও মুসলমানের ছেলে জরিফের মধ্যে প্রেম ও বিবাহ ঘটাইয়া অতি সহজে সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন। উপন্যাস হিসাবে বইটি মোটেই জমে নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় কিছু কিছু ত্যাগ ও সেবাধর্ম দেখান হইয়াছে; কিন্তু শিল্পবোধের অভাবে সেগুলি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান সমাজধর্ম সম্বন্ধে লেখকের অজ্ঞতাও কোন কোন স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'কলমা পড়িয়ে শ্যামলীকে বিয়ে না করার দরুণ......জরিফকে কাফের বলে প্রকারান্তরে সমাজচ্যুত করলে মুসলমান সমাজ।' ইহা ঠিক নহে। এরূপ ক্ষেত্রে যে মুসলমান সমাজের সক্রিয় সমর্থন খুবই পাওয়া যায়, লেখক চারিদিকে একটু চোখ বুলাইলে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেন। এ রকম বই রচনার আমরা কোন দিক হইতেই সার্থকতা দেখি না।

৮০।৪৮

**হেথা নয়** (উপন্যাস)—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু রচিত। প্রকাশক—ভারতী ভবন, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীযুত শক্তিপদ রাজগুরুর শক্তি এই উপন্যাসটির মধ্যে নানাভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। একদিকে ভাষার ওজস্বিতা ও ঝঙ্কার, অন্যদিকে আখ্যানভাগে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি ও ঘটনাবলীর সমাবেশ বইটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। উপন্যাসটি রাজনীতি ঘেঁষা; কিন্তু রস সৃষ্টিই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ার দরুণ ইহা সকল শ্রেণীর পাঠককে সমান আনন্দ দিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

৮১।৪৮

**উত্তর পুরুষ** (উপন্যাস)—কমলাকান্ত ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ভারতী ভবন, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ভাস্কর একজন মূর্তিশিল্পী। মমতা একটি হৃদয়বতী নারী। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা। কিন্তু তৃতীয় জীব—কৃষ্ণা—ভাস্করের মন বিগড়াইয়া দিল; ভাস্কর তাহার অনুরাগী হইয়া মমতার মমতা বিসর্জন দিল। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া শেষে ভাস্করের শোচনীয় পরিণতি ঘটাইয়া গ্রন্থকার উপন্যাসের যবনিকা টানিলেন। কাহিনী মন্থর; সংলাপ, ঘটনাবিন্যাস বৈচিত্র্যহীন। আগাগোড়া পড়িবার জন্য পাঠকের মনে কোন তীব্র কৌতূহলের উদ্রেক করে না। তবে শিল্পী ভাস্করের চরিত্র চিত্রনে নিপুণতার পরিচয় আছে।

৮২।৪৮

**কংগ্রেস রথ সারথি ধারা**—প্রকাশক—ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

এই গ্রন্থে ভারতের ষোলজন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া কংগ্রেস অধিবেশনের তালিকা, জাতীয় পতাকার ব্যাখ্যা, আগস্ট প্রস্তাবের সারাংশ, ভারতীয় স্বাধীনতার [illegible] ইত্যাদি কয়েকটি জ্ঞাতব্য নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থে লেখকের নাম নাই। তবে প্রকাশক জানাইয়াছেন যে, 'এই পুস্তকের পরিকল্পনায় ও রচনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন স্বনামধন্য তরুণ কবি শ্রীপ্রভাত বসু......ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের জীবন-কথা রচনা করেছেন শ্রীসুধেন্দু দাশগুপ্ত।' এই পুস্তকের সাহায্যে ছেলেমেয়েরা অল্পের মধ্যে দেশবরেণ্য নেতৃবর্গের পরিচয় লাভে সক্ষম হইবে। এইজন্য পুস্তকটির বহুল প্রচার কাম্য।

৮৪।৪৮

**জওহরলালের গল্প**—শ্রীপ্রভাত বসু প্রণীত। প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ টাকা।

শৈশব হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত পণ্ডিতজীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা শিশুদের জন্য এই বইটিতে পরিবেষণ করা হইয়াছে। লেখকের রচনায় কোন শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় না থাকিলেও এই মহান্ দেশনেতার সহিত পরিচয় লাভের আগ্রহে বালকবালিকারা বইটি যে রুদ্ধনিশ্বাসে পাঠ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখক সরস ভাষায় সংক্ষেপে এবং অনাড়ম্বরভাবে শিশুদিগকে এই জওহরলালের গল্প শুনাইয়াছেন। পণ্ডিতজীর তরুণ বয়সের কয়েকখানা এবং স্কুল জীবনের ও নেতৃজীবনের কয়েকখানা ছবি বইটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করিয়াছে। গ্রন্থশেষে পণ্ডিতজীর কতকগুলি বাণী দেওয়া হইয়াছে। শিশুদের মন ও চরিত্র গঠনে পণ্ডিতজীর নির্ভীক কৈশোরের ও সুকঠোর ত্যাগব্রতী নেতৃজীবনের কাহিনীগুলি অপরিহার্যরূপে সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা এইরূপ গ্রন্থের সমধিক প্রচার কামনা করি।

৪৬।৪৮

**জাতীয় বাহিনীর নব-জাগরণ**—শ্রীসুধাংশু সেন প্রণীত। প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্‌কালে বোম্বাই পোতাশ্রয়ে ভারতীয় নৌ-সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়া নানাস্থানে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে বিবরণাদি সংবাদপত্রের মারফতে সকলেরই জানা আছে। এই বিদ্রোহের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং উহাতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন একজন নৌ-সৈনিকের লিখিত আলোচ্য গ্রন্থখানি যে বিদ্রোহের পটভূমিকা এবং ঘটনাবলীর উপর সঠিকভাবে আলোকপাত [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখকের প্রত্যক্ষ [illegible] গ্রন্থ এই বিদ্রোহের কাহিনী, বৃটিশ [illegible] অফিসারদের সহিত ভারতীয় তরুণদের [illegible] দেশী বিনিময়ের বিবরণ, বাঙলার [illegible] শক্তিপ্রেরণা জাগাইবে। ঘটনাবলীর [illegible] হিসাবে বইটি বিশেষ মূল্যবান [illegible] ছিল না-বিদ্রোহ সম্বন্ধে সংবাদপত্রসমূহ [illegible] ও তাঁর [illegible] করা হইয়াছে। কিন্তু উহা [illegible] অনুকম্পা বে

৯০।৫৪

# ভুল বসন্ত

শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী

চিনিবিহীন চা খেয়ে সুকান্ত এই প্রথম অনুভব করলো—চায়েরও একটা স্বতন্ত্র স্বাদ আছে, চিনি দিয়ে তাকে ঘোলাটে করার কোন মানে হয় না। চায়ের নিজস্ব একটা আবেদন—স্বাদে, গন্ধে পরিচয়ের মধুর রূপটাই ঢাকা পড়ে যায়।

প্রথম আঘাত এমন কিছু মারাত্মক নয়—সুকান্ত একটুও মুষড়ে পড়েনি তার জন্যে। হেমনলিনীর দ্বিতীয় আক্রমণ সত্যি তাকে ভাবিয়ে তুললে।

: চাল নেই—সপ্তাহ শেষ হতে এখনও একদিন বাকী। গৃহিণীর অসহযোগ ঠিক অহিংসার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে না, পর পর এক-একটা অভাবকে খুঁচিয়ে বের করে তার নগ্ন রূপ প্রকাশ করার মধ্যে একটা নির্মম কাঠিন্য ধরা পড়ছে। হেমনলিনীর স্বভাবের মধ্যে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই, ধূলি-রুক্ষ বাস্তবতায় সে যেন একটু বেশী ধারালো হয়েছে আজকাল।

বহুবিধ গঞ্জনা, বিশৃঙ্খলা এবং অভাব-অভিযোগের পর গত রাত্রি থেকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব সে নিজে গ্রহণ করেছে। হেমনলিনী চাবিকাঠি হাতে তুলে দিয়ে খালাস—তারপর সব নিজে দেখে শুনে নাও। মজুত তহবিল হাতে নিয়েই সুকান্ত ক্ষান্ত হয়েছে, ভাঁড়ারেরও যে একটা চার্জ্জ নেওয়া উচিত ছিল—সুকান্তের সেটা খেয়াল হয়নি।

চিনি নেই, শুনে সুকান্ত চুপ করে ছিল—চাল বাড়ন্ত সংবাদে চক্ষু বিস্ফারিত করে বলল : তার মানে?

: আমি কি জানি! আজ থেকে সংসার চালানোর ভার তুমি নিয়েছ। আমিও নিশ্চিন্ত; অনর্থক ভেবে মরি কেন? কথাটা হেমনলিনী ঠিকই বলেছে। অর্থ উপায়ের দায়িত্ব যখন সুকান্তর—তখন ভাবনাটা তারই থাক।

কিন্তু 'র‍্যাশনিংয়ের' যুগে চাল নেই সংবাদটা সত্য হলেও একটা অপ্রীতিকর ঘটনা। অর্থ থাকলেও মুস্কিল আসান হবার সুযোগ কম। কালোবাজারে যদিও কিনারা হবার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট—কিন্তু অন্ধকার না হলে কালো পথে পা বাড়াতে তার নিজেরই কেমন যেন লজ্জা করে। একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বললে সুকান্ত।

: কাল বলোনি কেন?

: থাকলে আবার বলতে যাবো কেন? কাল তো ছিল।

: পরের দিনের কথা ভাবতে হয় না?

: সে তো তুমি ভাববে। পরের ভাবনা আমি ভাবি কেন?

: স্বার্থপর কোথাকার! টিমওয়ার্ক বোঝ? কো-অপারেশন?

: না। নন-কো-অপারেশন বুঝি।

: সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

সুকান্ত একটা থলি হাতে উঠে পড়লো। অযথা অন্বেষণ এবং পরিক্রমণে কেটে গেল অনেকটা সময়। শূন্য হাতে, শূন্য মনে ফিরে এলো সুকান্ত। ঠিক সৌম্য সহাস না হলেও অনেকটা শান্ত এবং নিরুদ্বেগ বলা যেতে পারে।

এসব বিষয়ে চিন্তা আর অস্বস্তি নিয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। যা হচ্ছে, তাই মেনে নাও। অবস্থার ওপর যখন তোমার হাত নেই, তখন এছাড়া উপায় কি?

—পাঞ্জাবী হোটেলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে। সুকান্ত সব ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মনে মনে খুশি হলো বোধ হয়।

স্নান সেরে পোষাক পরে সুকান্ত অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। হেমনলিনীর অকৃপণ দাক্ষিণ্য তাকে রীতিমত বিস্মিত করে দিলে।

খেতে খেতে খুশি মনে বললে সুকান্ত: টিমওয়ার্ক।

: ক্র্যাফ্‌টম্যানশিপ। —বাধা দিলে হেমনলিনী।

: ধুলো আর কাঁকরের কবর থেকে অল্প কিছু চাল উদ্ধার হলো—মিশিয়ে দিলাম ডালের সঙ্গে।

: হচ্‌পচ্‌? —বিস্মিত কণ্ঠে বললে সুকান্ত।

: মন্দ কি! হেমনলিনী ঠোঁটে হাসি চেপে মুখ তুলে তাকাল।

: মন্দ মানে? অতিরিক্ত ভাল। —হেমনলিনীর নির্ভেজাল প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হলো সুকান্ত। বই হাতে স্কুলে যাবার সময় লীলা একবার তাগিদ দিয়ে গেল : বাবা, আজ কিন্তু না আনলে চলবে না। ক্লাসের মেয়েরা বলেছে, এক্সিবিশনে লাইনে দাঁড়ালে শাড়ি পাওয়া যায়। —নিশ্চয় এনো কিন্তু, ভুলে যেও না আবার।

: কি বিরক্ত করিস সব সময়! —হেমনলিনীর ধমকে একটুও দমে না গিয়ে লীলা বললে : বিরক্ত নয় মা, আমার আর একটাও আস্ত শাড়ি নেই কিনা—তাই বলছি।

সুকান্ত হেসে বললে : বলবে বই কি মা, —আজ থেকে আমিই তো চার্জ্জ নিয়েছি।

বাদুরের মত ঝুলতে ঝুলতে দুটো স্টপ এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে সুকান্ত দেহটা ঢুকিয়ে দিলে, তারপর ধাক্কায় ধাক্কায় একেবারে কোণঠেসা হয়ে দাঁড়ালো। অফিসে তার সেক্সনের কেরানী ব্রজগোপাল একপাশে বসেছিল, তাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

সুকান্ত বাধা দিতে যাচ্ছিল, তাকে একরকম জোর করে বসিয়ে দিয়ে ব্রজগোপাল বললে : বলেন কি স্যার! আমাদের তো কোম্পানীর সঙ্গে স্ট্যাণ্ড স্টিল এগ্রিমেণ্ট—যেটুকু বসেছি—সেটুকুই ফাউ বলতে হবে।

দিব্যি হাসিখুশি আধা-বয়স্ক ভদ্রলোক—যাকে বলে প্রৌঢ়—কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যে মুখখানির জৌলুস একটুও কমেনি। চোখের নীচে সামান্য একটু যা কালির দাগ পড়েছে—সব সময় হাসিখুশি থাকার জন্যে সেটা প্রায়ই ঢাকা পড়ে যায়।

ঘর্মাক্ত কলেবর স্থূলকায় এক ভদ্রলোক মুক্ত বায়ুর আশায় জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : এই গরমে মোটা মানুষের যা কষ্ট।

ব্রজগোপাল একটু হেসে কটাক্ষ করে বললে : সেই জন্যেই র‍্যাশনিংয়ের প্রবর্তন মশায়—তা আপনাকে কিছু করতে পারেনি দেখছি।

পাশের ছোকরা উত্তর দিলে : কি করে করবে? —কালোবাজার আছে।

: 'তা যা বলেছেন।' স্থূলকায় ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন।

: —কিছু মনে করেন নি মনে হলো।

: রোগা হয়ে আর কি লাভ? —রোদে পুড়ে, লোকের চাপে চাপে একেবারে পটাটো চিপস হয়ে গেছি।

—দু'পাশের লোকের মধ্যে থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বললে।

: চিপস্‌ নয়—স্যাণ্ডউইচ বলুন। ব্রজগোপাল সংশোধন করলে।

: জেনানা উৎরেগী—একদম বাঁধো—দরজায় দাঁড়িয়ে যে ভদ্রলোক পথ আটকে ছিলেন, তিনিই বললেন।

ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে ব্রজগোপাল একটু হেসে উত্তর দিলে : বেশ বলেছো খুড়ো—দয়া করে ভাইঝিকে একটু করিডর দাও।

: আর করিডর। —কেটে পড়ুন মশায়।

: আরে এ তো আড়াই হাজার মাইল লম্বা নয়—মাত্র এক হাত।

ব্রজগোপাল নেমে যেতেই আবার একটান ক্লান্তি শুরু হলো।

নিরুপদ্রব অবসর দূরের কথা, একটুখ ফাঁক নেই কোথাও। কাজের ঠাসবুনানিতে

নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ফাইলের পর ফাইল জমে উঠেছে টেবিলে—'জরুরী,' 'ত্বরান্বিত'—নানা রকমের লেবেল আঁটা। ইমার্জেন্সির বাঙলা করা হয়েছে ত্বরান্বিত।

বাঙলায় কাজকর্ম চলছে আজকাল। ইংরিজির প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে বড়-কর্তারা অনেকেই হাঁপিয়ে উঠছেন দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ বনেদি চালের জের টানতে গিয়ে ইংরিজির সঙ্গে বাঙলা মিশিয়ে অপরূপ ট্যাঁশ ভাষার সৃষ্টি করছেন।

একটা ফাইল খুলে দেখলো বড়কর্তা, তার প্রস্তাবের পাশে লিখেছেন 'তথাস্তু'—হাসি পেল সুকান্তর।

প্রথম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অনেকগুলো ফাইল শেষ করে সুকান্ত এইমাত্র সামনের দিকে তাকাবার অবসর পেল। সুপ্রভা মিত্রের পাশে ব্রজগোপাল বেশ জমিয়ে বসেছে মনে হলো—অফিসে এসে সে বোধ হয় একটিও কালির আঁচড় কাটেনি। সুপ্রভা, রুবি—দুজনেই চকোলেট খেতে খেতে হেসে গল্প করছে।

ওপাশের শান্ত বেঁটে মেয়েটি একমনে কাজ করে যাচ্ছে—কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার।

সুকান্ত সুপ্রভাকে ডেকে পাঠালো।

ঃ কাল চারটার সময় আপনাকে ডেকে পাইনি। —সুকান্ত ফাইলে চোখ রেখে বললে।

ঃ ও সময় আমি থাকি না। সুপ্রভা একটুও নার্ভাস হলো না—উচ্চারণে আটকালো না কোথাও।

ঃ কেন? বাধা আছে নাকি?

ঃ বাধা নয়—এর আগে কোনদিন থাকতে হয়নি।

ঃ এইবার থেকে থাকবেন।

ঃ জানা রইলো। —সুপ্রভা একটু থেমে জিগ্গেস করলো ঃ আর কিছু বলবেন?

ঃ না। যা বলেছি, সেটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে।

খট্ খট্ শব্দ করে আঁচল দুলিয়ে চলে গেল সুপ্রভা। তার দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ-পৌরুষ নিয়ে উত্তেজনায় ফুলে উঠলো সুকান্ত।

ব্রজগোপালকে আর ডেকে পাঠালো না—মুখোমুখি রূঢ় কথা বলতে কেমন যেন লজ্জা করছিল তার।

শুধু এরিয়র কাজ আজকের মধ্যে শেষ করার জন্যে একটা কড়া আদেশ দিলে।

খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে জরুরী অধিবেশন শেষ হতে বেশ সময় লাগলো। ট্রামে ঠেলাঠেলি, ঠাসাঠাসি, আর ভিড় এড়ানোর জন্যে সুকান্ত একটু দেরি করেই রাস্তায় নামলো।

বাতাসটা বেশ লাগছে তার। বিকেলের সোনালি রোদ গাছের ওপর থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। কাঞ্চন-চূড়ার আগুন আকাশে গিয়ে মিশেছে। দোলা লাগছে মনে। জটপাকানো গ্রন্থিগুলো যেন ক্রমশ খুলে যাচ্ছে; ধুয়ে মুছে যাচ্ছে রক্তঝরা দিনের অবসাদ আর গ্লানি। আপন মনে অকারণে খুশি হয়ে উঠলো সুকান্ত।

সামনের মেয়েটির কালো শাড়িতে শরু জরির পাড় বেশ সুন্দর মানিয়েছে। হাল্কা নরম পায়ে চলেছে—হাওয়ায় শাড়িটাকে শাসনে আনতে পারছে না। কাঁধের পাশ থেকে সরে সরে যাচ্ছে। কুঞ্চিত কেশদাম এলোমেলোভাবে মুখে এসে লাগছে। কৃষ্ণাঙ্গী তন্বী হলেও মুখখানা সুশ্রী এবং ধারালো। যৌবনের উচ্ছলতায় একটু বেশী চঞ্চল—বার বার ফিরে তাকানোয় সেটা ধরা পড়ছে।

অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে সোজা মেট্রোর কাউণ্টারের কাছে দাঁড়ালো সুকান্ত। —মেয়েটি তার আগেই ভিতরে ঢুকে গেছে।

অনুসন্ধিৎসু চোখের ব্যর্থ অন্বেষণ—এত-গুলো মুখের মধ্যে একখানা মুখ। অন্ধকারের মধ্যে অনেক চেষ্টা করেও সুকান্ত ঠাহর করতে পারছে না।

আলো জ্বলে উঠতেই আর একবার সে ফিরে তাকালো। মেয়েটি পিছনের আসনে বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে।

সে-ও কি এতক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করছে নাকি? সুকান্ত মনে মনে একটু উৎসাহিত হলো।

পর্দায় ছবি আরম্ভ হয়েছে। সুকান্ত অন্যমনস্কতায় ছবির সূত্র হারিয়ে ফেলছে। পিছনের দিকে থেকে থেকে ফিরে তাকাচ্ছে—যদিও অন্ধকারে তার কোন অর্থ হয় না।

সিনেমা শেষ হবার আগেই বিনতা উঠে এলো। কাকে যেন সে এড়িয়ে যেতে চায়? যে-লোকটা গোধূলির আলোছায়ায় পিছু নিয়েছে—তার কথাই মনে হচ্ছে বার বার।

কে জানে, হয়তো সে ভুল করেছে—সিনেমায় এমনিই হয়ত সে ঢুকে পড়েছে—হয়ত তারও ভালো লাগছিল না।

কাজের চাকায় নিষ্পেষিত হচ্ছে এক-একটা দিন,—রঙ আর রেখার স্বপ্ন। তবু এর মাঝে একটু সরে পড়া, কর্মব্যস্ত জনতা থেকে পালিয়ে যাওয়া। একটুখানি মনের মত অবসর। পরিমিত মুহূর্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ব্যর্থ চেষ্টা—বাঁচবার জন্যে আয়াস বলা যেতে পারে, কিম্বা পরের দিন কাজের জোয়াল কাঁধে নেবার জন্যে প্রস্তুতি। —অবসন্ন ঝিমিয়ে-পড়া স্নায়ুগুলো একটু সতেজ করে নেওয়া। —এছাড়া আর কি?

পরের দিনের সকাল কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নিয়ে ফুটে উঠবে না। আবার সেই দশটা-পাঁচটার অফিসের পরিচিত দাগকাটা পথে পা বাড়ান।

—খুশিদি ঠিকই বলেছে, টাকা রোজ-গারের একটা মোহ আছে, চাকরির পথ বেছে নিলে মেয়েরা সহজে ঘর বাঁধে না। অবিশ্যি ব্যতিক্রম আছে। এই ত সেদিন মিঃ বিশ্বাস তাদের সেক্সনের একটি মেয়েকে বিয়ে করলো। যা ভয় করেছিল তাই, বিয়ে করার পর মেয়েটির চাকরি ছাড়তে হয়েছে। এ দুটোর যেন সামঞ্জস্য হয় না। যারা চেষ্টা করেছে, তারা দুদিকের ফাঁক ভরাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এক জায়গায় একটু ত্রুটি থাকবেই।

বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সিনেমা শেষ হলো। কিলবিল করে রুদ্ধ জনস্রোত প্লাবনের মত এগিয়ে আসছে। বাসের হ্যান্ডেল ধরে বিনতা চটপট উঠে পড়লো।

নামবার সময় সেই লোকটার সঙ্গে আবার চোখাচোখি। আশ্চর্য! সে-ও এই বাসে

উঠেছিল নাকি? এতক্ষণ বিনতা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল,—নিজের ভাবনা নিয়ে খেলা করতে ভাল লাগছিল তার। —হঠাৎ মনটা অশুচি হয়ে উঠলো। নন্দন রোড আসার আগেই সে নেমে পড়লো—কোনদিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে। সে বেশ বুঝতে পারছে লোকটা আবার তার পিছু নিয়েছে। বিভ্রান্ত তরুণের নির্লজ্জতা বরং ক্ষমা করা যায়, কিন্তু বয়স্ক লোকের বেহায়াপনা শুধু অশ্লীল নয়, রীতিমত কুৎসিত। উত্তেজনায় কানের পাশটা গরম হয়েছে তার,—মাথাটাও বেশ টনটন করছে মনে হলো।

বড় রাস্তা পার হয়ে দু-তিনটা বাড়ির পর হলদে রঙের বাড়ির দরজায় সে সজোরে কড়া নাড়তে লাগলো। সে যে বেশ ভয় পেয়েছে, তা তার চলার ভঙ্গীতে আর দ্রুত কড়া নাড়ার মধ্যে ধরা পড়লো।

—অথচ ভয় পাবার কি আছে? সুকান্ত তো তাই মনে করে। একজন অচেনা পুরুষ সম্বন্ধে মনে মনে কিছু আঁচ করার আগে তার সঙ্গে সহজভাবে আলাপ করেই তো জেনে নেওয়া যায়। এতে দোষের কি থাকতে পারে? উদ্দেশ্য সাধু না হলে—তোমার যদি ভাল না লাগে, সরে পড়ো। এসব ব্যাপারে আতঙ্কে উঠে চীৎকার, চেঁচামেচির কোন মানে হয় না। খারাপ লোকেরও ভাল কথা কিছু বলার থাকতে পারে—আবার ভালো লোকেরও মন্দ প্রস্তাব করা বিচিত্র নয়।

এই কথা বুঝিয়ে বলার জন্যে হয়ত সে এগিয়ে যাচ্ছিল, আবার কি ভেবে পিছিয়ে গেল।

এতক্ষণ উদ্দাম মাদকতায় অন্যমনস্কভাবে তার সময় কেটেছে; এইবার তার মোহ ভাঙলো। —যে মেয়েটি দরজা খুলে দিলে, গ্যাসের আলোয় তার মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হলো। তার অফিসের সুপ্রভা নয় তো? ঐ তো সামনের দাঁত দুটো উঁচু—আর ভুল হবার নয়।

সুপ্রভা মুখ খুলেছে এবার—মেয়েটি আঙুল দিয়ে কি যেন ইঙ্গিতে দেখালো।

সুকান্ত আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না, ফিরে তাকালো না একবার—অন্ধকার গলি-পথে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে দ্রুত পা চালিয়ে গেল।

সিঁড়ি পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে নীচে নেমে এলো,—যেন পায়ের শব্দ শোনার জন্যে সে কান পেতে ছিল, বললে: নিশ্চয় আবার তুমি লতা পাড়ের শাড়ি এনেছো—আমি কিন্তু তাহলে সত্যি রাগ করবো বলে দিচ্ছি। হেমনলিনী ওপর থেকেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেল—এতক্ষণে তিনি চাল নিয়ে এলেন! কাকর শুদ্ধ চাল হলে কিন্তু নর্দমায় ফেলে দেবো। —চোখ নষ্ট করতে পারলো না তোমার জন্যে।

শূন্য হাতে, শূন্য দৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো সুকান্ত।

উনুনের ফুটন্ত জল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে—হেমনলিনী শক্তভাবে তার হাত চেপে ধরেছে—তার প্রখর দৃষ্টির দিকে তাকাতে না পেরে বোকার মত সুকান্ত বললে: দাঁড়াও বলছি।

—কি বলবে সুকান্ত? মধুগন্ধ বসন্তের শিহরণ আর নয়—বৈশাখের খরতাপ এবার শুরু।

# ঢোঁড়াই চরিতমানস

## (সটীক)
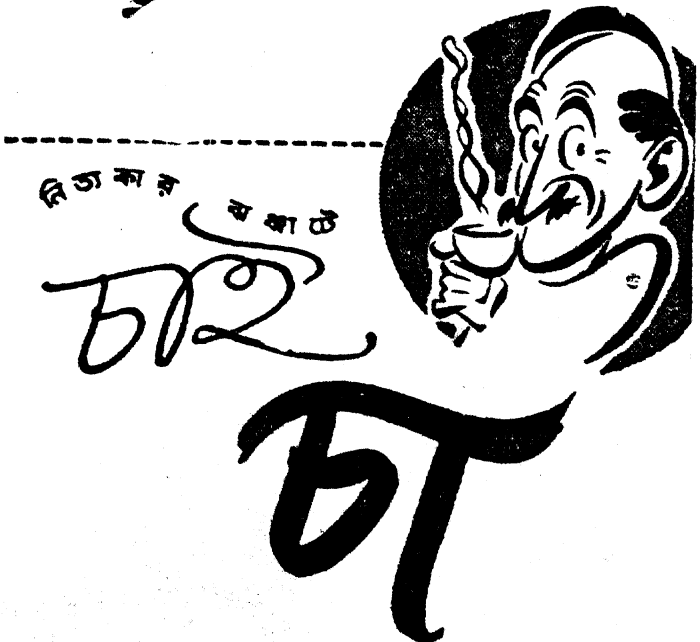
### শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

(প্রথম চরণ)

আদি কাণ্ড

**জিরানিয়ার বিবরণ**

**অযোধ্যাজী** নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে (১) এর নাম লেখা আছে জীর্ণারণ্য। পড়তে না পারো তো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই। বালিয়ারী জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। রেলগাড়ি ইস্টিশানে পোঁছুবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে 'জঙ্গল আগেয়া, জিরানিয়া আগেয়া' (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।

তাৎমাটুলীর লোকেরা একেই বলে 'টৌন' (টাউন)। যেমন-তেমন হেঁজিপেঁজি শহর নয়—'ভারী সাহার (২), পারিগঞ্জ থেকেও বড়, বিসারিয়া থেকেও বড়। পারিগঞ্জে কলস্টর (কলেক্টর) সাহেবের কাছারি আছে? বিসারিয়ায় ধরমশালা আছে? পাদ্রী সাহেবের গির্জা আছে? ভা-আ-রী সাহার জিরানিয়া। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাস্তা দিয়ে টমটম যায়; পাকা রাস্তা দিয়ে। দোতলা বাড়িও আছে, পাকা দোতলা। চেরমেন (চেয়ারম্যান) সাহেবের।

শহরের 'বাবুভাইয়ারা' সব ছিলেন 'বাং-গালী, ওকিল, মুখ্‌তার, ডক্‌টর, আমলা' সব। তাঁদের ছেলেপিলেদেরও এ শহরের গর্ব ছিল তাৎমাদেরই মত। না হলে সেকালের যুগে কালীবাড়ি কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পড়ার সময় বিরাটবপু রায়সাহেব জিরানিয়াকে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, 'এটা একটা সামান্য পল্ডগ্রাম'। ছেলের দল চীৎকার করে তাঁকে আর 'গণ্ডগ্রম' না করে বসে পড়তে বলে। তাদের নাগরিক গর্বে আঘাত লেগেছিল।

টীকা:—

(১) **রামচরিতমানস**—তুলসীদাসজীর লেখা রামায়ণের নাম রামচরিতমানস। ভারতবর্ষের মধ্যে রামচরিতমানসই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় বই। রামচরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল। ইহার ভিতর রামকথারূপ হাঁস ঘুরিয়া বেড়ায়।

(২) **ভারী সাহার**—প্রকাণ্ড শহর।

**তাৎমাটুলীর কাহিনী**

এহেন শহরের শহরতলী, তাৎমাটুলী; শহর যখন, তার শহরতলী থাকবে না কেন? জিরানিয়া আর তাৎমাটুলীর মধ্যে আর কোন গাঁ নেই। সেই জন্যই তাৎমাটুলীকে বলছি শহরতলী। শহর থেকে মাইল চারেক দূরে হবে; তাৎমারা বলে 'কোশভর' (১)। তাৎমাটুলীর পশ্চিমে শিমুলগাছ-ভরা বকরহাট্টার মাঠ, তারপর ধাঙ্গড়টুলী। দক্ষিণ ঘেঁষে গিয়েছে মজা নদী কারীকোশী—লোকে বলে মরণাধার। মাঠের বুক চিরে গিয়েছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড তাৎমাটুলীর লোকরা এই রাস্তাকে বলে 'পাক্কী' (২)।

বোধ হয় তাৎমারা জাতে তাঁতি। তারা যখন প্রথম আসে, তখন খালি একজনের কাছে ছিল একটা ভাঙ্গাচোরা গোছের গামছা বোনার তাঁত। দ্বারভাঙ্গা জেলার রোশরা গ্রামের কাছ থেকে অনেকদিন আগে এখানে এসেছিল দল বেঁধে—পেটের ধান্ধায়। না এদের কেউ কোনদিন কাপড় বুনতে দেখেছে, না এরা স্বীকার করতো যে, এরা তাঁতি। এরা চাষবাস করে না, বাসের জমি ছাড়া জমি চায় না। আর বাড়িতে একবেলার খাওয়ার সংস্থান থাকলে কাজে বেরোয় না। সেটুকুও বোধ হয় জুটছিল না দ্বারভাঙ্গা জেলায়। তাই এসে তারা ধন্না দিয়েছিল ফুকন মণ্ডলের কাছে। তিনি তখনকার একজন বড় 'কিসান' (জোতদার) (৩)। তাঁর আবার জমিদার হওয়ার ভারী সখ। নামমাত্র খাজনায় একরকম জোর করে তিনি এদের এই জমিতে রেখেছিলেন। নিজেই এদের বাড়ি করবার জন্য বাঁশ খড় দিয়েছিলেন। চিঠির কাগজে মনোগ্রাম ছাপিয়েছিলেন—বকরহাট্টা এস্টেট দেউরী ফুকন নগর। তাঁর দেওয়া ফুকন নগর নাম ধোপে টেঁকেনি। নাম হয়ে গেল তাৎমাটুলী। যতদিন বেঁচেছিলেন, তিনি রোজ এখানে আসতেন। তাঁর পাড়ার বখা ছেলেরা তাঁর আসার পথ ছেড়ে দিত—'সরে যা, সরে যা—জমিদার সাহেব ক্যাম্প টাটমাটৌলি-তে যাচ্ছেন, নিমন্ত্রণের পকেটে এস্টেটের কাছারী নিয়ে। মোটা লেন্সের চশমার মধ্যে দিয়ে তিনি রোজ ধাঙ্গড়টোলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। —সবুজ বাঁশবনের পিছনে পরিষ্কার করে নিকোনো ধাঙ্গড়দের খড়ের ঘরগুলো, এখান থেকেই যেন দেখতে পেতেন। অঙ্গনে, সেটো পথে, আমগাছের তলায় খড়ের কুটোটি পর্যন্ত নেই। সব ঝকঝকে তকতকে। লোকের চকচকে কালো; সুন্দর স্বাস্থ্য। সেখানকার ছাগল, কুকুর, গাছ, ল্যাংটো শিশু, সবই যেন তাজা নধর। এতদূর থেকেও যেন দেখা যায়, তাদের কাপড় চোপড়, বাঁদরার ছাইয়ের ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার ধবধবে করে কাচা। মাদলের শব্দ যেন কাণে আসছে পিড়িং পিড়িং।

বকরহাট্টা এস্টেটের জমিদারবাবু ভাবেন কেন তাঁর প্রজা তাৎমারা এরকম হলনা, কেন তারা ধাঙ্গড়দের মত ঠিক সময়ে খাজনা দিয়ে দেয় না। জমিদারী থেকে রোজগার না হয় নাই হল, কিন্তু প্রজারা একটু পরিষ্কার ঝরিষ্কার থাকলে, একটু পাড়াটা দেখতে ভাল হলে, জমিদারের ইজ্জৎ বাড়ে। বাঙালী উকীল হরগোপালবাবু কতদিনই বা পূর্ণিয়া থেকে এসেছেন। এখনও ত্রিশ বছর হয়নি। যেবার রেল লাইন হ'লো বাঙালী বাবুভাইয়ারা পিঁপড়ের মত দলে দলে এসে শহরের ওদিকেতো বাংগালী বাবুদের পাড়া সাহেবদের মহল্লা, সাহেবরাই রেল লাইন আনিয়েছে নিজেদের পাড়ার কাছ দিয়ে। ওদিকেতো বাংগালী বাবুদের ডাল গললোনা" (৫)। ও'রা এলেন এদিকে। তখন ধাঙ্গড়রা থাকতো ঐখানেই। লোক দেখলেই তারা পালায় দূরে। তাই তারা এসে ঘর বাঁধলো আজকালকার ধাঙ্গড়টোলায়। ভারী বুদ্ধিমান লোক হরগোপালবাবু পয়সা করতে জানেন। কাছারীর নিলামে কেনা 'পড়তী' জমি, গরুচরার জন্যও লোকে নিত কিনা সন্দেহ, তাই দিলেন ধাঙ্গড়দের মধ্যে বিলি করে। সেই জিনিসই এখন দেখ কেমন ফেঁপে ফুলে উঠেছে। ঐ কিরিস্তান ধাঙ্গড়গুলোও বাংগালীদের সঙ্গেই খাপ খায়। মরুকগে! মরুকগে! রামচন্দ্রজী! "কৃপা তুমহারি সকল ভগবানা" (৬)

টীকা:—

(১) **কোশভর**—মাত্র এক ক্রোশ।

(২) **পাক্কী**—পাকা রাস্তা।

(৩) **কিসান**—জিরানিয়া জেলায় 'কিসান' বলতে ঠিক যারা নিজেরা জমি চাষ করে তাদের বোঝায় না। দশ পনের হাজার বিঘা জমি যার সেও কিসান, কেবল গভর্নমেণ্টে রেভনিউ দিলেই তবে তাকে বলে জমিদার।

(৪) **বাঁদরা**—একরকম পরগাছা।

(৫) **ডালগললোনা**—মুরদে কুলোলোনা; টুঁ শব্দ চলবে না ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।

(৬) **সবই তোমার কৃপা**—তুলসীদাস হইতে।

এ অনেক দিনের কথা হ'ল।

এর পর বহুবার বকরহাট্টার মাঠ সবুজ হয়ে গেলে মরণাধারে জল এসেছে, বহুবার কুল পাকার সময় শিমুল বনে ফুলের আগুন লেগেছে, মৃদু বাতাসে শিমুল তুলো উড়ে যাওয়ার সময় "পাক্কীর" ধারের নেড়া অশত্থ গাছগুলো তাৎমাদের আচার খাওয়ার জন্য কচি কচি ডগা ছেড়েছে। তাৎমাদের মধ্যে কেউ হিসাব জানলে বলতো—এ "ঢের সালের"(৭) কথা—দশ সাল, বিশ সাল, এককুড়ি, দোকুড়ি, তিন কুড়ি সালের কথা। মনে মনে গুণবার মিছা চেষ্টা করতো—এর মধ্যে "ঝোহাটা"রা(৮) ক'বার স্নান করেছে(৯)।

### তাৎমাটুলীর মাহাত্ম্য বর্ণন

তাৎমাটুলীতে ঢুকতে হবে পালতে-মাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায়—শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে—দেশালাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার পর ফের সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফরসা কাপড় পরা লোক দেখলে এখানকার কুকুর ডাকে, কোমরে ঘুনসি বাঁধা ন্যাংটো ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়, বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ন্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য। মেয়েরা কিন্তু একটু অন্য রকম। এর বাড়ীর উঠোন আর ওর বাড়ীর পিছন দিয়েতো যাওয়ার পথ। ধোঁদলের হলদে ফুলে ভরা একচালাটার নীচে যে মেয়েটা তামাক খাচ্ছে, সে না হুঁকোটা নামায়, না চিরকুট কাপড়খান সামলে গায়ে দেবার চেষ্টা করে। ইঁদারা তলার ঝগড়া সেইরকমই চলতে থাকে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না; তেলের বোতল হাতে কুঁজো বুড়ীটা ফিক্ করে হেসে হয়ত জিজ্ঞাসাও করে ফেলতে পারে যে বাবু কোনদিকে যাবেন।

এই হল বাইরের রূপ; কিন্তু বাইরের রূপটাই সব নয়,—

তাৎমাটোলার লোকরা বলে—রোজা, রোজ-গার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজগার এদের ঘরামীর কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়ীরই খোলার চাল, আর প্রত্যেক বাড়ীতেই আছে কুয়ো। তাই কোন রকমে চলে যায়। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু রামায়ণের নজীর এদের পুরুষদের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের।

মেয়েদের না জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলে—গাঁয়ে আছে কেবল 'পঞ্চায়তী', আর 'পঞ্চায়তী' আর 'পঞ্চায়তী'(১)।

### ধাঙ্গড় টুলীর বৃত্তান্ত

ধাঙ্গড়টুলীর সঙ্গে তাৎমাটুলীর ঝগড়া, রেষারেষি চিরকাল চলে আসছে। ধাঙ্গড়দের পূর্বপুরুষরা আসলে ওরাওঁ। কবে তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে গঙ্গার এপারে আসে কেউ জানে না। তবে সাঁওতাল পরগণার ওরাওঁদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার মিল আছে। ধাঙ্গড় ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবার সময় তারা হিন্দিতে কথা বলে।

ধাঙ্গড়দের মধ্যে কয়েক ঘর আছে খৃষ্টান। অধিকাংশ ধাঙ্গড়ই সাহেবদের বাড়ী মালীর কাজ করে। যারা মালীর কাজ না পায় বা পছন্দ না করে তারা অন্য অন্য কাজকর্ম করে। কুলের ডাল কাটা থেকে আরম্ভ করে মৌচাক কাটা পর্যন্ত কোন কাজেই তাদের আপত্তি নেই। সকলেরই গায়ে অসীম ক্ষমতা, আর কাজে ফাঁকি দেয় না বলে, সকলেই তাদের মজুর রাখতে চায়।

ধাঙ্গড়রা তাৎমাদের বলে নোংরা জানোয়ার। তাৎমারা ধাঙ্গড়দের বলে "বুড়বক কিরিস্তান" (বোকা খৃষ্টান)।

ধাঙ্গড়টুলী পড়ে পরগণা ধরমপুরে, আর তাৎমাটুলী হাভেলী(ক) পরগণাতে। রাজা তোডরমল্লের যুগে যখন এই দুই পরগণার সৃষ্টি হয়, তখনও পরগণা দুইটির মধ্যের সীমারেখা ছিল একটি উঁচু রাস্তা। সেইটাকেই এযুগে পাকা করে নাম হয়েছে কোশী-সিলিগুড়ি রোড। কিন্তু এখন ঐ রাস্তা কেবল ধরমপুর আর হাভেলী পরগণার সীমারেখা মাত্র নয়, তাৎমা ও ধাঙ্গড় এই দুটি সম্প্রদায়ের হৃদয়েরও বিচ্ছেদ রেখা।

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাৎমা আর ধাঙ্গড়দের মধ্যে নিত্য ঝগড়া লেগেই আছে। গায়ে পড়ে ঝগড়া আরম্ভ করে তাৎমারাই। ঝগড়াটা বেশ বেধে যাওয়ার পর পালানোর পথ পায় না। তবু অভ্যাস যাবে কোথায়।

### বৌকা বাওয়ার আদিকথা

তাৎমাটুলীর বড় রাস্তার ধারে আছে একটা প্রকাণ্ড অশত্থ গাছ। তার নীচে একটি উঁচু মাটির ঢিবি বেশ করে সিঁদুর মাখানো। ইনিই হচ্ছেন তাৎমাদের 'গোঁসাই।' (১) এই গোঁসাইয়ের সম্মুখে পোঁতা আছে একটা প্রকাণ্ড হাড়িকাঠ। এই জায়গাটার নাম গোঁসাইথান লোকে ছোট করে বলে 'থান'। প্রতি বছর ভাইদ্বিতীয়া না তার পরের দিন এই হাড়িকাঠে তেল-সিঁদুর পড়ে, একটা নিশান পোঁতা হয় আর চাঁদা করে কেনা একটা ভেড়া বলি দেওয়া হয়।

এই 'থানেই' বৌকা বাওয়ার (২) আস্তানা। বৌকা বাওয়ার আগে কিম্বা পরে তাৎমাদের মধ্যে আর কেউ সাধু-সন্ন্যাসী হয়নি।

ছোট বেলায় বৌকা তার মার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুত। শহরের গেরস্থদের দোরগোড়ায় 'খোখা-আ নুনু-উ-উ-উ' (৩) এই ডাক শুনলেই বাড়ির লোকে বলত, 'এইরে বৌকামাই এসেছে, এখন দুটি ঘণ্টা চলবে এর একটানা চীৎকার।' দিদিরা ছোট ভাইকে ভয় দেখাতো—কাঁদলেই দেবো বৌকা মাইয়ের কাছে ধরিয়ে।

সেই বৌকা বড় হয়ে তার দাড়ি-গোঁফ গজালে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, একটা চিমটে আর একটা ছোট ত্রিশূল নিয়ে সে গোঁসাইথানে বসে আছে। পাড়ার লোকে দেখতে এলে বৌকা ত্রিশূলটা ইট দিয়ে ঠুকে মাটিতে গেঁথে দিল। সেই দিন থেকে ঐ 'থানেই' তার আস্তানা। এতদিনকার বৌকা ঐদিন থেকেই বৌকা বাওয়া হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরের কথা। গোঁসাইথানের পাশেই পথের ধারে একটা ঝড়ে-পড়া পাকুড়-গাছ বহুদিন থেকে পড়েছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের জিনিস; কিন্তু তাৎমারা নিয়মিত শুকনো গাছটার থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে নিচ্ছিল। শিকড়ের মোটা কাঠগুলিকে পর্যন্ত তারা গর্ত করে বের করে নিতে ছাড়েনি। পড়েছিল কেবল মোটা গুঁড়িটা। এই কাত হয়ে পড়া গুঁড়িটা একদিন সকালে খাড়া দাঁড় করানো অবস্থায় দেখা যায়। আরও দেখা যায়, যে বৌকা বাওয়া হাত জোড় করে গাছের চারিদিকে ঘুরছে আর প্রত্যেক পরিক্রমার পর একবার করে সূর্যদেবকে প্রণাম করছে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। রেবন 'গুণী' বলে জিনের কাণ্ড। চশমা-পরা সর্বজ্ঞ পেশকার সাহেব রায় দিলেন—

---

(৭) ঢের সাল—অনেক বছর।

(৮) ঝোটাহা—শব্দার্থ ঝুঁটিওয়ালী; তাৎমারা জেলেদের এই নামেই ডাকে।

(৯) ক'বার স্নান করেছে—তাৎমা মেয়েরা সাধারণত বছরে একবার ছটপরবের সময় স্নান করত। যে মেয়েরা একটু বেশী ছিমছাম্, তারা স্নান করে মাসে একবার।

টীকা:—

(১) পঞ্চায়তের মোড়লকে বলে "মহতো"। চারজন মাতব্বরকে এরা বলে 'নায়েব'। আর যে নুটিস্ তামিল করে, আর লোকজনকে ডেকে-ডুকে নিয়ে আসে তার নাম "ছড়িদার"। মহতো আর চারজন নায়েব পঞ্চায়তে থাকে পাঁচজন 'পঞ্চ'।

(ক) হাভেলী কথাটার শব্দার্থ অন্দর মহল।

টীকা:—

(১) তাৎমারা সূর্যদেবকেও গোঁসাই বলে; আবার ঐ অশত্থতলায় সিঁদুর মাখানো যিনি আছেন তাঁকেও গোঁসাই বলে।

(২) বৌকা—বোবা।
বাওয়া—সন্ন্যাসী।

(৩) খোখা—খোকা; নুনু—ছোট ছেলে।

'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড' পাথর ধারে ডাল পুঁতে গাছ লাগায়। সেই জন্য এসব গাছের ট্যাপরুট নেই —তা নাহলে কি এরকম হয়।' বিজনবাবু উকীলের কলেজে-পড়া ছেলে ফরিদপুরের সূর্যোপাসক 'খেজুরগাছের কথা তোলে। স্কুলের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে,—'নন্তদা পণ্ডিত হবে না? ও যে কলেজে 'ভুটানি' (৪) পড়ে। এসব ব্যাখ্যা তাৎমা ধাঙগড়দের মনে ধরেনি। এই দিন থেকে বৌকা বাওয়ার পসার-প্রতিপত্তি অনেক গুণ বেড়ে যায়। তার নামডাক তাৎমাটোলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। গোঁসাইথানের বেদীর উপরের তেল-সিঁদুরের প্রলেপ আরও পুরু হয়ে উঠতে থাকে। বাওয়ার আস্তানার জন্য লোকে নিজে থেকে খড় বাঁশ দড়ি পৌঁছে দেয়।

তাৎমাদের বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ টাকা পায় বরপক্ষের কাছ থেকে। তাৎমাটুলীর বুড়িরা বলে 'আহা টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বৌকাটা সন্ন্যাসী হয়ে গেল।

তাৎমাদের ছেলেরা বিয়ে হলেই সাহেবদের মত মা-বাপের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ভয়ে বৌকার মা ভিক্ষায় জমানো আধলা-গুলো একদিনও ছেলের হাতে দেয়নি।

বৌকামাই (৫) মারা যাওয়ার দিন বৌকা যখন নারকেলের মালায় করে তার মুখে জল দিচ্ছিল, তখন সে ছেলের হাতটা বুকে টেনে নিয়ে বলেছিল—'অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকিস—সেখানে খুব ভিক্ষে পাওয়া যায়। পীপড় (অশথ) গাছ কোনদিন কাটিস না। ধাঙগড়-টোলার 'কর্মাধর্মার' (৬) নাচ দেখতে যাস না, ওদের মেয়েরা বড় খারাপ। অদৌড়ি (৭) খেতে বড় ইচ্ছে করছে। নারকেলের মালা যেখানেই দেখবি তুলে নিস, ও এঁটো হয় না।'

—এর পরের কথাগুলো বৌকা মায়ের মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়েও বুঝতে পারেনি। কেবল শুকনো ঠোঁট দুখান নড়তে দেখেছিল। মায়ের আধবোজা চোখের কোণ থেকে যে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, সেটাকে মুছিয়ে দিয়েছিল লেঙ্গটের খুঁট খুলে নিয়ে। ঠোঁটের কোণের ছোট্ট লাল পিঁপড়েটাকে দু আঙুল দিয়ে খুঁটে তুলে দূরে ফেলে দিয়েছিল—মেরে ফেলতে মন সরেনি।

(ক্রমশ)

---

(৪) ভুটানী—Botany।
(৫) বৌকামাই—বৌকার মা; কারও নামের সঙ্গে মাই শব্দটি যোগ করিলে অর্থ হয় অমুকের মা।
(৬) কর্মাধর্মা—ধাঙগড়দের ভাদ্র পূর্ণিমার দিনের উৎসব আর পূজা।
(৭) অদৌড়ি—আদা দেওয়া একরকম বড়ি।

## সাহিত্য-সংবাদ

**প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা**

প্রবন্ধের বিষয়—"মাইকেল সাহিত্য ধারা"। পাঁচ পৃষ্ঠা মধ্যে রচনা করিবেন।

কবিতার বিষয়—"মাইকেলের মহাকাব্য"; তিন পৃষ্ঠা মধ্যে রচনা করিবেন।

পাঠাইবার তারিখ—৭ই জুন। প্রত্যেক সাহিত্যিক ও ছাত্রছাত্রী পাঠাইতে পারিবেন।

২৯শে জুন মাইকেল স্মৃতি সভায় যশোরে পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, যশোহর সাহিত্য সঙ্ঘ, যশোহর। ১২।৫।৪৮

যে সময় ভারত-রাষ্ট্রের ও পাকিস্থানের নেতারা মীমাংসার সর্তের মর্যাদা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, সংবাদ প্রচারিত হইতেছে, সেই সময়ের নানা সংবাদে কিন্তু পূর্ব-পাকিস্থানে প্রকৃত পরিবর্তনের পরিচয়াভাব দেখা যাইতেছে। আমরা নিম্নে একটি সংবাদ প্রদান করিতেছি ঃ—

রাণাঘাটে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, অল্পদিন পূর্বে পোড়াদহে (পাকিস্থান) ভদ্রমহিলারা পাকিস্থানী পুলিশ ও দুর্বৃত্তদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন। প্রকাশ, গত ৩রা মে কুষ্ঠিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের জনৈকা শিক্ষয়িত্রী চট্টগ্রাম মেল ট্রেনে কলিকাতা হইতে কুষ্ঠিয়ায় গমন-কালে পোড়াদহ ষ্টেশনে একজন পুলিশ ও দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রান্তা হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে প্রহারে জর্জরিত করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলে ও তাঁহার অলঙ্কার-বস্ত্রাদি লইয়া সরিয়া পড়ে। আর একজন ভদ্রমহিলা তাঁহার সাহায্য করিতে যাইয়া দুর্বৃত্তদিগের দ্বারা প্রহৃতা হন।

কিছুদিন পূর্বে—তখনও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ইংরেজিতে পাকিস্থান সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'বিভক্ত ভারত' পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। তাহাতে লিখিত হয়, ভারতের একাংশ লইয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে একদিক হইতে আরব, তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্থান এবং আর একদিক হইতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয় প্রভৃতি হইতে মুসলমানগণ হিন্দুরাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবে। বিজিত ভারতের 'ইণ্ডিয়া' নাম পরিবর্তিত করিয়া তখন 'দিনীয়া' রাখা হইবে। মুসলমানের ধর্মের নাম 'দিন।'

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও কিভাবে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত গত ১লা জানুয়ারী তারিখ লাহোরের 'লাইট' পত্রে পাওয়া যায়। এই পত্র মুসলমানদিগের কেদাশিয়ানী সম্প্রদায়ের মুখপত্র। স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা এই সম্প্রদায়ের লোক। বোধ হয়, ঢাকায়ও এই সম্প্রদায়ের একখানি সাপ্তাহিক পত্র আছে। 'লাইট' পত্রে পাঞ্জাবে হাঙ্গামার সময় বহু উত্তেজনাকারী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জিন্নার সাফল্যের উল্লেখ করিয়া উপসংহারে লিখিত হয় ঃ—

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে পয়গম্বর স্বপ্নে মিস্টার জিন্নাকে তাঁহার মহত্ত্বের বিষয় জানাইয়া দিয়াছিলেন। মিস্টার জিন্না দেখিতে পাইয়াছিলেন, পয়গম্বর জ্যোতির্ময়রূপে সিনাই পর্বতের উপর দণ্ডায়মান। কায়েদে আজমকে একখানি তরবার ও একটি রাজদণ্ড দিয়া তিনি বলেন—'ইহাতেই তোমার জয় ও সাফল্য লাভ হইবে—আবার ইসলামের পতাকা উড্ডীন হইয়া বিজয় গর্বে স্বর্গীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবে। অনুতাপের দ্বার শীঘ্রই রুদ্ধ হইবে। মুসলমানদিগকে তিরস্কার করিয়া অনুতাপ করিতে ও সৎ ধর্মের ও সৎ কর্মের পথে ফিরিয়া যাইতে বল।' সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ উপসংহারে বলেন, 'নিশ্চয়ই পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে।' সেই স্বপ্নাবস্থায় কায়েদে আজম দিল্লীর জুম্মা মসজেদের দ্বারে ও দিল্লী দুর্গে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন।

তাহার পর—

স্বপ্নের প্রথমাংশ কিরূপ সফল হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র মুসলমান জাতিকে তাহাদিগের অতীতে কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া অনুতপ্তভাবে মহান্ ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইবে—তাহা হইলেই অদূরভবিষ্যতে স্বপ্নের অবশিষ্ট অংশও সফল হইবে। স্বপ্ন অনুসারে জুম্মা মসজেদে ও দিল্লী দুর্গে ইসলামের সবুজ পতাকা উড্ডীন হইবে। মুসলমানদিগকে সেই সময় নিকটবর্তী করিতে হইবে।

দিল্লী এখনও পাকিস্থানভুক্ত নহে। সেই-জন্যই কি এই স্বপ্নের কথা বলিয়া মুসলমান-দিগকে দিল্লী অধিকার করিতে প্ররোচিত করা হইতেছে না? দিল্লীর জুম্মা মসজেদে ও শাহজাহানের দিল্লী দুর্গে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার আর কোন অর্থই হইতে পারে না।

মুসলমান জনগণকে আল্লার ও পয়গম্বরের নামে উত্তেজিত করিয়া ভারত-রাষ্ট্র জয়ে প্ররোচিত করার ফল কি হইতে পারে, তাহা আমরা কলিকাতায় ও পূর্ববঙ্গে 'লড়কে' ও 'মারকে'—পাকিস্থান লইবার চেষ্টায় বুঝিয়াছি।

এখন জিজ্ঞাসা, ভারত সরকার কি এইরূপ প্রচারকার্যে আপত্তি করিয়া সে আপত্তি পাকিস্থান সরকারকে জানাইয়া প্রতিকার চাহিবেন? ভারত-রাষ্ট্রে ঐরূপ উত্তেজনাদ্যোতক রচনা প্রকাশ সরকার চাহেন না। কিন্তু সেই সদিচ্ছা কি 'একতরফা' হইবে?

পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ব-পাকিস্থানে নিষিদ্ধ দ্রব্য লইয়া যাইবার চেষ্টায় লোক ধরা পড়িতেছে, এমন সংবাদ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়, কিন্তু সেই সকল আইনভঙ্গকারীর কিরূপ শাস্তি হইতেছে, তাহা নিয়মিতভাবে প্রকাশের কোন ব্যবস্থা আজও হয় নাই। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকিতে পারে না যে, চোরাকারবারীরা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত না হইলে এবং সেই সংবাদ প্রচারিত না হইলে তাহাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইবে না—তাহারা সতর্ক হইবে না।

পূর্ব-পাকিস্থান কিরূপে বে-আইনীভাবে মাল লইবার কাজ করিতেছে, তাহার প্রমাণ—

(১) গত এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ পূর্ব পাকিস্থানে বে-আইনীভাবে কাপড় চালানের ৬ শত ৯২টি ব্যাপার ধরিয়া-ছিল। অবশ্য ইহার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতগুলি চোরাকারবারীকে শাস্তি দিতে পারিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

(২) বিহার প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে—বিহার সুলতানগঞ্জে কোন কারখানার জন্য ৩৫ হাজার ৫ শত ২৬ মণ ঝোলা গুড় প্রেরিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে মাত্র নয় হাজার তিনশত ৫৩ মণ মাল কারখানায় পাওয়া যায়। পথে—রেলগাড়ি হইতে ২৬ হাজার মণ ঝোলা গুড় সরিয়া যায়। বোধ হয়, এই ২৬ হাজার মণের অনেকাংশ পূর্ব-পাকিস্থানে ও অল্প কিছু চোরাবাজারে চালান গিয়াছিল। পুলিশ এখনও অনুসন্ধান করিতেছে এবং ঐ সম্পর্কে কতকগুলি কাগজপত্রও নাকি তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এইরূপ কার্যে যেমন ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশের নানারূপ অনিষ্ট ঘটে, তেমনই ইহা মনে করা একান্ত সঙ্গত যে, পাকিস্থান সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ও সম্মতি ব্যতীত কখনই এই সব ব্যাপার ঘটিতে পারে না।

ভারত-রাষ্ট্র হইতে পাকিস্থানগামী যাত্রীরা বাসে আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইতেছে।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি—কংগ্রেস প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে—পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্ত করিবার জন্য যতই আন্দোলন হইতেছে, ততই বিহারীরা তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। যখন কংগ্রেসের সভাপতি স্বয়ং কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা পদদলিত করিয়া বিহারের বিস্তার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ব্যাকুল, তখন ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণই থাকিতে পারে না। বিহারের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রায় বৃজরাজ এক প্রশ্ন করিলে বিহারের রাজস্ব সচিব বলেন, বিহার সরকার অবগত আছেন, বিহারে কোন কোন লোক বা প্রতিষ্ঠান বিহারের কোন কোন অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতকতাজনক আন্দোলন পরিচালিত করিতেছেন। প্রশ্নে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়—'ঐ আন্দোলন কিন্তু সকল অংশের আদিম অধিবাসীদিগের এবং

বিহারের অধিবাসীসাধারণের সংগত স্বার্থের বিরোধী নহে কি?' ঐরূপ আন্দোলন বিহার প্রদেশের রাজনীতিক একত্ববিরোধী, এমন কথাও বলা হয় এবং সরকার পক্ষ হইতে বলা হয়—'সরকার ঐ আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন।' বিহার সরকার যে ঐ আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, তাহার পরিচয় আমরা—বিহারের পুলিশকে ঐ আন্দোলনকারীদিগের সম্বন্ধে খরদৃষ্টি রাখিতে নির্দেশদানে দেখিতে পাইয়াছি। ঐ নির্দেশের সংগে সংগে বলা হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে আন্দোলনকারীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

পাকিস্থান যেমন পাকিস্থানের সহিত ভারত-রাষ্ট্রের মিলনের কথা উচ্চারণ সরকার-দ্রোহিতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, বিহার সরকার তেমনই এই আন্দোলন দণ্ডলাভের উপযুক্ত মনে করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহারা যে ইতিমধ্যেই আন্দোলনকারীদিগকে কাহিল করিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।

এ সম্বন্ধে 'দেশের' একজন পাঠক বিহার হইতে আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহার বর্ণিত অংশ উধৃত করিয়া দিতেছি। লেখক স্বয়ং বিহার সরকারের বাঙালী-বিদ্বেষ সম্বন্ধে ভুক্তভোগী—'ম্যাট্রিক হইতে বি এস-সি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়াছি এবং বরাবর পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইয়াও পাই নাই; যেহেতু আমার ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট ছিল না।' তিনি বলেন—ভাষা ব্যতীত আর একটি বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন—'আজ পাকিস্থানের বাস্তুত্যাগী বাঙালীর স্থান সঙ্কুলানের জন্যও বিহারের যে যে অঞ্চলে বঙ্গভাষাভাষী অধিক, সে সকল পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত করা হউক। দেখা যায়—ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া বাদ দিলে ঐ অঞ্চল-সমূহে আদিবাসীদিগের সংখ্যা অতি ক্ষীণ, বহু জমি আবাদ" করা হয় নাই। বিহার সরকারও এই সকল অঞ্চলের উন্নতিকর কাজ করেন নাই।' বাস্তবিক বাঙালীর অভ্র ও কয়লা শিল্পের উন্নতির সহিত এই সকল অঞ্চলের আর্থিক ভিত্তির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং ইহাদিগের যে কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সে বিদেশী শিল্পপতিদিগের সহায়তায়। বিহার সরকার এই সকল অঞ্চলের বাঙালীদিগের জন্য দেশীয় কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যস্থতা ব্যতীত কোন যোগও রাখেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই সকল স্থানের সরকারী চাকুরিয়াদিগকে বাঙলা লিখিতে হয়।' বাঙলা ভাষা না জানিলে সরকারের কাজ তথায় পরিচালিত করা যায় না।

এখন বিহার সরকার পরস্বাত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল অঞ্চলে বহু অর্থ-ব্যয়ে বাঙালীদিগকে হিন্দী শিখাইতেছেন। তাঁহাদিগের যুক্তি—হিন্দী ভারতের প্রধান ভাষা'।

পত্রলেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি ভিত্তিহীন না হয়, তবে তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান—ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যদ্বয় বিহারের অংগীভূত করা হইয়াছে। খরসোয়ানের কাহাকেও বড় চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। পত্রলেখক আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন—ঐ সকল অঞ্চলের বাঙালীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিপত্তিসম্পন্ন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ চেষ্টা হইতে পারে।

বিহারে বাঙলার দাবী দমন করিবার জন্য ইতোমধ্যেই যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, বৃটিশ আমলা-তন্ত্রের অস্ত্রও বিহারের জাতীয় সরকার অবাধে ব্যবহার করিতে পারেন—পুলিশের লাঠিচার্জ হইতে গুলীচালনা পর্যন্ত আইন ও শৃংখলা রক্ষার নামে ব্যবহৃত হইতে পারে। সে অবস্থায় বিহারের বংগভাষাভাষী জিলাগুলিতে আন্দোলন বিপজ্জনক হইতে পারে। সুতরাং সে আন্দোলন পশ্চিমবংগেই করিতে হইবে। সেই আন্দোলন যে পশ্চিমবংগে বিশেষ উৎসাহের উদ্রেক করিয়াছে, তাহাও আশার বিষয়।

পশ্চিমবংগ সরকার সেরাইকেল্লা সম্বন্ধে বাঙলার দাবী উপস্থাপিত করেন নাই। এখনও তাঁহারা দাবী করিতেছেন না! বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াও বিহারের বংগভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী প্রচলিত করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রী সরকারের বাঙালী সদস্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসী না হইয়াও নির্বাক।

পূর্ববংগ হইতে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবংগে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

আমাদিগের মনে হয়, পূর্ববংগ হইতে হিন্দুদিগের পলায়নের নূতন কারণ উদ্ভূত হইয়াছে। গত ১৭ই মে করাচী হইতে সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে —পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানের সভাপতিত্বে পাকিস্থান পার্লামেন্টের মুসলিম লীগ দলের এক সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদিগের 'অন্যায় অধিকার চেষ্টার' বিরুদ্ধে পাকিস্থানের অধিবাসীদিগকে আরবদিগকে সর্ববিধ সাহায্য করিতে বলা হইয়াছে। প্রস্তাবটি পূর্ববংগের আবুল কাশেম খান উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

পাকিস্থানের অধিবাসী কেবল মুসলমানই নহে। পূর্ব-পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুর সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহারা নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইতেছেন। হিন্দুদিগের আয়কর যে অসঙ্গতরূপ অধিক ধার্য করা হইয়াছে ও হইতেছে, এমন কি, হিন্দুদিগের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার অধিকারও সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, তাহা খাজা নাজিমুদ্দীনও আশা করি, অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিভাবে হিন্দুদিগকে জিন্না ধনভাণ্ডারে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হইতেছে—বন্দুকের লাইসেন্সের জন্যও সেইভাবে টাকা দিতে হইতেছে; তাহা বিবেচনা করিলে স্বতঃই আশঙ্কা হয়—ইহুদীদিগের সহিত মুসলমান-আরবদিগের —রাজ্য লইয়া যুদ্ধে—পাকিস্থানের হিন্দু-দিগকে অর্থসাহায্য করিতে হইতে পারে। মুসলমান রাষ্ট্রের প্রজা বলিয়া যদি হিন্দু-দিগকে এই কার্যের জন্য অর্থ দিতে হয়, তবে তাহা যে কেবল অন্যায় হইবে, তাহাই নহে; তাহা অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। প্যালেস্টাইনের সহিত আরবদিগের যুদ্ধ মুসলমানেরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছে। কাজেই পাকিস্থানে ইহার কি প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আজও পূর্ব পাকি-স্থানের বাস্তুত্যাগী হিন্দুদিগের সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করেন নাই, তাহা একান্ত দুঃখের বিষয়। 'স্টেটসম্যান' গত দুর্ভিক্ষের সময় যেমন চিত্রে দুর্দশার স্বরূপ বুঝাইয়া-ছিলেন, তেমনই নবদ্বীপে আগতগণ কিরূপে বাস করিতেছে, চিত্রে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। সে অবস্থা মানুষ সহ্য করিবে? সামান্য অনুসন্ধান করিলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানিতে পারিবেন, কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে জমি লইয়া জুয়াখেলা চলিতেছে। যে স্থানে 'রিজেণ্ট পার্ক' রচিত হইয়াছে, সেই স্থানে যে একজন মাত্র ধনী লক্ষ লক্ষ টাকায় জমি কিনিয়া লাভের আশায় বসিয়া আছেন, তাহা কি দরিদ্রকে বঞ্চিত করা নহে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি সেই জমি ক্রেতা যে মূল্যে কিনিয়াছেন—তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া শতকরা একটা সংগত লাভ দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্যে বিলি করিতে পারেন না?

পশ্চিমবংগে বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কি চেষ্টা হইতেছে? পশ্চিম-বঙ্গে চিনির কল প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সকল আবেদন অনুমোদিত হইয়াছে, সেগুলির জন্য কলকব্জা আমদানীর অনুমতি কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন চেষ্টা করিয়া আনাইয়া দিতেছেন না? যে সকল তন্তুবায় পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া উল্টাডাঙ্গায় পলতায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা যে মূল্য দিয়াও সুতা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না সে বিষয়ে বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ মনো-যোগ দিতে বিরত কেন? তাঁহারা সে বিষয়ে মনোযোগ দিলে যে এক-একটি প্রতিষ্ঠানে শত শত লোকের অন্নার্জন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে উন্নত ছাঁচের তাঁতের বিবরণ শ্রী[illegible] নাথ দাশ 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' দিয়াছিলেন

তাহা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে সরকার বিরত কেন?

কলিকাতার বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক-গুলি হইতে মধ্যে যে টাকা তুলিবার জন্য ব্যগ্রতা লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার অবসান হইয়াছে। আমরা আশা করি, অতঃপর এই সকল ব্যাঙ্ক একদিনে যেমন আপনাদিগের ত্রুটি সংশোধনে সচেষ্ট হইবেন, তেমনই আকস্মিক বিপদে পরস্পরকে আবশ্যক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থাও করিবেন।

বাঙলার বাহিরে আসাম ও উড়িষ্যায় আবার বাঙালী বিদ্বেষ বিষের ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে। গত বৎসর পুরীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিছুদিন সে সকলের পুনরাবৃত্তি হয় নাই বটে, কিন্তু আবার সেইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। গত ১৮ই মে সন্ধ্যা সাতটা, সাড়ে সাতটায় মেদিনীপুরের কংগ্রেসকর্মী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সভ্য শ্রীসাতকড়িপতি রায়ের পত্নী, পুত্রবধূ ও কন্যাকে লইয়া তাঁহার পুত্র মাণিকচাঁদ সমুদ্রতীরে বসিয়াছিলেন, তখন কয়টি উড়িয়া যুবক তথায় আসিয়া বালু ছিটাইলে মাণিকচাঁদ তাহার প্রতিবাদ করিলে আরও বালু ছিটাইতে থাকে এবং শেষে তাঁহাকে আক্রমণ করে। মাণিকচাঁদও তাহাদিগকে প্রতি-আক্রমণ করিলে, তাহারা কয়জন তাঁহাকে ধরিয়া জলকূলে লইয়া যায়। তখন সাতকড়িপতি বাবুর কন্যা তাহাদিগের মধ্যে একজনের জামা টানিয়া ফেলিয়া দিলে উড়িয়া যুবকরা পলায়নপর হয়। পুরীর সমুদ্রতীরে ও অন্যত্রও এইরূপ দুই-চারিটি ঘটনা ঘটিতেছে। গত বৎসরের ঘটনার প্রতিক্রিয়া কলিকাতায় হইয়াছিল এবং তাহাতে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিলে উড়িষ্যা সরকার সমুদ্রতীরে প্রহরীর সুব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানেন, মেদিনীপুরে—দীঘায় সমুদ্রতীরে নূতন নগর সামান্য চেষ্টায় গঠিত হইতে পারে। তাঁহারা সেদিকে অবহিত হইলে সমুদ্রতীরে যাইবার জন্যও বাঙালীদিগকে আর বাঙলার বাহিরে যাইতে হইবে না।

বাঙলায়—বিশেষ কলিকাতায় উড়িয়ার সংখ্যা অল্প নহে। উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল যেন তাহা বিবেচনা করিয়া আবশ্যক সতর্কতা অবলম্বন করেন। নহিলে বাঙলায় উড়িয়া-বর্জন আন্দোলন আরম্ভ হইতে পারে এবং তাহার ফল কিরূপ হইতে পারে, তাহার আভাস তাঁহারা পাইয়াছেন। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী কি এ বিষয়ে বিবৃতি প্রচার করিবেন? আমরা অবগত হইয়াছি, কলিকাতার কোন কোন ধনী উড়িষ্যায় কাপড়ের কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদিগকেও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করি।

আসামের ঘটনাও শোচনীয়। তাহার মূলে যে বাঙালী বিদ্বেষ রহিয়াছে, তাহা মনে করিবার অনেক কারণ আছে। কয় মাস পূর্বে গৌহাটীতে আসামীরা বাঙালীর দোকান হইতে বাঙলায় লিখিত সাইনবোর্ড সরাইয়াছিল—বাঙালীদিগকে বলিয়াছিল, দুর্গাপূজা করিতে হইলে দেবী প্রতিমাকে 'মেখলা' পরাইতে হইবে—কলেজের কোন মহিলা অধ্যাপকের শাড়ী পরায় আপত্তি করিয়াছিল। যদি আসাম সরকার এইরূপ অশিষ্টাচারের প্রতিকার করিতে না পারেন, তবে যে বাঙালীকে সে বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি উড়িষ্যার ও আসামের সরকারকে এইরূপ ব্যবহারের প্রতিকারে তৎপর হইতে বলিবেন? তাহা না হইলে অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা যে প্রবল, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

**ডক্টর কাইম হ্বাইজম্যান—**

নবগঠিত ইস্রাইল রাষ্ট্রের অস্থায়ী পরিষদের যিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তাঁর নাম ডক্টর কাইম হ্বাইজম্যান, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিক। এ-যুগে এই একটিমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বজাতির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত সম্মান, স্বার্থ ও প্রচুর আর্থিক লাভ উপেক্ষা করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ১৯১৫ সালের গোড়ার কথা, লয়েড জর্জ সাহেব তখন যুদ্ধোপকরণের মন্ত্রী। বৃটেন তখন এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, সঞ্চিত অ্যাসিটোন ক্রমশঃ কমে আসছে। অ্যাসিটোন তৈরী করতে বৃটেন জানেনা, অথচ জার্মানীতে যার বাড়ীতে গোয়াল আছে সেই অ্যাসিটোন তৈরী করে। অ্যাসিটোন ছাড়া যুদ্ধ চালানো অসম্ভব, ধূমহীন বারুদ ও বিস্ফোরক তৈরী করতেই পারবেনা। অ্যাসিটোনের অভাবের জন্য লয়েড জর্জকে বহু বিনিদ্ররজনী যাপন করতে হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান কি করে হ'ল তা লয়েড জর্জের মুখ থেকেই শোনা ভাল। তিনি তাঁর যুদ্ধের স্মৃতিতে লিখছেনঃ—

অ্যাসিটোন-সমস্যায় সমাধানের জন্য তখন আমাকে খুব মাথা ঘামাতে হচ্ছে। এহেন অবস্থায় আমি একদিন ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদক মিঃ পি স্কটের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন অধ্যাপক আছেন, তিনি এই বিপদের সময় বৃটেনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন—যদিও তিনি ভিশ্চুলা নদীর কোনো তীরে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম হ্বাইজম্যান। স্কটের কথামতো হ্বাইজম্যানকে আমি লণ্ডনে আমন্ত্রণ করে আনালাম। তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই আমি বুঝলাম যে স্কটের কথাই ঠিক, সত্যই লোকটি অসাধারণ

লণ্ডন বিমানঘাঁটিতে ডক্টর কাইম হ্বাইজম্যান ও তদীয় পত্নী

বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁর প্রশস্ত কপালই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমি হ্বাইজ্‌ম্যানকে সব কথাই বললাম এবং কি রকম বিপদের যে সম্মুখীন হয়েছি তাও জানালাম এবং বেশী সময় দিতে পারবনা এও জানালাম। ব্যাপারটা খুব জরুরী।

দিন রাত্রি পরিশ্রম করে আমি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব, বলে হ্বাইজ্‌ম্যান বিদায় নিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি ফিরে এলেন। সত্যই তিনি দিবারাত্র কঠিন পরিশ্রম করে অ্যাসিটোন প্রস্তুতের নতুন প্রণালী আবিষ্কার করেছেন, ভুট্টা থেকে।

এইরূপে বৃটেন যখন বিপন্মুক্ত হলো তখন কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ হ্বাইজ্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর কিছু যাচ্ঞা আছে কিনা —তাহলে সম্রাটের অনুমোদনের জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রী মিস্টার অ্যাস্কুইথকে অনুরোধ করবেন। কিন্তু হ্বাইজ্‌ম্যান কোনো উপাধি, তা সে যতই উচ্চ হোক না কেন অথবা অর্থ, তার পরিমাণ যতই হোকনা কেন তিনি তা চান না, তিনি চান তাঁর স্বজাতি ইহুদীদের বাস করবার জন্য একখণ্ড ভূমি।

প্রধানমন্ত্রী হয়েই লয়েড জর্জ পররাষ্ট্র সচিব ব্যালফুরকে হ্বাইজ্‌ম্যানের বিষয় সব কিছু জানালেন। ক্রমে ব্যালফুর কমিশন বসল এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বসবাস করতে দেওয়া হবে এরূপ ঘোষণাও করা হল। ইহুদীরা তাদের প্রাচীন ভূমি জুডিয়া, গ্যালিলি ও স্যামারিয়া ফিরে এসেছে, এখন তারা সেখানে বাস করতে পারবে অথবা আর কোনো মোজেস তাদের সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তাই লক্ষ্যণীয়।

### পালতোলা জাহাজ

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পূর্বে পালতোলা জাহাজের প্রচলন ছিল। বর্তমান কালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে পালতোলা জাহাজের প্রচলন
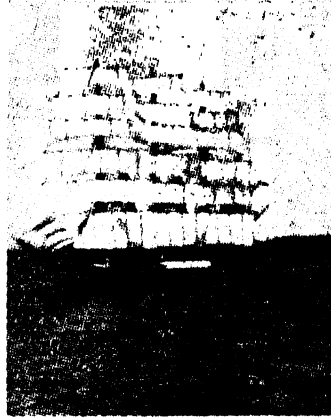
পালতোলা জাহাজ 'পামীর'

আর নেই। কিন্তু 'পামীর' নামে পালতোলা একটি জাহাজ নিউ জিল্যান্ড থেকে ইংলন্ডে গিয়েছিল মাল নিয়ে, আবার পুনরায় ইংলন্ডে মাল বোঝাই করে স্বদেশে ফিরে আসছে। এখানে পামীরের ছবি দেওয়া হ'ল।

* * *

"কি অস্ত্রের সাহায্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে তা আমি জানিনা যদিই এমন কোনো যুদ্ধ হয়; কিন্তু চতুর্থ মহাযুদ্ধ কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে হবে তা আমি জানি—পাথরের মুগুর।'

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

### প্রতি বছরে যমজ

পরিবারে যমজ শিশুর আবির্ভাব বড় একটা ঘটে না। ঘটলে অদ্ভুত বলেই মনে হয় এবং বেশ উপভোগ্য বলে মনে হয়। তবে দুটির বেশী সন্তান একবার জন্মগ্রহণ করেছে এবং তারা সকলেই বেঁচে আছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। উপরি উপরি তিন বারই যমজ শিশু প্রসব হয়েছে এমন ঘটনার কথা কখনো শোনা যায়নি, কিন্তু এমন ঘটনাও ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যের কুইন্স শহরের জন ওয়ালস্‌এর পত্নী শ্রীমতী স্পার ওয়ালস ১৯৪৫, ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালের প্রতি অক্টোবর মাসে যমজ শিশুর জন্ম দিয়েছেন। প্রথমবারে হয় দুটি ছেলে, দ্বিতীয়বার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এবং তৃতীয়বার দুটি মেয়ে। দুবৎসরে তাহলে ছয়টি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। শিশুগুলির বাবা বলেন যে, প্রথমবার যমজ শিশুর আবির্ভাবে তাঁরা বেশ কৌতুক অনুভব করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়বারে যমজ শিশুই আশা করেছিলেন, কিন্তু তৃতীয়বারে যমজ না হলে তাঁরা নিরাশ হতেন। তাঁর সাপ্তাহিক আয় মাত্র ৪৯ ডলার কিন্তু তাঁর পত্নী অত্যন্ত সুকৌশলী গৃহিণী, তাই তাঁদের অভাব হয় না নচেৎ মার্কিন মুলুকের পক্ষে এই আয় যথেষ্ট নয়।

স্পার ওয়ালস্, তাঁর স্বামী জন ওয়ালস্ এবং তাদের তিন জোড়া যমজ শিশু

# কাশ্মীর

প্রভাকর সেন

১

অনেকে কাশ্মীর দেখেছে, অনেকে দেখেনি। কিন্তু যারা দেখেছে তারা যে কাশ্মীরকে বেশি জানে একথা বলা শক্ত। কেন না কাশ্মীর বাস্তবিকই এমন এক দেশ যেখানে মানুষের কল্পনাকে নিরাশ হতে হয় না। সেদেশে শীতকালে জ্যোৎস্না রাত্রে চিনার গাছের মাথায় বরফের ফুল ফুটে থাকে, সকালের প্রসন্ন রোদে পাহাড়ের চূড়ায় সোনা ঝলসায়, বাতাসে ভেসে বেড়ায় অচেনা ফুলের সুগন্ধ। সেদেশে বসন্ত আসে রাজ-বেশে, বাদামফুলের মুকুট পরে, হিমেল হাওয়ার ঘোড়ায় চড়ে, শাল দেবদারু বাহিনীর কুর্ণিশ কুড়োতে কুড়োতে। এদেশ সম্পর্কে যা কিছু কল্পনা করা যায় তা যেন মিথ্যা হতে পারে না।

অথচ সেই দেশ সম্পর্কে কোনদিন যা কেউ কল্পনা করতে পারেনি অদৃষ্টের পরিহাসে তাই আজ রূঢ়তম সত্য। আমরা কি কেউ ভাবতে পেরেছিলাম যে অত্যাচারীর নৃশংস হস্তে কোনদিন নিরীহ কাশ্মীরীদের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে? আমরা কি কল্পনা করেছিলাম যে, দুরত্যয় পাহাড়ের গুহার অন্ধকারে যে শান্তি চির বিরাজমান তা কোনদিন লুব্ধ শয়তানের দর্পিত পদক্ষেপে লাঞ্ছিত হবে? আমরা কি কোনদিন জানতাম, যে খণ্ডিত স্বাধীনতার দীপ মশাল জেলে আমরা শহরে গ্রামে দেশব্যাপী উদ্দাম নৃত্য করেছি, সেই মশালেরই অলক্ষ্য স্ফুলিঙ্গে নিরপরাধ কাশ্মীরীদের পর্ণকুটীর ভস্মীভূত হবে? ঈশ্বর আমাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে গড়েননি জানি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি যে এত ক্ষীণ তা কি কখনো বুঝতে পেরেছি?

তবুও, ভাবাবেগের দিক থেকে আমরা যত বড় আঘাতই পাই না কেন, কাশ্মীরে যা ঘটছে তা ইতিহাসের মূল স্রোতের বহির্ভূত কিছু নয়। একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবো।

আমরা অধুনা ইতিহাসকে একটি ত্রিধারা স্বাধীনতার ইতিহাস বলে মনে করতে পারি। এই তিনটি ধারা হলো: রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এই ত্রিমূর্তি রূপকেই উপলব্ধি করার চেষ্টা সর্বত্রই চলেছে, যেমন অন্য সব দেশেই চলেছে। কেবল স্থানকালের বিশিষ্টতায় কাশ্মীর আজ পৃথিবীর চোখে এতটা গুরুত্ব অর্জন করেছে।

২

আমরা যদি কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করি, তা হলে এই গুরুত্বের কারণ নির্ণয় করতে পারবো।

কাশ্মীর একটি কীলকের আকারে মধ্য এশিয়ার বুকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। চীন, রাশিয়া, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ, তিব্বত এবং অধুনা পাকিস্থানের সীমানা কাশ্মীরের সীমানায় মিলিত হয়েছে। এর থেকেই দেশটির সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

১৮৪৬ খৃস্টাব্দে গুলাব সিং নামক শিখ বাহিনীর একজন ডোগরা অধিনায়কের কাছে মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকায় ইংরাজ কাশ্মীর প্রদেশ বিক্রী করে দেয়। তখন পর্যন্ত ইংরাজ কাশ্মীরের সামরিক প্রয়োজনীয়তা বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। কিন্তু ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আফগান যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ কাশ্মীরের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। তারপর থেকে কি করে আবার কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করা যায়, ইংরাজ এই চেষ্টাতেই রইলো। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে শ্রীনগরে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয় এবং অশেষ চেষ্টার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুকাল পরে গিলগিট ইংরাজের হাতে আসে। দেশরক্ষা নাম করে বিশ বছরের কড়ারে ইংরাজ গিলগিটের শাসনভার গ্রহণ করে। ভারত ছাড়বার সময় পর্যন্ত সেই বিশ বছরের মেয়াদ ফুরোয়নি।

এই প্রসঙ্গে নাইট সাহেব তাঁর "Where three Empires meet" নামক পুস্তকে খোলাখুলি ভাবেই বলেছেন, —"আমাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য গিরিপথের অন্তত এই দিকটা আমাদের দখলে রাখতেই হবে। এ যদি আমরা না করতে পারি, তা হলে

রুশিয়া এই পথটির দুটি মুখকেই অচিরে নিয়ন্ত্রিত করবে।"

কাশ্মীরের লোক সংখ্যার শতকরা ৭৮ জনই মুসলমান। সেই কারণেই কাশ্মীরীদের রাজনৈতিক সংগ্রামকে শত্রুপক্ষ অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম বলে চালাতে চেয়েছে। ১৯৩১ সালের গণ-অভ্যুত্থানকে প্রায় পুরো-পুরি মুসলিম আন্দোলনই বলা চলে। লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স, আহমদীয়া ও অহ্‌রগণ যে শুধু মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল তা নয়, তারা কাশ্মীরের বিদ্রোহীদের দস্তুর মতো সাহায্য করেছিল। এই পর্যন্ত জনতার যে দাবী ছিল তা হচ্ছেঃ রাজকীয় শাসন-ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক মুসলমান নিযুক্ত করা হোক, মুসলমানদের আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোক ইত্যাদি। কাশ্মীরের রাজনীতিতে শেখ আবদুল্লার আবির্ভাব এই সময়েই।

সংগ্রামের এই রূপ দেখে সংখ্যালঘু হিন্দুরাও কিছু পরিমাণে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং উচ্চপদস্থ হিন্দুরা ডোগরারাজের আঁচল ধরে পরিত্রাণ পাবে মনে করেই বোধ হয় অতিমাত্রায় রাজভক্ত হয়ে ওঠে।

১৯৩৮ সালে কাশ্মীরে গণ-আন্দোলনের প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হয়। ভারতে কংগ্রেসী আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রবাদের ধারা লক্ষ্য করে শেখ আবদুল্লা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না, জাতীয়তাবাদের মুক্ত প্রাঙ্গণে নেমে না দাঁড়ালে সেই সংগ্রামের কোন অর্থই থাকে না। শেখ সাহেবের এই বিশ্বাসই জাতীয় কনফারেন্সের সূত্রপাত করে। পুরোনো মুসলিম কনফারেন্স অবশ্য টিঁকে যায়, কিন্তু সে জমিদার ও সুবিধাবাদীদের আখড়া হিসেবে। কাশ্মীরের তরুণ সম্প্রদায়, বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায় ও কিষাণরা নূতন রাজনীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামকে জাতীয়তার ভিত্তিতে ও অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে গড়ে তুলবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল হলো কাশ্মীরের জনগণের সংগ্রামের অধ্যায়। দৈনন্দিন প্রচারকার্য, আন্দোলন ও সংগঠনের ফলে ১৯৪৫ সালে দুটি লোকায়ত্ত মন্ত্রীর পদ মঞ্জুর করা হয়। স্বায়ত্তশাসন বিভাগ দেওয়া হয় শ্রীগংগারামের হাতে—কেননা, মহারাজার ধামা ধরার ব্যাপারে এঁর ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। দ্বিতীয় পদটি পান মির্জা আফজাল বেগ—জাতীয় কনফারেন্সের মনোনীত সদস্য। অল্প দিনের মধ্যেই জাতীয় কনফারেন্স বুঝতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার কণামাত্রও জনতার হাতে আসেনি এবং মহারাজার ইচ্ছাও নয় যে আসে। ১৯৪৬ সালের ১৭ই মার্চ কনফারেন্স তার প্রতিনিধিকে মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে প্রত্যাহার করে।

এদিকে রাজশক্তিও সুযোগ খুঁজছিল জনশক্তিকে চূড়ান্ত ভাবে বিনষ্ট করবার। এতদিন কোন 'সুযোগ্য' প্রধান মন্ত্রীর অভাবেই বোধ হয় মহারাজা এই বিরাট কাজে নামতে পারছিলেন না। শ্রীযুত গোপালস্বামী আয়েংগার থেকে আরম্ভ করে স্যার বি এন রাও পর্যন্ত কাউকে তিনি যোগ্য বলে মনে করেননি। অবশেষে শ্রীরামচন্দ্র কাক প্রধান

শেখ মহম্মদ আবদুল্লা

মন্ত্রিত্বের গদিতে আরোহণ করলেন। মহারাজার মনে হলো এইবার তিনি সুযোগ্য মন্ত্রণাদাতা পেয়েছেন।

এইখানে কাকের ইতিহাস বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কাক তাঁর জীবনের প্রারম্ভে একটি কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। স্বীয় অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের জোরে তিনি ডাইরেক্টর অব আর্কিয়লজি হন। কাশ্মীরের প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন সম্পর্কে তাঁর বই শুধু যে অসাধারণ তা নয়, অতি সুন্দর। অথচ এই প্রকৃত বিদ্বান ভদ্রলোকটিই রাজ-নীতিতে নেমে কাশ্মীরের যতটা ক্ষতি করেছেন আর কেউ বোধ হয় অতটা পারেন নি।

যখন জাতীয় কনফারেন্স মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেয়, তখন রামচন্দ্র কাক হীন কৌশলে রাজ্য পরিষদে জাতীয় কনফারেন্স দলের নেতা আহম্মদ ইয়ার খানকে বশীভূত করেন এবং বেগ সাহেবের পরিত্যক্ত গদিতে তাঁকে অধিষ্ঠিত করেন। জাতীয় কনফারেন্স এই দুর্নীতি-পরায়ণ প্রধান মন্ত্রীর কাজে স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং চূড়ান্ত সংগ্রাম করবে বলে স্থির করে।

এই প্রতিজ্ঞা জাতীয় কনফারেন্সের "নয়া রাস্তা" নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। শেখ আব্দুল্লা গ্রামে গ্রামে এর ভিত্তিতে প্রচার ও সংগঠন আরম্ভ করেন। তিনি ১৮৪৬ সালের অমৃতসর চুক্তির নিন্দা করে মহারাজার কাশ্মীর ত্যাগ দাবী করেন। দিকে দিকে আওয়াজ ওঠে: "কাশ্মীর ছাড়ো।" বলা বাহুল্য, ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের আদর্শই আব্দুল্লাকে প্রেরণা জোগায়।

বিপুল গণ-অভ্যুত্থানের স্রোতে কাশ্মীরের রাজ সিংহাসনের ভিৎ নড়ে উঠল। মহারাজা প্রমাদ গুণলেন, অনেক রক্তপাত হ'লো, অনেক ঘর পুড়লো। তারপর কাকের সহযোগিতায় নৃশংস অত্যাচারের মুখে জনতার প্রতিরোধকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা হলো। শেখ আব্দুল্লার হলো তিন বৎসর কারাদণ্ড।

ঠিক এই সময়েই ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীরের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে চিন্তিত হচ্ছিলেন। তিনি স্বয়ং ... কাছরুর সংগে শ্রীনগরে গিয়ে মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কাশ্মীর সীমান্তে এখন যেখানে পাকিস্থানী হানাদাররা ঘাঁটি ফেলেছে, সেখানে মহারাজার ভাড়াটে সৈন্য বেয়নেটে বর্তমান ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করলো—পণ্ডিত নেহরু ... কারাবাসের পর দিল্লীতে ফিরে এলেন।

এদিকে কাশ্মীরের মহারাজা ... লীগের সংগে কথাবার্তা চালাতে ... করলেন। জিন্না সাহেব দেখলেন, ... কাশ্মীরের আদর্শ তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক ... তিনি একদিকে কাশ্মীরের "মুসলমানদের উপর অত্যাচারের" নিন্দা করেও অন্যদিকে ... আব্দুল্লার কারাদণ্ডে নৈতিক সমর্থন জানালেন। কাক-জিন্না শলা পরামর্শ চলতে ... তখনও পূরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরকে স্বাধীন দেশ ... মেনে নিতে জিন্না সাহেবের আন্তরিক ... ছিল না। কেননা কাশ্মীরের ভৌগোলিক গুরুত্ব তাকে পাকিস্থানের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য করে তুলেছিল।

১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে ... কনফারেন্সের একটি প্রতিনিধি দল ... আলীর সংগে দেখা করেন। তাঁদের ... দাবী ছিল, কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কাশ্মীরীদের হাতে ... এবং কাশ্মীরকে পাকিস্থান স্বীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের শৈলাবাস হিসাবেই ... দ্বিতীয় দাবী ছিল, "নূতন ... শাসনতন্ত্র বলে জাতীয় কনফারেন্স যে ... প্রস্তুত করেছিলেন, তাকে কাশ্মীরের শাসনতন্ত্র বলে স্বীকার করে নিতে হবে। ... এই প্রস্তাবে লীগ কর্তৃপক্ষ রাজী ...

কাশ্মীরে স্বাধীনতা উৎসব দিবসে পণ্ডিত নেহরু যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য মেজর ভারত সিংকে পদক উপহার দিতেছেন।

এবং জাতীয় কনফারেন্সও বুঝতে পারলেন যে, কাশ্মীর পাকিস্থানী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাশ্মীরীদেরও কোনো সুবিধাই হবে না।

তারপর মহাত্মা গান্ধী কাশ্মীরে যান এবং মহারাজার সঙ্গে আলাপ করেন। খুব সম্ভব এই আলাপের ফলেই এবং প্রজাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে সাময়িকভাবে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যই মহারাজা তাঁর নীতির পরিবর্তন করেন। শেখ আবদুল্লা মুক্তি পেলেন এবং জাতীয় কনফারেন্সের উপর থেকে কর্তৃপক্ষের চাপ ধীরে ধীরে কমতে লাগলো।

ইতিমধ্যে পাকিস্থান রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হলো। জিন্না সাহেবের স্বপ্ন সফল হ'ল। কিন্তু তিনি বুঝলেন যে কাশ্মীরকে শুধু রাজনৈতিক চাপ দিয়ে বাগ মানানো যাবে না, সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপও দিতে হবে। তারপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে কিভাবে হানাদারদের [illegible] কাশ্মীর সীমান্তে এনে পৌঁছে দেওয়া হলো, কি করে কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিলো এবং আবদুল্লা শাসনভার গ্রহণ করলেন তার ইতিহাস আমাদের সকলেরই মনে আছে। এখানে শুধু উপরোক্ত ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে দুয়েক কথা বলেই কাশ্মীরের অর্থনীতি বর্ণনা করতে চেষ্টা করব।

প্রথমতঃ কাশ্মীরের ৪০ লক্ষ অধিবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম হল প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক নয়, সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক।

দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হতে না হতেই কাশ্মীরীদের দেশ রক্ষার দায়িত্ব আংশিকভাবে বহন করতে হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই যে নিরাপদ নয় এবং সব সময়েই যে তার সামরিক প্রস্তুতি থাকা উচিত এ কথাটাও কাশ্মীরে নূতন করে প্রমাণ হলো।

তৃতীয়ত, পাকিস্থানের নায়কতন্ত্র যে কোন প্রদেশ বা যোগদানকারী রাজ্যের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা স্বীকার করতে পারে না, এই অনুমান কাশ্মীরের ব্যাপারেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজ যদি কাশ্মীর পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থের কাছে রুশিয়ার বিরুদ্ধে কাশ্মীরকে একটা মস্ত বড় রণ চক্রে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা যেত। ঠিক এই জন্যেই জিন্না সাহেবের কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করার প্রয়োজন। কাশ্মীরীদের রাজনৈতিক আদর্শ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।

চতুর্থত, যদি কাশ্মীরীদের সঙ্গে রাজতন্ত্রের খোলাখুলি সংঘর্ষ হ'ত তা' হলে সেক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবার সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের রাজাকে গদী ছাড়তে বলতে কাশ্মীরীদের কোন আপত্তি না থাকলেও ভারত সরকারের বিভিন্ন রাজনৈতিক দায়িত্বের জন্যই বোধ হয় তা সম্ভব নয়। কেননা, কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করার ফলে কাশ্মীরের রাজনীতি দেশীয় রাজাদের প্রতি ভারত সরকারের নীতির অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে কাশ্মীরে গণতন্ত্রের কিছু প্রগতি হলেও আশু রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হলো।

৩

কাশ্মীরের রাজস্ব সংগৃহীত হয় বনজ দ্রব্য বিক্রী করে এবং শ্রীনগর ও জম্মুর রেশমের কারখানার উপর শুল্ক বসিয়ে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, জনকল্যাণকর বা অন্য কোনরকম সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার মতো স্বাচ্ছন্দ্য কাশ্মীর সরকারের নেই। কাশ্মীরের বিশেষ করে জম্মুর অধিবাসীরা জীবিকার জন্য চাষবাসের উপর নির্ভর করে। কাশ্মীর উপত্যকার লোকরা করে পর্যটকদের খাদ্য সরবরাহ। এ থেকে শীতকালটা কিছু সময় বাদ দিয়ে, প্রায় সারাবছরই তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায়। কোন ভারী শিল্প কাশ্মীরে এখনো আরম্ভ হয়নি। খনিজ সম্পদ কি আছে না আছে তার অনুসন্ধানও এখন পর্যন্ত বিশেষ এগোয়নি। এক কথায়, কাশ্মীর সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়িয়ে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ভারতের কোন কোন দেশীয় রাজ্যে পুঁজিবাদ যে রকম প্রসার লাভ করেছে এখানে তার শতাংশও হয়নি। এই কারণেই জাতীয় কনফারেন্সের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে রচিত। জাতীয় কনফারেন্সের নিশান—লাল পটভূমির উপর লাঙল—তাই কাশ্মীরীদের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জাতীয় কনফারেন্স একদিকে কাশ্মীরকে যেমন সমৃদ্ধ কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করতে চায়, তেমনি চায় তাকে যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী করতে। বাইরের থেকে বিবিধ প্রাথমিক দ্রব্যের আমদানীর উপর কাশ্মীরকে যে কতটা নির্ভর করতে হয় তা অধুনা কাশ্মীর-যুদ্ধেই বোঝা গেছে।

পাকিস্থানী হানাদারগণ কাশ্মীর আক্রমণ করেছে ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর। কিন্তু এর আগে প্রায় দু'মাস ধরে পাকিস্থান আস্তে আস্তে কাশ্মীরের আমদানীর শ্বাসরোধ করেছে—রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কোনরকম পণ্য বা খাদ্য

যেতে দেয়নি শ্রীনগরে। শুধু তাই নয়, চিঠিপত্র খুশীমত খুলে পরীক্ষা করেছে পাকিস্থান সরকারের লোক। এর থেকে বোঝা যায় পাকিস্থান রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হবার সংগে সংগেই কিংবা তার আগে থেকেই কাশ্মীরের দিকে জিন্না সাহেবের দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি প্রস্তুত হতে থাকেন। উপরোক্ত অর্থনৈতিক অবরোধের সংবাদ কাশ্মীর আক্রমণের অনেক আগে থেকেই পাওয়া যেতে থাকে। কিন্তু তাকে বিভাগজনিত অব্যবস্থা বলে পাকিস্থান ধোঁকা দিয়েছিল।

কাশ্মীরের অর্থনীতি প্রসংগে একথা মনে রাখা দরকার যে কাশ্মীর কৃষিপ্রধান অনতিধনী দেশ হলেও হানাদারদের চোখে কাশ্মীরের ফলের বাগান ও সবুজ ক্ষেতগুলি প্রায় স্বর্গের মতোই লোভনীয়। ইংরাজদের ভারত ত্যাগের আগে পর্যন্ত হানাদারদের অর্থনীতি বলতে বোঝাত লুঠতরাজ এবং উৎকোচ গ্রহণ। শান্তিপ্রিয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গ্রামগুলিতে তারা নিজেদের এলাকা থেকে এসে চড়াও হতো, লুঠতরাজ করতো, চলে যেতো। এদিকে ইংরাজরাও সীমান্তের ওদিকের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে তাদের হাতে রাখার জন্য নিয়মিত উৎকোচ দিত। এছাড়া কোন সৎ উপায়ে যে হানাদাররা জীবনযাপন করবে তার সম্ভাবনাও ছিল না। কেননা তারা তৈরী করার মধ্যে করে অস্ত্রশস্ত্র। কাজে কাজেই যে কারণে প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ ভবঘুরে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আসছে এক্ষেত্রেও যে তার ব্যতিক্রম হয়নি তাতে আর আশ্চর্য কি? এককালে কংগ্রেসসেবী কাইয়ুম সাহেব (যিনি এখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী) তাঁর "সীমান্তে সোনা ও সীসা" (Gold and guns in the frontier) নামক বইতে দেখিয়েছেন এই সকল বিপজ্জনক উপজাতীয়দের পিছনে ব্রিটিশ সরকার বছরে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় করতো। স্বভাবতই পাকিস্থানের পক্ষে এত টাকা ঘুষ দিয়ে নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। অনেকটা সেই কারণেই এবং খানিকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই পাকিস্থান উপজাতীয়দের কাশ্মীরের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে।

এই প্রসংগে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। কাশ্মীর থেকে হানাদাররা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হলেও কাশ্মীরের অর্থনীতিকে আবার দাঁড় করাতে অনেক সময় লাগবে। ভারত ইউনিয়ন থেকে সরাসরি কাশ্মীর যাবার যে রাস্তা পনিহাল গিরিপথ দিয়ে তৈরী হয়েছে তা শীতকালে চালু রাখা কষ্টকর। সুতরাং ভারতের সংগে কাশ্মীরের বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের সম্ভাবনা অদূরভবিষ্যতে খুব বেশী নেই।

কাশ্মীরে জাতীয় উৎসব উপলক্ষে ডাল হ্রদে নৌকা-বাইচ

৪

উপরে কাশ্মীরের অর্থনীতি বর্ণিত হয়েছে। যে সকল অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর সাম্প্রদায়িকতা নিজের অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে, কাশ্মীরে সে রকম বৈষম্য খুব বেশী নেই। সমস্ত সাম্প্রদায়িক রেষারেষি শুধু সরকারী চাকুরীর ভাগ বাঁটোয়ারা ও সেনা বিভাগের হারাহারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাকের শাসনকালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিছুটা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাও সরকারী প্ররোচনায় এবং ভারতের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে। মহারাজার উপর প্রজাদের আস্থা নেই তার কারণ এই নয়, যে তিনি হিন্দু, তার কারণ এই যে তিনি মহারাজা। তা ছাড়া বিগত ২৫শে অক্টোবরের কথা শ্রীনগরের অধিবাসীরা সহজে ভুলবে না।

২২শে অক্টোবর হানাদাররা মুজফ্‌ফরাবাদ দখল করলো, ২৩শে গাঢ়ি এবং চিনারি, ২৪শে উরি। ২৫শে তারিখে মহারাজা স-মাল সপরিবারে শ্রীনগরকে শত্রুর মুখে ফেলে জম্মু পালিয়ে গেলেন। মহারাজাই ছিলেন আবার কাশ্মীরের প্রধান সেনাপতি।

এর পর অবশ্য জম্মু প্রদেশে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ঘটেছে। কিন্তু তার পিছনে ভয় বা সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া আর কিছু ছিল না। জাতীয় কনফারেন্সের দৃঢ় সাম্প্রদায়িকতালেশশূন্য শাসন প্রত্যেক কাশ্মীরী—সে মুসলমানই হোক, হিন্দুই হোক অথবা শিখই হোক—কৃতজ্ঞতার সংগে মেনে নিয়েছে। যখন মহারাজা শ্রীনগর ফেলে পালালেন এবং যখন লালবাগে জাতীয় কনফারেন্সের নিশান অজেয় কাশ্মীরের সংকল্প ঘোষণা করলে, তারপর থেকে ২৭শে অক্টোবর কাশ্মীরের আকাশে ভারতীয় বিমানবহরের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত যে সংকট গিয়েছে, কোন কাশ্মীরী তা ভুলবে না। সে একথাও ভুলবে না যে, এই সংকটে তাকে যা রক্ষা করেছে তা চোরাকারবারীদের গুদাম থেকে উদ্ধার করা পেট্রল নয় বা বড় কিছু, পাঁচ [illegible] অস্ত্রশস্ত্র নয়, তা হচ্ছে তাদের একতা।

কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতা সর্বাধিক [illegible]

৫

এই সেদিন কাশ্মীরে মহাসমারোহে জাতীয় সপ্তাহ পালিত হয়েছে। ভারতীয় বাহিনীও হানাদারদের ক্রমশঃ হটিয়ে দিচ্ছে। বলা বাহুল্য ভারতীয় বাহিনী সেখানকার কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে শেখ আবদুল্লা ও তাঁর সহকর্মী গোলাম মহম্মদ বক্সীর নেতৃত্বে কাশ্মীর জাতীয় ফৌজ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তারাও ভবিষ্যতে কাশ্মীর রক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে। এও অনুমান করা যায় যে, যদি কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা হয় তাহলে কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবার ইচ্ছাই জ্ঞাপন করবে। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্ব অবিসম্বাদী।

কে শত্রু, কে মিত্র, কাশ্মীর আজ ভাল করেই জানে। সম্মিলিত জাতিসংঘের ভেতর বৃহৎ শক্তির দাবাখেলায় তার স্থান কোথায় কাশ্মীর তাও ভালো করেই জানে। তাই তো লাঙ্গলচিহ্নিত পতাকার পাশে যে চক্রচিহ্নিত পতাকা কাশ্মীরের গৃহে গৃহে উড্ডীন হয়েছে তাদের মিতালি সহজে নষ্ট হবার নয়।

# রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি

**কথা ও সুর :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  **স্বরলিপি :** ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

"চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে"

II রা রা মা | মা -গমা | রা রা I রা পা মা | মা -গমা | রগা সা I রা মা মা | পা -ধা |
চ লে ছে ত ০০ র ণী প্র সা দ প ০০ ব০ নে কে রা বে এ ০

| র্সা পধা I পা -ধা পা | মা -গমা | রগা সা II মা পা পা | না -া | নধা না I র্সা র্সনা র্রা |
সো হে শা ০ স্তি ত ০০ ব০ নে এ ভ ব সং ০ সা০ রে ঘি রে০ ছে

| র্সনা -ধনা | র্রা র্সা I না র্সা র্রা | র্রা র্জ্জা | র্রা র্সা I নর্সা -নর্সর্রা র্সা | পা -া | -ধা -া I
আঁ০ ০০ ধা রে কে ন রে ব সে হে থা য়া ০০০ ন য়ু ০ ০ থ্

[মা ধা ধা]
I { ধা ধা ধা | ধর্সণাঃ -ধঃ | পা ধা I ধা ণা র্রা | র্সণর্সা -ণা | ধা পা } I ধা পা মা | জ্ঞা জ্ঞা |
প্রা ণে র বা০০ ০ স না হে থা য় পূ০০ ০ রে না হে থা য় কো থা

| রা -সা I রা -পা মা | পা -া | -া -া -I মা পা না | না র্সা | র্সা -া I সা মা মা | মা গমপা |
প্রে ম্ কো ০ থা য় ০ ০ থ্ এ ভ ব কো লা হ ল্ এ পা প হ লা০০

| পা -া I পা ধা পা | ধা ধা | ধা -ণা I ণা -ধণর্সা না | না -র্সা | -ধা না I না র্সা না |
হ ল্ এ দু খ শো কা ন ল্ দূ ০০০ রে যা ০ ০ ক স মু খে

| র্সা -নর্সর্রা | র্সা র্সা I সা মা মা | মা -গমপা | পা পা I পা ধা পা | ধা ধা |
চা ০০০ হি য়ে পু ল কে গা ০০০ হি য়ে চ ল রে শু নে

| ধা ধনা I না -র্সা না | র্সা -া | -ণধা -পমা I { মা ধা ধা | ধর্সণাঃ -ধঃ | পা ধা I
চ লি০ তাঁ ০ র ডা ০ ০০ ০ক্ বি ষ য় ভা০ ০ ব না

[পা]
I ধা ণা র্রা | র্সণর্সা -ণা | ধা পমগা } I ধা -পা মা | জ্ঞা জ্ঞা | রজ্ঞা সা I
ল ই যা যা০০ ০ ব না০০ তু ০ চ্ছ সু খ দু০ খ

I রা -পা মা | পা -া | -া -া I মা পা পা | ধা ধপা | মা পা I ধা র্সা র্সা |
প ০ ড়ে থা ০ ০ ক্ ভ বে র নি শী০ থি নী ঘি রি বে

| ধা পধা | মপা মজ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা মা | রা -া | সনা সা I রা -পা মা | পা -া |
ঘ ন ঘো০ রে০ ত খ ন কা রু মু০ খ চা ০ হি বে ০

| -া -া I { মা পা না | না না | না না I র্সা র্সনা র্রা | র্সনা -না | না র্সা } I
০ ০ সা ধে র ধ ন জ ন দি য়ে০ বি স০ ০ র্জ্জ ন

I না নর্রা র্সা | ণা ণা | ধা পধা I মা -ণা ণধা | পা -মগা | -রগরা -সা IIII
কি সে০ র আ শে প্রা ণ০ রা ০ খি০ বে ০০ ০০০ ০

ইংরাজদের প্যালেস্টাইন ত্যাগ—বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার এলেন কানিংহামের কনভয় জেরুজালেমের মধ্য দিয়া কালান্ডিয়া বিমান ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইতেছে'

মাজান পরিদর্শনে ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লা। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তাহের এবং অপর পার্শ্বে ইরাক সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ ও আরব লিজিয়ানের অফিসারদিগকে দেখা যাইতেছে

# ধ্বনিতত্ত্ব

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন সাহা

আমরা ধ্বনিমুখর ধরিত্রীর অধিবাসী। এখানে পাখীর রব পশুর ডাক, মানুষের কথা প্রভৃতি অসংখ্য রকম শব্দ অবিরতই আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। শব্দহীন স্তব্ধতা সুস্থ মানুষের পক্ষে দুঃসহ, ভয়াবহ। সুনির্বাচিত শব্দ-বৈচিত্র্যই ভাষার জনক। ভাষাই সভ্য মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান সহায়।

সভ্যতার ধারক এবং বাহক এই শব্দ কি? কিরূপে ইহা উৎপন্ন হয়? কি উপায়েই বা প্রবাহিত হইয়া আমাদের শ্রবণগোচর হইয়া থাকে? বিচক্ষণ চিকিৎসকের নিপুণ শব-ব্যবচ্ছেদের মতন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণও ধ্বনির উৎপত্তি প্রবাহ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

উৎস হইতে ধ্বনি স্ফুরিত হয়। যেকোন ধ্বনিরই একটি উৎস থাকে। ঘড়ি পিটাইলে, তবলায় চাঁটি মারিলে, বেহালার তারে আঘাত করিলে শব্দ হয়। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, শব্দায়মান বস্তু কম্পিত হইতেছে। পিতলের ঘটী বাটী হাত হইতে হঠাৎ পড়িয়া গেলে বিরক্তিকর শব্দ উৎপাদন করে। হাত দিয়া সেই শব্দ থামাইতে গেলেই তাহাদের কম্পন অনুভূত হয়। জলপূর্ণ বালতিতে আঘাত করিলেও শব্দ হয় এবং জল ছিটকাইয়া উঠে। জল ছিটকান হইতেই বালতির কম্পন অনুমান করা চলে। বাদ্যযন্ত্রের আচ্ছাদনের উপর বালুকণা অথবা অনুরূপ কোন ক্ষুদ্রবস্তু থাকিলে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তাহা লাফাইতে থাকে। ইহাও শব্দ উৎপাদকের কম্পনের প্রমাণ। এই সমস্ত দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে, শব্দ উৎপাদন করিতে হইলে উৎসকে কম্পিত হইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় কম্পিত বস্তু হইতেই যে শ্রুতিগম্য ধ্বনি স্ফুরিত হইয়া থাকে, তাহা নহে। সুতায় ঝুলাইয়া কোন ভারী জিনিষ দুলাইলে তাহা দুলিতে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থানের এদিকে ওদিকে এই দোলনকেও কম্পন বলা হয়। কিন্তু এই কম্পনে শব্দোৎপন্ন হয় না। ভয়ার্ত মানব দেহও কম্পিত হয়, কিন্তু এইরূপ বেপথুমান দেহ হইতেও কোন ধ্বনি স্ফুরিত হয় না। হাঁটিতে গেলে মাটি কাঁপে, টেবিলের উপর চায়ের কাপ রাখিতে গেলে টেবিল কাঁপে, লিখিতে গেলে অনেকের হাত কাঁপে, কিন্তু এই সমস্ত কম্পন নিঃশব্দ।

বৈজ্ঞানিকগণ বিবিধ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে শ্রুতিগম্য শব্দোৎপাদন করিতে হইলেই উৎপাদকের কম্পন-সংখ্যা দুইটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিবে। কম্পিত বস্তুর কম্পন সংখ্যা যদি প্রতি সেকেণ্ডে কুড়ির বেশী হয় তবেই শব্দ শ্রুতিগম্য হয়। ইহার কম সংখ্যক কম্পন চোখে দেখা সম্ভব হইতে পারে, কাণে শুনা যায় না। প্রতি সেকেণ্ডে কম্পনের এই সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া যদি চল্লিশ হাজারের বেশী হয়, তাহা হইলেও উৎপন্ন শব্দ পুনরায় শ্রুতি এড়াইয়া যায়, কাণে ধরা পড়ে না এই দুইটি সীমা সুনির্দিষ্ট নহে, মোটামুটি। ব্যক্তিভেদে এই সীমার সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। মানুষের পক্ষে এই সীমা যে প্রকার, অন্যান্য জীবের পক্ষে তাহা নয়। এই কারণে অনেক শব্দ মানুষের শ্রুতিতে ধরা পড়ে না কিন্তু প্রাণী বিশেষের শ্রুতিগম্য হইয়া থাকে। অতিদ্রুত কম্পনে উৎপন্ন মানুষের অশ্রুত ধ্বনিও বাদুড় সুস্পষ্ট শুনিতে পায়। আলোক বিহীন সংকীর্ণ অন্ধকার স্থানে নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন থাকিলেও এই শব্দ শুনিয়া ইহারা অক্লেশে বিচরণ করিতে পারে। জিহ্বা এবং ঠোঁটের সাহায্যে এই অশ্রুত ধ্বনি উৎপন্ন করিয়া দিকে দিকে প্রেরণ করে। সেই ধ্বনি কোন বাধায় ধাক্কা খাইলে ফিরিয়া আসিয়া কাণে পেঁছে, সেই প্রত্যাগত ধ্বনি হইতেই বাদুড় তাহার সম্মুখস্থ বাধার অবস্থান নির্ণয় করিয়া থাকে। অন্ধকারে বাদুড়ের কাণই তাহার চোখের কাজ করে। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক অভিনব আবিষ্কার র‍্যাডারের (Rader) মূল সূত্র বাদুড়ের সহজাত এই অদ্ভুত প্রকৃতির সহিত অভিন্ন।

কম্পিত বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে যতবার কাঁপে, সেই সংখ্যাকে বলা হয় বস্তুটির কম্পনাঙ্ক (frequency)। সুতরাং স্ফুরিত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে হইলে বস্তুর কম্পনাঙ্ক কুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ হাজারের মধ্যে থাকা আবশ্যক। ইহার ব্যতিক্রমে উৎপন্ন ধ্বনি আমাদের কাণে ধরা পড়ে না।

শব্দায়মান বস্তুকে কাণের সহিত ঠেকাইয়া শব্দ শুনিতে হয় না। দূর হইতেই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিরূপে ইহা এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রবাহিত হয়? আমরা কথায় বলিয়া থাকি—হাওয়ায় ভাসিয়া শব্দ আসিতেছে। প্রকৃতই তাই। পাখী যেমন হাওয়ায় ভর করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, ধ্বনিও সেইরূপ বাতাসকে অবলম্বন করিয়া কাণে আসিয়া পেঁছে। শব্দ যে কেবলমাত্র বাতাসের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে তাহা নহে কঠিন এবং তরল মাধ্যমেও (medium) ইহার প্রবাহ অবাধ। জলে ডুব দিয়া অনেক সময় দূরবর্তী চলন্ত ষ্টীমারের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা তরল মাধ্যমে শব্দ প্রবাহের নিদর্শন। রেল লাইনে কাণ পাতিয়া বহু দূরে অবস্থিত ইঞ্জিনের শব্দ শুনিতে পাওয়া সম্ভব। ম্যাচ বাক্স এবং সুতায় তৈরী খেলনা টেলিফোনের শব্দ কঠিন মাধ্যম সুতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হয়। উচ্চ অট্টালিকার দীর্ঘ জল-বাহী নলের গোড়ায় হাতুড়ীর আঘাত করিলে নলের গায়ে কাণ লাগাইয়া আঘাতের শব্দ উপর হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে ধ্বনি সকল প্রকার মাধ্যমেই প্রবাহিত হইতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার মাধ্যমই যেখানে নাই, অর্থাৎ শূন্য স্থানের মধ্য দিয়া কি ইহা এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রবাহিত হইতে পারে? বৈজ্ঞানিকগণ বিবিধ পরীক্ষা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শূন্য স্থানের মধ্য দিয়া কোন প্রকার ধ্বনিই প্রবাহিত হয় না। ইহার প্রবাহের জন্য অনু পরমাণু বিশিষ্ট বাস্তব মাধ্যম আবশ্যক। মাধ্যমে বস্তু পরিমাণ যত বেশী, অর্থাৎ যাহার ঘনত্ব যত বেশী, তাহার মধ্যে শব্দের প্রবাহ তত স্বচ্ছন্দ। বস্তু পরিমাণ হ্রাস হইয়া মাধ্যম যত হাল্কা হইতে থাকে, তাহার মধ্যে শব্দের প্রবাহ তত দুরূহ হইয়া উঠে। হিমালয় অভিযাত্রিগণ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর সন্নিকটে থাকিয়াও কেহ কাহারও সাধারণ আলাপ শুনিতে পান নাই; ইহার জন্য তাঁহাদের উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ হইল—যতই উঁচুতে উঠা যায় বায়ুস্তর ততই হাল্কা হইতে থাকে। সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গে বায়ুস্তর অত্যন্ত হাল্কা, তাই সেখানে শব্দের প্রবাহ অত্যন্ত ক্ষীণ। এই অভিজ্ঞতা হইতে অনুমাণ করা সম্ভব যে শূন্য স্থানের মধ্য দিয়া শব্দের আন্দোলন প্রবাহিত হইতে পারে না। আলোকরশ্মি সূর্যবক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে আসে। যন্ত্রসাহায্যে দেখা গিয়াছে সেখানে প্রতিনিয়তই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিতেছে। বিস্ফোরণে উদ্ভূত আলোক পৃথিবীতে আসে কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। কারণ পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যবর্তী

শূন্য স্থানের মধ্য দিয়া আলোক রশ্মি প্রবাহিত হইতে পারে, কিন্তু বহনকারী বস্তু-কণার অভাবে শব্দতরঙ্গ ভাসিয়া আসিতে পারে না।

ধরাপৃষ্ঠে সর্বত্রই বায়ুস্তর বিদ্যমান। মৎস্য যেমন জলে, আমরাও সেইরূপ বায়ু-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আছি। তাই পৃথিবীতে শব্দ প্রবাহের জন্য বাতাসকেই প্রধান বাহন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই বাহনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াই শব্দতরঙ্গ উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্রোতার কাণে আসিয়া পৌঁছে। কিন্তু কি উপায়ে? কম্পিত উৎসের দেহ-সংলগ্ন বায়ুকণাসমূহই কি সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া শ্রোতার কাণে আঘাত করে? যদি তাহাই হয়, তবে বন্দুকের শব্দ দিকে দিকে বহু দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িলেও, বিস্ফোরণের ধূঁয়ার কুণ্ডলী তো শব্দকে অনুসরণ করিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় না। শব্দ প্রবাহের জন্য কোন কঠিন মাধ্যমের অংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া কাণে আঘাত করিলে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তাহা হইলে কি হয়?

শব্দায়মান বস্তু ইতস্তত কম্পিত হইতে থাকিলে, তাহার দেহ সংলগ্ন বায়ুস্তর একবার সম্মুখদিকে এবং পুনরায় পশ্চাদ্দিকে ধাক্কা খাইতে থাকে। এই ধাক্কার ফলে নিকটবর্তী বায়ুস্তরে বায়ুকণার পরিমাণ স্বাভাবিক পরিমাণ হইতে একবার বেশী হয় পুনরায় হ্রাস পায়। কোন স্থানে স্বাভাবিক পরিমাণের বেশী বস্তুকণা থাকিলে স্থানটিকে বলা হয় সংনমিত (compressed) এবং কমসংখ্যক বস্তুকণা থাকিলে বলা হয় তনুকৃত (rarefied)। বস্তুমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে চেষ্টা করে। কোন অপ্রাকৃত কারণে অস্বাভাবিকতা আরোপিত হইলে তাহা যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাহার নিজস্ব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইতে। নিজস্ব স্বাভাবিক সরল অবস্থা ফিরিয়া পাইবার তীব্র চেষ্টার সময়ই বাঁকানো ধনুক তাহার ছিলায় স্থাপিত তীরকে সবেগে সম্মুখদিকে ঠেলিয়া দেয়। খানিকটা স্পঞ্জকে চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা পুনরায় ফুলিয়া উঠে। গাছের ডাল নোয়াইয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। এই একই কারণে সংনমিত বায়ুস্তর চেষ্টা করে তাহার উদ্বৃত্ত বায়ুকণাকে চতুর্দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া স্বাভাবিক হইতে এবং তনুকৃত বায়ুস্তর চেষ্টা করে, চারিদিক হইতে বায়ুকণা আহরণ করিয়া পূর্ব সংখ্যা ফিরিয়া পাইতে। সংনমিত বায়ুস্তর যখন স্বীয় উদ্বৃত্ত অংশ বাহিরে ঠেলিয়া দেয়, তখন নিজে স্বাভাবিক হইলেও পার্শ্ববর্তী বায়ুস্তরে কণার পরিমাণ বর্ধিত হইয়া উঠে, ফলে সেই স্তর হইয়া দাঁড়ায় সংনমিত। সংনমিত এই দ্বিতীয় স্তরের স্বাভাবিক হইবার প্রচেষ্টায় তৃতীয় স্তর সংনমিত হয়। অনুরূপ কারণে তনুকৃত বায়ুস্তর নিজের ঘাটতি পূরণের জন্য নিকট-বর্তী স্তরের স্বাভাবিক সঞ্চয়ে হাত দেয় এবং তাহাকে তনুকৃত করিয়া ফেলে। এইরূপে স্পন্দিত বস্তুর অগ্রপশ্চাৎ কম্পনের ফলে একই বায়ুস্তর পর্যায়ক্রমে একবার হয় সংনমিত পুনরায় হয় তনুকৃত। এই সংনমন এবং তনুকরণ স্তর হইতে স্তরান্তরে সঞ্চালিত হইয়া চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্যাপ্তি কানের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছিলে ধ্বনি শ্রুত হয়।

শব্দ প্রবাহের ফলে বায়ুস্তর কোথাও স্বীয় অবস্থান হইতে স্থায়ীভাবে বিচ্যুত হয় না। ধানের খেতে ঢেউয়ের আন্দোলন যেমন এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌঁছায়, ইহাও সেইরূপে এক স্থান হইতে অপর স্থানে নীত হয়। উন্নত শীর্ষ ধানের গাছ কেবল এদিকে ওদিকে মাথা দোলাইয়াই যেমন ঢেউয়ের প্রবাহ সৃষ্টি করে, বায়ুকণাও সেইরূপ স্বীয় অবস্থান কেন্দ্রের এপাশে ওপাশে আন্দোলিত হইয়া শব্দের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া থাকে। অদৃশ্য বায়ুস্তরের এই সংকুচন এবং প্রসারণ হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর। ইহাকে জোঁক, কেঁচো প্রভৃতি জীবের ভ্রমণ কৌশলের সহিত তুলনা করা চলে। ইহারা যেমন স্বীয় দেহকে একবার সংকুচিত এবং পুনরায় প্রসারিত করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে, বায়ুস্তরও সেইরূপ একবার সংকুচিত হইয়া এবং পুনরায় প্রসারিত হইয়া শব্দ-তরঙ্গকে স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রচারিত করিয়া ফিরে। কেবলমাত্র বায়ুস্তর বলিয়া নহে, যে কোন মাধ্যমে শব্দ প্রবাহের ফলে তন্মধ্যস্থ কণাসমূহ একইভাবে ইতস্তত আন্দোলিত হইয়া থাকে। বায়ুস্তরের এই বিক্ষেপ ক্রমশ প্রবাহিত হইয়া আমাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে এবং কর্ণপটহে ধাক্কা দিতে থাকে, ফলে পটহ কম্পিত হয়। কর্ণপটহের এই প্রকম্পনই মস্তিষ্কে ধ্বনির অনুভূতি জাগায়।

আমাদের শ্রবণযন্ত্র অতীব জটিল। ইহার মোটামুটি তিনটি অংশ। কর্ণমূল হইতে পটহ পর্যন্ত যে অংশ তাহাকে বলা হয় কর্ণের বহিরঙ্গ (External ear)। বাহির হইতে এই পটহ পর্যন্তই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রবণযন্ত্রের মধ্যাঙ্গ (Middle ear) হইল অস্থিনির্মিত একটি ফাঁপা গোলক বিশেষ। এই গোলকের গায়ে দুই দিকে দুইটি ছিদ্র আছে। সম্মুখ দিকের ছিদ্রটি কর্ণপটহ দ্বারা আচ্ছাদিত পশ্চাৎদিকের ছিদ্রটি অপর একটি পাতলা পরদায় আবরিত। বিপরীত দিকে অবস্থিত এই পরদা দুইটি গোলক মধ্যস্থ কয়েক খণ্ড সূক্ষ্ম অস্থিখণ্ডের সংযোগে পরস্পর সংস্পৃষ্ট। এইজন্য কোন কারণে সম্মুখস্থ পটহ আন্দোলিত হইলে পশ্চাদ্বর্তী আচ্ছাদনও অনুরূপভাবে বিচলিত হইয়া উঠে। কাপড় শুকাইবার তার যখন হাওয়ায় কাঁপিতে থাকে, তখন দীর্ঘ পাটকাঠী দিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তারের কম্পন পাটকাঠীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হাতে আসিয়া পৌঁছিতেছে। এইরূপভাবেই সংযোগ অস্থির মধ্য দিয়া পটহের কম্পন পশ্চাদ্বর্তী পরদায় সংক্রমিত হয়। দ্বিতীয় আচ্ছাদনীর পশ্চাতে কর্ণের অন্তরঙ্গ (Internal ear)। সমস্ত অন্তরঙ্গই ডিম্বলালার ন্যায় একপ্রকার থলথলে পদার্থে পরিপূর্ণ, ইহার মধ্যেই শ্রবণযন্ত্রের যাবতীয় সূক্ষ্ম অংশ সংগোপনে সুরক্ষিত। পটহের কম্পন দ্বিতীয় আচ্ছাদনীতে সংক্রমিত হইলে তৎসংলগ্ন এই লালাও কম্পিত হয়। তন্মধ্যে নিমজ্জিত অসংখ্য স্নায়ু দ্বারা এই কম্পন গৃহীত হয় এবং বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে পৌঁছে। কম্পনের প্রকার ভেদে, পরিবাহী স্নায়ুও ভিন্ন। বিভিন্ন প্রকৃতির হরেক রকম কম্পন এইরূপ অসংখ্য স্নায়ুপথে প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে পৌঁছায় এবং ধ্বনির অনুভূতি জাগায়। গ্রহণকারী স্নায়ু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই বহুবিধ ধ্বনি যুগপৎ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও বিশ্লিষ্টভাবেই অনুভূত হইয়া থাকে।

প্রবাহিত হইয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে পৌঁছিতে শব্দ তরঙ্গের সময় আবশ্যক হয়। বক্তা তাহার বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যে শ্রোতা তাহা শুনিতে পায় তাহা নহে। বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করিতে শব্দ তরঙ্গের একটু সময় লাগে। কিন্তু শব্দ তরঙ্গ ক্ষিপ্রগামী এবং অন্তর্বর্তী ব্যবধানও সাধারণের কম থাকে। এই সামান্য ব্যবধান অতিক্রম করিতে যে সময় আবশ্যক হয়, তাহা অতি সামান্য, বুঝিতেই পারা যায় না। তাই মনে হয়, বক্তা ঠোঁট খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ শ্রোতার কানে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু শব্দের উৎস এবং শ্রোতার মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি বেশী হয় তাহা হইলে ক্ষিপ্রগতি শব্দ-তরঙ্গেরও যে সময় আবশ্যক হয়, তাহা আমাদের লক্ষ্য এড়াইতে পারে না, শব্দের উৎপাদন এবং গ্রহণের অন্তর্বর্তী সময়ের ব্যবধান সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। ক্রিকেট খেলার মাঠে অনেক সময় দেখা যায় যে, আহত ক্রিকেট বল মাঠের বাহিরে চলিয়া গেলে পরে, আঘাতের ধ্বনি কানে আসে। সুগভীর কূপে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে ছলাৎ করিয়া যে শব্দ হয় তাহাও লোষ্ট্রটির জলতল স্পর্শ করিবার একটু পরে কানে আসে। বিদ্যুৎস্ফুরণ এবং মেঘগর্জন সর্বদাই যুগপৎ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যুতের তীব্র আলোকে চোখ ধাঁধিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে তাহার গর্জন শ্রুত হয়। দূরবর্তী ইঞ্জিনের হুইসীল দেওয়া লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে হুইসীলের বাষ্প দৃষ্ট হইবার একটু পরে তাহার শব্দ কাণে আসিতেছে। এই সমস্ত দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে অনুমান করা চলে যে শব্দের উৎপাদন এবং শ্রবণ

যুগপৎ হয় না। দূরত্ব অতিক্রম করিতে ইহার সময় আবশ্যক হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে-কোন একটি মাধ্যমের সর্বত্রই শব্দ তরঙ্গ নির্দিষ্ট বেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু মাধ্যমের পরিবর্তনের এই বেগের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইট, কাঠ লোহা প্রভৃতি কঠিন মাধ্যমে গতির বেগ বেশী এবং হাওয়ার ন্যায় হাল্কা বায়বীয় মাধ্যমে সেই গতির বেগ কম। মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে গতির ক্ষিপ্রতা বর্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু শব্দের প্রকৃতি ভেদে তাহার গতিবেগের কোন পরিবর্তন হয় না। ক্ষীণ অথবা তীব্র মধুর অথবা কর্কশ সমস্ত শব্দের গতিবেগই এক এক প্রকার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট। মাধ্যমের উষ্ণতার পরিবর্তনে এই বেগ সামান্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে এবং তাহার পরিমাণও অঙ্ক কষিয়া স্থির করা যায়।

কম্পিত বস্তু হাওয়ার মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া শব্দ উৎপন্ন করে। দ্রুত অথবা মন্থর যে কোন কম্পনেই উৎপন্ন হউক না কেন, শব্দতরঙ্গ নির্দিষ্ট বেগে দিকে দিকে ধাবিত হয়। এদিকে ওদিকে একবার কম্পনের জন্য একটি করিয়া তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। পদার্থটির কম্পনাঙ্ক যত, প্রতি সেকেণ্ডে ঠিক ততগুলি তরঙ্গই ইহা সৃষ্টি করিয়া থাকে। এক সেকেণ্ডে ভ্রাম্য দূরত্বের মধ্যে ইহার সমস্তগুলি তরঙ্গই একটির পর একটি করিয়া অবিচ্ছিন্নরূপে সজ্জিত হয়। সুতরাং দ্রুত কম্পনে উৎপন্ন তরঙ্গ বেশী সংখ্যায় এবং মন্থর কম্পনে উৎপন্ন তরঙ্গ কম সংখ্যায় সেই নির্দিষ্ট স্থানে বিন্যস্ত হয়। অতএব সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে মন্থর কম্পনে উৎপন্ন শব্দতরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেশী এবং দ্রুত কম্পনে উৎপন্ন শব্দতরঙ্গের দৈর্ঘ্য কম। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধিতেই ধ্বনির প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্তনের উপর সঙ্গীতের সপ্তস্বর নির্ভর করে। উদারা জাতীয় মোটা শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ বেশী, সুতরাং উৎপাদকের কম্পনাঙ্ক কম। তারা জাতীয় তীক্ষ্ন শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম এবং উৎপাদকের কম্পনাঙ্ক বেশী।

আহত হইলে সমস্ত বস্তুই অল্পবিস্তর কম্পিত হয়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পদার্থের কম্পনাঙ্ক নির্ভর করে তাহার আকৃতি, আয়তন, ওজন প্রভৃতির উপর। সুতরাং প্রত্যেকটি পদার্থেরই নিজস্ব নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্ক আছে। এই জন্য কোন পদার্থ কম্পিত হইয়া শব্দ উৎপাদন করিলে উৎপন্ন শব্দের সুর পদার্থটির প্রকৃতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট থাকে। আঘাতের গুরুত্বের উপর পদার্থের কম্পনাঙ্ক নির্ভর করে না। মৃদু অথবা তীব্র যে কোন প্রকার আঘাতেই আহত হউক না কেন, প্রতি সেকেণ্ডে তাহার কম্পনসংখ্যা অপরিবর্তিতই থাকিবে। সুতরাং উৎপন্ন সুরের কোন তারতম্য হইবে না। পেটা ঘড়ির আকৃতি এবং ওজনের উপর তাহার কম্পনাঙ্ক নির্ভর করে। এইরূপ একটি ঘড়িকে জোরে আঘাত করিলে শব্দ জোর হয়, আস্তে আঘাত করিলে শব্দ ক্ষীণ হয়; কিন্তু উৎপন্ন শব্দের সুর অপরিবর্তিতই থাকে। আঘাতের গুরুত্বের উপর উৎপন্ন ধ্বনির তীব্রতা নির্ভর করে, তীক্ষ্নতা নহে। হারমোনিয়মের যে কোন একটি রীড্ টিপিয়া ধরিয়া আস্তে 'ব্লো' করিলে শব্দ ক্ষীণ হয়, এবং জোরে 'ব্লো' করিলে শব্দ তীব্র হয়, কিন্তু সুরের কোন পরিবর্তন হয় না। কারণ রীড্‌টির কম্পনাঙ্ক অনুযায়ী সুর উৎপন্ন হয় এবং সেই কম্পনাঙ্ক রীড্ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট। মোটা সুরের রীডের কম্পনাঙ্ক কম এবং চড়া সুরের রীডের কম্পনাঙ্ক বেশী। হারমোনিয়মের ব্লো করার তারতম্যে কেবল মাত্র আঘাতের গুরুত্বের তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাতে সুরের কোন পরিবর্তন হয় না, কেবলমাত্র আওয়াজের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তারের কম্পনাঙ্ক নির্ভর করে তাহার দৈর্ঘ্য এবং প্রসারণী টানের (tension) উপর। দৈর্ঘ্য ঠিক রাখিয়া তারের টান যদি বেশি করা হয়, তাহা হইলে তাহার কম্পনের হার বর্ধিত হইয়া থাকে। কম্পনাঙ্ক বৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন সুর চড়া হয়। টান কমিলে কম্পনাঙ্ক কমে এবং সুর নামিয়া যায়। বেহালা, সেতার প্রভৃতি তারযন্ত্রের কান মুচড়াইয়া তার কসা অর্থই তারের উপর প্রযুক্ত টানের পরিমাণ বর্ধিত করা। তারের উপর প্রযুক্ত এই টান হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াই গানের আসরে বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করা হইয়া থাকে। তবলার আচ্ছাদনের টান কম-বেশি হইলেও উৎপন্ন সুরের ইতর বিশেষ হয়। তবলার টান ঠিক করা হয় তাহার ঘাড়ে হাতুড়ি ঠুকিয়া।

প্রসারণী টান ঠিক রাখিয়া তারের দৈর্ঘ্য হ্রাস-বৃদ্ধি করিলেও তাহার কম্পন সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। দৈর্ঘ্য যত কম হয়, কম্পন তত বাড়ে, ফলে স্বর উচ্চগ্রামে উঠিতে থাকে। দৈর্ঘ্য হ্রাস করিলে সুর খাদে নামিয়া যায়। বাদ্যযন্ত্রের তারে হস্ত সঞ্চালন অর্থই হইল বিভিন্ন স্থানে টিপিয়া ধরিয়া তারের কম্পিত অংশের দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত করা। দ্রুত হস্ত সঞ্চালনের ফলে সুরের উঠানামায় শ্রুতি-মধুর ধ্বনি স্ফুরিত হইয়া থাকে।

ঐকতান বাদনের মজলিসে হারমনিয়ম, বেহালা, বাঁশী প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সুসঙ্গত ভাবে একই সুর বাজাইতে থাকিলেও, কানে শুনিয়া ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ধ্বনি বুঝিতে পারা যায়। যন্ত্রসমূহ হইতে উৎপন্ন ধ্বনির সুর যখন এক, তখন তাহাদের কম্পনাঙ্কও অভিন্ন। সুতরাং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র হইতে উৎপাদিত একই সুরের ধ্বনির মধ্যে নিশ্চয়ই অপর কোন বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকে, যাহার ফলে একই সুরের ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিকে বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ধ্বনির এই বৈচিত্র্য নির্ভর করে তাহার তরঙ্গের আকৃতির উপর। বেহালা হইতে উৎপন্ন শব্দ-তরঙ্গের আকৃতি সেতারের তরঙ্গ হইতে ভিন্ন। যদিও একই সুরের জন্য তাহাদের কম্পনাঙ্ক এক এবং উৎপন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও অভিন্ন।

ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে উৎপন্ন ধ্বনির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সেই জন্য সেতার, এস্রাজ, তবলা প্রভৃতি এক এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র যথাসম্ভব একই ঢংয়ে নির্মিত হইয়া থাকে। আকৃতির পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন যন্ত্রের সুরে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সমস্ত বেহালা হইতে নির্গত যে-কোন একটি সুর শুনিতে অবিকল একই রকম, কিন্তু সুর মিলিয়া গেলেও সেতারের আওয়াজ হইতে বেহালার আওয়াজ পৃথক করিয়া বুঝিতে পারা যায়।

ধ্বনির তীব্রতা নির্ভর করে বায়ুস্তরের বিক্ষেপের পরিমাণের উপর। স্পন্দিত বস্তুর কম্পনের বিস্তার (amplitude) যদি বেশি হয়, তাহা হইলে বায়ুমণ্ডলে বিক্ষেপের পরিমাণও বেশি হয়। বর্ধিত বিক্ষেপজনিত ধ্বনিও তীব্র হইয়া থাকে। কম্পনের বিস্তার কম হইলে উৎপন্ন ধ্বনি ক্ষীণ হয়। শব্দায়মান বস্তুর সুবিস্তৃত স্পন্দনের ফলে প্রকম্পিত বায়ুস্তরের বিস্তারও বর্ধিত হয়। এই বিবর্ধিত বিস্তৃতির কম্পন যখন কানে আসিয়া লাগে, তখন কর্ণপটহও সজোরে কাঁপিতে থাকে। পটহের কম্পন জোর হইলেই অনুভূত ধ্বনি জোর হয়। এই কারণে সুতীব্র ধ্বনির ফলে অনেক সময় কর্ণপটহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং শ্রোতার শ্রবণ শক্তি চিরতরে লুপ্ত হয়।

কম্পনের বিস্তার আঘাতের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। আস্তে আঘাত করিলে বিস্তার কম হয়, ফলে উৎপন্ন ধ্বনি ক্ষীণ শোনায়। জোরে আঘাত করিলে বিস্তৃতি বর্ধিত হয় এবং ধ্বনি তীব্র হয়। হারমনিয়ম জোরে ব্লো করা অর্থই বেশি বাতাস ঠেলিয়া রীডের উপর প্রযুক্ত আঘাতের শক্তি বৃদ্ধি করা। আঘাতের শক্তি বৃদ্ধিতে কম্পনের বিস্তার বর্ধিত হয় এবং শব্দ জোর হয়। বেহালা, এস্রাজ প্রভৃতির তারে সজোরে ছড়ি ঘষিলে, তারের কম্পনের বিস্তৃতি বৃদ্ধির জন্যও আওয়াজ তীব্রতর হইয়া থাকে। তবলার চাঁটি জোর হইলে, একই কারণে উৎপন্ন ধ্বনিও জোর হয়।

শব্দায়মান বস্তুর আয়তনের উপরও শব্দের তীব্রতা নির্ভর করে। গঠন ঠিক রাখিয়া যদি বাদ্যযন্ত্রের আয়তন বর্ধিত করা হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন ধ্বনির তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং আয়তন হ্রাসে হ্রাস পায়। এই কারণে পেটা-ঘড়ির আকার ছোট হইলে আওয়াজ ক্ষীণ হয়, কিন্তু বৃহদায়তনের ঘড়ির আওয়াজ তীব্র হইয়া থাকে। ইহার কারণ হইল, আয়তন বেশি

হইলে, স্পন্দিত হইয়া তাহা বেশি পরিমাণ বাতাসকে প্রকম্পিত করিতে পারে। ফলে অধিক সংখ্যক বায়ুকণা কানে আসিয়া ধাক্কা দেয়। আঘাতকারী বায়ুকণার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কর্ণপটহের কম্পনের বিস্তার বর্ধিত হয়; সুতরাং ধ্বনিও তীব্র শোনায়। এলার্ম ঘড়ি হাতে ঝুলাইয়া বাজাইলে শব্দ ক্ষীণ হয়, কিন্তু টেবিলের উপর বসাইয়া বাজাইলে শব্দ অপেক্ষাকৃত জোর হয়। কারণ টেবিলের উপর রক্ষিত ঘড়ির ঘণ্টা যখন কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতে থাকে, তখন সেই কম্পন ঘড়ি হইতে টেবিলে সংক্রমিত হয়। ফলে টেবিলটিও কাঁপিতে থাকে। টেবিলের আয়তন বেশি বলিয়া তাহার কম্পনের ফলে অধিক পরিমাণ বাতাস বিক্ষিপ্ত হইয়া আওয়াজ জোর করিয়া তোলে। বেহালা, সেতার, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় যন্ত্রদেহই ফাঁপা। কারণ উদরস্থ বাতাসের মধ্যে অতি সহজেই কম্পন সংক্রমিত হইতে পারে। তাহাতে উৎপন্ন শব্দ অপেক্ষাকৃত তীব্র শোনায়।

টেবিলের উপর রক্ষিত ঘড়িটির এলার্মের কম্পন দৈবাৎ যদি টেবিলের স্বাভাবিক কম্পনাঙ্কের সহিত মিলিয়া যায় তাহা হইলে উৎপন্ন ধ্বনি অস্বাভাবিক রকম তীব্র হয়। কারণ, কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত ধাক্কার পারম্পর্য যদি বস্তুটির নিজস্ব কম্পনের পারম্পর্যের সহিত মিলে তাহা হইলে বস্তুটির কম্পনের বিস্তার শনৈঃ শনৈঃ বর্ধিত হইতে থাকে। ঝুলনের দোলনা সুষ্ঠুভাবে দোলাইতে হইলে তালে তালে ধাক্কা দিতে হয় অর্থাৎ দোলনার স্বাভাবিক কম্পনাঙ্কের সহিত পর পর প্রযুক্ত ধাক্কার মিল রাখিতে হয়। অন্যথায় বেতালে ধাক্কা পড়িলে দোলনা ভাল দোলে না। প্রযুক্ত ধাক্কার পারম্পর্য বস্তুর স্বাভাবিক কম্পনের সহিত মিলিয়া গেলে অনেক সময় অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। নদীনালার উপর নির্মিত সাঁকোরও নিজস্ব কম্পনাঙ্ক আছে। তাহার উপর তালে তালে পা ফেলিয়া যদি অনেক লোক এক সঙ্গে হাঁটিয়া পার হইতে থাকে এবং যদি দৈবাৎ তাহাদের পায়ের তালের সহিত সাঁকোর কম্পন মিলিয়া যায়, তাহা হইলে কম্পনের বিস্তৃতি ক্রমশ বর্ধিত হইয়া সাঁকোটি ভাঙিয়া যাইতে পারে।

বোমার কর্ণবিদারী সুতীব্র ধ্বনিও বায়ুমণ্ডলে সুনির্দিষ্ট কম্পনাঙ্কের আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই আলোড়নের কম্পনাঙ্কের সহিত যদি কোন অট্টালিকার স্বাভাবিক কম্পনের মিল হয় তাহা হইলে কম্পনের বিস্তৃতি ক্রমশ বর্ধিত হইয়া অট্টালিকাটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। এই কারণে বোমার বিস্ফোরণের ফলে অনেক সময় নিকটবর্তী গৃহ রক্ষা পায়, কিন্তু সুদূরবর্তী অনেক গৃহ ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আলোক-তরঙ্গের ন্যায় শব্দ-তরঙ্গও বাধা পাইলে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে। আলোক-রশ্মির প্রতিফলনে উৎপন্ন হয় প্রতিবিম্ব, ধ্বনির প্রতিফলনে সৃষ্ট হয় প্রতিধ্বনি। শব্দ-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া ইহার প্রতিফলনে আলোকের ন্যায় সুমসৃণ প্রতিফলক আবশ্যক হয় না। পর্বত-গাত্র বৃক্ষশ্রেণী প্রভৃতিই শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলনের পক্ষে যথেষ্ট। শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলনের জন্য প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে কোন প্রতিফলনই প্রতিধ্বনির অনুভূতি জোগায় না। কারণ যে কোন ধ্বনিই একবার শ্রুত হইলে অল্প কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহার অনুভূতি শ্রোতার মস্তিষ্কে বজায় থাকে। সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই যদি প্রতিফলিত ধ্বনিটি ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে মূল ধ্বনির সহিত মিশিয়া যায়, প্রতিধ্বনির অনুভূতি জাগায় না। কিন্তু মূল ধ্বনিটি মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণে বিলীন হইয়া যাইবার পরে যদি প্রতিফলিত ধ্বনিটি ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে প্রত্যাগত ধ্বনি সম্পূর্ণ পৃথক এক নূতন ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই প্রতিধ্বনি।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন প্রতিফলকে বারংবার প্রতিফলিত হইলে একই ধ্বনি বহু প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিতে পারে। এই কারণে কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলে একই ধ্বনির অসংখ্য প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে অনেক সমাধি-মন্দির এমন সুকৌশলে নির্মিত যে, তাহার অভ্যন্তরে কোন শব্দ করা হইলে বারংবার প্রতিফলিত হইয়া দীর্ঘস্থায়ী প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিয়া থাকে। মেঘ গর্জনের দীর্ঘকালস্থায়ী শব্দও আকাশস্থ বিভিন্ন মেঘে মূল শব্দের প্রতিফলনের ফল।

শব্দ-তরঙ্গ প্রায় যে কোন প্রতিফলকে ধাক্কা খাইয়া সহজেই প্রতিফলিত হইতে পারে বলিয়াই শব্দ সম্বন্ধে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করা হইয়া থাকে। দূরবর্তী কাহাকেও কোন কিছু বলিতে হইলে আমরা হাতের তেলো অনেকটা বাটির মতন করিয়া মুখের সম্মুখে ধরিয়া থাকি। ইহাতে জিহ্বা এবং ওষ্ঠের আন্দোলনে উৎপন্ন শব্দ হাতের তেলোয় ধাক্কা খাইয়া কেবলমাত্র সম্মুখ দিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া অল্পদূরে যাইয়াই শক্তি হারাইয়া ফেলে না। অনেকদূর পর্যন্ত তীব্রতা প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে। একই কারণে কোন ক্ষীণ শব্দ শুনিতে হইলে আমরা হাত দুইটি বাঁকাইয়া কানের পিছনে বাটির মতন করিয়া ধরিয়া থাকি। ইহাতে হাতের তেলোয় ধাক্কা খাইয়া অধিক পরিমাণ শব্দ-তরঙ্গ আমাদের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। ডাক্তারের স্টেথোস্কোপ, ভোট সংগ্রহকারীর মাউথ-ট্রাম্পেট প্রভৃতিতে শব্দ-তরঙ্গের এই সহজ প্রতিফলন ক্ষমতাকেই কাজে লাগান হইয়া থাকে।

সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপেও এখন ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির সাহায্য লওয়া হয়। জাহাজ হইতে তীব্র ধ্বনি উৎপন্ন করিয়া জলমধ্যে প্রেরণ করা হয়, সেই ধ্বনি সুনির্দিষ্ট বেগে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রতলে প্রতিহত হয় এবং ফিরিয়া আসিয়া প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির অন্তর্বর্তী ব্যবধান লক্ষ্য করিয়া শব্দ-তরঙ্গের গমনাগমন পথের দৈর্ঘ্য স্থির করা সম্ভব। এই প্রবাহ-পথের অর্ধেক হইল সমুদ্রের গভীরতা। এইরূপ ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি গ্রহণকারী আধুনিক যন্ত্র এ্যাস্‌ডিকে (Asdic) সাহায্যে তিমি-শিকারীগণ জলতলে সন্ত্রস্ত পলায়মান তিমি-মাছের দ্রুত বিচরণ সহজেই লক্ষ্য করিয়া থাকে।

আলোক তরঙ্গের ন্যায় শব্দ তরঙ্গ এক মাধ্যম হইতে অপর মাধ্যমে প্রবেশ করিতে তাহার গতিপথের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। এ ব্যাপারকে বলা হয় শব্দতরঙ্গের প্রতিসরণ (Refraction of Sound Wave)। প্রতি সরণ সর্বত্রই আংশিকভাবে ঘটে। আগন্তু শব্দতরঙ্গের সমস্তখানিই প্রথম মাধ্যম হই দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করিতে পারে ন কিছুটা প্রতিফলিত হইয়া প্রথম মাধ্যমে থাকিয়া যায়। এই শক্তি ক্ষয়ের জন্য প্রতি সরিত ধ্বনির তীব্রতা দ্বিতীয় মাধ্যমে এব কম হয়। বারংবার প্রতিসরিত হইলে তীব্রত এই হ্রাস সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায়। দিনে বেলায় বায়ুস্তরের উষ্ণতা সর্বত্র সমান থা না। গাছের ছায়ায় সূর্যকিরণ কম প সুতরাং সেখানে উষ্ণতা কম হয়। উষ্ণ ব্যতিক্রমে বাতাসের ঘনত্বের ব্যতিক্রম ঘ দিনের বেলায় শব্দতরঙ্গকে একস্থান হই অপর স্থানে প্রবাহিত হইতে হইলে বিভি ঘনত্বযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বায়ুস্তরের মধ্য দি তাহাকে চলিতে হয়। প্রতি স্তরেই আং প্রতিফলনের জন্য শব্দের তীব্রতা ক্রমশঃ পায়। এই জন্য বেশী দূর হইতে শুনি পাওয়া যায় না। কিন্তু রাত্রিকালে বায়ু সর্বত্রই সমান উষ্ণ থাকে বলিয়া কো ঘনত্বের কোন ব্যতিক্রম হয় না। সু শব্দ তরঙ্গের প্রবাহ হয় অবারিত। প্রতিফ অথবা প্রতিসরণের জন্য শক্তিক্ষয়ের হেতু ঘটে না। এই কারণে একই শব্দ দি চেয়ে রাত্রিবেলা বেশী স্পষ্ট হয় এবং অ দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।

ধ্বনি এবং ধ্বনিত বস্তুর বিভিন্ন সুকৌশলে ব্যবহার করিয়াই আধুনিক ক গ্রামোফোন, সবাক ছবি এবং অপরাপর যন্ত্র নির্মিত হইয়া থাকে। গ্রামোফোনে ধ্ব স্থায়ীভাবে রেকর্ডে অঙ্কিত করিয়া অঙ্কন হইতে আবশ্যক মতন ধ পুনরাবৃত্তি করা হয়। এই অঙ্কন পদ্ধ কৌশল বেশ সরল। শঙ্কু (con আকারের একটি মোটা পাত্রের সরু একটি পাতলা পরদায় আচ্ছাদিত

শঙ্কুটির উন্মুক্ত প্রান্তে কোন প্রকার ধ্বনি করিলে তাহা পরদার উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাকে কম্পিত করিয়া তোলে। এই কম্পনের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে উচ্চারিত ধ্বনির বৈচিত্র্যের উপর। পর্দাটির অপর দিকে একটি সূক্ষ্ম সূচ সংলগ্ন থাকে। পর্দার সঙ্গে সঙ্গে সূচটিও ধ্বনি অনুযায়ী স্পন্দিত হয়। পিচ্, গালা প্রভৃতি কোন কোমল পদার্থের একটি চক্রাকার প্লেটের উপর এই স্পন্দিত সূচের সাহায্যে একটি সর্পিল (spiral) রেখা অঙ্কিত করা হয়। রেখাটির গভীরতা সর্বত্র সমান হয় না। যে কোন স্থানের গভীরতা নির্ভর করে তৎকালীন শব্দতরঙ্গের বৈচিত্র্যের উপর। সুতরাং এই বন্ধুর সর্পিল রেখাটিকেই মূল ধ্বনির প্রতিলিপি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিতেই গ্রামোফোনের রেকর্ডে শব্দাঙ্কন করা হয়।

অঙ্কিত রেখাটিকে অক্ষত রাখিয়া বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্লেটটিকে কঠিন করা হয়। এই কঠিন প্লেটের উপর রেখাটির একপ্রান্তে শঙ্কুসহ সূচটীকে চাপিয়া ধরিয়া পূর্বের ন্যায় রেকর্ডটিকে ঘুরাইতে থাকিলে রেখার গভীরতার ব্যতিক্রমে সূচটি অবিকল পূর্বের ন্যায় স্পন্দিত হইতে থাকিবে। সূচের স্পন্দনে পর্দা স্পন্দিত হইয়া মূল ধ্বনির পুনরাবৃত্তি করিবে। এইরূপে উৎপন্ন ধ্বনি বিবিধ কারণে ক্ষীণ হইয়া থাকে। ইহাকে যথাসম্ভব তীব্র করিবার জন্য সাউণ্ড বক্স এবং হর্ণের সাহায্য লওয়া হয়।

সবাক ছবিতে ধ্বনিকে প্রথমতঃ বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হয়। সেই বিদ্যুৎকে পুনরায় আলোকে রূপান্তরিত করিয়া ফিল্ম তোলা হয়। ছবি দেখাইবার সময় এই ফিল্ম হইতে নিঃসৃত আলোককে পুনরায় বিদ্যুতে পরিণত করা হয় এবং সেই বিদ্যুতের সাহায্যে লাউড স্পীকারের সহযোগিতায় প্রাক্তন ধ্বনিকে বিবর্ধিত ভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়।

ফিল্ম তৈয়ার করিবার শব্দগ্রাহী যন্ত্রে চুম্বক এবং তারের সমাবেশ সুকৌশলে করা থাকে। এই সমাবেশের জন্য শব্দতরঙ্গের ধাক্কায় গ্রাহীযন্ত্রের পর্দা কম্পিত হইলেই তারের মধ্যে বিদ্যুতের আবেশ হয়। এই বিদ্যুতের পরিমাণ এবং প্রকৃতি নির্ভর করে সম্মুখস্থ পর্দার কম্পনের উপর, সুতরাং মূলতঃ ইহা নির্ভর করে পর্দার সম্মুখে উচ্চারিত ধ্বনির উপর। এই বিদ্যুতের সাহায্যে যদি কোন বাতি জ্বালান যায়, তাহা হইলে বাতির তারে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বাতি হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের প্রভারও হ্রাসবৃদ্ধি হইবে। এই অস্থির প্রভাকে লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া ফিল্মের উপর ফেলা হইলে, তাহার উপর যে কাল দাগ পড়িবে, শব্দের প্রকৃতি অনুযায়ী সেই দাগের কালিমা কোথাও গাঢ় এবং কোথাও ফিকে হইবে।

কোন উজ্জ্বল উৎস হইতে তীব্র আলোক যদি এ ফিল্মের এই রেখার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে রেখাটির কালিমার তারতম্য অনুযায়ী কোথাও কম কোথাও বেশী পরিমাণ আলোক নিঃসৃত হইয়া বাহিরে আসিবে। ফিল্ম হইতে নিঃসৃত এই অস্থির-প্রভ আলোক যদি ফটো ইলেকট্রীক সেলে (Photo electric cell) ফেলা হয়, তাহা হইলে সেই আলোক বিদ্যুতে রূপান্তরিত হইবে। ফটো ইলেকট্রীক সেল এক প্রকার বিদ্যুতের উৎস। ইহার উপর আলোক তরঙ্গের আঘাত পড়িলে, বিদ্যুত নিঃসৃত হয়। এই বিদ্যুতের পরিমাণ নির্ভর করে আঘাতকারী আলোকের তীব্রতার উপর। তীব্রতা বেশী হইলে উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণ বেশী হয় এবং তীব্রতা কম হইলে পরিমাণ হ্রাস পায়। সুতরাং এই সেল হইতে নিঃসৃত বিদ্যুৎ প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে মূল শব্দের বৈচিত্র্যের উপর। কারণ শব্দ বৈচিত্র্যের জন্যই ফিল্মের কালিমার গাঢ়তার ইতরবিশেষ হয়, এবং কালিমার তারতম্যের জন্যই বিদ্যুৎ উৎপাদক আঘাতকারী আলোকের তীব্রতা হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে আলোকের আঘাতে উৎপন্ন বিদ্যুত অতীব ক্ষীণ। নানা প্রকার কৃত্রিম উপায়ে বিবর্ধিত করিয়া এই অস্থির শক্তি বিদ্যুৎকে পুনরায় লাউড স্পীকারের সাহায্যে ধ্বনিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই ধ্বনিই সিনেমার পর্দায় ছবির সহিত সুসংগতভাবে সরবরাহ করিয়া আমাদের নয়ন এবং শ্রবণকে যুগপৎ পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে।

## প্র-না-বি-র এলবাম

### চিত্র-চরিত্র

#### কেশব সেন

কেশব সেনের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পেৌঁছানো সহজ নয়, কারণ দুটি মিশ্র উপাদানে তাঁহার চরিত্র গঠিত। বিচিত্র উপাদান ও মিশ্র উপাদান এক বস্তু নয়; বিচিত্র উপাদান চরিত্রকে সবল করিয়া তোলে কিন্তু মিশ্র উপাদানে গঠিত হইবার বিপদ এই যে বিরুদ্ধমুখী টানাটানিতে চরিত্র অনেক সময়ে একাগ্রমুখিতা হারাইয়া ফেলে। তবে ইহা জোর করিয়া বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষিগণের মধ্যে তাঁহার মতো প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। আজ এ-কথা সহজবোধ্য নয়—প্রমাণ করা তো রীতিমতো কঠিন, তার কারণ, যে প্রতিষ্ঠান ও বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তাঁহার চরিত্রবেগ প্রকাশ পাইয়াছিল আজ আর তাহাদের পূর্বগৌরব নাই। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দকে ছাড়িয়া দিলে কেশব সেনের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বের বেগ আর কাহারো ছিল কি না সন্দেহ। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ নিঃসন্দেহ মহাপুরুষ কিন্তু ব্যক্তিত্ববেগ তাঁহাদের প্রধান লক্ষণ নয়, তাঁহাদের প্রভাব তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ মহিমান্বিত পুরুষ, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি রক্ষণশীল প্রকৃতির, রক্ষণশীলতা ব্যক্তিত্বতে সংহতি দান করে, গতি তাহার ধর্মবিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগরের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব সমাজমুখী ছিল না—ঊর্ধ্বমুখী ছিল; ব্যক্তিত্বের বেগে তিনি মনুষ্যত্বের দিকে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; সে ব্যক্তিত্ব এতই বেগবান ছিল যে অপর পাঁচজনকে লইয়া তিনি পথ চলিতে পারিতেন না, তাহারা পিছনে পড়িয়া থাকিত, বিদ্যাসাগর চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব কোন প্রতিষ্ঠানকে সৃষ্টি করে নাই, বিদ্যাসাগর নামধেয় অপূর্ব ব্যক্তিটিকে সৃষ্টি করিয়াছিল—সেই সৃষ্টি আজিও সকলের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া বিরাজমান। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠান। কিভাবে ব্যক্তিত্বকে একটি human habitation ও name দিয়া প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হয় বৌদ্ধ সঙ্ঘ সৃষ্টিকারীদের ন্যায় সে কৌশল তাঁহার সুপরিজ্ঞাত ছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব আজও রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সক্রিয়। কেশব সেনের ব্যক্তিত্ব সে রকম কোন স্থায়ী আধার লাভ করে নাই। পরবর্তীকালের সুভাষ-চন্দ্রের ব্যক্তিত্বের সহিত কেশব সেনের তুলনা চলে। সুভাষচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সুভাষ-চরিত্র, কেশব সেনেরও শ্রেষ্ঠ কীর্তি কেশব-চরিত্র।

১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৭২ সালের তিন আইনি বিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়া অবধি বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এবং পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়টাকে ব্রাহ্মমনীষীদের কীর্তির ইতিহাস বলা অসঙ্গত হইবে না। ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭২ এই পর্বটাতে ব্রাহ্মসমাজ

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল এই বারের ইংলণ্ড ভ্রমণে বিভিন্ন খেলায় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, ইতিপূর্বে কোন ভ্রমণ ব্যবস্থায় এইরূপ সাফল্য লাভ করিতে দেখা যায় নাই। এই পর্যন্ত মোট ৭টি ম্যাচ খেলিয়াছেন এবং ৭টিতেই জয়ী হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৬টিতে ইনিংসে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে পরাজিত করিয়াছেন।

৭টি খেলায় ৮ ইনিংসের খেলায় মোট ৩২৭২ রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ৭টির মধ্যে মাত্র ৫টি খেলায় প্রথম ইনিংস সম্পূর্ণ শেষ করিতে হইয়াছে।

একদিনের খেলায় এসেক্স দলের বিরুদ্ধে ৭২১ রাণ করিয়া একদিনের রাণ সংখ্যার নূতন পৃথিবীর রেকর্ড করিয়াছেন।

ইতিমধ্যেই দুইজন খেলোয়াড় কিথ মিলার ও ব্রাউন দ্বিশত রাণের কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ব্রাউন পর পর তিনটি খেলায় শতাধিক রাণ করিয়াছেন। দলের অধিনায়ক ডন ব্রাডম্যান এই পর্যন্ত চারিটি খেলায় যোগদান করিয়া ৩টিতে শতাধিক রাণ ও একটিতে ৮৭ রাণ করেন।

বোলিংয়ে মিলার, জনসন, জনষ্টন, ম্যাককুল ও টোসাক সকলেই অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ইংলণ্ডের ক্রিকেট পরিচালকগণ টেস্ট খেলায় জয়লাভের সকল আশাই একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা শক্তিশালী দল গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম টেস্টে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ইতিপূর্বে পাঁচটি খেলার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে পরবর্তী দুইটি খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

**অক্সফোর্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া**

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের সহিত দুইদিনব্যাপী খেলায় যোগদান করিয়া অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৯০ রাণে জয়ী হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম খেলিয়া ৪৩১ রাণে ইনিংস শেষ করে। ব্রাউন শতাধিক রাণ করেন। পরে অক্সফোর্ড দল খেলিয়া মাত্র ১৮৫ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। টোসাক ও জনস্টনের বোলিং [illegible] সৃষ্টি করে। ভারতীয় খেলোয়াড় আব্দুল [illegible] ওরফে কারদার ৫৪ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে [illegible] প্রদর্শন করেন। ফলো অন করিয়া [illegible] দল ১৫৬ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ [illegible] টোসাক ও ম্যাককুল বোলিংয়ে সাফল্য লাভ [illegible] নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

**অস্ট্রেলিয়ান প্রথম ইনিংস:**—৪৩১ রাণ ([illegible] ১০৮, মোরিস ৬৪, লক্সটন নট আউট ৭৯, [illegible] ৫০, রিং ৫৩, হুইটকোম্ব ৮৩ রাণে ২টি, [illegible] ৩৬ রাণে ২টি, কারদার ১১৮ রাণে ২টি [illegible] পান।)

**অক্সফোর্ড প্রথম ইনিংস:**—১৮৫ রাণ (কিলে [illegible] কারদার ৫৪, ট্রাভার্স ২৬, জনস্টন ৪০ রাণে [illegible] টোসাক ৩৪ রাণে ৩টি উইকেট পান)

**অক্সফোর্ড দ্বিতীয় ইনিংস:**—১৫৬ রাণ ([illegible] ২৯, হুইটকোম্ব ২৬, টোসাক ৩৭ রাণে [illegible] ম্যাককুল ২৯ রাণে ৩টি উইকেট পান।

**এসেক্স বনাম অস্ট্রেলিয়া দল**

[illegible] এন্ড এসেক্স দলের সহিত অস্ট্রেলিয়া তিনদিনব্যাপী খেলা হয়। এই খেলায় [illegible] এক ইনিংস ও ৪৫১ রাণে পরাজিত [illegible] অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ [illegible] দিনে ৭২১ রাণ করিয়া প্রথম ইনিংস [illegible] ইতিপূর্বে কোন খেলায় এত অধিক

রাণ হয় নাই। ইহা একদিনের খেলার নূতন পৃথিবীর রেকর্ড। এই খেলায় ব্রাউন ১৫৩, ব্রাডম্যান ১৮৭, লক্সটন ১২০ ও স্যাগার্স নট আউট ১০৪ রাণ করেন।

পরে এসেক্স দল খেলিয়া প্রথম ইনিংস ৮৩ রাণে ও দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৭ রাণে শেষ করে। টোসাক ও জনস্টনের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। খেলার ফলাফল:—

**অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস:**—৭২১ রাণ (বার্ণেস ৭৯, ব্রাউন ১৫৩, ব্রাডম্যান ১৮৭, লক্সটন ১২০, স্যাগার্স ১০৪ রাণ নট আউট, পিটার স্মিথ ১৯৩ রাণে ৪টি, ভিগার ৬৬ রাণে ২টি ও বেলী ১২৮ ২টি উইকেট পান।)

**এসেক্স প্রথম ইনিংস:**—৮৩ রাণ (পিয়ার্স ২৫, মিলার ১৪ রাণে ৩টি, টোসাক ৩১ রাণে ৫টি উইকেট পান।)

**এসেক্স দ্বিতীয় ইনিংস:**—১৮৭ রাণ (পিয়ার্স ৭১, পি স্মিথ ৫৪; জনস্টন ৩৭ রাণে ৬টি ও টোসাক ৫০ রাণে ২টি উইকেট পান।)

**অস্ট্রেলিয়া দলের কৃতিত্ব**

অস্ট্রেলিয়ান দলের ব্যাটিংয়ে আটজন খেলোয়াড় এই পর্যন্ত শতাধিক রাণের কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। মোট ১২টি শতাধিক রাণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রাডম্যান তিনটি খেলায় শতাধিক রাণ করেন। ব্রাউনও তিনটি খেলায় শতাধিক রাণ করিয়াছেন ও কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে দ্বিশত রাণ করিয়াছেন। মিলার লিস্টারের বিরুদ্ধে ২০২ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। ইহা ছাড়া মোরিস উরস্টারের বিরুদ্ধে ১৩৮ রাণ, বার্ণেস সারের বিরুদ্ধে ১৭৬ রাণ, হ্যাসেট সারের বিরুদ্ধে ১১০ রাণ, লক্সটন এসেক্সের বিরুদ্ধে ১২১ রাণ ও স্যাগার্স এসেক্সের বিরুদ্ধে ১০৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

মিলার বোলিংয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ১০৮ ওভার বল দিয়া ২৬টি মেডেন, ২৫৮ রাণে ২২টি উইকেট পাইয়াছেন। জনসন ১২৯ ওভার বল দিয়া ৩৬টি মেডেন, ৩৪৯ রাণে ২৭টি উইকেট পাইয়াছেন। জনস্টন ১৬২ ওভার বল দিয়া ৬৩টি মেডেন, ২৭২ রাণে ২০টি উইকেট পাইয়াছেন। ম্যাককুল ১০৬ ওভার বল দিয়া ৩২টি মেডেন, ২৪৪ রাণে ১৭টি উইকেট পাইয়াছে। টোসাক ১৪৭ ওভার বল দিয়া ৪০টি মেডেন, ৩২৬ রাণে ১৯টি উইকেট পাইয়াছেন।

**ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত ভ্রমণ**

আগামী শীতের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতে ভ্রমণ করিতে আসিবেন। এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কথা উঠিয়াছে এই ভ্রমণের সময় ভারতীয় দলের কে অধিনায়ক হইবেন। এই প্রশ্ন অমরনাথ ও কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ ডি মেলোকে অনেকেই করিয়াছেন। এই দুইজনেই বেশ বুদ্ধিমানের মত উত্তর দিয়াছেন। অমরনাথ বলিয়াছেন, "যে কেহ অধিনায়ক হউন না কেন আমার সাহায্য প্রয়োজন হইলেই আমি খেলায় যোগদান করিব।" অপর দিকে কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, "বিজয় মার্চেণ্ট দলের অধিনায়ক হইবেন যদি তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন।" অপর এক জায়গায় মিঃ ডিমেলো বলিয়াছেন, "একজন অধিনায়ক সকল টেস্ট খেলার জন্য করা হইবে অথবা প্রত্যেক খেলায় একজন করিয়া অধিনায়ক করা হইবে তাহা কণ্ট্রোল বোর্ডের সাধারণ সভায় আগামী ১লা জুন কলিকাতায় স্থির হইবে।" ইহাদের উত্তরের মধ্যে সঠিক কিছুই নাই। সাধারণের মনস্তুষ্টির দিকেই ইহারা লক্ষ্য দিয়া উত্তর দিয়াছেন। তবে এই কথা ঠিক বিজয় মার্চেণ্ট খেলিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক না করিয়া মিঃ ডিমেলো পারিবেন না। অমরনাথ যে দল পরিচালনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহা অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণেই প্রমাণিত হইয়াছে। বিজয় হাজারী দল পরিচালনায় অমরনাথ অপেক্ষা ভাল ইহাও অনেক খেলাতেই সকলে উপলব্ধি করিয়াছেন।

বিভিন্ন টেস্ট খেলার জন্য বিভিন্ন অধিনায়ক নির্বাচন এই কথা সর্বপ্রথম আমরা মিঃ ডিমেলোর মুখেই শুনিলাম। এইরূপ নীতি কোথাও অনুসৃত হয় না। সুতরাং বোর্ডের সভাগণ এই নীতি প্রবর্তন করিয়া ভারতকে বিশ্বের ক্রিকেট পরিচালকদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবেন বলিয়া মনে হয় না। সকল খেলার জন্য একজনই অধিনায়ক করিতে হইবে এবং সেইজন্য বিজয় মার্চেণ্টই হইবেন।

হকি

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের যুগ্ম ম্যানেজার মিঃ পি গুপ্তকে হঠাৎ পদত্যাগ করিতে দেখিয়া আমরা খুবই আশ্চর্য হইয়াছি। ইতিপূর্বে হকি দলের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবেই তিনি ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এইবারে সেই সুবিধা নাই বলিয়াই কি তিনি পদত্যাগ করিলেন অথবা অন্য কোন কারণ আছে। যদি থাকে তাহা কি সর্বসাধারণকে তিনি জানাইবেন। অনেকেই আমাদের মতন এই সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন।

মিঃ গুপ্তের পদত্যাগের কারণ হিসাবে কেহ কেহ বলিতেছেন, "খরচ কমাইবার জন্যই মিঃ গুপ্ত ইহা করিয়াছেন। তিনি চান প্রতি দলের একজন ম্যানেজার থাকুক।" এই সংবাদ যদি কিছুটা সত্য হয় আমরা মিঃ গুপ্তকে অনুরোধ করিব তিনি যাহাতে অন্যান্য ভারতীয় দলের দুইজন ম্যানেজার যাইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা বন্ধ করেন। এইরূপ অনুরোধ করিবার যুক্তি হিসাবে বলিতে পারি ভারতীয় অলিম্পিকের যতগুলি নির্বাচন হইয়াছে দল—সন্তরণ, মুষ্টিযুদ্ধ, হকি, ফুটবল, সকল ক্ষেত্রেই মিঃ গুপ্তের বলিবার ও করিবার অধিকার ছিল। হকি দলের সম্পর্কে তিনি যে নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করিতেছেন অন্যান্য সকল দলের সম্পর্কেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সত্যই ইহা খুবই খারাপ লাগে যখন আমরা দেখিতে পাই মাত্র কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধির জন্য ১১ জন বা ১২ জন ম্যানেজার যাইতেছেন। ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিনিধি দলের একজন ম্যানেজার নির্বাচিত হইতে দেখিলে আমরা খুবই খুসী হইতাম।

---

# দেশী সংবাদ

১৭ই মে—হায়দরাবাদে রাজাকারদের অত্যাচার, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও পাশবিক অত্যাচার নিরঙ্কুশভাবে চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রাজ্য হইতে ব্যাপকভাবে লোকজন চলিয়া যাইতেছে। জানা গিয়াছে যে, এ পর্যন্ত প্রায় ১৮ হাজার হরিজনকে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। রাজ্যে ব্যাপক সমরায়োজন চলিতেছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট কিভাবে নিজাম পুলিশ ও সৈন্যদের অযৌক্তিক ও আক্রমণমূলক কার্যকলাপ চাপা দিবার জন্য ভারতীয় পুলিশের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতেছে, বোম্বাই সরকারের এক প্রেস নোটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮ই মে—ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সেরাইকেল্লা ও খারসোয়ান রাজ্য দুইটিকে বিহার প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। সারগুজা ও জাসপুর রাজ্য দুইটি মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের সহিত যুক্ত থাকিবে।

উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং সম্পর্কে লণ্ডনে আসন্ন আলোচনায় ভারতের অর্থসচিব শ্রীযুত আর কে ষণ্মুখম চেট্টি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন বলিয়া এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৯শে মে—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, হায়দরাবাদে রাজাকারদের নির্মম অত্যাচারের ফলে হায়দরাবাদ হইতে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিয়াছে। হায়দরাবাদ সীমান্তস্থিত অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ১০ হইতে ১৫ হাজার হিন্দু হায়দরাবাদ হইতে জেতোমল জেলায় আশ্রয় লইয়াছে। প্রকাশ, ওয়াঙ্গল জেলায় রাজাকারগণ ১৩ জন লোককে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে এবং আরও প্রায় একশত লোককে হত্যা করিয়াছে। সুতাখেরে রাজাকারগণ কয়েকটি শিশুকে হত্যা করিয়াছে। নানাছন্দ প্রভৃতি ৫০টি গ্রাম হইতে নগদ সাড়ে ১০ কোটি টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে, ৯১ জন লোককে হত্যা করা হইয়াছে এবং ১৩৫ জন নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুর কমিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট হইতে দশ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করার সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২০শে মে—পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্ট বিহারের অন্তর্ভুক্ত ধলভুম, মানভুম এবং দিনাজপুরের পার্শ্বে পুর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট দাবী জানাইয়া পত্র দিয়াছেন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে একজন এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ যে প্রস্তাব করিয়াছিল, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অদ্য তাহা অগ্রাহ্য করে। প্রস্তাবে এডমিনিস্ট্রেটরকে যে সমস্ত কার্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, ভারতের পক্ষ হইতে প্রধানত তৎসম্পর্কেই আপত্তি করা হয়।

২১শে মে—কলিকাতায় ১৬৬নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে 'মহাজাতি সদনের' নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিবার এবং উহার প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রিয় আদর্শের জন্য উহাকে উৎসর্গ করিবার জন্য উপায়াদি নির্ধারণের নিমিত্ত এক্ষণে

কলিকাতা কর্পোরেশন ও পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অদ্য ভারত সরকার শ্রমিকনেতা শ্রীযুত আর এস রুইকর ও অন্যান্য কয়েকজন শ্রমিকনেতার মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। গত ১৬ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার দরুণ শ্রীযুত রুইকরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২২শে মে—আসানসোলে সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

উত্তর বঙ্গে দিনাজপুর শহরের ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত বাণগড় স্তূপ খনন করায় খৃস্ট-জন্মের প্রায় একশত বৎসর পূর্বেও বাঙলার যে গৌরবময় ইতিহাস ছিল, তাহারই একটি লুপ্ত অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের উদ্যোগে উক্ত খননকার্য সম্পন্ন হইয়াছে।

২৩শে মে—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট হইতে গতকল্য টেলিফোনযোগে জরুরী আহ্বান পাইয়া হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলী অদ্য সকালে বিমানযোগে হায়দরাবাদ হইতে দিল্লী যাত্রা করেন। আগামীকল্য নয়াদিল্লীতে ভারতীয় ডোমিনিয়ন মন্ত্রিসভার যে বৈঠক হইবে, সে সম্পর্কেই তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত বৈঠকে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, গত শুক্রবার যে মাদ্রাজ-বোম্বাই মেলখানি মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়াছিল, গতকল্য অপরাহ্নে নিজামের রাজ্যের এলাকায় উহা আক্রান্ত হয়। জানা গিয়াছে যে, উক্ত ট্রেন আক্রমণের ফলে দুই ব্যক্তি নিহত ও ১১ জন আহত হইয়াছে। চারিজন মহিলা ও দুইটি শিশুসহ ১৩ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

আসানসোলে সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির পশ্চিম বাঙলা প্রাদেশিক সম্মেলন সমাপ্ত হয়। এই দিন সম্মেলনে বিহারের বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিম বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

# বিদেশী সংবাদ

১৭ই মে—ইহুদী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ কায়াম ওয়েজম্যান গত রাত্রে ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্থায়ী পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৮ই মে—মিঃ হেনরী ওয়ালেসের খোলা চিঠির ভিত্তিতে রুশ-মার্কিন আলোচনার জন্য মার্শাল স্ট্যালিন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, মার্কিন গভর্নমেণ্ট অদ্য রাত্রিতে উহা সরকারীভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

রাজা আব্দুল্লার আরব বাহিনী জেরুজালেমে প্রবেশ করিয়াছে।

১৯শে মে—ইহুদী সেনাদল অদ্য প্রাচীন জেরুজালেমের রাজপথে ও অলি-গলিতে রাজা আব্দুল্লার আরব ফৌজের সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে।

দামাস্কাস হইতে প্রচারিত সিরিয়া গভর্নমেণ্টের এক ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, উত্তর প্যালেস্টাইনে এক যুদ্ধে সিরিয়ান সৈন্যদলের আক্রমণে ১৭২ জন ইহুদী নিহত হয়।

২০শে মে—অদ্য জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক চীনের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

মিশরীয় সেনাদল অদ্য শিনাই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া বীরসেবা দখল করিয়াছে। অপর একটি মিশরীয় সেনাদল গাজার ৮ মাইল উত্তরে বেৎ-সুনেদ অধিকার করিয়াছে।

ট্রান্সজর্ডানের রাজা আব্দুল্লা আরব সমর নেতাগণকে বলেন যে, জেরুজালেমে ষ্ট্যালিনগ্রাদের ন্যায় অবস্থা দেখা দিয়াছে। ইহুদীরা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিবে না—প্রত্যেকটি গৃহকে তাঁহারা ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছে।

২১শে মে—আজ প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সপ্তম দিবস। এই দিন পুরাতন জেরুজালেম শহরে সারারাত্রিব্যাপী সংগ্রাম চলে।

২২শে মে—অদ্য ইহুদীরা প্রাচীর-বেষ্টিত জেরুজালেম শহরের এক বর্গমাইলের এক-চতুর্থাংশ স্থানে অবরুদ্ধ হইয়া শেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং আরব লিজিয়নের সৈন্যদল ইহুদীদিগকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ জানায়। ইহুদীরা 'বিনাসর্তে' আত্মসমর্পণের দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য মিশরীয় বিমান বহর রামাথ-ডেভিড বিমান ঘাঁটিতে তিন দফা আক্রমণ চালায়। বৃটিশ বিমানবহর ৫খানি মিশরীয় বিমান ধ্বংস করে।

২৩শে মে—নিরাপত্তা পরিষদ গত সা[...] প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে এক নির্দেশ প্রচার করিয়াছেন। এই নির্দেশ ২৪শে মে বেলা ৪টা (গ্রীণউইচ টাইম—ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাত্রি সাড়ে ৯টা) হইতে কার্যকর হইবে।



শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ ] শনিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 5th June, 1948. [ ৩১শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**অকৃতজ্ঞতার সীমা**

বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাঙলার অংশসমূহ পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া পাইবার জন্য যে আন্দোলন চলিতেছে, বিহারের ব্যবস্থা-পরিষদে সেজন্য সেদিন প্রচুর বিক্ষোভ দেখা গিয়াছে। বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় বলিয়াছেন, তাঁহারা বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাঙলার সূচাগ্র ভূমি তো ছাড়িবেনই না, অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গ হইতে যতটা অংশ বিহারে টানিয়া লওয়া যায়, সেজন্য চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যুক্তি এই যে, এগুলি পূর্বে যখন ভাগলপুর বিভাগে ছিল, তখন বিহারের দাবী এ সম্বন্ধে রহিয়াছে। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের নীতি গ্রহণ করিবার পরও এই রকম উদ্ভট কথা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন; কিন্তু আমরা বিস্ময়ের কিছুই দেখিতেছি না। বাঙলার অদৃষ্ট যখন খারাপ পড়িয়াছে এবং বাঙলার সর্বনাশ সাধনের জন্যই যখন চারিদিক হইতে চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে, তখন সকলই সম্ভব। ক্রমেই দেখিতেছি, বাঙলার দিকে তাকাইয়া কথা বলিবার লোক ঊর্ধ্বতন কংগ্রেস-নেতৃবর্গের মধ্যে কেহ নাই; পক্ষান্তরে বাঙলার সংগত, অধিকন্তু কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসম্মত দাবীকে চাপাইয়া দিবার জন্যই কৌশলপূর্ণ যুক্তিরাজি উত্তরোত্তর সকল দিক হইতে মুখর হইয়া উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর শ্রীরাজাগোপালাচারী দার্জিলিংয়ে কিছুদিন পূর্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রদেশ পুনর্গঠনের এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রাজাজীর উক্তির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত বাঙালী মাত্রকেই ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। রাজাজী পশ্চিমবঙ্গের শাসক। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলার পক্ষ হইতে বর্তমানে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি, বিহারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁহাদের এ বিষয়ে আলোচনারও সূত্রপাত হইতে চলিয়াছে। রাজাজী ঠিক এই সময়েই সর্বভারতের সমন্বয়ের সুর উঁচুতে চড়াইয়া প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবীকে নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার এমন উক্তির তাৎপর্য কোন্ ক্ষেত্রে এবং কাহার উপর গিয়া বর্তে, তিনি সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিক, এ সত্য উপলব্ধি করা তাঁহার উচিত ছিল। তাঁহার অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়া কথা বলা উচিত ছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের শাসকস্বরূপে তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধেই গিয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ শাসনতান্ত্রিক শিষ্টাচার বা যুক্তি কোন দিক দিয়াই রাজাজীর উক্তি সময়োপযোগী হয় নাই। ফলতঃ অন্য যে-কোন প্রদেশ, বাঙলার উপর যতই অবিচার করুক না কেন, বাঙলাকে সব সহ্য করিয়া যাইতে হইবে, এই ভাবে আত্ম-বিলোপের পথই বাঙলার পরমধর্মস্বরূপে নির্দেশিত হইতেছে। প্রাদেশিকতার কলঙ্ক অন্য কোন প্রদেশকে স্পর্শ করে না; কিন্তু কংগ্রেসের নির্দেশিত নীতি অনুসারে বাঙলার প্রতি সুবিচারের কথা তুলিলেই একান্ত অসংযত এবং উৎকট কলরব উত্থিত হয়। বাঙলার জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের শোষণ-পথের সবচেয়ে বড় কণ্টক-স্বরূপ ছিল। এই প্রবল এবং পরম শত্রুকে উৎখাত করিবার জন্য তাঁহারা ছলে-বলে-কৌশলে কোন দিক হইতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নাই। ভারত সচিবস্বরূপে স্যার স্যামুয়েল হোর একদিন প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বাঙলাকে আমরা মাথা কিছুতেই তুলিতে দিব না। বস্তুতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদ-নীতির যত আঘাত মুখ্যতঃ বাঙলার উপরই আপতিত হয়। মূল বাঙলাদেশে যাহা ছিল, তাহাকে ১৯১১ সালে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। মধ্যভাগের নাম বাঙলা রাখিয়া পূর্বের একফালি আসামকে এবং পশ্চিমের একফালি বিহারকে দেওয়া হয়। এই ত্রিধা-খণ্ডিত প্রদেশের যেটুকু বাঙলা নামে অবশিষ্ট ছিল, ব্রিটিশ শাসনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাহাকে পুনরায় খণ্ডিত করিয়া দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্থানভুক্ত করা হইয়াছে এবং মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিম বাঙলা নামে ভারত-রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম প্রদেশস্বরূপে মানচিত্রে স্থান পাইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই শেষ পদাঘাতে বাঙলার যেটুকু প্রাণস্পন্দন চলিতেছে, তাহাও স্তব্ধ করিবার জন্য নিষ্ঠুর, নির্মম ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং সে ষড়যন্ত্র যাঁহারা নাটের গুরু, তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নহেন, এই দেশেরই লোক, শুধু তাহাও নহে, এই দেশেরই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং বাঙলার অদৃষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাহার অস্তিত্ব বুঝি আর বজায় থাকে না। ইতিহাসে অনেক অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বাঙলা অনেক সহ্য করিয়াছে। ছিন্নমস্তার মত সে নিজের মাথা কাটিয়া নিজের রক্তে ভারতকে তুষ্ট ও পুষ্ট করিয়াছে। সেজন্য কোন দিন কোন অভিযোগ সে উত্থাপন করে নাই। কিন্তু বাঙলাকে উৎখাত করিবার এ উদ্যম সে সহ্য করিবে না। প্রাদেশিকতার ধুয়া এ ক্ষেত্রে যাঁহারা তুলিতেছেন, তাহাদের বুজরুকী বাঙালী মানিবে না। বাঙালী প্রাদেশিকতা জানে না, বুঝে না। বাঙালীর সংস্কৃতির সমগ্র ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। বাঙলার অতীত

ঐতিহ্য সে পক্ষে প্রমাণ এবং বাঙলার বর্তমান রাষ্ট্র ও অর্থনীতিক জীবন সে পক্ষে প্রমাণ। এ সব সত্য তো চোখের সামনেই রহিয়াছে। বিহারে এবং আসামের বাঙালীদের অবস্থার সংগে বাঙলার অবাঙালীদের অবস্থার তুলনা করিলেই বোঝা যায়। কংগ্রেস-নেতৃবর্গের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে, বাঙলার ন্যায্য দাবীকে প্রতিহত করিবার জন্য যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংযত করুন। বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গকে দিয়া তাঁহারা কংগ্রেসের বহু-বিঘোষিত নীতির মর্যাদা রক্ষা করুন। সেই পথে ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় হইবে এবং প্রাদেশিকতার সঙ্কট হইতে জাতি রক্ষা পাইবে।

### দোষী কাহারা?

বিহার ব্যবস্থা-পরিষদে বাঙালীদের বিরুদ্ধে কয়েকজন সদস্য যে অনুচিত উত্তেজনা প্রকাশ করেন এবং বক্তৃতাবলীতে বিষোদ্গার করেন, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত শঙ্কররাও দেওয়ের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "প্রদেশে প্রদেশে যদি এই বিষয় লইয়া লড়াই চলিতে থাকে, বিহার বাঙলার বিরুদ্ধে এবং বাঙলা আসামের বিরুদ্ধে যদি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তবে কংগ্রেস ধ্বংস হইবে। মহাত্মা গান্ধীর প্রগাঢ় অনুরাগী বিহারের নিকট হইতে আমি এই ধরণের আচরণ প্রত্যাশা করি নাই।" শ্রীযুত শঙ্কররাওয়ের এই উক্তিতে বিহারের নেতাদের জ্ঞানচক্ষু কতটা উন্মীলিত হইবে আমরা জানি না; কিন্তু আমাদিগকে নিতান্ত দুঃখের সংগে এ কথা বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা মুখে গান্ধীজীর আনুগত্যের বড় বেশি দোহাই দেন, বিহারের এমন কয়েকজন নেতার মধ্যেই বাঙালী বিদ্বেষের বেশি উগ্রতা পরিলক্ষিত হয়। বিহার কংগ্রেসের মুখপত্র বলিয়া যে কয়েকখানা সংবাদপত্রের নাম আছে, অনর্থক বাঙালীর মুণ্ডপাত করিবার বেলায় তাহাদের রসনাই সর্বদা বলগাবিহীন হইয়া পড়ে। বাঙলা ভাষাকে পিষিয়া মারিবার জন্য বিহারের উর্ধ্বতন শাসন বিভাগ হইতে নিম্নতন কর্মচারীরা পর্যন্ত যে নির্লজ্জ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নয়। অথচ বাঙলা বিহারের কাছে এমন কি অপরাধ করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বাঙলাদেশ বুকের রক্ত দিয়া বিহারকে তুষ্ট এবং পুষ্ট করিয়াই চলিয়াছে। বাঙালী বিহারের সংগে কোনদিন বিরোধ বাধাইতে যায় নাই। তেমন বিরোধের সম্ভাবনার কথা তুলিয়া যাহারা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের জন্য বাঙলার দাবীকে চাপিয়া যাইতে চাহেন, সত্য কথা বলিতে গেলে তাঁহাদের উক্তি যতই মধুর রসে মোলায়েম হউক না কেন, আমরা তাঁহাদের কংগ্রেস-নিষ্ঠা এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি শুভবুদ্ধিকে সরলভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের প্রধান কথা এই যে, বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করিতে ন্যায় এবং যুক্তির দিক হইতে কোন অন্তরায় নাই এবং প্রশ্নটির সংগে রাষ্ট্রনীতিক কোন জটিল সমস্যাও বিজড়িত নহে। এক্ষেত্রে শুধু সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির প্রয়োজন। নিরপেক্ষভাবে কংগ্রেসের গৃহীত নীতির অনুসরণ করিলেই সব সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমরা আশা করি, কংগ্রেস-নেতারা শুধু কথায় কথায় প্রশ্নটির গুরুত্ব পাকাইয়া না তুলিয়া উভয় প্রদেশের মধ্যে সুমীমাংসার পথে কাজে হাত দিবেন।

### যুক্তি ও উক্তি

গৌহাটির অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। আসাম গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগ উৎসাহ এবং উদ্যমের সংগে এই কথা প্রচার করিয়াছেন। আসামের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস-নায়ক ও কংগ্রেসসেবীরা তাহাদের দিক হইতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ত্রুটি করেন নাই, এতৎসম্পর্কিত বিবৃতিও প্রচার করা হইয়াছে। এসব সত্ত্বেও আমাদের মনের সন্দেহের নিরসন হইতেছে না। বলা বাহুল্য, গৌহাটিতে বাঙালীদের, বিশেষভাবে বাঙালী হিন্দুদের উপরই আক্রমণ হইয়াছে। বাঙালীদের বিরুদ্ধে আসামের এক শ্রেণীর লোকের এই বিদ্বেষ আকস্মিক কিছু নয়। দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত উদ্যম, পরিশ্রম এবং প্রচারকার্যের দ্বারা এই বিদ্বেষ সৃষ্ট ও পুষ্ট করা হইয়াছে। আসামের উপদলীয় রাজনীতির সংগে এই অপচেষ্টা অংগাংগিভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রধানত এই উপদলীয় রাজনীতিক স্বার্থের প্রয়োজনে আসাম গভর্নমেণ্ট এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের যাঁহারা নায়ক ও পরিচালক তাঁহাদের আচরণ সন্তোষজনক হয় নাই। তাঁহারা উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের বিরুদ্ধতাকে ভয় করিয়াছেন এবং প্রাদেশিকতাবাদীদের মনস্তুষ্টির জন্য দুর্বল নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুত এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আসাম গভর্নমেণ্টের জ্ঞাতসারেই বাঙাল-খেদা আন্দোলনের প্রচারকার্য চলিয়াছে। অথচ আসাম গভর্নমেণ্ট যথাসময়ে তাহা রোধ করিবার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। এখনও তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহাতেও দুষ্কার্যের দ্বিধাহীন অকপট নিন্দা নয়, কংগ্রেসের নীতি-নিষ্ঠার মৌখিক দোহাই মাত্র। গৌহাটি কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাক্তার ভুবনেশ্বর বড়ুয়া মহাশয়ের মতে গৌহাটির ঘটনাটি ছাত্র ও রেল-কর্মচারীদের বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসামের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে শ্রীসুরেন্দ্র ভূঞা ইহার জবাব দিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রকৃত অপরাধী লোকদিগকে ঢাকিয়া রাখিবার অভিপ্রায়েই ছাত্র সম্প্রদায়কে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করানো হইয়াছে।" ছাত্রগণ ছাড়া অন্যান্য "অবাঞ্ছনীয় লোক"ও যে গৌহাটির ঘটনায় বাঙালী রেলকর্মচারীদের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, গৌহাটি কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মহাশয় শেষ পর্যন্ত সেকথা স্বীকার করিতেছেন। এই অবাঞ্ছনীয় লোক কাহারা? তাহাদের বিরুদ্ধে কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, শুধু তাহাই নয়, পিছনে থাকিয়া কাহারা তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতেছে, আমরা সোজা ভাষায় এই কথা জানিতে চাই।

### বাস্তুত্যাগীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব

কয়েকদিন হইল পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা কিছু হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ ইহা নহে যে, পূর্ববঙ্গের সর্বত্র আশ্বস্তি এবং নিরুদ্বেগের প্রতিবেশ ইতিমধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বাস্তুত্যাগে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের অদৃষ্ট বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন। যাঁহারা বড় আশা অন্তরে লইয়া পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় তাঁহাদের মনে গভীর নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাস্তুহারাদের বাসস্থান, জীবিকা ও শিক্ষা প্রভৃতি সমস্যার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনে আবশ্যক তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছেন না; এজন্য বাস্তুহারাদের এখানে অবস্থান অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়াছে। ইহার ফলে অবশেষে বাস্তুহারাদিগকে মানসিক পীড়ন সত্ত্বেও ব্যর্থ চিত্তে নিজেদের দুর্গত অবস্থার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। পূর্ববঙ্গে বড় রকমের কোন হাংগামা ঘটিতেছে না, ইহা সত্য। সেকথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। কিন্তু জীবনের সম্বন্ধে নিরাপত্তাই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা নয় এবং অনেক সময় অশান্তি এবং উপদ্রবকেও মানুষ তুচ্ছ করিয়া চলিতে পারে এবং চলিয়াও থাকে। বস্তুত নির্জীবের জড়বৎ শান্তির চেয়ে মনুষ্যত্বের মহিমা যেখানে পিষ্ট বা ক্লিষ্ট হয় না, এমন অশান্তির অবস্থাও মানুষকে অন্তরের বলে স্বচ্ছন্দ এবং সঞ্জীবিত রাখে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেখানকার রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে পড়িয়া এই মানসিক বল হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের রক্ষার প্রশ্ন এদিক হইতে আজ বড় প্রশ্ন নয়, তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমতুল্য রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই বড় প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁহাদের মনের মূলে রাষ্ট্রগত মর্যাদাবোধের কোন আগ্রহই

কোন দিক হইতে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা এবং সংস্কৃতির সব ধারা ছিন্ন হইতে বসিয়াছে। বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম পূর্ববঙ্গের সমগ্র সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু ঐসলামিক রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িকতার ধুঁয়া তাঁহাদের সেই স্বদেশপ্রেমকে আঘাতের উপর আঘাতে অমর্যাদ করিয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্র-পরিচালনে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের কোন কর্তৃত্বই নাই। পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন একথা উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন স্থান দেওয়া হয় নাই। শাসন-বিভাগে ষোল আনা মুসলমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে; কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ দূরের কথা, প্রাদেশিক শাসন বিভাগেও সংখ্যানুপাতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চাকুরী দিবার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন, সেক্ষেত্রেও সামান্য দুই একজন লোককেই লওয়া হইতেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্বারাই নূতন পদগুলি ভর্তি করা হইতেছে। এই সব নানা কারণে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনের অস্বস্তি ও উদ্বেগ দূরে হইতেছে না, রাষ্ট্রের প্রতি মর্যাদাবোধে তাঁহারা মনের আগ্রহশীল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ফলতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি কিম্বা ঐসলামিক গণতন্ত্রের সাম্য-মূলক আদর্শের বড় বড় কথা শুনাইলেই এই অবস্থার প্রতিকার ঘটিবে না। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি প্রকৃতই স্বস্তির ভাব ফিরাইয়া আনিতে হয়, তবে রাষ্ট্র-পরিচালনে যথাযোগ্য স্থান তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংস্কৃতিসম্পন্ন; মনুষ্যত্বকে আহত করিয়া—ক্রীতদাসের জীবন যাপন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। গ্লানিময় তেমন প্রতিবেশের মধ্যে তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য কেহ কেহ দূরে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন। ইঁহাদের তেমন উপদেশে সহৃদয়তার একান্তই অভাব আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

### যে ব্রতের যে ফল

করাচী পাকিস্থানের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। রাজধানী হিসাবে এই শহর সিন্ধু প্রদেশের বাহিরে বলিয়া গণ্য হইবে। সম্প্রতি এ বিষয় লইয়া পাকিস্থানের গণ-পরিষদে বেশ জোরালো বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। সিন্ধু প্রদেশের এইভাবে অঙ্গচ্ছেদ করাতে তথাকার একদল পাকিস্থানের কেন্দ্র-নীতির নিয়ামকদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মিঃ গজদার ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার মতে এইভাবে সিন্ধুর অঙ্গচ্ছেদ করিয়া পাকিস্থানের কেন্দ্র-নীতি পরিচালকগণ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের মূলে নীতি ভঙ্গ করিয়াছেন। লাহোরের প্রস্তাবে প্রদেশসমূহের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তাই দেওয়া হইয়াছিল। মিঃ গজদারের মনের এই বিশ্বাস মালিক ফিরোজ খাঁ নুন ভাঙ্গিয়া দেন। তিনি বলেন, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর লাহোরে গৃহীত প্রস্তাবের কোন মূল্য নাই। পাকিস্থানের গণ-পরিষদের সিদ্ধান্তই এখন বলবৎ হইবে। বলা বাহুল্য, পাকিস্থানের গণ-পরিষদ মিঃ জিন্নার হাতের মুঠোর মধ্যে, গণ-পরিষদ কর্তার রায়েই সায় দিয়া চলে। সুতরাং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বাতন্ত্র্য—পাকিস্থানী রাষ্ট্রনীতিতে এগুলির এখন আর কোন মূল্যই নাই। মিঃ জিন্নার কর্তৃত্ব সর্বত্র অবাধ এবং অপ্রতিহত। তিনি দ্বিতীয় হিটলার। প্রকৃত অবস্থাটা ক্রমেই পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে এবং মিঃ জিন্নার স্বেচ্ছাচারের চাপে তাঁহার অবলম্বিত নীতির প্রতি আনুগত্যের জন্য অনেকের মনে এখন অনুতাপ দেখা দিয়াছে। মিঃ গজদার এমন অনুতাপের বশে সেদিন বলিয়াছেন, করাচীর অদৃষ্টে ইহাই ঘটিবে সিন্ধুবাসীরা আগে যদি তাহা বুঝিতে পারিত, তবে কিছুতেই তাহারা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় রাজী হইত না। মধ্য-যুগীয় সাম্প্রদায়িকতা হইতে স্বেচ্ছাচারের যে দানব পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে তুষ্ট করিবার দায় ঘাড়ে লইয়া যুগোচিত অধিকারের দাবী করিলে চলিবে কেন? এ ব্রতের এই ফল।

### ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি

সম্প্রতি করাচীতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ পাকিস্থানকে কয়লা, লোহা, কাপড়, জুতা, বস্ত্র এবং বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করিবে; পক্ষান্তরে পাকিস্থান ভারতবর্ষকে পাট, তুলা, খাদ্যশস্য, কাঁচা চামড়া ইত্যাদি দিবে। আগামী জুলাই মাস হইতে এক বৎসরের জন্য এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে, তবে চাউল, তুলা প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য সংক্রান্ত চুক্তি আগামী বৎসরের আগস্ট মাস পর্যন্ত বহাল থাকিবে। মাসাধিক কাল পূর্বে কলিকাতায় ভারত-পাকিস্থান সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতেও উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটা স্থায়ী এবং যুক্তিসংগত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ফলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কাঁচা শাক-সব্জী, ফল, মাছ, দুধ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় এবং দ্রুত পচনশীল কতকগুলি দ্রব্যের অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থা ঘোষিত হয়। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে তখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। করাচী সম্মেলনে উভয় রাষ্ট্রের প্রতি-নিধিরা সম্মিলিত হইয়া সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করিলেন। এই চুক্তি সম্পাদনের ফলে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভিতরকার অনেক সমস্যা সহজ হইয়া আসিয়াছে। এই দুইটি প্রদেশের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ এমনই যে, একের ছাড়িয়া অপরের চলা কঠিন। উভয় বঙ্গের মধ্যে শুল্ক প্রাচীর স্থাপিত হইবার পর ব্যবসা-বাণিজ্যে একরকম অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। করাচীতে নিষ্পন্ন চুক্তি কার্যকর হইলে এই অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইবে, আশা করা যায়। ট্রেন, স্টীমার পথে যাত্রীদের খানাতল্লাসীর যে বিড়ম্বনা দুরন্ত হইয়াছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত অভদ্র আকার ধারণ করিয়াছিল। সে উপদ্রব এখন অনেকটা কমিয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত বিভাগের কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে দুর্নীতি যদি প্রশ্রয় না পায়, তবে অল্পদিনের মধ্যেই উভয় বঙ্গের মধ্যে গতিবিধি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ হইয়া দাঁড়াইবে।

### বস্ত্র ব্যবসায়ে দুর্নীতি

শোনা যাইতেছে, ভারত গভর্নমেণ্ট বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, অনতিবিলম্বে যদি কাপড়ের বাজারের অবস্থার উন্নতি সাধিত না হয়, তবে জুন মাসের মাঝামাঝি তাঁহারা বস্ত্রের বাজারের দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। বলা বাহুল্য, শুধু ফাঁকা কথার হুমকিতে কাজ হইবে না। কাপড়ের বাজার কণ্ট্রোল মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অতিলাভের লোভ মিল-মালিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ী সমাজকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অর্থের প্রলোভন চোরাকারবারের বাজার পরিস্ফীত করিতেছে। প্রকৃত চোরাকারবারকে এখন আর চোরা বলা চলে না। এখন সাধারণের চোখের উপরই চোরাবাজার চলিতেছে। পশ্চিম-বঙ্গের জন্য বরাদ্দ কাপড় বহুবিধ বিচিত্র উপায়ে পূর্ববঙ্গে চালান যাইতেছে। ওদিকে শুনিতেছি, আমেদাবাদের বাজারে কাপড় স্তূপীকৃত হইয়াছে। সেখানে নাকি এত কাপড় জমিয়াছে যে, সেগুলি কাটাইবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সুতরাং কাপড়ের অভাব কিছু ঘটে নাই; স্বার্থগৃধ্নু দল ঘোঁট পাকাইয়া বস্ত্রের বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতেছে; এবং কৃত্রিম ভাবে বস্ত্রের অভাব দেখানো হইতেছে। যাহারা এইভাবে চোরা কারবার চালাইতেছে, তাহারা রাষ্ট্রের শত্রু এবং সমাজের শত্রু। এই পাপাচারকে সংযত করিবার জন্য রাষ্ট্রনায়কদের যেরূপ তৎপর হওয়া প্রয়োজন, তেমনই ইহাদের বিরুদ্ধে সমাজ-চেতনাও জাগ্রত হওয়া দরকার।

হিমালয়ের তীর্থস্থানসমূহে মহাত্মাজীর চিতাভস্ম লইয়া যাওয়া হইতেছে। দুর্গম পর্বতপথের মোহনীয় দৃশ্য লক্ষণীয়

## জার্মানীর ভাগ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিন বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য আজও অনির্ধারিত। চতুঃশক্তির পাল্লায় পড়ে জার্মানী আজও চার ভাগে বিভক্ত। অবস্থা ক্রমশ যেরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে জার্মানীতে অখণ্ড কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। জার্মানীকে চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে না থাকতে হলেও দুটি সুস্পষ্ট ভাবে তার বিভক্ত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি—রুশ নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মানী ও ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম জার্মানী। জার্মানীকে এই দুর্দৈব থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হল পরস্পর-বিরোধী উভয় পক্ষের পূর্ণ মতৈক্য। কিন্তু মতৈক্য ত দূরের কথা, উভয় পক্ষের মতানৈক্যই ক্রমশ বেড়ে চলেছে। জার্মানীকে এ ভাবে বিভক্ত করার দায়িত্ব কোন পক্ষই নিতে চাইছে না। পরাধীনতার দরুণ জার্মানদের কণ্ঠ আজ নিস্তব্ধ বলে তারা কিছু বলতে পারছে না কিংবা তাদের মতামত নেবার প্রয়োজনও কোন পক্ষ অনুভব করছে না। কিন্তু একদিন না একদিন তারা সে শক্তি অর্জন করবে এবং সেদিন তারা কৈফিয়ৎ দাবী করবে। তাই জার্মানীর ভাগ্য নিয়ে সুস্পষ্ট ভাবে কেউ কিছু বলছে না—শুধু উভয় পক্ষ থেকে চলেছে ঘুঁটি চালবার চেষ্টা। প্রত্যেকেই চাইছে জার্মান বিভাগের দায়িত্ব অপর পক্ষের ঘাড়ে ফেলতে।

বার্লিনে গত ২০শে মার্চ থেকে সোভিয়েট রাশিয়া বনাম ইঙ্গ-মার্কিনদের যে বিরোধ চলেছে তার মূল হল এইখানে। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ বার বার চেষ্টা করেও সোভিয়েট বিরোধিতার ফলে অখণ্ড জার্মান রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। তাই তারা এ ব্যাপারে বর্তমানে হতাশ হয়ে পড়েছে এবং চেষ্টা করছে সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব জার্মানকে বাদ দিয়ে পশ্চিম জার্মানীকে একটি অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে সংগঠিত করতে। এ প্রচেষ্টা না করে তাদের উপায়ও নেই। জার্মানী যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারে, তবে তারা আর কতকাল জার্মানদের বোঝা টানবে? তা ছাড়া পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করে তারা পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যে চেষ্টা করছে তারও সঙ্গে জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট। সোভিয়েট রাশিয়া স্বভাবতঃই এই ইঙ্গ-মার্কিন প্রয়াসকে সন্দেহের চোখে দেখছে। তার বিরোধিতার ফলেই যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় এ প্রয়াস করছে সেটাও সে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চায়। তার উদ্দেশ্য হল জার্মানী বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়ের ঘাড়ে ফেলে দেওয়া। ২০শে মার্চ তারিখে মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ থেকে মার্শাল সোকোলভস্কি বেরিয়ে যাওয়ায় বার্লিনে যে সংকটের উদ্ভব হয়েছিল, তার মূলে ছিল সেই সময়ে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ত্রিশক্তি সম্মেলন। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এই বৈঠকে তখন তিনটি রাষ্ট্রের অধীন পশ্চিম জার্মানীতে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা চলছিল। সেই সময় অকস্মাৎ বার্লিনে বিরোধ বাধিয়ে সোভিয়েট রুশিয়া চেয়েছিল এই রাষ্ট্রত্রয়কে বার্লিন ত্যাগে বাধ্য করতে। তা হলে সোভিয়েট রুশিয়া প্রমাণ করতে পারত যে, জার্মানী বিভাগের জন্যে পুরাপুরি দায়ী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়। তার পর বার্লিনের বিরোধ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা না থাকলেও অনিশ্চয়তা আছে পূর্ণ মাত্রায়। মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ ও বার্লিন মিউনিসিপ্যাল শাসনযন্ত্রের পরিদর্শন কম্যাণ্ডাটুরার কাজ প্রায় অচল। সোভিয়েট রুশিয়া সরাসরি এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার না করলেও এর কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছে না। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া যতই অসুবিধা সৃষ্টি করুক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যে সহজে বার্লিন ত্যাগ করবে না—এ কথা তারা ভাল ভাবেই জানিয়ে দিয়েছে। তবু সোভিয়েট রাশিয়া হাল ছাড়েনি। সম্প্রতি যে পাঁচটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে তাদের প্রতিনিধি ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর ভাগ্য নিয়ে পুনরায় লণ্ডনে আলোচনা বৈঠক বসেছে। ঠিক সেই সময়ে বার্লিনে সোভিয়েট রাশিয়া আবার ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে চাপ দিয়েছে বাড়িয়ে। বৃটিশ ও মার্কিন বিমানের পক্ষে তারা গ্যাটো ও টেম্পেল হফ বিমানঘাটির ব্যবহার দিয়েছে নিষিদ্ধ করে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পশ্চিম ইউরোপকে একই শাসনাধীনে একত্রীকরণ ও বার্লিন থেকে ইঙ্গ-মার্কিনদের পশ্চাদপসরণ একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হোক সোভিয়েট রাশিয়া তাই চায়। এতে তাদের প্রচারের সুবিধা হবে যে, জার্মানী বিভাগের জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া দায়ী নয়—দায়ী হল বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পশ্চিম জার্মানীর ভাগ্য নির্ধারণ নিয়ে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কম বিপাকে পড়েনি। তাদের নিজেদের দলীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই এ সম্বন্ধে দেখা দিয়েছে মত-বিরোধ। একই সঙ্গে জার্মানীকে স্বাধীনতা দিতে হবে, তার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে আবার জার্মানী যাতে বিপথগামী না হয় তার জন্যে তার উপরে আন্তর্জাতিক খবরদারীও রাখতে হবে। বিশেষ করে এ সম্বন্ধে ফ্রান্সের ভীতি অত্যন্ত বেশি। জার্মানীর নিয়ন্ত্রণ-বিহীন অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন যে তার পক্ষে ভয়ের কারণ হতে পারে পূর্ব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত তার এ ভীতিকে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফরাসীদের এ ভীতি দূর করতে না পারলে জার্মানী সম্বন্ধে তাদের পক্ষে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। বর্তমানে লণ্ডনে সেই প্রয়াসই চলেছে। জার্মানীর ভাগ্য নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের মধ্যে এই যে, ঘুঁটি চালাচালি চলেছে তার শেষ পরিণতি কি হবে কে জানে।

## ভিয়েৎনামে ফরাসী কূটনীতি

গত ২৯শে মার্চ তারিখে ভিয়েৎনামে ফরাসী কূটনীতি সম্বন্ধে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছিলঃ "ইন্দোচীনের প্রতি ফরাসী সরকারী নীতিতে দৃশ্যত যে অস্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে নিহিত আছে ফরাসীদের হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে এমন একটি আপোষ চাপিয়ে দেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা। বাও দাইকে করা হবে এই নীতি পরিচালনার যন্ত্র-বিশেষ।" ভিয়েৎনামে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক কূটনীতি থেকে এই উক্তির সত্যতাই প্রমাণিত হচ্ছে। পরিপূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়োগ করে ফরাসী ইন্দোচীনকে আয়ত্তাধীনে আনতে না পেরে ফরাসীরা আজ অন্য পথে ভিয়েৎনামকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার দুঃস্বপ্ন দেখছে। তারা দেখাচ্ছে যে ভিয়েৎনামকে স্বাধীনতা দেওয়াই তাদের ইচ্ছা—কিন্তু কার্যত স্বাধীনতার নামে তারা দিতে চাইছে সীমাবদ্ধ শাসন-ক্ষমতা। তা নইলে তারা আজ ভিয়েৎনাম রিপাবলিকের হো-চি-মিন গবর্ণমেণ্টকে বাদ দিয়ে নিজেদের তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস করছে কেন? ১৯৪৬ সালের ৬ই মার্চ ভিয়েৎনাম রিপাবলিকের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীদের যে চুক্তি হয়েছিল তাতে রিপাবলিককে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থা ফরাসীদের মনঃপূত হয়নি। উপায়ান্তর না থাকাতেই তারা এ ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তদবধি ফরাসীরা এক হাতে স্বাধীনতাকামী ভিয়েৎনামীদের বিরুদ্ধে চালিয়েছে সংগ্রাম অপর হাতে তাদের সঙ্গে আপোষ করার চেষ্টা করেছে। আজ দুই বৎসরকাল জাতীয়তাবাদী ভিয়েৎনামীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়ে তারা বুঝেছে যে এ পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব।

**বিশেষ করে গত শীতকালীন ব্যয়বহুল অভিযানের বিরাট ব্যর্থতা** তাদের চোখ অনেকটা খুলে দিয়েছে। সংগ্রামরত ইন্দোচীনে আজ দুর্দশার অন্ত নেই। যুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় সেখানে জীবিকা নির্বাহের ব্যয় বেড়েছে প্রায় ২৫ গুণ। ইন্দোচীনে কোন মীমাংসা না হওয়ায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফ্রান্সেও শুরু হয়েছে। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে মার্কিন ডলারের সাহায্যে ফরাসী দেশকে পুনর্গঠিত করার যে পরিকল্পনা হচ্ছে তার বহুলাংশে ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই চলেছে আপোষ-প্রয়াস। এই আপোষ প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর। ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এই সময় একটি আপোষ প্রস্তাব এনেছিলেন ফরাসী হাইকমিশনার মঁসিয়ে বলেয়ার। কিন্তু প্রধানত দুটি কারণে প্রস্তাবটি জাতীয়তাবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। প্রথমতঃ টংকিন, আন্নাম ও কোচিন চীনকে নিয়ে অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের কথা এই প্রস্তাবের কোথাও ছিল না। দ্বিতীয়তঃ দেশরক্ষা, অর্থনীতি, বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ণয় প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় ফরাসীরা রাখতে চেয়েছিল নিজেদের হাতে। সুতরাং এ প্রস্তাব প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিন পরিচালিত জাতীয়তাবাদী ভিয়েৎনামীদের মনে কোন সাড়াই জাগাতে পারেনি। এই ব্যর্থতার ফলে ফরাসীরা স্থির করেছে যে অতঃপর হো-চি-মিন গভর্ণমেণ্টের কাছে কোন আপোষ-প্রস্তাব নিয়েই তারা যাবে না। তাই অন্যান্য দল নিয়ে তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা।

এই আপোষ-আলোচনার গোড়া থেকেই হো-চি-মিন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্নামের ভূতপূর্ব সম্রাট বাওদাইকে দাঁড় করানোর একটা চেষ্টা চলেছে। বাওদাইকে এই উদ্দেশ্যে ফরাসী দেশে আমন্ত্রণ করে নেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের একটা আপোষ-রফাও হয়েছিল বলে প্রকাশ। কিন্তু তারপর এ বিষয়ে তিনি আর কোন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। পুনরায় সমগ্র ইন্দোচীনের সম্রাটপদে বসবার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি সহসা কিছু করতে রাজী নন। তিনি এখনও সাবধানী পদক্ষেপে স্বদেশের রাজনৈতিক গতি পরিবর্তনের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের আর তর সয় নি। তারা কোচীন চীনের তাঁবেদার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল জুয়ানকে সমগ্র ইন্দোচীনের অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করে এক তাঁবেদার রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেছে। ইন্দোচীনের জনগণের উপর জেনারেল জুয়ানের আদৌ কোন রাজনৈতিক প্রভাব আছে কিনা—গভীর সন্দেহের বিষয়। তিনি বরাবরই ছিলেন ফরাসী বেতনভুক বাহিনীর অন্তর্গত। এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে দিয়েই সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীরা চাইছে ভিয়েৎনামের উপর তাদের আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখতে। তারা নাকি তাঁর অনেক দাবী-দাওয়াই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু চুক্তির সর্তাদি সুস্পষ্টভাবে জানা না থাকায় এখানে মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। তবে কলকাঠি হাতে রেখেই তারা যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে চাইছে—সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তা নইলে জাতীয়তাবাদী ভিয়েৎনামের প্রকৃত প্রতিনিধি হো চি মিনের সঙ্গেই আপোষরফা করা সম্ভব হ'ত। ফরাসীরা বর্তমানে সমগ্র ইন্দোচীনের অখণ্ডত্ব স্বীকার করেছে সত্য, কিন্তু সাইগন, হাইফং প্রভৃতি সব বড় বড় শহর ও নৌবহরের উপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্বার্থবাদী জেনারেল জুয়ান বা বাও দাই এ ব্যবস্থা মেনে নিলেও জাতীয়তাবাদী ভিয়েৎনমীদের কাছে এ ব্যবস্থার ফাঁকি চাপা থাকবে না। ইন্দোচীনে এ ধরণের তাঁবেদার নেতা সৃষ্টি করার প্রয়াস এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে কোচিন চীনের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ডাঃ গুয়েন ভ্যান্ থিন্কেও ফরাসীরা এই কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে শোচনীয় অবস্থায় আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে লিখে গিয়েছিলেনঃ "এই দুঃসাহসিক অভিযানে আপনাদের পরিচালিত করার জন্যে আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। আমাকে একটি প্রহসনের ভূমিকা গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল।" জেনারেল জুয়ানেরও অনুরূপ পরিণতি হবার সম্ভাবনা আছে। নিজেদের দেশে হিটলারের সঙ্গে সহযোগিতাকারী মার্শাল পেতাঁর দুর্দশা দেখেও ফরাসীদের জ্ঞানোদয় হয় নি। নিজেদের সাম্রাজ্যেও পেতাঁ সৃষ্টি করে তারা সমস্যার সমাধান করতে চাইছে। কিন্তু এ আশা বৃথা।

**স্মাট্সের পরাজয়**

২৬শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে ফিল্ড মার্শাল স্মাট্সের বিস্ময়কর পরাজয় ঘটেছে। নিজের নির্বাচনকেন্দ্রে একজন ন্যাশনালিস্ট প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে মাত্র ২২৪ ভোটে তিনি পরাজিত হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে এই হল তাঁর দ্বিতীয় পরাজয়। ইতিপূর্বে ১৯২৪ সালে তিনি প্রিটোরিয়া নির্বাচনকেন্দ্র থেকে প্রথম নির্বাচিত হাতে অসমর্থ হন। তদবধি তিনি স্যাণ্ডারটন নির্বাচনকেন্দ্র থেকে পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। গত ২৪ বৎসরকাল তিনি এই স্যাণ্ডারটনের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মন্ত্রী নিযুক্ত হন ১৯১০ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর পদে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন দুবার—১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। **বর্তমানে তাঁর বয়েস ৭৮ বৎসর। তাঁকে যে এভাবে পরাজিত হতে হবে, নির্বাচনের** শেষ **ফলাফল ঘোষিত হবার পূর্বে পর্যন্ত** সেকথা **কেউ কল্পনা করতে পারে নি। যাই** হোক, **ফলাফল ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনতান্ত্রিক আইনানুযায়ী স্মাট্স** আরও **তিন মাসকাল তাঁর বর্তমান** আসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি তা চান না বলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গভর্নর-জেনারেলের কাছে পদত্যাগ-পত্র পেশ করেছেন। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী হবেন বিজয়ী ন্যাসানলিস্ট দলের নেতা ডাঃ ড্যানিয়েল ম্যালান্। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির সংখ্যা শক্তি নিম্নোক্তরূপঃ—স্মাট্সের ইউনাইটেড পার্টি ৬৫, স্মাটস্-সমর্থক লেবার পার্টির সদস্য সংখ্যা ৬ জন। সুতরাং এই দুটি দলের মিলিত সদস্য সংখ্যা ৭১। অপরপক্ষে ডাঃ ম্যালানের ন্যাসানলিস্ট পার্টি দখল করেছে ৬৯টি আসন। তাঁর সমর্থক আফ্রিকানার দল পেয়েছে ৯টি আসন। অতএব এই দুটি দলের মিলিত সংখ্যা-শক্তি হল ৭৮। যে একটিমাত্র নির্বাচনকেন্দ্রের ফলাফল এখনও ঘোষিত হয় নি—সেটি নিশ্চিতরূপে দখল করবে ন্যাসনালিস্ট পার্টি। দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টের মোট ১৫০টি আসনের মধ্যে তিনটি নির্বাচনকেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আরও পরে। এই তিনটি আসন স্মাটসের দল যদি দখল করে, তবু তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে না।

এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে পুরোপুরি বর্ণবৈষম্যকে কেন্দ্র করে। অশ্বেত জাতিপুঞ্জের প্রতি স্মাট্স গভর্ণমেণ্টের নীতির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু এ বিষয়ে ডাঃ ম্যালানের ন্যাসানালিস্ট পার্টির কার্যক্রম আরও উগ্রপন্থী। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার আছে, এ কথাও তারা স্বীকার করতে চায় না। তাদের একাধিকবার এমন কথাও বলতে শোনা গেছে যে, কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়দের জাহাজে করে ভারতে ফেরৎ পাঠানো উচিত। এই দল রীতিমত প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্যাসিস্টপন্থী। যুদ্ধকালে নাৎসী জার্মানীকে ডাঃ ম্যালানের দল কিভাবে সমর্থন জানিয়েছিল, তা আমরা জানি। এবারের নির্বাচনেও তারা বিজয়ী হয়েছে কৃষ্ণাতঙ্কের ধুয়া তুলে। স্মাট্স নিজেও অবশ্য বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাসী। তবু তাঁকে কিছুটা নরমপন্থী বলা চলে। কিন্তু ডাঃ ম্যালান একেবারে চরমপন্থী। তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে দক্ষিণ আফ্রিকায় পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার আরম্ভ হবে—এ আশঙ্কা করা অন্যায় হবে না। শ্বেতাঙ্গ বনাম কৃষ্ণাঙ্গদের বিরোধও এই সময় তীব্রতম রূপ ধরবে বলে আশঙ্কা হয়। স্মাট্সের পরাজয়ের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিক্ষেত্রে যে একটা বড় ধরণের নীতিগত পরিবর্তন হয়ে গেল—একথা অনস্বীকার্য।

# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

(১৯)

দরজা খাঁ খাঁ করছে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। আসবাবপত্র সব অন্তর্ধান। কার্পেটের উপর এটাচিকেসে মাথা রেখে দোস্ত মুহম্মদ শুয়ে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, 'বোরো, গুমশো'—বেরিয়ে যা, পালা এখান থেকে।

দোস্ত মুহম্মদের রকমারি অভ্যর্থনা সম্ভাষণে ততদিনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কাছে গিয়ে বললুম, জিনিসপত্র সব কি হল? আগা আহমদ যে ভারীভারী টেবিল চেয়ার, কোচ সোফা পর্যন্ত সরাবে ততটা আঁচ করতে পারিনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বিড়বিড় করে বললেন, সব ব্যাটা চোর, সব শালা চোর, কোনো ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই, কাবুল থেকে প্যারিস পর্যন্ত।'

আমি বললুম, বড় অন্যায় কথা—চুরি করল আগা আহমদ, দোষ ছড়ালো প্যারিস পর্যন্ত।'

বললেন, 'কী মুশকিল, আগা আহমদ চুরি করলে তার পেছনে আমি রাইফেল কাঁধে করে বেরুতুম না? না বেরুলে আফ্রিদি সমাজে আমার জাত ইজ্জত থাকত? নিয়েছে ব্যাটা লাঁফো?

'সে আবার কে?'

'পর্শু এসে পৌঁচেছে, ফরাসীর অধ্যাপক। লবে দরিয়ায় বাসা বেঁধেছে—বেশ বাড়ীখানা। আফগান সরকারের যত আদিখ্যেতা আত্তি সে-সব বিদেশীদের জন্য।

আমি বললুম চোর কে, তার সাকিন ঠিকানা সব যখন জানেন তখন মাল উদ্ধার—'

বল্লেন, আইনে দেয় না—বেচারী দুঃখ করছিল কোথাও আসবাবপত্র পাচ্ছে না, আমি বল্লুম আমার বাড়ীতে বিস্তর আছে—ফরাসী জানোতো, বকুদ্য ম্যোবল, ফুল দ্য ম্যোবল, ত্য দ্য ম্যোবল, ব্যাটাকে দেখিয়েছিলুম 'বিস্তর মাল' কত বিচিত্র কায়দায় ফরাসীতে বলা যায়। শুনে ব্যাটা দুসরা আফগান লড়াইয়ের গোরা সেপাইয়ের মত কচুকাটা হয়ে শুয়ে পড়ল।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, শুয়ে পড়ল কোথায়, এসে তো দিব্যি সব কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল।

আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তওবা, তওবা, নিজে এলে আর কি সব নিয়ে যেত—দেখত না ভিটেতে কবুতর চরার মত অবস্থা হয়ে উঠেছে। আমিই সব পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বেশ করেছ, এখন মরো হিমে শুয়ে—

এক লাফ দিয়ে দোস্ত মুহম্মদ আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন, 'বলিনি বলিনি, তখনি বলবি নি, পারবি নি রে, পারবি নে—তোকে 'আপনি' বলা ছাড়তেই হবে। কিন্তু তুই ভাই রেকর্ড ব্রেক করেছিস—ঝাড়া পনরো দিন আপনি চালিয়েছিস।'

আমি বল্লুম, 'বেশ বেশ।' কিন্তু স্বেচ্ছায় যখন সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছ তখন দুনিয়া শুদ্ধ লোককে 'চোর চামার' বলে কটু কাটব্য করছিলে কেন?

কাউকে বলবি নে, শুনেই ভুলে যাবি? তবে বলি শোন। তুই যখন ঘরে ঢুকলি তখন দেখলুম তোর মুখ বড্ড ভার। হয়ত দেশের কথা ভাবছিলি, নয় কালের রাত্তিরের গানের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারিস নি—কেন যে ক্ষ্যাপারা এরকম ভুতুড়ে গান গায়? তা সে যাকগে। কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হল তুই বড্ড বেজার। তাই যা তা সব বানিয়ে, তোকে চটিয়ে দিয়ে সব কথা ভুলিয়ে দিলুম। দেখলি কায়দাখানা!

আমি বললুম খুব দেখলুম, আমাকে বেকুব বানালে। তোমাকে বেকুব বানায় আগা আহমদ, আর তুমি বেকুব বানালে আমাকে। তা নূতন কিছু নয়—আমাদের দেশে একটা দোহা আছে—

শমন দমন রাবণ আর রাবণ দমন রাম
শ্বশুর দমন শাশুড়ী আর শাশুড়ী
দমন হাম্।'

চিলে' গল্প, কাঁচা রসিকতা। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদ নবীনের মত। 'যাহা পায় তাহাই খায়।' মুখে হাসি লেগেই আছে।

আমি বল্লুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু একটা খাট তো অন্ততঃ কেন, মাটিতে শোবে নাকি?'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তবে আসল কথাটা এই বেলা শোনো; বিলিতি আসবাবপত্রে আমি কখনো আরাম বোধ করিনি—দশ বৎসর চেষ্টা করার পরও। অথচ পয়সা দিয়ে কিনেছি, ফেলতে গেলে লাগে। এতদিনে যখন সুযোগ মিলল তখন নূতন করে জঞ্জাল জুটোব কেন? এইবার আরাম করে পাঠানি কায়দায় ঘরময় মই চষে বেড়াব—খাট থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙবার আর ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'কমরত ন শিকনদ' তোমার কোমর ভেঙে দু টুকরো না হোক।'

কথা ছিল দুজনে একসঙ্গে বগদানফ সায়েবের বাড়ী যাব।

পূর্বেই বলেছি ফরাসী দূতাবাসে বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানা ছিল বিদেশী মহলের কেন্দ্রভূমি। বাগান থেকেই শব্দ শুনে তার আভাস পেলুম। ঘরে ঢুকে দেখি এক পাল সায়েব মেম।

আমাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বগদানফ সায়েব চোস্ত ফরাসী ভাষায় দুরস্ত ফরাসী কায়দায় বললেন,

'পেরমেতে মওয়া ল্য প্লেজির দ্য ভু প্রেজাঁতের—অনুমতি যদি দেন তবে আপনাদের সামনে অমুককে নিবেদন করে বিমলানন্দ উপভোগ করি।'

তারপর এক একজন করে সকলের নাম বলে যেতে লাগলেন। আমি বলি 'হাডুডু,' তাঁদের কেউ বলেন, আঁশাতে, কেউ বলেন, 'শার্মে,' কেউ বলেন 'রাভি।' অর্থাৎ আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেউ হয়েছেন enchanted, কেউ charmed, কেউ বা ravished। একেই বলে ফরাসী ভদ্রতা। এঁরা যখন গ্রেতা গার্বো বা মার্লেনে দীতারিশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি সত্যি enchanted হন তখন কি বলেন তার সন্ধান এখনো পাই নি।

মঁসিয়ো লাঁফো গল্পের ছেঁড়া সুতোর খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'তারপর বাদশা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসী শিখতে ছ মাসের বেশী সময় লাগার তো কথা নয়।' আমি বললুম 'না হুজুর অন্ততঃ দু বছর লাগার কথা।'

বগদানফ সায়েব বললেন 'করেছেন কি? বাদশাহের কোনো কথায় না বলতে আছে। দিবা দ্বিপ্রহরে, প্রখর রৌদ্রালোকে যদি হুজুর বলেন, 'পশ্য, পশ্য, নীলাম্বরের ললাটদেশে চন্দ্রমা কি প্রকারে শ্বেতচন্দন প্রলেপ করেছেন।' আপনি তখন প্রথম বলবেন, 'হুজুরের যে পূতপবিত্র পদদ্বয়

অনাদি কাল থেকে অসীম কাল পর্যন্ত মণি-মাণিক্য বিজড়িত সিংহাসনে বিরাজমান এ-গোলাম সেই পদরজের স্পর্শ লাভের আশায় কুন্নবাণী হতে প্রস্তুত।' তারপর বলবেন,

বাধা দিয়ে মাদাম লাফোঁ বললেন, 'সম্পূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণে যদি ভুলচুক হয়ে যায়? দৈর্ঘ্য তো কিছু কম নয়।'

বগদানফ সায়েব সদয় হাসি হেসে বললেন,

অল্প-স্বল্প রদবদল হলে আপত্তি নেই। 'মণিমাণিক্যের' বদলে 'হীরা জহর' বলতে পারেন, 'পদরজের' পরিবর্তে 'পদধূলি' বললেও বাধবে না।

তারপর বলবেন, 'হুজুরের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি —চন্দ্রমা সত্যই কি অপূর্ব বেশ ধারণ করেছেন এবং নক্ষত্রমণ্ডলী কতই না নয়নাভিরাম।'

ইতালির সিন্যোর দিগাদো জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি ভদ্রতা বজায় রেখে হুজুরকে সত্যি কথা জানাবার কোনো উপায় নেই? এই মনে করুন মঁসিয়ে লাফোঁ যদি সত্যি সত্যি জানাতে চান যে, ফরাসী শিখতে দু'বছর লাগে।'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে, বাদশা যখন বলবেন ছ'মাস আপনি তখন বলবেন, 'নিশ্চয়ই, হুজুর, ছ'মাসেই হয়। দুবছরে আরো ভালো হয়।' হুজুরেরও তো কাণ্ডজ্ঞান আছে। আপনার ভদ্রতা সৌজন্যের আতর তিনি শুঁকবেন, গায়ে মাখবেন, তাই বলে তো আর গিলবেন না।

মসিয়ো লাফোঁ বললেন, 'এ সব বাড়াবাড়ি।'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই; বাড়াবাড়িরই আরেক নাম Superfluity। আর পোয়েট টেগোর—আমাদের তিনি গুরুদেব—' বলেই প্রোফেসর বেনওয়া ও আমার দিকে একবার বাও করলেন—তিনি বলেন, 'আর্টের সৃষ্টি হয়েছে সুপারফ্লুয়িটি থেকে।' আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা বোঝাতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রী মশায়কে একটা চমৎকার তুলনা দিয়েছিলেন না?'

আমি বল্লুম, 'কাঠের ডাণ্ডা লাগানো টিনের কেনেস্তেরায় করে রাধু মালীর নাইবার জল আনার মধ্যে আর নন্দলাল কর্তৃক চিত্র-বিচিত্রিত মৃৎপাত্র ভরে ষোড়শী তন্বাঙ্গী সুন্দরীর জল আনার মধ্যে যে সুপারফ্লুয়িটির তফাৎ তাই আর্ট।'

বগদানফ সায়েব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'শুধু আর্ট? দর্শন, বিজ্ঞান, সব কিছু—কলচর বলতে যা কিছু বুঝি। সবই সুপার-ফ্লুয়িটি থেকে, বাড়াবাড়ি থেকে।'

অধ্যাপক ভ্যাঁসা বললেন, 'কিন্তু এই কলচার যখন চরমে পৌঁছয় তখন গুরু-চণ্ডালে এত পার্থক্য হয়ে যায় যে, বাইরের শত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন সে দেশে সব শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে স্বাধীনতা হারায়। যেমন ইরাণ।'

আমি বল্লুম, 'ভারতবর্ষ'।

পোলিশ মহিলা মাদাম ভরভাচিয়েভিচ বললেন, 'কিন্তু ইংরাজ, তারা তো সভ্য, তাদের গুরু-চণ্ডালেও তফাৎ অনেক, কিন্তু তারা তো সব সময় এক হয়ে লড়তে পারে।

বগদানফ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাদের কথা বললেন, মাদাম?'

'ইংরেজের।'

'ঐ যারা ইয়োরোপের পশ্চিমে একটা ছোট দ্বীপে থাকে?'

মজলিসে ইংরেজ কেউ ছিলেন না। সবাই ভারী খুশি। আমি মনে মনে বললুম, 'আমাদের দেশেও বলে চরুয়া।'

অধ্যাপক ভ্যাঁসা বললেন, 'বগদানফ ঠিকই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের ভেতর অনেক খানদানি বংশ আছে সত্যি, কিন্তু গুরু-চণ্ডালে যে বৈদগ্ধ্যের পার্থক্য হবে, সে কোথায়? ওদের তো থাকার মধ্যে আছে এক সাহিত্য। সংগীত নেই, চিত্রকলা নেই, ভাস্কর্য নেই, স্থপতি নেই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে পার্থক্য হবে তার অনুভূতিগত উপকরণ কোথায়? অথচ ফ্রান্সে এসব উপকরণ প্রচুর; তাই দেখুন ফরাসীরা এক হয়ে লড়তে জানে না, শান্তির সময় রাজ্য পর্যন্ত চালাতে পারে না। যে দেশে আছি তার নিন্দে করতে নেই, কিন্তু দেখুন, এক ফোঁটা দেশ অথচ স্বাধীন।'

মাদাম ভরভাচিয়েভিচ বললেন, 'এ দেশেও তো মোল্লা আছে।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিন্তু ভয় নেই মাদাম। মোল্লাদের আমি বিলক্ষণ চিনি। ওদের বেশির ভাগ যেটুকু শাস্ত্র জানে আপনাকে সেটুকু আমি তিন দিনেই শিখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু মেয়েদের মোল্লা হওয়ার রেওয়াজ নেই।'

মাদাম চটে গিয়ে বললেন, 'কেন নেই?'

দোস্ত মুহম্মদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাড়ি গজায় না বলে।'

ভ্যাঁসা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মোল্লাই হন আর যাই হন এ দেশের মেয়ে হয়ে জন্মালে যে আপনাকে বোরকার আড়ালে থাকতে হত। আমাদের ক্ষেতিটা বিবেচনা করুন।'

সবাই একবাক্যে

Ovi, Madame,
Si, Si, Madame,
Certainement Madame,

কোরাস সমাপ্ত হলে দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিন্তু পর্দা-প্রথা ভালো।'

যেন আটখানা অদৃশ্য তলোয়ার খোলার শব্দ শুনতে পেলুম; চোখ বন্ধ করে দেখি দোস্ত মুহম্মদের মুণ্ডটা গড়িয়ে গড়িয়ে আফ্রিদি মুল্লুকের দিকে চলেছে।

নাঃ! কল্পনা। শুনি দোস্ত মুহম্মদ বলছেন,

ধর্মতঃ বলুন তো মশায়রা, মাদাম ভরভাচিয়েভিচ, মাদাম লাফোঁ, সিন্যোরা দি গাদোর মত সুন্দরী সংসারে কয়টি? বেশির ভাগই তো কুচ্ছিত। পাইকারী পর্দা চালালে তাহলে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি নয় কি?

মহিলারা কথঞ্চিৎ শান্ত হলেন।

কিন্তু মাদাম ভরভাচিয়েভিচ পোলিশ,—উষ্ণ রক্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, আর পুরুষদের সবাই বুঝি খাবসুরত এ্যাডনিস? তারাই বা বোরকা পরে না কেন শুনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তাই তো পুরুষের দিকে মেয়েদের তাকানো বারন।'

মজলিসে হট্টগোল পড়ে গেল। মেয়েরা খুশি হলেন না বেজার হলেন ঠিক বোঝা গেল না। কুয়াশা কাটিয়ে সিন্যোর দি গাদো দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরীর অপ্রাচুর্য বলেই কি আপনি বিয়ে করেননি?'

দোস্ত মুহম্মদ একটুখানি হা করে বাঁ হাত দিয়ে ডান দিকের গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, তা নয়। আসল কথা হচ্ছে, কোনো একটি সুন্দরীকে বেছে নিয়ে যদি তাকে বিয়ে করি তবে তার মানে কি এই নয় যে আমার মতে দুনিয়ার আর সব মেয়ে তার তুলনায় কুচ্ছিত। একটি সুন্দরীর জন্য দুনিয়ার সব মেয়েকে এ রকম বে-ইজ্জৎ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

সবাই খুশি। আমি বিশেষ করে। পাহাড়ী আফগান বিদগ্ধ ভ্যাঁসাকে শিভালরীতে ঘায়েল করে দিল বলে।

ইরাণী রাজদূতাবাসের আগা আদিব এতক্ষণে চুপ করে বসেছিলেন, বল্লেন, 'তবেই আফগানিস্থানের হয়েছে। ইরাণী কায়দার নকল করে আফগানিস্থানেরও কপাল ভাঙবে। ইরাণ কিন্তু ইতিমধ্যে হুঁসিয়ার হয়ে গিয়েছে। শাহ বাদশাহের সঙ্গে কথা বলবার যেসব কায়দা বগদানফ সাহেব বললেন সেগুলো তিনি দশ বছর আগে ইরাণে শিখেছিলেন। এখন আর সেদিন নেই। সব রকম এটিকেটের বিরুদ্ধে সেখানে এখন জোর আন্দোলন আর ঠাট্টা-মস্করা চলছে। ঘরে ঢোকার সময় যে সামান্য ভদ্রতা একে অন্যকে দেখায় তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত এখন কবিতা লেখা হয়। শুনে শুনে একটা তো আমারি মুখস্থ হয়ে গিয়েছে; আপনারা শোনেন তো বলি।

সবাই উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন,

আগা আদিব বেশ রসিয়ে রসিয়ে আবৃত্তি করে গেলেন,

'খুদা তুমি দিলে বহুৎ জ্ঞান,
শেষ রহস্য এই বারেতে কর সমাধান।
ইরাণ দেশের লোক
কসম খেয়ে বলতে পারি নয় এরা উজবোক,
বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে সাহস আছে ঢের
সিঙ্গি লড়ে, মোকাবেলা করে ইংরেজের।
তবে কেন ঢুকতে গেলেই ঘরে
সবাই এমন ঠেলাঠেলি করে?

দোরের গোড়ায় থমকে দাঁড়ায় ভেতর পানে চায়,
আপনি চলুন', 'আপনি ঢুকুন',
দাঁড়িয়ে কিন্তু ঠায়।
হাসি-খুশি বন্ধ হঠাৎ গল্প যে যায় থেমে
ঠেলাঠেলির মধ্যিখানে উঠছে সবাই ঘেমে।
অবাক হয়ে ভাবি সবাই কেন এমন করে,
দিনা-দ্বিপ্রহরে
কি করে হয় ঘরের মাঝে ভূত
তবে কি যমদূত?
সলমনের জিন?
কিম্বা গিলটিন?
ঢুকলে পরেই কপাৎ করে কেটে দেবে গলা,
তাই দেখে কি দোরে এসে বন্ধ সবার চলা?'

( ২০ )

কাবুলের রাস্তাঘাট, বাজারহাট, উজীর-নাজির, গুরুচণ্ডালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল বটে, কিন্তু গোটা দেশের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আশা দেখলুম কম, আর নগর, জনপদ উভয় ক্ষেত্রে যে-সব অদৃশ্য শক্তি শান্তির সময় মন্দ গতিতে এবং বিদ্রোহ-বিপ্লবের সময় দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে সেগুলোর তাল ধরা বুঝলুম আরো শক্ত, প্রায় অসম্ভব।

আফগানিস্থানের মেরুদণ্ড তৈরী হয়েছে জনপদবাসী আফগান উপজাতিদের নিয়ে অথচ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা, আভ্যন্তরিক শাসন-প্রণালী, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো কেতাব লেখা হয়নি; কাবুলে এমন কোনো গুণীরও সন্ধান পাইনি যিনি সে সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করুন আর নাই করুন অন্ততঃ একটা মোটামুটি বর্ণনাও দিতে পারেন। ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কাবুলীরা প্রায়ই বলেন, 'তারপর শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করল', কিন্তু যদি তখন প্রশ্ন করেন, বিদ্রোহ করল কেন, তবে উত্তর পাবেন, মোল্লারা তাদের খ্যাপালো বলে, কিন্তু তারপরও যদি প্রশ্ন শুধান যে, উপজাতির ভিতরে এমন কোন্ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উষ্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মোল্লাদের ফুলকি দেশময় আগুন ধরাতে পারল তা'হলে আর কোনো উত্তর পাবেন না। মাত্র একজন লোক—তিনিও ভারতীয়—আমাকে বলেছিলেন যে, মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, বিদেশের পণ্য-বাহিনীকে লুট-তরাজ না করলে গরীব আফগানের চলে না বলে সভ্যদেশের ট্রেড্-সাইক্লের মত তাদেরও বিপ্লব আর শান্তির চড়াই ওতরাই নিয়ে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়।

গ্রামের অবস্থা যেটুকু শুনতে পেলুম তা থেকে মনে হল শান্তির সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে শহরবাসীর মাত্র এইটুকু যোগাযোগ যে, গ্রামের লোক শহরে এসে তাদের ফসল তরকারি দুম্বা ভেড়া বিক্রয় করে সস্তা দরে, আর সামান্য যে দু'একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য না কিনলেই নয়, তাই কেনে আক্রা দরে। সভ্যদেশের শহরবাসীরা খাদবাকির বদলে গ্রামের জন্য ইস্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেয়। কাবুলের গ্রামে সরকারী কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বললেই হয়। কতকগুলো ছেলে সকালবেলা গাঁয়ের মসজিদে জড়ো হয়ে গলা ফাটিয়ে আমপারা (কোরানের শেষ অধ্যায়) মুখস্থ করে—এই হল বিদ্যাচর্চা। তাদের তদারক করনেওয়ালা মোল্লাই গাঁয়ের ডাক্তার। অসুখ-বিসুখে তাবিজ-কবচ তিনিই লিখে দেন। ব্যামো শক্ত হলে পানি-পড়ার বন্দোবস্ত আর মরে গেলে তিনিই তাকে ধুইয়ে নাইয়ে গোর দেন। মোল্লাকে পোষে গাঁয়ের লোক।

খাজনা দেবার বদলে আফগান গ্রাম যখন কিছুই ফেরত পায় না তখন যে সে বড় অনিচ্ছায় সরকারকে টাকা দেয় এ কথাটা সকলেই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

দেশময় অশান্তি হলে আফগান গাঁয়ের সিকি পয়সার ক্ষতি হয় না—বরঞ্চ তার লাভ। রাইফেল কাঁধে করে জোয়ানরা লুটে বেরোয়—'বিধিদত্ত' আফগানিস্থানের অশান্তিও বিধিদত্ত, সেই হিড়িকে দু'পয়সা কামাতে আপত্তি কি? ফ্রান্স-জার্মানীতে লড়াই লাগলে যে রকম জার্মানরা মার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, 'নাখ পারিজ, নাখ পারিজ', প্যারিস চলো, প্যারিস চলো, আফগানরা তেমনি বলে, 'বিআ, ব কাবুল, বুরুত্তম ব কাবুল', কাবুল চলো, কাবুল চলো।

শহরে বসে আছেন বাদশা। তাঁর প্রধান কর্ম আফগান উপজাতির লুণ্ঠন লিপ্সাকে দমন করে রাখা। তার জন্য সৈন্য দরকার, সৈন্যকে মাইনে দিতে হয়, গোলাগুলির খর্চা তো আছেই। শহরের লোক তার খানিকটা জোগায় বটে কিন্তু মোটা টাকাটা আসে গাঁ থেকে।

তাই এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হয়। খাজনা তোলার জন্য সেপাই দরকার, সেপাই পোষার জন্য খাজনার দরকার। এ-চক্র যিনি ভেদ করতে পারেন তিনিই যোগীবর, তিনিই আফগানিস্থানের বাদশা। তিনি মহাপুরুষ সন্দেহ নেই, যে আফগানের দাঁতের গোঁড়া ভাঙবার জন্য তিনি শিলনোড়া কিনতে চান সেই আফগানের কাছ থেকেই তিনি সে পয়সা আদায় করে নেন।

ঘানি থেকে যে তেল বেরোয় ঘানি সচল রাখার জন্য সেটুকু ঐ ঘানিতেই ঢেলে দিতে হয়।

সামান্য যেটুকু বাঁচে তাই দিয়ে কাবুল শহরের জলুস।

কিন্তু সে এতই কম যে, তা দিয়ে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তোলা যায় না, শিক্ষাদীক্ষার জন্য ব্যাপক কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায় না। কাজেই কাবুলে শিক্ষিত সম্প্রদায় নেই বল্লেও চলে।

কিন্তু তাই বলে কাবুল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বর্বর বলা ভুল। কাবুলের মোল্লা সম্প্রদায় ভারতবর্ষ-আফগানিস্থানের যোগা-যোগের ভগ্নাবশেষ।

কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

কাবুলের দরবারি ভাষা ফার্সী; কাজেই সাধারণ বিদেশীর মনে এই বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক যে, কাবুলের কৃষ্টিগত সম্পর্ক ইরানের সঙ্গে। কিন্তু ইরান শীয়া মতবাদের অনুরাগী হয়ে পড়ায় সুন্নি আফগানিস্থান শিক্ষা দীক্ষা পাওয়ার জন্য ইরান যাওয়া বন্ধ করে দিল। অথচ দেশ গরীব; আপন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মত সামর্থ্যও তার কোন কালে ছিল না।

এদিকে পাঠান, বিশেষ করে মোগল যুগে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দিল্লী লাহোরে ইসলাম ধর্মের সুন্নি শাখার নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। শিক্ষাদানের মাধ্যমিক ফার্সী; কাজেই দলে দলে কাবুল কান্দাহারের ধর্মজ্ঞানপিপাসু ছাত্র ভারতবর্ষে এসে এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, পূর্ববর্তী যুগে কাবুলীরা বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করার জন্য তক্ষশিলায় আসত—আফগানিস্থানে যে-সব প্রাচীন প্রাচীর চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অজন্তার ঐতিহ্যে আঁকা, চীন বা ইরানের প্রভাব নগণ্য।

এই ঐতিহ্য এখনো লোপ পায়নি। কাবুলের উচ্চশিক্ষিত মৌলবীমাত্রই ভারতে শিক্ষিত ও যদিও ছাত্রাবস্থায় ফার্সীর মাধ্যমিকে এদেশে জ্ঞানচর্চা করে গিয়েছেন, তবু সঙ্গে সঙ্গে দেশজ উর্দু ভাষাও শিখে নিয়েছেন। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের উপর এঁদের প্রভাব অসীম এবং গ্রামের মোল্লাই আফগান জাতির দৈনন্দিন জীবনের চক্রবর্তী।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জগৎ ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ। এঁরা নাকি সর্বপ্রকার প্রগতির শত্রু, এঁদের দৃষ্টি নাকি সব সময় অতীতের দিকে ফেরানো এবং সে অতীতও নাকি মানুষের সুখদুঃখে মেশানো, পতন অভ্যুদয়ে গড়া অতীত নয়, সে অতীত নাকি আকাশকুসুমজাত সত্যযুগের শাস্ত্রীয় অচলায়তনের অন্ধপ্রাচীর নিরুদ্ধ।

তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের পুস্তক লিখতে বসিনি, কাজেই পৃথিবীর সর্বধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়। কিন্তু আফগান মোল্লার একটি সাফাই না গাইলে অন্যায় করা হবে।

সে-সাফাই তুলনা দিয়ে পেশ করলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কর্ণধার ছিলেন মৌলবী মোল্লা, শাস্ত্রী ভটচায। কিন্তু এঁরা দেশের লোককে উত্তেজিত করে ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেন নি অথচ আফগান মোল্লার কট্টর দুষমণও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে,

ইংরেজকে তিন তিনবার আফগানিস্থান থেকে কান ধরে বের করবার জন্য প্রধানতঃ দায়ী আফগান মোল্লা।

আহা, আহা! এর পর আর কি বলা যেতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না। এর পর আর আফগান মোল্লার কোন দোষ ক্ষমা না করে থাকা যায়? কমজোর কলম আফগান মোল্লার তারীফ গাইবার মত ভাষা খ'ুজে পায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছেন এমন লোক আফগানিস্থানে দু' ডজন হবেন কিনা সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি থাকে তখন এ'দের দেখে মনে হয়, এ'রাই বুঝি সমস্ত দেশটা চালাচ্ছেন; অশান্তি দেখা গেলেই এ'দের আর খ'ুজে পাওয়া যায় না। এ'দের সংগেও আলাপচারী হল; দেখলুম, পারিসে তিনি বৎসর কাটিয়ে এসে মার্সেল প্রুস্ত, আঁদ্রে জিদের বই পড়েনি, বার্লিন ফের্তা ড্যুরারের নাম শোনেনি, রিলকের কবিতা পড়েনি। মিল্টন বাল্মীকি মিলিয়ে মধুসূদন যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তারি মত গ্যেটে ফেরদৌসী মিলিয়ে কাব্য রচনা করার মত লোক কাবুলে জন্মাতে এখনো ঢের বাকি।

তাহলে দাঁড়ালো এইঃ বিদেশফের্তাদের জ্ঞান পল্লবগ্রাহী, এবং দেশের নাড়ীর সংগে এদের যোগ নেই। মোল্লাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত,—যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের সাতখুন মাফ করলেও প্রশ্ন থেকে যায়, ইংরেজ রুশকে ঠেকিয়ে রাখাই কি আফগানিস্থানের চরম মোক্ষ? দেশের ধনদৌলত বাড়িয়ে শিক্ষা সভ্যতার জন্য যে প্রচেষ্টা, যে আন্দোলনের প্রয়োজন মৌলভী সম্প্রদায় কি কোনো দিন তার অনুপ্রেরণা জোগাতে পারবেন? মনে ত হয় না। তবে কি বাধা দেবেন? বলা যায় না।

পৃথিবীর সব জাত বিশ্বাস করে যে, তার মত ভুবনবরেণ্য জাত আর দুটো নেই; গরীব জাতের তার উপর আরেকটা বিশ্বাস যে, তার দেশের মাটি খ'ুড়লে সোনা রুপা তেল যা বেরুবে তার জোরে সে বাকি দুনিয়া, ইস্তেক চন্দ্রসূর্য কিনে ফেলতে পারবে। নিরপেক্ষ বিচারে জোর করে কিছু বলা শক্ত কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কিছু না বেরোয় তবে আফগানিস্থানের পক্ষে ধনী হয়ে শিক্ষা দীক্ষা বিস্তার করার অন্য কোনো সামর্থ্য নেই।

সত্যযুগে মহাপুরুষেরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, কলিযুগে গণৎকাররা করে। পাকাপাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস আমার নেই তবু অনুমান করি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে শক্তিশালী হওয়ামাত্র আবার আফগানিস্থান ভারতবর্ষে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাবুল কান্দাহারের বিদ্যার্থীরা আবার লাহোর দিল্লীতে পড়াশুনা করতে আসবে।

প্রমাণ? প্রমাণ আর কি? প্যারিস-বাসিন্দা ইংরিজি বলে না, ভিয়েনার লোক ফরাসী বলে না, কিন্তু বুডাপেস্টের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনো জর্মন বলেন, জ্ঞানান্বেষণে এখনো ভিয়েনা যান—ভিন্ন রাষ্ট্র নির্মিত হলেই তো আর ঐতিহ্য-কৃষ্টির যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলা যায় না। কাবুলের মৌলভী সম্প্রদায় এখনো উর্দু বলেন; ভারতবর্ষ বর্জন করে এ'দের উপায় নেই। ঝগড়া যদি করেন তবে সে তিনদিনের তরে।

উর্দু যে এদেশে একদিন কতটা ছড়িয়ে পড়েছিলো তার প্রমাণ পেলুম হাতে নাতে।

( ২১ )

আগেই বলেছি, আমার বাসা ছিল কাবুল থেকে তিন মাইল দূরে—সেখান থেকে আরো মাইল দুই দূরে নূতন শহরের পত্তন হচ্ছিল। সেখানে যাবার চওড়া রাস্তা বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। অনেক পয়সা খরচা করে অতি যত্নে তৈরী রাস্তা। দু'দিকে সারি বাঁধা সাইপ্রেস গাছ, স্বচ্ছ জলের নালা, পায়ে চলার আলাদা পথ, ঘোড়সওয়ারদের জন্যও পৃথক্ বন্দোবস্ত।

এ রাস্তা কাবুলীদের বুলভার। বিকেল হতে না হতেই মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, বাইসেকল, ঘোড়া চড়ে বিস্তর লোক এ রাস্তা ধরে নূতন শহরে হাওয়া খেতে যায়। হে'টে বেড়ানো কাবুলীরা পছন্দ করে না। প্রথম বিদেশী ডাক্তার যখন এক কাবুলী রোগীকে হজমের জন্য বেড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন তখন কাবুলী নাকি প্রশ্ন করেছিল যে, পায়ের পেশীকে হায়রাণ করে পেটের অন্ন হজম হবে কি করে?

বিকেল বেলা কাবুলে না গেলে আমি সাইপ্রেস সারির গা ঘে'ষে ঘে'ষে পায়চারী করতুম। এসব জায়গা সন্ধ্যার পর নিরাপদ নয় বলে রাস্তার চলাচল তখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

এক সন্ধ্যায় যখন বাড়ী ফিরছি তখন একখানা দামী মোটর ঠিক আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। স্টিয়ারিঙে এক বিরাট বপু কাবুলী ভদ্রলোক, তাঁর পাশে মেমসায়েবের পোষাকে এক ভদ্রমহিলা—হ্যাটের সামনে ঝুলানো পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেল তার থেকে অনুমান করলুম, ভদ্র-মহিলা সাধারণ সুন্দরী নন।

নমস্কার অভিবাদন কিছু না, ভদ্রলোক সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফারসী বলতে পারেন?'

আমি বল্লুম, 'অল্প স্বল্প'।

'দেশ কোথায়?'

'হিন্দুস্থান।'

তখন ফার্সী ছেড়ে ভদ্রলোক ভুল উর্দুতে, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করলেন,

'প্রায়ই আপনাকে অবেলায় এখানে দেখতে পাই। আপনি বিদেশী বলে হয়ত জানেন না যে, এ জায়গায় সন্ধ্যার পর চলাফেরা করাতে বিপদ আছে।'

আমি বললুম, 'আমার বাসা কাছেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি করে হয়? এখানে তো অজ পাড়া গাঁ—চাষাভুষোরা থাকে।'

আমি বল্লুম, 'বাদশা এখানে কৃষি বিভাগ খুলেছেন—আমরা জনাতিনেক বিদেশী এর সংগে এখানেই থাকি।'

আমার কথা ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে ফার্সীতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি হাঁ, না, কিছুই বলছিলেন না।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাবুল শহরে দোস্ত-আশনা নেই? একা একা বেড়ানোতে দিল হায়রাণ হয় না? আমার বিবি বলছিলেন, 'বাচ্চা গম মী খুরদ—ছেলেটার মনে সুখ নেই।' তাইতে আপনার সংগে আলাপ করলুম।

বুঝলুম, ভদ্রমহিলার সৌন্দর্য মাতৃত্বের সৌন্দর্য। নিচু হয়ে আদাব তসলিমাত জানালুম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেনিস খেলতে পারেন?'

'হাঁ।'

'তবে কাবুল এলেই আমার সংগে টেনিস খেলে যাবেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক ধন্যবাদ—কিন্তু আপনার কোর্ট কোথায়, আপনার পরিচয়ও তো পেলুম না।'

ভদ্রলোক প্রথম একটু অবাক হলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি? ওঃ আমি? আমি মুইন-উস-সুলতানে। আমার টেনিস কোর্ট ফরেন আফিসের কাছে। কাল আসবেন।' বলে আমাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেবার ফুর্সৎ না দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি মোটরের প্রায় বিশ গজ পেছনে দাঁড়িয়ে আমার ভৃত্য আব্দুর রহমান এরোপ্লেনের প্রপেলারের বেগে দু' হাত নেড়ে আমাকে কি বোঝাবার চেষ্টা করছে। মোটর চলে যেতেই এঞ্জিনের মত ছুটে এসে বলল,

'মুইন-উস-সুলতানে, মুইন-উস-সুলতানে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'লোকটি কে বটেন?'

আব্দুর রহমান উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হয় আর কি। আমি যতই জিজ্ঞাসা করি মুইন-উস-সুলতানে কে সে ততই মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধু বলে, মুইন-উস-সুলতানে, মুইন-উস-সুলতানে। শেষটায় নৈরাশ্য, অনুযোগ, ভর্ৎসনা মিশিয়ে বলল,

'চেনেন না, বরাদরে-আলা-হজরত, বাদশার ভাই, বড় ভাই, আপনি করেছেন কি, রাজবাড়ীর সক্কলের হাতে চুমো খেতে হয়।'

আমি বললুম, 'রাজবাড়ীতে লোক সবশুদ্ধ

জন না জেনে তো আর হুঁকো খেতে আরম্ভ করতে পারিনে। সকলের পোঁছাবার আগে আমার ঠোঁট খয়ে যাবে না তো?

আব্দুর রহমান শুধু বলে, 'ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, করেছেন কি, করেছেন কি?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা উনি যদি রাজার বড় ভাই-ই হবেন তবে উনি রাজা হলেন না কেন?'

আব্দুর রহমান প্রথম মুখ বন্ধ করে তার উপর হাত রাখল তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি গরীব তার কি জানি; কিন্তু এসব কথা শুধোতে নেই।'

সে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আব্দুর রহমান যখন ঘরের এক কোণে বাদামের খোসা ছাড়াতে বসল তখন তার মুখে ঐ এক মুইন-উস-সুলতানের কথা ছাড়া অন্য কিছু নেই। দু'তিনবার ধমক দিয়ে হার মানলুম। বুঝলুম, সরল আব্দুর রহমান মনে করেছে, আফগানিস্থান যখন 'কাকামামাশালার' দেশ, অর্থাৎ বড়লোকের নেকনজর পেলে সব কিছু হাসিল হয়ে যায় তখন আমি রাতারাতি উজীর নাজীর কেউ কেটা কিছু না কিছু একটা হয়ে যাবই যাব।

ততক্ষণে অভিধান খুলে দেখে নিয়েছি মুইন-উস-সুলতানে সমাসের অর্থ 'যুবরাজ'।

যুবরাজ রাজা হলেন না, হলেন ছোট ভাই। সমস্যাটার সমাধান করতে হয়। (ক্রমশ)

মানবজাতির আদিম ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহাকে আমরা 'প্রতীক' বা 'সংজ্ঞা' বলিয়া উল্লেখ করি তাহা অতি আদিম মানবজাতির ভিতরেই নানাভাবে প্রকাশের দিকে গতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে যাহা প্রতীকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে ঠিক প্রতীক বলা চলে না।

প্রতীকের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, সেই সব লক্ষণের ভিতর কয়েকটি প্রধান লক্ষণ এইরূপঃ—

১। মানুষের অবচেতন মন হইতে কতকগুলি ভাব, যাহা কথায় ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না তাহাই প্রতীকরূপে মূর্তি ধারণ করে।

২। এই সকল প্রতীক প্রায়শ একজাতীয় বিভিন্ন ভাবসমষ্টির একটি মূর্ত প্রকাশ। বহু জটিল ভাব ও প্রেরণা এক সঙ্গে একই প্রতীকে গ্রন্থীবদ্ধভাবে প্রকাশ পায়।

৩। প্রতীক সাধারণত উচ্চ ভাবের প্রেরণাদায়ক, এবং এই প্রেরণা ভাবকে কর্মের পথে গতিলাভের এমন এক প্রবল শক্তি দান করিতে সমর্থ হয় যাহা দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়, এবং সামান্যের ভিতরে অসামান্যের আবির্ভাব দেখা যায়।

৪। প্রতীকের মধ্য দিয়া ভাব ও ভাবময় প্রেরণা জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে। ভাবই কর্মের জীবনস্বরূপ, কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত কর্ম কখনও প্রাণবান কর্ম হয় না। কিন্তু ভাবমাত্রই যে মহান্ কর্মে আত্মোৎসর্গে প্রেরণা দান ও শক্তিবিধান করিতে পারে, তাহা নয়। সেই ভাবই মানুষকে উচ্চ কর্মে প্রেরণা দিতে পারে, যে ভাব জীবন্ত অর্থাৎ যে ভাবের সহিত মানবমনের অনুভূতি সমতানে মিশিয়া যায় এবং সেই ভাবই ভাবুকের কর্মসাধনের মধ্যে অদম্য শক্তি সঞ্চার করিতে পারে যাহা মহান ভাব। "মহান ভাব" বলিতে ইহাই বুঝায় যে, যে ভাব কোন ব্যক্তিগত স্বার্থকামনা এমন কি মুক্তি কামনার দ্বারাও শৃঙ্খলিত নয়। যে ভাবসমষ্টির কল্যাণের জন্য নিজের ব্যক্তিগত সকল স্বার্থ, সকল সম্মান এমন কি সুখদুঃখের অনুভূতি পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে অথবা একেবারে সে সমুদয় গণনাতেই আনে না। বস্তুত ভাবুককে ভাবের সহিত এক করিয়া লইতে কেবল মহান ভাবই শক্তিধারণ করে।

যখন এরূপ ঘটে (অর্থাৎ ভাবুক যখন ভাবের সহিত এক হইয়া যায়) তখন ভাব আর কল্পনা বা ধারণা মাত্র থাকে না, তখন তাহা একটি জীবন্ত শক্তিরূপে মূর্তিপরিগ্রহ করে। তখন তাহার সঞ্জীবনীয় ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে সংক্রামিত বা অনুপ্রাণিত হয় এবং ব্যক্তির ও সমগ্র জাতির মগ্ন চৈতন্যে সেই নবজীবন উদ্বোধক মহাশক্তির মূর্ত প্রকাশ স্বরূপ এমন কোন একটি বস্তুর আবির্ভাব হয়, সাধারণ দৃষ্টিতে যাহার কোন মূল্য না থাকিলেও তাহাই ব্যক্তিকে ও জাতিকে এক অভিনব বিকাশের পথে লইয়া চলে। এইরূপেই প্রতীক গঠিত হয়।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া প্রতীকের ভিতর যে লক্ষণগুলি দেখা যাইতেছে তাহা এইরূপঃ—

অবচেতন মনের ভিতর দিয়া প্রতীকের ক্রিয়া হয় সেইজন্য ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীকের তাৎপর্য বুঝানো যায় না।

প্রতীক সমষ্টির সহিত যুক্ততার যেন এক আকর্ষণী স্বরূপ।

প্রতীক ভাবকে কর্মের ভিতর গতিদান করে।

প্রতীক মনের পরিবর্তন সাধন করে।

প্রতীক ত্যাগের পথের প্রেরণাদায়ক। ধর্মভাব ও জাতীয়তা এই উভয় যে বস্তুত একই জিনিস প্রতীক হইতেই অনেক সময় তাহা আমরা একান্তভাবে অনুভব করি।

মানুষের অবচেতন মন হইতেই প্রতীকের উৎপত্তি সুতরাং নীচ ভাবের প্রতীকও অবশ্য আছে, কিন্তু প্রতীকের যেটি বিশেষ লক্ষণ তাহা তাহাতে লক্ষিত হয় না, সেরূপ প্রতীকের ব্যক্তিত্বের গন্ডির ঊর্ধ্বে উঠিবার শক্তি থাকে না। যাহা ব্যক্তিকে সমষ্টির সহিত একাত্মিকাবোধে বিভাবিত করিতে না পারে তাহাকে যথার্থ 'প্রতীক' বলা চলে না।

পৃথিবীর সকল দেশেই দেশাত্মিকাবোধের প্রতীকস্বরূপ জাতীয় পতাকার বিষয় এখানে আমরা স্মরণ করিতে পারি। এই পতাকা জিনিসটি একটি কাষ্ঠদণ্ডে সন্নিবদ্ধ বস্ত্রখণ্ড মাত্র। যুদ্ধের জন্য যে সকল অস্ত্র ও যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে পতাকা সেরূপে কোন কার্যকরী যন্ত্র বা অস্ত্র নয়। অথচ দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে,—জাতির বা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের পথে প্রেরণা দান করিতে এই কাষ্ঠদণ্ড-সংযুক্ত সামান্য বস্ত্রখণ্ডের কি অপরিসীম প্রভাব তাহা দেশভক্ত মাত্রেই মনে প্রাণে অনুভব করেন। "জাতীয় পতাকা" জাতির সম্মানের প্রতীকস্বরূপ। "পতাকা যেন অবনমিত না হয়" এই কথাটির মধ্যে এক গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে। বহু দেশভক্ত বীর পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য কিভাবে প্রাণ দিয়াছেন তাহার অনেক কাহিনী আমরা পাঠ করিয়াছি। দেশরক্ষার জন্য জীবন পণে যাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই সকল বীর সৈনিক নিজের দেশের পতাকা সগৌরবে উন্নত রহিয়াছে দেখিয়া যে উৎসাহ, শক্তি ও প্রেরণালাভ করিয়া থাকেন তাহার নিকট অস্ত্রবলের শক্তিও তুচ্ছ হইয়া যায়।

জাতীয় সঙ্গীতকেও আমরা ধ্বনিময় প্রতীক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। ধ্বনির ভিতর দিয়া যেন এক অপূর্ব অনুভূতি প্রাণের গভীরতম প্রদেশে আলোড়ন তুলিতেছে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে ইহা কি আমরা অনুভব করি নাই? কেবল ভারতবাসীই নয়, কেবল বাঙলাভাষাভাষীই নয় যখন আমরা ভিন্ন দেশ-

বাসী ও ভিন্ন ভাষাভাষীর কণ্ঠেও এই সঙ্গীত উচ্চারিত হইতে শুনি তখন বুঝিতে পারি—বঙ্কিমচন্দ্রের এই অপূর্ব মাতৃবন্দনায় কি অপরিমেয় শক্তি নিহিত আছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশ নিজ নিজ ভাষায় তন্ময়ভাবে এই মাতৃবন্দনা গাহিয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষ যেন এই মহাসঙ্গীতে একপ্রাণত্ব লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন যে, চীন-দেশের দেশপ্রেমিক যুবকের কণ্ঠে তিনি এই সঙ্গীত শুনিয়াছেন। কোথায় চীন ও কোথায় বাঙলা দেশ? ভাষার ব্যবধানও মাতৃবন্দনার মর্মার্থ অনুভূতিতে বাধা দিতে পারে নাই। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যেখানে যখন এই মহা-সঙ্গীত গীত হইয়াছে ভাষার ভিন্নতার জন্য কোনও দেশপ্রেমিকের কি ইহার অর্থ অনুভবের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে? যদি আমরা এখন বিচার করিতে বসি, "নবনী" শব্দের কি অর্থ, "মন্দির" বলিতে পৌত্তলিকতা বুঝায় কিনা, "দশপ্রহরণধারিণী" বলিতে গেলে অহিংসা-বাদ রক্ষা পায় কিনা তবে তাহার অপেক্ষা আর অধিক বাতুলতা কি আছে? "বন্দে মাতরম্" এই শব্দটিই সমস্ত সঙ্গীতের ব্যাখ্যাস্বরূপ, ইহা কেবল ধ্বনিময় নয়, একটি চিত্রময় প্রতীক, যে চিত্র প্রত্যেক মাতৃভূমি প্রেমিকের হৃদয়ে অনুভূতির তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া দেয় এমন এক মাতৃমূর্তি, যে জননীর নিকট জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বমাত্রও থাকিতে পারে না।

"ভাইভা লা রিপাব্লিক" "ওয়া গুরুজী কী ফতে" প্রভৃতিকেও ধ্বনিময় প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দেশবাসীকে একটি 'প্রতীক' দান করিয়া গিয়াছেন সেটি 'চরখা'। 'চরখা'র ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, সুতরাং 'চরখা' নামক সূত্র-উৎপাদন যন্ত্রটি মহাত্মা গান্ধীর উদ্ভাবিত বলা যায় না। কিন্তু মহাত্মা কেবল প্রয়োজন সাধনের উপকরণ হিসাবেই ইহাকে গ্রহণ করেন নাই বা দেশবাসীকে দান করেন নাই। এই একই চরখার ভিতর মহাত্মার অবচেতন মনের বহু সমধর্মাবলম্বী ভাবসমূহ একই আধারে চরখার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, প্রতীকরূপে। দেশের জন্য আত্মত্যাগ, বিলাসিতা বর্জন সর্বমানবের ভিতর ভ্রাতৃভাব ও একপ্রাণতা, একই লক্ষ্যে তন্ময়তা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও অভ্যাসযোগ, চিত্তের দৃঢ়তা ও ভয়-রাহিত্য এবং তাহার সহিত সরলতা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের স্পৃহা প্রভৃতি বহু পরস্পরাশ্রয়ী ভাব যেন এক জটিল গ্রন্থিতে সংবদ্ধ হইয়া চরখারূপে মূর্ত হইয়াছে।

এ পর্যন্ত দেশাত্মবোধের দিক দিয়াই আমরা প্রতীকের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আর এক দিক দিয়াও 'প্রতীক' সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। ধর্মের দিক দিয়া সাধনার ব্যাপারেও 'প্রতীকাশ্রয়' দেখা যায়। 'মন্দির' 'মঠ' 'মসজিদ' বা 'গির্জা' প্রভৃতিকে এক হিসাবে প্রতীক বলা চলে। মূর্তি গঠন করিয়া ভগবানের উপাসনাকেও 'প্রতীকোপাসনা' বলা হয়। কিন্তু 'ধর্ম' জিনিসটা যে কি ঠিক ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইতিহাসে আমরা দেখি, ধর্মের নাম লইয়া মানুষ মানুষের উপর যেরূপ অতি নৃশংস আচরণ করিয়াছে সহজ বুদ্ধিতে কখনই সেরূপ পারিত না। প্রচলিত ধর্মমত-বিরুদ্ধ নূতন মত প্রচারের অপরাধে যীশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে আবার তাঁহারই ভক্ত বলিয়া যাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে পরিচয় দান করেন তাঁহারাই "ধর্মদ্রোহীর বিচারালয়" নামে এক হত্যাশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং বহু নরনারীকে অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণের পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ধর্মের নাম লইয়া যেরূপ ভেদবুদ্ধির প্রচার হইয়াছে, মানুষে মানুষে যেরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করা হইয়াছে অপর কিছুতেই তাহা হয় নাই ও হইতে পারেও না। কেননা, অন্যায় কার্যে আত্মসমর্পণের পক্ষে ধর্মের সংস্কার যে অতি প্রবল শক্তিশালী ইহাতে সন্দেহ নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন ধর্মই, অন্তত সভ্যসমাজে প্রচলিত কোন ধর্মই এই সকল অন্যায় আচরণ সমর্থন করে না।

হিন্দুধর্মের ভিতর সার কথা এই যে, জীবমাত্রের ভিতরেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান রহিয়াছে। গীতায় আমরা পাই যে, সমষ্টির সহিত যুক্ততা-বোধই সাধনার সার কথা। দেশাত্মবোধই প্রকৃতপক্ষে সেই যুক্ততাবোধ, যাহার জন্য সকল ত্যাগই মানুষ হাসিমুখে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

খৃষ্টান ধর্মের প্রতীক ক্রুশকাষ্ঠ. এই ক্রুশ-কাষ্ঠের ভিতর সত্যের পথে চলিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্পের ইঙ্গিত রহিয়াছে, যত কিছু দুঃখ কষ্ট আসুক না, বীরের মত তাহা বরণ করিয়া লইবার দুর্জয় সাহসের ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং ইঙ্গিত রহিয়াছে প্রেমের পথে সকল মানবের সহিত ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি লাভ করিবার।

তন্ত্রশাস্ত্র অনেক মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন। শ্বেতবসনা, শ্বেতপুষ্পাভরণা, তুষারধবলা জ্ঞানের প্রতীকস্বরূপা দেবী সরস্বতী তন্ত্রেরই কল্পনা। দেব দেব মহেশ্বর যিনি একাধারে শিব ও মৃত্যুর দেবতা, বিশ্বের অমঙ্গলরূপ হলাহল যিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, যিনি সকল দেবের অধিশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব অথচ শ্মশানবাসী ভিক্ষুক, যাঁহার মস্তকে জীবনদায়িনী সুরধুনী এবং ভীষণ বিষধর ভুজঙ্গ একত্রে বাস করিতেছে সেই পরম যোগীর রূপও তন্ত্রের কল্পনা। ইহাও ধর্মসাধনার একটি প্রতীক। এইরূপ তন্ত্রকল্পিত নানা মূর্তি, সংহাররূপা কালিকা ও জননীরূপা জগদ্ধাত্রী সমস্তই একের বহুরূপ এবং বহু-রূপের প্রতীক। এই সকল প্রতীকের ভিতর যে গূঢ় অতি গভীর অর্থসমূহ নিহিত রহিয়াছে আমরা তাহা না জানিয়াও এইটুকু অনুভব করি যে, এই দৃশ্যত জীবন ও মৃত্যুর ভিতর সমষ্টিত্ববোধই প্রকৃত ধর্মবোধ, এবং দেশাত্মবোধের সহিতও ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

গীতায় আমরা "যজ্ঞ" শব্দের যে উল্লেখ দেখিতে পাই এই "যজ্ঞ" এবং 'আহুতি দান', এইগুলিও প্রতীকস্বরূপ। গীতায় যেমন বলা হইয়াছে, "যজ্ঞের জন্যই কর্ম কর, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মমাত্র মানুষের বন্ধনস্বরূপ।" সেই সঙ্গে আবার স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন, "আমার জন্য কর্ম কর, ব্যক্তিগত পাপ পুণ্যের কোন বিচারের প্রয়োজন নাই।" এই উভয় উক্তির একই অর্থ।

প্রতীক সম্বন্ধে ব্যাখ্যার দ্বারা তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ সম্ভব নয় অথচ আবার অনুভূতির দ্বারা তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অন্তরের সহিত এক করিয়া মিলাইয়া লইতেও পারা যায়। এবং সেরূপ তাৎপর্যগ্রাহীকেই সাধারণ মানুষ পূজা করে মহাপুরুষ জ্ঞানে, অথবা তাঁহাকে বুদ্ধিহীন পাগল বলিয়া উপেক্ষা করে।
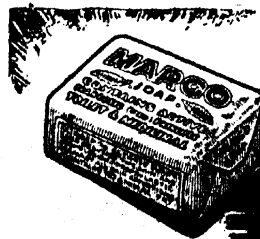
# বালক রাজার কবর

## শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন

পঁচিশ বৎসর আগে নীল নদের উপত্যকায় উত্তপ্ত সোনালী বালির রাজ্যে পুরাতত্ত্বিদ্‌গণ প্রাচীন মিশরের বালক রাজা টুটানখামেনের কবর আবিষ্কার করেন। লোকালয় থেকে বহু দূরে নিভৃতে বিস্তীর্ণ মরুরাজ্যের একপ্রান্তে অবস্থিত এই কবরের আবিষ্কার সমস্ত পৃথিবীতে আনে চাঞ্চল্য, কৌতূহলী হয়ে ওঠে জনগণ। তিন হাজার বছরের পুরাতন টুটানখামেনের এই কবর মিশরের প্রাচীন সভ্যতার অতুলনীয় ঐশ্বর্য আর তার বিরাট ঐতিহ্যের একটা আভাস দিল।

প্রাচীন সভ্যতার অপূর্ব নিদর্শন মিশরের ভাণ্ডারে যে পরিমাণে সঞ্চিত আছে তেমন আর কারও নেই; না চীনের, না ভারতের, না মধ্য-প্রাচ্যের। নীল নদের তীরে নলখাগড়ার বনের পাশে নেপোলিয়ানের একজন সৈনিক কুড়িয়ে পেল খোদাই করা পাথরের একটি টুকরো, যা নাকি প্রাচীন মিশরের সভ্যতার নিদর্শন। এই খোদাই করা ছোট পাথরের টুকরোটি তার ইতিহাস জানবার জন্য পণ্ডিতদের কৌতূহলী করে তোলে।

টুটানখামেনের নাম যারা জানেন লর্ড কার্নারভনের নামও তাদের কাছে পরিচিত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মিশরতত্ত্ববিৎ, ঈজিপ্টোলজিস্ট। আবার লর্ড কার্নারভনের নামও যারা জানেন, হাওয়ার্ড কার্টারের নামও তারা শুনেছেন। হাওয়ার্ড কার্টার লণ্ডন থেকে লর্ড কার্নারভনের পরামর্শক্রমে মিশরে খনন কার্য চালাতেন। তিনিও একজন বিখ্যাত মিশর-তাত্ত্বিক ছিলেন। খনন কার্য অবশ্য বৎসরের সব সময়ে চালানো যায় না, তার উপযুক্ত সময় অথবা মরশুম আছে। এই রকম দুটি মরশুম দুই বৎসরে নষ্ট হয়েছে, বৃথাই খনন কাজ চালানো হয়েছে, আশাপ্রদ কিছুই পাওয়া যায়নি। নিরাশ না হয়ে ১৯২২ সালেও তিনি খনন কার্য চালাতে লাগালেন, খুঁড়তে খুঁড়তে একদিন ধাতব খননিকায় আওয়াজ উঠল ঠং, বেধে গেছে বন্ধ এক পাথরের ধাপে। কার্টার আশান্বিত ও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, দ্বিগুণ গতিতে খনন কার্য চলতে লাগল, ক্রমে পর পর অনেকগুলি ধাপ আবিষ্কৃত হল যেগুলি একটি রুদ্ধ বড় দরজার সামনে শেষ হয়েছে। রুদ্ধ দরজার সামনে এসে কার্টারও থেমে গেলেন, আর একটু খুঁড়লেই হয়ত দরজার ওপাশটায় টুটানখামেনের রাজকীয় অভিজ্ঞানের দেখা তিনি পেতেন; কিন্তু তিনি তা না করে লর্ড কার্নারভনকে তার করলেন; "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করা গেছে, আশ্চর্য এক কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে, আপনার আগমনের অপেক্ষায় পরীক্ষা স্থগিত রইল। অভিনন্দন।"

ইতিমধ্যে সেই কবরের চতুর্দিকে রক্ষী বসিয়ে দেওয়া হল। তিন সপ্তাহ পরে কার্নারভন মিশরে এসে পৌঁছুলেন, খনন কার্য আবার আরম্ভ হল। এবার খুঁড়তে খুঁড়তে মোট ষোলটি ধাপ পাওয়া গেল, তারা পর পর এসে শেষ হয়েছে এক বিরাট প্রাচীন দরজার সামনে, যার গায়ে অঙ্কিত টুটানখামেনের মোহর এখনও চিনতে পারা যায়। রাবিশ স্তূপের মধ্যে আরও পুরাতন রাজাদের নামও পাওয়া যায়। দরজাটি কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে মনে হয়, কোনো না কোনো সময়ে আর কেউ প্রবেশ করেছিল, ক্ষণিকের তরে মনে সন্দেহ হয়, কেউ কি সত্যই ভেতরে প্রবেশ করেছিল? কিন্তু খনন কার্য চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। একদিন দরজা গাত্রে রাজা টুটানখামেনের মোহরের ছবি এঁকে নেওয়া হল, সেই সঙ্গে ফটোগ্রাফও তোলা হল, তারপর দরজা খোলা হল। দরজা খুলতেই সামনে পাওয়া গেল একটি সুড়ঙ্গ পথ, রাবিশ ও ভগ্ন পাথরে প্রায় পূর্ণ। এই সুড়ঙ্গটি ছাড়া আরও একটি সরু সুড়ঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেল সেটি দিয়ে সম্ভবতঃ কোনো কোনো সময়ে দস্যুরা গোপনে হানা দিত। মূল সুড়ঙ্গটি ত্রিশ ফিট লম্বা এবং ও পরিষ্কার করে তার প্রান্তে পৌঁছতে দুদিন লাগল। সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে আর একটি বিরাট দরজার সামনে, এ দরজা গাত্রেও রাজা টুটানখামেনের মোহর অঙ্কিত রয়েছে। এই দরজা গাত্রও হানাদারদের চিহ্ন বহন করছে, শেষ পর্যন্ত কি সবই ব্যর্থ হবে? ধীরে ধীরে ও সযত্নে সুড়ঙ্গ পথ ও দরজার সম্মুখ ভাগ পরিষ্কার করা হল। আর ধৈর্য ধরে রাখা যায় না। দরজার ওপরে একদিকে একটি গোলাকার ছিদ্র করা হল। সেই ছিদ্র পথ দিয়ে লম্বা একটি লোহার ডাণ্ডা চালিয়ে দেওয়া হল। লোহার ডাণ্ডা যতদূর চালানো গেল, কিছুতে ডাণ্ডা আঘাত করলো না, সমস্ত ঘরটা খালি মনে হল। তারপর জ্বলন্ত বাতি প্রবেশ করিয়ে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি পরীক্ষা করে নেওয়া হল। ছিদ্র পথটি আরও বড় করে কার্টার তার মধ্য দিয়ে বাতি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে উঁকি দিলেন; কে জানে তিন হাজার বৎসরের কি রহস্য লুক্কায়িত আছে এই ঘরের মধ্যে। ঘরের অপরাপর ব্যক্তিগণ তখন রুদ্ধ-নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলেন।

"প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পাইনি" কার্টার লিখেছেন "তারপর অন্ধকারে দৃষ্টি যখন অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং ঘরের কিছু কিছু দেখতে পেলাম আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছি। লর্ড কার্নারভন আর ধৈর্য ধরে থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, 'কিছু কি দেখতে পাচ্ছো?' বিস্ময় দমন করে অতি কষ্টে আমি যেন উত্তর দিলাম 'হাঁ খুবই আশ্চর্যজনক জিনিসই দেখছি।' তারপর ছিদ্র-পথ একটু বড় করে দিলাম, যাতে উভয়েই কিছু দেখতে পাই। ইলেকট্রিক টর্চ জ্বেলে আমরা

হাওয়ার্ড কার্টার টুটান খামেনের শবাধার পরীক্ষা করছেন।
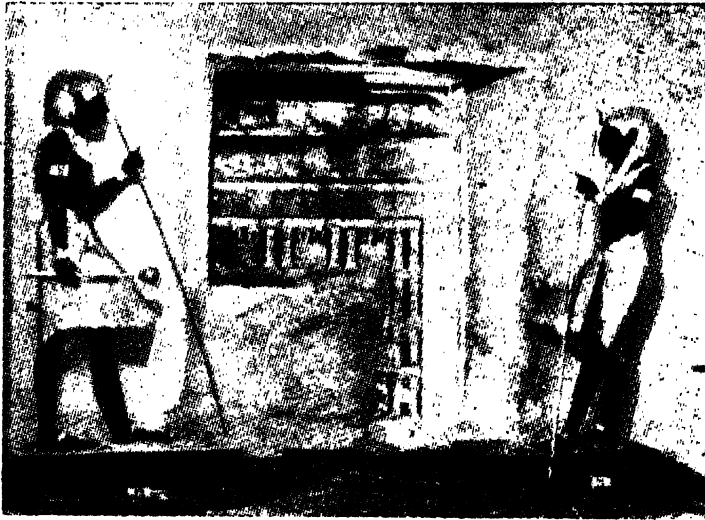
কবরখানার মূল ঘরে প্রবেশ করবার পূর্ববর্তী ঘর।

যেন শেষবারের মতো ঘরের সব কিছু আগ্রহ, বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগলাম।

তারপর এক সময়ে ঘরের দরজা সাবধানতার সঙ্গে খুলে ফেলা হ'ল। তিন হাজার বৎসর পরে মনে এক অদ্ভুত ভাব নিয়ে তাঁরা ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের আলোও কিছু বেড়েছে, জিনিসপত্রও অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে সিন্দুকে কি অপরূপ ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে, তাই দেখবার জন্য সকলেই বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে আরও রয়েছে রত্নখচিত তিনটি শয্যাধার, কোনো কাল্পনিক বীভৎসাকার প্রাণীর অনুকরণে তাদের পার্শ্বদেশ গঠিত। আর একটি দেওয়ালের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান রয়েছে দুজন রক্ষীর প্রতিমূর্তি, সুবর্ণ সজ্জায় সজ্জিত, মাথায় রয়েছে পবিত্র সর্পদেবতার প্রতীক। এছাড়া আরও বহু অমূল্য দ্রব্য-রাজিতে ঘর পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কিন্তু মৃত-দেহ সম্বলিত আধারটি কোথায়? রহস্যময় সেই মমী কোথায়?

ভাল করে ঘরটি পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, দুটি রক্ষীর মাঝে আর একটি দরজা রয়েছে। এটি একটি পার্শ্ববর্তী ঘর। এই ঘরের পর যে ঘরটি সেটি সম্ভবত ভাণ্ডার ঘর, রাজার প্রিয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ। বেশ বোঝা গেল কোন না কোন সময়ে এই দুটি ঘরে মানুষ হানা দিয়েছিল, তার সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। ভাঙা চেয়ার, খেলনা, ছোট্ট নৌকো, পাথরের প্রতিমূর্তি, সুরাপাত্র, পাখা, বিছানা আরও কত কিই না রয়েছে। অভিযাত্রী দল এক দুরূহ কার্যের সম্মুখীন হলেন, এই আবিষ্কার সামান্য নয়। অনেক কাজ করতে হবে, জিনিসগুলি শ্রেণীবিভাগ করে ও প্রত্যেকটিতে পরিচয়পত্র সম্বলিত করে তাদের যাদুঘরে যথাস্থানে রক্ষা করতে হবে। আবশ্যক মতো মেরামত এবং ক্ষণস্থায়ী জিনিসগুলির রক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। সমস্ত কাজটাই সময়সাপেক্ষ। এখান থেকে কায়রোর যাদুঘরে স্থানান্তরই এক বিরাট সমস্যা।

অবশেষে তাঁরা মূল ঘরে প্রবেশ করলেন, এই ঘরেতেই বালক রাজার দেহ রক্ষিত আছে। এই ঘরের অমূল্য সম্পদরাজি মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের সভাগৃহের বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়, 'ভূতলে অতুল শোভা'; যেদিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই স্বর্ণ। বালক রাজার শবাধারটি সুবর্ণনির্মিত ও বহুমূল্য রত্নখচিত, তখনই তার দাম ধার্য করা হয়েছিল আড়াই লক্ষ ডলার, বর্তমানে অন্ততঃ তার পাঁচগুণ। এই ঘর ছাড়া আর একটি ঘর পাওয়া গেল, যেটিকে ধনভাণ্ডার বলা যেতে পারে। ঘরের প্রবেশপথ রক্ষা করছেন শিবাকৃতি দেবতা আনুবিস, আর উভয়পার্শ্বে বিরাজ করছেন দুজন দেবী। অপরাপর ঘর যদি সুবর্ণমণ্ডিত হয়, তা'হলে ধনাগারটি যে কি হতে পারে তা কল্পনা করাই দুরূহ।

কবরখানার অন্ধকারের মধ্যে যখন সকলের অগোচরে এই কাজ চলছে, বহির্জগতে তখন তুমুল উত্তেজনা শুরু হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, টুটান খামেনের সংবাদ জানবার জন্য। সমস্ত সংবাদ-পত্র চায় খবর, ছবি। কাছাকাছি লুক্সর হোটেলের ঘরগুলি সাংবাদিকরা ভর্তি করে ফেললেন, অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর মতো কার্নারভনের দলকে তারা ঘিরে ধরলেন, কিন্তু কোনো খবরই তারা পেলেন না, আর আসল কবরখানায় কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। অবশেষে কার্নারভন ও দলের অন্য সকলে যখন সাংবাদিকদের "অত্যাচারে জর্জরিত" হয়ে উঠলেন তখন কার্নারভন লণ্ডন টাইমসে এক বিবৃতি প্রেরণ করলেন। এতে এবং বিশেষ করে মিশরের সংবাদপত্রগুলি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ বোধ করছিলেন। দেশের খবর বিদেশের কাগজে আগে প্রকাশিত হওয়াতে মিশর তো অপমানিতই বোধ করলে।

অনেকে মনে করেন যে, সংবাদপত্রের রেষা-রেষির "মিশরের মমীর অভিশাপ আছে"

টুটান খামেনের কবর খোঁড়বার সময় সাধারণ দৃশ্য।

ধারণার প্রচলন হয়। কে জানে কোন্ উর্বর মস্তিষ্কসম্পন্ন সাংবাদিক নিজের মূল্যবৃদ্ধির জন্য এই কাহিনী চালিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত সাংবাদিক ব্যতীত দর্শকদেরও কবরখানা দেখতে দেওয়া হত; কিন্তু এতে কাজের অসুবিধা হ'তে থাকে এবং দর্শকদের প্রবেশ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। সে সময় টুটান খামেনের কবর-খানার বস্ত্র, পোষাক ও অন্যান্য দ্রব্যরাজির অনুকরণে প্রাচ্যদেশে পোষাকে-আষাকে ফ্যাসন প্রবর্তিত হ'ল। মেমসায়েবদের টুপি, গলার হার, জানালার পর্দা অথবা ছেলেদের ঠেলা-গাড়ী সেই প্রাচীন মিশরীয়দের অনুকরণে প্রস্তুত হতে লাগল।

১৯২২ সালে কবর আবিষ্কৃত হয় এবং অভিশাপ থাকুক আর নাই থাকুক, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে কার্নারভন মারা গেলেন। সামান্য মশার দংশন থেকে রক্ত বিষিয়ে যায় এবং তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিনি মারা যান। দলের আর একজন অ্যাঙ্গবার্ট লিথগো ১৯৩৪ সালে মারা যান। তখন আবার ঐ অভিশাপের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু আর্টিরিওস্ক্লিরোসিস রোগে এবং ৬৫ বৎসর বয়সে যে তিনি মারা গেলেন, সেটা কেউ বিচার করলে না। দলের যে কর্তা, হাওয়ার্ড কার্টার, প্রথম কবরখানায় প্রবেশ করেন তিনি কিন্তু ৬৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং মারা যান ১৯৩৯ সালে। দলের আরও একজন এইচ ই উইনলক আজও জীবিত আছেন।

কিন্তু এই বিরাট ব্যাপারের যিনি নায়ক, রাজা টুটানখামেন তার কবরখানার বিরাট তিন খণ্ডের বিবরণীর মধ্যে একশতটি লাইন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছেন। সর্বা-পেক্ষা বড় কাজ তিনি যা করেছিলেন, তা এই মনে হয় যে "তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং সমাধিস্থ হয়েছিলেন" এবং আবিষ্কৃতও হয়েছিলেন, নচেৎ—।

মিশরের ফ্যারাওদের মধ্যে টুটানখামেন ছিল শেষ ফ্যারাও। নয় বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, মারা যান আঠারো বৎসর বয়সে। তখনকার একজন ধর্ম-সংস্কারক, ইখনাটনের কন্যার সঙ্গে টুটানখামেনের বিবাহ হয়েছিল। ইখনাটনকে বলা হত 'বিধর্মী' রাজা। ইখনাটন মিশরের ধর্মযাজকদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েছিলেন যার জন্য তাঁর রাজ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁর রাজধানী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। টুটানখামেনের শাশুড়ীর নাম ছিল নেফেরিটিটি। বার্লিনের কাইজার ফ্রেডারিক মিউজিয়ামে রক্ষিত চিত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁর তুল্য সুন্দরী প্রাচীন মিশরে ছিল না। টুটানখামেন সম্ভবতঃ নামেই রাজা ছিলেন, রাজ্য শাসন করতেন অপর কোনো ব্যক্তি। এই ব্যক্তির নাম ছিল জেনারেল আয়। টুটান-খামেনের মৃত্যুর পর এই আয় রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁর পরে যিনি শাসন করেন তিনিও একজন সেনাপতি ছিলেন। এই সেনাপতির সময়েই মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে।

এখন টুটানখামেনের সমাধিস্থানে তাঁর মমী ব্যতীত আর কিছুই নেই।

# কর্ণ-কুন্তী

### শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

হয়তো সত্যি, হয়তো মিথ্যা, হয়তো প্রতিমাকে আমি—না, সেকথা কিছুই বলবো না!

কতবার কতরকম করে কত লোককে আমি এ কাহিনী বলেছি! কিন্তু আর নয়, এই আমার শেষ বলা, তড়িৎ তুমিই আমার শেষ শ্রোতা!

বারে বারে চঞ্চল সমুদ্র রাত্রিদিন আমাকে ডাকে। মনের নিভৃততম কোণ থেকে কে যেন ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে কেঁদে ওঠে। প্রতিমা, তুমি কোথায়! তোমার প্রাণের নির্জন গহনে রেখে এলাম আমার কম্পিত স্বাক্ষর।

আজ আকাশে-বাতাসে শুধু শুনি ঘর-ভাঙার গান। ছেড়ে যাওয়ার নেশায় উন্মাদ হয়ে তুচ্ছ সংকীর্ণ গণ্ডির ঘুণ-ধরা বাঁধন চূর্ণ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। জীবনের কোথায় যেন তার কেটে গেছে, কোথায় যেন কাঁটা লেগে আছে, শুধু হাহাকার বাজে—শিশু কণ্ঠের দিগন্ত-দীর্ণ হাহাকার! চারপাশে শুধু ঘরভাঙার গান—শুধু সমুদ্র গর্জন। আজ ভাবি, ফেলে আসা, না ঠেলে আসা, রেখে আসা না সরে আসা, বিরহ না পলায়ন!

আজও মাঝে মাঝে দোলা লাগে, আর থেকে থেকে কানে বাজে জাহাজের বাঁশী। সে-বিরাট ভাসমান নগরী দুলে দুলে উঠছে। স্ফীত ক্রুদ্ধ অজগরের মতো চারপাশে শুধু একটানা সমুদ্র-গর্জন আর জলের ওপর গম্ভীর ঘন অন্ধকার!

মনে করো তড়িৎ, সেই জাহাজে তুমি দেশে ফিরছো, হ্যাঁ ধরে নাও এই তিন বছর তুমি বিলেতে ছিলে! কাল সকালে জাহাজ বম্বে বন্দরে পেঁৗছবে। অনেক দিন পর তুমি ফিরছো, তাই আজ রাত্রে একটা মধুর উত্তেজনায় তোমার শরীরে শিহরণ লাগা খুবই স্বাভাবিক।

কাল সকালে বম্বে! আজই জাহাজে তোমার শেষ রাত! ঘুম আসা কঠিন। কিছুতেই যখন ঘুম এলো না, তখন মনে করো আস্তে আস্তে তুমি 'ডেকে' চলে এলে আর চারপাশে তাকিয়ে মনে হলো, রাত অনেক!

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তুমি দিশেহারা হয়ে গেলে। জাহাজের স্তিমিত আলোয় শাণিত ইস্পাতের মতো ঝলসে ঝলসে উঠছে উজ্জ্বল রুপোলী ঢেউ!

ওপরে নক্ষত্রবহুল বিশাল আকাশ, সামনে ফেনিল উন্মত্ত জলরাশি। সেই রাত্রে তোমার চোখে ঘুম নেই, অনেক দিন পর তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার স্বাধীন ভারতের বুকে। সমুদ্র-গর্জনের তালে তালে তোমার চারপাশে শুধু একটি পদ নিরন্তর গুঞ্জন করে ফিরছে, "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি—" না না, তড়িৎ তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। এমন ক'রে আর আমাকে বাধা দিও না, আমাকে শুধু বলে যেতে দাও! আমি জানি না সে কোথায়। কিন্তু কে যেন ডাকে, আমাকে কেবলই ডাকে! ঝড়, সমুদ্র, অরণ্য-পর্বত আমাকে বারে বারে ডাকে!

ভেঙে যাক্ ঘর, প'ড়ে থাক্ সংসার! সমুদ্র, তুমি আমাকে মুক্তি দাও! আমার নিঃসীম শূন্যতা, আমার ব্যর্থতার জ্বালাময় ক্রন্দন, আমার বুকে জোড়া হাহাকার, ভ'রে তোলো তোমার রূপে, রঙে, গর্জনে—আমাকে নিয়ে চ'লো তোমার চঞ্চল কলোচ্ছ্বাসের মাঝে!

কিন্তু অবশেষে এমনি করেই কি মুক্তি এলো! শুধু হারানো দিনের অনুরণন, শুধু ছলো ছলো মুখ, শুধু পেয়ে-হারানোর মন্থর প্রহরের মৃদু কম্পন! মুক্তির মাঝে এমনি ক'রে পুরানো মায়ার কঙ্কন-ঝঙ্কার বাজে কেন! পারহীন সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসে এ কী করুণ পরিহাস! প্রতিমা, তুমি কোথায়!

তুমি অমন অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো? আরে ছি, ছি, কি ব'কে গেলাম এতক্ষণ! মিথ্যা, মিথ্যা! আমার প্রলাপ ক্ষমা ক'রো তড়িৎ! বয়স হয়েছে কি-না, তাই মাথার ঠিক নেই।

কোথায় থেমেছিলাম বল তো? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমি একা শেষ রাত্রে 'ডেকে' দাঁড়িয়ে—

হঠাৎ 'ডেকে'র একেবারে অন্য প্রান্তে তুমি তাকিয়ে দেখলে ডেক-চেয়ারে কে যেন শুয়ে আছে আর তার কোলে ছোট ছেলেকে দেখে তোমার বুঝতে দেরী হলো না যে সে প্রতিমা। হ্যাঁ, এই জাহাজে সে-ও দেশে ফিরছে!

প্রতিমার সংগে এর মধ্যে তোমার আলাপ হয়েছে বৈকি! এই সমুদ্র-পথেই তার সংগে তোমার অনেক কথা-বার্তা হয়েছে। আর যদি তুমি তোমার মনের মধ্যে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখো তাহ'লে—না, সেকথা থাক তড়িৎ!

প্রতিমার সংগে আলাপ-আলোচনায় তুমি এইটুকু জেনেছ যে সে বিলেতে সাংবাদিকের কাজ শিখতে এসেছিল—বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে সে। আর জেনেছ তার একটি খুব ছোট ছেলে আছে কিন্তু স্বামী নেই। লণ্ডনে প্রবীরের সংগে তার প্রেম হয় আর লণ্ডনেই দুর্ঘটনায় প্রবীর হঠাৎ মারা যায়। আরও একটি কথা তুমি জানো, প্রতিমার প্রেম অথবা তার এই শিশু সন্তানের কথা তার মা-বাবা এখনও জানেন না!

চলো এবার তড়িৎ, 'ডেকে'র অন্য প্রান্তে এগিয়ে চলো, প্রতিমার সংগে কথা বলা যাক্। না, তোমাকে বলতে হলো না, সে-ই আগে কথা বললো—

এখনও জেগে আছেন যে?

কিছুতেই ঘুম আসছে না।

হেসে প্রতিমা বললো, খুবই স্বাভাবিক, চেয়ারটা টেনে এনে বসুন, গল্প করা যাক্!

হ্যাঁ সেই ভালো, চেয়ার টেনে প্রতিমার পাশে তুমি বসে পড়লে, এত রাত্রে খোকাকে বাইরে রেখেছেন কেন? ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে—

কোথায় ঠাণ্ডা, যা গরম!

তারপর কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। চার পাশ থেকে তোমার কানে এসে বাজছে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দুরন্ত গর্জন। তোমাকে ঘিরে রয়েছে চঞ্চল কালো জল। আর সেই শেষ রাত্রে জাহাজের স্তিমিত আলোয় তুমি শুধু প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছো। আর তোমার মনের কোন কোণে হয়তো ক্ষণে ক্ষণে অকারণে বেদনা বাজছে!

হঠাৎ তুমি প্রতিমাকে প্রশ্ন করলে, আপনার বিয়ের কথা তো আপনার মা-বাবা এখনও জানেন না না?

বিয়ে? হঠাৎ যেন প্রতিমা চমকে উঠলো, বিয়ে তো আমার হয়নি তড়িৎবাবু!

বিক্ষুব্ধ জলরাশির উন্মত্ত গর্জন যেন তোমাকে এখুনি শুষ্ক তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বারে বারে জাহাজের বাঁশী বাজছে। বল্গাবিহীন বাতাসের দুরন্ত গতিবেগে হয়তো এই ভাসমান অট্টালিকা চূর্ণ ভগ্ন দীর্ণ হয়ে যাবে। তোমার রক্ত সমুদ্রের মতোই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তবু তুমি যেন বেঁচে' গেলে তড়িৎ'!

প্রতিমার আরও কাছে সরে এসে বললে, কি বলছেন আপনি!

মৃদু হেসে প্রতিমা বললো, আপনাকে বলতে পেরে অনেক হাল্কা বোধ করছি

প্রবীরের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক আগেই টিউব-য়্যাক্‌সিডেণ্টে সে মারা যায়!

কিন্তু খোকা? প্রশ্ন করেই তুমি তোমার ভুল বুঝতে পারলে, তাই আবার তাড়াতাড়ি বলে উঠলে, না না, মানে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

না বোঝবার তো কিছু নেই তড়িৎবাবু, সোজা কথা। কিন্তু আমি কঠিন, হ্যাঁ, খোকাকে আমি বাঁচাবো। আমার কোন ভয় নেই, কোন লজ্জা নেই, এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

লজ্জা ভয় সঙ্কোচ ত্যাগ করলেই সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হয় না প্রতিমা, হয় আরও দুর্গম—

জানি। আর এও জানি আজ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার ক্ষমতা আমার আছে!

কিন্তু কি নিয়ে সংগ্রাম সে কথা ভুলে যাবেন না, ভুলে যাবেন না এ সংগ্রামে আপনার নিশ্চিত পরাজয়!

না না না, আমি খাঁটি, কোন অন্যায় আমি করি নি!

ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয়—

তবে কিসের কথা?

আপনার আত্মীয়-স্বজন, আপনার সুনাম-দুর্নাম, আপনার চারপাশের আর পাঁচজনের কথা?

আমার শক্তি আছে, আমার সাহস আছে, আমার মেরুদণ্ডে জোর আছে!

কিন্তু কতদিন?

চিরদিন, চিরকাল!

না, কিছুতেই চার পাশে মাথা উঁচু করে আপনি চলাফেরা করতে পারবেন না।

সংস্কারে গড়া জাতের মতোই আপনি কথা বলছেন বটে, কিন্তু জেনে রাখুন, সমস্ত বাধা আমি এক হাতে ঠেলে দেবো। আজ তুচ্ছ সংস্কার আমার কেটে গেছে, কূপমণ্ডুকত্ব ঘুচে গেছে। সামাজিক অনুষ্ঠান না মেনে যদি কারো জন্ম হয় সে-ও মানুষ, বাঁচবার পূর্ণ অধিকার তার আছে, কে জানে সে মহামানব হবে কি-না!

ক্ষমা করবেন, হেসে তুমি বললে, সংসার কি তা বোধ হয় আপনি ভালো করে জানেন না, আমি জানি, তাই আপনার কথা আমার কানে সুবিধাবাদীর প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে, বুদ্ধিমতীর যুক্তির মতো নয়—

ক্ষতি নেই, কিন্তু সমস্ত যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে যে সংস্কার, আমি সেই সংস্কারের মূলে আঘাত করতে চাই—

কিন্তু প্রতিমা, আপনি কি বলতে চান ব্যাভিচার অন্যায় নয়?

হ্যাঁ, একশোবার অন্যায়, ব্যাভিচার আমি ঘৃণা করি, আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি মঙ্গল আর কল্যাণে, আমি শুধু উড়িয়ে দিতে চাই সংস্কার, যে সংস্কার আপনার আমার মজ্জায়-মজ্জায়—

আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

সমস্ত ব্যাপার খুলেই বলি তাহলে আপনাকে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি ভেবে নিয়ে প্রতিমা আরম্ভ করলো, প্রবীর আমাকে ভালবাসতো, আমি প্রবীরকে ভালবাসতাম, একই ফ্ল্যাটে থাকতাম আমরা দু'জনে, ঠিক ছিল তার পরীক্ষার পর আমাদের বিয়ে হবে!

তারপর? তুমি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিলে তড়িৎ।

এক সুরে গড় গড় করে প্রতিমা বলে গেল, বিয়ে আমাদের হলো না, কিন্তু খোকা হলো আর খোকা হবার অনেক আগেই প্রবীর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। লোকে জানলো বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে। একথা কাউকে বলতে না পেরে বুক আমার ছারখার হয়ে যাচ্ছিল, আজ আপনার কাছে মন খুলে আমি বাঁচলাম!

কিন্তু আপনার মা, বাবা তাঁদের কি বলবেন?

আপনাকে যতখানি বললাম, তাঁদেরও ঠিক ততখানিই বলবো!

আপনার দর্শন কি তাঁরা মানবেন।

যদি না মানেন ক্ষতি নেই, বাঁধাধরা জীবন আমার জন্যে আর নয় তাই ঘর বাঁধবার স্বপ্নও আর আমি দেখি না, দরকার হলে খোকাকে নিয়ে ভেসে পড়বো!

সারা জীবন ধরে আপনাকে শুধু ভাসতেই হবে, তাহলে খোকা মানুষ হবে কেমন করে?

সে কথা ভাববার সময় এখন নেই, কিন্তু সত্য, কষ্ট দিলেও জ্বালা দেয় না, আমার সত্যকে সূর্যের আলোয় আমি মেলে ধরবো। আমি জানি, কোন অন্যায়ই আমি করি নি। আজ প্রত্যেকের কাছে মিথ্যা কথা বলে নিজের প্রতিষ্ঠার পথ আমি সহজ করে তুলতে পারি। আমি অনায়াসেই বলতে পারি, আমি প্রবীরের স্ত্রী! একটি লোকও আসল কথা জানতে পারবে না!

তোমার সিগ্রেট ততক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তড়িৎ, সেই ছোট সিগ্রেটে আর একটা টান মেরে তুমি বললে, ক্ষতি কি প্রতিমা, কেউ যখন সন্দেহ করবে না তখন খোকার মঙ্গলের কথা ভেবে সামান্য মিথ্যা কথা বললে ক্ষতি কি?

হয়তো মিথ্যা কথা বলতে পারতাম যদি বুঝতাম অন্যায় করেছি। আমাদের প্রেম কাঁচা সোনার মতো খাঁটি!

কিন্তু তবু সামান্য মিথ্যায় যদি খোকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—

তড়িৎবাবু, লোককে ফাঁকি দেয়া সোজা, কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেয়া কঠিন। মিথ্যা বলে নিজেকে ফাঁকি দেবো কেমন করে? না, কিছুতেই আমি তা পারবো না।

সুবিধার খাতিরে কত লোক কত মিথ্যা বলে!

তারা জনপ্রিয় কিন্তু খাঁটি নয়, প্রিয় হওয়া সোজা, খাঁটি হওয়া কঠিন। আমি যদি কারুর প্রিয় না হই ক্ষতি নেই, কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দিয়ে অন্যের কাছে প্রিয় যেন কোন দিনও না হই, চিরদিন নিজের কাছে যেন আমি খাঁটি থাকতে পারি!

পদে পদে যদি হোঁচট খেতে হয়—কেউ যদি দাম না দেয় তাহলে সে খাঁটিত্বের মূল্য কি?

খাঁটিত্বের জহুরী মানুষ নিজে, তা অমূল্য, অলিতে গলিতে খাঁটিত্ব নিয়ে নিলাম হাঁকা যায় না তড়িৎবাবু, তার দাম দেবার ক্ষমতা হয়তো সাধারণের নেই। আমার খোকা তার সত্য পরিচয় নিয়ে বাঁচবে। আপনি সাহিত্যিক, স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে দেখুন, ব্যাভিচারের মধ্যে দিয়ে খোকা আসেনি, সে এসেছে সোনার প্রেমের মধ্যে দিয়ে—

কিন্তু সংসার যদি চোখ রাঙায়, দারিদ্র্য লজ্জা আর অপমান যদি আপনাদের দু'জনের জীবন বিষময় করে তোলে? ভুলে যাবেন না সংস্কারে ভরা সংসার—

বাঙলার সংস্কারের চেয়ে বড় আমার প্রেম—

এ সংস্কার শুধু বাঙলায় নয়—সমস্ত পৃথিবীর, এ কখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায় না!

আমার শুভ্র ন্যায় আমার চেয়ে পৃথিবীর কোন মানুষের কোন সংস্কার বড়ো নয়! লোকের ভয় আমি করি না।

কিন্তু অপবাদ? যদি আপনি সত্যি কথা বলেন তাহলে লোকে দোষ দেবে প্রবীরের, সে কথা ভেবে দেখেছেন কি?

সত্য বলে যদি অপবাদ আসে তাহলে তা তার গায়ে লাগবে না, কিন্তু মিথ্যা বলে সুনাম আমি চাই না, সত্যের দুর্নাম, সত্যেরই জয়গান, ক্ষণিকের চীৎকার, তা আত্মতৃপ্তি আনে না কিন্তু মিথ্যার জয়গান বাজেনা, সে যেন আনে গ্লানি।

আপনি স্বার্থপর, আপনি ছেলেমানুষ, আপনি শুধু নিজের তৃপ্তিই দেখছেন, খোকার মঙ্গল দেখছেন না?

সত্যই মঙ্গল, মঙ্গলই কল্যাণ! তার বাইরে আমি আর কিছু জানি না!

না, তুমি আর কিছু বলতে পারলে না তড়িৎ। নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দূরে তাকিয়ে রইলে। বহু দূরে আর একটি জাহাজ ভেসে চলেছে, ক্ষণে ক্ষণে তার বাঁশী বাজছে আর শুধু বয়লারের গম্ গম্ শব্দ আর দুরন্ত জলের কলোচ্ছ্বাস!

চুপ করে কেটে গেল কিছুক্ষণ। তোমার আর কোন যুক্তি নেই, বলবারও কিছু নেই। তুমি আস্তে আস্তে আর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিলে। সেই গভীর রাত্রে ভাসমান অট্টালিকার এক প্রান্তে তুমি বসে আছো আর যে দৃপ্ত বলিষ্ঠ সতেজ মেয়ে আজ তোমার একেবারে পার্শে বসে আছে তেমন মেয়ে তুমি আর কখনও দেখেছ কি? তেমন নির্ভীক পুরুষও তোমার এত কাছে কখনও বসেছে কি? বোধ হয় নয়। প্রতিমা আত্মহত্যা করে নি, স্বীকার করেছে প্রেম, খোকাকে বাঁচিয়েছে। তার প্রেমের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে লোক ভয়।

হয়তো সমস্ত পৃথিবীতে এমন মানুষ মেলে না, সত্যের জন্যে যে অপবাদ মাথায় তুলে নিতে বিচলিত হয় না। প্রশংসার স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তুমি আর একবার প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে! চোখ বন্ধ করেছে সে। কিন্তু সে মুখের চার পাশ ঘিরে রয়েছে জ্যোতি। তুমি কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না।

কি দেখছেন? হঠাৎ এক সময় চোখ খুলে প্রতিমা প্রশ্ন করলো।

আপনাকে—আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রত্যেকে হয়তো আপনার মতো এমন কথা বলবে, সে বিশ্বাস আমার আছে!

সংস্কার ভরা দেশের কথা জানি না, কিন্তু আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি!

এবার উঠে দাঁড়িয়ে তুমি বললে, এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক্, কাল সকালেই নামতে হবে।

যান আপনি, আমি এখানেই থাকবো, একটু থেমে আবার প্রতিমা বললো, কালকেই ভারতবর্ষ না? এত তাড়াতাড়ি—

আপনার বুঝি জাহাজে থাকতেই ভালো লাগে?

না, মৃদুস্বরে প্রতিমা বললো, ভারতবর্ষ এসে গেল না? আর ক ঘণ্টা? এইতো ঘণ্টা কয়েক দেখছেন না, ভোর হতে আর খুব বেশী বাকি নেই!

ওমা, তাই তো!

তুমি আস্তে আস্তে তোমার কেবিনে এসে শুয়ে পড়লে তড়িৎ। কিন্তু ঘুম এলো না কিছুতেই! মনে মনে ভাবলে, না এলেই ভালো হতো, হয়তো প্রতিমার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ আর তোমার জীবনে হবে না। আর একটু বসলেই তো হতো ওখানে। তবু এক সময় হঠাৎ কখন তন্দ্রা এলো!

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। চমকে বিছানার ওপর সহসা উঠে বসলে তুমি। তীক্ষ্ন এলার্মের শব্দে বিচলিত হয়ে উঠেছে সমস্ত জাহাজ। প্রচণ্ড কোলাহল আরম্ভ হয়েছে চারপাশে। লাইফ-বেল্ট নিয়ে দ্রুতবেগে তুমি আবার "ডেকে" চলে গেলে। কিন্তু তুমি আসবার অনেক আগেই লোকে-লোকে 'ডেক' ভরে উঠেছে। হঠাৎ প্রতিমাকে দূরে দেখতে পেয়ে তার কাছে ছুটে গেলে তুমি। কিন্তু তার চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলে। তার সমস্ত শরীরে যেন এক বিন্দু রক্ত নেই, পাথরের মতো নিষ্পন্দ দেহ!

তোমাকে দেখেই সে মন্ত্রচালিতের মতো বললো, খোকা জলে পড়ে গেছে—বলেই অজ্ঞান হয় পড়ে গেল তোমার পায়ের কাছে!

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দীর্ণ শিশু-কণ্ঠে কে যেন বলে উঠলো, না, না আমি পড়ে যাইনি, মা আমাকে ফেলে দিয়েছে, ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার সাহস নেই বলে—

দূরে নতুন সূর্যের আলোয় ভারতের প্রবেশ-তোরণ ঝলমল করছে! বম্বে এসে গেল!

# নীড়াভিলাষ

## সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

কোন এক মুগ্ধ ক্ষণে
হৃদয়কে মনে হয় স্নিগ্ধ সরোবর!

অতর্কিতে ভেসে আসে ভাবনার বিমুগ্ধ মরাল,
তাদের ডানায় নিয়ে আবেগের ঝড়।
এই ঝড় অনাদ্যন্ত জীবনের মাঝে
দীর্ঘ এক ছায়া ফেলিয়াছে।

পথিক চিত্তের পাখী বিচিত্রিত পথে
উড়ে চলে চঞ্চল পাখায়,
শ্রান্তিশূন্য ক্লান্তিহীন কত নীল আকাশের তীরে—
অনুকূল আকুল সমীরে।

হৃদয়ের সরোবর তরঙ্গে উচ্ছল,
সহস্র ফেনার ঢেউয়ে আবেগে অধীর—
হৃদয়ের নীর—
কতবার বাঁধ ভেঙে যায়।
নদী-গিরি-অরণ্যেরা মিনতি পাঠায়—
বেনোজল ছলোছল মানেনা শাসন!
মনের মরাল খোঁজে কতবার মানসের হ্রদ—
বহুদূরে দিগন্তে হারায়।

তবু ঝড় স্তব্ধ হয় একদিন মরাল ডানায়—
তরুশীর্ষে সূর্যাস্তের রশ্মিজাল স্বপনের আবেশ পাঠায়;
সুচির-প্রার্থিত দেশ খুঁজে পায় মনের মরাল,
আর এক সুনিদ্রার সুকোমল নীড়!

থেকে থেকে কতবার মনের পাখায়
বয়ে যায় আবেগের ঝড়।
তবু যেন কোন এক মুগ্ধ ক্ষণে—
হৃদয়কে মনে হয় স্নিগ্ধ সরোবর!

# ঢোঁড়াই চরিতমানস

## (সটীক)

••••••শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী•••

### বাল্যকাণ্ড

#### ঢোঁড়াইয়ের জন্ম

বুধনীর মনে আছে যে, ঢোঁড়াই যেদিন পাঁচ-দিনের সেদিন 'টৌনে'(১) ছিল একটা ভারী তামাসা' (২)। তার একদিন আগেই যদি ঢোঁড়াই জন্মায়, তাহলেই বুধনী ছদিনের দিন স্নান করে তামাসা দেখতে যেতে পারে; কিন্তু তা ওর বরাতে থাকবে কেন! কেবল খাও, রসুন গুড় আর আদাবাটা একসঙ্গে সেদ্ধ করে সেটা তেলে ভেজে। মরণ! বুধনী কাঁদতে বসে।

ওর স্বামীটা ভারী ভালমানুষ। অন্য লোকেরা বলে হাবাগোবা তাই রোজগার কম। বুধনীর নিজের রোজগার আছে বলেই, চলে যায় কোনোরকমে। তার স্বামীকে দিয়ে ...র দল চাল ছাইবার সময় ...ড়া বওয়ায়, খাপড়ার ঝুড়ি নিয়ে মইয়ে চড়ায়, পৌষ মাঘে কুয়ো পরিষ্কার করতে হলে, তাকেই জলের ভিতর বেশীক্ষণ ...র করায়।

বুধনীকে কাঁদতে দেখে সে বলে, 'তা ...কাঁদতে বসলি কেন? ছেলেটার দিকেও ...ঘাড় কাত করে রয়েছে কেন। তোর জন্যে ...র দুপয়সার মুসুরীর ডাল কিনে আনতে ...। কি গরম মসুর ডাল—না?

ওর স্বামী কোনদিন মসুর ডাল খায়নি। ...কেন কোন তাৎমাই খায় না। অত গরম জিনিস খেলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে সেই ভয়ে। ...লি খাবে মেয়েরা, ছেলেপিলে হওয়ার পর ...দিন, তখন ওদের শরীরের রস শুকোনোর ...র সেইজন্যে।

বুধনী বলে, হ্যাঁ, খেলেই যেন গরম ...গুন জ্বলে গায়ে।'

'আমি তামাসা দেখে এসে তোকে সব ...বো, বুঝলি? কাঁদিস না।'

সেদিন 'টৌন' থেকে বাড়ি ফিরবার সময় ...ড়াইয়ের বাপের বুক দুরু দুরু করে ভয়ে। ...টো পয়সা ছিল তার কাছে। তামাসায় গিয়ে সে তাই দিয়ে এক পয়সার এক 'পাকিট বাত্তিমার'(৩) কিনেছে, আর এক পয়সার খয়নি। বাড়ি গিয়ে এখন কি বলবে বুধনীর কাছে মসুর ডালের সম্বন্ধে, সেই কথাই সে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরে, যত বোকা তাকে সকলে ভাবে সে তত বোকা নয়।

'কে আর দোকান খোলা রাখবে, ঐ রাজার দরবারে 'জুলুস' (দিল্লী দরবারের মিছিল) দেখা ছেড়ে দিয়ে।' এই কথা বলতে বলতে সে বাড়ি ঢোকে। বুধনী অনেকক্ষণ থেকে তারই জন্য অপেক্ষা করছিল, তামাসার খবর শোনবার জন্য।

'কার; কপিলরাজার নাকি?'

কফিল রেজা কুলের জঙ্গলের ঠিকেদার, লার ব্যবসা করে। তাকেই সকলে বলে কপিল রাজা।

'না রে না। ওলায়তের (বিলাতের) রাজার। তার কাছে কলষ্টর সাহেব দারোগা পর্যন্ত থর থর থর থর।'(৪)

দরবার কথাটার ঠিক মানে, ঢোঁড়াইয়ের বাপ নিজেই বুঝতে পারেনি। মনে মনে আন্দাজ করেছে যে বোধহয় এই মিছিলেরই নাম দরবার। পাছে বুধনী ঐ কথাটার মানে জিজ্ঞাসা করে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে 'জুলুসের' হাতী ঘোড়া উটের কথা বলতে আরম্ভ করে।

সে কি বড় বড় হাতী! সোনার কুর্তা পরানো, ইয়াঃ বড় বড় দাঁত, 'চাঁদি' দিয়ে ঢাকা। সে যে কত চাঁদি, তা দিয়ে যে কত যুনুসি হতে পারে, তার আর ঠিকানা নেই! একটা হাতী ছিল সেটার আবার একটা দাঁত এই ছোট্ট কদুর মত। উটগুলো চলছে টিম-টাম্‌ টিম-টাম্‌, সামনে পিছনে, সামনে পিছনে—ঠিক খোঁড়া চথুরীটার মত চলার ধরণ। হাতীর পিঠে চাঁদির হাওদায় 'কলষ্টর সাহাব' (কলেক্টর সাহেব), আর একটায় বুধনগরের কুমাররা, আরও কত সাহেব, কত হাকিম কে কে সব কি অত চিনি ছাই! সাদা ঘোড়ার পিঠে ভাইচেরমেন সাহাব। কি তেজী ঘোড়া! টকস-টকস টকস-টকস কি চাল ঘোড়ার! তার কাছে যায় কার সাধ্যি। ছত্তিস বাবুর(৫) দোকানের বারান্দায় বাঙালী মাইজীদের মিছিল দেখার জন্য চিক টাঙিয়ে দিয়েছিল—ঘোড়াটা তার জোড়া পা তুলে দিতে চায় সেই চিকের উপর। ইয়াঃ তালের মত বড় বড় খুর!

বুধনী আঁতকে ওঠে ভয়ে 'গে মাইয়া! তাই নাকি!'

আরও কত তামাসার খবর বুধনী শোনে। তার দুঃখের সীমা নেই। উট আর কলষ্টর সাহাব দেখা তার পোড়া কপালে রামজী দেন নাই, সে আর কার দোষ দেবে।.........

ছেলেটা কেঁদে ওঠে।

ঢোঁড়াইয়ের বাপ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। —নে, নে, দুধ দে। অমন করে তুলিস না—ঘাড় মটকে যাবে 'বিলি বাচ্চাটার'(৬); তারপর ঐ 'বিলি বাচ্চা' ঢোঁড়াইয়ের দিকে মাথা নেড়ে নেড়ে, হাত তালি দেয়।

এ নুনু! (ও খোকন)

এত্তা ভাত খাওগে? (এতগুনো ভাত খাবে)

বকড়ি চড়াওগে? (ছাগল চড়াবে)

এত্তা ভাত খাওগে,—বকড়ি চরাওগে। এত্তা ভাত খাওগে, বকড়ি চরাওগে।

ছেলেকে দুধ দিতে দিতে গর্বে বুধনীর বুক ভরে ওঠে। ছেলেপাগল লোকটার আদর করা দেখে হাঁসি আসে। তোমার বিলিবাচ্চা কি এখন শুনতে শিখেছে, এখনও আলোর দিকে তাকায় না, ওকে হাততালি দিয়ে দিয়ে আদর হচ্ছে! পাগল নাকি!

ঢোঁড়াইয়ের বাপ বেঁচে গিয়েছে আজ খুব; 'তামাসার' গল্প আর ছেলে সামলানোর তালে মসুর ডাল না আনার কথা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু তার মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে—ছেলের তাকৎ মায়ের দুধে, আর মায়ের দুধ হয়, মসুর ডালে।

খানিকপরেই মহতো গিন্নি আসেন, প্রসূতির তদারক করতে। হাজার হোক ছেলে-মানুষতো বুধনী। মা হলে কি হয়, পেট থেকে পড়েই কি লোকে আঁতুরঘরের বিধিবিধান শিখে যাবে। কাল স্নান করবার দিন। মহতো গিন্নি না দেখাশুনো করলে, পাড়ায় আর কার গরজ পড়েছে বলো। মহতো গিন্নী হওয়ার ঝক্কি তো কম নয়। এসেই প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন বুধনীকে, 'মসুরডালে রসুন ফোড়ন দিয়েছিলে না আদা ফোড়ন? দোকান বন্ধ ছিল! কে বললো? তোমার 'পুরুখ'(৭)? আমি নিজের

---

টীকা:—

(১) টৌন—জিরানিয়া।

(২) ভারী—বড়।

(৩) এক পাকিট বাত্তিমার—এক প্যাকেট লণ্ঠন মার্কা সিগারেট। সিগারেটটির নাম ছিল রেড ল্যাম্প।

(৪) থর থর থর থর—তাৎমারা কথা বলিবার সময় ধ্বনিপ্রধান শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করে।

(৫) ছত্তিসবাবু—সতীশবাবু।

(৬) বিলি-বাচ্চাটার—বিড়ালের বাচ্চাটার (আদরে)।

(৭) পুরুখ—স্বামী।

দরবার—দিল্লী দরবার (১৯১২)।

চোখে দেখে এলাম খোলা রয়েছে; দেখে আসা কেন আমি নন কিনে এনেছি।.........'

তারপর চলে মহতো গিন্নির গালাগালি ঢোঁড়াইয়ের বাপকে। বুধনীও সংগে সংগে রসান দেয়। পাড়ার অন্য কোন বয়স্থ পুরুষকে এরকম-ভাবে বকতে মহতো গিন্নি নিশ্চয়ই পারতেন না। কিন্তু এ মানুষটিকে সবাই বকতে পারে।

তারপর মহতো গিন্নি চলে গেলে ঐ 'পুরুখ' বুধনীর কাছে সব কথা খুলে বলে, নিজের দোষ স্বীকার করে।

বুধনী মনে মনে হাসে। এমন 'পুরুখে'র উপর কি রাগ করে থাকা যায়। লোকের ঠাট্টাটা পর্যন্ত বোঝে না এ মানুষ; না হ'লে কাল হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে আমাকে খবর দেওয়া হল, যে রতিয়া 'ছড়িদার' রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করেছে ওকে—যে ছেলের রঙ মকসুদনবাবুর গায়ের রঙের মত হয়েছে নাকি।

## বুধনীর বৈধব্য ও পুনর্বিবাহ

ঢোঁড়াই হয়েছিল বেশ মোটা সোটা। রংটাও কাল না—মাজা মাজা গোছের—তাৎমারা বলে গমের রং। তার বাপ সন্ধ্যার সময় কাজে থেকে এসেই ছেলে কোলে নিয়ে বসতো। ছেলে হওয়ার পর থেকে সে রাতে পাড়ার ভজনের দলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই নিয়ে পাড়ার লোকের কত ঠাট্টা। বুধনী উনুনের ধারে উঠনে বসে। আর সে বসে দরজার ঝাঁপের পাশে ছেলে কোলে নিয়ে বুধনীর সংগে গল্প করতে।

বকড় হাট্টা—আ—আ
বড়দ বাট্টা—আ—আ
সো জা পাঠ্টা—আ—আ

(ছাগলের হাট, বলদের চলার পথ, শুয়ে পড় জোয়ান) ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে ছোট্ট ঢোঁড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে বাপের কোলে।

বুঝলি বুধনী, এ ছোঁড়া বড় হয়ে আমার বংশের নাম রাখবে। একে লেখাপড়া শেখাবো চিমনী বাজারের বুড়হা গুরুজীর কাছে। রামায়ণ পড়তে শিখবে, পাড়ার দশজনকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে; ধাঙড়টুলী মরগামা, কত দূর দূর থেকে লোক আসবে ওর কাছে, খাজনার রসিদ পড়াতে। ভারী 'তেজ'(১) ছোঁড়াটা, দেখিস্না এই বয়সেই কোলে নিলেই ছোট্ট ছোট্ট আঙ্গুল দিয়ে খাবলে ধরতে চায় আমার কান আর নাক।' —ঘুমন্ত ছেলের গাল দুটো টিপে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে 'ওনামাসী ধং গুরুজী পড়হং;—কিরে পড়বি?'(২)

'পড়ে টড়ে, খোকন আমার, ভিরগু তশীল-দারের মত জজসাহেবের পাশে কুর্শীতে বসে 'সেসরী' (দায়রা কোর্টের এসেসর্) করবে। আমার সেসর সাহেব ঘুমুলো; আমার সেসর সাহেব ঘুমিয়েছে। নে বুধনী, চাটাইটা ঝেড়ে একে শুইয়ে দে।'

কিন্তু এত সুখ বুধনীর সইলো না।

সেই যেবার কলন্টর সাহাব জিরানিয়ায় হাওয়াগাড়ী আনলেন প্রথম,(৩) সেইবারই ঢোঁড়াইয়ের বাপ মারা যায়। ঢোঁড়াই তখন বছর দেড়েকের হবে।

শহরে, দেহাতে, তাৎমাটুলীতে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে 'তামাম হল্লা'—কলেন্টর সাহেব হাওয়া-গাড়ী এনেছেন অনেক টাকা দিয়ে। আপনা থেকে চলবে,—'বিনা ঘোড়েকা',—পানিতে আর হাওয়ায় চলবে। আজ প্রথম চলবে হাওয়াগাড়ী। কলন্টর সাহেব যাবেন চাঁদমারীর মাঠে—যেখানে সাহেবরা ফৌজের উর্দী পরে বন্দুক চালানো শেখে—দমাদ্দম্, দমাদ্দম্ 'বড়া' নিশানা ঠিক কলন্টরের হাতের; তাঁর ধাঙগড় মালী বড়কা-বুদ্ধু বলে যে, মেমসাহেবের হাতে পেয়ালা রেখে নাকি গুলি মেরে চুরচুর করে দেয়। চাঁদমারীর মাঠে কাউকে যেতে দেয় না—ওটা পড়ে সাহেব পাড়ায়। কেউ গেলেই আর দেখতে হচ্ছে না; সোজা হিসাব; নও দো, এগারহ। (নয় আর দুয়ে এগারো); একেবারে সিধা ফাটক্।

তাই লোকে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়েছিল কামদাহা রোডের দুপাশে—হাওয়াগাড়ী দেখবার জন্য।

ঢোঁড়াইয়ের বাপের হয়েছিল জ্বর ক'দিন থেকে। নিশ্চয়ই পেয়ারা খেয়ে, কেননা সেটা বাতাবীলেবুর সময় নয়। জ্বর কিজন্যে হয় তা আর তাৎমাদের বলে দিতে হবে না—সবাই জানে, আশ্বিনের পরে জ্বর হয় বাতাবীলেবু খেয়ে, আর আশ্বিনের আগে জ্বর হয় পেয়ারা খেয়ে।

কলন্টর কখন যাবেন চাঁদমারীর মাঠে তা কেউ জানে না। সেইজন্য সকাল থেকে ঢোঁড়াইয়ের বাপ দাঁড়িয়েছিল রোদ্দুরে, হাওয়াগাড়ী দেখবার জন্য। ভয় ভয়ও করছিল,—'জিনে' (ভূত) কলের ভিতর থেকে গাড়ী চালাচ্ছে সে ভেবে নয়, —অত বোকা সে নয়,—ওসব ছেলেপিলেরা ভাবুক, না হয় দেহাতী ভূতরা ভাবুক;—সে ঠিকই জানে যে, হাওয়াগাড়ী চলে পানি আর হাওয়াতে। তবে তার ভয় করছিল যে, গাড়ীটা আবার তার গায়ের উপর এসে না পড়ে,—কলকব্জার কম্ম, বলাতো যায় না।,

ঐ আসছে! আসছে!

শব্দ হচ্ছে রেলগাড়ীর মত। কেমন দেখতে কিছুই বোঝা যায় না, কেবল ধুলো! না ধুলো কেন হবে, ধোঁয়া। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার! আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ হাওয়াগাড়ীর। দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে—প্রথমে অল্প, তারপরে হঠাৎ দাউ দাউ করে। কি হয়ে গেল হাওয়া-গাড়ীর! হাওয়া আর পানির গাড়ী আগুন হয়ে গেল। অধিকাংশই যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। কেউ কেউ আগুনের দিকে এগিয়ে যায়।

জ্বর গায়ে ঢোঁড়াইয়ের বাপ পালাতে আর পারে না।

ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি যখন পেঁাছোয় তখন ঢোঁড়াই ঘুমুচ্ছে বুধনী আসছে জল নিয়ে 'ফৌজী ইঁদারা থেকে। ফৌজের লোকদের কোশী-সিলিগুড়ি রোড দিয়ে মার্চ করে যাওয়ার সময় দরকার লাগবে বলে, এই ইঁদারাগুলো পথের ধারে ধারে বানানো হয়েছিল একসময়ে। আগেই ইঁদারাতলায় হল্লা হয়ে গিয়েছে যে পানি ছিল না বলে হাওয়া গাড়ী জ্বলেছে। তাই বুধনী হাঁকুপাঁকু করতে করতে এসেছে খাঁটির আসল খবর নেওয়ার জন্য 'পুরুখের (স্বামীর) কাছ থেকে। মাই গে! এ আবার কি! এসে দেখে 'পুরুখ' চাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। চোখ দুটো লাল শিমুল ফুলের মত! গা পুড়ে যাচ্ছে কলসীভরা জল খেতে চায়! খাও আরো পেয়ারা। বাপের কাতরানির চোটে ঢোঁড়াই ওঠে। এদিকে বাপ চেঁচায়, ওদিকে ঢোঁড়াই চেঁচায়। বাপে বেটায় চমৎকার! তারপর কদিন জ্বরে বেহুঁস। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক 'জড়ীবুটী', টোটকা-টাটকী অনেক চলে কিছুতেই কিছু নয়। জ্বরের ঘোরে 'গজ গজর গজর গজর' কি সব বলে, কখনো বোঝা যায় কখনও বা যায় না। কখনো ঢোঁড়াই, কখনও সেসর সাহেব, কখনো হাওয়া গাড়ী।......কদিন কি টানাপোড়েনই না গিয়েছে বুধনীর। তারপর তো শেষই হয়ে গেল সব।

একটা পয়সা নেই ঘরে। কিছুদিন আগে থেকেই রোজগার বন্ধ ছিল জ্বরের জন্য বুড়ো নুনুলাল তখন 'মহতো'। সে ছিল মহতোর মত মহতো। পুলিসের হাত থেকে আসামী ছিনিয়ে নেবার তার নাকি 'এক তিয়ার' ছিল। সে পঞ্চায়তীর জমা টাকা থেকে এক টাকা দশ আনা খরচ করে, নাপিত ঘাট, কিরিয়াকরম' (ক্রিয়াকর্ম) সব করিয়ে দেয়। দেড় বছরের ঢোঁড়াই মাথা নেড়া করে হাসে, আর গাঁ শুদ্ধ লোকের নেড়া মাথা দেখে, চেনা মুখকেও চিনতে পারে না! বুধনী কপালের মেটে সিঁদুর দিয়ে আঁকা চাঁদ মুছে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

অভ্যাস মত মহতো বলে—
ছিতি জল পাবক গগন সমীরা
পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা॥(৪)

---

টীকা:—

(১) তেজ—বুদ্ধিমান।

(২) **পড়া আরম্ভ করার সময়**—এদেশের ছেলেদের 'ওম্ নমস সিদ্ধং' বলে আরম্ভ করতে হয়। ছেলেরা তার মানে বোঝে না। তারা বিকৃত-ভাবে কথাটা উচ্চারণ করে 'ওনামাসি ধং, গুরুজী পড়হং' বলে পণ্ডিতমশায়কে চটায়।

(৩) **কলেক্টরের নাম ছিল কির্নাব সাহেব—১৯১৩ সালের কথা।**

(৪) মাটি জল আগুন আকাশ বাতাস—দিয়েই নশ্বর দেহ রচিত।

ওঠ্ বুধনী। এখানে বসে বসে কাঁদলেই কি চলবে। কোলের ছেলেটার কথাও তো ভাববি?

বুধনী বিধবা ছিল প্রায় বছর দেড়েক। বর্ষা নামলেই শুকনো বকরহাট্টার মাঠ নতুন ঘাসে সবুজ হয়ে যায়। এর পর মাস কয়েক বুধনী ঘাস বিক্রী করে টৌনে। অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে পুবে। মাঘ মাসে বুনো কুল, ফাগুনে চোতে শিমুল তুলো, আর কাঁচি আম, বাবুভাইয়াদের বাড়ী বিক্রি করা। এদিয়ে পেট চালানো বড় শক্ত। অন্য কোন রকম মজুরী করা তাৎমা মেয়েদের বারণ। তার উপর ঢোঁড়াইটাও আবার ভাত খেতে শিখলো, আস্তে আস্তে। দু দুটো পেট চালাতে বড় মেহনৎ করতে হয়। তাও চলে না।

বাবুভাইয়ারা আনাগোনা আরম্ভ করেন; বাবুলাল ঘোরাঘুরি করে তার বাড়ীতে। পাড়াপড়শী, 'নায়েব' 'মহতো' সবাই খোঁটা দেয়—মেয়েমানুষ আবার বিধবা থাকবে কি!

বুধনীও ভাবে, যদি অন্যের পয়সাই নিতে হয়, তবে বয়স থাকতে তাকে বিয়ে করাই ভাল। তার বয়সও ছিল, আর 'সিনুর লাগানোর'(৫) সখ যে ছিল না তা নয়। বাবুলালটা তখন এরই মধ্যে ডিষ্টি বোর্ডে ভাইচেরমেন সাহেবের চাপরাসীর কাজ পেয়ে গেল। লোকটা বড় হিসেবী। সে নিজের বিড়িতে একসংগে দুটোর বেশী টান দেয় না। তারপর নিবিয়ে কানে গুঁজে রাখে। বুধনীকে সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তিন বছরের ঢোঁড়াইয়ের ভার নিতে চায় না। "চুমৌনা" (৬) করতে ইচ্ছে হয় কর, না করতে ইচ্ছে হয় করো না; তা ব'লে পরের ছেলের ভার নিচ্ছি না।

অনেকদিন গড়িমসি করবার পর বুধনী মন ঠিক করে ফেলে।

একদিন সকাল বেলায় গোঁসাইথানে বৌকাবাওয়ার পায়ের কাছে ছেলেটাকে ধপ্ করে নামায়। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে নিজের দুঃখের কথা বলে। তারপর ঢোঁড়াইকে ঐখানে রেখেই বাবুলালের বাড়ী চলে যায়। ঢোঁড়াই তখন আঙুল-চোষা ভুলে বাওয়ার ত্রিশূলটা নিয়ে খেলা করছে। বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুণ্ডের উপরে তিনটে রেখা পড়েছে, ঠিক বালক শ্রীরামচন্দ্রজীর যেমন ছিল।(৭) ক্রমশঃ

(৫) সিনুর লাগানোর—বিয়ে করবার।
(৬) চুমৌনা—সাংগা।

(৭) "কটি কিঙ্কিনী উদর ত্রয় রেখা।
নাভি গভীর জান জিন্হ দেখা।"—
তুলসীদাস : বালকাণ্ড।

# বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জনগণের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা

## ........ ডক্টর শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী .....

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর বহুমুখী প্রতিভাতে—তাঁর কবিতার সুললিত ঝঙ্কারে, ছন্দের অপরূপ মাধুর্যে এবং গদ্যে, উপন্যাসে, নাট্যে, গল্পে, ভ্রমণকাহিনীতে, বিচিত্র পত্রাবলীতে, ও বিবিধ প্রবন্ধে ভারতকে নব ধারায় ও নবভাবে সঞ্জীবিত করেছিলেন সেই স্নিগ্ধ ধারা নির্ঝরিণীর সুশীতল বারির ন্যায় আমাদের তাপক্লিষ্ট হৃদয় আজিও স্নাত ও সিক্ত করছে। আমরা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করি তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন এবং তাঁর মংগল হস্ত ও শাশ্বত বাণী সকলকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করছে। তাঁর পার্থিব দেহ আমাদের মধ্যে নাই বটে, কিন্তু সেই দেহ যে মৃত্যুহীন প্রাণ বহন করেছিল সেই অজর অমর প্রাণ জরাজীর্ণ দেহমুক্ত হয়ে আজ আমাদের সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। আমরা কি কখনও ভাবতে পারি তিনি আমাদের মধ্যে নেই? তিনি পূর্বেও আমাদের ছিলেন, এখনও আমাদের মধ্যে এবং পরেও আমাদের ছেড়ে যাবেন না। তাঁর অক্ষয় কীর্তি চিরসবুজ, চির সুন্দর ও চির-জাগ্রত। শুধু তাঁর বেলায় নয় সমস্ত মহাপুরুষদের ঐ একই নিয়ম। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলছি, "ক্ষণজন্মা লোক যাঁরা তাঁরা শুধু বর্তমানকালের নন। বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকখানি ছোট করে আনতে হয়, এমনি করে বৃহৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাশ্বত মূর্তি প্রকাশ পায় তাকে খর্ব করি। আমাদের আশু প্রয়োজনের আদর্শে তাঁদের মহত্ত্বকে নিঃশেষিত করে বিচার করি। মহাকালের পটে যে ছবি ধরা পড়ে বিধাতা তার থেকে প্রাত্যহিক জীবনের আত্মবিরোধ ও আত্ম খণ্ডনের অনিবার্য কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখাগুলি মুছে দেন, যা আকস্মিক ও ক্ষণকালীন তাকে বিলীন করেন, আমাদের প্রণম্য যাঁরা তাঁদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মূর্তি সংসারে চিরন্তন হয়ে থাকে।"

রবীন্দ্রনাথ জমিদার বংশে জন্মেছিলেন ও সুখে লালিত পালিত হয়েছিলেন, সুতরাং দারিদ্র্যের নির্মম আঁচড় তার গায়ে কখনও লাগেনি। তিনি কবিতা রচনা, উপন্যাস লেখা ও সংগীত প্রভৃতি সুকোমল ও সুচারু কলার উৎকর্ষসাধনেও খুবই ব্যস্ত থাকতেন। কবিমন সাধারণতঃ ভাবপ্রবণতায় অতিমাত্রায় অস্থির ও বাস্তব জগতের প্রতি উদাসীন থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা এরকম চিত্রের পরিচয় পাই না। আমরা দেখতে পাই বাস্তবের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং জমিদার বংশে জন্মেও তিনি কার্যে ও চাল-চলনে সাধারণ-জমিদারগণের মত আভিজাত্য-বোধে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেন নাই। তিনি নিজেকে প্রজা হতে পৃথক করে দেখতেন না, তিনিও তাদেরই একজন—এইভাব তাঁর জীবনে সব সময়ে জাগ্রত ছিল। সমাজের মধ্যে যে বিভেদ,—উচ্চ ও নীচ, ধনী ও নির্ধন, প্রজা ও জমিদার,—এই এক এক স্তরের মধ্যে যে এক একটি পর্দা টেনে মানুষ মানুষকে পৃথক করে রেখেছে, মানুষ মানুষকে তাচ্ছিল্য করে, অবহেলা করে, একে অপরের উপরে আধিপত্য বিস্তার করে এবং একজন অপর একজনকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে এ সব কেন? মানুষের সংগে মানুষের ব্যবহারে, চলাফেরায় কেন একজন অপর একজনকে সমানভাবে দেখবে না, উচ্চ, নীচ ভেদ কেন থাকবে? মানুষে মানুষে এত বৈষম্যমূলক ব্যবহার কেন দেখতে পাই? যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের জন্য ফসল জন্মায়, যারা আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় —এক কথায় বলতে গেলে যাদের না হলে আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হত সেই চাষীদের প্রতি আমরা কিরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করি! তারা কি রকম অজ্ঞানতায়, ও অন্ধকারে পড়ে আছে এবং তারা কি ভয়ানক নিঃসহায় অবস্থায় ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করে। শিলাইদহে যখন তিনি জমিদারীর কাজ দেখা-শুনা করতেন তখন তাঁর মনের মধ্যে এসব প্রশ্ন আলোড়ন করত, কিন্তু সবচেয়ে বেশী তাঁর এই সব বিষয়ে আলোড়ন হয়েছে রাশিয়া পরিভ্রমণের পরে। তিনি বলছেন, "কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সংগে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা—ওদের

সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মত নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পেঁছিয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।”

আর এক যায়গায় বলছেন, “একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্য চর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোন কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন একথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি-পল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে একথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা, আমিই একাজে লাগব। ... ... ...

“তারপর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙ্গল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।”

পল্লীসেবা এবং কৃষকদের মঙ্গল করা তাঁর কর্মময় জীবনের মহা ব্রত ছিল। যখন যতটা পেরেছেন সেখানেই এই সহায় সম্বলহীন চাষীদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন। জমিদারকে জমিদারীর স্বত্ব ত্যাগ করতে বলা অতি ভয়ানক কথা। কিন্তু তাঁর মনকে জমির উপরে যে প্রজার স্বত্বের কথা আন্দোলিত করেছে, যদি সেইরূপ আরও জমিদারদের প্রাণ প্রজাদের জন্য উদ্বেলিত হত তাহলে জমিদারী প্রথা বহু পূর্বেই এদেশ হতে নির্বাসন পেত সন্দেহ নেই। ইহা তাঁর মনের অসীম বল ও সত্যকে সত্য বলেই পরিচয় দিতে তাঁর যে কুণ্ঠা বোধ ছিল না তারই সুন্দর পরিচয়—সে সত্য যতই কঠিন হোক্ বা তাতে নিজের বা অপরের স্বার্থের সংঘাত যত বড়ই আসুক তাতেও কোন ভয় নেই। গরীবের দুঃখে ও ব্যথিতের ব্যথায় সব সময়ে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছে—তাঁর বিভিন্ন লেখা হতে এর যথেষ্ট পরিচয় আমরা পাই।

গ্রামের বর্তমান দুর্দশা ও দুঃখকষ্টের ছবি তাঁর কোমল অন্তঃকরণে একটা ভয়ানক ব্যথার রেখা টেনে দিয়েছিল। ভারতের গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা-ত চিরকাল ছিল না। এখানে পূর্বে সকলে মিলে মিশে চলত, একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, এখানেই দেশের যথেষ্ট সুখ ও আনন্দের উৎস ছিল, পূজো পার্বণে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র—এইসব ভেদাভেদ তখন এত সংকীর্ণতার গণ্ডী টেনে দিত না—পূজো পার্বণে সকলে একত্রিত হত, এবং একে অপরের দুঃখে ও বিপদে সহায় হ'ত। এখন গ্রামগুলি যেন অতীত গৌরবের কঙ্কাল-স্বরূপ। শহর যে তখন গ্রাম অপেক্ষা বড় ছিল না তা নয়, তবে এখনকার মত তখন শহরেই সমস্ত সুখ-সুবিধা কেন্দ্রীভূত ছিল না। এখন যেমন গ্রামগুলি শহরের উচ্ছিষ্টের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন মোটেই তা ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথের কামনা ছিল “গ্রামগুলি শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্তভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক।”

পল্লীকে গড়ে তোলার যে আদর্শ তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল, সেই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্যই তাঁর শ্রীনিকেতনে এত শ্রম ও সাধনা। কবির নিজের ভাষাতেই বলছি; তিনি বলছেন, “এটা খুব করে বুঝেছি, আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে, ঐখানে ছোট আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত।” জমিদারী হালচালের উপরে তাঁর কখনও মন ছিল না, বিশ্বাসও ছিল না—এসব যেন তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হত; তাই তিনি জমিদারীর বিলাস-বাসন ত্যাগ করে বোলপুরের নিভৃতে প্রকৃতির শান্তি ও শোভাময় ক্রোড়ে পল্লী-মায়ের স্নিগ্ধ অঞ্চলে তাঁর সাধনার কেন্দ্র রূপায়িত করলেন।

তিনি কখনও দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখবার চেষ্টা করেন নি, বরং দেশের জনগণের অবস্থার প্রতি তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন। কাহারও দুঃখ-দারিদ্র্য, অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনী শুনলে তাঁর প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠত এর প্রতিকারের জন্য—তাঁর অমর লেখনীতে এই সমস্ত বিষয়ে তাঁর কঠোর ও দৃঢ় মনের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাই। বিদেশীয় বণিকগণ যে এই দেশের লোককে শোষণ করে এখানকার দারিদ্র্য আরও বাড়িয়েছে, এদেশে অন্ন-বস্ত্রের হাহাকার তুলেছে, তা দেখে তাঁর প্রাণ কত অসহ্য বেদনা অনুভব করেছে এবং এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কত তীব্র প্রতিধ্বনি জেগেছে তাঁর আবেগময়ী ভাষায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। দেশের জমিদার ও মহাজনের দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি অত্যাচারের কাহিনীতেও তাঁকে কম পীড়া দেয় নি। যেখানেই সম্ভব হয়েছে, তিনি তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন। মানব-প্রীতি, নির্যাতিত ও দরিদ্র অসহায় লোকের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি তাঁর জীবনে সব সময়ে জাজ্বল্যমান ছিল। এণ্ডরুজ সাহেব বলেছেন, “শান্তিনিকেতনে বিচিত্র কর্মব্যস্ততার ভিতরেও কবির দরিদ্র-প্রীতি কদাপি ম্লান হয় নাই।” তিনি আরও বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে “প্রকৃতি-প্রীতি, নির্জনতার অভিলাষ, ভারতের পল্লী-জীবনের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ ও দরিদ্রের প্রতি সহজ ও সুগভীর সহানুভূতি” অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। “মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় তিনিও দরিদ্রের সহিত একত্র বাস করিয়া তাহাদের দুঃখ-দৈন্যের ভার বহন করিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়েরই একমত যে, দেশসেবিবৃন্দ যতদিন না সমস্যার আবাঙ্খিত অন্তিম দারিদ্র্যগ্রস্ত, সমাজে সর্বনিম্নস্থ, সর্বহারা হতভাগ্যের সেবায় তৎপর না হইবেন, ততদিন ভারতের স্বাধীনতা লাভ কদাপি হইবে না।” দেশের অধিকাংশ লোককে যদি দারিদ্র্য অজ্ঞানতা ও অন্ধকারে দূরে ঠেলে পর করে রাখা হয় সেখানে মুক্তি কোথায়? সেজন্য রবীন্দ্রনাথের একান্ত কামনা ছিল শিক্ষায়, দীক্ষায় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধায় তাদের দুঃখ-কষ্টের লাঘব করা এবং তাদের মন নূতন ছাঁচে গড়ে তোলা।

তাই আমরা আজ রবীন্দ্রনাথকে যেমন বিশ্বকবি ও যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে হৃদয়ের অর্ঘ্য প্রদান করছি, তেমনি দুঃস্থ মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হিসাবেও তিনি আমাদের প্রণম্য।

# অনুবাদ সাহিত্য

## প্রতিহিংসা

সামুয়েল ব্লাস

গোধূলির সোনার আলো উপত্যকার বুকে প্রায় মিলিয়ে এলো। বহুদূরে নীচে শহর আর দেখা যায় না। তবে দুটি একটি আলো জ্বলে উঠছে বলে বোঝা যায় ওখানে মানুষ আছে। আমাদের গাড়ি ইঞ্জিনের গুরু-গম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে চড়াই আর উৎরাই অতিক্রম করে চলেছে। মাথার ওপরের আকাশের কোনো সীমা আছে বলে মনে হয় না। চারপাশ নীরব, নিথর। বিশাল স্তব্ধতার যেন কোনো শেষ নেই। বড়ো আলো জেলে এগিয়ে যেতে হোচ্ছে। সেই আলোকে হঠাৎ দুটো কথা চোখের সামনে যেন ভেসে উঠলোঃ সাবধান—সামনে ভীষণ বাঁক! গাড়ীর গতি কমিয়ে দেওয়া হোল। বাঁক পার হোয়ে এলুম। না কোনো বিপদ ঘটলো না, তবে এলমা যেদিকে বসেছিল সেদিকে একটা গাছের ডালের সংগে একবার আমাদের গাড়ীর সংঘর্ষ বাধলো, কয়েকটা পাতা বৃন্তচ্যুত হোয়ে এলমার গায়ে ঝরে পড়লো।

এলমা কিন্তু নীরব, নিশ্চল। ওকে দেখলে মনে হয় মাথার ওপরের স্তব্ধ আকাশের অংশ বিশেষ। ওকে জোর করে তুলে এনে এই গাড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসতে কিম্বা কথা বলতে ও যেন ভুলে গেছে। দুটি চোখে খালি গভীর বিষণ্ণতা। স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে শুধু বসে আছে। দেখলে মনে হয় পাথরের মূর্তি। অথচ আজই সকালে কি প্রাণময়ীই ও ছিল। আমাকে বিদায় দিতে গিয়ে যে হাসি হেসেছিল, তা কি কথায় বোঝানো যায়। সে হাসি মেঘের বুকে রোদ যেন ঝিলিক দিয়েছিল, রঙ ধরেছিল বর্ষার কালো দিগন্তে। শহরে না গিয়ে কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু কুটিরের দরোজার বাইরে এসে ওর দুটি হাত ধরে মনে হয়েছিল কোথাও যাবো না। এলমাকে সেই কথা বলবো ভাবছি এমন সময় সে হেসে উঠেছিল। দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ছিঃ! —ওর সেই অস্ফুট লজ্জাকে আরো গভীর করে সর্ব-শরীরে জাগিয়ে দিয়েছিলুম একটা চুমু দিয়ে। তারপর গাড়ীর ইঞ্জিন খুলে দিয়ে আমিও হেসেছিলুম।

সামান্য একটু ছোঁয়ায় কি অপূর্ব না হোয়ে ওঠে এই জীবন। আজ আমি সত্যি শহরে যেতুম না। কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। খাবার ফুরিয়ে গেছে। বিয়ের পর মধুচন্দ্রিকা যাপনের জন্যে জলার মাঝখানে আমি এই বাড়ীটা খুঁজে বের করেছিলুম। বাড়ী নয় ঠিক কুটির। তাহোক। মধুচন্দ্রিকা যাপনের এমন সুন্দর স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এলমাও আমার কথা স্বীকার করে। তবে অসুবিধাও আছে। কাছাকাছি কোনো লোকালয় নেই। দরকারী জিনিষের জন্যে যেতে হবে আট মাইল দূর শহরে। অন্যদিন এলমাও সংগে যায়। আজ কিন্তু সে নিজেই রাজী হয়নি। আমি বার বার প্রশ্ন করাতে সামান্য হেসে বলেছিল, পরে দেখতে পাবে। চুমু দিয়ে এলমাকে জব্দ করার পর থেকে মনটা আমার খুসীতে চঞ্চল হোয়ে উঠেছিল। জিনিষপত্র কেনাকাটা করতে বিশেষ সময় লাগলো না। মনে মনে স্থির করলুম এলমাকে দেওয়ার জন্যে কিছু উপহার নেবো। তাও নেওয়া হোল। বেলা বেশি হয়নি। সামান্য ক্ষিধে লাগলেও কোনো হোটেলে না গিয়ে আমি বাড়ীর পথে পাড়ি জমালুম। চৌমাথার ওপর গাড়ি থামাতে হোল। সামনে সাংকেতিক আলোয় নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোয়েছে। লাল আলোর শাসন কিছুতে আর শেষ হয় না, আমিও ধৈর্যের শেষ সীমানায় পৌঁছেছি এমন সময় কানে এলো হকারের চীৎকারঃ জোর খবর। জেল থেকে খুনে কয়েদী পালিয়েছে। একখানা কাগজ কিনে ফেললুম। পড়ে দেখি দু জন কয়েদী পালিয়েছিল, তাদের মধ্যে অবশ্য একজনকে গ্রেপ্তার করা হোয়েছে। অপরজন তখনও পলাতক, সন্দেহ করা হোচ্ছে কারাগারের সন্নিকটবর্তী জংগলে আত্ম-গোপন করে রয়েছে।

ভাবনা ধরে গেল। সাংকেতিক আলোর নিষেধাজ্ঞা সরে গেছল। গাড়ি চালাতে চালাতে মনে মনে চিন্তা করে দেখলুম, আমার সেই কুটির হোতে জংগল কতোদূরে। না, খুব কাছে নয়। তবে মনটা কেমন চঞ্চল হোয়ে উঠতে লাগলো। এলমা বেচারী একাকী আছে। চারপাশে লোকজনও কোথাও কেউ নেই। যদি সে বেতার খুলে থাকে, তবে যথাসময়ে খবরটা শুনে সাবধান হোতে পারবে, আর তা না হোলে—কিন্তু খবর শুনে যদি ও ভয় পায়!

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলুম। কিছুটা বনভূমি, কিছুটা উৎরাই, কিছুটা চড়াই আর খাদের পাশে পাশে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। সেই সর্পিল পথের প্রতিটি বাঁক পার হওয়ার সময় আমি নিজেকে দোষ দিতে লাগলুম, এলমাকে একাকী ফেলে রেখে এসেছি বলে। এমন কি মনে হোতে লাগলো, ও আসতে না চাইলেও আমার উচিত ছিল ওকে জোর করে ধরে আনা।

আঁকাবাঁকা পথ এক সময় শেষ হোয়ে গেল। সামনে মাঠ অতিক্রম করে এইবার সোজাপথ চলে গেছে। মাঠের শেষে জলাভূমি শুরু হয়েছে। তারপরই আমাদের কুটির। এই পথের ওপর এসে মনটা অনেকটা নিরুদ্বেগ হোল। আর একটুখানি। তারপর মোটরের শব্দ কাণে যাবে, এলমা হাসিমুখে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আমাকে ও কি চমকে দেবে? ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার দু হাত চেপে ধরে, বলবে, না গো, না, আমি একটুও ভয় পায়নি। কিন্তু হাত-ধরার ভংগী থেকেই ধরা পড়ে যাবে তার অন্তরের কথা। এটা ঠিক হাত-ধরার সংগে সংগে এলমার সব ভয় শেষ হোয়ে যাবে। তার সেই সুন্দর হাসিতে চোখ ভরে যাবে, মুখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠবে, আর আমাকে বলবে, শিগ্‌গির চোখ বন্ধ করো, দেরী হোয়ে গেলে আমি জানি না বাপু! এলমার কথা শেষ হওয়ার আগে যে আমি চোখ বন্ধ করবো সে কথা কি বলতে হবে?

বিয়ে হোয়েছে আমাদের একমাস। সময়ের অনন্ত অংকের অনুপাতে একমাস কিছু নয়, আমি কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ওর ওই হাসিকে চিনতে পেরেছি আর ভালোবেসেছি। আর সব থেকে ভালোবাসি ওর ওই মৃদু হাসি যখন কলহাস্যের ঝংকারে বেজে ওঠে। লোকের সামনে যখন সে আমার কাছে দাঁড়ায়, তখন কি গভীর লজ্জা যে ওকে অভিভূত করে তা বলবার নয়। কিন্তু সেই লজ্জা, সেই ব্রীড়াবনতভাব আমার ভারি ভালো লাগে। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয় আমার সমস্ত জীবনের কেন্দ্রস্থলে সূর্যমুখী ফুলের মতোন ও ফুটে উঠেছে—আমার দিকে ছাড়া আর কারোর দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না। ওর ওই গভীর লজ্জা মানুষকে চঞ্চল করে তোলে, চুম্বকের মতোন টানে। ও নিজেও বোধ হয় সেকথা অনুভব করে। যখন কেউ অসংকোচে ওর দিকে বার বার চায়, আমাকে তখন ও জড়িয়ে ধরে, কানে কানে বলে আরো জোরে ওর হাত চেপে ধরতে। কিন্তু কেন একথা বলে, তা সে কখনো খুলে বলে না। আমার প্রশ্নে, তার

ছোট দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে, না হয় আঙুল দিয়ে আমার হাতে বার বার দাগ টেনে যায়।

আমার গাড়ি যখন আসলো, মধ্যাহ্ন সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপর। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললুম, খুব শীঘ্র ফিরেছি। দরোজার দিকে চাইলুম এলমার সেই হাসিমাখা মুখখানি দেখার প্রত্যাশায়। কিন্তু কোথায় এলমা? চোখ পড়লো একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ওপর। সেই তীব্র রোদেও দেখি কুটিরের মাথায় একটা ধোঁয়ার জাল ছড়িয়ে গেছে—দরোজার ঈষৎ উন্মুক্ত কপাট দিয়ে অনর্গল ধোঁয়ার স্রোত বেরিয়ে আসছে।

সারা মাঠে ঝরাপাতা ছড়িয়ে পড়েছে। চারপাশে একটা স্তব্ধতা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটি মুহূর্ত নিশ্চল হোয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর ছুটে গিয়ে সেই অর্ধোন্মুক্ত দরোজা ধাক্কা দিয়ে খুলে কুটিরের মধ্যে ঢুকে গেলুম।

গাঢ় ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলা যায় না। দু একটা মুহূর্ত ধরে অনবরত কাসিতে আমি অভিভূত হোয়ে রইলুম। খোলা দরোজা দিয়ে মেঠো বাতাসের স্রোত ঘরের ধোঁয়া সরিয়ে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই কুয়াশার মতোন ধোঁয়া পাতলা হোয়ে গেল। কোনো উত্তাপ নেই। বুঝতে পারলুম আগুন লাগেনি—অন্য কোনো ব্যাপার হোয়েছে। উনানের ওপর চোখ পড়লো। চাটুতে বসানো খাবার পুড়ে গিয়ে ওই ধোঁয়া আর দুর্গন্ধের সৃষ্টি হোয়েছে। খাবারটা আর কিছুই নয় চপ্। আরো দুটো জিনিষ চোখে পড়লো। অগ্নিকুণ্ডের ওপর বসানো হাড়িতে বীন্ একেবারে পুড়ে কয়লা হোয়ে গেছে, আর বিজলীর উনানে যে জিনিষটা এখনো পুড়ছে ওটা নিশ্চয় মিষ্টি পিঠে ছিল। এলমা বোধ হয় ওই খাইয়ে আমাকে চমকে দেবে বলেছিল।

একটা অজানিত ভয়ে আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠলো। চীৎকার করে উঠলুম, এলমা!

কোথায় এলমা। আমার সেই কম্পিত গলার ডাক সমস্ত ঘরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোয়ে গেল, বার বার শব্দ উঠলো, এলমা, এলমা!

কোথায় গেল সে। বাইরে নিশ্চয় যায়নি। জানে খাবার পুড়ে যাবে! কাছাকাছি কোনো প্রতিবেশী নেই—তার কাছে যাবে। তাহোলে?

নীরব হোয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছি কি ব্যাপার হয়েছে যে এলমা অনুপস্থিত, এমন সময় কানে এলো একটা অস্ফুট নিঃশ্বাসের শব্দ। চোখ গিয়ে পড়ল আমাদের বিছানা আড়াল করা মোটা পর্দার ওপর। মনে হোল ওইখানে সে শুয়ে নেই তো? ঝাঁপিয়ে পড়ে পর্দা ধরে টানলুম, দেখি বিছানার ওপর অসাড় হোয়ে এলমা পড়ে আছে। সমস্ত মুখ সাদা, নিঃশ্বাস পড়ছে কি না বোঝবার কোনো উপায় নেই।

ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলুম, এলমা!

কোনো সাড়া পেলুম না। একটুখানি ভালো করে দেখে নিশ্চিত হলুম যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ঠিক চলেছে। ওর দুটি হাতের তালু বার বার ঘসতে সুরু করলুম, কপালের পাশের দুটি শিরা টেনে দিলুম যাতে রক্ত চলাচল ঠিক করে। তারপর ঝাঁকুনী দিতে লাগলুম। প্রথমে আস্তে, তারপরে জোরে এবং অবশেষে আরো জোরে। বার কয়েক ঝাঁকুনী দিয়ে কিন্তু ভয় হোল—যদি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হোয়ে যায়। কিন্তু আমার ভয় মিথ্যে। এলমা হঠাৎ যেন নড়ে উঠলো।

এখন দরকার হোচ্ছে ডাক্তার ডাকা। কিন্তু এই অবস্থায় ওকে ফেলে রেখে কেমন করে ডাক্তার ডাকি। বসে বসে ভাবছি কি করি, এমন সময় মনে পড়লো ব্র্যাণ্ডির কথা। লাফিয়ে উঠে আমাদের খাবার রাখা দেয়াল আলমারিটা খুলে দেখলুম। একটা গ্লাস আর ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নিয়ে বিছানার পাশে ফিরে এলুম। গ্লাস ভর্তি করে সেই তীব্র আরক ঢেলে একটা চামচ তুলে নিলুম। বার বার আমার হাত কেঁপে গেল, তা সত্ত্বেও এক সময় এলমার দুটি ঠোঁটের ফাঁকে চামচ হোতে খানিকটা আরক ঢুকিয়ে দিলুম।

প্রায় দু'চামচ আরক দেওয়ার পর কাজ হোল। ওর ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো। সেই অসাড় আর বিবর্ণ ভাব কেটে গেল, বড়ো বড়ো গোটা কয়েক নিঃশ্বাস পড়লো। একবার কেশে উঠে, চোখ মেললো। সে চোখের দৃষ্টি শূন্যতায় ভরা।

অনেকখানি সময় চলে গেল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে সেই উদাসীন চোখ মেলে শুয়ে রইলো। আমিও নির্বাক হয়ে ওর পাশে বসে সজোরে ওর হাত চেপে চেপে ধরছি, এমন সময় হঠাৎ একটা করুণ আর্তনাদে সারা ঘর ভরে গেল, ও আমার হাত ছিনিয়ে নিতে চাইলো। বুঝতে পারলুম চেতনা ফিরলেও ভয় ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ওকে জড়িয়ে ধরলুম কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে সাহস দেবো বলে। আমার টানেতে গায়ের চাদর সরে গেল, সবিস্ময়ে দেখলুম ওর অঙ্গে কোনো আবরণ নেই, ও সম্পূর্ণ পরিধেয় শূন্যা। সমস্ত দেহে রূঢ় আঘাতের চিহ্ন, কে যেন মেরেছে। কাঁধে আর গলার ওপর আঙুলের কঠিন নীল নীল দাগ পড়ে গেছে, বুকের ওপর সবল মুষ্ট্যাঘাতের নির্মমচিহ্ন কর্কশ হোয়ে জেগে উঠেছে—সে চিহ্ন চোখ মেলে দেখা যায় না।

আমার দেহের একটি একটি শিরা ধরে কে যেন ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। আমি জানি না কে আমাকে কুরে কুরে খেতে লাগলো লজ্জা না ক্রোধ? আমার সে সময়কার অবস্থা এ জীবনে কোনদিন আমি কথায় বোঝাতে পারবো না। মনে হোল সমস্ত জগৎ ও এলমাকে ঘিরে গতিহীন হোয়ে গেছে। একটু একটু করে সময় চলে যেতে লাগলো, নিশ্চল হোয়ে বসে রইলুম আমি। জানি না কি করবো। আমার জড়তা ভেঙে গেল এলমা হঠাৎ নড়ে উঠতে। ওকে আরো নিবিড় করে বুকে চেপে ধরে বাইরের দিকে চাইলুম। দু চোখে আমার তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। সে আগুন দেখলে ও হয়তো আরো ভয় পেয়ে যাবে কেননা পরিষ্কার বুঝতে পারলুম ওর ভয় মোটে যায়নিঃ আমার সেই দৃঢ়বদ্ধ বাহুর মধ্যে সে তখন অনবরত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সেই কম্পন বন্ধ হোল কান্নার প্লাবনে। এক সময় দেখি ও কাঁদছে, আকুল হোয়ে অবিশ্রান্ত অঝোর ঝরে কেঁদে চলেছে, ওই কান্নার বিরাম নেই, ওই অশ্রুঝরনের কোনো বিরতি নেই।

অকস্মাৎ চমকে উঠলুম, ও কথা বলছে কণ্ঠস্বরে কোনো প্রাণ নেই, কলের পুতুলের মতোন বলছে, আমাকে ও মেরে ফেলেছে—আমি, আমি মরে গেছি।

একটার পর একটা কথা সাজিয়ে আমার পক্ষে বলা অসম্ভব যে কেমন করে এই ঘটনার ইতিহাস আমি জানতে পারলুম। কেননা প্রথমে ও কোনো কথা বলতে গেলেই হয় ফুঁপিয়ে ওঠে, না হয় নিঃশব্দে কাঁদে, দু-চোখের কোণ দিয়ে অনবরত জল গড়িয়ে পড়ে। না হয় কিছুই না করে আমাকে খালি নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। আর আমি ওকে ছোট মেয়েকে ভোলানোর মতোন করে আদর করি, মিষ্টি কথা বলি আর বুকের মধ্যে ঘন করে চেপে ধরি।

অনেকটা সময় এই ভাবে বেরিয়ে গেল। তারপর ও একটু শান্ত হোল। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলো। কিন্তু দুটো একটা কথা বলতে না বলতে ভয়ে শিউরে উঠলো, সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগলো। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আর কোন সংযত করতে পারলুম না, উন্মাদের মতোন প্রশ্ন করে চললুম, কে, কে এ ব্যাপার করেছে, কখন এসেছিল সে? কেমন দেখতে, কি ভাবে তোমাকে আক্রমণ করলো?

বহুক্ষণ পরে আমার এই প্রশ্নবর্ষণের তীব্রতা ক্ষীণ হোয়ে এলো। ও তখন এই মর্মন্তুদ ঘটনার ইতিহাস বিবৃত করেছেঃ একজন লোক, ওকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে। হাতে তার একটা সুটকেশ আর সেই সুটকেশে নাকি নানা রকমের মনোহারী জিনিস ছিল।

এলমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলুম, ঠিক বলছো তুমি, কোনো ভুল হচ্ছে না?

—না। এলমা আস্তে আস্তে মাথা নাড়লোঃ তার কোনো ভুল হয়নি।

আমার অনুমান তা হোলে মিথ্যা। সেই পলাতক কয়েদী এখানে আসেনি, এসেছিল একজন হকার। তাই বা কেমন করে হবে—একজন অতি সাধারণ লোক এই নির্মম আঘাত হানতে পারে?

এলমা বলে যেতে লাগলো, সে তখন রান্না নিয়ে ব্যস্ত। একসঙ্গে তিনটে জিনিস রাঁধছে সে। কড়া নড়তে দরজা খুলে দেয়। লোকটা রান্নার বাসনপত্র বিক্রয় করে বলে নিজের পরিচয় দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে আসে আর সমানে এলমা কিছু নিক এই দাবী করতে থাকে। সকল সময়ই কিন্তু এলমার দেহের ওপর তার চোখ চঞ্চল হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কথা বলতে বলতে সুটকেশটা মাটিতে নামিয়ে রাখে যেন খুলে জিনিসপত্র দেখাবে। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাহু চেপে এলমাকে জড়িয়ে ধরে। মূর্চ্ছিত না হোয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত এলমা বাধা দেয়। তারপর—তারপর তার আর কিছু মনে নেই।

এলমা বলতে বলতে ও যেন নির্জীব হোয়ে গেল। মনে হোল আবার যেন ওর ওপর আক্রমণ শুরু হোয়েছে। দেখি ও সত্যি সত্যি আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, অস্ফুট কণ্ঠে বলছে, মেরে ফেললে, উঃ আমাকে মেরে ফেললে, ওগো আমাকে মেরে ফেললে......

দুটো বাহু ধরে সজোরে ওকে ঝাঁকুনী দিলুম। কতকটা চেতনা ফিরে এলো সেই ঝাঁকুনিতে, কিন্তু আর্তনাদ বন্ধ হোয়ে গেলেও চোখে ভয়ের কালো ছায়া ভেসে বেড়াতে লাগলো। একটু মন দিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যায় ও যেন চোখের সামনে সেই ওর অনায়ত্ত লোকটিকে দেখতে পাচ্ছে।

পুলিশের কথা আমি একবারও ভাবিনে। আমার চিন্তা তখন একটি মাত্র জায়গায় কেন্দ্রীভূত। আমি শুধু ভাবছিলুম কি করে প্রতিহিংসা, হ্যাঁ, নৃশংস প্রতিহিংসা নেওয়া যায়। দাঁতে দাঁত কসে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, এই নিষ্ঠুর দানবটাকে আমি খুঁজে বের করবো আর নিজে হাতে খুন করে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবো।

চীৎকার করে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। আমার সেই চীৎকারে এলমা বোধ হয় ভয় পেয়েছিল। আমার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ আমার দুহাত চেপে ধরেছিল। তারপর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, খুব শান্ত গলায় বলেছিল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, ঠিক, ঠিক বলেছো।

আমি তখন ক্রোধের দাবাগ্নিতে পুড়ে মরছি। এলমাকে জিগ্যেস করলুম, তুমি তাকে চিনতে পারবে?

—হ্যাঁ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর। কিন্তু বলার ভঙ্গী গম্ভীর এবং সংযত। আগ্রহও যেন প্রস্ফুট হোয়ে উঠেছে।

—বেশ। ওঠো জামা-কাপড় পরো। তারপর আমাদের সেই শয়তানের খোঁজে যেতে হবে।

আবার মোটরের ইঞ্জিন গর্জে উঠলো। একটু আগে যে পথ দিয়ে এলমার জন্যে আকুল হোয়ে ছুটে এসেছিলুম, সে পথ দিয়ে এইবার যে যাত্রায় এলমাকে নিয়ে চললুম জানি না তার শেষ কোথায়। আমি কিন্তু একটুও আশা ছাড়িনি। বরং আমার পরিকল্পনা যাতে সফল হয় সেই জন্যে এলমাকে কতকগুলি কথা বেশ বুঝিয়ে বললুম। মন দিয়ে ও আমার কথাগুলো শুনলো।

ধীরগতিতে পথাতিক্রম করে আমাদের গাড়ি চললো। আমার কথা মতো বেশ শান্ত হোয়ে বসে এলমা প্রতিটি পথচারীকে লক্ষ্য করতে লাগলো। সূর্য পশ্চিমদিগন্তে হেলে পড়েছে এমন সময় আমাদের গাড়ি শহরে ঢুকলো।

এক জায়গায় অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সামনে এক সারি দোকান। হঠাৎ চোখে পড়লো একটা লোক সেই গাড়িগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে আড়চোখে চাইছে আর দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছে। এলমাকে বললুম, দেখো তো—

এলমা মাথা নাড়লোঃ অর্থাৎ না।

পরমুহূর্তে সে সজোরে আমার হাত চেপে ধরলো। মুখের দিকে চাইতে দেখি ওর সমস্ত মুখ বিবর্ণ হোয়ে গেছে, দুটি ঠোঁট যেন উত্তাপে শুকিয়ে উঠেছে। আঙুল তুলে সে একখানা দুই রঙের গাড়ির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দেখি হোটেলের সামনে গাড়িখানা সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, একটি লোক গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করছে।

চাপা গলায় এলমা বলে উঠলো, ওই যে।

আমার ধমনীর রক্ত যেন এক মুহূর্তে আগুনের মতো ফুটে উঠলো। এলমার সেই নিষ্প্রভ চোখের দিকে চেয়ে বললুম, ঠিক বলছো?

এলমা তখনো সেই লোকটির দিকে চেয়ে আছে, আমার প্রশ্নের উত্তরে সে সেই পূর্বেকার নতকণ্ঠ আরো যেন নত করে বার বার বলতে লাগলো, ওই, ওই যে।

আমার মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলুম। সে লোকটা তখন পকেট থেকে চাবির গোছা তুলে নিয়ে অগ্রসর হোয়েছে। এলমাকে বললুম, চুপ করে এখানে বসে থাকো—আমি এখনি ফিরে আসছি।

অত্যন্ত শ্লথগতিতে গাড়ি থেকে নামলুম। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নেই। আমি শান্তপায়ে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। লম্বা দালানে বাইরের আলো প্রায় নেই—আবছা অন্ধকারে চার পাশ ঢাকা পড়েছে বলা চলে। লোকটা দালান পার হোয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। হাতে তার একটা সুটকেশ।

ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ নয়। দেখি কেউ কোথাও নেই। ও এগিয়ে গিয়ে দরোজা খুলে ঢুকে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। এইবার এগিয়ে এসে আমি দরোজায় করাঘাত করলুম, ঠক্ ঠক্ ঠক্!

লোকটা ভয়ানক আশ্চর্য হোয়ে গিয়েছিল। দরোজা খুলে আমার মুখের দিকে নীরবে চাইলোঃ কেন যে আমি এসেছি তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। একটু পরে সামান্য হেসে আমাকে সাদরে আহ্বান করেছিল, আসুন, আমাকে কিছু দরকার আছে?

ওর হাসি আর আহ্বানের স্বচ্ছভঙ্গী আমার গায়ে বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিলো। কোনো কথা না বলে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লুম এবং ও দরোজা ভেজিয়ে যেমন অগ্রসর হোল, অমনি আমার পাজামার পকেট থেকে হাতুড়ীটা বার করে নিলুম। বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগলো না, সবলে তার মাথায় সেই হাতুড়ী বসিয়ে দিলুম।

একটা করুণ আর্তনাদে সারা ঘর ভরে উঠলো। তারপর একটা ক্ষীয়মান নিশ্বাস যেন বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। তারপর আমারি পায়ের সামনে ওর দেহটা নিস্পন্দ হোয়ে পড়ে রইলো।

ওই নির্জীব দেহটার প্রতি তাকিয়ে হঠাৎ আমার সমস্ত ক্রোধ শান্ত হোয়ে গেল। একটি মাত্র আঘাতে আমার প্রতিহিংসা সার্থক হোয়েছে। আশ্চর্য! একটা ঘড়ি টিক্‌টিক্ করছিল। সেই শব্দে ধীরে ধীরে আমার চেতনা যেন ফিরে আসতে লাগলো। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখি একটি অতি সাধারণ বিছানা আর লেখাপড়ার টেবিল ছাড়া অন্য কোনো আসবাব সেখানে নেই। হাতের দিকে চেয়ে দেখি হাতুড়ী রক্তপ্লাবিত। পাজামার পকেটে ধীরে ধীরে হাতুড়ী ঢুকিয়ে দিলুম। কোটের বোতাম বন্ধ করে পাজামার অনেকখানি আবরিত করলুম। তারপর রুমাল দিয়ে দরোজার হাতল ধরে কপাট খুলে বাইরে এলুম। কি খেয়াল হোল দরোজা বন্ধ করার আগে আর একবার সেই লুণ্ঠিত নির্জীব দেহটার দিকে তাকালুম।

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসতে আসতে মনে হোল কয়েক ঘণ্টা বেশ নিরাপদে কেটে যাবে। সন্দেহ করার মতোন ঘটনা কিছু ঘটলো না। আমাকে চেনবার মতো লোকও কেউ এখানে নেই। এক চিনতে পারতো ওই হতভাগা নিজে। তা ও এখন চেনাচিনির বাইরে। সিঁড়ি শেষ হোয়ে দালানের সেই আবছা আলো পার হোয়ে বড়ো দরোজার সামনে এসে তখন আমি

দাঁড়িয়েছি। এক ঝলক দিনের আলো এসে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো, মনে হোল কই কিছু তো ঘটেনি। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলুম। রোদ লেগে ঘুম ভেঙে গেছে—স্বপ্নও শেষ হোয়েছে।

এলমা সেই একভাবে গাড়ীতে স্থির হোয়ে বসেছিল। আমার অনুপস্থিতির মধ্যে একবারও ভঙ্গী পরিবর্তন করেছে বলে মনে হোল না।

—শেষ করে দিয়ে এলুম।

আমার কথা শুনে ও সামান্যতম চঞ্চলও হোল না। তবে একটুখানি মাথা হেলিয়ে বেশ শান্ত কণ্ঠে বললো, ভালো!

ওর ওই একটা কথা শুনে আমার সমস্ত বুকটা ফেটে গেল। কলঙ্ক আর অত্যাচার ওকে কি কঠিন আবরণেই না আবৃত করেছে। আমার সাধ্য কি ওকে ওই অভিশাপ হোতে মুক্ত করি। একটা বিপুল অভিমান পাহাড়ের মতো আমার বুকে চেপে বসলো। ওকে আর কোনো কথা না বলে মোটরের ইঞ্জিন খুলে দিলুম। তারপর আবার সেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আমাদের সেই কুটিরে ফিরে এলুম।

কতো সাধ্যসাধনা করলুম, কতো চেষ্টা করলুম। কিন্তু সবি মিথ্যা। একটি কণা খাবারও মুখে তুললো না। কুটিরের খোলা দরোজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে নিশ্চল হোয়ে ও বসে রইলো। আমার কথা ওর কানে যাচ্ছে বলেও মনে হোল না। ওর সেই স্থাণুর মতো নিষ্প্রাণ বসে থাকা দেখতে দেখতে কান্নায় আমার বুক ভরে গেল। কি করবো আমি। ও যদি না খায়, কথা না বলে, শুধু দিনের পর দিন নিশ্চল নির্বিকার হোয়ে এমনভাবে বসে থাকে, তা'হলে যে মরে যাবে। আর আমাকে সেই মরণ চোখের ওপর দেখতে হবে। না, না, তা হোতে পারে না—আমি তা ভাবতেও পারি না। হঠাৎ মনে হোল এখান থেকে যদি ওকে নিয়ে চলে যাওয়া যায় অনেক, অনেক দূরে। এখানকার সমস্ত দৃশ্য ওর সামনে হোতে মুছে যাবে, ও হয়তো সব কথা ভুলে যাবে, এই আচ্ছন্ন ভাবটা হয়তো কেটে যাবে......

অতিদ্রুত হাতে কোনোরকমে একটা দীর্ঘ যাত্রার আয়োজন সমাপ্ত করলুম। সন্ধ্যা তখন প্রায় নেমে এসেছে। দিনের আলো ঢাকা পড়ে গেছে বললেই হয়। আমি জলাভূমি পেছনে ফেলে মাঠ প্রায় অতিক্রম করে এলুম। তারপর পাহাড়ী পথের যাত্রা। বিশাল উন্মুক্ত আকাশের নীচে নির্বাক প্রাণের চাঞ্চল্যহীন এলমাকে নিয়ে সে পথও শেষ করলুম। এইবার সামনে বড়ো শহর।

আর কয়েক মিনিট। তারপর আমাদের আশ্রয় দেবে ওই শহর। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এছাড়া আর অন্য কোনো পথ আছে বলে আমার মনে পড়ে না। বিপুল জন-কোলাহল উদ্বেলিত ওই শহরের জীবনযাত্রা আমার বিশ্বাস এলমাকে ভুলিয়ে দেবে। ওর নিশ্চয় মনে হবে এ পৃথিবী সংকীর্ণ নয়—ওর সমস্ত আকাশ ওই কুটিরেই মেঘাবৃত হোয়ে যায়নি।

এলমাকে আমার পরিকল্পনা খুলে বললুম। একটা ভালো হোটেলে উঠবো। সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি। সব থেকে ভালো ভালো খাবার ঘরে আনিয়ে খাবো। তার আগে অবশ্য গরম জলে স্নান করতে চাই। আর এলমা যদি আপত্তি না করে তবে এক গ্লাস করে ভালো মদ খাবার শেষ হোলে খাবো।

নিবিষ্ট চিত্তে আমার কথাগুলো এলমা শুনলো। সবশেষে যখন বললুম, তারপর শুধু ঘুম, কেমন?—

এলমা মাথা হেলিয়ে উত্তর দিলো, বেশ।

ওর এই 'বেশ' বলার ভঙ্গীতে আমি যেন সেই পূর্বেকার লাজুক এলমাকে খুঁজে পেলুম। আমার অনুমান মিথ্যা নয়ঃ দেখি ওর চোখে জল চিক্‌চিক্‌ করে উঠেছে। মনে হোল ওকে বুকে চেপে ধরি, বলিঃ কেন কাঁদছো, এইতো, এইতো আমি রয়েছি লক্ষ্মীটি! তোমার কিসের দুঃখ আমি থাকতে।

আমার কথা কিন্তু বলা হোল না। সামনে একটা বড়ো হোটেল। তার সামনে গাড়ী থামানোর জন্যে ব্যবস্থা করছি এমন সময় এলমা সজোরে আমার হাত চেপে ধরলো। চেয়ে দেখি ওর মুখ বিবর্ণ হোয়ে গেছে দুঠোঁট শুকনো। সামনের দিকে নিশ্চল হোয়ে তাকিয়ে আছে—দৃষ্টি আবদ্ধ রয়েছে রাস্তার একজন পথচারীর ওপর।

—কি হোয়েছে?

আমার প্রশ্ন শেষ হওয়ার পূর্বে সে অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো, ওই ওই যে!

—তবে, তবে যে সেই হোটেলে—না ওকে কোনো প্রশ্ন করা বৃথা। আমি শুধু মুখ ঢাকলুম একহাতে—অপর হাত তখনও গাড়ীর গতিনিরোধ যন্ত্রের ওপর রয়েছেঃ গাড়ী থামানো চলে এখানে!

অনুবাদকঃ **সমীর** ঘোষ

# ঘোষণা

**জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়**

সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেছি মেঘেদের কাছেঃ
এখনো অনেক তারা সূর্যের পথ রুখে আছে।
সূর্যের ঘুম ভাঙে যে-পথেতে তারাদের গান শেষ হলে,
সে-পথেরই ঝোপে-ঝাড়ে এখনো অনেক তারা
মুখরা হয়েছে কোলাহলেঃ

যে-তারারা গান গায়, স্বপ্ন দেখে আকাশের রঙে জেগে জেগে—
সে-তারারা কাঁপে নাকি আজো কোন অজানা উদ্বেগে?
বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে—তবে এক মেঘ-ডাকা রাতে?
পাতানো-মিতালি বুঝি ভেঙে গেলো সূর্যের সাথে!!
তারাদের গান শেষ হলে, একদিন যে-সূর্যকে করেছি প্রণাম—
আজ বুঝি মুখোমুখি হয়ে তাকেই জানাবো সংগ্রাম॥

# প্র-না-বি-র এলবাম

## চিত্র-চরিত্র

### বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ভূকম্পে নাড়া-খাওয়া পৃথিবীর গর্ভ বিদীর্ণ হইয়া যেমন কর্দম রাশি বাহির হইয়া পড়ে তেমনি রত্নখনি আবিষ্কৃত হইতেও বাধা নাই। গত শতাব্দীর বাঙালী সমাজ প্রচণ্ড একটা নাড়া খাইয়াছিল ইংরাজি শিক্ষার আঘাতে এবং তার ফলে সমাজের নিম্নতলের ভালো ও মন্দ যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙালী সমাজের অন্তরে যে সুপ্ত ধর্মপিপাসা ছিল তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে ধর্ম-পিপাসা আর পূর্বতন জপ তপ, ধ্যান ধারণা, আচার অনুষ্ঠান, পূজা অর্চনায় তৃপ্তি পাইতেছিল না, নূতন সার্থকতা, নূতন নির্গমন পথ সন্ধান করিতেছিল। এই সূত্রটিরও আদি রামমোহন। তারপরে দেবেন্দ্রনাথ আছেন, রাজনারায়ণ বসু আছেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রথম হইতেই ইঁহারা এমন একটি আশ্রয় পাইয়াছিলেন যে-ঘাটে শক্ত করিয়া নৌকাকে নোঙর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর কয়েকজন ব্যক্তি প্রথম চেষ্টাতেই এমন সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। তাঁহারা একাধিক ঘাট পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কোন কোন ব্যক্তিকে সারা জীবন নূতন নূতন ঘাট পরীক্ষা করিয়াই কাটাইতে হইয়াছিল। নরেন্দ্র দত্ত প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজের ঘাটে ভিড়িলেন, কিন্তু তৃপ্তি পাইলেন না, অবশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরের মহদাশ্রয়ে আসিয়া শান্তি পাইলেন। এই দলের আর একজন কেশব সেন। ধর্মের বাহন পরীক্ষায় তাঁহার জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হইল। তাঁহার অতিরিক্ত দুটি ভক্তি এই বাহন পরীক্ষারই একটা পর্ব। ব্রহ্মবান্ধব বাহন পরীক্ষাকারিগণের একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁহার কথা এখন নয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর একটি দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার বিষয় আলোচনার আগে আর একজন মহা-সৌভাগ্যবানের কথা বলিয়া লইতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব ধর্মসাধনার সবগুলি পথকে পরীক্ষা করিয়া রায় দিয়াছিলেন যে যত মত তত পথ। অর্থাৎ অন্তরে যদি ভক্তি এবং চরিত্রে যদি নিষ্ঠা থাকে, মুঠির মধ্যে হাল যদি দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে তবে যে স্রোতেই নৌকা ভাসাও না কেন নির্দিষ্ট চরিতার্থতায় গিয়া ঠিক পৌঁছিবে—এই ছিল তাঁহার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার জন্য যে ধর্ম-প্রতিভা ও ভগবৎ আশীর্বাদের আবশ্যক—তাহা একান্ত অনন্যসাধারণ। রামকৃষ্ণ অসাধারণ, তাঁহার সঙ্গে অপরের তুলনা চলে না। তাঁহার পরীক্ষা অপরের জন্য, নিজের জন্য নয়। অপরের মুক্তির পথ তিনি নির্দেশ করিতেছিলেন, নিজে তো ছিলেন জীবন্মুক্ত, তাঁহার জন্য সব পথই পথ, কারণ তিনি সব পথের শেষে পৌঁছিয়াছিলেন। এমন সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। আগে যাঁহাদের নাম করিয়াছি তাঁহাদের সকলের এমন সৌভাগ্য ছিল না, কেহ কেহ তো ঘাটের পরে ঘাট পরীক্ষা করিয়াই জীবন কাটাইয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন মেডিকেল স্কুলে পড়া ছাত্র; ইস্কুলে শিবনাথ শাস্ত্রীর সহাধ্যায়ী এবং ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা গ্রহণে তাঁহার পুরোবর্তী। ইংরাজী শিক্ষার ভূমিকম্পে তাঁহার চিত্ত নাড়া খাইয়া ফাটল ধরিয়াছিল, সে ফাটল আর কিছুই নয়, তৃষ্ণার বদন-ব্যাদান। কি প্রচণ্ড তৃষ্ণা লইয়াই না তিনি প্রথম দিন ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যোগ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি ভাবেন নাই যে সে ঘাটে তৃষ্ণার পেয় মিলিবে—কিন্তু আশ্চর্যভাবেই মিলিল! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্ম সমাজ দেখিবার পূর্বে আমার সংস্কার ছিল যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেবল তবলা বাজাইয়া গান করে, বেদ পাঠ করে, অবশেষে সুরা পান ও মাংস ভোজন করে। ......সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্ম সমাজে গেলাম। ভক্তিভাজন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গীয়ভাবে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পাপীর দুর্দশা, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া......আমার সমস্ত শরীর গদগদস্বরে কম্পিত হইতে লাগিল, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল। মনে মনে দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্মজীবনের গুরু বলিয়া ভক্তিযোগে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া আসিলাম। অবিলম্বে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুর নিকট দীক্ষিত হইলাম।" অনভিষ্ট ঘাটে তৃষ্ণার বারি মিলিল। নৌকা ঘাটে ভিড়িল, কিন্তু বেশি দিন থাকিল না।

এই সময়ে কেশব সেনের নেতৃত্বে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যগণের উপবীতধারণ ও উপবীতত্যাগ সমস্যা লইয়া দারুণ গোল পাকাইয়া উঠিল। এ সমস্যা আজ আমাদের কাছে সমস্যাই নয়, কারণ এযুগের অধিকাংশ লোকের কাছে পৈতার গুরুত্ব একগাছা সুতার চেয়ে অধিক নয়। আড়ম্বর সহকারে পৈতা ত্যাগ করাকেও এযুগের লোকে বাহুল্য মনে করে, এযুগে কেহ পৈতা ত্যাগ করে না, পৈতা আপনি খসিয়া পড়ে। সে যুগে পৈতাত্যাগকারীর দল পৈতার গুরুত্ব মানিত, নতুবা তাহার ধারণ বা ত্যাগ লইয়া এমন আন্দোলন করিতে পারিত না। বিজয়কৃষ্ণ লিখিতেছেন—"কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্যগণ যদি উপবীতধারী হন তবে আমি সমাজকে অসত্যের আলয় বলিয়া পরিত্যাগ করিব।" এ বিষয়ে তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—"কি আশ্চর্য, যিনি প্রথম বয়সে পৈতাধারী উপাচার্যকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে তাড়াইবার জন্য এমন উদ্যত, তিনি শেষ বয়সে পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, হিন্দু ব্রাহ্ম, যে-যে ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী সে ঠিক পথেই চলিতেছে, এই কথা বলিয়া কোন ধর্ম বা সমাজের কোন প্রথাকেই নিন্দা করিলেন না। একেবারে উল্টা প্রণালী ধরিলেন।"

আসল কথা পৈতা রাখা বা ফেলার সমস্যা নয়, আসল কথা বিজয়কৃষ্ণ ঠিক ঘাটে এখনো পৌঁছান নাই, তাই ভিতরে ভিতরে মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, তিনি মনে করিতেছেন উপবীতের সমস্যাই বুঝি তাহার কারণ।

অতঃপর মহর্ষিকে ত্যাগ করিয়া গোস্বামী মহাশয় কেশববাবুর দলে ভিড়িলেন, কিন্তু সেখানেও কি দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলেন! কেশববাবুকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে নরপূজার একটা ঢেউ উঠিল, ভক্ত ব্রাহ্মগণ আচার্যের ও পরস্পরের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, পানের সহিত অশ্রু মিশাইয়া পা ধৌত করিতে লাগিল এবং ভগবানের কাছে তাহাদের জন্য একটু সুপারিশ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল—এই ব্যাপারে অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিজয়কৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া দলত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের নিজ বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা কার্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিচ্ছেদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, বিজয়কৃষ্ণ আবার কেশব সেনের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু মিলনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কেশব সেনের দলত্যাগ করিয়া যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলেন বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাদের একজন। এইরূপে আদি, ভারতবর্ষীয় এবং সাধারণ তিন সমাজ ঘুরিয়া গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মচক্র আবর্তন সমাপ্ত হইল। এবারে চক্রভেদ করিবার পালা। অতঃপর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন এবং নিজের বিশিষ্ট সাধনার ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এতদিন পরে নৌকা ঠিক ঘাটটিতে আসিয়া ভিড়িল।

দীপ হইতে দীপ জ্বলিয়া ওঠে, কিন্তু তজ্জন্য শিখায় শিখায় যোগ হওয়া দরকার, একের শিখার সহিত অপরের অন্য স্থানের যোগ হইলে চলিবে না। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেন দুজনেই প্রজ্বলিত দীপ শিখা, কিন্তু সে শিখার মুখে গোস্বামী মহাশয়ের নিজ শিখা সৃষ্ট হয় নাই। দীপান্তরের শিখার তাপে দীপ তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু তপ্ত হওয়া মানেই দীপ্ত হওয়া নয়।

ব্রাহ্ম সমাজে বিজয়কৃষ্ণ তৃপ্ত হইয়াছিলেন—দীপ্ত হন নাই। সে দীপ্তি আসিল পরে।

গত শতাব্দীর ধর্ম্মজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস এক আশ্চর্য ও বিচিত্র বস্তু। রামমোহনের জ্ঞানময় ব্রহ্ম, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিরীশ্বরবাদ, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তর সংশয়বাদ, দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদ, রামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, পজিটিভিস্টগণের জ্ঞানময় নাস্তিক্য, শশধর তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনজাত ধর্ম্ম। অনুশীলনের উপরে বঙ্কিমচন্দ্র এমন গুরুত্ব আরোপ করিতেন যেন সেটা একটা নূতন অবতার! কত মত, কত পথ! আর যাই হোক ঘাটে ঘাটে ঘুরিবার মতো ঘাটের অভাব তখনকার দিনে ছিল না এবং দেখিলাম ঘাট যাচাই করিবার নৌকারও অভাব হয় নাই।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথের গুরুত্ব ও সংখ্যা কালক্রমে হ্রাস পাইল। গত শতাব্দীতে বাঙালী সমাজের প্রাণশক্তির প্রধান ধারা আত্ম জিজ্ঞাসার খাতে বহিতেছিল, বর্তমান শতাব্দীতে তাহাই বহমান রাজনীতির খাতে। আর শুধু বাঙলা দেশের কথাই বা বলি কেন আধুনিক মানুষের কাছে রাজনীতিই ধর্ম্ম! তাই তো সকলে মিলিয়া রাজনীতির প্রবাহের দুই দিকে পাকা করিয়া স্ফটিকের ঘাট বাঁধিতে লাগিয়া গিয়াছে। যেদিন নদী ধর্ম্মজীবনের খাতে আবার ফিরিয়া যাইবে শুষ্ক নদীর তীরে শূন্য ঘাট মানুষের পরিহাসকে বিদ্রূপ করিবে অথচ নূতন প্রবাহের অপরিজ্ঞাত জলে নামিবারও পথ পাওয়া যাইবে না। তখন আবার ঘাটের সন্ধানে নাবিকের দল বাহির হইয়া পড়িবে। সংশয় যতই বাড়ে ভক্তি যে ততই আসন্ন হয়। নদীর এপার যতই দূরে গিয়া পড়ে, অপর পার কি ততই নিকটতর হয় না?

# বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত ৮ই ও ৯ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে আসানসোল শহরে এক সম্মেলনে নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছেঃ—

(১) ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যে নীতি অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন, তদনুসারে বর্তমানে বিহারের অন্তর্ভুক্ত—বঙ্গ ভাষাভাষী মানভূম জিলা, সিংহভূম জিলার ধলভূম মহকুমা, সাঁওতাল পরগণার বঙ্গ ভাষাভাষী অংশ এবং মহানন্দা-কালিন্দী নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত পূর্ণিয়ার অংশ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হউক।

(২) সেরাইকেল্লা ও খর্শোয়ান রাজ্যদ্বয় প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত। ভারত সরকার সেই রাজ্যদ্বয় কোন প্রদেশে যুক্ত হইবে তাহা পুনর্বিবেচনা করুন এবং বাঙলার দাবী বিবেচিত হউক।

(৩) বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চল এবং সেরাইকেল্লা ও খর্শোয়ান রাজ্যদ্বয় পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করিবার দাবী করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ঔদাসীন্য ও কর্তব্য শৈথিল্য দেখাইয়াছেন, তাহা দুঃখের বিষয়। তাঁহারা অবিলম্বে এই বিষয়ে লোকমত সংঘবদ্ধ করিয়া আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া ভারত সরকারকে ও বিহার সরকারকে এ বিষয়ে বাঙলার দাবী সম্বন্ধে সচেতন করুন।

এই প্রস্তাবত্রয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আসানসোলে এই সম্মেলনের কারণও সার্থকতার কথা বলা প্রয়োজন। আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের বিহার সীমান্তস্থিত প্রধান শহর। ইহার নিকটে ধানবাদ, পুরুলিয়া, ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানে বিহার সরকার বলে ও কৌশলে লোককে বিহারে থাকিবার পক্ষে মত দিতে বাধ্য করিবার অপচেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চল বাঙলায় যুক্ত করিবার আন্দোলন করিতেছেন, পুলিশকে তাঁহাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ভয় দেখান হইতেছে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে এবং গ্রামের মণ্ডলদিগকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টাও চলিতেছে—কোন কোন "অনুন্নত" সম্প্রদায়কে সরকারী চাকরীতে অংশ দিবার আশাও দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ এ বিষয়ে বিহার সরকার বৃটিশ আমলাতন্ত্রের উপযুক্ত শিষ্যের মত ব্যবহার করিতেছেন। কোন কোন স্থানে সভাসমিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে, সভা ভঙ্গের সংবাদও যে পাওয়া যায় নাই এমন নহে। এই গণতন্ত্রবিরোধী অবস্থায় বিহারে বাঙালীদিগের পক্ষে আন্দোলন পরিচালন বিপদজ্জনক হইয়াছে। অবশ্য বাঙালীকে প্রয়োজনে বিপদ-বরণ-পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না; কিন্তু যতদিন বিপদ বরণ না করিয়া আন্দোলন পরিচালনা করা যায়, ততদিন সেই পন্থাই অবলম্বনীয়। এ বিষয়ে বিহারীদিগের মত সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পর তাঁহার কংগ্রেসের সভাপতি থাকা উচিত কিনা, তাহা অনেকে বিবেচনার বিষয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কংগ্রেসের পরিচালকগণ সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।

ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও যে এখন কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পালনে আপত্তি করিতেছেন, তাহা যত বেদনাদায়কই কেন হউক না এবং তাহাতে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে লোকের আস্থা-মূল যতই শিথিল হওয়া সম্ভব হউক না—নিষ্ঠুর সত্য। কাজেই লোকমত ব্যতীত ভারত সরকারকে সচেতন করা সম্ভব নহে। বিশেষ বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও ভারত সরকারে আছেন। ভারত সরকার বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশদ্বয়ে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতি সমর্থন করিলেও পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সম্বন্ধে সে নীতির অনুবর্তী হইয়া কাজ করিতে অসম্মত।

সেরাইকেল্লা ও খর্শোয়ান রাজ্যদ্বয়ে বাঙলা ভাষাভাষীর সংখ্যাধিক্য হইলেও প্রথমে রাজ্যদ্বয় পরিচালনভার উড়িষ্যা সরকারের প্রদান করা হইয়াছিল। তখন রাজ্যদ্বয় বিহার ও উড়িষ্যা কোন্ প্রদেশভুক্ত হইবে, তাহা বিবেচ্য হয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন কথা বলেন নাই। একজন বিচারককে উড়িষ্যা ও বিহার উভয় প্রদেশের দাবী পরীক্ষা করিবার ভার দিয়া কোন অজ্ঞাত কারণে সে ব্যবস্থা বর্জন করা হয়। ইতিমধ্যে আদিবাসীদিগের মধ্যে বিক্ষোভ হয়। তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিবার দাবী করেন। সেই বিক্ষোভে লোক হতাহত হয় এবং বিহারের পক্ষ হইতে বলা হয় আদিবাসীরা বিহারের এমনই অনুরক্ত যে তাহারা উড়িষ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। ভারত সরকার উড়িষ্যাকেও বঞ্চিত করিয়া রাজ্যদ্বয় বিহারকে দেন। ফলে উড়িষ্যায় প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পুরীতে ও কটকে হরতাল ও শোভাযাত্রা হইয়াছে—পুরীতে জনসভায় ভারত সরকারের নির্দ্ধারণের নিন্দা করিয়া বিষয়টি পুনর্বিচারের দাবী জানান হইয়াছে এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়। উড়িষ্যা সরকারের ভূতপূর্ব অর্থ মন্ত্রী শ্রীগোদাবরীশ মিশ্র বলেন—ভারত সরকারকে জানাইয়া দেওয়া হউক যদি তাঁহারা উড়িষ্যার প্রতি এই অবিচারের প্রতীকার না করেন, তবে উড়িষ্যা ভারত রাষ্ট্র সঙ্ঘ বর্জন করিয়া স্বাধীন হইবে। উড়িষ্যা সরকার সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে এই আন্দোলনে প্রকাশ্য ও সক্রিয়ভাবে যোগদান নিষেধ জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু উড়িষ্যার জনমত উগ্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। উড়িষ্যা সরকার ভারত সরকারের নিকট উড়িষ্যার দাবী উপস্থাপিত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল প্রাপ্তির দাবী প্রবল হইবার পরে এবং আসানসোলে সম্মিলনের আয়োজন হইলে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন, তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল এ বিষয় ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন এবং ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার উক্তি সম্বন্ধে বলা হইতেছে—যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবল দাবী জানাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কি কারণে এতদিন সে কথা অপ্রকাশ রাখিয়াছিলেন? ইহাই কি সত্য যে, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সে কথা উত্থাপিত করিলে পণ্ডিত জওহরলাল তাহাতে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন এবং তখনই তিনি কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছিলেন যে, কেবল ভাষার ভিত্তি বিবেচনা করিয়া প্রদেশ গঠন করা যায় না? তাহার পরে গান্ধীজীও এ সময় ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সংগত নহে বলিলে, কি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুযোগ পাইয়া বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী প্রচলিত করাইবার নির্দেশ দেন? পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বিধানবাবু যদি প্রধান মন্ত্রী হইয়া আবার সে প্রস্তাব করিয়া থাকেন, তবে তিনি তাহা কেবল মৌখিক আলোচনা প্রসঙ্গে করিয়াছিলেন, কি সে বিষয়ে কোন লিখিত মন্তব্য দিয়াছিলেন? যদি তিনি মৌখিক আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা করিয়া থাকেন, তবে তাহার ফল কি হইয়াছে? আর যদি তিনি কোন লিখিত মন্তব্য দিয়া থাকেন, তবে তাহা কি প্রকাশ করা হইবে? আসানসোলে সম্মিলনে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই এই আন্দোলনে সহায় করিতে আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাতে কি তাঁহারা সম্মত আছেন?

পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে আন্দোলন যেরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে অল্পদিন পূর্বে উড়িষ্যার সাগরবেলায় বাঙালীদিগের প্রতি উড়িয়ার কতকগুলি লোকের দুর্ব্যবহারে যেরূপ প্রতিক্রিয়া কলিকাতায় হইয়াছিল, বিহারে সরকারের বাঙালী-বিদ্বেষের ফলে যদি পশ্চিমবঙ্গে বিহারীদিগের সম্বন্ধে সেইরূপ অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, তবে যে তাহা সমগ্র ভারত রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে অকল্যাণকর হইবে তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? যাহাতে তাহা না হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়াই রাজনীতিকোচিত কাজ হইবে। কারণ, বিহার সরকারের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় বাঙালীর ধৈর্য সীমা লঙ্ঘিত হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও লক্ষিত হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে কি করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পরে কোন সরকার পক্ষ সমর্থনকারী সংবাদপত্রে সংবাদের সূত্র প্রকাশ না করিয়া বলা হইয়াছে—

"পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল, প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মারফৎ (অর্থাৎ সরাসরি নহে) ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য ধলভূম, মানভূম এবং পশ্চিমবঙ্গভুক্ত দিনাজপুরের সন্নিকটস্থ পূর্ণিয়ার অংশ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন।"

পরবর্তী সংবাদ:—

বিশ্বস্তসূত্রে জানা যাইতেছে, বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিরা ও বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিরা সম্মিলিত হইবেন। বেসরকারীভাবে নাকি আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিহার কংগ্রেস কমিটিকে ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে এ বিষয় জানাইয়া তাঁহাদিগের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ব্যাখ্যার ছলে বলা হইয়াছে—এইরূপে উভয় পক্ষের আলোচনা না করিয়া যদি এক পক্ষ হইতে আন্দোলন করা হয়, তবে তাহাতে উভয় প্রদেশের সম্বন্ধ তিক্ত হইবে এবং বর্তমান অবস্থায় তাহা কোন পক্ষের—এমন কি কংগ্রেসের কর্তাদিগেরও অভিপ্রেত নহে।

এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবী সুস্পষ্ট—সেজন্য জনমত জানিবার চেষ্টায় বৃথা সময় নষ্ট করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। বিহারের জন্য যিনি প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই, তিনিই আজ কংগ্রেসের সভাপতি। সে অবস্থায় ভারত সরকার যদি কংগ্রেস কমিটির মতে অধিক গুরুত্ব আরোপ না করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করেন, তবেই সহজে মীমাংসা হইতে পারে—নহিলে নহে।

আসানসোল সম্মিলনে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকেই জাড্য ত্যাগ করিয়া এবং কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্বন্ধীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব করিতে বলা হইয়াছে।

যাঁহারা বলেন, এক পক্ষের আন্দোলনে দুই প্রদেশের সম্বন্ধ অপ্রীতিকর হইতে পারে—তাঁহারা কি মনে করেন না, বিহার সরকারের বাঙালীদিগের সম্বন্ধীয় ব্যবহার যেমন অপ্রীতিকর, তেমনই অসংগত এবং তাহা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। তাঁহারা কি বিহার সরকারের অত্যন্ত অসংগত নির্দেশ ও ব্যবস্থা ও বিহারী সংবাদপত্রের বাঙালীবিদ্বেষ বিষাক্ত মন্তব্য ও টাটানগরে বাঙালীদিগের সভা আক্রমণ 'মায়া' মাত্র মনে করিতে পারিবেন?

শুনা যাইতেছে বাঙলার কতকগুলি অংশ জঠরে জীর্ণ করিবার সুযোগ পাইয়া এখন বিহার পশ্চিমবঙ্গের আর এক অংশও পাইতে আগ্রহশীল হইয়াছেন। অথচ উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ হইবার পরে বিহারের পক্ষে বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি পশ্চিমবঙ্গকে দিয়া স্বয়ং যুক্ত-প্রদেশভুক্ত হইলেই ভাল হয়। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র হিন্দীভাষী অঞ্চল এক হয়। পূর্বে একবার বিহার যুক্ত-প্রদেশের বারাণসী বিভাগ চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যুক্ত-প্রদেশ সে প্রস্তাব বাতুলের কল্পনা বলিয়াছিলেন।

বিহার কোন সংগত কারণ দেখাইয়া পশ্চিমবঙ্গকে মানভূম প্রভৃতি পূর্বোল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে বঞ্চিত রাখিতে পারে না। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের জনমত যদি সে দাবী সম্বন্ধে সচেতন না হন, তবে তাহা বাঙালীর দুর্ভাগ্যদ্যোতকই বলিতে হইবে।

ধানবাদ প্রভৃতি বাঙলার খনিবহুল অঞ্চল ও টাটানগর প্রভৃতি ছাড়িলে বিহারের সমৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইবে বলা হইতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন যে অত্যন্ত অধিক, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? যখন কংগ্রেস ভারত-বিভাগে অনেক আপত্তি জানাইবার পরে তাহাতে সম্মতি দেন তখন—পাকিস্থান ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হইবে জানিয়াও বলা হইয়াছিল, পূর্ব পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগকে ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার প্রদান করা হইবে, বিপদে রক্ষা করা হইবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ১৫ লক্ষের অধিক বাঙালী হিন্দুর সম্মানজনক নাগরিকরূপে বাসের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? বর্তমানের ব্যবস্থাও হয় নাই—ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও হয় নাই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যের চাষ, গো-জাতির উন্নতিবিধান, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা—এ সম্বন্ধে আবশ্যক লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না। আগন্তুকদিগের বাসের জন্য কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা হয় নাই। অথচ বঙ্গবিভাগের পরে ৯ মাসকাল কাটিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২বার মন্ত্রিমণ্ডলের গঠন ও পতন হইয়া এখন তৃতীয় মন্ত্রিমণ্ডল আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত। অল্পদিন পূর্বে দেখা গিয়াছে মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতীকে দুইজন অতিরিক্ত সেক্রেটারী দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যকে চাকরী দিলেই যে মন্ত্রিমণ্ডল স্থায়ী হইবে এমন নহে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল যদি লোককে বুঝাইতে পারেন, তাঁহারা লোকের প্রকৃত কল্যাণকর কার্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা হইলেই তাঁহারা নিরাপদ—নহিলে নহে। কেবল ক্ষমতালোভে কাজ করিলে সে কাজ লোকে সহ্য করিতে পারে না।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলনকারী বা সেই আন্দোলনের সমর্থক—সকলের উপর খরদৃষ্টি রাখিবার জন্য পুলিশ আদিষ্ট হইয়াছে। সে আন্দোলন তথায় নিষিদ্ধ হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিমবঙ্গেও কি তাহাই হইবে? আমরা যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে বলা হইয়াছে—এ বিষয়ে এক পক্ষের (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের) আন্দোলন—

"might lead to a deterioration in the relationship between the two provinces."

এই উক্তির উৎসের সন্ধান সহজেই পাওয়া যাইতে পারে।

ভারত রাষ্ট্রের ভাবী গভর্নর-জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী দার্জিলিংএ বাঙালীদিগকে প্রশংসায় তুষ্ট করিবার চেষ্টাতে বলিয়াছেন:—

"বাঙলায় জিলার সংখ্যা বা পরিমাণ লইয়া ব্যস্ত হইবেন না—সেজন্য মাথাব্যথা করিবেন না। সকল বিষয়ই বিবেচিত হইবে, সবই যথাযথভাবে করা হইবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। পূর্বে (অর্থাৎ ইংরেজ আমলে) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কিছু অর্থ ছিল। এখন সকল প্রদেশকে এমন সুসম্বন্ধ থাকিতে হইবে যে, প্রদেশে প্রদেশে কোন প্রভেদ থাকিবে না।......ভারত রাষ্ট্র এত সুসম্বন্ধ যে এখন প্রাদেশিক সীমা দেখিবার সময় নহে। প্রকৃতপক্ষে সব প্রাদেশিক সীমা লোপ পাইয়াছে—ভারতবর্ষ এক।"

অবশ্য বিহার যদি তাহার সীমা সরাইতে অসম্মত হয়, তবে তাহা দোষের হয় না। কিন্তু সীমার দিকে দৃষ্টি দেওয়া পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অসঙ্গত কিন্তু যদি সত্যসত্যই প্রাদেশিক সীমা লোপ পাইয়া থাকে, তবে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রাদেশিক গভর্নর হইলেন কেন?

তাহার পরে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর বলিয়াছেন—আজ অনেকে হয়ত নেতা হইতে পারেন, মনে করিতেছেন,—কিন্তু এই ফতোয়া দিতেছেন যে, আজ যাঁহারা নেতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা যোগ্যতর নেতা আর কেহ হইতে পারেন না। তাঁহারা লোকের সম্পূর্ণ আস্থালাভের উপযুক্ত। তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই ভারতের ঐক্য রক্ষা করিতে পারেন না।—"আমি আপনাদিগকে বলি, তাঁহাদিগকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করুন—এখন কিছুকাল নূতন করিয়া ভারতবর্ষ গঠন করিবার সুযোগ প্রদান করুন।"

অর্থাৎ "মামেকং শরণং ব্রজ।" অবশ্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও ইহাই চাহেন; কয় বৎসর সময় পাইলে তাঁহার বিহার যে ছলে বলে কৌশলে—শাসনশক্তির ব্যবহার অপব্যবহার করিয়া বিহারের বঙ্গভাষাভাষীদিগকে হিন্দী ভাষাভাষীতে পরিণত করিয়া বিহারের অখণ্ডত্ব দাবী করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব কয় বৎসর বাঙালীরা সীমার দিকে চাহিও না। আর একদিকে পূর্ববঙ্গত্যাগী বাঙালীরা অনাহারে, আশ্রয়ের অভাবে ও ব্যাধিতে সংখ্যায় হ্রাস পাইবে। স্বাধীন কিন্তু খণ্ডিত ভারতে রামমোহন, রামগোপাল, সুরেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্রের বাঙলা নাম শেষ হইয়া যাইবে। ইহাই কি ভারত রাষ্ট্রের ভাবী গভর্নর জেনারেলের অভিপ্রেত বলা যায় না? কিন্তু আমরা আশা করি বাঙালী আত্মবিলোপেই সার্থকতার সন্ধান করিবে না। সে তাহার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিবে না। আজ তাহার চারিদিকে যে বিপদ সে সব বিপদ তাহাকে আপনার চেষ্টার দ্বারা দলিত করিয়া তাহার সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

এই সকল বিপদ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে বিশেষভাবেই অবহিত হইতে হইবে। হায়দরাবাদের অবস্থার কি প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব পাকিস্তানে হয় তাহা বলা যায় না। কলিকাতায় "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" ও তাহার পরে পূর্ববঙ্গে "লড়কে লেঙ্গে—মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান"এর অব্যবহিত পূর্বে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায় নাই। প্যালেস্টাইনের প্রসঙ্গে একজন মুসলমান 'স্টেটসম্যান' পত্রে লিখিয়াছেন, মাস্টার তারা সিংহ ইহুদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা অভিনন্দিত করিয়া ভাল করেন নাই; কারণ, ভারত-রাষ্ট্রে ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলমানেরা তাহাদিগের স্বধর্মাবলম্বী আরবদিগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন। আর একজন মুসলমান লিখিয়াছেন, মুসলমানেরা সকলেই আরবদিগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন—কেননা, ইসলাম বিপন্ন—কেবল হিন্দু ভয়-ভীতি ব্যাপারেই সে ভাব প্রকাশের পথে বাধা। কয়দিন পূর্বে কলিকাতা হইতে হায়দরাবাদে সাহায্য প্রেরণের চমকপ্রদ বিবরণ কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে সম্বন্ধে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, —ঐ বিবরণ অতিরঞ্জিত, তবে—

"গত ২২শে মে কলিকাতা পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ দমদম বিমানঘাটিতে ২৮টি ও হাওড়া রেল স্টেশনে ৩৭টি বাণ্ডিল ধরিয়াছেন—ঐগুলি হায়দরাবাদে প্রেরিত হইতেছিল। দমদমে যেগুলি ধরা পড়িয়াছে, সেগুলিতে সূতী ও পশমী পোষাক প্রেরিত হইতেছিল। হাওড়ায় যেগুলি ধরা পড়িয়াছে, সেগুলির মাল এখন পুলিশ পরীক্ষা করিতেছে।"

ইহার পূর্বে যে মাল প্রেরিত হয় নাই, তাহা কে বলিবে? তবে এই ব্যাপার সম্পর্কিত কাগজপত্রও পাওয়া গিয়াছে। মধ্যে যে বেতারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা ধরা পড়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার কি হইয়াছে? এই সকল সম্পর্কে কি কোন বা কোন কোন সুপরিচিত মুসলমানের জড়িত হওয়া সম্ভব?

হায়দরাবাদের ব্যাপার ভারতরাষ্ট্রের সকল প্রদেশকেই সতর্কতাবলম্বনে প্ররোচিত করিলে আমরা তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করিব। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্থানের প্রতিনিধিরা করাচীতে পাকিস্থান সরকারের অর্থ মন্ত্রীকে জানাইয়াছেন:—

(১) পূর্ব পাকিস্থানে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের ব্যবসা করিবার ছাড় শতকরা ৭০ খানি মুসলমানদিগকে ও ৩০ খানি হিন্দুদিগকে দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান ব্যবসায়ীরা ছাড় পাইয়াও অর্থাভাবে মাল আনিতে না পারায় জিনিসের দাম বাড়িয়াছে।

(২) পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদিগের উপর অসঙ্গত অধিক কর ধার্য করা হইয়াছে।

পাকিস্থান সরকার এ সকল অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এসব যে সত্য, তাহা আমরা অবগত আছি। এইরূপ অবস্থায় যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগকে বলা হয়, যেহেতু তাঁহারা ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রজা, সেইহেতু তাঁহাদিগের পক্ষে সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সব অনাচার-অত্যাচার সহ্য করিয়া তথায় [illegible] করা সঙ্গত, তবে তাহা ভারত রাষ্ট্রের—বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কোনরূপে আপনার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা বলিয়া মনে [illegible] অসঙ্গত বলা যায় না। সে দায়িত্ব পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চয়ই [illegible] সরকারের নিকট আবশ্যক সাহায্য দাবী করিতে পারেন।

গত ২৫শে মে আনন্দবাজার পত্রিকায় [illegible] সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে:—

(১) সাতক্ষীরা থানার ইন্দিরা [illegible] গ্রামে কোন হিন্দু ভদ্রমহিলা শিশুপুত্রসহ [illegible] গৃহে ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার স্বামী [illegible] ছিলেন না। শেষ রাত্রিতে ৪ জন মুসলমান যুবক ঘরের দ্বার ভাঙিয়া ঘরে প্রবেশ করে [illegible] ছোরা দেখাইয়া ৪ জন তাঁহার উপর [illegible] অত্যাচার করে।

(২) যশোহর নরেন্দ্রপুরে গত ২রা [illegible] একজন হিন্দু বিধবা দিবাভাগে অন্য পল্লীতে গমনকালে ২ জন মুসলমান তাঁহার উপর অত্যাচার করে—তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়।

এই দুঃসময়ে আবার দুঃসংবাদ পাওয়া গিয়াছে—২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং [illegible] এলাকায় সুন্দরবনে ১১ মাইল দীর্ঘ [illegible] ৬ মাইলের মধ্যে কোন স্থানে বাঁধ নষ্ট [illegible] গত ২২শে মে ৬৫ হাজার একর জমি [illegible] জলে প্লাবিত হইয়াছে। ১৬ লক্ষ মণ ধান [illegible] হইয়াছে—ইহাই অনুমান।

খোঁজ করিতে করিতে কশীর করণ ঘণ্টা নামক পাড়ায় বাবু মিঞা নামক জনৈক মুসলমান ঠিকাদারের সন্ধান পাই। ইনি পুরাতন শিল্পীবংশের লোক। দুঃখ করিয়া বলিলেন, আজকাল লোকে আর তাঁহাদের ডাকে না, আদর করে না। অথচ মন্দিরে মন্দিরে প্রভেদ কোথায়, বিভিন্ন দেবতার মন্দিরে কি প্রভেদ থাকিবে, তাহা অপর কেহ জানে না। আগে এ কাজ শিল্পীবংশেরই ছিল, আজকাল মন্দির গড়িতে হইলে লোকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পড়া ঠিকাদারকে ডাকে; সেইজন্য তিনি বাধ্য হইয়া ছেলেকে ইস্কুলে দিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ীতে পুরানো হাতে লেখা খাতায় মন্দিরের লক্ষণাদি লিখিত আছে, অথচ ভবিষ্যতে আর কেহ তাহার আদর করিবে না।

বাবু মিঞা স্বীয় বৃত্তির সম্পর্কে যথেষ্ট অভিমান পোষণ করেন এবং শিল্পশাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করেন বলিয়া আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, দেখুন আজ আর কেহ হিন্দু নাই। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আপনারা গড়িয়াছেন, তাহার মধ্যে হিন্দুত্ব কতটুকু আছে? বাড়ীর গড়নটাই আসল, সাজ-পোষাক আসল নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়ন হইল সম্পূর্ণ ক্রীশ্চানী, তাহার উপর দুটা মন্দিরের চূড়া বা থাম অথবা লতাপাতা দিয়া ঢাকিলেই কি তাহার গড়নটা ঢাকা যায়, না তাহার জাত পরিবর্তন হয়? কথাটি শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল, কোন জাত-শিল্পীর সহিত কথা বলিতেছি, যাঁহার মধ্যে কৌলিক বিদ্যার সৌরভ এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে।

### হিন্দু শিক্ষিত সমাজে পরিবর্তন

পুরাতন বর্ণ-ব্যবস্থার আর্থিক মেরুদণ্ড এইরূপে অপেক্ষাকৃত অভগ্ন অবস্থায় থাকিলেও সমাজের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসে অথবা ব্যবহারে নানাবিধ পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও কোনও শিল্পিকুলের মত শহরের বাসিন্দা অথবা রাজসরকারের চাকুরিয়াদের মধ্যেও পরিবর্তনের পরিমাণ অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এবং ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমরা মধ্যযুগে ভারতবর্ষে অনেকগুলি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি বিভিন্ন সাধুগণের প্রবর্তিত সম্প্রদায় ভিন্ন আরও অনেক সম্প্রদায় হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া আরও উদার ও গণতান্ত্রিক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবার অপরপক্ষে রঘুনন্দনের মত সংস্কারক আসিয়া হিন্দু-ধর্মকে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত না করিয়া তাহার মধ্যে সমরজনিত আবর্জনা দূর করিয়া শুদ্ধতররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাও একই কালে আমরা ঘটিতে দেখি।

এই সময়ে সমাজের মধ্যে চৈতন্যদেব যে বিপুল আন্দোলন আনিয়াছিলেন, তাহাও কিন্তু উত্তরকালে গোঁড়ামির আঘাতে এক দিক দিয়া পরাস্ত হইয়া যায়। গ্রামের অর্থনৈতিক সংগঠন তখনও প্রাচীন আকারেই রহিয়া গিয়াছিল, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেখানে বৃত্তিতে কৌলিক অধিকার বিভিন্ন শিল্পী অথবা সেবককুলের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য অক্ষত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছিল। গ্রামদেশে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরাও তাহা বাঁচাইয়া চলিত। আমার মনে হয় ইহারই ফলে আচার এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও রঘুনন্দনেরই জয় হইল। মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভাব সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া রহিল; সমগ্র সমাজের অনুদারতা ভাঙিয়া তাহা নূতন জীবনের প্লাবন আনিতে সমর্থ হইল না।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। তাঁহার কিছুকাল পূর্বে মাধব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীপ্রবর মাধবেন্দ্রপুরী নূতন ভক্তি ধর্মের স্রোত বহাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী। শান্তিপুরের নিবাসী অদ্বৈত মহাপ্রভু এই ভক্তি-স্রোতে স্নান করিয়া সমগ্র দেশে তাহা প্রবাহিত করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। তাঁহার একার ক্ষমতা হইবে না মনে করিয়া তিনি কোনও অবতার পুরুষের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্মের প্রবর্তকরূপে প্রকাশিত হইলে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এবং রূপ ও সনাতন গোস্বামী সকলে মিলিয়া হিন্দুর জীবনকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টার ফল কতদূর গিয়াছিল, তাহা আভাসে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন সেই সময়ের সমাজের চিত্র অংকন করিয়া বর্তমান অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

### মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুর অবস্থা

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটী অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণরাম-ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে,
মঙ্গলচণ্ডির গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারাই না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির বাখান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমনে এ জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥

* * * *

এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাঞি॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্বজীব উদ্ধারিয়া॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত [illegible]
দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর তিনি [illegible] শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত মিলিত হইয়া নদীয়ায় ফিরিলেন, তখন হইতেই [illegible] নামসংকীর্তন এবং ভক্তিধর্মের উপদেশ [illegible] লাগিলেন।

প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম গুণ বহি না বলিহ আর॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥

* * * *

ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥

* * * *

প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণ নাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্তন করেন সবে দিয়া করতালী।
এই মত নগরে নগরে সংকীর্তন।
করাই লাগিলেন শচীর নন্দন॥

* * * *

একদিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥

হরি-নাম কোলাহল চতুর্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য॥
আথে ব্যথে পলাইল নগরিয়া-গণ।
মহা ত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাও আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন নাগালি পাইলে লইব জাতি॥
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্তন চাহিয়া॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুগণে কাজি সব মারে কদর্থিয়া॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-মধ্য-
২৩শ অধ্যায়

ইতিমধ্যে কিছু হিন্দু হয়ত ধনবান লোকই হইবেন—কাজিকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আসেন। মহাপ্রভু অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাজির আইন অমান্য করিয়া রাত্রে বিরাট এক কীর্তনের দল বাহির করিয়া কাজির সহিত মোকাবেলা করিতে যান। হয়ত সে মিছিলে সাধারণ লোকই ছিল, সম্পদশালীরা আইন অমান্যের দায়িত্ব স্বীকার করিতে চাহেন নাই; কারণ কাজি মহাপ্রভুর নিকট পরে বলিতেছেন :

কেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥ ২০৫
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই॥ ২০৬
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য-গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ॥ ২০৬

পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥ ২০৭
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালী।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥ ২০৮
না জানি কি খাইয়া মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥ ২০৯
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ॥ ২১০
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥ ২১১
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥ ২১২
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য হয় হানি॥ ২১৩
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন॥ ২১৫

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি-
১৭শ অধ্যায়

(ক্রমশঃ)

## পুস্তক পরিচয়

**আয়কর ফলের চাষ**—শ্রীকামেশ্বর সিংহ প্রণীত। [illegible]—শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ, ১৩ ল্যান্সডাউন [illegible] কলিকাতা—২৯। মূল্য বারো আনা।

[illegible] দেশে প্রায় সর্বত্রই নানাজাতীয় ফল [illegible] সামান্য পরিশ্রমে ঘরের [illegible] চারা রোপণ করিয়া [illegible] তাহার ফল ভক্ষণ করিতে [illegible] কিন্তু একটু পরিশ্রম করিয়া খানিকটা [illegible] করিলে উদ্যানে অনায়াসে [illegible] নির্বাহ করা যায়। [illegible] বলুন— [illegible] কল্পনা—[illegible] [illegible] যথাসময়ে ফলে [illegible] কিছুমাত্র [illegible] হয় না। [illegible] আয়কর ফলের [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] লিখিয়াছেন। [illegible] চারা রোপণ, বৃক্ষ- [illegible] নাম প্রভৃতি [illegible] নিয়েই [illegible] নিযুক্ত থাকিলেই [illegible] ১১৩।৪৮

**বালক ও পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যবিধি**—শ্রী[illegible] [illegible]। প্রকাশক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ, ১৩ [illegible] কলিকাতা—২৯। দ্বিতীয় [illegible] উল্লেখ নাই।

[illegible] শহর ও পল্লীতে প্রতি বৎসর সহস্র [illegible] মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত [illegible] পরিচ্ছন্নতা ও সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে [illegible] অভাব এই ব্যাধির বিস্তৃতির সহায়ক। [illegible] পল্লীবাসীদের অবশ্য পালনীয় [illegible] উপদেশ আছে। এই সকল উপদেশ [illegible] চলিলে পল্লীস্বাস্থ্য বহুলাংশে রক্ষিত হইতে [illegible] প্রতিরোধে অনেকটা সফলকাম [illegible] পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পল্লী- [illegible] মধ্যে এ ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার [illegible]। ১১২।৪৮

**সুর সপ্তক**—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। [illegible]—কাত্যায়নী বুক স্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস [illegible], কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

'সুর-সপ্তক' সাতটি গল্পের সমষ্টি, যথা— [illegible], কাঁসারির কারসাজি, অভিজ্ঞতা, [illegible]রের বিপত্তি, আপসোস, জাগ্রত নারায়ণ এবং মুক্তি। গল্পগুলির মোটামুটি চলনসই। কোনো কোনো গল্পে মানুষের দুঃখ বেদনাকে বেশ দরদের সহিত রূপ দেওয়া হইয়াছে। ১১৩।৪৮

**অলকানন্দা**—শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সিটি বুক সোসাইটি, ৬৪নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

[illegible] বন্ধু আনন্দময়কে ঠকাইয়া [illegible] অলকানন্দা নামে শিলংয়ের বাড়ীটিকে হাত করিয়া নিয়াছিল। [illegible] পুত্র মৃণাল রায় [illegible] লেখক। সে নিরুদ্দেশ হইলে তজ্জন্য [illegible] হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। 'অলকানন্দা' এখন হোটেলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সেখানে আনন্দময়ের কন্যা নন্দিতা ও অন্যান্যের [illegible] এক যুবক নিজেকে মৃণাল রায় [illegible] পরিচয় দিয়া [illegible] আশ্রয় পাইয়াছিল। পরিশেষে সেখানে আসল মৃণাল রায়ের আবির্ভাব হয়, নন্দিতার সাথে [illegible] পরিচয় ক্রমে এবং 'অলকানন্দা' তাহার প্রকৃত মালিক আনন্দময়ের হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। উপন্যাসটির মোটামুটি আখ্যান এই [illegible]। বইটি সিনেমা হইয়াছে। কাজেই ইহার অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তবে পড়িয়া বিশেষ কোন আনন্দ পাওয়া গেল না। ২৮৮।৪৭

**সংঘাত**—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীহট্ট লেখক-শিল্পিসংঘ, মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট অথবা ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'সংঘাত' একখানি চার অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক। ইহার রচয়িতা শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী একজন সুপরিচিত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। দীর্ঘকাল শ্রীহট্টের জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্র 'জনশক্তি'র সম্পাদনা করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। সাহিত্যিক হিসাবে মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি দরদের সহিত সুনিপুণভাবে রূপদান করিয়া থাকেন। প্রগতিশীল নূতন সম্ভাবনার হাতছানিতে পুরাতনের জীর্ণতা খসিয়া পড়ার ইঙ্গিত, তাঁহার অন্যান্য রচনার ন্যায় আলোচ্য নাটকটিতেও পরিস্ফুট হইয়াছে। বইটি অভিনয়ে কি রকম উৎরাইবে বলিতে পারি না; কিন্তু পড়িতে ভালই লাগিল।

প্রকাশক মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের প্রতি আর একটু নজর দিলে ভাল করিতেন। ২০।৪৮

**মহারাজ নন্দকুমার**—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

নন্দকুমারের ফাঁসী ভারতে বৃটিশ শাসনের দুরপনেয় কলঙ্ক। তিনি তৎকালীন বাঙলার বিশেষ প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের দুর্ব্যবহার ও দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের অবিচারের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া নন্দকুমার তাহাদের বিরাগভাজন হন এবং ভারতের প্রথম বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। বাঙলার ইতিহাসের এই বিশিষ্ট অধ্যায়টি এই পুস্তকে কিশোরদের উপযোগী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বইটি বাঙলার তরুণদের অবশ্যপাঠ্য। বই সুমুদ্রিত এবং মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ করা হইয়াছে। ১১।৪৮

**মৌলানা আবুল কালাম আজাদ**—শ্রীহরি দাস প্রণীত। প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০।

বইটি মৌলানা আজাদের একখানা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত জীবনকাহিনী। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রায় সমগ্র পরিস্থিতির সহিত মৌলানা আজাদের সুদীর্ঘ জীবনী, কর্মপ্রচেষ্টা ও নেতৃত্ব বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। এই জাতীয়তাবাদী, উদার এবং সুবিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বাঙলার তরুণদিগকে পরিচিত করার পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। লেখকের ভাষা ও বর্ণনা সুন্দর। মৌলানা সাহেবের জীবনের সঙ্গে জড়িত জাতীয় আন্দোলনের উপরও আলোকপাত করা হইয়াছে। ছাপা কাগজ উত্তম, মলাটে মৌলানা সাহেবের একখানা সুন্দর প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ৮৭।৪৮

বৃটিশ বাহিনীর প্যালেস্টাইন ত্যাগ : বৃটিশ সৈন্য, প্যালেস্টাইন পুলিশ ও অন্যান্য বৃটিশ নাগরিক হাইফা বন্দরে জাহাজে আরোহণ করিতেছে

প্যালেস্টাইনে নূতন ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়ার পর বাহিরাগত ইহুদীদের প্রথম দলের হাইফা বন্দরে পদার্পণের দৃশ্য। ১৫ই মে সকালে

# প্যালেস্টাইন

**প্রভাকর সেন**

যে ছোট দেশটি এশিয়াকে আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেছে তারই নাম প্যালেস্টাইন। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে মিশর, পূর্বে ট্রান্সজর্ডান এবং উত্তরে সিরিয়া-লেবানন—এই হলো দেশটির সীমানা। আয়তনে ১০,৪২৯ বর্গমাইল—তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই মরুভূমি। উনেস্কোর হিসাবে ১৯৪৬ সালে লোকসংখ্যা ছিল ১৮,৪০,৫৫৯—অর্থাৎ [illegible] তার লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও কম। কৃষি প্যালেস্টাইনের প্রধান উপজীবিকা, জমীর প্রধান [illegible] দ্রব্য এবং জলপাইয়ের তেলের

অনেক দেশেই এসব সমস্যার, বিশেষ করে শেষোক্ত সমস্যাটির, সমাধান হয়েছে। প্যালেস্টাইনেও তা না হবার কোনো অন্তর্নিহিত কারণ ছিল না এবং এখনো নেই। তা সত্ত্বেও আজ প্যালেস্টাইনের ইহুদী এবং মুসলমান যে পরস্পরের প্রতি বন্দুক চালাচ্ছে তার কারণ অন্য লোকের সমস্যা তাদের ঘাড়ে নিতে হয়েছে, অন্যের স্বার্থের জোয়ালে তারা আটকা পড়েছে। এই সকল বিভিন্ন স্বার্থ বিশ্লেষণ করার আগে প্যালেস্টাইন সম্পর্কে কতগুলি মোটা তথ্য জানা দরকার।

কেন এত ইহুদীর আমদানী হলো? সত্যি সত্যিই কি পৃথিবীর অন্য দেশের ইহুদীদের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের নাড়ির যোগ আছে? ইহুদীরা কি চায়? আরবরাই বা কি চায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা গত পঞ্চাশ বছরে প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে বহু রাজনীতিক বহু স্ব-বিরোধী এবং পরস্পর-বিরোধী উক্তি করেছেন, যার ফলে মূল সমস্যাটির সূত্র প্রায় হারিয়ে গেছে। কি করে প্যালেস্টাইন সমস্যার উদ্ভব হলো তার ইতিহাস না জানলে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। কিন্তু তারও আগে প্যালেস্টাইনের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া দরকার।

**প্রাচীন ইতিহাস**

ইহুদীরা প্যালেস্টাইনের সবচেয়ে আদিম অধিবাসী নয়। তাদের আগে থেকে কেনানীয়রা

**ধর্মানুসারে লোকসংখ্যা**

| সাল | মুসলমান | ইহুদী | খৃষ্টান | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯২২ | ৪,৮৬,১৭৭ (৭৫%) | ৮৩,৭৯০ (১২.৯১%) | ৭১,৪৬৪ (১১%) | ৭,৬১৭ | ৬,৪৯,০৪৮ |
| ১৯৩১ | ৬,৯৩,১৪৭ | ১,৭৪,৬০৬ | ৮৮,৯০৭ | ১০,১০১ | ৯,৬৬,৭৬১ |
| ১৯৪২ | ৯,০৬,৫৫৯ | ৪,৭৮,২০৯ | ১২৭,৪৪৫ | ১২,৮৮১ | ১৬,১৮,৯৯৭ |
| ১৯৪৬ | ১০,৭৬,৭৮৩ (৬০%) | ৬,০৮,২২৫ (৩৩.১৬%) | ১৪৫,০৬৩ (৮%) | ১৫,৪৮৮ | ১৮,৪৩,৫৫৯ |

[[illegible] ১২,০৩,০০০]

[illegible] উল্লেখযোগ্য। ছোট দেশ প্যালে-[illegible] দেশ প্যালেস্টাইন। অথচ [illegible] চরিত্রটি প্যালেস্টাইনেরই [illegible] প্যালেস্টাইনের সঙ্গে [illegible]।

[illegible] প্যালেস্টাইন সমস্যা [illegible] নয়, অথবা প্যালে-[illegible] মুসলমান অথবা ইহুদীর সমস্যা নয়। [illegible] মুসলমান এবং ইহুদী তারাই [illegible] বহু বহু বছর ধরে সে [illegible] বাস করে আসছে, [illegible] শতাব্দী ধরে [illegible] ও [illegible] হয়ে [illegible]। উনিশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে [illegible] বিদেশী ইহুদী ধর্মাবলম্বী [illegible] এসে বসবাস আরম্ভ করেছে তাদের [illegible] প্যালেস্টাইনের সন্তান বলার সময় এখনো [illegible] বলতে আরো সময় লাগবে। তাদের [illegible] আলাদা।

প্যালেস্টাইন সমস্যা হচ্ছে প্যালেস্টাইনের [illegible] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইহুদীদের [illegible] প্যালেস্টাইনকে [illegible] নিয়ে অন্যান্য [illegible] দেশগুলির সমস্যা, ব্রিটিশ কূটনীতির [illegible] আমেরিকার এবং অধুনা সোভিয়েট [illegible] সমস্যা। খাস প্যালেস্টাইনের [illegible] এবং ইহুদীদের যদি কোনো সমস্যা [illegible] থাকে তো তা হচ্ছে খাওয়াপরা, [illegible] শেখা, বড় জোর দুটি ভিন্ন [illegible] ধর্মাবলম্বীদের মিলেমিশে থাকার সমস্যা।

উপরের হিসাব থেকে বোঝা যায়, গত ২৫ বছরে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে গিয়েছে। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আইনসম্মতভাবে বাইরে থেকে ৩,৭৬,০০০ জন ইহুদী প্যালেস্টাইনে এসে বাসিন্দা হয়েছে—অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক বছরে ৮,০০০ ইহুদী প্যালেস্টাইনে আশ্রয় নিয়েছে। এ ছাড়া বে-আইনী প্রবেশ তো আছেই।

এ দেশে বাস করে আসছিলো। ফিনিশীয়রা এদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদেরই অধস্তন পুরুষ আরবী ভাষায় কথা বলতে শেখে। ৮০০ খৃষ্টাব্দে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তার আগে এরা পৌত্তলিক ছিল। এদের বাদ দিলেও, ইহুদীরা আসার আগে প্যালেস্টাইনে জেবুসীয়, আমরীয় ইত্যাদি বিভিন্ন পৌত্তলিক জাত বাস করে গেছে।

খৃষ্টপূর্ব ১২শ শতাব্দীতে ইহুদীরা প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন অংশ আস্তে আস্তে অধিকার করলো। তারপর তাদের দখলে যতখানি জায়গা ছিল, ক্রমে ক্রমে তারা তা নিজেদের বারটি গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে নিলো। খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ডেভিড এবং তাঁর পরে সলোমন রাজত্ব করেন। এঁদের রাজত্বকালেই ইহুদীদের সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়। কিন্তু এর পরেই গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরের থেকে আক্রমণ। ফলে জেরুজালেম ক্রমশ ধ্বংস হয়ে গেল এবং ইহুদীরা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হলো। ব্যাবিলনের পতনের পর অবশ্য সে দেশের কিছু ইহুদী এসে জেরুজালেমে বসবাস করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সেই যে পড়ে গেলো খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আর ইহুদীরা উঠতে পারলো না।

এর পর রোমানরা যখন ৭০ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করে তখন আবার **ইহুদীদের বিতাড়িত হতে হলো। যারা বাইরে**
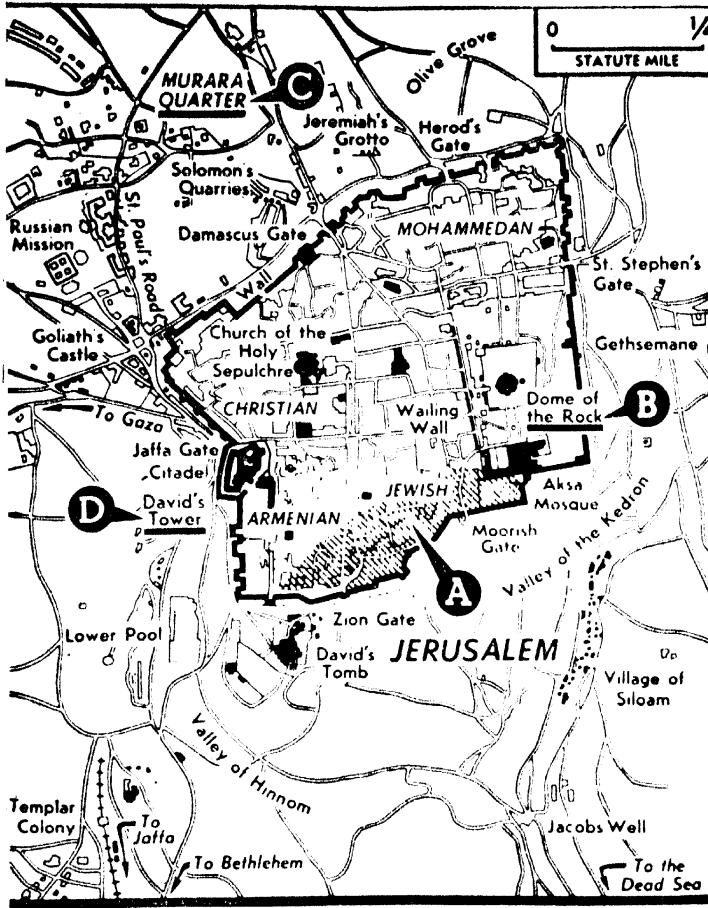
আরব-ইহুদী সম্ঘর্ষ : ইংরাজি "এ" চিহ্নিত স্থান পুরাতন প্রাচীরবেষ্টিত জেরুজালেম নগরী। উহার উপরিস্থিত কালো রেখাঙ্কিত স্থানে জিওন গেট ও "বিলাপ-প্রাচীর"এর মধ্যবর্তী স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছে এবং 'বি' চিহ্নিত স্থানে উক্ত প্রাচীর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 'সি' চিহ্নিত স্থানে মুরারা কোয়ার্টারে ইহুদীরা অগ্রসর হইয়াছে। "ডি" চিহ্নিত স্থানটি ডেভিড টাওয়ার। "বিলাপ প্রাচীরের" নিকটে ইহুদীরা অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকে

তারা ৬০ বছর পরে বিদ্রোহ করলো, কিন্তু রোমানদের রাজশক্তির সামনে তারা একেবারে গুঁড়িয়ে গেলো। অনেকে পরিণত হলো ক্রীতদাসে।

কিন্তু আরবদের অধিকার কখনো একেবারে নষ্ট হয়নি। তারা পাঁচ হাজার বছর ধরে প্যালেস্টাইনে রয়েছে। তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের মূল পরিচয়ের সূত্র কখনো হারায়নি। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে প্যালেস্টাইন পুরোপুরি আরবদের শাসনে আসে। ক্রুসেডার, মংগোল এবং মিশরীয়দের কখনো কখনো সাময়িক অধিকারের কথা বাদ দিলে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরবদের সে শাসন সমানে চলেছে। তারপর প্যালেস্টাইন ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছিল।

ইহুদীরা কিন্তু আগাগোড়াই একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়রূপেই প্যালেস্টাইনে বাস করে এসেছে।

**সমস্যার উদ্ভব**

প্যালেস্টাইন সমস্যার সঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থ জড়িত থাকলেও সমস্যাটির উদ্ভবের জন্য ইংরেজই দায়ী। ইংরেজ তিনটি বিভিন্ন স্বার্থের কাছে তিন রকম চাল দিয়েছিল। তিনটি চালই পরস্পর বিরোধী। অবশ্য এদের উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইনে ইংরেজের প্রভুত্ব কায়েম করা। সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল, কিন্তু কৃতকাজের স্ব-বিরোধ শেষ পর্যন্ত ইংরাজকে প্যালেস্টাইন ছাড়তে বাধ্য করেছে।

এই তিনটি পরস্পর বিরোধী কূটনৈতিক চাল হলোঃ ম্যাকমেহন প্রতিশ্রুতি, সাইকস-পিকো চুক্তি এবং ব্যালফুর ঘোষণা। আমরা যথাক্রমে এদের বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো প্রথমটির সঙ্গে আরবদের, দ্বিতীয়টির সঙ্গে দু-একটি বৃহৎ শক্তির এবং তৃতীয়টির সঙ্গে ইহুদীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট।

**ম্যাকমেহন প্রতিশ্রুতি**

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, তখন প্যালেস্টাইন তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তুরস্ক মিত্রশক্তির বিপক্ষে জার্মানীর দিকে গেল। ঠিক এই সময়েই আরব জাতীয়তাবাদ তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলছিল। মক্কার শরীফ হুসেন ইবন আলি এবং তাঁর ছেলে আবদুল্লা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন। ইংরাজ সুযোগ বুঝে আন্দোলন সমর্থন করলো এবং কাইরোর ব্রিটিশ হাইকমিশনার ম্যাকমেহন সাহেব ইবন আলিকে কতগুলি প্রতিশ্রুতি দিলেন। বলা হোল যুদ্ধের পরে সম্পূর্ণ আরব দ্বীপটিকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু এতে ইবন আলি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন যে, শুধু আরব দ্বীপ নয়, একেবারে তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, লেবানন ইত্যাদি সমগ্র ভূখণ্ডটিকে স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে। এই দাবীর উত্তরে ম্যাকমেহন সাহেব ১৯১৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সমস্ত ব্যাপারের একটা সাময়িক নিষ্পত্তি করলেন এই বলে যে তুরস্কের অন্তর্গত মার্সিন ও আলেকজান্দ্রেটা এবং দামাস্কাস, হমস, হামা ও আলেপ্পো জিলাগুলির পশ্চিমে সিরিয়ার অংশের ভূভাগকে পুরোপুরি আরব বলা যায় না। সুতরাং এগুলি আরব স্বাতন্ত্র্যের সীমা থেকে বাদ যাবে।

এখন প্যালেস্টাইন উপরোক্ত চুক্তি-বহির্ভূত এলাকার মধ্যে না বাইরে, এ নিয়ে ইংরাজ ও আরব তুমুল ঝগড়া করেছে। ইংরাজের মতে উপরোক্ত সর্তের অর্থই হলো এই যে, প্যালেস্টাইন আরব অধিকারে আসবে না। কিন্তু আরবেরা বলে যে, দামাস্কাস, হমস, হামা ও আলেপ্পোর সঙ্গে 'জিলা' কথাটি বসানো ভুল হয়েছে—কেননা ঐ নামে কোন বিভাগই ছিলো নেই। সুতরাং ঐগুলির দ্বারা শহর ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। তারা আরো বলে যে, সমগ্র প্যালেস্টাইনই হচ্ছে চুক্তি বহির্ভূত এলাকার দক্ষিণে, পশ্চিমে নয়। সুতরাং একে কিছুতেই এই এলাকার অংশ বলে মনে করা যেতে পারে না। আন্টোনিয়াস সাহেব তাঁর 'আরব জাগরণ' নামক পুস্তকে আরবদের এই যুক্তিকে বর্ণনা করেছেন।

এখন আরবদের দাবী ঠিক না ইংরাজের কথা ঠিক, এ তর্কের কোন শেষ নেই। তবে ইংরেজ যে একেবারে মুক্ত বিবেক নিয়ে কাজ করেছে তা মনে হয় না এই দেখে যে, যে এলাকাটি ইংরাজ আরব স্বাতন্ত্র্যের আওতা থেকে বাইরে রেখেছিলো পরে সেটিকে সে ফরাসীদের কোলে তুলে দিয়েছে। এই ইঙ্গ-ফরাসী বন্দোবস্তটিই হচ্ছে সাইকস-পিকো চুক্তি।

প্যালেস্টাইন রণাঙ্গন—(বাম হইতে দক্ষিণে) আরব বাহিনীর মেজর নাম্মান, ট্রান্স জর্ডানের রাফরাক এলাকার সৈন্যাধ্যক্ষ বানগাত পাশা ও ইরাকী আর্মির ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তাহের মহম্মদ আলোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছে

## সাইকস-পিকো চুক্তি

ইংরাজ ম্যাকমেহন প্রতিশ্রুতির কথা আরবীদের কাছে গোপন রেখে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে। ফলে ঠিক হয় যে, ইংরাজ ও ফরাসী সব আরব ভূখণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে। সিরিয়া ফরাসীদের প্রভাবাধীনে থাকবে, কিন্তু সিরিয়ার অন্তর্গত প্যালেস্টাইন এবং ইরাক ইত্যাদি দেশগুলি ইংরেজের আওতায় আসবে। রুশিয়ার সঙ্গেও এ মর্মে একটা সমঝোতা হয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবীদের হাতে এলে তারা এই চুক্তির কথা ফাঁস করে দেয়। তার আগে ইবন সৌদও এই বিষয়ে কিছু জানতে পারেননি।

বলা বাহুল্য, সাইকস-পিকো চুক্তি ম্যাকমেহন প্রতিশ্রুতির নির্লজ্জ প্রতিবাদ। কিন্তু ইংরাজ এতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে আর একপক্ষ অর্থাৎ ইহুদীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল। ১৯১৭ সালের ২রা নবেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব ব্যালফ্যুর ইহুদীদের নেতা ব্যারন রথসচাইল্ডকে যে চিঠি লিখেন তাতে এই বন্দোবস্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

## ব্যালফ্যুর ঘোষণা

ব্যালফ্যুর ঘোষণার অনেক আগে থেকেই আন্তর্জাতিক ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হতেই তারা বুঝলো যে তাদের সুযোগ এসেছে। তুরস্ক সরকারের কাছ থেকে কোনো সনদ আদায় করতে না পেরে তারা মিত্রশক্তির কাছে ধর্না দিলো এবং কয়েকমাস আলাপ আলোচনার পর ইংরেজের কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলো।

ব্যালফ্যুর তাঁর ঘোষণায় বললেনঃ "ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় গৃহ প্রতিষ্ঠাকে সুনজরে দেখেন এবং এই উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্যালেস্টাইনের বর্তমান অধিবাসী অ-ইহুদী সম্প্রদায়গুলির রাষ্ট্রিক ও ধর্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন কাজ ব্রিটিশ সরকার করবেন না।"

বলা বাহুল্য, প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের প্রতিষ্ঠা করার অর্থই হলো আরবদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করা। ইংরেজ কোনো দিন চায়নি যে, প্যালেস্টাইনে কোন বৃহৎ শক্তি বা খাস আরবদের পূর্ণ শাসন কায়েম হোক, কেননা তাতে তার সাম্রাজ্যের যোগাযোগ রক্ষা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হতে পারতো। তাই এমন একটি কূটনৈতিক চাল সে দিলো, যাতে করে একদিকে ফরাসীদের এবং অন্যদিকে আরবদের খানিকটা অসুবিধা ঘটলো। না জেনে শুনে ইংরাজ এই চাল দিয়েছিলেন, একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংরাজ এমন তিনটি চাল চেলেছিলো, যার প্রত্যেকটি পরস্পরবিরোধী। এই অন্তর্বিরোধের পরিণতি প্যালেস্টাইন সমস্যায়।

## লীগ অব নেশনস আদেশ-নামা

ইংরাজ প্যালেস্টাইনে কিভাবে বিভিন্ন স্বার্থের জট পাকালো, আমরা তা দেখলাম। ১৯২২ সালে লীগ অব নেশনস প্যালেস্টাইনে বৃটিশ মুরুব্বিয়ানা স্বীকার করে নিলো। লীগ অব নেশনসের আদেশ-নামা আসলে উপরোক্ত বিরোধী স্বার্থগুলিকে কোনরকমে তালি মেরে জুড়ে রাখারই চেষ্টা। আদেশ-নামার দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে, প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় গৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের প্রয়োজন, বৃটিশ সরকার সে সকল ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকবে। আবার এই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে প্যালেস্টাইনের সকল অধিবাসীদের রাষ্ট্রিক ও ধর্মগত অধিকার রক্ষার জন্যও ইংরাজ দায়ী থাকবে। বলা বাহুল্য, এই দুটি দায়িত্ব পরস্পরবিরোধী।

আবার আদেশ-নামার ৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্যালেস্টাইনের কর্তৃপক্ষকে ইহুদী আমদানীর বন্দোবস্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য, এই দায়িত্বও আরবদের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর।

বৃটিশ দায়িত্বের এই বিরোধ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বেড়েছে। অনেক রাজকীয় কমিশন এর কারণ অনুসন্ধান করতে এবং এর নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু সফলকাম হয়নি। ইতিমধ্যে খাস প্যালেস্টাইনে ইহুদী ও আরব মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে ব্যাপারটাকে আরো ঘোরালো করে তুললো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইহুদীদের সমস্যা আরো বড় হয়ে উঠলো। য়ুরোপের উদ্বাস্তু ইহুদীরা আশ্রয় চাইলো প্যালেস্টাইনে। প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বে-আইনী প্রবেশও আরম্ভ হলো। ইহুদী-আরব দাঙ্গাও চলতে লাগলো সমানে। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে বৃটিশ সরকার জাতিসংঘকে জানিয়ে দিলো যে,
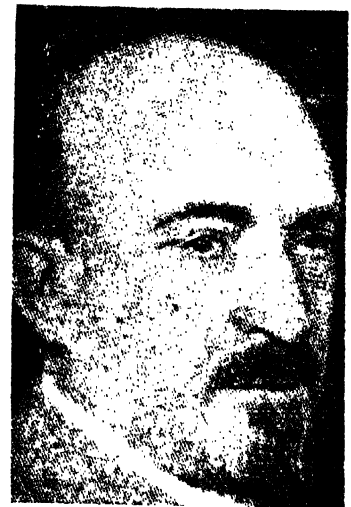
ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ওয়াইজম্যান

১৯৪৮ সাল থেকে বৃটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের ভার ছেড়ে দেবে। এই সময় থেকেই প্যালেস্টাইন সম্পর্কে আমেরিকার উদ্বেগ লক্ষ্য করা যেতে থাকে।

তারপর এক বছরের মধ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্যালেস্টাইন সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান হয়েছে, অনেক কালি ও কাগজ নষ্ট হয়েছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের নবেম্বরে জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত করেছে প্যালেস্টাইন বিভাগের। ভারতবর্ষের আপত্তি টেঁকেনি।

বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সমগ্র আরব জগতে তুমুল প্রতিবাদ উঠলো।

প্যালেস্টাইনের রণক্ষেত্রে রাজা আব্দুল্লা। ইরাকী মেডিক্যাল বাহিনীর জনৈক সৈন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছে

আরব লীগ ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক আরব নেতা এই সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করবেন বলে স্থির করলেন। ইতিমধ্যে ইংরাজও ঘোষণা করলো, ১৫ই মে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করবে।

ইহুদী সন্ত্রাসবাদী দল হাগানা ও ইরগুন চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে লাগলো।

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ১৫ই মে ইংরাজ প্যালেস্টাইনের শাসনভার ছেড়ে দেওয়ার সংগে সংগে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরব সৈন্যবাহিনীগুলিও প্রবেশ করছে প্যালেস্টাইনে। গত এপ্রিল মাস থেকে আলোচনা আরম্ভ করে জাতিসংঘ এখনো স্থির করতে পারেনি, প্যালেস্টাইনকে নিয়ে কি করা যায়। ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে রুশ-আমেরিকান স্বার্থের গতি প্রবাহ লক্ষ্য করার মতো।

### রুশ-মার্কিন স্বার্থবিরোধ

আমেরিকা প্রথমে বিভাগ সমর্থন করেছিল। রুশিয়াও বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন করে। কিন্তু তারপর আমেরিকা তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করলো, বিরোধিতা করলো প্যালেস্টাইন বিভাগের। অবশেষে যখন প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষিত হলো, তখন ঐ আমেরিকাই তাকে সবচেয়ে প্রথমে মেনে নিল। এর কারণ কি?

আমেরিকার প্যালেস্টাইনে হস্তক্ষেপ করার প্রথম কারণ হলো সে দেশের ইহুদী ধনপতিদের চাপ। তারপর যখন য়ুরোপকে সাহায্যদান করা সম্পর্কে স্থির হলো যে, আপাতত আরব পেট্রোলিয়মেই পশ্চিম য়ুরোপের চাহিদা মেটাতে হবে, তখন আমেরিকা দেখলো, মসুল থেকে তেলের নল হাইফা পর্যন্ত চলে এসেছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে হাইফাতে প্রভাব বিস্তার করতে হয়। সেইজন্য আমেরিকা-সমর্থিত ইহুদী রাষ্ট্র গঠন তার পক্ষে এত প্রয়োজন। কিন্তু পরে রুশিয়ার গতিবিধি দেখে আমেরিকা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং বিভাগের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে।

রুশিয়ারও ভূমধ্যসাগরে প্রভাব বিস্তার করা একান্ত প্রয়োজন। প্যালেস্টাইনের ইহুদী রাষ্ট্রকে সমর্থন করলে সেদিক থেকে কিছুটা সুবিধা হবে মনে করেই রুশিয়া ইসরাইলকে স্বীকার করে নিয়েছে। এখন আরব-ইহুদী লড়াইতে যদি ইহুদীদের পক্ষে বাইরের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখন রুশ সৈন্যের ইহুদীদের সাহায্য করার নাম করে সোজা ভূমধ্যসাগরে বেরিয়ে আসবে। অন্যান্য আরব রাষ্ট্র এবং তুরস্কও বৃটিশের প্রভাবাধীন; সেদিক থেকে রুশিয়ার এ পর্যন্ত কোন সুবিধা হয়নি। তাই প্যালেস্টাইনের সুযোগ সে ছাড়েনি।

### সমাধান

প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান সহজে হবে বলে মনে হয় না। জাতিসংঘ প্যালেস্টাইন বিভাগের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো, তাকে কাজে পরিণত করতে হলে জাতিসংঘের যথেষ্ট সামরিক শক্তি থাকা প্রয়োজন ছিল। জাতিসংঘের তা নেই এবং অদূরভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না। সুতরাং প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত বৃহৎ শক্তি অর্থাৎ আমেরিকা ও সোভিয়েট রুশিয়ার উপরেই নির্ভর করবে বলে মনে হয়।

আমেরিকা ও রুশিয়া এখন একযোগে ইহুদী রাষ্ট্র সমর্থন করছে বলে ভবিষ্যতেও যে তাই করবে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। তবে একথাও ঠিক যে, আমেরিকা চট করে আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে কিছু করে বসবে না। রুশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিম য়ুরোপকে খাড়া করানোই তার এখন প্রথম কাজ। অন্য কোথাও সে জড়িয়ে পড়বে না। ঠিক সেই কারণেই প্যালেস্টাইনে অশান্তির [illegible] অনেক দিন ধরে জ্বলবে বলে মনে হয়।

এদিকে পাকিস্তান আরবদের সমর্থন করছে। ভারতবর্ষ এখন পর্যন্ত [illegible] পক্ষকেই সমর্থন করেনি। ইহুদীদের প্রতি ভারতবাসীর সহানুভূতি আছে, তবে [illegible]দের যে প্যালেস্টাইনের উপর [illegible] থাকতে পারে, একথাও [illegible] বিশ্বাস করে। বস্তুত প্যালেস্টাইন সম্পর্কে ভারতবর্ষ যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা [illegible] সংঘের কাছে পেশ করেছিল, তাই [illegible] প্যালেস্টাইনের [illegible] উপকারে [illegible] কিন্তু যেখানে স্বার্থের সংঘাত, সেখানে [illegible] টিকতে পারে না। তাই [illegible] পরিকল্পনাও বৃহৎ শক্তিরা বাজে কাগজের [illegible] ফেলে দিয়েছে।

প্যালেস্টাইন যুদ্ধে পড়ে [illegible] ইহুদী ও আরব প্রাণ দেবে। কিন্তু [illegible] কোন দোষ নেই। বৃহৎ শক্তির [illegible] তারা দুটি অসহায় বড়ে।

নূতন ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষণা—বেন গুরিয়নকে (বামে) ঘোষণা পত্র স্বাক্ষর করিতে দেখা যাইতেছে

নূতন ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইহুদী বালক বালিকাদের আনন্দোৎসবের দৃশ্য।

তেল আভিবে ইহুদী হাসপাতালের উপর মিশরীয় বিমানবহরের বোমা বর্ষণের পর হাসপাতালের দৃশ্য।

**ক**লিকাতা চিড়িয়াখানায় প্রবেশের মূল্য চার পয়সা স্থলে দুই আনা ধার্য করা হইয়াছে। মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ত ছিল, কিন্তু আশংকা হইতেছে ইহাতে কর্তৃপক্ষ শেষ

পর্যন্ত লাভবান হইবেন না; কেননা সর্বসাধারণ বর্তমানে জন্তু-জানোয়ার দেখার সুযোগ চিড়িয়াখানায় প্রবেশ না করিয়াই পাইতেছে।

* * * *

**হা**য়দরাবাদে কিছুতেই দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া হইবে না,—এই ফারমান জারী করিয়াছেন H. E. H. রেজভি। শ্যামলাল বলিল, "মহামান্য রেজভি বাহাদুর ঠিক কথাই বলেছেন, অবাধ হত্যা আর লুঠতরাজের জন্য দায়িত্বহীনতার প্রয়োজনই যে বেশি।"

* * * *

**প**শ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি কলিকাতায় বাসের ব্যবসা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শুনিলাম সেই বাসের দুই ধারে গতির প্রতীক দুইটি লম্ফমান ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্তি থাকিবে। কিন্তু পালে সত্যি সত্যি বাঘ কি পড়িবে?

* * * *

**এ**কটি সংবাদে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলন নাকি শীঘ্রই সোনা-রূপার ব্যবসা খুলিবেন। "এবারে বেশ ভালো করে পান দেয়ার ব্যবস্থা হবে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

**ই**সরাইলে নাকি হীরার বদলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের তোড়জোড় চালিতেছে। পদ্ধতিটা কিছু নূতন নয়, নাকের বদলে নরুন সংগ্রহ আমরা বহুদিন হইতেই করিয়া আসিতেছি।

* * * *

**পা**কিস্তানের জাতীয় সংগীতের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া জনৈক সহযাত্রী বলিলেন,—কাশ্মীরের হানাদার বা হায়দরাবাদের রাজাকাররা ছাড়া এ রচনায় কেহই বড় সুবিধা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

* * * *

**ফি**ল্ড মার্শাল স্মাট বলিয়াছেন,—"Mankind has refused to conform to our vision"—খুড়ো

বলিলেন,—"অমানুষিক vision যে মানুষ শেষ পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারে না এ জ্ঞান কি শেষ বয়স পর্যন্ত স্মাট্‌ সাহেবের সত্যি হলো?"

* * * *

**কে**ন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব বলিয়াছেন,—"You have no chance to become a millionaire."—খুড়ো বলিলেন, "তবে আর কেনই বা নিত্যি তিরিশ দিন দশটা-পাঁচটা করছি!"

* * * *

**রা**জাজী বলিয়াছেন,—"Now that Independence has been achieved everyman can and must share it as a matter of right" আমরাও তো তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পরও পুলিশ থাকবে তা কি আর জানতাম"—কথাটা বলিতে বলিতে [illegible] একজন ট্রাম হইতে নামিয়া গেল।

* * * *

**বৃ**টিশ ইহুদীদের জন্য Sympathy এবং আরবদের জন্য good wishes জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিশুখুড়ো [illegible]

প্রসঙ্গের জের টানিয়া বলিলেন,—"[illegible] এই নীতিটাও নতুন নয়, তারা বহুদিন [illegible] চোরকে চুরি করতে এবং গেরস্তকে [illegible] থাকতে বলে আসছেন।"

* * * *

**এ**কটি সংবাদে শুনিলাম, [illegible] একদল ছেলেমেয়ে আমেরিকায় [illegible] ছেলে সরবরাহের জোর কারবার [illegible] খুড়ো বলিলেন, "ছেলেরা কি [illegible] হচ্ছে জানিনে, তবে চার্চিল প্রমুখ [illegible] পাকা ছেলেরা যে খুব উচ্চমূল্যে [illegible] তা অনুমান করা শক্ত নয়।"

* * * *

**S**chool for love in Paris' একটি সংবাদের শিরোনাম। [illegible] বলা প্রয়োজন যে, স্কুলটা হয়েছে [illegible] স্ত্রী-পুরুষকে প্রেমের পদ্ধতি শিক্ষা [illegible]

জন্য। "কিন্তু Divorceএর পদ্ধতি [illegible] দেওয়ার স্কুল না হলে যে জীবন [illegible] যাবে"—মন্তব্য করিলেন আমাদের [illegible] সংসারী বিশুখুড়ো।

## ডব্লু জি গ্রেস—

যেখানেই ক্রিকেট খেলা হয় সেখানেই ডব্লু জি, গ্রেসের নাম সকলেই জানেন। বর্তমান ইংরাজী বৎসর গ্রেসের শতবার্ষিকী বৎসর, তিনি আজ জীবিত থাকলে একশত বৎসর বয়স পূর্ণ করতেন। ইংলণ্ডে আরও বহু বড় ক্রিকেটারের জন্ম হয়েছে, জ্যাক হবস্, মরিস টেট, ভেরিটি, ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, কিন্তু প্রত্যেক ক্রীড়ামোদী গ্রেসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন, আমরা যেমন করি রণজিৎ সিংকে। গ্রেস আজ উপকথার পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন।

তিনি যখন ক্রিকেট খেলতেন তখন আজকালকার মতো মাঠের ভালো অবস্থা ছিল না কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যকারের খেলোয়াড়, ক্রিকেটের পিতা, মাঠ ভালো কি মন্দ সে সব তখন অত বিচার কেউ করত না, খেলবার জন্যই তিনি খেলতেন, হেরে গেলুম কি জিতলুম, শত দৌড় পূর্ণ হ'ল কি শূন্যতেই আউট হলুম, বিচার পরে হবে। খেলতে খেলতে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, অমনি মাঠ থেকে উইকেট তুলে নিয়ে চলে গেলেন, বৃষ্টি থামতে আবার উইকেট পুঁতে খেলতে আরম্ভ করলেন, মাঠ ভিজে, কি শক্ত, খেলবার যোগ্য কি অযোগ্য সে সব ভাববার দরকার কি? খেলা হ'ল খেলা, মনে আনন্দ পেলেই হ'ল।

গ্রেস ছিলেন ডাক্তার। একবার তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলছেন। তিনি তখন ব্যাট করছেন, একটি বল লাফিয়ে উঠে প্রায় তাঁর দাড়ি ভেদ করে চলে গেল। তিনি হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন, মাঠের প্রায় মাঝখানে এসে ব্যাট নাড়তে নাড়তে বোলারকে উদ্দেশ করে জোরে জোরে বলতে লাগলেন, "বলি তুমি খেলতে চাও, না আমাকে মারতে চাও।" বোলার কিন্তু চিনতেন গ্রেসকে, তিনি জানতেন গ্রেস একজন সত্যকারের খেলোয়াড় "সরি, ডক্টর" বোলার উত্তর দিলেন "হঠাৎ হাত ফস্কে বলটা বেরিয়ে গেছে।"

কে বড় ক্রিকেটার? ভিক্টর ট্রাম্পার না হেনড্রেন, পনসফোর্ড না ব্র্যাডম্যান, দলীপ সিং না হ্যামণ্ড, ভেরিটি না আর্থার মেলি? কিন্তু গ্রেস হলেন গ্রেস, তুলনাহীন।

## হাইজাম্পের রেকর্ড—

পৃথিবীতে হাই জাম্পের রেকর্ড কত? ১৯৪১ সালে লেস স্টিয়ার্স নামে জনৈক

মার্কিন ছয় ফিট এগারো ইঞ্চি লাফিয়ে পৃথিবীতে উচ্চ লম্ফনের রেকর্ড সৃষ্টি করে গেছেন।

কিন্তু মধ্য আফ্রিকায় বাতুসি নামে এক জাত আছে তারা সাত ফিট এগারো ইঞ্চি পর্যন্ত লাফাতে পারে। আমাদের কাছে

একজন বাতুসি সাত ফিট ছয় ইঞ্চি লাফাচ্ছে

অদ্ভুত হ'লেও তাদের কাছে মোটেই নয়, যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করতে এইরূপ উচ্চ লম্ফন তাদের নাকি শিখতেই হয়। বাতুসি জাতিরা বলে, তারা মিশরের ভূতপূর্ব ফ্যারাওদের বংশধর। এদের মধ্যে ছয় ফিট ছয় ইঞ্চির কমে লম্বা লোক পাওয়া মুস্কিল। তবে এরা লাফাবার পূর্বে একটু সুবিধা গ্রহণ করে, তারা যেখান থেকে জমি ত্যাগ করে সেখানে চৌদ্দ ইঞ্চি আন্দাজ উঁচু একটি ঢিবি থাকে। দৌড়ে এসে তার ওপর থেকে তারা লাফ মারে।

## বৃটেনে বিনামূল্যে চিকিৎসা—

বৃটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা আগামী জুলাই মাস থেকে নির্ধারিত কর্মসূচী আরম্ভ করবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃটেনের প্রত্যেক নরনারী ও শিশু বিনামূল্যে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসার সুযোগ পাবে। এই পরিকল্পনা কোনও ব্যক্তিবিশেষের দানের ওপর নির্ভর করছে না। প্রত্যেক করদাতা পরোক্ষভাবে এর ব্যয় বহন করবে। ইচ্ছা করলে কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো চিকিৎসকের সাহায্য নিতে পারবে। তাছাড়া হাসপাতাল ত' আছেই। এমন কি ডাক্তারবাবুর বিধানমতো ওষুধ কিনতেও পয়সা লাগবে না। প্রথম নয় মাসের জন্য মোট খরচ হবে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। একমাত্র রাশিয়াতে এইরূপ বিনামূল্যে চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান আছে।

# স্বত্ব

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বহুকাল আগে লেখা অখ্যাত কবিতা
ছাপা হয়েছিল ততোধিক অখ্যাত কাগজে
এখন ভুলতে পারলে বাঁচি
স্বীকার করিনে স্বত্ব
তারই দুটি পংক্তি
সেদিন চমক লাগাল মনে।

দিদির সেজো জা নবনীতা
বিয়ে হয়েছে বছর পোরেনি।
গানে যেমন গলা
তেমনি নিপুণ হাত সূচে।
বুনেছেন টেবিল ঢাকনি
সাদা জমির চারদিক ঘেরা সবুজলতা
ছোট ছোট পাতার ফাঁকে
নীলরঙের নাম না জানা ফুল।
তারপর একটু লক্ষ্য ক'রে দেখি
ফুল নয়, এক একটি অক্ষর
আর সেই অক্ষরের মালায় গাঁথা দুটি কলি :
'তোমাকে বাসি ভালো একথা ক্ষণে ক্ষণে
কত যে বলি ভাবি সদাই মনে মনে।'

বললুম, চমৎকার।
ভারি অদ্ভুত হাত তো আপনার
তুচ্ছ কবিতার দুটি চরণ,
যেমন খোঁড়া, তেমনি অপটু
তাদের রূপান্তর ঘটিয়েছেন
পার করেছেন রূপলোকে।

নবনীতা চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে
আপত্তির সুর ফুটল কণ্ঠে
বললেন, 'তুচ্ছ হবে কেন
আমার তো বেশ লাগে লাইন দুটি
আমেজ আছে আন্তরিকতার
শুধু মুখের কথা যে নয়
ধরা পড়ে শুনলে।'

মনে মনে ধন্য হয়ে গেলুম
কত অপবাদ, কত অখ্যাতি
ওই কবিতাটির জন্য রটেছিল বন্ধু মহলে
কিছু মনে রইল না।
হেসে বললুম, 'লোকে কিন্তু দেবে পক্ষপাত দোষ
বলবে লেখকটি আপনার চেনা
তাই এই সুখ্যাতি।'

আরক্ত আভায় অপরূপ দেখাল
নবনীতার সুগৌর সুন্দর মুখ
ঠোঁটে ফুটল মৃদু লজ্জিত হাসি
বললেন, 'জানলেন কি ক'রে
আর কাউকে বলেননি তো উনি।'

বললুম, বোকার মত, 'উনি মানে।'
মৃদু হাসলেন নবনীতা, 'জানিনে'
সেদিন বলেছিলুম ভারি ইচ্ছা'
তোমার হাতের অক্ষরে
লাগাই আমার সূচের রঙীন সুতো,
কিছু দাও না লিখে,
কিংবা এক কাজ করো
পদ্য লিখে দাও দু লাইনের বানিয়ে বানিয়ে
সবচেয়ে ভালো প্রথম বয়সের
পুরোণ কবিতা।
তাকে নতুন ক'রে তুলবো।'
উনি বললেন, তখন কত লিখেছি ছেপেছি ছিঁড়েছি
কিচ্ছু তো কাছে নেই,
মন থেকেও মুছে গেছে
আপদ গেছে চুকে।'
বললুম, আপদ চুকলে চলবে না
যেমন ক'রে হোক দিতেই হবে।

চলল খোঁজাখুঁজি,
ডুব সাঁতার মনের অতলে,
তারপর উঠে এল দুই পংক্তি।
যাই বলুন আপনার বন্ধুর
স্মৃতিশক্তি নেই মোটে
পরের কথাগুলি বলতে পারলেন না কিছুতে।"

গোপন করব না
সেই অখ্যাত লাইন দুটির মালিকানা হারিয়ে
জ্বালা ধরল বুকে
সূচ ফুটল অজস্র
ভাবলুম, পরের কথাগুলি যে কি বলি
সূক্ষ্ম একটি খোঁচায় জানিয়ে দিই
তারও পরের কথা।
তারপর চেয়ে চেয়ে দেখি কি হয়।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে
গট্ গট্ করে অফিস ফেরৎ ঘরে ঢুকল নীলকমল
আঁট সাঁট সাহেবী পোষাকে আপদ মস্তক মোড়া
বলল, 'ব্যাপারখানা কি।'
জবাব দিলুম, বাঁকা হেসে
দেখছিলুম তোমাদের টেবিল ঢাকনি
বুনন সৃষ্টি সুখী দম্পতীর।

ম্লান দেখাল নীলকমলের মুখ
খানিকক্ষণ কথা সরল না,
তারপর বলল মৃদু, অপ্রতিভ স্বরে
'কী যে বলো,
চলো চলো দেখবে কত বই কিনেছি
তোমাদের দেখাদেখি।'

## ক্রিকেট—

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংলণ্ড ভ্রমণ তালিকা আরম্ভ করিয়া পর পর বিভিন্ন দলকে শোচনীয়-ভাবে পরাজিত করায় ইংলণ্ডের ক্রিকেট পরিচালকগণের মনে যে ভীতির সঞ্চার হয় তাহা এখনও অপসারিত হয় নাই। টেস্ট খেলায় কিরূপে শোচনীয় পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইবেন এই চিন্তাই তাঁহাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এক এক সময় স্থির করিতেছেন সকল প্রবীণ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের লইয়াই টেস্ট টীম গঠন করিবেন আবার কখন কখনও ভাবিতেছেন সকল উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়দের লইয়াই দল গঠন করিবেন। ঠিক কোন নীতি অনুসরণ করিবেন ঠিক করিতেই পারিতেছেন না। টেস্টের দল গঠনের জন্য যে ট্রায়াল ম্যাচের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা অনেককেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন "ইঁহাদের দ্বারা অস্ট্রেলিয়ার বোলিং ও ব্যাটিং শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব।" দলের অধিনায়ক কে হইবেন তাহাও স্থির হয় নাই। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই দল গঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। দলের তালিকা পাইলে তখন এই বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

### এম সি সি বনাম অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ান দল ইংলণ্ডের এম সি সি দলকে এক ইনিংস ও ১৫৮ রানে পরাজিত করিয়াছে। এম সি সি দলটি ইংলণ্ডের অধিকাংশ টেস্ট খেলোয়াড়দের লইয়া গঠিত। অস্ট্রেলিয়া দল টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিং গ্রহণ করে ও ৫৫২ রানে ইনিংস শেষ করে। মিলার শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পরে এম সি সি দল খেলিয়া প্রথম ইনিংস ১৮৯ রানে শেষ করে। ফলে "ফলো অন" করিতে হয় ও দ্বিতীয় ইনিংস ২০৫ রানে শেষ হয়। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

**অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস**—৫৫২ রান (বার্নেস ৮১, ব্রাউন ২৬, হ্যাসেট ৫১, মিলার ১৬৩, ইয়ান জনসন ৮০, লেকার ১২৭ রানে ৩টি ও ইয়ং ১৫৭ রানে ৪টি উইকেট পান।)

**এম সি সি প্রথম ইনিংস**—১৮৯ রান (হাটন ৫২, কম্পটন ২৬, ইয়ার্ডলী ২১, টোশাক ৫১ রানে ৪টি ও মিলার ৮২ রানে ৩টি উইকেট পান।)

**এম সি সি দ্বিতীয় ইনিংস**—২০৫ রান (হাটন ৬৪, এডরিচ ২৬, ইয়ার্ডলী ২৭, ম্যাককুল ৮৮ রানে ৪টি ও জনসন ৩৮ রানে ৩টি উইকেট পান।)

### ল্যাংকাশায়ার বনাম অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংলণ্ডের ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া পর পর আটটি খেলায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টারে প্রথম ইহাদের ল্যাংকাশায়ার দলের সহিত অমীমাংসিত-ভাবে খেলা শেষ করিতে হইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী প্রাকৃতিক আবহাওয়া। খেলার সূচনায় বৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় দিন অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য খেলাই হয় নাই। তৃতীয় দিনে সেইজন্য সময়াভাবে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে।

ল্যাংকাশায়ার দল টসে জয়ী হইয়া মাঠের অবস্থা দেখিয়া অস্ট্রেলিয়া দলকে ব্যাট করিতে দেয়। ফলে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২০৪ রানে অস্ট্রেলিয়ান দল শেষ করে। ল্যাংকাশায়ার দল কিন্তু সুবিধা করিতে পারে না। ১৮২ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। পরে অস্ট্রেলিয়া দল খেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৪ উইকেটে ২৫৯ রান করে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

**অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস**—২০৪ রান (বার্নেস ৩১, হার্ভে ৩৫, লক্সটন ৩৯, রবার্টস ৫৭ রানে ৩টি, হিল্টন ৮১ রানে ৪টি উইকেট ও পোলার্ড ৩৭ রানে ৩টি উইকেট পান।)

**ল্যাংকাশায়ার প্রথম ইনিংস**—১৮২ রান (এডরিচ ৫৫, ওয়াশব্রুক ৩৩, জনস্টন ৪৯ রানে ৫টি ও লিণ্ডওয়াল ৪৯ রানে ৩টি উইকেট পান।)

**অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস**—৪ উইঃ ২৫৯ রান (বার্নেস ৩১, ব্রাউন্যান ৪৩, লক্সটন ৫২, হার্ভে নট আউট ৭৬, হেমেন্স নট আউট ৪৯, পোলার্ড ৪৮ রানে ১টি উইকেট পান।)

### ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ভ্রমণ

ভারত ভ্রমণকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন জে ডি গডার্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি পি কেলী দলের সহিত ম্যানেজার হিসাবে ভারতে আসিবেন। অধিনায়ক নির্বাচন হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রবীণ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়গণ কেহ এই দলের সহিত কেহই আসিবেন না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের উচিত এখন হইতে চাপ দেওয়া—যাহাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল বেশ শক্তিশালী করিয়াই গঠন করা হয়। এই ভ্রমণের জন্য বহু অর্থব্যয় করিতে যখন হইবে তখন যে কোন খেলোয়াড় লইয়া দল গঠিত হইলে ভারতের তথা বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ সহ্য করিবেন না।

## মুষ্টিযুদ্ধ—

পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টি-যোদ্ধা জো লুইকে পুনরায় শীঘ্রই জো ওয়ালকটের সহিত লড়িতে হইবে। গতবারের অভিজ্ঞতার পর জো লুই এইবারের লড়াইয়ের জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিতেছেন। অপরদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী জো ওয়ালকট উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন এক ভোজ-সভায় জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন "গতবার জো লুইকে সম্মান করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এবার তাহার রেহাই নাই।" জো লুইকে একজন তাঁহার অনুশীলন শিবিরে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি কিরূপ অনুভব করিতেছেন?" জো লুই একটু হাসিয়া বলেন "গতবারের চেয়ে অনেক ভাল। গতবার একেবারেই অনুশীলনের সময় পাই নাই।" জো লুই পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য শেষবার লড়িবেন এবং সেইজন্য অর্জিত গৌরব যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সাজ-পোষাকের দিকে পর্যন্ত তিনি দৃষ্টি দেন না। ইঁহার একনিষ্ঠতা দেখিয়া একজন সাংবাদিক বলিয়াছেন "ইঁহার জয় সুনিশ্চিত।"

### ভারতীয় অলিম্পিক মুষ্টিযুদ্ধ নির্বাচন

ভারতীয় অলিম্পিক মুষ্টিযুদ্ধ নির্বাচন একটি বিরাট প্রহসনে দাঁড়াইয়াছে। প্রতিযোগিতা শেষ হইল, দল নির্বাচিত হইল, দলকে বিভিন্ন স্থানে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হইল, হঠাৎ ইহার মাঝখান হইতে ভারতীয় অলিম্পিক মুষ্টিযুদ্ধ নির্বাচকমণ্ডলী হইতে প্রচারিত হইল "পুনরায় ট্রায়াল হইবে। পূর্বে যে ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আইন-গত অনেক ত্রুটী আছে।" এই আইনগত ত্রুটী নির্বাচনের পূর্বে কেন পরিচালকদের দৃষ্টিপথে পড়িল না খুঁজিয়া পাই না। পরিচালকগণ একটি ট্রায়াল পরিচালনায় যে সম্পূর্ণ অযোগ্য ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। সত্যই নির্বাচিত মুষ্টিযোদ্ধাদের জন্য আমাদের দুঃখ হইতেছে। এই বেচারীরা সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের সম্মুখে কিরূপে বাহির হইবেন? আত্মীয়-স্বজনই বা বর্ত্তমানে বলিবে কি? এইরূপভাবে তাহাদের হীন প্রতিপন্ন করিবার পরিচালক-মণ্ডলীর কোন অধিকার নাই। তাহাদের অক্ষমতার জন্য মুষ্টিযোদ্ধাদের হেয় হইতে হইবে ইহা মুষ্টি-যোদ্ধাগণই বা সহ্য করিবেন কি করিয়া ভাবিয়া পাই না। পুনরায় ট্রায়ালের ব্যবস্থা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোন মুষ্টিযোদ্ধা কি এই ট্রায়ালে যোগদান করিবে? তাহারা কি বলিবে না যে পুনরায় আইন-গত কোনত্রুটী বাহির হইবে না কে বলিতে পারে? ফলে এই হইবে যে, বিশ্বঅলিম্পিক অনুষ্ঠানে মুষ্টিযোদ্ধা যোগদান করিতে পারিবে না। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন মুষ্টিযোদ্ধা দল যোগদান করিবে বলিয়া বিশ্ব-অনুষ্ঠানের পরিচালকদের জানাইয়াছে। শেষ সময়ে যদি তাহা বাতিল করিতে হয় তাহা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। সেইজন্যই আমরা আন্তরিকভাবে সকল মুষ্টি-যোদ্ধাদের অনুরোধ করিব, তাহারা যেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া দেশের মান ও সম্মান রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া আসে এবং ট্রায়ালে যোগদান করে। কারণ ভারত হইতে যে কোন উপায়ে হউক মুষ্টি-যোদ্ধা দল প্রেরণ করিতেই হইবে।

---

## দেশী সংবাদ

২৪শে মে মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রিতে বিজায়াদা হইতে ২৫ মাইল দূরে হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ইরাপালায়াম স্টেশনে রাজাকারগণ নিজাম রাজ্যের একখানি ট্রেন আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ করে।

মধ্য প্রদেশ সংলগ্ন হায়দরাবাদ সীমান্ত হইতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রাজাকাররা রাজ্যের সৈন্য ও পলিশের সহায়তায় সেখানে ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু ভারতীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করিতেছে।

বোম্বাই সরকার হায়দরাবাদ সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

গৌহাটিতে বাঙালী হিন্দুদের উপর ব্যাপকভাবে অত্যাচার চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৫শে মেঃ—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, বস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে তদন্ত করার পর টেরিফ বোর্ড ভারত সরকারের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। টেরিফ বোর্ড নাকি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বস্ত্রের বর্তমান মূল্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং বর্তমান মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করার কোন যুক্তিই মিল মালিকদের পক্ষে নাই।

কলিকাতার রেলওয়েসমূহের পাবলিক রিলেসনস অফিসার শ্রীযুত বি সি মল্লিক অস্থায়ীভাবে বি এন রেলওয়ের ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীতে হায়দরাবাদ সম্পর্কিত আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

২৬শে মেঃ—হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলী অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীযুত ভি পি মেননের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই আলোচনাকালে হায়দরাবাদ সম্পর্কে ভারত সরকারের চূড়ান্ত প্রস্তাব মীর লায়েক আলীকে জানাইয়া দেওয়া হয়। প্রস্তাব সম্পর্কে নিজামের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া পুনরায় দিল্লী আগমনের জন্য মিঃ লায়েক আলী বিমানযোগে হায়দরাবাদ রওনা হইয়া গিয়াছেন।

আজ কলিকাতা কর্পোরেশনের তদন্ত কমিশনের সর্বপ্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয় এবং উহাতে কর্পোরেশনের প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রণয়নে অনাচার দূরীকরণ এবং আগামী নির্বাচনে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের প্রশ্ন আলোচিত হয়।

বিহারের বাঙালা ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব আজ কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক জনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গণপরিষদের সহকারী সভাপতি ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

২৭শে মেঃ—নয়াদিল্লীতে লালকেল্লায় বিশেষ আদালতে বিচারপতি শ্রীযুত আত্মাচরণ আই সি এস-এর এজলাসে মহাত্মা গান্ধীর হত্যা সম্পর্কে ধৃত নাথুরাম বিনায়ক গড়সে এবং অপর ৮ ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইয়াছে। আসামীদের নাম:—(১) নাথুরাম বিনায়ক গড়সে, (২) নারায়ণ

আপ্তে, (৩) বিষ্ণু করকরে, (৪) দিগম্বর বাডগে, (৫) মদনলাল, (৬) গোপাল গড়সে, (৭) শঙ্কর, (৮) বিনায়ক দামোদর সাভারকর, (৯) দত্তাত্রেয় সদাশিব পরাচুরে। ১৪ই জুন পর্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত রাখা হইয়াছে।।

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের বরাদ্দ ব্যবস্থা মত পশ্চিমবঙ্গ যে পরিমাণ কাপড় পায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার জুলাই মাস হইতে তাহার অর্ধেক পরিমাণ রেশন প্রথায় বিলির ব্যবস্থা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে প্রায় একশত নারী পুলিশ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ময়দানে নিখিল ভারত মণিমেলা সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। আচার্য জে বি কৃপালনী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৮শে মেঃ—অদ্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও মালব রাজ্যসমূহ লইয়া গঠিত মধ্য ভারত ইউনিয়নের উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য লইয়া যে সব ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা বৃহত্তম। মালবের ২২টি দেশীয় রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। গোয়ালিয়রের মহারাজা মধ্য ভারত ইউনিয়নের রাজপ্রমুখরূপে ও গোয়ালিয়রের প্রধান মন্ত্রী শ্রীলীলাধর যোশী ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করেন।

**২৬শে মে**—কটকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কম্যুনিস্টরা গঞ্জাম জেলায় অরাজকতার অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে। প্রকাশ, পুলিশ দল যখন গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত তাকারদা গ্রাম হইতে একদল কম্যুনিস্ট গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন প্রায় দুই হাজার লোকের এক জনতা উহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে পুলিশ দলের ১৭ জন আহত হয়। পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে দুইজন নারী সহ ৪ ব্যক্তি নিহত ও ২০ জন আহত হইয়াছে।

করাচীতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ পাকিস্থানকে কয়লা, লোহা, কাপড়, কাগজ ইত্যাদি সরবরাহ করিবে এবং পাকিস্থান ভারতবর্ষকে পাট, তুলা, খাদ্যশস্য, কাঁচা চামড়া ইত্যাদি দিবে।

**২৯শে মে**—হুগলী জেলার অন্তর্গত বড় কমলপুর গ্রামে ব্যাপকভাবে বে-আইনী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুলিশ গ্রামের প্রত্যেক গৃহে তল্লাসী চালায়। উক্ত গ্রামে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হইতে শনিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সান্ধ্য আইন ভঙ্গের দায়ে ৭৩ জনকে গেপ্তার করা হয়। বড় কমলপুর কম্যুনিস্টদের এক বিরাট কেন্দ্র।

**৩০শে মে**—ভারত সরকার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলিকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্তও যদি বস্ত্র পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটে, তবে ক্রেতা সাধারণকে ন্যায্য মূল্যে বস্ত্র সরবরাহের জন্য গভর্নমেণ্ট উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

মেদিনীপুরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুত কালীপদ মুখার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভায় পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত বাস্তুত্যাগীদের নানাবিধ সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

## বিদেশী সংবাদ

২৪শে মেঃ—দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্ট অদ্য ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত এই গভর্নমেণ্ট প্রথম ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইল।

অদ্য কুওমিণ্টাং সেণ্ট্রাল স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক অতিরিক্ত অধিবেশনে ডাঃ উং ওয়েনহাও সর্বসম্মতিক্রমে চীনের নূতন প্রধান মন্ত্রী পদে মনোনীত হইয়াছেন।

২৫শে মেঃ—সম্মিলিত রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ বলবৎ করার মেয়াদ আরও ৪৮ ঘণ্টার জন্য বাড়াইয়া দিয়াছেন।

২৬শে মে—অদ্য লেক সাকসেস-এ কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা যায়, আরব রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে সম্মিলিত জাতি পরিষদের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদে ভারত-পাকিস্থান আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইলে সভাপতি মঃ প্যারোডী ঘোষণা করেন যে, পরিষদ কাশ্মীর কমিশন গঠন করিয়াছেন। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধির নাম এখনও জানা যায় নাই।

২৭শে মে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জর্জ মার্শাল রাশিয়ার কতকগুলি কার্যকলাপের এক তালিকা সেনেটের বৈদেশিক বিষয়ক কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই সকল কার্যকলাপ নাকি যথার্থ শান্তির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে।

২৮শে মে—দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত জেনারেল স্মাটস অদ্য গভর্নর জেনারেলের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ডা ডানিয়েলে মালানকে প্রিটোরিয়ায় আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

প্যালেস্টাইন সমস্যা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য একমাস স্থায়ী যুদ্ধ বিরতি এবং এই একমাস যাহাতে আরব বা ইহুদীদের জন্য কোন অস্ত্র প্রেরিত না হয়, তদুদ্দেশ্যে বৃটিশ পক্ষ হইতে নিরাপত্তা পরিষদে একটি নূতন প্রস্তাব আনা হইয়াছে।

**২৯শে মে**—সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদ ইহুদী ও আরবদিগকে ৪ সপ্তাহের জন্য যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার নির্দেশ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্যালেস্টাইন ও আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে ঐ সময়ের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হইতে পারিবে না বলিয়াও নির্দেশ জারী করা হইয়াছে।

**শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।**
**স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।**

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　　সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ ]　　শনিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ সাল।　Saturday, 12th June, 1948.　[ ৩২শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

## রতের ঐক্য ও সংহতি

কিছুদিন পূর্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ডিত জওহরলাল নেহরু কোয়েম্বাটুরে জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের ঐক্য এবং তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ রিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলেন, ভারতকে একটি দৃঢ় এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রস্বরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ঐক্য ও পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে—ঘৃণা, হিংসা ও প্রাদেশিকতার পথে নয়। পণ্ডিতজী বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন, ভারতকে যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতের সর্বজনমান্য প্রধান মন্ত্রীর উক্তির গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিবেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "কুমারিকা অন্তরীপ হইতে খাইবার গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত যে সকল ঐক্য বিদ্যমান ছিল, তাহার বলেই আমরা এক বিরাট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থ হই এবং স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হই। সেই স্বাধীনতাকে চিরস্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং প্রাদেশিকতা বর্জন করিয়া গান্ধীজীর ঐক্য, প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে হইবে।" বলা বাহুল্য, আমরা বাঙালী, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই দিক হইতে আমরা বড় রকমের বিপর্যয় লক্ষ্য করিতেছি। পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতায় ভারত বিভাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—"দেশ বিভাগ আমাদের বুকে দারুণ আঘাত দিয়া গিয়াছে।" ভারতের জাতীয়তাবাদী মাত্রেরই বুকে এ আঘাত লাগিয়াছে, কিন্তু এই আঘাতে বিপন্ন এবং বিব্রত হইয়াছে বাঙালী সবচেয়ে বেশী। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগের ব্যবস্থায় বাঙলার যতখানি সর্বনাশ হইয়া বসিয়াছে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশেরই ততটা হয় নাই। অধিকন্তু প্রাদেশিকতার চক্র দুর্গত বাঙালীকে এই অবস্থার মধ্যে পিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। দেশ বিভাগ সত্ত্বেও প্রাদেশিকতার এই পীড়ন যদি বাঙলার উপর আসিয়া না পড়িত, তবে এমন সংকটের মধ্যেও তাহার পক্ষে সান্ত্বনার কিছু কারণ থাকিত এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের দিক হইতেও বাঙলার কিছু সুবিধা হইত। বস্তুত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদনীতির কুফল বাঙলা দেশ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকন্তু ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও এদিক হইতে বাঙলা দেশ কোন সুবিধাই পাইতেছে না। কংগ্রেসে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের নীতি বহুদিন পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। শুধু বৃটিশের বাধার জন্য সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এখন আর সে সমস্যা নাই। বাঙলার জনমত আজ সমবেত কণ্ঠে সমগ্র বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল ফিরিয়া পাইবার দাবী করিতেছে। কেহ কেহ বাঙলার এই দাবীর বিরুদ্ধে এই যুক্তি উপস্থিত করিতেছেন যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্মুখে নানাবিধ গুরুতর সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে; আপাতত বাঙলার এই দাবী উত্থাপন না করাই ভাল। বলা বাহুল্য, আমরা ইঁহাদের এমন যুক্তি সমর্থন করিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্য এবং সংহতিই বর্তমানে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধির দিক হইতে বাঙলার দাবীর প্রতিপূরণে যত্নশীল হওয়া অবিলম্বে কর্তব্য। বস্তুত বাঙলার দাবী রক্ষিত হইলে প্রাদেশিকতার একটা বড় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। বাঙলার দাবী উপেক্ষিত হওয়াতে প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তিই উত্তরোত্তর প্রশ্রয় লাভ করিতেছে।

## বাঙলী বিদ্বেষ প্রচার

ভারতে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়াছে বাঙলা দেশ। রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সমগ্র ভারতের সংস্কৃতি স্বাধীনতার উদ্দীপনাময় প্রেরণার উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে। বাঙলার ছেলেরা দলে দলে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া মরিয়াছে। কাননে কান্তারে, ভূধর শিখরে বাঙলার স্বদেশ-প্রেমিক সাধক জাতীয়তার যজ্ঞানল জ্বালিয়া তাহাতে নিজেদের আহুতি দিয়াছে। অথচ সেই বাঙলার নামে আজ প্রাদেশিক সংকীর্ণতার জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করিয়া দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত প্রচারকার্য সুরু হইয়াছে। পাটনার 'সার্চলাইট' পত্র কলিকাতার সংবাদ-দাতার প্রদত্ত বিবরণ বলিয়া জাঁকালো শিরোনামা বাঁধিয়া লিখিয়াছেন—"এখানে প্রত্যহ ট্রামে বাসে ও বাজারে বিহারী বিরোধ বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হইতেছে। সর্বত্র বিহারীরা প্রহৃত, লাঞ্ছিত এবং দূর দূর করিয়া বিতাড়িত হইতেছে। সিংভূম, মানভূম এবং বিহারের অন্যান্য অংশ পশ্চিম বঙ্গের সামিল করার আন্দোলন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। বাঙলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রতিদিন বহু ইস্তাহার ও প্রচারপত্র বিলি হইতেছে এবং বিহার ও বিহারীদের বিরুদ্ধে অতি উগ্র প্রচারকার্য চলিতেছে। ইহাতে জন-গণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হইতেছে। যে কোন সময়ে এই উত্তেজনা বিহারীদের পক্ষে অনিষ্ট-কর বিস্ফোরণ ঘটাইতে পারে।" বাঙলা দেশের রাজধানী কলিকাতার বুকের উপর বসিয়া যিনি বাঙলার বিরুদ্ধে এইরূপে মিথ্যা প্রচার করিতে পারেন, তাঁহার স্পর্ধা এবং নীচাশয়তা সত্যই আমাদের মনকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। কলিকাতার ট্রামে, বাসে ও বাজারে বিহারী লাঞ্ছনা ও বিতাড়ন চলিতেছে, এমন কথা বাঙলা এবং বাঙালীর অতি বড় নিন্দুক যে তেমন কেহও বলিতে পারিবে কি? বলা বাহুল্য বিহারের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গভাষাভাষী এলাকাগুলি পশ্চিম বঙ্গে ফিরিয়া পাইবার জন্য সম্প্রতি যে দাবী উঠিয়াছে, তাহাকে লোকচক্ষুতে হেয়

করিবার জন্যই এই শ্রেণীর অপপ্রচার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী তাহার চিরন্তন শিক্ষা এবং সংস্কৃতি হারায় নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্য সংহতি এবং সেই পথে তাহার সর্বাঙ্গীন উন্নতিই বাঙালীর কাম্য। বাঙালীর সমগ্র রীতি-প্রকৃতি প্রাদেশিকতার বিরোধী; নহিলে বিহারে এবং আসামে বাঙালীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন হইতে যেভাবে অপচেষ্টা চলিয়াছে বাঙলা দেশে তাহার শোচনীয় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইত। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে বিবেচনায় বাঙালী সব সহ্য করিয়া চলিতেছে। কিন্তু সহ্য গুণেরও একটা মাত্রা আছে। বঙ্গ বিভাগের ফলে আজ বাঙালী জাতি দুর্গত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙলী এখন জীবনমরণ সমস্যার মধ্যে পতিত। এই বিপদের দিনে বাঙালী শুধু তাহার প্রতি সুবিচার চাহিতেছে। বাঙলার দাবীর সঙ্গে প্রাদেশিকতার কোন সংস্রব নাই। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে সকলেই সে কথা স্বীকার করিবেন। এমন অবস্থায় বাঙলার ন্যায্য দাবী প্রতিপালনে যদি দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করা হয়, তবে বাঙালীর মনে স্বতঃই নানারূপ সন্দেহের সৃষ্টি হইবে। ইহার উপর যদি বাঙালীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চলিতে থাকে এবং তাহা সংযত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন সংশিলষ্ট প্রদেশের কর্তৃপক্ষ উদাসীনতা অবলম্বন করেন, তবে অনর্থ আরও ঘনাইয়া আসিবে। এইভাবে তিক্ততা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে। সুতরাং বাঙলার দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া অবিলম্বে সেগুলি প্রতিপালন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

### অদৃষ্টের পরিহাস

পাকিস্থান সংশিলষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে মিঃ সুরাবদীর নাম অক্ষয় এবং অব্যয় হইয়া থাকিবে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং তাহার ভয়াবহ পরিণতির যত কীর্তি সুরাবর্দী সাহেবের নামের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। এহেন মিঃ শহীদ সুরাবর্দী সেদিন পাকিস্থান পূর্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। তাঁহাকে ঢাকায় আটক করিয়া পরে কলিকাতাগামী স্টীমারে চড়াইয়া দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন মিঃ সুরাবদীর কাছে এই সম্পর্কে যে চিঠি দেন, তাহাতে তিনি মিঃ সুরাবদীর উপর কয়েকটি অভিযোগ আরোপ করেন। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ এই যে, সুরাবর্দী সাহেব গোপনে গোপনে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সেজন্য চক্রান্ত চালাইতেছেন। মিঃ সুরাবর্দী এ অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থান বা মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য যে সুরাবর্দীর দরদ যে কোন অংশে কম, আমরা তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না। মিঃ সুরাবর্দী খাজা নাজিমুদ্দীনের রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিরোধ আছে, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু রাষ্ট্রের নীতি পরিচালনে মুসলিম-প্রাধান্য অব্যাহত রাখার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুরাবর্দী সাহেব বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য একদিন ধুয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের মুখে তিনি যেই শুনিলেন যে, বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হইলে বাঙলাতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে না, অমনই তাঁহার কণ্ঠ আকস্মিকভাবে নীরব হইয়া গেল। সেকথা কে না জানে? বস্তুত মিঃ সুরাবর্দীর দল পূর্ব পাকিস্থানে উৎকট সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নীতি আগাগোড়া সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও মাঝে মাঝে তাঁহার সেই জিগীর যত্রতত্র তুলিয়া থাকেন। পাকিস্থানে শরিয়তী শাসন প্রচলন করা সম্পর্কে খাজা নাজিমুদ্দীনের অনুরাগী মৌলানা আক্রাম খাঁ এবং মিঃ সুরাবর্দীর দলের সমর্থক, ভাসানীর পীরের মধ্যে কোন পার্থক্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'আজাদে'র মারফতে মৌলানা সাহেবের মন্ত্র ছাড়া এবং পীর সাহেবের পানি-পড়া, কালোজীরা পড়া দুইয়েরই লক্ষ্য এক। সুতরাং মিঃ সুরাবর্দী পাকিস্থানের অনিষ্ট করিবেন, ইহা মূর্খেও বিশ্বাস করিবে না ও ফলত খাজা নাজিমুদ্দীন মিঃ সুরাবর্দীর সম্পর্কে এই যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন, ইহার কোন প্রমাণও নাই। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, মিঃ সুরাবর্দী কিছুদিন হইল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ফলত খাজা নাজিমুদ্দীন এই প্রচার-কার্যের পক্ষে দোষ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বর্তমানে কোন অসদ্ভাব নাই। এক্ষেত্রে ঐক্য এবং মিলনের বাণী প্রচার করিতে গেলে, সেখানে অনৈক্য এবং বিরোধ আছে, বাহিরের লোকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইবে। বলা বাহুল্য এমন যুক্তির সাহায্যে যে কোন ভাল কাজের জন্য প্রচারকার্য এই বলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় যে, তাহা প্রচার করিলে, লোকের মনে এই ধারণা হইবে যে, সেখানে মন্দ কাজই শুধু ঘটে। সুরাবর্দী সাহেব হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও মিলন সম্পর্কে প্রচার কার্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে কেন যান, খাজা নাজিমুদ্দীন এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এই প্রশ্ন উত্থাপন প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সরকারের উপরও বক্রোক্তি করিয়াছেন। নাজিমুদ্দীন সাহেব বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানেরা উৎপীড়িত হইয়াছে এবং বহু সংখ্যায় পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিয়া[illegible] এ অভিযোগ গুরুতর এবং ইহা ব্য[illegible] বিশেষের অভিযোগও নহে। একটা রা[illegible] বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপর একটি প্র[illegible] বেশী রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী নিত[illegible] রূঢ়তার সঙ্গে এবং অভদ্রভাবে এই অভি[illegible] উত্থাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পশ্চি[illegible] বঙ্গে মুসলমানদের উপর পীড়ন হই[illegible] এবং তাহারা দলে দলে সেজন্য পূর্ব[illegible] গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, ইহা জঘন্য মি[illegible] পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর তরফ [illegible] এতদিন এমন অভিসন্ধিপূর্ণ মিথ্যা ক[illegible] সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত [illegible] আমরা তো দেখিতেছি, পূর্ববঙ্গ হইতে সং[illegible] লঘু সম্প্রদায় দলে দলে এখনও পশ্চিম[illegible] আসিতেছে এবং তাহাদের উপর নিষ্ঠু[illegible] উৎপীড়নের খবর এখনও পাওয়া যাইতে[illegible] অন্য উৎপীড়নের কথা যদি ছাড়িয়াও দে[illegible] যায়, এক নারী নিগ্রহের যে সব স[illegible] আসিতেছে, তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখ[illegible] সুতরাং পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্[illegible] প্রচারের প্রয়োজনীয়তা শেষ হই[illegible] একথার মূলে কোন যুক্তি নাই। কার্য[illegible] নাজিমুদ্দীন তেমন প্রচার চাহেন না; [illegible] তাঁহার স্বার্থের বিরোধী; কারণ ইহাই [illegible] মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে [illegible] স্বীকার করিতেই হয় যে, স[illegible] দায়িক সম্প্রীতি পাকিস্থানী [illegible] সহায়ক নহে। ভেদবাদের উপরই সে [illegible] প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। সুতরাং সুরাবর্দী [illegible] সাম্প্রদায়িক প্রীতি প্রচার করিতে[illegible] পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত হইবেন, ই[illegible] আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই এবং [illegible] তিনি নিজের কৃত কার্যের পুর[illegible] এখন নিজে ভোগ করিতেছেন।

### শেষ মীমাংসার আশা

হায়দরাবাদের সমস্যা সম্বন্ধে [illegible] গভর্ণমেণ্ট এবার শেষ সিদ্ধান্ত অব[illegible] করিবেন বলিয়া শুনিতে পাইতেছি। এসব সত্ত্বেও আমাদের মনে সন্দেহ এবং [illegible] সমানভাবেই থাকিয়া যাইতেছে। প্রকৃ[illegible] নিজাম এবং তাঁহার পারিষদবর্গ যদি [illegible] গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা স[illegible] আন্তরিকতা অবলম্বন করিয়া চলিতেন, ত[illegible] সমস্যা অনেক দিন আগেই মিটিয়া [illegible] বলিয়া আমরা মনে করি; বস্তুতঃ উগ্র [illegible] দায়িকতাবাদী রাজাকর দলের সব আস্ফ[illegible] অন্তরালে নিজাম এবং তাঁহার পারিষদবর্গে[illegible] পৃষ্ঠপোষকতা রহিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। ন[illegible] কূট কৌশল অবলম্বন করিয়া নিজাম [illegible] তাঁহার গভর্ণমেণ্ট রাজাকর দলের বল[illegible] ছল খুঁজিতেছেন। ইত্তেহাদ-উল-মু[illegible] দলের প্রতিনিধিবর্গের জিম্মা-দর্শনে কে[illegible]

গমন এবং তৎসম্পর্কে মিঃ জিন্নার কূটনৈতিক বিবৃতি পারস্পরিক যুক্তি অনুসারে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। মিঃ জিন্না হায়দরাবাদের এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই। এ ক্ষেত্রে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতি ভদ্রতার তিনি একটা ভাণ করিয়াছেন; কিন্তু কার্যত বিবৃতির মারফতে তিনি নিজামের পক্ষের কাজ সারিয়াছেন। মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, ভারত গভর্নমেন্ট হায়দ্রাবাদকে ভারতীয় অন্তর্ভুক্তি করিবার জন্য বল প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করিবেন না, তিনি ইহাই আশা করেন। বলা বাহুল্য, এমন উক্তির দ্বারা ভারত গভর্নমেন্ট এ সম্বন্ধে বল প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করিতেছেন, ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং ভারত রাষ্ট্রের প্রতিকূলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভাব উস্কাইয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ জিন্না কিংবা তাঁহার অনুগত দল যাহাই করুন, আর রাজাকর দলও যাহাই করুক, হায়দ্রাবাদের সমস্যার অবিলম্বে চূড়ান্তভাবে মীমাংসা না করিলে অবস্থা জটিল আকার ধারণ করিবে। পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি একথাটা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুর মতে হায়দরাবাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এরূপ যে, ঐ রাজ্য ভারতের বাহিরে থাকিতে পারে না; এবং হায়দ্রাবাদকে জোর করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি করিবার ইচ্ছা ভারত গভর্নমেণ্টের নাই; কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া সে নীতিও যে শেষটা ভারত গভর্নমেণ্ট অবলম্বন করিতে পারেন, পণ্ডিতজী তেমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতীয় রাষ্ট্রের শত্রু সক্রিয় হায়দ্রাবাদকে নিজেদের ঘাঁটিস্বরূপে ব্যবহার করিতে পারে, এমন ভয়ের কারণ রহিয়াছে। এই শত্রু কাহারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, তবে পণ্ডিত জওহরলালের মত ব্যক্তির মুখে একথার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের মনে হয় অবিলম্বে হায়দ্রাবাদের এই সমস্যা যেমন করিয়া হোক মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। নিজাম যদি সহজে সে পথে আসিতে না চান, তবে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে স্বৈরাচারী এই শাসককে বিতাড়িত করাই ভারত সরকারের পক্ষে এখন প্রয়োজন।

**নিরাপত্তা পরিষদ ও কাশ্মীর**

বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিযুক্ত কমিশনের সদস্য কাশ্মীরে আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এখানে আসিয়া কি করিবেন, আমরা বুঝি না। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পরিষদকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, পরিষদ কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে অন্যান্তর রকমের পাকিস্থান ও ভারতের ভিতরকার আর কয়েকটি সমস্যা জড়াইয়া তদন্ত করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারত সরকার তাহা মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন। জুনাগড়ের সমস্যা এখন আর নাই। গণভোটের দ্বারা সেখানে শাসন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্র নিজেদের এলাকার মুসলমানদের হত্যা করিয়া উৎখাত করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া পাকিস্থানী প্রতিনিধি স্যর জাফরুল্লা খাঁ যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, কোন সভ্য গভর্নমেণ্ট তাহা মানিয়া লইতে পারে না। ভারত সরকার যদি তেমন মধ্যযুগীয় বর্বর নীতিই অবলম্বন করিবে, তবে দলে দলে মুসলমানেরা পাকিস্থান ছাড়িয়া ভারতে আসিতেছে কেন? সুতরাং ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নিতান্ত ধৃষ্ট এবং দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত। বস্তুতঃ ভারত সরকার এইসব অভিযোগকে কিছুতেই আমল দিতে পারেন না এবং দিবেনও না। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণ যদি কাশ্মীরের ব্যাপারের তদন্ত করিতে আসেন, তবে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত সরকারের যে অভিযোগ শুধু সেই সম্বন্ধেই তাঁহাদের তদন্ত করিতে হইবে। সে তদন্তকালেও ভারত গভর্নমেণ্ট কাশ্মীর হইতে তাঁহাদের সেনা সরাইবেন না। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সেদিনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাশ্মীর হইতে যতদিন পর্যন্ত হানাদারেরা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না হইবে, সে পর্যন্ত সেখান হইতে সেনাদল সরাইবার কোন ইচ্ছাই তাঁহাদের নাই। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁহাদের নীতির এ পর্যন্ত কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করেন নাই। এখন তো তথাকার পার্বত্য অঞ্চলে পাকিস্থানী সৈন্যেরা সাক্ষাৎ-সম্পর্কেই ভারতীয় সেনাদলকে বাধা দিতেছে। এ অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের এদেশে আসিয়া পণ্ডশ্রম স্বীকার করার কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

**উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারী ব্যবস্থা**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্তত্রাণ বিভাগের কমিশনার সম্প্রতি সেদিন সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগীদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য ও আশ্রয়দানের পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতি অনুসারে বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদিগের পুনর্বসতি বিধানের জন্য বহু সংখ্যক পতিত জমি দখলে আনিয়া কতকগুলি আদর্শ পল্লী নির্মাণ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। কমিশনার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত হিসাব অনুসারে পূর্ববঙ্গ হইতে এপর্যন্ত ১১ লক্ষ নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আগমন করিয়াছে। এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাহারা সরকারে নাম রেজেস্ট্রী করিয়াছে এই হিসাবে শুধু তাহাদিগকেই ধরা হইয়াছে। সকলেই যে নাম রেজেস্ট্রী করিয়াছে, এমন নয়, সুতরাং উদ্বাস্তুদের সংখ্যা আরও বেশী বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক বেশী, কিন্তু শিল্পী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের লোকও অনেক আছে। যাহারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাহাদের ছাড়িয়া দিলে অন্য যাহারা আসিয়াছে, তাহারা তাহাদের ভিটামাটি বিক্রয় করিয়াই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। পুনরায় ফিরিবার মত কোন সম্বল তাহারা রাখিয়া আসে নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতদিন পরে এইসব কারিকর, মজুর এবং কৃষকদিগকে লইয়া পল্লী সংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের গঠন কার্যে এইসব সম্প্রদায়ের লোকের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাদিগকে আর অধিকদিন অসংস্থিত ও অসহায় অবস্থায় রাখা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্য নহে। ইহা ছাড়া, পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগীদের আগমন এখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই। ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে গতিবিধি, শুল্ক বিভাগীয় সম্পর্কিত ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সুব্যবস্থা হইবার ফলে লোকের আতঙ্ক কিছু কমিয়াছে ইহা ঠিক। মেয়েদের অঙ্গ হইতে গহনা কাড়িয়া লইবার অভদ্র উপদ্রব, এখন দূর হইয়াছে। যাত্রীদের পদমর্যাদা এবং অবস্থা অনুসারে নির্ধারিত পরিমাণ অলংকার লইয়া গতিবিধিতে বর্তমানে শুল্ক বিভাগীয় বিধান আর ভঙ্গ হয় না। কিন্তু মূল সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই। পূর্ববঙ্গের শাসন বিভাগে তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মর্যাদা যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত তথাকার অব্যবস্থা দূর হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইহা বুঝিয়া বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা সমাধানে তৎপর থাকিতে হইবে।

**ডাক চলাচলের সুব্যবস্থা**

পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের মধ্যে ডাক চলাচলের অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। বাঙলা বিভক্ত হইবার পর উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনিঅর্ডার, চিঠি ও কাগজপত্র এক্সচেঞ্জ পোষ্ট অফিসের মারফৎ বিলি হইতেছিল। ১লা জুন হইতে সেগুলির সরাসরি বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে পথিমধ্যে চিঠিপত্র আটক থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কাজেই চিঠিপত্র পাইতে অযথা বিলম্ব ঘটিবে না। ইহাই আশা করা যায়।

# অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি খান কয়েক বাঙলা সংবাদপত্রে (সব পত্রিকায় কেন যে নয়, তা বুঝলাম না!) খবর জানলাম যে, বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কবি নজরুল ইসলামের বয়স পঞ্চাশে পড়লো। চমকে উঠলাম, কেমন যেন বিশ্বাস হলো না। বয়সের রাজ্যে পঞ্চাশ শুনলেই কানে শাস্ত্রবাক্য বাজতে থাকে ঃ "পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ"। এ-যে পাতা-ঝরা প্রৌঢ়ত্বের নির্মম নিরঙ্কুশ ঘোষণা, জীবনের সরস শ্যামল অরণ্যে 'কাজী নজরুল ইসলাম' নামটিকে মনে মনে নিঃসংশয়ে একদা আমরা একেবারে জড়িয়ে এক ক'রে ফেলেছিলাম বাঙলার নবজাগ্রত যৌবনের সঙ্গে। কালের অব্যর্থ তাড়নায় সে-জীবনেও যে একদিন পঞ্চাশ আসবে (তাঁর বর্তমান কঠিন ব্যাধির কথা না হয় নাই তুললাম), এতকাল তা মনেই পড়েনি। ফলে এ সংবাদে সচকিত হবারই কথা। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে মনের আকাশে এই চিন্তাই তাই বার বার শরতের স্বপ্নলঘু মেঘমালার মতো ভেসে বেড়াতে লাগলো—সারা বাঙলার সে-দিনের সেই উদাত্ত-শক্তি যৌবনও কি আজ তাহলে অসংখ্য আনন্দ-বেদনার বিচিত্র আঘাতে-সংঘাতে অবশেষে এসে পৌঁছল তার প্রৌঢ়ত্বের পশ্চাৎদ্বারে? নতুন যুগের নবীনতম যৌবনকে জয়টীকা পরিয়ে এবার এল বোধ হয় তার বিদায় নেবার লগ্ন। মন তবু মাথা নেড়ে যেন গুমরে উঠে বলতে চায়,—নবসৃষ্টির সদ্যোত্থিত গীতোল্লাসে সে দিনের সব গান কখনই একেবারে নিঃশেষে মুছে যাবে না! কালের ব্যবধান যতই হোক না কেন, প্রাণের বাণীতে প্রাণ কি কখনও সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে?

প্রায় বছর পঁচিশ পূর্বের কথা, আমাদের তখন নতুন ছাত্রজীবন। 'হাবিলদার কবি' কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলার কাব্য-রণাঙ্গনে মাত্র অল্প কিছুকাল হলো প্রবেশ করেছেন। তাঁর স্বকীয় প্রতিভার স্বপ্রকাশ-গৌরবে। কাব্য-ভারতীর অঙ্গনে কাজী নজরুলের সেই প্রথম প্রবেশ যথার্থই যোদ্ধৃবেশে, আদি-নজরুল-কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সে-অঙ্গণকে 'রণাঙ্গন' বললেই সঠিক বর্ণনা করা হয়। সেদিন তিনি কার পদাঙ্ক অনুসরণের প্রমাণ দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যে ও ভাষায়—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের, না 'বেদুইন'এর কবি মোহিতলাল মজুমদারের: বিখ্যাত তার "বিদ্রোহী" কবিতায় বিদ্রোহী আমেরিকান কবি ওয়ালট্ হুইটম্যান-এর 'সং অব্ মাইসেলফ্' সাক্ষাৎভাবে কতখানি ছায়া-পাত করেছিল; সে-সব সূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে প্রবেশ করবার মতো বিদ্যা বা বুদ্ধি কোনোটাই আমাদের ছিল না, সে-রকম কোনো বিচারও আমরা সেদিন করিনি। তবে তখনকার কবি-মনের সংক্ষুব্ধ ঝোড়ো আবহাওয়াটার কারণ আজ বেশ পরিষ্কার অনুমান করতে পারি। য়ুরোপের প্রথম মহাসমর সবেমাত্র শেষ হয়েছে, কবি স্বয়ং তার অনেকখানি স্বাদ নিজের জীবনেও সাক্ষাৎভাবে লাভ করেছেন। বয়স মাত্র পনের বছর যখন, কিশোর নজরুল স্কুল পালিয়ে যোগ দিয়েছিলেন বাঙালী পল্টনে; হাবিলদার হ'য়ে ঘুরেছিলেন মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্তান, ইরাণ ইত্যাদি পশ্চিম এশিয়ার সদ্য-সুপ্তোত্থিত কয়েকটি মুসলিম রাজ্যে। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে থাকলেও তখনো তাঁর তরুণ প্রাণে সে কুচকাওয়াজ ও ঊর্ধ্বশ্বাস-উন্মাদনার স্মৃতি সম্পূর্ণ কাটেনি। তুরস্ক-মিশরের নব-অভ্যুত্থানের সুতীব্র রক্তরেখায় হৃদয়ে জেগেছিল স্বাধীনতার অনাস্বাদিত প্রথম প্রেরণা। তারই সঙ্গে যোগ দিয়েছিল স্বদেশে ফেরবার পর অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সারা ভারত-জোড়া ঝঞ্ঝার ঝাপট, সমগ্র স্বদেশবাসীর নানা আশঙ্কায় আন্দোলিত অশান্ত সিন্ধুহিল্লোল। বাঙলার হিন্দু-মুসলিম নব-যৌবনেরা তখন সুগভীর আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার আগ্রহে উন্মুখ; দেশাত্মবোধের নিরুদ্ধ প্রেরণা তাদের বলিষ্ঠ বুকে মাথা কুটে মরছে ভাষায় ও কর্মে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায়। কর্মের আয়োজন করা অবশ্য প্রবীণ দেশনেতা-দেরই কাজ। কিন্তু তরুণের প্রকাশপ্রবণ প্রচণ্ড প্রাণশক্তিকে ভাষায় স্পন্দিত ও মূর্ত করে তোলার জন্যে নিতান্তই দরকার একজন যথার্থ হিম্মৎদার তরুণ কবিকে। এই থমথমে অবস্থার মাঝখানে সহসা বৈশাখী ঝড়ের মতো ধূলি-ধ্বজা উড়িয়ে বঙ্গবাণীর অঙ্গণে ছুটে এল কাজীর কবিতা তার উর্দু-ফার্সী-সংস্কৃত—

মাঝে মাঝে এমন কি ইংরেজি শব্দেরও আশ্চর্য ধ্বনিঝঙ্কনা বাজিয়ে পাতায় পাতায় অজস্র আবেগসঙ্কুল ড্যাশ্-হসন্ত-বিসর্গ-বিস্ময় চিহ্নের ফুলকি ফুটিয়ে দুরন্ত ছন্দের অবাধ অশ্বক্ষুর-ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক্ সচকিত ক'রে। অভিনব ভাষা ও অত্যাশ্চর্য ছন্দঝঙ্কারের উদ্দীপ্ত উপল-নৃত্যে বাঙলার বেলাভূমিতে ধারাপ্রবাহ নামল এ কোন্ খর-পার্বতীর! নজরুল-প্রতিভার এই অকস্মাৎ আবির্ভাব জটিল কোনো তত্ত্ব-তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধের সাহায্যে কোনো প্রাজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচককে মাসিক বা দৈনিক পত্রিকার পাতা জুড়ে সেদিন প্রমাণ করতে হয়নি বাঙলার নবযৌবনের কাছে। তাঁর প্রথম কাব্যেই যেন অমোঘ স্বরে ধ্বনিত হ'ল—"অহং অয়ম্ ভো", বাঙলার ছাত্র ও তরুণসমাজ সচকিত বিস্ময়ে শুনল সেই আত্মঘোষণা এবং অবিলম্বেই অন্তরের সঙ্গে সাড়া দিল। পরিয়ে দিল সহস্র হস্তে নবীন কবির বলিষ্ঠ কণ্ঠে আত্মীয়তার প্রীতিমাল্য। সেই থেকে আজীবন-কাল কাজী নজরুল সে-যুগের তরুণ সমাজের 'কাজীদা' বাঙলার উদ্ভিন্ন-যৌবন তরুণ দলের একান্তই নিজস্ব কবি।

সুদূর "স্বদেশী" আন্দোলনে প্রথম জাগরণের আমল থেকে এতকাল পর্যন্ত বাঙলার তরুণ ছাত্রসমাজ অনন্যোপায় হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রধানত প্রবীণদের কণ্ঠ দিয়ে, আজ পর্যন্ত এদেশের অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণ যেমন দেখতে পাই আত্মপ্রকাশ ক'রে অন্যত্র দরদী শিক্ষিতদেরই কণ্ঠে। রবীন্দ্র-নাথের স্বদেশী সংগীতে মানবজীবনের বৃহত্তর নিত্য-আদর্শের আহ্বান তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে সুদীর্ঘকাল সমবেত কণ্ঠে গান করেছে,—সুর তার কোথাও সংযতগম্ভীর, কোথাও বা বাঙলার মাঠ-ঘাটের আলোক-বাতাসের মতোই উদাস-করা। কিন্তু পরাধীন দেশের যে-নব-যৌবন জীবনের কোনো কোনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে সহসা উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনায় বিদ্রোহীর মতে মরিয়া হয়ে ওঠে, প্রচণ্ড তার আবেগকে ভাষা দেবে সাধ্য কি কোনো প্রবীণ প্রাণের! সেই প্রমত্ত প্রমাদ যৌবন যেন এতদিনে খুঁজে কাছে পেল তার একান্ত আপনার কবিটিকে। বাঙলার তরুণ সমাজের নিরুদ্ধ যৌবন প্রাণ-খোলা অট্টহাস্যে গান গেয়ে উঠল কাজী নজরুলের কণ্ঠে। ঈষৎ-ভাঙা ভাঙা উদাত্ত সেই কবিকণ্ঠে বাঙলার তরুণদেরই সহস্র কণ্ঠ কখনও করেছে আকাশ বিদীর্ণ আত্মোল্লাসের জয়-ধ্বনিতে, কখনও গেয়েছে দৃঢ় পদক্ষেপের নিত্য-নূতন ছন্দে অভিযাত্রিক উদ্দীপনার গান সমস্বরে, কখনও উচ্চারণ করেছে চারণের মতো নগরে-প্রান্তরে সংকল্পবাচন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের, আবার কখনও বা নান্দীপাঠ করেছে সুগম্ভীর স্বরে সমগ্র সমাজব্যাপী সাম্যের—

"যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিলেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।"

সর্ববিধ নারী ও পুরুষ, কুলি-মজুর, পাপী তাপী নির্বিশেষে পৃথিবীর যেখানে যে কেউ আছে, আমাদের নতুন যুগের তরুণেরা নজরুলের কণ্ঠ দিয়ে তাদের সকলকেই মানব-মৈত্রীর চরম আহ্বানটি জানিয়েছে:

"সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুনে এক মিলনের বাঁশী।
একজনে দিলে ব্যথা—
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানব জাতির লজ্জা—সকলের অপমান!"

শুধুই কেবল আত্মোদ্বোধন নয়, সর্ব-মানবের হৃদয়ের গভীরে অবগাহন ক'রে তার নিত্যকালীন স্বরূপটিকে উপলব্ধি করার চেষ্টাও তারা করেছে তাদের নজরুল-কাব্যের অনেক স্থলে। হৃদয় দিয়ে মানব-হৃদয়কে চিনে নেবার ও তার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে একাত্ম হবার কী আশ্চর্য অনায়াস দৃষ্টান্ত, অথচ কত অব্যর্থ তার আবেদন একবার পড়ে দেখুন:

"বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হ'লো মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যানগুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহাবেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।"

হিন্দু-মুসলিম চিন্তা ও ঐতিহ্যের সিন্ধু-মন্থনলব্ধ এই যে অমৃতরসায়ন, তরুণ বাঙলার এই দুর্লভ সম্পদ কবির-দাদু প্রভৃতি মধ্য-যুগীয় সাধকদের সহজ সমন্বয়-বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙলার যে পরিণত-যৌবন তার বেদনাদীর্ণ পঞ্চাশ বৎসরের দ্বারদেশে বসে কাজী নজরুলের দুই চোখে আজ অবশেষে স্মৃতিভ্রংশ বিহ্বল দৃষ্টি মেলে ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আছে, এ-সম্পদ তারই হৃদয়কন্দরলব্ধ মাণিক্য সম্পদ। নবীন যুগে যারা বাঙলার নবযৌবনের সেনানী, এই হারিয়ে-যাওয়া মাণিক তাদের শিরস্ত্রাণে পুনর্বার মাথার মণির মতো দ্যুতিমান হয়ে উঠুক। বিস্মৃতপ্রায় সে-যুগের যৌবন-মদমত্ত কবিদের জীবনে তার শেষ বিদায়ের মুহূর্তে বেঁধে দিয়ে যাক এই অক্ষয় বাণীসম্পদের রক্ষাকবচ। সংসারের হাটের ধূলায় হ'লই বা সে-বাণী আজ ম্লান, অনাগতের অব্যর্থ স্বাক্ষর রয়েছে তার সেই ধূলিমলিনতার অন্তরালে। বাঙলার ইতিহাসে এ-বাণীর গৌরব-রূপ একদিন দীপ্ত ভাস্বর হয়ে অবশ্যই উঠবে, হয়তো বা জ্ঞান-বিদ্যা-অভিমানী আমাদের নাগরিক দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরে লক্ষ কোটি গ্রামবাসীর মূক নীরব প্রাণে প্রাণে।

কবি নজরুল ইসলামকে দেখবার, তাঁর রুদ্রগম্ভীর অক্লান্ত কণ্ঠের গান শোনবার সৌভাগ্য এ জীবনে নানা উপলক্ষে অনেকবারই হয়েছে। তারুণ্যের উন্মাদনায় একেবারে বিপর্যস্ত আত্মহারা হয়ে যাবার প্রেরণা কোনো-দিনই প্রবল হয়নি আমাদের মধ্যে বোধ হয় বালক বয়সের রবীন্দ্রসান্নিধ্য ও শান্তিনিকেতন-বাস তার প্রধান কারণ। তবুও একথা অনস্বী-কার্য, কবি নজরুলের নিজের কণ্ঠে আশ্চর্য যে এক মাদকতা ছিল অনেকখানি তার প্রভাবে, এবং কবির উচ্ছ্বাসপ্রবণ সবল হৃদয়ের আন্ত-রিকতায় নজরুলের কবিতা আমাদের যথোপ-যুক্ত বয়সকালে আমরা গোপনে সযত্নে খাতায় পর্যন্ত টুকে রেখেছি এবং স্থানে অস্থানে উন্মুক্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করেছি।

কাজী নজরুলকে বহুবিচিত্র পারি-পার্শ্বিকের মধ্যে কতবারই না দেখেছি। কখনো দেখেছি কলকাতার হেদুয়ার ধারে ডি এম লাইব্রেরীর সরু লম্বা পুরোনো দুর্গন্ধ ঘরটির মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে তিনি বসে আছেন প্রায় খালি গায়ে মজলিসি মেজাজে কখনো হয়তো সেই দোকানঘরেরই পিছনে বসে অনর্গল কিছু লিখেই চলেছেন একমনে; কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের পেভমেণ্ট দিয়ে উসকো-খুসকো চুলে দ্রুতপদে হয়তো কখনো চলেছেন প্রেসের দিকে, হাতে এক তাড়া প্রুফ লুটপুট করছে, ছেলের দল তাঁকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে পিছন থেকে ডাকছে 'কাজীদা কাজীদা'; কখনো দেখেছি তাঁকে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের স্টেজের ওপর কোনো কলেজ য়ুনিয়নের বার্ষিক সভা বা ঐ ধরণের অন্য কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে পরিপাটি তরুণ কবির বেশে, গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করতে করতে তাঁর মাঝখানে ছাত্রদের অনুরোধে হয়তো অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসের প্রবল আবেগে উচ্চ-কণ্ঠে গান শুরু করে দিলেন; শেষের দিকে যখন তাঁর গ্রামোফোন কোম্পানী ও সিনেমার পর্ব তখন মাঝে মাঝে ঝকঝকে মোটরে করে চকিতের মতো রাজপথ দিয়ে তাঁকে চলে যেতেও দেখেছি, মনে হয়েছে কেমন একটু বেশী মোটা হয়ে পড়েছেন, সে প্রচণ্ড গতি অবসান' হয়ে আসছে যেন। এই সমস্তর মধ্যে একটি বিশেষ দিনের পুরাতন ঘটনা স্মরণ করলে আজো আনন্দ পাই, নজরুল কবির চিরন্তন যেরূপ সেদিন হয়তো তারই প্রথম পরিচয়টি পেয়েছিলাম।

বাঙলাদেশের মফঃস্বলের কলেজ, কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দুমতের। বোধ হয় হেমন্ত সরকার মহাশয়ের সঙ্গে কোনো নির্বাচন উপলক্ষ্যে কাজীও এসেছেন অতিথি হয়ে। সাড়া পড়ে গেছে ছাত্রদের মধ্যে, সবাই তারা বিকালে কলেজ ছুটি হবামাত্র ধর্না দিয়েছে গিয়ে অতিথিশালায় কবিকে দেখবার জন্যে। একটি-মাত্র হল ঘর, সকলে মিলে ভিড় জমিয়েছি সেই ঘরে। অধীর আগ্রহে আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর পাশের ছোট শোবার ঘরটি থেকে

শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ মূর্তি নজরুল সুপরিচ্ছন্ন শুভ্রবেশে বেরিয়ে এলেন, ঘনকৃষ্ণ আয়ত দৃষ্টিতে গভীর কোমলতা, মুখে তাঁর সুমিষ্ট হাসি, হাত দুটিতে বিনীত নমস্কার।

প্রথম নজরে তাঁর বলবান দেহের সচেষ্ট পেলব সাজ আমাকে একটু ধাক্কা দিয়েছিল, আজো মনে পড়ে। বড়ো চুলের ঢেউখেলানো আঁচড়ানোর পারিপাট্যে কেমন একটা কামিনী-সুলভ কমনীয় ভাব, ঘাড়ে-গলায় সুস্পষ্ট পাউডারের ছোপ সেই ভাবটিকেই যেন আরো প্রত্যক্ষ করে তুলেছিল ! সমস্ত জড়িয়ে কোথায় যেন রবীন্দ্রানুকরণের একটা দুর্বল প্রয়াস অনুভব করেছিলাম। বলা বাহুল্য, ছাত্রদের সমবেত অনুরোধ কবি সেদিন এড়াতে পারলেন না। এল হারমোনিয়াম, সহসা ধরলেন ঘর কাঁপিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বরচিত গান; "জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া"। কবির বাহির্বেশের সঙ্গে সে কণ্ঠস্বরের কোনো মিল না পেয়ে মনে মনে আশ্চর্য অথচ খুশিও হলাম। কলেজের কর্তারা অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, গান শুনতে শুনতে তাঁদের মুখের দিকে একবার তাকাবামাত্র সবাই আমরা ঝড়ের একটা ছোটখাটো আভাস পেলাম। গান শেষ হবামাত্র প্রাচীনতম অধ্যাপকদের একজন গুরুগম্ভীর গলায় জানালেন যে, হিন্দু বর্ণাশ্রমের আদর্শের ওপর এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত অতএব ও গান বা ওই ধরণের অন্য কোনো গান এখানে চলবে না। কাজী মনে আছে, উত্তরে ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন যে এই তাঁর সবচেয়ে নিরামিষ গান অন্য গানে পুলিশের ধাক্কাও সামলাতে হতে পারে অতএব কলেজের দেউড়ির মধ্যে গান তিনি আর গাইবেন না; তবে ভবিষ্যতে যদি কোনো দিন তাঁর কবি-প্রতিভার মতিভ্রান্ত ঘটে অতি অবশ্যই তিনি সংস্কারগত জাতিপ্রথার বিস্তারিত বন্দনা গান ছন্দে গেঁথে সর্বাগ্রে শুনিয়ে যাবেন এই বিদ্যা-মন্দিরের প্রবীণ পুরোহিতদের, ভট্ট-পল্লীতে তিনি আগে যাবেন না একথা তাঁরা এখন থেকেই স্মরণ রাখতে পারেন। অতিথি অবমাননার এই ব্যাপার নিয়ে অসম্ভব হৈ চৈ বাধিয়ে তুললাম আমরা ছাত্রের দল। পাণ্ডা স্থানীয় কয়েকজন বয়স্ক ছাত্র পরামর্শ দিলেন, গানের আসর কলেজ গেটের বাহিরে কোথাও করার। ইতিমধ্যে দেখি কাজী ও হেমন্তবাবু তাঁদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ কলেজ কর্তৃপক্ষের আশ্রয় ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ার জোগাড় করেছেন। আমাদের হল সোনায় সোহাগা, ছাত্র পাণ্ডারা তাঁদের বাক্স-বিছানা সোৎসাহে কাঁধে ফেলে বললে, চলুন আমরা কলেজ-প্রাঙ্গণের বাইরে আপনাকে নিয়ে আসর জমাব যে পর্যন্ত সন্ধ্যার ট্রেন না আসে। পঙ্গপালের মতো সবাই বেরিয়ে পড়লাম দল বেঁধে, সামনে কাজী নজরুল ও হেমন্তবাবু। রাস্তায় পা দিয়েই মনে পড়ল আজ তো হাটের দিন নয় অতএব বাঁধানো হাটতলা নিশ্চয় খালি পড়ে আছে,—ততক্ষণে শোনা গেল কবি নজরুলের কণ্ঠে গর্জে উঠেছে আমাদেরই সদ্য-উত্তেজিত প্রাণের ভাষাঃ

'আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল
* * * *
সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়
আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল !
আমরা ছাত্রদল।

গান গাইতে গাইতে বাজারের পথে ধুলো উড়িয়ে সবাই এসে পৌঁছলাম জনবিরল হাটতলার আটচালায়। কুকুর দুটো-চারটে যা শুয়েছিল পথের ধারে হাটের কোলে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল তারা তামাসা দেখার জন্যে। দুখানা ভাঙা চেয়ার কোনোমতে জোটান গেল সম্মানিত দুজনের জন্যে—তাঁরা কেউই অবশ্য তাতে বসলেন না, আমাদের সঙ্গে মেঝেতেই বসে পড়লেন। কবি নজরুলকে আমাদের সদল তাড়নায় সেদিন অধিকাংশ সময়ই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। চলল গানের পর গান অথবা আবৃত্তি। একথা বলবই, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে কণ্ঠের দিক দিয়ে বাঙলা-দেশে অতি অল্প কবিই কাজী নজরুলের মতো ভাগ্যবান, তার ওপর তাঁর গান বা কবিতা স্মরণ রাখবার ক্ষমতাও ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। "বিদ্রোহী" কবিতা আবৃত্তির অত হৈ-হট্টগোলের মধ্যে যেন মিনার কাজ করা দুটি লাইন কবিকণ্ঠে প্রথম সেদিন কানে কী অপ্রত্যাশিত সুরে বেজেছিল, আজো ভুলি নিঃ

"আমি ইন্দ্রাণি-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী,
আর হাতে রণতূর্য।"

বাস্তবিক কাজী নজরুলের নিজের কণ্ঠে ছাড়া "বিদ্রোহী" কবিতাটির অনেক অংশই অন্যের মুখে অনেক সময় নিছক শব্দ-প্রলাপ বলে মনে হতে থাকে।

আবৃত্তি কবি নজরুল করে চলেছেন একের পর এক। শুরু হল দুর্দামবেগে "প্রলয়োল্লাস" কবিতাটিঃ

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়।
* * * *
দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়।
* * * *
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

সামনে হঠাৎ চেয়ে দেখি, এ-কোন্ নূতন মানুষ! সে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি বেশ আগাগোড়া ধূলিধূসর; একমাথা শিবজটার মতো কেশ বাতাসে উড়ছে, সত্যিই যেন কালবৈশাখীর কেতন। অনর্গল ঘামে কখন ধুয়ে মুছে গেছে ঘাড়ে-গলায় সেই পাউডারের পেলবচিহ্ন, প্রথমেই যা ভালো লাগে নি আমার। ভস্মাচ্ছাদন নির্মুক্ত হয়ে ছাত্র-বন্ধুদের যাদু-স্পর্শে সহসা বেরিয়ে এসেছে এ-কোন্ রুদ্র-ভৈরব যৌবনের প্রবলপরাক্রান্ত প্রচণ্ড রূপ—হাটের ধুলো তুচ্ছ-করা কবি নজরুলের নিজস্ব চিরন্তন রূপ।

জানি, ললিত রসের কবিতাও নজরুল যথেষ্ট লিখেছেন; তার ঠুংরী ও গজল অঙ্গের গানগুলি শুধু যে জনপ্রিয় হয়েছিল তা নয়, একেবারে অত্যন্ত সস্তাও হয়ে গিয়েছিল হরেক রকমের মানুষের গলায়-গলায় ছড়িয়ে বিকৃত হয়ে গিয়ে। তবুও বাস্তবিক পক্ষে নজরুল ভিতরে বাহিরে বলিষ্ঠ আবেগেরই কবি। "এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য" —এ দুয়ের মধ্যে শেষেরটিতেই তিনি খাঁটি নতুন সুর ধ্বনিত করে তুলেছিলেন। মনে-প্রাণে (তাঁর কবি-জীবনের বহুকাল পর্যন্ত বয়সেও) তিনি বাঙলাদেশে কাব্যের ক্ষেত্রে তারুণ্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং নিজের সেই আকণ্ঠপূর্ণ তরুণ প্রাণটিকে তিনি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন যেখানেই তাঁর কাব্যে ও গানে, সেখানেই রৌদ্র-রুদ্ররসের অগ্ন্যুৎপাত অজস্র প্রবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের একটি বহু পুরাতন বাক্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখলে কাজী নজরুলের কবি-প্রতিভার প্রতি আধুনিক যুগের পাঠকবৃন্দ বোধ হয় যথার্থ সুবিচার করতে সক্ষম হবেন। সাক্ষাৎভাবে সাহিত্যের প্রসঙ্গে কথাগুলি না বলা হয়ে থাকলেও এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ খুব অন্যায় হবে না। "যখন বৃহৎ উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশের চিত্ত বহু-কাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন সে নিতান্ত শান্তভাবে, বিজ্ঞভাবে, বিবেচক-ভাবে, বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই।"

কাজী নজরুল বাঙলার বিপুল তরুণ সমাজের সেই প্রথম জাগরণের মত্ততার কবি। বাঙলা সাহিত্যের এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামের সে-আসন বহু সুদীর্ঘকালের জন্য অবিসংবাদিতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।

# আলোক

## সুশীল রায়

নাল উঁচু পাঁচিল দিয়ে চারধার ঘেরা। সেই উঁচু পাঁচিলের মাঝে মাঝে যেন চমকে কে ঢেউ উঠেছে। কী প্রকাণ্ড এই জেলখানা। টা মানুষকে আটক রাখার জন্যে এত বড় ক—আশ্চর্যই লাগে মতির। তাও তো, সে তো মানুষ নয়—মরদের মতো মরদ। কে আটকে রাখার জন্যে জবরদস্ত বন্দোবস্ত না তো চাইই।

পদ্মার এমব্যাঙ্কমেণ্ট। সেই মাটির বাঁধের র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জেলখানার দিকে ফ্যাল-ল ক'রে তাকিয়ে থাকে মতি। মতির সই হয় না যে, অমন একটা জ্যান্ত ষকে এরা এমনিভাবে মেরে ফেলবে। একটা ষকে মারার জন্যে আয়োজনের অন্ত নেই। আদালত জজ জুরি পুলিস দারোগা—কি! পরশু মদনের ফাঁসি। পরশু পাঁচটায়। সারা গা শিউরে ওঠে মতির। মারে যাবে? মদন যদি মরে যায়, মতি লে বাঁচবে কী ক'রে?

আজ পনর দিন হ'য়ে গেলো, মতি মদনের দেখা করেনি। দেখা আর সে করবে না। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মতির বুকের দুর্ দুর্ ক'রে ওঠে। কোন্ মুখ নিয়ে সে তার সামনে? তার সব চেষ্টা ব্যর্থ গেছে। জজ সাহেবের পায়ে ধ'রে কত কাটি করলো, জজ সাহেবের গিন্নির দরজায় ধরা দিলো, দারোগাবাবু যা চায় তাই দেবে চোখ বাঁকা ক'রে ইঙ্গিত জানিয়ে এলো—কিছুতেই কিছু হ'লো না। মদনকে বার জন্যে সে তার ইজ্জৎ বেচতেও রাজি, কিন্তু কাজের সময় কেউ তা নিতেও লো না। নিজের শরীর নিজেরই ছিঁড়ে খেতে হচ্ছে মতির। আর এ-মুখ নিয়ে সে বে না মদনের সামনে। সে তাই পালিয়ে চ্ছে। কিন্তু পালাতে গিয়েও দূরে পালিয়ে পারছে না। অজগরের মতো মদন তাকে টানছে। তাই অসহায় পাখির মতো এই পাঁচিল-ঘেরা জেলখানার চারপাশে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঁধের ওপর তবু ভেতরের দালানের খানিকটা দেখা। তাই সে গিয়ে ওঠে এমব্যাঙ্কমেণ্টে। র জানলাগুলো জাল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে র মানুষ আছে কি নেই, জানাই যায় না। এতবড় একটা জেলখানা, হাজার হাজার মানুষ নাকি কয়েদ করা আছে এর মধ্যে, তবু একটু মানুষের সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অগুন্তি কয়েদী আছে এর মধ্যে, মতি জানে। তবু তার মনে হয়, এক মদনকে বেঁধে রাখার জন্যেই বুঝি এত আয়োজন। মদন তো যা-তা লোক নয়, মরদের মত মরদ। যেমন বাঘ তার তেমনি তো খাঁচা হবে। পাঁচিল তাই এত উঁচু আর এত মজবুত। তা হোক, কিন্তু সে এখন করে কী? সে মদনকে কি ক'রে বাঁচাবে? মদনকে বাঁচাতে না পারলে, সে যে নিজেও বাঁচবে না কিছুতে।

বয়স যখন তার তের কি চোদ্দ, তখন তার জীবনে এসেছিলো একটি পুরুষ। সেই পুরুষকে দেখে ব্যাটাছেলের ওপর তার ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিলো। মাঝরাতে তার মায়ের কোলের কাছ থেকে তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল কারা যেন। তাদের কথা আজ তার তেমন মনে পড়ে না। এ-গাঁ সে-গাঁ ক'রে তিন গাঁ তফাতে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো সেই চোরেরা। কত কেঁদেছিলো মতি। তারা তার সে কান্নায় কান দেয়নি। তাকে তারা আটক রেখেছিলো একটা মাটির ঘরে, একটু একটু মনে পড়ছে তার। বহুদিন বাদে আজ আবার সেই কথা মনে আসছে মতির। সারাদিন কেঁদে কেঁদে সে কাহিল হ'য়ে গিয়েছিলো, তার চোখের জলে কাদা হ'য়ে গিয়েছিলো ঘরের মেঝে। তার পর সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। রাত তখন নিশ্চয় অনেক। একটা চিমটিতে তার ঘুম ভেঙে গেলো। একটা মানুষ তার পাশে ব'সে ফিস-ফিস ক'রে তাকে সাধছে। ঘরের কোণে জ্বলছে একটা কুপী। সেই ধোঁয়াটে আলোয় লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছিলো মতি। ঝাঁকি দিয়ে লোকটার হাত সরিয়ে দিয়ে মতি উঠে বসতেই লোকটা তার দুই পা চেপে ধ'রে ভিখিরীর মতো ভিক্ষে চাইতে লাগলো। কিন্তু না, ভিক্ষে সে দেয়নি।

তারপর এলো পুলিশ আর দারোগা, আইন আর আদালত। চোরের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গেলো মতি। সেই এস্তোক ব্যাটাছেলের ওপর তার ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিলো। তাই আর কোনো মানুষের ফাঁদে সে পড়েইনি। তার জীবনের পথে-ঘাটে গলি-ঘুঁজিতে অনেক মানুষের সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছে, কিন্তু কেউ তাকে আটক করতে পারেনি। পুরুষ মানুষ দেখলেই তার মনে হ'তো—ওরা সবাই ভিক্ষে চাইবার জন্যেই বুঝি জন্মেছে।

সেই কুঁড়েঘরের দুরাত্তিরের বন্দিজীবনের কথা মনে পড়লো তার। আজ মদনও নিশ্চয় তেমনি ক'রে কাৎরাচ্ছে। শুধু কি তেমনি ক'রে? সেদিন মতির তবু ছাড়া পাবার ভরসা ছিলো একটু, কিন্তু মদনের আজ সে ভরসা একটুও নেই। আজ তার আটক-থাকা মরে থাকারই সামিল। পরশু তার ফাঁসি। না, দেখা সে আর করবে না। কিছুতেই না। দেখা করতে পারবে না পারবে না পারবে না সে। ভাবতেই তার শিউরে উঠছে সারা গা। তার পা উঠছে কেঁপে। তার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

এপাশে পদ্মা, ওপাশে জেল। পদ্মার বুকে হাতির পিঠের মতো উঁচু উঁচু হ'য়ে জেগে আছে চর। ওপারের গাছপালা অস্পষ্ট, তার মাঝে মাঝে কুঁড়েঘর। তাল নারকেল আর খেজুর গাছের সার দেখা যায় এখান থেকে। এমনি একটা গাঁ থেকে এসেছে সে এই শহরে। এমনি একটা গাঁয়ের পথেই মদনের সঙ্গে আচমকা তার প্রথম দেখা। লম্বা চৌকশ মজবুত তার চেহারা। তাকে দেখেই ব্যাটাছেলের ওপর ঘেন্না সে যেন নিমেষে ভুলে গেল। তার সারা মনে ঠেলে উঠলো চাপা খিদে। সে ঘুরে ঘুরে চেয়ে দেখলো লোকটাকে। কিন্তু মদন ফিরেও চাইলো না। পুরুষ লোকটাই তবে ভিখিরী নয়। মতির বহুকেলে ভুল যেন ভেঙে গেলো। তার জীবনের কলঙ্ক আজ তাকে প্রথম লজ্জা দিলো। আজ সে প্রথম নিজেকে মেয়ে মানুষ ব'লে চিনলো। জীবনকে আর যৌবনকে আগলে আগলে সে বেড়ে উঠেছে অনেক। তার চোদ্দ বছরের দুর্ঘটনা তার জীবনের অনেক পিছনে প'ড়ে গেছে।

সব্জি বেচে দিন কাটাতো মতি। তার বাপ তো গত হ'য়েছে বহুকাল আগে। তার মাও আর বেঁচে নেই। সে একা। তার শরীরটাও শরীর নয়, লোকে বলে ওটা গতর। এ গতরের জন্যে কম নাকাল সইতে হয়নি তাকে। কত জনের দৃষ্টি এড়িয়ে এড়িয়ে তাকে চলতে হ'য়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কালো পাথর কুঁদে তার শরীরটা যেন তৈরি। এ যেন শরীর নয়, এ তার পাপ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতেই চোরেরা তাকে একবার ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো, আরও হাজার চোর-ডাকাত তার পিছু যে লেগে আছে —তাও সে জানে। কিন্তু না, তার মনের ঘরে সিঁদ দিতে কাউকে সে দিচ্ছে না। নিজের ওপর কড়া পাহারা সে রেখেছে। বন্দরগঞ্জ থেকে সব্জি কিনে মল্লিকপুরের হাটে সে

বেচতো। ফড়েদের বহুৎ ফাজলামো তার গায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। হাঁসের পালকে কি জল আটকায়? সে ফাজলামো মতির দেহেও নয় মনেও নয়—কোথাও দাগ কাটতে পারেনি। কিন্তু মদনের সাক্ষাৎ তার জীবনে বসন্তের ফুল ফুটিয়ে দিলো। সে এই প্রথম ভালবাসতে শিখে ফেললো এক নিমেষে।

সেই মদনের ফাঁসি হবে পরশু।

কথাটা মনে হ'তেই মতির গলা খুসখুস ক'রে উঠলো। তার গলাতেই কে যেন ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে ব'লে তার মনে হ'লো। উঃ, কী লাগাই লাগবে মদনের। ওই জোয়ান চেহারা, ওই ভারী শরীর। দড়িটা কেটে বসবে গলাতে, জিভ বেরিয়ে পড়বে এক হাত। লোকের গাল শুনতে না পার, লোকের ঘরে কাজে তা হ'লে না গেলেই হয়! কতদিন সেধেছে মতি। কতদিন সে ব'লেছে—আয়, দুজনে মিলে ফসল করি, সব্জি বুনি, এক জোট হ'য়ে হাটে বেচি।—কিন্তু না, তার কথায় কানই দিলো না মিনসেটা। সব কাজেই গোঁ। এখন ভোগো। কিন্তু একা ভুগলেই তো মিটে যেতো। তার সংগে মতিকে জড়ানো কেন। সে মরলে মতির যে কেমন কষ্ট হবে, তাও বুঝি একবার ভেবে দেখতে হয় না। এ তো আর যাতা মরা নয়, এ যে দড়িতে লটকে জ্যান্ত মানুষের দম আটকে মরা। অসুখ-বিসুখ একটা হ'য়ে চট্ ক'রে আজ যদি সে ম'রে যায়, তবু খানিকটা নিজেকে বুঝ দিতে পারে মতি।

কতজনের ঘর ছেয়ে বেড়িয়েছে মদন। আজ তার নিজের ঘর ছায় কে? তার ঘর যে আজ ছারখার হ'তে চললো। মতি পাগল হয়েই যাবে। লোকটার ভালোবাসা কিছুতে সে ভুলতে পারছে না। অত সোহাগ আর অত আদর, এক নিমিষে ভুলবে সে কেমন ক'রে। মদন যাবার সময় তার ভালোবাসার গলায় দায়ের একটা কোপ যদি বসিয়ে দিয়ে যেতে পারতো, মতি তবে রেহাই পেয়ে যেতো।

জাল-লাগানো জানলার খানিকটা দেখা যায় এখান থেকে। মতি একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সেই নবাবগঞ্জ থেকে টানা হাঁটা-পথে সে এতদূর চ'লে এসেছে। মদনকে দেখতে সে আসেনি। সে জেলখানাটার চারপাশে ঘুরে বেড়াবার জন্যে এসেছে। মদন কি করছে এখন? ফাঁসির আসামীরা কি করে, মতি তা জানে না। তারা কি কাঁদে? তারা কি ডুকরে ওঠে? তারা কি ধন্দ মেরে ব'সে থাকে? মদন এখন কি করছে, জানতে ইচ্ছে হয় মতির। মতিকে নাকি দেখতে চেয়েছে। পেয়াদা ডাকতে গিয়েছিলো কাল। কেন, দেখতে চাওয়া কেন? যাকে একা ফেলে চ'লে যেতে পারছো। তাকে এক ঝলক দেখে লাভটা কী? না, দেখা সে দেবে না।

এমব্যাংকমেণ্টের ওপর বিকেল গড়িয়ে আসছে। পদ্মার ওপারে হেলে প'ড়েছে প্রকাণ্ড একটা সূর্য। জলের ওপর দিয়ে মন্থরগতিতে চ'লেছে গহনার নৌকো, আর তীরবেগে চ'লেছে জেলে ডিঙি। চরের ওপর পাখির ঝাঁক এসে বসেছে। বাঁধের ওপর লোকের ভিড় বেড়ে উঠছে ক্রমশ। স্বাস্থ্য খুঁজতে বেরিয়েছে সবাই। পদ্মার হাওয়া খেয়ে চাঙ্গা হবার জন্যে বুড়োর দল আর রুগীর দল লাঠি ঠুকে ঠুকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'লেছে। মতি একপাশে উবু হ'য়ে ব'সেছিলো গালে হাত দিয়ে। তার সুখের চাহিদাও নেই, স্বাস্থ্যের টানাটানিও নেই। তার আছে একটি ছোট ঘর। তাতে আলোও আছে স্বাস্থ্যও আছে সুখও আছে। কিছুরই কমতি নেই সেখানে। তার স্বামী করে ঘরামীর কাজ, আর সে বেসাতী করে শাকসব্জীর। আজ দুই বছর তারা নবাবগঞ্জে এসে ডেরা বেঁধেছে। মদন নিজের হাতে তৈরি ক'রেছে এই ঘর। পুবে ঘন বন, পশ্চিমে রেল-লাইন, উত্তরে ধুধু মাঠ, মাঝখানে তাদের ছোট ঘরটা। তাদের পাড়াও নেই, পড়শীও নেই—ঝগড়াও নেই, কলহও নেই। সকালে উঠেই দুজনে বেরিয়ে যায় যে যার কাজে। মদন দা হাতে নিয়ে নতুন কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে, আর মতি সব্জির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে চ'লে যায় বোয়ালিয়ার বাজারে। সূর্য যখন মাঝ আকাশে উঠে আসে, মতি তখন ঘরে ফিরে এসে আখা ধরায়, ভাত রাঁধে। রাঁধাবাড়া শেষ হলে মদনের জন্যে সে ব'সে থাকে ভাত নিয়ে। একত্রে বসে তারা সারাদিনের জমা গল্প করে, আর বড় বড় গ্রাসে ভাত খায়।

মতি বলে, তুই বাবুদের সংগে কথা কয়ে ঠিক করে দে এই জমিটা। আমি ফসল করবো। তুই শক্ত করে বেড়া বেঁধে দিবি চারধার ঘিরে।

মদন উঁচু হয়ে বসে ভাত চিবোয় আর বলে, অত খাজনা দিবি কোত্থেকে।

—সব্জি বেচে। লাউ হবে, কুমড়ো হবে, শশা হবে, মুলো হবে,—সিম, বরবটি, ঢ্যাঁড়শ, বেগুন—সব লাগাবো আমি। তুই মাচান বেঁধে দিবি। তার ওপর বেয়ে উঠবে আমার লাউ কুমড়োর লতা। দুজনে মিলে মাটি কোপাবো।

মদন হাসে। জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে বসে বসে ভাত চিবোয়। ঘটি উঁচু করে ঢক ঢক করে জল খায়।

-হাসিস্ ক্যান্

মদন বলে, সব কাজ ছেড়ে তোর কাজেই লাগতে হবে দেখছি। তোর বেড়া বাঁধবো, তোর মাচান গড়বো, আর তোর সব্জির ক্ষেতের মাটি কোপাবো।

সব কাজ ছেড়ে তোরই কাজে লাগতে হবে দেখছি—

মতি শুধরে দিয়ে বলে, তা কেন? তা লছে কে? তোর কাজ সেরে-সুরে যখন ময় পাবি, তখন।

মদন বলে, দেখি তো!

খেতে বসে রোজ মতি এমনি বায়না ধরে। রোজ মদন এড়িয়ে যায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে দনেরও ইচ্ছে হয়, খুব বড় করে একটা িজের ক্ষেত বানাতে। পরের ঘরে কাজ না রে, নিজের কাজ গড়ে তুলতে সাধ তারও ায়। উত্তরের মাঠটার এক ফালি জায়গা যদি ায়, তা হ'লেই সে বন থেকে বাঁশ কেটে এনে রদিক বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলতে পারে। রের ভাঙা ঘর মেরামত ক'রে, আর নতুন রে ঘর বেঁধে দিয়ে দিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দতে তারও ইচ্ছে হয় না।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে দু'জনে রকে সে বসেছে। পুবের বন ভেদ করে ত্তরের মাঠের ওপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা গড়িয়ে াসছে। কলকেটা হাতের গর্তের মধ্যে ঁপিয়ে ধ'রে মদন তামাক টানছিলো। মতি লো, আমার কথা মনে ধরলোই না বুঝি?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ু ফেলে মদন বললো, কি কথা?

—আমার ক্ষেত।

মদন ভাবলো, বললো, করবো। হাতের াজটা সেরেই এ দিকে লাগবো ঠিক করেছি। ীকদারবাবুকে বললাম সেদিন।

উৎসুক হয়ে মতি একটু এগিয়ে এলো। লো, কি বললি?

—বললাম, বাবুর মাঠের একটা কোণ যদি েন একটু সব্জি বুনতাম। —তা, রাজি রে মনে হলো।

—তবে লাগ্ শীগ্গির!

মদন তেতে উঠলো। —লাগ্ বললেই াগ্‌ বললাম না, হাতের কাজটা খতম করে ি আগে?

মতি বললো, হাতের কাজ মানে?

—মেয়েমানুষের অত মানে জানতে হবে া। মস্ত এক আটচালার কাজ হচ্ছে এনায়েৎ-রের জমিদার বাড়িতে। আট দশ দিনের াজ। এবার বুঝলি তো?

মতি বললো, কথা পেটে না রেখে খুলে বলেই মিটে যেত।

মদন আর কোনো জবাব দিলো না। মতির িজেকে বড় চাঙগা বলে বোধ হলো আজ। ার চোখের সামনে এক নিমেষে তার স্বপ্নের ক্ষেত লতায় পাতায় কিলবিল করে ঠলো। উত্তরের বন্ধ্যা মাঠটা রূপে রসে লতায় পাতায় শাকে সব্জিতে সবুজ হয়ে উঠলো। ন্তু মাঠটার ওপর এখন গাঢ় অন্ধকার নেমে সেছে। এখন আর কিছু দেখা যায় না।

কাজ থেকে ফিরে আসার পর রোজই জ্ঞেস করে, কদ্দুর এগোলি? আর বাকি ত-টা?

মদন বলে, হচ্ছে। সময় মতই হয়ে যাবে। জমিদারের ছেলেটা বড় পাজি। কাজ নিয়ে বড় হুজ্জৎ করে। তা না হলে আরও এগিয়ে যেত।

—কেন, বলে কি?

—কেবল গলতি ধরে, আর যা-তা বলে গাল পাড়ে। রাগে এক এক সময় ইচ্ছে করে—

মতি বলে, যাক। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ শেষ করে দে। কিছু বলিসনে।

সেদিন মদন সময়মত ফিরলো না। মতি ভাত নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো। বিকেল পেরিয়ে গেলো, সন্ধ্যা নেমে এলো, তবু মদন এলো না। মতির ডান চোখের পাতা যেন নাচতে লাগলো। বালাই, বালাই। মতি চোখ রগড়ে মাঠ আর ঘর করতে লাগলো। কিন্তু তবু যেন মন মানে না। মন তার উতলা হয়ে উঠছে। এত দেরী তো সে করে না। একটা পড়শী নেই তার, কার কাছে সে খোঁজ নেবে? এনায়েৎপুর এখান থেকে তিন ক্রোশ পথ। সেখানে সে খুঁজতে যাবে কী করে। এক পথ দিয়ে সে যাবে, আর-এক পথ দিয়ে মদন ফিরে এসে দেখবে ফাঁকা ঘর। শীকদারবাবুদের বাড়িও কম রাস্তা নয়। ঘর ছেড়ে যেতেও পারছে না মতি। মদন ফিরে এসে ঘরে যদি মতিকে না পায়, তাহলে যে রেগে আগুন হয়ে যাবে। পায়ের ধুলো মতি চোখে দিতে লাগলো, তবু চোখের লাফানো থামছে না। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। মতিরও সব আঁধার ঠেকতে লাগলো। কুপী নিভিয়ে দিয়ে একা একা সে বসে রইলো। আলো জ্বাললে আরও একা লাগছে নিজেকে।

পায়ের শব্দ পেয়ে মতি ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। কে যেন আসছে। মতি বললো, কে?

শীকদারবাবু বললেন, মদনের খবর পেয়েছিস?

—না তো। রক থেকে নেমে এলো মতি। বললো, আপনি খবর জানেন, বাবু?

শীকদারবাবু বললেন, হুঁ। জানি। ও বেয়ালিয়ার থানায় আছে।

—থানা কেন?

—থানায় গেলেই জানতে পারবে। শীকদার-বাবু বললেন, একবার যাও থানায়।

মতি শীকদারের পা জড়িয়ে ধরে বললো, কি করেছে বাবু?

—খুন করেছে। জমিদারের ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে। ঘাড়-সই দায়ের এক কোপ বসিয়ে দিয়েছে। ব্যাটা খুনে। ঝাঁজ দিয়ে বললেন নীলরতন শীকদার।

আলকাৎরার মতো কালো অন্ধকার নেমে এসেছে এমব্যাঙ্কমেণ্টে। যারা স্বাস্থ্য খুঁজতে এসেছিল, তারা সব চলে গেছে। মতি একা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। জেলখানার জানলা দিয়ে অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। চার-দিকে স্তব্ধতা ঝিঁঝিঁর শব্দে বাজছে। পদ্মার কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে। মতি উঠে দাঁড়ালো। নবাবগঞ্জে ফিরে যেতে পা তার সরছে না। তার সব্জির সবুজ স্বপ্নকে ছারখার করে দিয়ে উত্তরের মাঠটা বন্ধ্যা হয়ে পড়ে আছে। কী হবে তার সেখানে গিয়ে? তার ঘরের চার ধারে বাতাস হাহাকার করে কেঁদে মরছে। সেই কান্নার রাজ্যে ফিরে যেতে তার ইচ্ছে নেই। তবু সে উঠলো। এমব্যাঙ্কমেণ্ট থেকে নেমে এলো রাস্তায়। লাল সুরকির রাস্তা। সোজা চলে গেছে রাস্তাটা। শহরের সিঁথেয় যেন সিঁদুরের দাগ এই পথটা। লাল জেলখানার পাশের এই পথটা চিরকালই লাল থাকবে। কিন্তু পরশুদিন মতির সিঁথের সিঁদুর মুছে যাবে। এত চেষ্টা করেও সে ভুলতে পারছে না মদনকে। দুনিয়ায় অমন একটা মরদ সে দেখেনি।

নবাবগঞ্জের ঘরেই ফিরে এলো মতি। এই আশ্রয় তো মদনেরই হাতে গড়া। এই ঘরের বাতায় বাতায়, চাঁচের প্রত্যেকটি গিঁটে গিঁটে মদনের হাতের মায়া মাখানো। শীকদারবাবু এসে মাঝে মাঝে তাকে প্রবোধ দেন। তাঁর প্রবোধের কি যে মানে, বোঝে না মতি। তিনি তাকে মন খারাপ করতে মানা ক'রে গেছেন। ব'লে গেছেন, মদন চেয়েছিল মাঠ, তুই চাস্ তো নিস্।—মতি তার কোনো জবাব দেয়নি। তার একার সাধ্য কি, একা সে ফসল করবে কিসের! তার জীবনের সঙ্গে এই মাঠটাও বন্ধ্যাই থাক্। শীকদারের দয়া সে আর চায় না। অন্ধকার ঘরে পায়চারী করেই তার জীবনটা যাক্—না কেটে। মতি দরজা বন্ধ করে দিলো। ঘরের মধ্যে সে একা একা ছট্‌ফট্ করতে লাগলো।

•

জেলারের সঙ্গে জেল-ডাক্তার মদনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এসে দেখলেন, লোকটা সেল-এর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরজার সামনে বন্দুক-কাঁধে শান্ত্রী দু'পা স'রে দাঁড়ালো।

জেলারকে দেখে মদন থমকে দাঁড়ালো, বললো, এখনই যেতে হবে?

জেলার বুঝলেন, বললেন, না। আজ না, কাল শেষ রাতে। কেমন আছ? শরীর ঠিক আছে তো?

জেল-ডাক্তার তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক'রে বললেন, অল-রাইট। কোয়াইট ফিট্।

জেলার বললেন, লম্বা একটা ঘুম দাও। সকালে বউ-এর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। ঘুম দিলেই শরীর চাঙ্গা হ'য়ে যাবে।

মদন জবাব দিলো না।

পরদিন সকালে জেলার পেয়াদা পাঠালেন মতির কাছে। ব'লে দিলেন, আসতে না চাইলে জোর ক'রে নিয়ে আসতে।

অনেক বেলা পর্যন্ত মতি শুয়ে ছিল।

**তুই ভিখিরীর মতো মেয়েমানুষের কাছে গিয়ে হাত পাতলি?**

দরজাও খোলেনি। ডাক শুনে সে দরজা খুলতেই দেখে, জন চার লাল-পাগড়ী দাঁড়িয়ে।

মতি বললো, নিতে এসেছো? চলো।

সেপাইরা চমকে গেলো। কাল অত ঝুলোঝুলি ক'রেও তাকে নিয়ে যেতে পারেনি। আর আজ না বলতেই তৈরি।

—আজ না দেখলে আর যে দেখতে পাব না, সেপাই। ও কি, গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবে নাকি আমাকে? আমার কদর এত বেড়ে গেছে?

তীর বেগে জেল-ফটক ভেদ ক'রে ঢুকলো তার ট্রাক্। জেলার ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে এসে বললেন, এসেছে? এসেছে? নিয়ে যাও, একদম ওপরে।

মতির কাছে এসে বললেন, যাও, ওপরে চ'লে যাও। জিগ্গেস ক'রো কিছু বাসনা, আই মিন, কিছু খেতে-টেতে চায় কি না। মাছ মাংস আর রাবড়ি—যা খুসি! আমি জিজ্ঞেস ক'রে হদ্দ হ'য়ে গেছি, কিছু বলে না।

মতি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই শান্ত্রী ঝটপট ক'রে তিনটে তালা খুলে দিলো। মুখোমুখী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো মতি আর মদন। সেপাই আর শান্ত্রীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। মতি মদনের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো, মদন দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে গিয়েই থেমে গেলো।

জেলারবাবু একটু উঁকি দিয়ে মুচকি হেসে কাৎ হ'য়ে দাঁড়ালেন।

কি কথা তারা বলবে, তা দু'জনের কেউই ঠিক করতে পারছে না। সব কথা একসংগে ঠেলে উঠে আসছে বুক দিয়ে। দু'জনে নীরবে ব'সে রইলো অনেক ক্ষণ।

জেলার গলা সাফ ক'রে বললেন, উঁহু। স'রে বসো। জিজ্ঞেস করো—কিছু খাবে-টাবে?

মতি কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। মদনও কোনো কথা বলতে পারছে না। কি কথা সে বলবে? সে চেনে মতিকে। মতিকে ফেলে রেখে গেলে তার-যে কী হবে, ভেবে পাচ্ছে না মদন। মতি সইতে পারলে হয়। মদনকে সে যদি ঘেন্না করতে পারতো, তাহ'লে মতি বুঝি রেহাই পেয়ে যেতো। মদন যদি এখন মতিকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল পাড়তে থাকে, মতি কি তাহ'লে রেগে-তেতে চ'লে যাবে এখান থেকে? তা যদি যায়, তবুও তাতে ঘেন্না তার আসবে না। রাগ পড়লেই আবার সে মদনের জন্যে কাৎরাতে থাকবে। সে চেনে মতিকে, মতির আঁতের খবর রাখে মদন।

মদন ভাবছিলো। আজ জীবনের এই শেষ দিনে মতিকে কি ক'রে সে একেবারে মুক্তি দিয়ে যেতে পারে, সেই কথাই সে ভাবছিলো। একেবারে পরম মুক্তি ও চরম মুক্তি। মদন একটু ন'ড়ে উঠলো যেন। কি বলার জন্যে সে যেন তৈরি হ'লো।

মদনের মাথায় হাত বুলিয়ে মতি বললো, রাগলে জ্ঞান থাকে না। কতবার বলেছি, মাথা ঠাণ্ডা কর্, শুনিসনি। আজ আমাকে একা ফেলে পালাচ্ছিস্ কেন?

মদন বললো, কানে কানে শোন্ একটা কথা। মতি, আমি পাপ করেছিলাম। এ তারি সাজা।

মদন গল্প বলতে লাগলো। এনায়েৎপুরের জমিদার বাড়ির এক মেয়ের ওপর তার টান হয়। মেয়েটা কোনোদিন ফিরেও চাইতো না মদনের দিকে। কী রূপ, কী রং, যেন একটা পরী। মদন কিছুতে তার দিকে না চেয়ে পারতো না। দিনের পর দিন সে ও-বাড়িটার চারপাশে ঘুরে বেড়াতো। তার সাহসের কথা ভেবে তার নিজেরই আশ্চর্য লাগে আজ। অনেক চেষ্টা সে করেছে, অনেক ইঙ্গিত করেছে। কিছুতেই তার মন গলাতে পারে না। তখন আরও কাছে যাবার জন্যে সে ওই বাড়ির ঘর বানাবার কাজ নিলো। আর পাঁচজন ঘরামীর চেয়ে অনেক কম দর ব'লে সে-কাজটা পেলো। শুনে মতি নিশ্চয় রাগ করবে, তাই সে আজ শেষ দিনে মনের কথাটা খুলে না ব'লে পারছে না। একদিন সে মেয়েটার পা চেপে ধরলো—কত কাকুতি মিনতি করলো। তারপর মেয়েটা রাজি হয়। বাধা দিতে এসেছিলো জমিদারের ছেলে, তাই তাকে—

মদন থেমে বললো, আমার ওপর রাগ করিসনে, মতি। আমি তোকে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তোকে দিনের পর দিন চোখে ধুলো দিয়ে বেড়িয়েছি। কাজে যাবার নাম ক'রে আমি—

মদনের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে মতি বললো, সত্যি? তুই-না মরদ! তুই ভিখিরীর মতো মেয়েমানুষের কাছে গিয়ে হাত পাতলি?

মদন জবাব দিলো না। সে মতির চোখের দিকে তাকিয়ে নজর করতে লাগলো তাকে। মতির সমস্ত জীবন যেন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেলো। একে সে মরদ ঠাউরে নিজেকে

এইভাবে এর সংগে জড়িয়ে ফেলেছিলো? তার চোদ্দ বছর বয়সের দুর্ঘটনাটা তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই চোরটার কাকুতি-মিনতির শব্দ তার কাণে বেজে উঠলো, কুপীর আলোয় সেই লোকটার মুখের যে-ছবি সে সেদিন দেখেছিল, ঠিক সেই ছবিই যেন ফুটে উঠলো মদনের মুখে।

মতি স'রে ব'সে বললো, জেলারবাবু জানতে চেয়েছেন—কিছু খেতে ইচ্ছে করে?

মদন বললো, বিষ।

—ঈস্। বড়ই সখ যে। দিচ্ছে কে?

মদন মতির দিকে হাত বাড়ালো। কাকুতি করে সে বললো—আয় মতি, এদিকে আয় একবার তোর দুটি পায়ে পড়ি।

সারা গা শিরশির ক'রে উঠলো মতির। যাক্, খতম হ'য়ে গেছে—তার মরদ শেষ হ'য়ে গেছে একেবারে।

মতি তরতর ক'রে নেমে এলো নিচে। পেছন পেছন জেলার আর সেপাইরা ছুটতে লাগলো। পেছন থেকে জেলার বললেন, উসকো পাকড়ো।

গেটের কাছে আটকে ফেললো পাহারাদার। মতি বললো, ছাড়, ছাড় শিগ্গির। আমি কি ক'রেছি? আমাকে আটকাচ্ছ কেন তোমরা? আমাকে যেতে দাও।

দূর থেকে জেলার বললেন, ঠারো। কথা আছে।

কাছে এসে বললেন, ভোরবেলা আসছো তো?

—কেন?

—লাশ নিতে।

—ও-লাশ চাইনে আমি। ফটক ঠেলে মতি কয়েদখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

# নূতন জাপ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক

শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী

জাপানের সংগে বাণিজ্য সম্পর্ক আমাদের নূতন নয়। যুদ্ধের আগে যে দুটো দেশের সংগে আমাদের সব চাইতে বেশী বাণিজ্য চলতো, তারা হচ্ছে ইংলণ্ড ও জাপান। নানা কারণে ইংলণ্ডের কথা স্বতন্ত্র। জাপানের সংগে সম্বন্ধটি নির্ভর করতো আমাদের কার্পাসজাত জিনিসের উপরেই। ১৯৩৪ সালে জাপানের সংগে আমাদের এক চুক্তি হয়। তাতে এক বিশেষ সর্ত ছিল। ইংরেজিতে অর্থনীতির ভাষায় একে বলে Most favoured nation clause. এর অর্থ হল এই যে, ভবিষ্যতে যদি কোন দেশকে এদের কেউ কোন বিশেষ সুযোগ দেয়, তবে সে সব সুযোগের অধিকারী এরা আপনা থেকেই হবে। এক কথায় এরা পরস্পর হল সবচাইতে খাতিরের লোক। যুদ্ধপূর্ব এই বাণিজ্য সম্পর্ক ও তার পরিণামের দিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। শুধু পটভূমি হিসেবে নয়, অনেক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতও এতে মিলবে।

১৯৩৪ সালের বাণিজ্যচুক্তিতে সর্ত ছিল যে, জাপান যদি আমাদের থেকে বছরে ১০ লক্ষ বেল তুলো নেয়, তবে তাকে কমপক্ষে ৩২৫০ লক্ষ গজ (১৯৩৫ সালে বর্মা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে ২৮৩০ লক্ষ গজ) এবং বেশীপক্ষে ৪০০০ লক্ষ গজ কাপড় (১৯৩৫ সালের পরে ৩৫৮০ লক্ষ গজ) এদেশে রপ্তানি করতে দেওয়া হবে। তারপর যত বেশী তুলো জাপান নেবে, তত বেশী কাপড় তাকে রপ্তানি করতে দেওয়া হবে। জাপান কিন্তু এ চুক্তির সম্মান রাখে নি। কিম্বা চুক্তি বাহ্যত ঠিক রেখে নানা রকমফের করে আমাদের ঠকিয়েছে। বিশিষ্ট কয়েকটি উপায়ের নমুনা দেওয়া গেল—

(১) চুক্তিতে যে কাপড়ের হিসেব ছিল, তা ধরা হয় লম্বা-লম্বিতে। জাপান কাপড়ের বহর বাড়িয়ে এদেশে পাঠাতে লাগলো।

(২) চুক্তিতে কাটা কাপড়ের (fent) চুক্তির এই অস্পষ্টভাষিতার সুযোগ নিয়ে জাপান বহু পরিমাণ কাপড় টুকরো টুকরো করে পাঠানো শুরু করলো।

(৩) তৈরী পোষাকের কথাও চুক্তিতে ছিল না, ক্রমশ বহুল পরিমাণে সেগুলোও পাঠানো শুরু হ'লো।

(৪) ছাপা সিল্কের কথা ছিল না চুক্তিতে; তাও ক্রমবর্ধমান পরিমাণে পাঠানো হতে লাগলো।

(৫) উত্তর চীনের জাপ-নিয়ন্ত্রিত কলগুলো থেকেও কাপড় রপ্তানি হতে লাগলো।

১৯৩৭ সালে চুক্তি সংশোধনের সময়ে এসব কথা ওঠে। তাতে কিছু ভাল ফল দেয়। তারপর আবার যা তাই। উপরোক্ত অসদুপায়গুলো ছাড়াও জাপান আর একটা পন্থা অবলম্বন করে। তা হচ্ছে, নিজের দেশে জিনিসগুলো বেশীদরে বেচে, বিদেশী বাজারে তা সস্তায় ছেড়ে দেওয়া। এরই নাম 'ডাম্পিং' (dumping)। এতে বিদেশী বাজার হাত করা যায়, মুনাফাও ঠিক থাকে। এ উপায়টি নিয়ে হরেকরকম সস্তা জাপানী মনোহারী জিনিস এদেশের বাজারে ছাড়া হতো। এই দুর্দিনের বলে আমাদের সুদূর পাড়াগাঁয়ের বাজারও জাপানী মালে ছিল ভর্তি—গত যুদ্ধের আগে।

আর একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। জাপান তখন যতই আমাদের বাজার উজাড় করে দুহাতে মাল ঢালতে থাকলো, ততই আমাদের থেকে তার আমদানীও কমতে শুরু করলো। এইভাবে চলতে চলতে দেখা গেল আগে যেখানে আমাদের সংগে বাণিজ্যে জাপানের ঘাটতি পড়তো, তা উলটে গিয়া বাড়তি শুরু হয়েছে। নীচের খতিয়ান থেকেই তা সম্যক বোঝা যাবে।

(লক্ষ টাকার হিসেবে)

| বৎসর | জাপান থেকে আমদানী | জাপানে রপ্তানি |
|---|---|---|
| ১৯৩৫ | ২১·৮৪ | ২২·০৭ |
| ১৯৩৬ | ২১·২৭ | ৩০·৩৩ |
| ১৯৩৭ | ২২·১৯ | ১৮·৫১ |
| ১৯৩৮ | ১৫·৪১ | ১৪·৮২ |
| ১৯৩৯ | ১৯·২৯ | ১৬·১৬ |
| ১৯৪০ | ২১·৫৪ | ৯·১৯ |
| ১৯৪১ | ১১·৭৮ | ৪·৭৭ |

এখন দেখা যাক, আমরা এত নিরুপায় হয়ে পড়লুম কেন? তার কারণ "We had no two stings to own bow. Our only stock-in-trade was cotton." (Vakil and Maluste: Commercial relations between India and Japan.) অর্থাৎ আমাদের এ ব্যবসাতে এক ভিন্ন আর দু' উপায় ছিল না। আর সে উপায়টি হলো তুলো অবলম্বন করে। আমরা কৃষিপ্রধান। আমাদের উৎপাদনের রকমফের করা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। ওদিকে জাপানের ছিল হাজারো রকমের সস্তা ও ঠুনকো জিনিস। তাই অক্টোপাস যখন তার একাধিক হাতে বাঁধতে লাগলো; আমরা তখন না পেরেছি তাকে বাধা দিতে, না পেরেছি ফিরে বাঁধতে।

এসব ব্যাপার নিয়ে তেমন একটা আন্দোলন বা আলোচনা আমাদের দেশে হয় নি। যা কিছু আপত্তি তা জনকয়েক শিল্পপতি করেছেন। সরকার তাতে অবহিত হন নি। অবশেষে যখন মহামান্য সরকারের টনক নড়লো এবং বাণিজ্য দপ্তর কি রকম শাস্তি দেবেন

ভাবছিলেন, তখন সমস্ত অবস্থাটাই গেল বদলে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস এল চলে। জাপান সিঙ্গাপুর দখল করে ফেললো, আর সেই সঙ্গে আমাদের দুটি দেশের বাণিজ্য সম্পর্কেও পূর্ণচ্ছেদ পড়লো।

আজ আবার নূতন করে সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছে। এর প্রয়োজনও নিশ্চয়ই আছে। তা বুঝেই গত জুন মাসে ভারত সরকার শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কিলাচাঁদের নেতৃত্বে এক বাণিজ্য মিশন পাঠান। তাঁদের কাছে সরকার পরামর্শ চেয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁদের বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তাঁরা জানিয়েছেন যে, এখন ইয়েনের (Yen) সঙ্গে টাকার মূল্যের অনুপাত নির্দিষ্ট হওয়া বিশেষ দরকার এবং আমদানী রপ্তানির জন্য একটা বিশেষ অর্থ-ভাণ্ডার (Export-Import Revolving fund) যতদিন না স্থাপিত হচ্ছে, ততদিন ব্যক্তিগত বাণিজ্যের সুবিধে হবে না। ভারত সরকারকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (exchange control) প্রথাটি আরও একটু শিথিল করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সব ব্যাঙ্ক জাপানে তাদের শাখা বিস্তারে আগ্রহশীল; তাদের সাহায্য করা দরকার। একজন বাণিজ্যদূত (trade commissioner) নিযুক্ত করাও উচিত। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, ইনি যেন জাপানের বাণিজ্য-প্রথা এবং তুলোর কারবার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি হন।

বণিক প্রতিনিধিদল আর একটা বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, যতদিন টাকার বাট্টা স্টার্লিংয়ের সঙ্গে ইয়েনের সম্পর্ক স্থির না হয়, ততদিন সরকারী বন্দোবস্তে একটা ঋণদানের ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং আমদানী-রপ্তানি সাহায্যকারী যে ভাণ্ডারের উল্লেখ করা হয়েছে তা এক্ষেত্রে একেবারেই অপরিহার্য। তার কার্যক্রম হবে অনেকটা এ রকমঃ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ও জাপানে মিত্রপক্ষীয় সর্বোচ্চ অধিনায়কের দপ্তরে (SCAP) দুটি বিশেষ অর্থভাণ্ডার স্থাপন করা হবে। ভারতীয় আমদানীকারীরা দামটা দেবে টাকায়—ঐ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবখানায়: আবার জাপানী আমদানীকারীরাও ইয়েনে দামটা জমা দেবে মিত্রপক্ষীয় অধিনায়কের কাছে। একটা বিশেষ পরিমাণ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চলতে পারে। তারপর এরা নিজেরাই অদলবদল করে হিসেব ঠিক করে নেবে।

ভারত সরকার জানতে চেয়েছিল জাপানের উৎপাদনশক্তি এখন কেমন এবং তার রপ্তানি বাণিজ্যের একটা উপযুক্ত অংশ যেন ভারতের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। বণিকদল জেনেছেন যে, কিছু-না কিছু না করেও জাপান এখনই তার ১৯৩৯ সালের উৎপাদনের ½ উৎপাদন করতে পারে এবং ভারতকে সরবরাহ করার মত যথেষ্ট উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র তার আছে। জাপমহল থেকে প্রত্যক্ষভাবেই আমরা এ কথার সমর্থন পাই। সম্প্রতি এক জাপ বাণিজ্য-মিশন এদেশে সফর করেছেন। কলকাতায় তাদের সম্বর্ধনার উত্তরে দলের নেতা ইটন সাহেব বলেছেন—"বাণিজ্য সম্পর্কে দুটি দেশকেই কতকগুলো সুযোগ সুবিধে দিতে হবে। যুদ্ধোত্তর অর্থ-নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে জাপানের দরকার হবে পাট, তুলো, চামড়া, খইল, তৈল-বীজ, লোহা, কয়লা ও এমনি সব জিনিষ। এর বদলে জাপান ভারতকে দিতে পারবে রেলের ইঞ্জিন, তেল নিষ্কাষণ যন্ত্রপাতি, কাপড়কলের যন্ত্রপাতি, সাইকেল, চীনামাটির বাসন, কাঁচা রেশম, রেয়ন প্রভৃতি।" (এ, পি, ১লা মে ১৯৪৮)।

দেখা যাচ্ছে, কাঁচা মালের বদলে আমরা পেতে পারি শিল্পজাত জিনিস। যুদ্ধপূর্ব বাণিজ্যকালেও ঠিক এই অবস্থাই ছিল আমাদের। এর পরিবর্তন কি, আমাদের আর সম্ভব হবে না? তারপর জাপানের ব্যবসাতে ধূর্তামির উপর এবার আমাদের নজর রাখতে হবে। এসব ছাড়াও আর একটা লক্ষণীয় বিষয় আছে। মিশনের নেতা একজন মার্কিন। অনেকেই তাই মনে করেন যে, জাপানের মাধ্যমে আমেরিকা এশিয়ার বাজার দখল করতে উদ্যত।

বিলেতের এক বামপন্থী পত্রিকা বলছে,—"জেনারেল ম্যাকার্থার তাঁদের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের সাধারণ নীতিটিকে এশিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন মাত্র। এতকাল চীন ছিল মার্কিন মালের উঠ্‌তি বাজার ও রুশশক্তির বিপক্ষে তার মিত্র। চীনের ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর এখন জাপানকেই সেই দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।" (নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশন) একথা আমেরিকা থেকেও এবং প্রভাবশালী বণিকমহল থেকেও সমর্থিত হয়েছে। বিখ্যাত ব্যাঙ্কার ক্র্যামার সাহেব বলেছেন, "জাপানী সম্পদের সাহায্যে মার্কিন শিল্পপতিরা অতি-সহজেই নতুন একটা বাজার দখল করতে পারেন। অবশ্য কিছুটা ভাগাভাগি করতেই হবে। এক্ষেত্রে এটি ছাড়া অন্য উপায় আর সম্ভবত নেই।" (ফরচুন, জুলাই, ১৯৪৮)।

অতএব সমূহ বিপদ। ইংরেজ ও অস্ট্রেলিয়ান ব্যবসায়ীরা ভাবিত হয়ে পড়েছেন। আমাদের কি চিন্তার কোন হেতুই নেই? কেউ কেউ বলতে পারেন, উপরোক্ত দেশ দুটিও শিল্পপ্রধান দেশ। শিল্পজাত জিনিস নিয়ে জাপান ও আমেরিকার সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা হবে বলেই না তাঁরা শঙ্কিত। ভারতের অবলম্বন কাঁচামাল। সত্য কথা; কিন্তু তাতে কি তার ভাগীদার নেই? বরং অবিভক্ত ভারতের রপ্তানি মালের অধিকাংশই বর্তমান পাকিস্থানে উৎপন্ন হয়। বেশী না বললেও আরেকবার উল্লেখ করতেই হচ্ছে যে, ব্যবসাক্ষেত্রে জাপান কি রকম সংকোচের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছে, সেকথা ভুললে চলবে না। কেননা, এবার রামে রক্ষে নেই, তায় এবারে আবার সুগ্রীব দোসর!

# কোন বন্ধুকে

**আশ্‌রাফ সিদ্দিকী**

জন্মে তোমার ফাগুন মাসের চাঁদ
হয়তো বা কভু কিছু সুধা ঢেলেছিল!
জন্মে তোমার ফাগুন মাসের ফুল
হয়তো বা কভু কিছু দল মেলেছিল!

অহল্যা আজ সে কথা গিয়েছে ভুলে!
রাজার কুমার! কি হ'বে সে কথা তুলে!
তবু অহল্যা হয়তো পাষাণ নয়!
তবু অহল্যা হয়তো জাগতে পারে!
যদি নৈঋতে আবার ঝঞ্ঝা বয়!
যদি সে আষাঢ় বয়ে যায় নব ধারে!

রাজার কুমার! গান শোনো। গান শোনো।
এবার ফাগুনে আগুনের গান বলি।
অহল্যা আজ ভুলেছে! ভুলুক। শোনোঃ
জন্মে তোমার ফুটেছিল শাল্মলী॥

# ঢোঁড়াই চরিতমানস
## (সটীক)
### শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

(পূর্বানুবৃত্তি)

**বস্ত্রলাভের উপাখ্যান**

বুধনীকে বোকা বাওয়া দোষ দেয়নি, পাড়ার লোকেও দেয়নি। [illegible] বা কি বেচারী। বিয়ে বিধবাকে করতেই হবে—যদি ছেলেপিলে হবার বয়স না গিয়ে থাকে। তবে—ছেলের কথা। এখন বাবুলাল খাওয়াতে [illegible] না তা বুধনী কি করবে।

মাকে ছেড়ে ছেলেটা কান্নাকাটি বিশেষ করেনি। প্রথম প্রথম যখন তখন মার কাছে পালিয়ে যেত। বাবুলাল বাড়িতে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন বুধনী কোলে করে ঢোঁড়াইকে 'থানে' পৌঁছে দিয়ে যায়। দিন-কয়েকের মধ্যে ছেলেটা বুঝে গেল যে, দুপুরে বেলায় বাবুলাল থাকে না বাড়িতে। কিন্তু এই দুপুর বেলায় বুধনীর কাছে যাওয়ার অভ্যাসও দু তিন মাসের মধ্যে আস্তে আস্তে কেটে যায়। ও যে ওখানে অবাঞ্ছিত, সেটা বুঝে, না বন্ধুদের সঙ্গে খেলার টানে, বলা শক্ত।

ছেলেটা কান্নাকাটি করে না, তবে দিন দিন রোগা হয়ে যায়। বাওয়া ব্যস্ত হয়ে ওঠে—[illegible] ছেলে ছিল।

একজন পশ্চিমা [illegible] লোক বহুদিন আগে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে না পেন্সন নিয়ে জিরানিয়া বাজারে একটা রামজীর মন্দির করেছিলেন। সে যুগে তাঁকে লোকে বলতো 'মিলিট্রি বাওয়া।' তাঁর একটা [illegible] ছিল। তারই হাতে নাকি 'মিলিট্রি বাওয়ার' [illegible]। মন্দিরের উঠোনে তাঁর বাঁধানো সমাধিস্থান আছে। আর এই মন্দিরের নাম [illegible] 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ি'।

বোকা বাওয়া রোজ যেত 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে'—নামে রামায়ণ শুনতে, আসলে গাঁজা খেতে।

বাওয়া দেখে যে, ঢোঁড়াই রোগা হয়ে যাচ্ছে; পাঁজরার হাড়গুলো গোণা যাচ্ছে, এই [illegible] বাপমরা ছেলেটির। রামজীই পাঠিয়ে দিয়েছেন তার কাছে—এখন তাঁর মনে কি আছে, কে জানে। রোগটা জানা রোগ; সবাই জানে যে, ছেলেটার হয়েছে 'বাই-উখড়ানোর' (১) রোগ। এ-রোগে পাতা, শিকড়ে কিছু উপকার হয় না, তবে দুধে হয়। দুধ তো বাবু-ভাইয়াদের জন্য। তারা 'রাজা-লোগ'। 'পরমাত্মা' তাদের দুধ খাবার সামর্থ্য দিয়েছেন। তবে 'বাই-উখড়োলে' শুষনির শাকটাও বেশ উপকার করে—ভাত আর শুষনির শাক দুবেলা, না হয় শুষনির শাক, আর কাঁচা চিঁড়ে না ভিজিয়ে। মুড়ি খবরদার না—পেট খারাপ করে মুড়ি, আর ঘর খারাপ করে বুড়ী......

ভাবতে ভাবতে বাওয়ার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে, ঢোঁড়াইটাকে একটু দুধ-টুধ খাওয়াবার এক উপায় করে দেখলে হয়।

সে ঢোঁড়াইকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে'। এক মিনিটের মধ্যে ঢোঁড়াই মোহন্তজীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। ন্যাংটা ঢোঁড়াইকে চিমটেটা দেখিয়ে মোহন্তজী বলেন, খবরদার 'পিসাব' (২) করো না এখানে। ওই হাড়-জিরজিরে ছোঁড়া, কোথায় একটু ভয় পাবে, তা-না খলখল করে হাসে। সেই দিন থেকেই রামায়ণ শুনলেই ঢোঁড়াইয়ের 'পাক্কা প্রসাদী' (ভোগের প্রসাদ) মঞ্জুর হয়ে যায়। এইতেই 'বাই-উখড়ানোর' অসুখের হাত থেকে ঢোঁড়াই-এর জান বেঁচে যায়।

না, না, এতে বাওয়ার কিছু কৃতিত্ব নেই। তিনি পাঠিয়েছিলেন ঢোঁড়াইকে তার কাছে, তিনিই ছেলেটাকে প্রসাদ দিচ্ছেন। তাঁরই কৃপায় এ-ছেলে বেঁচে-বর্তে থাকলে সে বাওয়ার উপযুক্ত চেলা হবে। অবছা স্বপ্ন-রাজ্য বাওয়ার চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে...... পোখরাথানে প্রকাণ্ড মন্দির হয়েছে.......... মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির চাইতেও বড় বড় নৈবেদ্যর থালায় মন্দিরের মত করে চিনি আর মুড়কোর করে পোঁতা সাজানো। ঢোঁড়াইকে ঐ থানের 'পূজারী' করে, না পূজারী কেন হবে, মোহান্তের "চাদর" (৩) দিয়ে, সে চলে গিয়েছে অযোধ্যাজী........

"করউঁ কাহ মুখ এক প্রশংসা......মাত্র একটা মুখ, তাও কথা বলতে পারি না...... তাদিয়ে তোমার আর কতটুকু প্রশংসা করতে পারি রামজী!

তোমার কৃপা না হলে যেদিন মোহন্তজী সরকারকে লড়ায়ে জেতাবার জন্য যজ্ঞ করলেন মিলিট্রি ঠাকুর বাড়ীতে, সেদিন ঢোঁড়াইকে নিজে সামনে বসে পুরী হালুয়া খাওয়ালেন —যত খেতে পারে। সে কি হালুয়া! ঘিতে জবজব জবজব। যত না ঘি আগুনে ঢালা হয়েছিল তার চাইতেও বোধহয় বেশী ঢালা হয়েছিল হালুয়ার প্রসাদে। চারিদিক থেকে সকলে ঢোঁড়াইয়ের খাওয়া দেখছে; ঢোঁড়াইয়ের কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। মোহন্তজী ঢোঁড়াইয়ের পাতের একখানা পুরী দেখিয়ে বোকা বাওয়াকে বুঝোন যে, পুরীর মোটা দিকটা, এমন কড়া করে কোথাও ভাজে না, কোন ভোজে না। এ হচ্ছে সীতারামের খাওয়ার জন্যে এতে কি ফাঁকি দেওয়া চলে'

তারপর মোহন্তজী বাওয়াকেও কড়া পুরীর প্রসাদ চাখানোর জন্য বড় চেলাকে হুকুম দেন।

ঢোঁড়াই আর বাওয়ার চোখোচোখি হয়। বাওয়ার মনে হয় যে, ঐ একরত্তি ছোঁড়াটা যেন বুঝেছে যে, বাওয়া যে পুরী পেল খেতে, সেটা মোহন্তজীর সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের এত আলাপ সেই জন্যে।......

হয়ত এটা বাওয়ার বোঝার ভুল; কিন্তু সেদিন বাড়ী ফিরবার সময়, মোহন্তজী যখন বাওয়াকে একখানা কাপড় দিলেন, ছিঁড়ে লেংটি আর গামছা করবার জন্য, তখন ঢোঁড়াইয়ের কি কান্না! কাপড়খানা যেন তারই পাওয়ার কথা ছিল।

এস, ডি, ও সাহেব এসেছিলেন যজ্ঞ দেখতে সকাল বেলায়। তিনিই খুশী হয়ে মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ীতে যজ্ঞের জন্য তিনজোড়া "লাটুমার রেলী" অর্থাৎ লাটু মার্কা র‍্যালি-ব্রাদার্সের কাপড়, "সরকারী খাজনা" থেকে দেন। তারই একখানা মহন্তজী বাওয়াকে দিয়েছিল।

ঢোঁড়াইয়ের কান্না আর থামে না। বাওয়া বুঝোয় তোর জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছি তোকেইতো দিয়েছেন মোহন্তজী।

না আমি আর কোন দিন যাবনা রামায়ণ শুনতে। আমাকে দিলে বড় কাপড় দেবে কেন?

বাবুলাল ঐ কাপড় দেখে বলে, বাওয়া তুমি পরতো লেংগটি। তুমি এ পাড়ওয়ালা কাপড় নিয়ে করবে কি। সরকারী "গিরানির" (৪) দোকান আছে না, যেখান থেকে হাকিম, বাঙ্গালী বাবু আর চাপরাসীদের সস্তায় কাপড় দেয় সেখান থেকে আমি পেয়েছি খুব ভাল মার্কিন, "জাপেনী" (জাপানী) আট আনা করে, পাঁচ-শ পঞ্চান্ন নম্বর থেকেও ভাল জিনিস। পাঁচ গজ তাই দিচ্ছি তোমাকে—এ ধুতি আমাকে দাও।

---

(১) বাই-উখড়ানোর রোগ—বায়ু উপড়োনোর রোগ। যে কোন অনিশ্চিত রোগকে এখানকার অশিক্ষিত লোকেরা বলে 'বাই উখড়োনোর' ব্যারাম।

(২) পিসাব—প্রস্রাব।

(৩) মহন্ত পদের নিদর্শন।

(৪) গিরানির দোকান—গিরানির অর্থ আক্রা; গভর্নমেণ্ট তৈরী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সস্তায় কাপড় দেওয়া হত যেখান থেকে। সকলে পেতো না এ কাপড়।

বাওয়াও খুশী। তানা হ'লে অতবড় কাপড় কি ঢোঁড়াই পরতে পারে।

এই মার্কিন ছিঁড়ে ঢোঁড়াইয়ের প্রথম কাপড় হ'লো। লেংগট ছাড়া, চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সে এই কাপড়খানাই দেখেছে।

বাওয়া আবার কাপড়খানা নিয়ে যায় পাক্কীর ধারের কপিল রাজার বাড়ীতে। কুলের ডালের পোকা থেকে গালার ঘুঁটে তোয়ের করে চালান দিত কপিল রাজা। তার উঠনের গামলায় থাকে লাল রং গোলা। তাই দিয়ে বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের ধুতি রং করে দেয়।

এই ধুতি কোনো রকমে কোমরে বেঁধে ঢোঁড়াই পাড়াশুদ্ধ সকলকে দেখিয়ে আসে—মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ীর মোহন্তজী দিয়েছে তাকে। কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক, সে সকলকে বোঝাতে চায় যে, মোহন্তজী এ কাপড় বাওয়াকে দেয়নি। পাঁচ বছরতো বয়স হবে, কিন্তু তখনই সে কারও কাছে ছোট হতে চায় না—বাওয়ার কাছে পর্যন্ত না। তবে বাবুভাইয়ারা "বড় আদমী" তাদের দেখলেই আদাব করতে হবে, আর সাহেব দেখলে কাছাকাছি থাকতে নেই, এ তাৎমাটুলীর সব ছেলেই জানে। ওর মধ্যে ছোট হওয়ার প্রশ্ন নেই।

ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছে যে কাপড়খানা পরে থাকে,—তার কোন বন্ধুর কাপড় নেই, ঐ কাপড়খানা দেখিয়ে তাদের চেয়ে একটু বড় হয়; কিন্তু বাওয়া কিছুতেই তাকে কাপড়খানা পরতে দেবে না; তুলে রেখে দেবে। লাল কাপড় পরে ভিক্ষে চাইতে গেলে লোকে এক মুঠিও চাল দেবে না। ও কাপড় পরে দেখতে যেতে হয় তামাসা, মেলা, মোহররমের দুলদুল ঘোড়া। তবুও হারামজাদা ছেলেটা মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে! ঢোঁড়াইকে ভয় দেখানোর জন্য বাওয়া চিমটে ওঠায়।

**ঢোঁড়াইয়ের মায়ের সন্তানবাৎসল্যের বিবরণ**

ছোঁড়াটা বুধনীর কাছে যেতে চায় না, এর জন্য বাওয়া বুধনীকে দোষ দেয় না। বাওয়া যতদূর জানে বুধনী কোন দিন ঢোঁড়াইকে হতশ্রদ্ধা করেনি। করবে কি করে, নিজে পেটে ধরেছে যে। আর একটা 'চুমৌনা' করেছে বলে কি নিজের নাড়ীর সম্বন্ধটা ধুয়েমুছে সাফ করে দিতে পারে। তা হয় না, তা হয় না! রামজী তেমন করে মানুষ গড়েনি। সময়ে অসময়ে বুধনী ঢোঁড়াইয়ের জন্য করেছে বৈকি।

—ঐ যখন 'জার্মানিবালা' রথ তারা হয়ে রাতের আকাশে ছুটে যেত;—সে রথ কোথায় নামে, কি করে, কেউ বলতে পারে না; বাওয়া অবশ্য সে রথ দেখেনি তবে তার চাকার কালো দাগ কচুর পাতার উপর তাৎমাটুলীর সবাই দেখেছে; সেই সময় বুধনী কতদিন বাবুলালকে লুকিয়ে ঢোঁড়াইকে ভাত খাইয়েছে। তখন চালের দাম উঠেছে দু আনায় আধ সের। ঐ আক্রগণ্ডার দিনে ভিক্ষে আর দিত কজন। —সে সাধুকেই হোক আর সন্তকেই হোক। তখন অফসর আদমীদের সরকারী দোকান থেকে সস্তায় চাল দিত। বাবুলালের বাড়ীতে সেই জন্যে চালের অভাব ছিল না। তখন যদি বুধনী ঢোঁড়াইকে লুকিয়ে চুরিয়ে না খেতে দিত, তা হলে সাধ্যি কি বাওয়ার, সে সময় ঐ ছেলে মানুষ করার। সে সময় অতটুকু ছেলে রামায়ণের চৌপই গেয়ে 'ভিখ মাঙ্গলেও' চৌনের কোনো গেরস্থ উপুরহস্ত করতো না।

আর কেবল খাওয়ানো কেন, ঢোঁড়াইয়ের উপর বুধনীর প্রাণের টান বাওয়া আরও একদিন দেখেছে। মিছে বলবে না। পাড়ার মেয়েরা যে যা বলুক। বাওয়া নিজের চোখে সাক্ষী, আর সাক্ষী ভূপলাল 'সোনার' (১)। ভূপলাল সোনারের নাও মনে থাকতে পারে, সে রাজা আদমী, তার 'গাহকীর ভরমার' (২)। ঢোঁড়াই তখন 'পাঁচ ছ সালের (বছরের) হবে। বাবুলাল গিয়েছে ভাইচেরমেন সাহেবের সঙ্গে দেহাতে, দিন কয়েকের জন্য। বুধনীর তখন দুখিয়া পেটে। এমনি তো বাবুলাল বৌকে বাড়ীর বাইরে কাজ করতে দেয় না; ইজ্জৎবালা আদমী' (৩) সে। তাই বুধনী সেই ফাঁকে সাত আনা পয়সা রোজগার করেছিল। লগা দিয়ে শিমুলে ফল পেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়ে, সেই ভিজে শিমুল তুলো বেচেছিল 'কিরাণী বাবুর' 'জনানার' (৪) কাছে। 'কিরাণীবাবু' বাবুলালের অফিসের মালিক। বুধনীর ভারি ইচ্ছে ঢোঁড়াইকে 'চাঁদির জেবর' (৫) দেয়—কোনো দিনতো কিছু দেয়নি। বুধনী বাওয়াকে বলে, দাও বাওয়া একটা চাঁদির সিকি কিনে ভূপলাল সেকরার দোকান থেকে, ঢোঁড়াইয়ের ঘুনসিতে দেবার জন্য। বাওয়ার ভারি আনন্দ হয় কথাটা শুনে। একটু ভয় ভয়ও করে, চাঁদির ঘুন্সিটা লেংগটের তলায় ঢেকে রাখতে হবে ঢোঁড়াইয়ের, না হলে ভিক্ষে জুটবে না। বাওয়ার সেদিনকার কথা সব মনে আছে,—তার ঢোঁড়াই গয়না পাবে, আর তার মনে থাকবে না সেদিনকার কথা। সেদিন বাওয়া আর ঢোঁড়াই মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ী থেকে রামায়ণ সেরে, যখন ভূপলাল সোনারের দোকানে আসে, তখন বুধনী সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অত লোকের মধ্যে ঢোঁড়াইকে কোলে টেনে নিয়েছিল সেদিন সেকরার সঙ্গে কথা বলার সময়। সেকরার দোকানের সিঁড়ির উপর বুধনী ওকে একটা বিড়িও ধরিয়ে দিয়েছিল। ও ছোঁড়া তখনও কাশে। ভূপলাল সোনারতো শুনেই আগুন। ভারী আদমি (বড়লোক)—তার কথার ঝাঁঝ থাকবে না? সে বলে সিকির দামইতো হ'ল আট আনা—তার উপর শালা পুলিসদের নজর বাঁচিয়ে দিতে হবে। বুধনী ভয় পেয়ে বলে যে ঘুনসি করলে যদি পুলিসে ধরে, তবে অন্য একটা কিছু করে দাও সিকি দিয়ে। ভূপলাল হুংকার দিয়ে ওঠে— 'জাহিল আওরৎ' (৬) কিছু বুঝবে না কথাটা, আর করে দাও করে দাও। আমার কাছে সোজা কথা, সাত আনায় হবে না। সিকির উপর আবার ছেঁদা করার মেহনতানা আছে।

সে অন্য খদ্দেরের সঙ্গে কথা আরম্ভ করে। তখন আর কি করা যায়। বাওয়া বুধনীকে নিয়ে যায় 'ছত্তিস' বাবুর দোকানে সওদা করাতে। ঐ পুরো সাত আনা খরচ করে বুধনী সেখান থেকে কেনে "কজরৌটী" (৭) —পেটের ছেলের জন্য। এর দেড় দুমাস পরে দুখিয়া আসে ওর কোলে। বাওয়ার সেদিন কি দুঃখই হয়েছিল। অমন একটা গয়না ছেলেটা পেতে পেতে পেল না। রাগ করবে সে কার উপর। ভূপলাল সোনারও অন্যায় কিছু বলেনি। বুধনীকেই বা কি বলা যায়। দেড় মাস পরেই কাজললতাটার দরকার; ওর নিজের কামানো পয়সা; আর মায়ের মনের সখ; ভূপলাল নিলে কি আর ও ঘুন্সির চাঁদি কিনতো না।

ঢোঁড়াইটারও সেই সময় যেন একটু চোখ ছলছল ছলছল করেছিল;—ও ছোঁড়া কাঁদতে তো জানে না।

বুধনী লোভে পড়ে আর ঝোঁকের মাথায় কাজললতাটা কিনবার পর, নিজেকে একটু দোষী দোষী মনে করে। ভাবে যে ঢোঁড়াই আর বাওয়ার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে সে। তার পেটের ছেলের জন্য কাজললতা, বাবুলাল নিশ্চয়ই কিনে দিত। তবে নিজের রোজগার করা পয়সা ও-কাজে খরচ করার দরকার কি ছিল।

আসলে ঢোঁড়াইয়ের উপর টান তার একটু কমেছে। ঢোঁড়াই ঠিকই ধরেছে। অত ছেলেপিলের মত এ জিনিস বুঝতে আর কেউ পারে না।

তাই মধ্যে মধ্যে বুধনী ঢোঁড়াইকে আর বিশেষ করে বাওয়াকে জানিয়ে দিতে চায় যে তার ছেলের উপর ভালবাসা একটুও কমেনি—যেটুকু কম, লোকে দেখে তা বাবুলালের ভয়ে। এইটা জানানোর জন্যই বুধনী বাওয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ভূপলাল সোনারের দোকানে।

নিজের দোষ কাটানোর জন্যেই না কি সে দিনকয়েকের মধ্যেই ঢোঁড়াইকে ডেকে পেট ভরে মেঠাই খাওয়ায়—একেবারে হঠাৎ। ভাই-

---

টীকাঃ—

(১) সোনার—সেকরা।
(২) গাহকীর ভরমার—দোকান খদ্দেরে ভরা।
(৩) ইজ্জৎবালা আদমী—সম্মানিত লোক।
(৪) কেরাণীবাবুর স্ত্রী
(৫) চাঁদীর জেবর—রূপোর গয়না।
(৬) জাহিল আওরৎ—নিরক্ষর স্ত্রীলোক।
(৭) কজরৌটি—কাজললতা।

চেরমেন সাহেব ডিস্টিবোডে লড়াই থামবার জন্য ভোজ আর দেওয়ালী করেছিলেন। সেদিন ছবির তামাসা দেখিয়েছিল সেখানে। দেওয়াল জোড়া অত বড় বড় কখনও হয়? "ভাগ!" ওসব দেহাতীদের বোঝান। কল্যাণীবাবু লোচ মুড়িয়ে কিষণজীভগবান সেজেছিলেন। সে দেখলে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়। কলক্টর সাহেব—তাকে ওখানে বলে চেরমেন সাহেব,—তিনি পর্যন্ত দেখেছিলেন। ভাইচেরমেন সাহেব তাঁকে "নাটক" বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সেইদিন বাবুলাল বাড়ী ফেরবার সময় ভাইচেরমেন সাহেবের চিঠি ফেলবার যে বেতের ঝুড়ি আছে, তাইতে করে এক ঝুড়ি ভরে কত রং বেরঙের মেঠাই এনেছিল। বুধনী সে সবের নামও জানে না। জানতে চায়ও না। তার নরাতটাই অমনি। [illegible] 'দরবারের' তামাসার সময় ও ছিল আঁতুড়ে, আবার, এবার যুদ্ধ থামবার তামাসার সময় আঁতুড়ে। আঁতুড়েতো মেয়েছেলেদের মিষ্টি খেতে নেই তা এত মিষ্টি কি হবে। [illegible] ও নিজেই বাবুলালকে বলে, ঢোঁড়াইকে [illegible] নিয়ে আসতে। বাবুলালেরও মনটা খুশী ছিল ছেলে হয়েছে নতুন। একটা [illegible] সে একখানা প্রকাণ্ড [illegible] তার ঢোঁড়াইকে খাবার সাটিফিকেট দেয়। [illegible] তুলসীর মালা দেওয়া [illegible]। না হলেতো তাকেও খাওয়াতাম।"

বুধনী নতুন ছেলেকে কোলে নিয়ে মাচার উপর বসে ছিল। সে বাবুলালকে বলে,—তুমি [illegible] বাইরে বেরিয়ে এসো, তোমার সামনে ঢোঁড়াই লজ্জায় খেতে পারছে না।

[illegible] আবার কিসের? বলে একটু [illegible] বাবুলাল চলে যায়।

ঢোঁড়াইয়ের খাওয়া হলে বুধনী ঢোঁড়াইকে কাছে ডাকে, একটু আদর করবার [illegible]। অতটুকু কচি ছেলে কোলে নিয়ে উঠতে [illegible] পারে না।

ঢোঁড়াই গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, [illegible] দিকে তাকিয়ে। তার একটুও ভাল [illegible] এই লাল খোকাটাকে, আর তার [illegible] বাওয়ার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে। [illegible] চোখ ফেটে কান্না আসবে বোধহয়। রাম্ [illegible]! সে কোন কথা না বলে দৌড়ে পালিয়ে [illegible] 'থানের' দিকে।

### রেবণ গুণীর কৃপায় ঢোঁড়াইয়ের পুনর্জীবন লাভ

দুখিয়া হওয়ার পর থেকে বুধনী হয়ে [illegible] দুখিয়ার মা। পাড়ার সবাই তাকে ঐ নামেই ডাকতে আরম্ভ করে। আর সত্যি সত্যিই এর পর থেকে, ঢোঁড়াইয়ের কথা তার [illegible] কম সময়েই মনে পড়ে। একে ঢোঁড়াই মার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চায়, আর এদিকে দুখিয়ার মারও সংসারের নানান লেঠা।



দুখিয়ার মার ছোট্ট মনের প্রায় সমস্ত জায়গাটুকুই জুড়ে থাকে দুখিয়া। এ সোজা কথাটা বাওয়াও মর্মে মর্মে বোঝে, আর সেই জন্যই আজ দরকারে পড়েও তাকে ডাকতে ইতস্ততঃ করছিল।

সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলীতে চড়াইপাখী দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলাবলি করে যে একটা বড় অসুখ শীগগিরই আসছে। তার উপর বাড়ীতে নম্বর দিয়ে লোক গুণে গিয়েছে (১)। সকলে ভয়ে কাটা হয়ে আছে। তারপর যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জিরানিয়ায়, তাৎমাটুলীতে, ধাঙ্গড়টুলীতে, কি অসুখ! কি অসুখ! 'বাই উখড়োনোর' ব্যারাম,—বেহুঁস জ্বর—'ঝটছে বিমার পটছে খতম' (২)।

কপিল রাজার বাড়ীশুদ্ধ সবাই উজাড় হয়ে যায় এই রোগে সেইবার। হবে না! বকড়হাট্টার মাঠের সব শিমুল গাছ সে কাটিয়েছিল, লা চালান দেওয়ার বাক্স তৈরী করার জন্য। শিমুল তুলো যে তাৎমানীদের রুজী সে কথা একবার ভাবলো না। কাটাচ্ছিলেন ওই নিরেট ধাঙ্গড়গুলোকে দিয়ে। আহাম্মকগুলো বোঝে না যে ধাঙ্গরাণীদেরও শিমুল তুলো বেচে কিছু রোজগার হয়। সেই তো নির্বংশ হয়ে গেল কপিলরাজা, কিন্তু যাওয়ার আগে "মোটিয়াদের" (মেয়েদের) রোজগার মেরে রেখে গেল। থাকগে সে যাদের স্ত্রী, ছেলে আছে তারা ভবুককে থাক। কিন্তু তারতো সম্বল ঐ একমাত্র ঢোঁড়াই।

সকালে ঢোঁড়াই ঘুম থেকে ওঠেনি। মিসিরজি ঠাকুরবাড়ীতে রামায়ণ শুনতে যাওয়ার সময় হলো তবুও ওঠে না। বাওয়া চিমটে দিয়ে খোঁচা মারে। হল কি ছোঁড়ার। বাওয়ার মনটা ছাঁৎ করে ওঠে। কপিল রাজার বাড়ী থেকে একটার পর একটা 'মুর্দা' বের করেছে—পরপর চারটে। নুনুলাল মাহতো খতম হয়ে গিয়েছে গত সপ্তাহে।......

গায়ে হাত দিয়ে দেখতে ভয় ভয় করে। গায়ে হাত দিয়ে দেখে যা ভেবেছে তাই। ও ঢোঁড়াই কথা বল্‌ চুপ করে কেন? ভিক্ষের বেরুলো, রামায়ণ শুনতে যাওয়া মাথায় চড়ে। এ কি করলে রামজী, আমার! এ রোগে তো ডাক্তার পর্যন্ত সময় দেয় না। দুখিয়ার মাকে খবর দেবে কিনা, ডাকা উচিত হবে কিনা সেই কথাই বাওয়া ভাবছে। দুখিয়ার মাতো মনে হয় একেবারে ধুয়ে-মুছে ফেলে দিয়েছে ঢোঁড়াইকে মন থেকে। এক বছরের মধ্যে একটি দিন খোঁজ করেনি। বাওয়া ভেবে কূল-কিনারা পায় না।

শেষ পর্যন্ত গিয়ে খবরই দেয়। তার পেটের ছেলে, কিছু একটা ঘটে গেলে, হয়ত সারা-

---

টীকা:—

(১) আদম-শুমারি।

(২) ঝটছে বিমার পটছে খতম—লোকে অসুখে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মরে।

জীবন দুঃখ থেকে যাবে। আসতে ইচ্ছে হয় আসবে, মন না চায় আসবে না। বাওয়া নিজের কর্তব্য করবে না কেন।

খবর দিতেই দুখিয়ার মা আঁতকে ওঠে। দুখিয়ারে বাবুলালের কোলে ফেলে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে আসে। আর যেন সে মানুষই না। পুরোন বুধনী ফিরে এসেছে যেন। বাবুলাল পিছন থেকে হাঁ হাঁ করে। কে কার কথা শোনে। গোঁসাই নেমে এলেও তার পথ আটকাতে পারতেন না তখন। এসেই ওই নেতিয়ে পড়া ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। ঢোঁড়াই তখন বেশ বড়—বছর আষ্টেক বয়স হবে। ওই বুড়ো-ধাড়ী ছেলেকে কোলে নিয়ে ছোটে রেবণগুণীর বাড়ীর দিকে। ওর গায়ে তখন মহাবীরজী তাকৎ জুটোচ্ছেন। বাওয়াতো গুণীর বাড়ী যেতে পারে না; গেলে, লোকে সে সন্ন্যাসীকে মানে না। তাই সে খানিকদূর সাথে সাথে গিয়ে পথের ধারে এক জায়গায় বসে পড়ে। সেখানে গিয়ে দুখিয়ার মা ঝাড়ফুঁকের কথা তুলতেই, রেবণগুণী ফুঁ দিয়ে তামাক ধরাতে ধরাতে বলে,—তুইতো বাসি পেটে আসিসনি।

দুখিয়ার মা হকচকিয়ে যায়। সকালে কি খেয়েছে মনে করতে চেষ্টা করে। গুণী যখন বলেছে নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে থাকবে। ওমা, সত্যিইতো! খইনিতো সে খেয়েছে। ঐ যে তখন, বাবুলাল ডলে নিজে খাওয়ার সময় তাকেও একটু দিয়েছিল। উৎকণ্ঠার জায়গায়—ভয়ের ছাপ পড়ে তার মুখে। রেবণগুণীতো চটে লাল। এই মারে তো এই মারে! তুই বুড়ো মাগী, জিন্দিগি গেল ছেলে বিইয়ে। সাতকাল তাৎমাটুলীতে কাটিয়ে তুই জানিস না ঝাড়ফুঁক করতে আসতে হলে খালি পেটে আসতে হয়, ভোর বেলাতে আসতে হয়।

রেবণগুণীর নামে পাড়ার লোকে কাঁপে। তাৎমাটুলীর আইবুড়ো মেয়েরা তাকে দূর থেকে দেখলে পালায়। মায়েদেরও মেয়েদের উপর সেই রকমই হুকুম। একতো তুকতাকের ভয়, তার উপর থাকে চব্বিশ ঘণ্টা নেশা করে। পরপর দুটো বিয়ে করেছে, এখনও দুটোকে নিয়ে ঘর করে। গোসাইথানে যেদিন ভেড়া বলি হয়, সেদিন প্রতি বছর তার উপর গোঁসাই ভর করেন। সেই সময় সে ভেড়ার রক্ত কাঁচা খায়; মুখে গায়ে ভেড়ার রক্ত মেখে, সে হুংকার ছাড়ে। সে কি আর করে? তার মধ্য দিয়ে গোঁসাই কথা বলেন। তার হাতের বেতের ছেরটা দিয়ে ছুঁয়ে সে যাকে যা বলবে, তা ফলবেই ফলবে। কুমারী মেয়েরা সে সময় পালায় সেখান থেকে। গতবার সে একটা একটা মেয়েকে ছুঁয়ে, তার সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছে। কোনও মা বাবার সাধ্যি নেই যে, সেই সময়কার গোঁসাইয়ের কথায় নড়চড় হতে দেয়।

পথে আসবার সময়ই দুখিয়ার মার এসব

কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ঢোঁড়াইটাকে বাঁচাতে হ'লে ঐগুণী ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক নেই। টৌনের হাসপাতালে গেলে কোন লোক আর বাড়ী ফিরেই আসে না। কপিলরাজাতো "বাঙালী ডাক্টর" দিয়েও দেখিয়েছিল। কিছু কি হল?

রেবণগুণী গালাগালি দিয়ে চলেছে দুখিয়ার মাকে। "ভরা দুপুরে কি মন্তরের ধক থাকে নাকি? বেরো শীগগির এখান থেকে।" দুখিয়ার মা গুণীর পা জড়িয়ে ধরে, ডুকরে ডুকরে কাঁদে।—এটার বাবা নেই গুণী। তুমি একে পায়ে ঠেলো না।

গুণীর মেজাজ বোধহয় গলে। বলে কালইতো শনিবার। কাল আসিস। কালতো আবার হাড়তাল না কি বলে. ওই কি একটা নতুন হয়েছে না আজকাল,—গত বছরেও হয়েছিল একবার,—দিনের বেলা সওদা মিলবে না, সাঁঝের পরে দোকান খুলবে, কাল আবার তাই আছে। সাঁঝের পর দোকান খুললে পান সুপারী কিনে নিয়ে রাতে আসিস। 'সিন্দুর'তো তোর আছেই। 'ভানমতীর' (৩) দয়ায় সেরে যাবে এই বদমাসটা। বলে ঠোঁটের কোণে হাসি এনে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়।

দুখিয়ার মার মনটা একটু হাল্কা হয়ে ওঠে। রেবণগুণীর মন তা হলে গলেছে। সে বলেছে সেরে যাবে. তার দুশ্চিন্তা অর্ধেক দূর হয়ে যায়। কিন্তু কাল রাত্তির পর্যন্ত দেরী করা কি ঠিক হবে? চিকিৎসা আরম্ভ করতে তার সবুর সয়না। কালই কি আবার ঐ কি যে বলে ছাই, 'হাড়তাল' না কি না হলেই হতোনা। দুনিয়ার সকলের আক্রোশ কি তারই উপর? এখানে আসবার আগে রেবণগুণীকে যতটা ভয় ভয় করছিল, এখন কথাবার্তা বলার পর ততটা ভয় করে না।

সাহসে বুক বেঁধে গুণীকে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা, আজকে পান সুপারী কিনে, কাল সকালে এলে হয়না—শনিবার আছে.....

"যা বললাম তাই কর"—চীৎকার করে ওঠে গুণী, "তোর বুদ্ধিতে আমি চলব, না আমার বুদ্ধিতে তুই চলবি?"

দুখিয়ার মা ভয়ে কাঁপে—গুণীর মুখের উপর কথা বলা তার অন্যায়ই হয়েছে।

গুণী একটু নরম সুরে বলে "আজকের কেনা পান সুপুরীতে মন্তর ধরবে না। আর ছেলেকে আনবার দরকার নেই। এখান থেকেই কাজ হয়ে যাবে। আজকের রাতে শোবার সময় ছেলেটার চোখে ধোঁদিলের ফুলের রস দিয়ে দিস। আর মরণাধারের এই মন্তর দেওয়া মাটি নিয়ে যা ওর কপালে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে। ঢোঁড়াই তখন দুখিয়ার মার কোলে নেতিয়ে পড়েছে। ঢোঁড়াইকে নিয়ে ফিরে আসবার সময় দুখিয়ার মার কানে আসে—রেবণগুণী আপন মনে বলছে......গত অমাবস্যাতে আদ্ধেক রাত্তিরে যখনই দেখেছি মুরবলিয়া (৪) ফৌজের দল পাক্কী দিয়ে গিয়েছে, তখনই বুঝেছি যে উজাড় হয়ে যাবে গাঁ। কাটা গলার উপর একটা করে আবার পিদীপ জ্বলছিল।......ভয়ে তার প্রাণ উড়ে যায়।......যাক্ সে যাত্রা বেরণগুণীর কৃপায় ঢোঁড়াই বেঁচে যায়। ঝাড়ফুঁকের জন্য দুখিয়ার মাকে যে দাম দিতে হয়েছিল, তারজন্য সে কোনদিন দুঃখিত হয়নি। ঐ রোগে কত লোক মরেছিল গাঁয়ে, শুধু রেবণগুণীরই মন্তের জোরে ঢোঁড়াই বেঁচেছে, এ উপকার দুখিয়ার মা ভুলতে পারবে না। এমন শনিবার রাত্রের মন্তরের ধক যে, জ্বর ছাড়বার পরও যত বিষ শরীরে ছিল, কালো কালো রক্তের চাপের মত হয়ে, নাকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়েছিল কদিন ধরে।

অসুখ সারবার পরও এক হপ্তা দুখিয়ার মা ঢোঁড়াইকে রেখেছিল বাড়িতে। এ ঢোঁড়াইয়ের এক নতুন অভিজ্ঞতা। তার শরীর তখনও দুর্বল। বাতায় গোঁজা কাজললতাটার দিকে শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ দেখলেই চোখ টন্ টন্ করে, হাঁড়ি ঝোলানোর শিকেগুলো বিনা হাওয়াতেও মনে হয় কাঁপে, ভাত আনতে দেরী হলে রাগে কান্না পায়। বাঁশের মাচার উপর, একদিকে শোয় ঢোঁড়াই, একদিকে দুখিয়া, আর মধ্যেখানে দুখিয়ার মা। দুখিয়ার মার গায়ের গরমের মধ্যে মুখ গুঁজে, গল্প শোনে ঢোঁড়াই ......রাজপুতের সদাবৃচ, মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন রাজকন্যা সুরঙ্গার মহলে যাওয়ার জন্য; অন্ধকার ঘুরঘুট্টি সুড়ঙ্গ, পিছল দেওয়াল, তার মধ্যে দিয়ে জল চুইছে টপ টপ করে।......... (৫)

ঢোঁড়াইয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে দুখিয়ার মার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে। অন্ধকারে ভয় পাচ্ছে নাকিরে ঢোঁড়াই, এইত আমি কাছে রয়েছি, কথা বলছি তবুও ভয় করছে। অসুখের পর এমনিই হয়।....

ওদিকে হিংসুটে দুখিয়াটা উঠে বসেছে হাতের মুঠো দিয়ে নাক রগড়াতে রগড়াতে। ছোট্ট ছোট্ট হাত দুখান দিয়ে সে ঢোঁড়াইকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায়, আর ঢোঁড়াই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

"ছি দুখীয়া, ঢোঁড়াই ভাইয়ার যে অসুখ," দুখীয়া কান্না জুড়ে দেয়। বাবুলাল অন্য মাচা থেকে চেঁচায়, "ও কাঁদছে কেন?" —শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে দুখীয়াকে নিয়ে যায় নিজের কাছে।

ঢোঁড়াই ছোট হলেও বোঝে যে, বাবুলাল রাগ করে দুখীয়াকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, আর রাগটা বোধ হয় তারই উপর। দুখীয়ার মাও চুপ করে গিয়েছে। তার চুলের গন্ধটা আসছে নাকে, বাওয়ার জটার গন্ধর মত না, অন্য রকম। কোথায় ভেবেছিল যে, আজ বিজা সিংএর গল্পটা শুনবে এর পর। বাবুলালটা সব মাটি করে দিল। ভারী ভাল লাগে বিজা সিংএর গল্পটা। ঘোড়া ছুটিয়ে, তরোয়াল নিয়ে যাচ্ছেন বিজা সিং—কার সাধ্য তার সম্মুখে দাঁড়ায়-হাওয়া গাড়ির চাইতেও কি বেশী জোরে তার ঘোড়া ছোটে। দুখীয়ার মাকে জিজ্ঞাসা করবে নাকি যে, এঞ্জিনের চাইতেও কি বিজা সিংয়ের গায়ে বেশী জোর। না দুখীয়ার মাটা বাবুলালের ভয়ে এখন কথা বললে না, তাই চুপচাপ শুয়ে রয়েছে।

"কিরে ঢোঁড়াই ঘুমোলি নাকি?"

ঢোঁড়াই উত্তর দেয় না। চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে থাকে। এইবার দুখীয়ার মা ওঠে। ঢোঁড়াই জানে যে, আংনাটুলীর প্রত্যেক মেয়েছেলেই রাত্রে পুরুষের পা টিপে দেয়। তেল থাকলে পায়ে তেল দিয়ে দেয়। তার বাওয়ার কথা মনে পড়ে। দুখীয়ার মা যদি বাওয়ার পায়ে তেল দিয়ে দিত, তাহলে বেশ ভাল হত। বাবুলালটাও ভাল না, দুখীয়ার মাটাও ভাল না, আর দুখীয়াটাও ভাল না। বাওয়া এখন কি করছে, কে জানে। একদিন তো নিতে বাওয়ার জন্য এসেছিল—দুখীয়ার মা যেতে দেয়নি। কালই সে চলে যাবে ওদের বাওয়ার কাছে.....বিজা সিংয়ের ঘোড়ায় চড়ে .....তরোয়াল হাতে নিয়ে রাজপুতের সদাবৃচের মত ......

ঢোঁড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে। (ক্রমশঃ)

---

(৩) ভানমতী — ভানুমতী — যাদুবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

(৪) মুরবলিয়া—কবন্ধকাটা ভূত। ঐ সময় কবন্ধকাটা মিলিটারী উর্দী পরা ভূতের দল, গিয়েছিল কোশী-সিলিগুড়ি রোডের উপর দিয়ে।

(৫) সুরঙ্গা সদাবৃচের, রূপকথা সবাই জানে এখানে। কিন্তু ওটা বলতে হয় গান করে সেইটা সকলে পারে না।

# বাবুতত্ত্ব

## শ্রীপরিমল দত্ত

**অমুকবাবুর** সঙ্গে যদি আমার আলাপ থাকে, সেটাকে আপনারা সামাজিকতার অঙ্গ বলেই মেনে নেবেন, যদি ওমুকে মহিলার সঙ্গে আমার হৃদয়ঘটিত ব্যাপার থেকে থাকে—তাহলে আপনারা আমার উপর খুশী না হলেও মুখ ফুটে খোলাখুলি কিছু বলবেন না। আর যদি বলেন তা মনে মনে, শ্লোক আউড়ে বলতে পারেন মেয়ে-মদ্দ রাজি তো কি করবে বল কাজি? যদি বলি ওমুকে মহিলাকে আমি পছন্দ করি, তাঁর মার্জিত রুচি তাঁর গান, সরস কৌতুকালাপ আমার ভাল লাগে কেবল এইজন্যেই কি শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি যাই ও 'চা-পান- সভায় হাঁটু জলের রস সাধনার সুযোগ নিয়ে নলিনী পাকড়াশি মার্কা আড্ডা আম মার্কা আধুনিক বাঙলা কবিদের আলোচনা করি—তাহলে নিঃসন্দেহে ধরে নেবেন, আমি প্রেমে পড়েছি। অবশ্য তাতে আমারও কিছু বয়ে যাবে না। সে কথা যাক। আসল কথা হল এই, কোনো নিস্পর অনাত্মীয়া মহিলা, আমার আন্তরে আত্মীয়তা যদি স্বীকার না করেন কিংবা সে নারীর কভু আমি হবো না উনি এমন কাউকে নির্বাচিত করেন নিজ ওমুকে বলে না ডেকে কি বলে ডাকা যায়? শ্রীমতী কুমারী নামে কাউকে সম্বোধন করা সমীচীন নয়, চাই কি নেকামিও মনে হতে পারে। কারণ এর চরিত্র নেই, অর্থাৎ শব্দটি অত্যন্ত ঘোলাটে, ব্যঞ্জনাহীন। যদিচ গান আর প্রমোদের জগতে মিস ও কুমারী সমবাচিক শব্দ নয়। অলিখিত ব্যবহারের নজিরে বলা চলে, এরা আলাদা জাতের আলাদা ঘরের মেয়ে—প্রথমটির আছে বর্তমান দ্বিতীয়টির কেবল অতীত। পরস্ত্রীর দিকে চোখ দেওয়া, পুরুষ মানুষের উচিত নয়, শাস্ত্রের দোহাই আছে। গরজ বড়ো বালাই কাব্যের জগতে কিন্তু পরস্ত্রী-প্রেম ও চর্চার নাম হল পরকীয়া। যাকে ভালবাসা যায়, তাকে যে কোনো নামেও ডাকা চলে। আর ভাল না বেসে অনাত্মীয়া ভদ্রকন্যাদের ডাকলে তাঁরা সাড়া দেবেন না—সাড় থাকা ভাল যে ডাকের বচন আপনাকে সশরীরে পৌঁছে দেবে মানহানির গোলকধামে আইনের গোলক ধাঁধা বেয়ে।

দেশরত্ন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁর আজীবনের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা বাবু উপসর্গ ত্যাগ। দশ বছর আগেও ছোটো ছেলেকে তার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত শ্রীযুত-বাবু ওমুক। আজকাল শ্রী ওমুক বললেই উপযুক্ত ভদ্রকৃত্য ও সম্মাননা দেখানো হয়। কাউকে অমুক বাবু বললে আপত্তি নেই কিন্তু বাবু ওমুক ঘোরতর প্রেস্টিজনাশক। লোকটা খুব বাবু, একথা বললে বোঝা যায়, সে শৌখিন প্রকৃতির বেশ-পোষাকী, স্টাইলিস্ট, চাই কি স্মার্টও হতে পারে। বিবি বৌ-এর অর্থ সে 'নীল নেজা-ওয়ালী' বিদুষী ভার্যা নাও হতে পারে। তবে সাজে সজ্জায় আভরণে গয়নার দোকান আর দর্জি বাড়ির জীবন্ত পুতুল। পটের বিবির বিবিয়ানা, আর কপালকুণ্ডলার মোতিবিবির বিবিত্ব একই অর্থে ব্যবহৃত হয় কি? কিম্বা ঈশ্বর গুপ্তের বিবিয়ান কথন লবেজান করে চলে যান—সেই অনির্বচনীয় অনির্দিষ্ট বেদনা কোন্ বিবি ভূমিকা আশ্রয় করে নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে বলা মুশকিল। উর্দু আর হিন্দী শব্দ বাঙলা মুলুকে 'ধেনো-শালিখ' হলে অদ্ভুত রকমের বিকারে বিকৃত হয়ে ওঠে। 'কিস্সা' শব্দের মূল অর্থ, কাহিনী, গল্প যা বাঙলায় বেমালুম 'কেচ্ছায়' এসে দাঁড়িয়েছে। 'তেরি-মেরি' (তোমার আমার বা তোর আমার) বাঙলার গালাগালি বা মেজাজ দেখানোর রকম ফের। বহেন, বেন, বাই—সবই ভগ্নী শব্দের বিকার। মীরা বাই, মীরাবেন—এঁদের নাম যে বাঙালী শোনেনি এমন নয় তবে বাই, বাইজী বললে সে বুঝে এক শ্রেণীর মেয়েদের যারা নাচে গান গায়, এক কথায় পণ্য স্ত্রী। বাঙলায় নামের শেষে বিবির নোঙ্গর একদা বারাঙ্গনাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ সারা উত্তর ভারতে বৌ-ঝিদের ভদ্র সম্বোধনের নাম—বিবি, বিবিজী। নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ অথচ উর্বশীও নন—এমন অনাত্মীয়া ভদ্রকন্যাদের আমরা কি কোনো দিন ডাকব না?

আমার চেনা ও জানা আলাপিত মহলে, কারুর ইংরেজি জ্ঞান যদি সম্পূর্ণ, নিখুঁত ও অব্যর্থ হয়ে থাকে আর যিনি তা সম্যকরূপে প্রয়োগ করতে পারেন—তিনি হচ্ছেন খুদিরাম হাওলাদার। গোল্ডস্মিথের সেই বিখ্যাত ইস্কুল মাস্টারের মতো, তাঁর মগজ ঘনীভূত, নিরেট, নিরন্দ্রেক জ্ঞানে ঠাসা, তা ভাবলেও মাথা ঘোরে। দেড় ফুট লম্বা লাতিন ফ্রেজের চমক, উপযুক্ত প্রিপোজিসানের নাৎসী ঝটিকা বাহিনী, ইংরেজি সমবাচিক শব্দের সজ্জিত চতুরঙ্গ আর আপিসী ইংরেজি শৈলীর ঠমকে—দপ্তর-চারী পঞ্জাব মারাঠা, দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গের সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ কেবল মুগ্ধ নন, ঈর্ষা জর্জরিতও। তিনি করিডরে পঞ্চাশ গজ দূরে দিয়ে অজান্তে হেঁটে গেলেও গন্ধগোকুল, ভোঁদড় কিম্বা ভামের মতো—তাঁর পাণ্ডিত্য ইংরেজির উৎকট গন্ধ আমার নাকে এসে লাগে; সে গন্ধ ম্যাকর্মাড, রো এবং হেনব, ও নেসফিল্ডের গন্ধ, সেই ইস্কুল ঘরের ওয়াক ধরানো ওষুধ গেলানো গন্ধ। ঘোড়ার আগে গাড়ির মতো, ভাষার আগে ব্যাকরণ জোতা যায় না।—খুদিরাম এ তত্ত্ব কোনো দিন হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেনি। ইংরেজি জানার অভিমানই প্রমাণ করে তাঁর ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে অপরূপ জ্ঞানহীনতা। ইংরেজি সাহিত্য সমুদ্রের দখিনা বাতাসের স্পর্শ তার গায়ে কখনো লাগে নি, সে যে ঘোলা ডোবার ঘাটলা ধরে হাত পা ছুঁড়ে জলে দাপাদাপি করে—ভাবে এরই সাহায্যে সেই সমুদ্র অবলীলাক্রমে পাড়ি দেওয়া চলে। জমিদারি সেরেস্তায় যে মুহুরী বাঙলায় চমৎকার মুসাবিদা লিখতে পারে আর কেবল মুসাবিদা লেখার জন্য সে যদি ভাবে তার ও যে-কোন নামকরা কথাশিল্পীর বাঙলা জ্ঞান ও প্রকাশের সৌকর্য এক পর্যায়ের, কেবল এক চোখা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাৎসরিক সমাবর্তন সভায় বারে বারেই তার গলায় জগত্তারিণী পদক ঝুলিয়ে দিতে ভুলে যায়—এমন বাঙলা নবিশ ইচ্ছাচারী স্বাপ্নিক সম্পর্কে আমরা কি ভাবব? কিন্তু ইংরেজি-নবিশ এমন বাঙালী মুহুরী, কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে দেখা যায়।

খুদিরাম হাওলাদার বলে বিদ্যাবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হল ইংরেজিতে ভাল নোট লেখা। আমার বিশ্বাস খোদ পরম কারুণিক ঈশ্বর দিল্লীতে কোনো জরুরি কাজে এসে যদি সেক্রেটেরিয়েটের উত্তর ব্লকে পথ হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে তেতালার গাঙ্গুলি-রেস্তোরাঁতে এক পেয়ালা চায়ের আশায় এসে বসেন ও অতর্কিতে খুদিরাম হাওলাদারের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে নির্ঘাৎ এই জাতীয় কথোপকথন হবে:

হাওলাদার। আপনি কে, কোথা থেকে আসচেন?

ঈশ্বর। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, নিবাস স্বর্গ-ধাম।

হাওলাদার। কোন্ ঈশ্বর?

ঈশ্বর। এক এবং অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান পরম কারুণিক ঈশ্বর।

হাওলাদার। (নমস্কারান্তে, বাফ রঙের নোটশিট ও ফাউন্টেনপেন এগিয়ে দিয়ে) আচ্ছা লিখুন দেখি একখানি নোট—বিষয়—আপনার মর্তে আগমনের হেতু: তাতে করেই বোঝা যাবে আপনার ঐশ্বরিক ক্ষমতা, বিভূতি, মুন্সীয়ানা

মায় আপনার বিদ্যার দৌড় পর্যন্ত। নচেৎ প্রমাণ হবে আপনি জাল ঈশ্বর। এর পর ঈশ্বর কি করবেন, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

হাওলাদার হ'ল ইংরেজের গড়া চিরন্তনী ক্রমচর্যার টিপিক্যাল 'বাবু'।

বাবু সম্পর্কে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় 'ক্লাসিক ডিক্লামেশন' বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কেউ লেখেন নি।

যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ লিখনে শত এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরেজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ ন্যাশনাল থিয়েটার, তিনি বাবু। যিনি মিশনারীর নিকট খৃস্টান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধু গৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মনিব সাহেবের গৃহে গলা ধাক্কা খান তিনিই বাবু'।

(বাবু—লোকরহস্য)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু', তাঁর দেশ দেশ নন্দিত বন্দে মাতরম্ সংগীতের মতো সর্বভারতীয় নয়। এ বাবু নিছক 'রাইটারস্ বিল্ডিংস'র খাঁটি বাঙালীবাবু আর সেকাল উত্তর-সিপাহী-বিদ্রোহ, মধ্য ভিক্টোরীয় যুগ। কিন্তু বাবু চরিত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে তাঁর পর্যবেক্ষণ নিখুঁত ও অভ্রান্ত। বাবুর অন্যান্য গুণের মধ্যে তিনি ইংরেজি নবিশ এবং মাতৃভাষা বিরোধী নিজেকে অনন্ত জ্ঞানী সবজান্তা বলে মনে করেন আর তিনি ব্রহ্মার মতো প্রজাসিসৃক্ষু।

আমাদের জাতীয় জীবন, শিক্ষা, ইতিহাস অর্থনীতির অবনতির মূল কারণ, ব্রিটিশ শোষণ, ইংরেজ শাসন। আর কেবল নোকরশাহী ইংরেজের তল্পীদারবাবুর কুৎসিত ভাবানুষঙ্গের জন্যই, বাবু নামের উপর আমরা কেবল বীতশ্রদ্ধ নই খড়্গহস্তও। বঙ্কিমচন্দ্র বাবু বলতে ইংরেজি শিক্ষিত সমগ্র মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রসমাজকে বুঝেছেন, বিষ্ণুর দশ অবতারের মতো বাবুও দশ পর্যায় ভাগ করা—কেরানি, মাস্টার ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দি, ডাক্তার, উকিল, হাকিম জমিদার সাংবাদিক এবং বেকার;—যার দুই প্রত্যন্ত সীমা কর্ণওয়ালিসী বেদ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর মেকলে-বেন্টিঙ্ক মনুসংহিতা—ভাষা বিপর্যয়ের পাথর দিয়ে সিমেন্ট করা। বাঙালি জাতকে জাত যাঁরা বাবুর আওতায় আসেন না, তাঁরাও বাবু মানসিকতা থেকে মুক্ত নন। ইংরেজ ও ইংরেজিপ্রিয়তা আত্মসন্তুষ্টিবোধ, হীনমন্যতা ও সব রকমের রচনাত্মক সৃষ্টি ও উদ্যমে অক্ষমতাই হল বাবু-মানসিকতা বা বাবু-মনোবৃত্তি।

আমাদের দেশে রচনাত্মক সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান অন্তরায় হল এই বাবু-মনোবৃত্তি। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে ইংরেজি শিখেছি, নকল ইংরেজ বনতে চেয়েছি, ইংরেজি বানান, ব্যাকরণ আর উচ্চারণ ভুল হলে লজ্জায় মরতে চেয়েছি—কিন্তু মৌলিক মতামত দিতে, আনকোরা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না ইংরেজি না বাঙলায় সফল হয়েছি। শোনা যায়, গত শতকের বাঙালি মনীষীরা এক একজন দিগ্‌গজ ইংরেজি বোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু ইংরেজি বা বাঙলায়, ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচনা কিছু কি লেখা হয়েছে? ইংরেজি-নবিশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যখন কিছু লেখেননি, তখন নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে, ইংরেজি শিক্ষার কসরতে তাঁদের মন পঙ্গু হয়ে যাওয়ায়, আত্মবিশ্বাসের অভাবে, কিম্বা পাছে ইংরেজ হাসে এই ভয়ে ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে হাঁ বা না কিছুই করেননি। লালবিহারী দে'র "ফোকটেলস অব বেঙ্গল" বাবু ইংরেজিতে লেখা নয়, কিন্তু পাতার পর পাতায় এই একান্ত অনুগত ভৃত্য বাবুর মনোবৃত্তি কাজ করছে। মনোযোগ দিয়ে পড়লে মনে হবে ইংরেজ সিভিলিয়ান উপরওয়ালার কাছে যেন নাজির গলবস্ত্র হয়ে, দেঁতো হাসি হেসে বুঝাচ্ছে, নিশির ডাক কাকে বলে, পুকুরঘাট কেন ভারতীয় পার্লামেন্ট, এটা হল ঐ, আর ওটা হল এই। কোনো পূর্ববঙ্গবাসীকে কলকাতা দেখার পর প্রশ্ন করা হয়,—কলকাতা কেমন দেখলে? সে বললে : কমু আর কি, এক তাল সোনা দিয়া কইলকাতা বানাইয়া থুইছে। ইংরেজি পড়ে, ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাব এককথায় অনির্বচনীয়—এই একতাল সোনার চাঙ দিয়ে বানানোর মতন তুরীয় উপলব্ধির ব্যাপার, যা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। অথচ এমন লোক অগুণতি পাওয়া যাবে, যাঁরা আজও বলে থাকেন, তাঁদের মাতৃভাষা তেমন আসে না, তবে ইংরেজি হলে লিখতে পারেন। কিন্তু সে কি লেখা? আফিসের নোট, আবেদন-নিবেদন বহু দরখাস্ত, পারিবারিক মামুলী চিঠিপত্র। তাঁদের সারা জীবনের দিস্তেবন্দী ম্যাজিক কলমের ইংরেজি ফসল ঢুঁড়ে একটি আস্ত পংক্তিও পাওয়া যাবে না যাতে আদিগন্ত বিস্তৃত কল্পনার সুনীলিম ইঙ্গিত আছে, আছে 'নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা' জয়তিলক। তাঁরা এক একটা সেকালের রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখুয্যে বা এ যুগের ধনগোপাল মুখুয্যে, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহরু আর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ নন। পরিসংখ্যানের অঙ্কের জুতের উপর আমার শ্রদ্ধা নেই, সুতরাং তা আওড়াতে চাই না—কেবল ভারতবর্ষে যত লোক ইংরেজি জানে, তা বোধ হয় ফ্রান্সের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি, আর ফরাসীরা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে ইংরেজি খারাপ লেখে ও জঘন্য উচ্চারণ করে, তা সত্ত্বেও ইংরেজি সাহিত্যের অন্তরের কথা তাদের চেয়ে কেউ কি বেশি জানে? তারা ইংরেজি ভাষার খোলার চেয়ে, ইংরেজি সাহিত্যের শাঁসের পক্ষপাতী।

আমরা ঠিক তার উল্টো। অভিশপ্ত কচের মতো ইংরেজি শিক্ষার ঝাঁকামুটে হয়েই রইলুম—না শেখা গেল তার প্রয়োগ, না পারা গেল অন্য কাউকে তা শেখাতে আর মাঝের থেকে বাঙলাও গেলুম ভুলে।

ব্রিটিশ ও ভারতীয় শিক্ষানীতির কিম্ভূত-কিমাকার অপজাতক চিজ্ হল বাবু—সে এক অদ্বিতীয় ফাঁপা কথার মানুষ মেকলের ঔরসজাত ফাঁপা সন্তান আর কিপলিঙের পেটোয়া চির-আদরের ভাঁড়, ব্যঙ্গচিত্রীর বাঁধা রসিকতার বিষয়। বিলিতি সাময়িকী 'পাঞ্চ'এর বাবু-বিষয়ক বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র কে না দেখেছে; সেই বাবুর মুখে হাস্যাস্পদ দো-আঁশলা ইংরেজি "বুলবুলি", চোখে পুরু পরকলার চশমা, ডান কানে বুইলের কলম গোঁজা, পরনে ইঙ্গ-ভারতীয় বিচিত্র বেশ, হাজারো ফাইল আর লেজারের চাপে কুব্জ পৃষ্ঠ আর নুব্জ দেহ নিয়ে সরকারী দপ্তরের ক্লান্ত করিডরে ধাবমান। রাজার ইংরেজিতে নয়, রবীন্দ্রনাথের বাঙলায় নয়—'রাজ-রাজেশ্বরের ইংরেজি'র পরিভাষায় বাবুর চরিত্র বলে কোনো জিনিষ গড়ে ওঠেনি। সে না-ভারতীয় না-ইংরেজ, না-ঘরের, না-ঘাটের—দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের পথে হয়েই রইল।

এ তথাকথিত বাবুর নাভিশ্বাস উঠেছে মৃত্যু আসন্ন, তবুও বাবুলীলা সংবরণ করতে কম করে সিকি শতাব্দী লাগবে।

মুল্করাজ আনন্দ তাঁর সম্প্রতিক পুস্তিকা 'রাজ-রাজেশ্বরের ইংরেজি'তে যা বলেছেন তার স্বাধীন বাঙলা তর্জমা নীচে দেওয়া গেল :

"খাঁটি শিক্ষার ভিৎ একেবারে না থাকায়, বাবু অশিক্ষিত ও অমার্জিত রয়ে গেছে, কাজে কাজেই উপযুক্ত ইংরেজিতে বা তার মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে সে অক্ষম। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের খোলা আকাশের নীচে, সবুজ পারিবেশের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ঋতু-বিপর্যয়ে মানুষের মধ্যে ঠেলে উঠে উচ্ছ্বসিত প্রক্ষোভ (emotion) যা কবিতায় প্রকাশিত হবার জন্য জানায় আকুতি এবং তা ছাড়া ভারতীয় সমাজ জীবনে বেশ উঁচুস্তরের নৈতিক চেতনার বিরোধ আছে। কিন্তু কিছুই বাবুর অগভীর মনের উপর প্রভাব ফেলেনি, কারণ না-ভাল, না-মন্দ এমন কলেজের পাঠ-ক্রমে তিনি শিক্ষিত। সুতরাং বাবুর পক্ষে রচনাত্মক লেখার চেষ্টা খোলাখুলি ভাবেই

অনধিকার চর্চা আর তা স্রেফ হাস্যাস্পদও বটে; আর এরই ভিত্তিতে সেই রচনাশৈলী দাঁড়িয়ে যার আমি নাম দিয়েছি 'রাজ-রাজেশ্বরের ইংরেজি'—আর এটা হল সেই জাতীয় ইংরেজি যা আমরা পরিপূর্ণ ভাবে ঘৃণা করি ও চাই তা আমাদের দেশ থেকে নির্বাসিত হ'ক।"

(The King Emperor's English) Mulk Raj Anand.

আজকের দিনে কলকাতার পথে ফেরিওয়ালা চীনাম্যান দেখলে, রাস্তার বয়াটে ছোঁড়ারা যেমন তাকে খেপায়—আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর পরে, কলকাতায় বোম্বাইয়ে দিল্লীতে মান্দ্রাজে—আর ভারতীয় বড়ো বড়ো শহরের আপিসপাড়ায়, হাটেবাজারে—ভ্রাম্যমাণ পথচারী ইংরেজ দেখলে লোকে হাসবে, জাতি-গত বিদ্বেষে নয়, ভাষাগত পার্থক্যে। হয়ত বলবে ইংরেজি এক আজব ভাষা হাসি পায় এই ইংরেজি ক্যাট্‌ম্যাট আর হা-ডু-ডু শুনলে। মায়ের কোলে কিছু সাবালক খোকাবাবু হাততালি দিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলবে: মা, মা, দেখ—একটা শাদা মানুষ। পিতৃলোক হতে বাবুর চতুর্দশ ঊর্ধতন পুরুষে গালে হাত দিয়ে ভাববে—সাতকাণ্ড ইংরেজি রামায়ণী কথার শেষে এই সাব্যস্ত হল, ইংরেজি জানাটাই হাসির; আশ্চর্য। বিলিতি গোরের নিচে, দারুণ অস্বস্তিতে 'মেকির উকিল মেকলে' বারে বারে পাশ বদলাবে, শপথ করবে, শেষে সজল চোখে ধরা গলায় বলবে: What man has made of man.

# বাঙ্গলার গোধন

শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী

আমার এক পশ্চিমপ্রবাসী বন্ধু বলিয়াছিলেন, "প্রথম যখন বাংলাদেশে যাই, তখন আমার বয়স বারো তের বছর। বাংলাদেশের অনেক কিছুই তখন অদ্ভুত ঠেকত। গরুগুলোকে দূর থেকে প্রায়ই ছাগল বলে ভুল করতাম।"

বাংলাদেশের এই ছাগলপ্রতিম গোজাতির কিছু সুরাহা করা সম্ভবপর কি না তারই সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিব। এককালে শুনিতাম, ভারতবর্ষে গৃহপালিত পশু সম্পদ পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ,—আজকাল শুনিতেছি, সে সম্পদ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে গোধনের অবস্থা কি? ছেলেবেলায় একটা সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়াছি:—

'পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্।'

আমাদের গোধনেরও সেই অবস্থা। সংখ্যায় সে ধন কিলবিল করিয়া বাড়িতেছে, কিন্তু দুধের বেলায় এককোঁটা নেই। এ অপ্রিয় সত্যটা কত বড় কঠোর সত্য কলিকাতাবাসী মাত্রই জানেন। এরূপ গোধন বাড়িয়া লাভ কি? লাভ তো নাই-ই বরং লোকসান। আজকালকার দিনে মানুষের খাদ্য যোগানই মুস্কিল, তা এত ফালতু জানোয়ারের খাদ্য কি করিয়া যোগান যাইবে? আর যে খাদ্য তাদের জুটিতেছে, তাহাতে গরুপিছু তিন পোয়ার বেশি দুধ পাওয়া সম্ভব নয়।

গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে সর্বপ্রথম নজর দিতে হইবে তাহার জন্মের উৎকর্ষের দিকে। সে-দিনে বহুসন্তানা একটি মহিলা বাংলাদেশের গরুর সংখ্যার আলোচনায় নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাংলাদেশে শুয়োরের পালের মতো শিশু জন্মায়, না হয় তাদের স্বাস্থ্য, না হয় শিক্ষা; অকাল-মৃত্যু হয় লক্ষ লক্ষ শিশুর। তা সে দেশের জন্তু-জানোয়ারই বা কম যাইবে কেন?" বস্তুতঃ গরুর নিকট হইতে দুধ পাইতে হইলে তাহা ভালো জাতের গরু হওয়া দরকার। ভালো বাছুর পাইতে হইলে ভালো জাতের বৃষ হইতে বাছুর উৎপন্ন করান উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দেশের লোকেরা অত্যন্ত অমনোযোগী। প্রথমতঃ আমাদের দেশে ভালো জাতির ষাঁড়ের একান্ত অভাব। তারপর আবার যেখানে ভালো ষাঁড় পাওয়া যায় তার আশে-পাশের অধিবাসীরাও অনেকে সেই ষাঁড় ব্যবহার করেন না, কারণ তাহা করিতে হইলে হয়তো দুই এক টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। কিন্তু এই সামান্য অর্থ বাঁচাইয়া তাঁহারা যে কয়েকটি পান, তাহা হয়তো পঙ্গু বা কমজোর বা রুগ্ন একটি বৃষের বাচ্চা। তাহার ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ভালো হইবার আশা কিছুই প্রায় থাকে না। এ তো গেল যাহারা সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভাল breeding bull ব্যবহার করান না। কিন্তু এ'দের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বেশির ভাগ লোকেই ভাল বৃষ পান না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নজর দেওয়া উচিত। ১০।১৫টা গ্রামের মানুষেরা যাহাতে অন্ততঃ দুই একটা ভালো বৃষ বৎসপ্রজনন কার্যের জন্য পান, সে ব্যবস্থা করা উচিত।

আর শুধু breeding bull-এর ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। গ্রামের গরুর পালে অপরিণত বয়স্ক বৃষের দল ভাল বৎস উৎপাদনের এক বিষম অন্তরায়। প্রায় দেড় বৎসর বয়সে বৃষের প্রজনন-ক্ষমতা জন্মে। তাহার পূর্বেই সমস্ত এঁড়ে বাছুরগুলিকে 'খাসি' (মুষ্কচ্ছেদন) করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা রুগ্ন কমজোর সন্ততি উৎপাদন করিতে না পারে। আমাদের দেশে কৃষকেরা এ বিষয়ে অত্যন্ত অসতর্ক ও অমনোযোগী। তাহারা এঁড়ে বাছুর অনেক সময় খাসি করে না বা অনেক সময় এত দেরীতে করে যে বাছুরটি তাহার পূর্বেই হয়তো অনেকগুলি সন্ততির জনক হইয়া পড়ে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল আমরা ভুগিতেছি। আমার মনে হয় গভর্নমেণ্টের প্রয়োজন হইলে এমন আইন পাশ করা উচিত যে, যে-কেহ এঁড়ে-বাছুরকে দেড় বৎসরের অধিককাল খাসি না করিয়া রাখিয়া দিবেন, তাহারা আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন। এই প্রকারে অনেক গরুর অকাল-মাতৃত্বও ঘুচিতে পারে। চাষীরা সাধারণতঃ এঁড়ে বাছুরের মুষ্কচ্ছেদন করিয়া দেয় বটে, কিন্তু দেয় দেরীতে। কারণ বৃষ একটু বর্ধিতাঙ্গ হইবার পর তাহার মুষ্কচ্ছেদন করিলে বলদ নাকি ভালো হয়,—অর্থাৎ অধিক কষ্ট সহিষ্ণু ও বলশালী হয়। সুতরাং তাহারা সাধারণতঃই যতটা সম্ভব এ কাজে বিলম্ব করিতে থাকে। তার উপরে আমাদের দেশের লোকেরা 'করি-কচ্ছি' করিয়াও সব কাজেই দেরী করে। ফলে যে অনর্থের পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ঘটিয়া থাকে। যদি এ বিষয়ে আইন পাশ করা হয় এবং সে আইন পালন করাইবার ব্যবস্থা রাজ-সরকার করিতে পারেন তবে এ অনর্থের নিরাকরণ হইতে পারে।

বৃষোৎসর্গের ষণ্ড আমাদের দেশের গরুর আর এক শত্রু। অধিকাংশ 'সূর্যের ষাঁড়'ই দেখিতে মোটাসোটা ও স্বাস্থ্যবান মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রজনন-কার্যে তাহার বেশির ভাগই উপযুক্ত নয়। মুক্ত অবস্থায় আহার, নিদ্রা, মৈথুনে ও যথেচ্ছা ভ্রমণের ফলে সেগুলিকে 'নাদুস-নুদুস' দেখায় মাত্র। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সে বৃষোৎসর্গ আজকাল কম লোকেই করিয়া থাকেন। পুরাকালে উৎসর্গীকৃত বৃষই আমাদের দেশে breeding bull-এর কাজ করিত এবং সেই জন্য শাস্ত্রে যে রকমের বৃষ উৎসর্গ কার্যের জন্য প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহা breeding bull হইবার

অনুপযোগী নয়। কিন্তু শাস্ত্রীয় কাজ আমরা করি বটে, কিন্তু তাহার বিধান অল্পই মানি। দেবতাদের ফাঁকি দিবার জন্য পঞ্চমুদ্রা মূল্যে ষণ্ডদ্বয় ক্রয়পূর্বক উৎসর্গ করিয়া তাহাদের ছাপ মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল,—এমন ব্যাপার আমি একাধিকবার দেখিয়াছি। রাজ-সরকারকে বৃষোৎসর্গ বন্ধ করাইতে বলিয়া হিন্দু সমাজের শত্রুতা করিতে চাই না, কিন্তু উৎসর্গার্থ বৃষ পশু চিকিৎসকের 'সার্টিফাইড' বা অনুমোদিত বৃষ হওয়া দরকার এমন আইন সরকার পাশ করিলে বাধা নাই। আমাদের মনে হয়, এমন আইন হওয়া উচিত।

তারপর রুগ্না গরুরও সন্তান হইতে দেওয়া বন্ধ করা উচিত। এ জন্য গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে পশুশালা খোলা কর্তব্য এবং সেখানে দেশের রুগ্না গাভী সব জড়ো করিয়া বৃষ-সংসর্গরহিত করিয়া রাখা উচিত এবং তাহাদের কোনো মতে বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

শেষোক্ত কথাটি এই জন্য বলিতে হইল যে, হিন্দু জাতি গরুকে জননীর মতো ভক্তি করে বলিয়া শুনি। যদিও গো-জাতির সেবায় হিন্দু যা ত্যাগস্বীকার ও অর্থব্যয় করে তা গো-খাদক ইংরেজ জাতির দশাংশের একাংশও নয়। অন্য যে-কোনো স্বাধীন এবং সুসভ্য দেশে এমন অকর্মণ্য গরু সে দেশের লোকেরা হত্যা করিয়া সেগুলিকে ভরণ-পোষণের ভার কমাইত ও সে সব গরুর চামড়া চালান দিয়া ব্যবসা করিত। কিন্তু এদেশে যে গরু মাতার সমান। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটা পুরানো গল্প মনে পড়িল। ভারতের পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণকালে 'গো-মাতা' রক্ষার জন্য সাহায্যার্থী জনৈক গো-শালা রক্ষক তাঁহার কাছে অর্থভিক্ষা করিয়াছিল। তখন উত্তরে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন,—গো-মাতার সন্তান আপনারা, আপনারাই এ কার্যে অর্থ-ব্যয় করিবেন, আমার অর্থ-সামর্থ্য মানুষের সেবার জন্য। যাহাই হউক, গরু মারা বিদ্যা আমরা কাহাকেও শিখাইতে চাহি না। উপরোক্ত প্রথা অবলম্বনে এ বিষয়ে সকলে মিলিয়া অবহিত হইলে ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে বাংলার রুগ্ন গোধন সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে।

আমি পশ্চিমপ্রবাসী বাঙালী। এ দেশের সাধারণ গরু আট দশ সের এবং ভাল গরু আধ মণ পর্যন্ত দুধ দেয়। ভাল মহিষ তো একমণের উপর দুধ দেয়। ইহা বাঙালীর পক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করাও মুস্কিল। কিন্তু এদেশের গরু-মহিষের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। এতদিন না হয় একটা অজুহাত ছিল, আমাদের হাত-পা বাঁধা, আমরা পরাধীন জাতি। কিন্তু, এখন তো আর তাহা বলা চলিবে না। আমাদের জাতিকে বাঁচিতে হইলে ভাল খাদ্য চাই। আর খাদ্য-পানীয়ের মধ্যে সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? দুগ্ধ। আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলে "দুগ্ধং অমৃতং।" ইংরেজরাও বলেন,—Milk is the perfect food. শিশুরা দুগ্ধপান না করিলে ক্যালসিয়াম-এর অভাব-জনিত রোগে আক্রান্ত হয়। বাংলায় যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা যে দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে, দুগ্ধাভাব নিশ্চয়ই তাহার অন্যতম কারণ। বাংলার দুধ চাই। তাহার দুগ্ধ ভাণ্ডার বাড়াইতে হইলে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে যে কথা বলিলাম, সে বিষয়ে আমাদের নজর দেওয়া কর্তব্য।

শেষ কথা এই যে, গরুকে 'মাতা' বলিলেই চলিবে না, মাতার মতো সেবাও তাহাকে দিতে হইবে। সেবায় যে গাভীর দুগ্ধদান ক্ষমতা কত বাড়িতে পারে, তাহার প্রমাণ আমি বহু দেখিয়াছি। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ পঁচিশ টাকা দিয়া দিল্লী শহরে —অবশ্য যুদ্ধের পূর্বে একটি সবৎসা গাভী কিনিয়াছিলেন। গরুটি তখন রোজ মাত্র চার সের দুধ দিত। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর সেবায় দুই মাসের মধ্যেই গরুটি আট সের করিয়া দুধ দিতে থাকে। সুতরাং গাভীকে যথাযথ যত্ন করিলে আমরা শতকরা একশত ভাগ দুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে পারি। আমাদের মনে আছে কিছুদিন পূর্বে বৃটিশ সরকারের আমলে—গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগ Drink more milk campaign বা "আরো দুধ খাও" অভিযান চালাইয়াছিলেন। বৃটিশ সরকারের আমলে এই রকম প্রহসন প্রায়ই চলিত। দেশে নাই দুধ, কিন্তু "আরো খাও দুধ, আরো খাও" রবে দেশ কাঁপাইয়া তোলা হইল। কিন্তু স্বরাজের আমলে তো এমনটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। গো-মাতা বলিয়া যদি সত্যই গরুকে আমরা আদর করি তো যথাযথরূপে গরুর সেবা-যত্ন করা আমাদের উচিত এবং যেরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে গো-জাতির উন্নতি হয়, সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া গভর্নমেণ্টের কর্তব্য।
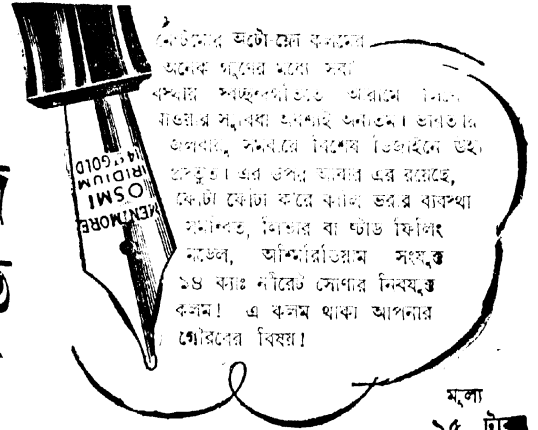
**বিশ্ববার্তা** (রবীন্দ্র সংখ্যা)—১ম বর্ষ,; শনিবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৫। মূল্য চারি আনা। বিশ্ববার্তা প্রেস, ৪৪।৪ গরচা রোড, কলিকাতা—১৯।

'বিশ্ববার্তা' সাপ্তাহিক পত্রিকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইহার সম্পাদক। পত্রিকাটির আলোচ্য সংখ্যা রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যারূপে বাহির হইয়াছে। বিশ্বকবির প্রতি সম্পাদক ও লেখকদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধুশেখর শাস্ত্রী, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় পত্রিকাটি সুসমৃদ্ধ। অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্র শোভিত হওয়ায় ইহার গৌরব আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে সর্বত্র সম্পাদকের সৌখিন রুচির সহিত আমাদের রুচির মিল হইল না, এই দুঃখটুকু রহিয়া গেল।

আমরা পত্রিকাটির উন্নতি ও ব্যাপক প্রচার কামনা করি। ১১৭।৪৮

**চলচ্চিত্র**—বীরেন দাশ; প্রকাশক—ভারত বুক এজেন্সী, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

আধুনিক যন্ত্রযুগে আমোদ প্রমোদের মধ্যে চলচ্চিত্রের স্থান সর্বাগ্রে। চলচ্চিত্র দেখে আনন্দ পান না এ যুগে এরকম লোক দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। দিন যত এগুবে আমাদের দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রচার ও প্রসার তত বাড়বে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। দুঃখের বিষয় বাঙলা দেশে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সাধারণ দর্শকদের জ্ঞান অত্যন্ত সামান্য। তার কারণ বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বইয়ের একান্ত অভাব। বিদেশী ভাষায় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে লেখা অনেক বই আছে। কিন্তু আমাদের দেশে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি সংবাদ সাময়িক পত্রিকা থাকলেও কোন বই নেই। এইসব সাময়িক পত্রিকায় প্রচলিত ছবি নিয়ে আলোচনা হয়, কিন্তু চলচ্চিত্রের শিল্পের দিক সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাদের জ্ঞান বাড়াবার কোন চেষ্টা করা হয় না। অথচ চিত্রশিল্পের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে দর্শকদের জ্ঞান যত বাড়বে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষে উন্নতি হবার সম্ভাবনাও তত বেশী।

শ্রীযুক্ত বীরেন দাশের "চলচ্চিত্র" গ্রন্থখানি [illegible] দিক থেকে বাঙালী দর্শকদের একটি বড় অভাব মেটাতে সাহায্য করবে বলে মনে হয়। কিভাবে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় তার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বীরেনবাবু এই গ্রন্থে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন। প্রধানত সাধারণ পাঠক ও দর্শকদের সম্মুখে রেখেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে সর্বপ্রকার জটিলতা সযত্নে পরিহার করে গেছেন। পর্দার গায়ে আমরা যে ছবি চলতে দেখি তা নির্মাণের জন্য চিত্র নির্মাতাদের কি কি করতে হয় তার সম্যক পরিচয় আছে এ গ্রন্থে। বীরেনবাবু নিজে দীর্ঘদিন চিত্রনির্মাণ শিল্পের সঙ্গে বিজড়িত আছেন বলে তাঁর আলোচনার মধ্যে আছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ—এ শুধু বই পড়ে অর্জিত জ্ঞানের উদ্গার নয়। চলচ্চিত্র নির্মাণ কৌশলের পরিচয় জানতে এ গ্রন্থখানি যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে মনে হয়। বীরেনবাবুর ভাষা প্রাঞ্জল ও বর্ণনাপদ্ধতি মনোজ্ঞ। বইখানির ভূমিকা লিখেছেন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রপরিচালক শ্রীনিরঞ্জন পাল। গ্রন্থখানিতে কতকগুলি ছবি দেওয়া হয়েছে—তবে ছবির সংখ্যা আরও বেশী হলে ভাল হত। মাঝে মাঝে ছাপার ভুলও

চোখে পড়ল। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এসব ত্রুটি সংশোধিত হবে। ১১৬।৪৮

**অগ্নিশিখা**—শ্রীপ্রভাত বসু প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এইরূপ দশজন মহিলার জীবনকথা সংক্ষেপে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গীয় কস্তুরবা গান্ধী, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ দেশবরেণ্য নেত্রীবর্গের সাথে সাথে এমন কয়েকজন মহীয়সী মহিলার জীবনকাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে যাঁহারা দীর্ঘকাল দেশের নেতৃত্ব না করিলেও দেশমাতৃকার আহ্বান-মুহূর্তে মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণ দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। মাতঙ্গিনী হাজরা, কনকলতা, রত্নমালা, প্রীতি ওয়াদ্দাদার প্রভৃতি যাঁহারা আগষ্ট বিপ্লবে প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদেরও পরিচয় বইটিতে পাওয়া যাইবে। রচনাগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। —১২০।৪৮

**নিশাচর**—পাক্ষিক পত্র। শ্রীসুজাতা দেবী ও [illegible] চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কার্যালয়, ২১ [illegible] লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে ছয় টাকা।

নিশাচরের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা পাইলাম। ইহাতে একটি ক্রমশ প্রকাশ্য ও একটি সম্পূর্ণ রচনা আছে। রচনাগুলি রহস্যকাহিনী বিষয়ক। ডিটেকটিভ কাহিনী পরিবেশনই পত্রখানার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইল। ১২১।৪৮

**কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন ও ডাঃ কোটনীস**—শ্রী[illegible] প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

জাপানের নিকট বহু বৎসর নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে; একদা বিদেশীর নির্যাতিত ভারতবাসীর চীনের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত হইয়াছে। উহাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিতে ভারত তাহার সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কংগ্রেস অ্যাম্বুলেন্স প্রেরণ এবং পরাধীন ভারত হইতে মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ ভারতের উদারতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। চীনের জেনারেল চু-তের আবেদনে পণ্ডিত নেহরু যে সাড়া দেন, তদনুযায়ী ১৯৩৮ সালে ডাঃ অটলের নেতৃত্বে মেডিক্যাল মিশন চীন অভিমুখে গমন করে। ডাঃ কোটনীস সেই মেডিক্যাল মিশনের একজন সাধারণ সদস্য ছিলেন, কিন্তু নিজের প্রাণ দিয়া তিনি অসাধারণ কর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ ও আদর্শপ্রীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। চীন রণাঙ্গনে তাঁহার অক্লান্ত কর্মধারার কাহিনী ও আনুষঙ্গিক বিবরণ বইটিতে বেশ মর্মস্পর্শী-ভাবে দেওয়া হইয়াছে। ১১৯।৪৮

**জ্ঞান ও বিজ্ঞান**—সম্পাদক—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র; ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা; বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে নয় টাকা।

এই বৈজ্ঞানিক পত্রিকাখানি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত। উক্ত পরিষদের সভাপতি বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি প্রচুর নহে, বৈজ্ঞানিক পত্রিকাও অপ্রচুর। এই পত্রিকা বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে হয়, কারণ অধ্যাপক বসু ইহার কর্ণধার। পত্রিকার যে তিন সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি লেখকের রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। তৃতীয় সংখ্যার 'বর্তমান খাদ্য ও অর্থ সমস্যার স্থান' প্রবন্ধে হাঁস মুরগী পালনের দ্বারা খাদ্যাভাবের সমস্যা কিভাবে আংশিক সমাধান করা যায় তাহার উল্লেখ আছে। তৃতীয় সংখ্যার অধ্যাপক বসুর 'শক্তির সন্ধানে মানুষ' প্রবন্ধ পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অনায়াসে সরল স্বচ্ছ বাঙলায় লিখিতে পারা যায়। যাঁহারা মনে করেন যে বাঙলা ভাষা এখনো বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অনুপযোগী—তাঁহারা এই প্রবন্ধটি হইতে দিগদর্শন পাইবেন। আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বহুল প্রচার কামনা করি। ১২৯।৪৮

**টলস্টয়ের স্মৃতি**—ম্যাক্সিম গোর্কী। অনুবাদক—শ্রীঋষি দাস। প্রকাশক—ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গোর্কীর এই স্মৃতিকথা বিষয়ক বইখানি একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক রচনা। রাশিয়ার এই দুই দিক্‌পালের মধ্যে কথাবার্তার মাধ্যমে যে সমস্ত ভাবের আদানপ্রদান হয়, তাহারই টুকরা বিবরণ গোর্কী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন এবং পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টির নানা কৌতূহলোদ্দীপক দিক ও জীবনের নানা সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ খুঁটিনাটি এই সমস্ত আলোচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিল্প ও সাহিত্যের সমসাময়িক ভাবধারার আভাসও এই আলোচনায় পাওয়া যাইবে। এই রচনাটির মধ্যে তাঁহাদের উভয়ের মন ও ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপ একখানা উৎকৃষ্ট রচনা বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। অনুবাদকের ভাষা ঝরঝরে; কোথাও জটিলতা বা অস্পষ্টতা নাই। বইখানার মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং প্রচ্ছদপট সুরুচির পরিচায়ক। ৮৯।৪৮

**পনেরোই আগস্ট**—শ্রীনরেন্দ্র সেন প্রণীত। প্রকাশক—দি সিটি বুক কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ভারতের ইতিহাসে পনেরোই আগস্ট দিনটি চিরস্মরণীয়। এই দিন ভারতের দুই শত বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি অপনোদিত হইয়াছে এবং দেশের জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে তার শাসনভার প্রত্যর্পিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে এই দিনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া ইংরাজদের ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বাপর ইতিহাস যথাযথভাবে বিবৃত হইয়াছে। ভারত বিভাগের ইতিকথা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ, ক্রিপস্‌ মিশন, আগস্ট আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, মন্ত্রিমিশনের ভারতে আগমন ও তাঁহাদের প্রস্তাব, মোস্‌লেম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ও লীগের অন্তর্ভুক্তি, প্রদেশ বিভাগের প্রস্তুতি ও বড়লাটের ঘোষণা—প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার এই বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতীয় আন্দোলন ও লীগের অভ্যুদয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে গণপরিষদ ও স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র এবং ভারতবর্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমকালীন ইতিহাস হিসাবে বইটি সকলেরই বিশেষ কাজে আসিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বইটির মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট উত্তম। ২৮৪।৪৭

## মধ্যভারত ইউনিয়নের উদ্বোধন
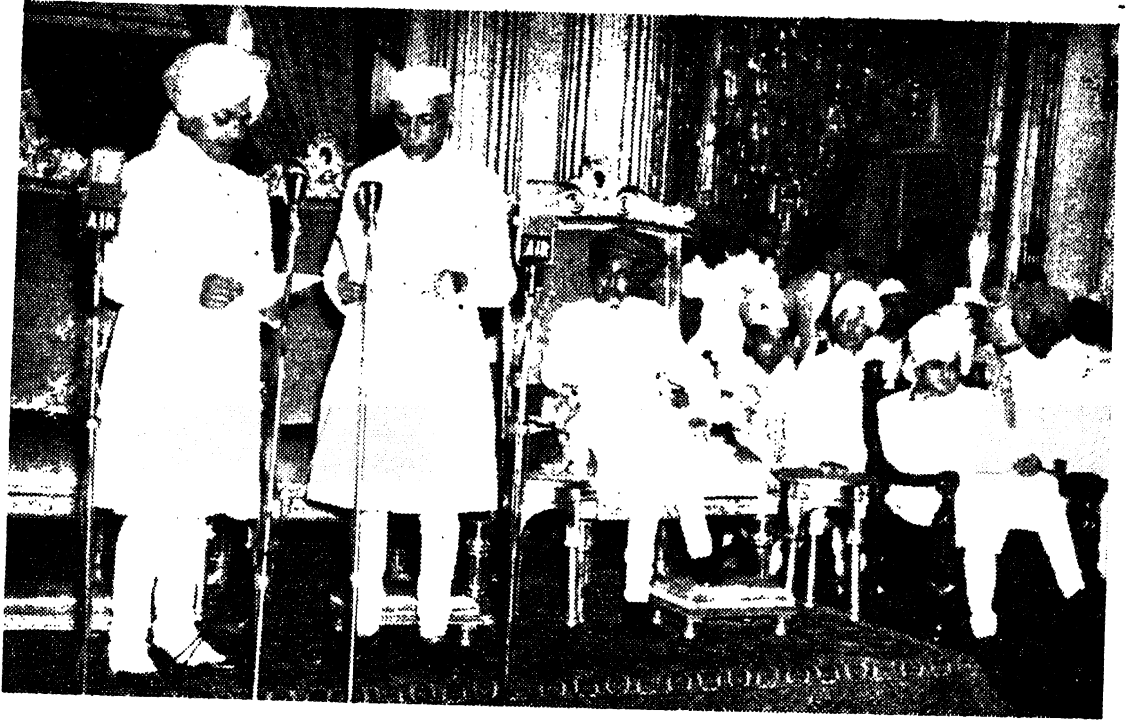
মধ্যভারত ইউনিয়নের উদ্বোধন উপলক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গোয়ালিয়রে রাজপ্রমুখ গোয়ালিয়রের মহারাজাকে কার্যভার গ্রহণের শপথ পাঠ করাইতেছেন। মালবের ২২টি রাজ্য লইয়া গঠিত এই ইউনিয়নের আয়তন প্রায় ৪৮০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৭০ লক্ষেরও বেশী এবং বাৎসরিক রাজস্ব নয় কোটি টাকা।
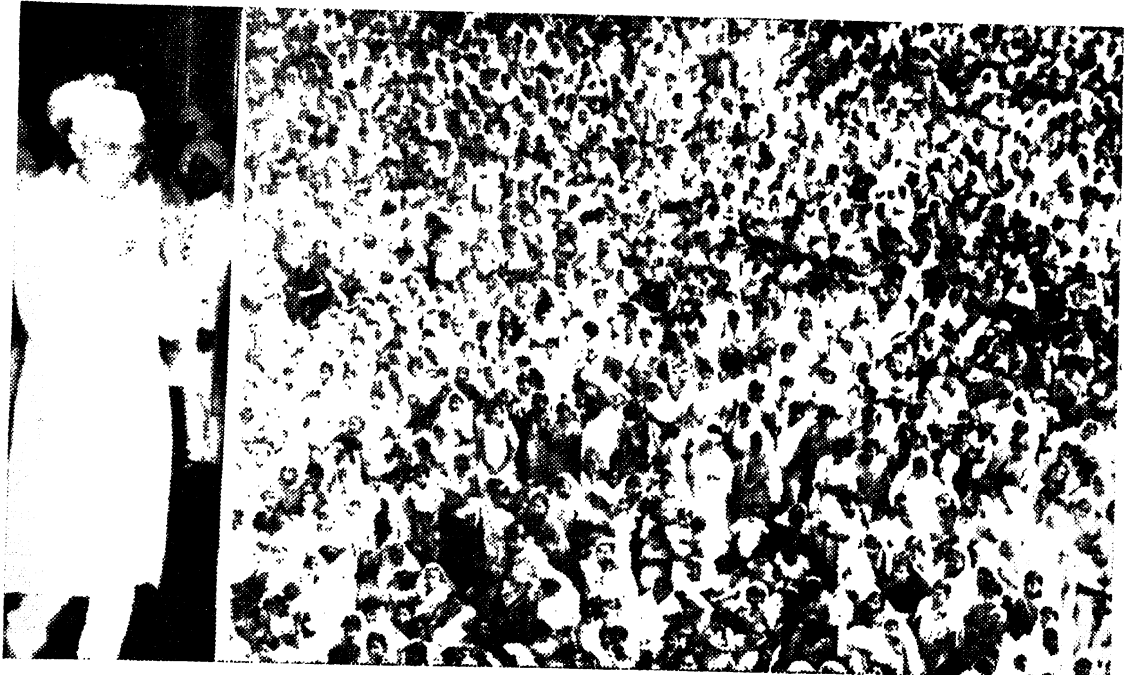
মধ্যভারত ইউনিয়নের উদ্বোধন উপ লক্ষে গোয়ালিয়রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমাগত

# মধ্যভারত ইউনিয়ন

বৃটিশ আজ ভারতবর্ষকে প্রধান দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা তার কূটনীতির পরাকাষ্ঠা হইলেও এ নীতিতে নূতনত্ব নাই। পৌনে দুই শত বৎসরের শাসনে এই নীতিই ছিল তার উপজীব্য। এদিকে বৃটিশ ভারতে' সাম্প্রদায়িক অনৈক্যে উস্কানি

গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া

দিয়াছে, ওদিকে 'অবশিষ্ট ভারতে' দেশীয় রাজ্যসমূহ শত শত সামন্ত শাসনকে সযত্নে অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল রাজ্যের জনসাধারণ নিশ্চেষ্ট থাকে নাই; ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও স্বৈরশাসনমুক্তির আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস চাহিয়াছিল সর্ব ভারতের জনগণের স্বাধীনতা। বৃটিশ শাসনের অবসানে ভারতের গণপ্রতিনিধিদের হাতে যেমন ক্ষমতা আসিয়াছে তেমনি দেশীয় রাজ্যসমূহেও ক্ষমতা জনগণের হস্তেই ন্যস্ত হউক এবং স্বৈরশাসনের অবসান হউক, স্বাধীন ভারতের গভর্নমেণ্ট ইহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন এবং অগোণে এই নীতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য সামন্ত নৃপতিদিগকে আহ্বান জানান। অনেকে বিনা দ্বিধায় এই আহ্বানে সাড়া দিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেন এবং কেহ কেহ দ্বিধাভরে দূরে দাঁড়াইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাট দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাজ্যখণ্ডগুলিতে আজিকার দিনে স্বাধীন থাকার নামে স্বৈরাচার চালাইয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি ইহাদের এই তথাকথিত স্বাধীনতা তাহাদের ও ভারতের উভয়ের পক্ষে বিপজ্জনক। সুখের বিষয়, দেশীয় নৃপতিবর্গের চোখ উন্মীলিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। দলে দলে তাঁহারা ভারত ইউনিয়নে যোগদান করিয়া প্রজা-প্রীতি ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দিতেছেন। অধিকসংখ্যক ঘনসন্নিবদ্ধ দেশীয় রাজ্যগুলির সম্মিলিত ইউনিয়ন গঠন করিয়া ভারতের সহিত যুক্ত হওয়ার একাধিক যে উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে তাহা আরও সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিছুদিন পূর্বে পূর্ব পাঞ্জাবের ঊনত্রিশটি রাজ্যের শাসনকর্তা মিলিয়া হিমাচল প্রদেশের সৃষ্টি করেন এবং ভারতের সহিত মিলিত হন। এই প্রদেশের পরিমাণফল এগার হাজার বর্গ-মাইল ও লোকসংখ্যা দশ লক্ষ। তারও পূর্বে রাজস্থানের রাজ্যসমূহ মিলিয়া রাজস্থান ইউনিয়ন গঠন করেন এবং ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেন। এ পর্যন্ত উহাই ছিল সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন।

কিন্তু সম্প্রতি বাইশটি মালব রাজ্য মিলিয়া যে ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে তাহা ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে লিখিত থাকিবে। উহা গোয়ালিয়র-ইন্দোর-মালব ইউনিয়ন বা মধ্যভারত ইউনিয়নরূপে অভিহিত। ইহা দেশীয় রাজ্যসমূহের বৃহত্তম ইউনিয়ন। ইহা বাইশটি রাজ্যের সমষ্টি; ইহার পরিমাণফল ৪৮০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা সত্তর লক্ষের উপর; বার্ষিক রাজস্ব নয় কোটি টাকা উত্থিত হয়। ইহার পরেই রাজস্থান ইউনিয়নের স্থান—উহার পরিমাণফল ৩০০০০ বর্গমাইল।

মালব অঞ্চলের ভূপাল একটি প্রধান রাজ্য। উহা এখনও ইউনিয়নে যোগদান করে নাই; তবে সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই রাজ্যটি ১লা জুলাই নাগাদ ইউনিয়নে যোগ দিয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এই মধ্যভারত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকে নেতৃবৃন্দ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে করেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইউনিয়নটির উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ২৮শে মে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। উদ্বোধন বক্তৃতায় পণ্ডিতজী বলেন: "ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যার সমাধানে প্রজাবর্গ, নৃপতিবর্গ এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার ভাব দেখাইয়াছেন তাহা শুভলক্ষণ এবং ভবিষ্যতের পক্ষে আশার কথা। এই ইউনিয়ন গঠনে ভারত ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইল। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমরা এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভারতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম। ঐ চিত্রের এক অংশে যুক্ত ছিল দেশীয় রাজ্যসমূহ; সুখের বিষয়, ঐ অংশ আমাদের আশাতীত স্বল্পকালের মধ্যেই বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। রাজা-প্রজার সদ্ভাব ও সহযোগের মধ্য দিয়াই উহা সম্ভব হইল।"

মধ্যভারত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা উৎসবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উপস্থিত থাকিতে

**ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এবং মধ্যভারত ইউনিয়নের রাজপ্রমুখ গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া।**

**মধ্যভারত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত লীলাধর যোশী**

পারেন নাই; কিন্তু তিনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ঃ মালব ইউনিয়নের উদ্বোধনে আজ দীর্ঘকালের এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল। মালবদেশ সুপ্রাচীন কাল হইতে ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সব দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এখানে আড়ম্বর, গৌরব ও মহত্ত্বের বহু দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এখানে যে-সকল হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরব কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি সমুজ্জ্বল। শত শত বৎসর পর মালবদেশ আবার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সমৃদ্ধির পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

মালব দেশ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া শত শত নৃপতির পতন ও অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বহু বহু রাজ্যের উত্থান ও বিলয় ঘটিয়াছে। রাজতন্ত্র এখানে অতীতে প্রজার মঙ্গল উপেক্ষা করিয়া নগ্ন হইয়া উঠে নাই। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আদর্শ রাজা ছিলেন এই দেশেরই নরপতি। তাঁহার কীর্তি ও মহানুভবতার কাহিনী এ দেশের প্রত্যেকটি নিভৃত পল্লীতেও প্রচলিত আছে। তাঁহার দয়া ও দাক্ষিণ্য উপলক্ষ্য করিয়া শত শত রূপকথা কিংবদন্তি দেশের সর্বত্র আজিও সুপ্রচলিত।

বস্তুতঃ এযুগের ন্যায়, পূর্বে সামন্ততন্ত্রে বোধ হয় এত স্বৈরাচার ছিল না। যদি থাকিত, তবে অতীতের আদর্শ নরপতিবৃন্দ মানুষের মনে এতখানি শ্রদ্ধার আসন লাভ করিতে পারিতেন না। বৃটিশ শাসনের পাশাপাশি থাকিয়াই না সামন্ততন্ত্র অধুনা অতখানি অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। এখন স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়ায় স্বৈরাচারের দূষিত ক্লেদ হইতে মুক্তিস্নান করিয়া নৃপতিবৃন্দ প্রজাদেরই পাশে দাঁড়াইবার প্রেরণা পাইয়াছেন। নৃপতিবর্গ একদিন রাজমুকুট স্বেচ্ছায় নামাইয়া রাখিয়া প্রজাদেরই কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইবে, তাহাদের সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবে—স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিতর আমরা তাহারই ইংগিত পাইতেছি।

এই সকল বড় বড় দেশীয় রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ভারতের শক্তি ও সম্পদ যে সমধিক বৃদ্ধি পাইবে, ভারতের যশ ও গৌরবের পথ যে সমধিক সুগম হইবে এ আশা অবশ্যই করা যায়। মধ্য ভারত ইউনিয়নের উদ্বোধন বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু বিশেষ সন্তোষের সহিত এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ সামন্ততন্ত্রের বেড়া জালে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশাল ভারতের মুক্ত বক্ষে স্বাধীনতার নিঃশ্বাসই কেবল গ্রহণ করিবে না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মধারাকে নিয়োজিত করিয়া দেশকে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ করারও সুযোগ পাইবে।

গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া এই ইউনিয়নের রাজপ্রমুখ এবং ইন্দোরের মহারাজা উপ-রাজপ্রমুখ নির্বাচিত হইয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সমক্ষে তাঁহারা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। বিশেষ জাঁকজমকের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন শ্রীলীলাধর যোশী। তাহা ছাড়া, এই ইউনিয়নের অন্যান্য সাতজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন,—তাঁহাদের নাম শ্রী রাধে ব্যাস (গোয়ালিয়র), শ্রী তাখতমল জৈন (গোয়ালিয়র), শ্রী জগমোহন লাল শ্রীবাস্তব (গোয়ালিয়র), শ্রী যশোবন্ত সিং কুশওয়া (গোয়ালিয়র); শ্রী নন্দলাল যোশী (ইন্দোর), মিঃ হামিদ আলী (রাজগড়) এবং শ্রী কাশীনাথ ত্রিবেদী (বারওয়ানী)। ৪ঠা জুন গোয়ালিয়রের গান্ধী হলে অনুষ্ঠিত এক দরবার সভাতে উক্ত সাতজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। গোয়ালিয়রের মহারাজার তত্ত্বাবধানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। সভাতে মহারাজা ঘোষণা করেন যে, অদ্য হইতে তিনি নিজেকে জনসেবারূপে নিয়োজিত করিবেন।
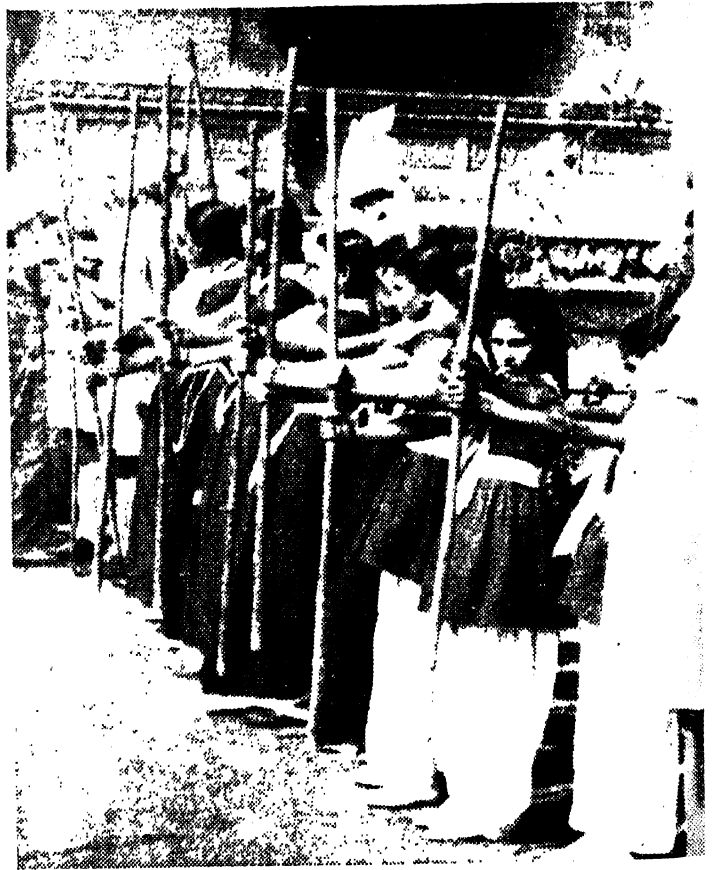
**গোয়ালিয়রের স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী পণ্ডিতজীকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন...... জানাইতেছেন!**

# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

( ২২ )

**মুইন-উস-সুলতানে** বা যুবরাজ রাজা না হয়ে ছোট ছেলে কেন রাজা হল সে-সমস্যার সমাধান করতে হলে একটু পেছিয়ে এ-শতকের গোড়ায় পৌঁছতে হয়।

বাঙালী পাঠক এখানে একটু বিপদগ্রস্ত হবেন। আমি জানি, বাঙালী—তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন—আরবী ফার্সী মুসলমানী নাম মনে রাখতে বা বানান করতে অল্পবিস্তর কাতর হয়ে পড়েন। একথা মনে রেখেই এতক্ষণ যতদূর সম্ভব কম নাম নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি—বিশেষত আনাতোল ফ্রাঁসের মত গুণী যখন বলেছেন, 'পাঠকের কাছ থেকে বড্ড বেশী মনোযোগ আশা করো না। আর যদি মনস্কামনা এই হয় যে তোমার লেখা দু'শ বছর পেরিয়ে গিয়ে পরবর্তী যুগে পৌঁছুক তাহলে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো।' আমার সে-বাসনা নেই, কারণ ভাষা এবং শৈলী সম্বন্ধে আমার অক্ষমতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন। কাজেই যখন ক্ষমতা নেই, বাসনাও নেই তখন পাঠকের নিকট ঈষৎ মনোযোগের আশা করতে পারি। মৌসুমি ফুলই সুযোগ চায় বেশী; দু'দিনের অতিথিকে তোয়াজ করতে মহা কঞ্জুসও রাজী হয়।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন আফগানিস্থানের কর্তা বা আমীর ছিলেন হবীবউল্লা। তাঁর ভাই নসরউল্লা মোল্লাদের এমনি খাস পেয়ারা ছিলেন যে, বড় ছেলে মুইন-উস-সুলতানে তাঁর মরার পর আমীর হবেন এ ঘোষণা হবীবউল্লা বুকে হিম্মৎ বেঁধে করতে পারেন নি। বরঞ্চ দুই ভায়ে এই নিষ্পত্তিই হয়েছিল যে, হবীবউল্লা মরার পর নসরউল্লা আমীর হবেন, আর তিনি মরে গেলে আমীর হবেন মুইন-উস-সুলতানে। এই নিষ্পত্তি পাকা-পোক্ত করার মতলবে হবীবউল্লা, নসরউল্লা দুই ভাইয়ে মীমাংসা করলেন যে, মুইন-উস-সুলতানে নসরউল্লার মেয়েকে বিয়ে করবেন। হবীবউল্লা মনে মনে বিচার করলেন, আর যাই হোক, নসরউল্লা জামাইকে খুন করে 'দামাদ-কুশ' (জামাতাহন্তা) আখ্যায় কলঙ্কিত হতে চাইবেন না। ঐতিহাসিকদের স্মরণ থাকতে পারে, জয়পুরের রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে জামাই দিল্লীর বাদশাহ ফররুখ সিয়রকে নিহত করেন তখন দিল্লীর ছেলে-বুড়োর 'দামাদ-কুশ' 'দামাদ-কুশ' চীৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষটায় তিনি দিল্লী ছাড়তে বাধ্য হন। রাস্তার ডেঁপো ছোঁড়ারা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিঙের পাল্কির দু'পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলত আর সেপাই-বরকন্দাজের তম্বি-তম্বাকে বিলকুল পরোয়া না করে তারস্বরে ঐক্যতানে 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ' বলে অজিত সিংকে ক্ষেপিয়ে তুলত।

হবীবউল্লা, নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতানে তিনজনই এ চুক্তিতে অল্পবিস্তর সন্তুষ্ট হলেন। একদম নারাজ হলেন মাতৃহীন মুইন-উস-সুলতানের বিমাতা। ইনি আমানউল্লার মা, হবীবউল্লার দ্বিতীয় মহিষী। আফগানিস্থানের লোক এঁকে রাণী-মা বা উলিয়া হজরত নামে চিনত। এঁর দাপটে আমীর হবীবউল্লার মত দুর্দান্ত কুরবানির বকরি অর্থাৎ বলির পাঁঠার মত কাঁপতেন। একবার গোসা করে রাণী-মা যখন নদীর ওপারে গিয়া তাঁবু খাটান তখন হবীবউল্লা কোনো কৌশলে কিনারা না লাগাতে পেরে শেষটায় এপারে বসে পাগলের মত সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা মেখে তাঁর সনঙ্-দিল বা পাষাণ হৃদয় গলাতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাণী-মা স্থির করলেন, এই সংসারকে যখন ওমর খৈয়াম দাবাখেলার ছকের সঙ্গে তুলনা করেছেন তখন নসরউল্লা এবং মুইন-উস-সুলতানের মত দুই জবর খুঁটিকে ঘায়েল করা আমানউল্লার মত নগণ্য বড়ের অসম্ভব নাও হতে পারে; তার পক্ষেই বা রাজা হওয়া অসম্ভব হবে কেন?

এমন সময় কাবুলের সেরা খানদানী বংশের মুহম্মদ তর্জী সিরিয়া নির্বাসন থেকে দেশে ফিরলেন। সঙ্গে পরীর মত তিন কন্যা, কাওকাব, সুরাইয়া আর বিবি খুর্দ। এঁরা দেশবিদেশ দেখেছেন, লেখাপড়া জানেন, রুজ-পাউডার ব্যবহারে ওকিব-হাল; এঁদের উদয়ে কাবুল কুমারীদের চেহারা অত্যন্ত ম্লান, সেকেলে, 'অমার্জিত' বা 'অনকালচরড' (আজ জংলী বা আমেদহ্‌=যেন জংলী। মনে হতে লাগল।

হবীবউল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমানউল্লার মা—যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী কিন্তু মুইন-উস-সুলতানের মাতার মৃত্যুতে প্রধানা মহিষী হয়েছেন—এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করলেন। অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজনকে পই পই করে বুঝিয়ে দিলেন, যে করেই হোক মুইন-উস-সুলতানেকে তর্জীর বড় মেয়ে কাওকাবের দিকে আকৃষ্ট করাতেই হবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে কানাচে দু'একটা কামরা বিশেষ করে খালি রাখা হল। সেখানে কেউ যেন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হয়।

খানাপিনা চলল, গানাবাজানায় রাজবাড়ি সরগরম। রাণী-মা নিজে মুইন-উস-সুলতানেকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর কাওকাবকে ফিস ফিস করে কানে কানে বললেন, 'ইনিই যুবরাজ, আফগানিস্থানের তখ্‌ৎ একদিন এঁরই হবে। কাওকাব বুদ্ধি-

মতী মেয়ে, ক' সের গমে ক' সের ময়দা হয় জানতেন, আর না জানলেই বা কি, ভগবান শঙ্করাচার্য তরুণতরুণীর প্রধান বৃত্তি সম্বন্ধে যে মোক্ষম তত্ত্ব বলেছেন সে রাজপ্রাসাদেও খাটে।
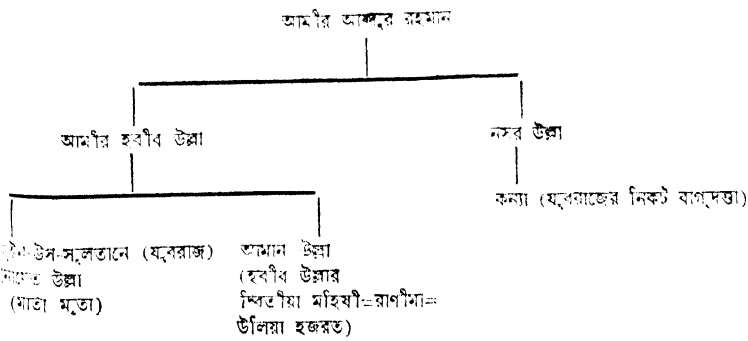
প্ল্যানটা ঠিক উতরে গেল। বিশাল রাজ-প্রাসাদে ঘুরতে ঘুরতে মুইন-উস-সুলতানে কাওকাবের সঙ্গে পুরীর এক নিভৃত কক্ষে বিশ্রম্ভালাপে মশগুল হলেন। মুইন ভাবলেন, খুশ-এখতেয়ারে নিভৃত কক্ষে ঢুকেছেন (ধর্ম-শাস্ত্রে যাকে বলে ফ্রীডম অব উইল), রাণী-মা জানতেন, শিকার জালে পড়েছে (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে প্ল্যান্‌ড্ ডেসটিনি)।

প্ল্যানমাফিকই রাণী-মা হঠাৎ যেন বেখেয়ালে সেই কামরায় ঢুকে পড়লেন। তরুণতরুণী একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালেন। রাণী-মা সোহাগ মেখে অমিয়া ছেনে সতীনপোকে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার মা নেই, আমিই তোমার মা। তোমার সুখদুঃখের কথা আমাকে বলবে না তো আর কাকে বলবে? তোমার বিয়ের ভার তো আমার কাঁধেই। কাওকাবকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তবে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? তর্জীর মেয়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়ে তো কাবুলে আর নেই। তোমার দিল কি বলে?'

দিল আর কি বলবে? মুইন তখন ফাটা বাঁশের মাঝখানে।

দিল যা বলে বলুক। মুখে কি বলেছিলেন সে সম্বন্ধে কাবুলে চারণরা পঞ্চমুখ। কেউ বলেন, মৌনতা দিয়ে সম্মতি দেখিয়েছিলেন; কেউ বলেন, মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ, জানতেন, নসরউল্লার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে; কেউ বলেন, মিনমিন করে সম্মতি জানিয়েছিলেন, কারণ ঠিক তার এক লহমা আগে ভালোমন্দ না ভেবে কাওকাবকে প্রেমনিবেদন করে বসেছিলেন—হয়ত ভেবেছিলেন, প্রেম আর বিয়ে দু জাতের মাথা-ধরা—এখন এড়াবেন কি করে; কেউ বলেন, শুধু 'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' করেছিলেন, তার থেকে হস্ত-নাস্ত ('হাঁ-না', যে কথা থেকে বাঙলা 'হেস্তনেস্ত' বেরিয়েছে) কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না; কেউ বলেন, তিনি রামগঙ্গা ভালো করে কিছু প্রকাশ করার আগেই রাণী-মা কামরা ছেড়ে চলে গিয়ে-ছিলেন।

অর্থাৎ কাবুল চারণদের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

মোদ্দা কথা এই, সে অবস্থায় আমীর হোক ফকীর হোক, ঘুঘু হোক আর কবুতর হোক্ আর পাঁচজন গুরুজনের সামনে পড়লে যা করে থাকে বা বলে থাকে মুইন-উস-সুলতানে তাই করেছিলেন।

কিন্তু কি বলেছিলেন সে কথা জানার যত না দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী জানা দরকার রাণীমা মজলিসে ফিরে গিয়ে সে বলা বা না-বলার কি অর্থ প্রকাশ করলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের টেক্সট্ বুক কি বলে না বলে সেটা অবান্তর, জীবনে কাজে লাগে বাজারের গাইডবুক।

রাণীমা পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও যখন তামাম আফগানিস্থান তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেত তখন মজলিসের হর্ষোল্লাস যে তাঁর গলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল তাতে আর কি সন্দেহ? রাণীমা বললেন, 'আজ বড় আনন্দের দিন। আমার চোখের জ্যোতি (নুর-ই-চশম) ইনায়েতউল্লা খান, মুইন-উস-সুলতানে তর্জী-কন্যা কাওকাবকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন। খানা-মজলিশ দুটোর সময় ভাঙবার কথা ছিল, সে বন্দোবস্ত বাতিল। ফজরের নমাজ (সূর্যোদয়) পর্যন্ত আজকের উৎসব চলবে। আজ রাত্রেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি।

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলে উঠল। চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস, হর্ষধ্বনি। দাসদাসী ছুটলো বিয়ের তত্ত্বের তত্ত্বতাবাস করতে। সব কিছু সেই দুপুর রাতে রাজ-বাড়ীতেই পাওয়া গেল। আশ্চর্য হওয়ার সাহস কার?

তর্জী হাতে স্বর্গ পেলেন। কাওকাব হৃদয়ে স্বর্গ পেয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাণীমা হবীবউল্লার কাছে সুসংবাদ জানিয়ে দূত পাঠালেন। মা ও রাজমহিষীরূপে তিনি মুইন-উস-সুলতানের হৃদয়ের গতি কোন দিকে জানতে পেরে তর্জী-কন্যা কাওকাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির করেছেন। 'প্রগতিশীল' আফগানিস্থানের ভাবী রাজমহিষী সুশিক্ষিতা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন কুমারী নেই যিনি কাওকাবের কাছে দাঁড়াতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান খুদাতালার মেহেরবাণীতে সুসম্পন্ন হয়েছে। মহারাজ অতি সত্বর রাজ-ধানীতে ফিরে এসে 'আকদ্-রসুমাতের' (আইনতঃ পূর্ণ বিবাহ) দিন ঠিক করে পৌরজনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবীবউল্লা তো রেগে টং। কিন্তু কাণ্ড-জ্ঞান হারালেন না। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক তিনি বিলক্ষণ টের পেলেন যে, মূর্খ মুইন-উস-সুল‌্তানে কাওকাবের প্রেমে পড়ে নসরউল্লার মেয়েকে পাবায় নি, হারাতে বসেছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবীবউল্লা যদিও পাঁড় শিশ্নোদর ছিলেন তবু তাঁর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছেন মহিষী। সৎমার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না।

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

পানি-ঢালা দেখেই হবীবউল্লা বুঝতে পারলেন, গুঁড়িটি নিশ্চয়ই কাটা হয়েছে।

রাগ সামলে নিয়ে হবীবউল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন।

খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে মহিষী শুভবুদ্ধি প্রণোদিতা হয়ে এই বিয়ে স্থির করেছেন। তর্জীকন্যা কাওকাব যে সব দিক দিয়ে মুইন-উস-সুলতানের উপযুক্ত তাতে আর কি সন্দেহ। কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, তর্জীর মেজো মেয়ে সুরাইয়াও তো সুশিক্ষিতা, সুরূপা, সুমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমানউল্লাই বা খাস কাবুলী জংলী মেয়ে বিয়ে করবেন কেন? তাই তিনি মহিষীর মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুরাইয়ার সঙ্গে আমানউল্লার বিয়ে স্থির করে এই চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তর্জীর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। সত্বর রাজধানীতে ফিরে এসে তিনি স্বয়ং ইত্যাদি।

হবীবউল্লা বুঝতে পেরেছিলেন, রাণীমার মতলব মুইন-উস-সুলতানের স্কন্ধে কাওকাবকে চাপিয়ে দিয়ে, আপন ছেলে আমানউল্লার সঙ্গে নসরউল্লার মেয়ের বিয়ে দেবার। তাহলে নসরউল্লার মরার পর আমানউল্লার আমীর হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। হবীউল্লা সে পথ বন্ধ করার জন্য আমানউল্লার স্কন্ধে সুরাইয়াকে চাপিয়ে দিলেন। আর রাণীমা কাওকাবের বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি সুরাইয়াকে ঠেকিয়ে রাখবেন কোন লজ্জায়? বিশেষ করে যখন চিলসতুন থেকে বাগ-ই-বালা পর্যন্ত সারা কাবুল জানে, সুরাইয়া কাওকাবের চেয়ে দেখতে শুনতে, পড়াশোনায় অনেক ভালো।

রাণীমার মস্তকে বজ্রাঘাত। [illegible] কিস্তিতে রাজাকে মাত করতে গিয়ে তিনি যে প্রায় চাল-মাতের কাছাকাছি। হবীবউল্লাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসরউল্লার মেয়েকে তুই পেলিনি, আম্মো পেলুম না তবু মন্দের ভালো; নসরউল্লার কাছে এখন মুইন-উস-সুলতানে আর আমানউল্লা দুজনেই বরাবর। মুইন-উস-সুলতানের পাল্লা এখন আর নসর-কন্যার সীসায় ভারী হবে না তো-সেই মন্দের ভালো।

দাবা খেলাতে ইংরিজিতে যাকে বলে 'ওয়েটিঙ মুভ' রাণীমা সেই পন্থা অবলম্বন করলেন।

(২৩)

এর পরের অধ্যায় আরম্ভ হয় ভারতবর্ষের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে নিয়ে।

১৯১৫ সালের মাঝামাঝি জর্মন পররাষ্ট্র বিভাগ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের উপদেশ মত স্থির করলেন যে কোন গতিকে যদি আমীর হবীবুল্লাকে দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করানো যায় তাহলে ইংরেজের এক ঠ্যাং খোঁড়া করার

হতেই হবে। ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা পাবার লোভে বিদ্রোহ করুক আর নাই করুক, ইংরেজকে অন্ততঃ একটা আস্ত বাহিনী পাঞ্জাবে রাখতে হবে—তাহলে তুর্কীরা মধ্য প্রাচ্যে ইংরেজকে কাবু করে আনতে পারবে। ফলে যদি সুয়েজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইংরেজের দু পাই-ই খোঁড়া হয়ে যাবে।

মহেন্দ্রপ্রতাপ অবশ্য আশা করেছিলেন যে, আর কিছু হোক না হোক ভারতবর্ষ যদি কাকতালে স্বাধীনতা পেয়ে যায় তা হলেই যথেষ্ট।

কাইজার রাজাকে প্রচুর খাতির যত্ন করে, স্বর্ণঈগল মেডেল পরিয়ে একদল জর্মন কূটনৈতিকের সঙ্গে আফগানিস্থান রওয়ানা করিয়ে দিলেন। পথে রাজা তুর্কীর সুলতানের কাছ থেকেও অনেক আদর-আপ্যায়ন পেলেন।

কিন্তু পূর্ব ইরান ও পশ্চিম আফগানিস্থানে রাজা ও জর্মন দলকে নানা বিপদ-আপদ, ফাঁড়া-গর্দিশ কাটিয়ে এগুতে হল। ইংরেজ ও রুশ উভয়েই রাজার দৌত্যের খবর পেয়ে উত্তর দক্ষিণ দুদিক থেকে হানা দেয়। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে বেশীর ভাগ নির্জন পথে [illegible] দিয়ে তাঁরা ১৯১৫এর শীতের শুরুতে কাবুল পৌঁছান।

আমীর হবীবুল্লা বাদশাহী কায়দায় রাজাকে অভ্যর্থনা করলেন—তামাম কাবুল শহর রাস্তার দু পাশে ভিড় লাগিয়ে রাজাকে তাঁদের আনন্দ অভিবাদন জানালো। বাবুর বাদশাহের কবরের কাছে রাজাকে হবীবুল্লার এক খাস প্রাসাদে রাখা হল।

কাবুলের লোক সহজে কাউকে অভিনন্দন করে না। রাজার জন্য তারা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তার প্রথম কারণ কাবুলের জনসাধারণ ইংরেজের নষ্টামি ও হবীবুল্লার ইংরেজ প্রীতিতে বিরক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; নব্য-তুর্কী নব্য মিশরের জাতীয়তাবাদের ক্কচিৎ সঞ্চারিত নিঃশব্দকাকলী কাবুলের গুলিস্তান বোস্তানকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় কারণ, রাজা ভারতবর্ষের লোক, জর্মনীর শেষ মতলব কি সে সম্বন্ধে কাবুলীদের মনে নানা সন্দেহ থাকলেও ভারতবর্ষের নিঃস্বার্থপরতা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। এ অনুমান কাইজার বার্লিনে বসেই করতে পেরেছিলেন বলে ভারতীয় মহেন্দ্রকে জর্মন কূটনৈতিকদের মাঝখানে ইন্দ্রের আসনে বসিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ইংরেজ অবশ্য হবীবুল্লাকে তম্বী করে হুকুম দিল, পত্রপাঠ যেন রাজা আর তার দলকে আফগানিস্থান থেকে বের করে দেওয়া হয় কিন্তু ধূর্ত হবীবুল্লা ইংরাজকে নানা রকম টাল-বাহানা দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখলেন। একথাও অবশ্য তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজের তখন দু হাত ভর্তি, আফগানিস্থান আক্রমণ করবার মত সৈন্যবলও তার কোমরে নেই।

কিন্তু হবীবুল্লা রাজার প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কেন হলেন না এবং না হয়ে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক কারণ, অনেক আলোচনা শুনেছি। সে-সব কারণের কটা খাঁটি কটা ঝুটো বলা অসম্ভব কিন্তু এ-বিষয়ে দেখলুম কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই যে হবীবউল্লা তখন ভারত আক্রমণ করলে সমস্ত আফগানিস্থান তাতে সাড়া দিত। অর্থাৎ আমীর জনমত উপেক্ষা করলেন; জর্মনী, তুর্কী ভারতবর্ষকেও নিরাশ করলেন।

জর্মানরা এক বৎসর চেষ্টা করে দেশে ফিরে গেল কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তখনকার মত আশা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতের জন্য জমি আবাদ করতে কসুর করলেন না। রাজা জানতেন, হবীবউল্লার মৃত্যুর পর আমীর হবেন হয় নসরউল্লা নয় মুইন-উস-সুলতান। কিন্তু দুটো টাকাই যে মেকি রাজা দু চারবার বাজিয়ে বেশ বুঝে নিয়েছিলেন। আমান-উল্লার কথা কেউ তখন হিসেবে নিত না কিন্তু রাজা যে তাঁকে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার পরখ করে নিয়েছিলেন সে কথা কাবুলের সকলেই জানে। কিন্তু তাঁকে কি কানমন্ত্র দিয়েছিলেন সে কথা কেউ জানে না; রাজাও মুখ ফুটে কিছু বলেন নি।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাজা কাবুল ছাড়েন। তারপর যুদ্ধ শেষ হল।

শেষ আশায় নিরাশ হয়ে কাবুলের প্রগতি-পন্থীরা নির্জীব হয়ে পড়লেন। পর্দার আড়ালে থেকে তখন এক অদৃশ্য হাত আফগানিস্থানের ঘুঁটি চালাতে লাগলো। সে হাত আমানউল্লার মাতা রাণী-মা উলিয়া হজরতের।

বহু বৎসর ধরে রাণী-মা প্রহর গুণছিলেন এই সুযোগের প্রত্যাশায়। তিনি জানতেন প্রগতিপন্থীরা হবীবউল্লা, নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত আমানউল্লার কথা হিসেবেই আনবেন না। পর্দার আড়ালে থেকেই রাণী-মা প্রগতিপন্থী যুবকদের বুঝিয়ে দিলেন যে, হবীবউল্লা কাবুলের বুকের উপর জগদ্দল পাথর, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও যখন সে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি তখন তাঁরা বসে আছেন কিসের আশায়? নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতান দুজনই ভাবেন সিংহাসন তাঁদের হক্কের মাল—সে-মালের জন্য তাঁরা কোনো দাম দিতে নারাজ।

কিন্তু আমানউল্লা দাম দিতে তৈরী। সে দাম কি? বুকের খুন দিয়ে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়ে দেশকে স্বাধীন করতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমানউল্লাকে আমীর করা যায় কি প্রকারে? রাণী-মা বোরকার ভেতর থেকে তারো নীলছাপ বের করলেন। আসছে শীতে হবীবউল্লা যখন নসরউল্লা আর মুইন-উস-সুলতানকে সঙ্গে নিয়ে জালালাবাদ যাবেন তখন আমানউল্লা কাবুলের গবর্ণর হবেন। তখন যদি হবীবউল্লা জালালাবাদে মারা যান তবে কাবুলের অস্ত্রশালা আর কোষাধ্যক্ষের জিম্মাদার গবর্ণর আমানউল্লা তার ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করতে পারবেন। রাজা হতে হলে এই দুটো জিনিসই যথেষ্ট।

কিন্তু মানুষ মরে ভগবানের ইচ্ছায়। নীলছাপের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে যে হবীবউল্লা ঠিক তখনই মরবেন তার কি স্থিরতা! অসহিষ্ণু রাণী-মা বুঝিয়ে দিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা মানুষের হাত দিয়েই সফল হয়—বিশেষতঃ যদি তার হাতে তখন একটি নগণ্য পিস্তল মাত্র থাকে।

স্বামী হত্যা? হ্যাঁ। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা হচ্ছে না—যেখানে সমস্ত দেশের আশা ভরসা, ভবিষ্যৎ মঙ্গল অমঙ্গল ভাগ নিরূপণের প্রশ্ন সেখানে কে স্বামী, স্ত্রীই বা কে?

শংকরাচার্য বলেছেন 'কা তব কান্তা?' কিন্তু ঠিক তার পরেই 'সংসার অতীব বিচিত্র' কেন বলেছেন সে তত্ত্বটা এতদিন পর আমার কাছে খোলসা হল।

অর্বাচীনেরা তবু শোধালো ঃ 'কিন্তু আমীর হবীবউল্লার সৈন্যদল আর জালালাবাদ অঞ্চলের লোকজন নসরউল্লা বা মুইন-উস-সুলতানের পক্ষ নেবে না?'

রাগে দুঃখে রাণীমার নাকি কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। উষ্মা চেপে শেষটায় বলেছিলেন,

'ওরে মূর্খের দল, জালালাবাদে যেই রাজা হোক না কেন, আমরা রটাব না যে, সিংহাসনের লোভে অসহিষ্ণু হয়ে সেই নিরীহ হবীবউল্লাকে খুন করেছে? মূর্খেরা এতক্ষণে বুঝল এখানে রাণীর কি মত নয়?' এখানে রাণীর মতই সকল মতের রাণী।

এসব আমার শোনা কথা—কতটা ঠিক কতটা ভুল হলপ করে বলতে পারব না; তবে একরকমেরই কিছু একটা যে হয়েছিল সে বিষয়ে কাবুল চারণদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথামালার গল্প ভুল। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য লোকেও জুটল।

আপন অলসতাই হবীবউল্লার মৃত্যুর আরেক কারণ। জালালাবাদে একদিন সন্ধ্যে বেলা শিকার থেকে ফিরে আসতেই তাঁর এক গুপ্তচর নিবেদন করল যে গোপনে হুজুরের সঙ্গে সে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চায়। সে নাকি কি করে শেষ মুহূর্তে এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গিয়েছিল। 'কাল হবে, কাল হবে' বলে নাকি হবীবউল্লা প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে গেলেন। সকলের সামনে গুপ্তচর

কিছু খুলে বলতে পারল না—আমীরও শুধু বলেন 'কাল হবে, কাল হবে।'

সে কাল আর কখনো হয় নি। সে রাত্রেই গুপ্ত ঘাতকের হাতে হবীবউল্লা প্রাণ দেন।

সকালবেলা জলালাবাদে যে কী তুমুল-কাণ্ড হয়েছিল তার বর্ণনার আশা করা অন্যায়। কেউ শুধায়, 'আমীরকে মারল কে?' কেউ শুধায় 'রাজা হবেন কে?' একদল বলল 'শহীদ আমীরের ইচ্ছা ছিল নসরউল্লা রাজা হবেন।' আরেকদল বলল, 'মৃত আমীরের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই; রাজা হবেন বড় ছেলে, যুবরাজ, মুইন-উস-সুলতান ইনায়েত উল্লা। তখ্‌তের হক, তাঁরই।

বেশীর ভাগ গিয়েছিল ইনায়েতউল্লার কাছে। তিনি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। লোকজন যতই জিজ্ঞেস করে রাজা হবেন কে? তিনি হয় উত্তর দেন না, নয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেন, **'ব কাকায়েম বোরো'** অর্থাৎ 'খুড়োর কাছে যাও, আমি কি জানি।' কেন সিংহাসনের লোভ করেন নি বলা শক্ত; হয়ত পিতৃশোকে অত্যধিক কাতর হয়ে পড়েছিলেন, হয়তো পিতার ইচ্ছার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন, হয়ত আন্দাজ করেছিলেন যে, যারা তাঁর পিতাকে খুন করেছে তাদের লোকই শেষ পর্যন্ত তখ্‌ত দখল করবে। তিনি যদি সে-পথে কাঁটা হয়ে মাথা খাড়া করেন তবে সে-মাথা বেশীদিন ঘাড়ে থাকবে না। অত্যন্ত কাঁচা কাঁচা-লঙ্কা ও পাঁঠার বলি দেখে খুশী হয় না। জানে এবার তাকে পেয়ার লগ্ন আসন্ন। নসরউল্লা আমীর হলেন।

এদিকে রাণী-মা কাবুলে বসে তড়িৎ গতিতে কাবুল কান্দাহার জলালাবাদ হিরাতে খবর রটালেন রাজ্যগৃধ্নু অসহিষ্ণু নসরউল্লা ভ্রাতা হবীবউল্লাকে খুন করেছেন। তাঁর আমীর হওয়ার এমনিতেই কোনো হক্ ছিল না—এখন তো আর কোনো কথাই উঠতে পারে না। হক্ ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুবরাজ মুইন-উস-সুলতানের। তিনি যখন স্বেচ্ছায়, খুশ-এখতিয়ারে নসরউল্লার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থাৎ সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেছেন, তখন হক বর্তালো আমানউল্লার উপর।

অকাট্য যুক্তি। তবু কাবুল চীৎকার করলো, 'জিন্দাবাদ আমানউল্লা খান'—ক্ষীণ-কণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রাণীমা আমানউল্লার তখ্‌ত লাভে খুশী হয়ে সেপাহিদের বিস্তর বখশীস দিলেন; নূতন বাদশা আমানউল্লা সেপাহিদের তনখা অত্যন্ত কম বলে নিতান্ত কর্তব্য পালনার্থে সে তনখা ডবল করে দিলেন। উভয় টাকাই রাজকোষ থেকে বেরুলো। কাবুল হুঙ্কার দিয়ে বলল 'জিন্দাবাদ আমান-উল্লা খান!'

মন্ত্রোচ্চারককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মারা যায় কিনা। ভলতেয়ার বলেছিলেন, 'যায়, কিন্তু গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে সেঁকো বিষ খাইয়ে দিলে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না।'

আফগান সেপাইয়ের কাছে যুক্তিতর্ক মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়—টাকাটাই সেঁকো।

আমানউল্লা কাবুল বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন। সজল নয়নে, বলদৃপ্ত কণ্ঠে পিতৃঘাতকের রক্তপাত করবেন বলে শপথ গ্রহণ করলেন। 'যে পাষণ্ড আমার জান-দিলের পিতাকে হত্যা করেছে তার রক্ত না দেখা পর্যন্ত আমার কাছে জল পর্যন্ত শরাবের মত হারাম, তার মাংস টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত সব মাংস আমার কাছে শূকরের মাংসের মত হারাম।'

আমানউল্লার শত্রুপক্ষ বলে আমানউল্লা থিয়েটারে ঢুকলে নাম করতে পারতেন; মিত্র-পক্ষ বলে, সমস্ত ষড়যন্ত্রটা রাণীমা সর্দারদের সঙ্গে তৈরী করেছিলেন—আমানউল্লাকে বাইরে রেখে। হাজার হোক **'পিদর-কুশ'** বা পিতৃহন্তার হস্ত চুম্বন করতে অনেক লোকই ঘৃণা বোধ করতে পারে। বিশেষতঃ রাণী-মা যখন একাই একলক্ষ তখন তরুণ আমানকে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নাবিয়ে লাভ কি! আফগানিস্থানে স্ত্রীলোকের আমীর হওয়ার রেওয়াজ থাকলে তাঁকে হয়ত সারাদিনই যবনিকা অন্তরালে থাকতে হত।

আমানুল্লার সৈন্যদল জলালাবাদ পৌঁছল। নসরউল্লা, এনায়েতউল্লা দুজনই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন। নসরউল্লা মোল্লাদের বুরুজ-মিনার স্বরূপ ছিলেন; সে মিনার থেকে অনেক সম্প্রদায়ের গম্ভীর নিনাদ বহির্গত হয়ে কেন যে সেপাইসান্ত্রী জড়ো করতে পারল না সেও এক সমস্যা।

কাবুলে ফেরার পথে যুবরাজ নাকি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেঁদে ফেলে-ছিলেন। জেলালাবাদের যেসব সেপাই তাঁকে আমীরের তখ্‌তে বসাবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল তারা তৎক্ষণে আমানউল্লার দলে যোগ দিয়ে কাবুল যাচ্ছে। কান্না দেখে তারা নাকি মুইন-উস-সুলতানের কাছে এসে বারবার বিদ্রূপ করে বলেছিল, বলোনা এখন, 'ব কাকায়েম বোরো— খুড়োর কাছে যাও, তিনি সব জানেন।' যাওনা এখন খুড়োর কাছে? এখন দেখি কাবুলে পৌঁছলে, খুড়ো তোমাকে বাঁচান কি করে!

কাবুলের আর্ক দুর্গে দুজনকেই বন্দী করে রাখা হ'ল। কিছুদিন পর নসরউল্লা 'কলেরায়' মারা যান। কফি খেয়ে নাকি তার কলেরা হয়েছিল। কফিতে অন্য কিছু মেশানো ছিল কি না সে বিষয়ে দেখলুম অধিকাংশ কাবুল চারণের স্মৃতিশক্তি বড়ই ক্ষীণ।

এর পর মুইন-উস-সুলতানের মনের অবস্থা কি হয়েছিল ভাবতে গেলে আমার মত নিরীহ বাঙালীর মাথা ঘুরে যায়। কল্পনা সেখানে পৌঁছয় না, মৃত্যুভয়ের তুলনাও নেই।

এখানে পৌঁছে সমস্ত দুনিয়ার উচিত আমানউল্লাকে বারবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা। প্রাচ্যের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি আমানউল্লা তাই করলেন। মায়ের হাত থেকে কেড়ে ক্ষমতা তিনি ততদিনে অধিকার করতে পেরে ছিলেন তারি জোরে, নিন্দুক কুটনৈতিকদের শত উপদেশ গ্রাহ্য না করে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মুক্তি দিলেন।

এ যে কত বড় সাহসের পরিচয় তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা মোগল পাঠানের ইতিহাস পড়েছেন। এত বড় দরাজ-দিল হিম্মৎ জিগরের নিশান আফগানিস্থানের ইতিহাসে আর নেই। (ক্রমশ)

"কিছুই না"—নির্বিকার স্বরে জবাব এল।

"কিন্তু সে আমার দিকে তাকাল"......মা লার সংযম আর রইল না, ঝরঝর করে এক নিঃশ্বাসে সে বলে গেল, মাউংগ আই কেমন করে তাকিয়েছিল তার দিকে, আর তারই বা লেগেছিল কেমন!

"তা এর চেয়ে আর ভাল কি হতে পারত—মা টিন জবাব দিলেন।" আসল কথা কি জান? তোমার চাউনিকে তুমি বড় বেশি দাম দিচ্ছ। প্রত্যেক মেয়েরই জীবনে এমনি সময় আসে যখন তার অহমিকায় ঘা পড়ে—তোমারও পড়েছে এই যা। এবারে তোমার কাজ হচ্ছে ব্যাপারটা স্রেফ ভুলে যাওয়া। বুঝেছ!

ঠোঁট দুটোকে শক্ত করে চেপে ধরে মাথা নাড়তে লাগল মা লা। তা হবে না, ভুলব না আমি কিছুতেই। শুধু তাই নয় আমি এর ......দেখো মাসী, আমি ওর সাথে দেখা করতে চাই, তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

আমি মোটেই সে রকম কোন কাজ করব না, তুমি নিশ্চিত জেন—মা টিন শক্ত হয়ে জবাব দিলেন। এর অর্থই বা কি? দেখা হলে কিসের আশা তুমি করছ, শুনি?

মা লা জেদ করতে লাগল, যাই হোক তুমি একবার দেখা করিয়েই দাও না। ওর ভেতরে কি যৌবনের আকাঙ্ক্ষা নেই, আর আমি কি সুন্দরী এবং তরুণী নই? আমাকে কেবল কয়েকটি মুহূর্ত ওর সঙ্গে একলা কাটাতে দাও, তারপরে দেখ না কেমন পোষ মানে।

কিন্তু তারপর? ওর মা কিংবা তোমার বাপ-মা কেউই এ বিয়েতে রাজী হবেন না, তখন?

মা লা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই না। আমি চাই ও আমার প্রেমে পড়ুক। তারপর, ওর মায়ের যা কাহিনী শুনেছি, ও নিশ্চয় আমাকে নিয়ে পালাতে চাইবে। আমি রাজী হব প্রথমটায়, তারপর সত্যি যখন সময় আসবে, জানিয়ে দেব ওকে নিয়ে আমি খেলা করছিলাম মাত্র। তাই হবে ওর যোগ্য প্রতিশোধ।...মাসী এস, আমাকে সাহায্য কর—মা লা বারবার মিনতি জানাতে লাগল।

মা টিন চমৎকৃত হলেন। বিরক্তি ভরা কণ্ঠে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ চেপে গেলেন। মনে মনে তিনি ভাবলেন, এখন যদি পাগলা মেয়েটার কথায় সায় দেওয়া যায়, পরে হয়ত সামলে নেওয়া যাবে।

চুপ করে বসে তিনি পাইপ টানতে লাগলেন। মা লাকে কি বলবেন ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ তার মনে ভেসে উঠল নীরস, দাম্ভিক একখানা মুখ, সে মুখ মাউংগ আইয়ের মায়ের। কি যেন ভাবলেন মা টিন, তারপর মা লাকে ডেকে বলে উঠলেন, "কিন্তু দেখা করেই বা কি করবে? তুমি তাকে কখনোই রাজী করাতে পারবে না।"

"হ্যাঁ পারব, নিশ্চয় পারব। তুমি খালি একটা সুযোগ করে দাও।" মা লা আশান্বিত হয়ে উঠল। তারপর বলল, শোন, আজ দুপুরে খেতে বসে আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে ......চুপি চুপি সে মাসীকে মতলবটা খুলে বলল। সব শুনেটুনে মাসী বললেন, "তা আমরা এটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। খালি ভয়, শেষে না অঘটন ঘটে। তুমি আজ খেয়ালের মাথায় যা করতে যাচ্ছ, এর চেয়ে ঢের কম অপরাধে পুরুষ তার প্রণয়িনীকে খুন করেছে,—এমন কথা ত শোনা যায়।"

* * * *

কয়েকদিন পর। মা লা আর তার মাসী পাহাড়ের পথ বেয়ে উঠছে। এটা একটা পায়ে চলা পথ বটে, কিন্তু এ পথে সাধারণত কেউ হাঁটে না—মাঝে মাঝে পথের পারেই লতা আর আগাছার ঝোপ।

খাড়া পথ বেয়ে উঠতে উঠতে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে মা লা, মাসী তুমি ঠিক জান ত?

"নিশ্চয়—মা টিন জবাব দিলেন—এই পথ ধরেই সে রোজ মাঠে যায়। মা লা, আমরা প্রায় অর্ধেক পথ উঠেছি। এই যথেষ্ট। ঐ একটা গাছ দেখা যাচ্ছে, ওতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। সামনেই ছোট একটা কাঁকড়া কাঁটা-ওয়ালা গাছের দিকে মা টিন লক্ষ্য করলেন।

মা লাকে গাছের নীচে অপেক্ষা করতে বলে মা টিন সামান্য একটু উঁচু হয়ে একটা ডাল ধরলেন; তারপর সেটাকে নীচু করে ধরে তার কাঁটাগুলো মা লার চুলে এলোমেলো ভাবে আটকে দিলেন। আর একটা ডাল ধরে তার কাঁটাগুলো মা লার পিঠের দিকে জ্যাকেটে লাগিয়ে মা টিন একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন কেমন হল। সোজাসুজি সামনে তাকালেই যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাতে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠল মা টিনের। হাত দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে খুকখুক করে কাশতে লাগলেন তিনি।

মা লা ভয়ানক অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল—নিজেকে এত বোকা বলে মনে হল তার। কাঁটার জাল থেকে বেরোবার জন্য ছটফট করতে লাগল সে।

"স্-স...চুপ," মাসী বলে উঠলেন, "পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি।" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

মা লা বেরোবার জন্য একটু হাঁকুপাঁকু করতে লাগল, কিন্তু একটু পরে বাধ্য হয়ে থেমে গেল, দেখল ছটফট করে সে ক্রমেই কাঁটায় জড়িয়ে পড়েছে বেশি। এরই মধ্যে চুলগুলো সব কাঁটার খোঁচায় বেণী খুলে মুখের চার পাশে এলোমেলো ভাবে ঝুলছে। পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে—রাগে দুঃখে মা লার চোখে জল এসে গেল। এ ভাবে ছেলেটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার বুদ্ধিটা ত ওরই মাথায় খেলেছিল—কিন্তু ওর এ দুর্দশায় মাসীকে হাসি চাপতে দেখে ও নিজের ওপরেই ভীষণ চটে গেল। এমনিধারা বিচ্ছিরি একটা অবস্থায় একজন অপরিচিতের সামনে ও পড়বে—ভাবতেই ওর প্রতিশোধস্পৃহাও যেন নিভে এল। খুব কাছে পায়ের শব্দ শোনা গেল। "কি ব্যাপার? গাছের পাশ থেকে একটা মিষ্টি স্বর ভেসে এল। সেদিক পানে ফিরে তাকাতেই মা লার অশ্রুভেজা দৃষ্টির সাথে মিশে গেল মাউংগ আইর বিস্মিত দৃষ্টি। মাউংগ আইর করুণাব্যাকুল চোখ দুটির পানে তাকিয়ে মা লা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেল তার লজ্জা আর অনুতাপ।" আমি ঠিক করেছি, আমি ঠিক করেছি—জয়ের আনন্দে বারবার সে নিজেকে বলতে লাগল। তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "নড়াচড়া করবেন না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি এক্ষুণি ছাড়িয়ে দিচ্ছি।" মাউংগ আই প্রথমেই মা লার জ্যাকেটের কাঁটাগুলো ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ছাড়াতে গিয়ে জ্যাকেটটার এক জায়গায় খানিকটা ছিঁড়েই গেল। এর পর চুলের পালা। এটা আরও শক্ত [illegible] এমনি [illegible] সে, [illegible] চুলের কাঁটাগুলো [illegible] হাঁপিয়ে [illegible] মাউংগ আই। [illegible] সে প্রথম একটি তরুণী মেয়েকে স্পর্শ করছে। [illegible] তার মাথা আর চুল। [illegible] তার হাত এমনি কাঁপতে লাগল যে, ছাড়াবার সময় চুলে টান পড়ে [illegible] আরও [illegible] করে। মা লা [illegible] একটা কাঁটা লেগে কেটে গেল। মা লার [illegible] রক্ত দেখে মাউংগ আই [illegible] আরও [illegible]

* * * *

চুলগুলো গোছাতে গোছাতে মা লা [illegible] মিষ্টি করে হাসলে।, বললে, "আমাকে মুক্ত করে দেবার জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

"না না, ও কিছু নয়। কিন্তু আপনি ও ভাবে কাঁটায় জড়িয়ে পড়লেন কি করে?"

"কি জানি, জানি না—অসহায় ভাবে মা লা জবাব দিলে, আমি বেরী তুলব বলে ওপরের ডালটা ধরেছিলাম, তারপরে এই বিপদ।"

মাউংগ আই সাবধান করে বললে, "এরপর যখনই বেরী তুলতে আসবেন, ঐ ঝোপের নীচু থেকে তুলবেন। ওপরের চাইতে নীচেরগুলোই পাকাও বেশি মিষ্টিও বেশি।"

"ঐ যে আমার মাসী আসছেন—মা লা চীৎকার করে উঠল।"

মা টিন মন্থরগতিতে ওপরে উঠে এলেন। দুজনের সামনে এসে মাউংগ আইয়ের দিকে

একবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর মা লাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী, তুমি যে এখনও প্যাগোডায় পেঁাছাও নি?

"ও মাসীমা, আমি যে কি রকম একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলুম!" মা লা তাড়াতাড়ি দুর্ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিলো। মা টিন এবার মাউংগ আইকে উদ্দেশ করে বললেন, "তোমার উচিত ছিল, সোজা হেঁটে চলে যাওয়া—ও অমনি কাঁটায় আটকে পড়ে থাকত। মেয়েটি একটি মহামূর্খ। নাও, এখন শীগগীর চল, আঁধার ঘনিয়ে এল বলে—বলার সংগে সংগেই লম্বা লম্বা পা ফেলে রওনা হলেন মা টিন। আসামী দুটি পেছনে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল—পাহাড়ের চূড়ায় পেঁাছতে পেঁাছতে দেখা গেল তারা দিব্বি মশগুল হয়ে গল্প করতে করতে চলেছে। চূড়ায় এসে তারা ভাগাভাগি হয়ে গেল। মেয়েরা প্যাগোডায় চলে গেল, মাউংগ আই গেল মঠের দিকে। মাউংগ আই কিন্তু এরই মধ্যে জেনে নিয়েছে মা লা প্রতিদিনই এ পথে মাসীকে নিয়ে প্যাগোডায় যায়।

পরের সপ্তাহে মাউংগ আইর মঠে যাবার সময়ের একটু অদলবদল হল। ফলে মঠে যাবার পথে রোজই দেখা হয় মা লার সাথে, সেও প্যাগোডায় যাচ্ছে। পাহাড়ের নীচে তাদের দুজনের দেখা হয়, চূড়োয় উঠে তারা ভিন্ন পথ নেয়। চতুর্থ দিনে মাউংগ আই ফিস ফিস করে জানালে মা লাকে সে ভালবেসেছে, বললে সাঁঝের আঁধারে তার সংগে দেখা করতে। সপ্তাহের শেষে মা লা একদিন এসে জানালো মাসীকে, "মাউংগ আই চায় আসছে কাল আমি পালাই তার সংগে। ঠিক হয়েছে ঐ পথটার বাঁকে আমি অপেক্ষা করব তার জন্যে, সে আসবে একটা গরুর গাড়ীতে চড়ে—গাড়ীটা সে নিজেই চালিয়ে আসবে। এখান থেকে সোজা চলে যাব মাউংগ আইর বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে—তিনি তার পরের দিন সকলকে জানিয়ে দেবেন আমাদের কাহিনী।—মাউংগ আই জানে ব্যাপারটা এরকম ঘটবে। আসলে যা ঘটবে তা হচ্ছে এই যে, আমি তার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। কিন্তু যে মুহূর্তে সে এসে আমাকে স্পর্শ করবে, অমনি আমি চেঁচিয়ে উঠব—আর তুমি কাছেই কোন একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে হাজির হবে আমার পাশে। তখন আমি তার মুখের ওপর হেসে উঠে আসল কথাটা খুলে বলে দেব।"

মা টিন জিজ্ঞাসা করলেন, ও তুমি তাহলে এখনও প্রতিশোধ নেবার কথাটা ভোলনি?"

মা লা মাথা নাড়লে।

"আচ্ছা তাহলে আশা করা যাক্ যে, সময় মত চীৎকার করে উঠতে তুমি ভুলবে না—কি বল?"

"ভুলে যাব, এমন কোন সম্ভাবনাই নেই"—মা লা হাসল।

"মানুষের স্বভাবের ওপর কখনোই ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না—বলে মা টিন জোরে হেসে উঠলেন।

*   *   *   *

সময় ঘনিয়ে এসেছে। মা লা গরুর গাড়ীর শব্দের জন্য কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে—বুক তার ঢিপঢিপ করছে। সত্যি সত্যি শেষপর্যন্ত ঠিক মত সামলাতে পারবে ত? মাসীর সাবধান-বাণীটাও হঠাৎ ঠিক সময়মত মনে এসে গেল—যদি ক্ষেপে যায়? দুটো মেয়েমানুষে কি রুখ্‌তে পারবে?

আঁধার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—এমনি সময় মাউংগ আইর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। মা লার কানের পাশে উত্তেজিত ফিস্‌ফিস্ স্বর শোনা গেল, "মা লা, মা লা, তুমি এসেছ, আঃ ভগবানকে ধন্যবাদ। যদি তুমি না আস, যদি তুমি মন বদলে ফেলে থাক, এই আশঙ্কায় আমি প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম আর কি: আঃ।

মাউংগ আই দুটি হাত বাড়িয়ে মা লাকে জড়িয়ে ধরলে; মা লা চীৎকার করবে বলে হা করল, কিন্তু স্বর আর ফুটল না—দুটি নরম ঠোঁট তার ঠোঁট দুটিকে বন্দী করে ফেলেছে। মা লা মাউংগ আইর বাহুবন্ধনে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল—সারা শরীর এক অপূর্ব শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠলো। এতদিনের কল্পনা প্রতিশোধ নেবার কথা কোথায় ভেসে চলে গেল এক মুহূর্তে! মাসী অপেক্ষা করছে—ও ঘটনাটা যেন আর এক জগতের! মা লা এই মুহূর্তে যে জগতে বাস করছে,—সেখানে আছে কেবল সে আর মাউংগ আই।

মাউংগ আই ডাকল, মা লা নিঃশব্দে গাড়ীতে উঠে বসল!

গাড়ীটাকে চলে যেতে দেখে মা টিন আস্তে আস্তে ঝোঁপের আড়াল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন! নীরবে আকাশের দিকে তাকালেন, মুখে ভেসে উঠলো তার এক টুকরো মিষ্টি হাসি!

অনুবাদঃ **শ্রীসাবিত্রী ঘোষাল**

দাও লা এফ বার্মার কথাশিল্পী। এই রচনাটি তাঁর "দি লাস্ট লাফ" গল্পের অনুবাদ।

পূর্ববঙ্গ হইতে বাধ্য হইয়া যে লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিরা পক্ষকাল ব্যারাকপুর হইতে খিদিরপুর পর্যন্ত নানা স্থানে সভায় আপনাদিগের শোচনীয় দুর্দশা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ও ভারত সরকারকে সচেতন করিবার জন্য তারস্বরে চীৎকার করিয়াছেন। এই সকল সভায় এক দিকে যেমন শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত ও ডক্টর মেঘনাদ সাহার মত লোকের উক্তিতে দুর্দশার বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদিগের নিস্তব্ধতায় তেমনই অপরদিকে ঔদাসীন্য দেখা দিয়াছে। সেই সকল সভার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন সহানুভূতি-স্নিগ্ধ বিবৃতি প্রচার করেন নাই—তাঁহারা কি করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। ইহার অনিবার্য ফল যে কি হইতেছে, তাহা তাঁহারা অনুভব করিবার পূর্বে যে অনুমান করিতে পারেন না, এমন মনে করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে।

একাধিক সভায় বলা হইয়াছে, এই সমস্যার সমাধান ভারত সরকারের সক্রিয় সাহায্য সাপেক্ষ, সে সরকারে শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর পদত্যাগের পরে দুইজন বাঙালী আছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। যখন বাঙলাকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান দুইভাগে বিভক্ত করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছিল, তখন তিনি বাঙলায় হিন্দু মহাসভার প্রত্যক্ষ নেতা। তিনি বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ বাঙালী হিন্দুর "হোম ল্যাণ্ড" হইবে— তাহা কেবল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর জন্য নহে—বাঙালী হিন্দুমাত্রেরই জন্য। আজ—গান্ধীজীর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে—তাঁহারই প্রস্তাবে হিন্দু মহাসভা রাজনীতিক কার্য বর্জন করিয়াছেন—কিন্তু সেইজন্য কি পশ্চিমবঙ্গ আর—হিন্দু মহাসভার মতে—বাঙালী হিন্দুর "হোম ল্যাণ্ড" বলিয়া বিবেচিত হইবে না? কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার কার্যালয়ে মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতির প্রতিকৃতি লইয়া যাঁহারা অপ্রীতিকর ঘটনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কি হিন্দু মহাসভার অর্থ ও সামর্থ্য পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্যের জন্য প্রযুক্ত করিবার পুণ্য পরিকল্পনায় প্রযুক্ত করাইতে পারেন নাই?

কিন্তু যে সরকার জাতীয় সরকার বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন, সে সরকারের শক্তি-সামর্থ্যই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। তাহার কি হইতেছে?

বস্ত্র বিষয়ে এই সরকারের শোচনীয় ব্যবস্থার বিষয় আজ আর কাহাকেও বলিয়া ... এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কৃষিবিভাগ সম্বন্ধে আমরা মন্ত্রীদিগকে বার বার সতর্ক করিয়া দিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি একটি ব্যাপারে প্রমাণ হইয়াছে—"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।" বাঙলা বিভক্ত হইবার পরে দেখা যায়—"চুঁচুড়া গ্রীন" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পাটের বীজ যাহা সরকারের ছিল, তাহা চতুর পাকিস্থানীরা লইয়া গিয়াছেন। ইহা যদি পাকিস্থানী সরকারের কর্মচারীদিগের রাষ্ট্র-চেতনার, রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্তির পরিচায়ক হয়, তবে যে ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদিগের অজ্ঞতার বা অযোগ্যতার বা তদপেক্ষাও গুরুতর অপরাধের প্রমাণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের প্রাবল্য গতবার গোল আলুর বীজ সরবরাহে আরও প্রতিপন্ন হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ কেন প্রার্থিত গোল আলুর বীজে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার উত্তরে ভারত সরকার বলেন, এই সরকার বীজ না চাহিয়া গোল আলু (আহারের জন্য) চাহিয়াছিলেন এবং তাহাই পাইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর কিছুই বলেন নাই—'কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক' নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে সকল কর্মচারী সে কাজের জন্য দায়ী, তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করাও হয় নাই! পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে এখন দার্জিলিং অঞ্চলে (বহু অর্থব্যয়ে) আলুর বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবেন বলিতেছেন, তাহা যদি সফল হয়, তথাপি তাহাতে গত বৎসরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। যে সকল বিশেষজ্ঞের অসতর্কতায় উৎকৃষ্ট পাটের বীজ পাকিস্থানে গিয়াছিল, তাঁহারাই এবার আর এক কার্যে সরকারের অর্থের ও বাঙালীর উদ্যমের অপব্যয় করিয়াছেন। ভাল পাটের বীজ বলিয়া তাঁহারা কৃষকদিগকে যে বীজ বিক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে দেড় হাত গাছেই ফুল হইয়া গিয়াছে—গাছ বহু প্রশাখাসমন্বিত হইয়াছে—কৃষকের সর্বনাশ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এখন আর সে জমি 'ভাঙ্গিয়া' কোন চাষ হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য—এই বীজ কি শিক্কা টাকায় ক্রীত হইয়া নীহার-নিষেকের পরে সরকারের বীজ-ভাণ্ডারে প্রেরিত হইয়াছিল! সে বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা হইবে কি? আমেরিকায় এক সময়ে—

"Fraud and speculation practised led more than one notable general to express a longing to hang an army contractor".

আমরা সে উপায় অবলম্বন করিতে বলি না বটে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—যে সকল বীজ-বিক্রেতা এই বীজ সরবরাহ করিয়াছিল, তাহারা প্রতারণার অপরাধে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সকল কর্মচারী পরীক্ষা করিয়া সেই বীজ মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাঁহারা কর্তব্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের অপরাধে মামলা-সোপর্দ হইবে কি? আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, বহু অপরাধীর কঠোর দণ্ড ব্যতীত —অবস্থার প্রতিকার হইবে না।

গত সংখ্যায় আমরা ২৪ পরগণা জিলায় ক্যানিং থানার এলাকায় সুন্দরবনে বাঁধ ভাঙ্গা জমিতে লবণাক্ত জল প্রবেশের দুঃসংবাদ দিয়াছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন—বিবৃতিতে প্রকাশ, বাঁধের দৈর্ঘ্য এগার মাইল—তিন বৎসর পূর্বে বাঙলা সরকার সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে উহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন; বিদ্যাধরী নদী হইতে বন্যা আসায় বাঁধটি পঞ্চাশ স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাম্বুলদহে একটি পুরাতন পরিত্যক্ত বাঁধের ফাটল দিয়া ঐ অঞ্চলে জল প্রবেশ করে। বাঁধ ভাঙ্গিলে তাহার পুনর্গঠন কিরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তাহা পাঠকগণ রোনাল্ডসের পুস্তকে পড়িলে জানিতে পারিবেন। কিন্তু সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন বৎসর পূর্বে যে বাঁধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থার ত্রুটিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে নাই? পরিত্যক্ত বাঁধের ফাটল কি সরকারের সেচ বিভাগ লক্ষ্য করেন নাই? এবার আবার কয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে? বলা হইয়াছে, শস্যের ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু সকলেই জানেন, যাহাতে লোণা-জল জমিতে প্রবেশ করিয়া জমি চাষের অযোগ্য করিতে না পারে, সেই জন্যই বাঁধ বাঁধা হয়। কাজেই বিস্তৃত স্থান লবণাক্ত জলপ্লাবিত হইলেও শস্যের ক্ষতি হয় নাই শুনিলে জিজ্ঞাসা করিতে কৌতূহল জন্মে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি নিকৃষ্ট পাটের বীজের মত কোন লোণা-জলে পুষ্ট হইবার ধান আবিস্কার করিয়াছেন? সহসা কি বিদ্যাধরীতে অত্যধিক বন্যা আসিয়াছিল? আমাদিগের মনে হয়, এই প্লাবনে ধানের ফসল কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। সে অবস্থায় এবার ধানের ফসল বৃদ্ধির কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে?

কলিকাতায় মৎস্যের সরবরাহ বাড়ান হইবে বলিয়া মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা যাইতেছে, সে আশার কোনই অবকাশ নাই। আবার শুনিতেছি, সমুদ্রে মাছ ধরিয়া কলিকাতায় সরবরাহের জন্য যে জাহাজ ব্যবহৃত হইবে স্থির ছিল, সে জাহাজ আজ জলে ভাসিতেছে না। যুদ্ধের সময় বাঙলার সরকারের জন্য যে সকল জলযান প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেগুলি জলে ভাসে নাই। এই জাহাজ কি জল-তলগামী হইয়াছে? কলিকাতায়

গড়ের মাঠে কতকগুলি পুষ্করিণীতে দেখা যায়—সাইনবোর্ড আছে—মৎস্য বিভাগ তাহাতে পোণার চাষ করিতেছেন। সেগুলিতে পোণার অবস্থা কিরূপ? আমাদিগের কোন বন্ধু তাঁহার বাসগ্রামে পুষ্করিণীতে পোণা ছাড়িবার জন্য দশ হাজার পোণার দাম কর্মচারীকে দিয়াছিলেন। যখন দুই বৎসর পরে তাহাতে মাছ পাওয়া গেল না, তখন কর্মচারী হিসাব দিয়াছিল— পোণা মরিয়াছে—এক হাজার; যাহারা পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের পদতলে পিষ্ট হইয়া মরিয়াছে পাঁচশত ও কলসীতে গিয়াছে পাঁচশত; বোয়াল মাছে খাইয়াছে— এক হাজার—ইত্যাদি। এ-ও সেইরূপ হইবে না ত?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রী সরকার যাহাই কেন বলুন না, পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন ও আসিবেন। গত ফুলদোলের সময় শ্রীপুরে (জিলা খুলনা) সংঘটিত ঘটনা এইরূপঃ—

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও এখানে ফুলদোলের আয়োজন করা হইয়াছিল। সহস্রাধিক হিন্দুর উপস্থিতিতে হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ হইলে শ্রীপুর থানার (মুসলমান?) হেড কনস্টেবল কয়জন কনস্টেবল লইয়া অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে আসিয়া আসরে লাঠি চালনা করিয়া জন-সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বহু বিশিষ্ট হিন্দু অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। হেড কনস্টেবল কবুল জবাব দেয়, পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় পুলিশের অনুমতি ব্যতীত কোনরূপ পূজার্চনা করিতে পারিবে না। অনুষ্ঠান শ্রীরণজিৎ দে'র গৃহে হইতেছিল এবং ঐ গৃহে এক শতাব্দীরও অধিককাল হইতে ঐ অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে।

বলা বাহুল্য, যখন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া ঢাকায় হিন্দুরা চিরাচরিত প্রথায় জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির করিয়াছিলেন, তখন পূর্ব-পাকিস্থানের গভর্নরের সম্মুখে ও প্রধান মন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুসলমান জনতা শোভাযাত্রা আক্রমণ করে এবং বলে, পূর্বে যাহাই কেন হইয়া থাকুক না—পাকিস্থানে হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধীয় শোভাযাত্রা সহ্য করা হইবে না। সরকারের অনুমতি যে উদ্ধত মুসলমানরা অনায়াসে পদদলিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে দণ্ডদানের সাহস পাকিস্থান সরকারের হয় নাই।

এই অবস্থায় এখনও তাঁহারা বলিতেছেন —পূর্ব-পাকিস্থানের হিন্দুরা যেন স্থানত্যাগ না করিয়া পূর্ব-পাকিস্থানেই—পাকিস্থানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বাস করেন—তাঁহাদিগের উক্তিতে কি কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায়?

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী সরকার প্রায় দশ মাস কাজ করিলেন। এখনও অনেক অব্যবস্থা কিরূপ রহিয়াছে, বহরমপুর হইতে প্রাপ্ত শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালের নিম্নলিখিত বিবৃতিতে তাহা বুঝিতে পারা যায়ঃ—

মুর্শিদাবাদ জিলা বোর্ডের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদিগের বেতন কয় মাস না পাওয়ায় অভাবের তাড়নায় একজন শিক্ষকের আত্মহত্যার সংবাদে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ ব্যবস্থা জনগণের নিকট দায়িত্বশীল নহে এমন সরকারের পক্ষেও লজ্জাজনক। কিন্তু আজ আমরা যে সরকারের অধীন, তাহা "জাতীয় সরকার" নামে অভিহিত—তাহা আমাদিগের লোকের দ্বারাই পরিচালিত।

আমরা এই সংবাদে স্তম্ভিত হইয়াছি। আমরা অবগত হইয়াছি, বর্তমান অবস্থাতেও —বৎসর শেষ হইবার পূর্বে—পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-মন্ত্রী শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ ব্যয়ের কতকাংশ "বাজেয়াপ্ত" ধরিয়া বাজেট করিয়াছিলেন এবং শিক্ষামন্ত্রী বহু চেষ্টায় সে টাকা উদ্ধার করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথায় ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, পর বৎসর শস্যের ফলন আশাতীত হয় বটে, কিন্তু সে ফসল ক্ষেতে থাকিতে থাকিতেই বহু লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও আমরা কি সেইরূপ ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছি না? বহু ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পূর্বে কি পূর্বোল্লিখিত ঘটনার মত ঘটনার সংঘটন সম্ভাবনা দূর করা বিশেষ প্রয়োজন নহে?

বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ব্যবস্থায় যে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সে বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র-সমস্যার কোনরূপ সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে যে চোরা কারবার চলিতেছে, তাহা যে কোন সরকারের পতন ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ বলিলে তাহা অসংগত হয় না।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগে—যৌথ দায়িত্ব থাকিলেও—আবশ্যক সহযোগ আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ আমরা দেখিয়াছি, সাহায্যদান ও পুনর্বসতি বিভাগ যে সকল দ্রব্য দিতে বলিতেন, বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ তাহা দিতে কার্পণ্য করিতেন এবং এখন দেখিতেছি, মৎস্য বিভাগ জাল প্রভৃতির জন্য যে সকল উপকরণ প্রয়োজন মনে করেন, সে সকল দিতে বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের আগ্রহের একান্ত অভাব। এ সকল কথা মন্ত্রীরাই স্বীকার করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি, লোক দেখিতেছে—এক দিকে দরিদ্র সর্বস্বান্তগণ গৃহের জন্য লৌহ ও সিমেণ্ট পাইতেছে না—আর এক দিকে কলিকাতায় বিরাট বিরাট গৃহ নির্মিত হইতেছে। সে সকলের জন্য উপকরণের অভাব হয় না।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলা কয়টি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সে আন্দোলন যতই প্রবল হইতেছে, ততই সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ব্যক্তিদিগের মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, প্রথমে পণ্ডিত জওহরলাল ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুত নীতি—বিহারের সম্বন্ধে—এখন প্রয়োগে আপত্তি জানাইয়াছিলেন এবং তাহার কয়দিন মাত্র পরেই গান্ধীজী মত প্রকাশ করেন— প্রতিশ্রুতি পালনের পক্ষে বর্তমান সময় উপযোগী নহে। আর তাহার পরেই বিহারী বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াও ঐ সকল জিলার বাঙ্গালীদিগকেও হিন্দীভাষাভাষী করিয়া তুলিবার জন্য বিহারকে পরামর্শ দেন। বিহার সরকার বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলনকারী প্রভৃতির প্রতি খর দৃষ্টি রাখিবার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়াছেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ সিং জামসেদপুর হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' লিখিয়াছেনঃ—

"প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের উপর বিহারে কিরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।......

"বর্তমান কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট বাঙ্গালীদিগের উপর বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছেন, যাহাতে বাঙ্গালীরা তাহাদিগের ন্যায্য দাবী ভাষায় অথবা অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ করিতে না পারে।

"সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় 'শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের' পারিতোষিক বিতরণে আহূত হইয়া গত ১৬ই মে এখানে আসিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে সভায় উপস্থিত কোন ভদ্রলোক যাহাতে বিহারের অন্যায় স্বার্থের প্রতিবাদ করিতে না পারেন, সে বিষয়ে পুলিসের কড়া পাহারা ছিল।

"টাটা কোম্পানীর কারখানায় যাহাতে কেবল বিহারীরা বিনা সুপারিশে নিযুক্ত হয়, সে বিষয়ে গভর্নমেণ্ট কোম্পানীর মালিকদিগের উপর বিশেষ চাপ দিতেছেন।

"সম্প্রতি এক উচ্চ কর্মচারীর বক্তৃতা হইতে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এক প্রকাশ্য সভায় জানান যে, বিহার গভর্নমেণ্ট কেবল বিহারীদিগকে কারখানায় ভর্তি করিবার জন্য বিশেষ চাপ দিতেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় টাটার হাসপাতালে কাজ করিবার জন্য একজন বিহারী ধাত্রী না পাওয়ায়

পদগুলি কোন বাঙালী ও সাদার্ন ইণ্ডিয়ান ভগিনীরাই পূর্ণ করিয়া থাকেন।

"গত কয়েক বৎসর হইতে বাসস্থানের অভাবে অনেক বাঙালী কর্মচারী সুবর্ণরেখা নদীর অপর পারে—যাহা পূর্বে মানভূমে ছিল, বর্তমানে ধলভূমে আসিয়াছে—বসত বাটীর জন্য ছোট ছোট প্লট কোন জমীদারের নিকট হইতে খরিদ ও রেজেষ্টারী করিয়া লইয়াছেন এবং ঐ সকল প্লটের উপর সীমানার দেওয়াল অথবা বাড়ী তৈয়ার করিতেছেন দেখিয়া বিহার গভর্নমেণ্ট জোর করিয়া ঐগুলি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। ঐ প্লটগুলি টাটার 'নোটিফায়েড কমিটির' ভিতর অবস্থিত হইলেও বিহার গভর্নমেণ্ট ১৮ বৎসর অতীত হওয়ার পর এখন জঙ্গল তৈয়ারীর অজুহাতে বাঙালীদের তাড়াইতেছেন।"

এই অত্যাচারের কি কোন প্রতীকার নাই? পণ্ডিত জওহরলাল হইতে শ্রীরাজাগোপাল পর্যন্ত বলিতেছেন—এখন এ সব আলোচনার সময় নহে। পণ্ডিতজী বলিতেছেন, তিনি হায়দারাবাদের ও কাশ্মীরের সমস্যা লইয়া ব্যস্ত—বাঙলা-বিহার সীমার সমস্যার মত তুচ্ছ ব্যাপারে তিনি মনোযোগ দিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার সেই যুক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বাঙালীরা সব অত্যাচার নতমস্তকে সহ্য করিবে, ইহাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কিছুতেই লোকমতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য। সেই লোকমত যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিহারী বিতাড়নের দাবী করিবে, তখন যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব অনিবার্য হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সে অবস্থা কেবল পশ্চিমবঙ্গের বা বিহারের পক্ষেই অনিষ্টকর হইবে না—পরন্তু নানারূপে বিব্রত ভারত রাষ্ট্রকে যেমন বিব্রত করিবে, তেমনই তাহাতে পাকিস্থানের সুযোগ ঘটিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এ বিষয়ে জওহরলালের মত জানিয়া আসিবার পরেও যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী জিলাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের দাবী জানাইয়াছেন, সে যে লোকমতের জন্য, সকলেই জানেন। তাহার পরে শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর বিবৃতি প্রচারের পরে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি এ বিষয় কেন্দ্রী সরকারকে জানাইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রকাশ পাইয়াছিল, বিহারের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, একথা কি জন্য উত্থাপিত হয়? কিন্তু বিধানবাবু জানাইয়াছেন, তিনি সেরূপ কোন পত্র পান নাই। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা করিতে ব্যস্ত বলিয়া কি ভারত সরকার তাঁহার প্রস্তাবের কোন উত্তর দেন নাই? না—নেহরুজী মনে করেন তাঁহার বক্তৃতা হইতেই বিধানবাবু তাঁহার প্রস্তাবের উত্তর সংগ্রহ করিবেন—স্বতন্ত্র উত্তর দিবার কোন প্রয়োজন নাই?

কিন্তু বিহারের কোন মন্ত্রী বলিয়াছেন, বিহার যে সূচ্যগ্র মেদিনী দিবে, পশ্চিমবঙ্গ যেন সে আশা না করে। তাঁহার উক্তি এতই ধৃষ্ট যে, বিধানবাবু তাহার প্রতিবাদ করা কর্তব্য ও প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। কিন্তু বাঙালী তাহার প্রয়োজনে—আত্মরক্ষার প্রবল প্রয়োজনে যে বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী জিলাগুলি দাবী করিয়া চলিবে—কংগ্রেস যদি আজ তাহার প্রতিশ্রুতি অসার বলিয়া উপেক্ষা অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে বাঙালী কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষার জন্য সমগ্র ভারতকে প্ররোচিত করিবে।

আসানসোল সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ বিষয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সেই অনুরোধের ফল কি হইয়াছে, এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩ হাজার লোক লইয়া "টেরিটোরিয়াল" সেনাদল ও ১০ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠিত করিবেন, স্থির করিয়াছেন। কেন্দ্রী সরকার তাঁহাকে জানাইয়াছেন, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার "টেরিটোরিয়াল" সেনাদলে আরও লোক চাহেন, তবে তাঁহারা তাহাও মঞ্জুর করিবেন। স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী বিলাতের "হোম গার্ডসের" মত কেবল যুদ্ধের জন্যও নহে, পরন্তু অগ্নিদাহ, ভূমিকম্প প্রভৃতিতেও সরকারকে সাহায্য করিবে। এই বাহিনীর কাজ কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকিবে না। সমগ্র প্রদেশে যখন যেস্থানে প্রয়োজন অনুভূত হইবে, সরকার তখনই তথায় বাহিনীর লোকদিগকে কাজের জন্য পাঠাইতে পারিবেন।

আমরা জানি, ইহার পূর্বে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৈনিক বাহিনী বিস্তারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সর্দার বলদেব সিংহ বলিয়াছিলেন, সেজন্য শিক্ষার ও অস্ত্রাদি প্রদানের ব্যবস্থা কেন্দ্রী সরকার করিতে অক্ষম। এখন বিধানবাবু যাহা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, সে সময়ে যে সকল অসুবিধা অনুভূত হইয়াছিল, এখন সে সকল অতিক্রম করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি ভারত রাষ্ট্রের সমর বিভাগে স্বতন্ত্র বাঙালী সেনাদল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম জার্মান যুদ্ধের সময় অনেক চেষ্টায় ভারত সরকার "বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোর" গঠনে সম্মতি দিয়াছিলেন। আজও স্বতন্ত্র বাঙালী সেনাদল নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য কম্যুনিস্ট শ্রীজ্যোতি বসুকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পক্ষ হইতে সরকারের আদেশ বে-আইনী বলিয়া হাইকোর্টে মুক্তির জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বিধানবাবুর মন্ত্রিমণ্ডলে এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ মন্ত্রী শ্রীকিরণশঙ্কর রায় আবার একটি চমকপ্রদ বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঙলার কম্যুনিস্টরা মাদ্রাজের ও ব্রহ্মের কম্যুনিস্টদিগের সহিত যোগরক্ষা করিয়া সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাইবার আয়োজন করিতেছেন। যে সকল ক্ষেত্রে সরকার কোন উক্তির জন্য প্রমাণ বা কার্যের জন্য কারণ প্রদর্শন করা প্রয়োজন মনে করেন না—সে সকল স্থানে সরকারের কার্যের সমালোচনা করা নিষ্ফল। কিন্তু সেই কার্যের সমর্থন করা না করা লোকের সরকারের প্রতি আস্থার উপর নির্ভর করে। সেই আস্থার ভিত্তি কিরূপ তা অতি অল্পদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিধানবাবুর মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্তনেই বুঝিতে পারা গিয়াছে।

---

# হিন্দুসমাজ ও তাহার ইতিহাস

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দু সমাজের মধ্যে কৌলিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে শোষণ এবং শ্রেণীগত অসমতা থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন নূতন স্থানে গ্রামপত্তনের সম্ভাবনা, বিদেশে শিল্পজাত মাল বিক্রয় এবং প্রতিকূল অথবা জাতির দেশাচার বা কুলাচার পালনে স্বাধীনতা থাকার কারণে তাহা দীর্ঘ-দিন ধরিয়া টিঁকিয়া রহিল। মুসলমান আমলে আমাদের অনুমান হয়, শহরের আশপাশে প্রাচীন ব্যবস্থার কিছু অদলবদল হইলেও মোটের উপর উহা কায়েমী অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছিল; এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিল্পসামগ্রী উৎপাদন ও বিদেশে বিক্রয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ হইতে প্রভূত ধনসম্ভার আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শত বৎসর এই সম্পদের লোভে পাঠান, তুর্ক বা মুঘল জাতি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে; খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতেও তেমনই পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ বণিককুল ভারতে আকৃষ্ট হইয়া নূতন এবং আরও সূক্ষ্ম উপায়ে ধনসংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকে। শেষ দুই শতাব্দীর মধ্যে ইউ-রোপের ধনোৎপাদন ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট পরি-বর্তন সাধিত হয় এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যেও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সম্প্রতি শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র সিংহ 'Studies in Pre-British Economy hundred years ago' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে ইহার এক সারবান বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠককে বইখানি পড়িয়া দেখিতে বলি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি হিন্দু সমাজ জীবনের দিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকায় আমরা কেবল এক দিক হইতে বৃটিশ অধিকারকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিব।

## রায়পুর

বর্ধমান জেলার উত্তরে এবং বীরভূম জেলার দক্ষিণ সীমানা দিয়া অজয় নদ প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা বিহারের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত হইয়া পূর্বমুখে বহিয়া ভাগী-রথীর সহিত কাটোয়া গ্রামের নিকট সম্মিলিত হইয়াছে। অজয়ের উভয় কূল অতি উর্বর। এক সময়ে অজয় নদ পথেই এ অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য চলাচল করিত। ইহার পাশে প্রাচীনকাল হইতে সমৃদ্ধিশালী গ্রামের পত্তন হইয়াছিল। ইচ্ছাই ঘোষের দেউল অনুমানিক ৯ম শতাব্দীতে রচিত হয়। সুপুর গ্রামে, দেউলিতে ও অপরাপর স্থানেও বহু উৎকৃষ্ট পাথরের দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কিছু পাল, কিছু সেনবংশের রাজত্বের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। বোলপুর শহরের অনতিদূরে সুপুর গ্রাম অবস্থিত। এক সময়ে এখানে ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র ছিল। নদীপথে লবণ আমদানি হওয়ার কারণে আজও সুপুর গ্রামে এক অংশ নুনেডাঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। সুপুরের পশ্চিমে মির্জাপুর এবং তাহার পাশেই রায়পুর গ্রাম। রায়পুর গ্রামে সুপুরের মত প্রাচীন ভগ্নাবশেষ নাই; কিন্তু রায়পুরের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা ইংরেজ অধিকারের বিস্তৃতি ও হিন্দু সমাজের উপর তাহার প্রভাবের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ব্যপদেশেই আগমন করেন। ফরাসীরাও তাহাই করিয়াছিলেন কিন্তু ফরাসীগণ মনে করেন যে, মুঘল রাজ্যশাসন দুর্বল হওয়ার ফলে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মারাঠাশক্তি ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির অভ্যুত্থানের ফলে যে অরাজকতা দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যে সত্যসত্যই লাভবান হইতে হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলিবে না। একপক্ষ বা অপর পক্ষকে সমর্থন করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সে চেষ্টায় ফরাসীগণ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইংরেজও সে খেলায় যোগ দেন। দুই শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের জয় হয় এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসাবাণিজ্য অপেক্ষা ক্রমশ অন্যদিকে বেশি জড়াইয়া পড়েন। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদারী গ্রহণ করার পর কোম্পানির মন ক্রমে অন্যদিকে চলিতে লাগিল। সেই সময় দেশে অরাজকতা এবং রাজশক্তির অদূরদর্শিতার ফলে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, বহুলোক প্রাণত্যাগ করে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া যায়। লোকে তখন একটু স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলিয়া খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়; অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যে পুরাতন বর্ণব্যবস্থা মানুষের খাওয়া পরার আর সুব্যবস্থা করিতে পারিতে-ছিল না। এক দিক হইতে বলা চলে যে, উৎপাদন ব্যাপারে বর্ণব্যবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, বর্ণব্যবস্থার আত্মরক্ষার কোনও ক্ষমতা ছিল না। মুসলমান অধিকারকালে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। কারণ, মুসলমানগণ ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বিপ্লবসাধন করেন নাই। এদেশে প্রবেশ করিয়া বাহুবলের দ্বারা তাঁহারা চলতি ধনতন্ত্রের মধ্যে মুখ্য আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং রাজস্ব আদায় করিয়া শাসককুল নিজেদের পরগাছা সমাজের পুষ্টিসাধন করিতেন। মূল গাছ মরে নাই, মারার অভিলাষ অথবা কারণও মুসলমানদের ছিল না। কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পরে পরেই ইউরোপের উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগান্তর সাধিত হইল, ইউ-রোপীয় শক্তি স্বীয় রাষ্ট্রবল বা বাহুবল প্রয়োগ করিয়া ভারতের ধনতন্ত্রকে নিজেদের জোয়ালে জুতিলেন এবং এই সময়ে বর্ণ-ব্যবস্থার দুর্বলতা, অর্থাৎ আত্মরক্ষা করার ক্ষমতার অভাব, অতি ভয়ঙ্করভাবে প্রকট হইয়া উঠিল।

এই পটভূমিকা পশ্চাতে রাখিয়া এবার রায়পুরের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাক্। পূর্বেই বলিয়াছি, সুপুরের তুলনায় রায়পুর অতি নূতন গ্রাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বোলপুরের সন্নিকটে জন চীপ নামে জনৈক কুঠিয়াল বাস করিতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ তখন স্বাধীনভাবে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার উত্তর ভাগে চন্দ্রকোণা নামক স্থানে এক প্রাচীন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশের বাস ছিল। সেই বংশের শ্রীলালচাঁদ সিংহ অজয় নদীর নিকটে রায়পুরে বসবাস করিয়াছিলেন। মুসলমানী অমলে বা তাহার পূর্বকালেও ভারতবর্ষ হইতে বহু তাঁতের কাপড় বিদেশে রপ্তানি হইত বলিয়া নানাস্থানে তাঁতিদের ঘন বসতি ছিল। লালচাঁদ চন্দ্রকোণা হইতে এক হাজার তাঁতি আনিয়া মির্জাপুর, রায়পুর প্রভৃতি গ্রামে বসাইয়াছিলেন। লালচাঁদের পুত্র শ্যামকিশোর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী জন চীপের নিকট মুৎসুদ্দির কাজ করিতেন। তিনি সেই সহস্র তাঁতি দ্বারা প্রচুর মোটা থান উৎপাদন করাইয়া এজেন্সিতে সরবরাহ করিতেন। প্রত্যহ শ্যামকিশোরকে নাকি প্রত্যেক তাঁতি এক টাকা করিয়া নজরানা দিত। তাঁতের কারবারের প্রসাদে সিংহ বংশের প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল।

সে সময়ে বীরভূমের অধিকার রাজ-নগরস্থিত "রাজা" উপাধিধারী মুসলমান ফৌজদারগণের আয়ত্তে ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের বশে তাঁহাদের অর্থ কষ্ট ঘটে। চীপ সাহেবের বাহুবলের কারণে দেশে সাধারণ অরাজকতার মধ্যে সিংহ পরিবারের কারবার শান্তিতে চলিতেছিল। তাঁহাদের হাতে সঞ্চিত অর্থের অভাব ছিল না। সেই অর্থের বিনিময়ে রাজনগরের রাজপরিবার সিউড়ি হইতে রায়-পুর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের জমিদারী সিংহ-বংশের নিকট বিক্রয় করেন। যাঁহারা তাঁত-শিল্পীদের খাটাইয়া রোজগার করিতেছিলেন, তাঁহারা ভূম্যধিকারীতে রূপান্তরিত হইলেন।

লালচাঁদের পুত্র শ্যামকিশোর; শ্যামকিশোরের পুত্র জগমোহন, ব্রজমোহন, ভুবনমোহন ও মনোমোহন। চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জমিদারী দেখিতেন, ভুবনমোহন সেরেস্তার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং মনোমোহন সংগীতাদি বিদ্যার চর্চা লইয়া কালক্ষেপ করিতেন বলিয়া প্রকাশ। মনোমোহনের চারপুত্র তাহার মধ্যে সিতিকণ্ঠ শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বা লর্ড সিংহের পিতা। সিতিকণ্ঠ, শ্যামকিশোর প্রভৃতি সে আমলে উত্তমরূপে ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সিতিকণ্ঠ ফারসী ভিন্ন ইংরেজী শিক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন।

সিংহ বংশের জমিদারী চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিকগণ এই অঞ্চলে লাক্ষা, চিনি, নীল প্রভৃতির এক একটি কারখানা আরম্ভ করিয়া দেন। বিলাতে শিল্পোৎপাদনের যে সকল উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইতেছিল, ইংরেজ বণিকগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আওতা ছাড়িয়া নিজেরাই একে একে ভারতে সেই সকল উন্নত উপায়ে শিল্পোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। চীপ সাহেবের সহায়তায় ডেভিড আর্সকিন নামক এক ব্যক্তি রায়পুরের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে নীলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮২৮ সালে চীপের মৃত্যু ঘটে এবং তৎপরে ১৮৩৭এ ডেভিড আর্সকিনের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পুত্র হেনরি আর্সকিন নূতন কোম্পানি করিয়া নীলের চাষ চালাইতে থাকেন। প্রবাদ যে সেই সময়ে সিংহ বংশের সিতিকণ্ঠ সিংহও ঐ কারবারে তাহাদের সহিত যোগ দেন। ইংরেজ বণিকগণ একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদারকে স্বপক্ষে লাভ করিয়া ব্যবসায়ের পথ সুগম করিয়া লইলেন। সিতিকণ্ঠের জমিদারী চলিতে লাগিল, পুত্রগণ কলিকাতায় ফারসী পড়া ছাড়িয়া ইংরেজী পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। সিতিকণ্ঠ আর্সকিন পরিবারের সহায়তায় পুত্র নরেন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের জন্য বিলাতে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তাঁহার দ্বারা পরিচালিত নীল কুঠীর ভগ্নাবশেষ আজও নিকটবর্তী গ্রামে ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সিতিকণ্ঠের পুত্র সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী হইয়াছিলেন এবং উত্তরকালে বিহারের প্রথম ভারতীয় প্রদেশপালরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রায়পুরের সিংহ পরিবারের জমিদারী আজও বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হওয়ার ফলে এবং জমিদারী হইতে অনুরূপ আয় বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায়, ক্রমে পরিবারের অনেকে ডাক্তারি, আইনব্যবসায়, নানাবিধ সরকারী চাকুরীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছেন। নীল বা তাঁতের কারবারে আর তখন লাভের আশা ছিল না।

বর্ণব্যবস্থা অনুসারে সিংহপরিবারের যাহা করণীয় ছিল, সে বৃত্তি অনুসরণ করিয়া থাকিলে তাঁহাদের নামই আমরা আজ হয়ত শুনিতে পাইতাম না। কিন্তু ইংরেজী ধনতন্ত্রের আঘাতে যখন স্রোত অন্যদিকে বহিতে লাগিল তখন সেই স্রোতে গা ঢালিয়া সিংহপরিবার কখনও ব্যবসায়ী, কখনও ভূম্যধিকারী, কখনও কারখানার মালিক, কখনও বা রাজসরকারের প্রসাদে নানাবিধ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিলেন। বর্ণ ব্যবস্থা সেই পরিবর্তনের স্রোতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

### বোলপুরের উদ্ভব ও বিভিন্ন পল্লী

রায়পুর হইতে বোলপুর বেশি দূরে নয়, ব্যবধান প্রায় ৩।৪ মাইল হইবে। অজয় নদের পথে যে বাণিজ্য চলিত, তাহা বর্ধমান হইতে ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বিস্তারের সহিত কক্ষচ্যুত হইয়া রেলপথে চলিতে আরম্ভ করিল। বোলপুর রেল স্টেশনে ব্যবসায়ের সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়া যে ছোট শহর গড়িয়া উঠিল, তাহা আজ একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইয়াছে। বীরভূম ধানের দেশ। ১৯১৪-১৮র মহাযুদ্ধের পর ধানের দর খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ধানের কল স্থাপন করিয়া ধনীরা তখন খুব লাভবান হইয়াছিলেন। দ্রুত লাভের আকর্ষণে যাহারই [illegible] অর্থ ছিল সে ধানের কলে বা ধানের কারবারে তাহা খাটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ফলে বোলপুরে আজ কুড়িটির উপর ধানকল স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার প্রয়োজনে আশপাশে গ্রামে [illegible] গরুর গাড়ী এবং গাড়ীর চালক দেখা দিয়াছে। যে সকল গ্রাম্য নারীরা পূর্বে ধান-ভানা করিয়া অন্নসংস্থান করিত, তাহারা [illegible] পড়িয়াছে। শহর বাজার থাকার কারণে [illegible] আশপাশে তরিতরকারীর চাষ [illegible]। এইরূপে নানাবিধ [illegible] [illegible] চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতেছে।

[illegible] প্রভাবে সমাজ ব্যবস্থার কি কি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের [illegible] বিষয়। বোলপুরের [illegible] [illegible] পাই, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে অনাচার প্রবেশ করিয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] বিষয় নহে। ধানকল [illegible] [illegible] ধানের দর বৃদ্ধি পাওয়ায়, ধানের চাষ [illegible] কিছু বাড়িয়াছে সত্য; কিন্তু আজ [illegible] [illegible] খাদ্যের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত না [illegible] অর্থের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। [illegible] আগে চামড়ার কাজ করিত, আজ চামড়া [illegible] [illegible] পাকাইয়ের জন্য চালান যায়। [illegible] কারবারও কলের সূতার উপর [illegible] [illegible] বলিয়া, কখনও চলে কখনও চলে [illegible] কলের মালিকদের প্রয়োজনের চাপে তাঁতি-[illegible] জীবন পরাধীন হইয়া গিয়াছে। কামারের [illegible] ভাল চলে না, বহু জিনিস কলে [illegible] হইয়া সস্তায় শহরবাজারে বিক্রয় হয়। [illegible] বিভিন্ন শিল্পকুল দিশাহারা হইয়া [illegible]। কেহ ভূমিহীন চাষী বা মজুরে [illegible] হইয়াছে, কেহ দেশত্যাগী হইয়া শেষে [illegible] গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার আর খোঁজ [illegible] যায় না।

[illegible] চাষী হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঔষধের দোকান [illegible], কায়স্থ; সদ্গোপ, উগ্র ক্ষত্রিয় [illegible] চাকরি করিতেছে, কোথাও জুতারের [illegible], কোথাও জুতার দোকান খুলিয়াছে। [illegible] ব্যবস্থা অনুসারে যাহার যাহা বৃত্তি ছিল, [illegible] তাহা ধরিয়া থাকিতে ভরসা পায় না। ফলে জাতিভেদ অর্থনীতির ক্ষেত্র পরিহার করিয়া শুধু সামাজিক ক্রিয়াকরণে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

শুধু শহর বাজারেই এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা নহে। গ্রামদেশও উপরোক্ত আর্থিক এবং সামাজিক বিপ্লবের ফলে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাঙলা দেশে এই পরিবর্তন কোন্ ধারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহার গতির কোনও দিশা পাওয়া যায় কিনা, তাহার সংখ্যামূলক আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা বীরভূমের একটি গ্রামের লোকসংখ্যা ও বৃত্তি-বিচার করিয়া বর্তমান অধ্যায় শেষ করি।

### যাজিগ্রাম

বীরভূম জেলার উত্তরভাগে, মুর্শিদাবাদ জেলার সীমারেখার নিকটে যাজিগ্রাম নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। আজ সেখানে ২০৬৫ লোকের বাস। ইহাদের সংখ্যা ও বৃত্তির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গ্রহাচার্য, কুমার, ডোম, জেলে, কামার, ছুতার, নাপিত প্রভৃতি জাতি মোটামুটি স্ববৃত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মুচি মজুর হইয়াছে, রাজবংশী মাছ না ধরিয়া মজুরী করে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য চাষের দিকে মন দিয়াছে; মোটের উপরে স্ববৃত্তি হইতে যেন চাষ এবং মজুরীর দিকের সমাজের মধ্যে ঝোঁক বেশী দেখা যাইতেছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত আছে: যে সকল জাতির জল চলে না, তাহাদের সংখ্যা ২০৬৫-এর মধ্যে ১৪৮৫ জন অর্থাৎ টাকায় ৸৶১০ মত লোক সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং মজুরের মধ্যে তাহাদেরই সংখ্যা বেশী।

**থানা মুরারই অন্তর্গত ৯নং ইউনিয়ন যাজিগ্রাম মধ্যে যাজিগ্রামের মোটামুটি বিবরণ**

| লোকের শ্রেণী | | পরিবার সংখ্যা | লোক সংখ্যা | পেশা |
|---|---|---|---|---|
| ১। মুচি | (অজলচল) | ৬৫ | ৩২৫ | মজুর শ্রেণী |
| ২। ভুঁইমালি | (ঐ) | ৪০ | ১৫০ | স্ববৃত্তি ও মজুর ও দুই ঘর চাষী |
| ৩। ফুলমালি | (ঐ) | ৭ | ২৫ | মজুর শ্রেণী |
| ৪। রাজবংশী | (ঐ) | ১০ | ৩৫ | মজুর শ্রেণী |
| ৫। ভড় | (ঐ) | ১২ | ৩৫ | স্ববৃত্তি চিড়া তৈরী ও মজুর |
| ৬। মাল | (ঐ) | ৮০ | ৪০০ | মজুর শ্রেণী. |
| ৭। কোনাই | (ঐ) | ১৫ | ৩৫০ | মজুর শ্রেণী, ৫ ঘর চাষী |
| ৮। মাহীর | (ঐ) | ১ | ৫ | মজুর |
| ৯। ডোম | (ঐ) | ৫ | ২০ | স্ববৃত্তি |
| ১০। কোঁড় সাঁওতাল | (ঐ) | ২৫ | ৬৫ | মজুর শ্রেণী |
| ১১। জেলে | (ঐ) | ১১ | ৫৫ | স্ববৃত্তি, ২ ঘর চাষ |
| ১২। বৈরাগী | | ৫ | ১৫ | স্ববৃত্তি, ১ ঘর চাষ |
| ১৩। গ্রহাচার্য | | ১ | ৫ | স্ববৃত্তি |
| ১৪। গোয়ালা | | ৮ | ২৫ | স্ববৃত্তি ও চাষ |
| ১৫। সদ্গোপ | | ৫ | ১০ | মজুর |
| ১৬। কুমার | | ৪ | ১০ | স্ববৃত্তি |
| ১৭। কামার | | ৬ | ২০ | স্ববৃত্তি, ১ ঘর চাকরী |
| ১৮। ছুতার | | ১ | ৫ | স্ববৃত্তি |
| ১৯। নাপিত | | ৭ | ৩০ | স্ববৃত্তি |
| ২০। রাজপুত | | ৪ | ১৫ | মজুর শ্রেণী |
| ২১। তেলে | | ২ | ৫ | স্ববৃত্তি ও চাষ |
| ২২। সাহই | | ৪০ | ২০০ | চাষ ও স্ববৃত্তি, ২ ঘর মুদিখানার দোকান, ৩ ঘর চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও বেকার |
| ২৩। ছত্রি | | ৬ | ১৫ | চাষ ও ১ ঘর চাকরী |
| ২৪। ভট | | ২ | ১০ | চাকরী |
| ২৫ ধোপা | (অজলচল) | ২ | ১০ | স্ববৃত্তি |
| ২৬। কায়স্থ | | ২৮ | ১২০ | চাষ চাকরী, ২ ঘর চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও বেকার |
| ২৭। বৈদ্য | | ১২ | ৫০ | চাষ, কবিরাজী, চাকরী, বেকার |
| ২৮। ব্রাহ্মণ | | ৩০ | ১৫০ | চাষ, চাকরী, ১ ঘর ডাক্তার ও বেকার |

(ক্রমশঃ)

বিগত ৩০শে মে নিরাপত্তা পরিষদ প্যালেস্টাইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে আরব ও ইহুদীদের চার সপ্তাহের জন্য সন্ধি করতে অনুরোধ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হয় যে, যুদ্ধ-বিরতি কালে কোন দেশ যেন প্যালেস্টাইন, মিশর, ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, ট্রান্সজর্ডান, সৌদী আরব এবং য়েমেনে কোন প্রকার যুদ্ধ-সামগ্রী আমদানী বা রপ্তানি না করে। আরব এবং ইহুদী—উভয় পক্ষই এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্যালেস্টাইনে লড়াই বন্ধ হয়নি।

ইহুদীরা মনে করে অস্ত্র আমদানী বা রপ্তানি বন্ধ করার অর্থ হলো আরব দেশগুলির মধ্যে যে সমস্ত যুদ্ধ-সামগ্রী ইতিমধ্যে বৈদেশিক সহায়তায় পৌঁছে গেছে, অথচ আরবদের হাতে এখনও তুলে দেওয়া হয়নি, সেগুলি আরবদের হাতে তুলে না দেওয়া। তারা আরও দাবী করে যে, অবরুদ্ধ জেরুজালেমে ইহুদীদের খাদ্য সরবরাহ করতে দিতে হবে। তাদের তৃতীয় দাবীঃ আরব ও ইহুদীরা পরস্পর এখন যে যে জায়গা দখল করে আছে, যুদ্ধ-বিরতি কালেও তারা সেখানেই থাকবে।

আরবরা মনে করে এই যুদ্ধ-বিরতির অর্থই হলো প্যালেস্টাইনে আরও ইহুদী আমদানীর সুযোগ দেওয়া। সুতরাং তাদের প্রথম দাবী হচ্ছে, যুদ্ধ-বিরতিকালে প্যালেস্টাইনে-বাইরে থেকে ইহুদী প্রবেশ করতে পারবে না। দ্বিতীয় দাবীঃ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে যে সীমানা আরব অধিকারে ছিল, সেই সীমানা আবার আরবদের অধিকারে ফিরিয়ে দিতে হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবকে ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা করার ফলে প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ থামেনি। ইহুদীদের তৃতীয় দাবীর কারণ এই যে, জাতি সংঘ নির্দিষ্ট ইহুদী রাষ্ট্রের কল্পিত এলাকা তারা প্রায় সম্পূর্ণ দখল করে ফেলেছে, সুতরাং স্থিতাবস্থায় যদি তাদের সে অধিকার থেকে বিচ্যুত করা না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা কায়েম হয়ে যেতে পারবে। আরবদের আশংকা একেবারে অমূলক নয়।

ইতিমধ্যে আরব ও ইহুদীরা প্রাণপণে পরস্পরের রক্তপাত করছে। প্যালেস্টাইনের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ কাউণ্ট বার্ণাদোত এই বৃদ্ধ বয়সে কায়রো-আম্মন, আম্মন-কায়রো করে বেড়াচ্ছেন। যুদ্ধ থামেনি।

সহজে যুদ্ধ-বিরতি হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেননা এমন কোন উপায় এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি যার দ্বারা আরবদের অধিকার এবং ইহুদীদের দাবী একই সঙ্গে বজায় থাকবে। রুশিয়া নিরাপত্তা পরিষদকে বলপ্রয়োগ করতে পরামর্শ দিয়েছিল। তাতে রুশিয়া ছাড়া অন্য কোন শক্তির পক্ষে উপভোগ করা সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। কেননা এখন একমাত্র রুশিয়াই সবচেয়ে আগে ভূমধ্যসাগরে বেরিয়ে এসে প্যালেস্টাইনে ঢুকে পড়তে পারে। বলা বাহুল্য, এ ফল রুশিয়ার পক্ষে নিষিদ্ধ। তাই প্যালেস্টাইনে কোন শক্তি গায়ের জোরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও হয়তো পারবে না। আরও বহু আরব এবং ইহুদীদের নিজেদের নির্বুদ্ধিতার ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।

## চেকোশ্লোভাকিয়া

চেকোশ্লোভাকিয়ার সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বিগত ৩১শে মে প্রকাশিত হয়েছে। কম্যুনিস্ট-প্রভাবান্বিত জাতীয় ফ্রন্ট গ্রাহ্য ভোটসংখ্যার ৮৯.২৮% ভাগ পেয়েছে। নাৎসী জার্মানী এবং ফ্যাসিস্ট ইতালীতে নির্বাচনে যে রকম একটিমাত্র সরকারী নামের তালিকা ভোটদাতাদের সামনে উপস্থিত করা হতো এবং সেই তালিকাটিকে যেমন হয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কিংবা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হতো, এখানেও তাই হয়েছে। ভোটদাতাদের সামনে কেবল একটি মাত্র নামের তালিকা ফেলে দেওয়া হয় এবং সমর্থন করতে বলা হয়। ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিল ৮০,০৫,৮৮৭ তার মধ্যে গ্রাহ্য ভোটের সংখ্যা ৭২,০৪,২৫৬ জাতীয় ফ্রন্ট পেয়েছে ৬৪,৩১,৯৬৩ এবং সাদা কাগজ ফেরত পাঠিয়েছে ৭,৭২,২৯৩ জন। যারা ভোট দেয়নি তাদের সরকার-বিরোধী দলের মধ্যেই ধরতে হবে এইজন্য যে, নির্বাচনে যারা যোগদান করবে না তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে বলা হয়েছিলো। তা ছাড়া যেহেতু সরকারী তালিকার বিরুদ্ধতা করতে হলে সাদা কাগজ পাঠান ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, সেই হেতু সাদা কাগজ প্রেরকরা বিরুদ্ধ দলের মধ্যেই পড়েন। নানা রকমের রাজনৈতিক চাপ ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিরুদ্ধ দলের প্রতিপত্তি যে নেহাৎ নগণ্য নয় তা নির্বাচনের ফলাফল থেকেই বোঝা গেছে। অনেক ভোটদাতা তাঁদের ভোটপত্রের সঙ্গে মাসারিক, বেনেস ও অন্যান্য চেক দেশপ্রেমিকের ছবি পাঠিয়েছে।

তা সত্ত্বেও এ কথা স্পষ্ট যে, পূর্ব ইউরোপের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশকে আজ একনায়কতন্ত্রের হাড়িকাঠে গলা পেতে দিতে হলো। স্যুদিনল চুক্তি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাস্রোত যে পথে চলেছে তাতে এ রকম পরিণতি একেবারে অচিন্তনীয় ছিল না। যুদ্ধের পরে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা দল গড়বার যে রকম সুযোগ পেয়েছিলো, রুশ-অধ্যুষিত চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতন্ত্রীরা সে সুযোগ পায়নি। গণতান্ত্রিক বিরোধের কথা ছেড়ে দিলেও নির্বাচন যে খুব সততার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়নি এ সন্দেহও একেবারে অমূলক নয়। শোনা গেছে, যেখানে বিদেশী সাংবাদিকরা ও ফটোগ্রাফাররা উপস্থিত ছিল, সেখানে কর্মচারীদের মধ্যে একটা অতিরিক্ত সাধুতার ভাব দেখা গিয়েছিল। আর যেখানে বৈদেশিক কোন দর্শক ছিল না, সেখানে কর্মচারীরা নাকি মুক্ত বিবেকে অবৈধ আচরণ করেছে।

## ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে তাঁদের দ্বিতীয় বিবরণীতে জাতি সংঘের গুড অফিসেস কমিটি বলেছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয়রা একমত হতে পেরেছেঃ (১) ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, স্বাতন্ত্র্য, গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিশেষত্ব; (২) ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা; (৩) কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির শাসনভার ও সম্পর্ক; (৪) ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ক্ষমতাবলী ও উদ্দেশ্য।

যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে এখনও মতানৈক্য রয়েছে সেগুলি হচ্ছেঃ (১) অন্তর্বর্তী কালে ওলন্দাজদের কাছে রাষ্ট্রগত ক্ষমতা হস্তান্তর; (২) যে সকল ক্ষমতা এখন কোন যোগদানকারী প্রদেশের নেই বা ভবিষ্যতে থাকবে না সেগুলির হস্তান্তরকরণ; (৩) গণভোটের তারিখ, গণভোট গ্রহণের এলাকা এবং ওলন্দাজ নির্বাচিনির ভবিষ্যৎ।

উপরোক্ত খবরটি ৩০শে মে তারিখের। এর পর তিন চার দিনের মধ্যেই মতানৈক্যগুলি এত বেশি প্রকট হয়ে ওঠে যে, হেগ থেকে একটি খবরে জানা যায় যে, ওলন্দাজরা যদি অচিরে ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক থেকে কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার উত্তর না পায়, তা হলে আলোচনা ভেঙে যাবে। এ আলোচনা ভেঙে যাওয়ার অর্থ হলো জাতি সংঘের গুড-অফিসেস কমিটির কাজ খতম হয়ে যাওয়া। যে কয়েকটি বিষয়ে ইন্দোনেশীয়রা পরিষ্কার জবাব দিচ্ছে না বলে ওলন্দাজদের ধারণা, তার মধ্যে একটি, অর্থাৎ গণভোটের কথা উপরেই বলা হয়েছে। আর একটি বিষয় হলো রুশিয়ার সঙ্গে রিপাবলিকের কূটনৈতিক বিনিময়। ওলন্দাজদের মতে এই বিনিময় অসিদ্ধ, কেননা অন্তর্বর্তী কালে ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌমত্ব তাদের কাছেই বর্তাবে। তাদের অমতে রুশিয়ার সঙ্গে দূত বিনিময় করাটা তাদের মনঃপূত হয়নি।

উপরোক্ত খবর দুটি জাতিসঙ্ঘের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। জাতিসঙ্ঘ প্যালেস্টাইনে এখন পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। কাশ্মীরে পারেনি এবং ইন্দোনেশিয়াতেও পারছে না। এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসীদের সম্পর্কেও জাতিসঙ্ঘ ন্যায়বিচার করতে পারেনি।

**দক্ষিণ আফ্রিকা**

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সত্যাগ্রহ পরিষদ সত্যাগ্রহ বন্ধ করে দেবার সংকল্প করেছে। পরিষদ ডক্টর মালানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। শ্রীযুত মণিলাল গান্ধী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, সরকারী বৈরীতা একেবারে খোলাখুলিভাবে হওয়াই ভালো, তাতে শাসকেরও সুবিধা, শাসিতেরও।

জেনারেল স্মাটসের ইউনাইটেড পার্টি যখন ডক্টর মালানের ন্যাশনালিষ্ট পার্টির কাছে পরাজিত হলো, তখন পৃথিবীর সব দেশেই ভারতীয়রা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো। তাদের সে উদ্বেগ যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়া গেছে।

কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে নিজেদের ন্যায্য দাবী রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিতে হলে একটা প্রাথমিক সর্ত আছে। তা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্বন্ধে সত্যিকারের দরদ। বলা বাহুল্য ভারতীয়দের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্র দরদ নেই। বরং অপরিসীম ঘৃণাই আছে এবং তার জন্য তাঁরা লজ্জিত নন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোন আন্দোলন করার অর্থ যে কামানের মুখে সোজা এগিয়ে যাওয়ার সামিল তা দক্ষিণ আফ্রিকার দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন। অত্যাচারের তীব্রতা একটা বিশেষ সীমা ছাড়িয়ে গেলে কোন রকম প্রতিরোধ যে শুধু অকেজো হয়ে পড়ে তা নয়, একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা আজ সেই অবস্থার সম্মুখীন। ভারত সরকার কি তবু তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে থাকবেন।

**রাশিয়াতে ভারত বিদ্যার চর্চা**

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়াতে প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে চর্চা আরম্ভ হয়। বৃটেন ও ফ্রান্সও এই সময়েই ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহলী হয় অবশ্য তখন তারা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্যস্ত ছিল এবং রাশিয়ারও এ রকম কোনো অভিসন্ধি ছিল কিনা তাও অপ্রকাশিত আছে। যাই হোক যতদূর জানা যায় আথনাসি নিকিতিন নামে জনৈক রাশিয়ান ১৪৬০ সালে ভারতে আসেন এবং মনে হয় তিনিই প্রথম ভ্রমণকারী। এর কয়েকশত বৎসর পরে জি এস লেবেডফ্ নামে একজন রাশিয়ান গীতিশিল্পী আমাদের দেশে আসেন। তিনি এদেশে প্রায় চব্বিশ বৎসর বাস করেছিলেন এবং কলকাতা শহরে প্রথম রঙ্গালয় তিনিই স্থাপন করেন, এজরা ষ্ট্রীটের কাছাকাছি কোনো অঞ্চলে। তিনি আমাদের দেশে কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করেন, হিন্দুস্থানীতে একখানি ব্যাকরণ আর ভারতীয় ভাষা পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। বই দুখানি যথাক্রমে ১৮০১ ও ১৮০৫ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে ভগবদ্গীতা ও অভিজ্ঞান শকুন্তলার রুশ ভাষায় তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৭৮৮ ও ১৭৯২ খৃস্টাব্দে। তখন অবশ্য রাশিয়াতে ধারাবাহিকভাবে ভারতবিদ্যার চর্চা হ'ত না, সেইজন্য মনে হয় কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো রাশিয়ান পণ্ডিত সংস্কৃত বিদ্যা আয়ত্ত করে উক্ত বই দুখানির অনুবাদ করেছিলেন।

এর পর থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে রাশিয়ানরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। রুশ আকাডেমি ও সেন্ট পিটার্সবার্গের ওরিয়েন্টাল ফ্যাকাল্টিতে ভারতীয় কৃষ্টি বিভাগ খোলা হয়। ক্রমে ভারতীয় বিদ্যা বিষয়ে চর্চা কাজান, খার্কফ কিয়েফ, ওডেসা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরম্ভ হল। মূল সংস্কৃত ব্যতীত, ভারতের নানা ভাষা ও বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধেই বেশী চর্চা হয়। সংস্কৃত ভাষার একটি অভিধান এবং কয়েকখানি ব্যাকরণও প্রকাশিত হয়। পালি ভাষারও একখানি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। সেই ব্যাকরণের আবার ইংরেজী ও ফরাসীতে তর্জমা হয়। প্রাচীন ভারতীয় আচার পদ্ধতি, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি বিষয়েও অনেক পুস্তক, মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। সাহিত্যের মধ্যে হিতোপদেশ ও মেঘদূতের অনুবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বিপ্লবের পর ১৯২০ সালে মস্কো ও লেনিনগ্রাডে প্রাচ্য বিদ্যামন্দির স্থাপিত হয়। ভারতের নানা ভাষা, যথা হিন্দী, বাঙলা মারাঠী, গুরুমুখী, তামিল উর্দু ইত্যাদি এই প্রাচ্যবিদ্যামন্দিরে শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দী ভাষা শিক্ষা, উর্দুভাষা শিক্ষা এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমচন্দের সাহিত্য ও তুলসীদাসের রামচরিতমানস নিয়ে কয়েকজন ছাত্র এখন গবেষণায় নিযুক্ত আছে। প্রেমচন্দের ছোট গল্পের অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের বহু বই রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বেতাল-পঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র, এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে মহাভারত ও ঋগ্বেদের অনুবাদ হচ্ছে। খালিবের গজল, বাগ ও বাহার, গঙ্গোত্রী ইত্যাদি উর্দুতে লিখিত পুস্তকগুলিরও তর্জমা হয়েছে। ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা ও বেদের ভাষা নিয়ে জোর গবেষণা চলছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন্ কোন্ শক্তি ও কোন্ কোন্ রাজনীতিক দল কিরূপ অংশ গ্রহণ করছে রুশবাসীরা সযত্নে তা লক্ষ্য করছে।

**ফসল সংগ্রহে ছাত্রদল**

এই বৎসর ফসল সংগ্রহের কাজে বৃটেনের পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রী সাহায্য করবে। বৃটেনের চতুর্দিকে প্রায় ৮০০ তাঁবু ফেলে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসব ছাত্রছাত্রীর বয়স ১৪ থেকে ১৯ বৎসরের মধ্যে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ তাদের কাযের নির্দেশ দেবেন ও তত্ত্বাবধানও করবেন। যদিও হাল্কা ধরণের কায এরা করবে তাহলেও তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। দেশে দারুণ শ্রমিক সংকটের জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

মা ও মেয়ের একসঙ্গে একই ঘরে সন্তান প্রসব আমাদের দেশে বিরল না হলেও মার্কিন দেশে বিরল। এইখানে এইরকম মা ও মেয়ের ছবি দেওয়া হল।

**কলিকাতার** গঙ্গায় যে হাঙ্গরটি ধরা পড়িয়াছে তাকে নাকি ধরিয়াছে ভগবান নামক জনৈক নৌকার মাঝি। কলিকাতার ডাঙায় যে হাঙ্গরগুলি এখনও ধরা পড়ে নাই তাদের ধরার কাজটাও আমাদের হালের মাঝি শ্রীভগবান ছাড়া আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়।

* * * * *

**পশ্চিমবঙ্গের** পুলিশ বাহিনীতে শুনিতেছি শীঘ্রই মেয়েদের রিক্রুট করা হবে। "একাজে অবিবাহিতা মেয়েদের বহাল করলেই ভালো হয়। বিবাহিতারা পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করলে—স্বামী নামক যে আদিম জীব এখনও বেঁচে আছে তারা পুলিশী জুলুমে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে

যাবে"—এই সারগর্ভ মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

**স্ত্রী** শুধু কড়াইশুটির সুপ ছাড়া আর কিছু খাইতে দেন নাই বলিয়া কোন এক স্বামী নাকি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনিয়াছেন। এই ধরণের অছিলা যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ বলিয়া গণ্য হয়—তাহা হইলে আমাদের দেশে বিবাহিতের জীবন—"পদ্মপত্রে জলের" মতো "সদাই টলমল" করিতে থাকিবে—এবং লক্ষ্মীছাড়ার দলের অনিবার্য সংখ্যাবৃদ্ধির আশঙ্কা সমাসন্ন হইয়া উঠিবে।

* * * * *

'THE love of home and family is a natural instinct which can never take second place".

—বলিয়াছেন রাজকুমারী এলিজাবেথ। প্রথম বিয়ের পর এ ধারণা অনেকেরই থাকে বলেই আমরা "বাহা-বাহারে" বলে গান ধরতে পারি। কিন্তু "শেষকালেতে মাথার রতন"—খুড়ো কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না দীর্ঘ নিশ্বাসের

* * * * *

**সরকারী** দপ্তরের সম্মুখে প্রায়ই মেয়েরা আসিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাঁহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ

Tear Gas ব্যবহার করেন। খুড়ো বলিলেন—"বেসরকারী দপ্তরে মেয়েরা হামেশাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং Gas ব্যবহার না করেই Tears-এ সেই বিক্ষোভ বিলীন হয়ে যায়।"

* * * * *

**গভর্নর** জেনারেল পদে নিযুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে রাজাজী বলিয়াছেন—আমার ঘাড়ে একটার বদলে তিন তিনটা কয়লার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—এই হয় রাজাজী, এই হয়, তিন টুকরো কয়লা

পেলে আমরা মনে করি হীরে পেলাম... তিন তিনটে কয়লার বোঝা! নূতন রাজ্যে... To carry coal to Newca... নীতির কোন পরিবর্তন হলো না।

* * * * *

**রাজাজী** দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন ... মানুষ যে এক গোষ্ঠীর সে কথা ... মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে। ... "না ভুলে উপায় কি, ... আমরাও কি একগোষ্ঠীর দোহাই দি... যায়?"

* * * * *

**বিহারের** ...

কেল্লাকে বিহারে অন্তর্ভুক্তির কোন ... উঠে নাই এ প্রশ্ন অনেকেই করিতেছেন ... বলিলেন—"ওটা ভুই নৃত্যের ... সুযোগ পরেই বিহার নিজের কাজ ... নিয়েছেন, ভেবেছিলেন কেউ দেখবে না ..."

* * * * *

**এতদিন** পর "সরকারীভাবে" ... মৃত্যু হইল। বে-সরকারীভাবে ... হইতে তাই নূতন সুদক্ষেত্রের ... চলিতেছে। নূরেমবার্গে আবার ... বসিলে আসামীদের এখন হইতেই ... ভাল।

* * * * *

'POVERTY is India's main problem...

—বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ ... বলিলেন—"এককালে তাই ছিল ... বর্তমানে কিন্তু ধন দৌলত এবং তার ...

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন          সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ ]     শনিবার, ৫ই আষাঢ়, ১৩৫৫ সাল।     Saturday, 19th June, 1948.     [ ৩৩শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

### দেশিকতার সংকট

আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ লুই সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় গোহাটির মার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন— াটিতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকলেরই র বিষয়। আসামে সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ অসমীয়া ও বাঙালীর প্রীতির সম্পর্ক গৌরবের বিষয় ছিল, কোন কারণে তাহা হইতে দেওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক।" বড়দলুইর এই উক্তির গুরুত্ব আমরা ার করি; কিন্তু আমাদিগকে নিতান্ত র সঙ্গে একথা বলিতে হইতেছে যে, া ভারতের স্বাধীনতার জন্য বলশালী শ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে অগ্রসর সংকোচ বোধ করেন নাই, তাঁহারাই আজ য়তার মহৎ আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া প্রদায়িকতার পথ অবলম্বন করিতেছেন। মের "বঙ্গাল খেদার দলে"র উপদলীয় ের সঙ্গে অনেক দুঃখদায়ক স্মৃতি ড়িত রহিয়াছে। আসামে যে ব্যাপার াছে বিহারেও আমরা প্রাদেশিকতার সেই ্ এবং উপদ্রব সমভাবেই লক্ষ্য করিতেছি। করিবার বিষয় এই যে, প্রাদেশিকতার ের আঘাত বাঙালীদের উপরই আসিয়া ড়িতেছে এবং ইহার ফলে কার্যতঃ বাঙালীর াশ হইতে বসিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- ীরা বাঙলার বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের বুকে মারিয়াছিল, উদ্দেশ্য তাহাদের বুঝি। তকে পরাধীন রাখিয়া শাসনসূত্রে নিজেদের ণ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখাই তাহাদের নিষ্ঠুর পাশব নীতির মূলীভূত উদ্দেশ্য ছিল। রেজ এখন চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু বাঙলার া যায় নাই। সাম্প্রদায়িকতার শেষ আঘাত ঙালী এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। ত বিভাগের ফলে সাম্প্রদায়িকতার নরঘাতী ধ্বংস-লীলায় বাঙলা ও পাঞ্জাব বিধ্বস্ত হয়। বিখণ্ডিত বাঙলার বুকে সাম্প্রদায়িক বর্বরতার সে বজ্রাঘাত এখনও বাজিতেছে। বাঙলা সে আঘাত কোনদিন ভুলিতে পারিবে কিনা, আমরা জানি না। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শে একদিন বাঙলার আকাশ অরুণোজ্জ্বল হইয়াছিল। আজ স্বজন বিচ্ছেদের আঁধার সে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহার উপর প্রাদেশিকতার আক্রমণে সে উপদ্রুত হইতেছে। বিহারে, আসামে, উড়িষ্যায় জাতীয়তার সুমহান্ সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ বাঙালী একশ্রেণীর লোকের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙলার অবদান 'বন্দেমাতরম' যাঁহারা মুখে উচ্চারণ করিতেছেন, কিংবা 'জন-গণ-মন অধিনায়ক' সংগীতে সুর বাঁধিতেছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে বাঙালী বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার অর্থ কি? বস্তুতঃ অখণ্ড ভারতের ঐক্য এবং আদর্শ হইতে আমরা বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। আমরা ভারতের সংস্কৃতির ও সাধনার মৌলিক নীতি ভুলিতে যাইতেছি এবং রাজনীতিক দূরদর্শিতাও হারাইতেছি। শুধু সাম্প্রদায়িকতাই আমাদের শত্রু নয়। আমাদের এ সত্য অন্তরে একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, প্রাদেশিকতা তাহার চেয়েও বড় শত্রু। যদি এ শত্রুকে আমরা দমন করিতে না পারি, তবে অল্পদিনের মধ্যে ভারতের সর্বনাশ ঘটিবে এবং স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র হিসাবে উন্নতির সব আশা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। আমরা এইদিক হইতেই বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চল অবিলম্বে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য দাবী করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, শুধু সেই পথেই ভারতকে দুর্বল রাখিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দুরভিসন্ধির মূলে চূড়ান্তভাবে আঘাত করা সম্ভব হইতে পারে। ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সব বিষয়টি দেখিতে হইবে। বৃহত্তর স্বার্থের তেমন নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়াই কংগ্রেস একদিন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে। গান্ধীজীও তাঁহার তিরোধানের পূর্বকাল পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রশ্ন তুলিলেই প্রাদেশিকতা প্রবল হইয়া উঠিবে, সুতরাং ঐ বিষয় এখন চাপা দেওয়াই ভাল, রাজনীতির উচ্চগ্রামে সুর তুলিয়া যাহারা এমন কথা বলিতেছেন, তাঁহাদের মতে আমাদের অন্তর সাড়া দেয় না। আমরা বুঝিতেছি, মুখ্যতঃ বাঙলাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা বলা হইতেছে এবং সেক্ষেত্রে বাঙলা এবং অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঐতিহ্যকে তলাইয়া দেখা হইতেছে না। ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বল প্রয়োগের দ্বারা সে আকর্ষণ ছিন্ন করা যায় না। সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া অনেক অনর্থ ঘটিয়াছে, ইতিহাসে তেমন প্রমাণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে বিভিন্ন প্রদেশকে পারস্পরিক নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাভাবিক বন্ধনে সুসংবদ্ধ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় করিতে হইবে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতির আঘাতে নিপীড়িত বাঙলা আজ স্বাধীন ভারতের কাছে তাহার প্রতি এই দিক হইতেই সুবিচার চাহিতেছে। বাঙলার সংস্কৃতি এবং সাধনা প্রাদেশিকতা হইতে মুক্ত, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতির যাঁহারা নিয়ামক অন্ততঃ তাঁহাদের কাছে, ইহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না, আমরা এটুকু প্রত্যাশা করিতে পারি।

**কলিকাতায় মিঃ ডি ভ্যালেরা**

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার কলিকাতার পৌরজনগণের পক্ষে এক স্মরণীয় মুহূর্ত সমাগত হয়। এই দিন আয়র্ল্যান্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রাম যজ্ঞের পুরোহিত মিঃ ডি ভ্যালেরা চার ঘণ্টার জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে পদার্পণ করেন। মিঃ ডি ভ্যালেরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি; কিন্তু কেবল সেই দিক হইতেই তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র নহেন, তিনি আমাদের সুপরিচিত শুধু তাহাও নয়, তিনি আমাদের একান্ত আত্মীয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সুতীব্র এবং সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছেন। বাঙলার স্বাধীনতাসেবী সন্তানগণ তাঁহাকে পূজা করিয়াছে। তাঁহার আদর্শ হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ী তাঁহার সংকল্প-শীলতা এবং অকুতোভয় অভীষ্ট নিষ্ঠা বাঙলার বৈপ্লবিক সাধনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য দুরন্ত বীর্যবলের যে বৈপ্লবিক বিচিত্র সমৃদ্ধি ও সমারোহ আয়র্ল্যান্ডের এই বীর সাধকের জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে, এক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনেই তেমন চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয়। স্বদেশের স্বাধীনতাব্রতী কর্মযোগীর প্রাণবলের এমন বিলাস ও বৈভব ইতিহাসে অপরিম্লান থাকে এবং সমগ্র মানব সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদকে ইঁহারা সমৃদ্ধ করেন। পৃথিবীর অন্যতম এই গরীয়ান পুরুষকে প্রথম জীবন হইতেই আমরা চিনিয়াছি, জানিয়াছি এবং আপনার বলিয়া বুঝিয়াছি। এতদিন দূরে থাকিয়া আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রণিপাত নিবেদন করিয়াছি। আমাদের দুঃখ এই যে, বেশী সময়ের জন্য আমরা তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে পাই নাই। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য তিনি বাঙলার মাটিতে পদার্পণ করেন। আমরা ইহাতেও নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

**দুর্জয় শত্রু**

জাতির উপর হইতে পরাধীনতার আবরণ অপসৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তাহার অন্তঃপ্রকৃতির যত দৈন্য এবং দুর্বলতা সব উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে। আমরা আজ নানা সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি পর পর কয়েকটি বক্তৃতায় এই সব সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা, হায়দরাবাদ সমস্যা, পাঞ্জাব সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের আশ্রয় বিধান ও পুনঃ সংস্থানের বিপুল জটিল সমস্যা; কিন্তু দুর্নীতি ও চোরাবাজারের সমস্যা, এ সব সমস্যাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের মনে আছে পণ্ডিত জওহরলাল দুর্নীতিপরায়ণ এবং চোরাবাজারীদিগকে আক্রমণ করিয়া কিছু দিন পূর্বে বলিয়াছিলেন, পরাধীন ভারতের শাসনমূলে জনগণের শোষণ-পিপাসা যে রকমে কাজ করিয়াছে, তেমন প্রতিবেশের মধ্যে দুর্নীতি এবং চোরাবাজারী চলিবার সুবিধা ছিল; কিন্তু জনগণের অধিকারে জাগ্রত স্বাধীন ভারত কিছুতেই এসব পাপ বরদাস্ত করিবে না। চোরাকারবারীরা নরঘাতকদের চেয়েও নৃশংস। যদি ইহাদিগকে সহজে সায়েস্তা না করা যায়, তবে দরকার হইলে ফাঁসী কাঠে ঝুলাইতেও আমরা দ্বিধা করিব না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এমন দৃঢ়চেতা পণ্ডিতজীকেও অবশেষে চোরাবাজারী এবং ঘুষখোরদের কাছে হার মানিতে হইয়াছে। তিনি সেদিন অনেকটা নৈরাশ্যের সঙ্গেই বলিয়াছেন, ইহাদিগকে যদি সায়েস্তা করা না যায়, তবে সমগ্র ভারতের সমাজ এবং অর্থনীতিক জীবন এলাইয়া পড়িবে। কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার পর চোরাকারবারীদের মহোৎসব সুরু হইয়াছে, পণ্ডিতজী বিশেষ-ভাবে একথা বলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের অসামরিক বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনও সেদিন বাঁকুড়ার বক্তৃতায় এই সম্পর্কে তাঁহার অসহায়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সেন মহাশয়ের মতে পশ্চিমবঙ্গের সুদীর্ঘ সীমান্তভাগ জুড়িয়া পুলিশ পাহারা বসাইয়া কাপড় চালানোর পাপ ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব নয়। আমরা কিন্তু এই ধরণের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্টিলাভ করিতে পারি না। বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনে এ দেশের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ কেমন তৎপর, ব্রিটিশ শাসনের সেদিনের ইতিহাস আমরা ভুলি নাই। যে পুলিশ পর্বতে কান্তারে সাগরে তন্ন তন্ন করিয়া বিপ্লবীদের বাছিয়া বাহির করিয়াছে আজ চোরাবাজারী চাতুরী দলনে তাহাদের উদ্যমের উৎস কেন যে এমন করিয়া শুকাইয়া গেল, ইহা রহস্য বিশেষ। বলা বাহুল্য, এই সব পাপকে উৎখাত করিবার জন্য আবশ্যক আইনের অভাব নাই; পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এজন্য এক অর্ডিন্যান্সও জারী করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যথোচিত প্রয়োগের অভাবে সে সব ব্যবস্থা অকেজো হইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে দুই চারজন চুনো-পুটিই ধরা পড়িতেছে অথচ রাঘব বোয়ালের দল গভীর জলে থাকিয়া ঘাই মারিতেছে। বেশ বড় রকমের চক্রান্ত দেশব্যাপী এই পাপ ব্যবসায়ের মূলে রহিয়াছে, ইহা সহজেই বোঝা যায় এবং ইহাও বুঝিতে বিলম্ব ঘটে না যে, তেমন চক্রান্তের সঙ্গে কোটিপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত কেহ কেহ জড়িত আছেন। দরিদ্র জনগণের শোষক, ছোট বড় এই দলকে সমূলে উৎখাত করা দরকার। যাঁহারা শাসকদের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং দিবারাত্র স্বদেশ সেবার মহিমা প্রচারে ব্রতী আছেন, এক্ষেত্রে অসামর্থ্যের যুক্তি উপস্থিত করা তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না।

**গণতান্ত্রিকতার নমুনা**

স্বেচ্ছাচারের স্বরূপ এই যে, অপরের সমালোচনা সহ্য করিবার সহিষ্ণুতা তাহার থাকে না। স্বেচ্ছাচারী নিজের বুঝই বড় বলিয়া বোঝে এবং জনমতকে চাপিয়া নিজের জোরে শাসনতন্ত্র চালাইয়া যায়। পাকিস্থানী শাসক-দের মধ্যে পরমত-অসহিষ্ণুতার এমন ঐক্যে আমরা আগাগোড়া লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা যুক্তি পরামর্শের পথে সহযোগিতা চাহেন না; অধিকন্তু যুক্তি পরামর্শ দিতে গেলে হিতে বিপরীত ... শুধু তাই নয়, তেমন যুক্তি পরামর্শ-দাতাদের প্রতি অকথ্য অভিযোগ আরোপ করিয়া কটূক্তি বর্ষণ করিতে এইসব মদগর্বীদের জিহ্বায় কিছু আটকায় না। আমরা এমন ব্যাপার একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছি। সম্প্রতি পূর্ব বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদে পাকিস্থানী শাসক সুলভ এমন অসংযম ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় আর এক দফা পাওয়া গিয়াছে। গত ৯ই জুন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি। দত্ত মহাশয় রাজনীতিক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তি নহেন। শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব এবং দক্ষতার খ্যাতি আছে। তাঁহার অতি বড় শত্রুও তাঁহার স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। এমন কয়েকজন ভদ্রলোকের প্রত্যুত্তরসূত্রে খাজা নাজিমুদ্দীনের এ চিত্তবিক্ষোভ ঘটিবার কারণ কি? প্রশ্নটি ... তলাইয়া দেখিতে গেলে শুধু একটা কথাই ... হয়। দত্ত মহাশয়ের অপরাধ এই যে, তিনি পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার কর্তব্য পালনের জন্য তিনি নির্ভীক ভাবে কর্তৃপক্ষের কার্যের সমালোচনার সাহস রাখেন। এই অপরাধেই তিনি সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, গণতান্ত্রিক শাসনের ইহাই কি ধারা? সংখ্যালঘু সম্প্রদা...

র্থের দিকে তাকাইয়া শাসকদের কোন র্যের সমালোচনা করিতে গেলেই যদি রাষ্ট্রের নষ্টকারী এই সন্দেহে পড়িতে হয়, তবে া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন বক্তব্য শাসকদের ছে উপস্থিত করিবারই উপায় থাকে না। রঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার তেমন প্রতিবেশের মধ্যে ম্প্রদায়িক সর্বময় প্রভুত্বের চাপে পিষ্ট য়াই সংখ্যালঘুদের পক্ষে বিধাতৃ-নির্দিষ্ট রণতি হইয়া দাঁড়ায়। বুঝি, এক্ষেত্রে খাজা জিমুদ্দীনের উত্তেজনাটা আকস্মিক হইতে রে। খাজা সাহেব নিজেও শেষটা সেকথা াকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আকস্মিক উত্তেজনার মূলেও একটা ধারণা জ করিয়াছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বশ্বাসের একটা ভাব যে স্থায়ীরূপে তাঁহার নের অবচেতন স্তরে রহিয়াছে, নিতান্ত অপ্রিয় সত্যকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি । পূর্ববংগ ব্যবস্থা পরিষদের বিতর্কে খ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি শাসকদের বৈষম্য-লক আচরণের বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি, যার মূলে সেই মনোভাবই রহিয়াছে। কারী কার্যের জন্য বাড়ি দখল, বন্দুক য়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরসূত্রে যেসব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সংখ্যালঘুদের পূর্ববংগ সরকারের সুবিবেচনার পরিচয় ওয়া যায় না। রাষ্ট্রকে সংহত করিবার পথ নয়। সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত রবার ভিত্তিতে স্বদেশ প্রেমকে বলিষ্ঠ করিয়া লার পথেই রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা সম্ভব তে পারে। পূর্ববংগ সরকার সংস্কারান্ধ দৃষ্টি ড়িয়া সেই দিকে মনোনিবেশ করিলে দেরই কল্যাণ সাধিত হইবে।

### ঙলার নূতন প্রদেশপাল

বাঙলার প্রদেশপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজা-গোপালাচারী ভারতের দেশপাল নিযুক্ত য়াছেন। আগামী ২১শে জুন হইতে নি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। উড়িষ্যার শপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু তাঁহার নে বাঙলার প্রদেশপাল নিযুক্ত হইয়া সিতেছেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী প্রদেশ-লস্বরূপে বাঙলার জনসমাজের সর্বত্র শ্রদ্ধা ও শেষ অর্জন করিয়াছেন। বর্তমানে শাসন ভাগের সব কাজ সাক্ষাৎ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর রেই পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রের দৈনন্দিন নীতি রণে প্রদেশপালের সাক্ষাৎ সম্পর্কে কর্তব্য ব কমই আছে। কিন্তু সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের তির অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টিতে প্রদেশ-লের প্রভাব কম নয়। শ্রীরাজাগোপালা-রী সুবিজ্ঞ এবং সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিক। হার প্রদেশপালত্বে বাঙলায় এমন একটি র্ণতিপূর্ণ প্রতিবেশ নানা অসুবিধার মধ্যেও জায় ছিল, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিধ স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বাঙলার রাষ্ট্রজীবনের অন্তঃস্থলে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছে, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী সে সব সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ভারতের সংস্কৃতি সাধনা ও স্বাধীনতার আদর্শ আমাদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে দোষ-ত্রুটির খুঁটি-নাটি জন-সাধারণ অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিল। শ্রীযুত আচারীর ব্যক্তিত্বের এই প্রভাব সব সময় ধরা পড়ে নাই; কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করা চলে না। স্বাধীন পশ্চিম বংগ তাঁহার ন্যায় একজন সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিককে প্রথম প্রদেশপাল-স্বরূপে পাইয়াছিল, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। তিনি আজ ভারতের সর্বোচ্চ শাসকের পদ মর্যাদালাভ করিয়া যাইতেছেন, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের আহ্বানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা তাঁহাকে আমাদের বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু সুপণ্ডিত ব্যক্তি। উড়িষ্যার প্রদেশপালস্বরূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আমরা আমাদের প্রদেশপাল-স্বরূপে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, ডক্টর কাটজুর প্রদেশপালত্বে বাঙলার সংস্কৃতির সমুন্নত মহিমা সর্বত্র পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পশ্চিম বংগ স্বার্থান্ধদের দুর্নীতি ও উপদলীয় চক্রান্তের দুর্গতি হইতে উদ্ধার পাইবে।

### জাতীয় সংগীত

ভারতের জাতীয় সংগীত লইয়া বিতর্কের এখনও অবসান ঘটে নাই। বস্তুত এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ভারতীয় গণপরিষদের উপর রহিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত চূড়ান্ত মীমাংসা না হয়, ততদিন কাজ চালাইবার জন্য ভারত সরকার রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' সংগীতটি নির্বাচিত করিয়াছেন এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে তদনুযায়ী নির্দেশ দান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, 'জনগণমন অধিনায়ক' সংগীতটির সম্বন্ধে আমাদের অনুরাগ কাহারো অপেক্ষা কম নয়; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরমে'র গুরুত্ব কিছুতেই আমরা ক্ষুণ্ণ করিতে পারি না। সুখের বিষয়, পশ্চিমবংগ সরকারও ভারত সরকারের নিকট তেমন অভিমতই জ্ঞাপন করিয়াছেন। জাতীয় সংগীত সম্পর্কিত এই বিতর্কের প্রসংগে কেহ কেহ সুরের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, এবং সুরকেই মুখ্য স্থান দিতে গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' সংগীতটির সুর সোজা এবং বহু লোকের কণ্ঠের সংগে তাহার সংগতি সাধনও সহজে হয়, আমরা একথা স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, 'বন্দে মাতরমে'ও সুর যোজনা করিয়া অনুরূপ সংগতি সাধন সম্ভব হইতে পারে। সর্বোপরি, আমাদের বক্তব্য এই যে, জাতীয় সংগীত শুধু একটি হইবে, এমন কোন বিধান না করিলেও চলিতে পারে। কয়েকটি দেশে একাধিক জাতীয় সংগীত প্রচলিত আছে। 'বন্দে মাতরমে'র মন্ত্রবীর্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্জয় করিয়াছে। সে মন্ত্রের শক্তি হইতে জাতিকে বঞ্চিত করিয়া স্বদেশপ্রেমের সংস্কৃতিসম্মত ঐতিহ্যসূত্রে সুগঠিত মনস্তাত্ত্বিকতার ভিত্তিকে বিচলিত করা উচিত হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। বলা বাহুল্য, জাতীয় সংগীত জোর করিয়া কোন দেশ বা জাতির উপর চাপানো যায় না, জাতি স্বাভাবিকভাবেই তাহা স্বীকার করিয়া লয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' সংগীতের মূর্ছনায় সমগ্র ভারতীয় জাতি তাহার অন্তঃ-প্রকৃতির পক্ষে সংগতিময় একান্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছে, কোন বিচার বুদ্ধির কসরতেই জাতি সে আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

### চূড়ান্ত ব্যবস্থার দাবী

সেখ আবদুল্লার ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক এবং বীর্যশালী পুরুষের পাল্লায় পড়িয়া কাশ্মীরের হানাদারেরা ক্রমেই ঠান্ডা হইয়া আসিতেছে। পাকিস্থানী বাহিনী সাক্ষাৎ সম্পর্কে সাহায্য পাইয়াও তাহারা কোণঠাসা হইয়াছে; কিন্তু হায়দরাবাদের সমস্যা মিটিবার কোন পথও দেখা যাইতেছে না; পক্ষান্তরে তাহা দৈনন্দিন উৎকণ্ঠার কারণে পরিণত হইয়াছে। হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীর সংগে ভারত সরকারের আলোচনাসূত্রে এ সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, নিজাম জনমতানুমোদিত শাসন-তন্ত্র স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তিনি তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতা অর্থাৎ স্বৈরাচার অপ্রতিহত রাখিতে চান; কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হায়দরাবাদে মধ্য-যুগীয় সাম্প্রদায়িক বর্বরতার একটা ঘাঁটি রাখিতে দেওয়া কোনক্রমেই নিরাপদ নয়। সমগ্র ভারতের, বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতের বিপুল অঞ্চলের সংগে হায়দরাবাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এমন অংগাংগীভাবে জড়িত আছে যে, সে রাষ্ট্রকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না। সুতরাং সমস্যা জটিল; কিন্তু সোজা পথে এ সমস্যার যখন সমাধান করা সম্ভব হইল না, তখন শেষ অস্ত্র প্রয়োগের জন্যই অগ্রসর হওয়া উচিত। ভারত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি অন্যায়ের কাছে অবনতি স্বীকারের অমনুষ্যত্ব আমাদিগকে যেন অভিভূত না করে।

# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২৪)

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কানমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে আমানউল্লা আরো ভালো রকমেই বুঝতে পারলেন যে চোরের যদি তিন দিন হয় তবে সাধুর মাত্র একদিন। সেই একদিনের হক্কের জোরে তিনি লড়াই জিতেছেন—এখন আবার দুষমনের পালা। আমানউল্লা তার জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

জমাখরচের খাতা খুলে দেখলেন, জমায় লেখা, আমানউল্লা খান দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন, তিনি আর 'আমীর' আমানউল্লা নন—তিনি 'গাজী' 'বাদশাহ' আমানউল্লা খান।

খরচে লেখা, নসরউল্লার মোল্লার দল যদিও আসর থেকে সরে গিয়েছে তবু তাদের বিশ্বাস নেই। আমানউল্লা ফরাসী জানতেন—'রেক্যুলের পুর মিয়ো সোতের' অর্থাৎ 'ভালো করে লাফ দেওয়ার জন্য পেছিয়ে যাওয়া' প্রবাদটা তাঁর অজানা ছিল না।

কিন্তু আমানউল্লা মনে মনে স্থির করলেন, মোল্লারা সরকারী রাস্তার কোন্‌খানে খানাখন্দ বানিয়ে রাখবে সে ভয় অহরহ বুকের ভেতর পুষে রাখলে দেশ সংস্কারের মোটর টপ গিয়ারে চালানো অসম্ভব। অথচ পুরা স্পীডে মোটর না চালিয়ে উপায় নেই—সাধুর মাত্র একদিন।

কাবুলে পেঁৗছে যেদিকে তাকাই সেখানেই দেখি হরেকরকম সরকারি উর্দীপরা স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা ঘোরাঘুরি করছে। খবর নিয়ে শুনি কোনো উর্দী ফরাসী স্কুলের, কোনোটা জার্মান, কোনোটা ইংরিজি আর কোনোটা মিলিটরী স্কুলের। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের পাঠশালা পাস করে যারা শহরে এসেছে তাদের জন্য ফ্রী বোর্ডিং, লজিং, জামাকাপড়, কেতাবপত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স, ডিক্‌সনরি, ছুটিতে বাড়ী যাবার জন্য খচ্চরের ভাড়া, এক কথায় 'অল ফাউন্ড'

ভারতবর্ষের হয়ে আমি বললুম, 'নাথিং লস্ট'।

প্যারিসফের্ৎ। সইফুল আলম বুঝিয়ে বললেন, 'আপনি ভেবেছেন 'অল ফাউন্ড' হলে বিদ্যেও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে জুটে যায়। মোটেই না। হোস্টেল থেকে ছেলেরা প্রায়ই পালায়।'

আমি বললুম 'ধরে আনার বন্দোবস্ত নেই।'

সইফুল আলম বললেন, 'গাঁয়ের ছেলেরা শক্ত হাতে তৈরী। পালিয়ে বাড়ী না গিয়ে যেখানে সেখানে দিন কাটাতে পারে। তারো দাওয়াই আমানউল্লা বের করেছেন। হোস্টেল থেকে পালান মাত্রই আমরা সরকারকে খবর দি। সরকারের তরফ থেকে তখন দুজন সেপাই ছোকরার গাঁয়ের বাড়ীতে গিয়ে আসন জমিয়ে বসে, তিন বেলা খায় দায় এবং যদিও হুকুম নেই তবু সকলের জানা কথা যে, কোর্মা-কালিয়া না পেলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ছেলের বাপকে তিন বেলা মার লাগায়। বাপ তখন ছেলেকে খুঁজতে বেরোয়। সে এসে হোস্টেলে হাজিরা দেবে, হেড মাস্টারের চিঠি গাঁয়ে পৌছবে যে আসামী ধরা দিয়েছে তখন সেপাইরা বাপের ভালো দুম্বাটি কেটে বিদায় ভোজ খেয়ে তাকে হুঁশিয়ার না করে শহরে ফিরবে। পরিস্থিতিটার পুনরাবৃত্তিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

আমি বললুম, 'কিন্তু পড়াশোনায় যদি কেউ নিতান্তই গর্দভ হয় তবে?'

পর পর তিনবার যদি ফেল মারে তবে হেড-মাস্টার বিবেচনা করে দেখবেন তাকে ডিসমিস করা যায় কি না। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে অথচ পড়াশুনোয় ঢিটেমি করছে জানলে তার তখনো ছুটি নেই।'

এর পর কোন্ দেশের রাজা আর কি করতে পারেন?

মিলিটরি স্কুলের ভার তুর্কদের হাতে। তুর্কী জেনারেলদের ঐতিহ্য বার্লিনের পৎস্‌দাম সমরবিদ্যায়তনের সঙ্গে জড়ানো; তাই শুনলুম ইস্কুলটি জার্মান কায়দায় গড়া। সেখানে কি রকম উন্নতি হচ্ছে তার খবর কেউ দিতে পারলেন না। শুধু অধ্যাপক বেনওয়া বললেন, 'ইস্কুলটা তুলে দিলে আফগানিস্থানের কিছু ক্ষেতি হবে না।'

মেয়েদের শিক্ষার জন্য আমানউল্লা আর তাঁর বেগম বিবি সুরাইয়া উঠে পড়ে লেগেছেন। বোর্কা পরে এক কাবুল শহরেই প্রায় দুহাজার মেয়ে ইস্কুলে যায়, উঁচু পাঁচিল ঘেরা আঙিনায় বাস্কেট বল, ভলি বল খেলে। সইফুল আলম বল্লেন, 'লিখতে পড়তে আঁক কষতে শেখে, সেই যথেষ্ট। আর তাও যদি না শেখে আমার অন্ততঃ কোনো আপত্তি নেই। হারেমের বন্ধ হাওয়ার বাইরে এসে লাফালাফি করছে এই কি যথেষ্ট নয়?'

আমি সর্বান্তঃকরণে সায় দিলুম। সইফুল আলম কানে কানে বললেন, 'কিন্তু একজন লোক একদম সায় দিচ্ছেন না। রাণীমা।'

শুনে একটু ঘাবড়ে গেলুম। দুই শত্রু নিপাত করে, তৃতীয় শত্রুকে ঠান্ডা রেখে যিনি আমানউল্লাকে বাদশা বানাতে পেরেছেন তাঁর রায়ের একটা মূল্য আছে বই কি? তাঁর মতে নাকি এত শিক্ষার খোরাক আফগানিস্থান হজম করতে পারবে না। এই নিয়ে নাকি মাতাপুত্রে মনোমালিন্যও হয়েছে—মাতা অভিমানভরে পুত্রকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ করেছেন। [illegible] সুরাইয়াও নাকি শাশুড়ীকে অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু কাবুল শহর তখন আমানউল্লার চাবুক খেয়ে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে—'দেরেশি' পরে। 'দেরেশি' কথাটা ইংরিজি 'ড্রেস' থেকে এসেছে—অর্থাৎ হ্যাট, কোট, টাই, পাতলুন। খবর নিয়ে জানতে পারলুম সরকারি কর্মচারী হলেই তাকে দেরেশি পরতে হয়, তা সে বিশ টাকার কেরাণীই হোক, আর দশ টাকার সেপাই হোক। শুধু তাই না দেরেশি পরা না থাকলে কাবুল নাগরিক সরকারি বাগানে পর্যন্ত ঢুকতে পায় না। একদিকে সরকারি চাপ অন্যদিকে [illegible] চাকচিক্যের প্রতি অনুন্নত জাতির মোহ, [illegible] খানে সিনেমার উস্কানি তিনে মিলে কাবুল দেরেশি-পাগল হয়ে উঠেছে।

ইস্তেক আব্দুর রহমানের মনে [illegible] লেগেচে। আমি বাড়ীতে শিলওয়ার পরে [illegible] থাকলে সে খুঁৎ খুঁৎ করে; আটপৌরে [illegible] পরে বেরুতে গেলে নীলকৃষ্ণ 'দেরেশি' পরার উপদেশ দেয়।

মেয়েরাও তাল রেখে চলেছেন [illegible] হবীবউল্লা হারেমের মেয়েদের ফ্রক [illegible] পরাতেন। আমানুল্লার আমলে দেখি [illegible] মহিলা মাত্রই উঁচু হিলের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, আস্বচ্ছ সিল্কের মোজা, লম্বা [illegible] আঁটসাঁট ব্লাউজ, দস্তানা আর হ্যাট পরে দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। হ্যাটের সামনে একখানা অতি পাতলা নেট্ ঝুলছে বলে চেহারাখানা পষ্টাপষ্টি দেখা যায় না। যে মহিলার যত সাহস, তাঁর নেটের বুনুনি তত ঢিলে।

Figure কথাটার ফরাসী উচ্চারণ ফিগর্, অর্থ মুখের চেহারা। ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলতেন, 'কাবুলি মেয়েদের ফিগার দেখা যায় বটে, কিন্তু ফিগর দেখবার উপায় নেই।'

কিন্তু দেশের ধনদৌলত না বাড়িয়ে তো নিত্য নিত্য নূতন স্কুল-কলেজ খোলা যায় না, দেরেশি দেখানো যায় না, ফিগার ফলানো যায় না। ধনদৌলত বাড়াতে হলে আজকের দিনে কলকারখানা বানিয়ে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার করতে হয়। তার জন্য প্রচুর পুঁজির দরকার। আফগানিস্থানের গাঁটে সে কড়ি নেই—বিদেশীদের হাতে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ছেড়ে দিতেও বাদশা নারাজ। আমানউল্লার পিতামহ দোর্দণ্ড প্রতাপ আব্দুর রহমান বলতেন, 'আফগানিস্থান সেদিনই রেলগাড়ী চালাবে যেদিন সে নিজের হাতে রেলগাড়ী তৈরী করতে পারবে।' পিতা হবীবউল্লা সে আইন ঠিক ঠিক মেনে চলেন নি—তবে কাবুলের বিজলি বাতির জন্য যে কলকব্জা কিনেছিলেন সেটা কাবুলী টাকায়। আমানউল্লা কি করবেন ঠিক মনস্থির করতে পারছিলেন না—ন্যাশনাল লোন তোলার উপদেশ কেউ কেউ তাঁকে দিয়েছিল বটে, কিন্তু তাহলে সবাইকে সুদ দিতে হয় এবং সুদ দেওয়া নেওয়া ইসলামে বারণ।

হয়ত আমানউল্লা ভেবেছিলেন যে, দেশের গুরুভারের খানিকটে নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে দেশের আর পাঁচজনের কাঁধে যদি ভাগ-বাটোয়ারা করে দেওয়া যায় তাহলে প্রগতির পথে চলার সুবিধে হবে। আমানউল্লা বল্লেন পার্লিমেণ্ট তৈরী করো।

সে পার্লিমেণ্টের স্বরূপ দেখতে পেলুম পাগমান গিয়ে।

কাবুল থেকে পাগমান কুড়ি মাইল রাস্তা। বাস চলাচল আছে। সমস্ত শহরটা গড়ে তোলা হয়েছে পাহাড়ের থাকে থাকে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা শাঁখ কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার ভাঁজে ভাঁজে ছোট ছোট বাঙলো, অনেকটা ইতালিয়ান ভিলার মত। সমস্ত পাগমান শহর জুড়ে আপেল নাসপাতির গাছ বাড়িগুলোকে ঘিরে রেখেছে আর চূড়ার বরফগলা ঝরণা রাস্তার এক পাশের নালা দিয়ে থাকে থাকে নেবে এসেছে। পিচ ঢালা পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে উঠছি আর দেখছি দুদিকে ঘন সবুজের নিবিড় স্তব্ধ সুষুপ্তি। কোনো দিকে কোনো প্রকার জীবনযাত্রার চঞ্চলতা নেই, কঠিন পাথরের খাড়া দেয়াল নেই, ঘিনে ঘিনে হলদে রঙের বাড়ী ঘরদোর নেই। কিছুতেই মনে হয় না যে নীরস কর্কশ আফগানিস্থানের ভেতর দিয়ে চলেছি, থেকে থেকে ভুল লাগে আর চোখ চেয়ে থাকে সামনের মোড় ফিরতেই নেবুর ঝাড় নিয়ে খাটি ... গুলোকে দেখবে বলে।

বাদশা আমীর ওমরাহ নিয়ে গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটান। এক সপ্তাহের জন্য তমাম আফগানিস্থান এখানে জড়ো হয় 'জশন' বা স্বাধীনতা দিবসের আমোদ আহ্লাদ করার জন্য। দল বেঁধে আপন তাঁবু সংগে নিয়ে এসে রাস্তার দুদিকে যেখানে সেখানে সেগুলো খাটায়। সমস্ত দিন কাটায় চাঁদমারি, মোংগল নাচ, পলটনের কুচকাওয়াজ দেখে না হয় চায়ের দোকানে আড্ডা জমিয়ে; রাত্রে তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয় গানের মজলিস। "আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই, জোয়ান হইব গোড়া হতে তবে এ জীবন দোহারাই"—ধরণের ওস্তাদি গানের রেওয়াজ প্রায় নেই, হরেকরকম "ফতুজানকে" অনেক রকম সাধ্য-সাধনা করে ডাকাডাকি করা হচ্ছে এ-সব গানের আসল ঝোঁক। মাঝে মাঝে একজন অতিরিক্ত উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে দুচার চক্কর নাচ ভী দেখিয়ে দেয়। আর সবাই গানের ফাঁকে ফাঁকে 'সাবাস সাবাস' বলে নাচনেওয়ালাকে উৎসাহ দেয়।

এ-রকম মজলিসে বেশীক্ষণ বসা কঠিন। বন্ধঘরে যদি সবাই সিগারেট ফোঁকে তবে নিজেকেও সিগারেট ধরাতে হয়—না হলে চোখ জ্বালা করে, গলা খুস্খুস্ করতে থাকে এ-সব মজলিসে আপনিও যদি মনের ভেতর কোনো "ফতুজান" বা কদম্ববনবিহারিনীর ছবি এঁকে গলা মিলিয়ে—না মিললেও আপত্তি নেই—চীৎকার করে গান না জোড়েন তবে দেখবেন ক্রমেই কানে তালা লেগে আসছে, শেষটায় ফাটার উপক্রম। রাগবি খেলার সংগে এ-সব গানের অনেক দিক দিয়ে মিল আছে—তাই এর রসভোগ করতে হয় বেশ একটু তফাতে আলগোছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আমার বার বার মনে হ'ল পাগমান হৈ-হল্লার জায়গা নয়। নির্ঝরের ঝরঝর, পত্র-পল্লবের মৃদু মর্মর, অচেনা পাখীর একটানা কূজন, পচা পাইনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সবশুদ্ধ মিলে গিয়ে এখানে বেলা দ্বিপ্রহরেও মানুষের চোখে তন্দ্রা আসে। ভর গ্রীষ্মকাল, গাছের তলায় বসলে তবু অল্প অল্প শীত শীত করে—কোটের কলারটা তুলে দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় পেয়ালা, প্রিয়া, কবিতার বই কিছুরই প্রয়োজন নেই, একখানা র‍্যাপার পেলে ওমটা ঠিক জমত।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চোখ মেলে দেখি এক অপরূপ মূর্তি। কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ি-ওয়ালা, ঘামে-ভেজা অজন্ম অস্নাত অধৌত, পীত দন্তকৌমুদী বিকসিত এক আফগান সামনে দাঁড়িয়ে। এরূপ আফগান অনেক দেখেছি, কিন্তু এর পরনে ধারালো ক্রীজওয়ালা সদ্য নূতন কালো পাতলুন, কালো ওয়েস্ট-কোট, স্টার্চ করা শক্ত সার্ট, কোণ-ভাংগা স্টিফ কলার, কালো টাই, দুবোতামওয়ালা নবাতম কাটের মর্নিং কোট, আর একমাথা বাবরি চুলের উপর দেড়ফুট উঁচু চকচকে সিল্কের অপেরা হ্যাট! সব কিছু আনকোরা ঝা-চকচকে নূতন; দেখে মনে হল যেন এই মাত্র দর্জির কার্ড-বোর্ডের বাক্স থেকে বের করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পরা হয়েছে। খাতা 'দেরেশি' নয়, ষোল আনা মর্নিং-সুট। প্যারেডের দিনে লাট-বেলাট এই রকম সুট পরে সেলুট নেন।

বেল্টের অভাবে পাজামার নোংরা নেওয়ার দিয়ে পাতলুন বাঁধা, কালো ওয়েস্টকোট আর পাতলুনের সংগমস্থল থেকে এক মুঠো ধবধবে সাদা সার্ট বেরিয়ে এসেছে, টাইটাও ওয়েস্ট-কোটের উপরে ঝুলছে।

বাঁহাতে পাগড়ীর কাপড় দিয়ে বানানো বোঁচকা, ডানহাতে ফিতেয় বাঁধা এক-জোড়া নূতন কালো বুট। এখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি পায়ে জুতো মোজা নেই!

আমাকে পশতু ভাষায় অভিবাদন করে বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে, লম্বা হাতে বুট জোড়া দোলাতে দোলাতে ওরাঙ-ওটাঙের মত বড় রাস্তার দিকে রওয়ানা হল।

আমি তো ভেবে ভেবে কোনো কূল-কিনারা পেলুম না যে এ-রকমের আফগান এ-ধরণের সুট পেলই বা কোথায়, আর এর প্রয়োজনই বা তার কি। কিন্তু ঐ এক মূর্তি নয়! বন থেকে বেরুবার আগে হুবহু এক দ্বিতীয় মূর্তির সংগে সাক্ষাৎ। সে দেখি এক মুচির সামনে উবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে আর মুচি তার বুটের তলায় লোহা ঠুকে ঠুকে আল্পনা এঁকে দিচ্ছে।

পরের দিন আমানউল্লার বক্তৃতা। সভায় যাবার পথে এ-রকম আরো ডজনখানেক মূর্তির সংগে দেখা হল। সেখানে গিয়ে দেখি সভার সবচেয়ে ভালো জায়গায়, প্লাটফর্মের মুখো-মুখি প্রায় শ'দেড়েক লোক এ-রকম মর্নিং-সুটের ইউনিফর্ম পরে বসে আছে।

যে তাজিক, হাজারা, মংগোল, পাঠান আপন আপন জাতীয় পোষাক পরে এতকাল স্বচ্ছন্দে ঘরে-বাহিরে ঘোরাফেরা করেছে, বিদেশীর মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আজ তারা বিকট বিজাতীয় বেশভূষা ধারণ করে সভাস্থলে কাঠের মত বসে আছে। শুনেছি অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে, কিন্তু এদের তো শুধু কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়নি, সর্বাংগে যেন কৃষ্ণচন্দন লেপে দেওয়া হয়েছে!

আমানউল্লা দেশের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে অনেক খাঁটি কথা বললেন। কাবুলের লোক হাততালি দিল। সদস্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনে, তারা এলোপাতাড়ি হাততালি দিয়ে লজ্জা পেয়ে এদিক ও-দিক তাকায়; ফরেন অপিসের কর্তারা আরো বেশী লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করেন। বিদেশী রাজ-দূতেরা অপলক দৃষ্টিতে আমানউল্লার দিকে তাকিয়ে—সেদিন বুঝতে পারলুম রাজদূত হতে হলে কতদূর আত্মসংযম, কত জোর চিত্তজয়ের প্রয়োজন।

জানি, সুট ভালো করে পরতে পারা না পারার উপর কিছুই নির্ভর করে না কিন্তু

তবু প্রশ্ন থেকে যায় কি প্রয়োজন ছিল লেফাফাদুরুস্ত করার লোভে দেড়শ' জন গাঁওবুড়াকে লাঞ্ছিত করে নিজে বিড়ম্বিত হওয়ার।

আমানউল্লার বক্তৃতা এরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল জানিনে—ভাষা এক হলেই তো আর ভাবের বাজারের বেচাকেনা সহজ সরল হয়ে ওঠে না। শুনেছি, পুরানো বোতল নাকি নয়া মদ সইতেও পারে না।

(২৫)

গ্রীষ্মকালটা কাটল ক্ষেত-খামারের কাজ দেখে দেখে। আমাদের দেশে সে সুবিধে নেই; ঠাঠা রুদ্দুর, ঝমঝম বৃষ্টি, ভলভলে কাদা আর লিকলিকে জোঁকের সঙ্গে একটা রফারফি না করে আমাদের দেশের ক্ষেত-খামারের পয়লা দিকটা রসিয়ে বসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই। এদেশের চাষবাসের বেশীর ভাগ শুকনো-শুকনিতে। শীতের গোড়ার দিকে বেশ ভালো করে একদফা হাল চালিয়ে দেয়; তারপর সমস্ত শীতকাল ধরে চাষীর আশা যেন বেশ ভালো রকম বরফ পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে বার কয়েক ক্ষেতের উপর বরফ জমে আর গলে; জল চুইয়ে চুইয়ে অনেক নিচে ঢোকে আর সমস্ত ক্ষেতটাকে বেশ নরম করে দেয়। বসন্তের শুরুতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঠ-ঘাট ডুবে যায় না। আধাভেজা আধা-শুকনোতে তখন ক্ষেতের কাজ চলে—নালার ধারে গাছতলায় একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বেশ আরাম করে বসে ক্ষেতের কাজ দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। তারপর গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকের পাহাড়ের উপরকার জমা-বরফ গলে কাবুল উপত্যকায় নেবে এসে খাল-নালা ভরে দেয়। চাষীরা তখন নালায় বাঁধ দিয়ে দুপাশের ক্ষেতকে নাইয়ে দেয়। ধান-ক্ষেতের মত আল বেঁধে বেবাক জমি টৈটম্বুর করে দিতে হয় না।

কোন্ চাষীর কখন নালায় বাঁধ দেবার অধিকার সে সম্বন্ধে বেশ কড়াকড়ি আইন আছে। শুধু তাই নয়, নালার উজান ভাটির গাঁয়ে গাঁয়ে জলের ভাগ বাঁটোয়ারার কি বন্দো-বস্ত তারো পাকাপাকি শর্ত সরকারের দফতরে লেখা থাকে। মাঝে মাঝে মারামারি মাথা ফাটাফাটি হয়, কিন্তু কাবুল উপত্যকার চাষারা দেখলুন বাঙালী চাষার মতই নিরীহ—মারামারির চেয়ে গালাগালিই বেশী পছন্দ করে। তার কারণ বোধ হয় এই যে কাবুল উপত্যকা বাঙলা দেশের জমির চেয়েও উর্বরা। তার উপর তাদের আরেকটা মস্ত সুবিধা এই যে তারা শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। শীতকালে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বরফ পড়ে তাদের ক্ষেত ভরে যায়, অথবা যদি পাহাড়ের বরফ প্রচুর পরিমাণে গলে নেবে আসে, তাহলে তারা আর বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। কাবুলের লোক তাই বলে, "কাবুল বেজর শওদ লাকিন বে-বর্ফ না বাশদ"—কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।

আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে প্রায় দশহাত চওড়া একটি নালা বয়ে যায়। তার দুদিকে দুসারি উঁচু চিনার গাছ, তারি নীচে দিয়ে পায়ে চলার পথ। আমি সেই পথ দিয়ে নালা উজিয়ে উজিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটা পঞ্চবটির মত পাঁচচিনারের মাঝখানে বরষাতি পেতে আরাম করে বসতুম। একটু উজানে নালায় বাঁধ দিয়ে আরেক চাষা তার ক্ষেত নাওয়াচ্ছে। আমি যে ক্ষেতের পাশে বসে আছি তার চাষা আমার সঙ্গে নানারকম সুখ দুঃখের কথা কইছে। এ দুজনের কান মসজিদের দিকে—কখন আসরের (অপরাহ্ন) নামাজের আজান পড়বে। তখন আমার চাষার পালা। আজান পড়া মাত্রই সে উপরের বাঁধের পাথর কাদা সরিয়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে কুলকুল করে নীচের বাঁধের জল ভর্তি হতে শুরু করে, চাষা তার বাঁধ আগের থেকেই তৈরী করে রেখেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে তখন বাঁধের তদারক করে বেড়ায়, কাঠের শাবল দিয়ে মাঝে মাঝে কাদা তুলে সেটাকে আরো শক্ত করে দেয়, ক্ষেতের ঢেলা মাটি এদিক ওদিক সরিয়ে দিয়ে বানের জলের পথ করে দেয়। শেলওয়ারটা হাঁটুর উপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে, জামাটা খুলে গাছতলায় পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে, আর পাগড়ীর লেজ দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছে। আমি ততক্ষণে তার হুঁকোটার তদারক করছি। সে মাঝে মাঝে এসে দুএকটা দম দেয় আর পাগড়ীর লেজ দিয়ে হাওয়া খায়। আমাদের চাষার গামছা আর কাবুলী চাষার পাগড়ী দুই-ই একবস্তু। হেন কর্ম নেই যা গামছা আর পাগড়ী দিয়ে করা যায় না—ইস্তেক মাছ ধরা পর্যন্ত। যদিও আমাদের নালায় সব সময়ই দেখেছি অতি নগণ্য পোনা মাছ।

বেশ বেলা থাকতে মেয়েরা কলসী মাথায় 'জলকে' আসত। গোড়ার দিকে আমাকে দেখে তারা মুখের উপর ওড়না টেনে দিত, আমাদের দেশের চাষীর বউ যে রকম 'ভদ্দর নোককে' দেখলে 'নজ্জা' পায়। তবে এদের 'নজ্জা' একটু কম। ডানহাত দিয়ে বুকের উপর ওড়না টেনে বাঁহাত দিয়ে হাঁটুর উপরে পাজামা তুলে এরা প্রথম দর্শনে আরবী ঘোড়ার মত ছুটে দেয়নি আর অল্প কয়েকদিনের ভেতরই তারা আমার সামনে স্বচ্ছন্দে আমার চাষা বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিন্তু চাষা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশী দিন টিকলো না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মুইন-উস-সুলতানে। চাষাই বলল, সে প্রথমটায় তার চোখকে বিশ্বাস করেনি যখন দেখতে পেল তারি আগা (ভদ্রলোক) বন্ধু মুইন-উস-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি (টেনিস) খেলছেন। আমি তাকে অনেক করে বোঝালুম যে তাতে কিছু মাত্র এসে যায় না, সেও সায় দিল, কিন্তু কাজের বেলা দেখলুম সে আর আমাকে তামাক সাজতে দেয় না, আগের মত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না, 'তো'র বদলে হঠাৎ 'শুমা' বলতে আরম্ভ করেছে আর সম্মানার্থে বহুবচন যদি বা সর্বনামে ঠিক রাখে তবু ক্রিয়াতে একবচন ব্যবহার করে নিজের ভুলে নিজেই লজ্জা পায়। ভাষা শুধরাতে গিয়ে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলে, আর কিছুতেই ভুলতে পারে না যে আমি মুইন-উস-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি খেলি। আমাদের তেলতেলে বন্ধুত্ব কেমন করে করকরে হয়ে গেল।

কিন্তু লেনদেন বন্ধ হয়নি; যতদিন গাঁয়ে ছিলুম প্রায়ই মুরগীটা আণ্ডাটা দিয়ে যেত। দাম নিতে চাইত না, কেবল আব্দুর রহমানের থাবার ভয়ে যা নিতান্ত না নিলে চলে না তাই নিতে স্বীকার করত।

হেমন্তের শেষের দিকে ফসল কাটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন চাষা কাঠুরে হয়ে গেল। আমাকে আগের থেকেই বলে রেখেছিল—একদিন দেখি পাঁচ গাধা বোঝাই শীতের জ্বালানী কাঠ নিয়ে উপস্থিত। আব্দুর রহমানের মত খুঁতখুঁতে লোকও উচ্ছ্বসিত স্বীকার করল যে, এরকম পয়লা নম্বরের নিম-তর **নিম-খুশক্** (আধা-ভেজা) কাঠ কাবুল বাজারের কোথাও পাওয়া যায় না। আব্দুর রহমান আমাকে বুঝিয়ে বলল যে সম্পূর্ণ শুকনো হলে কাঠ তাড়াতাড়ি জ্বলে গিয়ে ঘর বড্ড বেশী গরম করে তোলে, তাতে আবার খর্চাও হয় বেশী। আর যদি সম্পূর্ণ ভেজা হয় তাহলে গরমের চেয়ে ধুঁয়োই বেরোয় বেশী, যদিও খর্চা তাতে কম।

এবারে দাম দেবার বেলায় প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। আমি তাকে কাবুলের বাজার দর দিতে গেলে সে শুধু বলে যে কাবুলের বাজারে সে অত দাম পায় না। অনেক তর্কাতর্কির পর বুঝলুম যে বাজার দরের বেশ খানিকটা পুলিশ ও তাদের ইয়ার বক্সীকে দিয়ে দিতে হয়। শেষটায় গোলমাল শুনে মাদাম জিরার এসে মিটমাট করে দিয়ে গেলেন।

আমাদের দিলখোলা বন্ধুত্ব প্রায় [illegible] পানার মত অবস্থা হল যেদিন সে শুনতে পেল আমি 'সৈয়দ'। তারপর দেখা হলেই সে তার মাথার পাগড়ী ঠিক করে বসায় আর আমার হাতে চুমো খেতে চায়। আমি যতই বাধা দি সে ততই কাতর নয়নে তাকায়, আর পাগড়ী বাঁধে আর খোলে।

তামাক-সাজার সত্যযুগের কথা ভেবে নিশ্বাস ফেললুম।

ডিমোক্রেসি বড় ঠুনকো জিনিস, কখন যে কার অভিসম্পাতে ফেটে চৌচির হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। তারপর আর কিছুতেই জোড়া লাগে না। (ক্রমশঃ)

রোজ বেড়াবার সময়টা তো ঠিক আছে তোর? সেখানে তো কোন ভুল নেই। আর যতো ভুল বুঝি তোর কাজের বেলায়।'

'হ্যাঁ তাই।'

'কী?'

আর বলতে পারতো না। রমা কাজ ফেলে রেখে ওপরে এসে নিজের খাটে এলোমেলো শুয়ে পড়তো।

কিন্তু সেদিন হয়েছে তার রাগ মায়ের উপর। রমা সবে দরজাতে পা দিয়েছে, পেছন থেকে তার মার গলা তাকে টেনে রাখলো, 'রমা শুনে যা।'

'কেন?'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'জানো না কোথায় যাই রোজ।'

'না জানি না, তোকে বলতে হবে।'

'আমি বলতে পারব না।'

'কী' বলে তিনি হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোকে বলতেই হবে...... নিশ্চয়ই তুই অন্য কোথাও যাস্।'

'বেশ আজ থেকে কোথায়ও যাব না...... খুশী হলে তো শুনে' কথাটা বলতে প্রায় কান্না পেয়েছিলো রমার। কিন্তু বলতে হলো। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে এসে অনেক রাত পর্যন্ত বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিলো রমা।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেছে। রমার চুলগুলো বাতাস লেগে লেগে এলোমেলো হয়ে গেছে। হাত দিয়ে মুখের উপরকার চুলগুলোকে সরিয়ে দিলো মাথার উপর দিয়ে পিছন দিকে। মনটা বেশ অবসন্ন লাগছে তার। একবার মার কথা মনে হলো। সত্যি অনেকক্ষণ হলো তিনি ডেকে গেছেন। 'যাই, যাই' করেও কোথায় যেন একটা অদৃশ্য অনিচ্ছা তাকে বেঁধে রাখছে বার বার। খুব একলা থাকতে মন চাইছে তার।

এই সাতটা দিন কী ভীষণ মানসিক অশান্তি দিতে দিতেই না কেটেছে তার। একটা দিন যে রমা সুমন্তকে না দেখে অস্থির হয়ে ওঠে, আর সে কী করে নির্বিবাদে এই সাতটা দিন কাটালো। কখন বিকেল হবে, কতক্ষণে শর্বরীদের বাড়িতে যাবে সে, এই ভাবনাই তাকে উতলা করে রাখতো সারাটা দিন। কিন্তু যে সাতটা বিকেল কেটে গেছে, তাকে যন্ত্রণা দিতে দিতে সেই হৃদয় নিংড়ানো যন্ত্রণার বোঝা যেন রমা আজ সহ্য করতে পারছে না। আজ তার মনটা ছুটে যেতে চাইছে তার কাছে। এই মুহূর্তে যদি সে সত্যি এই হাওয়ায় ভর করে ভেসে যেতে পারতো।

ভিতর থেকে মায়ের গলার স্বর আবার পেল রমা। উত্তর দিল না সে। কেন যেন উত্তর না দেবার একটা দুষ্ট ইচ্ছা তাকে চেপে ধরল। বারান্দার পাঁচিলে বুক চেপে ভালো করে দাঁড়ালো সে।

'রমা...রমা, শুনতে পাস না নাকি?'

না—না কিছুই শুনতে পাই না আমি। কিছু শুনতে চাই না আমি। সুমন্ত তুমি আমাকে নিয়ে যাও—এক্ষুণি এ-বাড়ি থেকে নিয়ে যাও আমাকে।

হঠাৎ একেবারে তার পেছনে মায়ের গলা বাজল, 'কথার উত্তর দিচ্ছিস না যে? কখন ডেকে গেছি তোকে।'

পাক্ খুলে যাওয়া দড়ির মতো ঘুরে দাঁড়ালো রমা। হাত দুটো পেছন দিকে নিয়ে শক্ত করে বারান্দার পাঁচিলটাকে চেপে ধরে রইল সে। বলল—'কী?'

'এখানে কী করছিস তুই তখন থেকে?'

সুমন্তকে ভাবছি মা। তুমি জানো না তাকে ভাবতেও কত ভালো লাগে আমার। আজ সাতটা দিন তাকে দেখিনি। আজ মন চাইছে তাকে দেখতে। যাব মা? একটিবার শুধু।

'নীচে আয়' তিনি চলে গেলেন ঘরে।

রমা কিন্তু তখুনি গেল না মায়ের পিছন পিছন। বারান্দা থেকে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে আলোটা জেলে দিলো। তীব্র আলো মুহূর্তে সমস্ত অন্ধকার ছিঁড়ে ফেলল। মস্ত ডিমের মতো আরশীটা ঝলমল করছে আলো লেগে। রমা এসে দাঁড়ালো আরশীর ঝলমল বুকের ওপর। পিছনে হাত দিয়ে খোঁপাটা ঠিক করতে করতে আরশীর ভিতর দিয়ে দেখতে পেলে তার বাবাকে। আরশীর মুখোমুখি লম্বা বারান্দার ও-পাশের ঘরে তিনি খবরের কাগজে নিমগ্ন। এই খবরের কাগজটি পড়বার ভংগী থেকেই তার বাবার চরিত্রের কিছুটা বোঝা যায়। যেমন নির্লিপ্ত-ভাবে কাগজটি পড়ছেন, তেমনি নির্বিবাদি তাঁর জীবন। সংসারের কোন প্রকার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তিনি নেই। কথা বলেন অত্যন্ত ধীর এবং শান্তভাবে। আরও অদ্ভুত, তাঁর সব কথাগুলোই মনে হয় হাসতে হাসতে তাঁর মুখ থেকে বেরোয়। বাবাকে রমার খুব ভালো লাগে। একে কেন্দ্র করেই তাদের এই মাঝারি গোছের সংসারটি। অথচ বুঝতে কষ্ট হয় না, সত্যি ইনি আসলে সংসারের কেউ কী না। বাবাকে বড্ড একলা মনে হয় রমার। মাঝে মাঝে রমা ইচ্ছে করেই তাঁর পরিচর্যার ভার নিতে যেতো। কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিতেন। শান্ত গলায় বলতেন, 'থাক মা, তুই নিজের কাজ কর গিয়ে যা; যদি পারিস তোর মাকে একবার পাঠিয়ে দে'—রমার মনে পড়ে না, কোনদিন ছোট-বড় অপরাধে সে বাবার কাছ থেকে তিরস্কার পেয়েছে বলে। অথচ তেমন অপরাধ তো সে প্রতিদিন দু-একটা করছে। অন্তত মার ব্যবহারে আজকাল তাই তার মনে হয়।

এই তো অফিস থেকে ফিরে শান্ত হয়ে বসেছেন, দেখলে বোঝাই যাবে ইনি সারাদিন পেয়ালা চা দিয়ে যাবে, মনে মনে হয়তো সেই খেটে এইমাত্র বাড়ি ফিরলেন। কখন কে এক প্রত্যাশা করছেন। না দিলেও কিছু বলবেন না। রমা অনেকক্ষণ আরশীর ভিতর দিয়ে দেখলো তার বাবাকে। তারপর ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাবার ঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ির মুখে ছোট ভাই নণ্টুর সাথে দেখা হয়ে গেল। নণ্টু উপরে উঠছিল নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে। রমাকে দেখে বলল, 'দিদি তোমাকে মা ডাকছেন।'

'জানি', একটু থেমে সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'নণ্টু শোন্।'

নণ্টু বারান্দা দিয়ে যেতে গিয়ে থেমে পড়ল। কাছে এসে বলল—'কী?'

'বাবা কতক্ষণ এসেছেন রে অফিস থেকে।'

'জানি না তো।'

'কী জানো তুমি?' রমার খুব রাগ হলো নণ্টুর ওপর। কিন্তু আর কিছু না বলে তরতর করে নেমে এল নীচে। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াতেই মা রান্না থেকে মুখ না তুলে বললেন, 'এতক্ষণে সময় হলো তোমার' [illegible] রেগে গেলে 'তুই তুমি' হয়ে যায়। [illegible] দেখিয়ে দিলেন একদিকে, 'পটে' চা আছে [illegible] এসো ওপরে।'

রমা কোন কথা না বলে 'পট' থেকে চা ঢেলে নিলো একটা সুদৃশ্য পেয়ালায়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে এল উপরে। মনে মনে মার উপর কী রকম জ্বালা-ধরা রাগ হতে লাগলো তার। মা কেন এরকম! কেন এরকম [illegible]

রমার মনে আছে। মাত্র তিন মাস আগে একটু মধুর দিন জীবন্ত ঝড় তুলে দিয়েছিল তার মনে। তিনটে মাস আগেও [illegible] তো মোটামুটি ছকে ফেলাই ছিল। [illegible] জানতো কলেজের এই দ্বিতীয় বর্ষটি [illegible] পেরোতে হবে না। অথবা তাড়াহুড়ো [illegible] পরীক্ষাটি দিয়ে দিলেই তার সামনে [illegible] হাজির করা হবে একজন সুপাত্র [illegible] পাত্রের চেহারায় এই 'সু' কথাটি কোথাও থাকবে না সে তা জানে), তারপর কী হবে [illegible] পরের সম্বন্ধে রমা চিন্তাও করেনি। এই পর্যন্ত ভেবেই ভীষণ মন খারাপ লাগতো [illegible] আজ থেকে মাত্র তিনটে মাস, মাত্র [illegible] আগেও মনে মনে এই কথাই জানতো [illegible] মাকে যদিও তার খুব ভয়, (সংগে সংগে একটু অশ্রদ্ধাও হয়েছে যেন আজকাল), [illegible] ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবলেই [illegible] লাগতো মনের ভিতরটা তার। [illegible] মনে হতো, কেন সে মেয়ে হতে গেল [illegible] দিব্যি পারতো নণ্টুর মতো ছেলে [illegible] মেয়ে হয়েছে বলেই বা এমন কী? [illegible] হবার সংগে সংগেই তাকে নিয়ে সকলের মাথা না ঘামালেই নয়! তবু মা বলে বলুক, আত্মীয় অনাত্মীয়দের এই নিয়ে পাকামী [illegible] লাগে। বিয়ে সে করবে না, এমন অদ্ভুত [illegible] তার নেই। তবু সে বিষয়ে নিজের [illegible]

[illegible] ভালবাসা উচিত। আর তারপর নিজের পছন্দমত লোককে সে বেছে নিতে চায়। আর ঠিক যেন রমা সেইটেই বেশী করে চায়। মেয়েরা একটু বড় হলেই তাকে একটু নিশ্চিন্তে, নিরিবিলি থাকতে কেউ দেবে না।

রমা লক্ষ্য করেছে, মেয়েদের ওপর মেয়েদের দুশ্চিন্তাটাই চিরকাল বেশী। যেমন তার মা। মেয়ে বড় হলো, বড় হলো' করে অস্থির। বাবার কিন্তু সেদিকে বিশেষ লক্ষ্যই নেই। মা-ই বাবাকে মাঝে মাঝে সে সম্বন্ধে সচেতন করে দিতেন, 'মেয়েটা যে দিন দিন ধাড়ী হয়ে উঠলো শুনেছো!' (কী বিশ্রী রকমের কথাটি) বাবা একটু অন্যমনা হয়ে উত্তর দিতেন—হুঁ।'

'হুঁ মানে!'

'আঃ, একটু চুপ করো।' রমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলতেন, 'পড়াশুনো ভালো লাগছে তো মা?'

রমা কোনমতে সায় দিয়ে ঘর ছেড়ে পালাতো। মা বলতেন, 'আমি তো চুপ করেই ছিলুম চিরকাল।'

বাবা অতি ধীরভাবে বলতে বলতে কোন কাজে হাত দিতেন, 'তাই থাকো।'

বাবাকে রমার এত ভালো লাগে। আসলে উনিও যেন রমাকে হারাতে চাইতেন না।

[illegible] ছিল সুমন্ত্র এই তিন মাস আগে। [illegible] কী একবারও ভেবেছিলো একবার [illegible], যা শুধু তারই জন্য এমন একটা [illegible] নিয়ে অপেক্ষা করে আছে।

রমারা বালীগঞ্জে বাড়ি বদল করে এসেছে [illegible] দু বছরের বেশী নয়। আর এই সুদীর্ঘ [illegible]র ভিতর কটা দিন সে বার হয়েছে [illegible] বাড়ি থেকে আজও তা গুণে গুণে [illegible] পারবে সে। আর সে বার হওয়ার ভিতরেও [illegible] সুখ ছিল না। তার বার হতে হতো মার সঙ্গে মাঝে মাঝে কোন আত্মীয়দের বাড়িতে অথবা কচিৎ কখনো কোন ফিল্ম দেখতে। কিন্তু একলা পথে বার হবার কথা কলেজে [illegible] সে ভাবতে পারেনি। আর তখন সাথী মত কোন বান্ধবী ছিল না। এ-বয়সে মেয়েদের একাধিক বান্ধবী থাকে। কিন্তু তার হয় না।

ম্যাট্রিকের পরে লম্বা ছুটিটা কী ভীষণ [illegible] নিয়েই না কেটে গেছে। বাড়িতে [illegible] মাঝে মাঝে মনে হতো, এই সাদা [illegible] দেয়াল দেখে দেখে সে এবার অন্ধ হয়ে [illegible]। বলা বাহুল্য, রমা 'প্রাইভেটে' ম্যাট্রিক দিয়েছে। স্কুলে পাঠালে মেয়েরা নাকি অতি [illegible] পাকতে শুরু করে। কথাটা [illegible] একলা রমা অনেক ভেবে দেখেছে। [illegible] কিছুটা কথাটার ভিতর। আত্মীয়দের বাড়িতে স্কুলে-পড়া ছোট ছোট মেয়েদের মুখে যখন পাকা পাকা কথা শুনতো তখন তার এই কথাটাই মনে উঁকি দিতো।

কিন্তু ম্যাট্রিকের পরে এলো কলেজের পালা। রমা সারাটা গ্রীষ্ম মনে মনে ঠিক করে এসেছে—কলেজে সে পড়বেই। বাড়ির এই পাঁচিল তাকে ডিঙোতেই হবে। বাবার মত রমা জানতো। কিন্তু তার মা ভয়ানক বাধা দেবেন, তাতে কোন ভুল নেই। আর ঠিক বাধা এসেছিলো। আশ্চর্য সে বাধা টিঁকলো না। কলেজের নাম শুনে তিনি প্রায় আঁতকে উঠেছিলেন।

'মেয়েরা কলেজে পড়বে কী?' তিনি যেন মনে অনুভব করতেন মেয়ে তার কলেজে ঢুকলেই তার আঁচলের গেরো খুলে পালাবে।

কিন্তু বাবা তার কথা কানে তুললে না। তিনি নিজে গিয়ে রমাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। ঠিক হলো বাড়ির দরজার সামনে কলেজের বাস এসে দাঁড়াবে আর সেই বাসে রমা কোন মতে কোন দিকে না তাকিয়ে জড়ভরত হয়ে বসে পড়বে।

কিন্তু সে সত্বেও রমার কপালে টিঁকলো না। সুমন্ত্র যেন যেন ঝড়ের মতো এসে সব কেমন করে দিয়ে গেল। মনটিও গোলমেলে হয়ে গেল রমার।

যত দিন যেতে লাগলো কলেজে মেয়েদের সাথে ততই একটু একটু পরিচয় হতে লাগলো রমার। রমা অল্প লাজুক। তাই নিজে থেকে কোন মেয়ের সান্নিধ্য মনে মনে কামনা করলেও বাইরে প্রকাশ করতো না সে।

একটি মেয়ে খুব বেশী আকর্ষণ করলো তাকে। সে শর্বরী। সুন্দর শরীরের গঠন-ভঙ্গিমা। অত্যন্ত চপল। চোখে সব সময় একটা নিষ্ঠুর হাসি যা কোনদিন কোন মেয়ের চোখে রমা দেখেনি। চোখ তো সবারই থাকে। কিন্তু তাতে দেখে কটা লোক! রমার মনে হতো শর্বরী যে দেখতে পায় সবকিছু, অতি সুস্পষ্টভাবে তা ও চোখ দুটি দেখেই বোঝা যায়। দ্রুত হাঁটে, দ্রুত কথা বলে মেয়েটি। রমা ইচ্ছে করে নিজেই এগিয়ে গেলো শর্বরীর দিকে। রমা নিজের লজ্জার অর্থহীনতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলো। শর্বরীর কাছে নিজেকে আরো মুখর করে নিলো রমা। শর্বরী তাদের পাড়াতেই থাকে। কতদিন কথা দিয়েছে রমা কিন্তু যেতে পারেনি।

একদিন কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরেই রমা জানালো শর্বরীর কথা তার মাকে। 'জানো মা কী সুন্দর মেয়ে সে! আমাদের কলেজে ওই একটি মাত্র মেয়েই আছে শুধু। আর মা জানো যেমন দেখতে তেমন কথাবার্তায়। তুমি যদি দেখতে শর্বরীকে...'

'কে?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'শর্বরী...এই তো আমাদের রাস্তাতেই থাকে। কতদিন যেতে বলেছে।'

'কি নাম সব আজকালের মেয়েদের' তিনি গম্ভীর হলেন।

'কেন মা, শর্বরী নাম তো খুব ভালো।'

'তুই যা এখন কাপড় ছেড়ে আয়।'

'খুব কাছেই ওদের বাড়ি মা', রমা মায়ের মুখের দিকে কেমন একটা করুণ উৎসুক চোখে তাকালো।

তিনি কিন্তু উত্তর দেওয়ার তেমন প্রয়োজন বোধ করলেন না।

রমা কি ভেবে শেষে বলেই ফেললে, আজ ওদের বাড়িতে একটু যাব মা,' তারপর মায়ের গা ঘেঁষে এল সে, বললে, 'লক্ষ্মীটি মামণি যাই মা কেমন!' বুকের ভিতরটা তার কেমন ভারী বোধ হ'লো মায়ের উত্তরটার কথা চিন্তা করে।

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে কেমন নির্লিপ্ত-ভাবে তিনি বললেন, 'বেশ যেও, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফিরো।'

'রাগ করলে তুমি?' হঠাৎ রমা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেই কী মনে করে আবার বলল, 'খুব শিগ্গির-ই ফিরব।' মায়ের কাছ হ'তে এমন কথাটার কোন গুরুত্ব না দেখে রমা মনে মনে বেশ আশ্চর্য হলো। কিন্তু! কিন্তু তখনও কি রমা একবারও ভাবতে পেরেছিলো সেই কথা! ভাবতে পেরেছিলো এই রমা ফিরে আসবার সময় কার অলস অথচ দৃঢ় দুটি চোখ বহন করে নিয়ে আসবে মনে মনে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য সুতো দিয়ে গেঁথে দেবে নিজেকে তার সঙ্গে। হৃদয়ে সব তার বিচিত্র এক সুরে ভরে উঠবে! না-না-না। কখনোই সে তা ভাবতে পারেনি। কেউ তা পারে না। ঠিক কোন্ মুহূর্তটি তার চরম সুখ অথবা দুঃখ নিয়ে অপেক্ষা করছে সে তা জানে না।

বাড়িটা চিনে নিতে রমার খুব বেশী কষ্ট হলো না। রমাদের পাড়ার এই রাস্তাটাতে লোকজনের হাঁটাচলা একটু কম। ভাগ্যিস কম, তাইতো সে এত হন হন করে আসতে পেরেছে।

ছোট্ট একতলা বাংলো ধরণের সাদা বাড়িটি। বাড়িটার তিনদিকেই ফুলের বাগান—সবই প্রায় বিলিতি ফুল। শীতের সময়ে গেইটের গায়ে কয়েকটি গাঁদা ফুল ফুটে থাকে। মাঝে মাঝে দু একটি দোলোন চাঁপাও পাওয়া যাবে খুঁজলে। এতগুলো বিলিতিদের ঘেঁষাঘেঁষিতে ওরা লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকে। রমা আলতো হাতে গেইটটা খুলে ভিতরে এলো। বাড়ির পিছন দিক দিয়ে গা ঘেঁষে উঠেছে লম্বা শুধু একটা সুপারি গাছ। বিকেলের বাতাসে পাতাগুলো ঝিরঝির করে নড়ছে। দক্ষিণ দিকটাতে কোন বাগান নেই। সবুজ ঘাসে ঢাকা অনেকটা জায়গা। ঘাস-গুলোর মসৃণতা দূর থেকেই অনুভব করা যায়। গেইট্ থেকে বাড়িটা পর্যন্ত [illegible]

রংয়ের কুচি পাথর-ঢালা পথ। পায়ের নীচে সরে' সরে' যায় পাথরগুলো। রমা ধীরে এগিয়ে এল বাড়িটার দিকে। দরজা জান্‌লা সবই বন্ধ। চারদিকে ভারী চুপচাপ। রমার কি রকম মনে হলো যেন। ভয়ানক অচেনা জায়গাতে যেন হঠাৎ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাই বল, বাড়িটি সত্যই সুন্দর। আঃ এমন না হলে বাড়ি! রমা সিঁড়ি ভেঙ্গে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ভারী মেহগনি দরজাটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ভয় হয় দেখলে। মনে হয় এখুনি যেন গম্ভীর ভারী গলায় বলে বসবে, 'কাকে চাই আপনার'! দরজার ঠিক ওপরে ছোট্ট গোল সাদা বোতামটা টিপে দিলো রমা। আর একবার টিপতে যাবে, দরজাটা কেঁপে উঠল। শর্বরী একমুখ হেসে রমার হাত দু'টো ধ'রে বললে, 'খুব মেয়ে বটে তুই' রমাও ঠোঁটে হাসি টেনে বললে, 'কেন!'

'আয়, ভেতরে আয়'—হাত ধরেই টেনে আনলো ঘরের ভিতরে, বলল, 'বস।'

রমা ঘরের চারদিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো। সত্যি কি ঘর! আর তারা সকলে কী ঘরেই না এতকাল মানুষ হয়ে এসেছে। ঘরের দেয়ালগুলোতে মস্ত লম্বা লম্বা বাঁধানো ছবি। ছবিগুলো ঠিক কোথাকার বুঝলো না রমা। তবে এদেশের নয় যে তা বেশ জানা যায়। কারণ ওরকম ঘর, গাছ, জল, মাঠ কিছুই এদেশের মতো নয়। তাহোক্‌ তবু ছবিগুলো ভালোই লাগল তার। ঘরের মাঝে চারদিকে চারটে সোফা। মাঝে টেবিল। টেবিলের গায়ে নানা রকম কারুকার্য; কাজেই তাকে নগ্ন রাখতে হয়েছে। রমা বসে' পড়ল।

শর্বরী বলল, 'কবে থেকে তোর দিন গুণছি।'

একটু হেসে রমা বলল, 'তুই আবার কারো জন্য দিন গুণিস নাকি' একটু থেমে বলল 'জান্‌লাটা খুলে দে না' 'কেন, ওধারের গুলোতো খোলাই রয়েছে, রাস্তার দিকের জান্‌লা খুলে দিলে বাবা রাগ করেন। বলেন, বড্ড গোলমাল আসে ভেসে।'

'বাবা কোথায়?' রমা জিজ্ঞাসা করলো, 'আসবেন না তো এখানে!'

'লাইব্রেরীতে পড়াশুনো করছেন। আর একটু পরেই ছাত্রটিও আসবে তাঁর, যদিও ছাত্রটির পড়াশুনোর চাইতে আড্ডাই বেশী পছন্দ। তা হোক তবু ছাত্রটি ভালো।' শর্বরী একটু থেমে আবার বলল, 'তিনি এখানে এখন নিশ্চয় আসবেন না, আর এলেই বা।' রমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

'এখানেই বসে বসে বিকেলগুলো কাটাস নাকি' রমা হেসে বলল, 'চল্‌না বাইরে গিয়ে দাঁড়াই একটু।'

'যাব, তবে একটু অন্ধকার না হ'লে আমি ঘর থেকে বার হই না।'

'কেন!'

'এমনি, ভালো লাগে না তাই।'

শর্বরীকে রমার বেশ লাগছে। বিশেষ ক'রে ওর এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবনটার উপর ভারী লোভ জাগছে তার মনে মনে। শর্বরীর মা নেই। বাবা প্রফেসর। দিনরাত বইএর গাদাতে ডুবে থাকেন। সব কিছু মিলে কি রকম যেন শর্বরীরা। কোন মিল নেই রমাদের সঙ্গে। আর এই অমিলটার জন্য রমার প্রথমেই খুব কাছে ঘেঁষতে যেন সাহস হচ্ছে না। বেশ আছে ও। কোন দিকে কোন বাধা নেই—চারদিকে অপর্যাপ্ত আলো আর আকাশ। দেখে দেখে নিজের খেয়ালে দিন-গুলো কাটিয়ে দেয়। রমার মনে হলো যেন এই রকম মুক্তির ভিতর না থাকলে জীবনের পুরোপুরি স্বাদ গ্রহণ করা যায় না।

রমা একবার তাকালো শর্বরীর মাথার উপরে গোল দেয়াল ঘড়িটার দিকে। দুটো বেজে গেছে। এবার উঠতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু কি বলে উঠবে এখন।

শর্বরী কি বলতে যাচ্ছিল দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। রমা দাঁড়িয়ে উঠতেই শর্বরী বলল, 'বস, বস—দেখি বাবার ছাত্রটি এলেন কি না। রোজ কিছু দেরী করাটা ওর একটা অভ্যাস।' রমার ভারী লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলো না সে।

শর্বরী দরজাতেই বলল, 'এসো সুমন্ত্র আজ আমার এক বন্ধুবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তোমাকে—আর তুমিতো মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে ভালোই বাস—তাই না!'

সুমন্ত্র ঘরে ঢুকে বলল 'এরকম একটা মিথ্যে কথা তোমার বান্ধবীর সামনে না বললেই ভালো করতে।'

শর্বরী পরিচয় করিয়ে দিল—'রমা রায়, রায়—ই তো তোরা না?'

রমা মাথা নেড়ে সায় দিলো। লজ্জাতে মাথাটা একটু নীচু হলো তার।

'সুমন্ত্র সেন' আর কিছু বলল না শর্বরী। একটু হাসলো সে।

নমস্কার করতে গিয়ে রমার চোখ আটকে গেল সুমন্ত্রের চোখে। আশ্চর্য, কোথায়, কোথায়, কবে এই চোখ সে দেখেছে। কিন্তু কোথায় তা মনে পড়লো না তার। কি সুন্দর তাকানোর ভঙ্গী সুমন্ত্রের। রমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠলো। কি যেন মনে হলো তার...কি যেন। এরকম কখনো তার হয়নি (অবশ্য পুরুষ বলতে রমা এখন পর্যন্ত বাবাকে ছাড়া আর কাউকে দেখেই নি ভালো করে)। রমার মনে হয়, এই দুটি চোখ যেন শুধু দেখেই না, দেখার ভিতর দিয়ে যেন আরও কিছু দিয়ে দেয়। কিন্তু কী দেয়?

বেশ কাঁপা হাতে নমস্কার করলো রমা। সুমন্ত্র বসলো রমার উল্টো দিকে। শর্বরী সুমন্ত্রকে লক্ষ্য করে বললো, 'তুমি খাতা-বই কিছু আননি যে আজ!'

'রোজ রোজ খাতা আর পেন্সিল নিয়ে আসতে হবে তার কী মানে আছে!' তারপর রমাকে বলল সে, 'কী বলুন!'

রমা একটু হেসে চুপ করে রইল শুধু। আর একবার তাকাতেও পারলো না ওর গভীর কালো চোখ দুটির দিকে। মনে মনে বুঝতে পারলো, তার আর কোন উপায় নেই সুমন্ত্র ছাড়া। মনে হলো, একটি চাহনিতে যেন সুমন্ত্র তার মনের ভিতরে নেড়ে চেড়ে সব কিছু দেখে নিয়েছে। মনের ভিতরটা তোলপাড় করছে তার। ঠিক এই রকম অবস্থার সঙ্গে রমা পরিচিত নয় একেবারে। জীবনে তার নতুন দোলা দিল। অপূর্ব সে দোলা, অদ্ভুত [illegible] দোলা। ভয় হয় কিন্তু মন চায়। আবার দেখতে ইচ্ছে করছে ওই চোখ দুটি, আবার, [illegible] অনেকবার। চকিতে একবার তাকালো রমা সুমন্ত্রর মুখের দিকে।

সেদিন এটা-সেটা কথাবার্তার পর [illegible] উঠে এল। আসবার মুখে সুমন্ত্র [illegible] 'আসবেন মাঝে, মাঝে।'

রমা হাসল শুধু। মনে মনে বলল, [illegible] আসতেই হবে। শর্বরী আর সুমন্ত্র [illegible] রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

রমা তার বাবার ঘরে চা রেখে এসে [illegible] ঘরে টেবিলের উপর মাথা রেখে চোখ [illegible] বসেছিলো। প্রথম দিনকার সেই সুন্দর উত্তাপ [illegible] আবার টের পাচ্ছে যেন আজ। হ্যাঁ, তা [illegible] তিন মাস পর। তিন মাস যেন [illegible] হাওয়ার মতো কোথায় উড়ে গেছে। [illegible] সাতটা দিন সুমন্ত্রের কোন খবরই পায়নি [illegible] সাত দিন একটা ভীষণ ভারী পাথরের মত তার বুকে চেপে আছে। কেবলে শর্বরীকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারতো অনায়াসে [illegible] সে আশা করেছিলো, নিশ্চয়ই সুমন্ত্র [illegible] কথা জানতে চাইবে। কিন্তু শর্বরী কোন [illegible] বলেনি তাকে। এমন কি, যে রমা [illegible] তাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করেছে, সে [illegible] কেন সাতটা দিন যেতে পারেনি—সে [illegible] জানতে চায়নি তার কাছে।

এই তিন মাসে শর্বরী অবশ্য [illegible] বদলেছে। রমাও বদলেছে। শুধু [illegible] হয়তো সুমন্ত্র। শর্বরীর সাথে আজকাল [illegible] কী নিয়ে রেষারেষি চলছে তার। রমা [illegible] পারে শর্বরীর মনের আসল দ্বন্দ্বটা [illegible] কোথায়!

সুমন্ত্রকে শর্বরী পেতে চায়, তা রমা প্রথম থেকে জানে। কিন্তু তা নিয়ে রমা [illegible] বলেনি। রমা দেখেছিলো সুমন্ত্রর শর্বরীর [illegible] স্বতন্ত্র ব্যবহার এত খোলা যে, [illegible] কোন মলিনতা থাকতে পারে না। [illegible]

রমা বিশ্বাস করছে মনে মনে সুমন্ত্রকে। অনেক বিশ্বাস করেছে—রমা জানে, এই বিশ্বাসের অমর্যাদা নিশ্চয়ই সে করবে না। অন্তত রমা সে কথা মনে করতে পারে না। সুমন্ত্রকে যদিও রমা মুখ ফুটে বলেনি তার আসল মনের কথাটা। তবু বহুবার বহুদিন কাজের ভিতর দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, সে তাকে চায়। সুমন্ত্রও বলেনি তাকে কিছুই। শুধু হেসেছে। হাসির নিভৃত অর্থ রমার কাছে খুবই সহজ হয়ে এসেছে।

শর্বরীর কাছেও রমার এই আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তার মতো মেয়ের কাছ থেকে রমা এই রকম ব্যবহার আশা করেনি। রমা আজকাল জানে, তার বাধা শুধু তার মা-ই নয়। তার বাধা চারিদিকে। শর্বরীও।

সবচেয়ে খারাপ লাগলো রমার সুমন্ত্রর কথা ভেবে। সে নিশ্চয়ই পারতো একটা চিঠি অন্তত লিখতে তাকে।

রমার আজ আর একটা ছবি মস্ত আঁচড় কাটছে মনে। আর সেই দিনটিকে কেন্দ্র করেই না সে তার জীবনের অনেকগুলো অধ্যায় পর পর উল্টে গিয়েছিলো। আজ সেই দিনটি আর নেই। তার জায়গায় অনেক নতুন দিন এসেছে নতুন মোহ নিয়ে, কিন্তু সে আর আসে নি। [illegible] তাই তো হয়। [illegible] গেল তা গেলই। অতীতের [illegible] মাঝে এক একটি দিন রমা হারাচ্ছে [illegible] আর ফিরে আসবে না। অনন্তকাল ধরে [illegible] করে মরলেও না। এই নিষ্ঠুর একটা [illegible] ভিতর প্রতিদিন নিষ্পেষিত হচ্ছে [illegible]। আর কিছু নেই।

হঠাৎ রমা চোখ খুলে তাকালো তার তর্জনীটির প্রতি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। [illegible] আঙুলটিকে কাপড়ের ছায়া থেকে টেবিলের উপর আলোয় আনলো। একটা [illegible] কাটা দাগ। দাগ? না—না দাগ নয়, সুমন্ত্রর অনেক [illegible] করে আঁকা ছবি এটা। এর পরেও কী সে সুমন্ত্রকে ভুল বুঝবে। [illegible] তা ঠিক নয়। সুমন্ত্র তাকে বাধা দিয়েছে। আর সেই জন্যেই অত গভীরভাবে রমা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। আর আজ [illegible] যদি সে দেখে! কী দেখবে! কী! কিছু দেখবে না রমা। কিছু দেখার আগে সে যেন অন্ধ হয়ে যায়। সেই দিনকার সেই [illegible]—আর আজ সেই সুখের রোমন্থনই তাকে অসহ্য বাধা দিচ্ছে।

রমা সেদিন বেশ একটু আগেই গিয়েছিলো শর্বরীদের বাড়িতে। দরজা খুলে দেখেই রমা চেঁচিয়ে উঠেছিলো—"একি আপনি!" একটু থেমে বলল, 'শর্বরী কোথায় ?'

সুমন্ত্র ঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়ে বন্ধ বইটা খুলে নিতে নিতে বলল, 'শর্বরী একটু বেরিয়েছে......তা বসো তুমি' (সুমন্ত্র অনেক দিন থেকেই রমাকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছে)।

রমা একটু ইতস্তত করে ভিতরে এসে বসলো। আজ সুমন্ত্রকে একলা পাওয়া গেছে। আজ সে অনেক কথা বলতে পারে। কিন্তু সে পারবে না জানে। সুমন্ত্রকে সুযোগ দেবে বলতে।

'আজ একটু তাড়াতাড়ি এসেছেন আপনি।'

সুমন্ত্র বই থেকে মুখ তুলে তাকালো। হাসলো। বললো, 'তুমিও তাই দেখছি।'

রমা মাথা নীচু করেই তুলে নিল।

'শর্বরী কতক্ষণ গেছে?'

'জানি না।'

'আপনি আসবার আগেই বেরিয়ে গেছে?'

সুমন্ত্র রমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অল্প হাসল। রমার বুকের ভিতরটা অজানা আশংকায় দুর দুর করছে। কী যেন বলতে চাইছে সুমন্ত্র তাকে। কিন্তু কী বলবে!

'এত শর্বরীর কথা কেন তোমার মুখে, শর্বরী তো তোমার নাম আজকাল করেই না।'

রমা প্রথমে কিছু বললো না। শর্বরী কিছু বলেছে নিশ্চয়ই সুমন্ত্রকে। কিন্তু কী বলেছে। ভারী রাগ হচ্ছে তার শর্বরীর ওপর।

'তোমার লজ্জা করছে না তো আমার সামনে একলা বসে গল্প করতে।' 'কী করছ নাকি! তাহলে পাশের ঘরে শর্বরীর বাবার সাথে গল্প করতে পার।'

রমা কথা বলল না।

'আচ্ছা একটা কাজ করে দাও আমার।'

রমা তাকালো। 'কী।'

'এই পেন্সিলটা কেটে দাও।' সুমন্ত্র এগিয়ে ধরল একটা নিটোল হলদে রংয়ের পেন্সিল তার দিকে।

রমা হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়েও নিল না, বলল, 'দিন, ছুরি দিন আমাকে।'

'বাঃ, নাও না এই তো।'

'না।'

এবার সুমন্ত্র ছুঁড়ে দিল পেন্সিল আর একটা ছোট ছুরি রমার কোলে। আর হাসলো জোরে।

রমাও হাসল ঠোঁট কামড়ে।

কিন্তু রমা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। অন্যমনা হয়ে ছুরি চালাতে গিয়ে ছুরিটা পেন্সিল টপকে রমার এগনো তর্জনীটার উপর বসে গেল। কী রক্ত! রমার ঠোঁট দিয়ে একটু শব্দ হয়েছিলো : উঃ। সুমন্ত্র মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে রমার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আঙুলটা তার চেপে ধরল। তীব্র জোরে সুমন্ত্রের হাতের নিষ্পেষণে রমাকে ব্যস্ত করে তুলল।

রমা বলল—'না—না আপনি ছাড়ুন।'

সুমন্ত্র ছাড়লো না রমার আঙুলটা। বলল, রক্তটা থেমে গেলেই ছেড়ে দেব, একটু থেমে আবার বলল, 'সত্যি এর জন্য দায়ী আমিই।'

রমা অনেক ভেবে দেখেছে। এই কয়টা দিনে সে যে এতটা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে সুমন্ত্রকে দেখবার জন্যে, সে শুধু সুমন্ত্রর জন্য নয়। আজ মনে মনে সে একটু ভয়ই করে শর্বরীকে। শর্বরীই তাকে বাধ্য করেছে তাই করতে। তার ব্যবহার রমার প্রতি আর সহজ নেই। বরং একটু বাঁকা একটু এড়িয়ে চলতে চায় সে রমাকে। আঙুলের সরু দাগটার ওপর ছোট একটা চুমু খেয়ে রমা উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে। আরশীর টেবিলে তার হাতঘড়িতে কাঁটা বাজল দেখল। আটটা বেজে গেছে। নিশ্চয়ই পাবে সে এখন সুমন্ত্রকে ওদের বাড়িতে, নিশ্চয় পাবে তাকে। সুমন্ত্র অনেক রাত পর্যন্ত শর্বরীর বাবার কাছে পড়াশুনা করে চলে যায়।

রমা দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তার মাকে কী বলবে। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। কিন্তু যে কথাটা বলতে চায় মনে মনে তা কী পারবে আজই বলতে সে। না পারলে চলবে না। সুমন্ত্রর খুব উচিত ছিল একবার তার খোঁজ করা। রমা আবার ঘরে ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে ছোট কাগজ নিয়ে তার উপর পেন্সিল দিয়ে লিখল। একটা লাইন লিখেই কেটে দিল লাইনটি। কী লিখবে? কিছুক্ষণ ভেবে তাড়াতাড়ি খসখস করে লিখে গেল: সুমন্ত্র! তুমি অন্যায় করেছ ভীষণ। তোমার উপর রাগ হচ্ছে। শর্বরীর কাছে চিঠির কথা বলো না। ......থেমে পড়ল রমা। কাগজে নীচে একটা কথা লিখতে মন চাইলেও রমা তা লিখতে পারবে না। বড় বড় করে শুধু লিখল, 'রমা।'

চিঠিটা বুকের মধ্যে রেখে বারান্দায় এল সে আবার। বারান্দার এক কোণে নন্টুটা বই খুলে বসে বসে কী ভাবছে। রমাকে দেখে চট করে সোজা হয়ে বসলো। কিন্তু রমাকে তার দিকে এগোতে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সে। রমা একটু কাছে যেতেই নন্টু বলল, 'আমার ইংরেজি পড়াটা বলে দাও না।'

'দিচ্ছি, রমা বলল, 'একটা কাজ করতো নন্টু একবার নীচে যাবি।' কী ভাবল রমা।

'কেন?'

'মা কী করছেন শুধু দেখে আসবি যা', রমা ঠেলে দিল নন্টুকে, 'যা ওঠ......'

নন্টু আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

রমার বুকের ভিতরটা ভীষণ দুর দুর করছে।

নন্টু ফিরে এসে জানাল, 'মা নীচে নেই।'

'তবে কোথায়?'

'জানি না। হয়তো ছাদে গেছেন।'

'তুই দেখেছিস তো!' রমা হাত দিয়ে অনুভব করলো বুকের মধ্যের চিঠিটাকে।

সুমন্ত্রর দেখা পেলে তার দিকে ছুড়ে দিয়েই পালিয়ে আসবে সে।

'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি নণ্টু, কাউকে বলবি না বুঝলি।' রমা আর দাঁড়ালো না।

রাতের স্বল্প হাওয়া শিরশির করে গায়ে কাঁটা তুলে দিচ্ছে। রাস্তাতে লোক নেই একজন। শুধু মাঝে মাঝে নির্ভুল ব্যবধান রেখে জ্বলছে গ্যাসের সবুজ—ফ্যাকাশে সবুজ আলো। সারা রাস্তায় এরাই যেন একমাত্র জীবন্ত। রমা একটু ধীরে ধীরেই এগোতে লাগল।

শর্বরীদের গেটটার সামনে এসে একবার কী ভেবে নিল রমা। এবার নিঃশ্বাসের দ্রুত শব্দ সে নিজেও শুনতে পেল। গেটটাকে আস্তে পিছন দিকে ঠেলে দিতই সেটা খুব ক্ষীণ একটা 'কুঁউচ' শব্দ করে সরে গেল। ভিতরে এসে একবার দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। ঘরে আলো জ্বলছে। এবার একটু দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল রমা।

বারান্দায় উঠে দরজার বোতাম টিপতে গিয়ে থেমে গেল তার হাত। হাওয়ায় ভেসে এল রিণরিণ করতে করতে একটা সরু মেয়েলি হাসির শব্দ। মিষ্টি শব্দ। রমার সমস্ত গা রিণরিণ করে উঠল। শর্বরীর গলা চিনতে রমার কষ্ট হলো না। রমা ফিরে দাঁড়ালো। শব্দটা দক্ষিণের সবুজ মসৃণ ঘাসের দেশ হতে এল যেন। ওখানে কী করছে শর্বরী। পা টিপে টিপে রমা সিঁড়ি ভেঙে নীচে এল। বুকের ভিতর একটা নিঃশ্বাস উঠেই আটকে রইল। রমার কাছ থেকে কুড়ি গজ দূরে সবুজ ঘাসের বুকে দুটি সিলুয়েত্ মূর্তি। ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের ক্ষীণ আলোতে তাদের সান্নিধ্যের ব্যবধান বোঝা যাচ্ছে না। রমা মুহূর্তে ঘেমে উঠল। কান সোজা করলো সে। না কিছু শুনতে পাচ্ছে না সে।

রমা এগিয়ে এল। আরও—আরও। প্রায় ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে—চমকে উঠল সে। একবার কেঁপে উঠল সে। হঠাৎ ডেকে ফেলল সে, 'সুমন্ত্র......'

ওরা দুজন দুজনকে হঠাৎ ছেড়ে দিল। শর্বরী উঠে দাঁড়াবার আগেই সুমন্ত্র লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু রমা তখন গেটের কাছে। তারপরে রাস্তায়। সুমন্ত্রও ছুটে যেতে গিয়ে বাধা পেলো।

শর্বরী সুমন্ত্রর কাপড় ধরে টেনে বলল, 'বোস।'

তবু সুমন্ত্র একবার ডাকলো—'রমা শোন, শোন......'

কিন্তু রমা তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা কাগজ ছিঁড়ছে। তারপর দ্রুত পা চালাতে গিয়ে বাধা পেল যেন।

রমা স্পষ্ট অনুভব করলো আঙুলের এই ছোট্ট দাগটির আজ আর কোন ব্যথা নেই। নির্লিপ্ত মৃত সেটা দাগই শুধু।

# রবীন্দ্রনাথের একটি গান

**শ্রীশান্তিদেব ঘোষ**

গুরুদেবের "একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন," গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে এখনো অনেকে মনে করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "বন্দনা" নামে একটি স্বদেশী সঙ্গীত সংগ্রহ পুস্তকে ও 'রবীন্দ্র-জীবনী' রচয়িতা শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখার্জি এই গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলেই সমর্থন করেছেন। অন্যান্য পুস্তকের মতামত নিয়ে ভাববার নেই—কিন্তু 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার যখন মতামত প্রকাশ করলেন, তখন তাঁকে অবহেলা করা সহজ নয়। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত 'রবীন্দ্র-জীবনী' ২য় সংস্করণে তিনি এই গানটির বিষয়ে যে মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই তুলে দিচ্ছি।

"কাহারো কাহারো মতে গানটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু-বিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনাকালে বোধ হয় [illegible] প্রথম পংক্তি ভাঙিয়া দস্যুদের গান '[illegible] ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' লিখিয়াছিলেন (১৮৮১)। স্বর্ণকুমারী দেবী [illegible] 'স্নেহলতা' নামক উপন্যাসে সঞ্জীবনী সভার অনুরূপে এক গুপ্ত সভার [illegible] দিয়াছেন; তাহাতে চারু নামে এক তরুণ কবির [illegible] একটি গীত আছে; তাহার প্রথম পংক্তি 'একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন'। উভয়ের [illegible] ভাষা পৃথক হইলেও ভাব একই রূপের। [illegible] রচয়িতা নিজেকে সেক্সপীয়রের ন্যায় [illegible] মনে করিতেন; তাই সন্দেহ হয়, [illegible] তাঁহার সম্মুখে ছিলেন না।"

নীচে 'স্নেহলতা' উপন্যাস থেকে [illegible] অধ্যায়টি তুলে দিচ্ছি—

"চারু এখন ষোড়শ বর্ষীয় বালক। কিন্তু সে [illegible] আপনাকে বালক মনে করে না।

একদিন তাহার এক সমপাঠী তাহার পকেটে [illegible] খুঁজিতে গিয়া একটুকরা কাগজ লাভ করিয়াছিল—কাগজখানি আর কিছু নহে একটি ছন্দ কবিতা। সমপাঠী ছুটির ঘণ্টার সময় [illegible] বালকদের সমক্ষে মহা রহস্যে যখন পড়িল

এমন চাঁদিনী নিশি

পুলক-কম্পিত দিশি

এমনি বিজন উপবনে,

[illegible] চাঁদের আলো—

[illegible] আঁখির তারা কালো

[illegible] নয়নে নয়নে।

ছেলেদের মধ্যে তখন ভারী হাসি পড়িয়া গেল।

বিদ্রূপকারী বালকদিগের এই সামান্য কল্পনার অভাব দেখিয়া তাহার নিতান্তই ঘৃণা উপস্থিত হইল। এইরূপ চলিতেছে, এমন সময় আর একজন ছাত্র আগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ব্যাপার কি?' সকলে বলিল—"আরে মশায় আমাদের চারুবাবু কবি। শুনবেন—এমনি চাঁদিনী নিশি পুলক-কম্পিত দিশি"—

নবাগত ব্যক্তি তখন তাহার হাত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইয়া নিজে পড়িতে আরম্ভ করিল, শেষ করিয়া বলিল—"বাঃ বেশ হয়েছে—অতিসুন্দর"। চারুর আহ্লাদে মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিশোরীর মত সমজদার বুদ্ধিমান বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রশংসা পাইলে কাহার না আহ্লাদ হয়।........কিশোরীর কথায় অন্য ছাত্রদিগেরও হঠাৎ সে কবিতা সম্বন্ধে মত পরিবর্তিত হইয়া গেল—সকলেই ইহার পর প্রশংসা দৃষ্টিতে চারুর দিকে চাহিল।......।

কিশোরীই তাহাকে তাহাদের সভার মেম্বার করিয়াছে সেখানকার সে Poet Laureate.

আজ রবিবার। জগৎবাবুর চন্দননগরের বাগানে উক্ত সভার অধিবেশন। বেলা দুইটা হইতে বাগানবাটির একতলা গৃহের এক রুদ্ধ দ্বারের বহির্দেশে দুইজন ছাত্র দণ্ডায়মান। আশেপাশে গাছপালা—এবং মাথার গাড়ী বারান্দার আচ্ছাদন সত্ত্বেও প্রথম আশ্বিনের প্রখর রৌদ্রের ঝাঁজে তাহারা পুড়িয়া উঠিতেছে—তবুও তাহাদের পদ নিশ্চল। মনের অধীরতায় তাহাদের দৃষ্টি ক্রমাগত একদিক হইতে অপর দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে আর বিরক্তিসূচক বাক্যগুলা অভিধান ঝাড়া করিয়া ছুঁড়িয়াও তাহাদের আশ মিটিতেছে না।

এইরূপে যখন তিনটা বাজিয়া গেল—তখন গেটের মধ্যে দুইজন লোক প্রবেশ করিল, ক্রমে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের জন্যই উল্লিখিত ছাত্র দুইজন এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। নবাগতদিগের সহিত দুই একটা কথা কহিবার পরেই উহারা তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দ্বারে আঘাত করিল। দ্বার মুক্ত হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া ছাত্র দুইজন যেমন ভিতরে প্রবেশ করিল—অমনি পুনর্বার দ্বার বন্ধ হইল আর সকলে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—

আজি হতে একসূত্রে গাঁথিনু জীবন

জীবনে মরণে রব শপথ বন্ধন।

বহু কণ্ঠের সমস্বর গীতে রুদ্ধ গৃহ সহসা ঝটিকা তরঙ্গিত হইয়া উঠিল—অন্ধ নবাগত দুইজনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কিনা জানি ভয়ঙ্কর গোপনীয় ব্যাপার গৃহ মধ্যে চলিতেছে।.........।

গান থামিবামাত্র সভাপতি নিকটবর্তী হইয়া পদ্মবিন্দ দুইখানি খঙ্গ তাহাদের দুই-জনের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন—

এই পদ্ম ভারতের চিহ্নস্বরূপ,—এই খঙ্গ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চিহ্নস্বরূপ। ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—"

এইবার একসঙ্গে সুগম্ভীর স্বর উঠিল ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—"

সভাপতি।—আজ হইতে তুমি ভারতের মঙ্গলকার্যে প্রাণ পণ করিলে—আজ হইতে আমাদের সহিত ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলে?"

আবার সকলে। ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—"

সভাপতি। কোন কারণে সভা কর্তৃক পরিত্যক্ত কিম্বা সভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ইহার কার্যকলাপ প্রকাশ করিবে না—অঙ্গিকার বিশ্বাসভঙ্গ করিবে না—"

সকলে।—জীবনে মরণে এই বিশ্বাস পালন করিবে?"

নবাগতগণ কি শুনিতেছিল কি বলিতে-ছিল যেন বুঝিল না কেবল কম্পিতকণ্ঠে তাহা আবৃত্তি করিয়া গেল মাত্র। তখন তাহাদের চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন হইল; এবং একে একে প্রত্যেক সভ্য তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আর একবার সমস্বরে সকলে গান করিল—

একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন

জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন

ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ

সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান

প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান

সহায় আছেন ধর্ম কারে আর ভয়।

ইহা চারুর রচনা—যখন সকলে এক সঙ্গে ইহা গাহিয়া উঠিল, চারুর আপনাকে সেকস্-পিয়রের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।"

(অষ্টাদশ অধ্যায়—ভারতী ও বালক, কার্তিক, ১২৯৬। পৃঃ ৩৬২)

এই পরিচ্ছেদে বেশ পরিষ্কার ধরা পড়ে "চারু" নাট্যকার নয়, চারু একজন কবি—"Poet laureate ও তার বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র। 'একসূত্রে গাঁথিলাম' গানটি সকলে সমস্বরে গাইলে পরে—'চারু' নিজেকে তার রচয়িতা মনে করে গর্ব অনুভব করে, সেকস্পিয়রের মত নাট্যকাররূপে নয়, সেকস্-পিয়রের মত কবিরূপে।

আমরা জানি সঞ্জীবনী সভার সময় গুরু-দেবের বয়স ছিল ষোলর কাছাকাছি। জ্যোতি-রিন্দ্রের বয়স তখন—প্রায় আটাশের মত। "স্নেহলতা" উপন্যাসের চারুর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের কোনই মিল নেই, বস্তুতঃ 'চারু'র সঙ্গে গুরুদেবের মিল দেখি নানা দিক থেকে।

আর একটি বিষয়ে সাহিত্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি মনে করি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতি, পুরুবিক্রম, সরোজিনী ও স্বপ্নময়ী নাটকের কোনটিতে তাঁর নিজের রচিত একটিও জাতীয়তা উদ্দীপক গান নেই। যে কয়টি গান আছে তার সবকয়টির রচয়িতা সত্যেন্দ্রনাথ ও গুরুদেব। গান কটি হোলো "মিলে সবে ভারত সন্তান," "একসূত্রে বাঁধিয়াছি" ও "দেশে দেশে ভ্রমি তব দুঃখ গান গাহিয়ে"।

"একসূত্রে বাঁধিয়াছি" গানটির অনুসরণে বাল্মিকী প্রতিভায়, "এক ডোরে বাধিয়াছি" গানটি গুরুদেবেরই রচনা। সে গানটি দলপতি বেষ্টিত দস্যুদলের সম্মেলক সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুবিক্রমের দ্বিতীয় সংস্করণ 'একসূত্রে' গানটি পুরুরাজবেষ্টিত সৈনাগণের গান হিসেবে আছে। আবার ঐ গানটি সঞ্জীবনী সভায় সভাপতি সহ সভ্যদের সকলের মিলিত গান।

ঐ গানটি সঞ্জীবনী সভা উপলক্ষে রচিত বলেই পুরুবিক্রম দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পেয়েছে। কারণ, সঞ্জীবনী সভা ১৮৭৬ বা ৭৭ সালের ব্যাপার, আর পুরুবিক্রম দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে। ১৩০৭ সালের সংস্করণে গানটি নেই।

উপরোক্ত চারিটি নাটক রচনাকালে জ্যোতিবাবু যে কারণেই হোক নাটকে জাতীয়তা উদ্দীপক গানের প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নিয়েছেন দেখতে পাই। তাছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে নিজে কোনপ্রকার জাতীয় সংগীত লিখেছেন কিনা জানি না। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে গুরুদেব যদি "জ্বল জ্বল চিতা," "হিন্দুমেলার উপহার" ও "কিসের তরে গো ভারতের আজি" ইত্যাদি গান ও কবিতা লিখতে পারেন তবে তাঁর পক্ষে "একসূত্রে" গানটি লেখা কিছুই অসম্ভব নয়। "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ" গানটি সঞ্জীবনী সভার সময়ে লেখা। আমার মনে হয়, "একসূত্রে" গানটি সঞ্জীবনী সভার জন্য প্রথম রচিত গান।

সম্প্রতি ১৩১২ সালের প্রকাশিত সংগীত-প্রকাশিকা পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যা পাওয়া গেছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগের শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের কাছে তা সংরক্ষিত। এই অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় গানটি কথা ও স্বরলিপি সহ প্রকাশিত।* গানের নিচে রচয়িতা হিসেবে গুরুদেবের নাম খুব স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত। ঐ পত্রিকার সম্পাদক স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পূর্ণ তাঁরই আগ্রহে ও চেষ্টায় এই পত্রিকাটি ১৩০৮ সাল থেকে ১৩[illegible] পর্যন্ত নির্বিবাদে প্রকাশিত হয়েছে। যদি কোনক্রমে ভুলভ্রান্তি ঘটত তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তার সংশোধন করতেন।

সবশেষে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, ঐ গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিনা তারও সঠিক [illegible] প্রমাণ নেই। বরংচ ঐ গানটি গুরুদেবের [illegible] বলে বহুতর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর [illegible] স্বীকৃতিতে ও সংগীত-প্রকাশিকায় [illegible] ছাপা গানটি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুবিক্রম দ্বিতীয় সংস্করণে গানটি [illegible] পাওয়া গেছে বলেই তাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে মানতে হবে, অন্তত [illegible] বললে চলবে না। কারণ আমরা সকলেই [illegible] নিজের রচিত প্রায় প্রত্যেক নাটকেই [illegible] বহু গান ও কবিতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [illegible] করেছেন, অথচ রচয়িতা হিসেবে [illegible] কোথাও তিনি গুরুদেবের নাম উল্লেখ করেন [illegible]

# সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

## ( মাসিক-পত্রিকা )

৫ ভাগ—৩ সংখ্যা

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ" ॥

অগ্রহায়ণ ১৩১২

### খাম্বাজ—একতালা।

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,<br>
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন,<br>
—"বন্দে মাতরম্"।<br>
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়<br>
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় ;<br>
—"বন্দে মাতরম্"।<br>
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,<br>
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায় ;<br>
টুটেত টুটুক এই নশ্বর জীবন<br>
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন ;<br>
—"বন্দে মাতরম্" ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* অগ্রহায়ণ ১৩১২ সংগীত প্রকাশিকা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার ব্লক উর্ধ্বে মুদ্রিত হইল। পর পৃষ্ঠায় উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরলিপি পুনর্মুদ্রিত হইল।—সঃ দেঃ

# রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন······ রবীন্দ্রনাথ

১´ ২ ০ ৩ ১´
II সা -া -া । গা -া গা । মা -া মা । পা -া পা I ধণা -া ধা ।
এ ০ ক্ সূ ০ ত্রে বাঁ ০ ধি য়া ০ ছি স ০ হ্
২ ০ ৩ ১´ ২
। পা -মা গা । মা -া -া । -া -া -া I র্সা -া র্সা । র্সা -ণা ধা ।
স্র ০ টি ম ০ ন্ ০ ০ ০ এ ০ ক কা ০ র্য্যে
০ ৩ ১´ ২ ০
। ণা -া ণা । ণা -ধা পা I ধা -া ধা । পা -মা গা । মা -া -া ।
স ০ পি য়া ০ ছি স ০ হ স্র ০ জী ব ০ ন্
১ ২ ০
। া -া -া I { র্সা -া -া । র্সা -া -া । ধা -া পা । মা -া -া } II
০ ০ ০ ব ০ ০ ন্দে ০ ০ মা ০ ত র ০ ম্
১´ ২ ০ ৩ ১´
II মা -া মা । ধা -া ধা । র্সা -া না । র্সা -া র্সা I র্গা -া র্গা ।
আ ০ সু ক, ০ স হ ০ স্র বা ০ ধা বা ০ ধু
২ ০ ৩ ১´ ২
। র্মা -া র্পা । র্গা -া -া । -া -া -া I মা -া মা । পা -া ধা ।
ক ০ প্র ল ০ ০ ০ ০ য়্ আ ০ ম রা ০ স
০ ৩ ১´ ২ ০
। পা -া মা । গা -া -া I সা -া সা । গা -া গা । মা -া -া ।
হ ০ স্র প্রা ০ ণ্ র ০ হি ব ০ নি র্ভ ০ য়্
৩ ১´ ২ ০ ৩
। া -া -া I র্গা -া র্গা । র্গা -া র্গা । র্মর্গা -া র্রা । র্সা -া -া I
০ ০ ০ আ ০ ম রা ০ স হ ০ স্র প্রা ০ ণ্
১´ ২ ০ ৩ ১´
I ধা -ণা পা । মা -া গা । মা -া -া । -া -া -া I { র্সা -া -া ।
র ০ হি ব ০ নি র্ভ ০ য়্ ০ ০ ০ ব ০ ০
২ ০ ৩
। র্সা -া -া । ধা -া পা । মা -া -া } II
ন্দে ০ ০ মা ০ ত র ০ ম্
১´ ২ ০ ৩ ১´
II { র্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা । র্রর্সা -া র্রা । র্সা -া র্সা I ধা -া ধা ।
আ ০ ম রা ০ ভ রা ০ ই ব ০ না ঝ ০ টি
২ ০ ৩ ১´ ২
। পা -া পা । মা -া -া । -া -া -া } । সা -া রা । গা -া গা ।
কা ০ ঝ ঞ্ঝা ০ য়্ ০ ০ ০ অ ০ যু ত ০ ত
০ ৩ ১ ২ ০
। মা -া মা । পা -া পা । ধা -া ধা । না -া না । র্সা -া -া ।
র ০ ঙ্গ ব ০ ক্ষে স ০ হি ব ০ হে লা ০ য়্
৩ ১´ ২ ০ ৩
। -া -া -া } । { র্গা -া র্গা । র্গা -া র্গা । র্মর্গা -া র্রা । র্সা -া -া ।
০ ০ ০ টু ০ টৈ ত ০ টু টু ০ ক এ ০ ই
১´ ২ ১´
। ধা -ণা পা । মা -া গা । মা -া -া । -া -া -া } । { সা -া সা ।
ন ০ শ্ব র ০ জী ব ০ ন্ ০ ০ ০ ত ০ বু
২ ০ ৩ ১ ২
। মা -া মা । সা -া সা । মা -া মা । সা -া সা । গা -া গা ।
না ০ ছিঁ ড়ি ০ বে ক ০ ভু এ ০ দৃ ঢ় ০ ব
০ ৩ ১´ ২ ০
। মা -া -া । -া -া -া } । { র্সা -া -া । র্সা -া -া । ধা -া পা ।
ন্ধ ০ ন্ ০ ০ ০ ব ০ ০ ন্দে ০ ০ মা ০ ত
৩
। মা -া -া } II II
র ০ ম্

# উত্তর

## "বনফুল"

তুমি আমাকে যা করতে বলছ বয়স আর একটু কম হলে হয়তো তাতে আমি মেতে উঠতুম। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটুকু নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে কর্তৃপক্ষদের গালাগালি দিলে নিজের মনের ঝাল ঝাড়া যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। এই ঝাল ঝাড়তে গিয়ে হয়তো বাহবা পেতে পারি, হয়তো দু' পয়সা গুছিয়ে নিতে পারি, এমন কি হয়তো বড়লোক-পদবাচ্যও হয়ে যেতে পারি। কারণ অনেক ছোটলোক কেবল পরকে গাল দিতে দিতেই বড়লোক হয়ে উঠেছে এমন দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়। কিন্তু ও সবে রুচি নেই। ওতে অন্যায়ের প্রতিকারও হবে না।

একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন অন্যায়কে আমরা সহ্য করছি বলেই অন্যায় আছে। আমরা চীৎকার করছি এটা অন্যায় ওটা অন্যায় কিন্তু কার্যকালে সেগুলোকে মেনে নিচ্ছি। চালের দর এত বেশী, কাপড়ের দর এত বেশী, মাছের বাজারে আগুন, দুধের বাজারে সমুদ্র কিন্তু বাজারে একটি জিনিস কি পড়তে পাচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সব। অমুকের লেখা অতি ট্র্যাশ (trash), অমুক সিনেমাটা অতি বাজে, অমুক নেতা অতি-চোর, অমুক অভিনেতা অতি ওঁছা— এসব অহরহই শুনি। আবার এ-ও দেখি যে অতি-ট্র্যাশ লেখাই হু হু করে বিক্রি হচ্ছে, বাজে সিনেমারও টিকিট পাওয়া ভার, চোর-নেতার নয়ন-গোচর হবার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক লালায়িত, ওঁছা অভিনেতার ছোঁচা দর্শক-বৃন্দের সংখ্যা অগণ্য। চোরা-বাজারকে গালাগালি দিয়ে বই লিখে আমরা তা ছাপাচ্ছি চোরা-বাজার থেকেই কাগজ কিনে। সমাজ সংস্কারের বহুবিধ ফিরিস্তি আমরা সভায় আওড়াই নিজের জীবনে তার একটাকেও রূপ দেবার চেষ্টা করি না। বরং যারা করে তাদের ঠাট্টা করি।

এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষকে গালাগালি দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখলে বা ব্যঙ্গ করে কবিতা-নাটক লিখলে কি কোনও সুফল হবে বলে মনে কর? কবিরা আবহমান-কাল থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তো লিখে আসছেন, সেইগুলো পড়ে দেখ না, প্রেরণা পাবার মতো অনেক খোরাক পাবে। নতুন লেখা চাইছ কেন? জন্যে চাইছ। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত রোগী আচার খোঁজে যেজন্য। পুষ্টিকর দুধ মাছ মাংস হজম করবার শক্তি তার নেই, তাই ওসবে রুচিও নেই। কে কোথায় হিং আর লংকা দিয়ে ওল বা আমকে মুখ-রোচক করে' তুলেচে তারই খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। আমাদেরও অবস্থা অনেকটা তাই হয়েছে। মানসিক অজীর্ণ ব্যাধিতে ভুগছি আমরা; পুষ্টিকর আহার হজম করবার সামর্থ্য নেই। মুখ-রোচক আচার, লজেনজ্, মোদকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি তাই উৎসুক-চিত্তে এবং মনে করছি ওইগুলো খেলেই বুঝি স্বাস্থ্য ফিরে আসবে। কিন্তু আসবে না। যারা সুস্থ সবল, পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে হজম করবার শক্তি যাদের আছে, ওই সব চুটকি চটুল খাদ্য তাদের রসনা-বিলাসের জন্য, অসুস্থ লোকের পুষ্টি ওতে হবে না। শিল্পীরা ও রকম শৌখীন জিনিস চিরকাল প্রস্তুত করেছে, চিরকাল করবেও, কিন্তু তুমি যে সমস্যার কথা তুলেছ তার সমাধান ওতে হবে না। চিরন্তন সাহিত্যরসে যার চিত্ত পরিপুষ্ট দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' বা ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ' পড়ে তার কিছু উপকার হবে নিশ্চয় কিন্তু অপরিণত মন ওসবের ঠিক রস-গ্রহণ করতে পারবে না এবং না পারলে ইষ্ট না হয়ে অনিষ্ট হবারই সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গানের প্রভাবে একদল ন্যাকার সৃষ্টি হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। অথচ রবীন্দ্র-নাথের প্রতিটি রচনায় কি পৌরুষ, কি বলিষ্ঠতা দেদীপ্যমান। ভিত্তি মজবুত না হলে তার উপর তাজমহলই গড় বা অজন্তা। শিল্পের নিদর্শনই ফোটাও সমস্ত ধ্বসে গিয়ে ইট সুরকির স্তূপ হয়ে দাঁড়াবে শেষকালে। ভিত্তি মজবুত করতে হলে সূক্ষ্ম জিনিসের দরকার নেই। মোটা মোটা মালমশলারই বেশী প্রয়োজন তাতে। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বর্ণপরিচয়ে যে উপদেশ দিয়ে গেছেন আমরা তাই ঠিক মতো পালন করতে পারি যদি দেখবে চাল কাপড় সস্তা হয়ে গেছে। কিন্তু খাঁটি দুধ হজম করবার শক্তি আমাদের নেই, চানাচুর খুঁজে বেড়াচ্ছি তাই! হ্যাঁ, সমস্ত অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে আমরাই বাঁচিয়ে রেখেছি। আমাদের সমস্ত প্রতিবাদ বাচনিক, আন্তরিক নয়, তাই অন্যায় টিকে আছে এখনও। আমরা কি কিছুদিনের জন্যও চাল কাপড় কেনা বন্ধ করতে পারি না? তুমি করে? কিন্তু আমি ডাক্তার, আমি বলছি নিছ জল খেয়েও বেশ কিছুদিন বাঁচা যায়। মহা গান্ধি তা প্রমাণ করে গেছেন, দেখিয়ে দি গেছেন যতীন দাস। কষ্ট হয়, কিন্তু বাঁচা যায় ছেঁড়া কাপড় পরে, অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে, এমন কি উলঙ্গ হয়েও থাকা সম্ভব। যদি আমরা পা দেখবে সব গরম বাজার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কি আমরা তা পারব না এবং সে কথা ওই জু চোরগুলো জানে। তাই তারা আমাদে দন্তসর্বস্ব মুখে লাথি মারছে আর র মেরুদণ্ড পিঠে চাবকাচ্ছে ক্রমাগত। আমরা ন কাঁদছি, কিন্তু অনতিবিলম্বে মুখ আর পি পুনরায় পেতে দিচ্ছি সেই লাথি আর চাবুকে তলায়। অথচ এই কিছুদিন আগে পর আমাদের দেশে বেঁচেছিলেন সত্যাগ্রহী গান্ধীজী নিজের সারাজীবন দিয়ে যিনি দেখি দিয়েছেন অন্যায়ের সার্থক প্রতিবাদ কি ক করতে হয়।

সত্যাগ্রহই অন্যায়ের একমাত্র প্রতি একমাত্র প্রতিষেধক। কিন্তু তার জন্য যে এব যে নির্ভীক নিষ্ঠা, যে ঋজু মেরুদণ্ড প্রয়ো তা আমাদের নেই, তা অর্জন করবার শ হয়তো হারিয়েছি। এই শক্তির অভাবে কাউকে সত্যিকার হতেও তো দেখি না। ঈশপের গল্পের উচ্চস্থ আঙুরগুচ্ছকে লক্ষ্য শৃগালটা যেমন বলেছিল আঙুরগুলো টক আমি চাই না, আমাদের মধ্যে অনেক শি লোকও তেমনি বলে বেড়ান শুনতে পাই মহাত্মাজীর আদর্শ অতি বাজে জিনিস আমরা চাই না। হায় ভিত্তি-ময়ূরপুচ্ছ শো বায়সের দল, তোমাদের কথাও ঈশপের গ আছে, আর একবার পড়ে দেখ যদি মনে না থাকে।

মোট কথা, যতক্ষণ বেশী দাম দিয়ে কাপড় আমরা কিনতে থাকব ততদিন কাপড়ের দাম কমবে না। চাহিদা অনু বিক্রেতা চিরকাল জিনিসের মূল্য নির্ধারণ ক এসেছে, চিরকাল করবে।

মিনিস্ট্রি বদল করে, বর্তমান শা পরিষদকে গালাগালি দিয়ে, ওজস্বিনী ভাষা তুফান তুলে, স্ট্যাটিস্টিকসের ফর্দ শ্রমিক ক্ষেপিয়ে বা ধনিকের পায়ে তেল দি কবিতা লিখে বা প্রবন্ধ পড়ে কিছুতেই হবে না যতক্ষণ না আমরা আত্মশক্তিতে হয়ে একতাবদ্ধ হয়ে না বলতে পারছি আমরা কিছুতে সহ্য করব না।

এ আত্মশক্তি নিজেদের মধ্যেই আছে, করলেই পাবে। বাইরের কোন শক্তি কোন বিশেষ শাসন পরিষদ মসনদে আমাদের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে এ আলেয়ার পিছনে না ঘুরে আত্মশক্তি কাজে যদি আমরা লাগতে পারি তাহলেই দ ঘুচবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

# ঢোঁড়াই চরিতমানস

## (সটীক)

## ••••••• শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী •••

(পূর্বানুবৃত্তি)

### গুরু-শিষ্য সংবাদ

বোকাবাওয়া ঢোঁড়াইয়ের কদর বোঝে। ঢোঁড়া বেশ বুদ্ধিমান। বাওয়া বোবা। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার একটুও অসুবিধে হয় না; চোখের ইশারাতেই সে সব মনের কথা বুঝে যায়। আর ওর জন্যে ভিক্ষেটাও পাওয়া যায় খুব, গলাটা ওর খুব ভাল কিনা। মাইজীরা ওকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'সীয়-রাম-পদ-অঙ্ক বরায়ে। লখনু চলাই মগু দাহিন বাঁয়ে।(১)' শোনেন। কিছুদিন থেকে বাওয়া দেখছে, যে ঐ গানটায় আর সেরকম ভিক্ষে পাওয়া যায় না। সে ও ঢোঁড়াও বুঝেছে। এই যবে থেকে [illegible] টাঁড়তাল আরম্ভ হয়েছে, তবে থেকে বটোহীর(২) গ্রাম্য গানের হাওয়া লেগেছে দেশে। কি যে গান বুঝি না—যে কোন কথার শেষে রে বটোহিয়া জুড়ে দাও, আর অমনি গান হয়ে যাবে। যখন যে হাওয়া চলে তার কি!

বাওয়া ঢোঁড়াইকে ইশারায় বলে, "এই পাশের বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চলি কোথায়?"

"ও বাড়িতে অসুখ"

সব খবর ঢোঁড়াই রাখে। কোন বাড়িতে অসুখ, কোন বাসার মাইজীরা দেশে গিয়েছে দশেরার ছুটিতে, কোন্ কোন বাড়িতে দুপুর বেলায় যেতে হয়, বাবুরা অফিস কাছারী গেলে, কোন বাড়িতে বিয়ে, পৈতে, পুজো সব ঢোঁড়াইয়ের নখদর্পণে। বাওয়াকে সেই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাওয়ার ভিক্ষের অভিজ্ঞতা দুপুরুষের। তবুও এতসব খুঁটিনাটি মনে থাকে না। ঢোঁড়াই গান গাইছে……(৩)

সুন্দরা-আ সু । ভূমি ভাইয়া-আ
। ভারাতা-আ কে । দেশা-বাসে ।
মোরা প্রাণ-আ । বসে হিম-অ
। খোহরে বটোহিয়া-আ-আ……।

বাওয়া বলে, "চল এখানথেকে, কেউ সাড়া দেবে না কঞ্জুসের দল। এক দুয়োরে কতক্ষণ গলা ফাটাবি।"

ঢোঁড়াই ভাবে, বাওয়া বোঝে না তো কিছুই খালি চল্ চল্। হড়বড় করলে কি ভিক্ষে পাওয়া যায়। মাইজী এখন বসেছে পুজোয়। বাবু অফিসে গেলে, তারপর স্নান করে পুজোয় বসে। এখুনি উঠবে।

যা ভেবেছে ঠিক তাই।

বুড়ীমাইজী মটকার থান পরে ভিক্ষে দিয়ে গেলেন, সঙ্গে আবার একটা বেগুন।

বাওয়া অপ্রস্তুত হলেও মনে মনে খুশী হয়—এ ছোঁড়া উপযুক্ত চেলা হবে বড় হলে। একটু খালি শাসনে রাখতে হবে। বড় দুরন্ত ছেলে, দিনরাত খেলার দিকে মন। রোজগারের দিকে মন বসে না। সকালবেলা ধরতে পারলে তো সঙ্গে আসবে। একটু নজরের বার করেছো কি ফুট করে কখন যে থান থেকে সরে পড়বে, তা কেউ বুঝতেও পারবে না। তারপর কেবল সারাদিন টো টো টো টো, আজ এর সঙ্গে ঝগড়া কাল ওর সঙ্গে মারামারি। ঠিক যে সব কাজ বাওয়া পছন্দ করে না সেই সব কাজ। একদিন বাওয়া দেখে যে, একটা পাখা ধরে তার পিছু চলেছে। ঐ খৃষ্টান ধাঙড়গুলোর ছেলেদের সঙ্গে পর্যন্ত ওর আলাপ। হয়তো একদিন এ নিয়ে নালিশও করেছে তার কাছে। বুড়ো [illegible] ধাঙড়, যে ওকিলসাহেবের বাগানে মালীর কাজ করে, সে আবার ঢোঁড়াইকে বলে 'সন্ বেটা' (ধর্মছেলে)। রতিয়া ছড়িদার এই কদিন আগেও এসে বাওয়ার কাছে নালিশ করেছে ঢোঁড়াইয়ের নামে।

"গিয়েছিলাম চিমনি বাজার রাংগা আলু কিনতে। দেখি তোমার গুণধর ছেলে ঢোঁড়াই, গলায় একটা দড়ি জড়িয়ে, বোবা সেজে, গেরস্থ বাড়িতে গরু মরেছে বলে ভিক্ষা করছে। আমাদের নাম হাসালো। তোমার সঙ্গে ভিক্ষায় বেরুলেই হয়—তাতে তো বেইজ্জতি নেই। এর বিহিত একটা করতেই হয় বাওয়া তোমাকে।"

বাওয়া চটে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে আলাদা রোজগার করতে শিখেছে লুকিয়ে। কি করেচিস সে চাল আর পয়সা বল। কল্কের তামাকটা পর্যন্ত শেষ করে টানি না, পাছে ঐ ছোঁড়াটা ভাবে যে, ওর জন্যে রাখল না কিছু, আর এ ছোঁড়া তলে তলে রোজগার করে খরচ করে—নেমকহারাম, হারামজাদা কোথাকার। আংটা পরানো ত্রিশূলটা নিয়ে সে ঢোঁড়াইকে তাড়া করে যায় মারতে। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন? অনেকদূর যাবার পর, ঢোঁড়াই বাওয়ার নকল করে চলতে আরম্ভ করে—ঠিক যেন ত্রিশূল আর ঝোলা নিয়ে বাওয়া সকালে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। রতিয়া 'ছড়িদার', হেসে ফেলে। বাওয়া আরও চটে যায়—হাসছো কি, তোমাদের ছেলেরা যায় রোজগারে, খুরপী নিয়ে ঘাস ছুলতে, না হয় ঝাঁড়ি নিয়ে কুল কুড়োতে। এ ছোঁড়া যাবে তাদের সঙ্গে সমানে তাল দিতে, কিন্তু রোজগারের কথাও ওর কানে এলো না, তবে থাকবেন খুশী। আমি এনে দেবো তবে চারটি খেয়ে উপকার করবেন। না, ছোঁড়াটা দেখছি ধাঙড়টুলীর পথ ধরেছে। যা তোর সাতজন্মের বাপদের কাছে।

……তারপর রাগটা একটু কমে এলে, বাওয়ার উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। বদরাগী পাগল ছেলেটা আবার কি না করে বসে। মরণাধারের ওপারে 'গোঁসাই' (সূর্য) ডুবে যায়। বকরহাট্টার মাঠের তালগাছকটার উপরের আলোর রেশ মুছে যায়। গোঁসাইথানের অশথ গাছটির উপরের পাখীর কাকলী বন্ধ হয়ে যায়। তবুও ঢোঁড়াই আসে না। অনুতাপে বাওয়ার চোখ ছলছল করে তামাকে স্বাদ পায় না। সে কি গিয়েছে এখন। তখন 'গোঁসাই' ছিল মাথার উপর। সে তাল-পাতার চাটাইটা ঝেড়ে, অসময়ে শুয়ে পড়ে। খানিক পরে কাঠের বোঝা ফেলবার শব্দে বুঝতে পারে যে, ঢোঁড়াই জ্বালানী কাঠ কুড়িয়ে ফিরেছে। ঢোঁড়াই আগে কথা বলবে না, বাওয়াও ওর দিকে তাকাবে না। কোনদিকে না তাকিয়ে ফুঁ দিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টা করে। বাওয়া শব্দ শুনে বোঝে যে এই মাটির মালসাটাতে জল চড়ালো, এইবার ভিক্ষের ঝুলি থেকে চাল বের করছে। আর চুপ করে থাকা যায় না। বাওয়ার খাওয়ার জন্যে ভিখতীর মা, গোটা কয়েক সুথনী(৪) দিয়ে গিয়েছে। এখনও মাথার কাছে রাখা রয়েছে। ঢোঁড়াইটা জানে না—এখন ভাতে না দিলে সিদ্ধ হবে কি করে। বাওয়া ত্রিশূলটি নেড়ে ঝম্ ঝম্ শব্দ করে। এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের অভিমান ভাঙে—বাওয়া তাহলে তাকে ডেকেছে।

"এত সকাল সকাল শুয়ে পড়লে কেন বাওয়া? খাবে না?"

রাতে আবার ঢোঁড়াই বাওয়ার চাটাইয়ের

---

টীকা:—

(১) রাম ও সীতার পায়ের দাগ এড়াইয়া লক্ষ্মণ একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরিয়া রাস্তা চলিতেছেন।

(২) বটোহী—পথিক। এই নামের একটি গ্রাম্য সুর ১৯২০ সালের পর হইতে প্রচলিত হয়। এখন এ গান প্রায় লুপ্ত।

(৩) সুন্দর সুভূমি ভাই ভারত দেশটা,
আমার প্রাণ থাকে হিমালয়ের গুহায়,
রে পথিক!……

(৪) সুথনী—একপ্রকার কন্দ, কেবল গরীবরাই এই কন্দ খায়।

উপর তার কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। বাওয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। এর মধ্যে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতে পারে না।

এই হচ্ছে আজকালকার নিত্যকার ঘটনা। বাওয়া মধ্যে মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আবার ভাবে যে অল্প বয়স। যে বয়সের যা। ওর সমবয়সীদের সঙ্গে না খেললে ধুললে কি ওর এখন ভাল লাগে। হাঁ তবে খেলবি খেল। নিজের রোজগারের কাজটা করে তারপর খেল; আর ঐ দলের পান্ডামিটা ছেড়ে দে। এই এখনই থানে ফিরবে। আর কি ওর টিকি দেখবার জো থাকবে সেই গোঁসাই ডুববার আগে। আর কি জেদী, কি জেদী! বকে ঝকে কি ওকে সামলানো যায়। ঝোঁক একবার উঠলে হলো। এখন এই ঝোঁক থানের দিকে আর ভিক্ষের দিকে গেলে হয়, বড় হলে। তবে না আমার উপযুক্ত চেলা হতে পারবে। রামজীর মনে যা আছে তাইতো হবে। সিতারাম! সিতারাম! ঢোঁড়াই গেয়ে চলেছে সেই 'বটোহীর' গান। বুকের জোর আছে ছোঁড়াটার। গানের শেষে বটোহিয়ার আ টা যা ছেড়েছে একেবারে ভাইচেরমেন সাহেবের দারোয়ানের কুঠরীর জানলা খুলিয়ে ছেড়েছে। ঐ যে তাঁর বিজলীঘরের মিস্ত্রিও জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে দেখছি। ঝুলিটা ভরে গিয়েছেরে ঢোঁড়াই। চল্, ফেরা যাক থানে। আবার সাওজীর দোকান থেকে একটু নুন নিতে হবে।

### গানহীবাওয়ার বার্তা

কাঁপলরাজার বাড়িটা ভূতের বাড়ির মত পড়েছিল একবছর থেকে। বাড়ির লোকরা মারা যাবার পর, তার জামাই এসেছিল, বাড়িটা বিক্রী করতে। খদ্দের জোটেনি। বাড়িতো তেমনিই, তার উপর সহর থেকে এত দূরে। জমির দর এখানে নামমাত্র বললেই হয়। ঐ ভুতুড়ে বাড়ির, খড়ের চালা কিনবার জন্য কে আর পয়সা খরচ করতে যাবে। কাঁপলরাজার জামাইটা আবার ফিরে এসেছে, দিন কয়েক হল। শোনা যাচ্ছে যে, চামড়ার ব্যবসা করবে। আজ বাবুরা মুচির সঙ্গে নাকি সে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছে। কাল দু'গাড়ী নুন এসেছে তার বাড়িতে।

এই কথাই উঠেছিল সাঁঝের ভজনের আখড়ায়। ধনুয়া 'মহতো' বলে যে কথাটা ভাববার বটে। তা বাবুলালকে আসতে দে। একে সে পাড়ার পঞ্চায়তের একজন 'নায়েব' তার উপর 'অফসর আদমী'; হাকিম হুকুমের সঙ্গে কথা বলেছে! তার উর্দী পাগড়ীর রং বদলেছে কিছুদিন আগে—কলেক্টরের জায়গা নিয়েছে ওর ভাইচেরমেন সাহেব সেইজন্য। বাবুলাল বলেছে, যে ওর ভাইচেরমেন সাহেবকে এখন চেরমেন সাহেব না বললে চটে—আচ্ছা বাবা মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছো, যা বল তাই শুনতে রাজী আছি।

ঐ বাবুলালকে দিয়ে চেরমেন সাহেবকে বলাতে পারলে কাঁপল রাজার জামাইটার এ অনাছিষ্টি কান্ড বন্ধ করা যেতে পারে। বাদরামুচীটাকেই যদি চেরমেন সাহেব একবার বকে দেয় ,তাহলেই এ'র চামড়ার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। ছি ছি ছি ছি জাত-ধর্ম আর থাকবে না। দুর্গন্ধে পাড়ায় টেকা যাবে না, হাজারে হাজারে শকুন বসবে আমাদের ঘরের উপর। আর সেসব যা-তা চামড়া—নাম আনা যায় না মুখে। হ্যাক। থুঃ! থুঃ! সিতারাম।

কিন্তু বাবুলাল আজ আসেই না, আসেই না অফিস থেকে। চেরমেন সাহেবের বাড়িতে চিঠির ঝুড়ি পৌঁছে, তারপর হাট করে রোজ সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই ফিরে আসে। আজ রাত দশটা বাজলো। আরে দুখিয়ার মার কাছ থেকে খবর নেতো ঢোঁড়াই, যে বাবুলাল কিছু বলে গিয়েছে নাকি বাড়িতে।

আমি যাই না ও-বাড়িতে।

মহতো বলে যে, 'বাওয়া ছেলেটার মাথা একেবারে খেল; নেমকহারাম কোথাকার; গত বছরও তো অসুখে হয়ে অতদিন পড়ে থাকলি দুখিয়ার মার কাছে। আচ্ছা গুদর তুই-ই যা বাবুলালের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আয়। তারপর বিকৃত উচ্চারণে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—'আমি যাই না ও-বাড়িতে! বদমাস কোথাকার।

"কাহুহি বাদিন দোহিয় দোষু" (১)—মিছে দোষ দিস না দুখিয়ার মায়ের আর বাবুলালের।

এরই মধ্যে বাবুলাল এসে পড়ে। সে আর কাউকে প্রশ্ন করার অবকাশ দেয় না যে, আজ দেরী কেন হল।

ডিস্টি বোড অফিসে আজ ভারী হল্লা ছিল। মাস্টার সাহেব নৌকরীতে ইস্তফা দিয়ে সব ছেলেদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ছেলেরা ডিস্টিবোডের ঘড়ি-ঘরের (২) সমুখে 'সাভা' (৩) করতে এসেছিল। মুফীজুদ্দীন সাহেব মোক্তার আছে না, ঐ যে সব সময় আফিং খেয়ে ঢোলে, সে লাল কিতাব হাতে নিয়ে সদর হয়েছিল (৩।ক)।

"লে হালুয়া! (৪) মাস্টার সাহেবের......"

"ছুট্ গয়ী নৌকরী, সটক গয়া পান" (৫)

"কেন? মাস্টার সাহেবকে আবার পাগলা কুকুরে কামড়ালো কেন?"

'নৌকরী থেকে সরকার নিশ্চয়ই বরখাস্ত করেছে। টাকা-পয়সার ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু আছে?"

বাবুলাল সকলকে বুঝিয়ে দেয়—না না ওসব কিছু নয়, মাস্টার সাব—গানহী বাবার চেলা হয়েছে।

গানহী বাবা কে? গানহী বাবা?

"বড়া গুণী আদমী (৬)। বোকা বাওয়া আর রেবণ গুণীর চাইতেও 'নামী'। [illegible] বাওয়ার চাইতেও বড়, নাহলে কি মাস্টার [illegible] চেলা হয়েছে। গানহী বাওয়া মাস-মছলী, নেশা-ভাঙ থেকে 'পরহেজ' (৭)। [illegible] করেনি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল (৮)।

বঙ্গালী বাবু চংড়ী মছলী খাবু। [illegible] তকলীফ কি সইতে পারবে?

জমি-জমা করে নিয়েছে বোধ হয়।

প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বাবুলাল [illegible] হয়ে ওঠে। বহু রাত পর্যন্ত নানারকম [illegible] হয়। বাঙালীরা বুদ্ধিতে এক নম্বরের, [illegible] একটু পাগলাটে গোছের। ঠিক [illegible] মত। তবে তার চাইতে একটু কম [illegible] ভয় ভয়ই করে ওদের সঙ্গে কথা [illegible] বিজনবাবু ওকীলের ঘরের খাপড়া [illegible] সময় সেদিনও দেখেছি—জনেরী [illegible] ব্রাহ্মণ, অত বড় কিষাণ, বিজনবাবু [illegible] ছুঁড়ে ফেলেছে তার কাগজ। একবার [illegible] পর্যন্ত বলল না ওকে। কি রাগ! [illegible] চাকতো দেখি টিকটবাবু রেলগাড়ীতে [illegible] বাবুর কাছে টিকট। তবে [illegible] "বাজা ছাজা কেস তিন বাঙগালা দেশ।" (৯)

আজ সভায় সরকারকে, [illegible] বাদশাকে অনেক কথা শুনিয়েছে মাস্টার [illegible]

ও কেবল 'কথার তুলো ধোনা', [illegible] দারোগা সাহেবের [illegible] হিম্মৎ। বলতো চমাস সাহেবের [illegible] তো গুলী মেরে উড়িয়ে দিত চিমনীর [illegible] মজা করা হাত ওর।

চেরমেন সাহেব কলক্টর সাহেবকে [illegible] দিতে গেলেন যে তাঁর হাতে 'সাভা' করে লোকে, মানা করলেও শোনে না।

তবে যে তুই বললি যে তোর চেরমেন সাহেব, কলক্টরের জায়গা নিয়েছে।

বাবুলাল এই বোকাগুলোর [illegible] বিরক্ত হয়ে বলে—আরে সে তো কেবল ডিস্টি বোডে। জেলার মালিক তো কলক্টর আছেই।

"তাই তো বলি, কলক্টরের জায়গা কি [illegible] নেবে," কিন্তু চেরমেন সাহেব সেই যে গেলেন আজও গেলেন কালও গেলেন। আর [illegible] পর্যন্ত এলেন না—না কলক্টর, না সেপাই [illegible] কেউ, অপিসের বাবুরা তাদেরই এন্তেজারীতে

---

টীকা:—

(১) 'কাহুহি বাদি ন দেইয় দোষু'
—(তুলসীদাস)

(২) ঘড়িঘড়—ক্লক টাওয়ার।

(৩) সাভা—মিটিং, সভা

(৩ক) সদর—সভাপতি

(৪) লে হালুয়া—আশ্চর্য!

(৫) এটি একটি অতি চলিত কথা চাকরীও গেল, পান খাওয়াও শেষ হয়ে গেল।

(৬) বড় গুণী লোক—গুণীর মানে [illegible]

(৭) পরহেজ—সংযমী

(৮) উলঙ্গ থাকে একেবারে

(৯) বাজা ছাজা কেস, তিন বাংগালা দেশ =বাদ্য, ঘরছাউনি, মাথার চুল (মেয়েমানুষের) এই তিনটে জিনিষ বাংলাদেশের ভাল।

[illegible]ক্ষণ ভয়ে ভয়ে আলো জ্বালিয়ে বসে। [illegible]ইতো এত দেরী। বাবুলালের খাওয়া [illegible]নি এখনও। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে [illegible]। সকলে উঠে পড়ে, সে উঠবার [illegible]। ঢোঁড়াই সেই বকুনী খাওয়ার [illegible] থেকে এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে বসে [illegible]। কেবল সেই লক্ষ্য করে যে, যে চামড়ার [illegible] করতে নেই, সেই চামড়ার গুদাম পাড়ার [illegible] হওয়ার কথাটা, এই গোলমালে [illegible] চাপা পড়ে গিয়েছে। ঐ বেড়ালের [illegible] বাবুলালটা কতকগুলো গল্প [illegible] আছেই। গানহীবাওয়া রেবণগুণীর [illegible] বড়, বৌকা বাওয়ার, চাইতেও বড় [illegible] ঠাকুরবাড়ীর মোহন্তর চাইতেও বড়; [illegible] নম্বরের গপ্পবাজ বাবুলালটা। [illegible](১০) বললেই হল।

## গানহী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণন

[illegible](১) মধ্যের বটগাছে মৌমাছির [illegible] কতকাল থেকে আছে, কেউ [illegible] দেখেনি। কিন্তু একদিন যদি দেখে [illegible] নিয়ে [illegible] পড়ে। গানহী বাওয়ার [illegible] এই রকমই। [illegible] রাতে [illegible] কিছু [illegible] সম্মুখে কি বলে, [illegible] কিছু, কেউও যায় না। [illegible] আর রকম আজগুবি খবর [illegible] এ কাণ দিয়ে শোনে ও কাণ দিয়ে [illegible]।

[illegible] মনের মত ভাবে জমলো একদিন [illegible] বৌকাবাওয়া সাথে [illegible] দিয়ে খোঁচা দিয়ে ঢোঁড়াইটার ঘুম [illegible] এমন সময় শোনা গেল রবিয়ার [illegible] চীৎকার। কি বলছে ঠিক বোঝা [illegible] বাওয়া ঢোঁড়াই রবিয়ার বাড়ীর দিকে [illegible]। রবিয়া পাগলের মত চীৎকার করতে [illegible] ছুটে আসছে গানহী বাওয়া,—কুমড়োর [illegible] হয়ে গেল নাকি, তাতের সঙ্গে [illegible] পাঁচ চিঁচ খেয়ে। একদণ্ড দাঁড়িয়ে [illegible] ঠাণ্ডা হয়ে কথার জবাব দেবে, তার [illegible] সেই ওর। রবিয়ার বাড়ীতে ঢুকে দেখে, যে তার উঠন ভরে গিয়েছে পাড়ার লোকে। . নীচু চালের ছাঁচতলা থেকে একটা বিলিতি কুমড়ো ঝুলছে। সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেইখানটায়।

ঠিকই। যা বলেছে তাই। বিলিতী কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মুরত(৩) আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের। মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোন ভুল নেই। এখন কি করা যায়? এরকম করেতো গানহী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। মহতো নায়েবরা বৌকা বাওয়াকেই সালিশ মানে। ঢোঁড়াইয়ের ভারী আনন্দ হয় যে মহতো এসব ব্যাপারে বাওয়ার চাইতে ছোট। কুমড়োটার বোঁটা কাটার অধিকার বাওয়াই পেল; বাবুলালও না মহতোও না। বোঁটাটা কাটবার সময় উঠনভরা লোকের ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বাওয়ার হাত ঠক ঠক করে কাঁপে। ঢোঁড়াই ভাবে, সেদিন বাবুলাল মিথ্যে বলেনি, গানহী বাওয়া, বৌকা বাওয়ার চাইতেও গুণী। না হলে কুমড়োতে আসে।

থানে কুমড়োটার পূজো হল পান সুপুরী গড় দিয়ে। সেদিন ঢোঁড়াইয়ের কি খাতির! বাওয়া পূজো দিয়েই ব্যস্ত। ঢোঁড়াইকেই করতে হল দৌড়োদৌড়ি পাড়ায়, বাজারে। সেদিন এরকম একটা মস্ত সুযোগ পেয়ে, বাওয়া সকলের সম্মুখে ঢোঁড়াইয়ের গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দিল। মালা গলায় দিলেই সে হয়ে যায় "ভকত"। আর কেউ তাকে ঢোঁড়াই তৎমা কিম্বা ঢোঁড়াই দাস বলতে পারবে না। সে আর কেউকেটা নয় এখন, তাকে বলতে হবে ঢোঁড়াই ভকত। বৌকা বাওয়ার সমান বড় হয়ে গিয়েছে সে, গানহী বাওয়ার আবির্ভাবের দিনেই। তাকে আজ থেকে প্রত্যহ স্নান করতে হবে। আর অন্য চ্যাংড়া ছেলেদের মত না মাছ মছলী থেকে পরহেজ(৪)। গুরুকে দেখে ঢোঁড়াইয়ের মায়া হয় সেদিন; বেচারার গলায় কণ্ঠী নেই।

তারপর সেই গানহীবাওয়ার 'মুরত-বালা'(৫) কুমড়োটা মাথায় করে ঢোঁড়াই নিয়ে আসে মিরিচিয়া ঠাকুরবাড়ীতে। পরণে সেই লাল কাপড়খানা। আগে আগে আসে ঢোঁড়াই আর বাওয়া, আর পিছনে সব তাৎমারা। মহতো পর্যন্ত পিছনে।

ঠাকুরবাড়ীতে পৌঁছে তাদের সব উৎসাহ জল হয়ে যায়। মোহন্তজী বলেন, "কি রে ঢোঁড়াই, তোর যে আর দেখাই নেই। যে ঠাকুরবাড়ীতে রামসীতার মূর্তি আছে সেখানে গানহী মহারাজের 'মুরত' রাখা ঠিক নয়। তুলসীদাসজী তাই বলে গিয়েছেন।—চুথিয়া সরকার!......"

তুলসীদাসজীর নির্দেশ পর্যন্ত তাৎমারা বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু তার সঙ্গে চুথিয়া সরকারের কি সম্বন্ধ, তা তারা ঠিক ধরতে পারেনি।

'মুরতটাকে' নিয়ে মহা বিপদ। এখন কি করা যায়! কি করা যায় ওটাকে নিয়ে! এমন-ভাবে মুরতের 'দর্শন' পাওয়া গিয়েছে। রাম-সীতার পাশে যদি না রাখতে পারা যায়, তা' হলে 'থানেই' বা 'গোঁসাইয়ের' পাশে কি করে রাখা যাবে? বাওয়া ঘাড় নাড়ে—সে তো হতেই পারে না। তবে উপায়? একি পরীক্ষায় ফেললে রামজী। এত কৃপা করে, আমাদের ঘরে এলে গানহী মহারাজ, আর আমরা তোমাকে রাখবার জায়গা দিতে পাচ্ছি না। থাকতো টাকা সাহেবদের মত বাবুভাইয়াদের মত, রাজ দ্বারভাঙ্গার মত নিতাম একটা ঠাকুরবাড়ী বানিয়ে, গানহী বাওয়ার জন্যে। ঠিকই বলে গিয়েছে তুলসীদাসজী—"নহিং দরিদ্র সম দুখ জগমাহীঁ"(৬)। বাওয়ার চোখের কোণ জলে ভরে ওঠে। সারা জীবন তার ভিক্ষে করে কেটেছে। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত, কখনও দুবেলা ভাত খেয়েছে বলে মনে পড়ে না। একবেলা জল-পান, একবেলা ভাত—তাও জুটলে, এইতো সব তাৎমাই খায়। এ কেবল তার একার কথা নয়, তবুও 'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহী' এই আবছা কথাগুলোর মানে, এই বিপদের ঝলকে হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কলিকতার ঐ "পাখণ্ডী চামড়াবালা" জমাই(৭) গানহী বাওয়ার নামে সিন্নি দেওয়ার জন্য যে গুড়, আটা আর কাঁচকলা পাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তা অমনিই পড়ে থাকে।

এমন সময় রেবণগুণী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। আজকাল বিকালের দিকে গানহী বাওয়ার চেলারা 'কলালী'তে বড় জ্বালাতন করে। তাই সে দুপুরের দিকেই কাজটা সেরে আসে। সেখান থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ লোকমুখে গানহী বাওয়ার আবির্ভাবের কথা শুনেছে সে। তাই সে হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে। টোপা কুলের মত চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দৌড়ুবার মেহনতেও হতে পারে আবার মদের জন্যও হতে পারে। সে এসে ঝুঁকে পড়ে কুমড়োটার উপর। অন্য কেউ হলে সকলে হাঁ হাঁ করে উঠে তাকে আটকাতে যেত; কিন্তু কার ঘাড়ে কটা মাথা যে রেবণ-গুণীর মুখের উপর কিছু বলে। ঢোঁড়াইয়ের

---

[illegible]—বাজে মিথ্যে

(১) কোশী শিলিগুড়ি রোড

(২) কালালী—মদের দোকান

(৩) মূর্তি

(৪) পরহেজ—সংযমী; মাছ মাংস ছেড়ে দিতে হবে।

(৫) মূর্তি আঁকা

(৬) পৃথিবীতে দারিদ্র্যের মত দুঃখ আর নাই।—(তুলসীদাস)

(৭) পাষণ্ড চামড়াওয়ালা

বুক দুর দুর করে ভয়ে। এই বুঝি গুণী মুরতটাকে একটা কিছু করে বসে—যা মেজাজ। তাৎমা মেয়েরা রেবণ গুণীকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দেয়।

"ঠিকই তো। টৌনে যা শুনেছিলাম বিলকুল ঠিক। ঠিক! ঠিক! ঠিক! গানহী বাবা ফুটে বেরুচ্ছেন কুমড়োটার গায়ে। কেবল হাত পা টা ওঠেনি—জগন্নাথজীর মত।"

রেবণগুণী কুমড়োটাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে, তারপর চীৎকার করে ওঠে "লোহা মেনেছি(৮); লোহা মেনেছি আমি গানহী বাওয়ার কাছে।"

অবাক হয়ে যায় সকলে। রেবণগুণী 'লোহা মেনেছে'! চাকের মৌমাছি নড়ে বসার মত একটা উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায় দর্শকদের মধ্যে। রেবণগুণী যার 'লোহা মানে' সে তো প্রায় রামচন্দ্রজীর সমান। অত বড় না হোক, অন্তত গোঁসাই কিম্বা ভানমতীর মত জাগ্রত দেবতা তো বটেই।

মৃদু গুঞ্জন উঠবার আগেই গুণী আবার বলে ওঠে, "আজ থেকে কোন্‌ হারামীর বাচ্চা কালালীতে গিয়ে গানহী বাওয়ার কথার খেলাপ করে। আজকে যা করে ফেলেছি, তার তো আর চারা নেই। কাল থেকে গানহী বাওয়া, পচই ছাড়া অর কিচ্ছু খাবো না।" সে কেঁদে ফেললো বুঝি এইবার।

"দেখে নিও মহতো"

এইবার মহতো বর্তমান সমস্যার কথাটা তোলে।

গুণী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। গানহী বাওয়াকা জয় হো, বলে লাফিয়ে উঠে মাথার পাগড়ীটা সামলে নেয়। বাওয়া ঢোঁড়াইকে বলে, যা তুই পৌঁছে দিয়ে আয় মুরতটা ওর বাড়ীতে। সে ঠিক বিশ্বাস পাচ্ছে না গুণীটাকে। ঢোঁড়াইও সেই কথাই ভাবছিল। বাওয়া ঠিক তার মনের কথা বুঝতে পারে।

সে রাত্রে রেবণ গুণীর বাড়ীতে ভজনের আসর জমে—যা গ্রামের ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। ঢোঁড়াই 'ভকত' গানহী বাওয়ার নাম দেওয়া বটোহীর গান গায়। গুণী তার সংগে তান ধরে। সে রেবণগুণীর সংগে সমান হয়ে গিয়েছে গানহী বাওয়ার দৌলতে।

পরের দিন সকালে কুমড়োটাকে কাপড়ে ঢেকে গুণী চলে যায় বারারীর মেলায়। অনেক দিনের মদের খরচ সে রোজগার করেছিল যাত্রীদের কাছ থেকে ঐ মুরতটা দেখিয়ে। একটা করে পয়সা দিলেই, কাপড়ের ঢাকা তুলে কুমড়োটাকে দেখাতো।

**ঝোটাহা উদ্ধার**

তাৎমাটুলীর পঞ্চায়তীতে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, আলবৎ উঁচুদরের সন্ন্যাসী গানহী বাওয়া। মুসলমানকেও পিঁয়াজ গোস্ত ছাড়িয়েছে। একবার কপিলরাজার জামাইটার সংগে দেখা করাতে পারলে হয়, তাঁকে আনিয়ে। ওরে আসবে না রে আসবে না। মাস্টারসাবদের মত বাবুভাইয়া চেলা থাকতে, তোদের এখানে আসবে না, না হ'লে চালার উপর এসে রবিয়ার ঘরে ঢোকে নি। থানের মত ঘর-দুয়োর আংগণ 'সাফসুৎরা' রাখতে পারিস তবে না সাধুসন্ত এসে দাঁড়াতে পারে। এ একটা 'মার্কা'র (১) কথা বলেছিস বটে। সকলের কথাটা মনে ধরে। মরগামার গয়লারা রবিবারে গরু দোয় না। সেদিন তারা তাদের ঘর-বাড়ি সাফ করে, তারা সিরিদাস বাবাজীর চেলা কিনা। ধনুয়া 'মাহতো'র মাথায় ঢোকে যে আচ্ছা রবিবারে রবিবারে গানহীবাওয়ার নামে কাজে না গেলে বেশ হয়। রবিবার 'তেঁহারের' (২) দিন। সরকার বাহাদুর পর্যন্ত কাছারী বন্ধ রাখে, চেরমেন সাহেব ডিস্টি বোড বন্ধ রাখে, পাদ্রী-সাহেব দুধ বিলোয়—খ্রস্টান ধাঙগড়দের। সকলেরই এ বিষয়ে খুব উৎসাহ। রবিবারে কাছারী বন্ধ থাকায় বাবুভাইয়ারা বাড়িতে থাকে, আর যতক্ষণ তাৎমারা তাদের বাড়িতে কাজ করে, সংগে সংগে টিক্‌টিক্‌ টিকটিক করে। অন্য কোন কাজ নেই তো ঘরমীর পিছনেই লাগো। ঢোঁড়াইয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বাঁধা ঘরগুলোতে রবিবারের দিনই ভিক্ষে দেয়, বিশেষ করে যারা আধলা দেয় তারা। বৌকা-বাওয়া যে পঞ্চায়তীতে আসে না। সে এলে এর প্রতিবাদ করতে পারতো। ঢোঁড়াইয়ের কথা তো কারও মনেই পড়ে নি। ছোকরা ঢোঁড়াই দূর থেকে বলে, আমাদের 'পেট কেটো না মহতো' (৩)। রবিবারের রোজগারই আমাদের আসল রোজগার। এ অর্বাচীনের ধৃষ্টতায় নায়েব মহতোরা অবাক হয়। এইটুকু ছেলে পঞ্চায়তীর মধ্যে কথা বলতে এসেছে।

তুই আবার কণ্ঠি নিয়ে 'ভকত' হয়েছিস না? গানহী-বাওয়া বড় না তোর রোজগার বড়?

কোন্‌টা বড়, ঢোঁড়াই সত্যিই এ প্রশ্নের জবাব ঠিক করতে পারে না। কাঁচুমাচু মুখ করে সে বসে পড়ে। তার আর বাওয়ার রোজগারের কথাটা 'মুখিয়ারা' (৪) একবারও তো ভাবলো না। গানহীবাওয়া কর তাতে কিছু বলবার নেই, সে তো ঢোঁড়াই চায়ই, গানহীবাওয়া তো তারই দলের লোক, কিন্তু নিজের 'পেট কেটে' গানহী বাওয়া করা, এটা সে বুঝতে পারে না। রোজগারের কথাটা ঢোঁড়াই এই বয়সেই ঠিক বুঝেছে। বৌকা বাওয়া যতই ভাবুক না কেন যে ছোঁড়ার সেদিকে খেয়াল নেই।

ঢোঁড়াইয়ের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে পঞ্চায়তীর ধনুয়া মহতো, আর বাবুলালটার উপর। কিন্তু তার বিষয় ভেবে পঞ্চায়তী এক মিনিটও সময় বাজে খরচ করতে রাজী না। ততক্ষণে একটা অনেক বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, সেখানে 'ঝোটাহা'দের নিয়ে। খালি রবিবারে আংগণ সাফ করলেই হবে না। ঝোটাহাদেরও একটু 'পাক সাফ' (৫) থাকতে হবে। মেয়ে-মানুষের জাতটাই এমন। হাজার ব'লেও ওদের দিয়ে কিছু করাতে পারবে না।

কে কথা শুনবে না কোন 'ঝোটাহা' শুনি! মাসে একদিন করে সব 'ঝোটাহা'দের স্নান করে 'পাক সাফ' হতে হবে। গাঁটের পয়সা খরচ করে বিয়ে করেছি না, না মাঙনা?

খোঁড়া চথুরী বসে ছিল দূরে। [illegible] তার সংগে থাকতে চায় না ব'লে মহতো [illegible] তার 'সাগাই' (৬) করে দিয়েছে ইসরার [illegible] সে বলে মহতো আর ছড়িদার ইসরার [illegible] থেকে টাকা খেয়েছে। সে চেঁচিয়ে ওঠে [illegible] ঝোটাহাদের মাথায় চড়াতো তোমরাই। [illegible] যদি করা হয় একটু, তাহলে ঝোটাহাদের [illegible] কি যে তারা ফুলবুলে করে। তার [illegible] চলার লাঠিটা মাথার উপর ঘুরিয়ে [illegible] 'তাহলে একটু চালের থেকে [illegible] কি........."। [illegible] একদিক থেকে [illegible] ওঠায় তার শেষের কথাগুলো [illegible] তবে খোঁড়া চথুরীর [illegible] চোখ দুটো [illegible] মারাত্মক রকমের ওষুধের কথা কিছু [illegible] সেদিক থেকে [illegible] ওঠে, [illegible] যায় কয়েকজন মিলে ইসরারকে [illegible] বসাচ্ছে।

আরও কত রকমের প্রশ্ন ওঠে [illegible] বড় একটা প্রশ্ন [illegible] কথায় নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে [illegible] বড় প্রশ্ন ঝোটাহাদের [illegible] একখানা করে তো কাপড় পরনের [illegible] গায়ে শুকোতে পারে। কিন্তু [illegible]

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়—মাসে একদিন [illegible] মেয়েদের করতেই হবে। কোন ওজর [illegible] হবে না। 'গোঁসাই', হুউ-উ! [illegible] অস্তর পর, আর কোন [illegible] ইঁদারার (৭) উত্তরে বাঁশঝাড়টার দিকে [illegible] পারবে না—ওখানে 'ঝোটাহারা' [illegible] শুকোবে।

এর পর নিত্য নতুন কাণ্ড। [illegible]

---

(৮) লোহা মানা—পরাজয় স্বীকার করা।

টীকা:—

(১) মার্কার কথা—কথার মত কথা

(২) পর্বের দিন

(৩) পেট কেটো না—রোজগার মেরো না

(৪) মুখিয়া—(মুখ্য শব্দ হইতে); মাতব্বর।

(৫) 'পাক সাফ'—পরিষ্কার [illegible]

(৬) সাগাই—সাঙা

(৭) ফৌজী ইঁদারা—কোশী [illegible] রোডের ধারে ধারে বড় বড় পাকা [illegible] আগেকার কালে ফৌজের দল দার্জিলিং [illegible] এগুলো ব্যবহার করতো। তাৎমাটুলীর [illegible] এরই একটা ইঁদারা আছে, যাকে সকলে [illegible] ইঁদারা।

রের গাণহী বাওয়ার। বৌকা বাওয়ারা দেখতে গেল কাঝা গণেশপুরে। ঢোঁড়াইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে না—সে অনেকদূর সাতকোশ—অত দূর হাঁটতে পারবি না তুই। তারপর তারা যখন নরাগের সাঁকো পার হয়েছে, তখন দেখে যে ঢোঁড়াই ভকত লাল কাপড়খান পরে ছুটতে ছুটতে আসছে পিছন থেকে। কি জেদী ছেলেরে বাবা! ঢোঁড়াইকে জিরোবার ফুরসৎ দেবার জন্য বাওয়াকে কুলগাছতলায় বসতে হয়? তারপর কাঝা-গণেশপুরের বেলগাছটার তলায় পৌঁছে দেখে, যে যা শোনা গিয়েছিল ঠিক তাই। প্রকাণ্ড বেলগাছের মগডালের পাতা তিরতির তিরতির করে নড়ছে—তিনটে করে পাতা একসঙ্গে। পাতাগুণোয় কি যেন লেখা লেখার মতই লাগে। ঠিকই গাণহী বাওয়ার নাম। জয় জয় হো! নয়ন সার্থক, জীবন সার্থক বাওয়ার আজ। ঢোঁড়াইয়ের এত কষ্ট করে আসা সার্থক হয়েছে। জয় হো গাণহী বাওয়া। তোমার নামের গুণেই না এত লোক বেলগাছটার ডালে ডালে হাঁকো বেঁধে দিয়ে গিয়েছে। ঐ [illegible] ধুলো ঢোঁড়াই লালকাপড়ের খুঁটে করে বেঁধে নিয়ে আসে।

পরদিন ভোরে থানে পৌঁছেই, না মুখ ধোয়া না কিছু, বাওয়া তার নিজের হাঁকো কলকেটা নিয়ে ঢোঁড়াইকে চড়িয়ে দিল মহতোর [illegible] পাশের বরমভুতওয়ালা (৮) বেল-গাছে। ঢোঁড়াই বেলগাছে বাওয়ার হুঁকো-কলকেটা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে এল।

তামাক না খেয়ে সেদিন বাওয়ার কি ছটফটানি। ঢোঁড়াই লুকিয়ে পেটের চুপটি করে বাওয়ার পাশে বসে থাকে। [illegible] খালি খালি। ছোট আলুর গাছের মত [illegible] বেড়ায়, ওদের মত কত ধাঙড়রা খায়। ঢোঁড়াই তাদের কাছ থেকেই শিখেছে, যে ওই গাছগুলোকে চুন দিয়ে ঘষলেই তার [illegible] কেটে যায়। এগুলো অনেকক্ষণ পাওয়া যায় থানের আশেপাশে। অথচ তামাকের ওর কাছে [illegible]। ঢোঁড়াই অনেকক্ষণ ধরে ঐ আলু চিন্তা করে। সময় আর কাটতেই চায় না। অথচ আগের মত নিজে বাওয়াকে ছেড়ে দূরে সরতে ঢোঁড়াইয়ের মন সরে না। বাওয়া ঢোঁড়াইকে ইশারা করে বলে তোর ভালই হল—আর অন্যর জন্য তোর তামাক সাজতে হবে না। বাওয়া মড়ার মত শুয়ে পড়ে থাকে। ঢোঁড়াইয়ের বড় মায়া হয় বাওয়ার উপর। নিশ্চয়ই গা হাতপা আনচান করছে। পা-টা একটু টিপে দি। বাওয়া আপত্তি করে না, বরঞ্চ বলে, গায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিতে।

বাওয়ার গা টিপে দিতে দিতে কেন যেন ঢোঁড়াইয়ের দুখিয়ার মার কথা মনে পড়ে। বেশ হতো সে যদি বাওয়ার পা টিপে আরাম করে দিত। তার অসুখের সময়ের সেই রাত্রের কথা মনে আসে। দুখিয়ার মা, বাবুলালের মাচায়, ওই বিড়ালের মত গোঁফওয়ালা বাবুলালের পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছে—শালা নবাব......

"পরণাম বাওয়া!"

"মহতো যে! হঠাৎ রাতে যে! ছাঁড়িদারকেও সঙ্গে দেখছি।"

"এই সঙ্গত করতে এলাম। খুব ছেলের সেবা খাচ্ছ।"

ঢোঁড়াই লজ্জিত হয়ে যায় বাওয়ার চাইতেও বেশী—বাওয়ার গায়ের উপর পা দিতে বাইরের লোকে দেখে ফেলেছে বলে। চেলাতে দেয় গুরুর গায়ে পা! কালই হয়ত মহতো এই নিয়ে দশ কথা বলবে লোকের কাছে।

বাওয়া লজ্জিত হয়ে উঠে বসে। ছাঁড়িদার আর মহতো বিনা মতলবে থানে আসার লোক নয়।

ঢোঁড়াই লজ্জা কাটানোর জন্য বলে,—আজ তামাক না খেয়ে বাওয়ার শরীরটা অস্থির অস্থির করছে। মহতো রসিকতা করে বলে "আর তোর?"

"আমি পেলে একটান মারতাম। না পেলে পরোয়া নেই।"

মহতো দুঃখ করে বলে, আমারই হয়েছে বিপদ। তামাক বিড়ি না খেলে এক ঘণ্টাও চলে না। বুঝি খুব খারাপ জিনিস তামাক। তার উপর আজকাল আবার শুনছি, অনেক জায়গায় গরুর রোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে তামাকে.......বলেই সে কাসতে থাকে যেন—যেন তার গলায় একটা রোঁয়া এখনও লেগে রয়েছে.....

ছাঁড়িদার বলে গরু তো নয়। রামজীর দেওয়া শরীর, তামাকের পাতা দিয়ে তৈরি কোন রকম জিনিস, নিতে চায় না। খইনি খাও—থুথুর সঙ্গে ফেলে দিতে হবে; নস্যি নাও নাক ঝেড়ে ফেলতে হবে; জর্দা খাও, পানের পিচ ফেলতে হবে; তামাক সিগ্রেট খাও, ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে হবে। এ হারামজাদার নেশা কিন্তু—ছাড়তে—পারবেও না। বাওয়া, তোমারও আগে সাতদিন কাটুক তারপর বুঝবো।"

"সুরাজ (৯) মত ভোজা না" বলে মহতো তামাকের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে দেয়।

তারপর মহতো আসল কাজের কথাটা পাড়ে।—তাদের ইচ্ছে 'ভকত' হবার।

মহতো 'ভকত' হওয়ার সুবিধে অসুবিধে বেশ ভাল করে খতিয়ে দেখেছে। প্রথম অসুবিধে মাছ মাংস খেতে পাবে না। মাংস তো এক ভেড়া বলির দিন খায়—মাছ ন'মাসে-ছ'মাসে মরণাধারে জল এলে হয়ত এক আধবার জুটে যায়। কাজেই ওটা বড় কথা নয়। প্রত্যহ স্নান করা—ওটা একটু গোলমেলে ব্যাপার বটে, কিন্তু এ কষ্টটুকু সে স্বীকার করতে রাজি আছে। একমাত্র সত্যিকারের অসুবিধা যে, সে ভকত ছাড়া আর কারও বাড়ি ভোজে কাজে খেতে পারবে না। কিন্তু এর বদলে সে পাবে অনেক কিছু। লোকের চোখে সে বড় হয়ে যাবে। এমনিই মহতো, ছাড়িদার, নায়েবদের সম্বন্ধে লোকে কিছুদিন থেকে অল্প অল্প স্পষ্ট কথা বলতে আরম্ভ করেছে। এ জিনিস আগে ছিল না। ঐ তো সেদিন খোঁড়া চথুরী পঞ্চায়তীর মধ্যে চেঁচিয়ে কি সব বলে দিল। খারাপ হাওয়ার দিন আসছে। মহতো নিজের জায়গা আরও একটু মজবুত করতে চায়। বছরে একদিন মাছ খাওয়া ছেড়ে যদি লোকের মুখ বন্ধ করা যায়, তাহলে মহতোগিরি থেকে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে নেওয়া যেতে পারে। তাহ'লে তার সমাজে পসার প্রতিপত্তি অনেক বাড়বে; চাই কি সে তার আগের মহতো নুনুলালের সমান হয়ে যেতে পারে খ্যাতিতে।

তাই তারা এসেছে বাওয়ার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করতে।

ঢোঁড়াইয়ের কথাটা একটুও ভাল লাগে না। এ যেন তাদের ঘরের জিনিসে বাইরের লোক হাত দিচ্ছে। রবিবারে রোজগার বন্ধ করবার সময় বাওয়ার সলার দরকার ছিল না, আর এখন নিজের গরজ পড়েছে, আর দরকার হয়েছে বাওয়ার সলার। বাওয়া যদি না বলে দেয় তো বেশ হয়।

বাওয়াও আবার অদ্ভুত ধরণের জীব। সে খুব খুশী হয় ছাড়িদার আর মহতোর প্রস্তাবে। তাদের পিঠ চাপড়ে হেসে অস্থির। আঙ্গুলের ইশারায় আকাশের দিকে দেখিয়ে, মাথার চুল দেখিয়ে, বুঝিয়ে দেয়, রবিবারে সকালে স্নান করে এলেই, বাওয়া তাদের গলায় তুলসীর মালা দিয়ে দেবে।

ঢোঁড়াই বাওয়ার উপর রাগে গজরায়। ও'র আবার পা টিপে দেবে! মহতোর মত লোক 'ভকত' হলে আর সে চায় না ভকত থাকতে।

(ক্রমশঃ)

(৮) বরমভুতওয়ালা—ব্রহ্মদৈত্য থাকেন যে গাছে।

(৯) সুরাজ—স্বরাজ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

## ভগিনী নিবেদিতা

যে-ভারতজিজ্ঞাসায় আমরা বাহির হইয়াছি, যে-ভারতজিজ্ঞাসার পথে গত শতাব্দীর মনীষীগণ চালিত হইতেছিলেন, সেই ধ্যানের ভারতবর্ষের উপলব্ধি বড় সহজ নয়, বড় সহজে হয় নাই। বাস্তব ভারতবর্ষের সান্নিধ্যই ভাব ভারতবর্ষের উপলব্ধির প্রধান অন্তরায় ছিল। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আকর্ষণ, আর একদিকে ভারতবর্ষের দৈহিক দীনতা। প্রত্যহের তুচ্ছতা আর অতি পরিচিত অবজ্ঞা ভারতবর্ষের ভাবমূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এত সব বাধা সত্ত্বেও কোন কোন মনীষী প্রেমের তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টিতে সেই সত্তাকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই যে তাহাকে অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিয়াছিল, ইহাতো আজ ঐতিহাসিক সত্য।

এহেন সময়ে একজন বিদেশিনী বাহিরের সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া, সমস্ত প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া অতি অনায়াসে সেই ধ্যানমূর্তিকে দর্শন করিলেন। দূরত্বই এ ক্ষেত্রে তাঁহার সহায় হইল, বাস্তবের নমিত ফণার উপরে দণ্ডায়মান ভাবরূপ তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লইল।

ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় না হইয়াও ভারতবর্ষীয় ছিলেন, আনুষ্ঠানিক অর্থে হিন্দু না হইয়াও গভীরতর অর্থে হিন্দু ছিলেন এবং ভারতবর্ষের সার্থক উপলব্ধির গৌরবে তৎকালীন ভারতজিজ্ঞাসু মনীষীগণের পুরোভাগে আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দীনতার, তুচ্ছতার, দুঃখ, দারিদ্র্য অভাব অভিযোগের অন্ত নাই, একজন অভিজাত বংশীয় বিদেশী মহিলার চোখে সে সমস্ত আরও অধিক প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রেমের তীব্রতায় নিবেদিতা সেই সব বাধাকে গোড়াতেই অতিক্রম করিয়া গেলেন। অন্য সকলের পক্ষে যাহা দুরতিক্রম্য নিবেদিতার কাছে তাহার অস্তিত্বমাত্র ছিল না। তিনি উমার ন্যায় শিবের জটার মধ্যে অনন্ত যৌবনের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

"একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণ সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বি তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মতো রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারি মধ্যে আমার সমস্ত মন ভাবৈক রস হইয়া স্থির রহিয়াছে। শিবের মধ্যেই যে-সতীর [illegible]

ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন। ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্য দুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এইজন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে সরিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।"

তাঁহার শিব ভারতবর্ষের ভাবমূর্তি, নিবেদিতা তপস্বিনী সতী। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মাধ্যমে নিবেদিতা ভারতবর্ষের পদপ্রান্তে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

২

বাগবাজারের বোসপাড়ার ছোট গলিটিতে নিবেদিতা একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—এই কার্যে লিপ্ত থাকিবার কালেই ১৯১১ সালে দার্জিলিঙে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বিদ্যালয় বাড়ীটি কোন ইউরোপীয় মহিলার থাকিবার যোগ্য ছিল না, বিশেষ গ্রীষ্মকালে। মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার পরে সারাদিন তিনি নিজের লেখাপড়ায় ডুবিয়া থাকিতেন, সংকীর্ণ ঘরের চাপা গরমে তাঁহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিত। "ঐ সময়ে এক একদিন কপালে হাত দিয়া মাঝে মাঝে চাপিয়া ধরিতেছেন দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীদেরকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—মাথার বড় কষ্ট। কিন্তু তখনই আবার গিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিতেন।"

এই বিদ্যালয়টি এবং এখানকার কাজ নিবেদিতার পক্ষে ভারতোপলব্ধির সাধন ক্ষেত্র ছিল। পদ্মফুলের চিত্র তাঁহার বড় প্রিয় ছিল, তিনি বলিতেন—"এই ফুল ভারতবর্ষীয় চিত্রকর ভিন্ন অন্য কেহ আঁকিতে জানে না।" নিবেদিতার দৃষ্টিতে পদ্মফুল ভারতের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল। আর শুধু পদ্মফুলের ছবিই বা কেন, ভারতের ভাস্কর্য ও চিত্র তাঁহার বড় প্রিয় ছিল—কেবল সুন্দর শিল্পবস্তুরূপে নয়, ওই শিল্পের মধ্যে ভারতের আত্মা প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই নিবেদিতার তাহাদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—নিবেদিতার প্রেরণায় ও চেষ্টায় নন্দলাল বসু প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পিগণ [illegible] হন।

যেমন শিল্পে, তেমনি ইতিহাসে সর্বত্রই নিবেদিতা ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহার চিতোর ভ্রমণের কাহিনী বলিবার সময় পদ্মিনীর উপাখ্যান স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেছেন—"আমি পাহাড়ে উঠিয়া [illegible] উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, চক্ষু মুদিয়া [illegible] পদ্মিনী দেবীর কথা স্মরণ করিলাম। [illegible] কুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দেবী হাত [illegible] দাঁড়াইয়াছেন। আমি চোখ বুজিয়া [illegible] শেষ চেষ্টা মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম। [illegible] কি সুন্দর! কি সুন্দর!" "ভারতবর্ষের [illegible] উঠিলেই তিনি একেবারে ভাব[illegible] যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন [illegible] ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা! [illegible] কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে, [illegible] ভারতবর্ষ! মা! মা! মা! বলিয়া [illegible] জপমালা হাতে লইয়া নিজেই [illegible] লাগিলেন মা, মা, মা!" তাঁহার [illegible] বাঙলা ভাষার মধ্যে কোন ইংরেজী [illegible] শুনিলে লজ্জায় তাঁহার মুখ লাল [illegible] উঠিত। আবার কাহারো মুখে [illegible] প্রতি শব্দ শুনিবামাত্র তিনি [illegible] উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। [illegible] লেখিকা বলিতেছেন [illegible] কাছে যে গোয়ালা দুধ দিত, সে একদিন [illegible] নিকট ধর্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়া [illegible] নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া [illegible] সঙ্কুচিতা হইলেন এবং [illegible] মনে করিয়া [illegible] বলিলেন—তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার [illegible] কি উপদেশ চাও? তোমরা [illegible] শ্রীকৃষ্ণের জাতি, তোমাকে আমি [illegible]

ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা এই [illegible] অতিক্রম করিতে পারে কি? কোন [illegible] বলিয়াছেন যে, যে-লোক প্রভুভক্ত, তিনি [illegible] দাস। বৈষ্ণব ভক্তের আকাঙ্ক্ষার [illegible] রূপিনী কি ভগিনী নিবেদিতা নন?

"অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে [illegible] মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার [illegible] হইয়াছিল। সর্বদা পাদুকা পরিধান [illegible] থাকিলেও তিনি স্কুল বাড়ী হইতে খালি [illegible] হাঁটিয়া গিয়াছিলেন এবং সিঁড়িতে [illegible] উঠিতেই এমন আগ্রহ ও সরল ভক্তি [illegible] পূজা কোথায়, পূজা কোথায় জিজ্ঞাসা [illegible] ছিলেন, তাঁহার সেই ভাব দেখিয়াই [illegible] সকলে যেন সেই মুহূর্তেই পূজার [illegible] অনুভব করিলেন।"

এমন যে হইতে পারিয়াছিল তাহার [illegible] কারণ নিবেদিতার উপরে বিবেকানন্দের [illegible] বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রদ্ধাপ্রবণ হৃদয়কে [illegible] অনুকূলে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু আরও কারণ আছে—নিবেদিতার চরিত্রে [illegible]

সেই তাহা নিহিত। নিবেদিতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ভক্তি, কিন্তু এই ভক্তি অসাধারণ নিষ্ঠা ও বীরত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই গুরুর প্রতিকূলতার মধ্যেও ভক্তি তাহার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সাধারণ লোকের ভক্তি প্রতিষ্ঠিত নয়; তাহাতে নিষ্ঠার ভাব না থাকাতে সে ভক্তি কর্মের ভিতর দিয়া, কঠোরতার ভিতর দিয়া আপনার সার্থকতায় পেঁছিতে পারে না। নিবেদিতার চরিত্রে নারীসুলভ ভক্তির তলে পুরুষ দুর্লভ বীর্য ছিল। বিবেকানন্দের বীরত্বের শিখা হইতে নিজের বর্তিকাটি যেন তিনি প্রজ্বলিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী লেখিকা বলিতেছেন "তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধে এই কথাটি বলিব আমরা তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি—তাঁহার নাম বীরেশ্বর, তিনি বীরগণের ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবীর বীরগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিবে। তোমরা সকলে ছোট ছোট দুঃখ ছাড়িয়া বীর হও। এই কথাটি তিনি সকল সময়েই পুর্বোক্ত প্রকারে জোর দিয়া বলিতেন।" নিবেদিতার আদর্শ রমণী ছিলেন গান্ধারী, যিনি যুদ্ধে যাত্রাকালে পুত্রগণকেও যতো ধর্ম স্ততো জয়, ছাড়া অন্য আশীর্বাদ করিতেন না। ধর্মের জন্য পুত্রের পরাজয়ও তাঁহার কাম্য ছিল।

নিবেদিতার চরিত্রের এই দুটি দিককে, ভক্তি ও বীরত্বকে মিলাইয়া না দেখিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দেখা হইবে না। তাঁহার বীরত্বের বাহন ছিল তাঁহার অসাধারণ মনীষা। এই মনীষার গুণে, তিনি অনায়াসে পুরুষগণের সমকক্ষতা করিতেন, অনেক সময়েই তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইতেন। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে লোকমাতা বলিয়াছিলেন—তিনি সমানভাবেই লোক নেতাও ছিলেন বটে। তাঁহার চরিত্রের ভক্তি ও বীরত্বের মধ্যে ভারতীয় ভাবের সহিত যেন ইউরোপীয় ভাবের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের নিন্দা শুনিলে তাঁহার মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিত—এমন কিন্তু ভারতীয়ের হইয়া থাকে। নিবেদিতার তর্কাতীত চারিত্রিক মহত্ব অবশ্যই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কিন্তু তাঁহার চরিত্র যে বিচিত্র উপাদানে সৃষ্ট হইয়াছিল—তাহার আকর্ষণও অল্প নয়। নিবেদিতা-চরিত্র ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দুজনারই আদরের সামগ্রী। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ধারে নামক স্মৃতিগ্রন্থে নিবেদিতার ছবির দুএকটা টুকরা আছে, সেগুলির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়াই মনে হয়। নিবেদিতা অপরিচিতের উপরে কিভাবে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেন—তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

"প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসলের বাড়ীতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে শাদা ঘাগরা, গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা, ঠিক যেন শাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা এক দিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুটি তারা এসে মিলেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।"

আবার একটি অভিজাত ধনিকের সান্ধ্য বৈঠকের বর্ণনা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"সন্ধ্যে হয়ে এলো এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, সোনালী রুপোলীতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলবো যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেয়েরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগলো। উড্রফ, ব্লান্ট এসে বললেন, কে এ? তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম। সুন্দরী, সুন্দরী, কাকে বলো তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।"

নিবেদিতার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেতো।"

নিবেদিতার চরিত্রের উপরিতলে চাঁদের আলো কিন্তু সে চাঁদের আলো পড়িয়াছে অটল পাহাড়ের উপরে। বীর্যের উপরে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত, ফলে তপস্বিনী মহাশ্বেতার সৃষ্টি করিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাছে গিয়া কথা বলিলে মনে বল পাওয়া যাইত। নিবেদিতা-চরিত্রে লোকমাতা ও লোকনেতার মিলন ঘটিয়াছিল।*

---

* শ্রীসরলাবালা দাসী রচিত 'নিবেদিতা' গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

# বাংলার কথা

**শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ**

পশ্চিমবঙ্গে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলা ও মহকুমা কয়টি পাইবার দাবী যত প্রবল হইতেছে, ততই অপ্রত্যাশিত ও প্রত্যাশিত দিক হইতে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাহাতে আপত্তি প্রবল হইতেছে। দুঃখের বিষয়, অপ্রত্যাশিত দিক হইতে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে তাহাতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুরও সমর্থন রহিয়াছে। তিনিই প্রথমে বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠননীতি স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতিই প্রদেশ গঠনে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইতে পারে না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই যুক্তি তিনি বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমা পরিবর্তন সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার পরে তিনি আরও কতকগুলি যুক্তির কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্তমানে নবগঠিত ভারত রাষ্ট্র নানা সমস্যা লইয়া বিব্রত—এখন প্রদেশের পরিবর্তন-সমস্যায় মন দিবার সময় নহে। অথচ এই সমস্যার সমাধানের জন্য—রাষ্ট্র-চেতনা ও পরস্পরের স্বার্থ ও সুবিধা সম্বন্ধে অবহিত থাকিলে বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী যে বলিয়াছেন, এ সমস্যা পরস্পরের মধ্যে আলোচনার দ্বারা সহজেই সমাধান করা যায়, তাহা অতি সত্য। তাঁহার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী নাকি এ বিষয়ে বিহারী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের ও পণ্ডিত জওহরলালের বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাইয়াই আর চেষ্টা করেন নাই। বিধানবাবু কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের লোকের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া দাবী উপস্থাপিত করিতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। জওহরলালের শেষ উক্তি এইরূপঃ—

"সাম্প্রদায়িকতান্ধ ও স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার আগ্রহে বাধা দিতে হইবে।......প্রত্যেক প্রদেশ এমনভাবে ব্যবহার করিতেছে, যেন সে স্বাধীন রাজ্য। তাহারা আপনাদিগের সীমারেখা নূতন করিয়া অঙ্কিত করিতে যাইতেছে। কোন কোন প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশের কোন কোন অংশ চাহিতেছে। কোন জিলা যদি এক প্রদেশ হইতে লইয়া অন্য প্রদেশভুক্ত করা হয়, তবে তাহাতে লোকের জীবনের কি পরিবর্তন হইবে, তাহা বুঝা যায় না। এইরূপ প্রস্তাব অবশ্য পরে বিবেচিত হইতে পারে—কিন্তু বর্তমান সময়ে এই সকল অকারণ বিতর্ক আরম্ভ করা সঙ্গত নহে।"

বিহারে বাঙালীরা যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহা জওহরলালের অবিদিত নাই। তবুও যদি তিনি বলেন, বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি পশ্চিমবঙ্গে আসিলে সে সকলের অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রা নির্বাহের কোন পরিবর্তন হইবে না, তবে আমরা কি বলিতে পারি? বাঙলায় যেমন বিহারীর সম্পত্তি ক্রয়ে, বিদ্যালয়ে প্রবেশে, হাসপাতালে চিকিৎসায়, সরকারী চাকরীতে কলকারখানায় কাজে কোন বাধা নাই—যদি বিহারে বাঙালীদিগের সেইরূপ হইত, তবে পণ্ডিতজীর কথার কোন মূল্য থাকিতে পারিত। কিন্তু তিনি জানেন, বিহারে বাঙালীরা সে সকল অধিকারে বঞ্চিত। এমনকি, বিহারে বাঙালীদিগের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারও বিহার সরকার অস্বীকার করিতেছেন। অথচ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে—

"Far more important than the acquisition of any foreign tongue is the art of skilfully handling your own."

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলিতে অধিবাসীরা যে হিন্দী বুঝে না, তাহা স্বীকার করিয়াই রাজেন্দ্রবাবুকে একটি সম্মিলনে বাঙলায় সভাপতির অভিভাষণ দিতে হইয়াছিল। তাহা জানিয়াই তিনি আজ সে সকল জিলাকে হিন্দীভাষাভাষী করিবার জন্য হিন্দী প্রচার সমিতিকে প্ররোচিত করিতেছেন।

আর বিহার সরকার বিহারে বাঙালীদিগের সভাসমিতি সম্বন্ধেও বাধার সৃষ্টি করিতে লজ্জানুভব করিতেছেন না। সে সকল বাধা অপ্রত্যক্ষ নহে—বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ।

সেদিন বিহারের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ রাঁচিতে বলিয়াছেনঃ—

"যে সকল বাঙালী বিহারে বাস করেন, আমি তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিতে পারি যে, যদি তাঁহারা বিহারের সম্বন্ধে মমত্ববোধ করেন ও বিহারের উন্নতিকামী হন, তবে বিহারের আকাশে ও ভূমিতে আমার যে অধিকার তাঁহাদিগেরও সেই অধিকার।"

অবশ্য কিসে বিহারের সম্বন্ধে মমত্ববোধ ও বিহারের উন্নতি কামনা করা হয়, তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু আমরা জানি, অতি অল্পদিন পূর্বেও পূর্ববঙ্গের কোন বাঙালী বিহারে—হাজারিবাগে একখানি গৃহনির্মাণের জন্য জমি চাহিলে তাঁহাকে তাহা দিতে সরকার অস্বীকার করিয়াছেন—কারণ, তিনি "বিহারী নহেন—হিন্দুস্থানীও নহেন, কলিকাতা হইতে আগত একজন বাঙালী।"

এই অবস্থায় যদি বলা হয়, বিহারে বাঙালী কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকারে বঞ্চিত নহে, তবে তাহাতে সার মাস্টারজী ভবনগরীর সেই গল্প মনে পড়ে—এক রাত্রিতে ট্রেন কোন স্টেশনে দাঁড়াইলে যে কামরায় সার ফিরোজ শা মে[illegible] ছিলেন, তাহার দ্বারমুক্ত হইল এবং তাঁহার মত পার্শী সার মাঞ্চারজী ভবনগরী তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার সে কামরা আসিবার কারণ নির্দেশ করিয়া বলিলেন, তিনি যে কামরায় ছিলেন, মধ্যপথে একজন ইংরেজ সামরিক কর্মচারী একটি [illegible] কুকুর লইয়া তাহাতে প্রবেশ করে। তিনি [illegible] নিরস্ত করিতে না পারিয়া স্টেশনমাস্টারকে তাঁহার আপত্তি জানাইলে আগন্তুককে [illegible] স্টেশন মাস্টার বলেন, কামরায় অন্য কেহ [illegible] আপত্তি করিলে কেহ তাহাতে কুকুর [illegible] পারেন না, তখনও সে সেকথা না শুনিয়া বলে, "ভারতীয় কেন আমার কুকুরের সঙ্গে [illegible] আপত্তি করিবে? আমার কুকুর তো ভারতীয় সহিত এক কামরায় যাইতে আপত্তি করে না।" বিহারের নেতৃগণের কথাও সেইরূপ, [illegible] সেইরূপ।

১৯১১ খৃস্টাব্দ হইতে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলিতে বাঙলার যে [illegible] কংগ্রেস স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, [illegible] তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তবে যে [illegible] কংগ্রেসের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও আস্থা [illegible] করা হয়, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বিহারে আর একভাবে বাঙালীদিগকে [illegible] দেখান ও বিহারীদিগকে উত্তেজিত [illegible] হইতেছে। যাঁহারা বাঙালীও নহেন বিহারীও নহেন—মারবারী সেই বিত্তশালীদিগের [illegible] 'সার্চ লাইট' মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতেছেন, কলিকাতায় বিহারীদিগকে লাঞ্ছিত [illegible] হইতেছে—ট্রামে, বাসে—সর্বত্র বিহারী [illegible] প্রচার করা হইতেছে ইত্যাদি। [illegible] জুলাই [illegible] এই পত্রে টাটানগরে বিহারীদিগের [illegible] বাঙালীদিগের সভা আক্রমণের [illegible] প্রকাশ করিয়া বাঙালীদিগকেই দোষী প্রতিপন্ন করিবার হীন চেষ্টা হইয়াছিল। [illegible] পত্র (৯ই জুলাই) বলিয়াছিলেন—[illegible] কোন অংশ অন্য প্রদেশে প্রদানের চেষ্টা [illegible] কিছুতেই সহ্য করিবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে বিহারে বাঙালীদিগকে ভয় দেখান হয়ঃ

"Bengalee residents of the province do well to examine the implications of their conduct before they make themselves party to what the people are bound to regard on a conspiracy against their existence as a political unit."

এবার 'সার্চ লাইটের' সাহস আরও বাড়িয়া গিয়াছে—সুর আরও চড়িয়াছে। বোধ হয় তাহার কারণ—যখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াও বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি যাহাতে পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান করা না হয় সেজন্য আগ্রহশীল আর যখন ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল

বাঙলার দাবীর বিরোধী, তখন "আমি কি ডরাই কভু" বাঙালীকে?

পশ্চিমবঙ্গে ঐ জিলাগুলি লাভের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার অতিরঞ্জিত ও অসত্য বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে, উহার ফলে বিহারেও সম্প্রীতি থাকিবে না—

"We are afraid if this spoute of abusive propaganda continues long it may provoke retaliatory sentiment and feeling. Recent incidents at Gauhati may serve as an eye-opener to our friends in Bengal".

অর্থাৎ গৌহাটিতে অসমিয়ারা (সকল আসামী সম্প্রদায় নহে) যেভাবে বাঙালীদিগের সম্বন্ধে হিংসাশ্রয়ী হইয়াছে, বিহারে বিহারীরাও তেমনই হইবে।

এইরূপ অতিরঞ্জনের সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী জিলাগুলির সম্বন্ধে বাঙলার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার আন্দোলনে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু যোগ করিতেছেন। আন্দোলন যে ঘৃণার ও বিদ্বেষের উপর নির্ভর না করিয়া ন্যায়ের ও যুক্তির উপর নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

যদি কোন পক্ষে আন্দোলন অনিষ্টপথে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা যে বিহারের পক্ষে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না।

'সার্চ লাইট' বিহারের কংগ্রেস পক্ষের মুখপত্র। তাহার উক্তি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতে যুক্তির অবসর নাই। আর সেদিন বিহারের ব্যবস্থা পরিষদে কোন (বিহারী) সদস্য অনায়াসে বলিয়াছেন, বাঙলা যদি বিহারের বঙ্গভাষাভাষী স্থানগুলি সম্বন্ধে) তাহার দাবী ত্যাগ না করে, তবে "ন্যায় ও অন্যায় বিচার না করিয়া প্রতিহিংসা" গৃহীত হইতে পারে। "ন্যায় ও অন্যায় নিরপেক্ষ প্রতিহিংসা" গ্রহণের কথা বাঙলার কোন সভায় বা সংবাদপত্রে উচ্চারিত হয় নাই। গত জুলাই মাসে টাটানগরে কতকগুলি বিহারী বাঙালী-দিগের সভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য যে যুক্তি শক্তি ব্যবহার করিয়াছিল, বাঙলায় কুত্রাপি তদ্রূপ ব্যবহারের কথা কেহ বলেন নাই। বাঙলায় আজ বিহারীরা বাঙালীর সকল অধিকার অনায়াসে সম্ভোগ করিতেছেন—কোন বিহারীর লাঞ্ছনা হয় নাই, কোন বিহারীর ব্যবসা বর্জিত হয় নাই, কোন বিহারীর বিদ্যালয়ে ও হাসপাতালে প্রবেশের অধিকার ক্ষুন্ন হয় নাই, কোন বিহারী, বিহারী বলিয়া বিদ্যালয়ের বৃত্তিতে বঞ্চিত হয় নাই। আশা করি, সেরূপ কোন ঘটনা ঘটিবে না। কিন্তু বিহারে যদি বাঙালীরা লাঞ্ছিত হইতে থাকে, তবে বাঙলায় তাহার প্রতিক্রিয়া যে হইতেও পারে, তাহা বিহারের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে রাখা আমরা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ, উত্তেজিত হইলে মানুষ ধৈর্য হারাইতে পারে।

ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য সেরাইকেল্লা কোন্ প্রদেশভুক্ত করা হইবে, যখন তাহা বিবেচিত হয়, তখন বিহার ও উড়িষ্যা যে যাহার দাবী উপস্থাপিত করেন। কিন্তু সে রাজ্যে বাঙলা ভাষা-ভাষী অধিবাসীর সংখ্যা উড়িয়া ভাষাভাষী ও হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবী উপস্থাপিত করেন নাই। ঐ রাজ্য প্রথমে উড়িষ্যা সরকারের কর্তৃত্বাধীন করিয়া পরে বিহারভুক্ত করা হইয়াছে। "আদিবাসীরা" উহা দাবী করিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহাই তাহাদিগের বিহার-ভুক্ত হইবার ইচ্ছার অভিব্যক্তি—এই বিস্ময়কর যুক্তিতে উহা বিহারকে দিলে উড়িষ্যাবাসীরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া ও হরতাল করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং সভা করিয়া ঘোষণা করে, ভারত সরকার যদি ঐ রাজ্য উড়িষ্যাভুক্ত না করেন, তবে উড়িষ্যা ভারতরাষ্ট্র ত্যাগ করিবে।

উড়িষ্যার কংগ্রেসী সরকার সে বিক্ষোভ প্রকাশ অসম্ভব করিতে পারেন নাই। এমন কি উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব বিহারের প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লিখেন, যেন সেরাইকেল্লা ও খরশোয়ান রাজ্যদ্বয়ের অধিবাসী উড়িয়াদিগের সম্বন্ধে সুবিচার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেরূপ কোন কথাই বলেন নাই। বিহারের প্রধানমন্ত্রী যে চাইবাসায় যাইয়া ঘোষণা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন—তিনি সেরাইকেল্লা ও খরশোয়ান রাজ্যদ্বয়ের উড়িয়া-দিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, বিহার সরকার তাঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র অধিকার সর্বতোভাবে অক্ষুন্ন রাখিবেন, তাঁহাতেই বুঝিতে পারা যায়, উড়িয়ারা এখনও বিক্ষুব্ধ। তাহার কারণ, তাহারা উড়িষ্যার জনগণের সমর্থন পাইয়াছে। বিহার সরকারের প্রতি-শ্রুতিতে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে কি না, বলা যায় না। কিন্তু ঐ রাজ্যদ্বয়ের বাঙালীদিগের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদাসীন। উড়িয়া-দিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান প্রসঙ্গে বিহারের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন—বিহারের কোন কোন অংশ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে—ভারত সরকারের নির্ধারণে তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা আছে এবং তাঁহার বিশ্বাস, সেই নির্ধারণ সকলেই স্বীকার করিয়া লইবেন এবং তাহাই দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের আচরণে ও পণ্ডিত জওহরলালের উক্তিতে হয়ত বিহারের প্রধানমন্ত্রীর এরূপ বিশ্বাসের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেরাইকেল্লা ও খরশোয়ান রাজ্যদ্বয় উড়িষ্যার নিকট হইতে লইয়া বিহারকে প্রদানে হয়ত সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু বাঙলার পক্ষ হইতে একথা বলা অসঙ্গত হইতে পারে না যে, ঐ সকল কারণেই বাঙলার ভারত সরকারের ব্যবস্থায় অবিচলিত বিশ্বাস না থাকিতে পারে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—সেরাইকেল্লা ও খরশোয়ান রাজ্যদ্বয়ের ভাগ্য-নির্ণয়ভার ভারত সরকার একজন বিচারককে দিয়া পরে সে ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া আপনারাই ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যদি বিহারে সত্য সত্যই বাঙালীদিগকে বিহারীদিগের মত আপনাদিগের ভাষা, সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার সুযোগদানে বিহার সরকার কার্পণ্য না করিতেন—যদি তাঁহারা সে বিষয়ে বাঙলার উদার আদর্শের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে বিহারী-বাঙালী সমস্যার উদ্ভব হইত না। বিহার সরকারের ব্যবহারেই সে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং সে সমস্যা সম্বন্ধে বাঙলায় লোকমত যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে বাঙলার কোন মন্ত্রিমণ্ডলই তাহা উপেক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না।

বিধানবাবুর প্রস্তাবে বিহারের প্রধানমন্ত্রী কি উত্তর দেন, তাহার জন্য বাঙলার লোক উদ্গ্রীব হইয়া থাকিবে।

'সার্চ লাইট' বিহারে বাঙালীদিগকে গৌহাটীর ঘটনা স্মরণ করাইয়া ভয় দেখাইয়াছেন। আজ আসামের অসমীয়া মন্ত্রীরা সত্য গোপন করিবার জন্য যত কথাই বলুন না, আসামে যে বাঙালীদিগকেই বিতাড়িত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা সেই আন্দোলনের নামেই সুপ্রকাশ। তাহাকে অসমীয়ারা "বঙ্গাল খেদা" নাম দিয়াছেন, অর্থাৎ বাঙ্গালীকে আসাম হইতে বিতাড়নই সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

আজ আসাম ও বিহার পশ্চিমবঙ্গের মত ভারত রাষ্ট্রভুক্ত। আজ প্রদেশে প্রদেশে যে প্রাদেশিকতা জাতীয়তার স্থান অধিকার করিতেছে, তাহাতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীশংকররাও দেও হতাশ ভাবে বলিয়াছেন,—"শেষে কি কংগ্রেসের এই অবস্থা ঘটিল?" এই প্রশ্ন তিনি যদি কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে করেন, তবেই তাহা সঙ্গত হয়। আমরা পূর্বে চাইবাসায় বিহারের প্রধানমন্ত্রীর উক্তির উল্লেখ করিয়াছি। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তিনি এমন কথা বলেন নাই যে, অতীতে যাহাই কেন হইয়া থাকুক না, ভবিষ্যতে বিহারে বাঙালীরা কোন অধিকারে বঞ্চিত হইবেন না। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলিকে হিন্দী-ভাষাভাষী করিয়া বিহারের বিস্তৃতি রক্ষা করিবার জন্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের আগ্রহ কি ভারত-রাষ্ট্রে প্রাদেশিকতার উচ্ছেদসাধনের সহিত সামঞ্জস্য-সম্পন্ন বলা যাইতে পারে?

আসামে প্রথমে পূর্ববঙ্গ হইতে তথায় গত মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যে কারণে তখন সে চেষ্টা হইয়াছিল, এখন সেই কারণেই আসাম হইতে বাঙালী হিন্দুদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গৌহাটীতে মুসলমানদিগের

দোকান প্রভৃতির বাংলায় লিখিত সাইন বোর্ড নষ্ট করা হয় নাই। আসামে অসমীয়াতিরিক্ত যে সকল সম্প্রদায় অসমীয়া ভাবাভাষী নহে—তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার লাভ হইতেছে। তাহারা যদি বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের সহিত একযোগে গণতন্ত্রানুমোদিত অধিকার দাবী করে, তাহা হইলে আর অসমীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে সরকারের সব অধিকার একচেটিয়া করিয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীহট্টকে আসামভুক্ত রাখিবার জন্য যে আসামের সরকার আবশ্যক চেষ্টা করেন নাই, তাহার মূল সন্ধান করিলেও ইহাই মনে হয় কি না, তাহা বিবেচনার বিষয়।

এখন পশ্চিমবঙ্গের লোককে ও পশ্চিম-বঙ্গের সরকারকে বিবেচনা করিতে হইবে, আসামে বাঙালীর নির্বিঘ্নে বসবাসের ও ব্যবসা পরিচালন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে? সেদিন পশ্চিমবঙ্গের কোন মন্ত্রী বলিয়াছেন, —বাঙালীকে আজ "দেহি! দেহি!" রব তুলিয়া আপনার কাজ আপনি করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এ কথা ত অস্বীকার করা যায় না যে, আপনার কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইলে, অপরকে যেমন কিছু দিতে হয়, অপরের নিকট হইতেও তেমনই কিছু দাবী করিতে হয়। সেই দেওয়া ও লওয়ার সামঞ্জস্য সাধন করা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে শান্তিতে কার্য পরিচালন সম্ভব হয় নাই। সেই জন্যই সন্ধির সর্ত ও চুক্তি।

উড়িষ্যায় পুরীতে সমুদ্রতীরে যে ঘটনার উল্লেখ আমাদিগকে করিতে হইয়াছিল, তার পরে কিছুদিন আর সেরূপ কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এ ঘটনা একটি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা মাত্র মনে করিবার উপায় নাই। উহা ওড়িয়াদিগের যে মনোভাবের পরিচায়ক, তাহার পরিচয় কিছুকাল পূর্বেও পাওয়া গিয়াছিল এবং এখনও পথে ওড়িয়া তরুণদিগের বাঙালী সম্বন্ধে মন্তব্যে বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে মনে হয়—অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই, ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে। বিহারে যেমন উড়িষ্যায়ও তেমনই একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই মনোভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে। উড়িষ্যার ব্যাপারে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিব—ইতঃপূর্বে যেসব ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সে সকলের পরে পুরীর সমুদ্রতীরে সতর্ক প্রহরীর যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা শিথিল করিবার কি প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল? পূর্ব বৎসর কি কোন কোন পুলিশ কর্মচারীকে কর্তব্যচ্যুতির জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল? এবার যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য কে দায়ী? কেবল সমুদ্রতীরেই নহে—সর্বত্র যাহাতে ঐরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে না পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব উড়িষ্যা সরকারের। আমরা শুনিতেছি, শিল্প-প্রতিষ্ঠা কার্যে উড়িষ্যা সরকার বাঙালী ধনিকের ও শিল্পপতিদিগের সাহায্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বাঙালী ধনিকরা ও শিল্পপতিরা যদি উড়িষ্যায় বাঙালীর লাঞ্ছনার সম্ভাবনা নির্মূলে করিবার উপায় না করিয়াই উড়িষ্যায় গমন করেন, তবে যে তাঁহারা বিশেষ ভুল করিবেন, তাহা আজ তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমরা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

ভারত সরকার নির্দেশ দিয়াছেন, সরকারী প্রয়োজনে আর "বন্দেমাতরম" জাতীয় সংগীত বলিয়া বিবেচিত ও ব্যবহৃত হইবে না; আপাততঃ রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন" ব্যবহৃত হইবে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা অস্থায়ী হইলেও —ইহাই স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা যে প্রবল, তাহা কিছুদিন হইতেই সেনাদলের বাদ্যে "জনগণমন" বাজাইবার "মহড়া" দেওয়ায় বুঝিতে পারা গিয়াছিল। "বন্দেমাতরম" রচয়িতা যেমন বাঙালী "জনগণমন" লেখকও তেমনই বাঙালী। গান দুইটিই বাংলা—"বন্দেমাতরম" সংস্কৃত মিশ্রিত। জাতীয় সংগীত জাতির স্বতঃস্ফূর্ত আদরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়—কাহারও আদেশে বা নির্দেশে তাহা হয় না। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক যে শিবাজীর সমাধি তোরণে "বন্দেমাতরম" উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। "বন্দেমাতরম" সম্বন্ধে গান্ধীজী, তিলক ও অরবিন্দ একমত। সে বিষয়ে অরবিন্দের অভিমত কি পণ্ডিত জওহরলাল পাঠ করিয়াছেন? পাঠ করিয়া থাকিলেও কি তিনি অরবিন্দের উক্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই? আমাদিগের মনে হয়, অরবিন্দের উক্তির পরে সে সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

পূর্ব পাকিস্থান হইতে হিন্দুরা কেন পলায়ন করিতেছেন, তাহার কারণ খাজা নাজিমুদ্দীন জানিয়াও কেন জানেন না বলিতে পারেন? কিন্তু গত ২৯শে মে বগুড়া জেলার দোবারিয়া গ্রামের বরদাকান্ত নিয়োগী নামক এক ব্যক্তি বর্ধমানে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যে আবেদন করিয়াছে, তাহা যদি অসত্য না হয়, তবে সে কারণ কি তাহা বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বরদা বলে—গত ২রা বৈশাখ সে পিতামাতার সহিত কলহ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলে গ্রামের মুসলমানরা তাহাকে মুসলমান হইতে প্রলুব্ধ করে। সে তাহাদিগের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাহারা তাহাকে ভয় দেখায় ও ৬ই বৈশাখ তাহাকে ভবানীগঞ্জে পাঞ্জাবী মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করে। ঐ ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে, তাহার অনিচ্ছা জানিয়াও, মুসলমান হইতে বাধ্য করেন এবং লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী বেরানুদ্দীনকে বলেন, ফতিমপুরের আবাই খাঁনের কন্যা রমোলা খাতুনের সহিত বরদার বিবাহ দিয়া তাহাকে ৫৭৬ শত টাকা দেওয়া হউক। ফকিরপুর হইতে সে কোন রূপে পলায়ন করিয়া বর্ধমানে উপস্থিত হইয়াছে। সে বলে, সে ফকিরপুরে মুসলমান গৃহ হইতে পলায়ন করায় মুসলমানের এজাহার দিয়াছে, সে মুসলমান হওয়ায় তাহার পিতামাতা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই এজাহার অনুসারে তাহার পিতামাতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এইরূপ ব্যাপার যদি গ্রামের মুসলমানদিগের ও মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটের যোগে হইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুর ধন প্রাণ মান কিরূপ বিপন্ন তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে অন্নকষ্টাভাবের কোনরূপ উপশম হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করা হয় নাই। যে সকল পরিকল্পনা কাগজে দেখা যাইতেছে, সে সকল কার্যে পরিণত করার কি হইতেছে, বলা যায় না। গত বৎসর গোল আলুর বীজের অভাবে আলুর চাষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল—প্রকাশ এবৎসর কৃষি বিভাগের কর্মচারীরা সর্বদা বলিতেছেন, মন্ত্রীরা কে কখন থাকেন, তাহার স্থিরতা নাই, তাঁহারাই বিভাগের কাজ পরিচালিত করেন; তাঁহারা গোল আলুর বীজ সম্বন্ধে যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন তাহাই করিবেন।

মৎস্য বিভাগের বিষয় অধিক আলোচনা করিতেও আর প্রবৃত্তি হয় না। প্রকাশ, কোন পূর্বে মন্ত্রিমণ্ডলের নূতন চীফ হুইপ সদস্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য সম্পর্কে গবেষণাগারে যাইয়া পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য বিভাগ সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করার উত্তরে পাইয়াছেন—ঐ বিভাগের কর্মকর্তাদিগকে রাখিলে কোন পরিকল্পনাতেই কাজ হইবে না।

এখনও কিভাবে পাকিস্থানে কাপড় চালান যাইতেছে, তাহার বিবরণ গত ১০ই জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শিয়ালদহ রেল স্টেশন যেমন বিমান ঘাটিতেও তেমনই চালানী কাপড় ধরা পড়িতেছে, কিন্তু তাহার জন্য কত লোক ধরা পড়িতেছে এবং যাহারা ধরা পড়িতেছে, তাহারা কিরূপ দণ্ড লাভ করিতেছে, তাহা জানিতে পারা যায় না কেন? এই চোরা কারবারে কত লোক জড়িত তাহা কি পুলিস সন্ধান রাখে?

## ্যাভাজো—মার্কিনদের লজ্জা

পৃথিবীর সভ্যতম জাতি বলে মার্কিন ্তুরাজ্যের অধিবাসিগণ গর্ব করেন। এই ভ্যতম জাতিদের মধ্যেই বাস করে ্যামেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান াতির একটি শ্রেণী যাদের নাম হ'ল ্যাভাজো। ভারতবাসীরাই দরিদ্রতম জাতিদের ধ্যে অন্যতম নয় তাদেরও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে াধীন মার্কিন গণতন্ত্রে, সর্বাপেক্ষা ধ্নশালীদের দেশে।

অ্যারিজোনা ও নিউ মেক্সিকোর জঙ্গলে ্যাভাজোরা বাস করে, সংখ্যায় তারা ষাট াজারের কিছু বেশী, কিন্তু তাদের যে জমি ওয়া হয়েছে তা বড়জোর সাড়ে সাত হাজার াকের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। শ্বেত-ধারীরা অ্যামেরিকায় যাবার আগে ্যাভাজোরা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু শ্বেত-

করতে হয়। শ্বেতাঙ্গরা তাদের প্রস্তুত জিনিসপত্র দয়া করে সামান্যমূল্যে দিয়ে কিনে নিয়ে যান, পরিবর্তে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে গোপনে মদ কিনতে হয়। শ্বেতাঙ্গরাই তাদের প্রকাশ্যে মদ কেনা ও খাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। যক্ষ্মা ও সিফিলিস তাদের ঘরে ঘরে। ষাট হাজার লোকের জন্য একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে, যক্ষ্মায় মৃত্যুর হার শতকরা ৪৫ এবং প্রতি ছয় হাজারের জন্য একজন চিকিৎসক। যে কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী ন্যাভাজো বিদেশে যায় তাদের দ্বারা সস্তা মজুরের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। কোনো

ভাল কাজের সুযোগ তাদের দেওয়া হয় না।

মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে জার্মানরা যে খাদ্য পায়, ন্যাভাজোদের খাদ্য তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাদের দারিদ্র্য এত বেশী যে কাঁচা অবস্থাতেই তারা শস্য খেয়ে নেয় ফলে শূলবেদনায় ও আমাশয়ে তাদের ভুগতে হয়। স্থানীয় রেড ক্রস প্রতিষ্ঠানে একটি ন্যাভাজো যখন সাহায্যের জন্য যায় তখন তাকে প্রশ্ন করা হয় সে কোনো কাজ করে না কেন? উত্তরে সে বলে যে সে পারে না, সর্বদাই সে ক্লান্তি বোধ করে। অনেক সময় দু'তিন দিন কোনো খাদ্যই জোটে না এবং নিয়মিত খাদ্যের অভাবে দুর্বল বোধ করে।

কিছুদিন হ'ল ন্যাভাজোদের উন্নয়নের জন্য দশ বৎসরের মধ্যে কার্যকরী একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান এজন্য দুই লক্ষ ডলার মঞ্জুর করেছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে ন্যাভাজোদের বাস করবার ঘর ও চাষের জমি জুটবে। জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হবে। তাদের জন্য কোনো কোনো চাকরীও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে এবং তাদের দেশজ শিল্প পুনর্গঠন করতে উৎসাহ দেওয়া হবে। লেখা-পড়ার জন্য স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বাস্থ্য-বিধি নিয়মিত শেখাবার ব্যবস্থাও করা হবে, কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্রও স্থাপিত হবে।

মার্কিন সরকারের আদিবাসী বিভাগে একটি শাখা আছে, ন্যাভাজো সার্ভিস। এই প্রতিষ্ঠানও দ্রুত এবং আরও ব্যাপক উন্নয়নের জন্য মার্কিন সরকারকে চাপ দিচ্ছেন। মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে ন্যাভাজোদের বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি যত লেখা ও ছবি ছাপা হচ্ছে, অত তাড়াতাড়ি কিন্তু সাহায্য তাদের করা হচ্ছে না, দেরী হলে হয়ত অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে' যাবে।
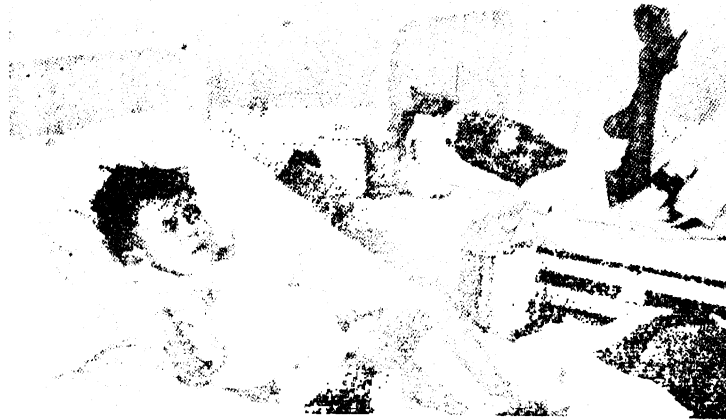
যক্ষ্মা হাসপাতালে ন্যাভাজো বালক ও বৃদ্ধ

দের জমির ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল। নৃশংসে ৎ এই আদিবাসীদের পরাজয় বরণ করতে । তাদের মেষপাল হ'ল শ্বেতাঙ্গদের আর তাদের কুটির জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের দা করা হল। কেউ কেউ দূরে পাহাড়ে লে পালিয়ে গেল, তাদের ভাগ্যে কি কেউ জানে না। আট হাজার ন্যাভাজোকে মেক্সিকোর ফোর্ট সামারে তিন বৎসর দী রাখা হ'ল। মুক্তির পর যে পরিমাণ তাদের বাস করবার জন্য নির্দিষ্ট করে া হ'ল তার ঘাস তাদের মেষপালের যথেষ্ট নয় অথচ এই মেষপালনই তাদের ম প্রধান জীবিকা। তাদের ইচ্ছা করে লা করা হতে লাগল, যেন তারা মার্কিন দের গলগ্রহ।

ড়ে একজন ন্যাভাজোর বাৎসরিক আয় র ষাট টাকা, বিদ্যালয়ের সংখ্যা নগণ্য, পড়া জানা লোকের সংখ্যাও তদনুরূপ। । অবশ্য তারা দেয় যদিও তাদের ভোট এবং মার্কিন সরকারের জন্য যুদ্ধও

একটি ন্যাভাজো পরিবার, স্ত্রী স্বামীর কেশ পরিচর্যায় রত

# এশিয়ার জাগরণ

## শ্রীঅনিলকুমার বসু

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের এশিয়া দূরপ্রাচ্য সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কমিশনের তৃতীয় অধিবেশন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক উতকামণ্ডে উদ্বোধিত হইয়াছে। এই অধিবেশনে পৃথিবীর অন্যূন ১৮টি জাতি যোগদান করিয়াছে। একদিন রবীন্দ্রনাথ ভারত তীর্থের যে বন্দনাগীতি উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন, তাহা আজ সফল হইতে চলিয়াছে।

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে,
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

এই অধিবেশনে ভারতের আমন্ত্রণে সারা পৃথিবী যেভাবে সাড়া দিয়াছে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ছন্দ-বন্ধ-বন্দনা-গানের প্রতিটি কথা মহা সত্যে পরিণত হইয়াছেঃ

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমান ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

যুগ যুগান্তকাল ভারতের অপূর্ব বাণী শুনিবার জন্য সারা পৃথিবী উন্মুখ হইয়া আছে। ভারত জগৎকে শুনাইয়াছিল সেই অমরত্বের বাণী, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" ভারততীর্থ হইতে দূর দূরান্তে প্রচারিত হইয়াছিল প্রেম, ত্যাগ ও অহিংসার মর্মবাণী, ভারতেই ঘটিয়াছে সর্ব জাতি ও সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়। তাই বর্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব ভারতবাসীর কাছে এত বেশী। সত্যের যে অনির্বাণ দীপশিখা ভারতে একদিন জ্বলিয়াছিল তাহাই আজ পর্যন্ত সমগ্র জগৎকে আলোক দান করিতেছে। তাই পণ্ডিত নেহরুর কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইয়াছে ভারতের সেই শাশ্বতবাণী। ভারতের জাগরণ নব-এশিয়ার জাগরণ সূচনা করিতেছে। একদিন বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ হইতে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে যে বিরহীযক্ষের বিরহ ব্যথা মেঘদূত-রূপে অলকাপুরীর অভিমুখে ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহাই ছিল সারা পৃথিবীর অতল-স্পর্শ বিরহ কাহিনী! আর আজ নীলগিরির পাদদেশে উতকামণ্ড হইতে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণে যে ঐক্য ও সহযোগিতার নির্দেশ প্রচারিত হইল তাহাই হইবে সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডের প্রাণধারা যাহা সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া শান্তির মন্দাকিনীধারায় পরিপ্লুত করিবে।

পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন, "বহুদিন হইতেই ঐক্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একক জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক হইতে এক জগৎ গঠন করার আবশ্যকতা আরও বেশী। বর্তমান এশিয়ার পুনর্গঠন সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষণীতে বিচার করিতে হইবে। এশিয়ার মত মহাদেশ অনুন্নত থাকিলে তাহার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর অপরাপর দেশের উপর এমনভাবে পতিত হইবে যে তাহাদের উন্নতির সৌধ অচিরাৎ ধূলিসাৎ হইবে। কাজেই পৃথিবীর সার্বজনীন মঙ্গল সাধনের জন্যও অনুন্নত দেশগুলির পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্কার প্রয়োজন।" এশিয়া প্রায় ১০০ কোটি লোকের আবাসভূমি। এই মহাদেশের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার অর্ধভাগ। কাজেই দেহের এক অঙ্গ বাদ দিয়া অপর অঙ্গের পরিপুষ্টি বিধান যেমন সম্ভব নয়, সেই রকম অর্ধ পৃথিবীকে অভুক্ত, নগ্ন ও অসহায় রাখিয়া বাকি অর্ধাংশের উন্নতি সাধন আকাশকুসুমের মতই অলীক। কিন্তু এযাবৎ এই কঠিন সত্যটিকেই উপেক্ষা করিয়া আসা হইতেছিল। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের হীন প্রচেষ্টায় সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডই শোষিত হইতেছিল। বহু শতাব্দীর নিরঙ্কুশ শোষণের ফলে এশিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য পশ্চিমের পদপ্রান্তে একে একে স্তূপীকৃত হইল। পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে দেখা গেল জীর্ণ দেহ, জীর্ণ বক্ষ, হৃতবল এক সর্বস্বান্ত মানব-গোষ্ঠী, যাহাদের চোখে-মুখে হতাশার ঘন কৃষ্ণ ছায়া, আর পশ্চিম প্রান্তে রহিল বলদৃপ্ত, উদ্ধত, শক্তি-মদমত্ত কয়েকটি জাতি। কিন্তু ভাগ্যচক্রের দুর্নিবার আবর্তনে সেই ভোগের পশরা আস্তে আস্তে শূন্য হইতে চলিল। পরিশেষে সেই সব সঞ্চয় তাহাদিগকে পথপ্রান্তে ফেলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গেল ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া নিষ্ফলতার দুর্বহ পঙ্ক-শয্যা। সেই নিষ্ফলতার পঙ্ক-শয্যায় প্রাণ-শক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য চাই পাশ্চাত্য জাতিগুলির নব-রাজ্য লিপ্সা পরিহার ও অনুন্নত জাতিগুলির প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি। কিন্তু এযাবৎ এশিয়ার নির্যাতিত দেশগুলি সেই দিক দিয়া জগৎসভায় কোন সুবিচার পায় নাই। পণ্ডিত নেহেরুও বলিয়াছেন যে পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এশিয়ার সমস্যাগুলিকে উপেক্ষাই করা হইয়াছে; এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির বিবিধ সমস্যা সমাধানের কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয় নাই। এশিয়ার অগণিত নরনারীর দুঃখ দুর্দশা দীনতা-হীনতা, দৈন্য ও ভাগ্যবৈগুণ্য, ব্যথা বেদনার করুণ কাহিনী বহুশতাব্দী ধরিয়া কালের বিচিত্র পটে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আশু অবসান জগতের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন এবং এই সব সমস্যার সমাধান বীজগণিতের বাঁধাধরা সূত্রের ন্যায় গতানুগতিকভাবে সম্ভব নয়। এই জন্যই প্রথমেই চাই সর্বপ্রকার বৈদেশিক অধিকারের বিলোপসাধন। এবং প্রত্যেক দেশেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। সেই সঙ্গে আবশ্যক উন্নত জাতিগুলির পক্ষ হইতে এশিয়ার অনুন্নত জাতিগুলিকে অকৃপণ সাহায্য-দান। ঐ সব দেশগুলিকে শিল্পোন্নত করিবার জন্য যন্ত্রপাতি ও সুশিক্ষিত কর্মী প্রেরণও প্রয়োজন। এশিয়া ভূখণ্ডের নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য লোকবাহুল্যকেই দায়ী করা হইতেছিল। এমনভাবে যুক্তি দেখান হইয়াছিল যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধ না করিতে পারিলে দারিদ্র্যের নাগ-পাশ হইতে এশিয়ার কোন দেশকেই মুক্ত করা সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষের প্রতিও এই অব্যর্থ যুক্তিবাণ নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। পণ্ডিত নেহেরু দৃঢ়কণ্ঠে এই যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতের অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এখন পর্যন্ত পূর্ণভাবে দেশের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হয় নাই। ভারতে কৃষিকার্য ও শিল্পপ্রসারের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেই ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ঐ সব ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রসারের সুযোগ গ্রহণ করিলে ভারতের জনসাধারণকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখা মোটেই অসম্ভব নয়। ভারতের বেলায় যে যুক্তি পণ্ডিত নেহেরু দর্শাইয়াছেন, সেই যুক্তি এশিয়ার অপরাপর অনুন্নত দেশগুলির বেলায়ও প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ তিনি ইন্দোনেশিয়ার কথা বলিয়াছেন। সেই দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে যাহা কাজে লাগাইলে শুধু সেই দেশের নয়, অপরাপর দেশেরও প্রভূত মঙ্গল সাধন হইতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক কমিশনের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার কোন স্থান না থাকায় পণ্ডিত নেহেরু মর্মাহত হন। তিনি বলেন, বাস্তবতার দিক হইতে ইন্দোনেশিয়ার মত একটি স্বর্ণপ্রসূ দেশকে বাদ দিয়া এশিয়ার দূর প্রাচ্য পুনর্গঠন সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে না। পরিশেষে পণ্ডিত নেহরুর বিশেষ অনুরোধে ইন্দোনেশিয়াকে বিষয়-সূচীর অন্তর্ভুক্ত এবং সদস্যতালিকাভুক্ত করা হয়।

দূর প্রাচ্য বলিতে ভারতবর্ষ, চীন, শ্যাম, বর্মা, জাপান প্রভৃতি দেশগুলিকে সাধারণতঃ বোঝায়। ভারতবর্ষ এতকাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরাধীনতা শিকলে আবদ্ধ ছিল। দুই শত

বৎসরের নিরবকাশ শোষণের ফলে ভারতের বহু সমস্যা পর্বত প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষি সম্পর্কিত ও শিল্পগত সমস্যাগুলির কোন সমাধান না হওয়ায় ভারতের মত একটি অত্যুর্বর দেশে খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব নগ্নরূপে দেখা দিয়াছে। অথচ একটু মনোযোগ দিলেই এই সব অভাব অনটন দূর করিবার সহজ পন্থা ভারতের ছিল। তাই পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন, ভারতের কৃষি-উন্নয়নের জন্য ও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য নদনদী সম্পর্কিত যে সব বিরাট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহা অচিরে কার্যকরী করিতে হইবে। এই জন্য বৈদেশিক অর্থ, শিক্ষা ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন। তিনি আশা করেন পৃথিবীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল চিন্তা করিয়া—ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি এই সব পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তরিত করিবার জন্য অকুণ্ঠ সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। তিনি আরও বলেন যে এই সব পরিকল্পনা দ্বারা ভারতের শিল্পপ্রসারের কণ্টকাকীর্ণ পথও অনেকখানি সুগম হইবে। ইহা ছাড়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ফলে সমাজের এক শ্রেণীর লোকের প্রতি যে অন্যায় অবিচার বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার আশু প্রতিকারের প্রয়োজন। ভারত সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, এই দেশে সামাজিক অবিচার ও কুবিচারের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রতিপদে ব্যাহত হইয়াছে। সমাজের যে কোন শ্রেণী যখনই কোন অন্যায় অবিচারের গুরুভারে পিষ্ট হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে সমাজের মধ্যে শ্রেণীগত সহযোগিতার অভাব দেখা দিয়াছে। এই সমস্যাটিকে শুধু অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও মনুষ্যত্বের বিকাশের কোণ হইতেও বিচার করিতে হইবে। এশিয়াকে নূতন করিয়া গঠন করিবার জন্য সকল প্রকার শ্রেণীগত বিরোধ ও বৈষম্য অচিরে দূর করিবার গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করিতে হইবে। তাই পণ্ডিত নেহেরু কমিশনের সদস্যদের প্রতি এই আবেদন মর্মস্পর্শী ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছেন, "অর্থ-নীতি সম্পর্কিত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিটি দেশ বিরাট মানব জাতির কল্যাণের দিকটাই বেশী করিয়া অনুভব ও চিন্তা করে, তবে জাতিগত সহযোগিতার পথ অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে। কাজেই মানুষের প্রতি মানুষের যে অন্যায় অবিচার যুগ যুগ ধরিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য কমিশনের সদস্যদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা কর্তব্য। যদিও এই কমিশন কোন দেশকে নির্দিষ্ট অর্থনীতি অবলম্বন করিবার জন্য আদেশ প্রয়োগ করিবেন না, তবুও তাহাদের উপদেশ অনেক অন্যায় অবিচারের ভার লাঘব করিতে নূতন প্রেরণা জোগাইবে।"

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এশিয়ার বিচিত্র ও জটিল সমস্যা-গুলিকে বরাবরই উপেক্ষা করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডে যে সব দেশ যোগদান করিয়াছে, সেইখানেও ইউরোপের পুনর্বসতি ও পুনর্গঠন সমস্যাগুলির প্রতি আশু গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এশিয়ার সমস্যার কোন উল্লেখ করাই হয় নাই। তাহা ছাড়া আমেরিকা রচিত 'মার্শাল প্ল্যানে' ইউরোপের প্রয়োজনকেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। শোষণ ক্লিষ্ট এশিয়ার কোন তাগিদই শক্তি চতুষ্টয়ের লৌহ অর্গল দ্বারে মৃদু করাঘাত করিতেও সক্ষম হয় নাই। কাজেই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এশিয়ার ভরসা পাইবার মত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কিছুই নাই। সুতরাং এশিয়ার উন্নতি বিধানের জন্য পাশ্চাত্য জাতির পক্ষ হইতে যদি কোন পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাহার সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার এশিয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কেবল কার্য দ্বারাই এই সন্দেহের নিরসন সম্ভব। এই কমিশনের কার্যকরী সম্পাদক ডাঃ লোক-নাথন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত শিক্ষার্থী বিনিময়ের উপযোগিতার উপর জোর দিয়াছেন। সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের বিভিন্ন কমিশনের মধ্যে প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব বিদ্যমান থাকায়, অনেক সমস্যা সরল হইয়া গিয়াছে। এই কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আন্তর্জাতিক খাদ্য সমস্যা বিষয়ে দুই বৎসর মেয়াদী যে পরিকল্পনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহা অনেকখানি ফলপ্রসূ হওয়াতে আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতি অনেকটা বাধা মুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুদ্রানীতি সময়োপযোগী করিবার নিমিত্ত, বিনিময় সমস্যার সমাধানের জন্য অনুন্নত দেশগুলির শিল্প প্রসার বৃদ্ধি করিতে আন্ত-র্জাতিক মুদ্রাভাণ্ড ও ব্যাংক হইতে যথেষ্ট উপদেশ পাওয়া গিয়াছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা জানিবার জন্য প্রতিনিধি বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কার্যনীতির সাহায্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধন অনেকটা সহজলভ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই এশিয়া মহাদেশে একটি স্থায়ী ব্যবসায় উন্নয়ন কমিটি (Trade Promotion Bureau) গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। এই মহাদেশে যানবাহন সমস্যাই জটিলাকারে দেখা দিয়াছে। উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে খাদ্য চলাচলের পথে বিবিধ সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই অবিলম্বে যানবাহন সরবরাহ ও উহার উন্নতি বিধান এশিয়া মহাদেশের পক্ষে আরও প্রয়োজন। ইহা ছাড়া এশিয়ার পুনর্বসতি ও পুনর্গঠন সম্পর্কীয় বিষয়ে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহারও একটা হিসাব তৈরী করা কর্তব্য। বর্তমান অধিবেশনে আর্থিক তথ্যের অপ্রাচুর্য অনুভূত হয়। যাহাতে পুনর্গঠন কার্য অনতিবিলম্বে অগ্রসর হইতে পারে সেই জন্য তৎসম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত তথ্য সংহত করিয়া পুনর্গঠন কার্যে নিয়োগ করিবার জন্য Liasion officer-এর সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শিল্পপণ্যের বিনিময়ে কাঁচামাল প্রেরণ করার বিষয়ও বিচার্য। এশিয়া ভূখণ্ডে শিল্প প্রসারের প্রধান অন্তরায় কয়লা, ইস্পাত, যানবাহন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি. কমিশনের কার্যকরী সমিতি মনে করেন যে, জাপানে শিল্পপণ্য উৎপাদনের যে শক্তি এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহাতে এই ভূখণ্ডের পুনর্গঠন কার্যে অনেকাংশে সহায়তা করিতে পারিবে।

এশিয়ার বিপুল জল-শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারও একটি প্রধান সমস্যা। চীনের ইয়াংসি, হোয়াংহো, বোর্ণিও দ্বীপের নদনদী, ভারতের মহানদী, দামোদর, নর্মদা প্রভৃতি নদনদীর প্লাবন নিরোধ বিষয়ও এই অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে। চীনের বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি কমিটির এই অভিমত যে প্লাবন নিরোধ বিষয়টি জলশক্তির সঞ্চয়, নিয়ন্ত্রণ ও উহার পূর্ণ নিয়োগ সমস্যার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই এই বিষয়টি অপর সমস্যার সহিত বিযুক্ত করিয়া বিচার করা সমীচীন হইবে না। কিন্তু ডাঃ লোকনাথন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক দেশের প্রয়োজনানুসারে ভারতের জল-সেচ কমিশনের ন্যায় এই বিষয়ে গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন। তবে যেই সব নদনদী একাধিক দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত—তৎসম্পর্কীয় বিষয় পরস্পর আলাপ-আলোচনার দ্বারা সমাধান করিতে হইবে। মোটের উপর এই অধিবেশনকে এশিয়ার পুনর্গঠন সমস্যাগুলি নিরপেক্ষরূপে জগৎ কল্যাণের পট-ভূমিকায় বিচার করিয়া তাহার সমাধান করিতে হইবে। বহু শতাব্দী ধরিয়া বৈদেশিক শক্তি যে এশিয়া ভূখণ্ডকে শোষণ করিয়া আসিতেছে তাহার অপসারণ বিশ্ব শান্তির আনুকূল্যে প্রয়োজন। যে পর্যন্ত না পররাজ্যলিপ্সা ও শোষণনীতি বিষবৎ পরিত্যক্ত হইবে, সেই পর্যন্ত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। এশিয়ার জাগরণ সমস্ত পরাধীন জাতির নবজাগরণের সূচনা করে। কাজেই শোষিত, নির্যাতিত এশিয়ার যাবতীয় সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত। তাই নীলগিরির পাদদেশে পণ্ডিত নেহরুর কণ্ঠে নব এশিয়ার চিরন্তন বাণী জগৎ সভায় উচ্চারিত হইতেছে।—ভারত তীর্থে এই মহাজাতি সম্মিলন সফলামণ্ডিত হউক তাহা দেখিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীর আশা আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক সম্মেলনে ব্রহ্মের প্রতিনিধিবর্গ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উতকামণ্ডে এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের উদ্বোধন করিতেছেন

# 'একাফ' অধিবেশনে কি দেখলাম

কে রামা রাও

একাফ' (ECAFE) কথাটা ঠিক 'সি আই ডি' (C. I. D) শব্দটির মতো; এর আসল নামটার চাইতে নামের সংক্ষিপ্ত রূপটাই বেশি পরিচয় লাভ করেছে। আর আমি যদি বলি 'একাফ' প্রাচ্য দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে কাজও করবে 'সি আই ডি'র, তা হলে এ কথা মেনে নিতে কারো আপত্তি থাকবে না বলেই আমার বিশ্বাস। যাই হোক, এর পদপাত সন্দেহের সংগে না হলেও সতর্কতার সংগে আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ জন্ মাথাই

নীলগিরির পাহাড়গুলো একদিকে যেমন উঁচুরও সীমা নাই, অন্য দিকে তেমনি নীচুরও সীমা নাই। এমন পাহাড় আর কোথাও দেখতে পাবেন না। এক বিরাট চড়াই, উচ্চতা তার সাত হাজার ফিটেরও বেশি—'ব্লু মাউন্টেন এক্সপ্রেসে' চড়ে (এক্সপ্রেস তো ভারি, ঘণ্টায় মোটে আট মাইল চলে) সে চড়াই অতিক্রম করলে 'একাফের' অধিবেশন স্থানটি পাওয়া যায়। অধিবেশনটির বাংলা নাম হচ্ছে 'এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনীতিক কমিশনের অধিবেশন'। উঁচু-নীচু পাহাড়গুলোকে পটভূমি রেখে এই যে অধিবেশন শুরু ও শেষ হলো, তার সমস্যাগুলিও তেমনি দুরতিক্রম্য, সমাধান ততোধিক বন্ধুর। সকলকে সমান সন্তুষ্ট করে এসব সমস্যার মীমাংসা হওয়া দুষ্কর। এই জন্যে পণ্ডিত নেহরু উদ্দীপনার আমেজ মিশিয়ে বলেছেন, "অধিবেশনটি আদৌ না হওয়ার চেয়ে, হয়েছে যে, এইটেই বড় কথা।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতে উতকামণ্ড স্থানটি সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি—অবশ্য তার নিজের কাশ্মীর ছাড়া।—কিন্তু ভারতের পার্বতীয় সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি যে কোন্‌টি, এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে।

* * * * *

পৃথিবীর নানা স্থান থেকে লোক এসে এই অধিবেশনে সমবেত হয়েছিলেন, ফলে অধিবেশনটি হয়েছে সুদীর্ঘ। এখানে পুরোনো সাম্রাজ্যের পাকাপোক্ত রাজভক্তদেরকে রাতারাতি নবজাতীয়তার উদ্গাতারূপে পরিবর্তিত হতে দেখা গিয়েছে।

প্রতিনিধিদের জন্য ব্যবস্থাদি খুব সুন্দর হয়েছিল। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা এসব ব্যাপারে উপেক্ষা পেয়েই অভ্যস্ত। আলোচ্য স্থানে তাদের জন্যও ভালো ব্যবস্থা হয়েছিল। উটিতে যানবাহনের খরচা খুব বেশি। সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের কয়টি রিপোর্টার ও সংবাদদাতারা পরিপূর্ণ করে তুলিতেছিলেন নিজেদের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা। সরকারী প্রচার বিভাগের সাড়ম্বর হুসিয়ারী লক্ষ্যযোগ্য হয়েছিল।

যে স্থানটিতে অধিবেশন বসে, তার নাম আরানমোর (Arranmore)। স্থানটি তৃণ-সৌন্দর্যে ও পুষ্প-সম্ভারে রমণীয়। তদুপরি রাজোচিত কারুমণ্ডিত দারুময় প্রাসাদ। তার এখানে সেখানে জন্তুদের বহু মৃতদেহ—শিকারীদের অস্ত্রাঘাতে এরা মারা পড়ে এখন গৃহশোভা বর্ধন করছে। হরিণ, চিতা, মহিষ, বাঘ এরা
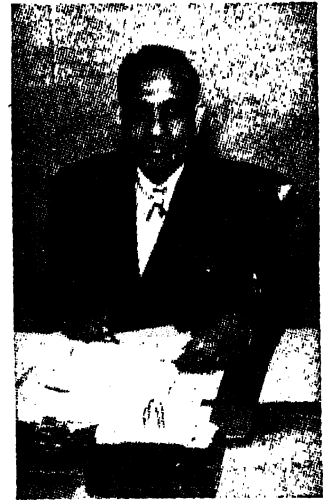
অধিবেশনের একজিকিউটিভ সেক্রেটারী—ডাঃ পি এস লোকনাথন্

বামে: যোধপুরের মহারাজার আরানমোর প্রাসাদের বহির্দৃশ্য
দক্ষিণে: "একাফ" সম্মেলনের এক্‌জিকিউটিভ সেক্রেটারী ডাঃ পি এস লোকনাথন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকা উত্তোলন করিতেছেন

"একাফ" সম্মেলনের চীনদেশীয় প্রতিনিধি ডাঃ এস এন চাও (দক্ষিণে) এবং তদীয় পত্নী

আরানমোর প্রাসাদ প্রাঙ্গণে মার্কিন রাজদূতের পত্নী মিসেস হেনরি গ্র্যাডি, এবং শ্রীযুক্তা অম্মু স্বামীনাথন

এখানে গৃহটির চারি দেয়ালে রূপের ভোজ জমিয়েছে। দেখে মনে হয়, সৎ প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে যেন এক শব্দময় বাণী উৎকীর্ণ করে রাখা হয়েছে। সেগুলো যেন এক নির্মম পরিহাসের সঙ্গে বলে দিচ্ছে, একমাত্র মৃত প্রতিবেশীরাই সৎ-প্রতিবেশী।

* * * * *

সরকারী দোভাষীদিগকে আমার কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। এখানে তাঁদের নাম বলে রাখছি। জি মাহোভস্কি এবং বি চিলিকিন। এ'রা দু'জনে বেশ গর্বের সঙ্গে আমাকে জানান যে, ...তিতে তাঁরা বিশ্ব-নিরাপত্তা পরিষদীয়। এ ছাড়া কোন সংকীর্ণ জাত তাঁরা মানতে নারাজ। একটি বক্তৃতা শেষ হবা মাত্রই সেটিকে অনুবাদ করা শুরু হয়— ইংরাজি থেকে ফরাসীতে এবং ফরাসী থেকে ইংরাজিতে। অনুবাদ হয়েছে ঠিক যন্ত্রের মতো নির্ভুল, বাহুল্যবর্জিত, দ্রুত এবং প্রাঞ্জল। এরূপ যে হতে পারে, না দেখলে আমার বিশ্বাস করা কঠিন হতো। এই অনুবাদকদের এক একজন যেন একসঙ্গে ডিক্টাফোন, গ্রামোফোন আর মেগাফোনের একত্র সমাবেশ। আমি চিলিকিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করে আপ... পারেন?' তিনি যা জানালেন তা এইঃ প্রথ... তিনি প্রত্যেক বাক্যের প্রধান প্রধান ... আইডিয়াগুলিকে টুকে নেন, তারপর ... থেকে কথার জাল বুনতে থাকেন। এর ... যে, কতখানি শ্রবণ, স্মরণ ও মনন... প্রয়োজন, বলে শেষ করা যায় না। ... যাদুকর ও চিন্তার হাউইবাজি এই দু'জনকে আমার নমস্কার।

* * * * *

প্রেসিডেন্ট ডাঃ জন মাথাই যেন ... অনুপম হয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট। তবু সবাইকে সঙ্গে মানিয়ে চলার আগ্রহ তাঁর মধ্যে সুস্প...
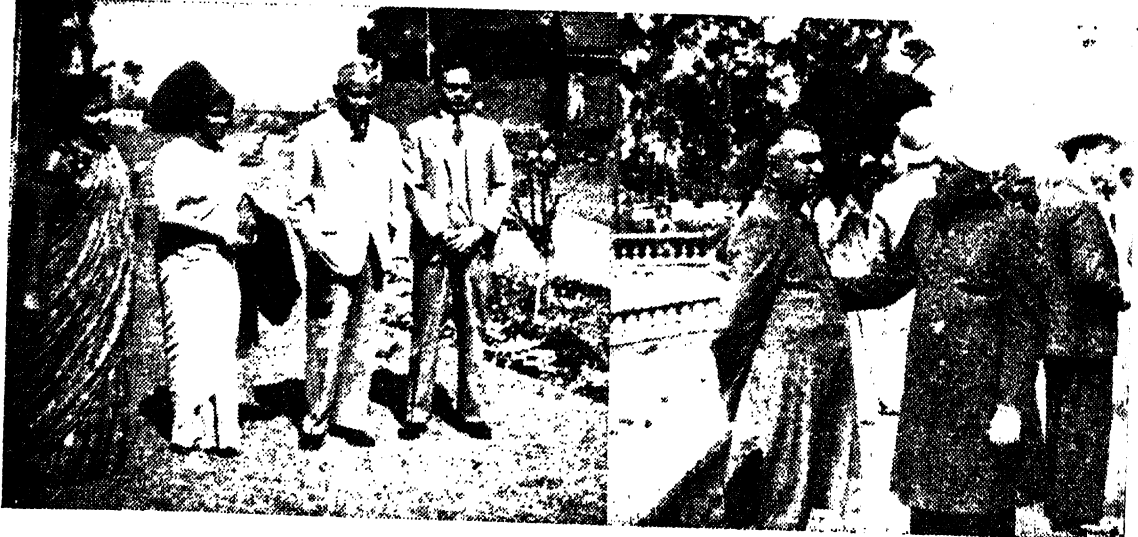
বামে : "একাফ" অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট ডাঃ জন্ মাথাই (ডানদিক হইতে দ্বিতীয়) এবং তদীয় পত্নী
দক্ষিণে : স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার, শ্রী বি শিবরাও এবং ম'সিয়ে মও (ফরাসি প্রতিনিধি)
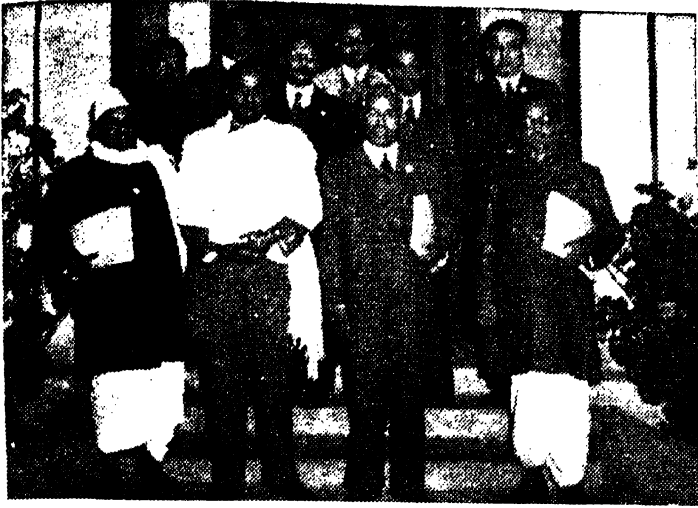
"একাফ" অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিবর্গ: সম্মুখের সারি (বামদিক হইতে) শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ জন মাথাই, শ্রীসীতারাম রেড্ডি; পশ্চাতের সারি (বামদিক হইতে) শ্রী এস চক্রবর্তী, স্যার জে সি ঘোষ, শ্রী সি সি দেশাই, ডাঃ বি নটরাজন্ এবং শ্রী এস এন রায়

তাঁর মধ্যে যেন অধ্যাপনা আর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির সমন্বয় ঘটেছে।

'একাফে'র এক্‌জিকিউটিভ সেক্রেটারী হয়েছিলেন ডক্টর লোকনাথন। তিনি যেন জ্ঞানের কল্পবৃন্দ এবং উৎসাহের ফল্গুধারা! অধিবেশনে ভারত তার কার্যভার বেশ ভাল ভাবেই বহন করেছে।

* * * * *

'একাফ' একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশ। তার মধ্যে রয়েছে নানা বিচিত্র পদবী ও পদমর্যাদার লোক, যথা, সদস্যবৃন্দ, এসোসিয়েটেড সদস্য-বৃন্দ, উপদেশকবৃন্দ, সম্পাদকবর্গ, স্টেনো-গ্রাফারের দল (এ দলে মহিলাই অধিক); আর আছে কমিটি, সাব-কমিটি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের সব্বাইর পদার্পণে উটি ধন্য হয়েছে। তাঁদের সকলেই খেটে খুটে যার যার কাজ করেছেন বলতে পারিনে; কেউ কেউ ছিলেন যেন কাঠের পুতুল, এককোণে নীরবে উপবিষ্ট। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হলেও, যাঁরা প্রকৃতই অফিসিয়াল এডভাইজাররূপে এসেছেন, সামনের সারিতে উপবিষ্ট তাঁদের প্রভুদের নথিপত্র সরবরাহের কাজ ও'রা ভালই করেছেন।

"একাফ" সম্মেলনে যোগদানার্থ উটি গমনের প্রাক্কালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারিগণের সহিত কোয়েম্বাটোরে ভারতীয় বিমান শিক্ষার্থীদের পরিদর্শন করেন

এই সম্মেলনের অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জনসাধারণের মণ্ডলামণ্ডলের সহিত দীর্ঘকাল নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সম্মেলনের বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ভাবগ্রহণ অতি সহজে করেছেন। এশিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণে এশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য ভারতের যে নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তারই প্রেরণা নবনির্মুক্ত জাতির কর্ণে তিনি শুনিয়েছেন।

* * * * *

বাহিরের প্রতিনিধিদের মধ্যে চীন থেকে আগত ডাঃ. সি এম লী আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছেন। তাঁর প্রাচীন স্বদেশ যেমন জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনিও তেমনি জ্ঞানপ্রবীণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তিনি সুপ্রবীণ, জ্ঞানে সর্বজন শ্রদ্ধেয়।

রাশিয়ার প্রতিনিধি নিকভ একজন প্রকৃত অভিজাত। তাঁর পা থেকে চুলের ডগাটিতে পর্যন্ত আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। তিনি স্ট্যালিনের দেশ থেকে এসেছেন এটুকু জানা না থাকলে যে কেউ তাঁকে দেখে মনে করবে তিনি বুঝি 'আরানমোর' প্রাসাদটির মালিক। তিনি ইংরাজি জানেন, কিন্তু মর্যাদার খাতিরে, ইংরাজির চাইতে তার ফরাসী অনুবাদটাকেই তিনি বেশি পছন্দ করেন। প্রেস-গ্যালারিতে জনৈক বন্ধুর কাছে শুনলাম, তিনি ফরাসী প্রতিনিধির চাইতেও ভাল ফরাসী বলতে পারেন।

* * * * *

মার্কিন প্রতিনিধি ডাঃ গ্র্যাডি একজন খাঁটি মার্কিনী। সমাগত প্রার্থীদের মধ্যে তিনি যেন দাক্ষিণ্যের আমেজ মিশিয়ে অভক্ষ্য নীতির গ্রাস তাদের গলাধঃকরণ করাবার প্রয়াস পাচ্ছেন, তাঁর বক্তৃতায় এইটিই প্রকাশ পেয়েছে বেশি।

* * *

পাকিস্থানের প্রতিনিধি ডাঃ হায়দার যে স্থানটিতে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান সম্বন্ধে তিনি যেন একটু দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন, স্থানটি হচ্ছে তাঁর পুরোনো আলিগড় লেকচার রুম। "নম্বর এক," "নম্বর দো" বলে তিনি পয়েন্টগুলোর উপর টোক্কর দিচ্ছিলেন। এই সম্মেলনে পাকিস্থানেরও স্থান ভারতের সঙ্গে একই নৌকোয়; অথচ ভারত বিভক্ত করা হ'ল।

* * * * *

বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার এণ্ডরু ক্লোকে নিয়ে কি যে করব, ভেবে পাচ্ছি নে। তিনি কি ভাবে শুরু করেন আর কি ভাবেই বা শেষ করেন, তার কিছুই বুঝতে পারা যায় না। বিশ্বজনীনতার নূতন মদ্য বুঝি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের পুরোনো বোতলে ঠাঁই খুঁজছে।

অধিবেশনের কার্যাবলীকে বলা যায় বিরাট একটা "কেমোফ্লেজ"। প্রত্যেকেই এসেছেন নথিপত্র প্রস্তুত করে, তার থেকে ঢেলে দিচ্ছেন যেন নিষ্প্রাণ নির্জীব সব নানা ধরণের সমাধান সূত্র। আলোচনা যা হয়েছে, নিতান্ত গম্ভীর ও নিরস ধরণের। কারো মুখে সহজ হাসি নেই; জোর করে আনা হাসি। অধিবেশনের প্রস্তাবগুলো দীর্ঘ কি সংক্ষিপ্ত তা যেমন বোঝার উপায় নেই, তেমনি সংশোধন যা হল তা কেবল মৌখিক না পাকা তাও ধরবার জো নেই। কবির ভাষায়, "এক জগৎ মরে গিয়ে, তার মধ্যে নূতন জগৎ জন্ম নেবার চেষ্টা করছে," এমন কোন কিছু দেখছি বলে সেদিন 'একাফে'র অধিবেশনে বসে মনে আনতে পারিনি।

["একাফ" (ECAFE — Economic Conference for Asia and Far East) বা এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনীতিক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন সম্প্রতি উতকামণ্ডে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর ১৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ সম্মেলনে যোগদান করিয়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন।

১লা জুন অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উহার উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ জন্ মাথাই। পণ্ডিতজী তাঁহার সুদীর্ঘ উদ্বোধন-বক্তৃতায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির শিল্পে অনুন্নত ও দরিদ্র হওয়ার কারণ এবং উহাদের উন্নয়নে বিশ্বের সম্মিলিত জাতিনিচয়ের কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

...অধিবেশন বারো দিন পর্যন্ত বসিয়া ১২ই জুন পরিসমাপ্ত হয়।

কমিশনের পরবর্তী অধিবেশন, অর্থাৎ চতুর্থ অধিবেশন আগামী বৎসর এপ্রিলের মাঝামাঝি চীনে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। উহাতে প্রধানতঃ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কৃষিসংক্রান্ত সমস্যার পর্যালোচনা হইবে।]

# হিন্দুসমাজ ও তাহার ইতিহাস

শ্রীনির্মলকুমার বসু

### আদমসুমারির হিসাব

ভারতবর্ষে লোকগণনা ১৮৭২ সালে শুরু হয়। কিন্তু সে বছর গণনার কাজ বড় অসম্পূর্ণভাবে করা হইয়াছিল। ১৮৮১ সাল হইতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই গণনা ভালভাবে করা হইতেছে। তাহার মধ্যে ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ এই চার সালে আমরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ প্রাপ্ত হই। ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের সম্বন্ধের প্রথম হইতে যদি অধিকৃত স্থানগুলিরও আদমসুমারী পাইতাম, তবে গত দুইশত বৎসরে ভারতবর্ষের সমাজের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহারও একটি পরিপূর্ণ চিত্র আঁকা সম্ভব হইত। যে সামান্য ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়, এইবার তাহারই পর্যালোচনা করা যাক।

শ্রীযুক্তা প্রীতি মিত্র নৃতত্ত্ববিভাগে গবেষণাকালে যে মূল্যবান্ কাজ করিয়াছিলেন, সেই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির উপরেই বর্তমানে আমাদের নির্ভর করিতে হইবে।

### বৈদ্য—স্ববৃত্তি—চিকিৎসা

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ৩১,৩৫৭ | ৮৮,২৯৮ | ১,০২,৮৭০ | ১,১০,৭৩৯ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে, | | ২১,১৩৩ | ২৪,১১৪ | ২৬,২৯২ |
| যাহারা রোজগার করে, তাহাদের শতকরা হার | | ২৩'৯৩ | ২৩ ৪৪ | ২৩৮৩ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ৪৫'৬২ | ৫৩'২১ | ৫৭'৫২ | ৫১.৭৯ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৩৬'১০ | ২০'১১ | ১৫'০২ | ১৮'৮০ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ৭':৬৩ | ১২'৪:৮ | ৬'০৪ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ২'১৩ | ১'২২ | ১'৮৫ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) | | ৫৪'৬৩ | ৪৬'৮১১ | ৪৯'৪০ |

### বারুই—পানের চাষ ও ব্যবসায়

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ৭২,১৮৩ | ১,০১,১১২ | ১,৮৫,৫২৬ | ১,৯৫,১৩৯ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ৩০৯৮৪ | ৫৬৪২২ | ৫০৭৫৪ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৩০,৬৮ | ৩০,৪২ | ২৬,০১ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ১২'৯০ | ১৫'২৯ | ২০'৩২ | ১৭'৩৯ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৯৪'৯৬ | ৬১'১৮ | ৪৪'১৫ | ৫৪.৫৮ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ৭৫'৩১১ | ৭০'৭৪ | ৭৩'৬৮ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ১'৯৫ | ৩'৪৬৭ | ৩'৮৮ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) | | ২'০৭ | ৩'৭৫৭ | ৮'৬৭০ |

## বাউরি—স্ববৃত্তি—মজুরি

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ২,৬০,৪৯৪ | ২,৫৭,৬৬৯ | ৩,০৩,০১৩ | ৩,৩১,২৩৮ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ১,৬১৯১৪ | ১৬৪,৮৮১ | ১,৪৩,৪৬৮ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৬২·০২ | ৫৬·৪৩ | ৪৩·৩২ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ০·৩৮ | ০·৯৯ | ০·৫৯ | ০·৭৭ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৩৭·২৫ | ৫২·০২ | ৬৩·১৬ | ৪০·৭৯ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ৫৯·৫২ | ৭৯·১৭ | ৬৫·৯৪ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৮·২১ | ২·৯৯৭ | ৪·০৭ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) | | ০·০৭৪৬ | ০·০৪৬ | ০·৭৮১ |

## ব্রাহ্মণ—স্ববৃত্তি—যজন, যাজন, অধ্যাপন ইত্যাদি

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ১০,১৯,৩৪৮ | ১১,৯১,৮৬৭ | ১৩,১৪,৪৩০ | ১৪,৫৬,১৮০ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ৪,০০০৬৪ | ৪,২৫,১৭৩ | ৪,১৭,১২৭ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৩৩·৫৮ | ৩২·৩৬ | ২৮·৬৮ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ৩৫·৮৪ | ৩৯·৮৫ | ৪৩·১৫ | ৩৭·২৮ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৩৩·৫৪ | ২১·৭৯ | ১৪·৫৭ | ১৬·৭৭ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ১৯·৩৮৮ | ২২·৬৩১ | ১৫·৩৬ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ২·৯২ | ৩·৫৭ | ৪·৫০ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) | | ৪৩·৭১২ | ৩৪·৯৬ | ৩০·৭৬ |

## চামার ও মুচি—স্ববৃত্তি—চামড়া আলানো, পাকানো ও চামড়ার জিনিষ তৈয়ারি

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ৯৬,৩৯১ (শুধু চামার) | ৫,৩৩,১৩১ | ৫,৬৪,৮৭৯ | ৫,৬৪,৬৮২ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ২,৩৮,০৫৮ | ২,৪৪,১৪৫ | ২,১৭,৩৬৬ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৪৪·৬৭ | ৪৩·২১ | ৩৮·৫০ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ৩·১৯ | ২·৯৭ | ৩·১১ | ৪·৫২ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ২৩·২৬ | ৩৩·৭৭ | ২৩·৯৪ | ২৪·৫৯ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | ৩৩·৪৭ | ৩২·৩৩ | ২৮·৬০ | ৩২·৮৮ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৩৭·০৬ | ৪২·৮৪ | ৪৩·১৩ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) | | ০·২৫৪ | ০·৪৪৯ | ১·০৭১ |

## ধোপা—স্ববৃত্তি—কাপড়কাচা

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ১,৬২,৪১০ | ২,০৪,১৩৮ | ২,২৭,২৯৫ | ২,২৯,৬০৮ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ৮০,৪২৯ | ৮৮,৬৯১ | ৭৩,৪৫৬ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৩৯·৪২ | ৩৯·০১ | ৩২·০০ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ৫·৪৯ | ৫·৫১ | ৭·৭৮ | ৮·১১ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৫৯·৭৭ | ৫৩·৯৩ | ৪২·৮১ | ৪৮·৭১ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ৩৩·৫০ | ৩৬·৩৩ | ২৯·৬৪ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৩·৮২ | ৪·২১ | ৫·৪১ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর, ইত্যাদি) | | ১·১৪২ | ০·৮৪৯ | ৩·০৬৯ |

## গোয়ালা—গোপালন ও দুধের ব্যবসায়

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ৪,৯৪,৬৯৯ | ৫,৮৩,৭৯০ | ৫,৮২,৫৯৭ | ৫,৯৯,২৮১ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ২,৫১,৮২৯ | ২,৩৯,৭২৯ | ২,১৭,৪৩৮ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৪৩·১৩ | ৪১·১০ | ৩৬·২৮ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ৬·৩৩ | ৭·৬৮ | ১০·৫৭ | ১০·১৭ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৪১·৪৫ | ৩১·৩৯ | ২১·৩০ | ২৪·৭৭ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ৪১·০০ | ৪২·২১ | ৩৭·৪৯ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৬·৪৭ | ৭·৪৩ | ৭·২৮ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর, ইত্যাদি) | | ১·৬৫০ | ১·৮৭৩ | ৫·৪২১ |

## যুগী—স্ববৃত্তি—তাঁতের কাজ

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ৩,৭৩,১০৫ | ৩,৪২,৮৩৩ | ৩,৬৫,৮৯১ | ৩,৮৪,৬৩৪ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ১,১৯,২৩৪ | ১,২৭,৫৭৭ | ১,০৭,৯৫২ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৩৪·৭৭ | ৩৪·৮৬ | ২৮·০৮ |
| শিক্ষিতের হার শতকরা | ৭·৬১ | ১২·৯৭ | ১৫·৪৪ | ১১·৩৬ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৫৩·৮৮ | ৩৬·০৯ | ৩৬·২৫ | ৪০·৮২ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ৩২·৯৩ | ৩২·৬২ | ২৪·০৯ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৪২·৪৭ | ৪০·২৩ | ৪৯·৪১ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর, ইত্যাদি) | | ২·৭১২ | ৩·০৫৬ | ৬·৮৩৪ |

## নমঃশূদ্র—স্ববৃত্তি=চাষী এবং নৌকার মাঝি

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| মোট জনসংখ্যা | ১৭,৯৬,২২০ | ১৮,২৬,১৩৯ | | ২০,৯৪,৯৩৬ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ৬,০৯,২৫৫ | | ৫,৫২,৭৯৬ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৩৩ ৩৬ | | ২৬·৩৮ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ৩·৩০ | ৪ ৯১ | ৭·৫১ | ৬·৬৪ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৮৮·০২ | ৭৫·১৯ | | |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ৭৭·৪৯ | | ৭০ ৪৫ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৭·২০ | | ৪· ৯৪ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপর নির্ভর, ইত্যাদি) | | ১·০৯২ | | ৬·০২৮ |

## নাপিত—স্ববৃত্তি=ক্ষৌরকর্ম

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| মোট জনসংখ্যা | ৩,৮৫,৯৮৪ | ৪,২৭,৪৮৮ | ৪,৪৪,০২৩ | ৪,৫১,০৮৫ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ১,৫০,৮৬০ | ১,৫১,০৩৭ | ১,৩৩,৮৯৮ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৩৫ ৩০ | ৩৪·০২ | ২৯ ৬৮ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ৯·৭৯ | ১১·০৪ | ১৩·৪৭ | ১১·৫৮ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৬০·৫৫ | ৪৮·৪১ | ৩৬·৭০ | ৪৫·৪১ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ৩৩·৯৫ | ৩২ ২৯ | ২৭·০১ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৪·৮১ | ৪ ২১ | ৫ ৬৪ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর, ইত্যাদি) | | ৩ ২৮১ | ৩ ২৩০ | ৭·৪৪৯ |

## বাগদি—বা ব্যগ্রক্ষত্রিয়, স্ববৃত্তি—চাষ ও মাছধরা

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| মোট জনসংখ্যা | ৭,০৩১৪৭ | ৮,৪৭২২৮ | ৮,৮৬৮২১ | ৯,৮৭৩১৫ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ৩৯২,৪৭২ | ৩৭১,৪৭৭ | ৩৬৬৪৫৫ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৪৬·৩৩ | ৪৪ ১৫ | ৩৭·১৩ |
| শিক্ষিতের হার শতকরা | ১·৫৭ | ১·৯১ | ২·১৩ | ১·৯২ |
| স্ববৃত্তি শতকরা | ৭০·১৩ | ৭১·২৮ | ৪২ ২৮ | ৬৯·৭৯ |
| চাষ মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | | (?) | |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৭৩·৪১ | ৬৮ ৬৬ | ৮১·৭৪ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি), শতকরা | | ১০·০৫<br>০·২৪৭ | ৯·২৩<br>?<br>০·৩৫৫ | ৫·০৩<br>১·১৭১ |

## কামার—স্ববৃত্তি=লোহার কাজ

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ১,৭৬,৮৭৩ | ২,৩৮,৫৯৫ | ২,৫৬,৮৫৩ | ২,৬৫,৫২৬ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ৮৬,৯০২ | ৮৯,৬৩৩ | ৮১,৭১০ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৩৬·৩৮ | ৩৪·৫৯ | ৩০·৭৭ |
| শিক্ষিতের হার শতকরা | ১০·৩৪ | ১৪ ৯৮ | ১৭·৮৮ | ১৪·৯১ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৪৭·৩৫ | ৫৭·৪৮ | ৩৪·১১ | ৪৩·৭৬ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ১৯·৩০ | ২৬·০২ | ২১ ৮১ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৬৭·৫৩ | ৫২ ০৪ | ৫৬·১১ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর, ইত্যাদি) | | ১·৭৪৫ | ১·২৯০ | ৫·৩২১ |

## কায়স্থ—স্ববৃত্তি=হিসাবপত্র বা অন্য লেখার কাজ

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ৮,৪৫,৯৬৮ | ১০,২৩,৭৩৪ | × | ১৫,৫৮,৪৪২ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ৩,০৫,১৯০ | | ৪,১১,৬৫৭ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার শতকরা | | ২৯·৮০ | | ২৬·৪২ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ৩০·৮৬ | ৩৪·৭৫ | ৩৬·৫৭ | ৩২·৯০ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | | ১০·৫৪ | | ১২·৬৪ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | | ৩৩·৮৩ | | ২০ ২৩ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৫·০৯ | | ৫·১৬ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) | | ২১·৩৫ | | ২২·৪২ |

## কুমার—স্ববৃত্তি=হাঁড়িকুঁড়ি গড়া

| সাল | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ১,৯৫,৫৩৩ | ২,৭৮,২০৬ | ২,৮৪,৫১৪ | ২,৮৯,৬৫৪ |
| তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে | | ৯২,৬৫৯ | ৭৫ ৩২৬ | ৫৩,৫০৬ |
| যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা | | ৩৩·৩২ | ২৬·৪৮ | ১৮·৪৭ |
| শিক্ষিতের হার, শতকরা | ৬·৫৬ | ৮·০৪ | ১০·১৮ | ৯·৬৬ |
| স্ববৃত্তি, শতকরা | ৭৫·১৬ | ৭৩·৮০ | ৬১·৬৯ | ৫৮·৮৭ |
| চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা | ১৬·৬০ | ১৩·৪০ | ১৯·৭৬ | ১৯ ৮৯ |
| শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা | | ৭৮·১৪ | ৬৪·৫০ | ৬৫·৬৬ |
| মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা (চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) | | ০·৮৫৭ | ১·২৮৮ | ৪·২৫৭ |

পাঠক পূর্বে উদ্ধৃত তালিকাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবেন।

প্রথম, যে সকল জাতির উল্লেখ ১৯০১ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত আদমসুমারির মধ্যে পাওয়া যায়, অতএব যাহাদের সম্বন্ধে কোনও বিশ্লেষণ করা সম্ভব, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করা চলে। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে শিক্ষিতের হার বেশি। তাহাদের মধ্যে স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত লোকের হার কম, মধ্যবিত্তের সংখ্যা অধিক। এক, কায়স্থের মধ্যে কিছু চাষের প্রাদুর্ভাব আছে, নয়ত চাষীর দিকে ব্রাহ্মণ বৈদ্যে অগ্রসর হয় নাই। শিল্পের দিকেও ইহাদের গতি অতিশয় ক্ষীণ।

যে সকল জাতির মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব ক্ষীণ, তাহাদের গতি দুই মুখে অথবা তিন মুখে হইয়াছে। চামার ও মুচি স্ববৃত্তিতে মাঝারি সংখ্যায় রহিয়াছে, চাষীর সংখ্যাও তাহাদের মধ্যে মন্দ নয়। তাহারা হাতের কাজ করিত, স্ববৃত্তি কমিয়া আসায় অন্যান্য হাতের কাজের দিকে ঝুঁকিবার ফলে, তাহাদের মধ্যে শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকের হার ঊর্ধ্বমুখী হইয়া আছে। কামারদের মধ্যে শিক্ষিতের হার অপরাপর শিল্পীকুল অপেক্ষা অধিক হওয়ার জন্য এবং তাহাদের দক্ষতার জন্যই স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠান কমিয়া আসিলেও তাহাদের অন্য শিল্পবৃত্তির দিকে যাওয়া সহজ হইয়াছে।

সমাজের সেবক, ধোপা বা নাপিতের মধ্যে স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত লোকের হার এখনও কম নয়। চাষের দিকেও তাহাদের গতি মধ্যম, কিন্তু শিল্প বা মধ্যবিত্ত বৃত্তিগুলির দিকে তাহাদের গতি ক্ষীণ।

বাগদি, বাউড়ি অথবা নমঃ প্রভৃতি জাতি পূর্বেও যেমন অশিক্ষিত ছিল, আজও তেমনই রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে চাষ ও মজুরিতে অধিষ্ঠিতদের সংখ্যা বেশ উচ্চ। তাহাদের মধ্যে মধ্যবিত্তের বৃত্তি অথবা শিল্পের অভিমুখে গতি অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

মোটের উপর বলা চলে যে, ইংরেজী শাসন এবং ধনতন্ত্র বিস্তারের ফল বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। যাহারা পূর্বেও চাকরি করিত, আজও তাহারা চাকরি করিতেছে। যে সকল শিল্প ধনু-তন্ত্রের আঘা[ত]... পর্যুদস্ত হইয়াছে সেই সকল জাতির ম[ধ্যে] পরিবর্তনের মাত্রা বেশী। বিদেশে চামড়া চা[লান] দেওয়ার ফলে মুচির বৃত্তি অনেকাংশে [...] হইয়াছে, তাঁহারা স্ববৃত্তি খানিক অংশে ত[্যাগ] করিয়া চাষ বা অন্য শিল্পে মজুরি করিতে[ছে।] বিদেশী ও স্বদেশী মিলের সহিত প্রতিযোগি[তা] আরম্ভ হওয়ায় যুগীকে চাষের দিকে ঝুঁকি[তে] হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাঁতের কাপ[ড়ের] প্রয়োজনে তাহারা স্ববৃত্তি সম্পূর্ণ পরি[ত্যাগ] করে নাই। কিন্তু কুমারের হাঁড়িকুঁড়ি স[...] হওয়ায় বিলাতী শিল্পের আঘাতে তাহা আ[...] বিধ্বস্ত হয় নাই; বহু কুমার স্ববৃত্তির দ্বা[রা] জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

সমগ্র সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক[রিয়া] আমরা যে শিক্ষা লাভ করিলাম, এবার বি[ভিন্ন] জাতির আধুনিক কালের আভ্যন্তরীণ ইতিহ[াস] পর্যালোচনা করিয়া আমরা হি[ন্দু] সমাজের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমা[দের] জ্ঞান আরও দৃঢ় করিব।

(ক্রমশ[ঃ])

**Education and The Draft Constitution of India:** By Anathnath Basu. Indian Associated Publishing Co. Ltd., Calcutta. Pp. vi & 24. Price Re. 1 only.

ভারতের খসড়া রাজ্য শাসন বিধিতে শিক্ষার স্থান যা দেওয়া হবে বলে প্রস্তাব করেছেন, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থাপক সভার স্বদেশবাসী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ, আলোচ্য পুস্তিকায় তার একেবারে মূলে ঘেঁসে প্রশ্ন তুলেছেন বাঙ্গলা দেশ থেকে অধ্যাপক অনাথনাথ বসু। অনাথবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেণিং কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, তাছাড়া বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও ব্যাপক ও বিশেষ অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎভাবে লাভ করার সুযোগ তাঁর যথেষ্টই হয়েছে। অতএব এ আলোচনার যোগ্যতা তাঁর অবিসংবাদিত। স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমস্যা ও দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষাবিধি সম্পর্কে অনাথবাবুর মতো দেশের অন্যান্য বিচক্ষণ শিক্ষাবিদরা সর্বসমক্ষে ঠাণ্ডা মাথায় যতই আরো আলোচনা করবেন আমাদের দুর্ভাগা দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল, এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়।

অন্তত প্রাথমিক শিক্ষায় সমগ্র দেশবাসীর মৌলিক অধিকার (fundamental right) থাকবে, প্রস্তাবিত শিক্ষাবিধিটিতে একথা সুস্পষ্ট ভাষায় এবং সুনির্দিষ্ট বিধি অনুসারে বলা উচিত ছিল—সব সমালোচনার মধ্যে এইটিই অনাথবাবুর প্রধান সমালোচনা। বিধি-রচয়িতারা এখনো তা করেন নি। হয়তো ক্রমে ক্রমে করবেন। দলগত রাষ্ট্র শাসনের যুগে (Parliamentary Party rule) ষোলো আনা রাষ্ট্রের হাতেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সঁপে দেওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা সেটা গভীরভাবে ভেবে দেখবার জিনিস। আজকের দিনে যা "অধিকার" কালকের দিনে তা "দায়" হয়ে দেশের আপামরসাধারণের ঘাড়ে চেপে না বসে, সে-দিকটাও [ভা]ল করে বোঝা দরকার। ইউরোপে এ-ধরণের দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। 'স্টেট্' জিনিসটাই ইউরোপের সৃষ্টি, হুবহু তারি ছাঁচে আমাদের শাসনব্যবস্থাকে যাঁরা গড়ছেন তাঁদের এদিক থেকে সাফাই গাইবার কিছুই থাকতে পারে না। তবে আমরা যারা বিদেশের রাশি রাশি রাজনীতির শুকনো পুঁথির পায়ে আপনাকে এখনো অন্ধভাবে বিকিয়ে দিতে রাজী নই, যারা এখনো আশা করি অন্তরের সঙ্গে যে, ভারতবর্ষ তার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একদিন হয়তো নূতন যুগের উপযোগী কোন নূতনতর শাসনবিধি রচনা করবে যার থেকে ইউরোপেরও কিছু নেবার থাকতে পারে—এ ধরণের তর্ক আলোচনাকে মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম ন্যায়ের তর্কের মতো তাদের নিরর্থক বোধ হতে থাকে। হয়তো আমাদের ফেলা হবে অকেজো স্বপ্নবিলাসীদের দলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদেরি দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং শেষ জীবনের গান্ধীজীও।

তবু, সকলকেই অনাথবাবুর ছোট্ট এই বইখানা পড়ে দেখতে অনুরোধ করি, যে সমস্যা একেবারে দোরে এসে আঘাত দিচ্ছে আমাদের দিল্লীর প্রতিনিধিদের সম্পাদনায়, সেই সমস্যাই সাধারণের পক্ষে আজ অত্যন্ত কাছের সমস্যা—ভারতবাসী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই সে সম্বন্ধে চিন্তা ও বিচার করতে হবে। দেশের সর্বসাধারণের কাছে তাঁদের চিন্তার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবেই রয়েছে, সে-দায়িত্ব সমাজের সহস্র নিরক্ষরের বুকে বসে তাদেরই অন্নে-রক্তে শিক্ষালাভ করার দায়িত্ব, সমাজে নিজেকে উচ্চ ধরে অভিমান করার দায়িত্ব।

বইটির ছাপা পরিচ্ছন্ন ও প্রায় নির্ভুল; [...] প্রকাশকদের সুরুচির পরিচয় পেলাম। ১০২[...]

**পুরবী**—পাক্ষিক পত্রিকা। কার্যালয়, [...] প্রেস, ১৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূ[ল্য] বার্ষিক সডাক ৪৷৽, প্রতি সংখ্যা তিন আনা।

কয়েকটি গল্প, প্রবন্ধ এবং খেলাধু[লা ও] সিনেমার খবরাখবর এই সংখ্যাটিতে স্থান পাই[য়াছে।] আমরা পত্রিকাখানার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন ক[ামনা] করি। ১২[...]

**কলিকাতা (সাপ্তাহিক পত্র)**—স[ম্পাদক] শ্রীসুনীলকুমার ধর। কার্যালয় ৬৬, কলে[জ স্ট্রী]ট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক বারো টাকা; প্র[তি] সংখ্যা চারি আনা।

নূতন সাপ্তাহিক "কলিকাতা"র প্রথম [...] প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। [...] কলিকাতা শহরের রূপরস ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে [...] দিবার উদ্দেশ্যেই পত্রিকাখানার সূত্রপাত। আ[লোচ্য] সংখ্যাটিতে কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধে শহরের [...] সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। আমরা পত্রিকা[র] সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

১২২।৪

**কলির দধীচি**—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী [...] প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০[...] কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টা[কা।]

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতর্পণমূলক [...] কবিতা, তাঁহার মূল্যবান উপদেশরাজির সার [...] জীবনপঞ্জী, সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গান্ধীজীর [...] সংগীতাবলী দ্বারা পুস্তকখানা সমৃদ্ধ। [...] চক্রবর্তী মহাশয় বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপরিচি[ত।] তাঁহার প্রণীত কলির দধীচি মহামানব [...] গান্ধীজীর জীবনাদর্শের গরিমায় জাতির স[...] সাধনে সাহায্য করিবে। আমরা এমন [...] বহুল প্রচার কামনা করি। পুস্তকের ছাপা, [...] সুন্দর এবং প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য। ১০৪[...]

"I want the culture of Bengal not to be locked inside a province but to spread through out India"—

বলিয়াছেন চক্রবর্তী রাজাজী। এই উক্তিতে আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে—রাজাজীর জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হইবার আশংকা আছে।

* * * *

শ্যামলাল ট্রামে চড়িয়াই একটি সংবাদ গড়গড় করিয়া পাঠ করিয়া যাইতে লাগিল—"কলিকাতায় প্রত্যহ ট্রামে-বাসে বিহার বিরোধী বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হইতেছে, সর্বত্র বিহারীরা প্রহৃত, লাঞ্ছিত এবং দূর দূর করিয়া বিতাড়িত হইতেছেঃ—আমরা তার মুখের দিকে বিস্ময়ের মত তাকাইতেই সে বলিল—"সংবাদটি দিচ্ছেন Searchlight পত্রিকার কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা। Searchlight ছাড়া কি এমন সংবাদ চোখে পড়ে? খুড়ো চোখ বুজিয়া সংবাদটা শুনিতেছিলেন, এইবার তাকাইয়া বলিলেন—"তা পড়ে, তবে রাঁচী বা নওগাঁর সঙ্গে যোগাযোগ থাকা চাই।"

* * * *

শুনিতেছি ট্রাইবুনাল নাকি ট্রাম কোম্পানীর ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব আংশিকভাবে সমর্থন করিয়াছেন। "সমূহ ক্ষতি স্বীকার করে কোম্পানী যে আমাদের এতদিন গাড়ীতে ঝুলে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন সেই জন্য আমরা কোম্পানীর গাড়ী হ্রাসের অকথিত প্রস্তাবটা পুরোপুরিই সমর্থন করছি"—বলিলেন আমাদের প্রাচীন প্যাসেঞ্জার বিশু খুড়ো।

* * * *

মুর্শিদাবাদে যে হতভাগ্য প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আত্মহত্যা করিয়াছেন তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা নাকি হইতেছে। খুড়ো বলিলেন—"কতকদিন আগে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা আশীজন বুদ্ধির পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন—এই মৃত্যু হয়ত তারই পুরস্কার"—বলিতে বলিতে খুড়োর মুখখানা ক্ষোভে ও রোষে বিকৃত হইয়া উঠিল—তাঁর এ চেহারা খুব কমই দেখা যায়।

* * * *

সাঁতরাগাছির সন্নিকটে একটি শহর গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা চলিতেছে। শ্যাম বলিল—"প্রস্তাবটা নিশ্চয়ই উত্তম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহর হবে তো, না শহর আর সাঁতরাগাছির ওল দুই-ই খুইয়ে বসবো?"

* * * *

* * * * *

পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা কেহ যেন বাস্তু ত্যাগ করিয়া চলিয়া না যান—এই কথা কয়টি বলিতে গিয়া সুরাবর্দী সাহেব
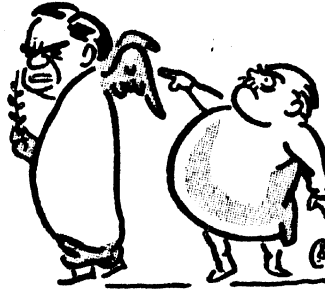
খাজা সাহেবের বিরাগভাজন হইয়াছেন। আপনারা সব ভিটামাটি ছাড়িয়া পাকিস্তান ত্যাগ করুন এই কথা বলিয়া সেই খাজা সাহেবের অনুরাগভাজন হইয়াছেন কি না সে সংবাদ এখনও পাই নাই।

* * * * *

"EAST Pakistan's need for medicine" একটি সংবাদের শিরোনামা। "কিন্তু রোগের নিদানটা ঠিক্ মত করা হয়েছে তো? একটা গানে শুনেছিলাম কে যেন কি দেখে পাগল হয়ে বলেছিল—'ঔষধে আর মানে না'"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

শুনিলাম পাকিস্তানে নাকি "History of Division" ছাপার ব্যবস্থা হইতেছে। খুড়ো বলিলেন—"তার চেয়ে Geography of Division ছাপলেই ভালো হতো। Historyটা আবার repeated হয় কি না, তাই তো ভয়!"

* * * *

শুনিলাম উই-এর উৎপাত বন্ধ করার জন্য নাকি বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। সংবাদ সত্য হইলে—কর্পোরেশন নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিবেন, কেন না বেয়াড়া ফাইলগুলি উইর হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়ার নজীর কর্পোরেশনের আছে!

* * * *

রয়টার সংবাদ দিতেছেন—ভিয়েৎনামে নাকি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। খুড়ো বলিলেন—"ভিয়েৎনাম সরকার কোলকাতার কাগজে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন দিলে পারেন, এখানে অনেক বেকার ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে, তাদের সবাই মন্ত্রিত্ব-পদের সম্পূর্ণ উপযোগী:—আমাদের সর্বাত্মক অভাবের মধ্যেও মন্ত্রীর অভাব এখনো হয়নি!"

* * * *

আফ্রিকার সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে স্মাট্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন—"জনসাধারণ আর পুরাতন মুখ, পুরাতন কণ্ঠস্বর, পুরাতন হাসি, পুরাতন কথা পছন্দ করে না, নির্বাচনের এরকম ফলের একমাত্র কারণ তাই। খুড়ো চোখ বুজিয়া গান ধরিলেন—"ছিঃ ছিঃ কেমন করে পাসরিলি রাই-মুখ ইন্দু"!

* * * *

বধিরদের শুনিবার সুবিধার জন্য নাকি লণ্ডনে প্রায় চল্লিশ হাজার যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর ভারতে

থাকিয়া না শুনিবার ভান করিতে করিতে এ'রা বুঝি এখন সত্যি সত্যি বধির হইয়া গিয়াছেন—বেচারীরা!

## ভিয়েৎনাম

গত ৫ই জ‍ুন আলং উপসাগরের তীরে ফরাসী য়‍ুনিয়নের মধ্যে ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে এক চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফরাসীদের পক্ষ থেকে ইন্দোচীনের ফরাসী হাই কমিশনার ম'সিয়ে বোলার্ট এবং ভিয়েৎনামের পক্ষ থেকে আনামের প্রাক্তন সম্রাট বাও-দাই এবং সেনাপতি স্কুয়ান এই চুক্তি সই করেছেন। ৮ই জ‍ুন ফরাসী জাতীয় পরিষদে ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ম'সিয়ে ফ্লোরে ফরাসী সরকারের ভিয়েৎনাম নীতি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভিয়েৎনামের যা কিছ‍ু সৈন্য বল আছে, তা একমাত্র সাধারণ শান্তিরক্ষার কাজেই নিয়োজিত হতে পারবে। টনকিন, আনাম ও কোচিন-চীনের অধিবাসীরা যদি য‍ুক্ত হতে চায়, তাহলে ফরাসী সরকারের আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু উক্ত প্রদেশগ‍ুলির অধিবাসীদের গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে হবে। অবশ্য ফরাসী জাতীয় পরিষদের সম্মতি ছাড়া এই য‍ুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

সকলের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, গত মহায‍ুদ্ধের পর এশিয়ার যে দ‍ুটি দেশে বিদেশী শাসক গায়ের জোরে হ‍ৃত অধিকার প‍ুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে, সেদ‍ুটি দেশ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েৎনাম। দ‍ুটি দেশেই বিদেশী শাসক এক নীতি অন‍ুসরণ করেছে। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজরা প্রথমে শক্তি পরীক্ষা করতে নামে, কিন্তু পরে বিফলকাম হয়ে আলাপ-আলোচনা শ‍ুর‍ু করতে বাধ্য হয়। ইন্দোচীনেও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রথমে অস্ত্রবলে নিজেকে প‍ুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভিয়েটমিন পার্টির জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে যখন অধিকাংশ অধিবাসী ফরাসী শাসনের বির‍ুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, তখন ফরাসীরা আলাপ-আলোচনার পথে চলতে রাজি হলো। বলা বাহ‍ুল্য উভয় ক্ষেত্রেই যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চ‍ূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে একথা বলা যায় না। কেননা ইচ্ছা করে সময় নিয়ে ও দেরী করে ফরাসীরা এবং ওলন্দাজরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিরোধ শিথিল করে আনতে সক্ষম হয়েছে। তারপর নিজের নিজের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে দেশগ‍ুলিকে আটকে রাখা তাদের পক্ষে খ‍ুব বেশী কঠিন হয়নি। বলা বাহ‍ুল্য, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশেও ইংরেজ একই নীতি অন‍ুসরণ করেছে। প্রথমে ভারতবর্ষ, তারপর ইন্দোনেশিয়া এবং অধ‍ুনা ভিয়েৎনাম—তিনটি দেশেই যে ঘটনাবলী গত মহায‍ুদ্ধের পর থেকে ঘটেছে তার থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা অসংগত নয়।

প্রথমতঃ, সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগ‍ুলি পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করছে এবং একই রকম রাজনীতি অন‍ুসরণ করছে।

দ্বিতীয়ত, যে কয়টি দেশ বৈদেশিক শাসন থেকে 'ম‍ুক্তি' পেয়েছে তাদের প্রত্যেকেই আবার কোন না কোন স‍ূত্রে সেই শাসনের জালেই জড়িয়ে পড়েছে। চ‍ূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব তাদের কপালে জোটেনি।

তৃতীয়তঃ, যদিও সাম্রাজ্যবাদ এপর্যন্ত এশিয়াতে অনেক আঘাত খেয়েছে, তাহলেও একথা সত্য নয় যে, সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া থেকে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের চেহারা বদলে যাচ্ছে এইমাত্র, শাসন ঠিকই আছে।

## সৌদী আরব

ব্রিটেন ও আমেরিকার বন্ধ‍ুত্বের ভিত যে একেবারে পাকাপোক্ত কংক্রীটে গড়া নয় তার প্রমাণ এসেছে ওয়াশিংটনের এক খবর থেকে। আমেরিকার সেনেটের য‍ুদ্ধ সম্পর্কীয় অন‍ুসন্ধানী কমিটির বিবরণীতে উল্লিখিত সৌদী আরবের পেট্রোলিয়াম নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধের মধ্যেই এই প্রমাণটি রয়েছে।

কি করে আমেরিকান সরকার আরব দেশের তৈল স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে শ‍ুর‍ু করলো তার উল্লেখ করে বিবরণীতে বলা হয়েছে, য‍ুদ্ধের মধ্যে সৌদী আরবকে ৯,৯০,০০,০০০ ডলার ধার দেওয়া হয়। এই ধারের বদলে সৌদী আরব তার তৈল স্বার্থ আমেরিকার কাছে বন্ধক রাখে, অর্থাৎ য‍ুদ্ধের মধ্যে শ‍ুধ‍ু মিত্রশক্তিকেই তৈল সরবরাহ করার অংগীকার করে। কিন্তু রাজা ইবন সাউদের এত অর্থের প্রয়োজন কেন হলো একথা ব‍ুঝতে হলে সৌদী আরবের অর্থনীতি বোঝা প্রয়োজন।

য‍ুদ্ধের আগে সৌদী আরবের রাজস্ব আসতো প্রধানতঃ মক্কা ও মদিনাগামী ম‍ুসলমান তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে। দ্বিতীয়ত, তৈল কোম্পানীগ‍ুলি থেকে বাৎসরিক নজর নিয়ে ও ব্রিটিশ সরকারের থেকে খয়রাত গ্রহণ করে সৌদী সরকারের শাসনকার্য নির্বাহ হতো। য‍ুদ্ধের সময় তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা একেবারে কমে যাওয়ায় রাজা ইবন সাউদের ভাণ্ডার প্রায় খালি হয়ে গেল। উপায় না দেখে তিনি আমেরিকান তৈল কোম্পানীগ‍ুলির কাছে অর্থ সাহায্য চাইলেন।

আমেরিকান তৈল কোম্পানীগ‍ুলি য‍ুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক দপ্তরে জানালো যে ইবন সাউদকে আরও বেশী অর্থ সাহায্য করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অন‍ুরোধ করা হোক। এর পর থেকে দ‍ু' বছরে অর্থাৎ ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ইবন সাউদ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বছরে ৫১,০০০,০০০ ডলার হিসাবে পান। সৌদী আরবকে আমেরিকা সরাসরি ধার দিতে অস্বীকার করে।

১৯৪৩ সালের ফেব্র‍ুয়ারী মাসে আরব-আমেরিকান তৈল কোম্পানীর বিবরণীতে এই আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, ইংরেজ যেভাবে ক্রমশঃ আরব অর্থনীতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, তাতে য‍ুদ্ধ শেষ হলে, আমেরিকান তৈলস্বার্থ বিপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ আরব দেশে আমেরিকানদের তৈল উত্তোলন করার অধিকার চলে যেতে পারে।

য‍ুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক দপ্তর এই খবর পেয়ে এক ম‍ুহ‍ূর্তও সময় নষ্ট করেনি। আমেরিকা সোজাস‍ুজি সৌদী আরবকে ধার দিতে স্বীকার করলো, সংগে সংগে তার তৈল-স্বার্থকে প‍ুরোপ‍ুরি কায়েম করে নিল। বলা বাহ‍ুল্য আরব দেশ আমেরিকার কাছে তার তৈলস্বার্থকে বন্ধক দিয়েই এই সাময়িক স‍ুবিধা পেয়েছে। এখন তার পক্ষে আমেরিকাকে বিতাড়িত করা অসম্ভব। সময়ের সংগে সংগে ক্রমশঃ আরব অর্থনীতির উপর আমেরিকার প্রভাব বেড়েছে, এমন কি আজ সে প্রভাব ব্রিটিশ প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এই মহায‍ুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, য়‍ুরোপ ও এশিয়াতে আমেরিকার প্রভাব বিস্তার। আরব দেশের তৈলস্বার্থ এই প্রভাবের গণ্ডির বাইরে যেতে পারেনি।

## চেকোশ্লোভাকিয়া

চেকোশ্লোভাকিয়ার সাধারণ নির্বাচন কিভাবে কম্য‍ুনিস্ট প্রাধান্যকে কায়েম করেছে তা আমরা গত সপ্তাহে দেখতে পেয়েছি। আমরা এই স‍ূত্রে এ আশংকা প্রকাশ করেছিলাম যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় গণতন্ত্রের হয়তো সমাধি ঘটলো। আমাদের এ আশংকা যে একেবারে অম‍ূলক নয়, তা একটি অত্যন্ত গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রমাণ করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট ডক্টর বেনেস পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন,—"শারীরিক অস‍ুস্থতা ও সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমস্যা।"

১৯১৮ সালে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারী সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে টমাস মাসারিক এবং তাঁর সহকর্মী ডক্টর বেনেস চেকোশ্লোভাকিয়া সাধারণতন্ত্রকে স‍ৃষ্টি করেন। কিন্তু তার থেকেও বেশী চাঞ্চল্যকর ডক্টর বেনেসের আজকের পদত্যাগ।

ডক্টর বেনেস পদত্যাগ করার প‍ূর্বে চেকোশ্লোভাকিয়ার ন‍ূতন শাসনতন্ত্র স্বাক্ষর করেননি বলে জানা গেছে। এই শাসনতন্ত্র প্রায়

## ফুটবল—

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের প্রথমার্ধের খেলা শেষ হইয়াছে। অধিকাংশ নূতন খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ তালিকার শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছে। মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয় স্থান ও লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেংগল তৃতীয় স্থান-লাভ করিয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান এই দুইটি দল এই পর্যন্ত কোন খেলায় পরাজয় বরণ করে নাই। নিম্নে তিনটি দলের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

| | খেঃ | জঃ | ড্রঃ | পঃ | পক্ষে | বি | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মহমেডান | ১২ | ১০ | ২ | ০ | ১৭ | ৩ | ২২ |
| মোহনবাগান | ১২ | ৮ | ৪ | ০ | ১৯ | ১ | ২০ |
| ইস্টবেংগল | ১২ | ৭ | ৪ | ১ | ২০ | ৫ | ১৮ |

### মহমেডান স্পোর্টিং দলের কৃতিত্ব

মহমেডান স্পোর্টিং দল একরূপ নূতন খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত। লীগ প্রতিযোগিতার সূচনায় বিভিন্ন খেলা দেখিয়া কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, এই দল কোন সময় লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানের অধিকারী হইবে। কি রক্ষণ ভাগ, কি আক্রমণ ভাগ সকল বিভাগেই দলীয় শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রথমার্ধের খেলার শেষ দিকে দেখা যায় দল বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সর্বপ্রথম মোহনবাগান দলের সহিত খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়া তাহার প্রমাণ দেয়। পরে লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেংগল দলকে পরাজিত করে। এই দিনকার খেলায় মহমেডান দলের আত্মরক্ষার অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। খেলার সূচনায় অতর্কিতে একটি গোল করিয়া খেলার শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ দলের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে। এই দলের বিভিন্ন বিভাগের খেলোয়াড়গণ বর্তমানে যেরূপ খেলিতেছেন লীগ প্রতিযোগিতার শেষ পর্যন্ত যদি বজায় রাখিতে পারেন—দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে।

### মোহনবাগান শক্তিহীন

মোহনবাগান দল লীগ প্রতিযোগিতার সূচনায় যেরূপ শক্তিশালী ছিল বর্তমানে তেমন আর নাই। এই দলের তিনজন রক্ষণভাগের খেলোয়াড় এস মান্না, টি আও ও মহাবীর বিশ্বঅলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য লণ্ডন গিয়াছেন। এই তিনজন খেলোয়াড়ের স্থান পূরণ করা মোহনবাগান দলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সেই-জন্য এই শক্তিহীন মোহনবাগান দল লীগ প্রতি-যোগিতায় শেষ পর্যন্ত কিরূপ খেলিবে বলা খুবই কঠিন।

### ইস্টবেঙ্গল দলের ভবিষ্যৎ

লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেংগল দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। লীগ প্রতিযোগিতা যতই অগ্রসর হইতেছে এই দলের খেলায় ততই অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করিয়া পরিচালকগণ দলের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই। আক্রমণ ভাগের শক্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেও রক্ষণভাগ সম্পূর্ণ শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। এই বিভাগের উন্নতির যদি কোন ব্যবস্থা না হয়
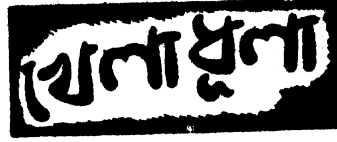
আশংকা হয় চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেংগল দল শেষ পর্যন্ত অর্জিত গৌরব রক্ষা করিতে পারিবে না।

### খেলার মাঠে গোলমাল

ফুটবল খেলার মাঠে প্রতি বৎসরই গোলমাল হইয়া থাকে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি জাগরূক রাখিবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহাও আর নাই সেইজন্য আমাদের ধারণা হইয়াছিল এইবারে ফুটবল মাঠে আর কোনরূপ গোলযোগ হইবে না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে আমাদের সেই ধারণা যে ভিত্তিহীন তাহা কয়েকদিন মাঠে প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্বের ন্যায় মাঠে ঢিল ছোড়াছুড়ি, রেফারীকে প্রহার করিতে জনতার মাঠে প্রবেশ প্রভৃতির কোনই অভাব হয় নাই। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া মনে হইয়াছে ফুটবল খেলা যতদিন প্রচলিত থাকিবে ততদিন মাঠে এইরূপ অপ্রীতি-কর ঘটনাও ঘটিবে।

আই এফ এর পরিচালকগণ কিছুদিন পূর্বে মাঠের এই সকল গোলমাল বন্ধ করিবার জন্য শান্তি দল বা বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, সেই সকল দলের যদি অস্তিত্ব থাকে তাহারা কি করিতেছেন জানিতে ইচ্ছা হয়।

## ব্যাডমিণ্টন—

বেংগল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালক-গণ দীর্ঘকাল প্রচেষ্টার পর গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের পাশে স্থায়ী আচ্ছাদিত কোর্ট নির্মাণের অনুমতি পাইয়াছেন বলিয়া জানা গেল। সংবাদটি যদি সত্য হয় খুবই সুখের বিষয়। আমরা আশা করি দেশবাসী, বিশেষ করিয়া বাংলার শত শত ব্যাড-মিণ্টন ক্লাবের পরিচালকগণ এই আচ্ছাদিত কোর্ট নির্মাণের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হইবে সেই বিষয় এসোসিয়েশনকে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন। এই আচ্ছাদিত কোর্টের উপরই বাংলার ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে ইহা ভুলিলে চলিবে না।

## মুষ্টিযুদ্ধ—

লণ্ডনের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা দল প্রেরিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইতিপূর্বের ব্যবস্থায় যে সকল মুষ্টি-যোদ্ধা ভারতীয় দলের জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই পুনরায় নবগঠিত দলে স্থান লাভ করিয়াছেন। কেবল নবগঠিত দলে কতকগুলি মুষ্টিযোদ্ধাকে অতিরিক্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই যে লণ্ডন যাইতে পারিবেন সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর্থিক সমস্যাই বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে। পূর্বের মনোনীত মুষ্টিযোদ্ধাগণ সকলেই প্রয়ো-জনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদকের নিকট জমা দিয়াছেন। অতিরিক্ত মনোনীতের মধ্যে একদল মাত্র এই পর্যন্ত অর্থসংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অপর সকলেই ট্রায়ালের পরিচালকদের নিকট ছুটাছুটি করিতে-ছেন। অলিম্পিক ট্রায়াল দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইলে পরিচালকগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে কাহাকেও অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন না। সুতরাং বর্তমানে তাঁহাদের চাপ দিলে কোনই ফল হইবে না। আগামী ২৪শে জুন বোম্বাই হইতে ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাগণ বিমানযোগে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ইহার মধ্যে যাঁহারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাঁহারাই বিশ্ব অনুষ্ঠানে যাইবেন।

একটি বিষয় দ্বিতীয় বারের ট্রায়ালে প্রমাণিত হইয়াছে যে পূর্বের ট্রায়াল ও নির্বাচন ঠিকই হইয়াছিল। প্রথম ট্রায়াল অনুষ্ঠান ও নির্বাচন লইয়া যাহারা নানাপ্রকার কুৎসিৎ প্রচার চালাইয়া ছিলেন তাঁহারা যে কি শ্রেণীর লোক তাহা দেশ-বাসী ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। নিম্নে মনোনীত মুষ্টিযোদ্ধাগণের নাম প্রদত্ত হইল :—

**হেভী ওয়েট**—ও ও এরাটুন (বাঙলা) অধি-নায়ক।

**লাইট হেভী ওয়েট**—ম্যাক জোয়াকিন (বাঙলা)

**মিডল ওয়েট**—জনী নুটেল (বাঙলা)

সহ-অধিনায়ক, রুণী মুর (বাঙলা)

**ওয়েল্টার ওয়েট**—জনী নুটাল (বাঙলা)

**লাইট ওয়েট**—ডিনি রেমণ্ড (বোম্বাই) ও আর ক্রানস্টল (বাঙলা) অতিরিক্ত

**ফেদার ওয়েট**—বি বসু (বাঙলা) ও ডিলন স্মিথ (বাঙলা) অতিরিক্ত

**ব্যাণ্টম ওয়েট**—বাবুলাল (বাঙলা) ও এস সিরাজী (বোম্বাই) অতিরিক্ত

**ফ্লাই ওয়েট**—আর ভট্ট (বাঙলা) ও আই মেনাসী (বোম্বাই) অতিরিক্ত

**শিক্ষক**—শ্রীযুত জে কে শীল।

## সাইকেল চালনা—

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারত হইতে সাইকেল চালক দল প্রেরিত হইয়াছে। যে দল প্রেরিত হইয়াছে তাহার নির্বাচন লইয়া বাঙলার অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক একটু গোল-মাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন যে নির্বাচন ট্রায়াল ঠিক আইন মত হয় নাই। ভারতীয় সাইক্লিষ্ট ফেডারেশন বাঙ্গলার এই প্রতিবাদ একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহারা গোলমালের অবসান হিসাবে বাঙলার দুই-জন সাইকেল চালক, আর কে মেহেরা ও এন সি বসাককে দলভুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পূর্বের মনোনীত সাইকেল চালকগণ জাহাজযোগে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বাঙলার সাইকেল চালকদ্বয় বর্তমানে কিভাবে যাইবেন চিন্তা করিতেছেন। কখনও শোনা যাইতেছে জাহাজে যাইবেন, কখনও শোনা যাইতেছে বিমানে যাইবেন। এই সমস্যা কবে সমাধান হইবে জানি না। আমাদের আশংকা হয় বাঙলার সাইকেল চালকদ্বয়ের বোধহয় শেষ পর্যন্ত যাওয়া হইবে না। যে সকল সাইকেল চালকগণ ভারতের পক্ষ সমর্থন করিতে ইতিপূর্বে সাঁতারু ও ফুটবল খেলোয়াড় দলের সহিত চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আর আর নোবল (বোম্বাই), আর জে মুরাফিরোজ (বোম্বাই), জে এফ আমিন (বোম্বাই), বি ম্যালকম (বোম্বাই), এ হাভেওয়ালা (বোম্বাই), ই মিস্ত্রী (বোম্বাই), পি আর সরকারী (বোম্বাই) ও এইচ পাভরী (বোম্বাই)।

## দেশী সংবাদ

৭ই জুন—ভারতের জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে গণ-পরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ভারত গভর্নমেণ্ট যেসব স্থলে জাতীয় সংগীত গীত হইবার প্রয়োজন হয়, সেসব ক্ষেত্রে সর্বত্র "জন-গণ-মন অধিনায়ক" সংগীত গাহিবার ক্রমবর্ধমান প্রথা অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গণ-পরিষদে সংযুক্ত প্রদেশের প্রতিনিধি শ্রীযুত মোহনলাল সকসেনা কেবিনেট বহির্ভূত মন্ত্রীরূপে ভারত সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

উতকামণ্ডে এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের শিল্প উন্নয়ন কমিটির বৈঠকে আমেরিকান প্রতিনিধি দলের নেতা ডাঃ হেনরী গ্র্যাডি বলেন যে, সম্মিলিত জাতির এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থ-নৈতিক কমিশনের এলাকার অন্তর্ভুক্ত যে সকল দেশের বৈদেশিক মূলধন সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা-দিগকে বৈদেশিক অর্থ বিনিয়োগকারীদিগকে সিকিউরিটি ও ন্যায়সংগত প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া একটা সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করিতে হইবে।

মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রদেশের নিরক্ষরতা দূরী-করণের জন্য একটা পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। তদুদ্দেশ্যে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

৮ই জুন—নয়াদিল্লীতে ভারত ও হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই এবং ভারত সরকার আলোচনার ভিত্তি হিসাবে হায়দরাবাদ প্রতিনিধি-মণ্ডলীর নিকট বে-সরকারীভাবে যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

৯ই জুন—ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীযুত ভি পি মেনন আজ নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, হায়দরাবাদ প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলোচনা নিষ্ফল হইয়াছে এবং প্রতিনিধি দল আরও নির্দেশের জন্য হায়দরাবাদ ফিরিয়া যাইতেছেন। শ্রীযুত মেনন আরও জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য অদ্য ভারত সরকার হায়দরাবাদের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করিয়া হইলেও দুষ্কৃতিকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সেনা ও পুলিশ বাহিনীকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন।

১০ই জুন—শোলাপুর হইতে ৪৪ মাইল দূরে অবস্থিত সীমান্তবর্তী হাদালগী গ্রামে বোম্বাই পুলিশ ও রাজাকারদের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে ৪ জন রাজাকার নিহত হইয়াছে। বোম্বাই সরকারের দুইজন পুলিশ কনেষ্টবল আহত হইয়াছে।

নাগপুরের সংবাদে প্রকাশ, একদল সশস্ত্র রাজাকার বেরার সীমান্ত হইতে তিন মাইল দূরবর্তী নিজাম রাজ্যের একটি গ্রাম আক্রমণ করে। তাহারা জনৈকা মারাঠী রমণীর গৃহে হানা দিয়া সমস্ত নগদ টাকাকড়ি ও সম্পত্তি লুঠ করে।

যে সকল ব্যক্তি নিরাপত্তা আইন অনুসারে রাজ-নৈতিক বন্দী হিসাবে আটক আছেন, পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে পারিবারিক ভাতা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১১ই জুন—শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর স্থলে উড়িষ্যার বর্তমান গভর্নর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতের ওয়াশিংটনস্থ ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফ আলি ডাঃ কাটজুর স্থলে উড়িষ্যার গভর্নররূপে কাজ করিবেন।

নিজামের সৈন্যদল ও রাজাকার বাহিনী ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। নিজামের প্রধান সেনাপতি ভারত আক্রমণের জন্য প্রধান প্রধান ঘাঁটিতে তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন।

পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্ট 'বন্দে মাতরম্' সংগীতকে ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১২ই জুন—নিজামের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা স্যার ওয়াল্টার মঙ্কটন অদ্য এক নূতন প্রস্তাব লইয়া নয়াদিল্লীতে গমন করেন। তিনি লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজাম প্রেরিত প্রস্তাবের বিশদ বিবরণ তাঁহাকে জানান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নৈনীতালে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের কথা বলা বাচালতা মাত্র। ভৌগোলিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এমন বন্ধন রহিয়াছে যে, মৈত্রী সম্পর্ক বজায় না রাখিয়া চলা অসম্ভব।

আম্বালার নিকটে এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনার ফলে ক্যাডেট অফিসার শ্রীযুত সন্তোষ ভট্টাচার্য নিহত হইয়াছেন।

বোম্বাইস্থিত হায়দরাবাদ স্টেট কংগ্রেস কর্তৃক প্রচারিত এক বুলেটিনে প্রকাশ, গত ২রা জুন প্রায় ১০০ জন সশস্ত্র রাজাকার স্টেট পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় নান্দেদ জিলার সবরগাঁও গ্রাম আক্রমণ করে। তাহারা গ্রামবাসীর উপর গুলী চালনা করে। ফলে ১০।১২ জন লোক নিহত হয়।

করাচীতে পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিষয়ক উপদেষ্টা বোর্ডের প্রথম সভায় প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে উর্দু ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাষায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেচনার্থ পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ছয় হইতে এগার বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদের জন্য নিম্ন বুনিয়াদী ধরণের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে।

উতকামণ্ডে এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে।

১৩ই জুন—নাগপুরের সংবাদে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ-হায়দরাবাদ সীমান্তে অবস্থিত চন্দা ঘাঁটি হইতে মধ্যপ্রদেশ সীমান্তরক্ষী পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র ফৌজ গত শুক্রবার একদল রাজাকার হানাদারকে তাড়া করিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নিজাম রাজ্যের এলাকায় প্রবেশ করে। এইসব [illegible] গ্রামে হানা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

বিহারের সর্বত্র প্রচণ্ড তাপ প্রবাহের ফলে সর্দিগর্মীতে বহু লোকের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত গয়া, মুঙ্গের ও পাটনা জেলা হইতে ৩০ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

করাচীর 'ডন' পত্রিকা জানাইতেছেন যে, কাবুল হইতে প্রকাশিত আফগান সরকারের মুখপত্র 'আনিস' এক প্রবন্ধে পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ডুরাণ্ড লাইন হইতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত ৬০০ মাইল লম্বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকার জন্য পাকিস্থানের নিকট জোর দাবী করিয়াছেন।

## বিদেশী সংবাদ

৭ই জুন—পশ্চিম জার্মানীতে একটি গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ও রুর অঞ্চলে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব প্রবর্তন সম্পর্কে প্রতীচ্যের ছয়টি রাষ্ট্র তাহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। জার্মানীতে মিত্র-পক্ষের সামরিক কর্তৃত্ব অবসানের পর এই পরিকল্পনা বলবৎ হইবে। বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গের প্রতিনিধিরা গত সপ্তাহে লণ্ডনে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট বেনেস চেকোশ্লোভাকিয়া মন্ত্রি-সভার নিকট তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারতের অর্থসচিব শ্রীযুত ষন্মুখম চেট্টি লণ্ডনে বৃটিশ ট্রেজারীতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ভারতের প্রাপ্য ১,২০,০০,০০,০০০ মজুত স্টার্লিং সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। এই আলোচনায় পাকিস্থানের অর্থসচিব গোলাম মহম্মদও যোগদান করেন।

আজ লণ্ডনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে লর্ড ব্যানসপেট ভারতীয় শিল্পী শ্রী ভি আর রাও কর্তৃক অঙ্কিত মহাত্মা গান্ধীর একখানি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। লণ্ডনে পরিকল্পিত "নিউ ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টস ইউনিয়নে" এই প্রতিকৃতিখানি রক্ষিত হইবে।

৯ই জুন—জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রতীচ্যের ছয়টি রাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহা মানিয়া লইয়াছে।

১১ই জুন—প্যালেস্টাইন রণাঙ্গনের সর্বত্র যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্য যুদ্ধ বিরতির আদেশ বলবৎ হইবার কয়েক ঘণ্টা পরে আরবেরা অভিযোগ করে যে, উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য-রণাঙ্গনে ইহুদীরা যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে।

১২ই জুন—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, ১৪ই জুন কায়রোতে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের সেনানায়ক ও প্রধান মন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহূত হইয়াছে। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সালিস কাউণ্ট ফোক বার্নাদোত্ত অদ্য বিমানযোগে জেরুজালেম যাত্রা করিয়াছেন।

১৩ই জুন—দামাস্কাসের সংবাদে প্রকাশ, আরবরা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সালিস কাউণ্ট ফোক বার্নাদোত্তকে চূড়ান্তভাবে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে, অদ্য অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় ইহুদীরা যদি কড়াকড়িভাবে যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ পালনের ব্যবস্থা না করে, তবে প্যালেস্টাইনের সমস্ত রণাঙ্গনে 'ব্যাপক আক্রমণ' চালানো হইবে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ] শনিবার, ১২ই আষাঢ়, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 26th June, 1948. [৩৪শ সংখ্যা

**শ্চমবঙ্গের প্রদেশপাল**

ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু পশ্চিমবঙ্গের দশপালের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। রা তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন রতেছি। ডক্টর কাটজু আমাদের অপরিচিত নে। তাঁহার প্রখর মনীষা এবং জনগণের য় হৃদ্যতাপূর্ণ অবদান বহুপূর্বেই গ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রদেশের সংগঠন এবং বিচারসচিবস্বরূপে দ প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বস্তুত ক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর ন্যায় ডক্টর জুও ভারতের সংস্কৃতি এবং সাধনার প্রতি ঢ় শ্রদ্ধাবুদ্ধিশীল এবং তাঁহারা উভয়েই র্মাত্মক মনোবৃত্তিসম্পন্ন দার্শনিকতার দৃষ্টি-পন্ন পুরুষ। যুক্তপ্রদেশের পল্লী-সংগঠন এবং বয় আন্দোলনের সম্প্রসারণে ডক্টর কাটজু দ্র জনশ্রেণীর সেবায় তাঁহার আন্তরিক তার পরিচয় দিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। নি আত্যন্তিকভাবে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি; কিন্তু হার এই ধর্মবুদ্ধি গীতার লোক-সংগ্রহের দর্শে অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন শ্রদ্ধার প্রসারিত দৃষ্টি লাভে সুসম্পন্ন হইয়া ছে। পশ্চিম বাঙলার সমস্যা বর্তমানে বিধ; কিন্তু বলিষ্ঠ জাতীয়তার উদার ভিত্তিতে তিষ্ঠিত মানবসেবামূলক প্রাণময় আদর্শের য়োজন এখানে সবচেয়ে বেশী হইয়া ড়িয়াছে। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের পস্যায় যে ভূমি পবিত্র হইয়াছে, আজ সেখানে রাষ্ট্র-জীবনের ধারা বৃহদাদর্শের শক্তি হারাইয়া ন স্বার্থ এবং শোষণের খাতের ভিতর গিয়া ড়িতেছে। আবহাওয়া এমন হইয়া ঠিতেছে যে, উজ্জ্বল আদর্শের আকর্ষণে র্থের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হইবার ক্তি আমরা নিজেদের মনের মধ্যে যেন ষ্টা করিয়াও জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছি না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যেও কিছুদিন হইল দুর্নীতি দলনে যে আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে তাহা এখনও সরকারী মামুলী শুভেচ্ছামূলক বিবৃতির মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। ফলত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আমাদের সব কর্তব্য যেন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং লব্ধ সম্পদ লুফিয়া লইবার দিকেই আমাদের মনোবৃত্তি কেবল গৃধ্নুদৃষ্টি লইয়া ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। আমরা আশা করি, ডক্টর কাটজুর প্রদেশপালত্বে পশ্চিম বাঙলার রাষ্ট্রীয় জীবনের এই শোচনীয় কার্পণ্য দূর হইবে এবং শোষক দলের নীতি-চাতুর্যে প্রপীড়িত হইবার অবীর্য হইতে জাতি মুক্তিলাভ করিবে। সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনীতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙলার রাজনীতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব কত বেশী, ডক্টর কাটজু তাহা বিশেষভাবেই অবগত আছেন। প্রাদেশিকতার হীন চক্রান্ত চারিদিক হইতে বাঙালীকে পিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের জন্য আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আজ নির্মমভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে ইহার অনিষ্টের সুদূরপ্রসারী সম্ভাব্যতা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির যাঁহারা নিয়ামক, তাঁহারা পর্যন্ত সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন না। আমরা আশা করি, ডক্টর কাটজু এই দুর্দৈব হইতে বাঙলাদেশকে উদ্ধার করিবেন এবং নিরপেক্ষ স্বচ্ছ-দৃষ্টির বলে বাঙলার সঙ্গত দাবী মিটাইয়া সমগ্র ভারতের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করিবার দিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপালত্বের অধিকার প্রয়োগ করিবেন। তাঁহার কর্তব্যের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করি; পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনগণের সমর্থন তিনি সেই কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রে লাভ করিবেন, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

**বাঙলার ক্ষেত্রে বৈষম্য**

সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের বোম্বাই এবং মাদ্রাজ এই দুইটি প্রদেশ ভাঙিয়া অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র নামে চারটি নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া ভারতীয় গণ-পরিষদের পক্ষ হইতে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রদেশ পুনর্গঠনে এই প্রশ্নটি গৌণ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্মুখে এত সব জটিল সমস্যা রহিয়াছে যে, বর্তমানে ঐ প্রশ্ন না তোলাই ভাল। পণ্ডিতজীর এরূপ উক্তি সত্ত্বেও ভারতীয় গণপরিষদ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। গণপরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদের অনুমোদনক্রমেই যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে ইহাও স্পষ্টই বোঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবী বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছে; এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের দাবীকে কেন উপেক্ষা করা হইল এবং কমিশনের নির্ধারণযোগ্য বিষয়ের মধ্যে সে দাবী অন্তর্ভুক্ত করা হইল না, ইহাই আমাদের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয়। বলা বাহুল্য, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কংগ্রেস-গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারেই গণপরিষদ এক্ষেত্রে কার্যক্রম অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কথা উঠিতে পারে, বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী ও পশ্চিমবঙ্গের দাবী এক নহে। পশ্চিমবঙ্গ অন্য প্রদেশের কতকটা অঞ্চল দাবী করিতেছে, স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন সে ক্ষেত্রে নয়। আমরা জানি, পারিভাষিক বিচারে কথার এমন মারপ্যাঁচ দিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা হইতে পারে; কিন্তু কংগ্রেস-গৃহীত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের মূল নীতির প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি তাহাতে থাকে না। বস্তুত চারটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের সব ঝুঁকি লইতে ভারত গভর্নমেণ্টের যদি অসুবিধা না হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের দাবী অনুযায়ী কাজ করিতে ভারত রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে, এমন যুক্তি সাধারণ বুদ্ধিরও অগোচর। অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গের দাবী শুধু সীমানার মধ্যে মীমাংসা লইয়া সেক্ষেত্রে সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সরল; কিন্তু চারটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল। এ সব সত্ত্বেও যদি পশ্চিম বাঙলার দাবীকে কমিশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তবে পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করা হইতেছে, এমন সন্দেহ স্বভাবতই আমাদের মনে জাগিবে। বলা বাহুল্য, গণপরিষদের সভাপতিস্বরূপে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি যে কার্যক্রম অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কংগ্রেসের প্রতি মর্যাদাবুদ্ধির প্রখর দৃষ্টিরই পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায়; কিন্তু যদি পশ্চিমবঙ্গের দাবী তাঁহার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তবে অবলম্বিত নীতির সর্বাঙ্গীন সঙ্গতি বজায় থাকে না। এইরূপ একদেশদর্শিতা সমগ্র দেশ এবং জাতির স্বার্থের পক্ষে একান্তই বিসদৃশ, শুধু তাহাই নয়, স্বাধীনতালব্ধ ভারতের সকল অংশের ঐক্য ও সংহতিকেই তাহা শিথিল করিয়া দিবে। আমাদের মনে এই আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি ভাষার ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠিত হইয়া যায়, অথচ পশ্চিমবঙ্গের দাবী চাপা থাকে, তবে সে দাবী প্রতিপালনের সুযোগ কোনদিনই আমাদের থাকিবে না। ভারতের নবগঠিত শাসনতন্ত্রের ধারাতে যেরূপ বিধি-বিধানই থাকুক না কেন, কার্যত সেগুলি অকেজো হইয়া পড়িবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যদি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চায়, তবে আর কালবিলম্ব করিলে চলিবে না। বস্তুত স্বল্পপরিসর পশ্চিমবঙ্গের উপর চারিদিক হইতে যেরূপ চাপ আসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে বিহার ও আসামের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি যদি সে না পায়, তবে তাহার সংস্কৃতি সভ্যতা সব নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সংকটের গুরুত্ব সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিবেন এবং বাঙলার প্রতি যে অবিচার অনুষ্ঠিত হইতে বসিয়াছে, তাহাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই সঙ্গে বাঙালী জাতিকে আমরা সচেতন হইতে আহ্বান করিতেছি, নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় আর নাই। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবী যাহাতে পালিত হয় সেজন্য আন্তরিকতা এবং প্রয়োজন হইলে উগ্রতর সংকল্পশীলতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ করিতেই হইবে; সেক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বনের কোনরূপ শুভেচ্ছামূলক প্রবঞ্চনায় আমরা যেন বিড়ম্বিত না হই।

**পরলোকে ভূপেন্দ্রনাথ বসু**

আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ কর্মী, বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু গত ২রা আষাঢ় বুধবার পরলোকগমন

করিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা একান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্য বহুদিনের ছিল। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ২৭ বৎসরকাল একাদিক্রমে আমরা তাঁহাকে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত দেখিয়াছি। নানারূপ সংকট এবং প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি সব সময় আমাদের পার্শ্বে ছিলেন। আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের সেবায় তাঁহার অনলস উদ্যম এবং কর্তব্যনিষ্ঠা আমাদের আদর্শস্বরূপ ছিল। প্রকৃতপক্ষে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অবলম্বন করিয়া আমরা এক পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তাঁহার বিয়োগ-বেদনা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। সহকর্মিগণের প্রতি অকৃত্রিম দরদ এবং বিশ্বাস ভূপেনবাবুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রধানত এ দুই গুণে ভূপেনবাবু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে আপনার সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র ভূপেনবাবুর অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ সহকর্মিগণ তাঁহার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিবেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি ও সদ্গতি প্রার্থনা করিতেছি।

**সুনিশ্চিত এবং শেষ সিদ্ধান্ত**

নিজামের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের সুদীর্ঘ আলোচনার এতদিনে যবনিকাপাত হইল বলিয়া মনে হইতেছে। নিজামের প্রধান মন্ত্রী সর্বশেষ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় সম্মুখীন হইবার সামিল। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও বলিয়া দিয়াছেন যে, নূতন আলোচনায় তাঁহারা আর প্রবৃত্ত হইবেন না এবং ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে নিজাম যদি আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছিতে চাহেন, তবে ভারত সরকারের স্থিরীকৃত সর্তনামায় তাহাকে সহি দিতে হইবে। কি কারণে নিজামের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি সম্ভব হইবে না, আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক মনে করি। প্রকৃতপক্ষে হায়দরাবাদ রাজ্যে গণতন্ত্রসম্মত দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং রাজাকরবাহিনী নামে যে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডার দল সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা ভাঙিয়া দিতে হইবে, ইহাই ছিল মুখ্য ভারত গভর্নমেণ্টের শেষ দাবী। স্বৈরাচারী নিজাম এ সর্তে রাজী হইতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিন নামক মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ দলের পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিজাম অবাস্তব স্বপ্নে নিমগ্ন আছেন। ভারত গভর্নমেণ্ট অতঃপর হায়দরাবাদের চতুর্দিকে অর্থনীতিক বেষ্টনী দৃঢ় করিবেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রে নিজামের গুণ্ডার দল হানা দিলে তাহাদিগকে সায়েস্তা করিতে হায়দরাবাদের ভিতরে সেনাদল পাঠাইতেও দ্বিধা করিবেন না, এই সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহারা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁহাদের কর্মনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে নিজামের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে বিশেষ বিলম্ব ঘটিবে না এবং বর্তমান জগতে যে মধ্যযুগীয় বর্বরতার স্থান নাই, নিজাম এবং তাঁহার স্বৈরাচারের সমর্থক প্রগতিবিরোধী দল সে সত্য সত্বরই উপলব্ধি করিবেন। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে হায়দরাবাদ সম্পর্কিত সুদীর্ঘ আলোচনা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আমরা সুখীই হইয়াছি। স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে কোনরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি আমরা চাহি না; হায়দরাবাদ হইতে মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়, আমরা ইহাই দেখিতে চাই; সেজন্য ভারতীয় যু

রাষ্ট্রকে যদি কঠোরতর অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহাও স্বীকার।

**লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের বিদায় গ্রহণ**

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন পনেরো মাসকাল ভারতের রাষ্ট্রপালস্বরূপে অবস্থান করিবার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিদায়-কালীন বাণীতে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"ভারতের ঐতিহ্য মহান্ এবং তাহার ভবিষ্যৎ প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ। ভারতের বহু সমস্যা আছে। কোন জাতি অকস্মাৎ স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহাকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, ভারতবর্ষকেও সেই প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ এইসব সমস্যার সমাধান করিয়া পথের বাধাগুলি অপসারিত করিতে সমর্থ হইবে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর রাষ্ট্রসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে এবং বিশ্বব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে।" ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা বৈপ্লবিক বিবর্তনের মুখে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এখানকার রাষ্ট্র-জীবনে নিজের কর্মোদ্যম প্রযুক্ত করেন। তিনি বিদেশী; সুতরাং বিজিত জাতির মনে তাঁহার কার্যের গতি ও প্রকৃতির সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু সে সব সত্ত্বেও একটি বিষয় সুস্পষ্ট। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একটা কাজ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্য-বাদীদের কূটচক্র হইতে বাহির করিয়া স্বাধীনতার উন্মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে আনিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিকতায় সন্দেহও করা যায় না। স্বাধীনতার পথ কোনদিন কুসুমে আস্তৃত হয় না। রক্ত-গঙ্গার ভিতর দিয়াই সে দিকে যাইতে হয়। ভারতবর্ষকে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে বিজেতৃ-শক্তির সংগে রক্তপাতবহুল সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হয় নাই; কিন্তু তাহারা যে অনর্থের বীজ বপন করিয়াছিল, তাহার নির্মম এবং নিষ্ঠুর আঘাত হইতে সে অব্যাহতি পায় নাই। তথাপি এক্ষেত্রে আমাদের সান্ত্বনা রহিয়াছে স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি এবং একবার যখন সাম্রাজ্য-সাম্রাজ্যবাদীদের কূটচক্র কাটিয়া বাহির হইয়াছি, তখন নিজেদের পথ নিজেরা করিয়াও লইতে পারিব। সেই সংগে এ সত্যও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা লাভে সমগ্র এসিয়ার উপর হইতে পৃথিবীর সর্বাধিক সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শোষণশক্তি এলাইয়া পড়িয়াছে এবং সমগ্র এসিয়া নূতন জীবনের সাড়া পাইয়াছে। রক্তপাত হউক, অনর্থ ঘটুক, জাতির অগ্রগতির পথে এগুলি একেবারে এড়াইয়া চলা যায় না এবং সে সব মূল্য দিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়। এ পথে বিষয় বিচারের কার্পণ্যের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া জাতি কেবল ঘুরপাক খায়। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সে কার্পণ্য কাটাইয়া বাহির হইতে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্থায়ী হইয়া থাকিবে।

**বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার**

গত ৫ই আষাঢ়, শনিবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখিতে বাধ্য হওয়াতে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ইতিহাসে এবং বাঙলার ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার মত ব্যাপার আর কোন-দিন ঘটে নাই। এম-বি পরীক্ষা বন্ধ রাখিবার জন্য দাবী করিয়া ছাত্রদের পক্ষ হইতে কিছুদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছিল, সেই আন্দোলনের পরিণতিতে এই বিসদৃশ অবস্থা দেখা দেয়। ঐদিন ছেলেদের দাবী সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সিণ্ডিকেটের সভা হইবার কথা ছিল। ছেলেরা সিণ্ডিকেটের সভ্যদিগকে সভাস্থলে যাইতে বাধা দেয়। গুরুতর অনর্থের আশংকা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকিতে বাধ্য হন; অবশেষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখিতে হয়। এদেশের তরুণদের আন্দোলন আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সমর্থন করিয়া থাকি; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহারা যথোচিত সংযম এবং ধীরতার সংগে কাজ করেন নাই, আমরা একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ব্যবস্থাই সর্বাংগসুন্দর, এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু শিক্ষার্থীর পক্ষে বিদ্যা-নিকেতনের এবং যাঁহারা বিদ্যাদানের পবিত্র কার্যে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সেই শ্রদ্ধাবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি অগ্রসর হইতেন, তবে তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির পথই সুগম হইত, কিন্তু তাঁহারা যে পথ ধরিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বিঘ্নই সৃষ্টি হইবে। অসংযম এবং অশ্রদ্ধা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে পারে না; অধিকন্তু তাহা শক্তিমত্তার পরিচায়ক নয়। শক্তি আদর্শের সমীহিত নিষ্ঠার উপর ভিত্তি করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে উদ্দাম অসংযম শক্তির ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে ব্যর্থতার মধ্যেই লইয়া যায়। বৃহৎ আদর্শের প্রতি সুসমীহিত শ্রদ্ধাবুদ্ধি বাঙলার তরুণদের সাধনাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে; বাঙলার ঐতিহ্য সে সাধনায় সমুজ্জ্বল। আমরা আশা করি, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁহাদের কাজে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা বাঙলার সে ঐতিহ্যের সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং শিষ্টাচার ও নিয়মানুবর্তিতার সীমা লঙ্ঘন করিবার ভ্রান্ত পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। বাঙলার সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সমুন্নতি এবং তাহার ভবিষ্যৎ তরুণদের উপরই নির্ভর করিতেছে। সংযম ও শৃঙ্খলার পথে এই তরুণদিগকেই স্বাধীন বাঙলাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে নিজেদের দায়িত্ব তাঁহারা যেন আকস্মিক অসংযত উত্তেজনায় পড়িয়া বিস্মৃত না হন।

**পাকিস্থানে উর্দুর প্রচলন**

পূর্ব পাকিস্থানে বাঙলা ভাষা এখনও সরকারীভাবে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হয় নাই, অথচ পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট উর্দু ভাষাকে পাকিস্থানের সমগ্র অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য-শিক্ষণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উর্দু ভাষার সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন বিরুদ্ধ সংস্কার নাই, তথাপি আমরা এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, উর্দু পাকিস্থানের নিজস্ব ভাষা নয়। সুতরাং পাকিস্থানের সব অঞ্চলের ছাত্রদের পক্ষেই এ ভাষা শিক্ষা করা সহজ হইবে না। পাকিস্থানের ছাত্রদিগকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাহাদের মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরেজি শিক্ষা করিতে হইবে; কারণ ইংরেজি এখনও সেখানে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম রহিয়াছে। ইহার উপর উর্দু যদি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়, তবে তাহাদের উপর গুরুতর চাপ পড়িবে। হিন্দু ছাত্রদের বিশেষ অসুবিধার কারণ রহিয়াছে, উর্দু অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত সংস্কৃত ভাষা তাহাদের পক্ষে গৌণ হইয়া পড়িবে। বাঙলা ভাষার উপর যাঁহাদের মর্যাদাবোধ আছে, সংস্কৃতকে উপেক্ষিত হইতে দেখিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বেদনা বোধ করিবেন; কারণ সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই বাঙলার প্রাণশক্তি নিহিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, হিন্দু-মুসল-মানের প্রশ্ন এখানে বড় নয়, প্রধানত মাতৃভাষার মর্যাদাবুদ্ধি এবং সে ভাষার সর্বাংগীণ সমৃদ্ধির প্রশ্নই এখানে উঠিতেছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া উর্দু ভাষার ভ্রান্ত ঐসলামিক মর্যাদা মোহ হইতে মুক্ত হইয়া কাজ করাই পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ছিল এবং উর্দু ভাষাকে ইচ্ছানুসারে শিক্ষণীয় বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত রাখিলেই তাঁহারা সমধিক সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস। ট্রামে চড়িয়া অফিসে যাইতেছি আর ভাবিতেছি বপ্রক্রীড়ারত মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রিয়া বিরহের বারমাসী গাওয়া হয়ত সহজ, কিন্তু শূন্য আকাশ আর পূর্ণ ট্রামের দিকে স্বেদসিক্তাবস্থায় তাকাইয়া তাকাইয়া একটি-মাত্র সীটের বিরহকাতরতা বর্ণনা করা সত্যই কঠিন।

* * *

একটি অসমর্থিত সংবাদের কথা উল্লেখ করিয়া বিশু খুড়ো বলিলেন—সম্প্রতি কলিকাতার কোন এক অঞ্চলে নাকি একটি শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। শোভা-

যাত্রীরা "আমাদের দাবী মানতে হবে" ইত্যাদি ধ্বনি করিতে করিতে সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু গন্তব্য স্থানে পেণছিবার আগেই পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অনুসন্ধানে জানা গেল তাঁরা কর্মচ্যুত কেরাণীও নহেন, কমিউনিস্টও নহেন, তাঁরা সকলেই জামাই। বাজারে বস্ত্র নাই, আম আর মিষ্টি অগ্নিমূল্য, মৎস্য অন্তর্হিত; ঝাঁকরে চাল কিছু সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকিলেও কয়লার অভাবে হাঁড়ি চড়ান অসম্ভব বলিয়া শ্বশুর কুল এবারে জামাইষষ্ঠীতে জামাতৃবৃন্দকে আহ্বান করেন নাই। ইহাতে জামাইদের জন্মাধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে এবং ফলে অচিরেই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী—এই কথা কয়টি মন্ত্রীদের গোচর করাইবার জন্যই শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ, চিরকুমার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় জামাইদের অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করেন নাই।

* * *

খুড়ো আরও বলিলেন—অনুরূপ একটি শোভাযাত্রা নাকি ভারতের প্রায় সমস্ত সহরেই বাহির করা হইয়াছিল। সেই শোভাযাত্রীরা অন্ন, বস্ত্র, চাকরী, পারমিট কোন কিছুই চাহেন নাই, তাঁরা চাহিয়াছিলেন—রাজার জন্মদিনে একটু খেতাব! জহরলাল সরকার খেতাবের বদলে শুধু একদিনের ছুটি ঘোষণা করিয়া তাঁদের কাটা ঘায়ে নুন ছিটাইলেন।

* * *

রাজাজী মহিলাদের এক সভায় বলিয়াছেন তিনি যদি আবার নূতন করিয়া জীবন শুরু করিতে পারিতেন তবে দেশের মেয়েদের হাতে-তৈরী জিনিস বিদেশে চালান দিয়া প্রচুর লাভ করিতে পারিতেন। খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু রাজাজী পণ্ডিত ব্যক্তি বলেই সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধেক ত্যাগ করে শুধু গভর্নর জেনারেলের পদটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন বলে স্থির করেছেন।"

* * *

খুড়ো একটি সুগোপন সরকারী সংবাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, অফুরন্ত বিদায় সভার বিষাদ করুণ দৃশ্য হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাজাজী নাকি নির্ধারিত সময়ের আগেই বাঙলাদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। সুতরাং (খুড়ো বলিতে থাকেন) যাঁরা এখনও অশ্রু বিসর্জনের সুযোগ লাভ করেননি, তাঁরা অবিলম্বে 'কিউ'তে না দাঁড়ালে হতাশ হবেন।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের পরিষদ প্রসঙ্গে একটি সংবাদের শিরোনামা ministers to contest vacant seats. —বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু পারবেন কি?

ট্রামে-বাসে চড়া অভ্যেস থাক্‌লে 'ভেকেন্ট সিট' নিয়ে কড়াকড়ি করাটা সহজ হতো।"

* * *

MR. Laik Ali's midnight request to Delhi.—অন্য একটি সংবাদের শিরোনামা। এ প্রসঙ্গে শ্যাম মন্তব্য করিল—"প্রকাশ্যে অন্যায় আব্দার করতে বুঝি লজ্জা হচ্ছে? কিন্তু আমরা বলি—যাবে কি যাবে না, মিছে এ ভাবনা, মিছে মর লোকলাজে!"

* * *

হায়দরাবাদের হিন্দুসভা বলিতেছেন—

"Hyderabad's carftiness towards the Indian Dominions smelt strongly of foreign inspiration."—

—খুড়ো বলিলেন—"নিশ্চয় ওটা 'ইভনিং ইন হায়দরাবাদ' গোছের নূতন সেণ্ট্ হবে!"

* * * * *

RED rain recently fell in America—একটি সাম্প্রতিক সংবাদ। প্রেসিডেণ্ট

ট্রুম্যান রাশ্যাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—to drop tactics of "coercion" and "open agression" কিন্তু রাশ্যা কি তার বদলে "Red rain" ছাড়িতেছেন?

* * * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, চীন দেশের একটি মেয়ে নাকি বিগত নয় বৎসর শুধু জল খাইয়া বাঁচিয়া আছে। খুড়ো বলিলেন—"চীনের সঙ্গে যে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আছে, এ তারই অন্য এক প্রমাণ।"

**স্ক্যান্ডিনেভিয়া**

সম্প্রতি নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের পররাষ্ট্র ও সামরিক নীতি নিয়ে বেশ খানিকটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নরওয়ের পররাষ্ট্র সচিব ডক্টর লাঙ্গ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশ তিনটি যদি একই নীতি অনুসরণ করে পরস্পরের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্নিবিষ্ট করে তাহলে সকলেরই লাভ। ডক্টর লাঙ্গ এই প্রসঙ্গে সুইডিশ পররাষ্ট্র সচিব মঁসিয় উন্ডেনের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির প্রতি কটাক্ষপাত করে বলেন যে, ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হবে কিনা এ বিষয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি অবশ্য এখনও একমত হতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, লণ্ডনে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিস্টার বেভিন সম্প্রতি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করেছেন।

সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ যখন আমেরিকার অনুগ্রহ ভাজন হয়ে শ্লাভ আঁতাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তৈরী হচ্ছে, তখন সমগ্র স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় একই সামরিক নীতি প্রবর্তন করার চেষ্টা বিশেষ অর্থপূর্ণ। রুশিয়ার বিরুদ্ধে দল গড়তে হলে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ককে উপেক্ষা করলে যে চলবে না তা মিস্টার বেভিনের উদ্যোগ থেকেই বোঝা যায়। বস্তুতঃ রুশিয়ার বিরুদ্ধে কোন সামরিক ব্যবস্থাই কার্যকরী হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি যদি বাল্টিকের পথ আটকাতে পারে তাহলে রুশ নৌবহর প্রকৃতপক্ষে অকেজো হয়ে পড়বে। অবশ্য রুশিয়াও যে এই সম্ভাবনা থেকে একেবারে অন্ধকারে রয়েছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। রুশ নীতি হচ্ছে সমগ্র স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পরস্পর নিরপেক্ষ সামরিক নীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করা। সুইডিশ পররাষ্ট্র নীতির আপাতঃ নিরপেক্ষতা থেকেই রুশ প্রভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাহলেও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় রুশ পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে সাফল্য লাভ করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব হবে। কেননা চিন্তাধারায় ও সমাজ ব্যবস্থায় স্ক্যান্ডিনেভিয়া পশ্চিম ইউরোপেরই সগোত্র পূর্ব ইউরোপের নয়।

**"আলাস্কা"**

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশরক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে পৃথিবীর আরেক প্রান্তস্থিত আলাস্কার দেশরক্ষার কথা উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি আমেরিকান প্রতিনিধি পরিষদের বরাদ্দ উপসভা আলাস্কায় দেশরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং যুদ্ধ দ্রব্যাদি জড় করার জন্য ৪৮৫১৯৬৯৫১ ডলার অনুমোদন করেছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মেরু প্রদেশের একটি সংকীর্ণ কোণ আলাস্কা ও রুশিয়াকে বিযুক্ত করছে।

অনুমোদিত বিলটিতে পাঁচটি খাতে বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে:—(১) গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় রক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী জড় করা; (২) আলাস্কাতে সৈন্য বিভাগের নির্মাণকার্য চালিয়ে যাওয়া; (৩) নৌ-বিভাগের নির্মাণকার্য এবং বিশেষ করে আলুশিয়ান দ্বীপগুলি ও প্রশান্ত মহাসাগরে রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (৪) আলাস্কাতে বাণিজ্যিক বিমান ঘাঁটি নির্মাণ; (৫) কলম্বিয়া নদী উপত্যকায় বন্যা নিবরণী ব্যবস্থা।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার অস্ত্র উৎপাদন বোর্ডের সভাপতি মিস্টার হারগ্রেভ বলেছেন যে, যুদ্ধ সামগ্রী জড় করার ব্যাপারে আমেরিকা দু' বছর পিছিয়ে পড়েছে।

এতদিন আলাস্কা প্রান্তর নির্জন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। যুদ্ধের মধ্যেও রাস্তা নির্মাণকার্য বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। কিন্তু ভবিষ্যত কোন যুদ্ধে আমেরিকান ভূখণ্ড সরাসরি আক্রান্ত হবে না এই চিরপ্রচলিত বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। সেই কারণেই আলাস্কার মত সুদূর উপেক্ষিত সীমান্তকেও সুরক্ষিত করার চেষ্টা চলেছে, যদিও কানাডার অধিবাসীদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের এই দুশ্চিন্তা নেহাৎই ছেলেমানুষীর পরিচায়ক। তবে একথাও ঠিক যে, সাইবেরিয়াতে রুশেরা যেভাবে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করে চলেছে তাতে ঠিক উল্টো দিকে বসে আমেরিকার একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও আলাস্কা একই সূত্রে বাঁধা।

**ব্রহ্মদেশ**

গত দুই সপ্তাহ ধরে ব্রহ্মদেশকে কেন্দ্র করে একটি ছোটখাট কমেডির সূচনা হয়েছে। এই নাটকের মূল অভিনেতা হচ্ছেন ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন্ নু এবং এই নাটকের বিষয় হচ্ছে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে রুশিয়ার সম্পর্ক স্থাপন।

বিগত ১৩ই জুন তাঁর সম্মিলিত বামপন্থী দলের নীতি বর্ণনা করতে গিয়ে থাকিন নু বলেছেন যে, তিনি রুশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তিনি আরও বলেন যে, যদিও ব্রহ্মদেশ ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবের মধ্যে আটকা পড়েছে তাহলেও তার নেতারা রুশ আদর্শকেই অনুসরণ করতে চান।

থাকিন নুর এই চাঞ্চল্যকর উক্তিকে কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়া বলে ধরে নিয়ে লণ্ডনে উদ্বেগজনক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, থাকিন নু যদি সত্যি সত্যিই তাঁর নীতির পরিবর্তন করে থাকেন তাহলে তা ব্রহ্মের নিজের দিক থেকে কিংবা আশেপাশের দেশগুলির দিক থেকেও বিশেষ ভাল হবে না। যদি কম্যুনিস্টরা ব্রহ্মের শাসনযন্ত্রে সূচ হয়ে ঢুকতে পারে তাহলে তারা অদূর ভবিষ্যতে যে ফাল হয়ে বেরুবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। অপর পক্ষে কম্যুনিস্টভাবাপন্ন ব্রহ্মদেশ, গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাবান ভারতবর্ষ অথবা ক্ষতবিক্ষত চীনের পক্ষেও একটা খুব মহৎ দৃষ্টান্ত হবে বলে লণ্ডনের কূটনৈতিক মহল মনে করতে পাচ্ছেন না। অর্থাৎ সোজা কথায় ব্রহ্মদেশ যদি কম্যুনিস্ট হয়ে যায় তাহলে সেই বিপত্তির সামনে কি করে টিঁকে থাকা যাবে এই ছিল লণ্ডনের চিন্তার বিষয়। এই হলো নাটকটির প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট থাকিন নুর এই নীতির ব্যাখ্যা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বিগত ১৭ই জুন পার্লামেণ্টে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন বলেছেন : যে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথ ছেড়ে রুশ আদর্শকে গ্রহণ করার ঘোষণা বলে ধরা যেতে পারে তিনি একথাও বলেছেন যে, ব্রহ্মকে সাহায্য করার জন্য বৃটেন উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তি যাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে তাঁর লক্ষ্য থাকবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই চুক্তি ব্রহ্মদেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বৃটেনের তাঁবেদার করে রেখেছে। বৃটিশ স্বার্থকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে টিঁকিয়ে রাখতে হলে এই চুক্তির সর্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হওয়া প্রয়োজন। ঠিক সেই কারণেই ব্রহ্মের পররাষ্ট্র নীতির এই সম্ভাব্য পরিবর্তন বৃটেনের পক্ষে এত দুর্দৈব।

ব্রহ্ম নাটকের তৃতীয় অঙ্কে একটি নূতন চরিত্র প্রবেশ করেছেন—তিনি হলেন ব্রহ্মের পররাষ্ট্র সচিব উ-টিন-টুট। গত ১৭ই তারিখে রেঙ্গুন থেকে এক ঘোষণায় তিনি বলেছেন যে, ব্রহ্মের নীতি মোটেই কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকছে না। সোভিয়েট রুশিয়া কিংবা কোন বিশেষ শক্তির সঙ্গে ব্রহ্মের কোন রকম দল গড়ার সংকল্প বা চেষ্টা নেই। থাকিন নু বর্ণিত ১৫-দফা কর্মসূচীতে এমন কিছু নেই যা ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তির বিরুদ্ধে যাবে। উ-টিন-টুটের বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম-নাটকের যবনিকা পতন হল বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার কেন থাকিন নু তাঁর নীতির পরিবর্তন ঘোষণা করলেন এবং কেনই বা বৃটেন এত বেশী উদ্বিগ্ন হল।

গত কয়েক মাস থেকে ব্রহ্মের কম্যুনিস্টরা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বলা যেতে পারে। মধ্য ব্রহ্মে সম্পূর্ণ অরাজকতা। এই অবস্থায় থাকিন নুর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি যে কম্যুনিস্টদের কিছু পরিমাণে তুষ্ট করে ব্রহ্মে শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? কম্যুনিস্টদের জন্য যে ক'টি টোপ ফেলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে রংচঙে হলো রুশ নীতি সম্বন্ধীয়। এদিকে থাকিন নুর ঘোষণার যে অংশটি বৃটিশদের মনে সবচেয়ে বেশী উদ্বেগের সৃষ্টি করে তা হচ্ছে আশু জাতীয়করণের প্রতিজ্ঞা। ব্রহ্মের রুশনীতি যত না ভয়াবহ তার থেকেও বেশী দুশ্চিন্তাজনক হচ্ছে ব্রহ্মের অর্থনীতি থেকে ইংরাজ বণিকের অর্ধচন্দ্র লাভের সম্ভাবনা। আমদানী ও রপ্তানিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞাও বৃটেনের পক্ষে আশঙ্কার কারণ।

কিন্তু আসলে থাকিন নুর ঘোষণা যে ঘোষণামাত্র একথা কয়েক দিনের ঘটনাবলীকে একসঙ্গে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়।

**মালয়**

গত ১৩ই জুন সিঙ্গাপুর থেকে একটি ছোট খবর আসে যে, মালয়ে সন্ত্রাসবাদের ঝড় বইছে। বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার এডওয়ার্ড জেন্ট এই সন্ত্রাসবাদ দমন করার উদ্দেশ্যে মালয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনকে বেআইনী ঘোষণা করেন। স্যার এডওয়ার্ড বলেন যে, মালয়ে এখন ২৩টি ধর্মঘট চলছে, ধর্মঘটীরা জুলুম করে ও খুন করবার ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের হাতে রেখেছে। বেআইনী ফেডারেশনটি কম্যুনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত। এই সঙ্গে খবর আসে যে, চিয়াং গভর্নমেণ্টের সমর্থক দুজন চীনাকে এবং একজন চীনা ঠিকাদারকে উত্তর মোহোরে সন্ত্রাসবাদীরা খুন করেছে। এই ছোট খবরটির মধ্যে যে কতখানি গুরুত্ব ছিল তা পরদিনের আর একটি ছোট খবরে বোঝা যায়।

সিঙ্গাপুর থেকে ১৪ই তারিখের এক খবরে জানা যায় যে, মালয়ের রেঙ্গম জেলার দশটি রবার আবাদের ৬০ জন সাহেব মালিক সন্ত্রাসবাদ দমন করার উপায় নির্ণয় করার জন্য এক সভা করেন। এইদিন স্ট্রেটস টাইমস পত্রিকাতেও বলা হয় যে, সন্ত্রাসবাদীরা কুয়োমিন-তাঙ সমর্থকদের উৎখাত করার চেষ্টা করছে। এর পরই বড় খবর আসে যে, ১৬ই তারিখে চীনা সন্ত্রাসবাদীরা স্টেনগান ও রিভলবার দিয়ে ইপোর ২০ মাইল দূরে এক রবার বাগানে তিনজন সাহেবকে খুন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে গুর্খা সৈন্যদের সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানা খুঁজে বার করার জন্য পাঠানো হয়। এইদিনই পার্লামেণ্টে ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ ক্রীক জোনস ঘোষণা করেন যে, মালয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সৈন্য নিযুক্ত করা হবে কি না তার দপ্তর বিবেচনা করছেন। তিনি আরও বলেন যে, বৃটিশ হাই-কমিশনার পুলিশকে লোকজনদের খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার করার জন্য বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ সময়ের মধ্যে কারো কাছে বেআইনী অস্ত্র পাওয়া গেলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

এর দুইদিন পরেই খবর আসে যে, সন্ত্রাসবাদের ঢেউ উত্তর মালয়ে বিস্তৃত হয়েছে। চীনা ও শ্বেতাঙ্গ হত্যা থামেনি, শ্বেতাঙ্গ শিশু ও মহিলাদের অপসারণ চলেছে।

উপরোক্ত খবর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যুনিস্টদের কর্মসূচী মূলতঃ এক। তবে মালয়ে কম্যুনিস্ট সন্ত্রাসবাদের বিস্তার যে অনেক বেশী সহজ তার কারণ মালয় ফেডারেশনে চীনা ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। খাস মালয়বাসীদের নিজেদের দেশ সম্পর্কে যতটা দরদ থাকা সম্ভব চীনা ঔপনিবেশিকদের কাছ থেকে ততটা আশা করা যেতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কয়েক মাস আগে ফেডারেশন চালু হওয়ার সময় থেকেই চীনাদের ভয় হয়েছে যে, ঔপনিবেশিক হিসেবে তাদের হয়ত মালয়বাসীদের মত সমান সুযোগ সুবিধা জুটবে না। তৃতীয়তঃ জাপানী অধিকারের পর থেকেই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী এত বেড়ে গেছে যে, অত্যন্ত বেশী নাগরিক জ্ঞান সম্পন্ন না হলে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার না করে থাকা কঠিন। এই সব কারণেই কম্যুনিস্টরা তাদের বর্তমান এ্যাডভেঞ্চারের স্থান হিসাবে মালয়কেই বেছে নিয়েছে। একদিকে শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষ, আরেকদিকে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের সুযোগ নিয়ে কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র—এই দুইএর মধ্যে পড়ে মালয় হত্যাকারীর লীলাভূমিতে পরিণত হতে চলেছে।

# সাংসারিক

**মৃগাঙ্ক রায়**

একখানি ছোট ঘর, পরিপূর্ণ আত্মীয়-স্বজনেঃ  
পুত্রকন্যা, ভাইবোন, দূরের সম্পর্ক কোন, প্রিয় পরিজনে  
সদা উচ্ছ্বসিত। অনুরাগে, মানে অভিমানে  
কখনো বসন্ত আসে, কখনো শীতের দিন হিমঝড় হানে।

কখনো নীরব; সন্ধ্যার প্রহরে  
গোলাপী-হলুদ আলো বাঁকা হয়ে পড়ে।

উন্মেষিত হয়ে ওঠে অনেক হৃদয়।  
একখানি ছোট ঘরে অনেক প্রাণের স্রোত ঢেউ তুলে বয়।

প্রশান্ত প্রভাতে শুনি কলস্বর শিশুর ভাষণ ঃ  
মধ্যাহ্ন তপ্তদাহে গৃহিণীর শ্রান্ত চোখ, কর্মরত মন;

অপরাহ্ন একান্ত গভীর। এরি মাঝে আছে হিংসা, আছে দ্বেষ—  
উত্তাল ক্রোধের ঝড়, আর আছে আমাদের হাসি-টানা সভ্যতম বেশ।  
আছে মৃত্যু। হঠাৎ স্তিমিত হয়ে শেষ হয় কাহারো জীবন।  
হৃদয়ে আঘাত লাগে; শোকাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে মন।  
সংসার নীরব থাকে। দুঃখ করে আত্মীয়-স্বজন।  
তারপর সব ভুলি; হিংসাদ্বেষ, জীবনের মৃত্যু পরিণতি;  
ভুলে যাই যত কিছু ব্যর্থ মনস্কাম, সংসারের গতি।  
আবার কখন উচ্ছ্বসিত এ সংসারে বন্ধন বুঝি;  
নিভৃত মনের কথা বলি কারো কাছে, কখনো বা স্তব্ধ হয়ে শুনি।  
তারপর কোন এক শান্ত শুভ্র দিনে অবির্ভাব হয় কোন নতুন শিশুর;  
আরো দু'টি পদচিহ্ন এ প্রাঙ্গণে বাড়ে, হৃদয়ের তারে জাগে আরো সুর।

# চুঁচুড়ায় যাই না কেন

অক্রূব

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি বিনা আপত্তিতে চুঁচুড়ার এপারে াকি, চুঁচুড়ার ওপারে চলিয়া যাইতেও বিন্দুমাত্র াপত্তি করি না, কিন্তু চুঁচুড়ায় যাইতে আমার ়ে আপত্তি কেন? ক্রমাগত কয়েক বছর অর্থ- ূর্ণ ভঙ্গীতে অর্থহীন হাসি হাসিয়া ়প্রশ্নটির জবাব এড়াইয়া গিয়াছি। কিন্তু ়বার ঠিক করিয়াছি, আর নয়, প্রশ্নটির জবাব ়া বুকটা হালকা করিয়া ফেলিব।

চুঁচুড়ায় গিয়াছিলাম একবার, বছর কয়েক ়াগে, বন্ধু মনোহরের সঙ্গে। মনোহরের ়াদা সেখানকার পুলিশ অফিসের প্রধান ়েরাণী। মনোহর বলিল, চলো দাদার ওখানে ়েকবার বেড়াইয়া আসা যাক। আমিও বলিলাম, ়লো। মনোহর চলিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ়লিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া যে মনোহর ়মন বেকায়দায় ফেলিয়া দিবে তাহা আগে ়ানিলে হয়তো যাইতাম না। যা হোক, আগে ়াহা জানিতাম না—গেলাম।

মনোহরের দাদার বাড়িতে পৌঁছিলাম দুপুরবেলা। আহারাদি সারিয়া তারপর ়িকাল পর্যন্ত গল্পগুজবে চমৎকার কাটিয়া ়েল। বিকালে চা ও খাবার খাইয়া আমাকে ়লইয়া মনোহর বেড়াইতে বাহির হইল। কহিল, "চলো এখানকার সেরা সেরা লোকের সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দিই।"

আমি কহিলাম, "অনেক ঘুরতে হবে নাকি?"

মনোহর কহিল, "আরে না না, তুমি কি আমায় বোকা পেয়েছো নাকি? তোমায় নিয়ে যাচ্ছি সতোন ক্লাবে।"

"সেটা আবার কি?"

"সতোন ক্লাব হচ্ছে এখানকার সেরা লোকদের আড্ডা। বিকেলে এদের অর্থাৎ এই সেরা লোকদের—প্রায় সকলকেই এই ক্লাবে পাবে। বিকেল থেকে রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত। সতোনবাবু এই ক্লাবের পত্তন করে যান—"

"কোথায় যান?"

"মারা যান। তাই তাঁর নাম অনুসারেই ক্লাবটির নাম হয়েছে সতোন ক্লাব। তাস বলো, পাশা বলো, ক্যারম বলো, পিংপং বলো, দাবা বলো—সব কিছুই পাবে। লাইব্রেরীতে বই আছে প্রচুর, তার প্রায় সবগুলোই উপন্যাস। দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিক প্রায় সবগুলিই রাখা হয়। তাছাড়া রেডিও আছে। ব্যাড-মিণ্টনের ব্যবস্থা হ'চ্ছে। পাশের জায়গাটা পেলেই টেনিস্ কোর্ট হবে। মানে এ একটা যাকে বলে ক্লাবের মতো ক্লাব। তুমি দেখে খুশী হবে অতীন। আর তোমাকে দেখেও সবাই খুশী হবে।"

"কেন?"

"খুশী হওয়াটা এদের স্বভাব। লোক পেলেই এরা খুশী। বিশেষ করে তুমি যখন আমার বন্ধু, তখন তো কথাই নেই। কি আদরটা পাও, একবার দেখোই না।"

বুঝিলাম তাহার বন্ধুর মর্যাদা যে সতোন ক্লাবের সভ্যদের কাছে কতখানি, তাহা আমাকে দেখাইবার জন্য মনোহর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সতোন ক্লাবে উপস্থিত হইলাম। ক্লাবটি বাস্তবিকই বড় রকমের। বাজে কথা বলে নাই মনোহর। এবং মনোহরকে দেখিয়া সকলে যেরূপ খুশী হইয়া উঠিল দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম সে ইঁহাদের বিশেষ প্রীতিভাজন। মনোহর আমার পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল "আমার বন্ধুকে কলকাতা থেকে বেড়াতে নিয়ে এসেছি। নাম হচ্ছে অতীন রায়। চমৎকার লেখে। এর লেখা নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছো?"

যাঁহাদিগকে প্রশ্ন করা হইল তাঁহারা কেহই আমার লেখা কাগজে বা অন্য কোথাও পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহারা সবাই একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। বেগতিক দেখিয়া আমি কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য কহিলাম "কি এমন লিখি যে ও'রা পড়বেন?

"কি এমন লিখি মানে? অদ্ভুত মজার লেখা। তোমার ধরণের 'হিউমার'স' লেখা আজ-কাল তো আর কাউকে বড় একটা লিখতে দেখি না।"

সতোন ক্লাবের একজন সভ্য এইবার কহিলেন "খুব হিউমারাস্ লেখেন বুঝি?"

মনোহর কহিল স্প্লেনডিড। সেই পাগলা ডিটেক্টিভের মজার গল্পটা বলো না অতীন। সেই যে—"

বলিয়া মজার গল্পের কথা মনে করিয়া সে একাই কিছুক্ষণ হাসিয়া নিল।

এই সময় ক্লাবের রেডিওতে শোনা গেল "এইবার বিখ্যাত খেয়াল গায়ক কানুবাবু আপনাদের একটি জয়জয়ন্তী রাগের খেয়াল গেয়ে শোনাচ্ছেন।"

শোনামাত্র সবাই গান শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। গান শেষ হইয়া গেলে সবাই একবাক্যে কহিলেন "চমৎকার!"

মনোহর উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল 'চমৎকার মানে? কানুবাবুর মতো খেয়াল গাইয়ে শুধু বাঙলায় কেন, সারা ভারতেই আজকাল ক'জন আছে?"

এ কথাও সবাই একবাক্যে স্বীকার করিলেন। তখন মনোহর কহিল "আমার বন্ধুর আসল গুণের কথাই তো তোমাদের এখন পর্যন্ত বলিনি।"

তৎক্ষণাৎ সবাই আমার আসল গুণের কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং আমি মনে মনে আসল বিপদের কথা ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

মনোহর একবার আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া এবং পরে সতোন ক্লাবের সভ্যদের দিকে সগর্ব দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল "অতীন আজকাল কানুবাবুর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। কানুবাবু তো অতীন বলতে অজ্ঞান।"

শুনিয়া আমার প্রায় অজ্ঞান হইবার মতো অবস্থা হইল। কিন্তু আমার কোনো কথা ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মনোহর বলিতে লাগিল "এই জয়জয়ন্তী—যা এইমাত্র কানুবাবু রেডিও-তে গেয়ে শোনালেন—অতীনের কণ্ঠে একটিবার শুনলে আপনারা মুগ্ধ হয়ে যাবেন।"

আমার লেখা সম্বন্ধে ভদ্রলোকেরা তেমন উৎসাহ দেখান নাই। কিন্তু আমার গান শুনিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের প্রিয়তম গায়কের প্রিয়তম শিষ্য আমি, অজ বেশ ভাল করিয়াই আমার গান তাঁহারা শুনিবেন বলিয়া আমাকে তাঁহারা ভয় দেখাইলেন।

এখন, আসল সত্যটা এই যে, আমি তখন কানুবাবুর ছাত্র ছিলাম বটে, কিন্তু প্রিয় নহে, অম তো নহেই। বছরখানেক ধরিয়াই কানু-বাবুর কাছে তালিম নিতেছিলাম, কিন্তু বিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই। তাহার কারণ ইমনের তালিম নিতে নিতে মনে হইত ইমনের চাইতে বাগেশ্রী ভাল। বাগেশ্রী শিখিতে আরম্ভ করিয়াই মনে হইত জয়জয়ন্তীর তুলনা নাই। এইরূপে বাঁশবনে ডোমকানা হইয়া রাগ হইতে রাগান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে কোনো একটি রাগ বা কোনো একটি গানও শেখা হয় নাই। তাছাড়া তবলা সঙ্গতের সঙ্গে গান গাওয়া তো দূরের কথা, তবলার চাঁটি শুনিলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। তাল ঠিক রাখিতে গেলে সুর হয় না, সুর ঠিক রাখিতে গেলে তাল কাটে।

সুতরাং সংগীতে ব্যুৎপত্তি যে আমার এ জীবনে হইবে না তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু মনোহর জানিত না, অথবা জানিতে চাহিত না। বিপদ সেই খানেই। আমি যতই বলিতে লাগিলাম গান আমি জানি না, মনোহর ততই জোর গলায় বলিতে লাগিল আমার মত এমন অতুলনীয় কণ্ঠ ক্বচিৎ শোনা যায়। এবং আমি যতই আপত্তি করিতে লাগিলাম ততই আমার আপত্তিকে বিনয় ভাবিয়া সত্যেন ক্লাবের সভ্যগণ পুলকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

মনোহর আমার দর বাড়াইবার জন্য কহিল "কিন্তু একজন ভাল তবলচী চাই যে। ভালো সংগত ছাড়া ভালো সংগীত তো হতে পারে না। অতীন আবার ... ... ... ..."

অর্থাৎ বাংলার সেরা গায়কের সেরা শিষ্য যে সে তবলচীর সংগে গাহিবে না। মনোহরের এই কথাটা শুনিয়া একটু ভরসা হইল। চুঁচুড়ায় ভালো তবলচী না থাকিবারই কথা। কিন্তু আমাকে দমাইয়া দিলেন সত্যেন ক্লাবের একজন মোটা সদস্য। সহসা উল্লাসিত হইয়া তিনি কহিলেন "কেন, আমাদের তিনকড়িই তো রয়েছে। ওকে ডেকে নিয়ে আসা হোক্।"

আমার মনে হইল যেন এইবার আমাকে ঝুলাইয়া দিবার জন্য জহ্লাদকে ডাকিতে পাঠানো হইতেছে।

মনোহরও খুশী হইয়া কহিল "হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনকড়িকে পেলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা। মিউজিক কনফারেন্সে সংগত করে করে ওর হাতে কড়া পড়ে গেছে। ও পারবে।"

আমি ভীত হইয়া কহিলাম "বলো কি? মিউজিক কনফারেন্সে বাজিয়েছে?"

"বাজিয়েছে বই কি? ঢিমে তেতালা বলো, একতালা বলো, যৎ বলো, কাওয়ালী বলো, কাহারবা বলো, দাদ্‌রা বলো— সবগুলো ভালই চমৎকার বাজায়। বিশেষ করে ঢিমেতে একেবারে মার্ভেলাস। না-আ-আ-আ ধি-ই-ই-ইন ধি-ই-ই-ইন না-আ ... ... ..." বলিয়া মুখে মুখে ঢিমে তেতালার বোল বলিয়া সে দেখাইয়া দিল কি ভয়ঙ্কর রকম ঢিমা তিনকড়ি বাজাইতে পারে। শুনিয়া আমার হৃদ্‌যন্ত্রের গতিও যেন দ্রুতবেগে ঢিমা হইয়া আসিতে লাগিল।

ঢিমা-তেতালা বিশারদ তিনকড়িকে ডাকিতে লোক চলিয়া গেল। সত্যেন ক্লাবের সংগীত-পিপাসু সদস্যগণ আমাকে ঘিরিয়া গোল হইয়া বসিলেন, তিনকড়ি আসিলেই আমার অতুলনীয় খেয়াল শুনিবেন। আমার পাশে বসিয়া বন্ধু-গুণগর্বিত মনোহর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আমি অস্থির বোধ করিয়া স্থিরকণ্ঠে কহিলাম "এক গ্লাস জল।"

আমার পাশের ভদ্রলোক কহিলেন "হ্যাঁ, গান গাইবার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন। আজ শনিবার আছে। কাল অফিসের তাড়া নেই। দিব্বি চুটিয়ে গান শোনা যাবে।"

জল খাইলাম। তিনকড়ির আগমনকাল যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই আমি অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলাম।

যিনি তিনকড়িকে ডাকিতে গিয়াছিলেন তিনি ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন তিনকড়ি বিকালেই কলিকাতা বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়া আমার বুকের উপর হইতে একটা বিরাট বোঝা নামিয়া গেল। কিন্তু আসরের সবাই দুঃখিত হইলেন। আমিও ভরসা পাইয়া গভীর দুঃখের অভিনয় করিতে লাগিলাম।

মনোহর হাত উল্টাইয়া কহিতে লাগিল "তোমাদেরই বরাত খারাপ। আমি তার কি করবো?"

ক্লাবের সদস্যগণ আফশোষ করিয়া কহিতে লাগিলেন "উনি আসবেন আগে জানলে তিনকড়িকে ধরে রেখে দিতাম। আগে খবর দিয়ে আসতে হয়। তোমার কি একটা আক্কেল নেই মনোহর?"

অর্থাৎ আমার মত একজন গুণী খেয়াল-গায়ককে নিয়া আসিতেছে একথা মনোহর আগে জানাইলে মিউজিক কনফারেন্সে তবলা বাজাইতে বাজাইতে হাতে কড়া পড়া তিনকড়ি তবলচীকে আজ কলিকাতা বেড়াইতে যাইতে দেওয়া হইত না। মনোহরের এই আক্কেলহীনতার কথা ভাবিয়া সত্যেন ক্লাবের প্রত্যেকটি সভ্য হায় হায় করিতে লাগিলেন।

ভাবিলাম এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু হায়! হঠাৎ কোথা হইতে এক ছোকরা আসিয়া হাজির হইল, অমনি সকলে সমস্বরে কহিয়া উঠিলেন "এই ভেন্টু এসেছে, বাঁচিয়েছে। ভেন্টুর কথাটা একেবারে মনেই ছিল না ছাই।"

ভেন্টু কহিল "ব্যাপার কি?"

এক ভদ্রলোক বলিলেন "তবলা। এঁর খেয়াল-ঠুংরীর সংগে একটু তবলা সংগত করবে। ইনি হচ্ছেন কানুবাবুর একেবারে সেরা ছাত্র।"

কিন্তু আমার এইটুকু মাত্র পরিচয়েই খুশী না হইয়া মনোহর কহিল "বাজিয়ে সুখ পাবে হে ভেন্টু। অতীন অদ্ভুত লয়দার গাইয়ে। কিন্তু ভায়া, একটু হুঁসিয়ার হয়ে সংগৎ কোরো, আমাদের চুঁচুড়োর মানটা যেন থাকে।" ইহার পর একটি লম্বা বক্তৃতায় মনোহর বুঝাইয়া দিল যে, আমার সংগে সংগৎ করা যে সে তবলচীর কর্ম নয়। কেন না যাঁরা তবলচীকে নাস্তানাবুদ করিয়া থাকেন আমি সেই শ্রেণীরই গায়ক। শুনিয়া ভেন্টু এমন ঘাবড়াইয়া গেল যে, কিছুতেই বাজাইতে রাজী না হইয়া বাড়ীতে জরুরী কাজ আছে বলিয়া সরিয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য সেদিন গান হইল না। আমি মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং বাহিরে দুঃখিত হইলাম। পরদিন ভোরে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। পলাইয়া আসিলাম বলিলেই হয়।

ইহার পর আর চুঁচুড়া যাইতে ভরসা হয় না, কেননা, গেলেই সত্যেন ক্লাবের আমন্ত্রণ আসিতে পারে এবং সেদিন তবলচী তিনকড়ি চুঁচুড়ায় অনুপস্থিত নাও থাকিতে পারে।

# আমার তরণী

### চিত্রলেখা চৌধুরী

বন্দরে নোঙর করা জীর্ণ মালবাহী
গাধাবোট সম গতি কাঁপে থর থর,
একঘেয়ে দৈনন্দিন জলে অবগাহি'
নিদারুণ ভারাক্রান্ত খোলের পাঁজর।
আমার তরণী চলে টর্পেডোর গতি
বন্দরে ভিড়িতে হবে, বিধি নেই তার,
টান রাখে কূল ছেড়ে অকূলের প্রতি
জরা জীর্ণ মন্থরের নাহি ধারে ধার।

নূতন আস্বাদ লয়ে বিচিত্র সাগরে
ছুটিবে তরণী মোর, করি বেচাকেনা,
অতীত আশ্রয় রবে পিছে থাকি পড়ে
অনাগত পথে শুরু হবে আনাগোনা।
নোঙর ভুলিয়া থাকি, আমার তরণী,
দিক্ হতে দিগন্তরে উল্কাসম যাবে
বাঁধিবে না গন্ডি দিয়ে ধূসর ধরণী
তুলে লবে যাত্রাহারা যাত্রী যত পাবে।

অনুবাদ সাহিত্য

# মিস লী

**লো সিং চীয়েন**

[চীনা গল্প। ৭৯৫ খৃঃ অঃ লো সিং চীয়েন কর্তৃক লিখিত এবং আর্থার ওয়েলি কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়।]

মিস লী এক সময় চ্যাং আনে বারবনিতা ছিল। তাকে 'চীয়েন কুয়ের লেডী' এই সম্মানিত উপাধিতেও সময় সময় ডাকা হত।

টীয়েন পাওয়ের যুগে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বাস করতেন। তিনি চ্যাং চৌ-এর গভর্নর ছিলেন এবং যুং ইয়াং-এর জমিদারও ছিলেন। নামটা না হয় গোপনই থাকল। ধনী ছিলেন বলে সর্বসাধারণে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তার নিজের বয়স ৫০ হলেও ছেলের বয়স কুড়ির কাছাকাছি। ছেলেটি কিন্তু সাহিত্যিক প্রতিভাতে অন্য সব সহপাঠীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাই তার পিতা তাকে নিয়ে খুব গর্ব করতেন এবং তার সম্বন্ধে খুব উঁচু আশা রাখতেন। ছেলে যখন প্রাদেশিক পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে যাবে ঠিক হল তখন তার বাবা তাকে যথেষ্ট দামী দামী কাপড়-চোপড়, একটি গাড়ী ও মূল্যবান সজ্জায় সজ্জিত ঘোড়া দিলেন। রাজধানীতে গিয়ে খরচ খরচার জন্য নগদ টাকাকড়িও যথেষ্ট দিলেন এবং বললেন—"আমার খুব বিশ্বাস আছে, তুমি একবারেই পাশ করবে, তবুও যেন নিশ্চিন্তে পড়াশুনা করতে পার, সেজন্য আমি তোমাকে দ্বিগুণ করে টাকাকড়ি দিলাম।" ছেলে নিজেও খুবই নিশ্চিন্ত ছিল এ বিষয়ে এবং সে যেন জলের মত পরিষ্কার দেখতে পেল—সে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে পি-লিং থেকে চ্যাং এ্যানে এসে পেঁছিল। এখানে এসে পুচেং-এর দিকে একটা বাড়ি ভাড়া নিল। 'ইষ্টার্ন মার্কেট' দেখে সে একদিন ফিরে আসছিল। ফিরতি পথে পিং কাং-এর পূর্ব দ্বারপথে শহরে প্রবেশ করে মনে করল, শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। যখন সে মিং কো বাঁকের সম্মুখে এসেছে, তার চোখে পড়ল প্রকাণ্ড একটা বাড়ি। বাড়ির তুলনায় কিন্তু তার প্রবেশপথ ও প্রাঙ্গণটি সংকীর্ণই ছিল বলতে হবে। যাই হোক, বাড়ির দুটো প্রবেশপথের একটা খোলা ছিল এবং সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল দাসী পরিবৃতা পরমাসুন্দরী অপ্সরী বিনিন্দিত সৌন্দর্যময়ী এক রমণী।

তাকে দেখে যুবকটি যন্ত্রচালিতেরই মত ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল এবং ইতস্তত করতে লাগল। অবশেষে সে ইচ্ছে করে তার চাবুকটি ফেলে দিল এবং চাকরে সেটা কুড়িয়ে দেবার অপেক্ষায় রইল। দৃষ্টি তার দ্বারপথে দণ্ডায়মানা সুন্দরীর প্রতি নিবদ্ধ।

প্রত্যুত্তরস্বরূপেই যেন সুন্দরীও তার দিকে সর্বক্ষণই তাকিয়ে ছিল। অবশেষে সত্যি সে সেদিনের মত একটি কথাও না বলে চলে গেল।

কিন্তু সে স্থির থাকতে পারল না। যারা চ্যাং এ্যানের কুখ্যাত পল্লীর খবরাখবর রাখত, গোপনে তাদের মিনতি করল এ সুন্দরীটি কে সে খবর তাকে জানানোর জন্য। তাতে সে জানতে পেল, ঐ বাড়ির অধিবাসিনী একজন নিম্নজাতীয়া, খামখেয়ালী মহিলা—নাম লী।

কি করলে তাকে মুঠোর মধ্যে আনা যায় জিজ্ঞেস করাতে বন্ধুরা বলল—"অতীতে ধনী এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে কারবার করাতে লী অনেক টাকাকড়ি কামিয়েছে। কাজেই যদি তুমি হাজার কয়েক টাকা ঢালতে পার ওর পাদপদ্মে, তবেই তো তোমার কাছে আসতে পারে—নতুবা নয়।" উত্তরে সে বললে—"কুছ পরোয়া নেই। লাখ টাকা লাগে সেও স্বীকার, কিন্তু ওকে আমার চাই-ই।"

পরের দিন কতকগুলো চাকর সঙ্গে নিয়ে মূল্যবান পোষাক পরে সে গিয়ে হাজির হল মিস লী-এর বাড়িতে; দরজায় ধাক্কা দিতেই একজন ছোকরা দরজা খুলে দিল। "এটা কার বাড়ি"—প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে ছোকরা গায়ের জোরে চীৎকার আরম্ভ করে দিলে—"যে লোকটা সেদিন চাবুক ফেলেছিল, এখানে সে আজ এসেছে।"

মিস লীকে বেশ সন্তুষ্টই মনে হল। কারণ উত্তর ভেসে এল—"দেখ, উনি যেন চলে না যান, আমি কাপড়টা বদলিয়ে চুলটা আঁচড়িয়ে এক্ষুণি আসছি।" অনেক আশা নিয়ে চাকরের প্রদর্শিত পথে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। শুভ্রকেশা একজন মহিলা উপরতলায় উঠছিলেন—বোধ করি লি'র মা—তাকেই একটা নমস্কার করে সে বলল—দেখুন, শুনলাম আপনার একটা প্লট পতিত জমি আছে, সেটা আপনি বাড়ি তৈরীর জন্য বিলি করতে চান, তা ওটা আমাকে বন্দোবস্ত করে দেন না কেন? বৃদ্ধা উত্তরে বললেন—"জায়গাটা খুবই ছোট এবং আলো-বাতাসও তেমন নেই; কোন ভদ্রলোকের পক্ষে বাড়ি করার অনুপযুক্ত। তাই আমার মনে হয় আপনার পক্ষে ওটা না নেওয়াই ভাল।" তারপর তিনি তাকে এক সুসজ্জিত বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললেন—"দেখুন, আমার একটিমাত্র মেয়ে, তেমন সুন্দরীও নয়, বা শিক্ষা দীক্ষা তেমন নেই, কিন্তু সে অচেনা লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে খুব ভালবাসে। আপনি তার সঙ্গে কথা বলুন—এই বলে তিনি মেয়েকে ডাকলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মিস লী এসে ঘরে ঢুকলেন। তার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি, তার মৃণালনিন্দিত শ্বেতশুভ্র বাহু তার অপূর্ব ভঙ্গীর গতিবিধিতে যুবকটি এত বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে, সে প্রায় লাফিয়ে উঠল, কিন্তু সে চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পারল না। নমস্কার আদান-প্রদানের পর কতকগুলো বাজে কথা হল এবং যুবকটি বুঝল, এ হেন সুন্দরী নারীর সম্মুখীন সে ইতিপূর্বে কোনও দিন হয় নি।

বেলা অপরাহ্নের দিকে গড়িয়ে চলল এবং সে ইচ্ছে করেই দেরী করতে লাগল। অবশেষে যখন সাঁঝবাতির নিনাদে চারটি ঘণ্টা বাজিয়ে দিনের অবসান জানিয়ে দিল তখন বৃদ্ধা এসে তাকে শুধালেন—"আপনার বাসা এখান থেকে কত দূর? সে মিথ্যে বলল—অনেক দূর। সে আশা করেছিল একথা শুনে বৃদ্ধা তাকে সেদিনের মত থেকে যেতে বলবেন। বৃদ্ধা কিন্তু সে ধার দিয়েও গেলেন না, বললেন,—"চারটে বাজল। যদি আইন অমান্য করবার ইচ্ছে না থাকে তবে আপনার এখনই ফিরে যাওয়া উচিত।"

যুবক তবুও বলল—"আপনাদের ব্যবহারে আমি এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, দিনের অবসান জানতেই পারিনি। আমার বাড়ী এখান থেকে বহুদূরে; শহরে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই—তাইতো কি করি!"

মিস লী তাকে উদ্ধার করল, বলল—"আমাদের তো এই দরিদ্র অবস্থা, দেখতেই পাচ্ছেন; যদি কিছু মনে না করেন তবে আমাদের এখানে রাত্রি বাসটা করলে কোন ক্ষতি হবে কি? অবশ্য আপনার একটু অসুবিধা হবে হয়ত।" যুবক সন্দিগ্ধচিত্তে তার মায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, বোঝা গেল এতে তার সমর্থন আছে।

চাকরদের ডেকে রাত্রির মত খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে নিতে বলবার জন্যে যেই টাকা দিতে যাবে, অমনই লী তাকে বাধা দিয়ে মিষ্টি হেসে বললে—"অতিথি সৎকারের [illegible] তা

নয়। আপনি আমাদের অতিথি, কাজেই আপনার সমস্ত অভাব-অভিযোগ আমরাই দেখব। আপনার আজকের এই দয়াদাক্ষিণ্যটা অন্য কোন দিন দেখাবেন।" যুবক অবশ্য এর প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষে হার মানতে হল এবং সবাইকে পশ্চিমদিকের খাবার হলঘরে যেতে হল। সেখানকার পর্দা, খড়খড়ি, সোফা, প্রসাধনের বাক্স, কম্বল বালিশ ইত্যাদি দেখে তার তাক লেগে গেল। সে-রাত্রে খুব উচ্চাংগের নৈশভোজন পরিবেশন করা হল।

নৈশভোজনের পর বৃদ্ধা অপর কক্ষে গেলেন এবং প্রেমিক-প্রেমিকাকে ইচ্ছামত আলাপ-আলোচনা, হাসি-তামাসার সুযোগ দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে যুবকটি বলল—"সেদিন যখন আমি তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাই, তখন তুমি দরজায় দাঁড়িয়েছিলে। তোমাকে দেখবার পর থেকে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কেবলই তোমার চিন্তা, তোমারই ধ্যান-ধারণা আমি করেছি।" যুবতী উত্তর দিল—"আমারও ঠিক একই অবস্থা।"

যুবক বলে চলল—"তুমি জানো, আমি আজ শুধু বাড়ীর জায়গা দেখতেই আসিনি। এই আশা করেও এসেছি, তুমি আমার আজীবনের বাসনা পূর্ণ করবে। আমি ঠিক জানতাম না, তুমি কিভাবে আমাকে নেবে। আর—" আরও কি তারা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বৃদ্ধা অকস্মাৎ সেই ঘরে ঢুকলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি বলাবলি করছিল। তারা যখন বলল শুনে তিনি হাসলেন এবং বললেন প্রেমিক-প্রেমিকার মতের মিল হলে মা-বাপের আদেশেও সে মিলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু আমার মেয়ে গরীব —ভেবে দেখ, সে ঠিক একজন ধনীলোকের স্ত্রী হবার উপযুক্ত হবে কিনা।"

আসন থেকে নেমে এসে তাকে নমস্কার করে যুবক বলল—"আপনার মেয়ে আমাকে ক্রীতদাস করে রাখতে চেয়েছেন।"

এর পর থেকে বৃদ্ধা তাকে জামাতার মতই দেখতে লাগলেন।

এদিকে যুবকটি পরের দিন সকালবেলায় তার বিছানাপত্র বাক্স-পেটরা সব নিয়ে এসে মিসেস লীর বাড়ীতে উঠল এবং সেখানেই চিরস্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করে দিল। বন্ধু-বান্ধবরাও তার কথা ভুলে গেল। সে কেবল অভিনেতা, নর্তক এবং নীচ সম্প্রদায়ের লোকেদের সংগে চলাফেরা করতে লাগল আর সময় কাটাতে লাগল অসংযত, উচ্ছৃংখল আমোদ-প্রমোদ শিকার প্রভৃতিতে। অবশেষে তার গাড়ী ঘোড়া এমন কি চাকরদের পর্যন্ত বেচতে হল এ-সবের খরচ মিটাবার জন্যে। ...ং বছরখানেকের মধ্যে তার টাকাকড়ি, সম্পত্তি, গাড়ী-ঘোড়া, চাকর-বাকর কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না।

বৃদ্ধার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে উদাসীনতায় পর্যবসিত হলেও গৃহকর্ত্রী (মিস লী) কিন্তু আগের মতই আসক্ত রইল। একদিন বলে ফেলল—"দেখ, বছরখানেক তো আমরা একত্র রয়েছি, কিন্তু আমার তো কোন সন্তানাদি হল না। লোকে বলে, বাঁশঝাড়ে দেবতার যে মন্দির আছে সেখানে গিয়ে মানত করলে নাকি নির্ঘাত ফল পাওয়া যায়। চল না আমরা একদিন সেখানে গিয়ে একটা মানত করে আসি।"

এর মধ্যে যে কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে, যুবক তা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। সে খুশী মনে লীকে নিয়ে চলল মন্দিরে। দেবতার কাছে মিষ্টি মদ উৎসর্গ করতে হবে। সেই মদ কেনবার জন্য ছোঁ মেরে সে নিজের কোটটা তুলে নিল। তারপর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনার কাজ সারা করল। মন্দিরে একরাত্রি থেকে পরের দিন ফিরতি পথে পি হং কাং পাড়ার উত্তর দিকে প্রবেশপথে যখন এসেছে, তখন তার গৃহকর্ত্রী তার দিকে চেয়ে বলল—"আমার মাসীমার বাড়ী এই নিকটে একটা বাঁকের মুখেই। চল না সেখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে আসি?"

গাড়ী চলল তার নির্দেশ মত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মস্ত একটা পার্কের চওড়া রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াল। একটা চাকর বেরিয়ে এসে গাড়ী থামিয়ে বলল—"এটা প্রবেশ পথ।"

যুবক গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। এমন সময় আর একজন লোক এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, তারা কে। লী এসেছে শুনে লোকটা চলে গেল এবং সেটা প্রচার করে দিল। অল্প-কাল পরেই বছর চল্লিশ বয়সের একজন বিবাহিতা মহিলা বাইরে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—'আমার বোনঝি এসেছে কৈ?' লী গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে তিনি বললেন—"এতদিন কোথায় ছিলে মা?" উত্তরে কিন্তু পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন দুজনে—হাসলেনও। যুবককে তার মাসীমার সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তারা সকলে পশ্চিমদিকের গেটের সামনের বাগানটার এক অংশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। বাগানের মাঝখানে একটা প্যাগোডা ছিল। তার চার পাশের বাঁশঝাড়, নানা রকমের গাছপালা, পুষ্করিণী, বিশ্রামাগার—সব মিলিয়ে স্থানটিকে বেশ নির্জন করে তুলেছিল। এগুলো তার মাসীমার সম্পত্তি কিনা, যুবকের এ প্রশ্নের উত্তরে লী কোন কথা না বলে একটু হেসে বিষয়ান্তরে আলোচনা নিয়ে গেল।

অতি উত্তম চা সরবরাহ করা হয়েছিল। চা খাওয়া চলছিল, এমন সময় হঠাৎ বিরাট এক সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে একজন বার্তাবহ এসে থামল। সে বললে—"মিস লীর মা হ... অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—একেবারে ... হারিয়েছেন। সুতরাং আপনাদের এক... বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত।"

লী তার মাসীমাকে বললে—"আমি খু... অস্থির হচ্ছি; আমি বরং এই ঘোড়াটা ... আগে চলে যাই। আমি গিয়ে ঘোড়াটা পাঠি... দেব—তখন তোমরা দুজনে যেও।" যুবকে... ঐ সংগে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু মাসী... আর তার চাকরেরা তাকে কথান্তরে ব্যাপ... রাখায় তার আর যাওয়া হল না। তা-ছা... মাসীমা বারণও করলেন, বললেন—"কোন... আর এতক্ষণ বেঁচে আছে—নেই। তার চে... এখন ভাবা যাক কি করে তার সৎকারের ব্যব... করতে হবে। শুধু শুধু ওভাবে ছুটে ল... কি? তার চেয়ে বরং তুমি এখানে থাক এ... শোকযাত্রা ইত্যাদির কোনটি কিভাবে কর... হবে তাই আলোচনা করা যাবে।"

অনেকক্ষণ কেটে গেল—কিন্তু বার্তা... ফিরল না। মাসীমা বললেন—"তাই... এতক্ষণও কেউ ঘোড়া নিয়ে ফিরে... এ... আশ্চর্য! তুমি না হয় হেঁটেই চলে যাও, ... ব্যাপার কি? আমিও আসছি পরে।"

যুবক হেঁটেই রওনা হলো। মিসেস লী... বাড়ীর সামনে এসে দেখল বাড়ী বন্ধ, তা... ঝুলছে এবং শীলমোহর করা। সে ভ... বিস্মিত হল। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস ক... জানল—মিসেস লী কিছুদিনের জন্য বাড়ী... বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন। সময় উত্ত... হয়ে যাওয়াতে, মালিক ফিরে দখল করে... মিসেস লী কোথায় উঠে গিয়েছেন সে খ... তারা কেউ জানে না।

ভোর না হতেই সে বেরিয়ে পড়ল ... 'মাসীমার বাড়ীর' উদ্দেশ্যে—টলতে টলতে ... চলছিল কোনক্রমে।

এখানে এসে অনেকবার সে দরজায় ... দিল। তখন প্রাতরাশের সময় কোন উত্তর ... না। অবশেষে অনেকক্ষণ ধরে গায়ের জো... চীৎকার করে ডাকবার পর একটা লোক ... ভাবে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। যু... ততক্ষণে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছে। ... মাসীমার নাম বলে জিজ্ঞেস করল ... বাড়ীতে আছেন কিনা। লোকটি উত্তর দি... "ও নামে কেউ নেই এখানে।" আপত্তির স... যুবক আবার বলল—"কিন্তু কাল সন্ধ্যাবে... তিনি এখানে ছিলেন—আপনি কেন অম... মিথ্যে ধোঁকা দিচ্ছেন? তাঁর বাড়ী, তিনি... যদি এখানে না থাকেন তবে এ বাড়ীটা কার... লোকটি উত্তর দিল—"এ বাড়ী মহামান্য... সুই'র। হ্যাঁ মনে পড়ছে, কাল কতকগু... লোক তাদের দূরাগত কোন মাসতুতো ভা... আদর অভ্যর্থনা করবার জন্যে বাগানের এ... অংশ ভাড়া নিয়েছিল বটে। কিন্তু তারা সন্ধ্যের আগেই চলে গিয়েছিল।"

যুবক এর উত্তরে আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেল প্রায় পাগল হবার জোগাড় আর কি! সে যেন খেই হারিয়ে ফেলেছিল এর পর কি বলতে কি করতে হবে। তার মনে হল, পু-চেংএর কাছে চ্যাং এ্যানে প্রথম এসে সে যেখানে ওঠে সেখানে ফিরে যাওয়াই কর্তব্য। তাই সে করল।

গৃহস্বামী লোকটা দয়ালু ছিল। তাকে খেতে অনুরোধ করলেও সে মনের এই সংশয়িত অবস্থায় কিছুই খেতে পারল না। ক্রমাগত তিনদিন ধরে উপবাসে দরুণ সে ভয়ানক অসুখে হ'য়ে পড়ল। দিন দিন তার অবস্থা খারাপ হতে লাগল। তার আর বাঁচার আশা নেই দেখে গৃহস্বামী তাকে সোজা শোক-সজ্জাকারের (undertaker) দোকানে পাঠিয়ে দিলেন। শোকসজ্জাকারের কর্মচারীরা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। তাদেরই চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সে সেরে উঠল এবং লাঠির সাহায্যে চলে ফিরেও বেড়াতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যেই সে বেশ শক্তি সঞ্চয় করল। কিন্তু যখনই তার কাণে আসত মৃতের অনুগামীদের আকুল ক্রন্দনধ্বনি—যখন সে শুনত আত্মীয়-স্বজনের পিছে পড়ে থাকার ব্যাকুল আক্ষেপোক্তি—বাধাহীন অশ্রুসাগর যখন উথলে উঠত তাদের আঁখিতে, তখনই সে তাদের বাড়ীতে যেত এবং তাদের এগুলো অনুকরণ করত।

বুদ্ধিমান হওয়াতে যুবক শীঘ্রই এই 'আর্ট' আয়ত্ত করে নিল এবং অল্পদিনের মধ্যই চ্যাং-এ্যানের সর্বাপেক্ষা নিখুঁত শোককারী বলে গণ্য হল।

ঐ সময় চ্যাং-এ্যানে দুজন শোকসজ্জাকার ছিল—তাদের মধ্যে সর্বদাই ভয়ানক প্রতি-যোগিতা চলত। পূর্বদিকের লোকটা ভাল ভাল গাড়ী ও মাচান তৈরী করলেও শবানুগামীর দল তার ভাল ছিল না। এই যুবকের দক্ষতার কথা শুনে তাকে তার দলে আনার জন্য মোটা টাকা সে দিতে চাইল। এই সজ্জাকারের সমর্থন-কারীর দল—যারা তার পুঁজির খবর জানত—গোপনে যুবককে অনেক নূতন নূতন সুর শিখিয়ে দিল এবং কোন্ কোন্ কথা কেমনভাবে খাপ খাওয়াতে হয় সে সুরের সঙ্গে তাও শিখিয়ে দিল। কাউকে না জানিয়ে অনেকদিন ধরে তার এই শিক্ষা চলল। তারপর দুজন শোক-সজ্জাকারের দোকানের সাজসরঞ্জাম নিয়ে টিয়ে-মেন স্ট্রীটে এক প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হল। ঠিক হল, পরাভূত পক্ষকে খরচ-খরচা বাবদ ৫০০০০ ইয়েন নগদ দিতে হবে—প্রদর্শনীর আগে এই মর্মে একটা চুক্তিনামা তৈরী হল এবং সাক্ষীরা তাতে সইও করলে।

প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য হাজারে হাজারে লোক ভেঙ্গে পড়ল। মেয়র এর বিবরণী কেমন করে আগেই জানতে পেরেছিলেন। তিনি পুলিশের বড়কর্তাকে বললেন—তিনি আবার গভর্নরকে বললেন। শীগ্‌গীরই শহরের গণ্যমান্য সবাই এসে জড় হল নির্ধারিত জায়গায়। শহরের প্রতিটি বাড়ী হল জনশূন্য।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রদর্শনী ছিল। যত রকমের গাড়ী, মাচান, শবাধার ছিল একে একে সবই দেখানো হল—কিন্তু পশ্চিমের শোকসজ্জাকার কিছুতেই পেরে উঠল না অপর পক্ষের সঙ্গে। লজ্জায় সে অধোবদন হয়ে স্কোয়ারের দক্ষিণ কোণে সে এক বেদী তৈরী করল। অল্পকাল পরে বহু সহকারী পরিবৃত হয়ে, হাতে একটা ছোট ঘণ্টা নিয়ে মস্ত দাড়ি-ওয়ালা একজন লোক এসে দাঁড়ালো সেখানে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে চোখ তুলে একবার তাকাল, তারপর বুকের সামনে হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার করল। বেদীর উপর উঠে এর পর সে "শ্বেত অশ্বের শোকগাথা"টি গাইলে। শেষ হলে পর সে একবার অগ্নি-দৃষ্টিতে চাইলে, যেন তার বিরুদ্ধবাদীর দলকে ছাই করে দেবে। অবশ্য সকলে তার প্রশংসা করল। সে নিজে মনে করল—এ-যুগের অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি সে এবং তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কেউ জন্মায়নি আজও।

কিছুক্ষণ পরে পূর্বদিককার শোকসজ্জা-কারকে দেখা গেল সেই স্কোয়ারের উত্তরদিককার কোণাতে কতকগুলি বেঞ্চি সাজাচ্ছে। তারপর কালো টুপি মাথায় একজন যুবক এগিয়ে গেল আর তার পিছনে পাঁচজন তার সহকারী—হাতে তাদের শবাধার সাজানোর নক্সা করা পালকগুচ্ছ; এই যুবকই আমাদের গল্পের নায়ক।

সে "ডিউক অন দি গারলিক" শোক গাথাটি গাইল। তার স্বর এত স্পষ্ট এবং করুণ ছিল যে তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল দূরে বনানীর পাতায় পাতায় কম্পন তুলে। প্রথম সর্গ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, সবাই চাপা-স্বরে কাঁদছে আর অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করছে।

আমোদ-প্রমোদ শেষে সবাই পশ্চিমের সজ্জাকারকে উপহাসে জর্জরিত করে তুলল। সে নিজেও এতটা অস্বস্তি বোধ করছিল যে সে তখনই তার দর্শনীয় জিনিষপত্র নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

এখন রাজা একটা হুকুম জারী করেছিলেন যে বাইরের গভর্নরদের বছরে অন্তত একবার করে রাজধানীতে এসে তাঁকে জানাতে হবে—তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

এই সময় যুবটির পিতা চ্যাং চৌ প্রদেশের গভর্নর হিসাবে তাঁর রিপোর্ট দেওয়ার জন্য রাজধানীতে এসেছিলেন। এই প্রতিযোগিতার কথা শুনে, তিনি এবং তাঁর আর কয়েকজন সহকর্মী সরকারী পোষাক-আসাক ছেড়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। এ'দের সঙ্গে এক-জন বৃদ্ধ চাকর এসেছিল, সে ছিল আবার যুবকটির দাইমার স্বামী। তাদেরই হাতে করে 'মানুষকরা' ছেলের মতন চালচলন ও কথা-বার্তার ভঙ্গী দেখে তার কেমন সন্দেহ হল। সে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের জিজ্ঞেস করল—"এই যে লোকটা এমন অপূর্ব ভঙ্গীতে গান গাইলে, সে কে?" উত্তর হল—"ওই অমুকের ছেলে।" যুবকের নামও তার কাছে অপরিচিত, কারণ সে তখন একটা ছদ্ম নামের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। তার এতটা ধাঁধা লাগল যে সে নিজে পরীক্ষা করে দেখবে বলে স্থির করল। কিন্তু যুবকটি যখন বৃদ্ধকে তার দিকে আসতে দেখল তখন সে হঠাৎ একটা অস্বস্তি অনুভব করল এবং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভীড়ের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে চেষ্টা তার সফল হল না। বৃদ্ধ খপ করে তার জামার আস্তিনটা ধরে ফেলল, বলল—"তুমি! আমি জানতাম তুমি ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।" কিছুক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় থেকে দুজনেরই চোখে জল এল। তারপর তারা পিতার আশ্রয়স্থলে গিয়ে উঠল।

কিন্তু পিতা রেগে উঠলেন। তিনি বললেন—"তোমার আচরণ আমাদের কুলে কালি দিয়েছে—আবারও তুমি মুখ দেখাতে এসেছ?" এই বলে তিনি তাকে বাড়ীর বাইরে টেনে আনলেন। তারপর চুয়াং-এর দীঘি আর এ্যাপ্রিকটের বাগানের মাঝে যে মাঠটা সেই মাঠে এনে দাঁড় করালেন। এখানে এনে তার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নিলেন। তারপর এমনভাবে চাবকাতে আরম্ভ করলেন যে যুবক শেষে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তিনি তখন তাকে সেই অবস্থায় রেখে ঘরে ফিরে এলেন।

যুবকের সঙ্গীত শিক্ষক তার কয়েকজন বন্ধুকে বলেছিল—তার কি অবস্থা হয় সেটা নজর রাখবার জন্য। তারা যখন তাকে উপরোক্ত অবস্থায় মৃতের মত পড়ে থাকতে দেখল, তখন ফিরে এসে অন্যান্য সকলকে এই খবর দিল।

এই সংবাদে ব্যাপকভাবে বিলাপের সৃষ্টি হল এবং দেহটিকে ঢাকা দেওয়ার জন্য দুজন লোক পাঠানো হল একটা মাদুর তাদের সঙ্গে দিয়ে। তারা মাঠে এসে দেখল সে তখনও বেঁচে আছে। তারা তাকে খাড়া করে কিছুক্ষণ ধরে রাখল এবং এতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আবার স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইতে আরম্ভ করল। তারা নিজেরাই তখন ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসে নলের সাহায্যে তাকে কিছু তরল পানীয় খেতে দিল। পরের দিন সকাল বেলায় তার জ্ঞান ফিরে এল বটে, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত সে হাতপা নড়াতে পারত না। তাছাড়া চাবুকের ক্ষতগুলি এতই বীভৎস আকার ধারণ করেছিল যে তার বন্ধুদের ভয়ঙ্কর বিরক্তি এসে গেল; তাই তারা একদিন রাত্রিতে তাকে রাস্তার মাঝে ফেলে দিয়ে এল। পথ-চলতি লোকে তার এই দুর্দশায় দয়াপরবশ হয়ে কিছু কিছু খাবার ফেলে দিয়ে যেত।

এই খাবারের পরিমাণ এত বেশী হল যে, মাস তিনেকের মধ্যে সে লাঠি ভর দিয়ে বেড়াতে সুরু করলে। তারপর সে আরম্ভ করল—অপেক্ষাকৃত নির্জন অঞ্চলে পেশাদার ভিক্ষুকের মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা, হাতে একটা ছোট পাত্র, গায়ে তার শতছিন্ন সুতী কোট।

শরৎকাল গিয়ে শীতকাল এল। তার রাত্রি কাটতে লাগল সরকারী পায়খানাগুলোতে আর দিন কাটতে লাগল—বাজারে এবং মেলাতে হানা দিয়ে।

সেদিন ভয়ানক বরফ পড়ছে। শীতে এবং ক্ষুধায় অস্থির হয়ে তাকে তবু রাস্তায় বেরুতে হয়েছে। তার ভিখারীর মর্মস্পর্শী কাতরুক্তি প্রতিটি শ্রোতাকেই বিচলিত করে তুলেছিল;—কিন্তু বরফ ছিল তার চাইতেও নির্মম, তাই সেদিন ক্বচিৎ কোন বাড়ীর দরজা খোলা ছিল—রাস্তায় লোকজন তো ছিল-ই না।

সিউনি দেওয়ালের ৭ কি ৮নং বাঁকে অ্যান-ই'র পূর্বদিককার গেটে সে যখন এসে দাঁড়াল, ভাগ্যক্রমে একটা বাড়ীর দরজা অর্ধোন্মুক্ত ছিল। যুবক জানত না বটে, কিন্তু এই বাড়ীতেই তখন মিস লী ভাড়া নিয়ে বাস করছিল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ক্রন্দনধ্বনি তার জেগে উঠল।

শীত এবং ক্ষুধায় তার কাতরধ্বনিতে এমন একটা করুণ সুর বেজে উঠেছিল যে, যারা শুনেছে তারাই মর্মে মর্মে অনুভব করেছে।

মিস লী শোনামাত্রই চাকরকে ডেকে বলল—"ঐ লোকটি অমুক—আমি তার গলা চিনি।" ঝড়ের বেগে সে দরজায় এসে দাঁড়াল। ক্ষুধায় শীর্ণ এবং ক্ষতে বিকৃত দেহে তার প্রণয়ীকে এ অবস্থায় দেখে সে অসম্ভব ভয় পেয়ে গেল। যুবকও যেন আবেগে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল; তার আর মুখ ফুটে কথা বেরুল না—ঠোঁট দুটো শুধু একবার নড়ে উঠল।

যুবতী আর স্থির থাকতে পারল না—দুবাহু বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করল; নিজের কারুকার্যখচিত পোষাকে তাকে আবৃত করল; তারপর তাকে বৈঠকখানায় নিয়ে এল। তাকে বসিয়ে নিজেকে তিরস্কার ছলে সে একবার অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—আমারই কৃতকর্মের জন্য তোমার আজ এই দুর্দশা।—তারপরই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মা ছুটে বেরিয়ে এলেন কাঁপতে কাঁপতে; জিজ্ঞেস করলেন কে এসেছে। ইতিমধ্যে মিস লীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে-ই বলল, কে এসেছে। শুনেই বৃদ্ধা রাগে চীৎকার করে উঠলেন—"বের করে দাও তাকে এক্ষুণি। কেন তাকে এখানে আসতে দিয়েছ?"

মিস লী যেন সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। বৃদ্ধার দিকে চোখ তুলে তাকাল; তারপর বললে—"না, সে ভদ্র ঘরের ছেলে। একদিন সে দামী গাড়ী হাঁকাত, জামাতে ছিল সোণার কাজ করা। আমাদের সংস্পর্শে এসেই সে সব কিছু হারাল। আমরা দুজনে ষড়যন্ত্র করে তাকে আজ সর্বস্বান্ত করেছি। আমরা কি মানুষের মত আচরণ করেছি!

মিস লী বলতে লাগল—"দেশের প্রতিটি লোক জানে তার এ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। রাজার সভাসদবর্গের মধ্যে তার আত্মীয়-স্বজন বহু আছে। তাদের কেউ কোনদিন ক্ষমতা হাতে পাবে। তখন অনুসন্ধানের ফলে আমাদের আর সর্বনাশের কিছু বাকী থাকবে না। আমরা ভগবানকে উপহাস করেছি, মনুষ্যত্বের ধার দিয়েও যাইনি—সুতরাং আমাদের পক্ষে আজ কেউ নেই, না ভগবান—না মানুষ। আর না—ও-রকম বেপরোয়াভাবে পাপের কাজকে আজ থেকে নমস্কার!

"তোমার মেয়ের মত হয়ে আজ বিশ বছর কাটালাম। আমার পিছনে এতদিন তোমার খরচ হয়েছে, আমার মনে হয় প্রায় সহস্র স্ব মুদ্রার কাছাকাছি। তোমার বয়স এখন যা ধর আরও কুড়ি বছরের ভাতকাপড়ের শীন আমি তোমাকে ধরে দিই, তবেই আমি তো ঋণমুক্ত হতে পারি, নয় কি? আমার ইচ্ছা, যুবকের সঙ্গে পৃথকভাবে বাস করি। আ আমরা বেশী দূরে যাব না। রোজ সক বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে এবং আ মতই সম্মান তুমি পাবে আমাদের কাছে।"

'মা' দেখল এর আর প্রতিবাদ করে ব হবে না; এবং ব্যবস্থাটাও মন্দ বলে মনে না। তিনি তাই রাজী হলেন। মুক্তির মূ স্বরূপে দেওয়া-থোওয়ার পর মিস লী দে তার আর আছে মাত্র শতখানেক স্বর্ণমু তাই দিয়েই পাঁচটা বাড়ীর পর তারা এ খালি বাড়ী ভাড়া করল। এখানে এসে যুব

ান করাল, কাপড়-চোপড় বদলিয়ে দিল, দ্‌প খাওয়াল। ক্রমে ক্রমে দুধ-ঘি খাইয়ে বেশ নাদুস-নুদুসও করে তুললো।

ছুদিন পর থেকে তাকে দেখাতে লাগল দেশের ও সাগর-সমুদ্রের অলৌকিক রাশি। ক্রমে তার মাথায় উঠল টুপি, সর্বোৎকৃষ্ট মোজা ও জুতো। বছর-র মধ্যেই সে তার আগেকার স্বাস্থ্য পেল।

কদিন লী তাকে বলল—"দেখ এখন তো শরীর সেরেছে, মানসিক অবস্থাও কখনও কখনও নিভৃতে গভীর চিন্তা-য়ে আমি ভাবি, তোমার অতীতের সম্বন্ধে পড়াশুনার কিছু মনে আছে ভেবে আশ্চর্যও হই।" যুবক একটু উত্তর দিল—"হ্যাঁ আছে, তবে ১০ ভাগের ভাগ মাত্র।"

স লী গাড়ী প্রস্তুত করে আনতে হুকুম যুবক অশ্বপৃষ্ঠে চলল তার পিছনে।

গেটওয়ারের দক্ষিণে একটা গেটের প্রথম শ্রেণীর (classical) এক পুস্তক র দোকানের সামনে এসে তারা দাঁড়াল। ন একশত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়িত হল যুবকের ইচ্ছামত যত বই দরকার সব কিনতে বলল। তারপর বইগুলো গাড়ীতে লীর দিকে গাড়ী চালাল। সমস্ত চিন্তা দিয়ে, শুধু পড়াশুনায় মন দিতে এব যুবককে বাধ্য করলে।

র বছরের মধ্যে সে তার পাঠ্য বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে ফেলল। দেশের বড় বড় পণ্ডিতরাও তার প্রশংসা লাগল। লীকে সে বলল—"আমি পরীক্ষার জন্য তৈরী।" লী রাজী হল প্রথমে যুদ্ধের জন্য পঠিত বিষয়সমূহ আবার পড়তে বললে। তৃতীয় বৎসরান্তে তুমি এখন যেতে পার।" পরীক্ষাতে সেই সে যখন পাশ করল তখন দ্রুত নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। তার বিদ্যুৎ বয়স্ক ব্যক্তিরাও সুখ্যাতি করে পারলেন না—এমন কি অনেকে তার বন্ধুত্বও কামনা করলেন।

কিন্তু মিস লী তাকে এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব দিল না, বলল—"শোন, একটা কথা—সবাই মনে করে বি এ পাশ করলেই মনে করে, সকলের মধ্যে একটা সুবিধাজনক পদ পেতে এবং সার্বজনীন খ্যাতিরও যোগ্য। তোমার অতীতের অখ্যাতি ও অগৌরব একটু বেকায়দায় ফেলেছে—তোমার সহপাঠী গুণীদের কথা ছেড়ে দাও। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা আরও একটু পালিশ চকচকে কর—আর একটা যুদ্ধ জয় করতে হবে। তখনই তুমি বড় বিদ্বান ও গুণীদের সঙ্গে সর্বাংশে সমতুল হতে পারবে।"

যুবকও তার কথামত চেষ্টা করতে লাগল এবং তার দর বাড়াতে চেষ্টা করল। এখন—সেবার রাজা হুকুম দিলেন—রাজ্যের অনন্য-সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন প্রার্থীদের বাছাই করবার জন্য সেবার একটা বিশেষ পরীক্ষা হবে। যুবকও একজন প্রতিযোগী ছিল। পরে দেখা গেল—পরীক্ষায় যুবক প্রথম স্থান অধিকার করেছে। চেং টু ফু'তে এরপর তাকে সৈন্য পরিদর্শনের পদ দেওয়া হল।

কাজের জন্য সে তৈরী হচ্ছে, এমন সময় লী এসে তাকে বলল—"এখন তুমি জীবনে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছ, আমি এখন আর তোমার বোঝা বাড়াব না, আমায় এবার মুক্তি দাও। কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলার পাণিগ্রহণের চেষ্টা কর। অসম-মিলনের দিকে গিয়ে তোমার ভবিষ্যৎকে তুমি নষ্ট কর না। যাক, বিদায়—আচ্ছা, এখন আসি!"

যুবকের চোখে জল দেখা দিল, এমন কি লী তাকে ছেড়ে গেলে আত্মহত্যা পর্যন্ত করবে বলে ভয় দেখাল। লী তবু অনমনীয়—তার সঙ্গে যেতে রাজী হল না। আবার যুবক কাতর প্রার্থনা জানাল, তাকে সে যেন ছেড়ে না চলে যায়। অবশেষে নদী পার হয়ে চীয়েন-মেন পর্যন্ত তার সঙ্গে যেতে লী রাজী হল; বলল—"ঐখানে কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।" যুবক রাজী হল; কিছুদিনের মধ্যেই তারা চীয়েন-মেনএ পৌঁছল। সে পুনর্বার যাত্রা আরম্ভ করবার আগেই এক ঘোষণাপত্র জারী হল যে, যুবকের পিতা চ্যাং-চৌ-এর গভর্নরকে চেং-টুএর গভর্নর নিযুক্ত করা হল, তিনি চিয়েন-নান এলাকার ম্যানেজারের কাজও করবেন। পরেরদিনই পিতা এসে হাজির। যুবক গিয়ে নিজের কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পিতা তাকে না চিনতে পারলেও ভুল করবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ কার্ডেই যুবকের বিস্তৃত পরিচয় ছিল—তার বাবা, ঠাকুর্দার নাম, গোষ্ঠীগত উপাধি ইত্যাদি। এ সমস্ত দেখবার পর বাস্তবিক তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে ছেলেকে উপরে আসতে বললেন। তারপর আদর করতে লাগলেন—আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ল তার দুচোখ বেয়ে। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন—"আজ আবার আমরা পিতা-পুত্র এক হলাম। তারপর তোমার খবর আদ্যোপান্ত সব বল, শুনি।" যুবক যখন তার রোমাঞ্চকর কাহিনী বলল, শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ শুধালেন—"লী এখন কোথায়?" যুবক বলল—"সে আমার সঙ্গে এই পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু এখন সে ফিরে যাবে এখান থেকে।"

"ফিরে যাবে বললেই হল, না তা হবে না।" পিতা বললেন। তারপর তিনি ছেলেকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, চেং-টুতে তার কার্যস্থলে হাজিরা দেওয়ার জন্য; আর এদিকে লীকে চীয়েন মেন-এ আটকিয়ে রাখলেন। লীর জন্যে সুন্দর একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে দিলেন। তারপর ঘটক ডাকা হল এবং তাকে এই দুই পরিবারের মিলন ঘটাবার জন্য প্রাথমিক কর্তব্যসমূহ করতে বলা হল। অভ্যর্থনার ক্রিয়া-কর্মও শেষ করতে বলা হল। চেং-টু থেকে ইতিমধ্যে যুবক ফিরে এল এবং দুজনের বিয়ে হয়ে গেল যথারীতি। বিয়ের পরে মিস লী কিন্তু অনুগত স্ত্রী এবং উপযুক্ত গৃহকর্ত্রীরূপে পরিচয় দিয়েছিল, আর সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছিল।

কালক্রমে তার চারটি ছেলে হয়েছিল—সকলেই কৃতী। যে কিছু করতে পারেনি, সে-ও তাই-টয়ানের গভর্নর হয়েছিল। আর তার অন্যান্য ভাইয়েরা বড় ঘরে বিয়ে করেছিল। এতে ঘরে এবং বাইরে যুবকের যে সৌভাগ্য হয়েছিল, তার তুলনা নেই—সকলেরই ঈর্ষার বস্তু।

এক বারবনিতার চরিত্রে এই অপূর্ব আনুগত্যের তুলনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নায়িকাদের মধ্যেও দুর্লভ। সত্যিই এ গল্পে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সকলেরই পড়বে জানি।

আমারই সম্পর্কিত এক কাকা চীন-চৌএ গভর্নর ছিলেন। পরে তিনি অর্থসচিবের দপ্তরে কাজ করেন। সেচ বিভাগে তিনি ইন্সপেক্টরের কাজও করেছিলেন। সর্বশেষে তিনি পথঘাট ইত্যাদির ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন। এ সমস্ত অফিসে কাজ করবার সময় লীর স্বামীকে তিনি সহকর্মীরূপে পেয়েছিলেন। তাতেই লীর সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত জানতে পেরেছিলেন। চেংটয়ানে থাকাকালীন আমি একদিন লুং হাইয়ের অধিবাসী লী-কুং সো'র সঙ্গে গল্প করছিলাম। কথায় কথায় এসে পড়ল, যে সমস্ত স্ত্রী তাদের চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, তাদের গল্প। আমি তাকে মিস লীর গল্প শুনালাম। মুগ্ধ-বিস্ময়ে সে শুনবার পর আমাকে এটা লিখবার জন্য অনুরোধ করলে। আমিও তাই কলম ধরলাম এবং তাই আজ এই গল্প দাঁড়িয়েছে।

অনুবাদ—শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ

# সাহিত্যে নতুন কথা

শ্রীঅজিতকুমার মিত্র

আমাদের ধর্ম সাহিত্য এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। অন্য কোন ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে এই ধর্মের সাহিত্যের উদ্ভব হয়নি। যুগে যুগে ধর্মের সাহিত্যের অভ্যুদয়ে নূতন ধারার প্রবর্তনও হয়েছে, কারণ সাহিত্যই মুখ্যত ধর্মপ্রচার করেছে। ইতিহাসে অসিবলের দ্বারা হিন্দুধর্ম প্রচার কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। তার কারণ এত প্রচারকের আবির্ভাবও হয়নি অন্য কোন ধর্মে। প্রচারকদের অনুপ্রেরণা দেবার ক্ষমতা ছিল, তাঁদের মধ্যে ছিল আকর্ষণী শক্তি। আর তখনকার জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার থাকায় পুস্তক ধর্মের সব কথা সাধারণ্যে প্রচার করতো।

হিন্দুধর্মের ইতিহাসে জোয়ার এল। সেদিনকার বাঙালী দেখলো নদীয়ার মাটিতে চাঁদের উদয়। ভাব-বিহ্বল বাঙালী কি ভাবোন্মাদ গোরাচাঁদের আবির্ভাবে বিশাল বৈষ্ণব-সাহিত্যের সম্ভাবনা কল্পনা করতে পেরেছিল? কিন্তু পাগল ছেলের পথে পথে গেয়ে-যাওয়া গানে বাঙলার আকাশ বাতাস ভরে গেছে। সেদিন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাবে যুগপৎ বাঙলা সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের উন্নতি হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য। বৈষ্ণব কবিদের প্রেম, অধ্যাত্মচিন্তা, তাঁদের ভক্তি সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ ক'রে তুলট কাগজের পাতায় নিবদ্ধ হয়ে রইলো। শুধু যে পুঁথির পাতায় কথার শিকলে বাঁধা পড়ে গেল তা নয়; তার ভাব সাধারণ্যে প্রচারের জন্যে গায়কেরা উঠে পড়ে লেগে যায়। এইভাবে কীর্তন গান, কৃষ্ণমংগল গান ও চৈতন্যমংগল গান প্রভৃতি সংগীত ধারার সৃষ্টি। এইভাবে রাম, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার ও লোকশিক্ষা প্রসারের জন্য যথাক্রমে রামমংগল, চণ্ডীমংগল ও মনসা মংগলেরও উৎপত্তি। তাই আমরা দেখি, কীর্তনিয়া, কথকঠাকুর, মূল গায়েন প্রভৃতির মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে বেঁচে থাকতে তা' তারা জাতি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বা অন্য যে কোন বর্ণের হোক না কেন।

কিন্তু একথা আমরা লক্ষ্য করি না যে, এক একটা জাতি এক ধারার সাহিত্যকে অবিকৃত অবস্থায় মুখে মুখে বংশের পুরুষ পরম্পরায় বাঁচিয়ে রেখেছে। এ সব গানের কোন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় না। এবং এই সাহিত্যই এদের জীবিকার্জনের সহায়তা করে চলেছে। আমরা এ রকম তিনটি জাতির সন্ধান পাই।

বাঁকুড়া জিলার গোয়ালী। গোয়ালী জাতি অক্ষয়ার দিনে কালেভদ্রে গৃহস্থের বাড়িতে এসে ছোট মন্দিরা বাজাতে বাজাতে ভগবতী মংগল গান করে। এবং সেই সংগে গরুর ব্যাধি চিকিৎসা করেও বেড়ায়। এই এদের জীবিকা। গোয়ালী জাতির ভগবতী মংগল কাব্যেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বিক্ষিপ্ত কাব্যাংশ লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়। এ কাব্যে "কবি চন্দ" নামক কবির ভণিতা আছে।

> কবি চন্দ বলে মাগো অবনীতে চল।
> শিবের দোহাই যদি আর কিছু বল॥

এই ভণিতা ছাড়া রচনার সাল-তারিখ বা আর কোন জ্ঞাতব্য অবধারণ করা যায় না। তবে শ্রদ্ধেয় দীনেশ সেন মহাশয়ের 'বংগ ভাষা ও সাহিত্যে' কবি চন্দের কোপিলা মংগল কাব্যের নাম পাওয়া গেছে, কিন্তু কোন পুঁথির সন্ধান মেলে না। গোয়ালীরাও কোন সন্ধান দিতে পারে না। কবি চন্দ বৈষ্ণব যুগের লোক। মনে হয়, পঞ্চদশ শতাব্দী হ'তে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই তাঁর আবির্ভাবকাল। কবি চন্দের রচিত উদ্ধব সংবাদ নামক একখানি পুঁথি পশ্চিমবংগে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের অব্যক্ত প্রেমলীলার স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস যে সাধক বৈষ্ণব কবির মধ্যে তাঁর দ্বারা কোপিলা মংগল-বা ভগবতী মংগল কাব্য রচিত হওয়া দুরূহ না হলেও স্বাভাবিক নয়। কারণ, সে যুগে কোন বৈষ্ণব কবির রামমংগল বা অন্য কোন কাব্য পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব ধর্মের রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যই ছিলেন তাঁদের সাহিত্যের উপজীব্য। অবিশ্যি চৈতন্য-পূর্ব যুগের বিদ্যাপতির কথা বাদ দিলে। তুর্কী আক্রমণ যুগে বৈদেশিকদের অত্যাচার বশতঃ গোজাতির প্রতি সাধারণের স্নেহ-মমতা অত্যধিক বেড়ে যায়। তখন গোজাতির মাহাত্ম্য লোকমুখে প্রচারিত হ'ত। সে প্রায় খৃষ্টীয় ১১০০ সাল থেকে ১২০০ সালের কথা। তখন রাষ্ট্রবিপ্লব সাহিত্যে ভাঁটা এনে দেয়। পরে মংগল কাব্যের চরম অভ্যুত্থান যুগের খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ণবিকাশ। গরুকে হিন্দুরা দেবতার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সাহিত্যে মানুষ ভগবানের পূজা করে। বৌদ্ধ চর্যাপদ থেকে এই বিংশ শতাব্দীর গীতাঞ্জলির মধ্যেও এ ভাবের ব্যত্যয় দেখি না। ভগবতী মংগল কাব্য বহুদিনের ভালবাসা ও ভক্তির নিদর্শন; নিশ্চয় পূর্ব প্রচলিত উপদেশ এবং গল্পকে কবি চন্দ কবিতায় রূপান্তরিত ও সংস্কৃত করেন। গোপালন, নীলাবতীর গো পূজা প্রভৃতিতে কোন ভণিতা নেই, কেবল কোপিলার মর্ত্যে আগমন পর্বেই কবি চন্দের নাম পাওয়া যায়।

গরুর পালন করতে হ'লে কতকগুলি বিধি নিষেধ মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। এ কাব্যে অনেকগুলি বিধি নিষেধ আছে। গরুর তথা গৃহস্থের মংগলের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থ এ সব মেনে চলে। অশীতিপর বৃদ্ধারা, এক মুষ্টি ভিক্ষা হাতে বাড়ির বৌ এবং ছোট বড় মেয়ের বাড়ির দরজা ধরে শোনে, উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ভগবতীকে।

> চালভাজা কলাইভাজা গোয়ালে বসে খায়।
> তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্য বাড়ী যায়॥
> পান খেয়ে পানের চিবা গোয়ালে ফেলায়।
> তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্যবাড়ী যায়॥
> বড় বসন্তে তার গরু ধনো যায়॥
> রবিবার দিনে যে জন মাছপোড়া খায়।
> ধড়ফড়িয়া রোগে তার গরু ধনো যায়॥
> বাড়া ভাতের খোড়া নায় গোয়ালে দেবা রাখে।
> উদুন কেঁউরে তার গরু ধন ঘুচে।
> ভাদ্র মাসে গোয়ালে যেবা দেয় মাটী।
> নব লক্ষ ধেনুর পাল যায় গুটী গুটী॥
> ভাদ্রমাসে গোয়ালেতে তাল ভোগ খায়।
> তাল ও বেতালে তালে গরু ধনও যায়॥
> সিনান করে এসে গোয়ালে কাপড় শুকায়।
> তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্য বাড়ী যায়॥
> জুতা পায়ে দিয়ে যেবা গোয়ালে সিন্ধায়।
> তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্যবাড়ী যায়॥
> চামদল বসন্তে তার গরু ধনও যায়॥
> কাঁঠাল খাইয়ে ভোঁতা গোয়ালে ফেলায়।
> কাঁঠালে বসন্তে তার গরু ধন যায়॥
> রম্ভা খাইয়ে চোকা গোয়ালে ফেলায়।
> ঘুঁটে পিলুয়ে তার গরু ধনও যায়॥
> এলোকেশ করে নারী গোয়ালে সিন্ধায়।
> তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্যবাড়ী যায়॥
> গরুর পালন কর গরু বড় ধন।
> যার ঘরে গরু নাই তার বিফল জীবন॥

গৃহস্থকে গোজাতি সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য নীলাবতীর 'গোপূজা' নামক উপাখ্যানের পরিকল্পনা। নীলাবতী ছয় বৌ-এর শাশুড়ী। একদিন সমস্ত বৌদের ডেকে সে গো-সেবার জন্য প্রত্যেকের এক একদিন করে 'পালি' করে দিল। শাশুড়ী বড় বৌকে

> বাসুলী পাজুলী দিল গলাতে মাদুলী।
> হুড়া পাঁচ গাছুয়া দিল সোনার চাঁপকলি॥
> রুমু ঝুমু শব্দে বৌ গোয়ালে দিল পা।
> গোবর দেখে কাঁদে বৌ কপালে মারে ঘা॥
> নিগুরের (?) ঘরে যদি বাপে বিবাহ দিত।
> কেন তবে সাধের শরীর গোবর লাগিত॥
> সোয়ামীর সৌভাগ্য হবে বসিতাম খাটে।
> এক খণ্ডে গোবরে গো মোর প্রাণ ফাটে॥
> এই হাতে গো যদি আ আমি গোবর ঠেলিব।
> ঘরে গিয়ে অন্ন আমি কেমনে খাইব॥

আর একটি বৌ এল নামে চন্দ্রকলা।
গোয়াল কাড়িতে যায় গো ঠিক দুপুর বেলা।
সেজো বোয়ে মেজো বোয়ে চাল ধুতে যায়।
ইধার উধার চেয়ে বৌরা খামল পাঁচ ছয় খায়॥
আর একটা বৌ থাকে উলার ঘরের দুলা।
পাট করিবার সময় হইলে বৌ গায়ে মাখে ধুলা॥
আর একটি বৌ থাকে চিমরা চামর।
সাত হাঁড়ি পিঠা মুড়ি বৌ-এর একই কামড়॥
সেজো বৌয়ে মেজো বৌয়ে শিব পূজা করে
ফুল তুলতে দেয়ে বৌগো বনবাস করে॥
ল বৌ থাকে দেখ গো চিকশালে পড়ে।
গোয়াল কাড়িবার সময় হইলে বৌ যায় কুন্দলে
করে॥

বড় বৌ বলে গো মা হৈত বড় জ্বালা।
আজ বুঝো দেখ গিন্নী ছোট বোয়ের পালা॥
ছোট বৌ বলে আমার গায়ে এল জ্বর।
আজ লাড়বো গোয়াল কাড়তে নিকাইব ঘর॥
আর একটি বৌ এল হরি ঘোষের ঝি।
তাহার গুণের কথা কইবো আর কি॥
ঘুরিয়ে কাটার মুড়া গরুকে মারিল।
ছয় মাসের গর্ভ গাই খসিয়া পড়িল॥
অঝোর নয়ন গাই কাঁদিতে লাগিল।
দূর দূর করিয়া কোপিলাকে গাল দিল॥
চাঁড়ুবারে গেল পাল ফিরে না আইল।
চালের বাতা ধরে বৌরা নাচিতে লাগিল॥
চাল হইল ঘুচে গেল শ্বশুর ঘরের পাল।
সাঁঝ সলতে গোয়াল কাড়া ঘুচিল জঞ্জাল॥
দুঃখ ঘুঙ নয়ে গিন্নী বেচিতে চলিল।
মাঝপথে ভগবতী দরশন দিল॥
কোথা যাও মা ভগবতী কোথায় গমন।
কেউ কিছু বলেছে কি ঘরের বৌ জন॥
ভগবতী বলে গিন্নী মা কইবো আর কি।
তোমার বৌদের জ্বালায় ঘর ছেড়েছি॥
যটি বৌ দেখ তোমার ছয় বহু করে।
ঘুরিয়ে কাটার মুড়া ভেঙেছে পাঁজরে॥
চল মোর ভগবতী চল মোর ঘরে।
সদাই রাখিব আমি হৃদয় মাঝারে॥
এত বিবচন যদি গিন্নী কইলো।
ফের ভনায় ভগবতী ঘর ফিরে এল॥
ছয় বৌ করেছিল কোপিলার অপমান।
কোপিলার সাক্ষ্যে তাদের কাটিল নাক কান॥
ছয় বোয়ের আঙুল কেটে বাতি সাজাইল।
কোটার মানুষ নাম প্রদীপ গাড়িল॥
পা কেটে রক্ত নয়ে আলিপনা দিল।
বেশদন্ড কাটিয়ে চামরে ঢুলালো॥
ছয় বোয়ের জিভ কেটে কলা পত্রে দিল।
মাথুরের পাখাতে মায়ের গোয়ালী ছেয়ে দিল॥
গোয়ালী ডাকিয়া মায়ের গোয়াল বাজিল॥
কাটিয়া করিয়ে কাট দেয় সাত বার।
তিন বার মার্জ্জন করে কেশেতে আপনার॥
ধূপধূনো প্রদীপ জ্বালেন সারি সারি।
ধেড়বারে করেন সেবা চিত্তবতীর নাড়ী॥
কোপিলার মত বল কেবা পুণ্যবান।
গোলোকেতে করেন বাস সিদ্ধপদসহান॥
অসংখ্য ভগবতী অসংখ্য রাখাল।
বিনোদ রাখাল যত দিবা পালা যায়।
বনফুলের চূড়া বাঁধে শিরি মাথে গায়॥
পাঁচুনী ফিরায় সবে করে হোর হোর।
সবাই বলে মোরবী ঘোষের পাল আসিছে ঐ॥

কোপিলার মর্ত্যে আগমন পর্বে ধরায় জন-গণ রক্ষার্থে ভগবতী দেবীকে অনুনয় করা হয়েছে। পরে তিনি পৃথিবীতে গরুর শত সহস্র দুঃখের কথা বর্ণনা করেছেন। * * *

বরষায় বিষম দুঃখ পাইব চার মাস।
বাহিরে বাঘের ভয় ঘরে মশা ডাঁশ॥
কলিকালের লোক দেখ বড়ই সিয়ান।
মৃত্তিকার ভাঁড়ে করে দুগ্ধের অনুমান॥
কুলাই চক্ষেতে দেবে ঠুলি ঘুরাইবে চক্রে।
কোনরে অপরাধ আমি ঠুলি নিব চক্ষে॥
গরুভার পাহার যদি না পারি সহিতে।
পাঁভিয়া গরু বলিয়া মারিবে চারিভিতে॥
উত্তম ছাগর (বাচ্চা) মোর হইবেক যদি।
নিষ্কামে ধরিবে (বলদ করে দেয়)
ওগো জনম অবধি॥
অনেক দূরে গেয়েছে পাল মা আসিবে উছুর
(শেষ বেলা)।
যত্ন ক'রে খোয়াড়ে মা বাঁধিবে বাছুরে।
অন্য ঘরে বাঁধিবে বাছুর ভিন্ন ঘরে গাই।
সারা রাত্রি মায়ে ছায়ে দেখা শুনা নাই॥
পিছুকার পায়েতে মা ছাঁদন দড়ি দিবে।
চারিটা বাঁটের দুগ্ধ কাড়িয়ে লইবে॥

**বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জিলার নাগা বৈরাগী**

এরাও জাত-ভিখারী তবে গোয়ালীদের থেকে কিছু শিক্ষিত। নিজেরা সত্যমংগল গান ক'রে বেড়ায়। এই সত্যমংগল বহুল-প্রচারিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। তবে এতেও নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। ঝিঁ ঝিঁ মুখরিত দূরে পল্লীর গৃহস্থের দরজায় এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য নাগা বৈরাগী একটানা পয়ার ছন্দে মাহাত্ম্য কীর্তন করে। ভক্তি আনত শিরে শোনে পল্লীবাসী। ধর্মের প্রচার হয়, লোকশিক্ষার প্রসার হয়। এই কাব্যে কোন লেখকের নাম পাওয়া যায় না। বাঙলার পাঁচালী গানের যুগে এই কাব্যের উৎপত্তি কিন্তু দ্বিজ রামভদ্রের সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মত ইহা জনচিত্ত আকর্ষণ করতে পারেনি। যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড়া বাঙলা সাহিত্যে আরও অনেক রামায়ণ আছে যদিও, তবুও পূর্বোক্ত গ্রন্থের মত সমাদরলাভ করেনি। নাগা বৈরাগীদের মুখ থেকে শোনা ছাড়া এ গানেরও কোন পুঁথি পাওয়া যায় না।

এক সওদাগরের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের দুটি সন্তান। একটি ছয় বৎসরের অপরটি বারো বৎসরের। ছেলে দুটি অতি কষ্টে 'মানুষ' হয়। বিমাতা সব সময় তাদের মৃত্যু কামনা করে। পিতা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই থাকে, ছেলেদের প্রতি তার কোন দৃষ্টি নেই। কিন্তু ছেলে দুটির সহায় স্বয়ং সত্যনারায়ণ, কারণ, এদের মা সত্যনারায়ণের পূজা দিয়ে সুকুমার ও নবকুমারকে লাভ করে।

দিনে দিনে দিন যায়। আরও তিন বৎসর গত হ'ল। সওদাগরের স্ত্রী কংকা কিন্তু সুকুমার ও নবকুমারকে সওদাগরের বিরাগভাজন করার চেষ্টা করে। খলের ছলের অভাব হয় না। একদিন সে সর্বাংগেতে ছাই-কাদা মেখে বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে আঙিনায় পড়ে আছে। বেশ বাস অসংযত। রক্তজবার মত চোখ লাল। থর থর ক'রে কাঁপছে সে। সওদাগর বাড়িতে এসে প্রেয়সীর এ রকম অবস্থা বিপর্যয় দেখে হতবাক। উদ্‌গ্রীব সওদাগর জিজ্ঞেস করলে, "এর কারণ কি? কি হয়েছে প্রিয়তমে?" "তোমার বড় ছেলে আমার অপমান করে। বলে, 'আমি তোমায় স্ত্রীর মত পেতে চাই'।"—ঘন ঘন কাঁপতে থাকে কংকা। ধনদাস ঝটিতি স্ত্রীকে হাত ধরে টেনে তোলে। প্রতিজ্ঞা ক'রে বলে, "বনবাস দোব।" নিষ্ঠুর খুনীর মত দেখতে লাগে তাকে। কংকার মুখে এক ঝলক আনন্দ খেলে যায়। কথাও যা কাজও তাই।

সওদাগর ছেলে দুটিকে গভীর বনানীতে নির্বাসন দিয়ে এল। নিঃসহায় পড়ে রইলো তারা। কিন্তু বনটি এত গভীর যে, রাস্তা পাওয়া কঠিন। কোন জলাশয়েরও চিহ্ন নেই। পিপাসায় ছোট ভাইয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সুকুমার জলের অন্বেষণে গেল। কিন্তু পথ-হারা হয়ে ভাইয়ের কাছ হ'তে অনেক দূরে গিয়ে পড়লো। কতকগুলি লোক সুকুমারকে দেখে খুব আনন্দ করতে লাগলো এবং তাকে ধরে নিয়ে গেল। অত লোকের কাছে বাধাই বা কি করে দেয় সে। এদিকে দাদার পাত্তা নেই দেখে নবকুমার ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। এমন সময় এক ব্যাধ শিকার করতে এসে দেখে, মহুয়া গাছের উপর একটি "হন্তেল" পাখী বসে রয়েছে। পাখীটিকে মারবার জন্য তীর ছুড়লো ব্যাধ। ঝুপ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। ব্যাধ ঝোপের মধ্যে পাখীটিকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পাখী পেল না সে তার বদলে দেখলে একটি ছেলে মরার মত প'ড়ে রয়েছে। ছেলেটিকে নিয়ে এল সে। বলা বাহুল্য, সত্যনারায়ণ "হন্তেলের" রূপ ধরে থেকে নবকুমারের দিকে ব্যাধের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে নবকুমার আশ্রয় পেল। নবকুমারের দুঃখের কালো রাত গাঢ়তর হয়ে এল। ব্যাধ এক সওদাগরের কাছে তাকে বিক্রয় ক'রে দেয়। সত্যনারায়ণের কৃপাতে কিন্তু এ সওদাগর নব-কুমারকে ছেলের মত ভালবাসতে থাকে। এবং বাণিজ্য করতে শিক্ষা দেয়। পরে নবকুমার বড় হলে তাকে এক জাহাজ মাল দিয়ে বাণিজ্য করতে পাঠায়। নদীর উপর ভেসে চলেছে নবকুমার। হঠাৎ দেখলো সে নদীর তীরে কতকগুলো লোক একটি বিড়ালকে দাঁড়তে বেঁধে যৎপরোনাস্তি প্রহার করছে। জীবে দয়াশীল নবকুমার জাহাজ থামিয়ে সেই লোকদের বিড়ালটিকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলে। কিন্তু তারা বললে যে বিড়ালটি অনেক ক্ষতি করেছে। তখন নবকুমার অনেক টাকা দিয়ে তাদের মনস্তুষ্টি ক'রে তাদের কাছ

---

*ভগবতী মংগল কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছি—"সংহতি," অগ্রহায়ণ '৫৩।

হ'তে বিড়ালটিকে নিয়ে আবার জাহাজ ছেড়ে দিলে। রাত্রে ঘুমন্ত নবকুমার স্বপ্ন দেখলে—স্বয়ং সত্যনারায়ণ বলছেন, "আমি বিড়ালরূপে তোমায় ছলনা করলাম। খুব প্রীত হয়েছি আমি। তোমার নৌকা কেবল সোনাতে বোঝাই হয়ে যাবে।" দেববাক্য মিথ্যা হবার নয়। নবকুমার দেশে ফিরে যাবার মানসে এক রাজ্যে জাহাজ নোঙগর করলে। কিছুক্ষণ পরে রাজ্যের লোকদের কাছে শুনলে রাজা রাজকন্যার বিয়ে দেবে যে কন্যার সমান সোনা ওজন করে দিতে পারবে তার সঙ্গে। নবকুমারের সত্যনারায়ণ প্রদত্ত অনেক সোনা ছিল। সে কন্যার সমান ওজনের সোনা দিয়ে তাকে বিবাহ করলে। পরে নিজের দেশে ফিরে আসবার সময় জাহাজ ডুবি হ'ল। কোথায় স্ত্রী আর কোথায় নিজে? গৌড়দেশের কতকগুলো লোক নবকুমারকে নদীর কবল হ'তে উদ্ধার ক'রে তারা বোঝা বইবার কাজে তাকে নিয়োগ করে। নবকুমার একটু আস্তে চললে তারা চাবুক কষে দেয় কোন দ্বিধা না ক'রেই। একদিন নবকুমার কড়া কথা বলতে তারা তাকে রাজ দরবারে চুরির আসামী বলে বিচার চায়। সে নাকি লোক-গুলির গহনা চুরি করেছে।

বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে। নবকুমার তার গত জীবনের কুহেলিকাবৃত জীবন ইতিহাস বর্ণনা ক'রে বললে, "সেই আমি কি চুরি করতে পারি ধর্মাবতার?"

রাজার চোখ দুটি অশ্রু-আবিল হয়ে ওঠে। পর্দার আড়াল হতে শোনে একটা পাগলিনী। এই পাগলিনীকে নদীর তুফান হ'তে উদ্ধার ক'রে রাজার এক বন্ধু তাকে উপহার দেয়। কিন্তু সে রাজাকে বলে তার স্বামীর নিরুদ্দেশের কথা। রাজার দয়া হয়। পাগলিনী ছুটে বেরিয়ে এসে নবকুমারকে বলে, "ওগো দেবতা চিনতে পারলে না?" রাজাসন থেকে উঠে এসে রাজা নবকুমারের গলা জড়িয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে। "কে, দাদা? তুমি—তুমি—" "হাঁ—আমি। সত্যনারায়ণ তুমিই সত্য। শোন্ ভাই আমার কথা"ঃ

সত্যনারায়ণ স্বপ্নে বলে এ রাজারে।
কন্যা সমর্পণ কর বলি এ জনারে॥
বাম হাতে ছ' আঙুল নাসিকা তার সোজা।
তারে আনি সিংহাসনে কর ওহে রাজা॥
রাজার চরেরা তাই মোপে ধরে আনে।
শ্বশুর গত হন জানিবা এইখানে॥
হেনসময়ে এক পাগল আইলা দরবারে।
বলে আমি তোদের বাপ না খেদারিও (তাড়িও না) মোরে॥
তখন সবে গলাগলি হুলাহুলি করে।
আনন্দেতে চোখের জল মিশিল সাগরে॥

**বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, বর্ধমান প্রভৃতি জিলার পটুয়া**

পটুয়াদের মধ্যে বাঙলার নিজস্ব অংকন-চাতুর্য ও সংক্ষিপ্ত ধর্ম কাহিনী পদ্য ছন্দে বেঁচে আছে। এরা সমস্ত ধর্ম কাহিনীর ছবি এ'কে রেখেছে লম্বা পটের মধ্যে। গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে সেই পট দেখাবার সময় সুর ক'রে তাদের গান গেয়ে গেয়ে ছবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে চলে। ভক্তিতে গদগদ হয়ে বিমুগ্ধ পল্লীবাসী চোখের সামনে সমস্ত লীলা দেখে। চমৎকার লোকশিক্ষা দেবার কৌশল। পটুয়ারা না-হিন্দু না-মুসলমান। এরা নিজেদের চিত্রকর বলে পরিচয় দেয়। মুসলমানের মত কতক আচার ব্যবহার আবার হিন্দুর দেবদেবী নিয়ে কারবার। আরও এক রকমের পটুয়া জাত আছে। এরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। নিজেরা সাঁওতাল-দের গুরু গুণিন (মুস্তাজি)। তাদের বোঙা-বুঙি দেবতার কথা এরা গান ক'রে যায়। আর ভূত প্রেত প্রভৃতি মানুষের দেহে ভর করলে আভিচারিক মন্ত্র সাহায্যে তাড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে সাঁওতালদের কাছে এরা বেশ রোজগার করে। বনের মাঝে ছোট ছোট সাঁওতাল বস্তিতে দু' এক ঘর ক'রে এই পটুয়া জাতির বাস। এদের গান সাঁওতালী ভাষাতে রচিত। কোন উপাখ্যান নেই। বনজংগল, পাখী, ভূত-প্রেত প্রভৃতির কথা আছে।

টিকিলারে ঘুটো (তিলক) কাটে যত বোরেগিগণ।
থাকি থাকি হরি হরি বলে ঘনে ঘন॥
কৃষ্ণকথা হ'তেঃ উনি যশোদা রাণী লাঠি নয়ে হাতে।
ননী চোর কিষ্টেরে যান দেখ তারাতে॥
জগতের হরি যিনি চিমধুসূদন।
লীলা করে তিনি নয়ে মনুষ্যজনম॥
এই দেখ মা আগে রাম (আঙুল দিয়ে রামের ছবিটি দেখায়) পিছুতে সীতা জনকনন্দিনী।
আর শিরে ছত্ত (ছাতা) ধরে যায় লক্ষ্মণ গুণমণি॥

যমালয়ে বিচারঃ

এই লোকটি লোকের ঘরে আগুন দিয়েছিল।
আগুনের মধ্যেতে তারে যমরাজ চুকাইল॥
এই লোকটি বিধবার সম্পত্তি নয়েছিল।
ফুটন্ত তেলেতে যমরাজ নিক্ষ করে দিল॥

আরও অনেক ধর্মকথা এদের গানে ঠাঁই পেয়েছে। তবে এদের গানের ভাষা সরল হলেও সব পংক্তির শেষে মিল পাওয়া যায় না। কিন্তু সুর অতীব বৈশিষ্ট্যময়। অবিশ্যি ভগবতী মংগল ও সত্যমংগল গানের সুরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

তখন প্রচারের জন্য কি সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক একটা জাতি ভার নিয়েছিল এ মহৎ কাজের। তখনকার দিনে কদর ছিল এদের। আঁচল ভরে পেতও তারা প্রয়োজন মত খাদ্য সামগ্রী। কিন্তু আজকাল চাকা ঘুরে গেছে। এই সব লোকশিক্ষার বাহনদের ভুলে গেছে আজিকার মানুষ। তাই এই কাব্যগুলি লুপ্ত হ'তে চলেছে। অতি বৃদ্ধ ছাড়া জাতির যুবকরা পিতা-পিতামহের কাছ হ'তে আর মুখস্থ ক'রে নেয় না এই সব গান। কিছুদিনের মধ্যেই লোকশিক্ষার এ ধারা ব্যাহত হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ। কিন্তু ডাকের উপদেশ, খনার বচন, লক্ষ্মী চরিত্র, মনসা মংগল এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মত আজিকার দিনে পূর্বোক্ত কাব্যগুলি তেমনি-ভাবে গীত হওয়া উচিত। গ্রামীন সংস্কৃতির একটা ধারার উৎস-মুখ রুদ্ধ হওয়া কি ভাল?

# ঢোঁড়াই চরিতমানস

## (সটীক)

### ••••••শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী•••

(পূর্বানুবৃত্তি)

### তাৎমাধাঙড় সংবাদ

ঢোঁড়াই ঠিক বোঝে না গানহী বাওয়াকে। তো আর ছড়িদার ভকত হবার পরদিনই খা গেল, গানহী বাওয়া তাদেরই উপর সদয়, ঢোঁড়াইয়ের উপর নয়।

সকালে স্নান করেই মহতো আর ছড়িদার তাৎমাটুলীর মোড়ের উপর খানিকটা জায়গা শ করে লেপতে বসে, গোবর দিয়ে। সেখানে খে একটা ঘটি। তারপর ঘটিতে খানিকটা ল ঢেলে দেয় মহতো। রতিয়া 'ছড়িদার' ঘটির পর গামছা ঢাকা দিয়ে তার উপর তিনটে লসীপাতা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মহতো মনে নে গানহী বাওয়ার মন্তর পড়তে থাকে।

প্রণাম করে গামছা সরানোর পর দেখা গেল য, গানহী বাওয়া ঘটির জলে এসেছেন; জল বেড়ে গিয়েছে; ঐ তো বেড়ে গিয়েছে, চোখে দেখছিস না। দু আঙ্গুল তো জল ঢালা য়েছিল মোটে। সত্যিই তো! ছুঁস না ছুঁস ন ঘটি; ও জল আবার সোরা নদীতে দিয়ে াসতে হবে।

ঢোঁড়াইয়ের হিংসে হয় মহতো আর ছড়িদারের উপর। তারা ভকত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গানহী বাওয়াকে আনাচ্ছে। সে নিজেও চুপি চুপি থানে চেষ্টা করে দেখে। কিন্তু তার ঘটিতে গানহী বাওয়া আঁসেন না—জল সেই যেমন তেমনিই আছে। গানহী বাওয়ার এই একচোখোমি তার মনে বড় আঘাত দেয়। কিন্তু সে একথা প্রকাশ করতে পারে না কারও কাছে: তার 'ভকত'গিরির তাকৎ নেই, একথা লোকে জানলে, সে ছোট হয়ে যাবে পাড়ার লোকের কাছে।

কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সেদিনকার প্রার্থনা বোধ হয় গানহী বাওয়া শোনেন। মহতো আর ছড়িদারকে ধাঙড়রা 'আচ্ছা রকম' বেইজ্জত করে। রবিবারের দিন দুপুরে মহতোর দল গিয়েছিলেন, নতুন তুলসীর মালা দেখাতে ধাঙড়টুলীতে। ধাঙড়দের সঙ্গে আসল ঝগড়া তাৎমাদের রোজগার নিয়ে। তারা সব কাজ করতে রাজী। তার উপর সাহেব, পাদ্রী, বাবু-ভাইয়ারা, কপিলরাজা সকলেই তাদের দিকে। কপিলরাজার জন্যে বড় শিমুলগাছগুলো একেবারে নির্মূল করে দিয়েছিল তারা। লড়ায়ের আমলে লার জন্য কুলের ডাল কাটতো কপিলরাজার জন্য তারাই। শুয়োরখোর, মুর্গীখোর লোকগুলোকে গানহী বাওয়ার নামে, নিজেদের প্রতিপত্তি দেখাতে গিয়েছিল দুই নতুন 'ভকত'। গিয়েই তাদের বলে যে, তোদের শুয়োর-মুর্গী ছাড়তে হবে—গানহী বাওয়ার হুকুম। মাস্টারসাবও সসুরার (১) থেকে বেরিয়ে বলেছে। জয়সোয়াল সোডা কোম্পানীতে কাজ করে বুড়ো এতোয়ারী। সে ফোকলা দাঁতে হেসেই কুটি কুটি। আরে গানহী বাওয়া তোদের 'খত' (২) দিয়েছে নাকি রে? তাহলে ডাকপিয়ন এসেছে বল তোদের পাড়ায়। শনিচরা ধাঙড় বলে—"লে ডিগি ডিগি! তাই বল! মহতো 'ভকত' হয়েছিস। ছড়িদারও দেখছি তাই। 'বিলি ভকৎ আর বগুলা ভকৎ'! তাই গানহী বাওয়ার হুকুম ফলাতে এসেছিস। পরশুও তো ছড়িদারকে 'কলালীতে' (৩) দেখেছি সাঁঝের পর।

"মিছে বলিস না খবরদার! জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো।"

"আয় না মরদ দেখি।"

এতোয়ারী শনিচরাকে চুপ করতে বলে। তারপর মহতোকে পরিষ্কার বলে দেয় যে, সাহেব-মেমদের কাছে শুয়রের মাংস, আর মুর্গীর ডিম বেচে তাদের পয়সা রোজগার হয়। গানহী বাওয়া যদি আমাদের 'পেট কাটেন', তাহলে তিনি তোমাদেরই থাকুন। আর 'পচই' আমাদের পুজোয় লাগে; ও ও ছাড়তে পারব না। মাস্টারসাব 'বাবুভাইয়া' লোক। তাঁদের যা করা সাজে, আমাদের তা করা সাজে না। ঐ যে সেবার "টুরমন"এর তামাসা (৪) হল ঝিকটিহার মাঠ ঘিরে, তাতে যে রংরেজ জার্মন লড়াই (১১) হল;—আনাদের ভিতরে যেতে দিয়েছিল? তোদের যেতে দিয়েছিল? 'গিরানী'র দোকানের (৫) সস্তা চাল, তোদের দিত সে সময়? এস ডি ও সাহেবের সরকারী কাছারীর দোকানের 'লাট্টু মার', আর পেয়ারা মার্কা "রৈলী" (৬) আমাদের দিয়েছে কোন দিন? আর রোজ স্নান করা,—তোরা আজ 'ভকত' হয়ে করছিস। আমাদের মেয়েরা পর্যন্ত চিরকাল প্রত্যহ স্নান করে এসেছে। মহতো আর তার দল চটে আগুন হয়ে যায়। আমাদের মেয়েছেলেদের উপর ঠেস দিয়ে কথা। ঐ মেমসাহেব ধাঙগড়ানীদের দিস পাঠিয়ে সাহেব টোলায়। আর ঐ মুসলমানদের বাড়িতে যাদের সঙ্গে মিলে তোরা শিমুলগাছ-গুলো সাবড়ে দিয়েছিস। পাঠিয়ে দিস শনিচরার বৌটাকে, মর্লি সাহেবের পাকা চুল তুলে দিতে।

তুলমারী কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যায়। কারও কথা বোঝা যায় না হট্টগোলের মধ্যে। তাৎমাদের সজীব গালির তোড়ে ধাঙগড়ারা থই পায় না। শেষকালে একরকম দিশেহারা হয়েই তাৎমাদের তাড়া করে। চিরকালের অভ্যাস মত আজও তাৎমারা পালায়। সোজা 'পাক্কীর' দিকে; লাঠি ফেলে, টিকি উড়িয়ে, পাক্কীর পাথরে হোঁচট খেয়ে; পালা পালা! তারপর রাস্তা পার হয়ে, তারা পাক্কীর তাৎমাটুলীর দিকের গাছের সারির নীচে,—রাস্তার মাটিকাটার গর্তের মধ্যে দাঁড়ায়। এখানে আবার নতুন 'মোর্চাবন্দী' করে (৭) তারা গালাগালির লড়াই আরম্ভ করে। ধাঙগড়রা হাসতে হাসতে ফিরে যায়। তাদের চিরকালের নিয়ম, তারা পাক্কী পার হয়ে গিয়ে কখনও তাৎমাদের সঙ্গে মার পিঠ করে না। কেবল চীৎকার করে বলে যায়, "হাভেলী পরগণায় (৮) পেঁছে দিয়েছি সঙ্গে করে। 'সিনুর' লাগাস। 'সিনুর' (৯)। দুই ভকতে। বিল্লি ভকৎ আর বগুলা ভকৎ। দুজনের গলার হার দুটো দেখাতে ভুলিস না ঝোটাহাদের।" তারপর ধাঙগড়রা ফিরবার সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, শালাদের রক্তর কি ঠিক আছে? সন্ধ্যার সময় দেখিস না কত বাবুভাইয়ারা, তাৎমাটুলীর আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরী করে। সাহস অসবে কোথা থেকে। সব রক্ত পানি হয়ে যাচ্ছে। হত আমাদের টোলা, দিতাম বাবুদের মজা টের পাইয়ে। বাবুভাইয়ারা মিহি চালের ভাত খায়, গরু দেখলে ভয় পায়।

---

টীকা:—

(১) সাসুরার—শ্বশুরবাড়ী; এখানে জেলখানা

(২) চিঠি

(৩) মদের দোকানে

(৪) টুরমনের তামাসা—১৯১৭ সালে কয়দিন-ব্যাপী একটি উৎসব হয় জিরানিয়াতে, যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রচারের জন্য ইহার নাম ছিল ডিস্ট্রিক্ট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্ট হইতে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়।

(৫) যুদ্ধের সময়ের গভর্নমেন্ট স্টোরস; এখানে সস্তায় জিনিষ পাওয়া যাইত।

(৬) লাট্টু মার্কা, আর পেয়ারা মার্কা র‍্যালি ব্রাদার্সের কাপড়।

(৭) ব্যূহ রচনা করে

(৮) রাস্তার এপারটা পরে হাভেলী পরগণাতে; আর হাভেলী বাধাটার অর্থ অন্দর মহল; ইহা লইয়াই ধাঙগড়রা বিদ্রূপ করে।

(৯) সিঁদুর

শনিচরা বলে, "বিয়ের আগে আমিও তো কত বাবুভাইয়ার বাড়ি ভাত খেয়েছি! এত সাদা চাল! একদম মিঠা না। সেরভরের কম ও চালে পেটই ভরে না। তারপর এক লোটা জল খাও। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ফুস্-স্-স্।" —বলে সে একটি তুড়ি দেয়।

একমাত্র শুক্রা ধাঙগড় এই অনধিকার চর্চার প্রতিবাদ করে। "জানিস, মিহি চাল খেলে বুদ্ধি খোলে। ঐ মিহি চালের জোরেই বাবুভাইয়ারা গেলে হাকিম বসতে "কুর্সি" দেয়। তোকে আমাকে দেয়? তাৎমাদের দেয়? এসব টোলায় ডাক পিয়ন আসে চিঠি নিয়ে? যা রয় সয় তাই বলিস।"

তাৎমা খেদানোর উল্লাসের মধ্যে শুক্রা কি সব বাবুভাইয়াদের কথা এনে সমস্ত জিনিসটাকে তেতো করে তুলেছে।

বুড়ো এতোয়ারী লাল চাল খেলেও বেশ বুদ্ধিমান। সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে বলে, "চল চল। সিঙ্গাবাদ থেকে শনিচরা নতুন মাদল এনেছে। মুচিয়ার মাদল কোথায় লাগে এর কাছে। চল শীগ্‌গির খেয়ে দেয়ে বাঙ্গা গাছের তলায়। ঘুটে ধরিয়ে আনতে ভুলিস না শনিচরা। শীগ্‌গির।

বিরৌলীকে হাটিয়া—আ—
দৌড়ে দোকানিয়া—আ—
ঠস ঠস রে বোলে বুনিয়া—আ-আ-আ-আ
(১০) জলদিরে জলদি!

**সামুয়রের ভর্ৎসনা**

ঢোঁড়াই বড় হয়ে উঠছে। আর সে তাৎমাটুলীর অলিতে গলিতে "কনেল খেলার ঘুচ্‌চী" (১) কাটে না, বাঁশের চোঙের মধ্যে দরদময়দার ফল দিয়ে বন্দুক ফোটায় না, মোরব্বার (২) পাতা দিয়ে ঘর ছাইবার খেলা খেলে না। ও সব বাচ্চারা করুক। সে এখন মোহরমের সময় ফুদী সিংয়ের দলে 'মাতুম' গায় (৩) দুলে দুলে ঘোড়ার মেলায়—

'হিন্দু মুসলমান ভাইয়া, জোরহু রে পীরীতিয়া
রে ভাই,
হায় রে হায়! (৪)

বর্ষা শেষ হলেও যেমন মরণাধারে জল থেকে যায়, গানহী বাওয়ার হাওয়া পড়ে' আসবার পরও সেই সময়ের রেশ রেখে যায় এই মাতুমগানে।

মরগামার তাৎমাদের 'ঝুগিরা' (৫) নাচের দলে তাকে নিয়ে টানাটানি। মরগামার ওরা 'মুঙ্গেরিয়া তাৎমা' আর তাৎমাটুলীর তাৎমারা, 'কনৌজিয়া তাৎমা'। মুঙ্গেরিয়া তাৎমারা জাতে ছোট বলে, তাদের সঙ্গে এত মাখামাখি —তাৎমাটুলীর লোকরা পছন্দ করে না।

কিন্তু, ও ছোঁড়া কি কারও কথা শুনবে। ধাঙগড়টুলীর 'কর্মাধর্মার' নাচের মধ্যে পর্যন্ত গিয়ে বসে আছে। ধাঙগড়টুলীতে যাওয়াই ছাড়লো না—অন্য জায়গায় যাওয়া ছাড়লো কি না ছাড়লো—তাতে কি আসে যায়।

বাওয়া মনে মনে এক বিষয়ে খুশী, যে ধাঙগড়টুলী থেকে আম, লিচু নানারকম ফল ঢোঁড়াই নিয়ে আসে—এমন এমন জিনিস যা তাৎমারা কোনদিন দেখেও নি। ধাঙগড়রা সাহেবদের বাগান থেকে এই সব কলম চুরি করে এনে লাগিয়েছে। তারা তাদের সনবেটাকে (৬) খাওয়ার জন্য দেয়। ঢোঁড়াই আবার সেসব পাড়ার তার দলের ছেলেদের এনে দেয়, বাওয়ার জন্যে রেখে দেয়। কার সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের আলাপ না। 'কালো ঘাঘড়াওয়ালী' পাদ্রী মেম যিনি ধাঙগড়টুলীতে আসেন, তার সঙ্গে পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের আলাপ।

বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের সব দোষ সহ্য করে যায়, কিন্তু ঐ রোজগারে বার হওয়ার সময় যে অধিকাংশ দিনই তার টিকি দেখার জো নেই. এ জিনিসটা সে সহ্য করতে পারে না। ভিক্ষের রোজগারে ঢোঁড়াইয়ের কেমন যেন একটু কুণ্ঠিত ভাব অন্যর কাছে. এটুকু বাওয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেইজনাই বাওয়ার চিন্তা সব চাইতে বেশী। ভোরে উঠেই ছোঁড়া পালিয়েছে। তার বন্ধুরা তো সব রোজগারে বেরিয়েছে, ওটা কোথায় থাকে, কি করছে এখন বাওয়া কিছুই ঠিক করতে পারে না। ঢোঁড়াই হয়ত তখন মরণাধারের কাঠের সাঁকোটির উপর পা ঝুলিয়ে বসে বকের পোকা খাওয়া দেখছে। মন উড়ে গিয়েছে কোথায় কোন স্বপ্নরাজ্যে......বিজা সিং চলেছেন, ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন কুয়াশার রাজ্যের মধ্যে দিয়ে......অসংখ্য জোনাকী মিট্ মিট্ করে জ্বলছে অন্ধকারে......সে তার চাইতেও জোরে চালাবে রেলগাড়ি......কোথায় চলে যাবে এঞ্জিনের 'সিটি' দিতে দিতে। বাওয়ার দেখাশুনো করবে দুখিয়ার মা;......না ও মাগীর দায় পড়েছে।......বিজা সিং যদি তরোয়াল দিয়ে দুখিয়ার মা আর বাবুলালকে কেটে ফেলে।......

এমনভাবে বকগুলো পা ফেলে যে, দেখলেই হাসি আসে—'বগুলা চুনি চুনি খায় (৭)......

মরগামার 'লম্বী গোয়ারিন' (৮) যাচ্ছে ঐ দূরে পক্কীর উপর শুটকো হাঁটুর উপর কাপড় তুলে দিয়েছে—বোধ হয় রাস্তায় কাদা, ঠিক বকের চলার মত করে চলছে......"গে-এ-এ......লম্বী গোয়ারিন! বগুলা চুনি চুনি খায়।" বলে ঢোঁড়াই নিজেই হাসে। লম্বী গোয়ারিন এদিকে তাকায়—বোধ হয় কথাটা বুঝতে পারে না হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, যাচ্ছি টৌনে।......বকটা ঘাড় কাত করে অতি মনোযোগের সঙ্গে কি যেন একটা গর্ত না কি লক্ষ্য করছে। ভিক্ষা পাওয়ার পর চলে আসবার সময়, বাওয়াও ঠিক অমনি করে, এক মুঠো চাল হাতে নিয়ে, ঘাড় কাত করে দেখে—চালটি ভাল না খারাপ। চাল খারাপ হলে বাওয়ার মুখ অমনি অন্ধকার হয়ে ওঠে। সে চাল কটিকে ঝুলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে, জোরে জোরে পা ফেলতে আরম্ভ করে। ত্রিশূলের সঙ্গে লাগানো পিতলের আংটাটা ঝমড় ঝমড় করে বাজে। ঢোঁড়াইয়ের মুখ দুষ্টুমীর হাসিতে ভরে ওঠে।......

ছাই রঙের ডানাওয়ালা বকগুলিকে সাদা বকরা নিশ্চয়ই দেখতে পারে না। বাবুভাইয়ারা কি তাৎমা ধাঙগড়দের সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু ছাই রঙের ডানা হয়েছে বলে কি তার 'হুক্কা পানি' (৯) একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। 'বগুলা ভকৎ' (১০) দেখতে ঐ ভাল মানুষ, কিন্তু তার পেটে পেটে শয়তানী।

"আরে বগুলা ভকৎ কি করছিস, বকের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে?"—সামুয়র হাসতে হাসতে ঢোঁড়াইকে জিজ্ঞাসা করে।

—ঢোঁড়াই চমকে উঠেছে। সামুয়রটা কোন দিক থেকে এসে গেল, ঢোঁড়াই অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করেনি এতক্ষণ। এই খাঁকির হাফপ্যাণ্ট পরা কিরিস্তান ধাঙগড় ছেলেটা কি 'গুণ' (১১) জানে নাকি? না হলে হঠাৎ তাকে বগুলা ভকৎ বলে ডাকলো কেন? সেও যে ঠিক ঐ বগুলা ভকতের কথাটাই ভাবছিল। ঐ পাদরী সাহেবের 'টাটু' (১২) সামুয়রটা কি তাকে এক দণ্ডও নিরিবিলিতে থাকতে দেবে না। তার আসল নাম স্যামুয়েল, বয়সে ঢোঁড়াইয়ের চেয়ে দু' এক বছরের বড়; ফুটফুটে ফরসা, নীল চোখ, কটা চুল, মুখে বিড়ি, চোখে মুখে কথা, দরকারের চাইতে বেশী চটপটে শুয়রের কুঁচির মত খাড়া অবাধ্য চুলগুলিকে জবজবে করে সরষের তেল মেখে টেড়ি কেটেছে জেমসন সাহেব নীলকুঠি—বহুল জিরানিয়াতে নীলকুঠির পড়তি যুগে একটা পাঁউরুটির কারখানা খুলেছিল। পরে সে স্নানের ঘরে ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করে

---

(১০) ধাঙগড়দের দ্রুততালের গান। বিরৌলীর হাটে দৌড়ুচ্ছে দোকানদার, বোঁদে (মিষ্টান্ন) থেকে ঠস্ ঠস্ শব্দ হচ্ছে।

(১১) রংরেজ—ইংরাজ
টুর্নামেন্টে ইংরাজ জার্মানদের mockfight হইয়াছিল।

টীকা:—

(১) কন্কেকুলের বীচি দিয়ে খেলার জন্য গর্ত
(২) মোরব্বা—aloe—আনারসের মত পাতা দেখতে
(৩) মহরমের শোকের গীত—এর প্রতি লাইনের শেষে, হায়রে হায়, কথা কয়টি থাকে
(৪) হিন্দু-মুসলমান ভাই প্রীতির বন্ধনে বাঁধো রে ভাই, হায়রে হায়।
(৫) ঝুগিরা—একপ্রকার গ্রাম্য গীতিনৃত্য
(৬) সনবেটা—ধর্মছেলে
(৭) বক বেছে বেছে খায়
(৮) লম্বী গোয়ারিন—লম্বা গয়লানী
(৯) হুঁকো জল। ইহার অর্থ একঘরে কর
(১০) বকধার্মিক
(১১) গুণ—ইন্দ্রজাল
(১২) আদুরে গোপাল

তার ভিটের মিষ্টি কুলের গাছটা। তাৎমা আর ধাঙগড় ছেলেদের লোভ আর ভয়ের জিনিস। মিষ্টি ফলের তুলনা দিতে গেলেই তারা বলে, 'গলাকাটা সাহেবের' হাতার কুলের মত মিষ্টি। দিনের বেলাতেও রাখাল ছেলেরা একলা সে গাছের তলায় বসতে ভয় পায়। সেই 'গলাকাটা' সাহেবের মেমকে পাউরুটি তৈরী করতে সাহায্য করত, সামুয়রের দিদিমা। 'গলাকাটা সাহেব' পান খেত, গড়গড়া টানতো। সামুয়রের দিদিমার স্নানের জায়গার জন্য চুনার থেকে নৌকোয় করে একটা চৌকোণা পাথর এনে দিয়েছিল! সেটা এখনও পড়ে আছে সামুয়রদের বাড়ির উঠনে। কালো ঘাঘরাওয়ালী পাদ্রী মেম, ধাঙগড়টুলীতে এলে, ঐ পাথরখানার উপরেই তাঁকে বসতে দেওয়া হয়।

আবলুসের মত কালো সামুয়রের দিদিমার যখন ফুটফুটে মেমের মত রঙের মেয়ে হয়, তখন সেইজন্যে কেউ আশ্চর্য হয়নি।

সামুয়রও পেয়েছে মায়ের রঙ।

"কিরে বগুলা ভগৎ, আজকে রবিবার। আজ যে বড় বোকা বাওয়ার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুসনি?"

প্রশ্নটিতে ঢোঁড়াইয়ের যেন একটু অপমান অপমান বোধ হয়।

"কারও চাকরও না, কারও পয়সাও ধার করিনি। তোদের মত তো নয় যে, আজকে গির্জায় যেতেই হবে, নইলে পাদ্রী সাহেব দুধ বন্ধ করে দেবে।"

"আরে যা যা! 'লবড় লবড়' (১৩) বলিস না। বাড়ি বাড়ি থেকে চাল ভিক্ষে করার চেয়ে, পাদ্রী সাহেবের দেওয়া দুধ নেওয়া ঢের ভাল।"

"মুখ সামলে কথা বলিস। চুকন্দর (১৪) কোথাকার। সাধু সন্তকে কি লোকে ভিক্ষে দেয় নাকি? ও তো গেরস্তরা রামজীর হুকুম মত সাধুদের কাছে নিজেদের ধার শোধ করে। না হলে বাওয়া কি 'বরমভূত'কে দিয়ে মরণাধারের নীচ থেকে আশরফির ঘড়া বার করতে পারে না।"

"থাক থাক, তোর বাওয়ার মুরোদ জানা আছে। সেবার যখন টোলায় পিশাচের উপদ্রব হল, কোথায় ছিল তোর বাওয়া। রেবণ গুণী "ভুক" করে, যেই না বালি ছুড়ে 'বাণ' মারা (১৫) অমনি সেটা একটা বিরাট বুনো মোষ হয়ে কাশবনের মধ্যে থেকে মরণাধারে ঝাঁপ দিল। তার চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করিস তোদের মহতোকে।"

এই অকাট্য যুক্তির সম্মুখে আর ঢোঁড়াইয়ের তর্ক চলে না, কিন্তু বাইরের লোকের মুখে বাওয়ার নিন্দা সে কখনই সহ্য করতে পারে না।

"থাম, থাম! ফের ছোট মুখে বড় কথা বলবি তো পিটিয়ে তোর সাদা চামড়া আমি কালো করে দেবো। গির্জেতে যে টুপীতে করে পয়সা নিস তার নাম কি? তুই নিজেই তো দেখিয়েছিস।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে সব শালা তাৎমাদের"

"বিল্লির মত চোখ কিরিস্তান, তুই জাত তুলে গালাগালি দিস্!" ঢোঁড়াই সামুয়রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। "আর বলবি? বলবি? বল।"

সামুয়রকে "না" বলিয়ে তবে ঢোঁড়াই তাকে ছেড়ে দেয়। সামুয়র যেতে যেতে গায়ের ধুলো ঝাড়ে—আর যাওয়ার সময় বলে যায় যে, আজ রবিবার না হলে দেখিয়ে দিতাম।

এ ঢোঁড়াইয়ের জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা; কিন্তু অন্য তাৎমার মত সে গায়ে পড়ে ঝগড়া আরম্ভও করে না, আর ঝগড়া একবার আরম্ভ হয়ে যাবার পর সে পালায়ও না।

## পঞ্চায়েত কাণ্ড

### দুখিয়ার মায়ের খেদ

অনেকে দুখিয়ার মা না ব'লে, বলে 'বাবুলালকা-আদমী' (১)। কথাটা খুবই ভাল লাগে দুখিয়ার মার, বিশেষ করে যখনই আপিসের উর্দিপাগড়ি পরা বাবুলালের চেহারা তার মনে আসে। এমন মানায় এ পোষাকে বাবুলালকে। বুধনী ভাবে পাড়ার সকলে হিংসের ফেটে পড়ছে। দুখিয়ার মাকে রোজগার করতে হয় না বলে সত্যিই পাড়ার মেয়েরা তাকে হিংসে করে। এত লোকের বিষের নজর এড়িয়ে দুখিয়াটা বাঁচলে হয়! বড় হ'লে সেও আবার উর্দিপাগড়ি পরে, বাবার জায়গায় কাজ করবে। ও কাজের কি সোজা ইজ্জৎ! দুখিয়ার মা বাবুলালের কাছে শুনেছে, যে চেরমেনসাহেবের ঘরে,—না না চেরমেনসাহেব বললে আবার আজকাল বাবুলাল চটে, আজকাল বলতে হবে রায়বাহাদুর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নাম বদলালে আর মনে না থাকার দোষ কি?—যে রায়বাহাদুরের ঘরে ঠিকেদার সাহেবরা, ডাক্তার সাহেবরা, গুরুজীরা পর্যন্ত ঢুকতে পায় না, সেখানে বাবুলালের অবারিত দ্বার। গর্বে দুখিয়ার মার বুক ফুলে ওঠে। আজ সে আপিস ফেরৎ বাবুলালকে ভাল করে খাওয়াবে। তাই সে তাল গুলতে বসে। তার ভিতর গুড় আর চুনের জল দিয়ে সে বরফি করবে। রায়বাহাদুরের ডেরাইভারই কত বড় লোক, না হ'লে কি আর তার বৌয়ের ছেলে হওয়ার সময়, বাবুলাল চাপরাশী রাতদুপুরে চামারনী ডাকতে ছোটে। ডেরাইভারসাহেবই তো ধনুয়া মহতোর সমান 'অকতিয়ারের' (২) লোক। সেই ডেরাইভারসাহেবকেও চাকর রাখে রায়বাহাদুর। এত বড় লোকটিকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে একবার দুখিয়ার মার। কত কথা সে শুনেছে তাঁর সম্বন্ধে বাবুলালের কাছে থেকে। যেই ঘণ্টিতে হাত দেবে অমনি বাবুলাল চাপরাশীকে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে হুজৌর। আজব দুনিয়াটা! বড়র উপরও বড় আছে। রায়বাহাদুরের উপরেও আছে দারোগা, কলস্টর...... ঢোঁড়াইয়ের বাপের কথা হঠাৎ বুধনীর মনে পড়ে—সেই ঢোঁড়াই যেবার হয় সেইবার কলস্টর দেখে এসেছিল। বাবুলালের মত এত "ইজ্জৎদার আদমী" (৩) ছিল না বটে, কিন্তু ছিল বড় ভালমানুষ।......এক রাত্তি ঢোঁড়াইকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে সুর করে গাইত—"বকড়হাট্টা; বরদবাট্টা; সো যা পাট্টা"......। সে আর আজ ক'দিনের কথা। তবু সে সব ঝাপসা মনে পড়ার দাগগুলো পর্যন্ত একরকম মুছে গিয়েছে। অনুতাপ নয়, তবুও কোথায় যেন একটু কি খচ্খচ্ করে বেঁধে......

খাবারের লোভে দু'একজন করে দুখিয়ার বন্ধুরা এসে জড় হয়। সকলেই এক একটা তালের আঁটি চুষছে। কার তালের দাড়ি কত বড় তাই নিয়ে ঝগড়া জমে উঠেছে, কিন্তু নজর সকলেরই রয়েছে দুখিয়ার মার দিকে।

"নে দুখিয়া। নে নে তোরা সকলে আয়; একটু একটু নে। যা, এখন ভাগ্! জলদী!"

এক দণ্ড নিশ্চিন্দি নেই এদের জ্বালায়! পাড়া শুদ্ধ শুয়রের পালের মত ছেলেপিলেকে দুখিয়ার মা তালের মিঠাই খাওয়ালো। কিন্তু ঢোঁড়াই! ঢোঁড়াইয়ের কথা তার আজ বড্ড বেশী করে মনে পড়ছে অনেক দিনের পর। বহুদিন তার খোঁজখবরও করা হয়নি। পথে ঘাটে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। ছোঁড়া পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। যাক ছোঁড়া ভাল থাকলেই হল। গোঁসাইথানের মাটির কল্যাণে আর বাওয়ার আশীর্বাদে ছেলেটা বেঁচে বর্তে থাকলেই হল। সে আর ও ছেলের কাছ থেকে কি চায়।

অনেকদিন ছেলেটাকে কিছু খাওয়ানো হয়নি। বাড়িতে ডেকে পাঠালেও আসবে কিনা কে জানে। দুখিয়ার মা একখান কচুপাতায় করে খানকয়েক তালের বরফি নিয়ে, গোঁসাইথানে যাবে বলে বেরোয়।......সে ছোঁড়া কি আর এখন গোঁসাইথানে আছে। হয়ত মুখপোড়া ধাঙগড় ছেলেগুলোর সঙ্গে 'পক্কীতে', বিসারিয়া থেকে যে নূতন "লৌরী" (৪) খুলেছে, তাই দেখতে গিয়েছে। 'লৌরী' আসবার সময় ওরা রাস্তার ধুলো উড়িয়ে না হয় রাস্তার উপর গাছের ডাল ফেলে পালিয়ে আসে। একদিন ধরবে তালে মহলদার 'রোড সরকার' তো মজা

(১৩) লবড় লবড় বলা—বাজে বকা
(১৪) চুকন্দর—বীটপালং
(১৫) যাদুবিদ্যার প্রক্রিয়া বিশেষ

টীকা:—
(১) স্থানীয় ভাষায় আদমী মানে স্ত্রী। মানুষ অর্থেও ইহা প্রচলিত
(২) অকতিয়ার—অধিকার।
(৩) সম্মানিত লোক
(৪) লরী—মোটরবাস।

ঢেঁর পাইয়ে দেবে।......ঢোঁড়াই এখন কত বড় হয়ে উঠেছে। কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য।......ওই তালে মহলদার, ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রোড সরকার, যার নাম করে বাবুলাল 'ইপাক্কীর' পাকা অংশটির উপর দিয়ে গরুর গাড়ি যেতে দেখলে, গাড়োয়ানের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে; তারপর দুজনে আধাআধি ভাগ করে নেয়,—সেই তালে মহলদার একদিন ঢোঁড়াইকে দেখে ধাঙগড়দের ছেলে বলে ভেবেছিল, ভুল ধরিয়ে দিলে বলেছিল যে, এমন 'পাট্টা যোয়ান' তো তাৎমার ছেলে হয় না। লোকটা অন্ধ না-কি! ঢোঁড়াইয়ের রঙ ধাঙগড়দের মত কালো নাকি? সামুয়রের মত ফর্সা না হলেও আখার মত কালোও তো না। মকসুদনবাবুর রঙের সংগে ওর রঙের মিল থাকতেও পারে; বলা যায় না। ......ঐতো বাগভেরেণ্ডা গাছের ফাঁক দিয়ে বৌকা বাওয়ার কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে গোঁসাইথানে। ......আ মর, মহতোর ছাগল কিনা তাই সাধারণ লোক দেখে আর পথ থেকে সরবার নাম নেই! হট্! হট্!......

"আরে কোথায় চললি দুখিয়ার মা?"

"এই একটু ঐদিকে, কাজ আছে।" এতদিনের অনভ্যাসের পর ঢোঁড়াইয়ের কাছে যাচ্ছি বলতে সংকোচ লাগে লোকের কাছে।...... আজ আর কেউ তাকে ঢোঁড়াইয়ের মা বলে ডাকে না। অথচ ঢোঁড়াই হচ্ছে প্রথম ছেলে;—তার দাবীই সবার উপর। সেই প্রথম ছেলে হওয়ার আগের ভয়, আনন্দ, বুড়ো নুনুলাল মহতোর বৌয়ের আদর যত্ন বকুনি, কত নতুন অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা মেশানো—ঢোঁড়াইয়ের পৃথিবীতে আসার সংগে। সব সেই পুরোনো অস্পষ্ট স্মৃতিগুলোর হালকা ছোঁয়াচ লাগছে মনে।......না ঐতো দেখা যাচ্ছে ঢোঁড়াইকে, বাওয়ার লোটা মাজছে। আজ ভাগ্যি ভাল। বাওয়া আজ তাকে দুপুরে বেরুতে দেয়নি দেখছি।......

কিন্তু এ ভিক্ষে করে আর কতকাল চলবে? ......"এই বাওয়ার 'দর্শন' করতে এলাম"—বলে দুখিয়ার মা গোঁসাইথানের মাটির বেদীটাকে প্রণাম করে। তারপর বাওয়াকে বলে, "পরণাম"। বাওয়া আগেই আড়চোখে তার হাতের কচুপাতার মোড়কটা দেখে নিয়েছে। দুখিয়ার মা যে ঢোঁড়াইয়ের কাছে এসেছে সে কথা প্রকাশ করতে চায় না। ঢোঁড়াইও তার দিকে না তাকিয়ে একমনে নিজের কাজ করে যায়। লোটা মাজে, বাওয়ার ত্রিশূল, চিমটে ছাই দিয়ে ঘষে ঝকঝকে পরিষ্কার করে রাখে। তার কাজের আর শেষ নেই। একবার যখন ধরা পড়েছে, এখন গাছ-তলাটা ঝাঁট দেওয়ার আগে আর বাওয়ার হাত থেকে নিস্তার নেই। তারপর আবার কোন কাজ বাওয়ার মনে পড়বে ঠিক নেই। দুখিয়ার মা-টা আবার এই অসময়ে কোথা থেকে এসে জমিয়ে বসলো! কি গল্পই করতে পারে এই মেয়েজাতটা। ধনুয়া মহতোর একদিনের কথা ঢোঁড়াইয়ের বেশ মনে আছে। ধনুয়া তার স্ত্রীকে বকছিল,—কাজের মধ্যে তো ঘাস ছেলা আর উনুনের পাশে বসে লবড় লবড় বকা (৫)। চাবুকের উপর রাখতে পারলে তবে তোদের জাতের চাল বিগড়োয় না।" মহতো গিন্নি গিয়েছিল মহতোর দিকে এগিয়ে—"রামজী মোচটা দিয়েছেন বলে যা ইচ্ছে তাই বলে যাবে নাকি? চাবুক! মরদ চাবুক দেখাতে এসেছো! এসো না দেখি!"......ধনুয়া মহতোর সেইদিনের কথা ঢোঁড়াইয়ের খুব মনে ধরেছিল। মেয়ে জাতটাই এই রকম! কি রকম তা সে এখনও ঠিক বুঝতে পারে না, তবে খারাপ নিশ্চয়ই। আর বাবুলালের পরিবারের উপর সব তাৎমাই মনে মনে বিরক্ত। দুখিয়ার মার নাকি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না—চাপরাশীর বৌ বলে। সে ঘাস বিক্রি করে না, কোন রোজগার করে না, পারতপক্ষে বাবুলাল তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না; বাবুভাইদের বাড়ির মেয়েদের মত সে তার নিজের স্ত্রীকে রাখতে চায়। যখন তখন দুখিয়ার মাকে চটে মারতে যায়—তোর তাৎমানী থাকাই ভাল—তোর আবার চাপরাশীর স্ত্রী হওয়ার সখ কেন—মাথা কাটা যায় নাকি তার, দুখিয়ার মার বেহায়াপনায়।......

ঢোঁড়াই গাছতলা ঝাঁট দেওয়া আরম্ভ করে। রোজ ঝাঁট দেওয়া হয় তবু এত ময়লা কোথা থেকে যে আসে সে ভেবে পায় না। পাড়ার যত ছাগলের আড্ডা, বর্ষাকালে এই গাছতলায়!

চেরমেন সাহেবের ডেরাইভারের সামনে বাবুলাল চাপরাশী চুপচাপ চোরের মত থাকে, আর বাবুলালের স্ত্রী, গোঁসাইথানে প্রণাম করতে এসেও চুপ করে থাকতে পারে না। গোঁসাই উপর থেকে সব দেখছেন।......হঠাৎ দুখিয়ার মার গল্প কানে আসে......

"......আপনারা সাধুসন্ন্যাসী মানুষ আপনারা ভিক্ষে করেন সে এক কথা; কিন্তু সংগে সংগে ছেলেটাও কি সারা জীবন ভিক্ষে

(৫) বাজে বকা

করে জীবন কাটাবে? ও ছেলে কি কোনদিন আপনার চেলা হতে পারবে? কিরিস্তান ধাঙগড়দের সঙ্গে আলাপ, না আছে কথার "ঢং"(৬), না আছে মনের ঠিকানা উনি আবার হবেন সাধুবাবা। অন্য ঘরের ছেলে হলে এতদিন একটা রোজগারের 'ধান্ধা' দেখে নিত। বয়সতো কম হ'ল না। ওর বয়সী ঘোড়াই, গুদরতো ঘরামীর কাজে বেরুনো আরম্ভ করেছে। আপনি বাওয়া ছেলেটার মাথা খেলেন......"

ঢোঁড়াইয়ের কান খাড়া হয়ে উঠেছে। বাওয়ার মুখের উপর এতবড় কথা!......

"বলেন তো, চাপরাশী সাহেবকে বলে ঢোঁড়াইকে ডিষ্টিবোডের পাংখা টানার কাজে বাহাল করিয়ে দিতে পারি। বছরে চারমাস কাজ। আট টাকা করে পাবে। তার মধ্যে থেকে দুটাকা করে বহালীর(৭) জন্য চাপরাশী সাহেবকে দিতে হবে। বাকি টাকা তোমার হাতে এনে দেবে। বছরের মধ্যে বাকি আট মাস, কেরাণীবাবুর বাড়ী কাজ করবে। তাঁর ছেলেমেয়ে রাখবে। ওজর না থাকে তো বাওয়া বলুন। কতলোক এ নিয়ে চাপরাশী সাহেবের কাছে ঘোরাঘুরি করছে।"......

ঢোঁড়াই লক্ষ্য করে যে বাওয়ার মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াই আর বাওয়ার চোখোচোখি হয়ে যায়। দুজনেরই স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। প্রস্তাবটি কারও মনঃপূত নয়। বাওয়া ভাবে ঢোঁড়াই করতে যাবে চাকরী! পরের ছেলেকে আপন করে নিলাম কিসের জন্য? ওর জন্য এত কষ্ট সইলাম কেন?

আর ঢোঁড়াই ভাবে শেষকালে বাবুলালের খোসামোদ করে দিন কাটাতে হবে; তার দয়ায় রোজগার! এও রামজী কপালে লিখেছিলেন? বাওয়ার সেবা করে, বেশতো ওর দিন কেটে যাচ্ছে। দুখিয়ার মা টার 'বুকের উপর মুগের দানা রগড়াচ্ছে' কে এর জন্যে(৮)। সকলেই তাকে ভিক্ষের কথা নিয়ে খোঁচা দেয়। বাবুলালের পরিবারেরও এই কথা নিয়ে দুর্ভাবনার শেষ নেই। অন্তরের থেকে সকলেই তাদের ভিখিরী ছাড়া আর অন্য কিছু মনে করে না।

বাওয়া ভাবে, দরদ! এতদিনে মায়ের দরদ উছলে উঠলো!

সে আংটা লাগানো ত্রিশূলটা দুখিয়ার মার সম্মুখে মাটিতে তিনবার ঠোকে; তারপর তিনবার মাথা নাড়ে—না, না, না।

অপমানে দুখিয়ার মার চোখে জল এসে যায়। সে কচুপাতায় মোড়া তালের বরফি ফেলে উঠে পড়ে। কার জন্যে এত ভেবে মরি!

কার জন্য তালের বরফিগুলো এনেছিল, সে কথা আর বলা হয় না।

সে চলে গেলে বাওয়া একটু অপ্রস্তুত হয়ে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়। ঢোঁড়াই হঠাৎ কচুপাতার ঠোঙ্গাটী তুলে নিয়ে দূরে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ঝোপের নীচের ভাদ্রের ভরা নালায়, একটা ব্যাং লাফিয়ে পড়ে।

"ভিখ দিতে এসেছেন, ভিখ! তোর দেওয়া ভিখ যে খায়, তার বাপের ঠিক নেই। ডিষ্টিবোডের পয়সা দেখাতে এসেছেন! অমন খাবারে আমি......"

তারপর ঢোঁড়াই আর বাওয়া চুপ করে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকে। একই বেদনায় দুটো মন মিলে এক হয়ে যায়।

### ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধ-ঘোষণা

পরের দিন ভোরে উঠেই ঢোঁড়াই যায় ধাঙগড়টুলীতে শনিচরার কাছে। এত ভোরে তাকে দেখে শনিচরা অবাক হয়ে যায়।

"কি রে? সব ভাল তো?"

"ভালও আবার মন্দও। আমি 'পাক্কী' মেরামতির দলে কাজ করতে চাই। আমাকে ভর্তি করে নেবে?"

শনিচরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর হো হো করে হেসে ওঠে।

"এতদিনে তাহলে তাৎমাদের বুদ্ধি খুলেছে। গয়লার ষাট বছরে, আর তাৎমার সত্তর বছরে বুদ্ধি খোলে। আরে এতোয়ারী, শুক্রা, আকলু, বিরসা, বড়কাবুদ্ধু, ছোটকা বুদ্ধু, শোন শোন; শুনে যা 'খুশখবরী'(১)। মজার খবর। ময়নার বাচ্চার চোখ ফুটেছে।"

সকলে এসে জড়ো হয়। হাসি মস্করার মধ্যে মেয়েরাও এসে যোগ দেয়।

"এতদিনে তাৎমারা 'বেলদার'(২) হয়ে গেল।"

আরে বাবা, করবি তো মজুরী। যেখানে পয়সা পাবি সেখানে কাজ করবি। তার মধ্যে আবার বাছ বিচার।"

শুক্রা বাধা দিয়ে বলে, "তাই বলে নিজের মান ইজ্জৎ নেই। পয়সা পেলেই মেথর ডোমের কাজও করতে হবে নাকি?"

এতোয়ারী শুক্রাকে ঠাণ্ডা করে—"কোথায় মেথরের কাজ, কোথায় মাটিকাটার কাজ।"

"কালে কালে কিন্তু সকলের ফুটানী ভাঙগবে। দেখ অত বড় গেরস্থ ছৈস্থী চৌধরী, বনেদী ব্রাহ্মণ পরিবার পাড়া শুদ্ধ লোকের সম্মুখে হাল চালিয়েছে। জাতের মাথা দ্বারভাঙ্গারাজ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করেন নি। একে সখের হাল চালানো ভাবিস না। দিন আসছে, চনরচূড় ঝা, এতকাল 'ফুটানী ছাঁটতো'(৩) যে সে গরুর গাড়ীতে চড়ে না। সেদিন দেখি কামিখ্যাথানের মেলায় গরুর গাড়ী থেকে নামছে। লোটাতে করে জমানো পয়সা ঘরের মেঝেতে পোঁতা থাকলে তবেই 'বিবিকে' কাজ করতে বারণ করা যায়।

এসব তো অনেক হল। এখন 'বেটা'(৪) তুই বল, তুই যে রাস্তামেরামতির কাজ করবি, পাড়ার মহতো নায়েবদের জিজ্ঞাসা করেছিস।"

"তারা কি আমায় খেতে দেয়? জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন? আর জিজ্ঞাসা করলে জানাই আছে যে, তারা মাটিকাটার কাজ আমাকে করতে দেবে না।"

"দেখিস না, পঞ্চায়েত তোর কি করে। নোখে বেলদার কবে পচ্ছিম থেকে এসে, এক কুড়ি বছরের উপর এই এলাকায় আছে। তাকে কি তোর জাতভাইরা মানুষ বলে ভাবে? সে বেচারা রোজ কাজ করার সময় এই নিয়ে দুঃখু করে।"

সেই দিন থেকেই ঢোঁড়াই কোশী-শিলিগুড়ি রোডের একুশ থেকে পঁচিশ মাইলের গ্যাংএ বাহাল হয়।

সব ধাঙগড়রা তাকে ঠাট্টা করে বলে যে তোকে এবার থেকে 'বাচ্চা বেলদার' বলবো। শুক্রা ধাঙগড় তার বাবুর বাড়ীর মাইজীর কাছ থেকে, মাইনের থেকে এক টাকা আগাম নেয়; তার 'সনবেটার' কোদাল কিনবার জন্য। বুড়ো এতোয়ারী ধাঙগড়ের দল নিয়ে বেরোয় বকরহাট্টার মাঠের থেকে ময়নার ডাল বাছতে, —বাচ্চা বেলদারের কোদালের বাঁটের জন্য।

বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ফিরবার সময় ঢোঁড়াইয়ের দেখা হয় ধাঙগড়টুলীর ডাইনী-বুড়ী আকলুর মার সঙ্গে। সে মাটি খুঁড়ে একটা কি বার করছিল, মাটির ভিতর থেকে। ঢোঁড়াইকে দেখে হেসেই আটখান। ছালটা পোকায় খাওয়া খাওয়া গোছের, একটা প্রকাণ্ড শাঁক আলু ঢোঁড়াইয়ের হাতে দেয়। "নে নাতি, অসময়ের জিনিস।" সবাই একে ডাইনী বলে ভয় করে। কিন্তু এর চোখে একটা অননুভূত কোমলতার আভাস দেখে, ঢোঁড়াই ভয় করবার অবকাশও পায় না সেদিন। (ক্রমশঃ)

---

টীকা:—

(১) সুখবর

(২) বেলদার আর নুনিয়া, এই দুটো জাতই কেবল এই অঞ্চলে মাটিকাটার কাজ করে।

(৩) বড়াই করতো

(৪) ঢোঁড়াই শুক্রার সনবেটা অর্থাৎ ধর্মছেলে সেইজন্যই অন্য ধাঙগড়রাও তাকে ছেলে বলে।

(৬) আদবকায়দা

(৭) নিযুক্তি

(৮) 'পাকাধানে মই দেওয়া'র হিন্দী

# প্র·না·বি·র এলবাম

চিত্র-চরিত্র

## ফার্স্ট বুকের প্যারি সরকার

গত আশী বৎসরের মধ্যে কোন্ ইংরাজি শিক্ষার্থী বাঙালী ছাত্র না প্যারিচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক পড়িয়াছে? ওই ফার্স্ট বুকের চাবিতেই সকলকে ইংরাজি ভাষার তালা খুলিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকেও এই বইখানা দিয়া সুরু করিতে হইয়াছিল। আবার প্রভাত মুখুজ্জের গল্প হইতে জানিতে পারি যে, সেকালের বালিকারা ফার্স্ট বুকের গাধার গল্প পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলে বিবাহের বাজারের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইত। বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ এবং প্যারি সরকারের ফার্স্ট বুক দিবা রাত্রির মতো বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষাসূত্রপাতকে নিঃশেষে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

ফার্স্ট বুকের মতো ফার্স্ট বুকের লেখকের ছবিখানাও কে না দেখিয়াছে। চোগা চাপকান পরিহিত স্থূলদেহের উপরে পাট করা চাদর, এক হাতে বই, মাথায় টাক প্যারিচরণের মূর্তি সর্বজন পরিচিত। ফার্স্ট বুকের প্রথম শিক্ষার্থিগণ সে মূর্তির প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে সে কথা না তোলাই ভালো—কিন্তু মানিতেই হইবে যে পরবর্তীকালে সকলেই কখনো না কখনো সরকার মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব অনুভব করিয়াছে।

প্যারিচরণ সরকার সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন—"তিনি বহুকাল বারাশত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তৎপরে কলিকাতা হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আসিয়া শেষে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কলিকাতাতেও তিনি বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে কলেজের ছেলেদের জন্য বর্তমান ইডেন হোস্টেলের অনুরূপ একটি আবাস বাটি স্থাপিত হইয়াছিল; তিনি চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকরূপে তিনি সকল সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা ছিলেন; কিন্তু শিক্ষিত দলের মধ্যে সুরা পান নিবারণের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি অমর কীর্তি লাভ করিয়াছেন। এতদর্থে ১৮৬৩ সালে একটি সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেন। এই সভা হইতে ইংরাজিতে 'well-wisher' ও বাংলাতে 'হিত সাধক' নামে মাসিক পত্রিকা বাহির হইত; তাহাতে সুরা পানের অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে প্রতিবাদিত হইত। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এই কার্যের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। বলিতে কি তিনিই আমাদিগকে সুরা পানের বিরোধী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সরকার মহাশয় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত দেশের হিত-চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই।"

উপরের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তৎকালে প্যারিচরণ সরকার সমাজ সংস্কারকরূপে, সুরাপান নিবারণের প্রধান উদ্যোক্তারূপে সকলের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কার স্রোতের জলে রেখা টানিবার মতো—সমাজের পরিবর্তন হইলেই সংস্কারের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এমন কি বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার গৌরব পর্যন্ত আজ লঘু হইয়া পড়িয়াছে। অজেয় পৌরুষের মাহাত্ম্যেই বিদ্যাসাগর অমর হইয়া আছেন, সমাজ সংস্কারকরূপে নহে। সমাজ সংস্কারকদের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই যে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই অমরতার পথ ত্যাগ করেন। ইতিহাসের পাতায় কোন রকমে নামটা থাকিলেই লোককে অমর বলা যায় না—নামটা এমন জীবন্তভাবে থাকা দরকার, যাহাতে তাহার প্রভাব লোক সমাজে সক্রিয় থাকে। যাদুঘরে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই জন্তু জানোয়ারগুলিকে অমর বলা চলে না। অমরত্ব সজীব সত্তা।

সমাজ সংস্কারকরূপে বা সুরা পান নিবারকরূপে প্যারিচরণ সরকার তৎকালের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—আমাদের কৃতজ্ঞতার দাবীও করিতে পারেন, কিন্তু অমরতার দাবী করিতে পারেন না। প্যারিচরণ সরকার ইংরাজি শিক্ষার প্রধান প্রচারকরূপে অমর হইয়া আছেন। এক সময়ে ইংরাজি শিখিবার আশায় বাঙালী ছেলেরা হেয়ার সাহেবের পাল্কীর পাশে পাশে ছুটিত, বলিত "Me poor boy Sir"। হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইলে ছেলেরা ভাবিত ভাবী উন্নতির সদর রাস্তাটার হদিস তাহারা পাইল।

তাহারও আগে—"প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরি করিতেন. কিন্তু কলিকাতার একজনও ইংরাজি ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্তা ইশারা দ্বারা হইত। মানব স্বভাব এই যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু ইংরাজি কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাক্কায় ইংরাজি চর্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময়ে রাম রাম মিশ্রী ও আনন্দিরাম দাস অনেক ইংরাজি কথা শিখিয়াছিলেন। রাম রাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরাণীগিরি করিতেন, ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪।১৬ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত।......বিবাহে অথবা ভোজের সভায় যে ছেলে জাইন ঝাড়িতে (compound word বলা) পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাওহা দিতেন।"

এই গেল ইংরাজি শিক্ষার প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা হেয়ার সাহেবের পাল্কীর সঙ্গে দৌড়, তৃতীয় অবস্থা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। তখনো ইংরাজি শিক্ষা বাড়ীর বাহিরে ছিল—সাধারণ জলাশয়ের মতো, ঘাটে গেলে তবেই তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভব ছিল। প্যারী সরকার ফার্স্ট বুক লিখিয়া ইংরাজি শিক্ষার কলের জলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বাড়ীতে বাড়ীতে কলের জল আসিল—একটু কষ্ট করিয়া নলের মুখটা খুলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

ইংরাজি শিক্ষার ফলে এদেশের ভালো ও মন্দ দুই-ই হইয়াছে। একথা যদি সত্য হয় তবে যিনি ইংরাজি শিক্ষার দানসত্র খুলিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাকে যথাযোগ্যভাবে স্মরণ করিতে হয়। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব আমাদের সমাজে এখন পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয়, সেই সঙ্গে হেয়ার, বেথুন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মেকলের সঙ্গে প্যারিচরণ সরকারের নামও অমর হইয়া আছে, এখনও দীর্ঘকাল থাকিবে। ফার্স্ট বুকের মতো সামান্য একখানা পুস্তকের বলে আর কেহ অমরত্বের দাবী করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ! কিন্তু সামান্য একখানা পুস্তক বলা বোধ করি সঙ্গত হইল না, সমাজের একটা প্রচণ্ড প্রবণতার প্রতীক ওই সামান্য বইখানা। তখনকার কালে দেশের মধ্যে ইংরাজি শিখিবার যে ঝোঁক দেখা দিয়াছিল—ফার্স্ট বুক তাহারই অক্ষর মূর্তি। প্যারী সরকার সেই প্রবণতার গ্রন্থকার। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস যে ব্যক্তি লিখিতে বসিবে তাহাকে অনেক মোটা মোটা বইয়ের নাম বাদ দিতে হইবে কিন্তু ওই তন্বী পুস্তিকাটির নামোল্লেখ না করিয়া সে পারিবে না। ফার্স্ট বুক ও প্যারিচরণ সরকার একখানি বই ও ব্যক্তিমাত্র নয়—একটি প্রতিষ্ঠান।

# হিন্দুসমাজ ও তাহার ইতিহাস

শ্রীনির্মলকুমার বসু

### বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন

#### যুগী

যুগী জাতির সংখ্যা বাঙলা দেশে প্রায় চার লক্ষের কাছাকাছি হইবে। ১৯৩১ সালে তাহার মধ্যে ত্রিপুরায় ২২·০৮%, নোয়াখালিতে ১৭·১০%, মৈমনসিংহে ১১·৮৩%, চট্টগ্রামে ৯·৮২%, বাখরগঞ্জে ১·৭৪%, ঢাকাতে ৫·৫৫% এবং খুলনায় ১·২৩% জনের বাস। অবশিষ্ট শতকরা প্রায় ২৫ জন বাঙলা দেশের অন্যান্য জেলায় ছড়াইয়া আছে। যুগীদের মধ্যে তাঁতের ব্যবসায় স্বরাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। ইতিপূর্বে যুগীদের সম্পর্কে যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্বব্যত্তিতে অধিষ্ঠিত যুগীর সংখ্যা ১৯০১এ ৫৩·৮৮%, ১৯১১এ ৩৬·০৯%, ১৯২১এ ৩৬·২৫% এবং ১৯৩১ সালে ৪০·৮২% দাঁড়ায়। চাকের দিকে অথবা অন্যান্য বৃত্তির অভিমুখে সংখ্যার দিক দিয়া যুগীদের গতিকে গৌণ বলিয়া ধরা যায়। তাহা সত্ত্বেও জাতির আভ্যন্তরীণ সামাজিক আন্দোলনের ধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, উহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাই।

যুগীজাতির মধ্যে বর্তমানকালে সামাজিক চেতনার প্রমাণ সন ১২৭৯ (খ্রী ১৮৭২) সালে প্রথম পাওয়া যায়। সেই সময়ে কলিকাতার নিকটে আন্দুল-মৌড়ী গ্রামে কয়েকজন কৈবর্ত যুগীদের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করায় জাতিচ্যুত হয়। ইহার ফলে যুগীদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত সমাজের নিকট প্রশ্ন করেন, 'যোগী জাতি পবিত্র কি অপবিত্র এবং তাঁহাদিগের ব্যবহার কিরূপ?' যোগীজাতিকে পণ্ডিত সমাজ 'সদ্ব্যবহারযুক্ত' বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহার পরে যুগীদের মধ্যে কেহ কেহ উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সে আন্দোলন বিশেষ বিস্তারলাভ করে নাই। যোগীসখা পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩১৩) প্রকাশ যে, ১২৮৪ বং (খ্রী ১৮৭৭)তে ফাল্গুন মাসে লোনসিংহ গ্রামে ৭ জন উপবীত ধারণ করেন; চৈত্র মাসে রাজনগরে ২৪ জন এবং পরবর্তী বৎসর রাজগঞ্জে মাত্র ৭ জন ঐ পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সন ১২৮৭তে (১৮৮০ খ্রী) ভারতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক লিখিত যোগী সংস্কার নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়।

১৯০১ সালের আদমসুমারীতে প্রথম বিস্তৃতভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিগুলির পৃথকভাবে গণনাকার্য হয়। তাহার পর ১৯০৯ সালে মিণ্টো-মরলি শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হইল, সে সময়েও বিভিন্ন জাতি স্বীয় রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে পৃথক্‌ভাবে অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা ১৯০১ সাল হইতে পরবর্তীকালের ইতিহাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়া থাকি।

১৮৯১ সালে রিজলি 'ট্রাইব্‌স্ এণ্ড কাস্ট্‌স্ অব বেঙ্গল' গ্রন্থে যুগীদের উদ্ভব সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ মত প্রকাশ করেন, তাহার প্রতিবাদস্বরূপ যুগীসমাজের পক্ষ হইতে রিজলি সাহেবকে একখানি পত্র লেখা হইয়াছিল। ১৯০১এর আদমসুমারীর পরে **যোগী হিতৈষিণী সভা** স্থাপিত হয়; কিন্তু কিছুদিন চলার পর উহার লোপসাধন ঘটে। **যোগীসখা** পত্রিকাখানি খ্রীঃ ১৯০৫ সালে আরম্ভ হয় (বৈশাখ ১৩১১)। ইহার প্রবন্ধাবলি পাঠ করিলে যোগীসমাজ কোন্ মুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার আভাস এবং প্রমাণ পাওয়া যায়। যোগীসখার উদ্দেশ্য হইল, যোগীসমাজের বিভিন্ন উপশাখার উচ্ছেদ সাধন করিয়া জাতির মধ্যে একতার প্রতিষ্ঠা, জাতির সামাজিক মর্যাদার বৃদ্ধি সাধন এবং শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করা। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তাঁতশিল্পের দিকে দেশের মন যায় এবং যুগীজাতিও ইহাতে স্বীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা দেখিতে পান (যোগীসখা, আশ্বিন ১৩১৩)। ঐ সম্পর্কে আরও কিছু কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে থাকে, যথা শিল্প শিক্ষা (অগ্রহায়ণ ১৩১২), আমাদের উন্নতির মূলে কি কি আবশ্যক (বৈশাখ ১৩১৩)।

১৯০৯ সালে মিণ্টো-মরলি শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে উন্নতির সম্ভাবনা ও আশা বিভিন্নভাবে দেখা দেয়। যোগীসখা ভাদ্র ১৩১৫ (খ্রী ১৯০৮)এ দেখা যায়, জনৈক লেখক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন ঃ 'জাতীয় উন্নতিতে এখন স্বার্থপর ব্রাহ্মণের একাধিপত্য নাই; পাশ্চাত্য উদারতা উপযুক্ততার পুরস্কার দিতেছে।' শ্রাবণ ১৩১৮ (খ্রী ১৯১১) সালে যুগীজাতির পক্ষ হইতে চাকুরী এবং ছাত্রবৃত্তির জন্য বিশেষ একটি আবেদন করা হয়। গভর্নমেণ্টের নিকট বিশেষ প্রসাদলাভের প্রয়াস থাকার ফলে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিবামাত্র যোগীসখায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (ভাদ্র, ১৩২১=খৃ ১৯১৪)। তাহাতে লেখা ছিল ঃ 'আমরা এই ঘোর দুর্দিনে পিতৃস্বরূপ রাজার কার্যে সকলে আত্মদান করিতে পারিব না, কিন্তু যাঁহারা প্রাণ দিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের সাহায্য করা কর্তব্য। গভর্নমেণ্ট জানেন, আমরা অতি নিরীহ রাজভক্ত। রাজভক্তি প্রকাশের এমন সুবিধা আর হইবে না।' আবার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩২২ (খ্রী ১৯১৫)তে লেখা হয়, 'দরিদ্র যোগীজাতি চিরকাল রাজভক্ত, রাজার মঙ্গলকামনাই আমাদের মূলমন্ত্র......আমরা ইংরাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।'

ইংরেজের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য স্বীকারের মূলে ছিল, কিছু 'রাজনৈতিক অধিকারলাভ এবং চাকুরি প্রভৃতির দ্বারা' আর্থিক উন্নতির কিছু সম্ভাবনা। স্কুল কলেজের শিক্ষা বিস্তারের দিকে যুগী জাতির ঝোঁক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আশ্বিন ১৩১২ (খ্রী ১৯০৫) সালে 'সামাজিক স্বাতন্ত্র্য' নামক প্রবন্ধে যুগীজাতির অবনত অবস্থার জন্য শিক্ষার অভাবকে বিশেষভাবে দায়ী করা হয়। কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনামা হইতে এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। 'বিদ্যাশিক্ষা ও একতার অভাব' (মাঘ ১৩১২), 'শিক্ষা' (ফাল্গুন, ১৩১২), 'শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান' (ভাদ্র, ১৩১৩), 'আগে সাধনা পরে সিদ্ধি' (কার্তিক ১৩১৪), 'শিক্ষা' (পৌষ, ১৩১৫)।

**যোগী সম্মিলনী** নামক প্রতিষ্ঠান গভর্নমেণ্টের নিকট বৃত্তির জন্য আবেদন জানান (যোগীসখা, শ্রাবণ ১৩১৮=খ্রী ১৯১১); মৈমনসিংহে একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয় (অগ্রহায়ণ, ১৩২১=খ্রী ১৯১৪)। ছাত্রদের সাহায্যার্থ কিছু চাঁদাও সংগ্রহ করা হইয়াছিল। হয়ত এই সকল কারণেই জাতির মধ্যে শিক্ষার অনুপাত কিয়দংশে বৃদ্ধি পায়।

১৯০১— ৭·৬১%
১৯১১—১২·৯৭%
১৯২১—১৫·৪৪%
১৯৩১—১১·৩৬%

কলেজী শিক্ষা এবং চাকুরির দিকে গতি কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যুগীসমাজে স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। যুগীজাতির প্রাচীন ইতিহাস লইয়া গবেষণা আরম্ভ হয় এবং ১৯১১ সালের আদমসুমারীর পূর্বে সেনসাস কমিশনার সাহেবের জন্য রাধাগোবিন্দ নাথ প্রণীত বঙ্গীয় যোগীজাতি নামক একখানি পুস্তক উপহার প্রেরিত হয়। যোগীসখাতেও নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে।

'প্রত্নতত্ত্ব'—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, ১৩১২

'যোগীজাতির ঐতিহাসিকতা'—আশ্বিন, ১৩২৭, কার্তিক ১৩২৮

'আলোক রশ্মি'—বৈশাখ, ১৩৩০
'তোমরা কে'—মাঘ, ১৩১৭
'অধঃপতন ও প্রতিকার'—ভাদ্র, ১৩২৭

১৯২১ সালে আদমসুমারীর সময়ে যুগী-জাতির পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণবর্ণে গণ্য হইবার দাবী পেশ করেন; ১৯৩১ সালে সমগ্র যুগী-জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবী জানান। (Census Report, 1931)

যুগী সম্মিলনীর আন্দোলনের ফলে উপবীত ধারণ কিয়দংশে সার্থক হয়, কিন্তু উহা আশানুরূপ বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই।

সামাজিক মর্যাদার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে যুগীসমাজে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্যও চেষ্টা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যোগীসখায় 'উপনয়ন সংস্কার' (ভাদ্র, ১৩২১), 'উপবীত প্রচলন' (বৈশাখ, ১৩২৮) প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বৈশাখ, ১৩১৮ এবং জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০তে যোগী-দের মধ্যে পুরোহিতগণ যাহাতে সত্যই শিক্ষা-লাভ করেন এবং স্ববৃত্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহার বিষয় লেখা হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যুগীদের মধ্যে উপজাতিগুলি তুলিয়া দিবার জন্য আবেদন প্রকাশিত হইতে থাকে এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার বিষয়েও জনমত গঠনের চেষ্টা চলিতে থাকে। ('পরিণয় সংস্কার' —আশ্বিন, ১৩৩৮; 'বাল্যবিবাহ'—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২)। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে নিম্ন-লিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়।

'স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য'—অগ্রহায়ণ ১৩২৭।
'স্ত্রী-শিক্ষা'—মাঘ ১৩২৭।
'ভগ্নীবৃন্দের প্রতি নিবেদন'—মাঘ ১৩২৭।
'মেয়েরা কি মানুষ হবে না'—ভাদ্র ১৩৩০।
'নারী সমস্যা'—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১।

বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্ন লইয়া দুইটি মত দেখা দেয়। তাহার মধ্যে প্রাচীনপন্থিগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অগ্রগামী সমাজ কিছু বিধবার পরিণয়দানে সফল হন।

উপরে যোগীসমাজের মধ্যে যে গতির পরিচয় আমরা পাইলাম, তাহার মধ্যে শিল্পে উন্নতি অপেক্ষা গভর্নমেণ্টের নিকট অন্যান্য জাতির সহিত চাকুরী প্রভৃতিতে অধিকারের ব্যাপারই সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার মধ্যে এইটুকু দেখা যায়, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ইতিমধ্যে যে পথে চলিয়াছিলেন, যোগীগণ সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যোগী সম্প্রদায়ের বৃত্তি বস্ত্রশিল্প হইলেও সে বিষয়ে উন্নতির আভাস অল্পই পাওয়া যায়। কেবল স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ক্ষণিকের আলোর মত জাতির মধ্যে বয়ন শিল্পের দ্বারা আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিলেও যুগীজাতি স্থায়ীভাবে তাহার উপরে যেন নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না।

বৈশাখ ১৩১৩ (খৃঃ ১৯০৬) সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিলঃ 'স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে দিশী বস্ত্রের আদর হইয়াছে। ইহার অবলম্বনে আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে হইবে। Handloom ও fly-shuttle প্রভৃতি যে সকল কলের তাঁত আমদানী হইয়াছে, তাহার দ্বারা কাজ করিতে শিক্ষা করিলে অতি অল্প সময়ে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র বয়ন করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু হয়ত তাঁত শিল্পের উত্থান-পতন অতি অনিশ্চিত হওয়ায় অন্যদিকেও যুগী জাতিকে পথের সন্ধান করিতে হইতেছিল। যোগীসখা, বৈশাখ ১৩২১ (খৃঃ ১৯১৪)এ প্রশ্ন করা হয়, যাহারা উপবীত গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের দ্বারা চাষ কি সম্ভব হইবে? উত্তরে প্রকাশ যে যে-কোনও শিল্পে বা ব্যবসায়ে লাভ হওয়া সম্ভব, সেই দিকেই সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত।

যুগীজাতির আধুনিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—স্ববৃত্তিতে অনেকে নিয়োজিত থাকিলেও অধিকতর উন্নতির আশায় এবং সামাজিক মর্যাদার উৎকর্ষের জন্য এই শিল্পী জাতিটি কিরূপে স্বীয় সমাজ-সংস্কারের চেষ্টার ভিতর দিয়া ক্রমশ মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ সমাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যুগীদের মধ্যে সামাজিক উপজাতিগুলির সংশ্লেষ ঘটাইয়া ঐক্যবদ্ধ যুগীজাতি গঠনের চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির জন্য অধিকারের কিছু তারতম্য সৃজন করিবার ফলে ১৯০৯ সালে শাসন-সংস্কারের পূর্বে জাতিকে আশ্রয় করিয়া যে চেতনা অস্পষ্টভাবে ছিল, তাহাই যেন আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

### নমঃশূদ্র

বাঙলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, যেখানে নদী অথবা খালবিলের প্রাদুর্ভাব, নমঃশূদ্র জাতির প্রাদুর্ভাব সেই সকল জায়গায় বেশী। হিন্দুসমাজ চিরদিন এই কৃষিজীবী জাতিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, এমন কি অস্পৃশ্য বলিয়া গ্রামের প্রান্তে ভিন্ন পল্লীতে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছে। নমঃশূদ্রগণের স্ববৃত্তি বলিতে কৃষি ভিন্ন নৌকাচালনকেও বুঝায়।

যুগীজাতির স্ববৃত্তি অনেকাংশে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু নমঃশূদ্রগণের স্ববৃত্তি অত অধিক পরিবর্তিত হয় নাই। তাহাদের মধ্যেও শিক্ষা অতি অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবত দেখা দিয়াছে। কিন্তু যুগীজাতির মধ্যে যাহা ঘটে নাই, নমঃশূদ্রদের মধ্যে সেইরূপ একটি পরিণতির লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিল। নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা অল্প নহে এবং ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলার এক এক বৃহৎ অংশে ইহাদের বিস্তৃত বসতি আছে। কতকটা এই কারণে এবং কতকটা শিক্ষালাভের পরে বর্ণহিন্দুদের নিকট অপমানের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ নমঃশূদ্রগণ হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক জাতি এবং গভর্নমেণ্টের বিশেষভাবে অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া দাবী জানান। নমঃশূদ্রগণের মধ্যে নমঃশূদ্র হিতৈষণী সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান, অথবা পতাকা, নমঃশূদ্র সুহৃদ প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলি বিবেচনা না করিয়া আমরা কেবল একটি বিষয়ে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিব।

শ্রীরাইচরণ বিশ্বাস নামে জনৈক লেখক নমঃশূদ্র সুহৃদ (জানুয়ারী, খৃঃ ১৯০৮) পত্রিকায় লেখেন ঃ "আমরা ব্রাহ্মণের জাতি, হিংসা হেতু হউক বা ক্রোধবশত হউক, আমাদিগকে অনেকে না ভালবাসিতে পারেন, কিন্তু যুগান্তর ধরিয়া আমাদের ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার দেখিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, নমঃশূদ্র জাতি প্রাচীন মুনি-ঋষির অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্তান। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় আর্য কৃষিকার্য, সেই প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের মহাগৌরবের ব্যবসায়।" 'জাতিতত্ত্ব ও নমস্য ফলশ্রুতি' নামক একটি গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশিত হয়। নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে পূর্বে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের দাবীর সহিত সমাজে বিধবা বিবাহ নিরোধের জন্য একটি আন্দোলনও দেখা দিল।

শিক্ষার দাবী নমঃশূদ্রগণের পক্ষ হইতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এপ্রিল ১৯১৬ মাসের 'পতাকা' পত্রিকায় লেখা হয়ঃ "ব্রিটিশ রাজের কৃপায় যাহা একটু জ্ঞানকণা লাভ করিয়াছি, তাহার দ্বারাই এখন জানিতে সমর্থ হইয়াছি—আমরা কি ও আমাদের শক্তি কতটুকু। ২৫ লক্ষ লোক লইয়া যে সমাজ গঠিত, সে সমাজ কখনই চিরকাল ঘুমাইয়ো থাকিতে পারে না। হিন্দু সমাজের অন্ধ হিন্দু রাজের কৃপায় আমরা এতদিন ঘুমাইয়া ছিলাম। এখন জাতিভেদ জ্ঞানশূন্য সমদর্শী নিরপেক্ষ শক্তিশালী বৃটিশের কৃপায় জাগিলাম। অন্ধ চিত্ত ব্রাহ্মণকৃত আইনের শাসনে বাধ্য হইয়া আমাদের বাণী মন্দিরের চতুঃসীমানায়ও যাইতে দিতেন না।" "তোমার চিন্তা করিবার কি আছে? স্বয়ং ব্রিটিশরাজ অশিক্ষিতের বন্ধু, দরিদ্রের চিরসহায়, অনুন্নত জাতিসমূহের আশা-ভরসা তোমার সহায় হইবেন।"

ঢাকা জেলার গেজেটিয়ারে দেখা যায়, হিন্দু সমাজের প্রতি বিরূপ হওয়ার ফলে এবং ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত শিক্ষাদানের জন্য কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ নমঃশূদ্র জাতি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ

[illegible] আন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকার করে। [illegible] মজুমদার এবং রঘুনাথ সরকার নামে [illegible] অধিবাসী দুই ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুরকে [illegible] যে, নমঃশূদ্রগণ ব্রিটিশের সম্পূর্ণ [illegible] স্বীকার করেন এবং সরকারের পক্ষেও তাঁহাদের জন্য শিক্ষা ও চাকুরি বিষয়ে বিশেষ [illegible] স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। [illegible] ১৯০৭ সালের নমঃশূদ্র সুহৃদ পাঠে [illegible] পারা যায় যে, নমঃশূদ্র জাতির পক্ষ হইতে প্রতিনিধিবর্গ ছোট লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করে।

**'মুসলমানের জাতিভেদ'**

হিন্দু সমাজে শিল্পী বা অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে আমরা যে সকল সামাজিক গতি লক্ষ্য করি, স্বভাবতই উচ্চবর্ণের মধ্যে তদনুরূপ বিশেষ কিছু আন্দোলন দেখা যায় না। তবে একেবারে যায় নাই, ইহাও বলা চলে না। [illegible] স্বীয় ক্ষাত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য এক [illegible] চেষ্টা করেন, বৈদ্য জাতিও ব্রাহ্মণত্বের [illegible] প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান হন। কিন্তু [illegible] অথবা অস্পৃশ্য জাতিবৃন্দের মধ্যে [illegible] সংস্কারের জন্য যে উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষা [illegible], মর্যাদাশীল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের [illegible] অনুরূপ সংস্কারের তীব্রতা দেখা যায় না। [illegible] নিম্ন জাতিগুলি হিন্দু সমাজের [illegible] উচ্চবর্ণের সামাজিক রীতিনীতি [illegible] দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে [illegible]; অপর পক্ষে ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে [illegible] ঐক্য বা ন্যাশন্যালিজমের তাগিদে [illegible] বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল হইতে লাগিল। [illegible] অসবর্ণ বিবাহে সমাজে যে উত্তেজনার [illegible] হইত, স্বাধীনতার যজ্ঞে যখন দেশ [illegible] অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন অসবর্ণ [illegible] বিরুদ্ধে মনোভাবও আংশিকভাবে [illegible] হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কিন্তু বাঙলাদেশের হিন্দু [illegible] মত মুসলমান সমাজেও বিচিত্র কতক-[illegible] গতি পরিলক্ষিত হয়। সন ১৩৩৪ সালে (খৃঃ ১৯২৭) রাজারামপুর হাই স্কুলের ভূতপূর্ব হেড মাস্টার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী বি এ 'মুসলমানের জাতিভেদ' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ইহার সমালোচনা পাঠ করিয়া মনে হয়, বইখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ ইহা সমাদরের যোগ্যও বটে। সেই পুস্তক হইতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। পাঠকও উপলব্ধি করিতে পারিবেন, নমঃশূদ্রগণের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতার দাবী অস্ফুট আকারে দেখা দিয়াছিল, তাহা মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়া ভারতের উদীয়মান জাতীয় ঐক্যকে পঙ্গু করিবার প্রচেষ্টা করে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে ন্যাশনালিজমের তাগিদে জাতিগত ভেদ দূর করিয়া যে ক্ষীণ সংস্কার চেষ্টা চলিতেছিল, ইংরেজ শাসনের আওতায় পুষ্ট ভেদমূলক আন্দোলনগুলি সেই ঐক্য চেষ্টাকে অনেকাংশে পঙ্গু করিতে সমর্থ হয়।

"মুসলমানের জাতিভেদ" গ্রন্থের সমালোচনায় সওগাত পত্রিকা বলেনঃ 'ইসলাম সাম্য—বিশ্বভ্রাতৃত্ববাদের ধর্ম। মানব-শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদের প্রাচীর তুলিয়া উচ্চ-নীচের তারতম্য নির্দেশ করা ইসলাম সমর্থন ত করেই না। উপরন্তু জাতিভেদের ধ্বংসের উপরেই ইসলামের বুনিয়াদ গঠিত হইয়াছিল। ইসলাম অধ্যুষিত অন্য কোন দেশেই ইসলাম-প্রচারিত এই সাম্যবাদের ব্যতিক্রম বড় হয় নাই। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান সমাজের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে হিন্দু প্রতিবেশীর প্রভাব প্রবল; ফলে হিন্দুদের দেখাদেখি এদেশের মুসলমান সমাজেও জাতিভেদের তারতম্য ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়ির কদর্যতম দিকটা এখনো মুসলমান সমাজে আমল না পাইলেও তাহাদের প্রাচীনত্বের কৌলিন্য গর্ব এবং ব্যবসাতে উচ্চ-নীচ বিভাগটা বেশ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কাপড় বোনার ব্যবসা করিয়া তাঁতীগণ, মাছের ব্যবসা করিয়া নিকারী-গণ এবং এইরূপ আরও অনেক ব্যবসায়ী মুসলমানগণ নিতান্ত অকারণে সমাজে নিগৃহীত অবস্থায় রহিয়াছেন। ফলে সাম্য-বাদী মুসলমান সমাজেও আশরাফ—আতরাফ নামক দুইটা শ্রেণীর সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মূল পুস্তকখানিতে জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী লিখিতেছেনঃ

'১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশীয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ৮০ প্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যাও তাহাদের জাতি নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে মুসলমানগণের এই প্রকার জাতিভেদ এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, পৃথিবী পৃষ্ঠে অপর কোন দেশে মুসলমান সমাজে এরূপ জাতিভেদ প্রচলিত নাই।' (পৃঃ ১) পরিশিষ্ট হইতে তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছিঃ (১) আবদাল, (২) আজলাফ, (৩) আখুঞ্জি, (৪) বেদিয়া, (৫) বেহারা, (৬) বেলদার, (৭) ভাট, (৮) ভাটিয়া, (৯) চাটুয়া, (১০) চুরিহর, (১১) দফাদর, (১২) দাই, (১৩) দর্জি, (১৪) দেওয়ান, (১৫) ধাওয়া, (১৬) ধোবা, (১৭) ধুনিয়া বা ধুনকার, (১৮) ফকির, (১৯) গাইন, (২০) হজ্জাম, (২১) জোলা, (২২) কাগাজি, (২৩) কালান, (২৪) কান, (২৫) কাসুবি, (২৬) কসাই, (২৭) কাজি, (২৮) খাঁ, (২৯) খোন্দকার, (৩০) কলু, (৩১) কুমার, (৩২) কুঁজরা, (৩৩) লালবেগী, (৩৪) মাহিফেরুশ, (৩৫) মাহিমল, (৩৬) মাল্লাহ্, (৩৭) মল্লিক, (৩৮) মসালুচি, (৩৯) মেহতর, (৪০) মীর, (৪১) মির্জা, (৪২) মুচি, (৪৩) মোগল, (৪৪) নগার্চি, (৪৫) ননিয়া বা ননুয়া, (৪৬) নাস্যা, (৪৭) নাট, (৪৮) নিকারী, (৪৯) পাঠান, (৫০) পাওয়াবিয়া, (৫১) পীরকোদালী, (৫২) রাসুয়া, (৫৩) সৈয়দ, (৫৪) শেখ, (৫৫) সোনার, (৫৬) অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিঃ—(ক) আফগান, (খ) আশরাফ, (গ) বাকলি, (ঘ) বাথো, (ঙ) বাড়ি, (চ) ভুঁইয়া, (ছ) চৌধুরী, (জ) চুণারী, (ঝ) দফালি, (ঞ) গান্দি, (ট) গোলাম, (ঠ) হালালখোর, (ড) হিজরা, (ঢ) হোসেনী, (ণ) খরাদি, (ত) কোরেশী, (থ) লাহেরী, (দ) মাংটা, (ধ) মেহানা, (ন) মীরদেহ, (প) মিরিয়াসিন, (ফ) মিঞা, (ব) নওমোসলেম, (ভ) পাটেয়া, (ম) সুন্নি। (পৃঃ ৫৯)

মুসলমান সমাজে জাতি গণনার তীব্র সমালোনার পর লেখক বলিতেছেনঃ 'কিন্তু এ দেশে মুসলমানের জাতিভেদ প্রকরণে কেবল-মাত্র সেন্সাস কর্তৃপক্ষের দোষ নির্ণয়ে এক-দেশ-দর্শিতা প্রকাশ পাইবে। এ দেশীয় অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত মুসলমানগণও প্রতিবেশী হিন্দুর জাতিভেদের অনুকরণে আপনাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দুর সহিত একত্র বসবাস করিয়া হিন্দুর প্রভাব মুসলমানের সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অপরদিকে মুসলমানগণ সাধারণতঃ অশিক্ষিত বলিয়া ইসলামী আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। ...অধিকন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বল্পকাল মুসলমান সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বংশ পরম্পরাগত জাতিভেদ সংস্কার প্রভাবে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত রহিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান সমাজের অপরিচিত এই ভেদনীতি মূলে ভারতীয় মুসলমান সমাজে হিন্দু প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে'। (পৃঃ ১৬)

ভেদনীতির কুফল বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেনঃ 'সাম্যবাদী মুসলমান সমাজে অমুসলমানী প্রথায় জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে মুসলমানগণ হিংসা বিদ্বেষবশে পরস্পর কলহ বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িবে এবং এই সামাজিক কলহের ফলে মুসলমানদিগের একতা লুপ্ত হইয়া তাহারা দুর্বল ও হীনবীর্য হইয়া পড়িবে। মুসলমানদিগের বর্তমান অবনতির দিনে তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নিতান্ত নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন এবং মা[illegible] দেড় শত বৎসর ভারতের সিংহাসনচ্যুত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভূতপূর্ব প্রজা সাধারণ কর্তৃ[illegible] নিরতিশয় নগণ্য ও হেয় বলিয়া পরিগণি[illegible] হইতেছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের ম[illegible]

সামাজিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইলে তাঁহারা নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া তাঁহাদের ধ্বংসকামী সবলের কবলে পতিত ও নিপীড়িত হইবেন; এবং তদবস্থায় তাঁহাদিগকে ফেরাউনের হস্তে বনি ইসরাইলের ভাগ্য বরণ করিয়া লইতে হইবে।' (পৃঃ ১৯)

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের বিষয়ে তিনি লিখিতেছেন : 'বঙ্গদেশে মৎস্য ব্যবসায়ী দীক্ষিত মুসলমানগণ মধ্যে যেরূপ হিন্দু জাতীয় নিকারী আখ্যা প্রচলিত আছে, সেইরূপ অন্যান্য দীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে বিশ্বাস, মণ্ডল, প্রামানিক প্রভৃতি হিন্দু আখ্যারও প্রচলন রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল মুসলমান এ সম্বন্ধে ইসলামের বিধান সম্যক অবগত হইতে পারে নাই বলিয়া বর্তমান অবধি তাহাদের মধ্যে এই সকল হিন্দু আখ্যার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।...... জোলা, কলু, চাষা প্রভৃতি ব্যবসায়মূলক আখ্যাও বিধর্মীর হীন জাত্যর্থে মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে; সুতরাং এ সকল আখ্যার প্রচলনও রহিত হওয়া কর্তব্য।' (পৃঃ ৩৭)

'বর্তমান কালে হিন্দুগণ শিক্ষাদিতে উন্নত হইয়া বর্ণাশ্রমের গণ্ডিতে পদাঘাত পূর্বক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতম হিন্দুগণ মৎস্য ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন। এবং সাম্যবাদী মুসলমানগণের কতকাংশ অশিক্ষার অন্ধকার কূপে পতিত হইয়া কোরআন প্রশংসিত মৎস্য ব্যবসায় হেয় ভাবিয়া মৎস্য ব্যবসায়ী মুসলমানদিগের সহিত সামাজিক করণাদি বন্ধ করিতেছেন।' (পৃঃ ৩৪)

'আজ-কাল অনেক হিন্দু-ঘেঁষা অজ্ঞ মুসলমান কৃষি শিল্প ব্যবসায়জীবী মুসলমানদিগের সহিত সমাজ করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এবং হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথার অনুকরণে ঐ সকল মুসলমানের সহিত পানাহার করিতে বা একাসনে উপবেশন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কোন কোন স্থলে ইহাও পরিলক্ষিত হয়, যে বংশাভিমানী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদিগকে জায়গীর দান করিয়া কালক্রমে তাহাদিগকে চাষা, নিকারী, কলু বা জোলার সন্তান জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনাপন বংশগৌরব বা শরাফত রক্ষা করিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, যে আলেমগণ নবি করিমের খলিফা বলিয়া হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই আলেমগণ কৃষি শিল্প ব্যবসায়জীবীর বংশ-সম্ভূত হওয়ায় তাহারা তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িতেও অসম্মত হয়! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বাঙলার এই ভুঁইফোড় আশরাফগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ সন্তান নয় কি? ভণ্ডামীর নীচতা বোধ হয় আর ইহা অপেক্ষা নীচে নামিতে পারে না। মূর্খগণ কোরআন হাদিস খুলিয়া দেখুক, যে মুসলমান সমাজে তাহাদের এই ভণ্ডামীপূর্ণ শরাফতের স্থান নাই।' (পৃঃ ৩৯)

সুখের বিষয় ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পর হইতে শোনা যাইতেছে যে পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরা মাছ ধরা, পানের চাষ করা, ক্ষৌরকর্ম বা রজকের কাজ প্রভৃতি যাহা যাহা করিতেন না, এইবার স্বীয় সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং উন্নতি বিধানের জন্য সে সকল বৃত্তি সহজে গ্রহণ করিতেছেন।

অর্থাৎ যে বৃত্তিবিভাগ কুলগত করিয়া ভারতবর্ষ এক সময়ে শিল্প বাণিজ্যে উন্নত হইয়াছিল এবং মুসলমান শাসন প্রবর্তনের পরেও যাহা শহরে আংশিক আঘাতপ্রাপ্ত হইলেও গ্রামদেশে টিঁকিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যাহা ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের আঘাতে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য হিন্দু সমাজের মধ্যেও জাতিভেদের সংস্কার চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। মুসলমান সমাজের মধ্যেও তেমনি তাহার নাগপাশ হইতে মুক্তির একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। সকলেই বৃত্তিতে কুলগত অধিকার ভাঙিয়া স্বাধীনতা আনিবার চেষ্টা করিতেছে, সকলেই কুলগত পূর্বনিচয়ের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার তারতম্য সমূলে বিনাশ করিয়া উচ্চতম জাতি যে মর্যাদা অধিকার করিয়া আসিতেছিল, তাহাই আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

# মঞ্জু.....

শ্রীআশুতোষ মিত্র

মঞ্জুর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ হইলেও তাহার শরীরে আমাদের বঙ্গদেশীয় বয়সের বালিকাগণের ন্যায় যৌবনোচিত [illegible]লি ততটা দেখা দেয় নাই; তবে তাহার [illegible]মিশ্রিত সুবর্ণসদৃশ মুখকমলে এতটা [illegible] এতটা কমনীয় এতটা সরলতার ছাপ [illegible] যে, দর্শকমাত্রকেই হাঁ করিয়া দেখিতে হয়, [illegible] সেই দেববালাকে ভালবাসিতে হয়। মঞ্জু [illegible] বালিকা—গড়ওয়াল জিলার, দেবপ্রয়াগ [illegible] আড়াই মাইল পশ্চিমে একটি নগণ্য গ্রামে [illegible] বাস। বাসস্থানটি একটি ক্ষুদ্র [illegible]। তাহাতে সম্প্রতি মঞ্জু ও তাহার [illegible] মাতা থাকেন। মঞ্জুর এক দাদা ছিল। [illegible] প্রায় আট বৎসর হইল সে সৈন্যদলে [illegible] হইয়া দূরদেশে গিয়াছে। কখনও কখনও [illegible] কিছু টাকা পাঠাইত, তাহাতেই মাতা [illegible] গ্রাসাচ্ছাদন হইত। কিন্তু আজ তিন [illegible] যাবৎ সে কিছুই পাঠায় নাই, তাহার [illegible]ও পাওয়া যায় নাই। অতএব বৃদ্ধা [illegible] দেবপ্রয়াগে গিয়া প্রত্যহ [illegible] [illegible] বা ডাল ভিক্ষা করিয়া অতিকষ্টে [illegible] নির্বাহ করিতে হইতেছে এবং [illegible] তাহাদের সে, বৃদ্ধা যেদিন [illegible] পরিবার পরিবর্তে যে সামান্য গম [illegible] গৃহে আনিয়া সিদ্ধ করিয়া দুইজনে [illegible] একমাত্র খাইয়া দিন কাটাইয়া দেন, আর [illegible] সিদ্ধ গমগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পরদিনের [illegible] জন্য রাখিয়া দেন। আর যেদিন ডাল [illegible] সেদিন উহাই সিদ্ধ করিয়া খান।

এ কষ্টে মঞ্জুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। [illegible] শরীরে অমিত বল, পেশীগুলি শক্ত; [illegible] যেমন বলশালিনী সে, তেমনই তাহার [illegible]। রাত্রিটা সে কুটীরে মাতার নিকট [illegible]। প্রভাত হইলে একদিকে মাতা তাঁহার [illegible] যান, আর অপর দিকে সে তাহার [illegible]চিত বিক্রমে কুঠার স্কন্ধে মহা আনন্দে [illegible] লাফাইতে উচ্চ পর্বত আরোহণ [illegible] গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং [illegible] দ্বারা এক বোঝা কাঠ কাটিয়া লতা [illegible] বাঁধিয়া সেই উচ্চ পর্বতের তলে পৃষ্ঠে [illegible] করিয়া আনিয়া রাখিয়া দেয়, আর পুনরায় [illegible] জঙ্গলে গিয়া এদিক ওদিক লাফাইয়া বেড়ায়।

জঙ্গলে মঞ্জুর মহা আনন্দ। বেড়াইতে বেড়াইতে নিজ মনে গুণ গুণ করিতে থাকে, আর কখন 'কাফল' কখন বা 'হিঁসালু' পাড়িয়া খায়, আর কখন বা উচ্চ বৃক্ষে চড়িয়া তাহার শাখায় শুইয়া থাকে। বনে সর্প দেখিলে ভয় পায় না। তাহার ধারণা—যতক্ষণ তাহার নিকট কুঠারখানি আছে, ততক্ষণ কেহই তাহার কিছু করিতে পারে না। এইরূপে দ্বিপ্রহর অতীত হইলে পর পর্বত অবরোহণ করিয়া সে কাঠের বোঝাটা পূর্ববৎ পৃষ্ঠে লইয়া কুটীরে ফিরিয়া বোঝাটা রন্ধনের নিমিত্ত রাখিয়া দিয়া, যাহা পায়, তাহা আহার করিয়া লইয়া রিক্তহস্তে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া যায়।

এবার আর সে পর্বতে যায় না। এবার আর সে তাহার সঙ্গের সাথী কুঠারটাও লয় না। এবার রিক্তহস্তে যায় সে তাহাদের কুটীর হইতে প্রায় অর্ধমাইল নিম্নে যথায় মেঘগর্জনে ধাইতেছে পূতসলিলা অলকনন্দা তাপিত মর্তবাসীর তাপ দূরীকরণ করিতে। তথায় পৌঁছিলে তাহার আর সে প্রাতঃকালের চাঞ্চল্য থাকে না, সে কর্মপ্রবণতা থাকে না, তাহার মূর্তি যেন দেবী মূর্তিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। ধীর পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে সলিল মধ্যে অবতরণ করিয়া একখানি প্রকাণ্ড উপলখণ্ডের উপর গিয়া বসে। বসিবামাত্র সে ধীরস্থির হইয়া যায়।

খানিকক্ষণ ঐভাবে থাকিবার পর সে সেই অলকানন্দার মেঘগর্জনের অন্তরালে নিম্নস্বরে নিত্য তাহার অতি প্রিয় দুই ছত্র গান গাহে, যাহা সে তাহার ভ্রাতার নিকট বহুদিন হইল শিখিয়াছিল। গানটি সে তাহার পাহাড়ী ভাষায় গাহে। আমরা এখানে তাহার বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

"যদি কাণ্ডারী যেমন, আর কি তেমন আছে নেয়ে।
পার করেন দীনজনে অধমতারণ চরণ দিয়ে।"

গানটার অর্থ সে বুঝে না, তথাপি সে গাহে। দাদার নিকট শিখিয়াছিল, তাই তাহার প্রিয় লাগে। ঐ উপলখণ্ডের উপর বসিয়া সে শিখিয়াছিল, তাই উপলখণ্ডটি তাহার ভাল লাগে; তাই নিত্য সে উহার উপর আসিয়া বসে। উহা যেন তাহার নিকট অতি প্রিয়, অতি মনোরম স্থান। গাহিতে গাহিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসে, আপনাআপনি তাহার কুম্ভক হইয়া পড়ে, আর সে প্রস্তরবৎ হইয়া যায়। কতদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেও তাহার হুঁস থাকে না। কতদিন ঐভাবে এক প্রহর রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সে কুটীরে ফিরিয়াছে।

অলকানন্দাকে সে ভালবাসে। তাই কখন কখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সে কতদূর হইতে আসিতেছে, তাহার জন্মস্থান কোথায় এবং কত রমণীয় সে স্থান ইত্যাদি। উত্তরে অলকানন্দার নিকট হইতে কেবল গর্জন ছাড়া অন্য কিছু না পাইয়া সে নিজেই সে স্থানের রমণীয়তার বিষয় ভাবিতে থাকে আর ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া যায়। তাহার ঔৎসুক্য বাড়ে সে স্থান দেখিতে। যাইতে না পারিয়া সে অজ্ঞাত স্থানের দৃশ্যাবলী কল্পনায় গড়িয়া লয় আর মনে করে, সে সেইখানে এক উপলখণ্ডের উপর বসিয়া আছে—তাহার কি আনন্দ। আনন্দে সে ভরপুর হইয়া পড়ে—নিজ অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়া যায়।

দিন যায়, দিন কাহারও অপেক্ষা করে না। মঞ্জুর ঐ প্রকার উদাসীন থাকায় মাতার কঠোর পরিশ্রমে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তিনি শয্যাশায়িনী হয়েন। মাতাকে মঞ্জু অতিশয় ভালবাসে। দিবারাত্রি সে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকে, তাঁহার সেবা-সুশ্রূষা করে। আর সে জঙ্গলে যায় না, আর সে কাঠ কাটে না, আর সে অলকনন্দায় যায় না। অনাহারে থাকিয়া সে মাতার সেবা করে। মাতা কত বলেন, তাহাকে প্রতিবেশীদিগের নিকট খাইয়া আসিতে—সে আদৌ শুনে না। এক মুহূর্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। মাতার প্রবল জ্বর। ক্রমে আবল তাবল বকিতে থাকেন এবং অবশেষে ৪র্থ দিবস রাত্রে ইহধাম ত্যাগ করিয়া যান।

মাতার মৃত্যুর লক্ষণ দেখিয়া মঞ্জু তাঁহার হাতখানি নিজ কোলে টানিয়া লয়। সে হাত সেখানেই থাকিয়া যায়। একবার মাতাকে বলিতে শুনে—'তোর কি হবে?' যাহা হউক মাতার মৃত্যুতে তাহার নয়নে একবিন্দু অশ্রু দেখা দেয় না। অন্তঃকরণে কি হইল বা না হইল, আমরা জানি না। সে নিজের বিষয় কখনও কিছু ভাবে নাই—আজও ভাবিল না। চারিদিন অনাহারেও তাহার কিছু হয় নাই।

মাতার মৃত্যুতে মঞ্জু উঠে—কুঠারখানি কোমরে গুঁজিয়া লয়; একটি চকমকিও জামার ক্ষুদ্র পকেটে লয় আর তাহার স্বাভাবিক অমিতবলে মাতার মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া কুটীর ত্যাগ করে।

তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সেই গভীর নিশীথে মঞ্জু মাতার ক্ষীণ মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া একাকিনী কোথায় যায়? তাহার বল ও সাহস দৃষ্টে অবাক হইয়া পশ্চাদনুসরণ করি। দেখি—ধীরপদক্ষেপে সে পর্বত আরোহণ করিয়া তাহার প্রিয় অলকনন্দার তীরে পৌঁছিয়া চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া একটু অপেক্ষা করে। পরে তাহার সেই প্রিয় শিলাখণ্ডের উপর গিয়া দাঁড়াইয়া সেই প্রিয় গানটি একবার গাহে—

"হরি কাণ্ডারী যেমন, আর কি তেমন আছে নেয়ে।
পার করেন দীনজনে, অধমতারণ চরণ দিয়ে॥"

আর গানটি গাহিয়া মাতার মৃত শরীর ধীরে ধীরে অলকানন্দার পূত সলিলে সলিলসমাধি করে। পলক মধ্যে সে শরীর কোথায় চলিয়া যায়, কে জানে? অল্পক্ষণ বসিয়া থাকিয়া মঞ্জু তথায়ই শুইয়া পড়ে আর তাহার নাক ডাকিতে থাকে।

মঞ্জুর নাসিকাগর্জন অলকানন্দার সে মেঘগর্জনের নিকট "বিন্দুরের বুদ্দ" হইলেও অধিকতর আশ্চর্যান্বিত হই। ভাবি—এই দারুণ শোকের সময় কি মানুষ ঘুমাইতে পারে? বিশেষতঃ সে স্ত্রীলোক! তাহার কি মায়ামোহের লেশ মাত্র নাই? এ নূতন চরিত্র পাঠ করিতেই হইবে ভাবিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে থাকি।

প্রত্যুষে উঠিয়া মঞ্জু গৃহে না গিয়া সেই হিংস্র জন্তুসঙ্কুল ঘনারণ্যানি মধ্যে প্রবেশ করে আর অদ্যাবধি অরণ্যকেই নিজ ঘর করে। কেবল প্রতিদিন অপরাহ্ণে যথারীতি অলকানন্দার শিলাখণ্ডে আসে এবং সন্ধ্যা হইলেই পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করে—রাত্রিযাপন তথায়ই করে। কুটীরে প্রবেশ করা দূরে থাকুক সেদিকে আদৌ যায় না।

অরণ্যে সে স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, ক্ষুধা পাইলে কুঠার দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া কন্দমূল বাহির করিয়া খায়; তৃষ্ণার্ত হইলে ঝরণার শীতল বারি পান করে, নিদ্রাকর্ষণ হইলে বৃক্ষশাখায় চড়িয়া শয়ন করে। যে বৃক্ষশাখায় সে শয়ন করে, সেই বৃক্ষের অনতিদূরে শুষ্ক পত্র কুড়াইয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া দেয়—কদাচ রাত্রে ব্যাঘ্রের বোটকা গন্ধ পাইলে চকমকি দ্বারা পত্রগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে। অনতিবিলম্বে অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আর ব্যাঘ্র লাঙ্গুল গুটাইয়া পলায়ন করে। ইহাই মঞ্জুর মোটামুটি আরণ্য জীবন।

একদিন অপরাহ্ণে অলকানন্দার সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া সবেমাত্র সেই প্রিয় গানটা গাহিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে, এমন সময় তাহার স্কন্ধদেশ স্পৃষ্ট হওয়ায় মঞ্জু ফিরিয়া দেখে—মুণ্ডিত মস্তক এক নবীন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া। সে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসে—'কে?' সন্ন্যাসী কহে—"কেমন আছিস, মঞ্জু?"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর মঞ্জুর কর্ণে বাজিয়া উঠে। এ যে সেই স্বর, যাহা তাহার কর্ণে ৮ বৎসর যাবৎ প্রতিদিন সমভাবে বাজিয়া আসিতেছে, এ যে সেই স্বর, যে স্বরে সুর মিলাইয়া সে শিখিয়াছে—"হরি কাণ্ডারী যেমন—" ইত্যাদি। অমনি সে উঠিয়া সন্ন্যাসীর চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসে—"কে, দাদা? তোমার এ বেশ কেন? এতদিনে কি বোনকে মনে পড়েছে দাদা?" ইত্যাদি। উভয়ে ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়।

দাদা বিক্রম সিংহের নিকট মঞ্জু জানিতে পারে—পল্টনে চাকুরী করিতে করিতে এক মহাপুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ফলে সে সর্বত্যাগী হইয়া তাঁহারই নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে, আর সম্প্রতি তীর্থপর্যটনে বাহির হইয়া গঙ্গোত্তরী হইতে আসিতেছে। তাহার উদ্দেশ্য গুরুর সহিত বদরিকাশ্রমে মিলিত হয়। যাইতে যাইতে উপর পাহাড় হইতে মঞ্জুকে দেখিতে পাইয়া একবার দেখা করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছে।

মঞ্জুর নিকট বিক্রম সিং মাতৃবিয়োগের এবং সে অবধি তাহার অরণ্যে বাসের কথা শুনিয়া বলে—"তবে কি বোন্। আর কেন? আর তো তোর কোন পিছুটান নাই? প্রভু তো তোরে নিরাবলম্বিনী করে দিয়েছেন। চল্ তবে বদরিকাশ্রমে তোর এই প্রিয়া অলকানন্দার তীরে শিলাখণ্ডের উপর বসে সংযম ও তপস্যা শিক্ষা করবি, চল।"

মঞ্জু দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ দাদার অনুসরণ করে। তখন সেই সান্ধ্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গিরিবর্ত্ম ও অরণ্যানি ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলিত কণ্ঠ নিঃসৃত উচ্চ নিনাদ—

হরি কাণ্ডারী যেমন, আর কি তেমন
আছে নেয়ে।
পার করেন দীনজনে, অধম তারণ
চরণ দিয়ে

ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া নক্ষত্রখচিত আকাশ-মার্গে পৌঁছিতে থাকে।

ইহার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে মঞ্জু দাদার কৃপায় সেই মহাপুরুষের নিকট ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া শম, দম, তিতিক্ষাদির শিক্ষার্থিনী হইয়া বদরি-নারায়ণ যাইতে ৪ মাইল নিম্নে অলকানন্দার তীরে এক শিলাখণ্ডে বসিয়া এক্ষণে ধ্যান জপ আদি ত্যাগানুষ্ঠানে রত আছে। এখন তাহাকে দেখিলে পূর্বাপেক্ষা আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। তাহার সেই ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি হইতে ব্রহ্মচর্যের দীপ্তি ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তাহার শরীর হইতে তপস্যার নৈসর্গিক গন্ধ বাহির হইতেছে। তাহাকে দেখিলে দর্শকের মনে দেবীভাব ভিন্ন অন্যভাব আসে না।

কিন্তু সংসারের বিচিত্র ধারা,—দিবসের পর রজনী, সুখের পর দুঃখ, জন্মের পর মৃত্যু লাগিয়াই আছে। ইহা কি সংসারেরই ধারা অথবা সৃষ্টি কর্তার মর্জি কে জানে? যাহাই হউক না কেন, আমরা কিন্তু ইহা নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব, এক্ষেত্রেও ঐ নিয়মের বৈপরীত্য ঘটিবে কেন? আমাদের মঞ্জু ত আর সৃষ্টি ছাড়া মনুষ্য নহে যে, তাহার জন্য নূতন ধারার প্রচলন হইবে?

বৈশাখ মাস শেষ প্রায়। কয়েক দিন হইল, শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় কেদারনাথ ও বদরি-নারায়ণের মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। দলে দলে তীর্থযাত্রিগণ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে, কেহ ঝাঁপানে, কেহ ডাণ্ডিতে, কেহ কাণ্ডিতে কেহ বা পার্বতীয় অশ্বারোহণে, আর অধিকাংশই পদব্রজে ঐ দুইটি মহাতীর্থ দর্শনে চলিয়াছেন—সকলেরই হৃদয় আনন্দে ভরা, সকলেরই হৃদয় পবিত্রতায় ভরা—সকলেই চলিয়াছেন ইহজন্ম সার্থক করিবার উদ্দেশ্য লইয়া। কিন্তু আলোকের সঙ্গে অন্ধকার অবশ্যই থাকিবে।

অতএব, ঐ যাত্রীশ্রেণীর মধ্যে এমন একজন ঝাঁপানে চলিয়াছেন, যাঁহার প্রাপ্ত যৌবনাবধি অভ্যাস দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে [illegible] আনন্দ লইয়া জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশে ভ্রমণ করা। ইহার এবং অপরাপর যাত্রিগণের মধ্যে পার্থক্য কেবল পবিত্রতায়। ইহার হৃদয়ে পবিত্রতার লেশমাত্র নাই—অপবিত্রতায় ভরা; অন্য সকলের হৃদয় পবিত্রতায় ভরা।

ইনি ফৈজাবাদ নিবাসী মহা ধনবান ব্যক্তি, জাতিতে ক্ষেত্রী বয়স পঞ্চাশ উর্ধ্বে। নামটি আমাদের অজ্ঞাত হওয়ায় আমরা ইঁহাকে ধনী নামে অভিহিত করিব। ধনী নিজ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী—অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে ঐ প্রকার করিয়াছে। পারদর্শীতায়ই তিনি প্রায় সর্বত্র এযাবৎকাল জয়লাভ করিয়া আসিয়াছেন। কেবল দুই একস্থলে যেখানে পারদর্শীতা কাজে আসে নাই, সেই সেই স্থলে অর্থবলে কার্য [illegible] করিয়াছেন। ছল, বল, কৌশল—এ তিনটি অস্ত্রই তাঁহার করায়ত্ত। যেমন ধীবর পুষ্করিণীর জল কিভাবে তোলপাড় করিলে রুই কাতলা আদি বৃহদাকার মৎস্য তাহার জালে পড়িবে—জানে, সেই প্রকার 'ধনী' কাহার প্রতি কি অস্ত্র হানিলে সে করতলগত হইবে বিশেষ-ভাবে জানেন। ইনি জানেন, জন্ম সার্থক হয় ভোগে—ত্যাগে নহে। তাই ভোগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যৌবনের আরম্ভ হইতে এপর্যন্ত হেন কাজ নাই যাহা ইনি না করিয়াছেন—আর প্রতি কার্যে সফলকাম হইয়া আসিয়াছেন।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিনও পূর্ব পূর্বদিনের ন্যায় মঞ্জু সেই পূর্বোক্ত শিলা-খণ্ডের উপর বসিয়া ধ্যানস্থ—চক্ষু দুইটি মুদ্রিত। ঐ উপলখণ্ড হইতে কিঞ্চিদূর্ধ্বে বদরিনারায়ণের মন্দিরে যাইবার রাজমার্গ। কাতারে কাতারে যাত্রী ঐ মার্গ দিয়া চলিয়াছে—তপস্বিনী মঞ্জুকে দেখিয়া কেহ কেহ মার্গ হইতেই, তাহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছে, আর কেহ বা অবতরণ করিয়া শিলাখণ্ডে মস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিয়া পুনরায় মার্গে আসিতেছে। ঐরূপে ভীড় লাগিয়াছে দেখিতে পাইয়া আমাদের 'ধনী' ঝাঁপানে বসিয়াই পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র দূরবীন্ বাহির করিয়া উহার সাহায্যে তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার মঞ্জুকে দেখিয়া লয়েন এবং ঝাঁপান থামাইয়া শিলাখণ্ডের নিকট পৌঁছিয়া অপেক্ষা

...তে থাকেন, **যতক্ষণ না তপস্বিনীর চক্ষু** ...ষ্ট হয়।

...স্বিনীর চক্ষু খুলিলে তিনি সাষ্টাঙ্গ ... বলেন, "সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মধ্যে ...ভেদ নাই, তাঁহাদের চক্ষে ভেদদৃষ্টিও নাই। ...এব, প্রভো, দাসকে কৃপা করুন। দাস অতি ..., অতি দীন বৃদ্ধ হইলেও নরজন্ম সার্থক ...রার কোন চেষ্টা এ পর্যন্ত ...রা উঠিতে পারি নাই। নিজের ত কোন ... নাই। তাই মহাতীর্থ অযোধ্যাধামে বাস ...সেও ভারতের তীর্থসমূহ দর্শন এবং ...পনাদের ন্যায় মহদ্ব্যক্তির সঙ্গলাভে যদি ...ন উপায় হয় সেই চেষ্টায় বাহির হইয়াছি। ...পনাদের কৃপায় লোক চিনিবার জ্ঞান দাসের ...মান্য কিছু জন্মিয়াছে। তাহাতে সম্মুখে বলা ...চিত হইলেও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ...পনার ন্যায় সরল মহাপুরুষ অতি বিরল। ...নিয়াছি—সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শনের বিধি আছে ... তাহাতে পুণ্যসঞ্চয় অসীম। দাস মানস ...রে বাহির হইয়াছে শ্রীবদরীনারায়ণ দর্শনের ...শ্রীক্ষেত্র ও রামেশ্বর হইয়া দ্বারকাধীশের ...করে। ইহা হইলেই চারিটি ধাম হয়। ...র নবীন বয়স হইলেও বোধহয় ঐ সব ... হইয়া গিয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তাহা ...কে দাসের প্রতি আজ্ঞা হয়, যাহাতে দাস ...পনার সেবা করিতে করিতে আপনার সঙ্গ-... ঐ তীর্থগুলি দর্শন করিয়া অক্ষয় পুণ্য ... করিতে পারে আর জীবন ধন্য হয়। ... কৃপা করিয়া দাসকে সে সৌভাগ্য দান ... কৃতার্থ করুন। আপনার কিছুই যায় আসে ... আপনি যেখানে থাকেন, সেই স্থানই স্বর্গ। ... দয়া করিয়া পরহিতায় দাসের প্রতি ...দৃষ্টিক্ষেপ দেখুন। দাসের বয়সের প্রতিও লক্ষ্য ...ন।" ইত্যাদি নানাপ্রকারের স্তুতিবাক্যে ...স্বিনীর মন ভিজাইতে থাকেন।

...ফলেও ফলে। আর ফলিবেই না কেন? ...স্তুতিতে দেবতাগণেরই মন ভিজিয়া থাকে ...র তাঁহারা বরও দিয়া থাকেন তা মঞ্জুর কা... তীর্থ পর্যটনের কথা শুনিয়া তাহার মনে ...কথা জাগে—যাহাতে সে অলকানন্দার উৎ-...স্থান কোথা অলকানন্দাকেই জিজ্ঞাসা ...রিয়া তাহার নিকট কোন উত্তর না পাইয়া নিজ ...সে তথাকার মনোরম দৃশ্যের একটা কল্পনা ...রিয়াছিল। পর্যটক হইবার সাধ মঞ্জুর হৃদয়ে ...চ্ছন্নভাবে বরাবরই ছিল। ধনীর কথায় উহা ...কাশ পায় আর সে জিজ্ঞাসে—ঐ সব তীর্থের ...থ তোমার জানা আছে? আমায় লইয়া যাইতে ...মার কোন কষ্ট বা অসুবিধা ত হইবে না? ...নী কহেন—কি কহেন আপনি? তীর্থ পর্য-...নের জন্য ভগবান দাসকে যথেষ্ট ধন দিয়াছেন। ...র আপনার মত মহাপুরুষকে মাথায় বহিয়া ...ইয়া যাইবে ইত্যাদি। মঞ্জু সম্মত হইলে ঠিক ...র অনতিবিলম্বে ধনী শ্রীবদরিনারায়ণ দর্শন করিয়া আসিবেন এবং ফিরিবার পথে মঞ্জুকে লইয়া যাইবেন। ধীবর জালে মীন পতিত দেখিয়া ধীবররূপী ধনী মহোল্লাসে সম্প্রতি বিদায় লয়েন আর সরলমতি মঞ্জু বুঝিতে পারে না যে, সে স্বেচ্ছায় কি শৃঙ্খল পরিতেছে? ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যথাসময়ে ধনী একখানি ঝাঁপান ভাড়া করিয়া উহাতে মঞ্জুকে মহা সমাদরে বসাইয়া নিজ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে যাত্রা করেন আর পথে সাধুর প্রাপ্য সম্মান ও সেবা সমস্তই তাহাকে দিতে থাকেন। কথায় কথায় একবার জানিয়া লয়েন মঞ্জু পর্বত ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও কখন যায় নাই। তখন তিনি পাইয়া বসেন এবং বুঝাইয়া দেন যে, পথে যখন অযোধ্যা পড়িবে তখন ঐ স্থান হইয়া যাওয়াই শ্রেয়। ঐরূপ করায় উভয়েরই সুবিধা। মঞ্জুর একটি তীর্থ দর্শন হইবে আর তাঁহারও বাটীতে গিয়া খরচের টাকা-কড়ি গুছাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে দুই দশ দিন লাগিতে পারে, তাহাতে অবশ্য মঞ্জুর কোন প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে না। সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।

এই প্রকার বুঝাইয়া রামনগর হইতে ফয়জাবাদের টিকেট ক্রয় করিয়া উভয়ে ট্রেণে চড়েন। মঞ্জুর জীবনে সর্বপ্রথম রেলগাড়ী দেখিয়া মহা আনন্দ হইলেও পাহাড় হইতে নামিয়া তাহার গরম বোধ হইতে থাকে। পানীয় জল গরম লাগে; তথাপি সে ঐ সব কষ্ট গ্রাহ্য করে না—এতই তাহার দেশ ভ্রমণ করিবার, এতই তাহার তীর্থ পর্যটন করিবার প্রবল বাসনা।

যাহা হউক, যথাসময়ে তাঁহারা ফয়জাবাদ পৌঁছেন। তথায় ধনীর সুবৃহৎ অট্টালিকায় দ্বিতলের এক সুসজ্জিত কক্ষে মঞ্জুর থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হয়। অট্টালিকা ও সেই কক্ষের সাজসজ্জাদৃষ্টে অনাড়ম্বরা জন্ম-দরিদ্র মঞ্জুর মাথা ঘুরিয়া যায়—সে অবাক হইয়া দেখিতে থাকে আর সুযোগ পাইয়া মায়া অলক্ষে তাহার হৃদয় অধিকার করিতে প্রয়াস পায়। তাহার মনে বাসনা জাগে। ইহা কি তাহার পূর্বজন্ম সংস্কার?

বাসনা জাগিলে হইবে কি? সঙ্গে সঙ্গে যে এক মহা কষ্টের উদয় হইয়া তাহার মনকে বিধ্বস্ত করিতে থাকে। এ কষ্ট তাহার জানা ছিল না। এ কষ্ট হওয়া যে স্বাভাবিক, তাহা যে সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। অতএব এ কষ্ট তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে আর সে ফয়জাবাদ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য ধনীকে অনুরোধ করিতে থাকে।

সে অনুযোগ করে—এখানে তাহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে। অতএব অতি সত্বর এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে, যেখানে এরূপ কষ্ট নাই। নিরক্ষরা সরলা মঞ্জু স্বীয় অনুভূতি হইতেই অনুযোগ করে। সে জানে না যে, যাহার পার্বতীয় অরণ্যে এবং নদীবক্ষে শিলাখণ্ডে সদা বাস, যাহার সদা মুক্ত ও পবিত্র বায়ু সেবনই অভ্যাস, সে অট্টালিকাশ্রেণীতে আবদ্ধ, ধূলি-ধূসরিত রাস্তায় এবং মহাকোলাহলময় শহরের বদ্ধ ও অপবিত্র বাতাস সেবন যদি করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার শ্বাসরোধ হওয়াই স্বাভাবিক।

ধনী পথের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে আরও ২।৪ দিন লাগিবে কহিয়া মঞ্জুকে বুঝান, বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহার সেবায় রত হয়েন, কক্ষে টানা পাখার ব্যবস্থা করিয়া দেন, পানীয় জলে বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করেন, অযোধ্যার তীর্থগুলি দেখান, আর নিত্য অপরাহ্নে ফয়জাবাদের সরযূতীরে লইয়া গিয়া তাহাকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত বসান। ধনী এত করিলেন বটে, কিন্তু কোন ফল ফলিল না। মঞ্জুর শ্বাসরোধ এতটা অসহনীয় হইয়া উঠে যে সে আর এক মুহূর্তও ফয়জা-বাদে রহিতে চাহে না। তাহার ধারণা, সে স্থান ত্যাগ করিলেই সে হিমালয়ের সেই পবিত্র বাতাস আর সুস্বাদু শীতল জল পাইবে। সে বলে, যদি অন্যত্র যাইতে বিলম্ব থাকে, আমায় যেখান হইতে আনিয়াছ, সেখানেই রাখিয়া আইস—আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। সে ধনীকে উত্যক্ত করিতে থাকে।

ধনীকে আমাদের আর একটি ঘটনায় দরকার। উহার পর আর তাঁহার আবশ্যক হইবে না। অতএব তাঁহার চরিত্র বিষয়ে পূর্বে যথেষ্ট আভাস দিলেও এখানে একটু বিস্তারিত-ভাবে বলা উচিত।

অনেক দিন হইল তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। জাতিগত প্রথানুসারে তাঁহার বাল্য-বিবাহ হইলেও যৌবনের উন্মেষ হইতেই তিনি উচ্ছৃঙ্খল। তবে পত্নীর জীবদ্দশায় কুকার্যগুলি প্রচ্ছন্নভাবে সতর্কতার সহিত হইত। কিন্তু যেহেতু পাপকার্য লুক্কায়িত থাকে না, সেহেতু উত্তরকালে পত্নী ও উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের কর্ণে উঠিতে থাকে। ফলে পত্নীর মৃত্যুর পর পুত্রেরা প্রকাশ্যে তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। তিনি কিন্তু হটিবার পাত্র নহেন। পুত্রদ্বয়কে স্বতন্ত্র দুইখানি বাটী ও যথোচিত অর্থদানে আলাদা করিয়া দিয়া নিষ্কণ্টক হইয়া নিজ বসত বাটীখানিকে বিলাস ভবনে পরিণত করেন। মঞ্জুকে যখন আনেন, তখন বিলাসের তিনটী শীকার এই বাটীতে পৃথক ভাবে আছে। এতই কড়া নজর তাঁহার যে একটী শীকার অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পায় না।

যখন মঞ্জুকে ভালভাবে অবরোধ করিবার উপায়সমূহ ব্যর্থ হয়, আর সে তিলমাত্র তথায় থাকিতে চাহে না তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া রাত্রিকালে ধনী মঞ্জুর কক্ষে প্রবেশ-পূর্বক লালসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে

মঞ্জুর উপর বলপ্রয়োগে সাহসী হন।

অনভিজ্ঞ ধনী সে সময় সেই সুপ্রচলিত কথাটি একেবারে ভুলিয়া যান যে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?;" অথবা ইহা হওয়া স্বাভাবিক, যেমন—

> "অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্মঃ
> তথাপি রামঃ লুলুভে মৃগায়।
> প্রায়ঃ সমাপন্নে বিপত্তিকালে
> ধী য়োহপি পুংসং মলিনা ভবন্তি॥

সোণার হরিণের জন্ম অসম্ভব, ইহা সকলেই জানে; তথাপি রামচন্দ্র হেন ব্যক্তির ঐ মৃগের লোভ জন্মিয়াছিল। অতএব বিপদকাল উপস্থিত হইলে প্রায়শ পুরুষের বুদ্ধি মলিন হইয়া থাকে।"

আর ঐ শাস্ত্রে একেবারে অনধিতা ঐ বিদ্যায় একেবারে অনভিজ্ঞা সরলাবালা মঞ্জু আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া বলপ্রয়োগের উত্তর দিয়া বসে—সজোরে নিজ হস্তদ্বয় ছিনাইয়া লইয়া হীনবল বৃদ্ধের পৃষ্ঠদেশে এমন এক মুষ্ঠ্যাঘাত করে, যাহাতে তাঁহার মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইয়া যায়, আর উত্থানশক্তি রহিত হইয়া তিনি পুনঃপ্রহারের ভয়ে অতিকষ্টে কোন ক্রমে হামা দিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান। অমনি কালাবিলম্ব না করিয়া মঞ্জু ভিতর হইতে কক্ষদ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিয়া দুই হাতে বিপরীত দিকের গবাক্ষের দুইটি কাষ্ঠনির্মিত গরাদ উৎপাটিত করিয়া সেই ফাঁক দিয়া লম্ফপ্রদানপূর্বক রাজমার্গে পড়িয়া গাঢ় অন্ধকারে মিশিয়া যায়। ধনী গোঙাইতে গোঙাইতে ইঙ্গিত করায় ভৃত্যেরা ইতস্তত অনুসন্ধান করিয়া মঞ্জুর সন্ধান পায় না।

সেই গভীর নিশীথে মঞ্জু চলিয়াছে। একাকিনী বিদেশের রাজমার্গ ধরিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে নিজ মস্তিষ্কের জ্ঞানানুসারে ভাবিতেছে—আমি তার কি করিয়াছি যে, সে আমায় মারে? আমি ত আর আপনা হইতে আসিতে চাহি নাই। আমার কোন দোষ নাই যে, আমায় মারে। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে সে রাস্তা চলিতে থাকে।

ফরজাবাদে মঞ্জুর একটিমাত্র রাস্তা জানা আছে—তাহাতেই সে চলিতে থাকে। চলিতে চলিতে অবশেষে সরযূতীরে পৌঁছে এবং কিল্লার ভগ্নাংশের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অনেকক্ষণ ভাবে। চিন্তার পর নিজ বুদ্ধি অনুসারে সরযূকে সম্বোধন করিয়া কহে—সরযূ! তুমি ছাড়া আমার আপনার লোক এখানে কেউ নাই—আমার দাদা ও গুরুদেবও নাই যে, তাঁদের শরণাপন্ন হইব। অতএব তুমি আমার কথা শুন—আমায় সেই অলকানন্দার শিলাখণ্ডে পৌঁছাইয়া দাও।—ইহা কহিয়া অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুণ্যতোয়া সরযূনীরে ঝম্প প্রদান করে। আমাদের মঞ্জু কোথায় চলিয়া যায়, কে জানে। তবে বেদধ্বনিবৎ আকাশমার্গে সেই অমর গীতি হইতে শুনিতে পাই—

> হরি কাণ্ডারী যেমন, আর কি তেমন আছে নেয়ে।
> পার করেন দীনজনে, অধমতারণ চরণ দিয়ে॥

সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, স্বপনও ছুটিয়া যায়। জাগিয়া দেখি শয্যার উপর একইভাবে শুইয়া আছি। তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দিবসের কার্যে লাগিয়া যাই, আর সেই নিত্য একইভাবে কার্য করিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু মঞ্জুর চরিত্র এ যাবৎকাল সমভাবে হৃদয়ে জ্বল জ্বল করিতেছে। ভুলিতে পারি নাই। তাই বলি, আমাদের মঞ্জু দেবলোকের নহে, আমাদের মঞ্জু নরলোকেরও নহে,—আমাদের মঞ্জু স্বপ্নলোকের।

# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২৬)

হেমন্তের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন থেকে মৌলানা জিয়াউদ্দীন এসে কাবুলে পৌঁছলেন। বগদানফ, বেনোয়া, মৌলানা আমাতে মিলে তখন 'চারইয়ারী' জমে উঠল।

জিয়াউদ্দীন অমৃতসরের লোক। '২১'এর খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছাড়েন। ২২এ শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হন এবং পরে খুব ভালো বাঙলা শিখেছিলেন। বেশ গান গাইতে পারতেন আর রবীন্দ্রনাথের অনেক গান পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করে মূল সুরে গেয়ে শান্তিনিকেতনের সাহিত্য সভায় আসর জমাতেন। এখানে এসে সে সব গুণ খুব কাজে লেগে গেল, কাবুলের পাঞ্জাবী মহল তাঁকে লুফে নিল। মৌলানা ভালো ফার্সী জানতেন বলে কাবুলীরাও তাঁকে খুব সম্মান করত।

কিন্তু চারইয়ারী সভাতে ভাঙন ধরল। বগদানফের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি কাবুলী ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। বেনওয়া সায়েব তখন বড় মনমরা হয়ে গেলেন। কাবুলে তিনি কখনো খুব আরাম বোধ করেন নি—এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সনকে বাদ দিলে বেনওয়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সমজদার। শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক কেই উদাস হয়ে যেতেন ও খামখা কাবুলের নিন্দা করতে আরম্ভ করতেন।

বেনওয়া সায়েবই আমাকে একদিন রাশান এম্বেসিতে নিয়ে গেলেন।

প্রথম দর্শনেই তাভারিশ দেমিদভকে আমার ভারি ভালো লাগলো। রোগা চেহারা, সাধারণ বাঙালীর মতন উঁচু, সোনালি চুল, ভুরুর লোম পর্যন্ত সোনালি, শীর্ণ মুখ আর দুটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ নীল চোখ। বেনওয়া যখন আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি মুখ খোলার আগেই যেন চোখ দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছিলেন। সাধারণ ডিপ্লোম্যাটদের চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকে তিনি শেকহ্যান্ড করলেন, আর হাতের চাপ দেওয়ার ভঙ্গি দিয়ে অতি সহজে অভ্যর্থনার সহৃদয়তা প্রকাশ করলেন।

তাঁর স্ত্রীরও রেশমি চুল, তবে তিনি বেশ মোটাসোটা আর হাসিখুসী মুখ। কোথাও কোনো অলংকার পরেন নি, লিপস্টিক রুজ তো নয়ই। হাত দুখানা দেখে মনে হল ঘরের কাজকর্মও বেশ খানিকটা করেন। সাধারণ মেয়েদের কপালের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশী চওড়া কপাল, মাথার মাঝখানে সিঁথি আর বাঙালী মেয়েদেরই মত অযত্নে বাঁধা এলো-খোঁপা।

কর্তা কথা বললেন ইংরিজিতে, গিন্নি ফরাসীতে।

অভিজ্ঞান শেষ হতে না হতেই তাভারিশ দেমিদভ বললেন, 'চা, অন্য পানীয়, কি খাবেন বলুন।'

ইতিমধ্যে দেমিদভ পাপিরসি (রাশান সিগরেট) বাড়িয়ে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে তৈরী।

আমি বাঙালী, বেনওয়া সাহেব শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে অর্ধ বাঙালী হয়ে গিয়েছেন আর রাশানরা যে চা খাওয়াতে বাঙালীকেও হার মানায় সে তো জানা কথা।

তবে খাওয়ার কায়দাটা আলাদা। টেবিলের মাঝখানে সামোভার; তাতে জল টগবগ করে ফুটছে। এদিকে টি-পটে সকাল বেলা মুঠো-পাঁচেক চা আর গরম জল দিয়ে একটা ঘন মিশ কালো লিকার তৈরী করা হয়েছে—সেটা অবশ্য ততক্ষণে জুড়িয়ে হিম হয়ে গিয়েছে। টি-পট হাতে করে প্রত্যেকের পেয়ালা নিয়ে মাদাম শুধান কতটা দেব বলুন। পোয়াটাক নিলেই যথেষ্ট; সামোভারের চাবী খুলে টগবগে গরম জল তাতে মিশিয়ে নিলে দুয়ে মিলে তখন বাঙালী চায়ের রঙ ধরে। কায়দাটা মন্দ নয়, একই লিকার দিয়ে কখনো কড়া, কখনো ফিকে যা খুসী খাওয়া যায়। দুধের রেওয়াজ নেই, দুধ গরম করার হেঙ্গামও নেই। সকাল বেলাকার তৈরী লিকারে সমস্ত দিন চলে।

সামোভারটি দেখে মুগ্ধ হলুম। রুপোর তৈরী। দুদিকের হ্যাণ্ডেল, উপরের মুকুট, জল খোলার চাবী, দাঁড়াবার পা সব কিছুতেই পাকা হাতের সুন্দর সুদক্ষ, সুক্ষ্ম কাজ করা।

তারিফ করে বললুম, 'আপনাদের রুপোর তাজমহলটি ভারী চমৎকার।'

দেমিদভের মুখের উপর মিষ্টি লাজুক হাসি খেলে গেল—ছোট ছেলেদের প্রশংসা করলে যে রকম হয়। মাদাম উচ্ছ্বসিত হয়ে বেনওয়া সায়েবকে বললেন, 'আপনার ভারতীয় বন্ধু ভালো কমপ্লিমেণ্ট দিতে জানেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাজমহল ছাড়া ভারতীয় আর কোনো ইমারতের সঙ্গে তুলনা দিলে কিন্তু চলত না মসিয়ো; আমি ঐ একটির নাম জানি, ছবি দেখেছি।'

তখন দেমিদভ বললেন, 'সামোভারটি তুলা শহরে তৈরী।'

আমার মাথার ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, বললুম, 'কোথায় যেন চেখফ না গর্কীর লেখাতে একটা রাশান প্রবাদ পড়েছি, 'তুলাতে সামোভার নিয়ে যাওয়ার মত।' আমরা বাঙলাতে বলি 'তেলো মাথায় তেল ঢালা।'

'কেরিইং কোল টু নিউ কাস্‌ল', 'বরেলি মে বাঁশ লে জানা' ইত্যাদি সব কটাই আলোচিত হল। আমার ফরাসী প্রবাদটিও মনে পড়ছিল, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী নিয়ে যাওয়া' কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে সেটা চেপে রাখলুম। হাফিজও যখন বলেছেন, 'আমি কাজী নই মোল্লাও নই, আমি কোন দুঃখে 'তওবা' (অনুতাপ করতে যাব), আমি ভাবলুম, 'আমি ফরাসী নই, আমার কি দায় রসাল প্রবাদটা দাখিল করবার।'

দেমিদভ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষের লোক রাশান কথাসাহিত্য পড়ে কিনা।'

আমি বললুম, 'গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো মত দেওয়া কঠিন কিন্তু বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে এককালে ফরাসী সাহিত্য যে আসন নিয়েছিল সেটা কয়েক বৎসর হল রুশকে ছেড়ে দিয়েছে। বাঙলা দেশের অনেক গুণী বলেন, চেখফ মপাসাঁর চেয়ে অনেক উঁচু দরের স্রষ্টা।'

বাঙলা দেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষই যে ক্রমে ক্রমে রুশ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে সে সম্বন্ধে বেনওয়াসায়েব তখন অনেক আলোচনা করলেন। ভারতবাসীর সঙ্গে রুশের কোন জায়গায় মনের মিল, অনুভূতির ঐক্য, বাতাবরণের সাদৃশ্য, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বেনওয়া অনেকক্ষণ ধরে আপন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় মজলিসি কায়দায় পরিবেশণ করলেন। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে যে প্রচুর রাশান নভেল, ছোট গল্পের বই মজুদ আছে সে কথাও বলতে ভুললেন না।

দেমিদভ বললেন, 'রাশানরা প্রাচ্য না পাশ্চাত্যের লোক তার স্থির বিচার এখনো হয়নি। সামান্য একটা উদাহরণ নিন না। খাঁটি পশ্চিমের লোক শার্ট পাতলুনের নিচে গুঁজে দেয়, খাঁটি প্রাচ্যের লোক তা সে আফগানই হোক আর ভারতীয়ই হোক কুর্তাটা ঝুলিয়ে দেয় পাজামার উপরে। রাশানরা এ দুদলের

মাঝখানে—শার্ট পরলে সেটা পাতলুনের নিচে গোঁজে, রাশান কুর্তা পরলে সেটা পাতলুনের উপরে ঝুলিয়ে দেয়—সে কুর্তাও আবার প্রাচ্য কায়দায় তৈরী, তাতে অনেক রঙ অনেক নক্সা।'

দেমিদভের মত অত শান্ত ধীর কথা বলতে আমি কম লোককেই শুনেছি। ইংরেজী খুব যে বেশী জানতেন তা নয় তবু যেটুকু জানতেন তার ব্যবহার করতেন বেশ ভেবে চিন্তে সযত্নে, শব্দ বাছাই করে করে।

রাশান সাহিত্যে আমার সখ দেখে তিনি টলস্টয় গর্কি ও চেখচ ইয়াসনা পলিয়ানাতে যেসব আলাপ আলোচনা করেছিলেন তার অনেক কিছু বর্ণনা করে বললেন, 'জারের আমলে তার সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি—কারণ টলস্টয় আপন মতামত প্রকাশ করার সময় জারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেতেন। জারের পতনের পর নতুন সরকার এতদিন নানা জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল—এখন আস্তে আস্তে কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে নানা রহস্যের সমাধান হচ্ছে।'

আমি বললুম সে কি কথা, আমি তো শুনেছি আপনারা আপনাদের প্রাক-বলেশিভক সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত নন।

মাদামের মুখ লাল হয়ে উঠল, একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় ইংরেজের প্রোপাগাণ্ডা।'

আমি আমার ভুল খবরের জন্য হন্তদন্ত হয়ে মাপ চেয়ে বললুম, 'আমরা রাশান জানিনে, আমরা চেখফ পড়ি ইংরিজিতে, লাল রুশের নিন্দাও পড়ি ইংরিজিতে।'

দেমিদভ চুপ করে ছিলেন। ভাব দেখে বুঝলুম তিনি ইংরেজ কি করে না করে, কি বলে না বলে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আপন বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে যে অসত্য আপনার থেকে বিলোপ পাবে সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তার মূলে বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমরা এসেছিলুম চারটের সময় তখন বাজে প্রায় সাতটা। এর মাঝে যে কত পাপিরোস পুড়ল, কত চা চলল গল্পের তোড়ে আমি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিনি। এক কাপ শেষ হতেই মাদাম সেটা তুলে নিয়ে এ'টো চা একটা বড় পাত্রে ঢেলে ফেলেন, লিকার ঢেলে গরম জল মিশিয়ে চিনি দিয়ে আমার অজানাতেই আরেক কাপ সামনে রেখে দেন। জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন না কতটা লিকারের প্রয়োজন, দু একবার দেখেই আমার পরিমাণটা ততক্ষণ শিখে নিয়েছেন। আমি কখনো ধন্যবাদ দিয়েছি কখনো টলস্টয় গর্কির তর্কের ভেতরে ডুবে যাওয়ায় লক্ষ্য করিনি বলে পরে অনুতাপ প্রকাশ করেছি।

কথার ফাঁকে মাদাম বললেন, 'আপনারা এখানেই খেয়ে যান।' আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'আরেক দিন হবে', বেনওয়া সাহেব [illegible]

বললেন, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আজ উঠি, বহু বেশীক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি।'

আমি একটু বোকা বনে গেলুম। পরে বুঝতে পারলুম বেনওয়া সায়েব খাওয়ার নেমন্তন্নটা অন্য অর্থে ধরে নিয়ে লজ্জা পেয়েছেন। মাদামও দেখি আস্তে আস্তে বেনওয়ার মনের গতি ধরতে পেরেছেন। তখন লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে বললেন, 'না মসিয়ে আমি সে অর্থে বলিনি; আমি সত্যই আপনাদের গালগল্পে ভারী খুশী হয়ে ভাবলুম দুমুঠো খাবার জন্য কেন আপনাদের অড্ডাটা ভঙ্গ হয়।'

দেমিদভ চুপ করে ছিলেন। ভালো করে কুয়াশাটা কাটাবার জন্য বললেন, 'পশ্চিম ইয়োরোপীয় এটিকেটে এ রকম খেতে বলার অর্থ হয়ত 'তোমরা এবারে ওঠো, আমরা খেতে বসব।' আমার স্ত্রী সে ইঙ্গিত করেন নি। জানেন তো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমরা এখনো আমাদের কুর্তা পাতলুনের উপরে পরে থাকি—অর্থাৎ আমরা প্রাচ্যদেশীয়।'

সক্কলেই আরাম বোধ করলুম। কিন্তু সে যাত্রা ডিনার হ'ল না। সিঁড়ি দিয়ে নাববার সময় দেমিদভ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি রাশান শেখেন না কেন?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি শেখাবেন?'

তিনি বললেন, নিশ্চয়, with pleasure!

বেনওয়া বললেন, 'No, not with pleasure, বলে আমার দিকে চোখ ঠার দিলেন।

মাদাম বললেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বেনওয়া বলেন, 'এক ফরাসী লণ্ডনের হোটেলে ঢুকে বললে, 'Waiter, bring me a Cotlette, please!'

ওয়েটার বলল, 'With pleasure, Sir,'

ফরাসী ভয় পেয়ে বল্ল, 'No, no, not with pleasure, with potatoes, please!'

বেনওয়া বিদগ্ধ ফরাসী। একটুখানি হাল্কা রসিকতা দিয়ে শেষ পাতলা মেঘটুকু কেটে দিয়ে টুক করে বেরিয়ে এলেন।

মাদামও কিছু কম না। শেষ কথা শুনতে পেলুম,

"But I shall give you cotlettes with both, pleasure and potatoes."

রাস্তায় বেরিয়ে বেনওয়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'এ দুটি যথার্থ খাঁটি লোক।'

ক্রমশঃ

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী স্থানগুলি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার দাবী বাঙলায় দিন দিন প্রবল হইলেও তাহা যে শিষ্ট ও সংযতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাঙলা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অন্যায়ভাবে এইসকল স্থানে বঞ্চিত হইলেও কখন মনে করিতে পারে নাই যে, কংগ্রেস সে সকল সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পদদলিত করিবে। কিন্তু অন্ধ্রের ও মহারাষ্ট্রের যে দাবী স্বীকার বিলম্বিত হয় না, বাঙলার সে দাবী স্বীকৃত হয় না কেন—এ প্রশ্ন বাঙালীর মনে স্বভাবতঃই উঠে। বিশেষ দেখা যাইতেছে, বাঙলার দাবী পূর্ণ করিতে যে বিলম্ব হইবে, তাহারই মধ্যে বিহারের বঙ্গভাষাভাষীদিগকে হিন্দীভাষাভাষী করিবার অভিপ্রায় কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গোপন করেন নাই।

দেখা যাইতেছে, একদিকে যেমন বাঙলা তাহার অধিকার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, অপর দিকে বিহার তেমনই বাঙলার সেই অধিকার তাহার স্বার্থের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। অর্থাৎ এই স্থলে স্বার্থের সংঘাত লক্ষিত হইতেছে। আর বাঙলা কংগ্রেসী কেন্দ্রী সরকারের নিকট কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপরতার অভাবও দেখিতেছে। এই প্রসঙ্গে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' বলিয়াছেন, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু বাঙলার বিস্তার সাধন—বৃহত্তর বাঙলা গঠনের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন; আর গত বৎসর মিস্টার সুরাবর্দী কেবল বৃহত্তর বঙ্গের কথাই বলেন নাই—স্বাধীন বাঙলার স্বপ্নও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু মিস্টার সুরাবর্দী বাঙলার জন্য বৃহত্তর বঙ্গ চাহেন নাই—মুসলীম লীগের জন্য চাহিয়াছিলেন। সেইজন্যই যখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, তিনি বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল ও আসামের যে অংশের লোক বাঙলা ব্যবহার করে সেই অংশ বাঙলার সহিত যুক্ত করিলে বাঙলায় আর মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবেন না, তখন তিনি আর সে দাবী উত্থাপিত করেন নাই। তিনি যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাঙলার কথা বলিয়াছিলেন, সেও মুসলীম লীগের জন্য। তিনি বলিয়াছিলেন, বৃটিশ সরকার যদি মুসলীম লীগকে অবজ্ঞা করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে দেশ শাসনের ভার দেন, তবে বাঙলা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইবে এবং কংগ্রেসী কেন্দ্রী সরকারকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিবে। সে কথা বাঙলার লোক বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার পরে কলিকাতায় "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" ও পূর্ববঙ্গে "মারকে লেঙ্গে পাকিস্থানের" দৃশ্য দেখা গিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী বাঙলার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া তাহা যেমন কেন্দ্রী সরকারকে জানাইয়াছেন, তেমনই বিষয়টির আলোচনার জন্য বিহারের প্রধান-মন্ত্রীকেও পত্র লিখিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর অতি সংগত প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যাত বা অবজ্ঞাত হয়, তবে যে তাহা বাঙলা অপমানজনক বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহা বলা বাহুল্য এবং ফলে যদি বাঙলায়ও বিহারের মত প্রাদেশিকতার হলাহল উদ্গত হয়, তবে সে জন্য কেন্দ্রী সরকারকে ও বিহার সরকারকেই দায়ী হইতে হইবে।

বাঙলা যেমন বিহারীদিগকে বাঙালীর তুল্য শিক্ষা সম্পর্কিত, ব্যবসাগত, রাজনীতিক অধিকার দিয়া আসিতেছে বিহার যদি সেই আদর্শের অনুসরণ করিত—যদি সংকীর্ণ স্বার্থপরতার জন্য প্রকৃত উদার জাতীয়তার মর্যাদাহানি না করিত, তবে আজ এই সমস্যা তুচ্ছ বলিয়াই বিবেচনা করা সম্ভব হইত। আজ আর তাহা উপেক্ষা করা বাঙলার পক্ষে সম্ভব নহে। যে স্থলে বাঙালীকে তাহার মাতৃভাষা ত্যাগ করাইবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে বাঙালী কখন তাহা সহ্য করিতে পারে না।

যে সময় বাঙলার দাবী উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সেই সময়ে যে বিহারে কেবল মানভূম সদর ব্যতীত অন্য সর্বত্র হিন্দীই আদালতে ব্যবহার্য ভাষা ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতেও মানভূম সদর ব্যতীত অন্য সকল বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বাঙলাকে স্বস্থানচ্যুত করিবার জন্য বিহার সরকারের চেষ্টা দেখা যায়। অর্থাৎ বিহার সরকার মীমাংসার জন্যও—ব্যবস্থা পূর্ববৎ রাখিতে অসম্মত। ইহার পরে বাঙালী কখনই তাহার দাবীর সমর্থনে আন্দোলনে বিরত থাকিয়া সে দাবী দুর্বল করিতে পারে না।

বিহারের 'সার্চ লাইট' পত্র কলিকাতায় বিহারী লাঞ্ছনার যে সকল সংবাদ প্রকাশ করিয়া বিহারীদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন, সে সকল সত্য নহে। সে সকল সত্য নহে বলিয়াই তাহাদিগের উদ্দেশ্য কিরূপ নিন্দনীয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে পত্র এইরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহার অধিকারী বাঙালী বা বিহারী নহেন—কাজেই কোন প্রদেশের স্বার্থ সম্বন্ধে আন্তরিক আগ্রহ সে ব্যবহারের কারণ না হইয়া প্রাদেশিকতা বিস্তার তাহার একমাত্র কারণও হইতে পারে। লর্ড নর্থক্লিফ যেমন সংবাদপত্রে যুক্তির স্থানে কেবল উত্তেজনা দিয়া কার্যসিদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন—এক্ষেত্রেও তাহাই হইতে পারে। অথচ এই পত্রের অধিকারীরা কেন্দ্রী সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

অল্পদিন পূর্বে ভারত ও পাকিস্থান দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বৈঠকে যে সকল বিষয় স্থির হইয়াছে সে সকল যে পাকিস্থান কর্তৃক যথাযথভাবে পালিত হইবে, সে বিষয়ে আমাদিগের প্রথমাবধিই সন্দেহ ছিল। এখন সে সন্দেহ ঘণীভূত হইবার কারণ দেখা যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্থানের সরকার সে সকল নির্ধারণ পালনে বিরত থাকিয়া আবার বলিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারই চুক্তি ভঙ্গ করিতেছেন। আর অসত্য সংবাদ পরিবেশন করিয়া মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিবার কার্যে মুসলিম লীগের মুখপত্র করাচীর 'ডন' পাটনার 'সার্চ লাইটকে'ও পরাভূত করিয়াছে। 'ডনের' কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অনাচার করিতেছেন। তিনি বলেন, সীমান্তে খানাতল্লাসের ব্যবস্থা (মুসলমানদিগের পক্ষে) অপমানজনক—মুসলমান যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার অধিকার স্বীকৃত সে সকলও লুণ্ঠিত হইতেছে—এমন কি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সাহায্যদানেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলমানদিগের প্রতি অবিচার করিতেছেন। যে পাকিস্থান সরকার সীমান্তে যাত্রীদিগের খানাতল্লাসে হিন্দু মহিলাদিগের অঙ্গেও মুসলমানদিগের হস্তক্ষেপে দ্বিধা করেন নাই, সেই পাকিস্থানের লোকরা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে সেরূপ কোন অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে পারেন? ব্যবসায়ের বাজারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দেন নাই, তাহা যে কেহ একবার কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

একই দিনে (১লা আষাঢ়) 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত ২খানি পত্র উল্লেখযোগ্য। একখানিতে এক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, তিনি বরিশাল হইতে যে সকল জিনিস সঙ্গে আনিবার ছাড় লইয়া আসিয়াছিলেন, সে সকল সম্বন্ধে খুলনা রেল ষ্টেশনে তাঁহাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে তিনি জিনিস লইয়া কলিকাতায় আগমনের আশা ত্যাগ করিয়া বরিশালে ফিরিয়া গিয়াছেন। পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রী হিন্দুদিগকে এইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয় পত্রে এক ভদ্রলোক জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্থানী মুসলমানগণ অযথা অধিকার অবাধে সম্ভোগ করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"বারাসত দক্ষিণ কাজিরপাড়া (২৪ পরগণা) নিবাসী জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক বি এন্ড এ রেলওয়ের কয়লাঘাটা অফিসে ড্রাফট্‌সম্যানের কার্য করিতেন। বঙ্গ-বিভাগের পর এই ব্যক্তি পাকিস্থানে কার্য করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন ও এখন ইনি চট্টগ্রামে কার্য করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার বন্দুকটি এখনও বারাসত থানায় জমা দেন নাই। তাহা তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাহার হেপাজতে থাকে তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তিনি বারাসত মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার এবং এখনও সময় সময় মিউনিসিপ্যালিটির অধিবেশনে যোগদান করেন। এখন নিবেদন,

যিনি পাকিস্থানে পূর্ণ বিশ্বাসী এবং পাকিস্থানের (সরকারের) কর্মচারী তিনি ভারত ডোমিনিয়নে কিরূপে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কমিশনার রূপে কাজ চালাইয়া যাইতে পারেন? উপরন্তু তাঁহার বন্দুক রাখিবার অধিকার কিরূপে থাকিতে পারে?"

বারাসতের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দু—না মুসলমান?

'ডন' বলিয়াছেন, মীমাংসার সর্ত পাকিস্থান পালন করিতেছেন, কিন্তু ভারত রাষ্ট্র তাহা করিতেছেন না। এই উক্তি কিরূপ অসত্য তাহার প্রমাণ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভারতের স্বাধীনতা আদেশে নির্ধারিত হয়—কেন্দ্রী সরকারের দেশ বিভাগপূর্ব সব দেনা যেমন প্রথমে ভারত সরকার দিবেন, তেমনই পাকিস্থান প্রথমে প্রাদেশিক দেনা দিবেন। সেই নির্ধারণ অনুসারে কলিকাতায় যে ৬ কোটিরও অধিক টাকা সরকারী দেনার হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরীক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্থান সরকারকে প্রতিনিধি পাঠাইতে বলিলেও তাঁহারা প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই এবং যে সকল দেনা স্বীকৃত হইয়াছে, পূর্ব পাকিস্থান সরকার সে সকলও পরিশোধ করেন নাই।

কোন পক্ষ অপরাধী, তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

যে সকল ব্যবসায়ী সরকারের কাজ করিয়া বা সরকারকে মাল সরবরাহ করিয়া আজও টাকা পাইতেছেন না, তাঁহারা অধিকাংশই ভারত রাষ্ট্রের লোক। পাকিস্থান সরকারের ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থায় অমনোযোগ হেতু তাঁহাদিগের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

'ডন' পত্রের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্বন্ধে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ প্রচারিত হইতেছে। যে পাকিস্থান সরকার ছল করিয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশিত কোন কোন সুপরিচিত সংবাদপত্রের পাকিস্থানে প্রচার নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাকিস্থান সরকারের মুখপত্র যে অবাধে মিথ্যা প্রচারের দ্বারা মুসলমানদিগকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের অভাব নাই—সেই সকল মুসলমানের মধ্যে অনেকে পাকিস্থানপন্থী এবং তাঁহারা যদি ভারত রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তাহার আন্তরিকতায় যে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না, এমনও নহে। আবার পশ্চিমবঙ্গ ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম সীমান্ত প্রদেশ—সুতরাং তাহার বিপদের সম্ভাবনাও উপেক্ষা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ও কেন্দ্রী সরকারকে তাহাও মনে রাখিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্থান হইতে যে হিন্দুদিগের ধনপ্রাণ মান রক্ষার্থ চলিয়া আসিবার কারণ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব পাকিস্থানের সরকার মুখে যাহাই কেন বলুন না, তাঁহারা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, তাঁহারা পূর্ব পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগের অবশ্যপ্রাপ্য অধিকার রক্ষা করিতেছেন না বা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা যে পাকিস্থান রাষ্ট্রে হিন্দুদিগের সম্মান সহকারে বাস করিবার ইচ্ছা মনে পোষণ করেন, তাহারও প্রমাণ নাই।

আসামে "বঙ্গাল খেদা"র নূতন বিকাশ দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু গোহাটীর ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীরোহিণীকুমার চৌধুরী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা যেমন ভ্রমাত্মক তেমনই নিন্দনীয়। আসামে বাঙ্গালীদিগকে বিতাড়নের যে হীন চেষ্টা হইতেছে, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়া তাহার অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা করাই শিক্ষিত আসামীদিগের কর্তব্য এবং তাহাই শোভন। তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে আসামে আসামীরা যে অরক্ষিত বাঙ্গালী রেল কর্মচারীদিগের উপর আরও অত্যাচার করিতে সাহসী হইতে পারে, তাহাও চৌধুরী মহাশয় বিবেচনা করেন নাই! যে সকল বাঙ্গালী বেঙ্গল-আসাম রেলপথ বিভাগের ফলে পাণ্ডুতে ও গোহাটীতে গিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া তাহা করেন নাই। তথাপি 'আসাম টাইমস' সেজন্য উগ্র হইয়াছেন এবং আসামের ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীনীলমণি ফুকন অসংযতভাবে বক্তৃতা করিয়া আসামীদিগের সম্বন্ধে নানা কল্পিত অনাচারের উল্লেখ করায় অসমীয়ারা উত্তেজিত হইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় অনায়াসে বলিয়াছেন—গোহাটীর হাঙ্গামায় "মাত্র ২ বা ৩ জন লোক লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা রেলের কর্মচারী নহেন।" কিন্তু দেখা গিয়াছে—

(১) দামোহানীর ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এস কে মুখোপাধ্যায় ১৬ই মে এমন প্রহৃত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে হয়।

(২) দাশগুপ্ত গোহাটীর ডিষ্ট্রিক্ট কণ্ট্রোলার অব ষ্টোরসের কার্যালয়ে কেরাণী ছিলেন। প্রহারফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(৩) আসাম রেলের বাঙ্গালী ট্রেসারারের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। আবার তিনিই পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হন!

(৪) একজন বাঙ্গালী ইন্সপেক্টারের বক্ষে আঘাত লাগে।

ইহার পরেও কি চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বিবৃতির জন্য লজ্জানুভব করিবেন না? তিনি যদি মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের জন কয়েক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মিথ্যা বুঝাইতে পারিলেই তাঁহার কার্য সিদ্ধি হইবে, তবে তিনি ভুল করিবেন।

যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে তখন কলিকাতা কর্পোরেশন গৃহে পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের প্রতিনিধি সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কর্পোরেশনের তদন্ত কমিশনের সভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস তাহার সভাপতি এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির আয়ে তাহার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না এবং সম্প্রতি তথায় নিযুক্ত সকল শ্রেণীর কর্মীর বেতন যে হারে বর্ধিত করিবার নির্ধারণ সরকারের দ্বারা নিযুক্ত নির্ধারক দিয়াছেন, তাহাতে মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক ব্যয় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাইবে। সে টাকা মিউনিসিপ্যালিটি কোথা হইতে—কিরূপে সংগ্রহ করিবেন? কলিকাতা কর্পোরেশনের মত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিও সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সে সকলের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়—অবস্থার জন্য ব্যবস্থাও শোচনীয়। কি উপায়ে সে সকল মিউনিসিপ্যালিটির আবশ্যক অর্থাগম হইতে পারে, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়াছে। বাঙলার একাংশ পাকিস্থানভুক্ত হওয়ায় যে ইতোমধ্যেই অন্ততঃ ১৫ লক্ষ বাঙ্গালী পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, তাহা মনে রাখিতে হইবে। কলিকাতার লোক সংখ্যা ৬০ লক্ষ ছাড়াইয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে—বিশেষ কলিকাতার নিকটে নূতন নূতন নগর গঠন অনিবার্য হইয়াছে। কোন কোন স্থানে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় নূতন নূতন উপনিবেশ গঠিত হওয়ায় মিউনিসিপ্যালিটির কাজ ও দায়িত্ব বাড়িতেছে। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, পূর্বস্থলী, বহরমপুর প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটির পরিবর্তন অনিবার্য হইয়াছে। পানীয় জল সরবরাহের, পথের সংস্কারের ও বিস্তারের, আবর্জনা স্থানান্তরিত করার, জল নিকাশের, আলোকের ব্যবস্থার জন্য প্রথমেই বহু অর্থের প্রয়োজন। তাহার পরে যে সকল ব্যবস্থার জন্য স্থায়ী ব্যয় আছে। প্রথমেই সুচিন্তিত পরিকল্পনা করিয়া অবিলম্বে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এবিষয়ে সরকারকে বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শ লইয়া সহযোগ ও সাহায্য দিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, দলাদলিতে অনেক মিউনিসিপ্যালিটির কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। কলিকাতা কর্পোরেশনে রাজনীতিক ক্ষমতা লাভ পৌর দায়িত্ব বিকৃত করিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের মিউনিসিপ্যাল আইন আমলে আসার পরে চিত্তরঞ্জন দাস যখন কংগ্রেসের কার্যের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন অধিকার করেন, তখন হইতে একজনের পক্ষে ৩টি পদ অধিকার করা—

পল ক্লাউন" পরিধান করা—নিয়ম হয়—
ীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব,
ীয় ব্যবস্থাপক সভার সরকার-বিরোধী
র নেতৃত্ব ও কলিকাতা কর্পোরেশনের
র পদ। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর এই নেতৃত্ব
য়া দলাদলি হয় এবং দল রাখিবার জন্য
ীতি বাড়িতে থাকে—ভোটের ব্যাপার
য়া হত্যা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে—চাকরীর
রে যোগ্যতার স্থান দল পাকাইবার ক্ষমতা
ণ করিয়াছে। ফলে কি হইয়াছে, তাহা
রও অবিদিত নাই—অযোগ্যতা, দুর্নীতি
িতর জন্য সরকারকে কলিকাতা কর্পোরে-
র স্বায়ত্তশাসনসম্মত অধিকার
বীকার করিয়া এক দিকে এডমিনিস্ট্রেটর
। এক দিকে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করিতে
তেছে।

মিউনিসিপ্যালিটির সংস্কার করিতেই
বে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইনে মিউনি-
ালিটি প্রভৃতির কার্যে সরকারের হস্তক্ষেপ
ভিপ্রেত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। এখন
এ দেশের সরকার বিদেশীদিগের দ্বারা
চালিত নহে। এই পরিবর্তিত অবস্থায়—
শ্য সরকারকে যখন প্রভূত পরিমাণ অর্থ
[illegible] দিয়া মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে
র্যোপযোগী করিতে হইবে তখন—আইনে
কারের হস্তক্ষেপের কথা থাকা অসংগত
বে না। তবে সে ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বিরত
াই যে সরকারের অভিপ্রেত হইবে, তাহা
া বাহুল্য।

সর্ববিধ গঠনকার্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন।
ন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থের প্রাচুর্য
[illegible] বিশেষ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যয়সংকোচ
বন্ধে কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করিতেছেন,
কথা বলা যায় না। তাঁহারা যে চাকরীর
খ্যা বৃদ্ধিও করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার
য়। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র প্রদেশ—ইহার ব্যয় হ্রাস
র প্রয়োজন। আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচ
ভয় বা ইহার কোনটি ব্যতীত গঠনকার্যের
ন্য আবশ্যক অর্থ পাওয়া যাইবে না।
র্তমান অবস্থায় আয় বৃদ্ধির উপায় নাই
লেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু ব্যয় সংকোচের
নেক উপায় আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি
সকল উপেক্ষা করেন, তবে তাঁহাদিগের
র্যে প্রদেশের লোক উপকৃত হইবে না—
পকৃত হইতে পারে। মন্ত্রিত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা
করিয়া মন্ত্রীরা আপনাদিগের কার্যের দ্বারা
কের শ্রদ্ধা ও আদর অর্জন করিয়া
ন্ত্রিত্বের ভিত্তি দৃঢ় করিবেন, ইহাই লোক
শা করে। বিধান বাবুর মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত
ইবার পরে যে তাহার পতন ঘটাইবার
ষ্টা হইয়াছে, তাহা আমরা দুঃখের বিষয়
লিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু আমরা বিধান
বুকে বলিব, সরকারের নানা বিভাগে
বল কর্তব্য-শৈথিল্যের অভিযোগই গুঞ্জরিত
হইতেছে না, পরন্তু দুর্নীতির অভিযোগও
শুনা যাইতেছে। সে সকল অভিযোগের সহিত
যাঁহাদিগের নাম বিজড়িত হইতেছে, তাঁহা-
দিগের নিকট পশ্চিমবঙ্গের লোক অনুরূপ
ব্যবহার আশা করে।

পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী যে কেন্দ্রী
সরকারের জাতীয় সংগীত সম্বন্ধীয় নির্দেশে
আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি
জনমতও প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা মনে করি,
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে "বন্দে মাতরম্"
সমরাহ্বান বলিয়া এত দিন বিবেচিত হইয়াছে,
আজ তাহাকে জাতীয় সংগীতের সম্মানভ্রষ্ট
করা অনেকে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচনা করিবেন।
এক সময় এ দেশের ইংরেজ শাসকরা তাহা
রাজদ্রোহদ্যোতক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন, আর এক সময় মুসলীম লীগের
পক্ষ হইতে ইহাতে আপত্তি করা হইয়াছিল।
প্রথম আপত্তির আজ আর কোন কারণ নাই;
ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্থান স্বতন্ত্র হইবার
পরে দ্বিতীয় আপত্তিও থাকিতে পারে না—
কোন দিন তাহার কারণ ছিলও না। যে
স্বাধীনতা-সংগ্রাম দেশকে জাতীয়তার সঞ্জীবনী
ধারায় পুনর্জীবিত করিয়াছিল, তাহার আরম্ভে
যাঁহারা ছিলেন না—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
তাঁহাদিগের অন্যতম; তাই তিনি বালগঙ্গাধর
তিলক প্রমুখ ব্যক্তিদিগের মত সম্যক উপলব্ধি
করিতে পারিতেছেন না—"বন্দে মাতরম"
আমাদিগের জীবনের শান্তি হইয়াছে—মৃত্যুর
শান্তি হইবে। তখন মুসলমান তোষণের
বৃথা চেষ্টা হয় নাই—দেশাত্মবোধ শ্যামিকাশূন্য
ছিল। জাতীয় সংগীত কাহারও আদেশে বা
নির্দেশে রচিত হয় না—তাহা, মন্ত্র, জাতির
হৃদয় হইতে শুভ মুহূর্তে উচ্চারিত হয়।
অরবিন্দ বলিয়াছেন, লোক যখন মুক্তি-শেষে
সত্যের সন্ধান করিতেছিল, তখন—মাহেন্দ্রক্ষণে
কেহ "বন্দে মাতরম" গান গাহিয়াছিল—

"The mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism."

আমরা জানিয়া প্রীত হইয়াছি, পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের মত মধ্যপ্রদেশের সরকারও "বন্দে
মাতরম" বর্জনে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন।
অন্যান্য প্রদেশের মত এখনও জানা যায় নাই।
অন্ততঃ সকল প্রদেশের সম্মতি না লইয়া যে
অতর্কিতভাবে "বন্দে মাতরম" বর্জনের আদেশ
প্রচারিত হইয়াছে, তাহা স্বৈরাচার ব্যতীত
আর কিছুই বলিবার উপায় নাই। ভারত
সরকারের অন্যান্য মন্ত্রী— বিশেষ বাঙ্গালী মন্ত্রী
২ জন যে প্রধান মন্ত্রীর এই নির্দেশে আপত্তি
করেন নাই, তাহা কেবল বাঙলার লোকই নহে—
ভারতের সকল প্রদেশের জাতীয়তাবাদীরা
বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

অল্প দিনের ব্যবধানে বারাণসীধামে ২
জন উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী পরিণত বয়সে দেহ
রক্ষা করিয়াছেন। "ডন সোসাইটীর" প্রতিষ্ঠাতা
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও "জে ই সি বি"
ছদ্ম নামে বহু প্রবন্ধের লেখক জ্যোতিষচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই শিক্ষাব্রতী ছিলেন।
সতীশবাবু দেশের তরুণদিগকে দেশাত্মবোধে
উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বরাজের জন্য সংগ্রামের
সেনাপতি প্রস্তুত করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ
করিয়াছিলেন। জ্যোতিষবাবু তরুণদিগের
মনীষার বিকাশোপায় চিন্তা করিয়াছিলেন।
ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে জ্যোতিষবাবুর
অসাধারণ অধিকার ছিল এবং তিনি আজ
প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকদিগের রচনাও যে
ব্যাকরণের ও অলংকারের নিয়মভ্রষ্ট হইতে
পারে, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন
হিন্দুর দর্শন শাস্ত্রে, জ্যোতিষে ও আইনে
যে বুৎপত্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে
স্বতঃই মনে হয় এই বহুমুখী প্রতিভার
অধিকারী সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ,
ব্যাকরণশাস্ত্র—যে কোন বিষয়ে অনন্যসাধারণ
প্রসিদ্ধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন।
বাঙলায় ও বিহারে জ্যোতিষবাবু দীর্ঘকাল
অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তবে সতীশবাবু ও
জ্যোতিষবাবু উভয়েরই সম্বন্ধে আমাদিগের
অক্ষেপ—যে দাতা ইচ্ছা করিলে এক রাজকন্যা
ও অর্ধেক রাজ্য দিতে পারিতেন, সে দাতা
দেশকে মুষ্টিভিক্ষা মাত্র দিয়া গিয়াছেন— তাহা
স্বর্ণ মুষ্টি হইলেও মুষ্টি ভিক্ষা মাত্র।

দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরু প্রদত্ত প্রীতিভোজে মিঃ ডি ভ্যালেরা

দমদম বিমান ঘাঁটিতে নিখিল বঙ্গ নির্যাতিত রাজবন্দী সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ ডি ভ্যালেরাকে মানপত্র ও মাল্যদান

# ডি ভ্যালেরা

ডি ভ্যালেরা গত সপ্তাহে কলকাতা এসেছিলেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে ভারত পরিদর্শনের ইচ্ছায় তিনি যাত্রী বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। সেখানে এক বিপুল রাজোচিত সম্বর্ধনায় তাঁকে আপ্যায়িত করা হয়। এক বিরাট জনতা নানা রঙের, ত্রিবর্ণ পতাকা আন্দোলিত করে তাঁকে অভিবাদন জানায়। সমুচ্চ কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ ও জয় হিন্দ ধ্বনি দ্বারা তারা তাঁকে অভিনন্দিত করে। নানা কর্মী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তিনি পুষ্পশোভিত মালা ও স্তবকাদি উপহৃত হন; বাঙলার বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থার পুরোধা নায়কবর্গ তাঁকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করেন। নিখিল বঙ্গ নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীসঙ্ঘ তাঁকে মানপত্র প্রদান করেন।

সংক্ষেপে, বাঙালী তার স্বদেশের অগ্রণী নেতৃপুরুষকে যতখানি দরদ, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহবিহ্বলতার মধ্য দিয়ে বরণ করে এসেছে, সুদূর আয়ারল্যাণ্ড আগত বিদেশী এই জননায়ককে অভ্যর্থনার বেলাও এর কার্পণ্য ঘটে নি।

শ্বেত জাতির উপর কৃষ্ণ জাতির স্বাভাবিক একটা ঘৃণার ভাব রয়েছে; দীর্ঘকাল ধরে তারা শাসনে ও শোষণে, বন্ধনে ও পীড়নে দুনিয়ার কালো জাতিদের চর্বন ও ভক্ষণ করে এসেছে। তার জন্য শ্বেতাঙ্গ মাত্রই কালোর চোখে ভীতি ও অসম্ভ্রমের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানে ও বিত্তভারে বিশ্বে তাদের চাকচিক্য চোখ ধাঁধায়, এবং তারা এদের কাউকেই আপনজন বলে ভাবতেই পারে না।

সেই শ্বেত দ্বীপের একজন শ্বেতাঙ্গ হয়েও ডি ভ্যালেরা আমাদের মন থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার এমন অকৃপণ প্রাচুর্য কি করে লাভ করলেন! তার কারণ রয়েছে।

একই নিপীড়নের উৎস থেকে উৎসারিত দুইটি ধারা তাঁর দেশে ও আমাদের দেশে যুগপৎ বিসর্পিত ছিল। তিনি যেমন আজীবনের সাধনা, বিপ্লব ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সেই দাসত্বন্ধন ছিন্ন করে জাতিকে স্বাধীন করেছেন, আমরাও তেমনি যুগ যুগ ব্যাপী ত্যাগ ও দুঃখ বরণের মধ্য দিয়ে, সেই একই দাসত্বন্ধন ছিন্ন করে দেবদুর্লভ স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয়েছি। সেই জন্যে তাঁর সঙ্গে আমাদের আত্মার এক নিগূঢ় যোগসূত্র দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

যে আন্দোলন ও সংগ্রামের দ্বারা তিনি আইরিশ জাতিকে স্বাধীন করেছেন, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তার প্রকৃতিগত একটা ঐক্য সহজেই চোখে পড়ে। ঐক্য আজকের নয়, সুচিরকালের। তাঁর সঙ্গে আমাদের নিগূঢ়তার যোগ-বন্ধনও সুচিরকালের। তাই এদেশের জনতা সেদিন তাঁকে সহসা রাজপথে দেখতে পেয়ে আবেগের সঙ্গে বলে উঠেছে, বন্দে মাতরম্।
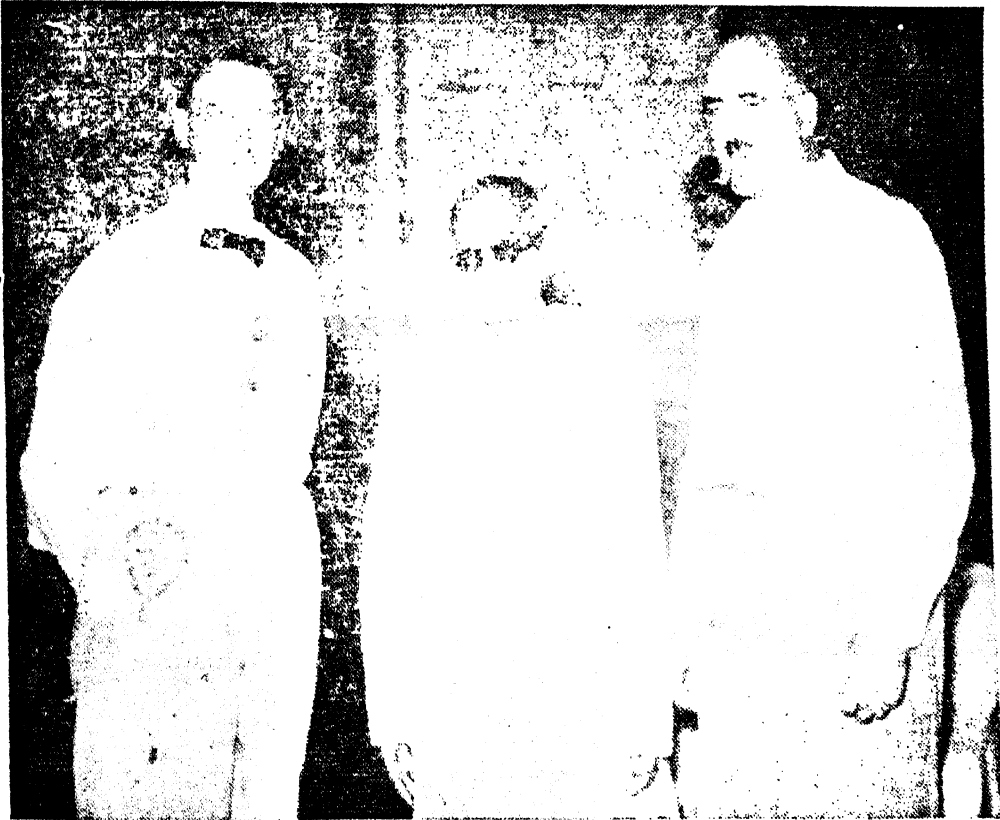
মিঃ ডি' ভ্যালেরা (বামদিকে), তাঁর সহকর্মী মিঃ এফ আকিন (ডানদিকে) এবং পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী গভর্নর শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (মধ্যস্থলে)

মিঃ ডি' ভ্যালেরা ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু

ডি' ভ্যালেরা আইরিশ বিপ্লবের নেতা। তাঁর জীবন বিচিত্র ও কর্মবহুল। প্রকৃত বিপ্লবী-জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁর সমগ্র জীবনটাই পূর্ণ। তিনি আইরিশ ফ্রি স্টেট রাষ্ট্রের স্রষ্টা।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক শহরে তাঁর জন্ম হয়। মাতা আইরিশ ও পিতা স্প্যানিশ। জন্মের অল্প পরেই পিতৃহারা হন এবং দুই বৎসর বয়সে মাতুলের তত্ত্বাবধানে বাস করার জন্য আয়ারল্যাণ্ডে আনীত হন। আয়ারল্যাণ্ডে তাঁকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে, নিকটবর্তী একটি কৃষিভবনে বাস করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। পরে একটি পাদরীপরিচালিত বিদ্যায়তনে ভর্তি হয়ে সেখানে গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে বৃত্তিলাভ করেন। পরে ডাবলিন শহরের নিকটবর্তী কোনো কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন, সংগে সংগে আরম্ভ হয় তাঁর বিপ্লবী জীবন।

**ঈস্টার বিদ্রোহ**

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ঈস্টারের সোমবার ডাবলিন শহরে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। প্যাড্রিয়াক পিয়ার্সের নেতৃত্বে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম দিক থেকে ডাবলিন প্রবেশের পথ রক্ষার ভার ডি' ভ্যালেরা গ্রহণ করেন। ডাবলিন ব্রিগেডের শ'খানেক যুবক স্বেচ্ছাসৈন্য নিয়ে তিনি ইংলণ্ড থেকে ডাবলিনে পেঁছাবার এই একমাত্র পথটি অবরোধ করলেন। সোমবার ও মঙ্গলবার অতিবাহনের পর বুধবার অপরাহ্নে ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত দুই ব্রিগেড বৃটিশ সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয়। ডি' ভ্যালেরা তাঁর সেনাদল নিয়ে বীরত্বের সংগে আক্রমণের সম্মুখীন হন। তাঁর সহকর্মীরা একে একে নিহত হলেন, গোলাগুলী ফুরিয়ে এল, ডি' ভ্যালেরা ও তাঁর অবশিষ্ট সহকর্মিবৃন্দ নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

ঈস্টার বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর সেখানে বৃটিশের যে বর্বর অত্যাচার চলতে থাকে, তার তুলনা কেবল এই ভারতবর্ষেই মেলে। বিনা বিচারে বা নামমাত্র বিচারে বিদ্রোহীদের গুলী করে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহের পরিচালক প্যাড্রিয়াক্ পিয়ার্স, কাউণ্ট প্লাংকেট, টম ক্লার্ক প্রমুখ নায়কগণকে গুলী করে মারা হয়। শ্রমিক নেতা টম কনোলে অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে তদবস্থাতেই স্ট্রেচারে করে, বধ্যভূমিতে এনে, কয়েকখানি চেয়ারের সাহায্যে তাঁর শীর্ণ দেহখানা তুলে ধরে, বারটি গুলীতে তা বিদ্ধ করা হয়। ডি' ভ্যালেরার সকল সহকর্মী এভাবে একে একে প্রাণ হারালেন। ডি' ভ্যালেরারও প্রাণদণ্ড হয়েছিল, কিন্তু যখন জানা গেল, তাঁর জন্মস্থান আমেরিকায় তখন তাঁকে প্রাণদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল।

বালী বিমানঘাঁটিতে বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মিঃ ডি' ভ্যালেরাকে মাল্যভূষিত করেন

এই বিদ্রোহ এবং তার দমনের ভঙ্গি আমাদের দেশের ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানেও ঠিক সেইরূপ মুক্তিকামনা নিয়ে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, দেখা দিয়েছিল তা ব্যাপক আকারে; এবং কর্তৃপক্ষ তা দমনও করলেন ঠিক সেই শ্রেণীর অকৃপণ নিষ্ঠুরতার সাহায্যে।

ঈস্টার বিদ্রোহের পাঁচজন নায়ককে হত্যা করে, ৭৫ জনকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করে, ৩২ জনকে জেল দিয়ে, ১৮৪১ জনকে অন্তরীণ করে এবং অতঃপর বিদ্রোহের অন্যতম হোতা স্যার রোজার কেজমেণ্টকে লণ্ডনে ফাঁসি দিয়ে বৃটিশরাজ বিদ্রোহ আপাতত দমন করলেন বটে, কিন্তু এর বহ্নিশিখা নেভাতে পারলেন না। এতে বীরেরা প্রাণ দিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হল না। প্রত্যেক বিপ্লবেই দেখা গেছে, তাতে বীরেরা প্রাণ দিয়েছে এবং তাদের উৎসৃষ্ট প্রাণেরই বিন্দু বিন্দু আহুতে হয়ে রূপায়িত হয়েছে নেতৃপুরুষের সত্তা। আমাদের আগস্ট বিপ্লবেও তা দেখেছি; "বীরের এ রক্তস্রোত, মায়ের এ অশ্রুধারা তা কি শুধু ধরার ধূলোতে হবে হারা?" সত্যদ্রষ্টা কবির এ জিজ্ঞাসার সদুত্তর অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তার মূল্যে 'স্বর্গ কেনা' আমাদের সমুজ্জ্বলমণ্ডিত হয়েছে।

আয়ারল্যাণ্ডের ঈস্টার বিদ্রোহ প্রত্যক্ষত দমিত হলেও, তার অপ্রত্যক্ষ প্রাণসত্তা প্রকাশ পেতে লাগল ডি' ভ্যালেরার মধ্যে।

বৃটিশ সৈন্যদল ক্ষিপ্তের মত, হিংস্রের মত এগিয়ে যখন এল, ডি' ভ্যালেরা তাঁর সেনাদলকে লক্ষ্য করে যে অমর বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, এখনও তা নিপীড়িত জাতিমাত্রেরই প্রাণে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে। তিনি বলেছিলেন—

"জীবনে কেবল একটিই মাত্র জন্ম, আর একটিই মাত্র মৃত্যু। দেখো, সে জন্ম যেন মানুষের জন্ম, সে মৃত্যু যেন মানুষের মৃত্যু হয়।"

আগস্ট বিপ্লবের শুরুতে মহাত্মাজী তাঁর দেশবাসীকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন —"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"। দেশকে স্বাধীন কর—প্রাণ দিয়ে অর্জন করে মৃত্যুবিজয়ীর সম্মান। মৃত্যু শুধু একটিই। দুবার মরবার সুযোগ পাবে না—সুতরাং শুভ্র অম্লান এ মৃত্যুকে যেন অগৌরবে মলিন করো না।

মিঃ ডি ভ্যালেরা বালী বিমান ঘাঁটি হইতে মোটরে আরোহণের জন্য অগ্রসর হইতেছেন

আশা আকাঙ্ক্ষার এমন অভিন্ন প্রকাশরূপে উপলব্ধি করেই সেদিন জনতা তাঁকে সহসা কলকাতার রাজপথে দেখতে পেয়ে সোল্লাসে বলে উঠেছিল, জয় হিন্দ, ডি' ভ্যালেরা কি জয়!

### সিন্ ফিন্ আন্দোলন

ডি' ভ্যালেরা ১৯১৭ সালে কারামুক্ত হন। বন্দীদের প্রতি সাধারণ কৃপা প্রদর্শন উপলক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে তাঁর এই মুক্তিলাভ। মুক্তির পর তিনি আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয়তার প্রতীকরূপে জনসাধারণের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করেন। সামরিক জীবন থেকে এখান হতে শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন।

"সিন্ ফিন্" আয়ারল্যাণ্ডের একটি রাজনৈতিক দল। কথাটির বাঙলা অর্থ 'কেবল আমরাই'। দলটি পূর্ব থেকেই ছিল। ডি' ভ্যালেরা ও তাঁর রিপাবলিকান সহকর্মিবৃন্দ এই দলে যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত এ দলের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল বৃটিশ রাজতন্ত্রের অধীনে কেবলমাত্র পৃথক্ আইরিশ পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা। ডি' ভ্যালেরা চরমপন্থী। তিনি "আবেদন নিবেদনের থালা" বহনের পক্ষপাতী কোনওকালে নন। গান্ধীজীর অসহযোগ মন্ত্রের অনুরূপ প্রেরণা নিয়ে তিনি স্থাপন করতে চললেন একেবারে স্বাধীন স্বতন্ত্র আইরিশ রাষ্ট্র। শীঘ্রই তিনি দলটির নায়ক হলেন। তিনি বৃটিশ

দিল্লীর পালাম বিমান ঘাঁটিতে মিঃ ডি ভ্যালেরার সম্বর্ধনা

বালী বিমান ঘাটিতে ডি ভ্যালেরা সকাশে সাংবাদিকগণ

কমন্স সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন, কিন্তু বৃটিশ রাজের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি কমন্স সভাতে পদার্পণই করলেন না।

১৯১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে ডি' ভ্যালেরা ও তাঁর দল বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন; ওয়েস্টমিনস্টারে আসন গ্রহণ করার বদলে তাঁরা নিজেরাই স্বতন্ত্র আইরিশ আইন সভা (Dail Eireann) গঠন করলেন এবং ডাবলিন শহরে বৈঠক বসালেন। বৃটিশের আইন সভাতে যোগ দিলে তাঁদেরকে চিরদিনই সংখ্যালঘিষ্ঠরূপে অবস্থান করতে হত। যা হোক, তাঁদের এই অপূর্ব সাফল্যে বৃটিশের টনক নড়ল। তাঁরা আয়ারল্যাণ্ডে এক তথাকথিত 'জার্মাণী সমর্থক' ষড়যন্ত্রের আভাস আবিষ্কার করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁরা গান্ধী ও জওহরলালের মধ্যে ফ্যাসিজম সমর্থনের ধ্য়া আবিষ্কার করেছিলেন। কি সুন্দর সাদৃশ্য। শত্রুকে দোষারোপ করে ঘায়েল করার এই একই নীতি তাঁরা দুইটি দেশেই প্রয়োগ করেছিলেন। স্থান এবং কালেরই মাত্র পার্থক্য; সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক তার নীতি প্রয়োগের পার্থক্য কোনও কালে হয় না।

সেদিন অকস্মাৎ এক রাত্রিতে আগা খাঁ প্রাসাদে হানা দিয়ে তাঁরা আমাদের নেতৃবর্গকে ধরে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে রেখে দিয়েছিলেন। তেমনি হঠকারিতার সঙ্গে তারা একদিন মধ্য রাত্রে আয়ারল্যাণ্ডেও হানা দিয়ে দেশভক্ত আইরিকদের দলে দলে বন্দী করে বিলাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডি' ভ্যালেরা আবার বন্দী হলেন। কিন্তু আইরিশ আইন সভার সদস্যগণ দমলেন না, তাঁরা বহুলসংখ্যায় সমবেত হয়ে ডি' ভ্যালেরাকে সভার প্রেসিডেণ্ট বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর কয়েকজন দুঃসাহসিক বন্ধু তাঁকে সুকৌশলে কারামুক্ত করে জাহাজে করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিলেন। বৃটিশের চোখে ধূলো দিয়ে তাঁর এই দুঃসাহসিক অন্তর্ধান আমাদের নেতাজীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনিও বৃটিশের সদাজাগ্রত চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন এবং সমুদ্র পেরিয়ে জার্মানী ও জাপানে উপনীত হয়েছিলেন, দেশের মুক্তি সাধনার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে।

**বিপ্লবের জয়পতাকা**

বিপ্লব চললো। বৃটীশও তাকে দমন করার জন্য দৃঢ়তম কঠোরতম বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করলেন। ডি ভ্যালেরা বসে থাকতে পারলেন না। বিপ্লবে নেতৃত্ব করার জন্য তিনি ১৯২০ সালে ছদ্মবেশে আয়র্লণ্ডে পদার্পন করলেন। সে এক চমকপ্রদ কাহিনী। ১৯২১ সালের মাঝামাঝি বৃটীশ দেখলেন বিপ্লব তাদের বজ্রমুষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে, আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। তাঁরা সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। তখন লয়েড জর্জ ছিলেন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী, আর তাঁর বিরোধী আইরিশ পক্ষের নেতা ডি ভ্যালেরা। কিন্তু সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া বৃটিশসিংহের স্বভাব নয়; তাঁরা দরকষাকষি করলেন, ফলে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। লয়েড জর্জ অতঃপর যে নীতি গ্রহণ করলেন, পরবর্তীকালে সে নীতিরই চরম বিকাশ আজ হিটলারের মধ্যে দেখেছি। তিনি বৃটিশ মন্ত্রিসভার একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করলেন এবং দুই দেশের মধ্যে চুক্তিপত্রে সম্পাদন করবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করতে ডি ভ্যালেরাকে বলে পাঠালেন। প্রতিনিধি ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে সম্মত হতে পারলেন না। লয়েড জর্জ একদিন তাঁদের জানালেন এই সন্ধ্যাতেই হয় চুক্তিপত্রে সই করতে হবে, নাহয় তো তাঁদের নির্মম যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। তারা সই করলেন। চুক্তি অর্থ আয়র্লণ্ড ডমিনিয়নরূপে পরিগণিত হবে;—ডি ভ্যালেরা তা মানতে অস্বীকার করলেন—তাঁর নিজের লোকে সই করা সত্ত্বেও কিন্তু আয়র্লণ্ডের আইনসভা ঐ চুক্তি অনুমোদন করলেন। ডি ভ্যালেরা তাঁর ভক্ত আইরিশ সেনা বাহিনী নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কণ্ঠে তাঁদের এই জয়-সংগীত ধ্বনিত হতে লাগল ঃ

Men of the gael, Sons of the Pale,
The long watched day is breaking
The serried ranks of Inisfail
Shall set the tryant quaking.
Our camp-fires now are burning low
See, in the East, a silvery glow,
Out yonder waits the Saxon foe
So chant a solider's song

Soliders are we
Whose lives are pledged to Ireland.
Some have come
From a land beyond the wave,
Sworn to be free,
No more, our ancient sireland
Shall shelter the despot or the Slave
To night we men the bearna baoghal
In Erin's cause come woe or weal.
Mid cannon's roar, or rifles' peal.
We will chant a soldier's song

আয়র্লণ্ড স্বাধীন হওয়ার পর এই সংগীতকেই তাদের জাতীয় সংগীত করা হয়। এই সংগীতটির সঙ্গে বন্দে মাতরম গানের তুলনা করা চলে, যদিও এই গানটিতে কামান গর্জন ও রণদামামার ধ্বনি এবং বন্দে মাতরম গানে বন্দনার সুর অনুরণিত। এই গান কণ্ঠে নিয়ে তারা বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করেছে, মৃত্যুবরণ করেছে, জয়ী হয়েছে। বন্দে মাতরম সংগীত কণ্ঠে নিয়ে আমাদের বীরগণ কারা ফাঁসি, গুলী সব কিছু বরণ করেছেন। সংগীতের সঙ্গে তাদের সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ যোগ তাকে তাঁরা জাতীয় সংগীত করে নিয়েছেন। আমাদেরও সুদীর্ঘ সংগ্রামের সঙ্গে সংগীতের নিবিড় সংযোগ, তাকেই জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা হওয়া ঠিক নয়।

যা হোক, পাঁচ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের পর অবশেষে ডি ভ্যালেরা স্বাধীন নিখিল আয়র্লণ্ড রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা করলেন।

ডি ভ্যালেরা ১৯৩২ সালে কংগ্রেসের ... প্রধান মন্ত্রী হন এবং পদ গ্রহণের সংগে ... বৃটীশরাজের প্রতি আনুগত্যের শপথ ... প্রথাটি তুলে দেন এবং বৃটিশ ... স-দপ্তর ডাবলিনের লাটপ্রাসাদ ... একেবারে উপড়ে ফেলেন। আয়ারল্যাণ্ড ... বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্যরূপে ... কিন্তু বৃটিশরাজের সংগে কোনো বাধ্য-... ধার তাকে ধরতে হয় না। কিন্তু ... ভ্যালেরা তাতেই সন্তুষ্ট নন, তিনি আয়ার-... ণ্ডকে বৃটিশের সংস্পর্শ থেকে একেবারে ...ভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চান। ...দেশের উত্তর প্রান্ত, যা বৃটিশের পুরোনো ...তে বিচ্ছিন্ন আছে, তাকেও তিনি আয়ার-... ণ্ডের সংগে যুক্ত করে স্বদেশের অখণ্ডতা ... ঐক্য সম্পাদন করতে চান।

ডি ভ্যালেরা প্রতিপক্ষ দলের সংগে রফা ...কে, নিজের মত ব্যাহত করে পরের মতে ... দেওয়াকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। তেমনি ...ন্দ্বী দলের সহিত রাষ্ট্র ক্ষমতা বণ্টন করে ...চালিত করাকেও ঘৃণা করেন। আয়ারল্যাণ্ডের ... নির্বাচনের সময়ে তাঁর দৃঢ়চিত্ততার সম্যক ... পাওয়া গিয়েছে। এর পূর্বের সকল ... তিনি জয়ী হয়েছেন। কিন্তু আলোচ্য ... ৭৫—৭০ ভোটে প্রধান মন্ত্রী পদ ... যে আয়র্লণ্ডকে তিনি নিজের ... ও দুঃখবরণের ভেতর দিয়ে গড়ে ... তার ভাগ্যনির্ধারণের কাজে তিনি ... সংগে কোয়ালিশন করা আর নিজের ... নীতি ও নিষ্ঠাকে পদদলিত করা ... মনে করেন, তাই স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের ... তাঁকে রাষ্ট্র পরিচালনার বাইরেই ...।

... কলকাতায় সাংবাদিকগণ প্রশ্ন ... তাঁর পরবর্তী কর্মপন্থা কি? ... তিনি জানান, "আমরা নির্বাচনের পূর্বে ...মণ্ডলীর সম্মুখে যে কর্মসূচী ... বিরোধী দলে থেকে আমরা ... কাজ করে যাব এবং যুদ্ধের পূর্বে ... দেশের পুনর্গঠনের কাজের যে ... আমাদের ছিল, তাও করে যাব।"

...র যে সকল নেতৃবৃন্দ ডি ভ্যালেরার ... সাক্ষাৎ করেছিলেন, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ... মধ্যে একজন। তিনি ডি ভ্যালেরাকে ... সুভাষচন্দ্রের একখানি আত্মজীবনী ... দেন। ডি ভ্যালেরা নেতাজীর পুরোনো ... ভারতবর্ষে এসে নেতাজীকে দেখবেন ... তাঁর আশা ছিল একথা তিনি ব্যক্ত ...। শরৎবাবু তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, ... ভারতীরা, বিশেষতঃ বাঙালীরা চিরদিন ...ল্যাণ্ডের কল্যাণ কামনা করেছি," একথার ... ডি ভ্যালেরা বলেছিলেন,

"আইরিশম্যান আমরা চিরদিন ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনা করে এসেছি।"

সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, "আয়ারল্যাণ্ডবাসী আমরা চিরদিন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টার প্রতি গভীর উৎসাহশীল ছিলাম এবং আজ যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তজ্জন্য অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি।"

কলকাতায় মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের পর ডি ভ্যালেরা দিল্লী চলে যান। সেখানে পণ্ডিত নেহরু তাঁকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। দিল্লী পরিদর্শনের পর বোম্বাই হয়ে তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন।

বোম্বাইএ সাংবাদিকদের নিকট তিনি দুইটি অতিশয় মূল্যবান কথা বলেন, তার একটি ভারত সম্বন্ধে ও অন্যটি বিশ্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তাঁর মতে দেশ বিভাগ হওয়ার মূলে রয়েছে জনসাধারণের অশিক্ষা। ভারতের জনসাধারণ সম্যকরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে, কতিপয় নেতা ধর্মের দোহাই তুলে তাদের গলা কাটাকাটিতে ও দেশবিচ্ছিন্ন করার কাজে প্ররোচিত করতে পারতেন না। এর ফলে দেশের প্রাত্যহিক সমস্যাবলীর উপর আরো নানা মারাত্মক সমস্যার চাপ পড়েছে; লোকের দুঃখকষ্ট বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে এবং প্রীতি ও সদিচ্ছার স্থলে নিরবচ্ছিন্ন বিরোধের উৎস উৎসারিত হয়েছে। এরূপ যাতে হবার সম্ভাবনা না ঘটে এজন্য ডি ভ্যালেরা তাঁর দেশের জনশিক্ষা ক্ষেত্রকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার পক্ষপাতী। তাঁর দ্বিতীয় উক্তি আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে, "বর্তমান বিশ্বে আমরা যুদ্ধ এড়াতে চাই। একাজ শুধু একার চেষ্টায় হবার নয়; পৃথিবীর যুদ্ধবিরোধী জাতিসমূহের এক হয়ে এক সংস্থায় থেকে, এর জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।" বলাবাহুল্য এ বাণী ঠিক ভারতেরই প্রাণবাণী। আজ বিশ্বের ছোট বড় প্রায় সকল রাষ্ট্রই যুদ্ধে জড়াবার পাঁয়তারা কষছে। বিশ্ববিধানের অতি ক্ষুদ্র এই হায়দরাবাদ পর্যন্ত সকল সদুপদেশ অগ্রাহ্য করে চীৎকার জুড়েছে যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি। অথচ স্বদেশের ও পরদেশের সমভাবে হিতকামনাশীল যে কয়জন নেতা বর্তমান বিশ্বে রয়েছেন, জগতের যুদ্ধোদাম এড়াবার জন্য তাঁদের চেষ্টার অন্ত নেই। পতংগের মত আগুনে ঝাঁপিয়ে একনিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু পৃথিবীকে সুখে শস্যে রূপে সংস্কৃতিতে হাস্যোজ্জ্বল করে তোলা কঠিন। এই কঠিনের ব্রত ভারত গ্রহণ করেছে আজ নয়, হাজার হাজার বৎসর পূর্বে। বর্তমান বিশ্বে দুর্লভ আইরিশ নেতার এই বাণী ভারতেরই অন্তরের কথা। বর্ণগত ও প্রাণগত এই রকম ঐক্য রয়েছে বলেই জনতা সেদিন তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে প্রাণ খুলে বলতে পেরেছে, ডি ভ্যালেরা কি জয়।

# সাহিত্য-সংবাদ

**বাঙলা ভাষায় উপাধি পরীক্ষা**

বাঙলা ভাষায় লিখিত যে কোন বিষয়ের মৌলিক প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়া আগামী ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৫, ইং ৭ই আগস্ট, ১৯৪৮, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবসে বঙ্গ-ভারতীর ষষ্ঠ বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে প্রবন্ধ লেখক লেখিকাকে বঙ্গ ভারতী হইতে সাহিত্য সরস্বতী উপাধি সম্বলিত মানপত্র দেওয়া হইবে।

—শিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বঙ্গভারতী, ২০নং রজনী গুপ্ত রো, কলিকাতা।

# এপার ওপার

## মুসোলিনীর পত্নী

সেদিন যাদের নামে সারা ইউরোপ কেঁপে উঠত, যাদের সংবাদে খবরের কাগজের পাতা ভর্তি থাকত, আজ তাদের নাম ক্রমশঃ অপর ব্যক্তির নাম দ্বারা পূর্ণ হচ্ছে। আজ গটওয়াল্ডের নাম যতটা শুনতে, পড়তে অথবা করতে হয়, ডলফিউসের নাম সে তুলনায় কিছুই করতে হয় না। এই হ'ল ইতিহাসের ধারা। তাই আজ মুসোলিনীর নাম স্মরণ করবার আবশ্যক হয় না। মুসোলিনীর নামই যখন ক্বচিৎ স্মরণ করতে হয় তখন তাঁর পত্নীর কথা কে আর মনে করে? কিন্তু তবুও কৌতূহল হয়।

নেপলস্ উপসাগরে আছে একটি দ্বীপ, তার নাম ইশ্চিয়া। ইশ্চিয়াতে আছে ফোরিয়ো নামে একটি জায়গা। এই ফোরিয়োতে মুসোলিনী পত্নী ডোনা র‍্যাচেল এক রকম নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন। ঘর সংসারের কাজ, সেলাই, পোশাক আশাক কাচা ও ইস্ত্রি করা এবং এমন কি রান্না, সবই তিনি স্বহস্তে করেন। তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, রোম্যানো ও অ্যানা-ম্যারিয়া। রোম্যানো স্থানীয় সরাইখানায় তার বন্ধুদের সঙ্গে তাস আর বিলিয়ার্ড খেলেই কাটিয়ে দেয়, অবসর সময়ে আনাড়ি হাতে মাকে গীটার বাজিয়ে শোনায়। অ্যানাম্যারিয়া সিনেমা ভক্ত, তার ঘরের দেওয়াল সিনেমা স্টারদের ছবিতে ভর্তি। অবসর সময়ে নতুন ফ্যাসনের ফ্রক কাটতে শেখে। সে কথাবার্তা ও ধরণ ধারণে অনেকটা বাপের মত হয়েছে।

ইটালীর একটি নিভৃত পল্লীতে, কৃষক পরিবারের পাথরের কুটিরে ডোনা জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটির নাম হ'ল প্রেডাপ্পিও। ডোনা মাত্র দু' বৎসর স্কুলে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল, ছয় থেকে আট। তারপর ক্ষেতে চাষের কাজে বড়দের সাহায্য করতেন, কিন্তু তাতে সংসার চলে না, তাই ডোনাকে অ্যালেসান্দ্রো মুসোলিনীর "ল' অ্যাগনেলো" (ভেড়ার ছানা) নামে সরাইখানায় চাকরী নিতে হ'ল। রাস্তার ধারে এই সরাইখানায় কত রকমের লোক আসত, কাউকে দিতে হ'ত শাকের তরকারী, কাউকে ঝলসানো মাংস, কাউকে মদ। এদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসত মনিব পুত্র বেনিটো, ইটালীর ভবিষ্যৎ ইল ডুচে। তিনি তখন সবেমাত্র সুইজারল্যাণ্ডে নির্বাসন থেকে মুক্তি পেয়েছেন, বয়স চব্বিশ, নবীন যুবক। ডোনার বয়স সতেরো, নবীনা কিশোরী। পরে তাঁদের বিবাহ হয় এবং সেই সরাইখানার সীমানা ছাড়িয়ে সমস্ত ইটালী, ইটালী থেকে ইউরোপ, ইউরোপ থেকে সমস্ত পৃথিবীতে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

মুসোলিনী পত্নীর এখন সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক মুহূর্ত হ'ল যে সময় ডাক-পিয়ন আসে। অ্যামেরিকা থেকে বহু চিঠি ও পার্শেল তাঁর নামে আসে। পার্শেলে থাকে লেখবার নিব থেকে আরম্ভ করে' দেশলাই, সাবান, কফি। পড়াশোনা তিনি বেশী করতে পারেন না, কারণ চশমাটি বদলাতে হবে, সেটি আর হয়ে উঠছে না। এই চশমাটি তাঁর স্বামী তাঁকে করিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি তিনি কাছছাড়া করেবন না। নতুন চশমাই করাতে হবে। এই চশমাজোড়া আর নিজের কিছু জামাকাপড় তিনি সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন, আর বাকি সব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্বামীর কলার, তলোয়ারের খাপ, মিষ্টির কৌটো এবং ব্যক্তিগত কাগজপত্র সব কিছুই গেছে। তবে মুসোলিনীর শেষ পত্রখানা তিনি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। এ চিঠিতে মুসোলিনী বিদায় জানিয়ে ভ্যাল্টেলিনায় যাত্রা করেছিলেন, সে[illegible] তাঁর শেষ যাত্রা। চিঠি পেয়েই ডোনা মুসোলিনীকে টেলিফোন করেছিলেন এবং কোনো নিরাপদ স্থানে বিমানে করে চলে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। "তা হয়না র‍্যাচেল" দৃঢ় স্বরে মুসোলিনী জবাব দিয়েছিলেন "ভাগ্যকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।"

স্বামীর পুরাতন বন্ধুরা কেউ ডোনার খবর নেয়না কিন্তু যখন অপরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর সাহায্য ও সুপারিশ প্রার্থনা করে চিঠি লেখে তখন তাঁর দুঃখ রাখবার আর স্থান হয়না। "নীরব প্রার্থনা ছাড়া তাদের জন্য আমি আর কি করতে পারি।"

মুসোলিনী পত্নী

## ক্রিকেট—

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল প্রথম টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড দলকে ৮ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া দলের সাফল্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবে ইংলণ্ড দলের খেলোয়াড়গণও শেষ সময় অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। দল যখন সুনিশ্চিত ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন তখন ইংলণ্ড দলের ডেনিস কম্পটন ও ইভান্স অষ্ট্রেলিয়ান বোলারদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া যেভাবে রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করিয়া ডেনিস কম্পটন ৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট খেলিয়া ১৮৪ রাণ করিয়া সত্যই ব্যাটিংয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এককথায় কম্পটন ও ইভান্সের জন্যই ইংলণ্ড দল ইনিংস পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। এই জন্যই অনেক সাংবাদিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড দল পরাজিত হইলেও অসম্মানের কিছুই হয় নাই। এই খেলা হইতে সকলের ধারণা হইয়াছে কোন টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ইনিংসে পরাজিত হইবে না। এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত না হইলেও এই কথা বলিলে দোষ হইবে না যে, অষ্ট্রেলিয়া দলকে অপর সকল টেষ্ট খেলাতেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করিতে হইবে।

### ডেনিস কম্পটনের কৃতিত্ব

ইংলণ্ড দলের ডেনিস কম্পটন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দলের সকলে যখন একে একে অল্প রাণে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন ঠিক সেই সময় তিনি দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া রাণ তুলিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট খেলিয়া ১৮৪ রাণ করিয়া আউট হইয়াছেন। তিনি যে অবস্থার মধ্যে আউট হইয়াছেন তাহা দুর্ভাগ্যপ্রসূত বলা চলে। তিনি মিলারের একটি উঁচু বল হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ১৬ রাণের জন্য দুইশত রাণ করিতে পারেন নাই। ও একটি উইকেটে আঘাত করে। ফলে তিনি মাত্র ১৬ রাণের জন্য দ্বিশত রাণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পতনের পরই ইংলণ্ড দলের অপর সকল খেলোয়াড়গণ আউট হইয়া যান। যদি তিনি এইভাবে আউট না হইতেন তবে খেলার ফলাফল অন্যরূপ হইত।

### ডন ব্রাডম্যানের শূন্য রাণ

এই টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ডন ব্রাডম্যান কোন রাণ না করিয়া আউট হন। ব্রাডম্যান ইংলণ্ডে এই পর্যন্ত ২৩টি টেষ্ট ইনিংস খেলিয়াছেন এবং কখনও এইভাবে আউট হন নাই।

### খেলার বিবরণ

ইংলণ্ড দল প্রথম ব্যাট করিয়া মাত্র ১৬৫ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। একমাত্র লেকার শেষ সময় দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া ৬৩ রাণ করেন। প্রথম দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়া দল মাত্র ১৭ রাণ করে এবং কেহ আউট হয় নাই। দ্বিতীয় দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪ উইকেটে ২৯৩ রাণ হয়। ব্রাডম্যান ১৩০ রাণ ও হ্যাসেট ৪১ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনের চা পান পর্যন্ত খেলিয়া অষ্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ইনিংসে ৫০৯ রাণে শেষ করে। ব্রাডম্যান ১৩৮ ও হ্যাসেট ১৩৭ রাণ করেন। পরে ইংলণ্ড দল খেলিয়া দিনের শেষে ২ উইকেটে ১২১ রাণ করে। হাটন ৬৩ রাণ ও কম্পটন ৩৬ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনের শেষে ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪৫ রাণ হয়। কম্পটন ১৫৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। ইংলণ্ড দল ইনিংস পরাজয় হইতে অব্যাহতি পান। পঞ্চম দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের অল্প পরেই ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৪৪১ রাণে শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া দল এই সময় খেলা আরম্ভ করে ও চা-পানের কিছু পরে দুই উইকেটে প্রয়োজনীয় রাণসংখ্যা সংগ্রহ করে।

**খেলার ফলাফল :—**

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—১৬৫ রাণ (লেকার ৬৩, বেডসার ২২, জনষ্টন ৩৬ রাণে ৫টি, মিলার ৩৮ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস—৫০৯ রাণ (বার্ণেস ৬২, ডন ব্রাডম্যান ১৩৮, হ্যাসেট ১৩৭, লিণ্ডওয়াল ৪২, লেকার ১৩৮ রাণে ৪টি, বেডসার ১১৩ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস—৪৪১ রাণ (কম্পটন ১৮৪, হাটন ৭৪, ইভান্স ৫০, মিলার ১২৫ রাণে ৪টি, জনষ্টন ১৪৭ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস—২ উইঃ ৯৮ রাণ (বার্ণেস নট আউট ৬৪, হ্যাসেট নট আউট ২১, বেডসার ৪৬ রাণে ২টি উইকেট পান।)

### অষ্ট্রেলিয়া বনাম নর্দাম্পটনসায়ার

অষ্ট্রেলিয়া বনাম নর্দাম্পটনসায়ার দলের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংস ও ৬৪ রাণে বিজয়ী হইয়াছে। এই খেলায় প্রাকৃতিক আবহাওয়া বিশেষ-ভাবে বাধা সৃষ্টি করে। প্রথমে নর্দাম্পটন দল খেলিয়া ১১৯ রাণে ইনিংস শেষ করে। জনসন ও জনষ্টনের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। ইহার পর অষ্ট্রেলিয়া দল খেলিয়া ৮ উইকেটে ৩৫২ রাণ করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। হ্যাসেট শতাধিক রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নর্দাম্পটন দল দ্বিতীয় ইনিংসও ১৬৯ রাণে শেষ করে। ফলে এক ইনিংস ও ৬৪ রাণে খেলায় পরাজিত হয়। খেলার ফলাফল—

নর্দাম্পটন—১১৯ রাণ (ডিভেঁচা ৩৩, জনষ্টন ২৪ রাণে ৩টি, জনসন ১৩ রাণে ৩টি ও লক্ষ্মণটন ২২ রাণে ২টি উইকেট পন।)

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস—৮ উইঃ ৩৫২ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড) হ্যাসেট ১২৭, মোরিস ৬০, ম্যাককুল নট আউট ৫০, নুটার ৫৭ রাণে ৫টি উইকেট পান।)

নর্দাম্পটন দল দ্বিতীয় ইনিংস—১৬৯ রাণ (ব্রুকস ৪৪, জনষ্টন ৪৯ রাণে ৪টি, রিং ৩১ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

## ফুটবল—

কলিকাতার ফুটবল মাঠে অপ্রীতিকর ঘটনার সমাবেশ হওয়ায় কোনই নূতনত্ব নাই। দীর্ঘকাল হইতেই ইহা পরিলক্ষিত হইতেছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এমন একটি বৎসর কেহ উল্লেখ করিতে পারে না যে বৎসর ফুটবল মরসুমের সময় কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। তবে এটা ঠিক কোন বৎসরেই এক বা দুইয়ের অধিক ঘটনা হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু এই বৎসর ইহা নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। খুব কম দিনই যায় যেদিন খেলার সময় মাঠের ভিতর দর্শকগণকে খেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে অথবা খেলার শেষে খেলোয়াড় বা খেলা পরিচালককে তাড়া করিতে দেখা না যায়। অনেক সপ্তাহে পর পর কয়েকদিন এই সকল ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই সকল ঘটনা লইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও বন্ধ হয় নাই। এই সকল ঘটনা যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য কলিকাতা রেফারী এসোসিয়েশন সর্বপ্রথম এক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহারা আই এফ এ-র পরিচালকগণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, দিনের পর দিন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতেছে অথচ তাহার প্রতিকারের কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না দেখিয়া এসোসিয়েশন স্থির করিয়াছেন, আই এফ এ-র কোন খেলা পরিচালনা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। আই এফ এ-র সভাপতি এই সিদ্ধান্ত জানিলে এসো-সিয়েশনকে হঠাৎ সকল দায়িত্ব হইতে সরিয়া না দাঁড়াইতে অনুরোধ করেন এবং কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। ইহার পর আই এফ এ ও রেফারী এসোসিয়েশনের মিলিত সভায় তিনজন করিয়া সভ্য লইয়া মোট ছয়জন সভ্যের এক ডেপুটেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত এই বিষয় আলাপ করিবেন বলিয়া স্থির হয়। ঐ ব্যবস্থা অনুযায়ী ডেপুটেশন মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট গিয়া খুব বেশী আশা বা ভরসা পান নাই। শোনা যাইতেছে মন্ত্রী মহাশয় নাকি শীঘ্রই এইজন্য এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করিবেন। কবে যে সম্মেলন বসিবে তিনিই জানেন।

এই সকল সংবাদ শুনিলে সাধারণ ক্রীড়ামোদী ধারণা করিবেন শীঘ্রই ব্যবস্থা হইবে। কারণ আমরা তাহা করি না। আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি সকলেই দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতেছেন।

খেলা বন্ধ না হইলে দ্রুত প্রতিকারের আশা নাই। রেফারী এসোসিয়েশনের উচিত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য করা।

### আরও দুইজন খেলোয়াড়ের বিলাত যাত্রা

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভারতীয় ফুটবল দল গত ৩রা জুন জাহাজযোগে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এই দলের সহিত যাইবার জন্য শেষ সময় মোহনবাগান দলের অনিল দে, ভবানীপুরের রবি দাস ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সুনীল ঘোষকে মনোনীত করা হয়। ইঁহাদের তিনজনের নিকট হইতে খরচা হিসাবে চারি হাজার টাকা করিয়া দাবী করা হয়। শ্রীযুত সুনীল ঘোষ ঐভাবে টাকা দিয়া যাইতে স্বীকৃত হন না। অপর দুইজন কিজন্য জানি না যাইতে পারেন না। এই দুইজন শোনা যাইতেছে বিমানযোগে শীঘ্রই লণ্ডন যাইতেছেন। ইঁহারা দাবীর টাকা দিয়াছেন কি না জানি না। যদি টাকা না দিয়াও ইঁহাদের যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে তবে কেন সুনীল ঘোষকে লওয়া হইতেছে না জানিতে ইচ্ছা হয়?

# দেশী সংবাদ

১৪ই জুন—আইরিশ নেতা মিঃ ইমন ডি ভ্যালেরা আজ অস্ট্রেলিয়া হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে কলিকাতায় উপনীত হইলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

দার্জিলিংয়ে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেন যে, গভর্নমেণ্ট পুনরায় বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিয়ন্ত্রণের পর কেবলমাত্র অনুমোদিত এজেন্সীর মারফৎ বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারত সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, গত ১৫ই মে পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্থান হইতে মোট ১২,৫১৪ জন অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ৪৯৭৮ জন হিন্দু ও ৭৫৩৬ জন মুসলমান নারী।

১৫ই জুন—বান্নু যাইবার পথে কোহাট জেলার বাহাদুরখেলে সীমান্ত নেতা খান আবদুল গফুর খানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে সীমান্ত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সীমান্ত অঞ্চলে গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি ইপির ফকিরের অনুচরবৃন্দের সহিত সহযোগিতার জন্য বান্নু যাইতেছিলেন।

বহিরাগতদের বসতি স্থাপন, নগর, আদর্শ পল্লী ও কৃষিকার্যের কলোনী প্রতিষ্ঠা, শহর ও পল্লী অঞ্চলে জীবন ধারণের উন্নততর অবস্থা সৃষ্টি, কৃষি, বন, মৎস্য ও শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি জনসেবামূলক কার্যের জন্য যাহাতে দ্রুততার সহিত জমি অধিকার করা যায়, তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ ভূমি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অর্ডিন্যান্স (১৯৪৮) জারী করিয়াছেন।

১৬ই জুন—খান আবদুল গফুর খান সীমান্ত অপরাধ দমন আইনের ৪০ ধারানুযায়ী তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

হায়দরাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত-হায়দরাবাদের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। আজ প্রাতে হায়দরাবাদ মন্ত্রিসভার অধিবেশনের পর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় যে, ভারতীয় ইউনিয়নের শেষ প্রস্তাব যেভাবে রচিত হইয়াছে, উহা গ্রহণের অযোগ্য। প্রকাশ যে, ভারত সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে নিজাম সরকারের আপত্তি প্রস্তাবের মূল নীতির দিক হইতে যতটা না আছে, প্রস্তাবের ভাষা বিন্যাসের দিক হইতেই বেশি আছে।

১৭ই জুন—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, ভারত-হায়দরাবাদ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ভারত সরকার সর্বনিম্ন সর্তাবলী দিয়া যে চুক্তির খসড়া উপস্থিত করেন, নিজাম এ পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করেন নাই। যে সকল সর্ত দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি সংশোধন করিবার আর কিছু নাই; সুতরাং আলোচনা শেষ হইয়াছে বলিলেই চলে।

কলিকাতা এবং তৎচতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাসমূহে রেলপথে গমনাগমনের অধিকতর সুযোগ সুবিধার প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনার্থে ভারত গভর্নমেণ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে কলিকাতাকে বেষ্টন করিয়া ২৩ মাইলের বৃত্তাকার ভূমি-উপরিস্থ বিদ্যুৎচালিত একটি রেল লাইন নির্মাণ করিবার এবং একদিকে

বর্ধমান ও খড়্গপুর পর্যন্ত এবং অপরদিকে রাণাঘাট পর্যন্ত বর্তমান রেলওয়েগুলিকে বিদ্যুৎচালিত ব্যবস্থায় পরিণত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

চট্টগ্রামের সংবাদে প্রকাশ, হাটহাজারীর জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুত শরৎ মহাজন গুরুতররূপে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ফলে মারা গিয়াছেন। প্রকাশ, দুর্বৃত্তরা গত ১৫ই জুন রাত্রে তাঁহার বাসভবনে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং তাহার ফলে তিনি অগ্নিদগ্ধ হন।

১৮ই জুন—হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলী অদ্য রাত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল প্রকার দুঃখকষ্ট এবং কঠোরতর অবরোধ ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতে হায়দরাবাদের জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানান। তিনি এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, যাহারা উহা করিতে অসমর্থ হইবে বা দ্বিধা প্রদর্শন করিবে, তাহাদিগকে রাজ্যের শত্রু বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

ভারত গভর্নমেণ্ট স্যার বি রমারাওকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করিয়াছেন। স্যার রমারাও টোকিওস্থিত ভারতীয় সংযোগরক্ষাকারী মিশনের নেতা ছিলেন।

মাদ্রাজ সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ যে, ভারতীয় ইউনিয়ন পরিবেষ্টিত হায়দরাবাদ রাজ্যের কম্যুনিস্ট অধ্যুষিত নরসিংহলুগুদেম গ্রামের তিনশত গ্রামবাসী একযোগে স্থানীয় থানায় গিয়া কর্তৃপক্ষকে জানায় যে, তাহারা কম্যুনিস্ট দল ত্যাগ করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছে।

নাগপুরের প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, মধ্যপ্রদেশ-হায়দরাবাদ সীমান্তে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহে রাজাকাররা বিশেষভাবে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য লোহা-লক্কড় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হানা দিতেছে। একটি গ্রামে রাজাকারদের বাধা দিবার ফলে দুইজন হিন্দু নিহত হয়।

১৯শে জুন—পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত গভর্নর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু আজ বিমানযোগে কলিকাতায় পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়।

আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে গুরুতর রকমের এক হাঙ্গামা হওয়ার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় অফিস ও বিভাগ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চূড়ান্ত এম বি পরীক্ষা আরও স্থগিত রাখার ও অন্যান্য দাবী পূরণ করিবার দাবী জানাইয়া মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভকারিগণ ও তাহাদের সমর্থকগণ এই দিন বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে সিণ্ডিকেটের সভা চলিবার কালে ভাইস-চ্যান্সেলারের কক্ষের সম্মুখে জমায়েত হইয়া পিকেটিং করিয়া উক্ত কক্ষের আগমন নির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়; উহার ফলেই সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন।

২০শে জুন—ভারতের নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল শ্রীযুত রাজা গোপালাচারী আজ বেলা ৯-৫৫ মিনিটের সময় একখানি বিশেষ বিমানযোগে দমদম হইতে দিল্লী যাত্রা করেন এবং অপরাহ্নে তথায় গিয়া পৌঁছেন। আগামীকল্য সকালে তিনি গভর্নর জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

আজ রাত্রিতে অল ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এক বিদায়বাণী দিবার সময় বলেন, ভারতবর্ষ বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে এবং বিশ্বব্যবস্থায় ভারতবর্ষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে।

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, রাজাকার এবং নিজাম পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে গত শুক্রবার মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য শ্রীযুত ভণসালী ১৪ জন ব্যক্তিসহ হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যাগ্রহ করেন।

# বিদেশী সংবাদ

১৪ই জুন—ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু ঘোষণা করেন যে, তিনি রাশিয়ার সহিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ইউনাইটেড ফ্রেণ্ট পার্টির কার্যসূচী বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, যদিও ব্রহ্মের চতুর্দিকে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবাধীন রাষ্ট্র রহিয়াছে তথাপি বর্মী নেতারা রাশিয়ার আদর্শই অনুসরণ করিবেন।

১৬ই জুন—আরব নেতারা অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত সালিশী কাউন্ট বার্নাদোত্তেকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম সর্ত এই যে, প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করা চলিবে না এবং সেখানে কোন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

১৭ই জুন—ব্রহ্মের পররাষ্ট্রসচিব উ টিন টুট আজ ঘোষণা করেন যে, ব্রহ্ম সরকারের নীতি কমিউনিজমের পথে অগ্রসর হয় নাই।

লেকসাক্সেস হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অদ্য ভারতীয় প্রতিনিধি ডাঃ পি পি পিল্লাই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি সংকটজনক। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের ফলে ইন্দোনেশিয়া রিপাব্লিক ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

১৮ই জুন—কুয়ালালামপুরে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সমগ্র মালয় যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদীদের দমনের জন্য পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, চুংকিং-এর পুলিশকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কাহাকেও চাউল লুঠ করিতে দেখিলেই যেন তাহাকে গুলী করা হয়। গত বুধবার যে ২৫০ জন চাউল লুণ্ঠনকারী গ্রেপ্তার হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২৩ জনকে অদ্য হত্যা করা হইয়াছে।

১৯শে জুন—আজ প্যারিসের উপকণ্ঠে পুতো নামক স্থানে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনে বৃটেন, ভারত, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বৃটিশ স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের সেক্রেটারী মিঃ বব এডওয়ার্ড বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশে পশ্চিম ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণকে লইয়া একটি "তৃতীয়" ব্লক গঠন করিতে হইবে।


শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
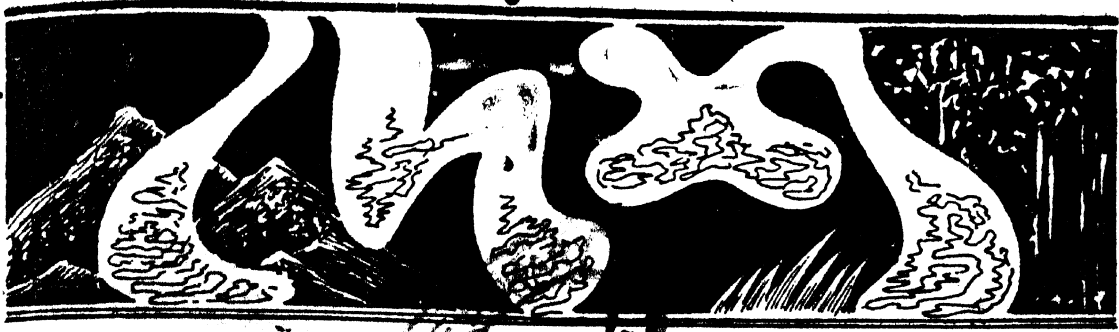
সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন                    সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ]    শনিবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৫৫ সাল।    Saturday, 3rd July, 1948.    [৩৫শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**জাতির প্রাণ-শক্তির উদ্বোধন**

পল্লীসমাজের উন্নতি সাধন এবং পল্লী সংগঠনের সম্বন্ধে পশ্চিম বাঙলার নবনিযুক্ত প্রদেশপাল ডক্টর কাটজুর বিশেষ আগ্রহ আছে। যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রিস্বরূপে তিনি এই ক্ষেত্রে তাঁহার কর্মোদ্যম প্রযুক্ত করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সে প্রচেষ্টা যুক্তপ্রদেশের পল্লী-সাধনায় স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ডক্টর কাটজু পল্লী সংগঠনের দিকেই জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার পর পর কয়েকটি বক্তৃতাতে তিনি পল্লীর উন্নতি সাধনের প্রয়োজনের কথাই বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নগরী কলিকাতা দেখিয়া এই প্রদেশের সত্যকার অবস্থার ধারণা করা যায় না। নগরীর গগনস্পর্শী সৌধরাজি বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত; কিন্তু এ সহরের সীমা ছাড়াইয়া কিছু দূরেই পল্লীর কটীরে দীপ জ্বলে না। পল্লী অঞ্চল এখনও অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, বুভুক্ষিত এবং অজ্ঞানতার আঁধারে আচ্ছন্ন। ভূতপূর্ব ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু এদেশের নিদারুণ দারিদ্র্য দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিলেন এবং দেশের বিপুল জনসমাজ এমন দারিদ্র্যের মধ্যেও মনের সন্তোষ এবং স্থৈর্য কেমন করিয়া বজায় রাখে ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরেজের সুদীর্ঘ শাসনে ভারতের রক্ত নিঃশেষে শোষিত হইয়াছে, ইতিহাসের নজীর আওড়াইয়া সে সত্য নূতন রকমে প্রমাণ করা বর্তমানে একান্তই অনাবশ্যক; কারণ ইংরেজ আজ চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এখন আমরা স্বাধীন; কিন্তু স্বাধীন হইয়াও এদেশের জনসাধারণের অবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে কি? যাহারা দৈনন্দিন জীবনে গভীর দৈন্য ও দুর্দশার মধ্যে পড়িয়া আছে বাঙলার পল্লী অঞ্চলের সেই অগণিত নরনারীর বুকে নূতন কোন আশা আজও জাগে নাই। এ কথা সত্য যে, আমরা সেদিন মাত্র স্বাধীনতা পাইয়াছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় একটা সমস্যার সমাধান করিয়া উঠা যায় না এবং আশা এই যে, অবস্থার ক্রমে ক্রমে উন্নতি ঘটিবে। কিন্তু ক্রমের সেই যে গতি আমাদের মন ও বুদ্ধির আলোকে আমরা তাহার কোন পরিচয়ই পাইতেছি না। স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও আমাদের সমাজ-জীবন বিদেশী শাসকদের স্বার্থ-প্রণোদিত শোষণ প্রবৃত্তির ধারা ধরিয়াই চলিতেছে। শুধু তাহাই নয়, বিজেতৃ-শক্তি বৃটিশের প্রতি বিদ্বেষের তোড়ে জাতির উপর যেটুকু টান এবং হৃদ্যতার ভাব আমাদের মধ্যে আগে ছিল, স্বাধীনতা পাইবার সংগে সংগে তাহাও যেন নিভিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, পদমানের লোভের তাড়না ছাড়া আমাদের কার্যত অন্য কোন সাধনাই আজ বলিতে গেলে নাই। চারিদিকে অসংযত এবং উদ্দাম অর্থ লালসার নির্দয় এবং বীভৎস বিলাস আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা দেশের জন্য একদিন প্রাণ দিতে আগাইয়া আসিয়াছিলেন, জাতির পরম দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহারাও তলে তলে স্বার্থ-সংকীর্ণতার পাকের ভিতর গিয়া পড়িতেছেন। বাঙলার স্বদেশপ্রেম এবং উদার মানব-প্রীতির যে আগ্নেয় বীর্য একদিন গোটা ভারতে চমক সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ কোথায় তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাজনীতির ক্ষেত্রে বচনসর্বস্বতা ছাড়া কোথায়ও প্রাণের আবেগ পরিলক্ষিত হইতেছে না। বাঙলার সামনে আজ প্রাণময় কোন আদর্শ নাই। বাস্তবিকপক্ষে দরিদ্রের নামে জয়ধ্বনি তুলিয়া তাহাদের প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার যে নিষ্ঠুর লীলা আজ আরম্ভ হইয়াছে, বাঙলার ইতিহাসে এমন নৈতিক অধোগতি এবং সাংস্কৃতিক একটা দৈন্য বহুদিন দেখা যায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের নূতন প্রদেশপালকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি আমাদের মানসিক ব্যাধির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং দুর্গতির নিদান তত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন। বস্তুত বাঙলার পল্লীসমাজ যদি না বাঁচে তবে সৌধপুরী কলিকাতার সম্পদে জাতি হিসাবে বাঙালী বাঁচিবে না। শোষিতের দল জাতির বুকে বসিয়াই জাতির সর্বনাশ করিবে। কয়েকজনের ভাগ্যে বড় জোর তাহাদের কিছু উচ্ছিষ্ট কণাই জুটিবে। বাঙলার আজ সর্বনাশ হইতে বসিয়াছে। সর্বাগ্রে ইহা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। জাতির যাহারা মেরুদণ্ডস্বরূপ, বাঙলাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা দরকার। স্বার্থ সাধনার হট্টগোলের মধ্যে নিঃস্বার্থ এবং নীরব সে সাধনায় কাহারা প্রবৃত্ত হইবে? শোষকদিগকে সায়েস্তা করিবে কাহারা এবং কাহারা নিরন্নের মুখে অন্ন দিবে, বস্ত্রহীনের জন্য বস্ত্রের সংস্থান করিবে? আজ কাহারা পশ্চিমবঙ্গের পল্লীর আঁধার আঙ্গিনায় আলো লইয়া যাইবে? তরুণরাই আমাদের একমাত্র ভরসা। বাঙলার তরুণেরা বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়া স্বাধীনতা আনিয়াছে। পল্লী সাধনার আদর্শ তাহারাই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে। আমরা তাহাদিগকে এজন্য আহ্বান করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গের নূতন প্রদেশপাল পল্লী সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ সমাজের সমর্থন সর্বাংশে লাভ করিবেন, ইহাই আমরা আশা করি। প্রকৃতপক্ষে পল্লীর অন্তর আজ প্রাণের স্পর্শ চায়। ডক্টর কাটজু প্রাণহীন রাজনীতিক বিলাসের বিড়ম্বনা হইতে জাতির জনসাধারণকে উদ্ধার করুন এবং তাহাদের সেবার

বাস্তব শক্তিকে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র সাধনায় জাগাইয়া তুলুন, আমাদের ইহাই কামনা।

**বাস্তুত্যাগীদের ভবিষ্যৎ**

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্বন্ধে নিজেদের সুনিশ্চিত একটি সিদ্ধান্তমূলক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, ২৫শে জুনের পর পূর্ববঙ্গ হইতে যে সব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিবে, তাহাদিগকে আর আশ্রয়প্রার্থী বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং সরকার হইতে তজ্জনিত সুবিধাও দেওয়া হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ইস্তাহারে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারত-পাকিস্থান পারস্পরিক চুক্তি সম্পন্ন হইবার পর কিছুদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা কিছু হ্রাস পায়, কিন্তু কিছুদিন হইল, পশ্চিমবঙ্গে আগতদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ পূর্ববঙ্গে বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক উপদ্রব নাই কিংবা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে ভয়ের যে কোন কারণ আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাও মনে করেন না। তথাপি সংখ্যা বৃদ্ধির এই কারণ কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতে অর্থনৈতিক অবস্থাই ইহার কারণ। শুধু সে কারণে অতঃপর বাস্তুত্যাগীদের জন্য আশ্রয়প্রার্থীদের মত ঝুঁকি লইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সমস্যাকে আর কোনদিনই লঘুভাবে দেখি নাই, তথাপি তাঁহারা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসুন, আমরা ইহা চাই না। পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দুর্বল নহেন, ইহা আমরা জানি। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি তাঁহারা রাখেন এবং তদুপযোগী প্রাণবলের অভাবও তাঁহাদের নাই, আমরা এ বিশ্বাস করি। তবে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি যে সংখ্যালঘুদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বস্তিমূলক হইয়াছে আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ কিছুদিন হইল ভারত সরকার কর্তৃক পূর্ববঙ্গের ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। সুরেন্দ্রমোহন বসু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্বদেশপ্রেমিক; বাঙলার রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামে তাঁহার দান সামান্য নয়। বিশেষভাবে তিনি জনগণের আস্থাভাজন ব্যক্তি। তিনি সেবানিষ্ঠ কর্মী। তাঁহার এই নিয়োগে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু স্বদেশপ্রেমের সংস্কৃতিপরায়ণ সমাজের মধ্যে আস্বস্তি বৃদ্ধি পাইবে, এমন আশা আমাদের আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়, পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রনীতি যতদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে মুক্ত না হইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মর্যাদা রাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, সে পর্যন্ত সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবে না। শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য লোকে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আসিতেছে, আমাদের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বস্তুত পূর্ববঙ্গের এই অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি জড়িত রহিয়াছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষেই ইহা বিশেষ সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যাকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে ভুল হইবে। পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রনীতি সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত; এক্ষেত্রে ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সুতরাং পূর্ববঙ্গের কেহই অতঃপর পশ্চিম পড়িবে না, বা পড়িতে পারে না, এমন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। যে বা যাহারা আশ্রয়প্রার্থী হইবার উপযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্তত তাহা বিবেচনা করিবার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিলেই সংগত হইত বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহারা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সহানুভূতিহীনভাবে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সব দায়িত্ব এড়াইবার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, লোকে এমন বুঝিতে পারে; প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্বন্ধে নৈতিক দায়িত্ব তাঁহারা একেবারে এড়াইতে পারেন না।

**দোষ কাহাদের**

পশ্চিম বাঙলার প্রদেশপাল ডক্টর কাটজু গত ১২ই আষাঢ় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ভারতের সংস্কৃতি এবং সাধনা সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বাঙালী সমাজ অনুপ্রাণিত হইবে। সেদিন ভারতের ঐক্য ও সংহতির কথা উল্লেখ করিয়া ডক্টর কাটজু বলেন, আজ বাঙালী, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি—এই হিসাবে আমরা যেন নিজেদের না দেখি, আমরা সকলেই ভারতীয় এবং সকলে মিলিয়া মাতৃভূমির কল্যাণ সাধন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, ডক্টর কাটজু যে আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন, বাঙলার জাতীয়তাবাদের মূলে অখণ্ড ভারতের সেই অগ্নিময় প্রেরণাই আগাগোড়া কাজ করিয়াছে। বাঙালী ভারতের কোন প্রদেশবাসীকেই পর করিয়া দেখে নাই। কিন্তু ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বাঙালীর ভাগ্যে কি প্রতিদান মিলিতেছে? পশ্চিমবঙ্গের নূতন প্রদেশপাল যদি এই প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তৃতায় অন্ততঃপক্ষে তাহার কিছু আভাসও দিতেন, তবে আমরা অধিকতর আশ্বস্ত হইতাম। বাঙলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে পিষ্ট করিবার জন্য চক্রান্ত ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, কংগ্রেসের আদর্শ অখণ্ড ভারতের সংহতির যাঁহারা সমর্থক, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ এই দলে যোগ দিয়াছেন। এই চক্রান্তকারীদের নীতি সমর্থন করিতে না পারিয়া মানভূম জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত অতুল্যচন্দ্র ঘোষ এবং সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই ত্যাগী কর্মী এবং নিষ্ঠাবান স্বদেশপ্রেমিক। পরলোকগত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত পুণ্যশ্লোক পুরুষ ছিলেন। বিভূতিবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। অতুল্যবাবুর নাম বিহারের সর্বত্র সুপরিচিত। ইঁহাদের পদত্যাগের প্রতিবাদস্বরূপে গত ২৩শে জুন পুরুলিয়া শহরে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এই দুই-জন প্রতিষ্ঠাবান স্বদেশসেবক সরিয়া দাঁড়ানোতে মানভূমের রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাণশক্তি শূন্য হইয়াছে। কিন্তু প্রাদেশিকতার মোহ এমনই যে, বিহারের নেতারা কংগ্রেসের এমন শক্তিক্ষয়েও চঞ্চল নহেন। বিহারের মন্ত্রিমণ্ডল এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় মানভূম ও সিংহভূম অঞ্চলে বাঙলা ভাষাকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা নিরঙ্কুশ উদ্যমে এবং নিতান্ত নির্লজ্জভাবে চলিতেছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের দৃষ্টি এদিকে বারংবার আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তাঁহারা এ সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। পক্ষান্তরে বাঙালীদের ন্যায্য দাবীকে অগ্রাহ্য করিবার একটা অসংগত জিদই যেন তাঁহাদের সমগ্র নীতিতে উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। চোখের সামনেই দেখিতেছি, দক্ষিণ ভারতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী রাখিতে তাঁহারা কাজে নামিলেন; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপর অবজ্ঞার আঘাতই আসিয়া পড়িল। ইঁহাদের অন্তত এইটুকু বোঝা উচিত যে, আত্মমর্যাদাবোধ বাঙালীরও আছে, নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উপর দরদ তাঁহাদের কম নয়। সমগ্র ভারতের ঐতিহ্যই সে সাক্ষ্য দিবে। সুতরাং অবমাননার উপর এমন অবমাননার আঘাতের প্রতিক্রিয়া বাঙলায় অনিবার্য হইয়া উঠিবে, আমাদের এই আশঙ্কা। আমরা তেমন অনর্থ এড়াইতেই চাই। সমগ্র ভারতের মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া বাঙলার ন্যায্য দাবী রক্ষায় অবহিত হইবার জন্য আমরা ভারতের রাষ্ট্রনীতির নিয়ামকদিগকে এখনও অনুরোধ করিতেছি। প্রাদেশিকতার পাপ হইতে তাঁহারা জাতিকে রক্ষা করুন।

**নিজামের নীতির খেলা**

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হায়দ্রাবাদের সম্পর্কে তাঁহার শেষ কথা শুনাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাহার পরেও আলোচনা পুনরারম্ভের উদ্যম চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ভারতের রাষ্ট্রপাল পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর নিজাম নূতন কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় আশা করিয়াছেন। তিনি ভারতের নূতন রাষ্ট্রপালকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিন দলের ধর্মান্ধ নেতা কাজিম

ভী পর্যন্ত এই অভিনন্দনের পালায় যোগ ছেন। আমরা জানি, শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল চারী আপোষ-মীমাংসার অনুকূল মতাবলম্বী । এক সময়ে পাকিস্থানও তিনি সমর্থন রিয়াছিলেন; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপাল রূপে মন্ত্রিমণ্ডলের সিদ্ধান্ত অনুসারেই হাকে চলিতে হইবে। সুতরাং নিজামের রতান্ত্রিকতা তাঁহার আমলে কোন রকমে শ্রয় পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। তবে একদিক তে নিজাম বিশেষ আশা ভরসা করিতেছেন। টিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল ভারতের এইসব স্বৈর-ন্ত্রিক শাসকদিগকে চিরকাল প্রশ্রয় দিয়াছেন। খনও তাঁহারা সে নীতি ছাড়েন নাই। মিঃ র্চিলের দল সেদিনও পার্লামেন্টে নিজামের ক্ষে ওকালতি করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন; বলা হুল্য পাকিস্থান রাষ্ট্রের সর্বতোময় নিয়ামক ঃ জিন্নার সংগে যোগসূত্রেই তাঁহাদের এই জ চলিতেছে। ইংলণ্ডের মন্ত্রিমণ্ডল মিঃ চিলের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই বং তাঁহারা ভারত হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে স্তক্ষেপ করিতে রাজী হন নাই। কিন্তু রটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের এতৎসম্পর্কিত সব ক্তি এবং বিবৃতিও দ্ব্যর্থতাময়। াঁহাদের মুখপাত্রগণ ভারত সম্পর্কিত ষ্ট্র নীতির যে ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রয়াছেন, তাহাতে নিজামের স্বৈরাচার চালাইবার ল-কৌশল খাটাইবার সুযোগ রাখা হইয়াছে। া বাহুল্য, ইংরেজ যতটাই উদার হোক না জ জাতির স্বার্থের দিকে ঝোল আনার উপর াহাদের নজর তাহাদের সকলেরই। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ পাকিস্থানকে তে রাখিতে চায়; কিন্তু তাহারা যাহাই রুক, ভারত নিজের স্বাধীনতা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদাকে কিছুতেই বিপন্ন করিবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদিগকে যাহারা তাড়াইয়াছে, তাহারা হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে এই কূটচক্রও বিচূর্ণ রিবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী যথেষ্ট দৃঢ়তার সংগে জনমতের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌতে বক্তৃতাকালে তিনি সম্প্রতি বলিয়া-ছেন, হায়দরাবাদের ভৌগোলিক প্রতিবেশ রূপ যে সে কিছুতেই সার্বভৌম অধিকার পাইতে পারে না; শুধু তাই নয়, হায়দ্রাবাদকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। হায়দ্রাবাদ ভারত হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ভারতের সেনাদল হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করিবে, এই কথাও পণ্ডিত নেহরু জানাইয়া দিয়াছেন।

### ষড়যন্ত্র দলের সাড়া

পাকিস্থানের পিছনে থাকিয়া কাহারা কাশ্মীরে হানাদারদিগকে লেলাইয়া দিতেছে, হায়দরাবাদে রেজভীর রাজাকার দলের গুণ্ডা-দিগকে কাহারা চালাইতেছে, ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। সংকট মুহূর্তে সমাগত বুঝিয়া প্রচ্ছন্নচারী শয়তানের দল এতদিনে স্বমূর্তিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীর হইতে হানাদারেরা প্রায় উৎখাত হইতে চলিল, নিজামের স্বৈরাচারের পথ চারিদিক হইতে ভারতীয় রাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া বিচূর্ণ হইতে বসিয়াছে, সুতরাং ইহাদের প্রাণের দায় দেখা দিয়াছে, তাই এহেন স্বপ্রকাশ। সেদিন ইংলণ্ডের লটন শহরে সংরক্ষণশীল দলের এক সভায় মিঃ চার্চিল রাজা ষষ্ঠ জর্জের নাম হইতে 'ভারত সম্রাট' এই উপাধি বর্জিত হওয়াতে প্রচুর অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। সে অশ্রুর পাথারে ঝাঁপ দিয়া চার্চিল সাহেবের বুকে কাশ্মীরের হানাদার এবং হায়দরাবাদে সাম্প্রদায়িকতান্ধ গুণ্ডাদের জন্য দরদ উথলিয়া উঠে। বৃটিশ সাম্রাজ্যকে এলাইতে দিবেন না বলিয়া তিনি একদিন দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন; আজ এশিয়ায় সেই সাম্রাজ্য-বাদীদের শক্তি বিধ্বস্ত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া মিঃ চার্চিল ধৈর্যের বাঁধ রাখিতে পারেন নাই। অশ্রুর জলে এবং আবেগের বলে যুগপৎ অভিষিক্ত ও উদ্দীপ্ত হইয়া চার্চিল সাহেব বলেন, 'পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া ভারতের রাজনীতিক দল-গুলির হাতে ইংরেজ ক্ষমতা দিয়া আসিয়াছে। ভারতের ৪০ কোটি নরনারী এতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের আশ্রয়ে সুখে-শান্তিতে ছিল, আজ তাহাদের দুর্দশার অন্ত নাই। তাহাদের দিকে কেহই তাকায় না। ভারতের অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে বলিলেই চলে। অনির্দিষ্টকাল সেখানে অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে বলিয়াই আশংকা হয়। কাশ্মীরের বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরু যে হিংস-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা তাহা দেখিয়াছি। সেখানকার চার-পঞ্চমাংশ অধিবাসীই মুসলমান। আমরা যেসব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ভারতে ফেলিয়া আসিয়াছি, হয়ত সেই সব লইয়া নেহরুর গভর্নমেণ্ট এক কোটি ৭০ লক্ষ নরনারীর অধ্যুষিত হায়দরা-বাদের প্রাচীন রাজনীতিকে আক্রমণ করিবে এবং নিজামের শাসন বিধ্বস্ত করিবে।' মিঃ চার্চিল ভারতের স্বাধীনতার চিরশত্রু। ভারত-বর্ষকে পরাধীন এবং অবনত রাখিয়া নিঃশেষে শোষণ করাই তাঁহার সমগ্র নীতির মূলীভূত উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুত হায়-দরাবাদ ও কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতির উপর আক্রমণের সকল আবেগের গোড়ায় ভারতবর্ষের ৪০ কোটি নরনারীর রক্তের জন্য চার্চিলের দলের উৎকট এবং অন্ধ পিপাসা কাজ করিতেছে। জনগণের স্বাধীনতার যাঁহারা সমর্থক, এই দিক হইতে ইঁহারা তাঁহাদের সকলের শত্রু। এই অবস্থায় হায়দরাবাদের ব্যাপারে নিজামের এবং কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের নীতির সমর্থন করার অর্থ চার্চিল এবং তাঁহাদের অনুগতদের উদ্দেশ্যের পরিপোষকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে পথ স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং বিদেশীর দাসত্বেরই পথ। স্বাধীন ভারত এমন মনোবৃত্তি, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতাকে কোনক্রমেই মাথা তুলিতে দিতে পারে না। এ অবস্থায় আমাদের সোজা কথা এই যে, কাশ্মীর সম্পর্কে যাঁহারা পাকিস্থানী নীতির সমর্থক এবং হায়-দরাবাদের সম্বন্ধে যাঁহারা রেজভীর গুণ্ডার দলকে কোনভাবে প্রশ্রয় দিবে, ভারতে তাঁহাদের স্থান নাই। বর্তমানে এ বিষয়ে ভারত সরকার এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে সচেতন থাকিতে হইবে। বিশ্বাস-ঘাতকদিগকে উৎখাত করিতে তাঁহাদের নীতি সর্বপ্রকার দুর্বলতাবিবর্জিত হয়, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

### পূর্ব পাকিস্থানে পাকচক্র

মিঃ জিন্না সঙ্কল্পশালী পুরুষ। যিনি যত ত্রুটিই ধরুন না কেন, নিজের খুঁটি হইতে তিনি নড়িবার বান্দা নহেন। মিঃ জিন্না এক রাষ্ট্র, এক ভাষা এই নীতির আগাগোড়া সমর্থক এবং পাকিস্থানের সর্বত্র উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠা হয়, মনে-প্রাণে ইহাই তাঁহার মতলব। পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা লইয়া যে খেলা চলিতেছে, তাহার মূলে মিঃ জিন্নার সেই মতলব হাসিল করিবার জন্য কারসাজি এখনও নানা রকমে চলিতেছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। পাকিস্থানের টিকিটে, মুদ্রায় এবং নোটে বাঙলা ভাষাকে স্থান দিবার জন্য দাবী করা হইয়াছিল। খাজা নাজিমুদ্দীন এ সম্বন্ধে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাড়াতাড়ি করার জন্য প্রথম দফার টিকিট, মুদ্রা প্রভৃতিতে বাঙলাকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নাই, অতঃপর সে ত্রুটি নিরসন করা হইবে; কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় দফায় প্রচলিত টিকিট, মুদ্রা প্রভৃতিতে বাঙলা সমভাবেই বর্জন করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা কমিটি পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের এই সব কাজের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং এ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তরুণ সমাজকে আহ্বান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক সংস্কারের বেষ্টনী হইতে পাকিস্থানকে উদার আন্তর্জাতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা তথাকার তরুণদেরই আছে; সাবেক নেতার দল যে সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তাহাদের মনোবৃত্তি সাম্প্রদায়িকতার জটিল প্যাঁচের মধ্যে পড়িয়াই ঘুরপাক খাইতেছে।

# আমি টাইমটেব্‌ল পড়ি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আমি টাইম টেব্‌ল পড়ি,
জানলার ধারে ব'সে,
বাইরের দিকে তাকিয়ে
একা একা ব'সে আমি টাইম টেব্‌ল পড়ি।
কালো আঁক-কাটা পাতাগুলো
দ্রুত উলটিয়ে যাই
গাড়ির উল্টো মুখে যেমন
উর্ধশ্বাসে ছোটে
মাইল স্টোনের পাথর।

ওই জানলার ধারে ব'সেই আমার ট্রেন লম্বা পাড়ি দেয়।
ঘন ঘন নদীনালার সাঁকো,
দুদিকে ধানক্ষেত,
পচা পুকুর,
বাঁশ ঝাড়,
আম-কাঁঠাল-নিম-শিরিষের জড়ানো ছায়াতে
ধোঁয়া-ওঠা কুটীর,
বিলে শাপলা,
মাঠে কৃষাণ,
আকাশে চিল,
ধূলোর আঁচল-ওড়া পথের প্রান্তে এই মাত্র মিলিয়ে-যাওয়া
গোরুর গাড়ীর আর্তনাদ,
তন্দ্রাভাঙা কুকুরের ক্ষুধিত কণ্ঠ,
মাঝখানে ট্রেন ছুটেছে জাঙাল-বাঁধা পথে।
আমি কিন্তু জানলার ধারেই ব'সে।

ক্রমে পৃথিবীর চেহারা বদলে আসে।
নারকেলের জায়গায় তাল,
আমের জায়গায় শাল,
বিলের জায়গায় বাঁধ
চমকিত করে তার ইস্পাত-ধবল বারি,
মাটিতে ঢেউ জাগে,
ভূস্তরের নিস্তব্ধ ওঠাপড়া বিস্তারিত হ'য়ে যায়
দিগন্তের দিকে
বনচিহ্নহীন নিঃসীম দূরত্বে
কয়েকটি শীর্ণ তাল
শূন্যেতার কঙ্কাল।
হঠাৎ শাল বনের মধ্যে গাড়ী ঢুকে পড়ে।
সাঁকোর ঝঙ্কারে বাইরে তাকিয়ে দেখি
নদীর বালুশয্যায় পাথর-চুয়ানো জল,
অর্ধমগ্ন মহিষের পাল,
মনে মনে ডুব দিয়ে নিই।
পরে পরে এসে পড়ে দুটো সিগনালের খুঁটি
তারপরেই স্টেশন।

গাড়ী থামে
লোক নামে
কেউ কেউ চড়ে
কেউ কেউ বা শুধুই ছুটোছুটি ডাকাডাকি ক'রে মরে।
হুইস্‌ল বাজে,
নিশান দোলে,
গাড়ী ছেড়ে দেয়,
আবার মাঠ, আবার বন,
আমি কিন্তু জানলার ধারেই ব'সে।

হেলে-পড়া সূর্যের চক্‌চকে সঙিন
জানলা দিয়ে খোঁচা মারে
চমকে স'রে বসি
বুঝতে পারি দিন শেষ হ'য়ে আসবার মুখে।
একে একে জনপদের চিহ্ন দেখা দেয়
কল, কুঠি, ধোঁয়া, শব্দ,
কুলিদের সারিবদ্ধ ব্যারিক।
দ্রুত লাইনে লাইনে জট পাকিয়ে যায়,
আবার একটা জট খুলে তিন জোড়া লাইন বেরোয়,
কোথাও বা মালগাড়ীর শ্রেণী,
কতক খালি, কতক বোঝাই
কিন্তু সমস্ত এমন নিঃসঙ্গ যেন লোকে
ভুলেই গিয়েছে ওদের প্রসঙ্গ।
ঘন ঘন সিগনাল, এঞ্জিন, উর্দিপরা লোক।
মস্ত স্টেশন, প্রকাণ্ড জংশন,
গাড়ী এসে থামলো।
রাবণের পুরীর বারান্দার মতো টানা প্লাটফর্ম,
কত মাল, কত মালিক,
কত যাত্রী, কত দর্শক,
বিচিত্র হাঁক-ডাকের অফুরন্ত ফুলঝুরি।
আমার কিন্তু নামবার তাড়া নেই,
আমি বসে আছি সেই জানলার ধারেই।

স্টেশনের বাইরে সারিবদ্ধ শিশু গাছের ছায়ায়
সুরকি-ঢালা লাল পথ,
সেই পথের ধারে এক জায়গায়
ঝুমকো লতার ফুল-দোলানো
লাল টালির বাংলো।
সেখানে আছ তুমি
তাই সেখানে আছে আমার পৃথিবী,
তাই সেখানে আছে অনন্তকাল।
অনন্ত যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে মুষ্টিমেয় পড়ে আছে
তোমার পায়ের কা

আর এত বড় যে পৃথিবী সে তোমার মছলন্দ খানার চেয়ে
অধিকতর প্রসর নয়।
আমি দেখতে পাচ্ছি
তোমার চরণ দুখানি ঘিরে ঝালর ঝুলিয়েছে
শুভ্র শাড়ীর সবুজ পাড়;
চলনের তালে চঞ্চল,
পরণের ভঙ্গীতে কুঞ্চিত,
সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রান্ত যেন তালে তালে স্তব করে
নাচছে সুন্দরী পৃথিবীর।
আমি কি তোমাকে দেখিনি
অষ্টমী চন্দ্রের দিব্য কমণ্ডলু
যখন ঢেলে দিয়েছে তোমার শিরে শুভ্র জ্যোৎস্না!
আমি কি তোমাকে দেখিনি
গোধূলির চেলিতে অপরূপ, অপূর্ব!
আমি যে দেখেছি
কামনার কুঁড়ি-ভরা তোমার অধরোষ্ঠ!
আমি যে দেখেছি
কিশোরী পক্ষোরিনীর নিপুণ হাতে গড়া
শিবপূজার যুগল বেদী তোমার বক্ষে।
আর দেখেছি
সৃষ্টিশেষের দিগন্তের রহস্যময় তোমার দুটি নেত্র।
উমার পূর্বরাগের মতো তোমার কপোল,
শচীর দর্পণের মতো তোমার ললাট।
কিন্তু সুন্দরী
আজ সে সমস্ত হার মেনেছে
তোমার ওই চরণ দুখানির কাছে।
আজ ইচ্ছা করছে আমার হৃদয়খানাকে
প্রচণ্ড বলে আছড়ে ফেলে দিই তোমার পায়ের তলে,
তার রক্তরাশি ছিটকে পড়ুক
তোমার চরণ দুটি ঘিরে,
শনি গ্রহের মেখলার মতো
অঙ্কিত করুক এক তপ্ত রক্ত মত্ত দীপ্ত অলক্তকের বেষ্টনী।

আমার বাসনার ফুলবনের উপর দিয়ে
ওই দুটি চরণ চলে যাক,
আমার কামনার দ্রাক্ষা বন দলে যাক,
আমার কানে কানে ব'লে যাক,
'ধরা দিইনি বলেই ধরতে চাইছো,
অন্বেষণেই তো মৃগয়ার আনন্দ।
স্বর্ণমৃগী ধরা দেয় না বটে
তাইতো সেই মৃগয়া-সুখেরও অবদান নেই কোন কালে।
জানলা দিয়ে মন যায়, দেহ যায় না
তাইতো জানলা এমন মোহিনীর মন্ত্র পড়া।'
ভোগবতীর হংসমিথুনের মতো
ওই চরণ দুটি আমার কানে কানে বলুক
'জানলায় বসে যদি সুধার স্বাদ পাও
তবে দ্বারের সন্ধান ক'রোনা।'
চমকে উঠি!
আমি তো জানলাতেই ব'সে।
আমার নামবার তাড়া কিসের?
ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ুক,
আমার বাতায়নিকাকে কাড়বে এমন সাধ্য কার?
আমি জানি টাইম টেব্‌ল পড়বার আনন্দ
দেশ ভ্রমণে নেই।
তাই আমি একা একা টাইম টেব্‌ল পড়ি
জানলার ধারে ব'সে॥

# স্ফুলিঙ্গ

## সুশীলকুমার গুপ্ত

স্ফুলিঙ্গ চলেছে উড়ে দুরন্ত বাতাসে—
মহাজীবনের সব স্ফুলিঙ্গ ভয়াল :
প্রলয়ের করতালি-ছন্দে শুনি নাচে মহাকাল!

সম্ভাবনা-ঝড় বয় পৃথিবীর মনে।
প্রতি শুষ্ক-সর্বহারা কঙ্কাল-ইন্ধনে
মানুষের প্রতি দীর্ঘশ্বাসে
স্ফুলিঙ্গরা বেড়ে ওঠে দারুণ আশ্বাসে :
জন্ম দেয় মহাদাবানল,
ভস্ম করে পরগাছা-আবর্জনা, কাঁটার জঙ্গল :
ধোঁয়ার খোলস ছেড়ে কোন এক ঝড়ের প্রহরে
আকাশ-পৃথিবী-গ্রাসে অতিকায় ফণা তুলে ধরে।
অস্থির স্ফুলিঙ্গ ছোটে শিখা হ'তে অপর শিখায়,
ঘুণধরা মেরুদণ্ডে চেতনার চাবুক হাঁকায় :
দিকে দিকে বুনে চলে আগুনের জাল,
শান্ত গৃহদীপ ক্রমে হ'য়ে ওঠে প্রলয়-মশাল :
অত্যাচারী সম্রাটের স্বর্ণলঙ্কাধামে
অগ্নিকাণ্ড ঘটাবারে নামে।

মুঠো-মুঠো এ স্ফুলিঙ্গ যারা সব কুড়ায় ছড়ায়
মৌসুমী ঝড়ের স্রোতে মাঠে-ঘাটে পাড়ায়-পাড়ায়—
ব্যর্থ ক'রে শাসনের সঙ্গিন-পাহারা,
ভেঙে বজ্র-ব্যূহ-রক্ষী কারা,—
দৃঢ় কণ্ঠে তারা যায় বলে—
সুনিশ্চিত কালান্তর, শোষণের দিন গেল চলে :
ভাবী পৃথ্বী গড়ে দেবে আমাদের মশাল-আঙুল,
গলে যাবে তার স্পর্শে সভ্যতার মোমের পুতুল :
কোন নব দিগন্ত-বোঁটায়
ফোটাবে উজ্জ্বল সূর্য-ফুল এক রক্তিম উষায়।

আমি তাই দিন যাপি আশা-রুদ্ধশ্বাসে,
নব পদধ্বনি শুনি হৃদপিণ্ড-তালে,
স্বপ্ন দেখি—পৃথ্বী ব্যাপ্ত প্রজ্বলন্ত মশালে-মশালে।

আমরা আমাদের নবাগত প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে স্বাগতম্ জানাইতেছি। প্রদেশপালের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"The duty of a Governor is that of a humble individual who meets lowliest, humblest citizens and tries to share their joys and sorrows".

তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর এই সদিচ্ছা প্রকাশে কৃতজ্ঞ হইয়া অভাজনদের পক্ষ হইতে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিতেছি—অভাজনদের সংগে আর যেখানে হউক মেলামেশা করুন অন্ততঃ অফিসের বেলায় তাদের সংগে ট্রামে-বাসে মেলা-মেশার সখ যেন তাঁর না হয়।

* * * * *

প্রদেশপালের ক্ষমতা প্রসংগে তিনি বলিয়াছেন—তাঁর চাকুরী দেওয়ার কোন অধিকার নাই, চাকুরীর জন্য কাহাকেও সুপারিশ করার ক্ষমতা নাই, দৈনন্দিন সরকারী কাজে হস্তক্ষেপ করার শক্তি তাঁর হাতে নাই। "প্রদেশপাল-প্রাসাদের আনাচে-কানাচে ঘোরা ফেরার জন্য যাঁরা কসরং কচ্ছেন তাঁরা এই কথাগুলো মনে রাখলে উপকৃত হবেন"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

সরকারী চিঠিপত্রে এখন আর I have the honour to be Sir, your most obedient servant—চলিবে না, তার বদলে চলিবে Yours faithfully. বিশু খুড়ো খুশি হইয়া বলিলেন,—"বিশ্বাসের প্রয়োজনটাই এখন সব-চেয়ে বড়, Servant দিয়ে যে এ কাজ হয় না তা আমাদের নগরপালের অপরাধের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে।"

* * * * *

রাজাজী বাঙলা ত্যাগের প্রাক্কালে—বাঙালীকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"Keep your hearts sweet and pure so that God may dwell therein".

কথাটা শুনিয়া বিশু খুড়ো বলিলেন—"ভগবানের বাড়ী-সমস্যা আছে কি না জানিনে, আপাততঃ আমাদের—dwelling placeএর হদিস দিয়ে গেলে রাজাজী আমাদের অনেক-খানি উপকার করতেন।"

* * * * *

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারত ত্যাগের সময় বলিয়া গিয়াছেন—

"India has a great history ahead".

কিন্তু ভারতের Geographyটা কিরূপ হইবে সে কথা শুনিলে অনেকখানি স্বস্তি বোধ করিতাম।

* * * * *

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সংগে—একযোগে কাজ করার কথা উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছেন—

"We have been actors in the historic scenes".

এ কথাতেও খুড়ো বলিলেন—"Actingটা বড় কথা নয়, একাজ এর আগে অনেকেই করে গেছেন, তবে আগে actingএর সময় সীনের

আড়ালে Prompter থাকতো, এবারে তা ছিল না"।

* * * * *

কেন্দ্রীয় সরকার চিনি রপ্তানি বিনিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। শ্যামলাল শূন্য চিনির ঝোলাটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল,—"অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।"

* * * * *

আইরিশ নেতা মিঃ ডি ভ্যালেরা বলিয়াছেন—

"We share common joy in the successes achieved and a common determination that the freedom which has been gained will be dedicated to the welfare of the whole people".

"তাঁর শেষের কথাটার সংগে অনেকেই একমত হবেন না, ওখানেই আয়ার্ল্যাণ্ডের সংগে ভারতের নীতিগত প্রভেদ"—বলেন খুড়ো।

* * * * *

একটি সংবাদে শুনলাম, সোভি[illegible] রাশ্যা নাকি অলিম্পিক প্রতিযোগি[illegible] যোগদান করে নাই। "সেখানে হয়ত এর [illegible] বড় অলিম্পিক প্রতিযোগিতার তোড়[illegible] চলছে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * * * *

কলিকাতার খেলার মাঠের কথা [illegible] খুড়ো কেন বলিতেছেন না সেই [illegible] করিলে খুড়ো অতি সংগোপনে ব্যাণ্ডেজ [illegible] একখানা পা দেখাইয়া দিয়া—ট্রামের [illegible] ওদিক তাকাইলেন এবং পরে অংগুলি স[illegible] করিয়া চুপ হইয়া গেলেন। শ্যাম [illegible] হয়ত বুঝিল না, বলিয়া উঠিল—"এখন [illegible] খেলা-ধুলার খেলা আর নেই, আছে [illegible] ধুলা।" চারিদিক হইতে অস্পষ্ট গুঞ্জন উ[illegible] কিন্তু ততক্ষণে ট্রাম ডালহৌসী [illegible] পৌঁছিয়া গিয়াছে।

* * * * *

পাকিস্তানের অন্য একটি খবরের শি[illegible] নামা—

"Malaria,—East Bengal's enemy No. [illegible]

বিশুখুড়ো বলিলেন—"অথচ জিন্না সা[illegible] এবং লীগের চাঁইরা কিন্তু এই শত্রু দপ[illegible] বরাবর অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে এসেছেন!"

* * * * *

পূর্ব পাকিস্তানের পরিষদে—লীগ [illegible] কংগ্রেসদল একযোগে সরকারী খ[illegible] নীতির নিন্দা করিয়াছেন। পেট কখনই ভা[illegible]

ভাগ মানে না, দুই রাষ্ট্রের থিওরি এক[illegible] এখানেই অচল।

# বিজ্ঞানের কথা

# চিকিৎসায় রেডিয়াম

অমরেন্দ্রকুমার সেন

[কো]নো এক শহরে কোন এক ব্যক্তির দেহের মধ্যে বিষাক্ত টিউমার হয়েছিল। তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। হাসপাতালে তার টিউমার সেরে যায় ও সে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বিদায় নেবার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককে তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায় এবং অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। চিকিৎসক মহাশয় কিন্তু তার স্তুতিপূর্ণ [illegible] উক্তিতে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, বললেন "সত্য কথা বলতে কি আমি কিছু করিনি, বরঞ্চ" বলতে বলতে তিনি [illegible] ধাতুর ছোট্ট পাত্র দেখাতে দেখাতে বললেন, "পাত্রের মধ্যে যা আছে তাই আপনার প্রাণ রক্ষা করেছে, আমি কেবলমাত্র আপনার দেহে প্রয়োগ করেছি। বাস্তবিক আমি কতদিন [illegible] রেডিয়াম না হয়ে

পিয়ার কুরি ও মেরি কুরি

[illegible] হল না কেন? মাদাম কুরি ও [illegible] এটি আবিষ্কার করেছেন বলে [illegible] নামানুসারে নয়, এর আরোগ্য করবার [illegible] বলে। [illegible] আছে [illegible] একমাত্র রেডিয়ামই সারাতে পারে। [illegible] কোনো ওষুধই আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত [illegible]।

চিকিৎসক মহাশয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নি। আজকাল বহু নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, কেউ কিন্তু আজ পর্যন্ত রেডিয়ামকে অতিক্রম করতে পারেনি, বরঞ্চ [illegible] কার্যকারিতা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আশ্চর্যজনক সালফা পর্যায়ের ওষুধগুলি পেনিসিলিন অথবা অপর কোনো ওষুধ ব্যবহারে অনেক অসুখ আশ্চর্যজনকভাবে সেরে যাচ্ছে, কিন্তু আবার অনেক রোগী এই ওষুধগুলির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ শক্তি যেন অর্জন করছেন, যার জন্য দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে হলে এই সব ওষুধগুলিতে তার কোনো কাজ হচ্ছে না। রেডিয়াম ব্যবহারে কিন্তু এ রকম কোনো আশঙ্কা নেই।

এক আউন্স খাঁটি রেডিয়ামের বর্তমান দর প্রায় এক কোটি ছয় লক্ষ আশী হাজার টাকা। আজ যদি ঐ দর দিয়ে রেডিয়াম কেনা যায়, তা হলে তার অর্ধেক শক্তি কমতে লাগবে ১৬৮০ বৎসর, ৩৩৬০ বৎসর পরেও তার সিকি শক্তি থাকবে এবং যখন ৫০৪০ বৎসর পরে তার দুই অনা রকম শক্তি থাকবে তখনও কিন্তু তাকে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা চলবে। তাহলে কি আশ্চর্য শক্তি রেডিয়ামের মধ্যে নিহিত আছে, কিন্তু এত শক্তিশালী হলেও মানুষের সুকৌশলী হাতের কাছে সে পোষ মেনেছে এবং দক্ষ চিকিৎসকগণ এমনভাবে রেডিয়াম প্রয়োগ করতে পারেন যে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না।

যে কোনো হাসপাতালের পক্ষে মাত্র অর্ধ গ্রাম রেডিয়ামই যথেষ্ট, তাকে আবার বহু অংশে এমন কি পঞ্চাশ থেকে শতাংশে ভাগ করে হাসপাতালের বিভিন্ন অংশে ব্যবহার করা যায়। বহু হাসপাতালে খাঁটি রেডিয়ামও থাকে না, কিন্তু যা থাকে চিকিৎসার জন্য তাই যথেষ্ট। রেডিয়াম সাধারণতঃ প্লাটিনাম, সোনা অথবা মোনেল নামক প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম [illegible] ধাতুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে রক্ষিত হয়। পাত্রগুলির আকৃতি অথবা তাদের ব্যবহার অনুযায়ী তাদের বলা হয় নিডল, টিউব, প্লাক অথবা "বম্ব"।

ঠিক সময়ে প্রয়োগ করতে পারলে রেডিয়াম অনেক প্রকারের ক্যানসার সম্পূর্ণ সারিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া জরুল ও আঁচিল ইত্যাদিতে রেডিয়াম রশ্মি প্রয়োগ উপকারী। বালকদের থাইমাস গ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়া মানে অবস্থা বিপজ্জনক অথবা বড়দের থাইরয়েড গ্রন্থির গোলযোগের জন্যও নানা অসুখ হতে পারে; এই সব ক্ষেত্রে এবং পিটুইটারী গ্রন্থির ক্রিয়া বাড়াতে হলে রেডিয়াম প্রয়োগ প্রয়োজন। স্ত্রীলোকদের রজোনিবৃত্তির সময় যে অসুস্থতা হয় তার বৈষম্য কমাবার জন্যও রেডিয়াম রশ্মি প্রয়োগ করা হয়, বলা বাহুল্য যে, সব কটি ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায়। প্রথম যুগে অনেক বৈজ্ঞানিকই রেডিয়াম নিয়ে গবেষণা করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে না জানার জন্য। সে সব শহীদগণ আমাদের নমস্য, পরবর্তীদের জন্য পথ তাঁরা সুগম করে গেছেন। আজ আর রেডিয়াম ব্যবহার কোনোই বিপদ নেই।

কুইনিনের ওপর যেমন ওলন্দাজদের একচেটিয়া অধিকার ছিল সেই রকম বেলজিয়াম সরকারের ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রেডিয়ামের ওপর একচেটিয়া অধিকার ছিল। কুরি দম্পতি প্রথম যে রেডিয়াম প্রস্তুত করেছিলেন, তার কাঁচা মাল, পীচব্লেণ্ড তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে। আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গোতে তারপর পাওয়া গেল পীচব্লেণ্ড, ওলন্দাজ সরকার নিজের ইচ্ছানুযায়ী দরে রেডিয়াম বিক্রয় করতে লাগলেন। তাঁরা বৎসরে ষাট গ্রাম রেডিয়াম নিষ্কাশিত করতেন এবং প্রায় দু' লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকায় এক গ্রাম রেডিয়াম বিক্রয় করতেন। এক আউন্সের দাম নিতেন প্রায় ছয় কোটি টাকা। ১৯৩০ সালে একজন ক্যানাডাবাসী খনির মালিক রূপোর সন্ধানে গ্রেট বিয়ার হ্রদের উপকূলে প্রায় উত্তর মেরুবৃত্তের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত
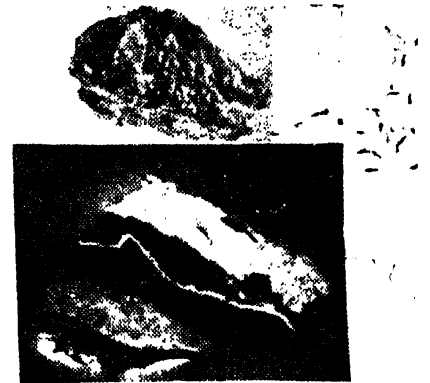
দিনে ও রাত্রে গৃহীত পীচ্‌—ব্লেণ্ডের ছবি

হলেন। ভদ্রলোকের নাম গিলবার্ট লা-বাইন। রূপোর সন্ধান অবশ্য তিনি পেলেন প্রচুর পরিমাণে, সেই সঙ্গে আরও একটি জিনিস পেলেন, তা হল পীচব্লেণ্ড। এই পীচব্লেণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে রেডিয়ামের দর কমে গেল। পীচব্লেণ্ডের এই নতুন ভাণ্ডার ক্যানাডা সরকারের পরিচালনাধীনে চলে এল। এইখান থেকে ইউরেনিয়ামও পাওয়া যায়।

খাঁটি রেডিয়াম প্রায় রূপোর মতো সাদা, সর্বদা তাপ ও তিনটি অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করে। এই তিনটি অদৃশ্য রশ্মির নাম গ্রীক বর্ণমালা অনুযায়ী আলফা বিটা ও গামা। এই তিনটি রশ্মিকে একমাত্র সীসে ও জল, সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় অনেক পরিমাণেই বোধ করতে পারে। পীচব্লেণ্ড থেকে রেডিয়াম নিষ্কাশন করতে বহু কাঠ খড় পোড়াতে হয়। দশ টন পীচব্লেণ্ড সেই সঙ্গে কুড়ি টন রসায়ন

আর সেই পরিমাণ জল খরচ করলে তবে এক গ্রাম মাত্র রেডিয়াম পাওয়া যায়, সময়ও লাগে অনেকদিন। তবে কেন রেডিয়ামের দাম এত বেশী হবে না?

এত মূল্যবান সম্পত্তি কিন্তু অনেক সময় ল্যাবরেটরীতে যেন অবহেলায় এক পাশে পড়ে থাকে, কারণ রেডিয়াম চুরির ভয় নেই। বাস্তবিক রেডিয়াম চুরি করে বিক্রয় করাই ত মুশকিল আর চোর তা ব্যবহার করবেই বা কি করে? তাছাড়া চুরি করে পালানও মুশকিল। একটি যন্ত্র আছে, যার নাম গাইগার মূলার কাউণ্টার। এই যন্ত্রে রেডিয়ামের উপস্থিতি বহু দূরেও ধরা পড়ে। আজকাল এই যন্ত্রের খুব উন্নতি হয়েছে। কার্যকারিতা প্রায় নিখুঁত হয়েছে। মাটির ভেতরে কোথাও ইউরেনিয়াম অথবা রেডিয়াম আছে কিনা এই যন্ত্র সাহায্যে জানা যায়। কিছুদিন হ'ল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে একটি পীচব্লেণ্ডের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার উপস্থিতি ধরা পড়েছে এই যন্ত্রের সাহায্যে।
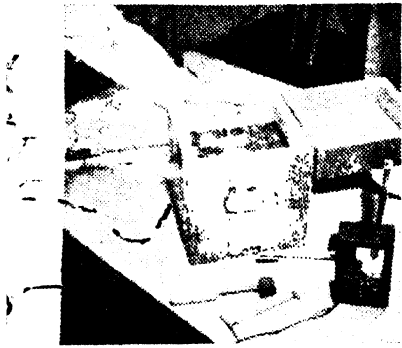
রেডিও স্টোপ বিশেষ যত্ন করে পাঠাতে হয়

চিকিৎসা জগৎ ছেড়ে কিছুদিন থেকে রেডিয়াম শিল্প জগতে প্রবেশ করেছে। যে সব কারখানায় দাহ্য পদার্থ প্রস্তুত হয় যেমন কাগজ, সূতী বস্ত্র, সেলুলয়েড অথবা প্লাস্টিক, সেই সব কারখানায় বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ থেকে অনেক সময়ে অগ্নিকাণ্ড হয়, কিন্তু রেডিয়ামের জ্ঞাতি ভাই পলোনিয়াম দ্বারা এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যে, সেটি সকলের অজ্ঞাতে অগ্নি নির্বাপকের কাজ করে। কোনো ভারী ধাতুর ওপর খুব পাতলা সোনার পাত লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এই সোনার পাতের ওপর কোনো কৌশলে পলোনিয়াম লাগিয়ে দেওয়া হয়। পলোনিয়াম থেকে যে অদৃশ্য আলফা রশ্মি বিকিরিত হয় তা আবার ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত। অতিরিক্ত নগন কোনো ঋণাত্মক তড়িৎ ছাড়া পেলেই এই আলফা রশ্মির ধনাত্মক তড়িৎ তাকে নষ্ট করে অগ্নিকাণ্ডের বিপদ কমিয়ে দেয়। এই ব্যবস্থা একবার লাগাতেই যা খরচ তারপর তা অন্তত ... বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত।

রেডিয়াম থেকে শক্তিশালী অদৃশ্য গ্যামা রশ্মি নির্গত হয়। তাকে কেউ রোধ করতে পারে না। একমাত্র কুড়ি ইঞ্চির অধিক পুরু সীসের তবক তাকে আটকাতে পারে। এই রশ্মিকেও কারখানায় কাজে লাগানো হচ্ছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেডিওগ্রাফি বলে এক নতুন বিজ্ঞানই গড়ে উঠেছে। কোন্ ধাতু কতখানি জোর কি অবস্থায় সহ্য করতে পারবে তা গ্যামা রশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া যায়। এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেডিওগ্রাফির দ্রুত উন্নতি সাধিত হয় গত যুদ্ধের সময়। ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও শেল ইত্যাদির ধাতব অংশ কতখানি ধকল সহ্য করতে পারবে তা এই রেডিওগ্রাফি অথবা গ্যামা রশ্মি প্রয়োগে জেনে নেওয়া হ'ত।

রেডিয়াম যে অত্যন্ত দুর্মূল্য পদার্থ তা আগেই বলা হয়েছে। অনেক হাসপাতাল অর্থাভাবে খুব সামান্য রেডিয়ামও কিনতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণ এই অসুবিধা দূর করবার জন্য আজকাল "কৃত্রিম রেডিয়াম" প্রস্তুত করেছেন, যাদের বলা হয় রেডিওস্টোপ। রেডিও অ্যাক্টিভ ও আইসোটোপ এই দু'টি কথা থেকে রেডিওস্টোপ কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। রেডিয়াম আপনা থেকে অদৃশ্য কিরণ বিকিরণ করে যার জন্য অন্ধকারেও রেডিয়াম জ্বলে। এই গুণেরই নাম হ'ল রেডিও অ্যাক্টিভিটি অথবা স্বতঃদীপ্তি। অনেক মৌলিক পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে আজকাল স্বতঃদীপ্ত করা যাচ্ছে। অনেক মৌলিক পদার্থ আছে যাদের একাধিক পরমাণবিক ওজনের পাওয়া যায়, যেমন ইউরেনিয়াম। একাধিক পরমাণবিক ওজনের হলেও এদের গুণ কিন্তু এক। তাই এদের পরস্পরকে বলা হয় পরস্পরের আইসোটোপ। যেমন ইউরেনিয়ামের তিনটি পরমাণবিক ওজন হ'ল ২৩৩, ২৩৪ ও ২৩৫। ২৩৩ হ'ল ২৩৪ অথবা ২৩৫এর আইসোটোপ। এই রকম অপর কোনো মৌলিক পদার্থ যথা আয়োডিন, ফসফরাস অথবা ম্যাঙ্গানিজের আইসোটোপদের কৃত্রিম উপায়ে স্বতঃদীপ্ত করা হচ্ছে। এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে রেডিও স্টোপ। রেডিয়ামের কাছ থেকে রোগ সারাবার জন্য যে কাজ পাওয়া যায় সেই কাজ এই সব রেডিওস্টোপদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়।

পরমাণু বিভাজন ও তা থেকে নির্গত শক্তি কি করে কাজে লাগানো যায় তার জন্য গবেষণা করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকরীজ নামক স্থানে একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এই ওকরীজে রেডিওস্টোপ তৈরী হচ্ছে। এই কারখানার পরিচালকগণ রেডিওস্টোপের যে দরসমেত তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাতে ষাটটি মৌলিক পদার্থের নব্বইটি রেডিওস্টোপের নাম পাওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ ৩০টি রেডিওস্টোপ প্রস্তুত করেন। ওকরীজের এই কারখানা থেকে পৃথিবীর নানাস্থানে রেডিওস্টোপ চালান যায়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাদাম কুরিকে দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'ল। তাঁর স্বামী পিয়ার কুড়ি তার পাঁচ বৎসর আগে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। মাদাম কুরি একা নিজ সন্তানদের মুখ চেয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। এই সময় নোবেল পুরস্কারের সম্মান ও ... হাতে আসাতে তিনি আবার যেন পুরাতন ... গুলি ফিরে পেলেন। রেডিয়ামের ... আরোগ্যমূলক গুণ আছে তার আরও ... হওয়া প্রয়োজন। কিছুকাল পরেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে উঠল। ... কার্যের জন্য মাদাম কুরি স্বয়ং কয়েকটি ... সাহায্য কেন্দ্র গঠিত করেন এবং নিজে ... তদারক করতে আরম্ভ করেন। ... মাদাম কুরি দয়াময়ীরূপে ফ্রান্সের এক ... থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আহতদের ... জন্য ভ্রমণ করেন, ক্লান্তি, অবসাদ, ... ও বিপদ তুচ্ছ করে। এক্স-রে ... সৈন্যরা ভয় পায়। "কোনোই ভয় নেই ...

রেডিও-অ্যাক্টিভ আয়োডিন

সমবেদনার সুরে তিনি উত্তর দেন। ... হাতের ছবি তুলে নেওয়া হবে, তুমি ... পারবে না"

তারপর যুদ্ধও একদিন শেষ হয় ... বিদেশ থেকে আরও কত সম্মান, ... কত পদক মাদাম কুরির কাছে আসে ... এ সব তো তিনি চান না, তিনি ... অনেকদিন ধরে সামান্য জ্বর হয়, ... করেন না, কিন্তু একদিন তাকে ... করতে হ'ল, পরদিন আর শয্যা ত্যাগ ... পারলেন না। রোগের লক্ষণ ... মনে হয় তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা, টিউবারকিউলোসিস অথবা রক্তহীনতা হয়েছে, কিন্তু ... কোনো রোগটিই তাঁর হয়নি। তাঁর মৃত্যুর ... জানা গেল রেডিয়াম বিষে (রেডিয়াম ...) তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শরীরের অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি রেডিয়াম থেকে নির্গত অদৃশ্য ... দ্বারা ক্রমশঃ দুর্বল হতে দুর্বলতর ... বিকল হয়ে গেছে।

স্বার্থহীন মাদাম কুরি বিজ্ঞানের ... শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন।

# প্রতিশোধ

শ্রী ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

সারা রাত্রি অস্থিরভাবে ঘোরাফেরা করে দীনু। ঘুম আসেনা চোখে, সারা [illegible] ছটফট করে, এপাশ ওপাশ করে চোখের [illegible]। মাথার ভেতর যত সব চিন্তা [illegible] দৌড়াদৌড়ি করে। পাগলার মত দীনু সারা বাড়ী পায়চারি করে [illegible] মধ্যে মধ্যে আবোল-তাবোল বকে। [illegible] কোন সময় হাসে আবার কখনও কখনও [illegible]। সমস্ত সময় দীনু এই ঘরের [illegible] আগুন নিয়ে দাউ দাউ করে পুড়িয়ে [illegible] দীনু চায় না।

[illegible] রাত্রে দীনু একটা [illegible] সারা বাড়ীটা ঘুরে দেখে [illegible] চারিদিক। একদিন এই বাড়ীতেই [illegible] কুকুরের মত [illegible] দিয়েছে।

[illegible] আর একটা বৌ নিয়ে এসে [illegible] এই বাড়ীতেই দরজায়, [illegible] এতোটুকু [illegible] উঠত সে।

এই আলো নিভিয়ে!

—কেমন করে মারো বাবা, এই দ্যাখো [illegible] পায়ের ঘা দেখিয়েছে দীনু।

—হি হি হি করে হাসি [illegible] করে লাঠির খোঁচা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। [illegible] ভয়ে তাড়াতাড়ি সরতে গিয়ে বেশী [illegible] আরো জোরে কেঁদে উঠেছে সময় সময়। [illegible] সে সময় এবাড়ীর কারও এতটুকু দয়া [illegible]।

আরে বুড্ঢা, কেয়া দেখতা হায়

লাঠিটা গিয়ে সোজা ঘায়ে আঘাত করেছে। [illegible] যন্ত্রণায় বুড়ী অজ্ঞান দীনু তাড়াতাড়ি [illegible] ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে মাথাটায় জড়িয়ে [illegible] পুঁজ আর রসে ময়লা ন্যাকড়াটাই [illegible] উঠেছে। তারপর বুড়ীকে কাঁধে নিয়ে [illegible] গিয়েছে অন্য দুয়োরে—

দীনু হাঁপায়। শ্বাস ওঠা রোগীর মত হাঁপায়। ইচ্ছা হয় এই রোগ সে এবাড়ীর প্রত্যেকটী লোকের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। বাইরে এত আলো এত বাতাস অথচ দীনুর শ্বাস নেওয়ায় এত বাধা। যেন সব বাতাস পৃথিবী থেকে ফুরিয়ে গিয়েছে। শুধু ফুরিয়ে যায়নি তার মনের প্রতিহিংসা; ঘায়ের ওপরে লাঠির খোঁচায় মায়ের যন্ত্রণাকাতর মুখ; ফুলে ওঠা কলাগাছের মতো পোয়াতী বৌ-এর দেহ; হাত কিলবিল করা দশ বছরের লোম ওঠা কুকুরের মতো মেয়ে। এরা সবাই মরেছে। আশীর্বাদ করে মরেছে। তাদের রোগ যা সব [illegible] গিয়েছে তারা; শুধু বলে গিয়েছে, [illegible] দীনু তের মাকে এরা না খেতে দিয়ে মেরেছে দগদগে ঘায়ের ওপরে এরা লাঠি চালিয়েছে, ভাল স্বাস্থ্যবতী বৌটাকে ভাত দেওয়ার নাম করে তার সতীত্ব নষ্ট করেছে; দশ বছরের মেয়েটাকে রাস্তা থেকে [illegible] লোক ডেকে এনে জ্যান্ত অবস্থাতেই ময়লা ফেলার মত গাড়ীতে তুলে কোন সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে।

দীনুর চোখ দুটো জ্বলে যায় আগুনের মত। যে মায়ের জন্যে পৃথিবীর এই আলো, এই আনন্দ চোখে পড়েছে সেই মাকে পিঠে নিয়ে নিয়ে সে দুয়োরে দুয়োরে ঘুরেছে দুমুঠো ভাতের জন্যে। সে ভাত সে তার শরীরকে বাঁচিয়ে [illegible] বাড়ীর হওয়ার পর। কোন কথা মনে হয়নি মনে হয়নি যে শুধু যে ভাত খাচ্ছে একমুঠো [illegible] জন্যে সেই ভাত আবার মানুষ পায় না। দীনু আবার উঠে দাঁড়ায়। সারা শরীরে তার রক্তের বান ডাকে। মনে হয় এই তো সময়—একবার নিতে হবে তার প্রতিশোধ।

মাথার ধারের জানালা খুলে দিয়ে বাবু এখন ঘুমুচ্ছে। বাইরে বর্ষণমুখর রাত। নারকেল গাছটার মাথার লম্বা লম্বা পাতা থেকে ঘুম-পাড়ানী গান গেয়ে টুপটাপ করে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে। এই হাওয়ায় বেশ আরামে ঘুমিয়েছে সব। সারা সহরটাই অসহায় ছোট্ট নতুন বৌ-এর মত একপাশে গুটিয়ে সুটিয়ে শুয়ে অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছে। সারা বাড়ীর ভার এখন দীনুর ওপরে। এইতো অবসর—!

দীনু দরজা ঠেলে আস্তে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। গিন্নিমার অন্য আর যাই ভুল হোক এ ভুল হয় না। দরজা বন্ধ করে শুতে অভ্যাস তাঁর। দীনু মালকোঁচা দিয়ে কাপড়টা বাগিয়ে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে আলসের ধার দিয়ে গিয়ে জানালার গরাদ ধরে। যে করেই হোক ভেতরে যেতে হবে। ওদের মনে নেই হয়ত চিনতে পারেনি। এই বাড়ীর দরজা থেকে যাকে তাড়িয়েছে আজ তাকেই বিশ্বাস করে বাড়ীর চাকর রেখেছে। আজ আর আকাল নেই, তাই আজ ঠাঁই পেয়েছে নইলে পেত না। যখন প্রয়োজন নেই তখন মানুষকে ওরা আশ্রয় দেয়। যখন ঘর বাঁধতে ইচ্ছা হয় যখন পড়ে যাওয়া ঘর আবার নূতন করে গড়ে তুলবার সময় আসে, তখন এরা দীনুকে আটকে রেখেছে, বলেছে খাবি আর শুবি এখানে আর পাঁচ টাকা করে মাইনে পাবি। কত দয়া, আর সেদিনে!

জানালার গরাদে হাত দিয়ে দিয়ে দেখে দীনু বড় মজবুত গরাদ। এর চেয়ে আলমারীর কাছে দেয়ালটা অনেক সরু, সহজে ভাঙা যাবে। দীনু সাবল নিয়ে যায়।

ইট খসেছে। একখানা দুখানা করে ইট খসছে। শাবলের শব্দে ভিত শুদ্ধ কাঁপছে এইবারে হয়ত ভেঙে পড়বে। শোষণের বাহুল্যে চরের ভিত এবারে কাঁপছে। শব্দে হয়ত ওদের ঘুম ভেঙে যাবে—চিরদিন যাদের পায়ের নীচে রেখেছে তাদের শব্দে ঘুম ভাঙবে। ইট খসেছে যেখান দিয়ে একটা মানুষ অনায়াসে যেতে পারে। দীনু ঢুকে পড়ে ঘরে—। সারা ঘর অন্ধকার। দিয়াশলাই জ্বালিয়ে দীনু দেখে নেয়, কর্তাগিন্নী জড়াজড়ি করে শুয়ে। যেন অনন্তকাল ধরে এই রকম সুখেই তারা শোবে। এ সুখেতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। অথচ এইরকম সুখে একদিন তারাও থাকতো। শুধু তারাই নয় কত শত লোক, কত চাষী মজুর। যারা সারা দিনভোর বোঝা বয় আর মাটী কাটে তাদের এই হাড়ভাঙা খাটুনীর পরের সুখটাকে এরা নষ্ট করেছে। কত ঘর, কত আশা, কত মানুষকে এরা জ্যান্ত কবর দিয়েছে। নিজেদের সামান্য একটু মাথা ধরায় ডাক্তার ডাকায়, অথচ ৫০ লক্ষ লোক খাবার অভাবে, ওষুধের অভাবে পোকামাকড়ের মধ্যে বেওয়ারিশ মরেছে যেন এদের মরণটাই স্বাভাবিক। মরলো-ত মরবেই। কেউ তাদের জন্যে এতটুকু কাঁদলো না, আপশোষ করলো না। কাঁদবার কি কেউ ছিলো—ওরা কাঁদবে ওদের তিন মাসের ছেলে মরে গেলে। তার ফটো রাখবে, সারাজীবন ধরে সেই ফটোকে দেখে চোখের জল ফেলবে যেন কত কষ্ট করে মানুষ করতে হয়েছে। অথচ এই সব মানুষ কত কষ্ট, কত আগ্রহ করে বেঁচে শেষে শেয়াল কুকুরের পেট ভরাতে মরলো তার হিসেব কে রাখে?

দীনুর মনে হয় মার কথা—ঃ

এক মুঠো ভাত দেনা বাবা এনে মহা-প্রাণীটা খাঁ খাঁ করছে—ও বাপ দীনু—

কোথায় পাব বল—

দেখ বাবা দেখ, ঐ যে বড় বাড়ীটা ওখানে একবার যা—বল মা খাবে—ওদেরও তো মা আছে, শুধু দুটোখানি ভাত—আর কোনদিন চাবনা, আর কোনদিনই চাব না—

মায়ের হাঁপানি যেন দীনু আজো শুনতে পায়। পায়ে পায়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে দীনু বাড়ীর মধ্যে, হেই-মা তোমার পায়ে পড়ি—দুটোখানি এ'টোকাটা ভাত দাও মা খাবে—আমার মা, হয়ত মরে যাবে এখুনই—গিন্নীমার পা চেপে ধরে কে'দে ওঠে।

আরে মলো, কোথাকার কে, জাতের ঠিক নেই—ছু'য়ে দিলো এখন আবার চান করতে হবে। বলি রামলগন—

জি—

তুমি কেন একে ঢুকতে দিলে—

আমিতো দেয়নি মাজী—

তুমি দরজা খুলে রেখেছো কেন? ওই ময়লা হাত দিয়ে আমার এই ফরসা কাপড়টা এখুনই পরলাম আর এটা ময়লা করে দিলো। যত মরা আসে এখানে, দেখছো কি? বের করে দাও গলায় হাত দিয়ে—কি জাত না কি জাত—

ভালো জাত মা—চাষা আমরা—

চাষা, যত সব জানোয়ার—

মা আমরাও মানুষ আজ পেটের দায়ে—

ততক্ষণে দারোয়ান গলায় হাত দিয়ে বের করে দিতে যাচ্ছে। ওদিকে বাঁধা বুল-ডগটা ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার করছে। সবু গলার চীৎকারে সারা বাড়ী ফেটে যাচ্ছে। কুকুরের সামনে ডিসে ভরা ভাত—ঝোল মাখা ভাত আর মাংস—দীনু মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে একমুঠো ভাত কুকুরের ডিস থেকে তুলে নিয়েছে কুকুরটাও সংগে সংগে ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে কামড়ে ধরেছে দীনুর হাত।

উঃ, অসহ্য! সারা শরীর কাঁপছে দীনুর। মা তার বাঁচেনি। কুকুরের কামড় আর দারোয়ানের লাঠি খেয়ে যখন ঝোল মাখা এক মুঠো ভাত নিয়ে গিয়েছে তখন মা তার খাবি খাচ্ছে। একটু জল দেওয়ার বদলে ভাতগুলো গ'ুজে দিয়েছে দীনু—একটা ভাতও গলা দিয়ে নামেনি।

সারা শরীরে দীনুর পোকায় কামড়ায়। আজ কত দয়া গিন্নীমার। অথচ সেদিন কি ক্ষিদে নিয়েই তার মা মরেছে—এই গিন্নীমার জন্যেই মরেছে মা—।

দীনু এগিয়ে গেল। হাত দুটো বাড়িয়েছে গলা টিপে মারবে। হঠাৎ যেন কোথায় শব্দ হোলো যেন কে বলছে : দীনু মারিসনে—ওতো, একজনের মা—মা হ'য়ে কি কোন মায়ের দুঃখু দেখতে পারি? মারিসনে—

দীনু চমকে উঠেছে—কে? কে কথা বলছে মা—

যারা আমাকে খেতে না দিয়ে মেরেছে তাদের একজনকে মারলে কি পাপ যায়—ওরা যে অনেক। অনেককে না মারতে পারলে হবে না—তা ছাড়া ওযে মা—দীনুর মুখেও জবাব এসেছে কিন্তু ওরাতো তোমার কথা ভাবেনি—তুমিওতো মা ছিলে তা ওরা তো সেকথা শুনে তোমার জন্যে একমুঠো ভাত দেয়নি—

তা না দিক—তবু সেওতো মা—তুই যেমন কে'দেছিস আমায় হারিয়ে, তেমনি উনি গেলেও যে কাঁদবে ও'র ছেলেমেয়ে—

দীনু মাথাটা ঝাড়া দিয়ে দেখেছে। কই কেউ তো নেই বাইরে শুধু বৃষ্টি ঝড়ছে। কোথায় মানুষ? ঘড়িটা শুধু টক্-টক্ শব্দ করে চলেছে—

আবার শব্দ আসে কানে, বৌ-এর গলা।

দীনু কেমন যেন অবাক হয়ে যায়! কই কেউ তো নেই—! তবে?

একটু জল—

কিসে করে আনবো পাত্তর যে নেই—

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলো বউ—একটু জলের জন্যে—কল থেকে হাতে করে জল আনতে আনতে হাতের ফাঁক দিয়েই সব জল পড়ে গিয়েছে, বউ-এর মুখে যায়নি একটাও।

জল দাওনা একটু—

দীনুর কানের মধ্যে কথাগুলো বাজছে। যেন বউ তার এখনো মরেনি—যেন কথা বলছে আগের মতো—।

না না, ওসব বাজে ভাবনা। গলা টিপে মারলেও যে রাগ যাবে না। এ কি একা দীনুর রাগ, ৫০ লক্ষ লোকের রাগ। মারবেই হবে অন্ততঃ একজনকেও মারলে হয়ত সেই মানুষ-গুলোর আত্মারা তৃপ্তি পাবে। এগিয়ে গেল দীনু—

ওকি করছো তুমি?

গলা টিপে মারবো—যারা তোমাকে মরবার আগে একটু জল খেতে দেয়নি।

সেতো অনেক লোকেই দেয়নি, আর সে কি একদিনের কথা চিরকালই ত ওরা তাই করেছে—

তবে তার প্রতিশোধ তো নিতে হবে—

প্রতিশোধ তুমি আর একা কি নেবে—

একাই পারি—

না, যদি পারো, তবে আমাদের মত অবস্থায় ফেলে প্রতিশোধ নিতে পারবে? না খেয়ে থাকলে তার কি জ্বালা, তাকি বোঝাতে পারবে ওদের—

দীনু আবার চমকে ওঠে। যারা মরে গিয়েছে, তারা কি করে কথা বলছে। অশরীরী আত্মা তাদের কি করে মানুষের মত বুদ্ধি, দয়া, যুক্তি আসছে। যারা চিরকাল অন্যকে ঠকিয়ে নিজেদের বাঁচালো, তারা তো একটুও ভাবতে পারে না—অথচ তারাই তো সভ্য মানুষ।

দীনু সরে দাঁড়ালো। না থাক—কিন্তু আবার যখন সেই দিন আসবে, তখন তো ওরা চিনতে পারবে না তখন তো আবার [illegible]।

হঠাৎ চিঁ-চিঁ গলার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলো দীনু। নিজের মেয়ের [illegible]।

বাবা গো, বাবা—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—ও বাবা—শুনতে পাচ্ছো না। [illegible] তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা, আমায় ধরো, ও বাবা, আমাকে ওরা জ্যান্ত ফেলে দেবে জলে—[illegible]।

উঃ, সারা শরীরে কি যেন কামড়াচ্ছে [illegible] ঠিক থাকতে পারছে না। কি করবে সে। [illegible] মেয়ে, দশ বছরের সবে [illegible] মেয়েটা। না খাওয়া গলায় যেন ওর [illegible] চেঁচাচ্ছে।

অসহ্য! দীনু পাগলের মত [illegible] ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো। তারপর [illegible] দরজাটা খুলে ওদিকের ঘরে চলে গেল। [illegible] কে ভাবে? দীনু [illegible] উত্তেজনায় হাত-পা সব কাঁপছে। [illegible] গরম হয়ে উঠেছে—

আমি বাবা, আমি ভ্রূণ। [illegible] আমি [illegible] পেটের মধ্যে ছিলাম [illegible] সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ওরা ফেলে [illegible] কিন্তু আমার [illegible] মায়ের মতই [illegible] ছিলো। আমাকেও জোর করে ওরা [illegible] তাই আমি ঠাঁই না পেয়ে ঠাঁই [illegible] আমাকে তুমি আশ্রয় দাও। [illegible] পৃথিবীতে আছো, তারা তো [illegible] অনেক বাতাস উপভোগ করছো, [illegible] সে অন্ধকারের শিশু, অন্ধকারেই [illegible], আমাকে একটু আলো দেখাও—

দীনু উত্তেজনায় কাঁপে থরথর [illegible] দিক অন্ধকার, কোথায় সে যাবে। দীনু [illegible] কাঁপতে ঠক করে দেশলাই জ্বালে। [illegible] চেয়ে দেখে—খাটের ওপর [illegible] দিদিমণি—মাথার সিঁদুরটা জ্বল জ্বল [illegible]

দীনু চোখ ফিরিয়ে নেয়—

কিন্তু ওরাই কি বিচার করেছে!

ফুঁ দিয়ে কাঠিটা নিভিয়ে [illegible] প্রতিশোধের জ্বালায় মিশিয়ে দিতে চায় [illegible] আর শোষিতের রক্ত এক নূতন [illegible] অন্তত যে ভ্রূণকে ওরা ইচ্ছা করে [illegible] তাকেই আবার সে তাদের মধ্যে বাঁচিয়ে [illegible]

আচার পালনের অধিকার পাইত, তাহারই কারণে মোটের উপর খুশি মনে থাকিত। নানক, চৈতন্যদেব অথবা রামমোহন ভেদনীতি বর্জন করিয়া যখন সামাজিক সমতা এবং জাতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত গুণ ও কর্মকে সমধিক মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখন শুধু ব্রাহ্মণ নহে, আপামর সাধারণ তাহাদিগকে বৃহৎ হিন্দুসমাজে নূতন একটি জাতিতে পরিণত করিয়া মহাপুরুষদের সংস্কার চেষ্টাকে পরাস্ত করিয়াছে। বৈষ্ণবকে আমরা 'বোষ্টম' নামক এক জাতিতে পরিণত করিয়াছি। শিখ এবং ব্রাহ্ম সমাজকেও আমরা প্রায় একটি 'জাতিতে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলাম, যাহার বিবাহ একমাত্র সেই সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে (endogamous group) ইহার মূলে শুধু ব্রাহ্মণের শঠতা অথবা শূদ্রগণের অন্ধ কুসংস্কার আছে বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। জগতের অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা শুধু জাতীয় নির্বীর্যতার জন্য ঘটে নাই, ইহা বলিলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দায় হইতে খালাস পাওয়া যায় না। মূলে রহিয়াছে, আপামর সাধারণের মনে বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য। বর্ণব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্রের স্থৈর্যের বশেই ভারতীয় সংস্কৃতির স্থৈর্য সম্ভব হইয়াছে।

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের পুরাতন ধনতন্ত্রের পরাজয় আরম্ভ হইয়াছে। অদ্যও বৃত্তিতে কুলগত অধিকার অভ্যাসবশত স্বীকৃত হইলেও অধিকাংশ জাতির বেলায়, এবং দেশের প্রায় সকল গ্রামে, প্রাচীন উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশঃ ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। এবং এই বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে পূর্বে বর্ণ-ব্যবস্থার প্রতি যে আনুগত্য ছিল, আজ তাহা দ্রুত ভাঙিতে বসিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারেই যে আমাদের মধ্যে সমাজ সংস্কারের বুদ্ধি আসিয়াছে তাহা নহে। এ কথা শুধু আংশিকভাবেই সত্য। যদি পুরাতন বৃত্তির আশ্রয়ে মানুষ অদ্যও সুখে স্বচ্ছন্দে খাওয়াপরা চালাইতে পারিত তবে ইংরাজী শিখিয়াও তাহারা বর্ণব্যবস্থাকে ভাঙিতে সক্ষম হইত না। ভারতবাসী শিক্ষিত সমাজ এক সময়ে ফারসী-নবিশ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দ্বারা সমাজের উপরস্তরে কিছু পরিবর্তন হইলেও গভীর-স্তরে তাহা পৌঁছায় নাই। শুধু তাহাই নহে। অনেকের ধারণা হিন্দু সমাজের শোষণ এবং অবমাননা নীতির ফলেই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বহু মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই যুক্তি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাহারা জাতিগত বৈষম্যের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধর্মান্তরিত হইল, তাহারা মুসলমান হইয়াও উচ্চনীচ ভেদাভেদ এবং ব্যবসায়ে কুলগত অধিকার গ্রাম্য সমাজে বজায় রাখিল কেন? তাই মনে হয়, মুসলমানী আমলেও হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত আর্থিক সংগঠনের স্থৈর্যই সমতাবুদ্ধিকেও পর্যুদস্ত করিয়াছিল।

পারিতেছে না, শুধু আজ। এবং তাহার কারণও বলা হইয়াছে, পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরাজয়।

গীতায় একটি কথা আছে—সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। আমরা ইউরোপীয় ক্যাপিটালিজমের আজ প্রভূত নিন্দা করিতেছি; তাহার মধ্যে যে সামাজিক বৈষম্য, ও শোষণ রহিয়াছে সেই পাপ হইতে মানবসমাজকে আমরা বাঁচাইতে চাই। কিন্তু ইউরোপীয় ধনতন্ত্র মানুষের লোভ এবং স্বার্থবুদ্ধির পোষণকে আশ্রয় করিয়াও জগতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও অধিক ফলপ্রসূ করিয়াছে, ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার দোষ কাটাইতে হইলে আমরা ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের যন্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া হয়ত তাহার পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া দিব। আনুষঙ্গিক দোষ কাটাইব। মূলে যদি স্বর্ণসম্ভার থাকে, সে স্বর্ণকে উপেক্ষা করিব না; বরং পুরাতন সোনার অলঙ্কারকে গলাইয়া নূতন রূপে তাহাকে চালাইয়া লইব।

বর্ণব্যবস্থার মধ্যেও তেমনই শোষণ, মনুষ্যত্বের অবমাননা, সবই ইহার সহিত জড়িত ছিল। কিন্তু বর্ণব্যবস্থার মধ্যে একটি বুদ্ধি ছিল ঃ মানুষ সমাজের দাস। সমাজের জন্য নির্ধারিত সেবা করিয়া কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, জেলে, সকলে জীবনযাপন করিয়া থাকে। সমাজকে তাহারা দেখে। অধিকার এবং দায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তদুপরি, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কুলের এমন কি বিভিন্ন মানুষের স্বধর্ম পালনের অধিকার আছে। এই দুইটি মূল নীতির উপরে রচিত হিন্দুসমাজ সংশ্লেষের দ্বারা ভারতবর্ষকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে কোনও সংশয় নাই।

সে সংশ্লেষে কোথায় দোষ ছিল, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু দোষ ছিল বলিয়া গুণের প্রতি আমরা দৃকপাত করিব না, ইহাও বলা চলে না। শ্রেণী শোষণ ভিন্ন ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা জড়তা দোষযুক্তও হইয়া পড়িয়াছিল। হয়ত ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের প্রভাবে মৌলিক স্বার্থবোধ আরও সুযোগ পাওয়ার ফলে পুরাতন ব্যবস্থার জড়তাকে ভাঙিয়া মানুষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কাঁটা দিয়াই কাঁটা তোলা হইয়াছে, রজোগুণ মিশ্রিত তামসিকতার আসর দ্বারাই তমোমূলক জড়তার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু আজ ধনতন্ত্র প্রদত্ত মুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার অধিক ফলপ্রসূ ক্ষমতা দেখিয়া আমরা যেন না ভাবি, যাহা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহার সবই ধুলা, সবই বালি। তাহার মধ্যেও যে সোনার দানা আছে, এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

ধনতন্ত্রের অপভ্রংশের উপর রচিত অধুনাতন ভারতীয় সমাজে আবার আমাদের নূতন করিয়া শিখাইতে হইবে যে মানুষ সমাজের নিকট ঋণী। সে ঋণ প্রাচীনেরা যেভাবে স্বীকার করিতেন আমরা হয়ত নূতনভাবে তাহা স্বীকার করিব। কিন্তু দায় আমাদের আছে; এবং সেই দায়ের উপরেই আমাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তির স্বাধীনতা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্বধর্ম অধিকার দিয়া প্রাচীন ব্যবস্থাপক এই অধিকারের স্বীকৃতি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা অত্যাশ্চর্য এক ব্যবস্থার প্রবর্তনও করিয়াছিলেন। মানুষ যতক্ষণ সমাজে থাকে ততক্ষণ সে সম্পূর্ণ সমাজের দাস, কুলাচার, লোকাচার পালন [illegible] স্বাধীনতা অবশ্য তাহার আছে। কিন্তু [illegible] পরিহারের স্বাধীনতা তাহার [illegible] কিন্তু এই বন্ধনের ঊর্ধ্বে আর একটি [illegible] প্রাচীন হিন্দুগণ স্বীকার করিতেন। [illegible] সন্ন্যাস গ্রহণ করে, পরিব্রাজক হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পারে না।

[illegible] প্রাচীন বর্ণব্যবস্থাযুক্ত হিন্দু সমাজ [illegible] সম্পূর্ণ সমাজের [illegible] [illegible]

প্রাচীন সমাজের [illegible] শোষণের দিকে কেবল না দেখিয়া [illegible] বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি লইয়া দোষকে [illegible] বলি, কিন্তু উদ্ধারের যোগ্য কোনও [illegible] সম্পদ থাকিলে তাহাকে সংগ্রহ করিতে [illegible] লজ্জিত না হই, তবেই আমরা প্রকৃত [illegible] হইব।

ইউরোপীয় ধনতন্ত্রকে গালি দিব না [illegible] যেখানে মানব সমাজের বৈষয়িক সম্পদ [illegible] ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছে। সেখানে [illegible] যোগ্য প্রশংসা করিব। তেমনই প্রাচীন [illegible] ব্যবস্থার মধ্যে যেখানে দোষের যাহা [illegible] তাহাকে ক্ষমা করিব না। কিন্তু প্রাচীন উৎপাদন ব্যবস্থা ও জাতি সংশ্লেষ অথবা সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে যদি কিছু ভাল [illegible]

ী হয়েছিল শোনো! (কারেন্-এর কাছে সে পাগলের মত) কাল ঐ বাগানে াঁড়িয়েছিলাম...শীতে কাঁপছি...অবাক্ হ'য়ে াবছি! হঠাৎ মেজাজ চ'ড়ে গেল, মনে হ'ল ামি খুন করতে পারি। আর তখন...হাঃ হাঃ াঃ! তখন...আমাদের রাজা...আমাদের রাজা াড়ি হাঁকিয়ে গেলেন...আর আমিও টুপি ুলে (উপহাসের সুরে) টুপি খুলে ফেললাম ুড়ো, ভক্তিভরে মাথা নোয়ালাম...ভিতরে তখন ৷ ঘেন্নার আগুন। ওর পশমের গলবন্ধ ুলে আমার আঙুলগুলো জড়িয়ে দিতে পারতাম ওখানে। উঃ!

কারেন্ : চুপ...চুপ! রাজাকে নিয়ে অমন থা ব'লো না। বেশ সুন্দর ছোট্ট ছেলে সে!

ক্রেগ্ : উঃ কী রাগ! কী ঘেন্না! এই মড়ার ঘরে বোধ হয় আর ঘেন্না পাবে না। (চার দিক চেয়ে) এখানে বেশ সব সমান। সব সমান।

কারেন্ : ঠিক। পৃথিবীতে এই একমাত্র জায়গা যেখানে সবার সমান বিচার। তাই তো ভালো লাগে। গরীবলোক-বড়লোক নেই এখানে। সবাই সমান...সবই সমান।

ক্রেগ্ : সবার সমান বিচার—এর জন্যে বোধ হয় প্রাণটাও দেওয়া যায়।

কারেন্ : প্রাণ দেওয়া ছাড়! আর ক্রিকেটটাকে ঐ বরফের ওপর ফেলতে দেখ্, তোর মরবার ইচ্ছে চ'লে যাবে। আমি তো বুড়ো, কিন্তু...

ক্রেগ্ : যদি আর দেখবার শক্তি থাকে, যদি আর সইতে পারি, তবেই—

কারেন্ : কেন, মাইনে তো মন্দ নয়?

ক্রেগ্ : লাখটাকাতেও এ জিনিস বিশ্রী লাগবে।

কারেন্ : ছো ছো! কেন, বেশ তো আছি...বেশ! ফুল নেই বটে...হিঃ হিঃ হিঃ... গানও নেই, কিন্তু...

ক্রেগ্ (পায়চারি ও দ্রুত বলে) মড়ার ওপর যা খরচ হয়, জ্যান্তরা যদি তাই পেত! যত বাজে খরচ...বিশ্রী অপব্যয়, মড়ার হাতে ফুল, মড়ার বুকে পাথর। ওদিকে জ্যান্তরা মরে উপোসে মরে, জ্যান্তের চোখ জ্বলে রূপের তৃষায়। আমি শুধু ভাবি, কেন মড়ারা আমাদের পাগলামি দেখে চীৎকার ক'রে ওঠে না, কেন ওদের কবর ফেটে চৌচির হ'য়ে যায় না এর বেদনায়!

কারেন্ : এরা কি পাগলের সঙ্গে আমায় আটকে রেখেছে...তোর কি একদম মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে!

(দরজায় করাঘাত)

কারেন্ (সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে) : কী চাই?

কণ্ঠস্বর : একবারটি আমায় ভেতরে যেতে দাও!

কারেন্ : দূর হ!

কণ্ঠস্বর : একবার, শুধু একটিবার!

কারেন্ : পরোয়ানা আছে?

কণ্ঠস্বর : না, না, আমায় যেতে দাও!

কারেন্ (সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে) : ভাগো!

কণ্ঠস্বর : আমায় ঢুকতে দাও......শুধু একটিবার (কারেন্ আবার দরজা খোলে) কোনও মেয়েছেলে আছে?

কারেন্ : মেয়েছেলে? হ্যাঁ আছে..... সর্বদাই মেয়েছেলের ব্যাপার! কী, চাই কী? ওদের রূপ দেখতে, না ওদের পচা মাংস শুঁকতে? চ'লে যা......বেরো! (দরজা বন্ধ করে)

ক্রেগ্ : কী চায় ও?

কারেন্ : মড়া দেখতে। ওর মেয়েছেলেকে খুঁজছে বোধ হয় (পর্দার পিছনে যায়)

ক্রেগ্ : ওঃ! (কারেন্ আসে কিনা দেখে সন্তর্পণে দরজা খুলে ডাকে) : ওহে! ঐ ফাঁক দিয়ে নতুনগুলোকে দেখতে পাবে—পর্দাটা তোলো। দুটো রয়েছে। সোণালী চুল একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। (পর্দা সরানোর শব্দে চট্ ক'রে ঘুরে দাঁড়ায়। কারেন্ ফেরে, ক্রেগ ধীরে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়) বেচারা!

কারেন্ : ঐ শেষ লাসটার ব্যাপারে একটু গোলমাল আছে।

ক্রেগ্ : কে, তেরো নম্বর?

কারেন্ : হ্যাঁ, তেরো নম্বর। তুই বোধহয় ঠিকই বলেছিস। জলে পড়ার মধ্যে কোনও অন্যায় ব্যাপার আছে। কিছু রহস্য আছে... কিছু গলদ। হিঃ হিঃ হিঃ! তেরো নম্বর তো মিছিমিছিই হয়নি।

ক্রেগ্ : কিসে বুঝলে গলদ আছে?

কারেন্ : স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ছোকরা! তুই দেখছি চট ক'রে চালাক হ'য়ে উঠলি... লাস দেখে দেখে?

ক্রেগ্ : উঃ!

কারেন্ : লোকজন টেলিফোন করছে, পথে সিপাই বেরিয়েছে তাই মনে হ'ল। আর বিশ্রী। না হয় দেরি করিয়ে দেয়। কী দেখছিস?

ক্রেগ্ : ঐ যে লোকটা দোরে এসেছিল। চ'লে যাচ্ছে না এখনও। কী জন্যে রয়েছে, তাই ভাবছি।

কারেন্ : নিশ্চয়! যদি ওর মেয়েছেলেকে দেখতে পায়! এদিকে খুঁজতেও ভয়।

ক্রেগ্ : মানে?

কারেন্ : আরে, লোকে জলে ডোবে শুধু দুই কারণে। পুরুষগুলো—যাদের ভিতরে কিছু নেই ব'লে, আর মেয়েগুলো—

ক্রেগ্ (ক্ষিপ্ত) চুপ।

কারেন্ : হিঃ হিঃ হিঃ! বেশ মজার কথা। হিঃ হিঃ। যাই, ছোঁড়াগুলোকে শুনিয়ে আসি।

ক্রেগ্ : ও লোকটার কী যেন হয়েছে। একবার দেখি গে।

কারেন্ : চোখ বুজে থাক; কিছু দেখিস না।

ক্রেগ্ : ও যে টলছে।

কারেন্ : টলতে দে।

ক্রেগ্ : ও হয়তো অসুস্থ-হয়তো ওর খিদে পেয়েছে।

কারেন্ : খিদে মেটাবার বেশ জায়গা এটা।

ক্রেগ্ : কী হল একবার দেখিই না গিয়ে।

কারেন্ : বেরোলে আর ঢোকা চলবে না কিন্তু। (একটু থেমে) ভিতরেই থাকবি তো?

ক্রেগ্ (দেখে নিয়ে) যা বলো।

(বাইরে একটু আর্তনাদ)

কণ্ঠস্বর : মারিয়া!

ক্রেগ্ : পড়ে গেল!

কারেন্ : উঠবে আবার।

ক্রেগ্ : বুঝছি না, কী হ'ল!

কারেন্ : বোধ হয় ঐ মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছে।

(দরজায় আঘাত)

ক্রেগ্ : ঐ এসেছে!

(কারেন্ সন্তর্পণে দরজা খোলে)

কণ্ঠস্বর : আমার মারিয়া! আমার

কারেন্ : যদি সমস্ত ক'রে [illegible] ক্রিচকান্দিস থামাও। জার্মানিদের [illegible] নিয়ে যাবার [illegible]।

কণ্ঠস্বর : মারিয়া!

কারেন্ : [illegible] জার্মানিদের [illegible]।

কণ্ঠস্বর : [illegible] ওকে [illegible] রেখো না।

কারেন্ : [illegible]

ক্রেগ্ : [illegible]

কারেন্ : [illegible] গেছে।

ক্রেগ্ : কিছু, কিছু, [illegible]

কারেন্ : [illegible]

ক্রেগ্ : [illegible] একটু, [illegible] সঙ্গে গেছে।

কারেন্ : কিছু ক্ষতি হয়নি। [illegible] মানুষই।

ক্রেগ্ : কী নরম, কী [illegible] মনে হচ্ছে মেয়েটিকে। [illegible] মুখে এক [illegible] না। [illegible] ছিল না।

কারেন্ : তোর উচিত ছিল [illegible] হওয়া। কী তুই?

ক্রেগ্ : আমি স্বপ্নদ্রষ্টা স্রষ্টা [illegible]

কারেন্ : তবে এখানে এসে ভুল [illegible] এ হ'ল সত্যের জায়গা—মিথ্যে [illegible] না। এখানে টাকা নেই, শক্তি নেই [illegible] ...কিছু নেই।

ক্রেগ : স্বপ্ন, সৌন্দর্য না থাকলে সে

শিল্পী ঃ রাম কিংকর

বাঁধা গরু [স্কেচ ঃ জল রং]

কেওরার গন্ধ। সে কথা ঢোঁড়াই কোনদিন ভুলতে পারবে না।......

মহতো, নায়েব, ছড়িদার সকলেরই হাত নিশপিশ করছে—ঢোঁড়াইটাকে একবার হাতের কাছে পেলে হয়।

ধনুয়া মহতো হুঁকোটায় কয়েকটা টান মেরে, তার উপরের নলটা মুছে লাল্লুর হাতে দেয়; তার মনের মত ধোঁয়া এখনও বের হচ্ছে না।

"নে লাল্লু তামাকটা টেনে ভাল করে ধরিয়ে দে! এখনও তোরা জোয়ান মরদ আছিস বুকের জোর আছে; আমাদের মত বুড়ো হয়ে যাসনি। তোদের মত বয়সে আমাদের এক-কোশের মধ্যে দিয়ে কোন মেয়েছেলে যেতো না।"

মহতোর রসিকতায় সকলে হাসে। মহতোর বয়সকালের অনেক কান্ড সকলের মনে আছে। মহতো গিন্নি আর তাঁর পঙ্গু মেয়ে ফুলঝরিয়া বাইরে আড়ি পেতে ছিল। মা গর্বপ্রসন্ন দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—এমন এমন কথা বলবে যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে।

ধনুয়া মহতোর উচ্চ হাসি ব্যাঙের এক ঘেয়ে ডাকের মধ্যেও কানে বাজে। হঠাৎ সে উদ্গত হাসিটা ঢক করে গিলে ফেলে গম্ভীর আর সোজা হয়ে বসে। মহতোর পদের একটা মর্যাদা আছে তো। সকলেই বোঝে যে এইবার আসল কাজের কথা আরম্ভ হবে। বৈঠকের আবহাওয়া থমথমে হয়ে ওঠে।

"ছেলে বাপের হয় না; ছেলে হয় জাতের। তারপর ছেলের উপর দাবী হয় টোলার। এই জিয়লের ডালের খুঁটি লেগে গিয়েছে তো; এ এখন সমস্ত চালাটাকে শুদ্ধ ঠেলে নিয়ে উঁচুতে উঠবে। সেই রকমই দ্যাখ, এই বাবুলাল তাৎমা জাতটার ইজ্জৎ কত বাড়িয়েছে। হৈজার ডাক্তার, (৮) যখন তাৎমাটুলীর 'ফৌজী' কুয়োতে লাল রঙ, (৯) দিতে আসে, তখন আমার বুক সত্যি কথা বলতে কি ভয়ে দুরু দুরু করে। বাবুলাল দেখি নেচে তা দিতে দিতে তার সঙ্গে কথা বলে; তবে না ও তৎমা জাতটাকে এক এতটা এগিয়ে দিতে পেরেছে।"

বাবুলাল, আত্মপ্রশংসা নিজের কানে শোনেনি এমনি একটা ভাব দেখায়।

"আর একদিকে দ্যাখো, "সারা বদমাইসির জড়" (১০) এই ঢোঁড়াই।"

সকলে ঢোঁড়াইয়ের নামে সোজা হয়ে বসে। লাল্লু শব্দ করে থুথু ফেলে; বাসুয়া চিক্ করে একটা শব্দ করে। বাবুলাল বলে, ছি ছি ছি ছি! তারপর গোঁফের একটা অবাধ্য চুলকে দাঁত দিয়ে কাটবার বৃথা চেষ্টা করে।

"সেই কুত্তার বাচ্চাটা কি না মাটি কাটার কাজ করবে, যা আমাদের সাত পুরুষে কেউ কোনদিন করেনি! তাৎমা জাতের মুখে কালি দিল! এর থেকে মুসলমানের এঁটো খাওয়া ভালো ছিল। আর লোক সমাজে মুখ দেখানোর জো রাখলো না তাৎমাদের। এখানে এলো না পর্যন্ত সে নবাব পুত্তুর। কি ছেলেই মানুষ করেছে বৌকাবাওয়া! বাওয়ার নাই দিয়ে মাথায় চড়ানোর জন্যেই তো ও এত বাড় বেড়েছে। দেখ দেখি কান্ড! নোখে বেলদার, আর শনিচরা ধাঙগড় আজ তাৎমার সঙ্গে সমান হয়ে গেল। আরে মাটি কেটেই যদি পয়সা রোজগার করতে হয়, তাহলে আমরা এতদিন ফুলে "ভাঁতি" (হাপড়) হয়ে যেতাম। আজ এই তিনকুড়ি বছর থেকে দেখছি এই 'পাক্কী' মেরামতের জন্য মাটি কাটার লোক, কত দূর দূরান্তর থেকে আসে? ধনুয়া মহতো আঙুল উঠোলে এখনই তিনশ তাৎমা রাস্তা মেরামতীর কাজে দিতে পারে। বাপ ঠাকুরদার নাম হাসালি। এই চোখের পর্দাটুকুর জন্যেই তো ধাঙগড়দের পোয়াবারো। রাতদিন পচই খেয়েও দুবেলা ভাত ডালের উপর আবার তরকারী খায়; আর আমাদের বরাতে মকাই মাঁরুয়ার দানাও জোটে না। একখান বাঁশুলী কিনতে হলে অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে দু টাকা ধার করতে হয়, দু আনা করে রবিবারে রবিবারে তাকে সুদ দেবো এই কড়ারে। এই দেখা না আমার দাখানা এই আঙুলের মত পাতলা হয়ে গিয়েছে, ধার দেওয়ার জায়গা নেই। নারকোলের দড়িটা কাটা যায় না এ দিয়ে। পয়সা না থাক একটা ইজ্জৎ, প্রতিষ্ঠা আছে। একটা ছোঁড়ার বদ খেয়ালের জন্য আমাদের সেটাও খোয়াতে হবে?"

'পঞ্চরা সকলে বেশ তেতে উঠেছে, এতক্ষণে।

"বন্ধ কর শালার 'হুক্কা পানি' (১১)।

"তাড়াও ওটাকে গোঁসাই থান থেকে।"

"বাওয়াটাই যত নষ্টের গোড়া

জোকে নখ অরু জটা বিসালা।

সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা॥ (১২)

"লুটিস দাও, বাওয়াকে"

"চল সকলে। থানে। ছোঁড়ার খাল ছিঁড়ে আজ হাড় মাস আলাদা করবো।

চল, চল।

বাইরে তখন বেশ জোরে বৃষ্টি এসেছে।

"পড়তে দে জল",—বলে হেঁপো রুগী তেতর বের হয়ে পড়ে ঘর থেকে। আর কারও বৃষ্টির কথা খেয়ালই নেই।

"লাঠি নিয়েছিস তো?"

**দুখিয়ার মার বিলাপ ও প্রার্থনা**

আগে আগে চলেছে বড়রা—মহতো, নায়েব চারজন, আর ছড়িদার। এর পিছনে চলেছে ছেলে বুড়ো সকলে। এরা সব এতক্ষণ ছিল কোথায়! বোধ হয় মহতোর বাড়ির আশে পাশে সবাই জড়ো হয়েছিল এই জল বৃষ্টির মধ্যেও আজকের পঞ্চায়তীর জম জমাট 'তামাসা' দেখবার জন্য। জল কাদা ব্যাঙ, কাঁটা মাড়িয়ে, অর্ধোলঙ্গ বীরের দল নৈশ অভিযানে বেরিয়েছে। তাদের জাত্যাভিমানে আঘাত লেগেছে। অন্ধকারে সরু পথের উপর আন্দাজে পা ফেলে চলেছে সকলে; পায়ের নীচের চটকানো কেঁচোগুলো থেকে আলোর আভাস ফুটে বেরুচ্ছে; গুগলি শামুক গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে খড়মড় করে। ক্ষ্যাপা শেয়ালের মত তারা হন্যে হয়ে ছুটেছে; কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই তাদের এখন—যেমন করে হোক তাদের জাতের এ অপমানের একটা প্রতিকার তারা করবেই করবে।

পাড়ার মেয়েরাও একে একে ধনুয়া মহতোর সদ্য খালি করা একচালাটিতে এসে জড় হয়। বাইরে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তবু সকলে ভিজে কাপড় নিঙড়োতে নিঙড়োতে বাইরে কি যেন দেখতে চেষ্টা করে। সকলেই এক সঙ্গে কথা বলতে চায়। মুখে কারও ভয় ভর মায়া মমতার ছায়াও নেই; আছে কেবল অভিযানের নিশ্চিত সাফল্যের জন্য উল্লাস, আর কয়েকটা অনিশ্চিত মজার খবরের জন্য কৌতূহল। ঐ একরত্তি ছোঁড়ার এই কাণ্ড! অসীম উৎসাহের সঙ্গে গুদরের মা আজকের পঞ্চায়তের সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী অন্য সকলকে বুঝোতে চেষ্টা করে। কুপীর আলোয় তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কে তার কথা শুনেছে? ওদের মধ্যে এত উত্তেজনা বোধ হয় এক কেবল ধাঙগড়টুলীতে আগুন লাগার সময় ছাড়া আর কখনও হয়নি। বাসুয়া লাল্লু, তেতর এই তিন নায়েবের স্ত্রীরাও মহতো গিন্নির চেয়ে গৌরবের অংশীদার হিসাবে কম বলে মনে করে না নিজেদের। তারাও সমস্বরে চীৎকার করছে। পাষণ্ডদলনে বীরেরা বেরিয়েছেন, বীরজায়ারা যাত্রার আগে কপালে জয়তিলক কেটে দিতে পারেননি; সেটা পুষিয়ে নিচ্ছেন চেঁচামেচি গালাগালির মধ্যে দিয়ে।

কেবল দুখিয়ার মা এদের মধ্যে নেই। সে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। দুখিয়াটা চাটাইয়ের উপর একটা কচি বাতাবীলেবু নিয়ে খেলতে খেলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ রান্নাবাড়ী করার মত মনের অবস্থা দুখিয়ার মার নেই। সন্ধ্যায় বাবুলাল বাড়ি থেকে বেরুবার পর থেকেই, তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে সে কান পেতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল—যদি কোন চেঁচামেচি শোনা যায়; পঞ্চায়তী কখনও বিনা হট্টগোলে শেষ হয় না। কেন মরতে গিয়েছিল সে কাল তাদের বরাফ নিতে

---

(৮) হৈজার ডাক্তার, শব্দার্থ কলেরার ডাক্তার, আসলে তাহার অ্যাসিস্টান্ট স্যানিটারী ইন্সপেক্টর।

(৯) পারমাঙ্গানেট অব পটাশ।

(১০) যত নষ্টের গোড়া।

(১১) একঘরে কর।

(১২) যার নখ আর জটা বড়, সেই কলিকালে প্রসিদ্ধ তপস্বী। (তুলসীদাস)

ছোঁড়াটার জন্য। সেই থেকেই তো এত কাণ্ড! কাল গোঁসাইথানে না গেলে আজ হয়ত ছেলেটা এ কাণ্ড করত না। চিরকাল বদরাগী ঢোঁড়াইটা—সেই যখন কোলে তখন থেকেই; কিন্তু রাগেরও তো একটা সীমা আছে! বলতে গেলাম ভাল কথা, বাওয়া আর ঢোঁড়াই দুজনেই মানে করে নিল উল্টো। মহতো নায়েবেরা, বিশেষ করে চাপরাসী সাহেব, অজ আর ঐ একরত্তি ছেলেটাকে আস্ত রাখবে না। দেবে হাড়গোড় ছেঁচে। চাপরাসী সাহেব কোন দিন ছেলেটাকে দেখতে পারে না।—'পঞ্চায়তীর' চেঁচামেচি মহতোর বাড়ি থেকে এতদূরে পেঁছোয় না, কেবল বৃষ্টির একটানা রিনঝিম শব্দ শোনা যায়।

টপ্ টপ্ করে চালের ছাঁচতলা থেকে জল পড়ছে তার সম্মুখে। জলের ফোঁটা পড়েই একটা একটা টুপির মত হয়ে যাচ্ছে। একটা নেপালী 'ফৌজ' চাপরাসী সাহেবকে একটা টুপী দিয়েছিল। সে তার পেন্সনের টাকা তুলতে পারছিল না সরকারী অফিস থেকে। বাবুলাল টাকায় চার আনা করে নিয়ে টাকাটা তুলে দিতে সাহায্য করে। তাই সে বাবুলালকে দিয়েছিল পুরানো টুপীটা। দুখিয়ার মা আবার একদিন সেই টুপীর মধ্যে বাবুলালের জন্যে কাঁঠাল ছাড়িয়ে রেখেছিল। কি মারই না মেরেছিল সেদিন বাবুলাল দুখিয়ার মাকে। আবার চাপরাসীর বৌ হতে সখ যায়; থাক তুই তাৎমাণী।......

বাবুলালের উপর বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে ওঠে। ঢোঁড়াইয়ের কথা মনে করে, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নীচে জলের ফোঁটা পড়ে টুপি হচ্ছে কি না, সেদিকে তার খেয়াল থাকে না। খেয়াল থাকলেও ঝাপসা চোখে তখন দেখতে পেতো না।

ঐ! এইবার একটা হট্টগোল শোনা যাচ্ছে! তারা বোধহয় পঞ্চায়তীতে ঢোঁড়াইকে মারছে! রামজী! গোঁসাইজী, তোমার থানের ধুলোবালি মেখে ছেলেটা এত বড় হয়েছে। দোষ করে ফেলেছে বলে তাকে পায়ে ঠেলো না।...... ছোঁড়াটা হয়ত এখন চীৎকার করে কাঁদছে।..... না কাঁদবে কেন? ঢোঁড়াইকে তো কেউ কোন দিন কাঁদতে দেখেনি।......হট্টগোল যেন দূরে সরে যাচ্ছে, বোধ হয় গোঁসাই থানের দিকে। এ আবার 'পঞ্চ'রা কি ফয়সলা করলো? বাওয়াকে আবার কিছু করবে না তো? হয়ত ঢোঁড়াইকে এত মেরেছে যে তার চলবার ফিরবার ক্ষমতা নেই; নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে বেহুঁস হয়ে গিয়েছে; তাই বোধ হয় সকলে মিলে ধরাধরি করে তাকে বোকাবাওয়ার কাছে পেঁছুতে যাচ্ছে।

চেঁচামেচির আওয়াজ বাড়তে থাকে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই—না হলে হয়ত কথাবার্তা কিছুটা শোনা যেত। ঝাঁপের সম্মুখে কুপির আলো পড়ে বৃষ্টির ধারা সাদাটে রঙের দেখাচ্ছিল,—চোখের জলে তাও ঝাপসা হয়ে গেল।...মাইয়া গে, তোর চুলে বাওয়ার জটার মত গন্ধ নেই কেন?......দূরে থেকে আপিস ফেরৎ বাবুলালকে দেখে, ধুলোকাদা মাখা ছেলেটা রাংচিতের বেড়ার মধ্যে দিয়ে পালাচ্ছে চোরের মত।......

হঠাৎ পায়ের শব্দ হয়। ছপ্ ছপ্ করে কাদার মধ্যে দিয়ে কে যেন এদিকে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বাবুলাল এসে ঘরে ঢোকে। সে যেন ধাক্কা দিয়ে দুখিয়ার মাকে দোরগোড়া থেকে সরিয়ে দেয়। তার সবাঙ্গ দিয়ে জলের স্রোত বইছে। উনুনের পাড় থেকে কুপিটা উঠিয়ে, সে ঘরের কোণার দিকে এগিয়ে যায়। আর একটু হলেই ঘুমন্ত দুখিয়াকে মাড়িয়ে ফেলেছিল আর কি! সবুজ আর গোলাপী রঙে রঙানো বেনাঘাসের কাঠাটির ভিতর থেকে বাবুলাল টেনে বের করে পেট্রোলের শিশিটা। যত্ন করে তুলে রাখা দুখিয়ার কাজললতাটা, কাঠা থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। বাইরের দমকা হাওয়ার মত বাবুলাল আবার বেরিয়ে পড়ে জলের মধ্যে। দুখিয়ার মা সশঙ্ক জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে, একবার শিশিটির দিকে একবার বাবুলালের মুখের দিকে তাকায়। দোর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বাবুলাল বলে যায় "শালা থানে নেই"।

দুখিয়ার মার মনে হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তোমার পায়ের ধুলোর ইজ্জত রেখো, গোঁসাই। ঢোঁড়াইকে আমার, এই 'চামার'গুলোর হাত থেকে আজ বাঁচিও। বাওয়ার মত 'ভকত' যাকে আগলে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা, তাকে এই বাবুলাল, তেতর, লাল্লু, বাসুয়া, কি করতে পারে? বিশ্বাস নেই বাবুলাল চাপরাসীকে। ও আগের জন্মের জমানো "সুকৃতের" (১) ফলে, সব কাটিয়ে উঠতে পারে, এ বিশ্বাস দুখিয়ার মার আছে। তার উপর 'পঞ্চ'এর রায়, দশের ফয়সলা। তার 'তাকৎ গোঁসাই আর রামজীর তাকতের সমান। 'পীপর' (২) গাছের আওতায় মানুষ হয়ে, ছেলেটা কি করে 'পঞ্চ'এর কথার খেলাপ যেতে পারলো। ওর ঘাড়ে এখন সয়তান সওয়ার হয়েছে। নিশ্চয়ই ধাঙড়টুলীর আকলুর মা, কিম্বা লম্বী গোয়ারিনের মত কোন 'ডাইন' (৩) জানা মেয়ে মানুষ ওর উপর "চক্কর" (৪) দিয়েছে। তা' নাহলে কি কখনও কেউ এমন করতে পারে। কত পাপই না আমি করেছি, গোঁসাই তোমার কাছে!......'পিট্রোল'এর শিশি নিয়ে বাবুলাল আবার এখন কি করতে গেল?......

টীকা :—

(১) সুকৃত —পুণ্য
(২) অশথগাছ
(৩) ডাইনী
(৪) যাদুমন্ত্রের প্রক্রিয়া বিশেষ

দুখিয়ার মা কিছু ভেবে ঠিক করে উঠতে পারে না।......কি একটা পোড়া পোড়া গন্ধ না? ঠিকই তো!......ধোঁয়ার গন্ধ, বর্ষার ধোঁয়া উচুতে ওঠে না; মেঝেতে পড়া কেরোসিন তেলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতেও ভয় হয়, কি জানি আবার কি দেখবো। বৃষ্টি ধরে এসেছে। ঘন আঁধার ভেদ করে, ধানের দিকে আকাশে উগ্র লাল আলোর ঝলক লেগেছে।

**বাওয়া ও ঢোঁড়াইয়ের অগ্নি পরীক্ষা**

ঢোঁড়াইকে গোঁসাই থানে না পাওয়ায় তাৎমা ফৌজের দল প্রথমটা কি করবে ভেবে পায় না।

শালা, এত রাতেও বাড়ি ফেরেনি। এই ঝড়বৃষ্টির দিনেও। শয়তানী করে নিশ্চয়ই ধাঙড়টুলীতে বসে আছে, তাৎমাদের বেইজ্জৎ করার জন্য। ঐ ধাঙড়, আর মুসলমানের বাড়ির ভাত খাওয়াটুকুই বাকি ছিল। তা সে সখটুকুও মিটিয়ে নে। খেয়ে নিস তার সঙ্গে মুর্গীর আন্ডা। ওটাকে হাতের কাছে এখন পেলে,— যেমন করে ধাঙড়রা শুয়োর মারে, এই তেমনি করে......

কয়েকজন বাওয়াকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে বার করে। সে কোন বাধা দেয় না। বাওয়ার দেখী মন, এই রকমই একটা কিছুর আশা করছিল। কিন্তু এত উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও, বাওয়াকে মারপিঠ করতে তাদের সাহস হয় না। তাকে কাদার মধ্যে টেনে এনে ফেলা হয়। তারপর চলে জেরা—কোথায় আছে ঢোঁড়াই, বল্। কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিস? শুক্রা ধাঙড়ের বাড়ি? নোখে বেলদারের বাড়ি? কোথায় লুকিয়ে আছে বল্? 'পাক্কী'র গাছতলায়?

বাওয়ার ঘাড় নেড়ে জবাব দেবার কথা। কিন্তু সে নির্বিকারভাবে পিট্ পিট্ করে তাকায়; কিম্বা কি ইসারা করে বলে, অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না।—আগুন দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেনা, কোন দিকে গিয়েছে। দে ঐ জটটায় আগুন লাগিয়ে। হাঁ বলেছিস ঠিক; মাথার চাঁদিতে একটু গরম লাগলেই পেটের কথা বেরুবে।

—এই যে বাবুলাল 'পিট্রোলের' শিশি আর দেশলাই নিয়ে এসেছে।

বাওয়ার ভিজে চালাটিকে জ্বালাবার পর এই পাগলের দলের আক্রোশ একটু কমে আসে। মহতো নায়েবেরা বুদ্ধিমান। তারা বুঝতে পারে যে যতটা করা উচিত ছিল, তার চাইতে একটু বেশী করা হয়ে গিয়েছে। বাবুলালের ভয় হয় যে সে-ই পেট্রোলের শিশি এনেছিল। এক এক করে তারা সরে পড়ে। বাকি সকলে গোঁসাই-থানে নানা রকম গালগল্প আরম্ভ করে।

আলবৎ বটে 'পিট্রোলের' ধক। তা নাহলে কি আর এদিয়ে হাওয়া গাড়ী চলে। মাদার-ঘাটের বুড়ী মুদিয়াইন সেবার শীতকালে গেঁটে

হাতের ব্যথায় মর মর হয়েছিল। ডেরাইভার সাহেব তাকে দিয়েছিল একটু 'পিট্রৌল' শীতে জবুস্থবু হয়ে, পায়ে পেট্রল ঢেলে যেই 'ঘুর'এর (১) আগুনের উপর পা দুটো তুলে ধরেছে, অমনি গিয়েছে পায়ে আগুন লেগে; চামড়া টানড়া ঝলসে একাক্কার।

তুই যে আবার সেই "শাঁখড়েল"এর (২) গল্প আরম্ভ করলি।

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলিস। আমি বলছি মিছে কথা। বাসুয়া নায়েবকে জিজ্ঞাসা কর, 'মুনিয়াইন'এর কথা সত্যি কিনা।

"এই বাসুয়া!"

বাসুয়াকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সকলে তাকিয়ে দেখে যে, মহতো নায়েবরা কেউ নাই। বহুদূর থকে হে'পো তেতরের কাশির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তাংমাসুলভ ভয় ও নিজের প্রাণটা বাঁচানোর প্রয়াস সকলকে পেয়ে বসে। এক এক করে দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

প্রেতের দলের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র একজন থেকে যায়—রতিয়া 'ছড়িদার' (৩)।

বাওয়া তার সম্মুখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ছাই আর আগুনের স্তূপের মধ্যে থেকে তখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে। রতিয়া বাওয়ার কাছে ঘেঁষে বসে। হাতের লাঠিটা দিয়ে খানিকটা পোড়া খড় আর ছাই সরিয়ে দেয়। নীচে থেকে আধপোড়া হাড়িকাঠটা বেরিয়ে আসে। এ কি! হাড়িকাঠ পুড়ে গিয়েছে। কৃত পাপের ভার তার বুকের উপর চেপে বসে। সকলে চলে গেলেও সে থেকে গিয়েছিল, বাওয়ার কাছে একটা প্রস্তাব আনবার জন্য। ভিক্ষের জমানো পয়সা যদি কিছু থাকে, তাই দিয়ে 'পঞ্চ'দের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করা উচিত, এই সোজা কথাটা বাওয়ার মোটা মাথায় ঢুকোনোর জন্য, সে কাছে ঘেঁষে বসেছিল। কিন্তু হাড়িকাঠ পুড়ে গিয়েছে। পাপের গ্লানিতে আর রেবণগুণীর ভয়ে তার বুক দুর দুর করে। এই হাড়িকাঠের পাশেই সর্বাঙ্গে রক্তমাখা রেবণগুণীর উপর প্রতি বছর গোঁসাই ভর করেন। ভয়ে ছড়িদার ঘেমে ওঠে। বাওয়ার পা জড়িয়ে ধরতে পারলে হয়ত কিছুটা পাপের বোঝা কমতো। ঝোঁকের মাথায় এ কি কাণ্ড করে বসেছে সকলে। রেবণগুণী তো সবই জানতে পারে। এই হাড়িকাঠ জ্বালানোর কথা সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গিয়েছে। এখন তার রাগ কার উপর পড়বে সেইটাই হল কথা......

আগুন আর ধোঁয়ায় উদ্ভ্রান্ত পাখীগুলো অশথগাছের উপর এখনও শান্ত হতে পারে নি। অশথগাছের ঝলসানো পাতাগুলো তখনও ধোঁয়ায় কাঁপছে। এমন সময় দূরে চেঁচামেচি শোনা যায়। সাপের ভয়ে হাততালি দিতে দিতে কারা যেন আসছে।

কি হয়েছে রে? আগুন কিসের? বাওয়া কোথায়? ধাঙড়ের দল আগুন দেখে এসে পড়েছে।

ঢোঁড়াই দৌড়ে গিয়ে বাওয়ার পাশে বসে। সে সমস্ত ঘটনাটা আন্দাজ করে নিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। বাওয়ার কাদামাখা হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে নেয়। কেউ কোন কথা বলে না। বাওয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ঢোঁড়াইও জীবনে কাঁদে নি বলেই নিজেকে সামলে নিতে পারে। সব ধাঙড়রা তাদের গোল হয়ে ঘিরে বসে। রতিয়া ছড়িদার পালাবার পথ পায় না।

শনিচরা উঠে তার দুহাত চেপে ধরেছে।

"বল কে কে ছিল? রগচটা বেড়াল রাগের জ্বালায় খুঁটি আঁচড়ায়। এ হয়েছে তাই। মুনিয়া পাখীর মত ফড়ুং ফড়ুং করছিস কেন? বেশী নড়াচড়া করেছিস কি দেবো ফেলে ঐ আগুনের ভিতর।"

বিরসা বলে—"পঞ্চায়তীর ভোজের ফয়সালা করতে এসেছিলে নাকি বাওয়ার কাছে। দেড় টাকা পেলেই তো ভাতের ভোজ মাপ করে দেবে এখুনি।"

এতোয়ারী বলে—"বাজে কথা যেতে দে। বল্ কে কে ছিল? আগুন লাগিয়েছে কে? বাওয়াকে মেরেছিস নাকি? বাওয়া তুমিই বল না।"

বাওয়া মাথা নেড়ে বলে যে না, কেউ তাকে মারে নি।

ঢোঁড়াই বাওয়ার গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে দেখে কোন মারের দাগ আছে কি না। সারা গা একেবারে ছড়ে গিয়েছে। "চামার, চণ্ডালের দল।" ঢোঁড়াইয়ের চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। তারই জন্য বাওয়াকে এই জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। শনিচরা রতিয়া ছড়িদারের চুলের গোছা ধরে বলে—"সব সত্যি কথা বল। তা না হলে তোকে আজকে এইখানে আধপোড়া হাড়িকাঠে বলি দেব। এখনও বললি না। দাঁড়া, তোর 'ছড়িদারি' ঘোচাচ্ছি।"

ছড়িদার ভয়ে ভয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বলে। শনিচরা আর বিরসার রক্ত গরম হয়ে ওঠে সব শুনে। দাঁড়া, ধনুয়ার মহতোগিরি, আর বাবুলালের চাপরাসীগিরি বের করছি। চল্লাম থানায়।"

এতোয়ারী, আর শুক্রা তাদের থানায় যেতে বারণ করে। জানিস না দারোগা পুলিসের ব্যাপার। মাথা গরম করিস না, গর্ত খুঁড়ে সজারু বের করতে গিয়ে শেষকালে গোখরো সাপ বেরিয়ে যাবে। পালানোর পথ পাবি না তখন। বুড়ো হাতীর কথা শোন। আমার বাবা আমাকে বলে গিয়েছিল কোনদিন বুড়ো আঙুলের ছাপ দিস না। তার কথা মনে না রেখে সেবার কি বিপদেই পড়েছিলাম, সেই অনিরুধ মোক্তারের ব্যাপারটা মনে আছে না শুক্রা ভাই।"

বিরসা বলে "বুড়োদের কোন কথা চলবে না এখানে। সে সব শুনবো নিজের টোলায়। চলুরে শনিচরা।"

"কথা যখন রাখবি না, তখন যা ভাল বুঝিস তাই কর। বুড়োর কথা আর গুণীর কথা না রাখ ফল ভাল হবে না, ঠোকর খাবে।"

শুক্রা সায় দেয়—"যত আক্কেল ঘরের বেড়ার মধ্যে। পুল পার হলেই সব বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে। ঘর বৈঠে বুধ প'য়তিস; রাহ চলতে বুধ পাঁচ কচহরী গয়ে তো একো ন সুঝে; যো হাকিম কহে সো সচ। (৪)

সকলে হেসে ওঠে।

সত্যি হলও তাই।

বিরসা আর শনিচরা যখন পাঁচ মাইল দূরের সদর থানায় পৌঁছুল তখন বেশ রাত। দারোগা সাহেব দুজনাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বহু ডাকাডাকির পর ছোট দারোগা সাহেবের ঘুম ভাঙে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে তিনি কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করেন—কোন 'শুয়ার' আমার এত রাতে জ্বালাতন করতে এসেছে। কেয়া হুয়া কুলদীপ সিং? আবার এখন এই রাতে "আউয়াল ইত্তলায়" (৫) লিখতে হবে? কুলদীপ সিং বেশ করে সম্বাটাকে (৬) একটু পেটো তো। বেটা নিজে কথা বলতে এসেছে নিশ্চয়।

শনিচরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বিরসা থানার কম্পাউণ্ডে ঢোকেই নি। থানা পর্যন্ত আসবার পর দারোগার নামে তার ভয় করে। শনিচরার হাজার টানাটানি সত্ত্বেও তার সাহসে কুলোয় নি। সে কম্পাউণ্ডের বাইরে বসেছিল। হঠাৎ শনিচরাকে পালাতে দেখে সেও প্রাণপণে দৌড়োয়—কি জানি আবার কি হল! শহরের কাঁকরওয়া রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, প্রায় সেখানে গিয়ে তারা থামে। যে ঘিয়ে-ভাজা খেঁকী কুকুর দুটো ডাকতে ডাকতে তাদের তাড়া করেছিল, সে দুটো আগেই থেমে গিয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সারা ঘটনার হিসাব নিকাশ করে। তারপর গাঁয়ে ফেরে।

শুক্রা আর এতোয়ারী সারা বৃত্তান্ত শুনে বিশেষ কিছু বলে না। এই রকম যে একটা কিছু হবে, তা তারা আশাই করছিল। ধাঙড়ানীরা বলে যে, যাক দারোগার হাত থেকে যে বেঁচে এসেছিস সেই ঢের।

---

(১) ঘুর—শীতে আগুন পোয়ানোর স্থান

(২) শাঁখড়েল—এক শ্রেণীর পেত্নীর নাম

(৩) ছড়িদার—তার কাজ পঞ্চায়েতের নোটিস বাদী, বিবাদী, সাক্ষী, নায়েব সকলকে জানানো, জরিমানার টাকা আদায় করা, ইত্যাদি কাজ। আসলে কিন্তু সে মাতব্বরদের ঘুষের দালালী করে।

(৪) বাড়ীতে থাকলে বুদ্ধি থাকে পঁয়ত্রিশ; পথে বেরুলে বুদ্ধি হয়ে যায় পাঁচ; কাছারী পৌঁছে একও দেখতে পায় না, যা হাকিম বলে তাই সত্যি মনে হয়।

(৫) আউয়ল ইত্তলায়—First Information Report

# বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে রঙ্গলালের স্থান

**রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত**

গত শতকে বাঙলা সমালোচনা সাহিত্য যেটুকু গড়ে উঠেছিল, তাতে রঙ্গলালের একটু বিশিষ্ট স্থান আছে। রঙ্গলাল একজন বড় সমালোচক ছিলেন না। তিনি সমালোচক হিসাবে পরিমাণে বেশী কিছু লেখেও যান নি। আর বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিলে গত শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্যে তেমন বড় সমালোচক কেই-বা ছিলেন। বস্তুত বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার কোন পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্য এখনও দানা বেঁধে উঠে নি। এ বিষয়ে আমরা বোধ হয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের পেছনে পড়ে আছি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন আমাদের নূতন সাহিত্য গড়ে উঠল, তখন আমরা সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বা অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে কোন পরিষ্কার বোঝাপড়া করে নিই নি। পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বকে টেনে নিয়ে বা তাকে উপেক্ষা করেও কোন নিজস্ব কাব্যতত্ত্ব সৃষ্টি করবার সার্থক চেষ্টা করি নি। সমালোচনা সাহিত্য কাব্যতত্ত্বের ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠে—তা সে কাব্যতত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে বিধিবদ্ধই হোক বা নাই হোক। বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার এক সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করা কঠিন। নানা সাময়িকপত্রে ছাপা সমালোচনা প্রবন্ধ, নানা সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা জড় করে আমাদের খুঁজে নিতে হচ্ছে পূর্বগামীদের সাহিত্য দর্শন।

সমালোচনা শব্দটি ঠিক কাব্যতত্ত্বকে বোঝায় না। আর শব্দটির বয়সও বেশী নয়। সংস্কৃত সমালোচনা বলে কিছু নেই। কাব্যতত্ত্ব বা কাব্য-বিচারকে ঠিক সমালোচনা বলা যায় না। সমালোচনা কথাটির প্রথম প্রয়োগ দেখতে পাই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহের" পাতায়। আলোচনা শব্দ এর আগে ব্যবহৃত হয়েছে। "জ্ঞান-চন্দ্রিকায়" পাই "পরস্পর শাস্ত্রাদি বিষয়ে যে কথোপকথন তাহার নাম আলোচনা।" বিবিধার্থ সংগ্রহের আগে ছাপা কোন বাঙলা অভিধানে সমালোচনা বা সমালোচন শব্দ মেলে না। কয়েকটি ইংরেজি বাঙলা অভিধানে criticism-এর অর্থ লেখা হয়েছে দোষ-গুণ-বিচার। এ কথাটি অবশ্য আলঙ্কারিকদের কথা। বিবিধার্থ সংগ্রহে ছাপা পুস্তক পরিচয়ের শিরোনামায় দেখতে পাই—নূতন গ্রন্থের সমালোচন। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দশকের সমাচার দর্পণে পুস্তক পরিচয়ের শিরোনামা থাকত "নূতন গ্রন্থ।" তবে সমাচার দর্পণের পুস্তক পরিচয় ছিল এক রকমের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি। তাকে সমালোচনা বলা চলে না।

বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে উদ্ভব গ্রন্থ সমালোচনা থেকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে criticism-এর উদ্ভব ঠিক review থেকে নয়। যদিও review অনেক সময় criticism-এর পর্যায়ে উঠেছে। আমরা যদি চলতি কথায় সমালোচনা বলতে কাব্যতত্ত্ব বুঝি, তাতে খুব দোষ নেই। ইংরেজিতে criticism বলতে aesthetics, poetics, rhetoric সবই বোঝায়। Saintsburyর "History of criticism"এ যেমন Aristotleএর poetics-এর আলোচনা বা Shellyর Defend of Poetryর আলোচনা আছে, তেমন আবার Edinburgh Reviewতে ছাপা Brougham বা Jeffreyর লেখা গ্রন্থ সমালোচনার বিবরণও আছে। ইংরেজ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত আলঙ্কারিক-দের critic বলে অভিহিত করেছেন। Horace Hayman Wilson তাঁর Select Specimens of the Theatre of the Hindoos গ্রন্থে অলংকার শাস্ত্রকে criticism বলে বিবেচনা করেছেন। কাব্যতত্ত্বকে সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে কোন বাধা নাই। কিন্তু আমাদের সমালোচনায় কাব্যতত্ত্ব কোথায় ?

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা দেখেছি যে, গত শতকের সাহিত্যিকরা অলংকার শাস্ত্রকে এড়িয়ে গেছেন। তখনকার ইংরেজ পণ্ডিতেরাও আলঙ্কারিকদের স্থান দিতেন না। ১৮২৭ সালে Wilson লিখছেন যেঃ

"Indian criticism has been always at its infancy. It never learned to contemplate causes and effects: it never looked to the influence exercised by imagination or passion in poetry: it never in short became either poetical or philosophical. Technicalities were the only objects within its comprehension and it delighted to elicit dogmatical precepts from the practice of established authors."

Wilson-এর এই মন্তব্যে কিছু সত্য থাকতে পারে কিন্তু এতে ভ্রমই বেশী। তার একথাও বলা যায় না যে, গত শতাব্দীর সব সাহিত্যিকই এই মত পোষণ করতেন। তবে এটা ঠিক যে, তাঁরা প্রায়ই অলংকারের ধার ধারতেন না। Wilson-এর এই লেখার ৩৩ বছর পরে মাইকেল বলছেনঃ—

"If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Shahitya-Darpan."

আবার এর ১৩ বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন তার উত্তর চরিত প্রবন্ধে যে সাহিত্য সমালোচনা সংস্কৃত আলংকারিকদের বাদ দিয়েই গড়ে তুলতে হবে। তবে বঙ্কিম যে শুধু ভারতীয় আলংকারিকদের উপেক্ষা করতেন তা নয়। তিনি কাব্যের পদ্ধতি ভাগ বিভাগ নিরর্থক বলে মনে করতেন। তার বঙ্গদর্শনে ১৮৭৩ সালে ছাপা গীতিকাব্য প্রবন্ধে একথা তিনি পরিষ্কার বলছেন। তাছাড়া কাব্যশরীরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে তার পরীক্ষা করা বঙ্কিমের কাছে সমালোচনা বলে মনে হত না। উত্তর চরিত প্রবন্ধে তিনি বলছেন যে, তাজ-মহলের পাথরগুলিকে আলাদা আলাদা দেখলে যেমন তাজমহল দেখা হয় না তেমনি একটি কাব্যের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা করে বিচার করলে সেই কাব্য উপভোগ করা হয় না।

কিন্তু এক সবল সাহিত্যের যে আবার একটি সবল সাহিত্য সমালোচনা চাই বঙ্কিম তা বুঝেছিলেন। Bengali Literature প্রবন্ধে তিনি বলছেনঃ—

"We can hardly hope for a healthy and vigorous literature in the utter absence of anything like intelligent criticism. The educated Bengali fails in the department almost as much as the antiquated pundit, in consequence no doubt of deficient culture."

বঙ্কিম এই অভাব যতটা দূর করেছেন ততটা গত শতাব্দীতে আর কেউ করেনি।

সংবাদ প্রভাকরের সাহিত্য প্রবন্ধগুলিতে ঠিক পূর্ণাবয়ব সমালোচনা থাকত না। বিবিধার্থ সংগ্রহের সমালোচনায় মৌলিকতা বা সূক্ষ্মতার অভাব সহজেই চোখে পড়ে। এ পত্রিকাটির সমালোচকরা আলঙ্কারিকদের বাদ দিতেন না কিন্তু তাদের ঠিক আত্মসাৎও করতে পারতেন না। বিবিধার্থ সংগ্রহের ৩য় পর্বে মাঘের সংখ্যায় দেখছি কুলিনকুল সর্বস্ব নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক কাব্যতত্ত্বের গোড়ার কথা নিয়ে বিচার করছেন। প্রবন্ধের গোড়াতেই সাহিত্য দর্পণে অভিনয় সম্বন্ধে যে কারিকা তার বিশ্লেষণ। প্রবন্ধটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ; কিন্তু এতে কাব্য দর্পণ বলে কিছু নেই। আলঙ্কারিকদের আইন কানুনের উল্লেখ আছে—চিন্তার মৌলিকতা বা অনুভূতির গভীরতা নেই। নাটক রচনার কতগুলি নিয়মের ফিরিস্তি দিয়ে সমালোচক বলছেনঃ "অসাধারণ ক্ষমতা ভিন্ন এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া নাটক রচিত হইতে পারে না। যেন নাট্য রচনার চিরাচরিত বা আলঙ্কারিক নিয়ম রক্ষাই নাট্যকারের একমাত্র কর্তব্য। সাহিত্য দর্পণের ৫৩৩ক নম্বর কারিকায় আছে প্রহসনে মাত্র ২ অঙ্ক থাকা উপযুক্ত। রামনারায়ণের 'কুলিনকুল সর্বস্ব' ছয় অঙ্কে সম্পূর্ণ। তাই সমালোচক লিখছেনঃ

"সাহিত্য কারের মতানুসারে এতৎপ্রকার রচনার নাম প্রহসন; এবং তাহাতে দুই অঙ্ক মাত্র থাকা উপযুক্ত। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তদনাথায় প্রহসনকে কি কারণে ষড়ঙ্কসম্পন্ন নাটকরূপে প্রচারিত করিলেন তাহার তাৎপর্য অনুভূত হইতেছে না।" ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে Valla-র পুস্তকাগারে Aristotle-এর poeticsখানা যখন আবিষ্কৃত হল তখন সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা হয়ে উঠল ইতালীয় সমালোচকদের মধ্যে অনেকের বাইবেল। Classicistদের সঙ্গে romance সাহিত্যের পরিপোষকদের বাধল ঝগড়া। কিন্তু সে যুগেও সমালোচকেরা অনেকে মেনে নিলেন যে, সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিভাকে পুরাণো নিয়ম দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। এ সম্বন্ধে একজন মার্কিন সমালোচক বলেছেনঃ

"During the struggle two fundamental concepts were made clear. In the first place, the principle of the unity of the work of art was fixed more firmly; in the second it was finally established that there had been developed new forms and types unknown to antiquity; for which the old laws must be revised; if new ones were not framed".

বিবিধার্থ সংগ্রহের এই সমালোচকের মতে সাহিত্যের নিয়মকানুন চিরসিদ্ধ—তার পরিবর্তন অসম্ভব। কিন্তু সে যুগের সমালোচনা আর সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে রইল না। তার পুষ্টি হল প্রগতিশীল লেখকদের হাতে। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান বঙ্কিমের। কিন্তু রঙ্গলালেরও সেখানে একটু বিশেষ স্থান আছে।

প্রথম কথা বাঙলা ভাষায় পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত সমালোচনা প্রবন্ধ রঙ্গলালেরই লেখা। তাঁর 'বাঙলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' ছাপা হয় ১৮৫২ সালে। ঈশ্বর গুপ্তের 'ভারতচন্দ্র' সম্বন্ধে প্রবন্ধ ছাপা হয় এর তিন বছর পরে ১৮৫৫ সালে। বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে। রঙ্গলালের এই পুস্তিকাখানি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষের লেখা রঙ্গলালের জীবনীতে গ্রন্থকার লিখেছেন যে, তিনি এই ছোট বইখানি সংগ্রহ করতে পারেন নি। ১৯৩৮ সালে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করে ছেপে দেন। রঙ্গলাল এই প্রবন্ধটি ১৮৫২ সালে Bethune Societyর এক সভায় পাঠ করেন। এসব তথ্য মন্মথবাবুর ও ব্রজেনবাবুর রঙ্গলাল জীবনীতে বিবৃত হয়েছে।

দুদিক দিয়ে রঙ্গলালের এই প্রবন্ধটির একটু বিশেষ মূল্য আছে। এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে রঙ্গলাল বলছেন, কাব্যের রূপ কবির পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এ সত্য তিনি নিজের আবিষ্কার বলে বলছেন না। তিনি এক ইংরাজ লেখকের উক্তির ভিত্তিতে এই মত প্রকাশ করছেন। প্রবন্ধের প্রথম পাতায় তিনি বলছেন—'কোন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় জ্ঞানী কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেশকালপাত্র ভেদে কবিতা সতী ভিন্ন ভিন্ন বেশে উদিতা হইয়া থাকেন।' সামাজিক অবস্থার সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম বিচার করেন। বঙ্গদর্শনে ছাপা এক সমালোচনায় তিনি বলেন যে, ক্যোৎ যে রকম দর্শনের ঐতিহাসিক বিচার করেছেন, সাহিত্যের সে রকম কোন ঐতিহাসিক বিচার হয়নি। বঙ্কিমের উপর Mill, Buckle ও Seeley-র প্রভাব যে কত গভীর ও বিস্তৃত তা তাঁর সমালোচনা প্রবন্ধগুলি পড়লে ভাল বোঝা যায়। বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধে বঙ্কিম মহাভারত থেকে আরম্ভ করে জয়দেব ও বৈষ্ণব কবিতা পর্যন্ত ভারতীয় কাব্যের বিচার করে দেখিয়েছেন যে, কাব্য মোটেই সামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষ নয়। রঙ্গলাল তাঁর প্রবন্ধে এত সূক্ষ্ম বিচার করেন নি। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ বছর আগে তিনিই প্রথম বললেন যে, সাহিত্যের রূপ সাহিত্য-স্রষ্টার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু কাব্যের যে দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ এক সার্বভৌম স্বরূপ আছে, তাও রঙ্গলাল বুঝেছিলেন। 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'মনুষ্যের মানসিক ভাবনিচয় সর্বদেশে একই প্রকার। তবে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তাহার কথঞ্চিৎ বিপর্যয় হইবার সম্ভাবনা।' বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর শকুন্তলা মিরাণ্ডা ও দেসদিমোনা প্রবন্ধে কাব্যের আত্মার এই সার্বভৌমতার কথা বলেছেন।

রঙ্গলালের বাঙলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল হরচন্দ্র দত্তের 'Bengali Poetry' প্রবন্ধের উত্তর হিসেবে। হরচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বাঙলা কাব্যে অশ্লীলতার নিন্দা করেন। রঙ্গলাল তখন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য—দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর মমতায় তাঁর প্রাণ তখন ভরপুর। তিনি তাঁর প্রবন্ধে হরচন্দ্রকে আক্রমণ করলেন কঠিন ভাষায় এবং দেখালেন যে, ইংরাজী কাব্যে অশ্লীলতার অভাব নেই। এবং এই ওকালতিতে তিনি গোড়াপত্তন করলেন আমাদের সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার। Shakespeare-এর Venus & Adonais-এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করে দেখালেন ইংরেজ কবির কাছে বাঙালী কবি অশ্লীলতার দিক দিয়ে একেবারে শিশু। রঙ্গলাল তাঁর প্রবন্ধের শেষের দিকে ভারতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী বাঙলা কবিদের সম্বন্ধে দু চার কথা বলেছেন। এর মধ্যে কোন ধারাবাহিক ঐতিহাসিক সমালোচনা নেই। কিন্তু এরূপ সমালোচনার একটি আভাষ এতে আছে। এর আগে একমাত্র কালীপ্রসাদ ঘোষ Literary Gazetteএ ১৮৩০ সালে ছাপা এক ইংরাজী প্রবন্ধে এ রকম একটি ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন।

রঙ্গলালের কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব গভীর ও সুস্পষ্ট। কিন্তু স্বদেশের সাহিত্যের প্রতিও তাঁর মমতা গভীর। সংবাদ প্রভাকর, এডুকেশন গেজেট, বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ প্রভৃতি কাগজে ছাপা তার সমস্ত প্রবন্ধ যদি উদ্ধার করা যায় ত দেখা যাবে যে, Renaissance মন বলতে আমরা যা বুঝি, রঙ্গলালের তা ছিল। তিনি বিদেশীয় সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্যকে মিশিয়ে নিতে চেয়েছেন দেশীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য—সংবাদ প্রভাকরের লেখক—অন্যদিকে আবার ছিলেন তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন বাঙলা সাহিত্যের একজন পথ প্রদর্শক।

# একই জমিতে ধান, গম ও সব্জী চাষ

শ্রীনিশাপতি মাঝি

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা"—কবি বাঙলা দেশকেই উদ্দেশ করে লিখেছিলেন। কিন্তু বাঙলার সে দিন আর নেই। বাঙলার অন্ন ভাণ্ডার আজ শূন্য। কিন্তু এই অন্নই বাঙালীর প্রাণ। ভাগ্যের পরিহাস অন্নপূর্ণার ভান্ডারে অন্ন নেই। অন্ন দাও—অন্ন দাও বলে দুর্গত জনগণ ক্রন্দন করছে। অন্ন সংস্থানের জন্য অন্নদাসের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। খাদ্যের অভাব ও দুর্ভিক্ষের সুযোগে যাঁরা আজ অন্নদাতা হতে চান, তাঁরা নিজেরা কেউ অন্ন উৎপন্ন করেন না। শিশুর অন্নপ্রাশনের মতন তাঁরা অন্ন উৎপন্নকারীর আহার ভক্ষণ করেন—অথচ তাঁরাই

অন্নপূর্ণা

আবার অন্নসত্রের মালিক উত্তরাধিকারী। পঞ্চাশের মন্বন্তর এই ধরণের নির্লজ্জ অন্নের মালিকেরা সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ সক্রিয়। তাই বর্তমানে পল্লীকে আত্মনির্ভরশীল করবার জন্য সরকারী শক্তি বিশেষভাবে নিযুক্ত হ'য়েছে। এ উদ্দেশ্য যদি সার্থক হয়, তবেই পশ্চিম বাঙলা রক্ষা পাবে। কেননা, পশ্চিম বাঙলায় আজ অন্ন সমস্যাই প্রধান হয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার প্রায় ৩৫ হাজার পল্লীর শতকরা ৯০টি পরিবার বর্তমানে অন্ন সমস্যার সম্মুখীন। সহর অঞ্চলে খাদ্য বরাদ্দ এলাকায়, কলকারখানা, খনি এবং চা বাগানে প্রায় ৮০ হাজার আবালবৃদ্ধবনিতাকে অন্নের জন্য প্রতিদিন গলবস্ত্র হ'য়ে দণ্ডায়মান হতে হচ্ছে।

সহরবাসী কোন দিন অন্ন উৎপন্ন করে নি। গ্রামবাসী অন্ন উৎপন্ন করেন এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। অন্নময় পল্লী এইজন্য মধুময় হয়ে থাকতো। পল্লীতে নব অন্ন গ্রহণ করবার আশায় নবান্ন উৎসব করে অন্নপূর্ণার অর্চনা হত। আজকাল নব অন্ন গ্রহণ করবার আর কোন বিধি নিয়মের বালাই নেই। অন্নের নামে ব্রহ্মদেশ থেকে আগত একপ্রকার বাঙালীর অখাদ্য চাল আসছে। দেশের চালও পচা, দুর্গন্ধ, কাঁকর, বালি মিশ্রিত। অন্ন দ্বারা তাই বাঙালীর উদর পূর্ণ হয় না। পক্ষান্তরে পল্লীবাসীও জমি, জায়গায়, হাল লাঙ্গল, সার, বীজ এবং ধর্ম-গোলার কাছে বিদায় গ্রহণ করে চোরাকারবার অথবা রাতারাতি ধনকুবের হবার পথ অন্বেষণ করছে। তাঁতী এতদিন লাঙ্গল ও মাকু সমানভাবে চালাতো—সে আজ লাঙ্গল বাদ দিয়ে মাকু ধরেছে। ঠিক এমনিভাবেই কুমার, ছুতার, কাঁসারী, শাঁখারী, কলু, গোয়ালা, ময়রা প্রভৃতি কৃষি ও শিল্পজীবী স্বীয় কর্মত্যাগ করে শিল্পী ও ব্যবসায়ী হয়ে পড়েছে। দেশের প্রকৃত চাষী মজুর, ভাগচাষী, রাখাল, মহিনদার প্রভৃতি সুযোগ বুঝে রাস্তার কাজে ও মিলের কাজের দিকে ধাবিত হয়েছে।

তা হলে কী উপায়ে পশ্চিম বঙলার সমস্যার সমাধান হবে? এই প্রদেশের প্রায় তিন কোটি লোকের অন্ন কোথায়? দামোদর এবং সমানজোর পরিকল্পনা দ্বারা হয়ত কয়েক বছর পরে এর বাস্তব সমাধান হতে পারে। কিন্তু তার পূর্বে বাঙলার অবস্থা কী হবে? বৃষ্টির তারতম্য, মহামারী এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সূচনা হলে এই প্রদেশের অন্ন সমস্যা কি রকম তীব্র হবে, তা কি বড় কেউ চিন্তা করেন? পশ্চিম বাঙলা ত আজ স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীনতার ভিত্তি—কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কাজের, কিন্তু এই কাজে বড় বেশী আগ্রহ দেখা যায় না। এই দেশের প্রায় ৩৫ হাজার গ্রামে ১ কোটি ১৭ লক্ষ কৃষক। প্রত্যেক গ্রামে কৃষকের গড় সংখ্যা ৭৩জন ছিল। ভাগচাষীর সংখ্যা দেখা যায়—১৭ লক্ষ ৭৭ হাজার। মোট জমি ১ কোটি ২০ লক্ষ একর। এর মাঝে আউস ধানের জমি ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার একর। আমন ধানের জমি ৫৭ লক্ষ ১১ হাজার একর। শাকসব্জী চাষের জমি ৭ লক্ষ ৭২ হাজার একর, তৈল বীজের জমি ১ লক্ষ ৭৭ হাজার একর, কলাই চাষের জমি ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার একর। গম, যব ইত্যাদি চাষের জমি ১ লক্ষ ৭১ হাজার একর, আলু চাষের জমি ৯১ হাজার একর। এখানে এই যে চাষ জমি এবং ফসলের একটা হিসেব দেওয়া হলো—এর

পল্লীর মাটী পরিচর্য্যা।—

পাকা আউস ধান্য।

এই বিবরণটি দেশবাসীর সম্যক উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এজন্যই প্রথমেই সুজলা সুফলা বাঙলা দেশের গৃহলক্ষ্মীর একটি চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রকেই সম্মুখে রেখে বলেছিলেন—'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল'। বাঙলার মাটি, বাঙলার জলের যথার্থ সদ্ব্যবহার দ্বারাই আমরা আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে পারি। এজন্য আমরা শক্তিকে উৎসর্গ করবো, নিজকে একটি পল্লী অঞ্চলে কৃষক বলে পরিচয় দেবো। জানি না এই মনোভাব কবে দেশে জাগ্রত হবে। আমার বিশ্বাস যতদিন এই মনোভাব জাগ্রত না হবে, ততদিন অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হবে না। 'ধনে ধান্যে, ফলে-ফুলে' পল্লীর শ্রী ফুটে উঠবে না।

উন্নতি বর্ধন করা স্বাধীন বাঙলার কর্তব্য নয় কি?

শতকরা পাঁচভাগ জমিতে যদি বেশী ফসলের ধান, ভাল শাকসব্জী উৎপন্ন হত তা হলে বিগত দশ বৎসরে এই প্রদেশের অন্ন সমস্যার আংশিক প্রতিবিধান হতে পারত। তৈল বীজ, কলাই, গম, যব এবং আলু চাষের তথ্য সংগ্রহ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে দেশের উৎপন্ন কার্য নানা সমস্যায় বাধাপ্রাপ্ত। এরকম অবস্থার মাঝে কৃষিবিষয়ক গবেষণামূলক কর্মপন্থা স্থির করতে হয়েছে। তন্মধ্যে সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা সহজ সরল উপায়ে যে সমস্ত বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করতে পারে সেই দিকটাকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসের জমির পরিচর্যার পর আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আউস ধান চাষ হয়ে থাকে। আশ্বিন, কার্তিক মাসে আউস ধান জমি থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এই জমিতে তখন মাটি সিক্ত থাকে। সিক্ত মাটিকে উর্বর করে সার দিয়ে কৃষক যদি এক একর জমিকে চার ভাগে ভাগ করে গম, কলাই, আলু, কপি, বিলাতি বেগুণ প্রভৃতি সব্জী চাষ করে, তা হলে এক একর জমিতে যত পরিমাণ মূল্যে ধান হয়, তত পরিমাণ মূল্যে অন্যান্য ফসল ফলতে পারে। একে একপ্রকার মিশ্র চাষ বলা যেতে পারে।

এইরূপ মিশ্র চাষের বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত এবং তাদের এ বিষয়ে ভাল-ভাবে শিক্ষা দেওয়াও বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, ময়ূরাক্ষী, মশানজোর ও দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত কৃষি কার্য শিক্ষা ও পরীক্ষামূলক নানা আয়োজন হওয়া বাঞ্ছনীয়। জেলাবাসীর এই ইচ্ছাকে প্রবল করে তুলবার জন্য এখানে এক এক জেলার কৃষকের, ভাগচাষীর ও জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি।—

## জেলাসমূহের কৃষকের, ভাগচাষীর ও জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

| জেলা | কৃষকের সংখ্যা | ভাগচাষীর সংখ্যা | মোট জমি (একর) |
|---|---|---|---|
| ২৪ পরগণা | ২০৮৯০০০ | ৩৯২০০০ | ১৬০২০০০ |
| নদীয়া | ৬১৯০০০ | ৪২০০০ | ৬৫৭০০০ |
| মুর্শিদাবাদ | ১১৩৯০০০ | ১২৪০০০ | ৯৪৮০০০ |
| বর্ধমান | ৯১০০০ | ২৬৯০০০ | ১১৬০০০০ |
| বাঁকুড়া | ৭৬৪০০০ | ৫০০০০ | ১০১৪০০০ |
| বীরভূম | ৭১৭০০০ | ৯২০০০ | ৭১৮০০০ |
| মেদিনীপুর | ২৫২৭০০০ | ১৬৪০০০ | ২২৬৮০০০ |
| হুগলী | ৭২৯০০০ | ২০২০০০ | ৫৬৩০০০ |
| হাওড়া | ৫৮১০০০ | ১৫৮০০০ | ২৪৯০০০ |
| পশ্চিম দিনাজপুর | ৫১২০০০ | ৭১০০০০ | ৭৩১০০০ |
| জলপাইগুড়ি | ৩৭৫০০০ | ১০০০০০ | ৮৩১০০০ |
| দার্জিলিং | ১০০০০০ | —— | ৫৪৬০০০ |
| মালদহ | ৬০৫০০০ | ১১৩০০০ | ৬৭১০০০ |
| মোট | ১১৭৫১০০০ | ১৭৭৭০০০ | ১২০৩৮০০০ |

আউসধান্য চাষের পর গম, কলাই ও সব্জীর চাষ।
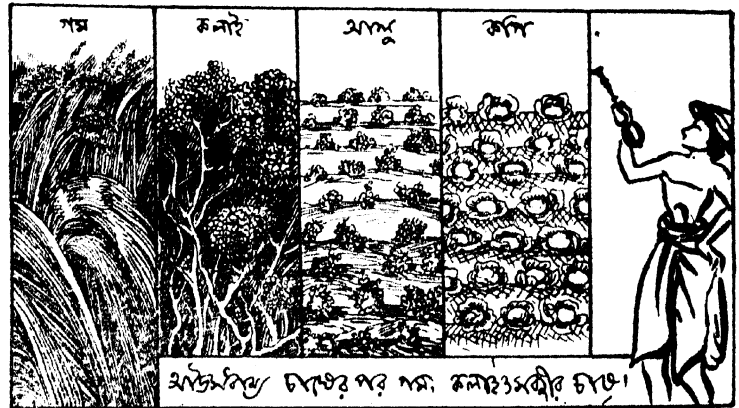
প্রবন্ধের ছবিগুলি শ্রীসুভাষ দে কর্তৃক অঙ্কিত।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গভর্নর শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ভারত রাষ্ট্রের বড়লাটের পদ পাইয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইংরেজের সম্পূর্ণ শাসনকালে রাজনীতিক ব্যাপারে তাঁহার সহিত বাঙলার নেতৃগণের বিরোধিতা ছিল—তিনি প্রথমে চিত্তরঞ্জনের ও পরে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালী—তিনি গভর্নর হইয়া আসিলে—তাঁহাকে, পূর্ব কথা স্মরণ রাখিয়াও—গভর্নরের প্রাপ্য সম্মান দিয়াছে,—

Render unto Caesar the things which are Caesar's.

বর্তমান শাসন পদ্ধতিতে নিয়মানুগ গভর্নরের পক্ষে "শোভার্থ" হইয়া থাকাই নিয়ম এবং শাসনকার্যে তাঁহার হস্তক্ষেপের অবকাশ অল্প। তিনি তাহা বুঝিয়া কাজ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, এমন বলিতে পারি না। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী দেশগুলি পাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দাবী তিনি সমর্থন করেন নাই এবং সে বিষয়ে নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতেও পারেন নাই। তাঁহার উক্তি বিহারের সমর্থন-দ্যোতক। তিনি বলিয়াছেন, ভারত রাষ্ট্রের সকল প্রদেশ এক—সুতরাং সীমা লইয়া—কোন কোন স্থান কোন কোন প্রদেশে থাকিবে তাহা লইয়া আন্দোলনের কোন কারণ নাই। অর্থাৎ কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি যাহাই কেন থাকিয়া থাকুক না, আজ যদি কংগ্রেসের ক্ষমতা যাঁহারা পরিচালিত করিতেছেন তাঁহারা তাহা ত্যাগ করেন, তবে তাহাতেও আপত্তি করিও না। আমাদিগের কিন্তু মনে হয়, যাঁহারা কংগ্রেসের ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাঁহারা যদি কংগ্রেসের নীতিভ্রষ্ট হন, তবে তাঁহাদিগের সে ক্ষমতা সম্ভোগ করিবার অধিকার তাঁহারা পাইতে পারেন না। সে যাহাই হউক, তিনি পশ্চিমবঙ্গকে যাহা বলিয়াছেন; বড়লাট হইয়া যদি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তাহা বলেন, তবে যেমন তাহা সঙ্গত হইবে, তেমনই তিনি যদি কংগ্রেসের নীতি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া কংগ্রেসের প্রতি লোকের আস্থা অবিচলিত রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত কাজ করিবেন।

তিনি বলিতেছেন বটে, কোন্ জিলা কোন্ প্রদেশান্তর্বর্তী থাকিবে, তাহাতে কিছুই আসে যায় না; কিন্তু বিহারের সংবাদপত্র 'সার্চলাইট' লিখিয়াছেন, বিহারের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, বিহার সূচাগ্রভূমি অন্য প্রদেশকে দিবে না।

বাঙালীকে বিতাড়িত করিবার বা হিন্দী ভাষাভাষী করিবার জন্য বিহারে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার নূতন পরিচয় সম্প্রতি পুরুলিয়া হইতে পাওয়া গিয়াছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সংবাদদাতা পুরুলিয়া হইতে লিখিয়াছেন, "জিলাবাসীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মানভূমকে বিশেষ কোন প্রদেশে

(অর্থাৎ বিহারে) রাখিবার জন্য অবাঞ্ছিত কর্মব্যবস্থার আশ্রয় লওয়া হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে একটি জয়েণ্ট কমিটি গঠিত হইয়াছে। জিলার উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারগণ ও জিলার অপর কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া এই কমিটি গঠিত।" কমিটির উদ্দেশ্যঃ—

(১) নূতন পাঠ্যতালিকায় হিন্দীকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাহা সমস্ত উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে চালাইবার জন্য জিলার বিদ্যালয়-পরিদর্শককে অনুরোধ করিতে হইবে। যদি বোর্ড এই বিষয়ে বিরোধিতা করে, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ সরকারের গোচরে আনিতে হইবে।

(২) সমস্ত নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে হিন্দী শিক্ষা দিবার শিক্ষাকেন্দ্র খুলিতে হইবে। শিক্ষাদান কার্যের ভার কেবল বিহারী-দিগকে দিতে হইবে।

(৩) নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্য হিন্দী-তেই আবদ্ধ থাকিবে।

মে ও জুন মাসে প্রায় সকল থানাতেই—বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্ত অঞ্চলে পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে হইবে। এই কাজের জন্য অবাধে অর্থ ব্যয় করা হইবে—কর্মীরা বেতন পাইবেন, মোটর গাড়ীও দেওয়া হইবে।

আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া বাঙালীদিগের পক্ষে বাঙলীপ্রধান মানভূম জিলায় বাস দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। বাঙালীদিগের সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিমূলক সম্মিলনও নিষিদ্ধ হইতেছে। কোন সভায় শ্রোতারা হিন্দী বুঝেন না বলিয়া কেহ যদি কোন বক্তার উক্তি বাঙলায় বুঝাইয়া দেন, তবে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কোন না কোন অছিলায় মামলায় সোপর্দ করা হয়। খ্যাতনামা বাঙালী কংগ্রেসকর্মীরাও মামলা-সোপর্দ হইতেছেন। যে সকল বাঙালী পুরুষানুক্রমে বন্দুক রাখিবার ছাড় পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের ছাড়ও বাতিল করিয়া বাঙালীদিগকে আত্মরক্ষায় অক্ষম করা হইতেছে। গত নির্বাচনকালে যেমনভাবে রাঁচীতে আদিবাসীদিগকে হত্যা পর্যন্ত করা হইয়াছিল, মানভূমে বাঙালীদিগকেও কি সেই-ভাবে ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে? অথচ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যে মানভূম রাজনীতিক সম্মিলনে মানভূম, সিংহভূম ও অন্যান্য বঙ্গ-ভাষাভাষী স্থান বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল—রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনিও বাঙলায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নির্বিঘ্নতা আইনের অপব্যবহার করিয়া শ্রীজওহরলাল বসুর মত শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ শিক্ষাব্রতীকে লাঞ্ছিত করা হইয়াছে। অথচ তিনি যে ছাত্র কংগ্রেসে যোগদান করার অপরাধে অভিযুক্ত বিহারের প্রধানমন্ত্রীই তাহার অধিবেশনের অনুমতি দিয়াছিলেন।

অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহাতে প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা ও গান্ধীজীর শিষ্য শ্রীবিভূতি-ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি জিলা কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া সরকারী ও বেসরকারী অনাচারীদিগের সম্বন্ধে সত্যাগ্রহীর উপযুক্ত কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

গত ১৮ই এপ্রিল আদ্রায় মানভূম জিলা ছাত্র কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেই সম্পর্কে ডক্টর অতীন বসু, আদ্রা হাইস্কুলের ৬০ বৎসর বয়স্ক প্রধান শিক্ষক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিহার সরকার মামলা উপস্থাপিত করিয়াছেন। গত ২৫শে মে হইতে ৪ঠা জুন পর্যন্ত পুরুলিয়ায় যে শিক্ষা-শিবির চলিয়াছিল, তাহার কার্যে পুলিশ হস্তক্ষেপ করিয়াছিল এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে মামলা-সোপর্দ করিয়াছে।

বিহার সরকার বিহারের আদালতসমূহে হিন্দী ভাষায় কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অথচ ধানবাদেও বর্তমানে আদালতে বাঙলা চলিত আছে।

এই সকল ব্যবহারের পরেও কি বলিবার কোন উপায় আছে যে, বিহার সরকার বিহারে বাঙালীদিগকে অবাঞ্ছিত বলিয়া ব্যবহার করেন? যদি তাহাই হয়, তবে বাঙলায় বিহারীরা কি সেইরূপ ব্যবহার লাভ করিতে প্রস্তুত আছেন? ভারত রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যদি অধিবাসীরা এইরূপ প্রাদেশিকভাবে প্রভাবিত হয়, তবে সে রাষ্ট্রের শক্তি কি তাহার আত্মরক্ষার পক্ষেও যথেষ্ট থাকিবে?

বিহারে বাঙলাকে দুর্বল করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু যে বলিয়াছেন, মালদহের কতকাংশ বিহারের অধিকৃত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মানভূমে যেমন বেতন দিয়া হিন্দী প্রচারক নিযুক্ত করা হইয়াছে, তেমনই সুবিধা-বাদীদিগকে সুবিধা দিয়া মালদহে মালদহ বিহারভুক্ত হইবে এই আন্দোলন প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সুবিধাবাদীদিগের মধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের একজন ভূতপূর্ব সুবিধাবাদী সদস্যও আছেন।

একদিকে বাঙলাকে বলা হইয়াছে, এখন বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি পশ্চিম বঙ্গভুক্ত করিবার আলোচনা করিয়া ভারত সরকারকে যেন বিব্রত করা না হয়, আর একদিকে বাঙলার দাবী মানিয়া লইবার বিলম্বের সুযোগে বিহার তাহার দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ কিছুতেই তাহার দাবীর জন্য আন্দোলনে বিরত থাকিতে পারে না।

আপাতত যদি বাঙলা সরকার বাঙলায় বিহারীদিগকে নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে কি তাহা বিহারের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইবে?

আসামে বাঙালীদিগকে নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত করবার জন্য যে অসমীয়া প্রধান কংগ্রেসী সরকার উদ্যত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আসামের রিফর্মস কমিশনার জিলায় রাজকর্মচারীদিগকে নির্দেশ দিয়াছেনঃ—

"সরকার এ বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছেন যে, জিলায় স্থায়ী অধিবাসী নহে এমন লোক আছে। তাহারা তাহাদিগের বন্ধু বা আত্মীয়দিগের নিকট অথবা শ্রমিক বা শরণাগতরূপে বাস করে। আপনার অধীনস্থ কর্মচারীরা যেন বিশেষ লক্ষ্য রাখে যে, ভোটদাতৃগণের তালিকায় কোনরূপে তাহাদিগের একজনেরও নাম যেন স্থান না পায়।"

এই নির্দেশের ফলে আসামে কত বাঙালী ভোটদানের অধিকারে বঞ্চিত হইবে এবং ইহার ফলে কত অনাচার হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

গৌহাটির ঘটনা প্রসঙ্গে আসাম সরকার ও অসমীয়াগণ যাহাই কেন বলুন না, থানা হইতে অদূরে কিরূপে হিন্দুদিগের দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং পুলিশ তাহাতে বাধা দেয় নাই তাহার কৈফিয়ৎ কি? হিন্দুদিগের দোকানগুলি হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি উদ্ধার করিবার জন্য কি এ পর্যন্ত খানাতল্লাস হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি?

যে সকল বাঙালী রেল কর্মচারী আসামে গিয়াছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় তথায় গমন করেন নাই—ভারত রাষ্ট্রের রেল বিভাগ তাঁহাদিগকে তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। অথচ গত আগষ্ট মাসে আসাম জাতীয় মহাসভার শ্রীঅম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী জুবিলী পার্কে এক সভায় ইঁহাদিগের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া অসমীয়াদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন এবং আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীনীলমণি ফুকন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থায় আসামে প্রেরিত বাঙালী রেল কর্মচারীদিগকে আসাম হইতে বিতাড়িত করিবার কথাও বলিয়াছিলেন। ইহারই ফলে টিকিট লইয়া রেল যাত্রীর সহিত সংঘর্ষ হয়। আজ এই শ্রীঅম্বিকাগিরিই আসামে "শান্তি সমিতির" সদস্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বরূপ লোক ভুলিবে না। নিহত বাঙালীর মৃত্যুর জন্য কাহারা দায়ী তাহা আজ বাঙলার লোক জানিতে চাহিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বাঙলায় যে সকল আসামী রহিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীঅম্বিকাগিরি চৌধুরী ও শ্রীনীলমণি ফুকনের নিন্দা করিয়া কোন প্রকাশ্য সভা করিয়াছেন কিনা? আর শ্রীগোপীনাথ বরদলই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? আমরা আশা করি, আসামে বাঙালীরা শ্রীঅম্বিকাগিরির মত লোকের সহিত শান্তি সমিতিতে একযোগে কাজ করা অসম্মানজনক বিবেচনা করিবেন—কারণ, সসর্প গৃহে বাস কখনই গৃহস্থের পক্ষে বাঞ্ছিত হইতে পারে না। বাঙালীদিগের পক্ষে তাঁহার মত লোকের সম্বন্ধে মনোভাব গোপন করিবার কোন কারণ নাই। সেই জন্যই আইরিশ নেতা পার্নেল যে ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাই আজ "বয়কট" নামে পরিচিত। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাহাই "বহিষ্কার" বলিতেন এবং তাহা "বহিষ্কার" না বলিয়া আমরা "বর্জন" বলিতে পারি।

আসামের পরে আমরা উড়িষ্যার কথা বলিব। বর্ণপুর টাউন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী জানাইয়াছেন, পুরীতে তীর্থযাত্রী বাঙালীদিগের যে লাঞ্ছনা হইতেছে, তাহার মূলে উড়িয়াদিগের বাঙালী-বিদ্বেষ সপ্রকাশঃ—"পুরীর গৌরবাটসাহীর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী চিকিৎসকের বাড়ীতে গত ১লা জুন বেলা ১১টায় একদল উড়িয়া যুবক অনধিকার প্রবেশ করিয়া গৃহের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহের নারীরা তাহাদিগের কার্যের প্রতিবাদ করিলে আগন্তুকগণ যে সকল মন্তব্য করে, সে সকলের অর্থ—বাঙালীদিগের উড়িষ্যায় গৃহ নির্মাণ করিবার ও বসবাসের কোন অধিকার নাই। বাঙালীরা মানে মানে উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া না যাইলে এইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিবেন। মধ্যাহ্নে গৃহস্বামী এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ উপস্থিত করিলে বেলা ৪টায় সেই যুবকদল আবার আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া থানায় সংবাদদানের জন্য শাসাইয়া যায়। যখন পুরীর বাসীন্দা বাঙালীর উপর এইরূপ অত্যাচার হইতে পারে, তখন তীর্থযাত্রী বাঙালীদিগের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

গত ১৭ই জুন উড়িষ্যার 'প্রজাতন্ত্র' পত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হইয়াছেঃ—

"আমাদের অফিসে জনৈক জনসেবক আসিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, কতকগুলি চরিত্রহীন যুবক পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে নবাগত যাত্রীদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে। পুরীর রাজার অফিসে ও সরকারী দপ্তরে তিনি বহুবার

বিষয়ে অভিযোগ করিয়াছেন; কিন্তু এ ...ন্ত প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই।" পুরীর কয়েকজন বিশিষ্ট অধিবাসী ...বৃতি দিয়াছেন—

"পুরী সহরে দিন দিন যেরূপ গুণ্ডার ...রাত্ম্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে জনসাধারণের প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী উড়িষ্যার ব্যবস্থা ...রিষদে এ সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ...তিশ্রুতি প্রদান করিলেও এই সকল দুষ্কৃত-...রীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থাই হয় নাই। ...হ তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে তাঁহাকে ...র করা হয়।

অল্প দিন পূর্বে আমরা সমুদ্রতীরে সাতকড়িপতি রায়ের পরিজনগণের লাঞ্ছনার ...ল্লেখ করিয়াছিলাম। গুণ্ডারা এইরূপ কাজ ...রিতেছে বলিয়াই উড়িষ্যা সরকার অব্যাহতি ...ত করিতে পারেন না। বিশেষ অত্যাচার যে ...ঙালীদিগের উপরেই হইতেছে, তাহা লক্ষ্য ...রা প্রয়োজন। উড়িষ্যার সরকার কি অযোগ্যতার ...া বাঙালী বিদ্বেষে সহায়তার পরিচয় ...তেছেন?

উড়িষ্যার স্বায়ত্ত শাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকার ...দি এই অবস্থার প্রতীকার না করেন, তবে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কি সে বিষয়ে অনবহিত ...াকিবেন? পুরীতে যদি বাঙালীরা লাঞ্ছিত ...ন তবে পশ্চিম বঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব নহে; কারণ মানুষের ধৈর্যের সীমা আছে এবং একবার কলিকাতায় তাহার পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে।

যদি বাঙালী তীর্থযাত্রীরা ও স্বাস্থ্যা-ন্বেষীরা পুরীতে গমনে বিরত হয়, তাহা হইলেও যে উড়িষ্যার লোকের আর্থিক দুরবস্থা অনিবার্য হয় তাহাও বলা বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি পশ্চিমবঙ্গে প্রতি-শোধাত্মক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সরকারী বা বেসরকারী ব্যবহার সম্ভাবনা বিহার সরকার, আসাম সরকার ও উড়িষ্যা সরকারকে জানাইয়া দিবেন? তাঁহারা যদি ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালীর ধন প্রাণ মান রক্ষার চেষ্টা না করেন, তবে লোক তাঁহাদিগেরই পদত্যাগ দাবী করিবে।

প্রতিবেশী প্রদেশসমূহে বাঙালীর প্রতি এই কুব্যবহার প্রতিকারের দায়িত্ব যে ভারত সরকারের নাই, এমনও বলা যায় না। তাঁহারা যে সেই দায়িত্ব পালনে অবহিত নহেন, যদি বাঙলার প্রতি তাঁহাদিগের কয়জনের মনো-ভাবই তাহার কারণ হয়, তবে তাহা একান্তই পরিতাপের বিষয় হইবে। ক্ষমতা যদি মানুষকে সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠিতে অক্ষম করে, তবে সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হয় না। আর যে দুইজন বাঙালী ভারত সরকারে রহিয়াছেন, তাঁহারা এবিষয়ে কি করিতেছেন? তাঁহারা যে বাঙলার প্রতিনিধি তাহা তাঁহারা কখনই ভুলিতে পারেন না এবং বাঙলার লোকমতের জন্য, প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন। বাঙলা তাঁহাদিগের নিকট সেই দৃঢ়তার পরিচয় পাইবার আশা অবশ্যই করিতে পারে। ভারত সরকারের পক্ষে ভারত রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যও বিভিন্ন প্রদেশে সম্প্রীতি রক্ষা করা যে প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহারা এ বিষয়ে নির্বাক হইয়া থাকিলে তাহা অশোভন ব্যতীত আর কিছুই মনে করিবার উপায় থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ যে ভারত সরকারের মন্ত্রী ও কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াও বিহারের স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ গোপন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই, তখন ভারত সরকারের বাঙালী মন্ত্রীদ্বয়ের পক্ষেও বাঙলার সঙ্গত স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা কখনই অসংগত হইতে পারে না।

আবার বাঙলার ভিতর হইতেও বিপদ লক্ষিত হইতেছে। সেদিন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল, তাহাতে শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি ছাত্র পরীক্ষা-বিশেষের দিন পিছাইয়া না দেওয়ায় অনশন আরম্ভ করে। আর বহু ছাত্র তাহাদিগের সহিত সহানুভূতিতে বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে প্রবেশ করিয়া কর্তাদিগকে বন্দী করে। যদিও একজন পুলিশকে ছুরিকাঘাত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পাদুকা প্রক্ষেপ ছাত্র-দিগের পক্ষ হইতে অস্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি যে ব্যবহারের জন্য পুলিশ আসিয়া ছাত্রদিগকে গ্রেপ্তার ও ছত্রভঙ্গ করে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—বাঙলার ভবিষ্যৎ আশা তরুণদিগের পক্ষে গৌরবজনক নহে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন—নানা পরীক্ষার বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করা হয়, একটি পরীক্ষার দিন পিছাইয়া দিলে সব পরীক্ষার সময় পরিবর্তিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরি-চালকগণ যে বিচার-বিবেচনা না করিয়া দিন স্থির করেন, এমন মনে করিবারও কারণ থাকিতে পারে না। সে অবস্থায় শৃঙ্খলাভঙ্গ করিবার কি কারণ অনুমান করা যায়?

আজ আমাদিগের মনে পড়িতেছে, প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে স্যার উইলিয়াম উইলসন হাণ্টার বলিয়াছিলেন—ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্জন করা হইয়াছে—কেবল একটি বিরাট কেরাণী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইতেছে। সেই শিক্ষা-পদ্ধতিতে তিনটি বিষয় অজ্ঞাত হয়—সেই তিনটি মানব-চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন-দ্যোতক—শৃঙ্খলা, ধর্ম ও সন্তোষ। সেকালে ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ে বেত্র ব্যবহৃত হইত, একালে তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ—তাহাতে শৃঙ্খলার অভাব হইতেছে; সেকালে এদেশে বিদ্যালয়ে ধর্মের অত্যধিক আদর ছিল—এখন বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা হইতে বর্জিত—তাহাতে লোকের ধর্মজ্ঞানের অভাব ঘটিতেছে; লোকের যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব, শিক্ষায় লোকের মনে সেই আশার ও আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইতেছে। তাই তিনি বৃটিশ সরকারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ—

"What are you to do with their great clever class, forced up under a foreign system, without discipline, without contentment, and without a God?"

আজ সেই উক্তি ভবিষ্যৎবাণীর মতই শুনাইতেছে।

এই শৃঙ্খলার অভাব সহসা আত্মপ্রকাশ করে নাই, ইহা দিন দিন বর্ধিত হইয়াছে। পরীক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে দাতৃগণের প্রতিকৃতি বিকৃত করিয়াছে। তাহারা পরীক্ষার সময় দুর্নীতির পরিচয় দিয়াছে এবং একজন পরিদর্শক নিহতও হইয়াছেন; ভাইস-চ্যান্সেলার বিধানবাবু লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন; ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল অপমানিত হইয়াছিলেন। এই সকলের প্রতিকার চেষ্টা হয় নাই। আজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। শৃঙ্খলার অভাব যেভাবে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে, তাহাতে জাতির ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা বিবেচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বাঙালী মাত্রেরই এখন প্রথম চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত—বাঙালীকে বাঁচিতে হইবে, তাহার পরে তাহাকে সকল ক্ষেত্রে তাহার পূর্বাবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেই বিষয়ে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার যদি আবশ্যক চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহাদিগের পদে অবস্থিত থাকিবার কোন অধিকার নাই। আব্রাহাম লিংকন বলিয়াছেনঃ—

দেশ ও দেশের সকল প্রতিষ্ঠান দেশবাসী-দিগের। যখনই তাহারা বর্তমান সরকার সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইবে তখনই তাহারা নিয়মানুগ অধিকারে তাহার সংশোধন বা বিপ্লবের দ্বারা তাহার অবসান ঘটাইতে পারে।

বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল গান্ধীঘাট নির্মাণে যে তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকের আহার্য বৃদ্ধির কার্যে সে তৎপরতা দেখাইতে পারিতেছেন না। ইহা দুঃখের বিষয়। কৃষি বিভাগের কাজ এখনও কিভাবে চলিতেছে, বাঁকুড়া জিলার ঝাঁটি-পামারী হইতে 'দেশের' একজন পাঠক কর্তৃক লিখিত পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

(১) ছাতনা সার্কেলের কৃষিবিভাগের সহ-কারী ইনস্পেক্টর পত্রলেখককে জানাইয়াছিলেন, সরকার লম্বা আঁকড়া তুলার চাষ করিতে আগ্রহশীল। তিনি সেইজন্য পত্রলেখককে তাঁহার মারফৎ বীজ, সার প্রভৃতির জন্য আবেদন করিতে বলেন। দীর্ঘ ৫ মাসেও তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(২) ছাতনা ইউনিয়নের কৃষিবিভাগের সহকারী কর্মচারী পত্রলেখককে বলেন, সরকার প্রতি ইউনিয়নে ২টি পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ করিতে চাহে—তাঁহার একটি পুষ্করিণীতে

সকল সমস্যা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ তাহার সমস্যার সমাধান করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে।"

ঐ দিন রাত্রিতে বড়লাট প্রাসাদে লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেনকে একটি ভোজসভায় বিদায়-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত সভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহর, বলেন, "মাউণ্টব্যাটেন পরিবার ভারতের সহিত তাঁহাদের আন্তরিক যোগ-সূত্রকে অচ্ছেদ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা কোনদিনই ছিন্ন হইবে না। আপনাদের সহিত কোথাও না কোথাও দেখা হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। দেখা হউক আর নাই হউক, আপনাদিগকে আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না।" পণ্ডিতজী অতঃপর বলেন, "ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়া আমরা ঐতিহাসিক দৃশ্যে অভিনয় করিলাম। গত বৎসর হইতে আমরা কি করিয়াছি, তাহা আমার পক্ষে—এমন কি, অন্য কাহারও পক্ষে স্থির করা কঠিন। আমরা এই সকল ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। হয়তো আমরা অনেক ভুল করিয়াছি। আমরা আমাদের নিজেদের উদ্দেশ্য বিচার করিতে পারি না। তবে আমাদের বিশ্বাস, আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা ঠিকই করিয়াছি—আপনিও ভারতকে সুপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই মনে হয়, আমাদের এই কার্যের ফলে আমাদের সমস্ত পাপ মুছিয়া যাইবে। লোকে আমাদের ভুল ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে দেখিবে।"

২১শে জুন সকাল সাড়ে দশ ঘটিকায় রাজাজী ভারতের রাষ্ট্রপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তাঁহার প্রতি এই সম্মাননার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে ভারতের প্রত্যেকটি লোক যাহাতে তাহাদের নাগরিক অধিকারের জন্য গর্ব ও আনন্দ বোধ করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই ভারত গভর্নমেণ্টের নীতি। কোন একটি বিশেষ বংশের শাসন যন্ত্রের দ্বারা আধিপত্য বিস্তারের দিন ভারতে শেষ হইয়াছে। কোন একটি অঞ্চল, জাতি অথবা ধর্ম-সম্প্রদায় অন্যের সহযোগিতা ব্যতীত বলপ্রয়োগের দ্বারা উন্নতি করিতে পারিবে না অথবা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে না। এই কারণে সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য পরিহার করা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। নিজেদের চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ না করিয়া নিজেদের সম্প্রসারিত করাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কর্তব্য।"

নূতন রাষ্ট্রপাল শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেনের বিদায় দৃশ্য দর্শন করিতেছেন

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু

শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপালের পদ শূন্য হয়; সে পদ গ্রহণ করেন ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু। ২১শে জুন তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন। পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশপাল রূপে শপথ গ্রহণান্তর তিনি প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ প্রসঙ্গে সাধারণ লোকের জীবন-ধারার উন্নতিবিধান এবং গ্রামবাসীদের মঙ্গলসাধন করার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

পশ্চিম বঙ্গের নূতন প্রদেশপাল শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কাটজু কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন

# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(২৭)

হেমন্তের কাবুল 'মধ্যযুগীয় সম্প্রসারণে ফুলে ওঠে', ইংরেজিতে যাকে বলে 'মিডল এজ্ স্প্রেড।' অর্থাৎ ভুঁড়িটি মোটা হয়, চলচলন ভারিক্কিভরা।

যব গমের দানা ফুলে উঠল, আপেল ফেটে পড়ার উপক্রম, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত গ্রীষ্ম ভর রোদ বাতাস বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, হাওয়া বইলে ডাইনে বাঁয়ে নাচন তোলে না, ঠায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কাঁপে, না হয় থপ করে ডাল ছেড়ে গাছতলায় শুয়ে পড়ে। প্রথম নবান্ন হয়ে গিয়েছে, চাষীরা ও খেয়ে দেয়ে মোটা হয়েছে। শীতকাতুরেরা দুটো একটা কাবুলি জামা পরে ফেলেছে। গাধাগুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠেছে, খড় চাপানো গাড়ীর পেট ফেটে গিয়ে এদিক ওদিক কুটোর নাড়ী ছড়িয়ে পড়ছে।

অর সফল হয়ে ফেঁপে ওঠার আসল গরিমা দেখা যায় সকাল বেলার শিশিরে। বেহায়া বড়লোকের মত কাবুল উপত্যকা কেবলি হীরের আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়, ঝলমলানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

কিন্তু এসব জেল্লাই কাবুল নদীর রক্তশোষণ করে। সাপের খোলসের মত সে নদী এখন শুকিয়ে গিয়েছে, বাতাস বইলে ধুক চিরে বালু ওড়ে। মার্কস তো আর ভুল বলেন নি, 'শোষণ করেই সবাই ফাঁপে।'

যে পামমান পাহাড়ের বরফের প্রসাদে কাবুল নদীর জৌলুস সে তার চূড়াগুলো থেকে এক একটা করে সব কটা সাদাটুপি খসিয়ে ফেলেছে। আকাশ যেন মাটির তুলনায় বড্ড বেশী বাড়িয়ে গেল—নীলচে খে পোলাটে ছানি পড়েছে।

পাকা, পচা ফলের গন্ধে মাথা ধরে; আফগানিস্থানের সরাইয়ের চতুর্দিকে বন্ধ বনে দুর্গন্ধ যে রকম বেরুতে পারে না, কাবুল উপত্যকার চারদিকে পাহাড় বলে তেমনি পাকা ফল ফসলের গন্ধ সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বাড়ীর সামনে যে ঘূর্ণিবায়ু খড়কুটো পাতা নিয়ে বাহিরে যাবে বলে রওয়ানা দেয় সেও দোঁধ খানিকক্ষণ পরে ঘুরে ফিরে কোনদিকে রাস্তা না পেয়ে মেকি টাকাটার মত সেই মাঠে ফিরে এসে সবশুদ্ধ নিয়ে থপ করে বসে পড়ে।

তারপর একদিন সন্ধ্যের সময় এল ঝড়। প্রথম ধাক্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম, মেলে দেখি শেলির 'ওয়েস্ট উইন্ড' কবিতার 'অটাম'কে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে,—সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'। খড় কুটা, জমে-ওঠা পাতা, ফেলে-দেয়া কুলো সবাই চলল দেশ ছেড়ে মুহাজিরিন হয়ে। কেউ চলে সার্কাসের সঙের মত ডিগবাজি খেয়ে, কেউ হনুমানের মত লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে আর বাদবাকি যেন ধনপতির দল—প্রলেতারিয়ার আক্রমণের ভয়ে একে ওকে জড়িয়ে ধরে।

অর্ধ ঘণ্টার ভেতর সব গাছ বিলকুল সাফ। সে কী বীভৎস দৃশ্য!

আমাদের দেশে বন্যার জল কেটে যাওয়ার পর কখনো কখনো দেখেছি কোন গাছের শেকড় পচে যাওয়ায় তার পাতা ঝরে গিয়েছে—সমস্ত গাছ ধবলকুষ্ঠ রোগীর মত ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে।

এখানে সব গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে, নেঙ্গা সঙ্গীন আকাশের দিকে উঁচিয়ে।

দু এক দিন অন্তর অন্তর দেখতে পাই গোর দিতে মড়া নিয়ে যাচ্ছে। আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলুম কোথাও মড়ক লেগেছে কি না। আব্দুর রহমান বললো,

'না হুজুর; পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োরাও ঝরে পড়ে। এই সময়েই তারা মরে বেশী।'

খবর নিয়ে দেখলুম, শুধু আব্দুর রহমান নয় সব কাবুলীরই এই বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে আব্দুর রহমানের সঙ্গে আমার রীতিমত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। তার জন্য দায়ী অবশ্য আব্দুর রহমানই।

রাত্রেই কোন একটা কাজ নিয়ে আমাকে খাইয়ে দাইয়ে সে রোজ আমার পড়ার ঘরের এক কোণে আসন পেতে বসে,—কখনো বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়ায়, কখনো চাল ডাল বাছে, কখনো কাঁকুড়ের আচার বানায় অর নিতান্ত কিছু না থাকলে সব ক জোড়া জুতো নিয়ে রঙ লাগাতে বসে।

আব্দুর রহমানের জুতো ব্রুষ করার কায়দা মামুলী সায়ান্স নয়, অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার অর্ধেক মেহন্নত দিয়ে মোনা লিসার ছবি আঁকা যায়।

প্রথম খবরের কাগজ মেলে তার মাঝখানে জুতো জোড়াটি রেখে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে। তারপর দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে যদি কোথাও শুকনো কাদা লেগে থাকে তাই ছাড়াবে। তারপর লাগাবে ইঞ্জিনের পিস্টনের গতিতে ব্রুষ। তারপর মেথিলেটেড স্পিরিটে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বেছে বেছে যে সব জায়গায় পুরোনো রঙ জমে গিয়েছে সেগুলোকে অতি সন্তর্পণে ওঠাবে। তারপর কাপড় ধোবার সাবানের উপর ভেজা ন্যাকড়া চালিয়ে তাই দিয়ে জুতোর উপর থেকে আগের দিনের রঙ সরাবে। তারপর নির্বিকার চিত্তে আধঘণ্টাটাক বসে থাকবে জুতো শুকোবার প্রতীক্ষায়—'ওয়াশের' আর্টিস্টরা যে রকম ছবি শুকোবার জন্য সবুর করে থাকেন। তারপর তার রঙ লাগানো দেখে মনে হবে প্যারিস-সুন্দরীও বুঝি এত যত্নে লিপস্টিক লাগান না—তখন আব্দুর রহমানের ক্রিটিকাল মোমেন্ট, প্রশ্ন শুধোলে সাড়া পাবেন না। তারপর বাঁ হাত জুতোর ভেতর ঢুকিয়ে ডান হাতে ব্রুষ নিয়ে কানের কাছে তুলে ধরে মাথা নিচু করে যখন ফের ব্রুষ চালাবে তখন মনে হবে তাকসাইটে কলাবৎ সমে পৌঁছিবার পূর্বে যেন দমে মজে গিয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে গিয়েছেন। তখন কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না, 'সাবাস' বললেও ওস্তাদ তেড়ে আসবেন।

সর্বশেষে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দেবে, মনে হবে দীর্ঘ অদর্শনের পরে প্রেমিক যেন প্রিয়ার চোখে মুখে, কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম দিন আমি আপন অজানাতে বলে ফেলেছিলুম, 'সাবাস।'

একটি আট ন বছরের মেয়েকে তারি সামনে আমরা একদিন কয়েকজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিলুম—সে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। যখন সকলের বলা কওয়া শেষ হল তখন সে শুধু আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তবু তো আজ তেল মাখিনি।'

আব্দুর রহমানের মুখে ঠিক সেই ভাব।

গোড়ার দিকে প্রায়ই ভেবেছি ওকে বলি যে সে ঘরে বসে থাকলে আমার অস্বস্তি বোধ হয়, কিন্তু প্রতিবারেই তার স্বচ্ছন্দ সরল ব্যবহার দেখে আটকে গিয়েছি। শেষটায় স্থির করলুম, ফার্সীতে যখন বলেছে এই দুনিয়া মাত্র কয়েকদিনের মুসাফিরী ছাড়া আর কিছুই নয়

তখন আমার ঘরে আর সরাইয়ের মধ্যে তফাৎ কোথায়? এবং আফগান সরাই যখন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতায় প্যারিসকেও হার মানায় তখন কমরেড আব্দুর রহমানকে এঘর থেকে ঠেকিয়ে রাখি কোন হক্কের জোরে? বিশেষতঃ সে যখন অন্যাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাদামের খোসা ছাড়াতে পারে, তবে আমিই বা তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রাশান ব্যাকরণ মুখস্থ করতে পারব না কেন?

আব্দুর রহমান ফরিয়াদ করে বলল, আমি যে মুইন-উস-সুলতানের সঙ্গে টেনিস খেলা কমিয়ে দিয়ে রাশান রাজদূতাবাসে খেলতে আরম্ভ করেছি সেটা ভালো কথা নয়।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, মুইন-উস-সুলতানের কোর্টে টেনিসের বল যে রকম শক্ত, এক মুইন-উস-সুলতানকে বাদ দিলে তার সকলের হৃদয়ও সে রকম শক্ত—রাশান রাজদূতাবাসের বল যে রকম নরম, হৃদয়ও সে রকম নরম।

আব্দুর রহমান ফিসফিস করে বলল, 'আপনি জানেন না হুজুর' ওরা সব 'বেদীন, বেমজহব।' অর্থাৎ ওদের সব 'কিছু ন দেবায়, ন ধর্মায়।'

আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'তোমাকে ও সব বাজে কথা কে বলেছে?'

সে বলল, 'সবাই জানে হুজুর, ওদেশে মেয়েদের পর্যন্ত হায়া শরম নেই, বিয়ে-শাদী পর্যন্ত উঠে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'তাই যদি হবে তবে বাদশা আমান উল্লা তাদের এদেশে ডেকে এনেছেন কেন?' ভাবলুম এই যুক্তিটাই তার মনে দাগ কাটবে সব চেয়ে বেশী।

আব্দুর রহমান বলল, 'বাদশা আমান-উল্লা তো—!' বলে থেমে গিয়ে চুপ করে রইল।

পরদিন টেনিস খেলায় দু সেটের ফাঁকে দেমিদভকে জানালুম, প্রলেতারিয়া আব্দুর রহমান ইউ এস এস আর সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করে। দেমিদভ বললেন, 'আফগানিস্থান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। তবে তুর্কীস্থান অঞ্চলে আমাদের একটু আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছে বলে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি কর্মধারা একটু অতিরিক্ত ঘোলাটে হয়ে আফগানিস্থানে পৌঁচচ্ছে। আমরা উপর থেকে তুর্কীস্থানের কাঁধে জোর করে নানা রকম সংস্কার চাপাতে চাইনে; আমরা চাই তুর্কীস্থান যেন নিজের থেকে আপন মঙ্গলের পথ বেছে নিয়ে বাকি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।'

দেমিদভের স্ত্রী বললেন, 'বুখারার আমীর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ শোষক সম্প্রদায় বলশেভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যহারা হয়ে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। তারা যে নানা রকম প্রোপাগান্ডা চালাতে কসুর করছে না, তা তো জানেনই।'

আমি কম্যুনিজমের কিছুই জানিনে, কিন্তু এঁদের কথা বলার ধরণ, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞের প্রতি সহিষ্ণুতা, আপন আদর্শে দৃঢ়-বিশ্বাস আমাকে সত্যই মুগ্ধ করল।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করল রাজদূতাবাসের ভিতর এঁদের সামাজিক জীবন। অন্যান্য রাজদূতাবাসে বড়কর্তা, মেজোকর্তা ও ভদ্রেতর জনে তফাৎ যেন গৌরীশঙ্কর, দুমকা পাহাড় আর উইয়ের ঢিপিতে। এখানে যে কোন তফাৎ নেই, সে কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, কিন্তু সে পার্থক্য কখনো রূঢ় কর্কশরূপে আমার চোখে ধরা দেয়নি।

কত অপরাহ্ণ, কত সন্ধ্যা কাটিয়েছি দেমিদভের বসবার ঘরে। তখন এ্যাম্বেসির কত লোক সেখানে এসেছেন, পাপিরসি টেনেছেন, গল্প-গুজব করেছেন। তাদের কেউ সেক্রেটারী, কেউ ডাক্তার, কেউ কেরানী, কেউ আফগান এয়ার ফোর্সের পাইলট—দেমিদভ স্বয়ং রাজদূতাবাসের কোষাধ্যক্ষ। সকলেই সমান খাতির-যত্ন পেয়েছেন; জিজ্ঞেস না করে জানবার কোন উপায় ছিল না যে কে সেক্রেটারী, আর কে কেরানী।

খুদ এ্যামবেসডর অর্থাৎ রুশ রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রতিভূ তাভারিশ স্টেৎ পর্যন্ত সেখানে আসতেন। প্রথম দর্শনে তো আমি বগদানফ সায়েবের তালিম মত খুব নীচু হয়ে ঝুঁকে শেকহ্যান্ড করে বললুম, 'I am honour to meet your Excellency!' কিন্তু আমার চোস্ত ভদ্রতায় একসেলেন্সি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে জোর হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতখানা তলোয়ারের মত এমনি ধারা চালালেন যে, আমার সমস্ত ভদ্রস্থতা যেন দু টুকরো হয়ে কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল।

মাদাম দেমিদভ বললেন, 'ইনি রুশ সাহিত্যের দরদী।'

কোন ইংরেজ বড়কর্তা হলে বলতেন, 'রিয়েলি? হাউ ইন্টারেস্টিঙ!' তারপর আবহাওয়ার কথাবার্তা পাড়তেন।

স্টেৎ বললেন, 'তাই নাকি, তাহলে বসুন আমার পাশে, আপনার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা হবে।' আর সকলে তখন আপন আপন গল্পে ফিরে গিয়েছেন। স্টেৎ প্রথমেই অসঙ্কোচে গোটাকয়েক চোখা চোখা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার বিদ্যের চৌহদ্দী জরিপ করে নিলেন, তারপর পুশকিনের গীতিকাব্য-রস আমাকে মূল থেকে আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলেন। যে অংশ বেছে নিলেন সে-ও ভারী মর্মময়। ওনিয়েগিন সংসারে নানা দুঃখ, নানা আঘাত পেয়ে তার প্রথমা প্রিয়ার কাছে ফিরে এসে প্রেম নিবেদন করেছেন; উত্তরে প্রিয়া প্রথম যৌবনের নষ্ট দিবসের কথা ভেবে বলছেন, 'ওনিয়েগিন, হে আমার বন্ধু, আমি তখন তরুণী ছিলুম, হয়ত সুন্দরীও ছিলুম'—

আমাদের দেশের রাধা যে রকম একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, আমার এই নতুন বয়সের কালে।'

আমি তন্ময় হয়ে শুনলুম। আবৃত্তি শেষ হলে ভাবলুম, বরঞ্চ একদিন শুনতে পাব স্বয়ং চার্চিল হেদোর পারে লঙ্কা-ঠাসা চীনে বাদাম খেয়ে সশব্দে ডাইনে-বাঁয়ে নাক ঝাড়ছেন, কিন্তু মহামান্য বৃটিশ রাজদূত প্রথম দর্শনে অভ্যাগতকে কীটসের 'ইসাবেলা' শোনাচ্ছেন, এ যেন 'বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়, দেখিলেও না করো প্রত্যয়।'

বৃটিশ রাজদূতকে হামেশাই দেখেছি স্ট্রাইপট ট্রাউজার আর স্প্যাট-পরা। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে যেন স্বয়ং পঞ্চম জর্জের মামাতো ভাই। নিতান্ত দৈবদুর্বিপাকে এই দুশমনের পুরীতে বড় অনিচ্ছায় কাল কাটাচ্ছেন। 'কীটস কে, অথবা কারা?—পেছনে যখন বহুবচনের 'এস' রয়েছে? পাসপোর্ট চায় নাকি? বলে দাও, ওসব হবে-টবে না'।

এমন কি, ফরাসী রাজদূতকেও কখনো বগদানফের ঘরে আসতে দেখিনি। বেনওয়া তাঁর কথা উঠলেই বলতেন, 'কার কথা বলছেন? মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন ইন কাবুল? ম দিয়ো! উনি হচ্ছেন মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন ইন মাবুল—'

'মাবুল' অর্থ অভিধানে লেখে, Loony, off his nut!

স্টেৎ বললেন, তিনি রাজদূতাবাসের সাহিত্য-সভাতে চেখফ সম্বন্ধে একখানা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। শুনে তো আমার চোখের তারা ছিটকে পড়ার উপক্রম। আরেকটা লিগেশনের কথা জানি, সেখানে চড়ুই পাখী শিকার সম্বন্ধে প্রবন্ধ চললেও চলতে পারে, কিন্তু চেখফ, বাই গাড্, স্যার!

আমি বললুম, 'রুশান শেখা হলে আপনার প্রবন্ধটি অনুবাদ করার বাসনা রাখি।'

স্টেৎ বললেন, 'বিলক্ষণ আপনাকে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। কোন স্বত্ব সংরক্ষিত নয়।'

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলুম আর পাঁচজন তখন বড়কর্তার মুখের কথা লুফে নেবার জন্য চতুর্দিকে ঝুলে থাকেন নি। ছোট্ট ছোট্ট দল পাকিয়ে সবাই আপন আপন গল্প নিয়ে মশগুল ছিলেন। আর সকলে কি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, ঠিক ঠিক বলতে পারিনে, তবে একটা কথা নিশ্চয় জানি যে, তারা ড্রইংরুমে বসে চাকরের মাইনে, ধোপার গাফিলি আর মাখনের অভাব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালাতে পারে না।

নিতান্ত ছোট জাত! আর শুধু কি তাই; এমনি বজ্জাত যে, সে কথাটা ঢাকবার পর্যন্ত চেষ্টা করে না।

সাধে কি আর ইংরেজের সঙ্গে এদের মুখ-দেখা পর্যন্ত বন্ধ।

ইংরেজ তখন মস্কো বাগে দূরবীন লাগিয়ে স্তালিন আর এৎস্কি দলের মোষের লড়াই

দেখছে, আর দিন গুণছে ইউ এস এস আরের জেরটা বাজবে কখন।

এ সব হচ্ছে ১৯২৭এর কথা

(২৮)

কবি বলেছেন, 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে।' আমানউল্লা ইউরোপ ভ্রমণে বেরুলেন, আমিও শীতের দু' মাসের ছুটি পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সত্য যুগ নয় বলে প্রবাদের মাত্র আধখানা ফলল—আমি ইউরোপ গেলুম না, গেলুম দেশ।

উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না কিন্তু ভারতবর্ষে দেখি আমানউল্লার ইউরোপ ভ্রমণ নিয়ে সবাই ক্ষেপে উঠেছে। আমানউল্লার সম্মানে প্রাচ্য ভারতবাসী যেন নিজের সম্মান অনুভব করছে।

আমাকে ধরল হাওড়া স্টেশনে কাবুলী পাজামা আর পেশোয়ারের টিকিট দেখে—হয়ত লাণ্ডিকোটাল থেকে খবরও পেয়েছিল। তন্ন তন্ন করে সার্চ করলো অনেকক্ষণ ধরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল তারো বেশীক্ষণ ধরে যেন মোক্ষ সিদ্ধিটা। কিন্তু আমি যখন কাবুলের কাস্টম হৌসে তালিম পেয়েছি, তখন ধৈর্যে আমাকে হারাতে পারে কোন্ বাঙালী অফিসার। খালাস পেয়ে অজানাতে তবু বেরিয়ে গেল, 'আল্লা মেরো রে বাবা।'

বাঙালী অফিসার চমকে উঠলেন, বললেন, 'দাঁড়ান, আপনি বাঙালী, তাহলে আরো ভালো করে সার্চ করি।'

বললুম, 'করুন, আমার নাম কমলাকান্ত।'

দেশে পৌঁছে মাকে দিলুম এক স্যুটকেস ভর্তি বাদাম, পেস্তা—আট গণ্ডা পয়সা খরচ করে কাবুল শহরে কেনা। মা পরমানন্দে পাড়ার সবাইকে বিলোলেন। পাড়াপড়শীতে যে বোনটির বিয়ে হয়েছিল, সে-ও বাদ পড়ল না।

কিন্তু থাক। সাত মাস কাবুলে কাটিয়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি যে, বাঙালী কাবুলীর চেয়ে ঢের বেশী হুঁসিয়ার। তারা যে আমার এ-বই পয়সা খরচ করে কিনবে, সে আশা কম। তাই ভাবছি, এ দু মাসের গর্ভাঙ্কটা 'সফর-ই-হিন্দ' নাম দিয়ে ফার্সীতে ছাপাবো। তাই দিয়ে যদি দু পয়সা হয়। কাবুলী কিনুক আর না-ই কিনুক, উনামটার প্রশংসা নিশ্চয়ই করবে। কারণ ফারসীতেই প্রবাদ আছে—

'খর বাশ ও খুক বাশ ও ইয়া সগে মুরদার বাশ।
হরচে বাশী বাশ আম্মা আন্দকী জরদার বাশ॥'

'হও না গাধা, হও না শুয়র, হও না মড়া কুকুর।
যা ইচ্ছে হও কিন্তু রেখো রত্তি সোনা টুকুর॥'

(২৯)

ফিরে দেখি সর্বত্র বরফ, দোরের গোড়ায় আব্দুর রহমান আর ঘরের ভিতর গনগনে আগুন। আমি তখন শীতে জমে গিয়েছি।

আব্দুর রহমান হাসিমুখে আমার হাতে চুমো খেল, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। 'দাঁড়ান হুজুর' বলে আমাকে কোলে করে এক লাফে উঠানে নেবে গেল। একমুঠো পেজা বরফ হাতে নিয়ে আমার নাক আর কানের ডগা সেই বরফ দিয়ে ঘন ঘন ঘষে আর ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে 'চিন চিন' করছে কিনা। আমি ভাবলুম, এ বুঝি পানশিরের কোন জঙ্গলী অভ্যর্থনার আদিখ্যেতা। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'চল, চল ঘরের ভেতর চল, শীতে আমার হাড়-মাস জমে গিয়েছে।' আব্দুর রহমান কিন্তু তখন তার শালপ্রাংশু মহাবাহু দিয়ে আমাকে এমনি জড়িয়ে ধরে দু'কানে বরফ ঘষছে যে আমি কেন, কিঙ্কড় সিংয়েরও সাধ্য নেই যে সে-বাহু ছিন্ন করে বেরুতে পারে। আব্দুর রহমান শুধু বরফ ঘষে আর একটানা মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধায় 'চিন্ চিন্ করছে, চিন্ চিন্ করছে?' শেষটায় অনুভব করলুম সত্যই নাক আর কানের ডগায় ঝিঁ ঝিঁ ছাড়ার সময় যে রকম চিন চিন করে সে রকম হতে আরম্ভ করেছে। আব্দুর রহমানকে সে খবরটা দেওয়া মাত্রই সে আমাকে কোলে করে আরেক লাফে ঘরে ঢুকল, কিন্তু বসাল আগুন থেকে দূরে ঘরের আরেক কোণে। রোদে-পোড়া মোষ যে রকম কাদার দিকে ধায়, আমিও সেই রকম আগুনের দিকে যতই ধাওয়া করি, আব্দুর রহমান ততই আমাকে ঠেকিয়ে রেখে বলে, 'সর্বাঙ্গে রক্তচলাচল সুরু হোক, হুজুর, তারপর যত খুসী আগুন পোয়াবেন।'

ততক্ষণে সে আমার জুতো খুলে পায়ের আঙুলগুলো পরখ করে দেখছে সেগুলোর রঙ কতটা নীল। আব্দুর রহমানের চেহারা থেকে আন্দাজ করলুম নীল রঙের প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা। ঘসে ঘসে আঙুলগুলোকে যখন বেশ বেগণী করে ফেলল তখন সে চেয়ারসুদ্ধ আমাকে আগুনের পাশে এনে বসাল। আমি ততক্ষণে দস্তানা খুলতে গিয়ে দেখি কমুলী ছোড়তে চায় না, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছে। দুষ্টু ছেলে যেরকম খাওয়ার সময় মাকে পেট কামড়ানোর খবর দেয় না আমিও ঠিক সেই রকম আঙুল-ফোলার খবরটা চেপে গেলুম। সরল আব্দুর রহমান ওদিকে আমার পায়ের তদারক করছে আমি এদিকে আগুনের সামনে হাত বাড়িয়ে আরাম করে দেখি, কলাগাছ বটগাছ হতে চলেছে। ততক্ষণে আব্দুর রহমান লক্ষ্য করে ফেলেছে যে আমার হাত তখনো দস্তানা-পরা। টমাটোর মত লাল মুখ করে আমাকে শুধাল, 'হাতের আঙুল ও যে জমে গিয়েছে সে কথাটা আমায় বল্লেন না কেন? এই তার প্রথম রাগ দেখলুম। ভৃত্য আব্দুর রহমানের গলায় আমীর আব্দুর রহমানের গলা শুনতে পেলুম। আমি চিঁ চিঁ করে কি একটা বলতে যাচ্ছিলুম। আমার দিকে কান না দিয়ে বলল, 'চা খাওয়ার পর ও যদি দস্তানা না খোলে তবে আমি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলব?

আমি শুধালুম, 'কি কাটবে? হাত না দস্তানা?'

আব্দুর রহমান অত্যন্ত বেরসিক। আমি আরো ঘাবড়ে গেলুম।

কিন্তু শুধু আমিই ঘাবড়াই না। দস্তানা পর্যন্ত আব্দুর রহমানের গলা শুনে বুঝতে পেরেছে যে সে চটে গেলে দস্তানা, দস্ত কাউকে আস্ত রাখবে না। চায়ের পেয়ালায় হাত দেবার পূর্বেই অক্টোপাসের পাশ খসে গেল।

সে রাত্রে আব্দুল রহমান আমাকে সাত তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আপন হাতে বিছানায় শুইয়ে দিল। লেপের তলায় আগেই গরম জলের বোতল ফ্ল্যানেলে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটাতে পা ঠেকিয়ে আমি মুনি-ঋষিদের সিংহাসনে পদাঘাত করার সুখ অনুভব করলুম। পেটের ভেতরে চর্বির ঘন শুরুয়া, লেপে-চাপা গরম বোতলের ওম, আর আব্দুর রহমানের বাঘের থাবার ডলাই-মলাই তিনে মিলে এক পলকেই চোখের পলক বন্ধ করে ফেলেছিলুম।

সমস্ত কাহিনীটী যে এত বাখানিয়া বললুম তার প্রধান কারণ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বই কোনো দিন কারো কোনো কাজে লাগবে না। আর অজকের দিনের ভরত-দাঁড়ন্ কম্যুনিস্টিরা বলেন, যে-আর্ট কাজে লাগে না সে-আর্ট আর্টই নয়। অর্থাৎ শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি দেয়ালে ' মশারির পেরেক পোঁতা না যায় তবে সে শিবলিঙ্গের 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

তবু যদি কোনো দিন কোনো পাকেচক্রে ফ্রস্টবিট্ন্ হন তবে প্রলেতারিয়ার প্রতীক ওঝা আব্দুর রহমানকে স্মরণ করে তার দাওয়াই চালাবেন। সেরে উঠবেন নিশ্চয়ই, এবং তখন যেন আপনার কৃতজ্ঞতা আব্দুর রহমানের দিকে ধায়। আব্দুর রহমানের প্রাপ্য প্রশংসা আমি কেতাবের মালিকরূপে কেড়ে নিয়ে 'শোষক,' 'বুর্জুয়া' নামে পরিচিত হতে চাইনে।

পরদিন সকাল বেলা দেখি, তিন মাইল বরফ ভেঙে বন্ধু মীর আসলম এসে উপস্থিত। বললেন, 'আত্মজনের বাচনিক অবগত হইলাম তুমি কল্য রজনীর প্রথম যামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ? কুশল-সন্দেশ কহ। শৈত্যাধিক্যে পথিমধ্যে অত্যধিক ক্লেশ হয় নাই তো?'

আমি আব্দুর রহমানের কবিরাজির শালঙ্কার বর্ণনা দিলে মীর আসলম বললেন 'নাতিদীর্ঘ দিবস তথা শর্বরীর প্রথম যামে স্বত্তচলনকটারোহীকে শিশিরবিদ্ধ করিলে

সক্ষম। কৃশাণু সংস্রব হইতে রক্ষা করিয়া তোমার পরিচারক বিচক্ষণের কর্ম করিয়াছে। অপিচ, লক্ষ্য করো নাই, স্বদেশে আতপতাপে দগ্ধ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন মাত্রই সুশীলা জননী তদ্দণ্ডেই শীতল জল পান করিতে নিষেধ করেন, অবগাহনকক্ষ উন্মোচন করেন না? সংকটদ্বয় আয়ুর্বেদের একই সূত্রে গ্রথিত।'

হক্ কথা।

বললুম, 'ইয়োরোপে আমান উল্লার সম্বর্ধনা নিয়ে হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান বড়ই গর্ব অনুভব করছে।'

মীর আসলম গম্ভীর গলায় যে বয়েত আবৃত্তি করলেন তার মোটামুটি অনুবাদ বাঙলায় দাঁড়ায়,

'কয়লা-ওলার দোস্তী? তওবা!
ময়লা হাতে রেহাই নাই,
আতর-ওলার বাক্স বন্ধ
ভুরভুরে তার খুশবাই পাই।'

আমি বললুম, 'এতো সূত্র। ব্যাখ্যা করুন।'

'পাশ্চাত্যসভ্যতার সঙ্গে গাত্রঘর্ষণজনিত যে কৃষ্ণপ্রস্তরচূর্ণ আমান উল্লা সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনান্তে তদ্দ্বারা তিনি অস্মদ্দেশীয় হট্টঘট্ট মসীলিপ্ত করিবেন। পক্ষান্তরে যদি কিঞ্চিৎ কৃষ্ণপ্রস্তর আনয়ন করিতেন তবে তদ্দ্বারা পরিজনের শৈত্য নিবারিত হইত।'

কাবুলে কয়লা নেই আমি সেদিকে কান না দিয়ে বললুম, 'কি মুশকিল! আপনি দেখি হিন্দুস্থান থেকে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে ফতওয়া সেটাও আর সব মুসলমানি ফতওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিখে এসেছেন।'

বললেন, 'বিদেশে সম্মানপ্রাপ্ত নৃপতির সম্মান স্বদেশে লাঘব হয়।'

এ যেন চাণক্য শ্লোকের তৃতীয় ছত্র। ভাবলুম, জিজ্ঞেস করি, 'মহাশয় ভারতবর্ষে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, মুসলমানি না হিন্দুয়ানি,' কিন্তু চেপে গিয়ে বললুম,

'আমান উল্লা বিদেশে সম্মান পাওয়াতে স্বদেশে সংস্কার কর্ম করবার সুবিধা পাবেন না?'

মীর আসলম বললেন, 'সংস্কার-পঙ্কে যে নৃপতি কণ্ঠমগ্ন, বৈদেশিক সম্মানমুকুটের গুরুভার তাঁহাকে অধিকতর নিমজ্জিত করিবে।'

আমি বললুম, 'রাণী সুরাইয়াকে দেখবার জন্য প্যারিসের বুলেভারো পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

মীর আসলম বল্লেন, 'ভদ্র, অদ্য যদি তুমি তোমার পদদ্বয়ের ব্যবহার পরিত্যাগপূর্বক মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হও তবে তোমার মত স্বল্পপরিচিত মনুষ্যেরও এবম্বিধ বাতুলতা নিরীক্ষণ করিবার জন্য কাবুলহট্ট সম্মিলিত হইবে।'

আমি বল্লুম, 'কী মুশকিল, তুলনাটা আদপেই ঠিক হল না; রাণী তো আর কোন-রকম পাগলামি করছেন না।'

মীর আসলম বল্লেন, 'মুসলমান রমণীর পক্ষে তুমি অন্য কোন বাতুলতা প্রত্যাশা করো: অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রশস্ত রাজবর্ত্মে কোন্ মুসলমান রমণী এবম্বিধ অশাস্ত্রীয় কর্ম করিতে পারে?'

আমি বল্লুম, 'আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী কুরান-হদীস পড়েছেন, মুখ দেখানো তো আর কুরান-হদীসে বারণ নেই।'

মীর আসলম বল্লেন, 'আমার ব্যক্তিগত শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে অবান্তর। পার্বত্য উপজাতির শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে প্রযোজ্য। তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।'

আমি আলোচনাটা হাল্কা করার জন্য বললুম, 'জানেন, ফরাসী ভাষায় 'সুরীর' শব্দের অর্থ 'মৃদু হাস্য।' রাণী সুরাইয়ার নাম তাই প্যারিসের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।'

মীর আসলম বল্লেন, 'আমীর হবীবউল্লার নামের অর্থ 'প্রিয়তম', 'বান্ধব'; ইংরেজ শতবার এই শব্দার্থের প্রতি আমীরের দৃষ্টি আকর্ষণ-করত শপথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন শত্রুহস্তের লৌহকিলক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, তখন হবীবউল্লার কোন 'হবীব' তাঁহাকে স্মরণ করিল।' অপিচ, হবীবউল্লার হবীববর্গই তাঁহাকে পুলসিরাতের (বৈতরণীর) প্রান্তদেশে অকারণে, অসময়ে দণ্ডায়মান করাইয়া দিলেন।'

আমি বল্লুম, 'ও তো পুরাণো কাসুন্দী। কিন্তু ঠিক করে বলুন তো, আপনি কি আমানউল্লার সংস্কার পছন্দ করেন না।'

বলিলেন, বৎস, গুরুর পদসেবা করিয়া আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমি শিক্ষা-সংস্কারের বিরুদ্ধে কেন দণ্ডায়মান হইব? কিন্তু আমানউল্লা যে ফিরিঙ্গি শিক্ষা প্রবর্তনাভিলাষী আমি তাহা ভারতবর্ষে দর্শন করিয়া ঘৃণাবোধ করিয়াছি। কিন্তু ভদ্র, তোমার সুমিষ্ট চৈনিক যূষ পরিত্যাগ করিয়া এই তিক্ত বিষয়ের আলোচনায় কি লভ্য? যব-পত্র কি তুমি স্বদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছ? গুরু-গৃহের সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে।'

আমি বল্লুম, 'আপনার জন্যও এক প্যাকেট এনেছি।'

মীর আসলম সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু ভদ্র, শুল্কধরনিকের ন্যায্য প্রাপ্য অর্পণ করিয়াছ সত্য?'

আমি বললুম, 'আপনার কোন ভয় নেই। কাবুল কাস্টম হাউসকে ফাঁকি দেবার মত বুদ্ধি আমার ঘটে নেই। বিছানার ছারপোকাকে পর্যন্ত সেখানে পাসপোর্ট দেখাতে হয়, মাশুল দিতে হয়। আমি তাদের সব অন্যায্য দাবী-দাওয়া কড়া-গণ্ডায় শোধ করেছি। আপনাকে হারাম খাইয়ে আমি কি আখেরে জাহান্নমে যাব?'

মীর আসলম আমাকে শীতকালে কোন্ কোন বিষয়ে সাবধান হতে হয়, সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, আব্দুর রহমানকে ডেকে ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধন সম্বন্ধে নানা সুযুক্তি দিয়ে বিদায় নিলেন।

খবর পেয়ে তারপর এলেন মৌলানা। আমি আমানউল্লার বিদেশে সম্মান পাওয়া, আর সে সম্বন্ধে মীর আসলমের মন্তব্য তাঁকে বললুম। মৌলানা বললেন, 'আমানউল্লা যাদের কথায় চলেন, তারা তো বাদশাহের সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করছে। তারা বলছে, 'মুস্তফা কামাল যদি তুর্কীকে' রেজা শাহ যদি ইরানকে প্রগতির পথে চালাতে পারেন, তবে আমানউল্লাই বা পারবেন না কেন?' এই হল তাদের মনের ভাব; কথাটা খুলে বলার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। কারণ কোনরকম বাধাও তো কেউ দিচ্ছে না।'

আমি বল্লুম, 'কিন্তু মৌলানা, কতকগুলো সংস্কারের প্রয়োজন আমি মোটেই বুঝে উঠতে পারিনে। এই ধরো না শুক্রবারের বদলে বৃহস্পতিবার ছুটির দিন করা।'

মৌলানা বললেন, 'শুক্রবার ছুটির দিন করলে জুম্মার নামাজের হিড়িকে সমস্ত দিনটা কেটে যায়, ফালতু কাজ-কর্ম করার ফুরসৎ পাওয়া যায় না। তাই আমানউল্লা দিয়েছেন সমস্ত বৃহস্পতিবার দিন ছুটি, আর শুক্রবারে জুম্মার নামাজের জন্য আধ ঘণ্টার বদলে এক ঘণ্টার ছুটি। কিন্তু জানো, আমি আরেকটা কারণ বের করেছি। এই দেখ না এ্যারোপ্লেনে করে যদি তুমি শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন বুধবারে বেরোও, এখানে পৌঁছবে ছুটির দিন বৃহস্পতিবারে, তারপর ইরাক পৌঁছবে শুক্রবারে সেও ছুটির দিন, তারপরের দিন প্যালেস্টাইনে— সেখানে ইহুদীদের জন্য শনিবারে ছুটি, তার-পরের দিন রবিবারে ইয়োরোপ, তারপরের দিন সাউথ-সী-আয়লেণ্ডে সেখানে তো তামাম হপ্তা ছুটি।'

আমি বললুম, 'উত্তম আবিষ্কার করেছ, কিন্তু বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছ তো? না হলে বরফ ভেঙে কাবুলে ফিরবে কি করে?'

মৌলানা বল্লেন, 'দুএকদিনের মধ্যেই বরফের উপর পায়ে-চলার পথ পড়ে যাবে; আসতে যেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি চললুম দেশে. বউকে নিয়ে আসতে। বেনওয়া সাহেব মত দিয়েছেন, তুমি কি বল?'

আমি শুধালুম, 'বউ রাজী আছেন?' মৌলানা বললেন, 'হাঁ'।

আমি বল্লুম, 'তবে আর কাবুল-অমৃতসরে প্লেবিসিট্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? তোমাদেরই ভাষায় তো রয়েছে বাপু,

'মিয়া বিবি রাজী
কিয়া করে কাজী?'

মনে মনে বললুম, বগদানভ গেছেন, তোমার দাড়িটির দর্শনও এখন আর কিছু দিনের তরে পাব না। নতুন বউয়ের কান্তা হতে অন্তত ছ'টি মাস লাগার কথা।

মৌলানা চলে যাওয়ার পর আব্দুর রহমানকে ডেকে বললুম, 'দাও তো হে কুর্শিখানা জানলার কাছে বসিয়ে, বাকি শীতটা তোমার ঐ বরফ দেখেই কাটাব।'

আব্দুর রহমানের বর্ণনামাফিক সব রকমেরই বরফ পড়ল। কখনো পেঁজা পেঁজা কখনো গাদা গাদা, কখনো ঘূর্ণিবায়ুর চক্কর খেয়ে দশদিশ অন্ধকার করে কখনো আস্বচ্ছ যবনিকার মত গিরিপ্রান্তর ঝাপসা করে দিয়ে, কখনো অতি কাছে আমারি বাতায়ন পাশে, কখনো বহুদূরে সানুশ্লিষ্ট হয়ে শিখর চুম্বন করে। আস্তে আস্তে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল, শুধু পত্রবিবর্জিত চিনার গাছের সারি দেখে মনে হয় দাঁত ভাঙা পুরানো চিরুণীখানা ঠাকুরমা যেন দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রেখে পাকা চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আব্দুর রহমান মর্মাহত। আমাকে প্রতিবার চা দেবার সময় একবার বাইরের দিকে তাকায় আর আর্তস্বরে বলে, 'না হুজুর, এ বরফ ঠিক বরফ নয়। এ শহুরে বরফ, বাবুয়ানী বরফ। সত্যিকার খাঁটি বরফ পড়ে পানশিরে। চেয়ে দেখুন বরফের চাপে এখনও গেট বন্ধ হয় নি। মানুষ এখনো দিব্যি চলা-ফেরা করছে, ফেঁসে যাচ্ছে না'।

আব্দুর রহমানের ভয় পাছে আমাকে বোকা পেয়ে কাবুল উপত্যকা তার ভেজাল বরফ আমাকে গছিয়ে দেয়। নিতান্তই যদি কিনতে হয় তবে যেন আমি কিনি আসল, খাঁটি মাল, 'মেড ইন পানশির।' (ক্রমশঃ)

## বার্লিনে বিরোধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের অধিকৃত পশ্চিম জার্মানীতে মুদ্রানীতির সংস্কারকে কেন্দ্র করে পুনরায় বার্লিনে এই কয়টি রাষ্ট্রের সংগে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। গত ২০শে মার্চ তারিখে মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদের থেকে মার্শাল সোকোলভস্কি বেরিয়ে যাওয়ায় যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল, মাঝখানে তার তীব্রতা এসেছিল কিছুটা কমে। এইবার নতুন করে সে বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বর্তমানে বার্লিন থেকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাড়ানোর জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া উঠে পড়ে লেগেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা সেটা পরের কথা। তবে তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এই যে, বার্লিন তাঁদের অধিকৃত পূর্ব জার্মানীতে পড়ে। সুতরাং বার্লিনের অংশবিশেষে যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভূমিকার দেওয়া হয়েছে সেটা শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার দয়ায়। বার্লিনের রুশ মিলিটারী গবর্নর মার্শাল সোকোলভস্কি ঘোষণা করেছেন যে, সমগ্র বার্লিনের উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব হল রাশিয়ার। কিন্তু তাঁর এই সাবধানবাণীকে অবজ্ঞা করে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্লিনে নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলে মুদ্রানীতির সংস্কার প্রবর্তন করেছে। এই নিয়েই হয়েছে নতুন বিরোধের সূত্রপাত। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, এর ফলে বার্লিন দুটো সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত হতে চলেছে। তাঁদের মতে সমগ্র বার্লিনে একই মুদ্রানীতি চলা উচিত এবং সে মুদ্রানীতি হতে পারে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার। শেষ মুহূর্তে এ ব্যাপার নিয়ে একটা আপোষরফার জন্যে রুশ, মার্কিন, ইংরেজ ও ফরাসী পক্ষের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। ফলে সোভিয়েট পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগ করে এদের বিপন্ন করার চেষ্টা চলেছে। এই এক তরফা মুদ্রা-সংস্কারের ফলে বার্লিনে জার্মান জনগণের মধ্যেও দেখা দিয়েছে একটা বিরাট বিশৃংখলা। পুরনো মুদ্রা বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন অঞ্চলে অচল হলেও সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে সচল। তাই সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে বাইরে থেকে এই মুদ্রা আমদানীর গোপন প্রয়াস চলেছে। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলেও মুদ্রাসংস্কার একপ্রকার অপরিহার্য। ইতাবসরে সোভিয়েট রাশিয়া ইংগ-মার্কিন-ফরাসী অধিকৃত বার্লিনের সংগে পশ্চিম ইউরোপের স্থলপথে যোগাযোগ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছেন। সমগ্র বার্লিনে বিদ্যুৎ সরবরাহের কেন্দ্র সোভিয়েট অঞ্চলে অবস্থিত বলে বিদ্যুৎ সরবরাহও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ইংগ-মার্কিন-ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে ভীষণ বিপদের সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে এ অবস্থার প্রতিকার না হলে ইংগ-মার্কিন-ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে মাসখানেকের মধ্যে ভয়ানক খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে বলেও বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। সোভিয়েট রাশিয়ার অসহযোগিতার ফলে মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অবসান কিছুকাল পূর্বেই ঘটেছে। এতদিন বার্লিন শাসনের জন্যে গঠিত কম্যান্ডাটুরার কাজ কোন-মতে চলে আসছিল। এবার তারও অবসান ঘটেছে।

পশ্চিম জার্মানীতে মুদ্রাসংস্কার নিয়ে বার্লিনে যে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা শক্ত। কেননা মুদ্রানীতির সংস্কার একটা ব্যাপক পরিকল্পনার অংশবিশেষ মাত্র। ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি রাষ্ট্রের উদ্যোগে কিছুকাল পূর্বে লন্ডনে পশ্চিম জার্মানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেছে মুদ্রানীতির সংস্কার তার অংশমাত্র। এর রাজনৈতিক অংশ অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানীতে একটি স্বয়ংশাসিত ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা কবে এবং কখন কার্যকরী হবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত আজও ঘোষণা করা হয় নি। তবে শীঘ্রই পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন স্টেটের জার্মান প্রধান মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করার পর ভাবী শাসনতন্ত্র নির্ধারণের জন্যে একটি গণপরিষদ আহ্বান করা হবে বলে প্রকাশ। জার্মানীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাগ্য সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে একমত হয়ে কোন ব্যবস্থা করতে না পারার ফলেই যে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে এরূপ একতরফা ব্যবস্থা করতে হয়েছে সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু এ পথে জার্মানী বিভক্তই শুধু হবে—তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান হবে কি?

## রিপাব্লিকানদের বৈদেশিক নীতি

আগামী নবেম্বর মাসে আমেরিকায় যে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হবে তাতে রিপাব্লিকান দলের প্রার্থীর সাফল্য প্রায় অবধারিত। ফিলাডেলফিয়াতে সম্প্রতি এই পার্টির বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেছে এবং সে সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে নিউইয়র্কের গভর্নর টমাস ই ডিউই প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বা তাঁর ডেমোক্র্যাটিক দল আগামী নির্বাচনে জয়ী হতে পারবেন—এরূপ আশা মার্কিন ওয়াকিবহাল মহল পোষণ করে না। তাই গভর্নর ডিউই ১৯৪৯ সালের গোড়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হবেন—একথা প্রায় সুনিশ্চিত। এ অবস্থায় আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যত্র জনমানসে একটি প্রশ্ন জেগেছে। ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেণ্টের বদলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনগদীতে রিপাব্লিকান প্রেসিডেণ্ট বসলে বিশ্বরাজনীতিতে

তার প্রতিক্রিয়া কি হবে? রিপাব্লিকানদের এই বিজয়ের ফলে বিশ্বশান্তির আশা বাড়বে না কমবে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বোঝাপড়ার পথ কি সুগম হবে? এক কথায় জনগণ রিপাব্লিকান্ দলের বৈদেশিক নীতির স্বরূপ জানতে চায়। জনগণের মনে ধারণা আছে এবং এ কথা বহুলাংশে সত্যও যে রিপাব্লিকান দল অনেকটা স্বাতন্ত্র্যবাদী—আন্তর্জাতিকতার ঊর্ধ্বে তারা স্থান দেয় জাতীয়তাকে, বিশ্বশান্তির জন্যে তারা মার্কিন জাতীয় স্বার্থকে বিপন্ন করতে নারাজ। আপাতদৃষ্টিতে রিপাব্লিকানরা তাদের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে যা বলে তার সঙ্গে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বৈদেশিক নীতির কোন বিরোধ বা বিভিন্নতা আবিষ্কার করা কঠিন। ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে যে বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করা হয়েছে তাতে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে সর্বশক্তিতে সমর্থন করার কথা আছে, সোভিয়েট রাশিয়াকে তোষণ না করে তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উল্লেখ আছে। আর একটা বড় প্রশ্ন হল ইউরোপে মার্শাল সাহায্য দানের ব্যাপারে রিপাব্লিকান দলের মনোভাব। এ সম্বন্ধে রিপাব্লিকান দল ঘোষণা করেছে যে তারা ইউরোপে মার্শাল সাহায্য দিয়ে চলবে সত্য—তবে তাদের নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের সীমারেখা মনে রেখে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অধিকৃত রাজ্যগুলিতে স্বায়ত্তশাসন ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা সংগঠনের জন্যে তারা চেষ্টা করে যাবে—তবে এসব দেশ ভবিষ্যতে যাতে আক্রমণাত্মক কর্মনীতি অবলম্বন না করতে পারে তার বিরুদ্ধেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। নবগঠিত ইহুদী রাষ্ট্র ইস্‌রাইলের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য করা এবং তাকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেখে বোঝা যায় যে, এটা আসন্ন ভোট-যুদ্ধে ইহুদী ভোটগুলি দখল করার প্রচেষ্টা সঞ্জাত।

ট্রুম্যান এবং মার্শালের বৈদেশিক কর্মনীতির সঙ্গে তুলনা করলে এ নীতির কোন বিভিন্নতা সহজে চোখে পড়ে না। মূলত ডেমোক্র্যাটিক দল ও রিপাব্লিকান দলের বৈদেশিক নীতির বিভিন্নতা হয়তো নেইও। তবে প্রকৃত বিভিন্নতা আছে কোন বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া না দেওয়ার মধ্যে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য দানের ব্যাপারে ট্রুম্যান এবং মার্শালের যে আগ্রহাধিক্য আছে, রিপাব্লিকান দলের তা নেই। কম্যুনিজমের প্রতি কিংবা কম্যুনিস্টদের প্রতি ট্রুম্যান গভর্নমেণ্টের খুব স্নেহাধিক্য আছে এমন কথা বলা চলে না। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি ট্রুম্যানের অনুসৃত নীতি তোষণমূলক এ দোষ তার শত্রুতেও দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। তার একটা বড় প্রমাণ এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মস্কোস্থিত রাষ্ট্রদূতের মারফতে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার সুযোগ পেয়েও ট্রুম্যান তা গ্রহণ করেননি। অথচ রিপাব্লিকান দল ট্রুম্যান গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট তোষণের অভিযোগই আনছে। ফিলাডেলফিয়া জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি মিঃ ক্যারল রীস ঘোষণা করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে এক দলকে বেছে নিতে হবে। নির্বাচন দ্বন্দ্ব যখন মূলত ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাব্লিকান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, ডেমোক্র্যাটরা ছদ্মবেশী কম্যুনিস্ট? অবশ্য প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী অদলীয় তৃতীয় ব্যক্তি মিঃ হেনরী ওয়ালেসের কথা স্বতন্ত্র। কেননা নির্বাচনে তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। রিপাব্লিকান দল যদি কম্যুনিস্ট বিরোধী ধুয়া তুলে নির্বাচনে জয়লাভ করে তার পরিণতি সহজেই অনুমেয়। তার ফলে রুশ-মার্কিন বিরোধ মীমাংসা তো নিকটবর্তী হবেই না—বরং সে সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত হবে।

**প্যালেস্টাইন**

প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ঘটিয়ে দেবার জন্যে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক নিয়োজিত কাউণ্ট বার্নাদোতের প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষ মাসখানেকের জন্যে যুদ্ধবিরতি করতে সম্মত হয়েছে। কাউণ্ট বার্নাদোত রোডস্ দ্বীপে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে আপোষ-মীমাংসার কাজে হাতও দিয়েছেন। কিন্তু আসল কাজ বিশেষ এগুচ্ছে না বলে মনে হয়। তার প্রধান কারণ বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আরব পক্ষের চরম আপোষ-বিরোধী মনোভাব এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির সর্ত পুরোপুরি মেনে চলার অনিচ্ছা। ইহুদী পক্ষ থেকে প্রতিনিয়তই আরবদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনা হচ্ছে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির একমাস সময়ের মধ্যে ১৫দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আরব-ইহুদী আপোষ-মীমাংসা প্রয়াস প্রাথমিক পর্যায় পার হয়েছে কিনা সন্দেহ। ইহুদীদের পক্ষ থেকে আপোষ-মীমাংসা করার কোন অনিচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। তাদের পক্ষ থেকেও মাঝে মাঝে যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভঙ্গ না হয়েছে এমন নয়। কিন্তু এজন্যে সরাসরি ইস্‌রাইল রাষ্ট্রকে দায়ী করা চলে না। ইসরাইল রাষ্ট্রের মধ্যে যে চরমপন্থী ইরগুনেভাই লিউমি নামক সন্ত্রাসবাদী দল আছে—চুক্তিভঙ্গ তাদেরই কাজ। ইরগুনের বাহিনীর এই চুক্তিভঙ্গের ফলে ইসরাইল রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অতি দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। এর থেকেই শান্তি স্থাপন সম্বন্ধে ইসরাইল রাষ্ট্রের সদিচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সরকারী কার্যক্রমের ফলে ইসরাইল রাষ্ট্রের মধ্যেই গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। রাষ্ট্রস্থাপনের মুখে ইহুদীদের চরম দুর্দিনে তাদের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল সে ঐক্যে ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। ইরগুনেভাই লিউমি সরাসরি ইসরাইলের অস্থায়ী জাতীয় গভর্নমেণ্টকে করেছে অস্বীকার এবং জাতীয় গভর্নমেণ্ট থেকে দুজন মন্ত্রী পদত্যাগও করেছেন। অপর পক্ষে আরব সংহতি ক্রমশঃ বাড়তির দিকে। আরবদের শান্তিবিরোধী অনমনীয় মনোভাবও প্রকট হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধবিরতিকে কেন্দ্র করে আরব জগতে নতুন করে কর্মচাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়েছে। ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লা সম্প্রতি কায়রোতে রাজা ফারুকের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ফিরেছেন। এইবার তাঁর সলাপরামর্শ আরম্ভ হবে তাঁর পুরনো শত্রু সৌদি আরবের রাজা ইবন্ সৌদের সঙ্গে। যে রকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক কোন আপোষ-মীমাংসা প্রায় অসম্ভব। কারণ, ইহুদীরা প্রাণপণে তাদের নবগঠিত রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেই আর অন্যদিকে আরবরাও সমগ্র প্যালেস্টাইনে আরব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়সংকল্প। মাত্র মাসখানেক কাল স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। এ আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হলেও তার জন্যে প্রয়োজন হবে সময়ের অর্থাৎ আরও কিছুকালের জন্যে যুদ্ধবিরতির। কিন্তু আরবরা এরই মধ্যে ধুয়া তুলেছে যে, তারা আর যুদ্ধবিরতির আবেদন শুনবে না—তারা অস্ত্রবলেই প্যালেস্টাইন জয় করে নেবে। রাজা আবদুল্লা এবং আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আজম পাশাও বলেন এই কথা। বিবদমান একপক্ষের মনোভাব যদি এতটা আপোষ-বিরোধী হয়, তবে সেখানে সাফল্যের আশা কোথায়? কাউণ্ট বার্নাদোতের আপোষ-প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে বলে আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

২৬-৬-৪৮

---

# ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পী—রাজা রবি বর্মা

## সুধা বসু এম.এ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা রবি বর্মা ভারতের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেশের লোক আজ তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহার নাম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বর্তমান কালের ভারতবাসীর অনেকেই সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হওয়া তো দূরের কথা—তাঁহার নাম ও কার্যা-

শিল্পী রবি বর্মা

বলীর আসল পরিচয়ও অনেকে জানেন না। সুতরাং তাঁহার জন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার জীবনী ও কার্যাবলীর আলোচনা করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের পরিচয় লইব।

আজ থেকে একশত বৎসর পূর্বে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল হল রাজা রবি বর্মার জন্মদিন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কিলিমানূর গ্রাম হল তাঁর জন্ম স্থান। পরবর্তী জীবনে তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবারের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার শিল্পচর্চার পথ অনেকটা সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। রবি বর্মার মাতা উমা অম্বাবাই ছিলেন তখনকার দিনের একজন শিক্ষিতা নারী এবং কবিতা রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা রবি বর্মার বাল্যকালের শিক্ষা আরম্ভ হয় তাঁহার বংশের প্রথানুযায়ী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ অপেক্ষা গৃহের প্রাচীরে ও চত্বরে খড়ি ও কয়লা দিয়া রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে বেশী ভাল বাসিতেন। তাঁর মাতুল রাজা রাজ বর্মা ঘরে বসিয়া চিত্র চর্চা করিতেন। চিত্র চর্চায় তাঁর ছিল অশিক্ষিত পটুত্ব। রবি বর্মাকেও তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১৮৬৬ সালে রবি বর্মা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বড় রাণীর ছোট ভগ্নীকে বিবাহ করেন। এই সূত্রেই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার যথেষ্ট সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া চিত্রশিল্পের জগতে এত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন।

রবি বর্মার শিল্পী জীবনের উদ্বোধন হইয়াছিল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে—যখন বিলাত হইতে থিওডোর জ্যানসেন (Theodore Jansen) নামে একজন ইংরাজ শিল্পী আসিয়াছিলেন ত্রিবান্দ্রাম্ রাজধানীতে রাজা ও রাজ পরিবারের সকলের প্রতিকৃতি চিত্র করিতে। রবি বর্মা সর্বদাই খুব মনোযোগের সহিত এই বিদেশী শিল্পীর মূর্তি চিত্র অঙ্কন লক্ষ্য করিতেন। এইভাবে কিছুদিন ইংরাজ শিল্পীর চিত্র রচনার পদ্ধতি অনুশীলন করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে তৈলচিত্র রচনার রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইলেন। এবং থিওডোর জ্যানসেনের প্রথা অনুসরণ করিয়াই তিনি তাঁর শিল্প প্রতিভা বিকাশের পথ কাটিয়া নিয়াছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যখন রবি বর্মার শিল্প পথের যাত্রা শুরু হয়—তখন ভারতবর্ষে ইংরাজীয়ানার বন্যা পূর্ণ বেগে প্রবাহিত। বিদেশী ভাবধারা আসিয়া ভারতের কৃষ্টি কলার ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আমাদের দেশীয় ধারাবাহিক শিল্পের রূপ ও প্রথা কি তাহা দেশের লোক ভুলিয়া গিয়াছিল। এই যুগ ধর্মের প্রভাবের মধ্যে রবি বর্মাও ভারতের নিজস্ব শিল্পের রূপ ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং পশ্চিমের দিকে মুখ করিয়া—তাহাদের শিল্পাদর্শ অনুসরণ করিয়াই তাঁহার শিল্পী জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

শিল্পী হিসাবে রবি বর্মার যশোভাগ্যের উদয় হয় ১৮৭৩ সালে—যখন মাদ্রাজের বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁহার অঙ্কিত "নায়ার মহিলার কেশ রচনা" নামক চিত্র গভর্নরের সুবর্ণ পদক লাভ করে। এই চিত্রখানি পরে ভিয়েনার আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে পদক ও মানপত্র লাভ করিয়াছিল। ত্রিবাঙ্কুরের শিল্পীর এই সম্মান ও খ্যাতি লাভে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রবি বর্মাকে নানা উপহার ও উপঢৌকনে সম্মানিত করিয়াছিলেন। পরের বৎসরে সেতারবাদিনী তামিল মহিলার চিত্র প্রদর্শন করিয়া মাদ্রাজে তিনি দ্বিতীয়বার সুবর্ণ পদক পান।

১৮৭৫ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন এদেশে আসেন, তখন ত্রিবাঙ্কুরের রাজা

গর্বিতা

তাঁহাকে রবি বর্মার তিনখানি তৈলচিত্র উপহার দেন। যুবরাজ তাঁহার চিত্রের বহুল প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ইউরোপে যাইয়া শিল্প শিক্ষা না করিয়া যে কেহ পাশ্চাত্য রীতিতে এমন সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারেন তাহা কল্পনার অতীত।

রবি বর্মার চিত্র শিল্প সাধনার মন্দিরের নব একটি নূতন দুয়ার খুলিল ১৮৭৬ সালে যখন তিনি প্রথম ভারতীয় প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করিয়া চিত্র আঁকিতে শুরু করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি প্রতিকৃতি বা মূর্তি চিত্র এবং সমসাময়িক নরনারীর চিত্রে বিশেষ বিশেষ রূপের আদর্শ ও সৌন্দর্যের

অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ বিশেষ ভাব ও রসের প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়কার তাঁহার কয়েকটি চিত্র উল্লেখযোগ্য—"গর্বিতা", "লজ্জিতা", "আনমনা", "পূজারিনী", "মোহিনী", ও "মালাবার সুন্দরী" ইহার পরেই তিনি তাঁর বিখ্যাত চিত্র "শকুন্তলার পত্র লিখন" রচনা করেন এবং মাদ্রাজের প্রদর্শনীতে উহা প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। ইহার ফলে চিত্রজগতে এই শিল্পীর স্থান সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তিনি ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকৃতি অংকনেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিলেন। এই সময়ই মাদ্রাজের গভর্নরের আদেশে তাঁহার দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি অংকন করেন। এই চিত্রখানা এখনও মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট হাউসে আছে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ মহারাজার মৃত্যুর পরে রাজা রাম বর্মা ত্রিবাঙ্কুরের সিংহাসনে বসিলেন। সংস্কৃত বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও রূপ-বিদ্যার বিশেষ পক্ষপাতী বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। তাঁহার হুকুমেই রবি বর্মা "সীতার পাতাল প্রবেশের" চিত্র রচনা করেন। এই চিত্রখানা বরোদার দেওয়ান টি মাধব রাও বরোদার মহারাজার জন্য খরিদ করিয়া লইয়া যান। এই চিত্র এত সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল যে বোম্বাই-এর গভর্নর স্যার জেমস্ ফার্গুসন ইহার একখানি নকল করাইয়া খরিদ করেন। রবি বর্মা এই জাতীয় অসংখ্য পৌরাণিক চিত্র রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে "বিরাট রাজার সভায় দ্রৌপদীর অবমাননা", "রাজা রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী", "শকুন্তলার জন্ম", "সীতা ও স্বর্ণ মৃগ", "হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা" "গঙ্গাবতরণ" ইত্যাদি বিশেষ পরিচিত। ভারতের চিত্র শিল্পের ধারাবাহিক রীতিকে বাদ দিয়া রবি বর্মা বিদেশী রীতিতে এই সকল বিষয় চিত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন বিষয়ে এইগুলি দৃষ্টিকটু মনে হয়।

লজ্জাশীলা

কিন্তু চিত্র রচনায় রবি বর্মা কতকগুলি বিষয় বিদেশী হইলেও—তাহাদিগকে একেবারে নিজস্ব করিয়া কাজে লাগাইয়াছেন। তন্মধ্যে বর্ণ-সংযোজনা, ভারসাম্যতা, দৃশ্যপট রচনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। এছাড়া কতকগুলি পৌরাণিক বিষয়-বস্তুকে তিনি এমন নাটকীয় রীতিতে তুলি কলমের সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে চিত্রপটে একটা জীবন্ত ভাব আনিয়াছে। রবি বর্মা তাঁহার অধিকাংশ চিত্রকে আকারে সুবৃহৎ করিয়া তাহাদের মধ্যে এমন একটা বিরাটত্বের ভাব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন যাহা মানবের মনকে সহজেই অভিভূত করে।

এইভাবে দিনের পর দিন রবি বর্মার খ্যাতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে ১৮৮১ সালে তিনি বরোদা রাজের নিমন্ত্রণে তাঁহার রাজ্যে গেলে সেখানকার দেওয়ান তাঁহাকে উপদেশ দেন যে রবি বর্মার পৌরাণিক চিত্রাবলী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য ইহাদের সস্তা রঙীন প্রতিলিপি প্রচার করা উচিত। রবি বর্মা এই উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি ছবি ছাপিবার যন্ত্র লইয়া পুণার নিকটে একটি ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানার মারফতে তাঁহার পৌরাণিক চিত্রাবলী সারা ভারতে প্রচারিত হইয়া জনপ্রিয় হইয়াছিল। ভারতের চিত্র শিল্পের ইতিহাসে কোন চিত্রকর এত বিস্তৃতরূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারেন নাই। কি ধনী—কি দরিদ্র সকলের গৃহই রবি বর্মার পৌরাণিক আখ্যানের ও দেবদেবীর চিত্রে সুশোভিত হইয়াছিল। এই জনপ্রিয়তার কারণ কি? রবি বর্মার সবগুলি পৌরাণিক চিত্রই উচ্চস্তরের নহে। উপরন্তু তাঁহার সব চিত্রই বিদেশী টেক্‌নিকে বা আঙ্গিকে অংকিত। সুতরাং ভারতের জনসাধারণ কি দেখিয়া বিদেশী টেক্‌নিকে অংকিত তাঁহার এই চিত্রমালার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল? ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই যে ভারতবর্ষে ১৯ শতকের মধ্যকালে প্রাচীন ভারতের চিত্র শিল্প সাধনার গতি স্তব্ধ হইয়াছিল। প্রাচীন যুগের যে সব শিল্পীর হাতে লেখা পৌরাণিক কাহিনী সাধারণ মানুষের ধর্মসাধনার সহায়ক ছিল—তাঁহাদের বংশ লোপ পাইবার ফলে পৌরাণিক চিত্রাবলীর প্রসার একেবারে বন্ধ হয়। অথচ সাধারণের মধ্যে উহার চাহিদা সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত ছিল। এই সন্ধিক্ষণে রবি বর্মার আবির্ভাব হইল এবং তাঁহার ছাপাখানার ছাপা সস্তা প্রতিলিপি সাধারণ মানুষের চিত্র পিপাসার সুধা জোগাইতে শুরু করিল। উৎকট চাহিদার মধ্যে যখন একটা দ্রব্য বাজারে বাহির হয়—তখন তাহার গুণ বিচার করিবার মন ও সুযোগ মানুষের থাকে না। সুতরাং ঐ সময়ে সাধারণ মানুষেরা রবি বর্মার পৌরাণিক চিত্র নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া-

শকুন্তলার পত্র-লিখন

বিরাট রাজার সভায় দ্রৌপদীর অবমাননা

ছিল। উহার ভালমন্দ বিচারের অবকাশ তাহাদের ছিল না। প্রায় এক শতাব্দী পরে আজ তাঁহার চিত্রের দোষগুণ ও ভালমন্দ বিচার করিয়া উহার সঠিক ও সম্যক সমালোচনা করিবার মত চেষ্টা ও মন অনেকের হইয়াছে।

ইতিমধ্যে দুইজন মনীষী রবি বর্মার চিত্রের দোষগুণ সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। ভারত শিল্পের জগৎবিখ্যাত প্রেমিক হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন,—"রাজা রবি বর্মার চিত্রাবলীতে আমরা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কৃত্রিম সংস্কৃতি ও ইঙ্গ-ভারতীয় শিল্প বিদ্যালয়ের কুশিক্ষার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাইতেছি। ইনি হইলেন নূতন ভারতের জনপ্রিয় ও সৌখিন চিত্রকর যাহার রচনা সেই শ্রেণীর ভারতীয় জনসাধারণকে মুগ্ধ করে যাহারা ভারত শিল্প সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নহেন। যদিও তিনি কোন শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই—তথাপি তাঁহার অঙ্কন রীতি ও পদ্ধতি বিলাতী বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ শিক্ষানীতি এবং ইংরাজের শিল্প পরিষদের শিল্প সমালোচকদের আদর্শ হইতে সংগৃহীত। তাঁহার চিত্রের এত জনপ্রিয়তার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করা দুরূহ। এটা ঠিক বোঝা যায় না যে তাঁহার চিত্রাবলীর আকর্ষণ ইউরোপের চিত্রশিল্প হইতে ঋণ করা বস্তুতান্ত্রিক কলমবাজীর উপর প্রতিষ্ঠিত, অথবা ভারতীয় বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত বলিয়াই তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তাঁহার চিত্রে ভারতীয় কাব্যাদর্শ ও কল্পনাবহুল কথাবস্তুর ব্যাখ্যাও চিত্রণে অত্যন্ত শোচনীয় কাব্যশক্তির অভাব দেখা যায় এবং এই মহৎ দোষটিকে কলমবাজীর চাতুর্য দ্বারা ঢাকা দেওয়া যায় না।"
(Havell's Indian Sculpture & Painting, page 251—252).

ভারত শিল্পের অদ্বিতীয় মর্ম ব্যাখ্যাতা সুপণ্ডিত ডাঃ কুমার স্বামী রবি বর্মার চিত্র সম্বন্ধে আরও কঠোর মন্তব্য করিয়াছেনঃ—"নাটুকে চাল, কল্পনার অভাব, ভারতীয় ভাবের দীনতাকে অবলম্বন করিয়া রবি বর্মা ভারতের

গঙ্গাবতরণ

পবিত্র গুরুগম্ভীর পৌরাণিক ও মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই মারাত্মক দোষে দুষ্ট হইয়া তাঁহার যাবতীয় চিত্র শিল্পকলার নিম্নস্তরে স্থান পাইয়াছে। উচ্চাঙ্গের মহাকাব্যের বিষয়বস্তুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিয়া তিনি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। রবি বর্মার দেবদেবী ও মহাপুরুষগণ সাধারণ নরনারীর আদর্শে কল্পিত। এইসব সামান্য মানুষের রূপ অবলম্বন করিয়া তিনি যে সমস্ত অসামান্য ও অলৌকিক কার্যে তাদের ব্যাপৃত করিয়াছেন—সে বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তিনি যে শ্রেণীর ভারতীয় চিত্র রচনা করিয়াছেন, যে কোন ইউরোপীয় শিল্পী ঐ বিষয়ের সাহিত্য পাঠ করিয়া এবং ভারতীয় জীবনের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় করিয়াই ঐ জাতীয় চিত্র অতি সহজে অঙ্কন করিতে পারিতেন।"

এই বিরুদ্ধ সমালোচনার বিরুদ্ধে আমরা দুইটি কথা বলিতে পারি। প্রথমত, রবি বর্মা যখন চিত্র রচনা শুরু করেন—তখন ইংলণ্ডে যে সকল প্রতিভাশালী কল্পনাপ্রবণ চিত্রকর এই জাতীয় প্রাচীন পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া চিত্র রচনা করিতেছিলেন (যেমন,—রসেটি, বার্ন জোনস্, উইলিয়ম মরিস এবং অন্যান্য শিল্পী), তাহাদের রচিত গ্রীক ও মধ্যযুগের পুরাণের চিত্রাবলী অনুশীলন করার সুযোগ ভারতবর্ষের ছিল না। সুতরাং প্রাচীন কাহিনীর চিত্রে কি রীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তাহা জানিবার সুযোগ রবি বর্মা পান নাই। দ্বিতীয়ত সে সময়ে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক জ্ঞান খুব শিশু অবস্থায় ছিল। প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিশিল্পে দেবদেবীর কল্পনার রূপ ও অবস্থা কি তাহার পরিচয় সাধারণে সুলভ ছিল না। অবশ্য ত্রিবাঙ্কুরের নানা প্রাচীন মন্দিরে দেবদেবীর কল্পনার নানা আদর্শ ভিত্তি চিত্রে বর্তমান ছিল। এগুলি পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করা তাঁহার পক্ষে কিছু অসম্ভব ছিল না। সুতরাং একথা অনুমান করা শক্ত যে, রবি বর্মা ইউরোপীয় শিল্প শিক্ষকের প্রভাবে পড়িয়া দেশীয় আদর্শ জানিয়া কিংবা না জানিয়া বর্জন করিয়াছিলেন।

দেবদেবীর কল্পনা বাদ দিলেও রবি বর্মার চিত্র রচনায় অদ্ভুত বর্ণন্যাস ও বস্তুর সমাবেশে যথেষ্ট চাতুর্য আছে। নিছক চিত্র রচনা হিসাবে তাঁহার শিল্পসৃষ্টি যথেষ্ট প্রশংসারযোগ্য। সবচেয়ে বেশী সম্মান লাভের যোগ্য হইল তাঁহার প্রতিকৃতি রচনা এবং বিশেষ ভাব ও রসের কাল্পনিক প্রতীক এক শ্রেণীর নারী চিত্রমালা। এই শ্রেণীর চিত্রে রবি বর্মা রসসৃষ্টির মৌলিক স্বকীয়তার সম্যক পরিচয় দিয়াছেন।

রবি বর্মা এইরূপে ভারতের চিত্রশিল্পে এক আধুনিকতার প্রবর্তন করিয়া এক নূতন ও বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন যাহার অনুসরণ করিয়া সমসাময়িক ভারতের ও পরবর্তী কালের বহু শিল্পী অনুরূপ রীতিতে বহু চিত্র রচনা করিয়া শিল্পজগতে "রবি বর্মার যুগ" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই যুগ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সুপ্রচলিত ছিল।

অনেকদিন পরে 'দেশে'র দরবারে 'ভবঘুরে'র ডাক পড়েছে—নতুন করে 'কাহিনী নয় খবর' শোনাবার জন্য—এর জন্য ধন্যবাদটা হয়তো আপনাদেরই প্রাপ্য, তাই ধন্যবাদটা জানিয়ে প্রতি সপ্তাহে বিদেশের তেমন সব খবর শোনাবার ভার নিচ্ছি, যেসব খবর—খবর হলেও 'কাহিনী'র মতই মনে হয়।

**এট্‌লি সাহেবের মনখোলা কথা**

সম্প্রতি এট্‌লি সাহেব পোর্টস্‌ মাউথ থেকে বেড়িয়ে ফিরেছেন। সেখানে তিনি শ্রমিক দলের এমন কয়েকজন সদস্যের দেখা পেয়েছেন, যাঁদের ষোল আনা মতিগতির মিল দেখা গেছে কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্যদের মতের সঙ্গে। তাঁদের মতে কমিউনিস্টরা যা করছে তা খুবই ঠিক কাজ। এই সব ব্যাপার এট্‌লি সাহেব নিজে জেনে এসেছেন বলেই শ্রমিক দলের অন্যতম কর্মকর্তা মিঃ প্ল্যাট মিলসকে দল থেকে বার ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ ধরণের আরও কয়েকজন সদস্যকে কড়া কড়কানীও দেওয়া হয়েছে এই বলে—যে এখনই তাঁরা মন ঠিক করে নিয়ে জানিয়ে দিন যে, তারা দলের বিশ্বাসভাজন হয়ে কাজ করবেন কি না?

এ সব ছাড়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এট্‌লি সাহেব কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বড় স্পষ্ট করে বলেছেন—তিনি বলেছেন, "নিজের দেশের চেয়ে রাশিয়ার জন্যই এ'দের বেশী মাথা ব্যাথা, মানুষের জীবনের সাফল্যের চেয়ে এ'রা চান এ'দের উদ্ভট খেয়াল ও মতবাদের সার্থকতা" আমাদের দেশের "কমিউনিস্ট দল" বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছে বটে, কিন্তু ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখুন—তলে তলে সরকারের হোমরা চোমরা অনেক চাঁই—গোপনে কোমলাঙ্গ কমিউনিস্টদের অনুরাগ বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন। আর তাই এটলি সাহেবের মত স্পষ্ট কথাও তাঁদের মুখে বড় একটা শোনা যায় না।

**রাজকন্যা বৃষ্টিতে ভিজলো!**

ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের কনিষ্ঠা কন্যা মার্গারেট নিশ্চয়ই আপনাদের পরিচিত। গত মে মাসের পয়লা তারিখে তাঁকে বৃষ্টিতে ভিজে 'বাথ' অঞ্চলের পথে হাঁটতে দেখা গেছে! তিনি যাচ্ছিলেন 'বাথ' অঞ্চলের একটি হাসপাতালে যেখানে শিশুদের পক্ষাঘাত রোগের চিকিৎসা হয়। রীতিমত বৃষ্টিতে ভিজে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুদের পাশে যখন পৌঁছুলেন, তখন ছোট ছোট রোগীরা খুব খুশী হয়ে উঠেছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু দুঃখও হয়তো হয়েছিল তাদের, এই কথা ভেবে যে তারা অমন বৃষ্টিতে ভিজবার সুযোগ পেলো না।

**এ যুগের রবিনসন ক্রুশো**

মধ্য নরওয়ের পার্বত্য প্রদেশের একটি পাহাড়ের ওপরে একদল বৈমানিকের হাতে এ যুগের রবিনসন ক্রুশো সম্প্রতি ধরা পড়েছেন। আসলে তিনি হচ্ছেন একজন ভূতপূর্ব জার্মান সৈনিক। এই সৈনিকটি রবিনসন ক্রুশোর মত লোমওয়ালা চামড়ার পোষাক পরে শীকার করে আর জানোয়ার মেরে গত তিনটি বছর কাটিয়েছে পাহাড়ের ওপরে গুহায় কন্দরে। চুল দাড়ী তার গজিয়েছে বিরাট লম্বা হয়ে—গায়েও হয়েছে এমন জোর যে, লোকটিকে ধরবার পর তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনতে হয়েছে। সৈনিকটি নিজে বলেছে, নরওয়েতে জার্মানরা ধরা দেওয়ার পরেই সে পালিয়ে গিয়ে ঐ পাহাড়ের ওপরে সেই যে উঠেছিল আর নামেনি। ঐভাবে গুহা কন্দরে থেকে সে আদিম বন্য মানুষের জীবনের সুখ শান্তির যে স্বাদ পেয়েছে তার তুলনায় পৃথিবীর সভ্যতার পরিবেশ নাকি অনেক বেশী দুঃখদায়ক, কণ্টকর ও ঘৃণ্য বলেই তার মনে হয়েছে।" কথাটাও হয়তো ভুল নয়, কিন্তু আদিম বন্য জীবনে ফিরে যাওয়ার উপায়তো দেখছি না, কি বলেন?

**রোগ-বীজাণুর সাহায্যে লড়াই!**

আগামী যুদ্ধে মারাত্মক রোগের বীজাণু ছড়িয়ে শত্রুপক্ষকে জব্দ করার কথাটা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল; কিন্তু ওটা সেরেফ গুজবই নয়। কারণ 'বীজাণুর সাহায্যে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আগামী গ্রীষ্মকালে বৃটেনে এক গোপন বৈঠক হবে বলে খবর পাওয়া গেছে। এ খবরটি দিয়েছেন, নিউজিল্যাণ্ডের গবেষক বৈজ্ঞানিক ডক্টর জি এইচ কানিংহাম। অকল্যাণ্ড থেকে রওনা হওয়ার সময় তিনি এই খবরটি প্রকাশ করেছেন। তবে এটাও বলেছেন যে, সম্মেলনটা খুব চুপি চুপি হচ্ছে। আপনারাও চুপি চুপি এই খবরটা বন্ধু-বান্ধবকে জানিয়ে দেবেন।

**বাথ অর্থোপেডিক হাসপাতালে রাজকন্যা মার্গারেটকে জোয়ান ডেভিজ ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছে।**

বেশী অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকদের এই জন্য দ্বারে দ্বারে অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘুরিতে হইয়াছে। যে সকল এ্যাথলীট, খেলোয়াড়, সাঁতারু, মুষ্টিযোদ্ধা, ভারোত্তোলনকারী এইভাবে লণ্ডনে গিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই পরিচালকদের শ্রম সম্পর্কে ধারণা করিতেই পারিবেন না। এই সকল অক্লান্ত পরিশ্রমী পরিচালকদের শ্রমের প্রকৃত মূল্য দেওয়া হইবে, যদি বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের যোগদানকারী প্রতিনিধিগণ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের কৃতী এ্যাথলীট, সাঁতারু, খেলোয়াড়দের নিকট হইতে কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া আসেন ও দেশে ফিরিয়া তাহা উৎসাহী ব্যায়ামবীরদের বিনা দ্বিধায় শিক্ষা দেন।

**রাশিয়া যোগদান করিল না**

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ৫২টি দেশ যোগদান করিয়াছে। ইতিপূর্বে কোন অনুষ্ঠানে এত অধিক দেশকে যোগদান করিতে দেখা যায় নাই। তবে দুঃখের বিষয়, রাশিয়া শেষ পর্যন্ত যোগদান করিল না। অনুষ্ঠানের পরিচালকগণকে তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা প্রস্তুত হইতে পারিবেন না। ইহার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক কারণ নাই ইহা সাধারণে না সন্দেহ করিলেও আমরা করি। জার্মান ও জাপানকে না যোগদান করিতে দেওয়াও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। রাশিয়ায় ব্যায়াম ও খেলাধূলা যে স্তরে উপনীত হইয়াছে তাহাতে অতি সহজেই রাশিয়া শক্তিশালী প্রতিনিধি দল গঠন করিতে পারে এবং ঐ প্রতিনিধি দল অনেক বিষয়ে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিতে পারে ইহা যাহারা রাশিয়ার ব্যায়াম ও খেলাধূলা বিষয় সংবাদ রাখে, তাহারাই জানে। ইহা সত্ত্বেও যখন যোগদান করিল না তখন অন্তর্নিহিত কারণ নিশ্চয়ই আছে।

**ব্যবস্থাপনা কমিটির অর্থলাভের সম্ভাবনা**

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি লর্ড বার্লে সংবাদপত্রের এক বিবৃতিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, অনুষ্ঠানের দায়িত্ব লইয়া তাঁহাদের কোন লোকসান হইবে না। উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিবে। ঐ অর্থ ব্রিটিশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন ব্রিটেনের এমেচার খেলাধূলা ও ব্যায়ামের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবে।

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া ব্রিটেনের কেবল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের আর্থিক লাভ হইবে তাহা নহে, দেশবাসী ও বিভিন্ন দেশ হইতে বহু খাদ্যদ্রব্য লাভ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধাও যে হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

## ব্যাডমিণ্টন

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের সুনাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক টমাস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। টমাস কাপ প্রতিযোগিতা টেনিসের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার প্রথায় অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতীয় দলকে প্রথমেই আমেরিকান অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। খেলা কবে আরম্ভ হইবে জানা যায় নাই। তবে শীঘ্রই খেলার তালিকা গঠিত হইবে। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা লণ্ডনে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদান নূতন নহে। ইতিপূর্বে লণ্ডনের আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড় দেবীন্দর মোহন ও প্রকাশনাথ যোগদান করেন। সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই সত্য তবে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ইহারাই পুনরায় ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকায় টমাস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলার তরুণ চ্যাম্পিয়ান মেমাভী এই দলে স্থান পাইলে বিশেষ সকলেই খুসী হইবেন। টমাস কাপ প্রতিযোগিতায় যে সকল দল যোগদান করিয়াছে তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—
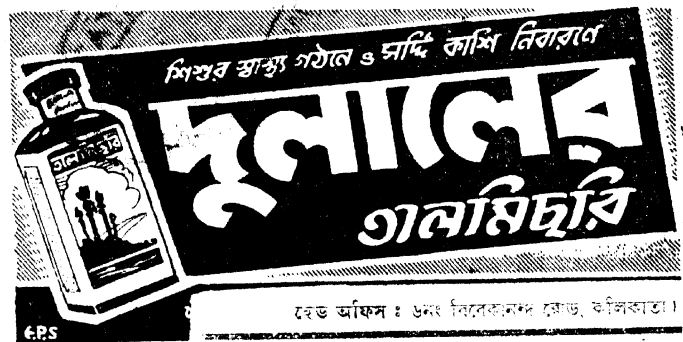
আমেরিকান অঞ্চল:—ক্যানাডা, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ।

ইউরোপীয় অঞ্চল:—ডেনমার্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও সুইডেন।

## টেনিস

নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশন ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যে চারিজন খেলোয়াড়কে প্রেরণ করেন তাঁহারা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ইহার পর কয়েকটি ইউরোপের ও ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ফলে এসোসিয়েশন কয়েকজনকে আমেরিকান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে খেলিবার অনুমতি দেন। ঐ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ পুনরায় সুবিধা করিতে পারেন না। আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করিয়া ইহারা পুনরায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা উইম্বলডনে যোগদান করেন। এই প্রতিযোগিতায় বাঙলার খেলোয়াড় দিলীপ বসু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সিঙ্গলসে চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্ত উঠিতে সক্ষম হন। এই রাউণ্ডে যাহার নিকট দিলীপ বসু পরাজয় বরণ করিয়াছেন তিনি উইম্বলডনে টেনিস প্রতিযোগিতার গত বৎসরের সিঙ্গলসের রাণার্স আপ। এই বৎসরে ইহার চ্যাম্পিয়ান হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমেরিকা ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। ফ্রাঙ্ক পার্কারের উপরই বেশি আশা রাখিয়াছিল। কিন্তু পার্কারও দিলীপ বসুর ন্যায় চতুর্থ রাউণ্ডে হাঙ্গেরিয়ান খেলোয়াড়ের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ শীঘ্রই স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ইঁহারা দেশে ফিরিয়া সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন না করিয়া যদি দেশের উৎসাহী টেনিস খেলোয়াড়দের নিয়মিতভাবে শিক্ষা দেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও ক্রীড়া কৌশলের উন্নতির চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত আনন্দলাভ করিব।

## দেশী সংবাদ

২১শে জন—আজ নয়াদিল্লীতে লাট ভবনের দরবার কক্ষে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ভারতের বড়লাট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। একজন ভারতের সন্তান হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম বড়লাট হইবার সম্মান লাভ করিলেন।

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু অদ্য পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এইদিন জনাব আসফ আলী উড়িষ্যার গভর্নরের কার্যভার গ্রহণ করেন।

ভারতের শেষ ইংরাজ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অদ্য প্রাতে পত্নী ও কন্যা সহ বিমানযোগে নয়াদিল্লী হইতে বৃটেন অভিমুখে যাত্রা করেন।

ময়মনসিংহের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৫ দিন যাবৎ ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে নেত্রকোণা মহকুমার কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে।

মুঙ্গের জেলার ঝাঝা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় পুলিশ একটি ছোটখাট গুপ্ত বন্দুক নির্মাণের কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, এই বৎসর এক কোটি পাঁচ লক্ষ লোক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৫ লক্ষ।

২২শে জুন—নয়াদিল্লীতে লালকেল্লায় মহাত্মা গান্ধীর হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত নাথুরাম গডসে, ভি ডি সাভারকর ও অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা আরম্ভ হইয়াছে। সরকার পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীযুত সি কে দফ্তরী মামলার উদ্বোধন করেন এবং বিশেষ আদালতের বিচারক শ্রীযুত আত্মাচরণ আসামীদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগসমূহ পাঠ করেন। বিচারক বলেন যে, আসামী দিগম্বর রামচন্দ্র বাদুগে রাজসাক্ষীতে পরিণত হইয়াছেন এবং তিনি রাজানুকম্পা লাভ করিয়াছেন। বিচারক জানান যে, অপর তিনজন আসামী ফেরার হইয়াছে।

সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী খান আবদুল কোয়ায়ুম খান ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থান-বিরোধীদের কার্যকলাপ দমন করিবার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শীঘ্রই একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে করাচীর দৈনিক "ডন" পত্রিকার প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

২৩শে জুন—অদ্য করাচীতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিমান চলাচল সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের এক বুলেটিনে জানা যায় যে, ১লা জুন হইতে ১৫ই জুনের মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের ১৩৬টি গ্রামে রাজাকারেরা হানা দেয়। এই সকল আক্রমণে দুইশত পল্লীবাসী নিহত হয়।

২৪শে জুন—গতকল্য নিজামের সৈন্যদল পুনরায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণা জেলায় আক্রমণ চালায়। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি হইতে সমস্ত লোক অপসারণ করা হইতেছে। সোলাপুর হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী হায়দরাবাদ রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত এক গ্রামে ভারতীয় পুলিসের সহিত গোলা-বিনিময়ের সময় ৪ জন রাজাকার নিহত হইয়াছে।

২৫শে জুন— কাশ্মীর রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনী পুঞ্চে অবস্থিত সৈন্যদলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং মেন্দেহর নামক একটি শহর দখল করিয়া বিরাট সামরিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে। পুঞ্চ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত হইয়াছে।

আলীপুরে স্পেশ্যাল বেঞ্চ হরেন্দ্র ঘোষ হত্যা মামলার রায় দিয়াছেন। আসামী বোম্বাইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং ওয়াজুল, হক ও রেজাক এই তিনজন আসামী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

২৬শে জুন—আসাম গভর্নমেণ্ট চাউল নিয়ন্ত্রণাদেশ রহিত করিয়াছেন। অদ্য শিলং-এ চাউল প্রতি মণ ৬৫্ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। চাউল দুষ্প্রাপ্য, অনেকেই এক বেলা আহার করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু আজ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির পরিদর্শন করিতে গেলে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে ডাঃ কাটজু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া বলেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমর বাণী বিশ্বের দরবারে ভারতকে মহান করিয়াছে।

হায়দরাবাদ রাজ্যে হিন্দুদিগকে বলপূর্বক ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, হাটকের ওয়াড়া গ্রামের ৫০০ হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে।

২৭শে জুন—মধ্য প্রদেশ ও বেরার সীমান্তের অদূরবর্তী হায়দরাবাদ রাজ্যের বিভিন্ন পল্লী হইতে রাজাকার ও গ্রামবাসীদের (অধিকাংশই হিন্দু) মধ্যে সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নলদুর্গ জিলার বোন এক গ্রামে রাজাকারেরা কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরাইয়া দেয়। রাজাকারদের গুলী বর্ষণের ফলে দুইটি শিশু সহ দশজন লোক নিহত হয়।

## বিদেশী সংবাদ

২৩শে জুন—ভারত-হায়দরাবাদ বিরোধে বৃটিশ সরকারকে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানাইয়া মিঃ উইনষ্টন চার্চিল যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, বৃটিশ সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মালয়ের উপদ্রুত অবস্থা সম্পর্কে সৈন্যাধ্যক্ষ ও বৃটিশ হাই কমিশনারের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া স্থল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল রীচি অদ্য বিমানযোগে কুয়ালালামপুরে পৌঁছিয়াছেন। সমগ্র মালয়ে পুলিশ ও সেনাদল নূতন নূতন ঘাঁটিতে মোতায়েন হইতেছে।

অদ্য বার্লিনের বৃটিশ, মার্কিণ ও ফরাসী সেনাপতিত্রয় তাহাদের বৈঠকের পর ঘোষণা করেন যে, বার্লিনের ত্রি-শক্তি অধিকৃত অঞ্চলে সোভিয়েটের মুদ্রা সংস্কার সংক্রান্ত আদেশ বলবৎ হইবে না।

২৪শে জুন—রুশ সামরিক গভর্নর মার্শাল সোকোলভস্কি বার্লিনের জনসাধারণের নিকট এই মর্মে এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, বার্লিনে কার্যত চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ঘোষণায় বার্লিনের মুদ্রা সম্পর্কেও বর্তমান অবস্থার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে দায়ী করা হয়।

২৫শে জুন—লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিশক্তি কর্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সোভিয়েট কর্তৃক পাল্টা ব্যবস্থা অলম্বনের ফলে বার্লিনে নীরব যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, রুশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রা সংস্কার বিধি জারী করায় সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে বলশেভিকবাদ চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বার্লিনের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদিগকে অদ্য তাহাদের মুদ্রাসমূহ জার্মান মার্কে রূপান্তরিত করিয়া লইতে হইবে। ফলে শহরের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরাপুরি বিচ্ছেদ হইল।

আজ মিঃ এটলী বৃটিশ মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক আহবান করেন। প্রকাশ, বার্লিনের সংকট-জনক পরিস্থিতি এবং ইউরোপ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইংগ-মার্কিন সন্ধি চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জনাই এই বৈঠক আহূত হইয়াছে।

২৬শে জুন—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ এলাকা হইতে কম্যুনিষ্টদের বিভিন্ন প্রকারের কার্যকলাপের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মালয়েই এই জাতীয় কার্যকলাপ সর্বাপেক্ষা উগ্র আকারে দেখা দিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃটিশ কমিশনার জেনারেল মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড লণ্ডনে এক বেতার বক্তৃতায় মালয়ের ব্যাপারকে রবার বাগান, খনি ও কারখানায় অস্ত্রবলের সাহায্যে [illegible]ষ্ট আন্দোলন-কারীদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করেন।

মিঃ চার্চিল এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, রাশিয়ার প্রতি একমাত্র কঠোর মনোভাব ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের দ্বারাই তৃতীয় মহাযুদ্ধ নিবারণ করা যাইতে পারে।

সানফ্রান্সিস্কোতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় প্রকাশ্য অধিবেশনে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি শ্রীহরিহরনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি আজ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং উক্ত পার্টির সহিত ভারতীয় শ্রমিক সাধারণের কোনই যোগ নাই।

২৭শে জুন—নানকিংএর সংবাদে প্রকাশ, চীনা কম্যুনিষ্ট দল উত্তর চীনের ৭০ মাইল রণাঙ্গনে প্রায় ১ লক্ষ সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে।

চীনা পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ হইতে চীনের সিকিয়াং প্রদেশ পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। এই পরিকল্পনা ইংরাজরা রচনা করিয়াছেন।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক গভর্নমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মালবাহী যত বিমান পাওয়া যাইবে তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটি অবরুদ্ধ পশ্চিম বার্লিনে খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য অবিলম্বে নিয়োজিত হইবে। রুশগণ কর্তৃক বার্লিনের পশ্চিম অংশের তিনটি এলাকা অবরোধের বিরুদ্ধে ইংরাজ, আমেরিকান ও ফরাসীগণ এই প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।


শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ ] শনিবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 10th July, 1948. [ ৩৬শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**বাঙলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত**

গণপরিষদের কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিংহ গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডার সম্পর্কিত কার্য উপলক্ষে সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর বঙ্গ-বিহার সীমানা সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয় বলিয়া শোনা যায়; কিন্তু এই আলোচনার ভিতরের কথা কিছুই জানা যায় নাই। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের জন্য গণপরিষদ কর্তৃক কিছুদিন পূর্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুত জগৎনারায়ণ লাল সে কমিশনের অন্যতম সদস্য। ইনিও কয়েকদিন আগে কলিকাতায় আগমন করেন। বঙ্গ বিহারের সীমানা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত জগৎনারায়ণ বলেন, ঐ বিষয়টি তাঁহাদের কমিশনের বিবেচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ব্যাপার লইয়া সম্প্রতি যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বিহার এবং বাঙলার মধ্যে তিক্ততার ভাব বৃদ্ধি পাইবার আশংকা আছে জগৎনারায়ণ লাল সে কথা স্বীকার করেন। তিনি উভয় প্রদেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার দ্বারা এতৎসম্পর্কিত বিতর্কের নিরসন করিতে উপদেশ দেন। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, পশ্চিম বঙ্গের ন্যায়-সঙ্গত দাবীকে ভারত সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অদ্যাপি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিবার মত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন না এবং কালাতায়ের কৌশলে এই দাবীকে চাপিয়া যাওয়াই তাঁহাদের মতলব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার কারণ কি? বিহারের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলকে বাঙলায় ফিরিয়া পাইবার জন্য দাবী আজ নূতন নয়। সিংহভূম, ধলভূম এবং সাঁওতাল পরগণার কতক অংশের জন্য বাঙলার এই দাবী বহু দিন হইতেই চলিতেছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বাঙলার বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে পিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ভেদনীতির প্রয়োগে বাঙলার কতকটা অঞ্চল একদিকে বিহার এবং অপরদিকে আসামের মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। বাঙলাকে ব্রিটিশের এই কূটনীতির বিষময় ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আজ বিদায় লইয়াছে; কিন্তু যাইবার আগে তাহারা বাঙলার সর্বনাশ করিয়া গিয়াছে। বাঙলা আজ বিভক্ত। বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। বিব্রত বাঙলা আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই আঘাত হইতে বাঁচিতে চাহিতেছে। সে সুবিচার প্রার্থনা করিতেছে এবং যাঁহাদের নিকট বাঙলার এই প্রার্থনা, তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় বাঙলার শত্রু নহেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালীর তাঁহারা সতীর্থ ছিলেন; শুধু তাহাই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে বাঙলার বিরুদ্ধে যে কূটনীতি প্রয়োগ করিয়াছে, তাঁহারা তখন তাহার প্রতিবাদই করিয়াছেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস বহু দিন পূর্বেই বাঙলার দাবীর ঔচিত্যকে অভ্রান্ত ভাষায় স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সে দাবীকে কার্যে পরিণত করিবার পথে ইংরেজের প্রতিকূলতা এখন নাই; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতিবাদ ইংরেজের যাহারা বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের দিক হইতেই আসিতেছে; অন্ততঃ-পক্ষে বাঙলার দাবীকে তাঁহারা আমল দিতে চাহিতেছেন না। বাঙলার ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতার এমন একটা নিতান্ত অশোভন এবং অসংগত মনোবৃত্তির অভিব্যক্তির পরিচয় আমরা বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দের কাজে পাইতেছি। অথচ কারণ ইহার কিছুই নাই। বাঙালী কোন প্রদেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে নাই। পক্ষান্তরে বাঙলার সংস্কৃতি স্বাধীনতার অগ্নিময় সংবেদনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংহতিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙলার এই ন্যায়সংগত দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দিক হইতেও আমরা এ পর্যন্ত যথেষ্ট আন্তরিকতা এবং সংকল্পশীলতামূলক কর্মোদ্যমের পরিচয় পাই নাই। এদিকে শিয়রে সংক্রান্তি। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র যদি একবার পাকাপাকি রকমে প্রবর্তিত হয়, তবে বাঙলার দাবী প্রতিপালিত হইবার কোন সম্ভাবনা যে থাকিবে, আমাদের এ বিশ্বাস নাই। আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে এখনও বাঙলার দাবী লইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াইতে বলিতেছি। প্রকৃতপক্ষে যে দিক হইতে যেমন চেষ্টাই হোক না কেন এবং বাঙলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত যে আকারেই ধরুক না কেন, বাঙলার দাবীকে প্রতিহত করা যাইবে না এবং সে দাবীর সম্বন্ধে অবিলম্বে সন্তোষজনক মীমাংসা যদি না হয়, তবে বাঙলায় বিক্ষোভ দেখা দিবে। কতিপয় নেতৃপদাভিমানীর অবিমৃষ্যকারিতা কিংবা দুর্বলতার জন্য বাঙালী নিজের সর্বনাশ ঘটিতে দিবে না। সহ্য গুণেরও একটা সীমা আছে।

**পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী**

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ১৯শে আষাঢ় পূর্ববঙ্গের আশ্রয়-প্রার্থীদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবলম্বিত বর্তমান নীতি সম্বন্ধে একটি

বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার রায় বলেন —"পূর্ববঙ্গ হইতে এখন যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা বড় রকমের কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে আসিতেছেন না; প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্যই তাঁহারা আসিতেছেন, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার যে ধরণের আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য টাকা দিতেছেন, শুধু সেই ধরণের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যই টাকা খরচ করা যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্পর্কে যখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আমি এখনও মনে করি, পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে লোক আসা বন্ধ করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল, তাহাই নয়, যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্ররোচিত করিতে হইবে। সেই ভিত্তিতে আমরা পূর্ববঙ্গের সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতেছি। ডাঃ রায়ের এই বিবৃতিতে বোঝা যায়, পূর্ববঙ্গ হইতে আগতদিগকে অতঃপর কোন অবস্থাতেই আশ্রয়প্রার্থীস্বরূপে গ্রহণ করা হইবে না. পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমন কোন সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেন নাই। এখনও পূর্ববঙ্গের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহারা ব্যবস্থা করিবেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন এই দাঁড়ায় যে, পূর্ববঙ্গের অবস্থা বর্তমানে এমন হইয়াছে কি, যাহাতে সেখানকার অধিবাসীদের পক্ষে বাস্তুত্যাগ অনাবশ্যক কিম্বা পরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন কিছুদিন পূর্বে আস্ফালনের সহকারে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। কেহ পূর্ববঙ্গ তো ছাড়িতেছেই না, বরং যাহারা পূর্ববঙ্গ হইতে গিয়াছিল, তাহারা দলে দলে ফিরিয়া আসিতেছে। খাজা সাহেব নিজে নাকি ইহাও প্রত্যক্ষ করেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতাগামী গাড়ী সব ফাঁকা যাইতেছে; কিন্তু কলিকাতা হইতে পূর্ববঙ্গের দিকে যেসব গাড়ী যাইতেছে সেগুলিতে লোকের বেজায় ভিড়। পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি যে সত্য নহে, তাহা চোখের উপরই দেখিতেছি। পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগীদের আগমন বন্ধ হয় নাই। এখনও তথাকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বিপন্ন এবং অসহায় অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের রেল ষ্টেশনসমূহে ভিড় জমাইতেছে। শিয়ালদহ ষ্টেশন পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয়শালায় পরিণত হইয়াছে। অর্থনীতিক কারণ যে এ ক্ষেত্রে না আছে, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। সম্প্রতি বন্যার ফলে পূর্ববঙ্গের ব্যাপক অঞ্চলে অবস্থা অতি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে অনশনে অর্ধাশনে দিনযাপন করিতে হইতেছে। চাউল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনধারণের আবশ্যক সব জিনিসই অতি মহার্ঘ এবং দুষ্প্রাপ্য। ইহার উপর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা দেশ ত্যাগ করাতে কারিগর, দিনমজুর ইহাদের অন্ন জুটিতেছে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে বয়কট করিবার একটা মনোবৃত্তি পূর্ববঙ্গের সমাজ-জীবনের সর্বত্র এখনও রহিয়াছে এবং তাহার ফলে অর্থনৈতিক জীবন একেবারে এলাইয়া পড়িতেছে। পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল সেদিন আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, নয় আনা সেরে চাউল যাহাতে লোকে পায়, তাঁহারা তেমন ব্যবস্থা করিতেছেন; কিন্তু যাহাদের দৈনিক আয় আট আনা দশ আনার বেশী নয়, তাহাদের পক্ষে ঐ মূল্যে চাউল ক্রয় করা সম্ভব হইতে পারে কি? প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গ সরকারকে সেখানকার এই নিদারুণ অর্থনীতিক সঙ্কটের সমাধানে তৎপর হইতে হইবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইবে, নতুবা পশ্চিমবঙ্গের অভিমুখে বাস্তুত্যাগীদের অভিযান বন্ধ করা যাইবে না। আশ্রয়প্রার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশের দ্বার বন্ধ করিবার আগে পূর্ববঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্য ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজ পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গের দ্বারস্থ হউন, আমরা ইহা চাহি না; কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবস্থা যদি এমন দাঁড়ায়, যাহার ফলে বিব্রত হইয়া তথাকার সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইতে হয়, তবে তাহাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতেই হইবে। পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বাস্তু ত্যাগ যেমন পূর্ববঙ্গ সরকারের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়, তেমনই একান্ত অসহায় অবস্থায় যাহারা পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশ্রয়প্রার্থী স্বরূপে গণ্য করুন আর না করুন, যদি নিরাশ্রয় অবস্থায় তাহাদিগকে পথের ধারে পড়িয়া থাকিতে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তাহা ততোধিক কলঙ্কের বিষয় হইবে। বস্তুতঃ বিপন্ন অবস্থায় যাঁহারা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন বা হইবেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাহা সাধ্য, তাঁহাদের জন্য তাহা করিতেই হইবে; কিন্তু যদি তাঁহাদের সামর্থ্যে না কুলায়, তবে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য দায়িত্ব অস্বীকার না করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর সে দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে হইবে। ই'হারা কেহই সে দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না।

**ভারতের নাগরিক অধিকার**

ভারত সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমানে পাকিস্থানের যে সব বাসিন্দা ভারতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে ইচ্ছুক এবং ভারত রাষ্ট্রের নাগরিকতার অধিকার লাভ করিতে চাহেন, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে সেজন্য আবেদন করিতে হইবে। ভারতের কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই আবেদন পেশ করিলেই চলিবে। ৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন বা আসিবেন শুধু তাঁহাদের আবেদনই বিধিসঙ্গত হইবে, পরে আসিলে চলিবে না। কিন্তু নানাদিক হইতে এই নির্দেশ অস্পষ্ট। কাহার পক্ষে এই আবেদন, কি আকারে, কোন অঞ্চলের কোন স্থানে, কাহার নিকট করিতে হইবে, লোকে তাহার কোন হদিসই পাইতেছে না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সংগঠন এবং শক্তির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত এমন একটা গুরুতর প্রশ্নেও জনসাধারণকে সাহায্য করিবার জন্য এ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কোন আগ্রহেরই পরিচয় আমরা পাইতেছি না। মোটামুটি সময়ের মেয়াদ জানা গেল। এইভাবে সময়ের মেয়াদ বাঁধিয়া দিবার পক্ষে যে প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, আমরা তাহা স্বীকার করি। কারণ নবগঠিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন আরম্ভ করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় নাগরিক অধিকার কাহাদের আছে, অর্থাৎ কাহারা ভোটাধিকার পাইলেন, তাহা সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। অনির্দিষ্টকালের জন্য একটা অব্যবস্থার মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র চলিতে পারে না। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাও তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে যাহারা ভারতে বসবাস করিতে ইচ্ছুক, অথচ এখন পর্যন্ত সে সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করিতে না পারিয়া দো-টানা অবস্থার মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহারা মত স্থির করিবার জন্য তিন মাস সময় পাইলেন। তিন মাস সময় অবশ্য কম নয়, দেশের অবস্থা যদি স্বাভাবিক থাকিত, তবে এই সময়ই যথেষ্ট। কিন্তু অবস্থা এখনও স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। হায়দরাবাদ এবং কাশ্মীরের অত্যাচার এখনও অনেকের মনকে অব্যবস্থিত রাখিয়াছে, ভবিষ্যতে অবস্থা কেমন দাঁড়াইবে, সাম্প্রদায়িকতার বিক্ষোভ পাকিস্থানে নূতন আকারে দেখা দিবে কিনা, তাঁহারা এই ভয় করিতেছেন। যাঁহারা ধনী, তাঁহারা অনেকে অবশ্য একরূপ মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ স্থির করা এখনও সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। ই'হারা যদি একবার ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকতা স্বীকার করিয়া ফেলেন, তবে পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়া বসবাস করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাঁহারা সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন। এই সব দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সময়ের মেয়াদ অন্ততঃ আরও কিছুদিনের জন্য বাড়াইয়া

[illegible] উচিত। শুধু ইহাই নয়, সর্ব্বসাপেক্ষ-[illegible] পাকিস্থানবাসীদের জন্য সব সময় [illegible] নাগরিক অধিকার লাভ করিবার সুবিধা উন্মুক্ত রাখাও আমরা একান্ত প্রয়োজন [illegible] মনে করি। আপাতত অবস্থা [illegible] অনিশ্চিত [illegible] নির্দ্দোষ [illegible] [illegible], পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অল্পদিনের [illegible] স্বাভাবিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে [illegible] আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং বাস্তু-[illegible] এই সমস্যা দীর্ঘ দিনের জন্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা বিপন্ন, এমন [illegible] [illegible] এখনও চলিতেছে। খাজা নাজি-[illegible] এবং তাঁহার অনুগত দলের একজন [illegible] এবং আগ্রহ কমিতেছে না, অশুভ লক্ষণ [illegible]।

### পাকিস্থানের স্টেট ব্যাঙ্ক

গত ১লা জুলাই হইতে পাকিস্থানের নিজস্ব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতঃপর পাকিস্থান সম্পর্কে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব শেষ হইল। পাকিস্থানের স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় যাহাতে না ঘটে, এরূপ কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, ভারত অর্থাদি প্রেরণে কোন নূতন বাধানিষেধ পাকিস্থানে আরোপিত হইবে না। উভয় রাষ্ট্রের মুদ্রা বিনিময়ের হারও সমানই থাকিবে অর্থাৎ পাকিস্থানের টাকা এবং ভারতের টাকার মূল্য সমান হইবে। আপাতত নীতির দিক হইতে এসব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থানের সমগ্র অর্থনৈতিক সমস্যার এগুলিতে সমাধান হইবে কিনা, এখনও সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক এমন সন্দেহের একটা প্রধান কারণ। সেখানকার রাষ্ট্রনায়কগণ পাকিস্থানকে মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু এইরূপ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি লইয়া আধুনিক জগতে কোন রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কশূন্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সে রাষ্ট্রকে বদ্ধ থাকিতে হয়। রাষ্ট্রনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার এই দৃষ্টি ইহার মধ্যেই পাকিস্থানের অর্থ-নৈতিক ভিত্তিকে অনেকখানি বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী মাত্রেই নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে সে বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতেছেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িকতা-গত মোহ অর্থনৈতিক সে তাড়নায় ক্রমেই ভাঙিতেছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে সম্প্রদায়বিশেষের একাধিপত্যের ফলে সংগঠনের মূল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহযোগিতা দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিতেছে না। পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থনীতির নিয়ামকগণ যদি নিজেদের রাষ্ট্রের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিপত্তি এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, তবে সাম্প্রদায়িকতার এমন সঙ্কীর্ণ মনোভাবকে সকল রকমে উৎখাত করিতে হইবে।

### শেষ অস্ত্র প্রয়োগ—

ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নিজাম সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা এই মর্ম্মে আদেশ জারী করিয়াছেন যে, অতঃপর ভারত রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া কোন বিমান হায়দরাবাদে গিয়া অবতরণ করিতে পারিবে না এবং ভারত হইতে সোণা, জহরত কিংবা মুদ্রাদি হায়দরাবাদে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারতে নিজাম সরকারের প্রায় একশত কোটী টাকা মূল্যের যে সিকিউরিটি আছে, তাহার হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভারত সরকার এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে এই সত্য এখন সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, নিজামের আপোষ-নিষ্পত্তির আশা তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়া এবার কাজের পথ ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ মধ্য যুগীয় মনোবৃত্তির মোহে, নিজামের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটিয়াছে। দস্তুরমত চাপের মধ্যে না পড়িলে যে তাঁহার চোখ খুলিবে না, এ কথা আমরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিয়াছি। এইবার ভারত সরকারের নীতি সেই পথ ধরিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এখন নিজামের বড় মুরুব্বী কাজিম রেজভী এবং তাঁহার রাজাকর গুণ্ডার দলের দৌড় কতদূর দেখা যাইবে। তারপর [illegible]জামের স্বৈর-চারিত্রের সমর্থক এ [illegible] ও বিদেশে, ভারতে ও পাকিস্থানে [illegible] যেখানে আছেন, তাঁহাদেরও কেরামতি[illegible] পরিচয় পাওয়া যাইবে। নিজামের প্রধান [illegible]ন্ত্রী মীর লায়েক আলী দম্ভ করিয়াছেন, [illegible]রা কাহাকেও ভয় করেন না। তাঁহারা [illegible]রাবাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিবেন। রাষ্ট্রের শতকরা ৭৫ জনকে মধ্যযুগীয় বর্ব্বর ধর্ম্মান্ধতায় চাপিয়া রাখিয়া মীর সাহেব হায়দরাবাদের জনসাধারণকে স্বাধীনতার প্রলোভনে নিজের পক্ষে রাখিবেন। আস্পর্দ্ধা কম নয়। নিজাম এবং তাঁহার পরিষদবর্গের এই ধরণের ধাপ্পায় প্রবঞ্চিত হইবার মত অমানুষ হায়দরাবাদে না আছে, আমরা এমন কথা বলি না; কিন্তু জনমত সেখানেও জাগিয়াছে। জগতের গতি ঘুরিয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধ বর্ব্বরতা ও স্বেচ্ছাচার এ যুগে খাটিবে না। মানুষ যাহারা, তাহারা পশুবলের স্পর্দ্ধার কাছে মনুষ্যত্ব বিকাইবে না বরং প্রাণ দিবে। নিজামের গুণ্ডার দলের ভয়ে তাহারা নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। তবে ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতি চরম পরিণতির দিকে গতি ত্বরিত হওয়া দরকার। গোড়ায় গিয়া আঘাত করিতে হইবে। তবেই নিজাম যে অন্ধতার বশে পরিচালিত হইতেছেন, তাহার ফল তিনি হাতে হাতে পাইবেন। হয়ত জুনাগড়ের নবাবের মত তাঁহাকেও গদী ছাড়িয়া পলাইতে হইবে। পাকিস্থানের সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোণিত-পিপাসার প্রশ্রয়ে নিজাম বাহাদুরের বড় দরদের যে সব দরদী আছেন, তাঁহাদের মুখে সেদিন চুণকালী পড়িবে।

### অনর্থ সৃষ্টির বাতিক

কিছুদিন হইল আসাম প্রদেশের বেতার-কেন্দ্রের উদ্বোধন সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে আসামের গভর্ণর স্যার আকবর হায়দরী এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ সময়োচিত বেতার বক্তৃতা করিয়াছেন। এইভাবে আসামের সমগ্র ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্ক নিবিড় হইল, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু এমন একটি শুভ অনুষ্ঠানেও একদল শিল্পী অনর্থ সৃষ্টি করেন। কবিগুরুর 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীতের দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। অসমীয়া কয়েকজন শিল্পীর মেজাজ ইহাতে ঠিক থাকে নাই। কণ্ঠসঙ্গীতে আসামের নাম নাই এই অজুহাত তুলিয়া তাঁহারা বেতারকেন্দ্রের প্রবেশ-পথে পিকেটিং করিতে থাকেন। ইহার পূর্ব্বে আর একটি ক্ষেত্রে কতকগুলি অসমীয়া যুবক কবিগুরুর উক্ত সঙ্গীতে এমন আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। প্রাদেশিকতার অন্ধতা জাতিকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে, আমরা এই সব ঘটনা হইতে তাহা অনুমান করিয়া শঙ্কিত হইতেছি। সমগ্র ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে যাহারা নিজদিগকে যুক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করে, তাহারা স্বাধীনতার মূল্য কি বুঝিবে? আসাম কি ভারত ছাড়া? বাস্তবিকপক্ষে স্বদেশপ্রেমের বলিষ্ঠ প্রেরণা যদি আমাদিগকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করে, তবে জাতির ভবিষ্যতের কোন আশা নাই। আমরা দেখিতেছি, ভারতের রাষ্ট্রনীতি আত্মমর্য্যাদার এই অগ্নিময় প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। কথায় কথায় আজ প্রাদেশিকতার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয়তার আদর্শ আমাদের কাছে যেন ক্রমেই পরোক্ষ হইয়া পড়িতেছে। প্রাণময় আলোকে তাহা আগের মত উজ্জ্বল নাই। অনেক সময় মনে হয়, পাকিস্থান এদিক হইতে আমাদের চেয়ে ভাল। রাষ্ট্রের সংহতির আদর্শ সেখানে এতটা অস্পষ্ট নয়। অবশ্য সর্ব্বতোময় কর্তৃত্বের স্বেচ্ছাচার সমর্থনযোগ্য নহে; জনচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত্ত জাগরণই জাতীয়তার ভিত্তিকে দৃঢ় করে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতি মিঃ জিন্নার সর্ব্বতোময় প্রভুত্বের পঙ্ক হইতে মুক্ত না হইলে তাহার ভিত্তিও ধ্বসিয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রাষ্ট্রগত মর্য্যাদাবোধ জনচিত্তে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলা আমাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অভাবে জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং এ জগতে দুর্ব্বলের কোন স্থান নাই।

উডকাট্

স্কেচ্ (পেন এণ্ড ইঙ্ক্)

শিল্পী: শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

# বিচিত্রিতা

**গোবিন্দ চক্রবর্তী**

ঘুরি কেবল পথে প্রান্তরে
মুসাফির আমি, বেদুইন।
প্রবালপুরীর নেশায় জমাই
সাত সাগরে পাড়ি—
নোঙর ছেঁড়া নাবিক।

এখেন থেকে ওখেনে—
আর,
ওখেন থেকে সেখেনে—
এলোমেলো পদচারণা আমার
বসুন্ধরাভোর।

বুকের ভেতর
চোরাবালির চর ছিলো তবু
এক জায়গায়।
যাইনি কখনো অজন্তা ইলোরায়,
দেখিনি কখনো শ্রাবস্তী উজ্জয়িনী।
শিল্প ভুবনের মণি কুট্টিমে পড়েনি আমার
একটি ক্ষণেরো শিশির!
মুগ্ধ শিশুর মত
পান করেছি শুধু

প্রতিচ্ছবির পর প্রতিচ্ছবি—
বিচ্যুত ব্যর্থ ব্যাকুলতায়।

কিন্তু আজ?
আজ আর কোন পিয়াস নেইক মনে।
আর ক্ষুব্ধ হবে না জীবন
কোনো শীর্ণনীল, তীব্র তীক্ষ্ম
বুভুক্ষায়।
কালের মন্দির-দীর্ণ
হুঁশিয়ারী শিঙাকেও করিনে আর পরোয়া।
তোমাকে যে দেখলাম:
তোমাকে যে পেলাম:
'নীলা'!

শত শ্রাবস্তী উজ্জয়িনীর স্বপ্ন-মাতা তুমি,
শ্রীনয়ি!
এ কোন বিচিত্র পৃথিবীকে ধরে রেখেছ
একটিমাত্র ক্ষুদ্র দেহখণ্ডের মণিশিলায়।
প্রতিমা আমার!
তবে, পুতুলের দিকে ফেরাতে দিয়ো না আর চোখ!
শৈবালকে
কুল দাও এবার প্রবালের!

# চিরঞ্জীব

**রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী**

তো আছে এই পৃথিবীর হায়! তবু তো আমার চোখে
সর সন্ধ্যা ঘনায় কেবল সর্বরিক্ত শোকে।
টিতে ফুলেরা, আকাশে তারার বাসা
মার ক্ষুধিত চোখ থেকে কেড়ে রেখেছে সর্বনাশা;
লি ওড়া পথ, যাত্রীর ভিড়, ঘনপ্রাসাদের সার—
পবাসী ক্ষীণ অনুভবে যেন দুঃসহ গুরুভার।
মার আকাশকুসুম কখন কেটেছে কুটিল কীট,
ন গহবরে ধ্বসে পড়ে গেছে স্বপ্নের পাদপীঠ—
ধান তার খুঁজে পায় নাকো ব্যথাহত বিস্ময়:
ু জানি এই অবলুপ্তির কিছুই নিয়ত নয়।
থিবী স্বীকার করেছে আমারে, সংগত অধিকার
তি ধূলিকণা প্রতিটি তারায় রেখেছে অংগীকার।

তবু জানি আজও সে অধিকার তো সহজ লভ্য নয়:
রক্তবন্যা, অযথা মৃত্যু, নিষ্ঠুর অবিচার।
ক্ষীণ অনুভূতি—তবু তো মরেনি সেই অধিকার বোধ—
আমার পাংশু দুচোখ নয়তো অচেতন নির্বোধ—
শিথিল শিরায় স্বপ্ন জাগায় মাটির অংগীকার।
শুষ্ক জিহ্বা, গলা ছিঁড়ে গিয়ে ঝলক রক্ত ওঠে—
তাইতো আমার কণ্ঠে এখনো জীবনের গান ফোটে,
ক্ষুধাতুর দেহে অনুভব করি ভোরের মুক্ত হাওয়া,
আমার মনের আকাশে তারার নিরাপদ আসা যাওয়া।
ধূসর আকাশে ঘনায় সর্বনাশ—
যতো দিন আছি বক্র ভাষায় করে যাবো পরিহাস।
এতো আছে এই পৃথিবীর—আমি সব পেতে চাই চোখে—
মরবো না ক্ষোভে, ক্ষুধা হতাশায় সর্বরিক্ত শোকে।

রাজাজীকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া H. E. H. রেজভি বলিয়াছেন—"C. R. is a man of vision." তাঁর মুখে এমন কথা শুনিয়া আমরা চমকাইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু পরে মনে হইল রাজাজীর কালো চশমা জোড়াই হয়ত এই স্তুতির মূল কারণ!

* * * * *

নস্কর মহাশয় আবার রায় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাইতেছিলাম। আলোচনার মাঝখানে খুড়ো গান ধরিলেন—"মধুরাতি পূর্ণিমা আসে যায় বারে বারে, সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে"—জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ জন খুড়ো? খুড়ো উত্তর দিলেন—"মাছ!" বিবাদ করুণ এই গান, ততোধিক বিবাদ করুণ খুড়োর ভাষ্য, তবু খুড়োকে একটি বিড়ি না দিয়া পারিলাম না।

* * * * *

শ্রীযুক্ত বীরেন রায় যে নূতন ধরণের এরোপ্লেনের পরিকল্পনা করিয়াছেন, শুনিলাম তার নাম হইবে "মেঘদূত"। ট্রামে-বাসের যাত্রীদের যোগ্য এরোপ্লেনই বটে, চড়াতো সম্ভব হইবে না, শুধু "মেঘদূতে"র মারফতে বিরহ জ্ঞাপন!

* * *

রিপাব্লিকানদের মনোনীত প্রেসিডেণ্ট ডিউই সাহেবকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—If he could handle Joe
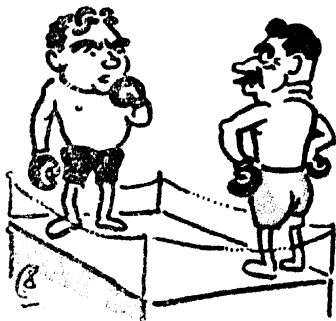
Stalin. কিন্তু Joe Louisর কাছে শিক্ষানবিশী না করিয়া কথাটার জবাব দেওয়া শক্ত!

* * * *

ইংলণ্ডেশ্বরের—"ভারত সম্রাট" উপাধি বর্জন উপলক্ষে মিঃ চার্চিল গেল রাজ্য, গেল মান বলিয়া অনেক বিলাপ করিয়াছেন

এবং বর্মার প্রসঙ্গে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছেন—

"we depended on Burmat for vital supplies of tropical produce"

"সত্যিই তো, রাজ্য তো গেলই, সেই সঙ্গে যে বর্মা চুরুটও গেল"—বিড়িটা টানিতে টানিতে মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * *

ডাঃ কাটজু ভারতের প্রদেশগুলিকে কণ্ঠহারের এক একটি মুক্তার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। প্রদেশ নিয়া যা কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইয়াছে—তাহাতেই মনে হয় তুলনা তাঁর সার্থক।

* * * * *

ডাঃ কাটজু আরও বলিয়াছেন যে তিনি রাজাজীর পদাঙ্ক অবশ্যই অনুসরণ করিবেন তবে রাজাজীর মত জনপ্রিয়তা অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। রূপক ব্যবহারে তিনি যে খানিকটা রাজাজীর কাছাকাছি পৌঁছিতে পারিবেন তার আভাস পাইতেছি, কিন্তু নির্বিচারে সমস্ত সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়ার সময় করিয়া উঠিতে না পারিলে জনপ্রিয়তার দিক হইতে একটু পিছাইয়া পড়িবেন বৈ কি!

* * * *

রেফরীদিগকে অতি-উৎসাহী ফুটবল ফ্যানদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া নাকি স্বরাষ্ট্র সচিব মহাশয় আশ্বাস দিয়াছেন। বিশুখুড়ো—গোবিন্দ মাণিক্যের ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—"হায় ফুটবল ফ্যান, অবশেষে সৈন্য দিয়া ঘিরিতে হইল রেফরী?"

* * * *

একটি সংবাদে শুনিলাম কেন্দ্রীয় সরকার নাকি বৃষ্টি কনট্রোলের গবেষণা করিতেছেন।—"অর্থাৎ অতঃপর বৃষ্টিও কালোবাজার থেকেই কিনতে হবে"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * * *

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, তাঁরা নাকি ভারতে দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই সঙ্গে জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হইতেছে কি না সে কথা সংবাদে বলা হয় নাই।

* * * * *

অন্য একটি বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ—অস্ত্রের অভাবে জার্মানীর শিকারীরা নাকি এখন তীর-ধনু নিয়া Huntingএ

যাইতেছেন। সে-টা ঠিক Head hunting কি না সে কথা খোলসা করিয়া বলা হয় নাই।

* * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম—যুক্ত রাষ্ট্রের চিকিৎসকগণ নাকি ঘুমন্ত অবস্থায় দাঁত কিড়িমিড়ি বন্ধ করার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। সোভিয়েটের চিকিৎসকগণ নিশ্চয়ই—জাগ্রত অবস্থায় দাঁত কিড়িমিড়ি বন্ধের ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

* * * *

উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়াও যদি পাঠক শতায়ু হইতে ইচ্ছা করেন তবে রাজনীতিতে যোগদান করুন। আন্তর্জাতিক চিকিৎসক সম্মেলনে কোন কোন চিকিৎসক নাকি বলিয়াছেন যে, রাজনীতিক হওয়া শতায়ু হওয়ার একটি উপায়।...... "সুতরাং ঘরেরও না খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে লেগে যান"—বলেন বিশুখুড়ো।

# ঢোঁড়াই চরিতমানস

## (সটীক)

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

(পূর্বানুবৃত্তি)

**পুলিশের নামে ঢোঁড়াইয়ের পাপক্ষয়**

এতোয়ারী পরের দিনও প্রত্যহের মত জয়সোয়ালদের সোডা-লেমনেডের কারখানায় কাজ করতে যায়। সেখানে ম্যানেজার সাধুবাবুকে সব কথা বলে। পুলিশ সাহেবের গাড়ি, সোডা আর তার আনুষঙ্গিক পানীয়ের বোতলের জন্য জয়সোয়াল কোম্পানীর দোকানে এলে সাধুবাবু ইংরেজি মিশানো হিন্দীতে সে রাতের তাৎমাটুলীর ঘটনাটির কথা তাঁকে বলেন। সাহেবের মাথা তখনও ঠিক ছিল; দিনের বেলা কোন কোন দিন থাকত।

তাই নাকি। আমার চোখের উপর এই ব্যাপার। চাপ্রাসী, দেখি পর বড় দারোগাকে সেলাম দেও। আগাগোড়া পচ ধরে গিয়েছে সার্ভিসের নীচের থাকগুলিতে। সব ঠিক করতে হচ্ছে।

সাহেবের রাগ দেখে কারখানার ঘরে এতোয়ারী ঘামতে থাকে।

সাধুবাবু এসে বলেন, 'এবার খাওয়াও এতোয়ারী, তোমার কাজ করে দিয়েছি।'

আমার নাম বলেন নি তো বাবু?

আরে না, না, সে আর তোমায় বলতে হবে না। ও কি! বুরুশ না দিয়ে, এমনিই বোতল পরিষ্কার করছিস কেন? বাবু হয়ে এতোয়ারী তোর কাজে ফাঁকি দেওয়া আরম্ভ হয়েছে।

এতোয়ারী অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

সেই রাতেই বড় দারোগা সাহেব দুজন কনস্টেবল নিয়ে গোঁসাইথানে পৌঁছান। আলো দেখে বাওয়া হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। চাটাইখানা বের করে পেতে দেয়। এত বড় হাকিমকে সে কি করে খাতির দেখাবে। চাটাইটার উপর দুই চাপড় মেরে ধুলো ঝাড়বার অছিলায় দারোগা সাহেবকে বসবার জায়গা দেখিয়ে দেয়।

কনস্টেবল ঢোঁড়াইকে বলে—কিরে দারোগা সাহেবের জন্য একখান খাটিয়াও যোগাড় করতে পারিস না।

হাঁ, কপিল রাজার জামাইয়ের কাছ থেকে একখান আনতে পারি।

দারোগা সাহেব বারণ করেন—না না অত 'খাতিরদারির' (১) দরকার নেই।

গাঁয়ের চৌকিদার লম্বা সেলাম করে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ সাহেবের গালাগালির কথা দারোগাবাবুর তখনও বেশ স্পষ্ট মনে আছে—সার্ভিস-বুকে কালো দাগ পড়বার ভয়;—সব এই নচ্ছার চৌকিদারটা খবর দেয়নি বলে। খবর না দেওয়ার জন্য চৌকিদারকে দুটি চড় মেরে দারোগাবাবু কাজ আরম্ভ করেন। আরম্ভ দেখেই সবাই বুঝতে পারে যে, আজ আর কারও রক্ষে নেই। চৌকিদারের মত 'অফসর' এরই যদি এই হালৎ হয়, তাহলে সাধারণ লোকের কপালে আজ কি যে আছে, তা গোঁসাই-ই জানেন।

চৌকিদার যায় ধাঙড়টুলী থেকে সকলকে ডাকতে, আর কনস্টেবলরা যায় তাৎমাটুলী থেকে আসামীদের ধরে আনতে। ঢোঁড়াই এত কাছ থেকে দারোগা-পুলিশকে কখনও দেখেনি। তার ভয় ভয় করে। তাই চৌকিদারের সংগে সংগে ধাঙড়টুলীর পথ ধরে।

ধাঙড়টুলীতে হুলস্থূল পড়ে যায়। আজ আর কারও নিস্তার নেই। কাল রাতের ছোট দারোগার মারের হুমকির কথা শনিচরা আর বিরসার মনে আছে। ছোট দারোগাতেই এই কাণ্ড। এতো আবার বড় দারোগা। বাপরে বাপ! পালা, পালা; চল সব গাঁ ছেড়ে পালাই! গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্ধকারে পালাতে আরম্ভ করে; কুলের জঙ্গলে, পুলের নীচে, বাঁশঝাড়ে। কেবল এতোয়ারী থেকে যায়, একজনও না গেলে দারোগা সাহেব চটবে। শুক্রা পালায় সবার শেষে। 'সনবেটোকে ফেলে পালাতে শুক্রার মন সরে না—আসবি নাকি ঢোঁড়াই? ঢোঁড়াইয়েরও ধাঙড়দের সংগে পালাতে ইচ্ছে করে। আবার ভাবে যে, না, বড় দারোগা আবার বাওয়াকে কি-না-কি করবে; বাঁড়াত দারোগা। এই বিপদের সময় বাওয়াকে দারোগার হাতে একলা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আর তার জন্যই তো এত কাণ্ড। না হলে এতে বাওয়ার আর কি দোষ ছিল।

যাওয়ার সময় শুক্রা চৌকীদারের হাতে চার আনা পয়সা গুঁজে দিয়ে যায়। এতোয়ারী আর চৌকিদারের সংগে ঢোঁড়াই ফিরে আসে। পথে এতোয়ারীর সংগে চৌকীদারের ঠিক হয় যে, সে যেন দারোগা সাহেবকে বলে যে, ধাঙররা সকলে আজ ভোজ খেতে নীলগঞ্জে গিয়েছে। কেবল এতোয়ারী ছিল পাড়া পাহারা দেবার জন্য। সিকিটা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে চৌকীদার ঢোঁড়াইকে বলে, তুই আবার যেন অন্য কিছু বলে টলে দিস না ছোঁড়া, বুঝলি।

ধাঙড়দের উপর চৌকীদারের এই অভাবনীয় করুণায় ঢোঁড়াইয়ের মন তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

সমবেত তাৎমার দল সকলে একবাক্যে বলে যে, তারা কেউ কিছু জানে না। বাবুলাল পিট্রোল এনেছিল। সে, তেতর নায়েব আর ধনুয়া মহতো ঘরে আগুন লাগিয়েছে।

কনস্টেবলরা বাবুলাল, তেতর, আর ধনুয়াকে গালাগালি দিতে দিতে সম্মুখে টেনে নিয়ে আসে। কোথায় গিয়েছে তেতর নায়েবের কাল রাতের প্রতাপ, কোথায় গিয়েছে ধনুয়া মহতোর ডিয়লগাছে হেলান দিয়ে বসা ন্যায়াধীশের গুরুগাম্ভীর্য, কোথায় গিয়েছে চাপরাশী সাহেবের পদগৌরব। দারোগা-পুলিশের হাতে বেইজ্জৎ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার, জেল থেকে বাঁচবার, হাকিমের হাত থেকে রক্ষা পাবার। বাবুলাল করুণ দৃষ্টিতে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়, মহতো দেখে বাওয়ার দিকে—দুই চাউনির ভিতর থেকে মিনতি আর কৃপা-ভিক্ষা ফুটে বেরুচ্ছে। তেতর উদ্গত শ্লেষ্মা গিলে দারোগা সাহেবের সম্মুখে কাশি চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আসন্ন বিপদের আশংকায় আর কাশি চাপবার উৎকট প্রয়াসে তার চোখে জল এসে গিয়েছে।

ঢোঁড়াইয়ের মনের ভিতর আগুন জ্বলছে;—এইবার ঠেলা বোঝো। দেখে যা দুখিয়ার মা, যে চাপরাশী সাহেবের জন্য তুই নিজেকে বাবু-ভাইয়াদের বাড়ির মাইজী মনে করিস, দেখে যা তার দশা। দেখিয়ে যা তাদের বরাফ দারোগা সাহেবকে, পিট্রোলের শিশির মালকাইন।

হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার সংগে চোখো-চোখি হয়ে যায়; বাওয়ার মনের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পায়। সে ঢোঁড়াইকে অনুরোধ করছে—আসামীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বল না—যা হবার হয়ে গিয়েছে, জাতের লোকের সংগে ঝগড়াঝাটি জীইয়ে রাখা ঠিক নয়।......

দারোগা সাহেবের জেরা আর গালাগালির বিরাম নেই। সব কটাকে জেলে পাঠাবো, সব কটার উপর 'চারশ ছত্রিস দফা' (২) চালাবো। সমস্ত গাঁটাকে পিষে একেবারে ছাতু ছাতু করে দেব; মুনেসোয়ার সিং দারোগাকে চেনোনা তাই! হিন্দু হয়ে থানের ইজ্জৎ রাখো না। মুসলমান হলেও না হয় কথা ছিল—ওরা সব করতে পারে......

সব আসামীই বলে যে, তারা হুজুরের

---

টীকা :—

(১) সম্মান দেখানোর

(২) ফৌজদারী আইনের চারশ ছত্রিশ ধারার মোকদ্দমা

কাছে মিথ্যা বলবে না, হুজুর মা-বাপ। আকাশে চাঁদ আছেন, গোঁসাই আছেন। রামচন্দ্রজীর রাজ্য চলছে। হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়—তাদের মধ্যে যে খারাপ লোক কেউ নেই, তা বলছে না; তবে সরকারের নিমক খেয়ে সরকারের কাছে মিথ্যে বললে তাদের গায়ে যেন কুষ্ঠ হয়। তারা আগুন লাগিয়েছিল ঠিক।......

কেন? শয়তানের বাচ্চা কোথাকার!

বাবুলাল সামলে নেয়। হুজুর বাওয়ার ঐ চালাটার উপর একটা শকুন বসেছিল। শকুন-বসা ঘর রাখতে নেই, তাতে পাড়ার অমঙ্গল, থানের অমঙ্গল, আর যে ঐ ঘরে থাকবে, তার তো কথাই নেই। এখানে একটা চামড়ার গুদাম আছে হুজুর, সেইটাই আমাদের জেরবার করলো, শকুন-টকুন পাড়ায় এনে।

সকলে প্রথমটায় অবাক হয়ে যায়। আসামী আর অন্য তাৎমাদের ধরে প্রাণ আসে। এখন সব নির্ভর করছে বাওয়া আর ঢোঁড়াইয়ের উপর —এই বুঝি তারা সব মিথ্যে ফাঁস করে দেয়।

দারোগা সাহেব বাওয়াকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এরা যা বলছে তা সত্যি কি না।

বাওয়া উত্তর দেয় না। সে প্রথম থেকে দারোগা সাহেবের সম্মুখে একইরকমভাবে বসে আছে। কোন কথায় সাড়া দেয়নি।

দারোগা ভাবেন লোকটা কেবল বোবা নয় কালাও। আর সাধারণতঃ তই হয়। একবার যেন মনে হয়েছিল যে, সে শুনতে পাচ্ছে—তাই না খটকা লেগেছিল দারোগা সাহেবের মনে।

তুই বল ছোকরা।

ঢোঁড়াইয়ের সব ঘুলিয়ে যায়। মুখ থেকে কথা বেরুতে চায় না। জিব যেন জড়িয়ে আসছে। এত বিপদেও কি লোকে পড়ে। প্রাণপণ শক্তিতে সে কথা বলতে চেষ্টা করে।

জোরে বল্। ভয় করিস না। তুই এখানেই থাকিস নাকি? বাপকা নাম? —এক নিশ্বাসে দারোগা সাহেব বলে যান।

ঢোঁড়াই মাথা নেড়ে জানায় যে, হাঁ সে এখানেই থাকে।

"এরা যা বলছে তা কি সত্যি?"

এতগুলো লোকের ভবিষ্যৎ এখন তার হাতে। একবার মাথা নাড়লে সে এখনই তার জাতের সেরা লোক কটির পঞ্চাগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারে, জেলের হাওয়া খাইয়ে আনতে পারে, অন্ততঃ পুলিশকে দিয়ে মার খাইয়ে বেইজ্জৎ তো করাতেই পারে। তার মনও তাই চায়। এই পঞ্চায়তের অত্যাচারের মাথাগুলোকে নীচু করাতে, এমন নীচু করাতে যাতে তারা আর কোনদিন মাথা উঁচু করে বাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে না পারে—যাতে তারা ঢোঁড়াইকে আর তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখতে পারে।......

কিন্তু বাওয়ার চাহনির আদেশ সে অমান্য করতে পারে না।...বাওয়া নীরবে তাকে বলছে, যে জেলে ধরে নিয়ে গেলে এদের এখন ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া ভাত খেতে হবে, কোথায় থাকবে তাৎমা জাতের গৌরব, কোথায় থাকবে 'কনৌজি তন্ত্রিমা ছত্রিদের' সুযশের সৌরভ।......

এতোয়ারী উস্‌খুস করে। বয়সের অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারে যে বাওয়া আর ঢোঁড়াই কেউই সত্যি কথা বলবে না। এতক্ষণ সে মনে মনে ভাবছিল, যে গোঁফমোটা জেলরবাবু রবিবারে আসেন জয়সোয়াল কোম্পানীতে, সওদা করতে, সাধুবাবুকে দিয়ে তাঁকে বলিয়ে বাবুলাল আর মহতোর হাতে বোনা একখানা সতরঞ্চি সে জেলখানা থেকে আনাবে; এনে একবার তার উপর বাওয়াকে বসাবে; তার জন্য যত খরচ হয় হোক; অনিরুদ্ধ মোক্তারের কাছ থেকে কর্জও যদি নিতে হয়, তাও স্বীকার...... কিন্তু সব 'চৌপট'(৩) করে দিল ঐ ঢোঁড়াইটা সে বলে যে, হাঁ বাবুলালের কথা সত্যি।

"কবে বসেছিল শকুন?"

"কাল সকালে।"

"মন্দা না মাদী।"

ঢোঁড়াই ঢোক গেলে।

"দুদিন পরে মোচ উঠবে এখনও শকুনের মন্দা মাদী চেনো না—বদমাস ছোকরা। অশথ-গাছে না বসে চালার উপর বসলো কেন শকুনটা' —মিথ্যাবাদীর ঝাড় সব!"

ঢোঁড়াই এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারে না। সে মনে মনে ভাবে, এইবার বোধহয় দারোগা-সাহেব তাকে মারবার জন্য উঠবেন।

"আর কেউ কিছু জানিস, এ সম্বন্ধে। এই বুড়ঢা!"

এতোয়ারীর সাদা ভুরুর নীচের ঝাপসা চোখজোড়া আর নির্বিকার মুখ দেখে, তার মনের কিছু বুঝবার উপায় নেই। সে ভেবেছিল তাৎমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবে; কিন্তু থানা পুলিশের ভয়ে সব কথা চেপে যায়। ঢোঁড়াইয়ের সাক্ষ্যেই যদি এই 'চোট্টা'গুলিকে সায়েস্তা করা যেত, তাহলে, মাছও উঠতো, ছিপও ভাঙ্গতো না। কিন্তু এমন সুযোগ পেয়েও এই নোংরা কুড়ের বাদশা, 'বিলকুল চোট্টা' পঞ্চগুলিকে ছেড়ে দিল ঢোঁড়াই। এ জাতটাকেই বিশ্বাস নেই। ও ছোঁড়ার শরীরেও তো এদেরই রক্ত। ......কাল সাধুবাবুর কাছে মুখ দেখানো শক্ত হবে তার।

"না হুজুর, আমি থাকি ধাঙ্গরটুলীতে।"

দারোগাবাবু সাক্ষী না পেয়ে বকে ঝকে চীৎকার করে উঠে পড়েন। চৌকিদারকে বলেন— এ শালাদের উপর ভাল করে নজর রাখবে। না হলে তোমার চাকরী থাকবে না।

চৌকিদার ঝুঁকে কুর্নিস করে। দারোগা-সাহেব কপিলরাজার জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করে, তারপর শহরে ফেরেন।

একজন কনেষ্টবল কেবল থেকে যায়। সে ছড়িদারকে দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিসব কথাবার্তা বলে। ছড়িদার এসে মহতো নায়েবদের বলে যে, সিপাহীজী জানে যে, ঢোঁড়াই বাবুলালের স্ত্রীর ছেলে। সব খবর পুলিশ রাখে। সে এখনি গিয়ে দারোগাসাহেবকে বলে দেবে যে, এই জন্যেই ঢোঁড়াই বাবুলালের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। তারপরই সবকটাকে জেলে পুরবে।

"পঞ্চরা" চাঁদা করে কিছু কিছু দিয়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলে, সিপাহীজীর সঙ্গে।

### ঢোঁড়াই ভকতের মর্যাদা বৃদ্ধি

এই ঘটনার পর ঢোঁড়াইকে মহতো নায়েবরা আর কিছু বলতে পারে না। মনে মনে নিশ্চয়ই সেই আগেকার মতই বিরূপ তার উপর, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। আর রাগ না চাপলে উপায় কি, মোকদ্দমা আবার 'খুলে যেতে' কতক্ষণ। পুলিশকে খবর দিয়েছিল কে তা তাৎমারা বুঝতে পারে না। সে লোকটাকেও খুশী করে রাখতে হবে।

বাওয়ার চালাঘর তাৎমারাই আবার তুলে দেয়। বাওয়া কিন্তু তার মধ্যে আর কখনও শোয় না। কেবল বর্ষার সময় ঢোঁড়াই বাওয়াকে ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়।

পাড়ার সকলে ঢোঁড়াইয়ের প্রশংসা করে। এতবড় বিপদের থেকে, এতবড় বেইজ্জতি থেকে, সে জাতটাকে বাঁচিয়েছে। তাকে আর কিছু হোক তাচ্ছিল্য করা চলে না। পাড়ার ছেলেরা ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলে ধন্য হয়, মেয়েরা ডেকে কথা বলে। তার বয়সী অন্য ছেলেদের গাঁয়ের বয়স্থ বয়স্থারা "ওরে ঢোঁড়া!" বলে ডাকে; কিন্তু তাকে এখন ঢোঁড়াই ছাড়া তার অন্য কিছু বলে ডাকতে বাধে—দুখিয়ার মার পর্যন্ত। এতটা সম্মান বাওয়া আর ঢোঁড়াই নিজের পাড়ায় কখনও পায়নি।

কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের মাটি কাটার কথাটা যেমন এই সূত্রে চাপা পড়ে যায়, তেমনি আবার একটা চার বছরের পুরোণো কথা হঠাৎ বেরিয়ে আসে—ঐ "চামড়াগুদামবালা" কপিলরাজার জামাইয়ের কথাটা। ওটা চাপা পড়ে গিয়েছিল সেবার গানহী বাওয়ার "সুরাজ"এর(১) তামাসার হিড়িকে।

বাবুলাল যে সেদিন দারোগাসাহেবের কাছে চামড়াগুদামের কথাটা তুলেছিল সেটার মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়াও অন্য কথা ছিল। এমনিই তো সবাই ছিল 'চামড়াবালা মুসলমান'টার উপর চটা। তার উপর কিছুদিন থেকে সে জিরানিয়ার একজন মেথরানীকে বাড়িতে এনে রেখেছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে, তাকে মুসলমান করে বিয়ে করবে।

কি যে পছন্দ ও জাতটার বুঝি না। একটা বৌ থাকতে আবার ঐ মেথরানীকে বিয়ে করতে

(৩) মাটিকরে দিল

টীকা:—

(১) স্বরাজ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ

ইচ্ছেও হয়! বলিহারি প্রবৃত্তির! গা দিয়ে সেটার 'ভক ভক ভক ভক' করে নিশ্চয় দুর্গন্ধ বেরোয়। এনে রেখেছিলে তাও না হয় বুঝেছিলাম; কিন্তু তাকে মুসলমান করে নিয়ে বিয়ে? কভ্ভী নহী!—হে'পো রুগী তেতর পর্যন্ত তাল ঠুকে বলে।

সেদিন দারোগাসাহেব রাতে ওর ওখানে গিয়ে কি বলেছেন, কি করেছেন জানতে পারা যায়নি। নিশ্চয়ই তাড়া টাড়া দিয়ে থাকবেন,—যা চটেছিলেন থানের থেকে যাওয়ার সময়।

এই মেথরানীর ব্যাপার নিয়ে গ্রামে বেশ সোরগোল পড়ে যায়। এমনি তো থানা পুলিশের ভয় ছিলই, তার উপর আবার গোসাই-থানে হয়ে গেল ঢোঁড়াইকে নিয়ে কাণ্ড; তাই কেউ আর কিছু করতে সাহস পায় না।

মেথরানীটাকে মুসলমান করে বিয়ে করা জিনিসটা, ধাঙড়রাও পছন্দ করে না। তারা নিজেরা হিন্দু কি, কি, এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামানো দরকার মনে করেনি; তবে তারা যে মুসলমান নয় এ কথা তারা জানতো। এই মেথরানীর বিয়ের ব্যাপারটাতে তাদের কেন যেন মনে হয় যে, তাদের হিন্দু জাতের উপর জুলুম করা হচ্ছে। মেথরানীকে তারা ছোঁয় না ঠিক তা হলেও সে তাদেরই মেয়ে। সেই মেয়েকে নিয়ে যাবে গরুখোরে? ছেলে হলেও না হয় অন্য কথা ছিল; এ মেয়ের ব্যাপার বিলকুল বেইজ্জতির কথা! আর যখন তার ব্যবসা ছিল, শিমুল গাছ কাটার কাজ ছিল, তখন না হয় কপিলরাজের সঙ্গে রোজগারের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই জামাইটা পরদেশী শুগা'(২) আজ নিষ্ফল খেতে বসেছে এখানকার নিমগাছে, কাল থাকবে না। কলে চামড়ার ব্যবসা, যার সঙ্গে ধাঙড়দের রোজগারে কোন সম্বন্ধই নেই। এটার সঙ্গে কিসের খাতির?

কিন্তু কি তাৎমাটুলীর, কি ধাঙড়টুলীর বড়রা কেউ থানা পুলিশের ভয়ে এবিষয়ে এগুতে রাজী নয়। ঢোঁড়াই এখন ছেলেদের মধ্যে একটু কেষ্ট বিষ্টু গোছের হয়ে উঠেছে। ধাঙড়টুলী তাৎমাটুলী দুই জায়গার ছেলেরাই তার কথা শোনে। 'পঞ্চ'রা ঢোঁড়াইকেই বলে চুপি চুপি—রাতে মধ্যে মধ্যে ঢিল ফেলিস চামড়া-গুদামে। খুব সাবধানে; এসব ছেলেপিলের কাজ। তোদের বয়সে আমরাও অনেক করেছি।

'পঞ্চ'রা মনে মনে ভেবে রেখেছে যে, এ নিয়ে বিপদ আপদ কিছু হলে, ঢোঁড়াইটার উপর দিয়েই যাবে।

ঢোঁড়াইরা মুসলমানটাকে একটু জব্দ করুক বাওয়াও তাই চায়। শোনা যাচ্ছে যে, 'মিসিরি ঠাকুরবাড়ির' মোহন্তজীরও এতে সমর্থন আছে। টোলার মহতো নায়েবদের কাছ থেকে, এত বড় একটা দায়িত্ব আর বিশ্বাসের পদ পেয়ে ঢোঁড়াই বর্তে যায়। কিন্তু একাজ তাদের বেশীদিন করতে হয় না। হঠাৎ শোনা যায় গানহী বাওয়া জিরানিয়ায় আসছেন, 'সাভা'(৩) করতে। তাঁকে কি কেউ জেলে ভরে রাখতে পারে। এক মন্তরে তালা পাঁচিল ভেঙে বাইরে চলে আসেন। গানহীবাওয়া মেথর মেথরানীদের খুব ভালবাসেন। তিনি এখানে এলে তাঁকেই বলা যাবে—এই জুলুম আর বেইজ্জতির একটা কিছু বিহিত করতে।

বন্ধ করে দে এখন ঢিল ফেলার কাজ, ঢোঁড়াই। কদিন দেখই না।

ঝিকটিহার মাঠে গানহীবাবার 'সাভায়' পৌঁছে তারা দেখে কি ভিড়! কি ভিড়! বকড়-হাট্টার মাঠে যত ঘাস, তত লোক; ই-ই-ই এখান থেকে মরণাধারের চাইতেও দূর পর্যন্ত লোক হবে। গানহীবাবার "রস্সি ভর"এর(৪) মধ্যেই তারা যেতে পারেনি, তার আবার তাঁর সঙ্গে কথা বলা। গানহীবাওয়ার কাছে বসেছিলেন মাস্টার সাব, বুধনগরের রাজাসাব, আরও কত বড় বড় লোক সব। কপিলরাজার জামাইয়ের কথাটা না বলতে পারায়, তাৎমাদের দুঃখ হয় খুব। একবার বলতে পারলেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু এই 'মেমুশা'র লোকের সকলেরই হয়ত নিজের নিজের কিছু কিছু কাজের কথা বলার আছে। যাঁর ধর্ম তিনি নিজেই যদি রক্ষা না করেন তাহলে আমরা কি করতে পারি। যাক গানহীবাওয়ার, 'দর্শন'টা তো হলো। ঢোঁড়াই দেখে যে, তার চাইতেও বোধহয় বেঁটে—কিন্তু কি নরম, ঠাণ্ডহা(৫) চেহারা—ঠিক মিসিরজীর মত। ঢোঁড়াই শুনেছে যে, ঘি খেলে নাকি অমনি চেহারা হয়। কিন্তু এ কিরকম 'সন্ত আদমী'(৬) দাড়ি নেই। ঢোঁড়াইদের সব চাইতে খারাপ লাগে, সৌখীন বাবুভাইয়াদের মত এই সন্ত আদমীর আবার চশমা পরার সখ। গানহী-বাওয়ার চেলারা সকলকে বসতে বলে। দর্শন হয়ে গিয়েছে, আর তারা বসে। কেবল বৌকা বাওয়া বসে থাকে—দূর থেকে সে দেখে কম, তাই সাভা শেষ হলে একবার ভাল করে দর্শন করবে বলে।

কিন্তু আজব ব্যাপার! ঢোঁড়াইদের কাজ হাসিল হয়ে গেল এর দিন কয়েকের মধ্যে। চামড়া গুদামটা উঠে গেল ইস্টিশানের কাছে। আসলে ইস্টিশানের কাছে না গেলে চামড়া চালান দেবার সুবিধে হচ্ছিল না, কিন্তু তাৎমা-টুলী ধাঙড়টুলীতে এর ব্যাখ্যা হল অন্য রকম। ঢোঁড়াইয়ের দলের ঢিলের জোর, গানহীবাওয়ার অদৃশ্য প্রভাব, আর সেদিনের দারোগাসাহেবের হুমকি, তিনটে মিলে যে কপিলরাজের জামাইকে এখান থেকে ভাগিয়েছে, এ সম্বন্ধে আর কারও কোন সন্দেহ নেই।

এই ঘটনার পর গাঁয়ে ঢোঁড়াইয়ের প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়ে, তার আত্মপ্রত্যয় বাড়ে তার চাইতে অনেক বেশী। সে মনে মনে অনুভব করে যে, রামজী আর গোসাই তার দিকে;—ঐ এমনি বোঝা যায় না, মনে হয় তাঁরা ঘুমুচ্ছেন, কিন্তু দেখছেন সব উপর থেকে; যিনি অন্যায় করেছেন তাঁকে ঘা খেতেই হবে।

রামজী ঢোঁড়াইয়ের তরফে; আর এখন সে কার পরোয়া করে দুনিয়ায়?

**তাৎমা ছাত্রদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ**

ভাগলপুর জেলার সোনবর্ষা থেকে মরগামায় এসেছিল মহগুদাস। তা বলে মরগামার মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের ওখানে নয়। মুঙ্গেরিয়া তাৎমারা রাজমিস্ত্রির কাজ করে, তাদের 'মেটাহারা'(১) মইয়ে চড়ে। তাদের ওখানে হেঁজিপেঁজি কনৌজী তাৎমাও জলস্পর্শ করে না; তার আবার মহগুদাসের মত লোক উঠবে সেখানে। তার বলে কত হাল বলদ জমি-জিরেৎ, তিন তিনটে সাদী(২) ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আঙ্গন, 'জনানা'রা(৩) বাড়ির বাহিরে যায় না, ছেলেপিলে নাতিপুতি, বাড়বাড়ন্ত সংসার।

সিরিদাস বাওয়ার কুর্মী চেলারা মরগামায় একটা সাভা করেছিল। সেই কুর্মী গুরুভাইদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে মহগুদাস এসেছিল;—আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের দর্শনটাও হয়ে যাবে, এটাও ছিল ইচ্ছা।

সেই সময় মহগুদাস কিছুক্ষণের জন্য এসে ছিল তাৎমাটুলীতে। অত বড় একটা লোককে এরা 'খাতিরদারী' কি করে করবে. তাই তাকে এরা থাকতেও বলেনি। কেবল ডিস্টিবোর্ড অপিস থেকে ডেকে আনিয়েছিল বাবুলালকে। গাঁয়ের মধ্যে 'ভালা আদমী'র(৪) সঙ্গে কথা বলা লোক, বাবুলাল ছাড়া আর কে আছে। সেই সময় মহগুদাসই কথা পাড়ে, জাতের সম্বন্ধে—তাৎমারা যে সে জাত নয়। রামচরিতমানসে তুলসীদাসজী বলে গিয়েছেন যে, তারা তন্ত্রিমাহাত্ম, একেবারে ব্রাহ্মণ না হলেও ঠিক ব্রাহ্মণের পরেই। পচ্ছিমে সব জায়গায় কনৌজী তাৎমারা এই নাম নিয়েছে, আর নিয়েছে 'জনৌ'(৫)। এই দেখো, বলে মহগুদাস তুলোর কুর্তার ফিতে খুলে, বের করে দেখায় তার গলার পৈতেটা—আঙ্গুলের মত মোটা, সোনার মত হলদে রঙের।

মহগুদাস তো গেলেন চলে, কিন্তু জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন আগুন তাৎমাটুলীতে।

---

(২) বিদেশী টিয়াপাখী

(৩) সভা, মিটিং
(৪) এক রশি অর্থাৎ সিকি মাইল
(৫) নরম, ঠাণ্ডা
(৬) সন্ন্যাসী মানুষ

টীকা :—
(১) মেয়েরা
(২) বিয়ে
(৩) মেয়েছেলেরা
(৪) বড়লোকের সঙ্গে
(৫) জনৌ—পৈতা

ঢোঁড়াই, রবিয়া, আরও অনেকে তখনই পৈতা নিতে চায় কিন্তু মহতো নায়েবরা রাজী না। এসব জিনিস হট্ করে করে ফেলা কিছু নয়। বুড়োরা ভয় পায়—ধম্ম নিয়ে, ছেলেখেলা করা ঠিক নয়। পচ্ছিমে করেছে, পচ্ছিমের লোক তোকে হাতের আঙ্গুল কেটে দিতে বল্লে দিবি? পচ্ছিমে একসের আটার রুটি হজম হয়, এখানে হয়? গোঁসাইকে ঘাটাস না খবর্দ্দার।—যেমন আছেন তেমনি তাঁকে থাকতে দে, খুশী না হন, অন্ততঃ তোর উপর চটবেন না।

তাৎমাদের পুরুত মিসিরজী, গত দু'বছর থেকে প্রতি রবিবারে গোঁসাইথানে রামায়ণ পড়ে শুনিয়ে যান, আর এর জন্য এক আনা করে পয়সা দক্ষিণা পান পঞ্চায়েতের কাছ থেকে। তাঁরই কাছে 'পঞ্চ'রা জিজ্ঞাসা করে পৈতা নেওয়ার কথা। তিনি বলেন যে, মহগুদাস বাজে কথা বলেছে—রামায়ণে তন্ত্রিমাছত্রির কথা লেখা নেই। কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করে না। ঢোঁড়াই পরিষ্কার তাঁর মুখের উপর বলে দেয় যে, তিনি অন্যজাতের নতুন করে পৈতা নেওয়া পছন্দ করেন না, তাই সত্যি কথাটা চেপে যাচ্ছেন। তুমি খামকা ভয় পাচ্ছ মিসিরজী: তুমি এলে গায়ের কম্বল চার পাট করে মুড়ে, ইয়াঃ 'গদ্দাদার' (৬) আসন পেতে দেবো বসতে—যেমন এখন পেয়েছো। চির-অ-কা-আল.........

বাওয়া ঢোঁড়াইকে থামিয়ে দেয়।

সুভ আচরণ কতহুঁ নহিঁ হোই।

দেব বিপ্র গুরু মানই ন কোঈ॥ (৭)

বলে, মিসিরজী চটে শালুর খোলে রামায়ণটা বাঁধতে আরম্ভ করেন।

তারপর ঢোঁড়াইরা মরগামায় সিরিদাস বাওয়ার কুর্মী চেলাদের সঙ্গে, এই পৈতা নেওয়া নিয়ে অনেকবার দেখাশুনো করেছে। তারাও পৈতা নিতে বারণ করে তাৎমাদের। ঢোঁড়াই চটে আগুন হয়ে যায়;—কুর্মী কূর্ম-ছত্রি হতে পারে, কিন্তু আমরা পৈতে নিলেই পৃথিবী ফেটে জল বেরিয়ে যাবে; না?

আমাদের কথা পছন্দ না, তা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলি কেন?

তাৎমাটুলী যখন এই ব্যাপার নিয়ে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন ধনুয়া মহতোর বাড়ীতে এল তার শালা মুঙ্গীলাল, 'কুটমৈতি' (৮) করতে। তাৎমাটুলীর তাৎমাদের মধ্যে মহতোই প্রথম বিয়ে করেছিল নিজের গাঁয়ের বাইরে ডগরহাতে, জিরানিয়া থেকে ন' মাইল দূরে। আজকাল 'কুটমৈতি'তে কেউ এলেই বাড়ীর লোকে বিরক্ত হয়। কুটম এসেই বলবেন 'ভেটমুলাকাৎ'(৯) করতে এলাম। কিন্তু বাড়ীর লোক সবাই জানে যে, 'ভেট-মুলাকাতে'র তখনই দরকার হয়, যখন নিজের বাড়ীতে খাওয়া জোটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কুটুম এলেই দিতে হবে পা-ধোবার জল, খড়ম থাকলে খড়ম, বসতে বলতে হবে বাইরের বাঁশের মাচাতে, নিজেরা খাও না খাও তাকে দুবেলা ভাত খাওয়াতেই হবে, আর আঁচানোর জল তার হাতে ঢেলে দিতেই হবে; কিন্তু এবার মুঙ্গী-লালের খাতির বেশী সে পৈতা নিয়েছে; ডগরাহার সব তাৎমাই নিয়েছে। পৈতাটা কানে জড়িয়েই, সে তার দিদির বাড়ীর দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। পা ধুয়েই সে পৈতার কথাটা পাড়ে। মহতোর ছেলে গুদর ডেকে নিয়ে আসে ঢোঁড়াইকে। পাড়াশুদ্ধ সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে কুটুমের মাচার উপর। খাসা মানিয়েছে পৈতাটা কানে জড়িয়ে! আরে হবে না এ যে আমাদের নিজেদের জাতের জিনিস। সকালে আমাদের বাপঠাকুরদ্দারা যখন কাপড় বুনতো, তখন মাড় দিয়ে সুতো মাজবার সময় সবাই কানে জড়িয়ে রাখতো এক এক গোছা সুতো। মাজতে গিয়ে সুতো ছিঁড়েছে কি কানের থেকে একগাছ খুলে নিয়ে ছেঁড়াটা জুড়ে দাও। পৈতা কি আর আমাদের নতুন জিনিস।

সেকালের তন্ত্রিমাছত্রিদের পুত-গৌরবের উত্তরাধিকারীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পচ্ছিমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এ জেলায় চার কোশ দূরের তাৎমারা পৈতে নিয়েও যখন তাদের মাথায় 'বজর' (১০) পড়েনি, তখন আমরা নেবোনা কেন? মুঙ্গীলালও এতে সায় দেয়। মহতো শালাকে কিছু বলতে পারে না। মনে মনে ভাবে যে, তাৎমাটুলীর লোকদের দলে ভিড়োতে না পারলে, ডগরাহার তাৎমাদের 'বিয়াসাদী কিরিয়া করম'এর(১১) অসুবিধা হবে, তাই মুঙ্গীলালটা এই সব ছোকরাদের নাচাচ্ছে।

খালি ছোকরাদের মধ্যে জিনিসটা সীমা-বদ্ধ থাকলে না হয় মহতো তাড়াতাড়ি দিয়ে ব্যাপারটা সামলে নিতে পারতো। লাল্টু নায়েবও ছেলেদের দিকে হয়ে গেল, বাবু-লালেরও নিমরাজি নিমরাজি ভাব, এই পৈতা নেওয়া সম্বন্ধে। হেঁপো তেতর হাঁ না কিছুই বলে না। ঠিক হয় পৈতে নেওয়া হবে। তবে এটা "কানফুকনেবালা গুরুগোঁসাই"(১২)এর অনুমতি সাপেক্ষ।

তিনি থাকেন অযোধ্যাজীতে। সেই একবার এসেছিলেন তাৎমাটুলীতে, যেবার জিরানিয়ায় "টুরমন"এর তামাসা(১৩) হয়। সকলের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয়েছিল তাঁকে দেবার জন্য। অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে কিছু কর্জও করতেও হয়েছিল, তাঁর 'গদ্দীবালা কিলাসের টিকস'(১৪) কাটিয়ে দেবার জন্য; এগারো টাকা সাড়ে তিন আনা ভাড়া; না না মহতোর বোধ হয় ভুল হচ্ছে—ন টাকা সাড়ে তিন আনা, সে কি আজকের কথা; সাড়ে তিন আনাটা ঠিক মনে আছে, তবে টাকাটা এগারো কি ন'........ বাবুলাল তুমিই বলনা, 'অফসর আদমী'—তোমরা......হিসেব টিসেব জানো......

বাবুলাল বলে, দশটাকা সাড়ে তিন আনা। সকলেই জানতো যে, বাবুলাল দশ টাকাই বলবে, পরিমান, মাপ, সংখ্যা প্রভৃতি নিয়ে ঝগড়া উঠলে মাঝামাঝি একটা নির্ণয় দেওয়াই ভাল 'পঞ্চ'দের নিয়ম।......

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—মহতো কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়—তাহলে 'গুরু-গোঁসাই'কে একখান 'পোসকার্ট' (১৫) লেখা যাক।

গ্রামে সাড়া পড়ে যায়—অযোধিয়াজীতে পোসকার্ট লেখা হবে। গাঁয়ে এর আগে কখনও চিঠি লেখা হয়নি। তবে মহতো নায়েবরা খবর রাখে যে, ডাকঘরের মুন্সীজী চিঠি লিখতে নেয় এক পয়সা। মিসিরজী লেখে ভাল। কিন্তু সে কি দুপয়সার কম কাজ করবে। যেমন জায়গায় পূজো দিতে যাবে, তেমনি খরচ হবে। 'থানে' এক পয়সার গুড়ে পূজো হতে পারে, কিন্তু অযোধিয়াজীতে পূজো দেওয়া তো দূরের কথা, পৌঁছুতেই দশ টাকা খরচ হয়ে যাবে।

মহতো পোসকার্টের দাম দিতে চায়না; বল্লে পঞ্চায়তের তবিলে 'খড়মহড়া' ও (১৬) নেই।

ঢোঁড়াইয়ের দল জ্বলে ওঠে—"কি করেছো জরিমানার সব পয়সা?"

ছড়িদার পঞ্চদের বাঁচিয়ে দেয়—"পঞ্চরা তার হিসেব দেবে কি, তোমাদের কাছে?"

"হাঁ দিতে হবে হিসেব"; "কেন দেবে না।"

একটা বড় রকমের ঝগড়া আসন্ন হয়ে ওঠে।

ঢোঁড়াই নিজের বাটুয়া থেকে একটা পয়সা বার করে দেয়—"এই আমি দিলাম পোসকার্টের দাম। সকলে অবাক হয়ে যায়—ঢোঁড়াইটা পাগল হল নাকি! দশের কাজ, একজন দিয়ে দিচ্ছে কি? আর একটু অপেক্ষা করলে মহতো নিজেই দিয়ে দিত। বোকা কোথাকার।

---

(৬) গদীযুক্ত

(৭) ভাল আচরণ আর কোথাও থাকিল না। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে কেহই আর মানেনা। (তুলসীদাস)

(৮) কুটুম্বিতা

(৯) দেখাসাক্ষাৎ

(১০) বজ্র

(১১) বিবাহ ও অন্যান্য ক্রিয়াকার্য

(১২) কানফুকনেবালা গুরুগোঁসাই—দীক্ষাগুরু

(১৩) ডিস্ট্রিক্ট টুর্ণামেণ্ট (১৯১৭) যুদ্ধে সাহায্যই ছিল ইহার-প্রধান উদ্দেশ্য

(১৪) ইণ্টার ক্লাস টিকিট

(১৫) পোষ্টকার্ড

(১৬) কানাকড়ি

বাবুলাল ঢোঁড়াইকে বলে 'আর এক পয়সা লাগবে পোসকার্টে'। ডিস্টিক বোর্ডের অফসর— পৃথিবীর সব খবর তার নখদর্পণে। ঢোঁড়াই আরও একটা পয়সা ফেলে দেয় সকলের মধ্যে।

মহতো বলে বাবুলাল তুমিই তাহলে কিনো পোসকার্ট, দেখেশুনে। ঢোঁড়াই তুই মিসিরজীকে রবিবারে দোয়াত-কলম্ আনতে বলে দিস।

রবিবারে মিসিরজী রামায়ণ পাঠের বদলে চিঠি লিখে দেন; আজ মেয়েরা পর্যন্ত রামায়ণ শুনতে এসেছে। কি জোর দিয়ে দিয়ে লেখে! এখানে পর্যন্ত খস্ খস্ করে শব্দ শোনা যাচ্ছে; দেখতে দেখতে কালি ফুরিয়ে যাচ্ছে কলমের। পৈতে নেওয়াটা মিসিরজীর মনঃপূত নয়, কে জানে আবার ভুলটুল না লিখে দেয় পোসকার্টে......

ঠিক হয় বাবুলাল চিঠি ডাকে দেবে। সকলে ডাকঘর পর্যন্ত তার সঙ্গে যায়।

তারপর চলে কত জল্পনা-কল্পনা, ডাক-পিয়নের জন্য প্রত্যহ প্রতীক্ষা। কি চিঠি মিসিরজী লিখে দিয়েছিল কে জানে। একমাস অপেক্ষা করেও চিঠির জবাব আসে না 'গুরু-গোঁসাইয়ের কাছ থেকে।

ঢোঁড়াইদের আর ধৈর্য থাকে না। আবার গাঁয়ে চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে যায় এ নিয়ে।

ঢোঁড়াই বলে—"আর কেউ না নিক, আমি একাই পৈতা নেবো। কালই যাব সোনবর্ষা।"

অন্তরের থেকে সকলেই এই জিনিসটাই চাইছিল। কেবল মনে মনে একটু ভয় ছিল,—কি জানি কি হয়; ডগরাহার তাৎমারা পৈতে নেওয়ার পর সেখানে অনেকগুলো গরুমোষ, দু' তিন দিনের অসুখে মারা গিয়েছে—গরুগুলো খায়ওনা দায়ওনা, দু'তিন দিন গোবরের সঙ্গে রক্ত পড়ে, তারপর মরে যায়।

যাক্, তাৎমাটুলীর লোকদের চাষবাস গরুমোষের বালাই নেই। গুরুগোঁসাইয়ের নাম নিয়ে তারা পৈতা দেওয়ানোর জন্য বামুন ডেকে পাঠায় সোনবর্ষা থেকে।

তারপর একদিন গাঁশুদ্ধ ছেলেবুড়ো এক-সঙ্গে মাথা নেড়া করে, আগুনের ধারে বসে, গলায় কাছির মত মোটা পৈতে নেয়। দুদিন গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষরা আলাদা থাকে, তারপর একসঙ্গে ভাতের ভোজ খেয়ে নিজের নিজের বাড়ী ফেরে। সেদিন থেকে তাৎমারা হয় দাস' —ঢোঁড়াই ভকত হয়ে যায় ঢোঁড়াইদাস।

মহতো নায়েবদের বিরুদ্ধে পৈতা নেওয়ার দলের নেতৃত্ব কবে কি করে এসে পড়েছিল ঢোঁড়াইয়ের উপর, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। লোকে বোধ হয় বুঝেছিল যে, মাটিকাটা নিয়ে তার দেওয়া আঘাত সমাজ সহ্য করে গিয়েছে। হিম্মৎ আছে ছোকরার। আর পৈতার ব্যাপারে ওটা বলে ঠিক সবার মনের কথাটা। আর একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করেছে যে, যে যতই ঢোঁড়াই 'পঞ্চ'দের বিরুদ্ধে কথা বলুক, মহতো সেরকম কড়া হতে পারে না আর ঢোঁড়াইয়ের উপর। কেন যে তা বোঝে কেবল মহতো গিন্নী আর মহতো—আর অল্প-সল্প আন্দাজ করে ঢোঁড়াই।

(ক্রমশ)

# দেশে বিদেশে

## সৈয়দ মুজতবা আলী

(৩)

শীত আর বসন্ত ঘরে বসে, ডুব সাঁতার দিয়ে কাটাতে হল।

এদেশের বসন্তের সঙ্গে আমাদের বর্ষার তুলনা হয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে ধরণী তপ্ত-শয়নে পিপাসার্ত হয়ে পড়ে থাকেন, আষাঢ়স্য যে কোন দিবসেই হোক্ ইন্দ্রপুরীর নববর্ষণ-বারতা পেয়ে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হন। এখানে শীতকালে ধরিত্রী প্রাণহীন স্পন্দনবিহীন মহা-নিদ্রায় লুটিয়ে পড়েন, তার পর নববসন্তের প্রথম রৌদ্রে চোখ মেলে তাকান। সে তাকানো প্রথম ফুটে ওঠে গাছে গাছে।

দূর থেকে মনে হল ফ্যাকাশে সাদা গাছ-গুলোতে বুঝি কোনরকম সবুজ পোকা লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখি গাছে গাছে অগুনতি ছোট্ট ছোট্ট পাতার কুঁড়ি জন্মের সময় কুকুরছানার বন্ধ চোখের মত। তারপর কয়েকদিন লক্ষ্য করি নি, হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখি সেগুলো ফুটেছে আর দুটি দুটি করে পাতা ফুটে বেরিয়েছে—গাছগুলো যেন সমস্ত শীতকাল বকপাখীর মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ ডানা মেলে ওড়বার উপক্রম করেছে। সহস্র সহস্র সবুজ বলাকা যেন মেলে ধরেছে লক্ষ লক্ষ অঙ্কুরের পাখা।

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

গাছে গাছে দেখন-হাসি, পাতায় পাতায় আড়াআড়ি—কে কাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। কোনো গাছ গোড়ার দিকে সাড়া দেয় নি, হঠাৎ একদিন একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ মেলে দেখে আর সবাই ঢের এগিয়ে গেছে, সে তখন এমনি জোর ছুট লাগাল যে, দেখতে না দেখতে আর সবাইকে পেছনে ফেলে, বাজী জিতে, মাথায় আইভি মুকুট পরে সগর্বে দুলতে লাগল। কেউ সারা গায়ে কিছু না পরে শুধু মাথায় সবুজ মুকুট পরল, কেউ ধীরেসুস্থে সর্বাঙ্গে যেন সবুজ চন্দনের ফোঁটা পরতে লাগল। এতদিন বাতাস শুকনো ডালের ভেতর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলে যেত, এখন দেখি কি আদরে পাতাগুলোর গায়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

কাবুল নদীর বুকের উপর জমে যাওয়া বরফের জগদ্দল-পাথর ফেটে চৌচির হল। পাহাড় থেকে নেবে এল গম্ভীর গর্জনে শত শত নব জলধারা—সঙ্গে নেবে আসছে লক্ষ লক্ষ পাথরের নুড়ি আর বরফের টুকরো। নদীর উপরে কাঠের পুলগুলো কাঁপতে আরম্ভ করেছে—সিকন্দর সাহের আমল থেকে তারা হাঁটু ভেঙে কতবার নুয়ে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে, ফের দাঁড়িয়ে উঠেছে তার হিসেব কেউ কখনো রাখতে পারে নি।

উপরে তাকিয়ে দেখি গভীর নীলাম্বুজের মত নবীন নীলাকাশ হংস-শুভ্র মেঘের ঝালর ঝুলিয়ে চন্দ্রাতপ সাজিয়েছে।

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি সবুজের বন্যায় জনপদ অরণ্য ডুবে গিয়েছে। এ রকম সবুজ দেখেই পূর্ববঙ্গের কবি প্রিয়ার শ্যামল রঙের স্মরণে বলেছিলেন,

ও বন্ধুয়া, কোন বন্ ধোওয়া, ছাঁওলা নীলাপানি
গোসল করি হইলা তুমি সকল রঙের রাণী।

কিন্তু এ-উপত্যকা এ-বনরাজি এ-রকম সবুজ পেল কোথা থেকে?

নীলাকাশের নীল আর সোনালি রোদের হলদে মিশিয়ে।

কিন্তু আমাদের বর্ষা আর এদেশের বসন্তে একটা গভীর পার্থক্য রয়েছে। বর্ষায় আমাদের মন ঘরমুখো হয় এদেশের জনপ্রাণীর মন বাহিরমুখো হয়। গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে

মানুষ যে সুপ্তোত্থিত নব যৌবনের স্পন্দন অনুভব করে; তারি স্মরণে কবি বলেছেন—

শপথ করিনু রাত্রে
পাপ পথে আর যেন মন নাহি ধায়,
প্রভাতে দ্বারেতে দেখি
শপথঘ্ন মধুঋতু কি করি উপায়!

শুধু ওমর খৈয়াম দোটানার ভেতর থাকা পছন্দ করেন না। তিনি গর্জন করে বললেন,—

বিধি বিধানের শীত পরিধান
ফাগুন আগুনে দহন করো।
আয়ু বিহঙ্গ উড়ে চলে যায়
হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধরো। *

কাবুলীরা তাই বেরিয়ে পড়েছে, না বেরিয়ে উপায়ও নেই—শীতের জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে এসেছে, দুম্বা ভেড়ার জাবনা তলায় এসে ঠেকেছে, শুঁটকি মাংসে পোকা কিলবিল করছে। এখন আতপ্ত বসন্তের রোদে শরীরকে কিঞ্চিৎ তাতানো যায়, দুম্বা ভেড়া কচি ঘাসে চরানো যায় আর আধখেঁচড়া শিকারের জন্য দুচার দল পাখীও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। আব্দুর রহমান বললো পানশীর অঞ্চলে ভাঙা বরফের তলার কি এক রকমের মাছও নাকি এখন ধরা যায়। অনুমান করলুম, কোনো রকমের স্প্রিং ট্রাউটই হবে।

রথ দেখার সময় যাঁরা কলা বেচার দিকেও মাঝে মাঝে নজর দেন তাঁদের মুখে শুনেছি কুবের যে যক্ষকে ঠিক একটি বৎসরের জন্যই নির্বাসন দিয়েছিলেন তার একটা গভীর কারণ আছে। ছয় ঋতুতে ছয় রকম করে প্রিয়ার বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ না করা পর্যন্ত মানুষ নাকি পরি-পূর্ণ বিচ্ছেদ বেদনার স্বরূপ চিনতে পারে না; আর বিদগ্ধ জনকে এক বছরের বেশী শাস্তি দেওয়াতেও নাকি কোনো সূক্ষ্ম চতুরতা নেই—সোজা বাঙলায় তখন তাকে বলে মরার উপর খাড়ার ঘা দেওয়া মাত্র।

আফগান সরকার অযথা বিঘ্ন-সন্তোষী নন বলে ছয়টি ঋতু পূর্ণ হওয়া মাত্রই আমাকে পান্ডব বর্জিত গন্ডগ্রামের নির্বাসন থেকে মুক্তি দিয়ে শহরে চাকুরী দিলেন। এবারে বাসা পেলুম লব-ই-দরিয়ায় অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে, রাশান রাজ দূতাবাসের গা ঘেঁষে বেনওয়া সাহেবের সঙ্গে একই বাড়িতে।

প্রকান্ড সে বাড়ি। ছোট খাটো দুর্গ বললে ভুল হয় না। চারদিকে উঁচু দেওয়াল, ভেতরে চকমেলানো একতলা দোতলা নিয়ে ছাব্বিশখানা বড় বড় কামরা। মাঝখানের চত্বরে ফুলের বাগান, জলের ফোয়ারাটা পর্যন্ত বাদ যায়নি। বড়-লোকের বাড়ি, সরকারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে—বেনওয়া সায়েব ফন্দী-ফিকির করে বাড়িটা বাগিয়েছিলেন।

আমি নিলুম এক কোণে চারটে ঘর আর বেনওয়া সায়েব রইলেন আরেক কোণে আর চারটে ঘর নিয়ে। বাকী বাড়িটা খা খা করে, আর সে এতই প্রকান্ড যে আব্দুর রহমানের সঙ্গীত রবও কায়ক্লেশে আঙিনা পাড়ি দিয়ে ওপারে পেঁছয়।

শহরে এসে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল। রাশান রাজদূতাবাসে রোজই যাই—দুদিন না গেলে দেমিদভ্ এসে দেখা দেন—সইফুল আলম মাঝে মাঝে ঢু মেরে যান, সোমত্থ বউ সম্বন্ধে অহরহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মৌলানার দাড়ির দর্শনও মাঝে মাঝে পাই, দোস্ত মুহম্মদ ঘূর্ণিবায়ুর মত বেলা অবেলায় চক্কর মেরে বেরুবার সময় কলাডা মুলাডা ফেলে যান, বিদগ্ধ মীর আসলম সুসিদ্ধ চৈনিক যুষ পান করে যান, তা ছাড়া ইনি উনি তিনি তো আছেনই আর নিতান্ত বান্ধব বাড়ন্ত হলে বিরহী যক্ষ বেনওয়া তো হাতের নাগাল।

রাশান রাজদূতাবাসে আরো অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল; দেমিদভকে বাদ দিলে সকলের পয়লা নাম করতে হয় বলশফের। নামের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে তাঁর দেহ—বৃড়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাবাহু বললে আব্দুর রহমান বরঞ্চ অপাংক্তেয় হতে পারে, ইনি সে বর্ণনা গলাধঃকরণ করে অনায়াসে সেকেন্ড হেল্পিঙ চাইতে পারেন।

আব্দুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় যে দ্বিতীয় নরদানবের কথা বলেছিলুম ইনিই সে-বিভীষিকা।

বহুবার এর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি—কাবুল বাজারের মত পপুলার লীগ অব নেশনসে আজ পর্যন্ত এমন দেশী বিদেশী চোখে পড়েনি যে তাঁকে দেখে হকচকিয়ে যায়নি।

হুঁশিয়ার সোয়ার হলে তক্ষুনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে—বহু ঘোড়াকে ঘাবড়ে গিয়ে সামনের পা দুটো আকাশে তুলতে দেখেছি।

টেনিস কোর্টে রেকেট নিয়ে নাবলে শত্রু-পক্ষ বেজ-লাইনের দশ হাত দূরে তারের জালের গা ঘেঁষে দাঁড়াত। বলশফ বেজে দাঁড়ালে তাঁর কোনো পার্টনার নেটে দাঁড়াতে রাজী হত না, শত্রুপক্ষের তো কথাই ওঠে না। তাঁতের রেকেট ঘন ঘন ছিঁড়ে যেত বলে এ্যালুমিনিয়ম জাতীয় ধাতুর রেকেট নিয়ে তিনি তাড়ু হাঁকড়াতেন, স্বচ্ছন্দে নেট ডিঙোতে পারতেন—লাফ দেবার প্রয়োজন হত না—আর ঝোলা নেট টাইট করার জন্য এক হাতে হ্যান্ডেল ঘোরাতেন মেয়েরা যেরকম সেলাই কলের হাতল ঘোরায়।

শুনেছি বিলেতে কোনো কোনো ফিলম্ নাকি ষোলো বছরের কম বয়স হলে দেখতে দেয় না—চরিত্র দোষ হবে বলে; যাদের ওজন ১৬০ পৌন্ডের কম তাদের ঠিক তেমনি বল-শফের সঙ্গে সেকহ্যান্ড করা বারণ ছিল, পাছে হাতের নড়া কাঁধ থেকে খসে যায়। মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

বীরপুরুষ হিসেবে রাশান রাজদূতাবাসে বলশফের খাতির ছিল। ১৯১৬ সাল থেকে বলশেভিক বিদ্রোহের শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে বিদেশে বিস্তর লড়াই লড়েছেন। ১৬-১৭-এর শীতকালে যখন রুশবাহিনী পোলান্ডে লড়াই হেরে পালায় তখন বলশফ রাশান ক্যাভালরিতে ছোকরা অফিসার। সেবারে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার সময় তার পিঠের চোদ্দ জায়গায় জখম হয়েছিল—সিস্টার ঝুলোঝুলির পর একদিন সার্ট খুলে তিনি আমায় দাগগুলো দেখিয়েছিলেন। কোনো কোনোটা তখনো আধ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'পৃষ্ঠে তব অস্ত্র লেখা।'

বলশফকে কেউ কখনো চটাতে পারেনি বলেই রসিকতাটা করেছিলুম। তিনি ভারত-বর্ষের ক্ষাত্র বীরত্বের 'কোড্' শুনে বললেন, 'যদি সেদিন না পালাতুম তবে এরমিকর আমলে পোলদের বেধড়ক পাল্টা মার দেবার সুখ থেকে যে বঞ্চিত হতুম, তার কি?'

মাদাম দেমিদভ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আর জানেন তো, মসিয়ো, ঐ লড়াইতেই সোভিয়েট রাশার অনেক পথ সুরাহা হয়ে যায়।'

বলশফের একটা মস্ত দোষ তিনি দুদন্ড চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। হাত দুখানা নিয়ে যে কি করবেন ঠিক করতে পারেন না বলে এটা সেটা নিয়ে সব সময় নাড়াচাড়া করেন, বেখেয়ালে একটু বেশী চাপ দিতেই কর্কস্ক্রুটা পর্যন্ত ভেঙে যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেই আমরা টুকি-টাকি সব জিনিস তাঁর হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে ফেলতুম। আমার ঘরে ঢুকলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে একখানা আস্ত আখরোট খেতে দিতুম।

দুটো একটা খেতেন মাঝে মাঝে—যাওয়ার পর দেখা যেত সব কটি আখরোটের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছেন, চারমগজ্ৰাশিকন (হাতুড়ি) না দেওয়া সত্ত্বেও।

এ রকম অজাতশত্রু লোক সমস্ত কাবুল শহরে আমি দুটি দেখিনি। একদিন তাই নিয়ে যখন দেমিদভের ঘরে আলোচনা হচ্ছিল তখন বলশফের সবচেয়ে দিলী দোস্ত রোগা-পটকা স্মিরেশকফ বল্লেন, 'বলশফের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব তার গায়ের জোরের ভয়ে।'

বলশফ বল্লেন, 'তাহলে তো তোমার সব-চেয়ে বেশী শত্রু থাকার কথা।'

স্মিরেশকফ যা বল্লেন, পদাবলীর ভাষায় প্রকাশ করলে তার রূপ হয়—

'বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তুঁহারি রূপে—

বাকিটা তিনি আর প্রাণের ভয়ে বলেননি।

বলশফ বল্লেন, 'রোগা লোকের ঐ এক মস্ত দোষ। খামখা বাজে তর্ক করে। বলে কি না

---

* অনুবাদকের নাম মনে নেই বলে দুঃখিত। নরেন্দ্র দেব ?

ওরা বন্ধুরে!' মতভর পরস্পর দ্বেষী, আত্মসুখী বাক্যাড়ম্বর!'

বলশফ সম্বন্ধে এত কথা বললুম তার কারণ তিনি তখন আমানউল্লার এয়ার ফোর্সের চীফ পাইলট। বলশেভিক বিদ্রোহ তাড়িয়ে দিয়ে ফিরিয়ে রাশিয়ায় তাঁর সংকটাবস্থী মন কাবুলে এসে নূতন বিপদের সন্ধানে আমানউল্লার চাকরী নিয়েছিল।

শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমানউল্লার সেবা করেছিলেন।

(৩১)

আমানউল্লা ইয়োরোপ থেকে নিয়ে এলেন একগাদা দামী আসবাব পত্র, অগুণতি মোটর গাড়ী আর বক্তৃতা দেবার বদঅভ্যাস। প্রাচ্য দেশে লোকে মেয়েদের চেয়ে তুলনায় তুবড়ে আরামে এলিয়ে দেয়, পশ্চিমে ডিনারের পর স্পীচ, লাঞ্চের পর আরেকটি—তাও আবার মত সব শিরঃপীড়াদায়ক পোলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে।

সায়েবরা বিলেতে লাঞ্চে ডিনারে আমানউল্লাকে যে নেশার পয়লা পাত্র খাইয়ে দিয়েছিল তার খোয়ারি তিনি চালালেন কাবুলে ফিরে এসে, মাথা বাড়িয়ে, লম্বা লম্বা লেকচার ঝেড়ে। পর পর তিনদিনে নাকি তিনি একুনে তিরিশ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কিন্তু কারো কথায় তো কান পাতার ফোস্কা পড়ে না, কাবুলে টিকিটের প্রচলন নেই—কাজেই শ্রোতারা কেউ ঘুমুলো, কেউ শুনলো, দুএকজন মনে মনে ইউরোপে তাঁর বাড়ে খর্চার আঁক কষলো।

তারপর আরম্ভ হল সংস্কারের পালা। সেদিন সকাল বেলা কাবুলের বাড়ি থেকে পথে দেখি দোকানদারেরা সব দোকানপাট বন্ধ। বড় দোকানের ভেতর দোকানদার ছোট দোকানের লোকটা খোলা ছিল। সে দোকানের পাঞ্জাবী মুসলমানের লোক; আমাদের সঙ্গে ভাব ছিল।

খবর শুনে নিশ্চিন্ত হল না। আমানউল্লার হুকুম, কার্পেটের উপর পদ্মাসনে বসে দোকান চালানো বর্বরতা বেআইনি করা হল; সব দোকানে বিলিতি কায়দায় চেয়ার টেবিল চাই।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা? ছুতোর সাধারণ, নালাইওয়ালা, মুচী?

'সব, সব।'

'ছোট ছোট খোপের ভেতর চেয়ার টেবিল ঢোকাবে বা কি করে, পাবেই বা কোথায়?'

নিরুত্তর।

'যারা পয়সাওয়ালা, যাদের দোকানে জায়গা আছে?'

'রাতারাতি মেজ কুর্সী পাবে কোথায়? সুতোরাও ভয়ে দোকান বন্ধ করেছে, বলে চেয়ারে বসে টেবিলে তক্তা রেখে সে নাকি রাঁদা চালাতে শেখেনি।'

'আগের থেকে নোটিশ দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়নি?'

'না। জানেন তো, আমানউল্লা বাদশার সব কুছ ঝটপট্।'

পাক্কা তিন সপ্তাহ চোদ্দ আনা দোকানপাট বন্ধ রইল। গম ডাল অবশ্যি পেছনের দরজা দিয়ে আড়ালে আবডালে বিক্রী হল, তাদের উপরে চোটপাট করে পুলিশ দু পয়সা কামিয়ে নিল।

আমানউল্লা হার মানলেন কি না জানিনে তবে তিন সপ্তাহ পরে একে একে সব দোকানই খুলল—পূর্ববৎ, অর্থাৎ বিন্ চেয়ার টেবিল। কাবুলের সবাই এই ব্যাপারে চটে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু রাজার খামখেয়ালিতে তারা অভ্যস্ত বলে অত্যধিক উম্মারোধ করেনি। কাবুলীদের এ মনোভাবটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি কারণ আমরা ভারতবর্ষে অত্যাচারে অবিচারে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু খামখেয়ালি বড় একটা দেখতে পাইনে।

কিন্তু আমার মনে খটকা লাগল। পাগমানের পাগলামির কথা মনে পড়ল—গাঁয়ের লোককে শহরে ডেকে এনে মর্ণিংস্যুট পরাবার বিড়ম্বনা। এ যে তারি পুনরাবৃত্তি, এযে আরো পীড়াদায়ক, মূল্যহীন, অর্থহীন, ইয়োরোপের অন্ধানুকরণ।

মীর আসলমের সঙ্গে দেখা হলে পর তিনি আমাকে সবিস্তর আলোচনা না করতে দিয়ে যেটুকু বললেন বাঙলা ছন্দে তার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ

> কয়লাওয়ালার দোস্তী? ওওরা!
> ময়লা হাত রেহাই নাই
> আতরওয়ালার বাক্স বন্ধ
> নিঃশ্বাসে তবু পাই খুশ বাই।

আমি বল্লুম, 'এতো হল সূত্র, ব্যাখ্যা করুন।'

মীর আসলম বল্লেন, 'পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের সঙ্গে গাত্র ঘর্ষণ করতঃ আমানউল্লা যে কৃষ্ণ-প্রস্তর চূর্ণ সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া আসিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি কাবুল-হট্ট মসীলিপ্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন।

'তথাপি অস্মদ্দেশীয় বিদগ্ধজনের শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত যদি নৃপতি প্রস্তর-চূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রস্তরখণ্ডও আনয়ন করিতেন। তদ্দ্বারা ইন্ধন প্রজ্বালিত করিয়ে দীনদেশের শৈত্য নিবারিত হইত।'

আমি বল্লুম, 'চেয়ারটেবিল চালানো যদি মসীলেপন মাত্রই হয় তবে তা নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর দুঃখ করবার কি আছে বলুন।'

মীর আসলম বললেন, 'অযথা শক্তিক্ষয়। নৃপতির অবমাননা। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলুম যে, তাঁরা মীর আসলমের মত কালো চশমা পরে ভবিষ্যৎ এত কালো করে দেখছেন না। ছোকরাদের চোখে তো গোলাপি চশমা; গোলাপি বললেও ভুল বলা হয়—সে চশমা লাল টকটকে, রক্ত-মাখানো। তারা বলে, যেসব বদমায়েশরা এখনো কার্পেটে বসে দোকান চালাচ্ছে তাদের ধরে ধরে কামানের মুখে বেঁধে হাজারো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমানউল্লা নিতান্ত ঠাণ্ডা বাদশা বলেই তাদের রেহাই দিয়েছেন।'

ভেবে চিন্তে আমি গোলাপী চশমাই পরলুম।

তার কিছুদিন পরে আরেক নয়া সংস্কারের খবর আনলেন মৌলানা। আফগান সেপাইদের মানা করা হয়েছে, তারা যেন কোন মোল্লাকে মুরশীদ না বানায় অর্থাৎ গুরু স্বীকার করে যেন মন্ত্র না নেয়।

খাঁটি ইসলামে গুরু ধরার রেওয়াজ নেই। পণ্ডিতেরা বলেন, 'কুরান শরীফ 'কিতাবুম্মুবীন' অর্থাৎ খোলা কেতাব, তাতেই জীবনযাত্রার প্রণালী আর পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের পন্থা, সোজা ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে; গুরু মেনে নিয়ে তার অন্ধানুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

অন্য দল বলেন, 'একথা আরবদের জন্য খাটতে পারে, কারণ তারা আরবীতে কুরান পড়তে পারে। কিন্তু ইরানী, কাবুলীরা আরবী জানে না; গুরু না নিলে তাদের কি উপায়?'

এ-তর্কের শেষ কখনো হবে না।

কিন্তু বিষয়টা যদি ধর্মের গণ্ডির ভেতরেই বন্ধ থাকত, তবে আমানউল্লা গুরু-ধরা বারণ করতেন না। কারণ যদিও মানুষ গুরু স্বীকার করে ধর্মের জন্য, তবু দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত গুরু দুনিয়াদারীর সব ব্যাপারেও উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছেন এবং গুরুর উপদেশ সাক্ষাৎ আদেশ।

তাহলে দাঁড়ালো এই যে, আমানউল্লার আদেশের বিরুদ্ধে মোল্লা যদি তার শিষ্য কোন সেপাইকে পাল্টা আদেশ দেন, তবে সে সেপাই মোল্লার আদেশই যে মেনে নেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চার্চ বনাম স্টেট।

গোলাপি চশমাটা কপালে তুলে অনুসন্ধান করলুম, দেয়ালে কোন লেখা ফুটে উঠেছে কিনা, আমানউল্লা কেন হঠাৎ এ আদেশ জারী করলেন তবে কি কোন অবাধ্যতা, কোন বিদ্রোহ, কোন—? কিন্তু এসব সন্দেহ কাবুলে মুখ ফুটে বলা তো দূরের কথা, ভাবতে পর্যন্ত ভয় হয়।

আমার শেষ ভরসা মীর আসলম। তিনি দেখি কালো চশমায় আরেক পোঁছ ভুসো মাখিয়ে রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। খবরটা দেখলুম তিনি বহু পূর্বেই জেনে গিয়েছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ইহলোক পরলোক, সর্বলোকের জনাই গুরু নিষ্প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ অনুসন্ধান করে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করাও ততোধিক নিষ্প্রয়োজন।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনি যখনই আপনার ভারতীয় গুরুর কথা স্মরণ করেন, তখনই তো দেখেছি তাঁর প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ।'

মীর আসলম, 'গুরু দ্বিবিধ, যে গুরু-গৃহে প্রবেশ করার দিন তোমার মনে হইবে, গুরু ভিন্ন পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারো না এবং ত্যাগ করার দিন মনে হইবে, গুরুতে তোমার প্রয়োজন নাই, তিনিই যথার্থ গুরু— অর্থাৎ গুরুর আদর্শ তিনি যেন একদিন শিষ্যের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরু শিষ্যকে প্রতি-দিন পরাধীন হইতে পরাধীনতর করেন। অবশেষে, গুরু বিনা সে-শিষ্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, কর্ম পর্যন্ত সুসম্পন্ন করিতে পারে না। আমার গুরু প্রথম শ্রেণীর। আফগান সৈন্যের গুরু দ্বিতীয় শ্রেণীর।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ আপনার গুরু আপনাকে স্বাধীন করলেন; আফগান সেপাইয়ের গুরু তাকে পরাধীন করেন। পরাধীনতা ভালো জিনিস নয়, তবে কেন বলেন, গুরু নিষ্প্রয়োজন? বরঞ্চ বলুন, গুরু গ্রহণ সেখানে অপকর্ম।'

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রশ্ন, সংসারে কয়জন লোক স্বাধীন হইয়া চলিতে ভালোবাসে বা চলিতে পারে। যাহারা পারে না, তাহাদের জন্য অন্য কি উপায়?'

আমি বললুম, 'খুদায় মালুম। কিন্তু উপস্থিত বলুন, সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা?'

মীর আসলম বললেন, 'নৃপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে না, যতক্ষণ না সিংহাসনের জন্য অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হন।'

আমি ভারী খুশি হয়ে বিদায় নিতে গিয়ে বললুম, 'কয়েক দিন হল লক্ষ্য করছি, আপনার ভাষাতে আপনি কঠিন আরবী শব্দ কমিয়ে আনছেন। সেটা কি সজ্ঞানে?'

মীর আসলম পরম পরিতোষ সহকারে মাথা দোলাতে দোলাতে হঠাৎ অত্যন্ত গ্রাম্য কাবুলী-ফারসীতে বললেন, 'এ্যাদ্দিনে বুঝতে পারলে চাঁদ? তবে হক কথা শুনে নাও। আর বছর যখন হেথায় এলে তখন ফারসী জানতে ঢু-ঢু। তাইতো তোমায় তালিম দেবার জন্য আরবী শব্দের বেড়া বানাতুম, তুমি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরোতে; গোড়ার দিকে ঠ্যাঙগুলো জখম-টখমও হয়েছে। এখন দিব্যি আরবী ঘোড়ার মত আরবী বেড়া ডিঙোচ্ছো বলে খামাখা বয়েড়া বাঁধার কম্ম বন্ধ করে দিলুম। গুরু এখন ফালতো। মাথার ডসভসে ঘিলুতে তুরপুন সেধোলো?'

আমি বাড়ি ফেরার সময় ভাবলুম, 'লোকটি সত্যিকার পণ্ডিত। গুরু কি করে নিজেকে নিষ্প্রয়োজন করে তোলেন, সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন।'

* * * *

তারপর বেশি দিন যায় নি, এমন সময় একদিন নোটিশ পেলুম, একদল আফগান মেয়েকে উচ্চ শিক্ষার জন্য তুর্কীতে পাঠানো হবে; স্বয়ং বাদশা উপস্থিত থেকে তাদের বিদায় আশীর্বাদ দেবেন।

আমি যাইনি। বৃটিশ রাজদূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীর মুখ থেকে বর্ণনাটা শুনলুম। তার নাম বলব না, সে নাম এখনো মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে ধূমকেতুর মত দেখা দেয়। বললেন, 'গিয়ে দেখি, জন কুড়ি কাবুলী মেয়ে গার্ল গাইডের ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে। আমানউল্লা স্বয়ং উপস্থিত, অনেক সরকারী কর্মচারী, বিদেশী রাজ-দূতাবাসের গণ্যমান্য সভ্যগণ, আর একপাশে মহিলারা। রাণী সুরাইয়াও আছেন, হ্যাটের সামনা পাতলা নেটের পরদা।

'আমানউল্লা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক খাঁটি এবং পুরানো কথা দিয়ে অবতরণিকা শেষ করে বললেন, 'আমি পরদা প্রথার পক্ষপাতী নই, তাই আমি এই মেয়েদের বিনা বোর্কায় তুর্কী পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমি স্বাধীনতাপ্রয়াসী; তাই কাবুলের কোন মেয়ে যদি মুখের সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরোতে চায়, তবে আমি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আবার আমি কাউকে জোর করতেও চাইনে, এমন কি, মহিষী সুরাইয়াও যদি বোর্কা পরাই পছন্দ করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

কর্মচারিটি বললেন, 'এতটা ভালোয়-ভালোয় চলল। কিন্তু আমানউল্লার বক্তৃতা শেষ হতেই রাণী সুরাইয়া এগিয়ে এসে নাটকি ঢঙে হ্যাটের সামনের পর্দা ছিঁড়ে ফেললেন। কাবুল শহরের লোক সভাস্থলে আফগানি-স্থানের রাজমহিষীর মুখ দেখতে পেল!'

কর্মচারিটির রসবোধ অত্যন্ত কম, তাই বর্ণনাটা দিলেন অত্যন্ত নীরস-নির্জলা। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে জিগ্যেস করব, তারো উপায় নেই। হয়ত ঘুঘু এসেছেন রিপোর্ট তৈরি করবার মতলব নিয়ে—ঘটনাটা ভারত-বাসীর মনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই হবে রিপোর্টের মশলা। আমিও পোকার খেলার জুয়াড়ীর মত মুখ করে বসে রইলুম।

যাবার সময় বলে গেলেন, 'এরকম ধারা ড্রামাটিক কায়দায় পর্দা ছেঁড়ার কি প্রয়োজন ছিল? রয়ে সয়ে করলেই ভালো হত না?'

আমি মনে মনে বললুম, 'ইংরেজের সনাতন পন্থা। সব কিছু রয়ে সয়ে। সব কিছু টাপে টোপে। তা সে ইংরেজি লেখাপড়া চালানোই হোক, আর ঢাকাই মসলিনের বুক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করাই হোক। ছুঁচ হয়ে ঢুকবে, মুষল হয়ে বেরুবে।'

কিছু একটা বলতে হয়। নিবেদন করলুম যে, এসব বিষয়ে এককালে ভারতবাসী মাত্রই কোন না কোন মত পোষণ করত। কারণ তখনকার দিনে আফগানিস্থান ভারতবর্ষের মুখের দিকে না তাকিয়ে কোন কাজ করত না, কিন্তু এখন আমানউল্লা নিজের চোখে সমস্ত পশ্চিম দেখে এসেছেন, রাস্তা তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছে; আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব, মঙ্গল কামনা করব, বাস।' (ক্রমশঃ)

# মাধ্যাকর্ষণ

শ্রীরবিদাস সাহা রায়
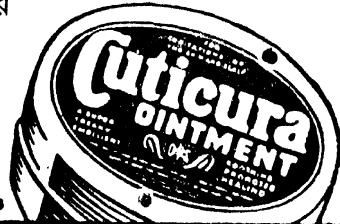
আজ সাধারণ একটা ব্যাপার লইয়া শাশুড়ীর সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া হইয়া গেল সবিতার। সবিতাও যে আজ এতটা অগ্রসর হইবে তাহা সে নিজেও ভাবে নাই। টুকিটাকি বিষয় নিয়া ঠোকাঠুকি তো কত সময়েই হয়। কিন্তু সবিতা মুখ বুজিয়া থাকে। শাশুড়ীর উপর মুখ তুলিয়া কথা সে কোনদিনই বলে নাই। না হইলে রোজই একটি করিয়া খণ্ড কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইত।

কিন্তু আজ কি যে হইয়াছিল সবিতার। শাশুড়ীর এক কথার উপর অনেক কথাই সে শুনাইয়া দিয়াছিল।

সবিতা এই সংসারে আসিয়াছে খুব বেশী-দিন নয়। এই তো সবে ফাল্গুনে দুই বছর পুরিয়াছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই যে তাহার পরিস্থিতিটা এমন হইয়া উঠিবে তাহা কি সে কখনো ভাবিয়াছিল?

মানুষের সব সময়ে এক কাজ ভাল লাগে না। কাজ করিতে করিতে হাঁপাইয়া উঠিলে মন একটু বিশ্রাম খোঁজে। কিন্তু তাই বলিয়া এক-ঘেয়ে ভাবে বসিয়া থাকাও সকলের পক্ষে অসহ্য। কাজেই অবসর সময়ে সবিতা বই নিয়া বসে। উপন্যাস বা গল্পের বই। এই হইল তাহার অপরাধ। শাশুড়ী দুই চোখে ইহা দেখিতে পারেন না। ইহার উপর সারদার জাত ক্রোধের কারণ যে কি সবিতা তাহা বোঝে না। কিন্তু যখনই সে একটু নিরিবিলিতে বই পড়িতে বসে—অমনি সারদার অগ্নিবর্ষী বাক্যবাণ শুরু হয়।

অজ পাড়াগাঁয়ে সহরের রীতিনীতি ও চালচলন—ইহা গাঁয়ের সেকেলে লোকদের কাছে যেন অসহ্য। সহরের আধুনিক শিক্ষা ও গুণ থাকাও যেন গ্রামে মেয়েদের পক্ষে পাপ।

আচ্ছা, বেশ। পাপ,—তাহা সবিতা না হয় স্বীকার করিল। কিন্তু তাই বলিয়া ঢাক ঢোল পিটাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বধূর গুণকীর্তন করিয়া বেড়াইবার দরকার কি?

এই তো সেদিন সবিতা পুকুরঘাট হইতে জল আনিতে গিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িতেছিল। অতিকষ্টে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু কলসীটা কাঁখ হইতে পড়িয়া গিয়াছিল মাটিতে। সেজন্য শাশুড়ীর কম বকুনি খাইতে হয় নাই। কাছেই ও বাড়ির সদুর মা ছিল। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া শাশুড়ী বলিয়া উঠিয়াছিলেন—দেখলে সদুর মা, বৌর কাণ্ড? হোঁচট খাবে না? যে চলার ছিরি—বসুমতী ফেটে যায় আর কি!

হোঁচট খাইয়া সবিতার পায়ের একটি আঙ্গুল থেঁতলাইয়া গিয়াছিল—ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল। সারদা সেদিন শুধু চলার ভঙ্গীটাই দেখিয়াছিলেন—রক্ত দেখেন নাই।

ইহাতো সাধারণ ঘটনা। ইহার চেয়েও কত গুরুতর কাণ্ড যে কতদিন হইয়া গিয়াছে—সব কি আর মনে আছে সবিতার?

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়—প্রবাদ বাক্যটা সবিতা খুব বিশ্বাস করে। দেবরের পাতে ভাত দিতে গিয়া আজ কয়েকটা ভাত মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। সারদা কাছে ছিলেন না। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোথা হইতে ঝড়ের মতন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—আমরাও তো জীবনভর লোককে ভাত দিয়ে এলাম, কই, এমনতরো ভাত পড়েছে কোনদিন? ছিঃ ছিঃ কি অলক্ষুণে কাণ্ড সব। লক্ষ্মীর দানা, তা কি এমনভাবে ফেলতে আছে? সাধ করে নেকাপড়া জানা বউ এনেছিলাম। ওমা, নেকাপড়ার ভেতর যে এত গুণ তা কি জানতাম?

আজ আর ধৈর্যের বাঁধ মানিল না সবিতার। সে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—দেখুন মা, লেখাপড়ার দোষ দিয়ে অমন অপমান করবেন না। কেন, কি দোষ করেছে লেখাপড়া? আর লেখা পড়া যদি আপনাদের চোখের বিষই হয়ে থাকে তবে লেখাপড়া জানা বউ আনলেন কেন?

সারদার চক্ষু কপালে উঠিল।—ওমা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার ছেলের বউ কথা বলবে আমার মুখের ওপর? এমন বউর মুখে আগুন!

শাশুড়ী গর্জাইতে লাগিলেন।

একক নিঃসঙ্গ জীবন সবিতার কাটিতে চায় না।

দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিবার লোকও নাই। আশে পাশে যে দু' একটি বাড়ি আছে তাহার লোকগুলির সঙ্গে সবিতার খাপ খায় না। সমবয়সী মেয়ে বউরা বিশেষ আসেও না তাহার কাছে। ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র পরিবেশের মাঝে সবিতার মন যেন হাঁপাইয়া ওঠে।

একটি ছেলে মাঝে মাঝে আসে তাহার কাছে। গাঁয়ের 'পল্লীমঙ্গল' ক্লাবের সেক্রেটারী —সুরেশ। মাথায় বাবরি ছাঁটা চুল—ফিট্‌ফাট চেহারা। গায়ের রঙ কালো হইলেও চালচলন একেবারে কেতা-দুরস্ত।

আসিয়া বলে—পড়বে বৌদি এই বইখানা? খাসা বই।—বগল হইতে একটি বই বাহির করিয়া দেয় সবিতাকে।

সবিতার যেন নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী মিলিয়া যায়। সাগ্রহে হাত পাতিয়া গ্রহণ করে বইটি।

মন্দ লাগে না ছেলেটিকে। কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরিয়া যায়। খালি বাজে গল্প জুড়িয়া দেয় সবিতার সঙ্গে। শাশুড়ী দেখিয়া ফেলিলে রক্ষা নাই। কাজেই সে যথাসম্ভব সুরেশকে এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করে।

দেবর নরেন্দ্রও মন্দ লোক নয়। বেশ হাসিখুসি ও গল্পগুজব-প্রিয়। কিন্তু তাহাকে সবিতা কাছে পায় কই? দুপুরে ও রাত্রে শুধু খাবার সময়ে বাড়িতে আসে। খাইতে বসিয়া একটু গল্পগুজব ও হাসিঠাটা করে—তারপর তাড়াতাড়ি চলিয়া যায় দোকানে।

স্বামীও দোকানেই থাকে। দিনরাত শুধু দোকান লইয়াই ব্যস্ত। দেবরের যদিও বা এতটুকু অবসর আছে—কিন্তু স্বামীর তাহার একাংশও নাই। নরেন্দ্র চলিয়া যাওয়ার পর হীরেন্দ্রনাথ আসে—মুখ বুজিয়া চুপটি করিয়া খাইয়া চলিয়া যায়। কাহারও সঙ্গে কথা বলার কোন দরকার মনে করে না—মায়ের সঙ্গে নয় এমনকি স্ত্রীর সঙ্গেও না।

সংসারের জটিল গ্রন্থিটাই বুঝি এইখানে।

কাছে থাকিয়াও সবিতা স্বামীর সাহচর্য পায় না। কর্মব্যস্ত স্বামীর হদিস পায় না সে। কেমন যেন নীরস রুক্ষ ব্যবহার। অর্থপ্রিয় ব্যবসায়ী লোকগুলি কি সকলেই এমন হয়? তাহাদের গাঁয়ের গদাধর সরকারকে চিনিত সে। পাকা ব্যবসায়ী লোক। অর্থ ছাড়া কিছুই জানিত না। তাহার স্বামী হীরেন্দ্রনাথও অর্থ ছাড়া কিছু জানে না। স্ত্রী যেন তাহার কাছে কিছুই নয়।

দুর্ভাগ্য সবিতার। না হইলে এমন সংসারে সে পড়িবে কেন?

পতি-দেবতার নিন্দা করিতে নাই। শিক্ষিতা সবিতা স্বামীর নিন্দা করিতে চাহে না। সে চাহে স্বামীকে একান্তভাবে পাইতে। তাহার সমস্ত হৃদয়-মন উন্মুখ হইয়া থাকে স্বামীর সাহচর্যের জন্য। কিন্তু তাহার স্বামী যেন ভিন্ন ছাঁচে গড়া। নারীর রূপ—নারীর চোখের চাহনি কিছুই তাহাকে প্রলুব্ধ করে না।

অবহেলার বোঝা বহিতে বহিতে হৃদয় ভাঙিয়া পড়িতেছে সবিতার। মন অভিমানে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

হীরেন্দ্রনাথ অনেক রাত্রে বাড়িতে আসে। দোকানের কাজকর্ম সারিয়া আসিতে রোজই অনেক রাত হইয়া যায়। সবিতা কোনদিন জাগিয়া থাকে—কোনদিন বা ঘুমাইয়া পড়ে। এত রাত অবধি জাগিয়া থাকা সবিতার ধাতে সয় না। নীরব নিথর পল্লীগ্রাম—ধূ ধূ মাঠের উপর দিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসে—ঝিঁঝিঁ পোকারা ডাকিয়া রাত্রির বিভীষিকাকে গভীর করিয়া তোলে। সবিতার ভয় হয়। কেমন করিয়া দুই চোখে তাহার ঘুম জড়াইয়া আসে, সে জানে না।

রাত্রে সারদাই খাইতে দেন হীরেন্দ্রনাথকে। তবু ভাল, এত রাত্রে শাশুড়ী ডাকাডাকি করিয়া বধুকে উত্ত্যক্ত করেন না।

সবিতার চোখে ঘুম সর্বদাই বেশী। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথের চোখেই বা ঘুম কম কি সে! মাঝ রাতে হয়তো সবিতা আচমকা জাগিয়া ওঠে—বুকের কাছে অনুভব করে ঘুমন্ত স্বামীকে। মানুষ নয় যেন—মনে হয় নিদ্রিত পাষাণ।

এমনি করিয়া রাত কাটে, দিন কাটে।

উষর মরুভূমির পথে যেন রিক্ত পথশ্রান্ত যাযাবর। তৃষ্ণার্ত পথিক যেন মরুভূমির মাঝে জলাশয় খুঁজিয়া মরে—যেমন করিয়া মৃগ ছুটিয়া চলে মরীচিকার সন্ধানে।

সেদিন সারদা দুপুরে বাড়িতে ছিলেন না। পাশের গাঁয়ে কি দরকারে গিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া ভাল লাগিতেছিল না সবিতার। ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের রোদ অপরূপ স্বপ্নচ্ছায়া বিছাইয়া দিয়াছিল তরুবীথির তলে। মনটা বড় নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হইতেছিল সবিতার। বালিশের উপর ঠেসান দিয়া সে একটি বই পড়িতেছিল। সুরেশের দেওয়া বই।

জানালার কাছে কাহার যেন ছায়া পড়িল। সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিল—দেখিল সুরেশ। সুরেশের মুখে প্রশান্ত হাসি। চোখে লুব্ধ দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি যেন সবিতার অন্তরে গিয়া বিঁধিল।

আরও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল সুরেশ। জিজ্ঞাসা করিল—কি গো বৌদি, কি করছ?

ইচ্ছা হইল সবিতা বলে—দেখছ না কি করছি? চোখের মাথা খেয়ে বসেছ নাকি? কি বেহায়া ছেলে!

কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইল সবিতা। বলিল—বই পড়ছি।

—কি বই? সেই উপন্যাসখানা? বেশ বই কিন্তু। আজ একটা নাটক এনেছি তোমার জন্য। "তিলোত্তমা"। বইটা এবার বারোয়ারী পূজোর সময় আমাদের গাঁয়ে হবে কিনা। তাই কলকাতা থেকে আনিয়েছি। বড় চমৎকার এই তিলোত্তমা নাটকটি।

সুরেশ জানালা দিয়া বাড়াইয়া দিল বইটি। সবিতা সংকোচ বোধ করিয়াও আবার কি ভাবিয়া হাত বাড়াইয়া বইটি লইল।

সুরেশ বলিল—আমি নিজে বইটি পছন্দ করেছি। বড় ভাল ভাল এক্টো আছে এতে। তিলোত্তমা গল্প তুমি জান বৌদি?

সবিতা বলিল—না।

গল্পের অবতারণা করিয়া বসিল সুরেশ। —সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই দৈত্য ছিল। প্রবল পরাক্রান্ত তারা দু'টি ভাই। দেবতারা পর্যন্ত তাদের বিক্রমে কাঁপত। স্বর্গরাজ্য দখল করতে সুরু করল তারা। দেবতাদের সঙ্গে লড়াই হল। কি ভীষণ লড়াই, তুমি যদি একবার প্লে-টা দেখো বৌদি—তবে বুঝবে কি রকম এক্টো করতে পারি আমি। আমি নেব সুন্দ দৈত্যের পার্ঠ। শুনবে একটু আমার এক্টো? আমার প্রায় সব মুখস্থ হয়ে গেছে।

সুরেশ মুখে চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া, হাত বজ্রমুষ্টি করিয়া বলিতে সুরু করিল—

মান-গর্ব অভিজাত্য বিসর্জিত
অমরত্বে কিবা প্রয়োজন?
করিব ভীষণ রণ,
দেবাসুর-সমরের প্রলয় গর্জনে
বিশ্ব দিব রসাতলে।

সঙ্গে সঙ্গে বাহুদ্বয়ের পেশী স্ফীত করিয়া শক্তির পরিচয় দেখাইতে সুরু করিল সবিতাকে।

—তারপর গল্প শোনো বৌদি। দেবতারা ভেবে দেখলেন—দু' ভাইয়ের ভেতর বিচ্ছেদ ঘটাতে না পারলে তাদের শক্তিহীন করা যাবে না। ব্রহ্মার বরে তারা বলীয়ান। তখন সকল দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ব্রহ্মা আদেশ দিলেন বিশ্বকর্মাকে স্বর্গ, মর্ত ও পাতালে যত সৌন্দর্য আছে, সব কিছু থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্য নিয়ে একটি নারী-মূর্তি গঠন করবার জন্য। নারীমূর্তি গঠন হল......তার নাম হল তিলোত্তমা। সেই মূর্তি দেখে দেবতারা পর্যন্ত ভুলে গেলেন আর দৈত্যেরা কোন্ ছার!

সবিতা কৌতূহলী হইয়া শুনিতে থাকে। এক একবার বিরক্তও লাগে এই সুরেশের কথায় —আবার ভালও লাগে কোন সময়।

বলিল—ঘরে এসো ঠাকুরপো, বাইরে দাঁড়িয়ে কি এত কথা বলা যায়?

সুরেশ তাহাই যেন চাহিতেছিল। ভিতরে আসিয়া বসিল চৌকির উপর—একেবারে সবিতার কাছাকাছি। কথার আকর্ষণে সবিতা যেন নিজের আত্ম-সংস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে দ্বিধা করিল না—সরিয়াও বসিল না।

—তোমাদের যাত্রা কবে হবে ঠাকুরপো?

—বেশী দিন নেই আর, এই তো কালী-পূজোর দিন হবে। যাবে তো বৌদি? তোমাকে আমি নিয়ে যাব। খুব ভাল জায়গায় বসিয়ে দেব তোমাকে—মেয়েদের সবার সামনে।

—নিয়ে যাবে তো?

—হ্যাঁ নিশ্চয়। তোমাকে নিয়ে যাব না?

অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছিল—

খেয়াল ছিল না কাহারও।

সারদা আসিয়া এই বিচিত্র ভঙ্গীতে দুই-জনকে দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। মুখে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সারদার বাক্যবাণ সুরু হইল সন্ধ্যার পরে। হাতের কাজকর্ম সারিয়া যখন অবসর পাইল—তখনই তারস্বরে সুরু করিল পুত্রবধূর গুণ-কীর্তন। অভদ্র, অশিষ্ট, অশ্রাব্য উক্তি—শুনিতেই ঘৃণা লাগে সবিতার। দুই হাতে কান ঢাকিয়া মুখ বুজিয়া সে শুইয়া রহিল।

রাত্রে শইয়া শুইয়া কত কথাই ভাবিত সবিতা। তিলোত্তমার কথা। নারীর রূপে পুরুষ মুগ্ধ হয়—উন্মত্ত হয়। কত যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে নারীর জন্য। বিধাতা তো এইজন্যই নারীকে সুন্দর করিয়া তৈরী করেন। কিন্তু নারী যদি না পায় তার সৌন্দর্যের মর্যাদা—না পায় ভালবাসা তবে এত রূপের সার্থকতা কি? এত রূপ থাকিয়াও সবিতা কেন বঞ্চিতা—কেন রিক্তা?

তাহার সামনেও তো পথ খোলা আছে—সে তো ইচ্ছা করিলেই জীবনকে উপভোগ করিতে পারে—জীবনের বঞ্চনাকে উপহাস করিতে পারে......

ভোর বেলায় ইচ্ছা করিয়াই সবিতা বিছানায় শুইয়া রহিল। শত কাজ করিয়াও যখন শাশুড়ীর মন পাওয়া যায় না তখন কাজ সে আজ করিবে না। ঝগড়া বাধিবে তাহা নিশ্চিত। কিন্তু আজ কোথায় ইহার শেষ তাহাই দেখিয়া লইবে।

বারোটা বাজিয়াছে বোধ হয়। স্বামী তাহার বাড়ি আসিয়াছে। তবু সবিতা উঠিল না। কিন্তু স্বামীটিও তাহার কেমন! সবিতার ঘরে একবার উঁকিটিও দিল না। বহু মেয়ের স্বামী সে দেখিয়াছে কিন্তু এমন স্বামীও আবার কাহারও থাকে? সবিতা বালিশের কোনে মুখ রাখিয়া অভিমানে চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

হীরেন্দ্রনাথ স্নান করিয়া খাইতে গেল। শাশুড়ী নিজেই তাহাকে ভাত দিলেন। সবই সবিতা বুঝিল। তবু উঠিল না।

শাশুড়ী হীরেন্দ্রনাথকে বলিতেছেন—সবিতা স্পষ্টই শুনিতে পাইল—বউকে দানোয় পেয়েছে—কেউ বশ করেছে—

হীরেন্দ্রনাথ জবাব দিল—চিকিৎসা করলে হয় না?

শাশুড়ী জবাব দিল—চিকিচ্ছে করালেও কিছু হবে না হীরেন, এই বউ নিয়ে তোর সুখ হবে না। গেরস্থের ঘরে ঢের ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে—তুই আর একটি বিয়ে কর্।

উত্তরে হীরেন্দ্রনাথ কি বলিল বোঝা গেল না।

কালীপূজার রাত্রি আসিল। পল্লীমঙ্গল ক্লাবের যাত্রার তারিখ।

দুপুর বেলায় সুরেশ আসিয়া চুপি চুপি সব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে।

সবিতা যাইতে ইতস্তত করিয়াছিল—যদি শাশুড়ী অনুমতি না দেয়।

—অনুমতি নিতে হবে না। তা হলে যেতেই দেবে না তোমাকে।

—না বলেই যাব?

—হ্যাঁ, যাবে বৌকি? আর ফিরে আসতে হবে না। যাত্রাগানের পর তোমাকে নিয়ে চলে যাবো ভিন্ গাঁয়ে—সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

কি ভয়ঙ্কর কথা বলে সুরেশ! সবিতা ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ নির্বাক হইয়া রহিল।

—সে কি; যাবে না বৌদি?

সবিতা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিল, তারপর বলিল—হ্যাঁ যাবো।

—যাত্রা সুরু হবার কিছুক্ষণ আগে আমি তোমার দরজায় ধীরে ধীরে টোকা মারব—আর তুমি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়বে—কেমন?

সবিতা বিমূঢ়ের মত ঘাড় নাড়িল।

সন্ধ্যার পরই সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল সবিতা। কেশ বিন্যাস করিয়া—মুখে পাউডার মাখিয়া বেশ পরিপাটি করিয়া প্রসাধন সারিয়া লইল। অনেকদিন সে মনের মত প্রসাধন করে নাই। আবশ্যকীয় কয়েকটি জিনিষপত্রও একটি ছোট কাপড়ের পুটুলিতে বাঁধিয়া লইল।

শাশুড়ী পাশের ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সবিতা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ঐ বুঝি যাত্রার আসরের কনসার্ট বাজিয়া উঠিল।

এক্ষুণি সুরেশ আসিবে।

সবিতার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। যতই সময় ঘনাইয়া আসিতেছে, ততই তাহার মনে জাগিতেছে সংকোচ......কুণ্ঠা......ভয়......

গা কাঁপিতে লাগিল।

টক্ টক্ টক্—দরজায় শব্দ।

সুরেশ আসিয়াছে।

সবিতা চৌকির উপর দৃঢ় হইয়া বসিল। নিজকে সে নিরাপদ মনে করিতেছে না। বালিশের উপর হাত চাপিয়া রাখিল। তবু যেন চৌকির কাঠ শক্ত করিয়া ধরিয়া এবার স্থির হইয়া বসিল।

আবার দরজায় টক্ টক্ শব্দ।

সবিতা আরও জোরে চৌকি আকড়াইয়া ধরিল। গা তাহার কাঁপিতেছে। উঠিয়া দরজা খুলিবার শক্তিও তাহার নাই।

হঠাৎ আত্ম-বিস্মৃতি হইয়া গেল সবিতার। নিজকে সে হারাইয়া ফেলিল। নিথর পাষাণের মত মৃত—বধির হইয়া গেল যেন সে।

পাষাণের মত ভারী দেহ এলাইয়া দিল চৌকির উপর।

এইভাবে কতক্ষণ কাটিল সে জানে না।

অনেক রাত্রে হীরেন্দ্রনাথ আসিল। স্বামীর কাছে শুইয়াও তাহার ভয় কাটিল না। বুক কাঁপিতে লাগিল—হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

আকাশে প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিল। ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল ঝিকিমিকি প্রভাতী আলোক।

হীরেন্দ্রনাথ সবিতার দিকে ফিরিয়া চাহিল। প্রভাতের সবিতার মতই যেন একটি নির্মল মুখ। আয়ত দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। হীরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন সুন্দর যেন আর কোনদিন সে সবিতাকে দেখে নাই।

হীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল—কিগো, আজ এত সেজেছ কেন বলতো? মুখে পাউডার মেখেছ, সুন্দর করে চুল বেঁধেছ—আর কি সুন্দর শাড়ীটা পরেছ—কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে—

মেঘ বুঝি বর্ষণোন্মুখ হইয়াই ছিল। ঝর ঝর করিয়া সবিতার চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

হীরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারিল না। নির্বোধের মত চাহিয়া রহিল। বিস্মিত ভাব কাটিলে সবিতাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিল—ছিঃ লক্ষ্মীটি, কেঁদো না—

কিন্তু কান্না আর থামে না। এইরূপ কান্না বুঝি সবিতার জীবনে আজ প্রথম।

# ইন্দ্রজিতের চিঠি—

## মাথার ছিট

আমার এই বন্ধুটি pun-রসিক। তিনি কথার মারপ্যাঁচ ভালবাসেন। কথাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কোথায় যে নিয়ে যাবেন, তার ঠিকানা নেই। তাঁর কাছে কথা মাত্রই কথার কথা। কথায় যে কথা বাড়ে, এঁকে দেখেই প্রথম বুঝলুম। পানরসের ন্যায় pun রসেও মাদকতা আছে, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে দুটোর ফলই শোচনীয় হয়ে ওঠে—একটায় মাতলামি আরেকটায় ভাঁড়ামি। মাত্রা ঠিক থাকলে পান দোষও তেমন দোষণীয় নয়। আর মাত্রা-মার্জিত pun-এর তো কথাই নেই। দিশী বিলিতি সব শাস্ত্রেই তাকে ভাষার অলংকার বলা হয়েছে। সাহিত্যিকরা pun-এর সাহায্যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। বিদগ্ধ সমাজের বিশ্রম্ভালাপে দেখেছি pun মুখে মুখে বিস্তারিত হয়ে চকমকি পাথরের ফুলকির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গান্ধীজী যখন বৃদ্ধ বয়সে রেস্ট-কিওরের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন সহাস্যে তাঁকে এ্যারেস্ট-কিওরের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিম্বা অতিরিক্ত ভোজনে কাতর অতিথিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ যখন সস্নেহ কৌতুকে বলেন, ওহে প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের কথা শুনেছি, কিন্তু আহারেণ ধনঞ্জয়ের কথা তো শুনিনি, তখন pun রস ভোজ্য বস্তুর চাইতেও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

আমার বন্ধুটির pun-এও মাঝে মাঝে দিব্য ঝাঁঝ থাকে। তবে যখন-তখন যত্র-তত্র করেন বলে কখনো কখনো মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেদিন মন্ত্রিমণ্ডলীর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি যখন কালীপদবাবু এবং খালিপদবাবুর নাম করছিলেন, তখন সত্যি আমার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। পাঁজা মশাই-এর মতো bare-footed মন্ত্রীতে আমাদের আপত্তি নেই, মন্ত্রীরা bare-faced না হলেই হল।

ঐ দেখুন, আসল কথার ধারে-কাছেও নয় আবোল-তাবোল বকেই চলেছি। pun সম্বন্ধে তো লিখতে বসিনি। অবশ্যি যে বস্তুটা নিয়ে লিখব ভেবেছি, আমার বন্ধুকৃত একটা pun থেকেই সে কথাটা উঠল। ছেলেপিলের জামা করানো দরকার। ছিটের কাপড় খুঁজছিলাম। বন্ধুকে জিগ্যেস করলুম, ছিট কোথায় পাওয়া যায় বলতো? বন্ধু বললে, কেন, মাথাতেই ঢের আছে। শুনুন কথা, আমার মাথায় নাকি ছিট আছে। বোধ করি মনে মনে চটেছিলাম। বললুম, বেশ তো, আমার মাথায় তবু তো ছিট আছে, বেশির ভাগ মানুষের মাথায় যে কিছু নেই, মাথা বেমালুম ফাঁকা।

pun-এর খোঁচায় চটেছিলাম। নইলে মাথায় ছিট আছে বলতে আমি বুঝি মাথায় কিছু পদার্থ আছে। সত্যি বলতে কি মাথায় যাদের ছিট নেই, তাদের মাথায় কিছু নেই। সাধারণ আর অসাধারণের তফাৎটাই ওখানে। সংসারে পনেরো আনা মানুষই অত্যন্ত শীতল মস্তিষ্ক অর্থাৎ গতানুগতিক কিম্বা বলতে পারেন অতি সাধারণ। খায় দায় ঘুমোয় ছাতা বগলে গলাবন্ধ কোট গায়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। সংসারের যেটুকু বৈচিত্র্য, সেটুকু আসচে বাকি একআনা মানুষের কাছ থেকে, যাদের মাথায় কিঞ্চিৎ ছিট আছে। সবাই বলচে, স্রোতে গা ভাসিয়ে নতুনের initiative যোগাচ্ছে সমাজের মুষ্টিমেয় ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি। এরা না থাকলে সমগ্র মানবসমাজের চেহারাটা হত লেপা-পোঁছা নাকখাঁদা মানুষের মতো—ধারালো ছুঁচলো কিছুই থাকত না।

ছিটগ্রস্ত মানুষের যে বদনাম তার আসল কারণটা খুব স্পষ্ট—আর দশজনের মতো

হওয়াটাই নিয়ম, না হওয়াটাই ব্যতিক্রম। নিয়মের ব্যতিক্রমকে লোকে সুনজরে দেখে না। অপরের মতো চলুন লোকে প্রশংসা করবে। আর নিজের মনমতো চলুন, বলবে মাথায় ছিট আছে। অমিট রায়ে লোকটা যে ছিটগ্রস্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। চলনে বলনে কাজে কর্মে তার প্রমাণ রয়েছে প্রচুর। অমিট্‌এর সৃষ্টিকর্তা গোড়াতেই বলে রেখেছেন, ও আর পাঁচজনের মতো নয়, একেবারে পঞ্চম। এই যে ব্যক্তিত্বের পঞ্চমত্ব, একেই বলে অসাধারণত্ব। অপর পক্ষে ব্যক্তিত্বের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটলেই লোকটা হরেদরে সাধারণ হয়ে গেল। ব্যক্তিত্ব যেখানে অপ্রকাশ, সেখানে মানুষটা ব্যক্তিবিশেষ আর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেলেই বিশেষ ব্যক্তি।

আরো দেখুন রতনেই রতন চেনে। ইংগ-বংগ সমাজের অত সব চক্‌চকে ঝকঝকে মেয়ে থাকতে অমিট খুঁজে পেতে লাবণ্যকে বের করল কেন? আর কেন? লাবণ্যরও যে মাথায় ছিট। সে-ও আর পাঁচজনের মতো নয়। অমিট নিজেই বলছে—

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।

কেটি মিত্তিরের মতো অপরের ছাঁচে ঢালাই করে নিজেকে ও অপরূপ করে তোলে নি, আপন স্বরূপটি বজায় রেখেছে। ভাগ্যিস মাথায় ছিট ছিল, নইলে সে-ও সিসি-লিসির দলে ভিড়ে যেত। সিসি লিসি কেটি—এরা সব নাক উঁচুর দল, কিন্তু নাক উঁচু হলেই মাথা উঁচু হয় না। মাথা উঁচু রাখতে হলে মাথায় ছিট থাকা চাই।

মাথার ছিট জিনিসটা আসলে হচ্ছে মানুষের প্রতিভা। এ যুগের সব চাইতে ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং গান্ধীজী। তাঁর ক্রিয়াকলাপ সমস্তই সাধারণ মানবিক নিয়মের বহির্ভূত। তিনি ব্যারিস্টার সাহেব, কিন্তু সাহেব হয়েও তিনি কৌপিনধারী, আইনজ্ঞ হয়েও তিনি আইন অমান্যকারী। পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রান্ত শক্তির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে করেছেন, কিন্তু কদাপি অস্ত্রধারণ করেন নি। গান্ধীজীর যেসব চ্যালারা মাথায় গান্ধীটুপি পরে দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করেছেন, তাঁরা মস্তকে গান্ধীটুপি ধারণ না করে যদি মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ ছিট পোষণ করতেন, তবে দেশের ঢের বেশি কল্যাণ হত। মাথার ওপরে যা থাকে, তা দিয়ে মানুষের বিচার নয়, মাথার ভেতরে কি থাকে, তাই দিয়েই মানুষের মূল্যে। গান্ধীজীর মাথার ছিট ছিটে-ফোঁটা পরিমাণেও এ'দের মাথায় থাকলে দেশ থেকে অন্তত কালোবাজারের কালিমা দূর হতো।

মাথার ছিট সম্বন্ধে কেউ যদি গবেষণা করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, জিনিসটা সভ্যতার বাই-প্রডাক্ট। অসভ্য মানুষের মাথায় ছিট থাকতে পারে না। কারণ ওদের জীবন খুব মোটা রকমের কয়েকটা অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অভ্যাস-নিয়ন্ত্রিত জীবন যেদিন থেকে বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেদিন থেকেই সভ্যতার শুরু। আবার দৈনন্দিন জীবনযাপনে অবশ্য প্রয়োজনীয় যে সামান্য বুদ্ধিটুকু তার মধ্যে মাথার ছিটের অবকাশ নেই। অবশ্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিকে ছাপিয়ে যে উদ্বৃত্ত বুদ্ধিটুকু মাথা থেকে উপচে পড়ে, তাকেই বলে মাথার ছিট। সে বুদ্ধিটা সংসারী বুদ্ধি নয়, প্রায়ই সংসারবিরোধী। এইজন্যই সংসারী লোকেরা ছিটগ্রস্ত মানুষকে ভয় করে চলে। কিন্তু একথা সত্য যে, সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে ছিটগ্রস্তের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলবে। আবার সেই সংগে ছিটগ্রস্তদের ছিটও ক্রমে সাধারণ মানুষের গা-সহা হয়ে আসবে। অসাধারণ মানুষের মাথার ছিট সাধারণ লোকেরা যে পরিমাণে বরদাস্ত করে নেবে, সভ্যতা সেই পরিমাণে বিস্তৃত লাভ করবে।

ঐতিহাসিকরা ঠিক বলতে পারবেন, কিন্তু আমার মনে হয়, সভ্য যুগের সর্বপ্রথম ছিট-গ্রস্ত ব্যক্তি হচ্ছেন সক্রেটিস। তিনি যেসব কথা বলতেন এবং যেসব কাজ করতেন, সেকালের গ্রীকদের কাছে তা অশ্রুতপূর্ব এবং অদৃষ্ট-পূর্ব। তাই সক্রেটিসকে তাঁরা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে নি; একটা প্রচণ্ড উপদ্রব বলে মনে করেছে। রাগের সবচেয়ে বড় কারণ, লোকটা জোর করে সবাইকে ভাবিয়ে নিয়েছে। সব কথাতেই বলে—কেন? —The why of it জোর করে কাজ করিয়ে নিলেও লোকে অত চটে না, যত চটে জোর করে ভাবিয়ে নিলে। লোকে তার শোধ তুলেছে—জ্যান্ত উপদ্রবটাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

কেন জানি না, সক্রেটিসের কথা ভা আমার বিদ্যেসাগরের কথা মনে হয়। শারীরিক এবং মানসিক গঠনে এ দুইয়ের মধ্যে কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে। সক্রেটিসের মতো বিদ্যে-সাগর মশায়ও সে যুগের বাঙলা সমাজকে ভিৎশুদ্ধ নেড়ে দিয়েছিলেন। নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়েও হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। অপরাধ কম নয়। বিষ খেয়ে যে তাঁকে মরতে হয়নি, এ তাঁর পরম ভাগ্য। মাথায় অতখানি ছিট রেখেও যে মাথাটা বাঁচাতে পেরেছেন তার কারণ পূর্বেই বলেছি। অসাধারণ মানুষের মাথার ছিট সাধারণ মানুষের গা-সহা হয়ে এসেছে। এখন আর ছিটগ্রস্তের মুখে বিষভাণ্ড এগিয়ে দেয় না, নিজেদের মুখ থেকেই বিষোদ্গীরণ করে। দু হাজার বছরে সভ্যতা এতটুকু অন্তত অগ্রসর হয়েছে।

## ছাড়পত্র

**সমীর ঘোষ**

একদিন নিজ হাতে ছাড়পত্র লিখে
নিজের নিরীখে
দিয়েছি তোমায়।
এই দান দেওয়ার অন্তরে
পরম গৌরব
অবারিত করেছিল বিতর্কের সব কলরব।
আজ দিন যায়।
চৈত্রের চঞ্চল হাওয়া ধীরে ধীরে
বকুল ঝরায়;
মাঠে মাঠে ধূলিকণা করে হায় হায়।
ওই বকুলের মধু আর ধূলিকণা
হয়েছে অনন্যা;
ঘর ছাড়া হয়ে ওরা হয়েছে উজ্জ্বল
ঢেকে গেছে সারা ধরাতল।
আজ তুমি ঢেকেছো ধরণী!
কালোচুলে মেঘ নিয়ে করেছো আড়াল
সকাল বিকাল
আমার এ আকাশের আলোর সরণী।
আজ তাই অনিমিখে
চেয়ে চেয়ে দেখি লিপি নিজ হাতে লিখে,
মনে মনে তর্ক করি বিক্ষুব্ধ অন্তরে
ছাড়পত্রে ছিল সত্য এতো অধিকার
এমনি অবাধ হবে শক্তি মোর দানগ্রহীতার!
হায় আমি শুধু তর্ক করি
চাহিনা বুঝিতে
যেদিন দিয়েছি পত্র লিখে
তারপর নাই আর কোনো অধিকার
তর্ক করিবার।
আজ যায় দিন।
কখনো বকুল ঝরে,
কখনো বা ধূলিকণা হতে চায়
পরম রঙীন।।

তাকে ধমকেছে, যেন আবারো কেউ তাকে ধমকাবে—এক্ষুণি যেন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে সে।

রাস্তার সামান্য উপর দিয়েই চড়ুইগুলি উড়ে ফিরছে, তাদের বাঁকানো ডানা যেন মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল, ডাঁশগুলিও নীচে নেমে এসেছে; রাত্তিরে বৃষ্টি হবে, এ তারই লক্ষণ। জানালার উল্টো দিকে বেড়ার উপর ছবির মতো একটা কাক বসে রয়েছে। এতো চুপচাপ যে একটা কাঠের কাক বলে মনে হয়। কালো চোখ মেলে উড়ন্ত চড়ুইগুলিকে দেখছে। গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেছে, আরো ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে ব্যাঙের গলা। এই স্তব্ধতাকে যেন আরও গাঢ়, আরও গুমট বলে মনে হলো।

বুকের ওপরে .আড়িভাবে হাত দুটিকে রেখে বিষণ্ণভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে উস্তানিয়া গাইলোঃ

আকাশের গায়ে শুনি পাখীদের গান,<br>
ফসলের মাঠে ফুটে ওঠে দ্যাখো ফুল,<br>
নির্ভয়ে সুরেলা গলায় ঝিঁটি এগিয়ে গেল;<br>
আহা কোথা সেই শ্যামল শস্যক্ষেত,<br>
কোথা বন—যেথা ফিরেছি দোঁহে অকুল।

গান শেষ করে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে অনেকক্ষণ বসে রইলো তারা চুপচাপ; তারপর এক সময় নীচু আর অন্যমনস্ক গলায় উস্তানিয়া বললোঃ

"নেহাৎ মন্দ গান বাঁধিনি, বেশ ভালো বলেই তো মনে হচ্ছে......"

বাধা দিয়ে ঝিঁটি বললো—"দ্যাখো........

রাস্তার ওপরে ডানদিকে তাকালো তারা। রৌদ্রস্নাত দেহে নীলাভ কামিজ-পরা দীর্ঘাঙ্গ এক পুরোহিত এগিয়ে আসছেন। গর্বোদ্ধত চলন, যেন মেপে মেপে ছড়ি ফেলছেন পথের ওপর। রূপা-বাঁধানো ছড়ির হাতল আর তাঁর বুকের ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া সোনার ক্রুশটি রোদ্দুরে চিকচিক করছে।

কালো ভাঁটার মতো চোখ তুলে কাকটি তাকালো পুরোহিতের দিকে, তারপর অলসভাবে তার ভারি ডানা ঝাপটে একটা এ্যাশ্-গাছের ডালে গিয়ে বসলো। বাগানের মধ্যে কী একটা পড়লো শাদা মতন।

মেয়ে দুটি দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নোয়ালো পুরোহিতের উদ্দেশ্যে; তিনি তা লক্ষ্যই করলেন না। দাঁড়িয়েই রইলো তারা, যতক্ষণ না তিনি মোড় ফিরলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো।

মাথার ওপরে রুমালটাকে ঠিকমতো এঁটে নিতে নিতে উস্তানিয়া বললো, "দ্যাখ্ ছুঁড়ি, এই যদি আমার কাঁচা বয়েস হতো, যদি একটু সুন্দর হতো মুখখানা......"

ঘুম-জড়ানো গলায় রাগত সুরে কে ডাকলোঃ

"মেরিয়া!......মাস্কা......!"

" এইরে, ডাকছে আমাকে......"

ভয়-খাওয়া খরগোসের মত ছুটে চলে গেল সে, আর চকচকে ফ্রকটাকে হাঁটুর ওপরে টান করতে করতে চিন্তায় ডুবে গিয়ে বসে রইলো উস্তানিয়া।

ব্যাঙ ডাকছে, হাঁপ-ধরা হাওয়াকে যেন অরণ্যের মধ্যেকার নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো মনে হয়। বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে বিদায় নিচ্ছে দিন। টেসা নদীর ওপার থেকে ক্ষেতের উপর দিয়ে রুদ্ধ একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। দূরের মেঘগর্জনকে যেন ভালুকের ডাকের মতো শোনালো।

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

# "ক্ষুরস্য ধারা"—

## সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের মূল উৎস বেদান্ত। খৃষ্টের জন্মের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে এই বেদান্ত-দর্শনের সূত্রগুলি রচিত হয়। অদ্যাবধি সেগুলি ভারতীয় ধর্মসমূহের প্রাণবস্তুরূপে চর্চিত ও অভ্যর্চিত। এশিয়ার অন্যান্য ধর্মের মূলেও প্রেরণা জুগিয়েছে এই বেদান্ত। পাশ্চাত্য স্বভাবত জড়ধর্মী। বিজ্ঞানের তীব্র সার্চ-লাইটে সব কিছুকে দেখতে অভ্যস্ত ব'লে হাজার হাজার বছর ধরে অম্লান যে দীপশিখা ভারতের অন্তরলোককে উদ্ভাসিত করে এসেছে, উপনিষদের সেই আলোর স্নিগ্ধতা তাদের সহসা চোখেই পড়ে না। যতদূর মনে হয়, সুপরিচিত পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে এমার্সন (Ralph Waldo Emerson) এবং হুইটম্যান (Walt Whitman) বেদান্ত-দর্শনে প্রবুদ্ধ হ'য়ে তারই ভাবকে তাঁদের রচনার স্থানে স্থানে উপজীব্য করে নিয়েছিলেন। অধুনা ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত সাহিত্যস্রষ্টা ডব্লু্য সমরসেট মম্ (W. Somerset Maugham) সেই বেদান্ত-উপনিষদের আলো-কে পটভূমি ক'রে তাঁর The Razor's Edge (ক্ষুরস্য ধারা) উপন্যাস রচনা করেন। গ্রন্থটি বিশ্বে সমাদর ও স্বীকৃতি পেয়েছে।

কেবল মম্ সাহেব একা নন্, বর্তমান ইউরোপের সুধী-সমাজের একটি দল ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁদের চিন্তাধারাকে এরই সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ ক'রে চলেছেন। এই সুপ্রাচীন ধর্ম-দর্শন তাঁদের রচনারই মোড় ফিরিয়েছে তা নয়, তাঁদের কারো কারো জীবনের ধারাও ফিরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা সাধারণ লেখক মাত্রই নন্, তাঁরা বর্তমান জগতের চিন্তাধারার প্রতিনিধি হিসাবে সর্বত্র সুপরিচিত। পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতে তাঁদের এই প্রগতিশীল মতবাদ বেশ আলোড়ন এনেছে। এই দলের হাক্সলি (Aldous Huxley) ও ঈশারউড্ (Christopher Isherwood) সাহেব ভারতীয় দর্শন-চর্চার জন্য ক্যালিফোর্ণিয়ার বেদান্ত মঠে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি হাক্সলির পেরেনিয়েল ফিলসফি (Perennial Philosophy) নামে নূতন গ্রন্থ পাশ্চাত্যের দর্শন-জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে—সেই গ্রন্থে আগাগোড়া এই আদিম দর্শনেরই মহিমা উদ্গীত হয়েছে। এই আদিম দর্শন ঈশারউডের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে; ধ্যান-ধারণা যোগাভ্যাসে আত্মনিয়োগ করে তিনি এখন সম্পূর্ণ যোগীর জীবন যাপন করছেন। মম্ সাহেবও সময় সময় উক্ত মঠে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে এই দর্শনের চর্চা ক'রে থাকেন। তাঁর Razor's Edge পুস্তিকায় জড়বাদের রুক্ষ যবনিকায় ত্যাগ ও অনাসক্তির উজ্জ্বল আলোকপাত করেছে। নরদেহী জীব অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তবু ব্রহ্মকে জানবার এক দুর্বার জিজ্ঞাসা তার মনে মনে রয়েছে। তা কখনো চাপা, কখনো প্রস্ফুটিত। দৈবাৎ কখনো তার মোহ-দৃষ্টি খুলে যায়, সে জ্ঞান দর্শন লাভ করে। সে তখনই হয় প্রকৃত জ্ঞানালোকের অধিকারী। Razor's Edge গ্রন্থের নায়কের মনে এক সময়ে জেগে উঠলো প্রবল ধর্ম-জিজ্ঞাসা। তিনি ধর্ম-মতের সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ—মৃত্যুর মুখোমুখী এসেও অর্থ ও সম্পদ ত্যাগ করে অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘুরে চলেছেন ভূমার সন্ধানে। অবশেষে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জগতে তিনি পেলেন তাঁর অনন্তের সন্ধান।

কঠোপনিষদে ঋষিপুত্র নচিকেতা যমরাজ সমীপে পরমতত্ত্ব অর্থাৎ পরলোকতত্ত্ব জানবার বাসনা করেন। যমরাজ তাঁকে এই তত্ত্বোদ্ঘাটন প্রসঙ্গে বলেন: এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম দর্শিভিঃ॥৬৬॥১২॥ তৎপূর্ব শ্লোকে পরাগতি ব'লে যাকে বলা হয়েছে, এই শ্লোকে তাঁকে প্রাপ্তির উপায় বলছেন—"ইনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে নিহিত থাকায় প্রকাশ পান না। অথবা সকলের নিকট প্রকাশ পান না। পরম সূক্ষ্ম-দর্শী পুরুষ একাগ্রতাযুক্ত ও সূক্ষ্ম যোগাদি সাধনে পরিশোধিত বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান, অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে।" যম অতঃপর বলেছেন: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥৬৮॥১৪॥—মুমুক্ষুগণের প্রতি এই উপদেশ: "উত্থিত হও অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ে চিন্তা ত্যাগ ক'রে আত্মজ্ঞান লাভে উদ্যোগী হও; (মোহ-নিদ্রা ত্যাগ করে) জাগ্রত হও এবং শ্রেষ্ঠ আচার্য সমীপে উপস্থিত হয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ কর; বিবেকিগণ ব্রহ্মলাভের পথকে ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম ব'লে বর্ণনা করে থাকেন।"

এই শ্লোকের অংশ বিশেষ নিয়েই মম্ তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন।

মম্ ১৮৭৫ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্যারিসের বৃটিশ দূতাবাসের সলিসিটর। বাল্যকাল প্যারিসে কাটিয়ে তিনি দশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে আসেন। সেখানে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ে মন বসেনি ব'লে সাহিত্য-সাধনাতেই সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করেন। ইংরাজি কথা-সাহিত্যে তাঁর স্থান শীর্ষদেশে। বিশাল পটভূমিকায় তাঁর রসসৃষ্টি। মানুষের ব্যথা-বেদনার এমন নিখুঁত প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে যতখানি স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে, তেমনটি অতি অল্প সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে। তিনি প্রায় সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। তাই তাঁর কাহিনীর পটভূমির বিশালতা। তাঁর লেখাতে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে।

**ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া**
**দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥**

[যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।]

**—কঠোপনিষদ**

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### (১)

**এতখানি** সংশয় মনে নিয়ে আমি আর কোন উপন্যাস রচনা শুরু করিনি। এই কাহিনীকে উপন্যাস বলছি, তার কারণ আর কি নাম দেওয়া যেতে পারে, তা স্থির করতে পারছি না। কাহিনী আমার সামান্য, আর সে কাহিনীর পরিণতি বিবাহ বা মৃত্যুতে নয়। মৃত্যুতেই সকল কিছুর অবসান ঘটে, কাহিনীরও তাই যথোচিত উপসংহার, অনেক কাহিনীর আবার সুষ্ঠু পরিণতি বিবাহে, আর প্রচলিত রীতি অনুসারে মিলনান্তক কাহিনীকে অবজ্ঞা করতে বিলাসী সমাজের চক্ষুলজ্জা হয়। সাধারণ জনগণের সহজাত বুদ্ধি তাদের বিশ্বাস করায় যে, এতদ্দ্বারা সব কিছুই বলা শেষ হল। যখন যতপ্রকার সম্ভাব্য ঘটনা-বিপর্যয়ের পর নর-নারী মিলিত হয়, সেই কালে তারা তাদের জৈব-ক্রিয়া শেষ করেছে, আর কৌতূহল জাগায় তখন যে পুরুষের আগমন সম্ভাবনা, সেই উত্তর-পুরুষে। আমি কিন্তু আমার পাঠকদের শূন্যে দোদুল্যমান রেখেছি। সুদীর্ঘ বিরতির মাঝে মাঝে আমার জীবনে এক ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলাম, তাঁরই স্মৃতিকথা দিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেছি, আর বিরতির ফাঁকে ফাঁকে তাঁর জীবনে কি ঘটেছিল, সে বিষয় আমার জ্ঞান খুবই কম। কল্পনার সহায়তায় সেই ফাঁকগুলি পূর্ণ করে আমার এই কাহিনী হয়তো আরো সংলগ্ন করা যায়, কিন্তু সে রকম কিছু করার বাসনা আমার নেই, শুধু যেটুকু জানি, সেইটুকুই লিপিবদ্ধ করাই আমার অভিলাষ।

বহুদিন আগে The Moon & Six pence নামক উপন্যাসটি রচনা করেছিলাম। সেই কাহিনীর ভিত্তিতে ছিল প্রখ্যাতনামা ফরাসী চিত্রকর পল গ'গার জীবন-কাহিনী। তাঁর জীবন-কাহিনীর তথ্যাবলী প্রচুর ছিল না, তাই ঔপন্যাসিকের বিশেষ অধিকারের সুযোগ নিয়ে তাঁর চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য কল্পনার তুলিতে অনেক ঘটনাবলী আমি উদ্ভাবন করেছিলাম, কিন্তু এই কাহিনীটিতে সেই জাতীয় কোন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টাও করিনি। কোন তথ্যই উদ্ভাবন করিনি। যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁদের অস্বস্তি ও অশান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের চরিত্রাবলীর কাল্পনিক নামকরণ করেছি, আর তাঁদের যাতে সহজে কেউ চিনতে না পারেন বিশেষভাবে তার জন্যে চেষ্টা করেছি।
যে-ব্যক্তিটির কথা এই কাহিনীর বিষয়বস্তু, তিনি তেমন খ্যাতিমান নন; কোনদিন হয়ত তেমন প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন না, নদীর বুকে পাথরের ঢেলা ছুঁড়ে ফেলে দিলে, মাটির বুকে যেমন সে কোন চিহ্নই রাখে না, তেমনই যেদিন এই ব্যক্তিটির জীবনাবসান ঘটবে, পৃথিবীর বুকে তিনি এতটুকু দাগ রেখে যেতে পারবেন না। এই কারণেই আমার এই গ্রন্থ যদি কেউ একান্তই পাঠ করেন, তা শুধু কাহিনীর নিজস্ব আকর্ষণে—আর কোন কারণে নয়। কিন্তু আমার এই কাহিনীর নায়ক যে বিচিত্র জীবনধারা নির্বাচন করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর চরিত্রের অপূর্ব মাধুর্য ও দৃঢ়তা হয়ত তাঁর সমকালীন মানব জাতির মনে চির-বর্ধমান প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হবে, হয়ত তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে জানা যাবে যে, এই যুগে এই পৃথিবীতেই এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তখন স্পষ্টই বোঝা যাবে, কার জীবনের উপাখ্যান নিয়ে আমি এই কাহিনী রচনা করেছি এবং যাঁরা তাঁর প্রথম জীবনের কথা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হবেন, আমার এই কাহিনীর ভিতরেই তাঁদের সেই আগ্রহের পরিতৃপ্তি হবে। আমার মনে হয়, আমার এই কাহিনী বহুবিধভাবে সীমাবদ্ধ হলেও এই কাহিনীর যিনি নায়ক, আমার সেই বন্ধুটির ভবিষ্যৎ জীবনীকারদের পক্ষে একটা মূল্যবান উপাদান বিবেচিত হবে।

যেসব কথোপকথন আমি লিপিবদ্ধ করেছি, তা যথাযথভাবেই যে লিখিত হয়েছে, একথা আমি বলতে চাই না। সময় সময় বিভিন্ন ঘটনাসূত্রে যেসব কথাবার্তা হয়েছে, আমি তার লিখিত বিবরণ রাখিনি, তবে নিজস্ব ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর, আর যদিচ আলাপ-আলোচনাগুলি আমার স্বকীয় ভাষাতেই লেখা হয়েছে, তবু তা যেমনটি বলা হয়েছে বলে মনে করেছি, সেইভাবেই লিখেছি। কিছু পূর্বেই আমি বলেছি যে, কল্পনার সাহায্যে আমি কিছুই উদ্ভাবন করিনি, এইখানে সেই বক্তব্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করছি—হেরোডটসের সময় থেকে ঐতিহাসিকগণ যে-স্বাধীনতা গ্রহণ করে আসছেন, আমিও সেই স্বাধীনতা গ্রহণ করে চরিত্রাবলীর মুখে বিভিন্ন কথা বসিয়েছি, যা আমি হয়ত শুনিনি বা শোনা সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিকরা ঠিক যে কারণে এই কার্য করেছেন, আমিও সেই কারণেই সম্ভাব্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীর মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করার উদ্দেশ্যেই এই সুযোগ নিয়েছি, নতুবা কাহিনীর সার্থকতা থাকতো না। আমি চাই কাহিনীটি পঠিত হোক, তাই এই কাহিনী পঠিতব্য করার জন্য যেটুকু করেছি, আশা করি, তা হয়ত যুক্তিসঙ্গত হয়েছে, বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই বুঝবেন, কোথায় এই কৌশল আমি প্রয়োগ করেছি, আর তিনি তা স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ না করে বর্জন করতে পারেন।

যেসব পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে আমার এই কাহিনী, তাঁরা প্রধানত আমেরিকান, আমার সংশয়ের এটি অন্যতম কারণ। মানুষকে চেনা খুবই কঠিন ব্যাপার—আর স্বদেশবাসী ভিন্ন অন্য দেশবাসীকে জানা আরো কঠিন। কারণ নর ও নারী স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী নয়, তারা যে অঞ্চলের অধিবাসী, যে শহর বা বাড়িতে বিচরণ করতে শিখেছে, শৈশবে যেসব খেলা করেছে, যেসব গল্প ও কাহিনী শুনেছে, যে-আহার্য গ্রহণ করেছে, যে-বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেছে, যেসব খেলাধুলো দেখেছে, যে-কবির কাব্য পাঠ করেছে, যে-দেবতায় বিশ্বাসী—এই সব জড়িয়ে সামগ্রিক বিচার করলেই নরনারীর চরিত্র সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

এই সব বস্তুগুলি একত্রে মিলে নরনারীর প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে—আর এই সব বিষয় আপনি লোকমুখে শুনে অনুমান করতে পারেন না, যদি এই সবের ভিতর জীবন কাটিয়ে থাকেন, তবেই তা জানতে পারবেন। আপনিও যদি তা-ই হন, তবেই এদের বুঝবেন। আর যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টি ব্যতীত বিদেশবাসীকে বোঝা কঠিন, সেই কারণে বইয়ের পাতায় তাদের প্রত্যয়যোগ্য চিত্র রচনা করা সহজসাধ্য নয়। এমন কি, হেনরী জেমসের মত ব্যক্তি, যিনি চল্লিশ বছর ইংলণ্ডে ছিলেন, তিনিও পুরোপুরি ইংরেজ-চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি। লোক হিসাবে আমিও কয়েকটি ছোট গল্প ভিন্ন বিদেশী চরিত্র নিয়ে আর কিছু করতে সাহসী হইনি, আর তাও করেছি, তার কারণ ছোট গল্প সংক্ষেপে সারা সম্ভব। মোটামুটি একটা ইঙ্গিত দিয়ে বিস্তারিত অংশটুকু পূরণ করার ভার পাঠকের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, পল গ'গাকে ইংরেজ হিসাবে যদি আঁকা হয়ে থাকে, তাহলে এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের বেলাতেই বা তা করলাম না কেন। উত্তরটি অত্যন্ত সাধারণ, আমি তা পারিনি, সক্ষম হইনি, তাহলে ওরা যে রকমের, ঠিক সেইমত আঁকতে পারতাম না, আমি অবশ্য বলতে চাইনে যে, ওরা আমেরিকানদের নিরিখ হিসাবে আমেরিকান হয়েছে, ওদের ইংরেজের দৃষ্টিতে আমেরিকান হিসাবে আঁকা হয়েছে। ওদের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য অঙ্কনের জন্য অবশ্য আমি চেষ্টা করিনি।

আমেরিকার ভাষায় দক্ষতা প্রদর্শন করতে ইংরেজ সাহিত্যিকবৃন্দ যে খিচুড়ীর সৃষ্টি করেন, তা শুধু ইংরেজি ভাষা ইংলণ্ডে যেভাবে কথিত হয়, মার্কিণ সাহিত্যিকদের তদনুরূপ প্রকাশ চেষ্টার সঙ্গেই তুলনীয়। প্রচলিত কথ্য ভাষায় সবচেয়ে মারাত্মক। হেনরী জেমস তাঁর ইংরেজি গল্পগুলিতে এই চলতি কথ্য ভাষার নিয়তঃই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা চলতি কথার আবহাওয়া সৃষ্টি না হয়ে ইংরেজ পাঠকের মনে এক অস্বস্তিকর অস্বাচ্ছন্দ্যতার উৎপত্তি হয়।

(২)

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দূর প্রাচ্যে ভ্রমণ-পথে শিকাগোয় দু-তিন সপ্তাহের জন্য ছিলাম—এ-কাহিনীর সঙ্গে অবশ্য সেই অবস্থানের কোনও সংস্পর্শ ছিল না। সেই সময় আমার একখানি সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস অত্যন্ত খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছিল, তাই ওদেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদসেবীরা সাক্ষাৎকার করলেন, আর সেই সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। পরদিন প্রাতে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল, উত্তর দিতেই শোনা গেলঃ

—এলিয়ট টেম্পলটন কথা বলছি।

—এলিয়ট? আমি ভেবেছিলুম, তুমি প্যারীতে আছ।

—না, আমার বোনের সঙ্গে এখানেই এসেছি, আজ আমাদের সঙ্গে একত্রে লাঞ্চে এসো না, আমাদের একান্ত বাসনা।

—স্বচ্ছন্দে।

সময় ও ঠিকানা জেনে নিলাম।

এলিয়ট টেম্পলটনকে পনের বছর ধরে জানি। —এই সময় ও পঞ্চাশের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, দীর্ঘকায়, সুদর্শন ও সুপুরুষ, মাথায় তরঙ্গায়িত ঘন কৃষ্ণ চুল, মাঝে মাঝে দু-চারটি পাকা চুলের চাকচিক্যে আকৃতির বৈশিষ্ট্য বর্ধিত হয়েছে। সর্বদাই এলিয়ট সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকতো। ওর পোষাকের খুঁটিনাটি অন্যত্র তৈরি হলেও স্যুট, জুতা, টুপী প্রভৃতি লণ্ডনেই প্রস্তুত করানো হত। প্যারীর ফ্যাশনদোরস্ত রাস্তার রু সেণ্ট গুইলায়ুমের রিভে গসের ওপর ওর একটা বাড়ি ছিল। যাঁরা ওকে পছন্দ করত না, তারা ওকে বলত ব্যবসাদার ও দালাল। অত্যন্ত ঘৃণাভরে কিন্তু এই বদনামে ও আপত্তি জানাত। লোকটির রুচিজ্ঞানও ছিল। অতীতে প্যারীর যেসব ধনী সংগ্রাহক চিত্রাদি সংগ্রহ করতেন, তাঁদের এলিয়ট একদা যথোচিত মূল্যবান উপদেশ দিত, একথা সে স্বীকার করত। সামাজিক যোগসূত্রে কখনও যদি তার কানে যেত, কোন সম্ভ্রান্ত ফরাসী বা ইংরেজ সংগ্রাহক কোনও ছবি বিক্রী করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখনই যেসব আমেরিকান মু্যজিয়ম ফরাসী শিল্পীদের ছবি সংগ্রহে আগ্রহশীল, এলিয়ট উদ্যোগী হয়ে এঁদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিত। অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য হয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অনেক প্রাচীন পরিবার তখন বুলের নামাঙ্কিত কোন চিত্র, বা স্বয়ং-রিপেণ্ডেলের তৈরি রাইটিং টেবল প্রভৃতি সম্ভব হলে নিঃশব্দে বিক্রয়ের জন্য সচেষ্ট থাকতেন, আর এই ব্যাপারে এলিয়টের মত একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন মার্জিতরুচির ভদ্রলোকের সাহায্যে তাঁরা খুশীই হতেন। স্বভাবতঃই অনেকে মনে করতেন এলিয়ট এতদ্দ্বারা লাভবান হচ্ছে, কিন্তু শালীনতার খাতিরে কেউই সেকথা উচ্চারণ করতেন না। নির্দয় লোকে বলাবলি করত, ওর বাড়ির সব কিছুই বিক্রয়ার্থে রক্ষিত, আর ধনী আমেরিকানদের সুচারু ভোজে নিমন্ত্রণ করে—উৎকৃষ্ট পানীয় সহযোগে আহারাদির পর ঘরের দু-একটি মূল্যবান আসবাব সরে যেত দামী জিনিসের পরিবর্তে তুচ্ছ বস্তু তার স্থান অধিকার করত। কেউ যদি জানতে চাইত অমুক দ্রব্যটি কোথায় গেল, এলিয়ট বলতো, জিনিসটা তেমন উচ্চাঙ্গের ছিল না, তাই তার বিনিময়ে একটা মূল্যবান বস্তু সংগ্রহ করে এনেছে। তারপর বলতো, সর্বদাই এক জিনিস দেখা বড়ই ক্লান্তিকর। বলতো.........“Nons antres Americains”—আমরা, আমেরিকানরা সর্বদাই নূতনত্বের পক্ষপাতী, এটা আমাদের চরিত্রের দৌর্বল্য, আবার দৃঢ়তাও।

যেসব আমেরিকান মহিলা প্যারীতে থাকতেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যাঁরা তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলে পরিচয় দিতেন, বলতেন—এলিয়টের পরিবারবর্গ বেশ দরিদ্র, ও যেরকম চালে থাকে, তা শুধু অত্যন্ত চতুর বলেই পারে। ওর যে কি পরিমাণ অর্থ-সামর্থ্য আছে, তা আমার অবশ্য জানা ছিল না, তবে ওর বাড়িওয়ালা যে ওর মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত মনোরম বাড়িটির জন্য বেশ উপযুক্ত ভাড়াই নিতেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। দেয়াল গাত্রে ওয়াতু, ফ্রাগোনার্ড, ক্লড লোরেন প্রভৃতি ফরাসী শিল্পীদের ছবি টাঙানো থাকতো; ঘরের মেঝেতে সাভোনেরী ও অবুসনের সুদৃশ্য রাগ বিছানো, আর ড্রয়িং-রুমে যে লুই কুইনজ-স্যুট সাজানো ছিল, তার এমনই বৈচিত্র্য যে তা দেখলে মনে হত এই দ্রব্য এককালে মাদাম পম্পাডোরের সম্পত্তি ছিল, এলিয়টও তাই বলত। যাই হোক, অর্থ উপার্জনে চেষ্টিত না থেকেও এলিয়ট যাকে বলে ভদ্রভাবে থাকা, সেই ভাবেই যথোচিত মর্যাদায় দিন কাটাত। আর কিভাবে সে অতীতে দিন কাটিয়েছে জানবার আগ্রহ থাকলে, যদি বন্ধুবিচ্ছেদের বাসনা না থাকে তাহলে ওকে সে বিষয়ে প্রশ্ন না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এইভাবে স্থূল বিষয়ের দায় থেকে মুক্ত থাকার ফলে ওর জীবনের সর্বপ্রধান কামনা হয়ে উঠেছিল বড় ঘরের সঙ্গে মেলা মেশার জন্য সামাজিক সখ্য স্থাপন। এই সব ঘুনধরা বনেদি বংশের ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে ব্যবসাগত সংযোগের ফলে য়ুরোপে পদার্পণ করার সময় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদের ওপর উৎকৃষ্ট পরিচয় পত্র পাওয়া যেত। নিজস্ব বংশ পরিচয়ে সম্পন্ন মার্কিন মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশারও সুযোগ গ্রহণ করত, এলিয়টের মাতামহ গোষ্ঠীর জনৈক পূর্বপুরুষ নাকি স্বাধীনতা ঘোষণার সনদে সই করেছিলেন। এলিয়ট ছিল জনপ্রিয় ও চাকচিক্যময়। ভাল নাচতে পারত, টেনিস খেলতে পারত, যে কোনো দলে ও ছিল সম্পদ বিশেষ। ফুল বা বহুমূল্য চকোলেট উপহার দিতেও ছিল মুক্তহস্ত, আর যদিও এলিয়ট কালেভদ্রে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করত, সেটা এমনভাবে করত যে সবাই প্রীত হত। এই সব ধনী রমণীদের কাছে সোহো বা ল্যাটিন কোয়ার্টারের বোহিমিয়ান রেস্তোরায় যাওয়াটা বিশেষ আমোদজনক মনে হত। এলিয়ট সর্বদাই নিজেকে পরের প্রয়োজনের জন্য তৈরী রাখত, আর কেউ তাকে কিছু করতে অনুরোধ করলে যতই বিরক্তিকর হোক, এলিয়ট তা সানন্দে সম্পাদন করত। বয়স্কা রমণীদের জন্য ও বিশেষ কষ্টস্বীকার করত,—আর শীঘ্রই ও ami de la maison, —বা গৃহপালিত পোষ্যের সামিল হয়ে উঠত, অনেক বড় বড় প্রাসাদেই ওর ঘরোয়া-ব্যক্তির সমাদর মিলত। ওর ভব্যতা ছিল চূড়ান্ত, সর্বদাই সকলকে সন্তুষ্ট করত—এমন কি বুড়িদের কাছেও এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ না করে ও মধুর ব্যবহার করত।

শরৎকালের শেষের দিকটায় এলিয়ট লণ্ডনের ‘কানট্রি ক্লাব’গুলিতে একটি চক্কর দেওয়ার জন্য লণ্ডনে যেত আর প্যারীতেই ও এক রকম থিতু হয়ে গিয়েছিল। এই দু জায়গাতেই —দুই বা ততোধিক বছরের ভিতর তরুণ আমেরিকানের পক্ষে যাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা উচিত, এলিয়ট তাদের সবাইকেই জানত। যে সব মহিলারা ওকে সর্বপ্রথম সমাজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তারা ওর পরিচিতদের সংখ্যা এইভাবে বর্ধিত হতে দেখে বিস্ময়বোধ করত। তাদের মনোভাব অবশ্য একটু মিশ্রিত ধরণের। একদিক দিয়ে তাঁরা প্রসন্ন হতেন এই ভেবে যে, তাদেরই সুপারিশে দিন দিন ওর কি পরিমাণ সাফল্য ঘটছে অপরদিকে বিস্মিত হয়ে ভাবতেন যে সব ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়বর্গের সংযোগ অত্যন্ত মৌখিক ধরণের সেখানে এলিয়টের পক্ষে এত ঘনিষ্ঠতা কিভাবে সম্ভব! যদিও এলিয়ট তাঁদের যথাসাধ্য তোষণ করেই চলত তবু তারা এই ভেবে একটু অস্বস্তিবোধ করতেন যে এলিয়টকে হয়ত তাঁদের সামাজিক মর্যাদায় ওপরে ওঠবার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ভয় হতো, ও হয়ত ‘স্নব’, সত্যই ও ‘স্নব’ ছিল, প্রকাণ্ড ‘স্নব’, লজ্জাহীন ‘স্নব’। যে কোনো তিরস্কার, লাঞ্ছনা বা অশিষ্টতা অম্লানবদনে সহ্য করে ও যে পার্টিতে যাবার ঝোঁক হত, তারই প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করত বা কোনো খ্যাতিসম্পন্ন ধনী বিধবার সঙ্গে সামাজিক যোগ রাখার জন্য চেষ্টা করত। এসব বিষয়ে ওর ছিল অক্লান্ত উৎসাহ। কোনো শীকারের ওপর নজর পড়লে অপূর্ব অধ্যবসায় নিয়ে ও তার পিছনে লাগত,

—বন্যা, ভূমিকম্প, জ্বর বা শত্রুভাবাপন্ন দেশীয় লোকদের ভিতর গিয়ে জীবন উপেক্ষা করে ভূতত্ত্ববিদ যেমন অধ্যবসায়ের সংগে কাজ করেন—এসব বিষয়ে ওরও ছিল সেই ভূতত্ত্ববিদের অধ্যবসায়।

১৯১৪-এর যুদ্ধে ওর চূড়ান্ত সুযোগ মিলল। যুদ্ধ সুরু হওয়ার সংগে একটা এম্বুল্যান্স দলে ভিড়ে ও গ্রামে ফ্ল্যাণ্ডার্স ও পরে আর্গণের যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেল। এক বছর পর 'বার্টন হোলে' একটা লাল, রিবণ সংগ্রহ করে ও প্যারীর রেড ক্রসে একটা উপযুক্ত পদ নিয়ে ফিরে এল। ইতিমধ্যে ওর অবস্থাও ভালোই ছিল, তাই পদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা সংগঠিত ও প্রয়োজিত ব্যাপারে ও মুক্ত হস্তে চাঁদা দিত। যেসব অবৈতনিক সাহায্য ব্যবস্থায় প্রচণ্ড প্রচার ব্যবস্থা ছিল, সেইসব ক্ষেত্রে অপূর্ব সংগঠনী শক্তি ও রুচি নিয়ে এলিয়ট গিয়ে যোগ দিত। প্যারীর দুটি বিশিষ্ট ক্লাবের সদস্য হল এলিয়ট, ফ্রান্সের নামকরা মহিলাদের কাছে ও ছিল ce cher Elliot—এলিয়ট জাতে উঠে গেল। (ক্রমশঃ)

# বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের ও ভিতরের বিপদের বিষয় আমরা বার বার আলোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিয়াছি। আমরা সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছি—"লড়কে" ও "মারকে" পাকিস্থান প্রতিষ্ঠাই যাহারা চাহিয়াছিল, তাহারা যে পশ্চিমবঙ্গের ও "সমৃদ্ধ বন্দর" কলিকাতার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাতে বিরত হইয়াছে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, তাহা কত সত্য তাহা একই দিনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ৩টি সংবাদে প্রতিপন্ন হইবে—

(১) কলিকাতার রাজপথে ডাকাইতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পুলিশ হলওয়েল লেনে (মীর্জাপুর—দপ্তরীপাড়া) মুসলমান গুণ্ডাদিগের গৃহ হইতে ৪ জন প্রাপ্ত বয়স্কা হিন্দু বালিকার ও ২ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হিন্দু বালকের উদ্ধার সাধন করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে রাত্রি প্রায় ১০টার সময় কোন ব্যবসায়ীকে ছোরা লইয়া ৩ জন লোক আক্রমণ করিয়া আড়াই হাজার টাকা কাড়িয়া লয়। সেই সম্পর্কে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানার দারোগা, আক্রমণকারীদিগের সর্দার সন্দেহে একজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে। থানাতল্লাসের সময় পুলিশ ঐ ৪ জন বালিকাকে ও ২ জন বালককে উদ্ধার করে। যে মুসলমানটিকে গ্রেপ্তার করা হয়, ২৬শে তারিখে সে পুলিশের হেপাজত হইতে পলায়নের চেষ্টাও করিয়াছিল।

(২) গত ২৬শে জুন প্রধানতঃ মুসলমান কর্তৃক অধ্যুষিত হাওড়ার একটি কারখানা অঞ্চল হইতে পুলিশ ১৮ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা ৪ জন হিন্দু নারীর উদ্ধার সাধন করিয়াছে। পূর্বদিন একজন হিন্দু নারীর উদ্ধার সাধন হইলে তাহার নিকট সংবাদ পাইয়া হাওড়া পুলিশ থানাতল্লাস করে। সে সংবাদ দেয়, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় ও তাহার পরে বলপূর্বক তথায় নীতা আরও হিন্দু স্ত্রীলোক ঐ অঞ্চলে রহিয়াছে। সংবাদদাত্রী স্বয়ং হাঙ্গামার সময় বিপন্না হইয়াছিল। সে কলিকাতায় তাহার বিমাতার সহিত বাস করিত। তাহার স্বামী হাওড়ায় কোন মুসলমান প্রধান পল্লীতে বাস করিত। সে হাঙ্গামার সময় গ্রেপ্তার হয়। তখন মুসলমানরা স্ত্রীলোকটিকে বলপূর্বক বেলিয়াঘাটায় লইয়া যাইয়া তাহার সব অলঙ্কার কাড়িয়া লয়। তাহার সঙ্গে একটি ৪ বৎসর বয়স্ক বালক ছিল। স্ত্রীলোকটিকে যখন বেলিয়াঘাটা হইতে হাওড়ায় আনা হয়, তখন আর বালকটির সন্ধান পাওয়া যায় নাই—সম্ভবতঃ তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। গত ২৬শে জুন তাহার স্বামী বৈষ্ণবপাড়া (শিবপুর) অঞ্চলে যাইয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পায়। সে স্ত্রীকে উদ্ধার করিবার জন্য চীৎকার করিতে থাকে এবং কতকগুলি লোক আসিয়া তাহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়—পুলিশও আসিয়া পড়ে। ততক্ষণে কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে সরাইয়া ফেলা হয়। বহুক্ষণ অনুসন্ধানের ফলে তাহাকে একটি ঘরে কাপড় ও শয্যার মধ্য হইতে উদ্ধার করে। তাহারই প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর করিয়া পুলিশ আরও ৪ জন হিন্দু স্ত্রীলোকের উদ্ধার সাধন করে।

(৩) গত ২৬শে জুন ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধী কার্যের অভিযোগে পুলিশ কলিকাতায় ৭ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগের মধ্যে একজন পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। বেলগাছিয়ায় জীবনকৃষ্ণ রোডে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া একখানি মোটর গাড়ী, ২ খানি ভোজালী ও একটি রিভলবারের খাপ পায়। সহর হইতে বহিষ্কৃত একজন গুণ্ডাকেও তথায় পাওয়া যায়।

কলিকাতায় ও হাওড়ায় যে সকল বস্তী হাঙ্গামার সময় পুলিশের বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল, সেই সকল বস্তীতে যদি আজও এইরূপে হিন্দু নারী ও বালক অবৈধভাবে রাখা মুসলমানদিগের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে পূর্ববঙ্গে অবস্থা কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় হিন্দু লাঞ্ছনার পরে গান্ধীজী যখন ঐ সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তখন ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন যে, সহস্র সহস্র হিন্দু নারীকে বোরকায় ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে, তাহারা জীবিত অবস্থায় পলে পলে দগ্ধ হইতেছে, তাহাদিগের উদ্ধার সাধনের উপায় কি? উপায় হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, যে সকল মুসলমান ঐ সব কাজ করিয়াছে, তাহাদিগের হীন মনোভাব। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, দেশ বিভক্ত হইবার পূর্বে বাঙলার মুসলীম লীগ সরকার কি এইরূপ পাপে লিপ্ত ছিলেন না? দেশ বিভক্ত হইবার সময় কলিকাতায় আশ্রয় কেন্দ্রে রক্ষিত বহু হিন্দু বালক-বালিকাকে যে মুসলমান পরিচয়ে পাকিস্থানে প্রেরণের আয়োজন হইয়াছিল এবং শিয়ালদহে ও দমদমে রেল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছিল, সে কাজ কি মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের দায়িত্বে হয় নাই?

এই সকল বিবেচনা করিয়াই আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বলিয়াছি, হায়দরাবাদে যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে সতর্কতার প্রয়োজন যে আরও বর্ধিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিমণ্ডল আশ্বাস দিয়াছিলেন, হাঙ্গামার জন্য হিন্দুরা যে সকল গৃহ মুসলমানদিগকে এবং মুসলমানরা যে সকল গৃহ হিন্দুদিগকে বিক্রয় করিয়াছেন, সে সকল পূর্বাধিকারীদিগকে প্রত্যর্পণের চেষ্টা হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ফলে দপ্তরীপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল হিন্দু শূন্য হইয়াছে, সুতরাং গুণ্ডারা অবাধে সে সকল স্থানে তাহাদিগের দুরভিসন্ধিমূলক কাজ করিতে পারে। আর পুলিশও যে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখে না। তাহা উল্লেখিত ঘটনাগুলিতেই বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে পুলিশের কাজও প্রশংসনীয় বলা যায় না। গভর্নরের মতন এখন কলিকাতার পুলিশ কমিশনারও "সাংবাদিক সম্মিলন" আরম্ভ করিয়াছেন। সে সম্মিলনে পুলিশের দ্বারা পুলিশের প্রশংসা কীর্তনই হয়। আমরা কলিকাতায় দপ্তরীপাড়ায় যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে তাঁহার কৈফিয়ৎ কি, তাহা কি কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তাঁহার বিবৃতিতে দিবেন? আমরা কি আশা করিতে পারি যে, পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীকিরণশঙ্কর রায় এ বিষয়ে পুলিশের জ্ঞাতব্য কি তাহা লোককে জানাইয়া দিবেন?

বাঙলায় হাহাকারের উপশম লক্ষিত হইতেছে না। সেনাবলে "স্যাপারস এণ্ড মাইনার্স" কাজে যাহারা রত তাহাদিগের সংখ্যা কত এবং তাহাতে বাঙালীর অনুপাত কিরূপ সে সন্ধান কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাখেন? ইহারা সেনাদলের একটি বিরাট অংশ এবং ইহারাই সামরিক প্রয়োজনে পথ, সেতু ও বিনান ঘাঁটি নির্মাণ হইতে যাবতীয় কারিগরী কাজ করে। এই দল ৩টি ভাগে বিভক্ত--(১) বোম্বাই, (২) মাদ্রাজ, (৩) বাঙলা। বোম্বাই "স্যাপারস এণ্ড মাইনার্সের" কেন্দ্রী কার্যালয় কিরকীতে। তাহাতে কেবল বোম্বাইবাসী গৃহীত হয়; যদি লোকের একান্ত অভাব ঘটে, তবে পাঞ্জাবী শিখ তাহাতে স্থান পায়। মাদ্রাজী অংশের কেন্দ্রী কার্যালয় বাঙালোরে। তাহাতে কেবল মাদ্রাজীরই স্থান হয়। তৃতীয় অংশের নাম—"স্যাপারস অ্যাণ্ড মাইনারস, বেঙল।" এই নামটি বিদ্রূপাত্মক ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। কারণ, ইহার কেন্দ্রী কার্যালয় বাঙলায় নহে—রুরকীতে এবং এই দলের নাম "বেঙল" হইলেও ইহাতে বাঙালীর স্থান নাই; তাহার সর্বপ্রধান কারণ--ইহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাঙলা ভাষার স্থান নাই। যে সকল রসিক লোক ইহার "বেঙল" নাম দিয়াছিলেন, তাঁহারা লোককে ভুল বুঝাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই এরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল কি পশ্চিমবঙ্গে কোথাও "বেঙল" দলের কেন্দ্রী কার্যালয় আনিয়া দলে বাঙালীর স্থানকালের অবস্থা করিয়া বেকার সমস্যার অন্ততঃ কিছু সমাধান করিতে পারেন না?

সীমান্ত প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গে সামরিক প্রয়োজনে যেমন বহু পথ ও ঘাঁটি নির্মাণ করিতে হইবে তেমনই বেসামরিক প্রয়োজনেও বহু পথ ও সেতু নির্মাণ করিতে হইবে। সে সকলের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। এই সকল কাজে একজনও অবাঙালী নিযুক্ত হইবে না, এমন কথা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিতে পারেন না? সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা বড় বড় কথা শুনিতে পাই! কাজ কিছু হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহাতে যাহারা কুলী মজুরের কাজ করিয়াছে, তাহারা বাঙালী—না অবাঙালী? সেচসচিব কি জানেন যে, সে কাজে বাঙালীর দক্ষতা অসাধারণ এবং পূর্বে মাদ্রাজে বাঁধ নির্মাণ ও জলাশয় খননের কাজে বাঙলা (বিশেষ রাঢ়) হইতে শ্রমিক লইয়া যাওয়া হইত? আজ কি কারণে সে সব কাজে কেবল বাঙালী নিযুক্ত করা হয় না? কলিকাতা কর্পোরেশন এখন সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের কর্তৃত্বাধীন। তাহাতে কত হাজার উড়িয়া ও বিহারী কাজ করে তাহার হিসাব পাওয়া যাইবে কি? যাহারা কাজ করিতেছে, তহাদিগকে কর্মচ্যুত করিতে না বলিলেও একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, নূতন লোক নিয়োগকালে কেবল বাঙালীর নিয়োগ ব্যবস্থা করিলে তাহা কখনই অসঙ্গত হয় না।

বিহার সরকার বিহারী নিয়োগের জন্য টাটার বিরাট কারখানাকে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। পশ্চিমবঙ্গে পাটকল প্রভৃতিকে কি তাঁহারা অনুরূপ নির্দেশ দিতে পারেন না?

পশ্চিমবঙ্গে লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্যের অভাব যে মন্ত্রীদিগের ব্যবস্থার ত্রুটি সঞ্জাত জ্বালানী কয়লার সরবরাহে তাহা প্রতিপন্ন হয়। মধ্যে মধ্যে কয়লার অভাবে কোন কোন গৃহস্থ রন্ধন করিতে পারে না—আর চোরাবাজারে কয়লার অভাব হয় না। পূর্বে যখন কলিকাতার লোকসংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক ছিল না, তখন প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯০ খানি মালগাড়ী বোঝাই জ্বালানী কয়লা কলিকাতায় আসিত। সে হিসবে এখন প্রতিদিন ২ শত ৭০ খানি গাড়ী আনা প্রয়োজন। কিন্তু এখন বরাদ্দ ৪৫ খানি গাড়ী—বলা হইতেছে, তাহা বাড়াইয়া ৬০ খানি করা হইতেছে। কিন্তু গত ১৫ দিনের হিসাবে দেখা যায়, কোন দিন ১৭ খানি হইতে ৩০ খানির অধিক গাড়ী জ্বালানী কয়লা লইয়া কলিকাতায় আসে নাই। কেহ বলেন, মালগাড়ীর অভাব, কেহ বা বলেন, গাড়ী বোঝাই হইলেও লাইনে আটক থাকিতেছে আসিতে পারিতেছে না। কিন্তু এ সকল কথায় কি লোক ভুলিবে? পাটকলের জন্য কয়লা আনিতে তো কোন অভাব হয় না। যত অভাব কি জ্বালানী কয়লা আনিবার সময় আত্মপ্রকাশ করে? আর যে সকল খনিতে জ্বালানী কয়লা প্রস্তুত করা হয়, সে সকল এ দেশের লোকের—শ্বেতাঙ্গদিগের নহে। তবেই দেখা যাইতেছে, যত অসুবিধা ভোগ করে--ভারতীয় গৃহস্থরা আর ভারতীয় কয়লা খনির অধিকারীরা। কয়লা আছে, গাড়ী আছে—নাই কেবল ব্যবস্থা। সেজন্য যাঁহারা দায়ী তাঁহারা যদি ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হন, তবে তাঁহাদিগকে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক—কার্যভার ত্যাগ করিয়া তাহা যোগ্যতর লোককে দিতে হইবে।

সরবরাহ বিভাগে যে বিরাট ক্ষতির হিসাব দেওয়া হয়, তাহা কি সত্য সত্যই অনিবার্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে?

অব্যবস্থা কি কেবল জ্বালানী কয়লা সরবরাহেই লক্ষিত হয়? কাপড়ের ব্যাপারে কি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে? এ কথা কি সত্য নহে যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে কাপড় আসিয়াছিল, তাহার অনেকাংশ ২৪ পরগণা জিলায় দেওয়া হইয়াছিল এবং সীমান্ত জিলা ২৪ পরগণা হইতে যে বহু কাপড় বে-আইনী ভাবে পাকিস্তানে চালান গিয়াছে, তাহা সরকারও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রীরা লোককে সদুপদেশ দিতেছেন—উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে মৃত্যু অনিবার্য কিন্তু যাহারা উৎপাদন করিবে, তাহারা যদি জিজ্ঞাসা করে, উপযুক্ত আহারের অভাবে দেহ যখন দুর্বল তখন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক শক্তি কোথা হইতে আসিবে, তবে তাহারা কি উত্তর পাইবে?

কৃষিকার্যের জন্য সেচের ও সারের প্রয়োজন। সেচ ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নহে। মিশর প্রভৃতি দেশে সেচের জন্য পাম্প ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি সমবায় সমিতির মধ্যস্থতায় বা অন্য ব্যবস্থায় কৃষককে পাম্প দিবার কোন আয়োজন করিয়াছেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে শিশিরকুমার ঘোষের প্ররোচনায় জগদীশ্বর ঘটক নামক এক-জন বাঙালী উটজ শিল্পের জন্য ধান ভানা, দেশলাই প্রস্তুত করা প্রভৃতির জন্য অনেক অল্প মূল্যের কল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস, ঘটক কোম্পানীর সস্তা পাম্পও ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু পাম্পের গ্রাহক হইলে "মাস প্রোডাকশনে" অল্প মূল্যে তাহা পাইতে পারেন। সেই সকল পাম্প যদি তাঁহারা কৃষকদিগকে দিবার ব্যবস্থা করেন, তবে খাদ্যদ্রব্যাদি বৃদ্ধির উপায় হয়। এক সময় যে বাঙলায় কোন বা কোন প্রতিষ্ঠান শীত-কালে ইক্ষু মাড়াই কল ভাড়া দিয়া লাভবান হইতেন, তাহাও কৃষি বিভাগের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। এ সকল দিকে কি সরকারের দৃষ্টি পতিত হয় না?

হরিণঘাটায় বহুলোককে উদ্বাস্তু করিয়া বাঙলা সরকার জমি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কি হইয়াছে? তথায় যে বিরাট কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্র করিবার পরিকল্পনা লইয়া এ পর্যন্ত, বোধ হয়, ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং আরও ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বা অপব্যয় হইবে। তাহার ফল কি হইয়াছে? বাঙলার অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ-অজ্ঞ পাঞ্জাবী কয়জনকে তাহার কার্যভার দিয়া পোষণ করা হইতেছে। তাঁহারাও কি সরকারী চাকরীতে পশ্চিমবঙ্গের লোকের অর্থ পরম সুখে শোষণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন? আমরা বলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি যেভাবে কাজ চলিতেছে তাহার পরিবর্তন সাধন করিতে না পারেন, তবে ঐ স্থান ছাড়িয়া দিন—তাহাতে বহুলোকের বাসের ও চাষের ব্যবস্থা হইবে; লোকের অর্থের অপব্যয় নিবারিত হইবে; সরকারের ভাণ্ডারেও অর্থাগম হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ঐ পরি-কল্পনা কার্যে পরিণত করিয়া সমগ্র প্রদেশের উপকার করিবার মত লোকের অভাব নাই। কেবল তাঁহারা সরকারের নিকট পরিচিত নহেন; সরকার সেরূপ লোকের সন্ধান করেন না--সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদিগকে ভয় করেন।

গত বৎসর গোল আলুর বীজ ক্রয়ে ও সরবরাহে যে অবস্থা দেখা গিয়াছে, তাহার পরেও কি লোকের আর কৃষি বিভাগের কর্মচারীদিগের যোগ্যতায় আস্থা থাকিতে পারে? এবারও কি সেই অবস্থাই হইবে?

বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় ব্যবস্থা না হইলে পশ্চিমবঙ্গে মাছের চাষের উন্নতি সাধনে আবার এক বৎসর নষ্ট হইবে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, গত দশ মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন কোন স্থানে নদীতে মাছ "ডিম ছাড়ে" তাহার সন্ধানও লন নাই। যদি আমাদিগের এই বিশ্বাসই সত্য হয়, তবে সেজন্য যে সকল কর্মচারী দায়ী তাঁহাদিগকে অবসর দেওয়া কি প্রয়োজন নহে?

পশ্চিমবঙ্গে যদি এ বৎসরও কৃষি বিভাগের ত্রুটিতে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি না পায়, তবে আগামী বৎসর অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হওয়া অনিবার্য তাহা বিবেচনা করা হইয়াছে কি? একান্ত পরিতাপের বিষয় আমরা কোন দিকে তাহা বিবেচনার প্রমাণ পাইতেছি না।

কোন দিকেই পশ্চিমবঙ্গের লোক দেশের সহিত সহানুভূতির অভাবসম্পন্ন বৃটিশ সরকারের ব্যবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না। আর শাসনের ব্যয় ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতীয় সরকার জাতির উন্নতির জন্য উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। তাহা অক্ষমতার পরিচায়ক কি অন্য কারণে উদ্ভূত তাহা বলা যায় না।

বিলম্বে হইলেও যে ব্যবস্থা পরিষদে নূতন নির্বাচন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেজন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করাও হইয়াছে ও হইতেছে। সে তালিকা কিরূপ হইবে? তাহাতে কাহাদিগের নাম স্থান পাইবে? যাহারা ভারত-রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে, কেবল যে তাহারাই ভোট দিবার অধিকারী তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেরূপ লোকমাত্রই পশ্চিমবঙ্গে ভোটার হইতে পারেন না, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বহু অবাঙালীর অবস্থান। গত ২৫শে জুন শ্রীরামপুরে উড়িয়াদিগের এক সম্মেলন হয়। তাহাতে শ্রীশচী রাউত রায় বলেন, ভারতবর্ষ হইতে প্রাদেশিকতার বিষ বিদূরিত করিতে হইবে এবং তাহার স্থলে আন্তঃ প্রাদেশিক সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তিনি বলেন, বৃহত্তর কলিকাতার অর্থাৎ কলিকাতার উপকণ্ঠের সাড়ে ৪ লক্ষ উড়িয়ার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের লোকের স্বার্থই আপনাদিগের স্বার্থ বলিয়া বিবেচনা করা কর্তব্য এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকের পক্ষেও উড়িয়াদিগের নানা সমস্যা সম্বন্ধে সেইরূপ ভাব প্রদর্শন কর্তব্য। উড়িয়াদিগের সমস্যায় বাঙালীর হস্তক্ষেপ কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। কিন্তু বাঙালী যে উড়িয়াদিগের সহিত সম্প্রীতির অভাবের পরিচয় কোন দিন দেয় নাই, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? সে যাহাই হউক, বলা হইয়াছে বৃহত্তর কলিকাতায় উড়িয়া শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে ৪ লক্ষ। ইহার সহিত কলিকাতায় উড়িয়াদিগের সংখ্যা যোগ দিতে হইবে। বৃহত্তর কলিকাতায় এবং কলিকাতায় উড়িয়াদিগের মত বিহারীদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। আবার কলিকাতার ও কলিকাতার উপকণ্ঠের কলকারখানায় মধ্যপ্রদেশ হইতে আগত শ্রমিকের সংখ্যাও সামান্য নহে। এই লক্ষ লক্ষ লোক বাঙলার নহে—ইহারা বাঙলার floating population ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী হইতে পারে না। ইহাদিগের সেই অধিকার স্ব স্ব প্রদেশে। কলিকাতায় ও বাঙলার অন্যান্য স্থানে বহু মাড়বারী, কাচ্ছি, বোরা আছেন। তাঁহারা অনেকে বাঙলায় ব্যবসা ব্যপদেশে, গৃহ নির্মাণও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগেরও আনুগত্য পশ্চিমবঙ্গে নহে—তাহা বিভক্ত অর্থাৎ "divided allegiance।" পশ্চিমবঙ্গের ভোটার-তালিকায় তাঁহাদিগের নাম স্থান পাইতে পারে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ যাঁহাদিগের স্বার্থ কেবল তাঁহারাই কি পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যাপারে কাজ করিবার অধিকারী? শুনা যাইতেছে; অবাঙালী ব্যবসায়ীদিগের কোন প্রতিষ্ঠান হইতে একজন বাঙালী মন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। যদি তাহা হয়, তবে তাহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্যও যে থাকিতে পারে না, এমন নহে।

আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা প্রাদেশিকতার পরিচায়ক মনে করিলে অসঙ্গত হইবে। যতদিন প্রদেশ ভেদ থাকিবে, ততদিন প্রদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার সেই প্রদেশের অধিকারীদিগের থাকিবে। কারণ প্রদেশের শুভাশুভ তাহাদিগেরই শুভাশুভ এবং প্রদেশ যেমন তাহাদিগের, তাহারাও তেমনই প্রদেশের। তাহাদিগের অধিকার অন্যের প্রাপ্য হইতে পারে না।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে দিবার দাবীতে কংগ্রেসের বর্তমান পরিচালকগণ যেভাবে কংগ্রেসের নীতি ও প্রতিশ্রুতি বর্জন করিতেছেন, তাহাতে কুচবিহারকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া যে জনরব রটনা হইতেছে, তাহা বাঙালী ভিত্তিহীন বলিয়া নিশ্চিত উপেক্ষা করিতে পারে না। এ বিষয়ে ভারত সরকার কি কোন বিবৃতি প্রচার করিবেন?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব বহুমতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, আগামী বর্ষের আয় অপেক্ষা ব্যয় ৪৪ লক্ষ টাকা অধিক হইবার সম্ভাবনা। বর্তমান বৎসরের ঘাটতি ১২ লক্ষ টাকা, ট্রাইব্যুনালের নির্ধারণে বেতনাদি বৃদ্ধি ও দুর্মূল্য ভাতা যথাক্রমে সাড়ে ৩ লক্ষ ও ৫ লক্ষ ২৫ হাজার এবং সম্প্রসারণের ব্যয় ১৭ লক্ষ টাকা। অধ্যাপক সত্যেন্দ্র বসু প্রমুখ সিনেটের কয়জন সদস্য বাজেটের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন এবং উত্তরে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাজেট জাতিগঠনমূলক বাজেট। তিনি একথাও সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ইহাই স্বাধীন ভারতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাজেট। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই বাজেট গতানুগতিক ব্যবস্থার বাজেট—গঠনকার্যের জন্য শিক্ষার জাতীয় ভাব প্রবর্তনের কোন পরিচয় ইহাতে নাই। সম্প্রসারণের জন্য যে ১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার কতকাংশ ভারত সরকার প্রদান করুন বা না করুন তাহাতে—আপনাদিগের ভারত শাসন ও শোষণের জন্য ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার অভিপ্রায়ে ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন হইবে, এমন আশার অবকাশ নাই। জাতীয় শিক্ষা মানুষকে তাহাদিগের আপন আপন কাজের উপযোগী করে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে তাহা হয় না। আজ আমরা এদেশে যে সকল মনীষীর পরিচয় পাই তাঁহারা এই শিক্ষাপদ্ধতির ফল নহেঃ—তাঁহারা ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমেই নিয়মের পরিচয় সপ্রকাশ হয়। যে শিক্ষা সম্বন্ধে অরবিন্দ বলিয়াছেন, তাহার সৃষ্টি—

"an infallible engine of universal knowledge within"

তাহারই প্রবর্তন প্রয়োজন। তাহা না হইলে স্বাধীনতা পাইলেও তাহা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে।

সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত "মহাজাতি সদনের নির্মাণকার্য শেষ হয় নাই। এতদিনে কলিকাতা হাইকোর্টে সে গৃহের স্বামিত্ব সম্বন্ধীয় মামলা শেষ হইয়াছে। আমরা আশা করি, অতঃপর কে ইহার কাজ শেষ করিবার গৌরব লাভ করিবেন, তাহা লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে নিবৃত্ত হইয়া—যে সমিতির উপর সুভাষচন্দ্র সে ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহাকেই কাজ করিবার অবসর দিয়া আপনারা সেই কার্যে সর্ববিধ সাহায্য দিবেন।

## মদনমোহন তর্কালঙ্কার

**মদনমোহন** তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণী, বাসবদত্তা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া জীবনকালে কবি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া মেঘদূত, কুমারসম্ভব, দশকুমার চরিত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য সম্পাদন করিয়া রসিক ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার একমাত্র পরিচয় 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' কবিতাটি। স্বরচিত শিশু-শিক্ষা নামে বর্ণপরিচায়ক যে গ্রন্থে এই কবিতাটি সন্নিবেশিত সেই বইখানাও নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া লোপ পাইয়াছে—এতবড় যে পণ্ডিত তাঁহার একমাত্র চিহ্নস্বরূপ ওই শিশুরঞ্জক সরল কবিতাটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এ যেন ভীমসেনের কৌরব-নিধনশীল গদাটির আজ চিহ্ন নাই, আছে তাহার খেলাঘরের একান্ত বালককালের চুষিকাঠিখানা মাত্র। আবার মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের জীবন-কাহিনীও আজ অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এমন যে হইয়াছে, তাহার কারণ তিনি বিদ্যাসাগরের ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার ও বিদ্যাসাগরের জীবন সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশা হইতে অনেকদূর পর্যন্ত, অনেক কীর্তিকলাপের মধ্য দিয়া সমান্তরালভাবে চলিয়াছে, বৃহত্তর পুরুষের ঘনতর ছায়া মদনমোহনের উপরে পড়িয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়াছে, তাই আজ তাঁহাকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, মাঝে মাঝে বিদ্যা-সাগরের ব্যক্তিত্ব ও কীর্তির ফাঁকে ফাঁকে তাঁহাকে নজরে পড়ে মাত্র। ইতিহাস সর্বোত্তমকে মনে রাখে, দ্বিতীয়কে মনে রাখিবার স্থান তাহার সোনার তরীতে নাই। ইতিহাস নানা নমুনার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা গড়িতেছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ফলগুলিকেই সে রক্ষা করে—অপরগুলি কালের ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে স্থান পায়। মদনমোহনের জীবন ও কার্যকলাপ বিদ্যাসাগরের জীবন-পরিধি হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত হইলে অধিকতর উজ্জ্বলতায় এবং স্বকীয় মহিমায় হয়তো ভাস্বর হইয়া থাকিত। কিন্তু ঘটনা-চক্রের অমোঘ আবর্তনে তিনি আজ বিদ্যাসাগরের understudy বা অনুষঙ্গ মাত্র।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম ১৮১৭ সালে। ১৮২৯ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ বছরেই বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তারপরে দুইজনে একই শ্রেণীতে, একই বিষয়সমূহ পড়িতে পড়িতে ১৮৪২ সালে বিদ্যালয়-জীবন সমাপ্ত করেন। দুইজনেই জজ পণ্ডিতের সার্টিফিকেট পাইয়া-ছিলেন।

# প্র-না-বি-র এলবাম

### চিত্র-চরিত্র

তারপরে হিন্দু কলেজের সংস্কৃত পাঠশালা, বারাসত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি স্থানে মদনমোহন অধ্যাপনা করেন। মনে রাখিতে হইবে এই সব প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করিবার সময়ে সর্বদাই তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের ঘন বা ঘনতর ছায়ায় বাস করিতে হইয়াছে—সংস্কৃত কলেজে কাজ করিবার সময়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন কলেজের সহকারী সম্পাদক। ১৮৫০ সালে মদনমোহন শিক্ষা বিভাগ পরিত্যাগ করিলে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত এবং ১৮৫৫ সালে মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ সালে তাঁহার মৃত্যু। শিক্ষা বিভাগ ও কলিকাতা ত্যাগ করিবার পরে বিদ্যাসাগরের প্রভাব হইতে তিনি দূরে গিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু ততদিনে যৌবনের শক্তি অনেকটা হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে, কর্মোৎসাহেও ভাটা পড়িয়াছে এবং অবশেষে অকালমৃত্যু আসিয়া সমস্ত সম্ভাবনার অবসান ঘটাইয়া দিয়াছে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, মদন-মোহন স্বকীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার সমস্ত সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই।

মদনমোহনের নাম অপর যে দুটি মহৎ কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, সে দুটিতেও বিদ্যাসাগর স্ব-কালে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রয়াসের সহিত মদনমোহনের নাম জড়িত। ১৮৪৯ সালে বীটন (বেথুন) সাহেব কর্তৃক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (বর্তমান বেথুন কলেজ) স্থাপিত হয়। যে কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালী এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, তন্মধ্যে মদনমোহন একজন। "তিনি নিজের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বিনা বেতনে প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ের বালিকাদের শিক্ষাদান করিয়াছেন এবং শিশু-শিক্ষা রচনা করিয়া তাহাদের পাঠ্য-পুস্তকের অভাব অনেকটা মোচন করিয়াছিলেন।" তাহা ছাড়া স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকল্পে প্রবন্ধাদিও তিনি লিখিতেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলন বিষয়ে মদনমোহন যে বিদ্যাসাগরের সহায়ক ছিলেন, এমন মনে করিবার কারণ আছে। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও-শিষ্যগণ খুব সম্ভবত বিদ্যাসাগরের পূর্ব হইতেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত 'বেঙ্গল স্পেকটেটার' কাগজে বিধবা বিবাহ সমর্থক আন্দোলন আরম্ভ হয়। এমন কি 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' প্রভৃতি পরাশরী উক্তি ঐ কাগজেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী অনুমান করেন যে, বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন এই শ্লোকগুলি 'বেঙ্গল স্পেকটেটার' পত্রের লেখকদের হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়াছিলেন। একবার রাম-গোপাল ঘোষের 'লোটাস' নামক স্টীমারে রামগোপাল, রাজনারায়ণ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এখন শিবনাথ শাস্ত্রীর এই অনুমান কতদূর সত্য জানি না, তবে বিদ্যাসাগর-বান্ধব মদন-মোহনের পক্ষে বিধবা বিবাহের সমর্থক হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। 'লোটাস' স্টীমারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে মদনমোহনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একান্ত হৃদয়গ্রাহী। ঐটুকু পরিচয়ে রাজনারায়ণ বসুর পরিহাসের বিদ্যুৎ ঝলকে অন্তত একবারের জন্য, বিদ্যাসাগরের ছায়ায় আচ্ছন্ন মদনমোহনকে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে, চোখে পড়ে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া নয়, সমাজ-সংস্কারক বলিয়া নয়, নিতান্তই মানুষ বলিয়া মনে হয়, হাত বাড়াইয়া করমর্দন করিতে ইচ্ছা জাগে।

রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখিতেছেন যে, লোটাস-যাত্রিগণ মালদহে পৌঁছিয়া গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—"ঐ ভগ্নাবশেষ মালদহ নগর হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উহা দেখিতে নিবিড় বনাকীর্ণ, আমাদিগের সঙ্গে যে কয়েকটি বন্দুক ছিল, তদ্ব্যতীত আর কয়েকটি বন্দুক ও কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করা গেল। আমাদিগের সঙ্গে মালদহের তদানীন্তন সিভিল সার্জন সাহেব জুটিলেন, তাঁহার নাম এতদিন পরে স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় Dr. Elton হইবে। এক হস্তীর উপরে রামগোপালবাবু ও ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর উপরে আমরা সকলে চলিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন, কোট ও পেণ্টলুন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফর ফর করিয়া বাতাসে উড়িতেছে। দৃশ্যটি দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল। যাইতে যাইতে তর্কালঙ্কার হাতীর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। হাতীটি অতি সায়েস্তা ছিল। অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল। আর এক পা নিক্ষেপ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় চেপটিয়া যাইতেন।"

# বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

**··ভবঘুরে····**

## এ্যালুমিনিয়মের জুতো—

জার্মানীতে চামড়ার অভাব ঘটার ফলে—জার্মানরা বার্লিনের পথে—এলুমিনিয়মের তৈরী জুতো পায়ে হাঁটছে! কথাটা শুনে তাক লাগে বটে—কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তাই। জার্মান-প্রবাসী তিনটি আমেরিকান—এই ধাতব-পাদুকা

এ্যালুমিনিয়মে তৈরী এ জুতো

নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করেছেন—আবিষ্কারকর্তারা বলেছেন—যে এই জুতো কমসেকম ১০ বছর টিকবে এবং কালো বাজারে যে দামে চামড়ার জুতো বিক্রী হচ্ছে—তারচেয়ে ঢের সস্তাতেই এর পড়তা হবে। এই জুতো-গুলোর চেটো আর গোড়ালীটপ এ্যালুমিনিয়মের তৈরী আর ওপরের খোলসটা নকল চামড়ার তৈরী।

## কথা-কওয়া-চিঠি—

"কথা-কওয়া-চিঠি" সে আবার কি? অর্থাৎ চিঠিতে যা লিখতে চান—সেটুকু ইচ্ছে করলে ২ মিনিটের কথায় রেকর্ড করিয়ে পাঠাতে পারেন—আপনার চিঠির অপেক্ষায় যিনি বসে আছেন তাঁর কাছে। এই রেকর্ড-তৈরী করবার অটোম্যাটিক কল বসানো হয়েছে আমেরিকার কোনও কোনও যায়গায়। আপনি ঐ কলে সিকি ডলার ফেলে দিলেই—আপনা থেকে বেরিয়ে আসবে রেকর্ডের চাকতিটি—আর সামনের কাঁচের পর্দায় আলো জ্বলে উঠতেই দেখতে পাবেন—লেখা রয়েছে—কি করে ঐ কথা-কওয়া-চিঠিতে কথা কইতে হয় তারই প্রাঞ্জল নির্দেশ। মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলতে অনেকের ভয় হয়, তাই তার বদলে টেলিফোনের মত 'মাইক' লাগানো হয়েছে কলটিতে। আপনার চিঠির কথা যখন ২ মিনিটের মধ্যে রেকর্ড করা শেষ হবে তখন যদি গোপনীয় কথা হয় তবে ঐ টেলিফোনের মারফৎই শুনতে পাবেন যা যা বলেছেন। আর তা না হলে লাউডস্পীকারেও শুনতে পারেন—যেমন আপনার অভিরুচি। এই রেকর্ডগুলি ভাঙবার ভয় নেই—খুব হালকা—খামে পুরে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন—যার কাছে চিঠি লিখতে চান—তাঁর কাছে। তিনি সেটি তাঁর গ্রামোফোন মেশিনে লাগালেই শুনতে পাবেন—

চিঠিতে কথা বলছে
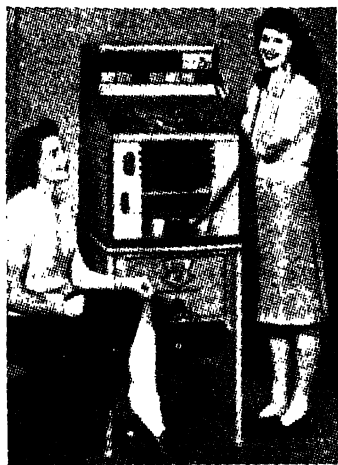
আপনার কথা। ভাবছেন কি মজা! কিন্তু ভাবুনতো আপিসের বড়বাবু কি ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি কথা-কওয়া-চিঠি পাঠান—তাহলে?

## পথচারীও হর্ন বাজাবে!

মোটরগাড়ীর ড্রাইভার এবং মোটর-মালিক যাঁরা গাড়ী চালান—তাঁরাতো কারণ অকারণে পথচারীদের কানের গোড়ায় ভ্যাঁক—ভ্যাঁক ভোঁক প্যাঁক—পোঁক কত রকম শব্দের শিঙা বাজিয়ে কেরামতী দেখান এবং রীতিমত

পথচারীর হাতে হর্ন

কতখানি যে বিরক্ত করেন তা আশা করি আপনারাও জানেন—কিন্তু এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা বা পাল্টা শোধ নেওয়ার ব্যবস্থায় কিছু করতে পেরেছেন কি? পারেন নি তো? বেআক্কেলে, ঐ সব মোটর-গাড়ী-চড়নে-ওয়ালাদের এই অত্যাচারের পাল্টা প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন পথচারীদের উপযোগী জোরালো এক হর্ন তৈরী করে—তিনি বে-আক্কেলে মোটর চালকদের পেছনে গিয়ে ঐ হর্ন বাজিয়ে কান ঝালাপালা করে জব্দ করে দিচ্ছেন। হর্নটি তৈরী করেছেন তিনি যুদ্ধে ব্যবহৃত কতকগুলো কলকব্জার টুকরো টাকরা আর দুটো মোটর বাসের হর্নের চোঙার সাহায্যে। এই হর্নটি হাতে করে হাঁটতে হয়, আর বেয়াড়া মোটর ড্রাইভার দেখলেই হাতলের কাছে যে ট্রিগার বা চাবিটা আছে সেটা চেপে ধরলেই ব্যাস—একেবারে ৫০০ পাউণ্ড বাতাসের চাপে পোঁ—ওঁ—ওঁ। এক মাইল পাল্লার জোর শব্দ! মোটর-গাড়ী-চড়নে-ওয়ালারা একেবারে জব্দ!

# শেভিয়ান ড্রামা

সমরেন্দ্রনাথ সেন শর্মা

সেক্সপীয়ারের পরবর্তী যুগ থেকে শুরু করে প্রায় তিনশ' বছর পর্যন্ত ইংরেজি নাটক মুমূর্ষু অবস্থায় কালাতিপাত করেছে। মাঝে মাঝে গোল্ডস্মিথ, ওস্কারওয়াইল্ড অথবা সেরিডনের দু'একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে বটে, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে বহু খ্যাতনামা অভিনেতা আত্মপ্রকাশ করলেও কোন বিখ্যাত নাট্যকারের আগমন হয় নি।

সেক্সপীয়ারের প্রতিভা এবং পিউরিটানিজমের উত্থানই সপ্তদশ শতকে সৌষ্ঠবপূর্ণ নাটক রচনায় প্রতিবন্ধক হয়েছে। একদিকে সেক্সপীয়ারের প্রতিভা তাদের অভিভূত করেছে, তেমনি পিউরিটানিজম্ রেখেছে তাদের দাবিয়ে। স্যার রবার্ট ওয়ালপোল বলেছেন, সপ্তদশ শতকের পর প্রায় দু'শ বছর পর্যন্ত ইংলণ্ডে চিন্তাশীল লেখকদের পরিবর্তে সাধারণ নাট্যকারদের ভীড়ই জমেছিল বেশী।

পরবর্তী যুগে সংস্কারক নাট্যকার হিসাবে যাদের আগমন, তারা সবাই বিষয়বস্তুর সারাংশ নিয়েছেন ফরাসী থেকে—যেমন নিয়েছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের শেষের দিকের নাট্যকারগণ। ইংরেজি নাট্যজগতে শ'র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি নাটক সস্তা মেলোড্রামা, য়্যাডাপটেসম্ এবং ফরাসী লেখক স্কাইব এবং সারডুর অনুকরণে লিখিত কৃত্রিম ঘটনাবিন্যাসে পুষ্ট হয়ে তখনকার রঙ্গমঞ্চকে একরকম বাঁচিয়ে রেখেছিলো। ফলে সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত রঙ্গালয়গুলোর এমন অধঃপতন ঘটলো যে এদের প্রধান লক্ষ্য হ'লো যৌন আবেদন. অবৈধ যৌন সংসর্গ ছিল শতকরা নব্বুইটি নাটকের বিষয়বস্তু। ১৮৯৫ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত নাট্যসমালোচক হিসেবে শ' সেযুগের ফ্যাশনেবল ড্রামার কঠোর সমালোচনা করলেন। তদানীন্তন রঙ্গালয়গুলির পক্ষে শ'র নাটকের শিল্প এবং মতবাদ এই দুই ছিল দুর্বোধ্য; সুতরাং অচল। ফলে প্রচলিত রঙ্গালয়গুলিকে আক্রমণ করা শ'র পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠল। এ আক্রমণ নিজের অধিকার বিস্তারের জন্য। শ' তার বর্মরূপে গ্রহণ করলেন ইব্‌সেনকে। পুরাতনপন্থী রঙ্গালয়গুলি ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছিল সেক্সপীয়ারকে। সেক্সপীয়রের যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ করা হোত রঙ্গালয়ের মালিকেরা তার গল্পাংশ বাদ দিয়ে সাজিয়ে নিত নিজেদের খুসী মত।

শ'র আক্রমণের ধারাটি মূলত তিনভাগে ভাগ করা যায়।

এক, শ' সেক্সপীয়রের তীব্র সমালোচনা করতে লাগলেন, বর্তমান যুগে তার শিল্প-দর্শনের অনুপযোগিতা সম্পর্কে। দুই, যারা সেক্সপীয়রের নাটকের অঙ্গচ্ছেদ করলো তাদেরও তিনি আক্রমণ করতে লাগলেন, সেক্সপীয়রের নাট্যশিল্পকে অপমান করার জন্যে। তিন, সেক্সপীয়রকে ইংরাজী মঞ্চ থেকে বিদায় করে সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন ইব্‌সেনকে—অর্থাৎ নিজেকে।

সেক্সপীয়রের শিল্পকে আক্রমণ কালে শ' প্রধানত দুইটি কারণ প্রয়োগ করলেন। প্রথম সেক্সপীয়রের ভাষা সংগীতধর্মী—চিন্তাধর্মী নয়, দ্বিতীয় কথা সেক্সপীয়রের কাছে মানব-প্রকৃতিই ছিল চরম। মানুষের চরিত্র চিত্রনই ছিল তাঁর শেষ কথা।

শ'র সমালোচনা সার্থক হোলো। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শেভিয়ান থিয়েটারের পত্তন হোল।

প্রথমে অবশ্য ইংলণ্ডের রঙ্গালয়ের পরিচালকবর্গ শ'র নাটকের সমাদর করেননি, তার কারণ সে যুগের রুচির সঙ্গে শ'র পার্থক্য ছিল অনেক। তখনকার নাটকগুলি রচিত হতো নিন্দা, একঘেয়ে সুর আর যৌন আবেদন নিয়ে। কিন্তু শ' চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করে তাঁর নাট্যে স্থান দিলেন সমাজ ব্যবস্থার কুৎসা, অপ্রচলিত দর্শন, আর রসাল কথোপকথন। শ'র নাটকের বড় কথা হল "উইট," ক্ষুরধার কৌতুকই শ'র বিশেষ অস্ত্র। তাই এগুলো সেযুগের রঙ্গমহলের মালিকদের সহজে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি।

শ' নিজে যেমন মৌলিক, তাঁর চিন্তাধারাও তেমনি মৌলিক। তিনি তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে গর্ব করে বলেছেন, আমি অন্যান্য লেখকদের মত ট্রাইফলকে ট্র্যাজেডি করিনি, ট্র্যাজেডিকে করেছি ট্রাইফল। জীবনের অশ্রুকে বুদ্ধির

চিরন্তন জি-বি-এস
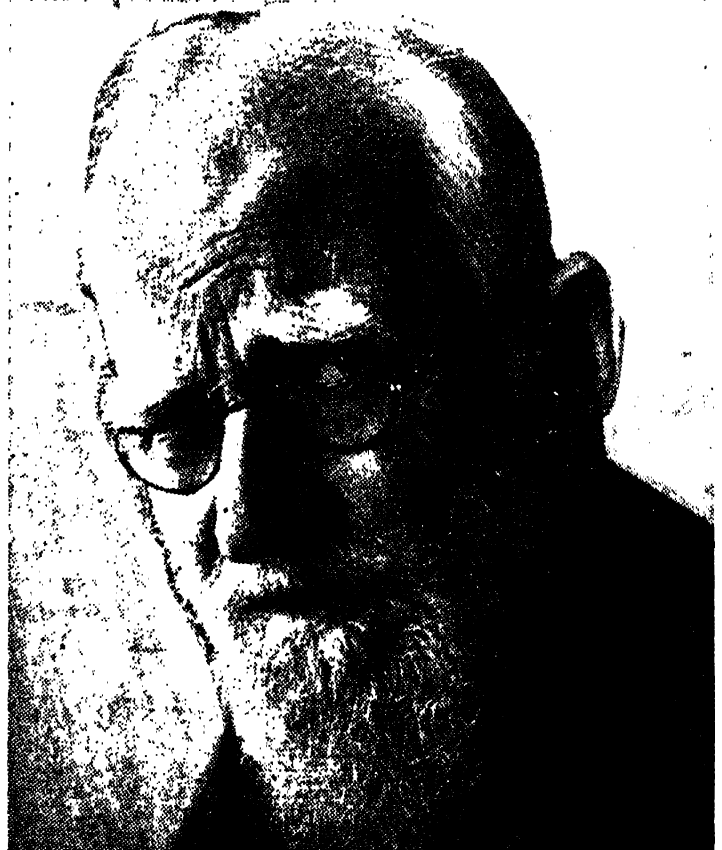
শ' নিজের "কপি" নিজেই টাইপ করতে ভালবাসেন

জারক রসে পরিশ্রুত করে জনসাধারণের কাছে বিতরণ করেছি হাস্যরূপে।

তখন ইংলণ্ডে নব নাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জেনেট আচার্চ ইব্‌সেনের রচিত নাটক ডল্‌স হাউস মঞ্চস্থ করেন। পুরোতন নাটক এবং মঞ্চের বিরুদ্ধে এই হ'ল সর্বপ্রথম কঠিন আঘাত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জ্যাকগ্রেণ এই নবনাট্য আন্দোলনের ধারা বহন করে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটার এবং তিনি মঞ্চস্থ করলেন ইব্‌সেনের বিখ্যাত নাটক ঘোস্টস্‌। কিন্তু ১৮৯২ সাল পর্যন্ত বিদেশী নাটক ছাড়া কোন দেশী নাটক এই আন্দোলনের উপকরণ হিসাবে পাওয়া গেল না। এই সময় শ'র নাটক "দি উইডোয়ার্স হাউসেস". গৃহীত হল মঞ্চস্থ করবার জন্য।

মিঃ গ্রেন নাটকটিকে অবিলম্বে মঞ্চস্থ করলেন রয়েলটি থিয়েটারে। নাটকটির বিষয়-বস্তু হোলো বর্তমান মূলধনী সমাজের একটি দিক; কাহিনীটি সংক্ষেপে এইঃ—

জার্মানীতে ভ্রমণকালে এক ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে এক ইংরেজ তরুণের পরিচয় হয় এবং পরিচয় থেকে প্রেম। তরুণী লাখপতির কন্যা। বিবাহের পূর্বে নায়ক জানতে পারে যে নায়িকার শিক্ষাদীক্ষা, বিলাসবৈভবের পিছনে রয়েছে বস্তির অসংখ্য দরিদ্র ভাড়াটের শোষণ অর্জিত দূষিত অর্থ। অর্থাৎ তরুণীর বাবা একজন বস্তির মালিক। তরুণের মনে বিদ্রোহ জেগে উঠলো, সে ঘোষণা করল যে, নায়িকাকে তার উপার্জিত অর্থের উপরই নির্ভর করতে হবে। শ্বশুরের এক কপর্দকও ছুঁতে পারবে না সে। তার বিবেকবুদ্ধি এবং রুচিতে বাঁধে এটা।

এখানেই নাটকের সংঘাত। এমন সময় অকস্মাৎ নায়কের বিবেকী আস্ফালন চুপসে গেল। সে আবিষ্কার করলো তার নিজের আয়ও এই বস্তির ওপর মর্টগেজ থেকে আসে। এইভাবে সংঘাতের হল শেষ, এবং নায়িকার সঙ্গে নায়কের হল পরিণয়।

নাটকটি যখন মঞ্চস্থ হল তখন সোস্যালিস্ট বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রশংসার আর সীমা রইল না। অপরপক্ষে সমস্যা—নাটকে অনভ্যস্ত সাধারণ দর্শকের পক্ষ থেকে এল ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, গোলমাল, গালাগাল। কেউ বলল এই নাটকে বস্তি-সমস্যাটিকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা অতিরঞ্জিত এবং দুষ্টকল্পনাপ্রসূত। আবার যারা শ'র আক্রমণের রীতির স্বরূপ ধরতে না পারল তারা শ'র এই আক্রমণকে পরাজয়—মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে উল্লেখ করলে। তাদের যুক্তি হল, তরুণ নায়কের কলুষিত সমাজকে মেনে নেওয়ার কাজটি পরাজয় এবং নতি স্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। নায়ক দুর্বল নইলে সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারত।

কিন্তু শ' সমাজের বিরুদ্ধে একক বিদ্রোহের পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ এমন কলুষিত যে, তার কলুষস্পর্শের হাত থেকে কারো অব্যাহতি নেই—আপাত দৃষ্টিতে যাদের বিশুদ্ধ বিবেকবান মনে হয়, তাদেরও না।

শ'র দ্বিতীয় নাটক "দি ফিলাণ্ডার"। এই নাটকে শ' তথাকথিত ইবসেনীদের বিদ্রূপ করেছেন যেমনটি তিনি পরবর্তীকালে করেছেন তথাকথিত বার্ণার্ড শ'র ভক্তদের, তাঁর "ডক্টর্স ডিলেমা" নাটকে।

"দি ফিলাণ্ডার" মঞ্চস্থ না হওয়ায় শ' লিখতে শুরু করলেন মিসেস্‌ "ওঅরেন প্রফেসন" নাটক। মিসেস্‌ ওঅরেনের পেশা হল গণিকাবৃত্তি। কেবল ব্যক্তিগত নয়, মূলধনী সমাজে সেই বৃত্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। প্রথমত, শ' এই নাটকে দেখাতে চাইলেন গণিকাবৃত্তির আসল কারণ কি। মেয়েদের চরিত্রহীনতা কিম্বা পুরুষের উচ্ছৃংখলতা নয়—মেয়েদের স্বাধীন জীবিকা অর্জনের অব্যবস্থা, তাদের পারিশ্রমিকের স্বল্পতা, এক কথায় তাদের দীনতা।

এ পর্যন্ত গণিকাবৃত্তি সম্পর্কে যত নাটক লেখা হয়েছে সেগুলিকে দেখান হয়েছে হয় রোমাণ্টিক সৌন্দর্য না হয় গণিকাকে করে তোলা হয়েছে অশুচিতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু মানব-প্রকৃতি যে পারিপার্শ্বিক অর্থনীতির ফসল মাত্র তা সোস্যালিস্ট শ' ছাড়া এর পূর্বে কেউ নাটকে আর প্রমাণ করতে চেষ্টা করেনি। তাই

"সিজার ও ক্লিওপ্যাট্রা" ছবি তোলবার সময় শ' ও পরিচালক গ্যাব্রিয়েল প্যাস্কাল

ইডোয়ার্স হাউসেসএর মতই মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেসন নাটকে শ'র আক্রমণের লক্ষ্য হল সমাজ। শ'র এই নাটকে গণিকাদের ব্যক্তিগতভাবে দোষী না ক'রে সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন। শ' বলেন, 'গণিকাবৃত্তি পুঁজিবাদের বাই-প্রডাক্ট।'

শ'র চতুর্থ নাটক 'আর্মস এ্যান্ড দি ম্যান"। এই নাটকে শ' রোমান্সের সাজপরা দুটি বীভৎসতাকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন। একটি আইডিয়াল প্রেম, একটি আইডিয়াল বীরত্ব। মানুষ আইডিয়াল বা আদর্শের নামে একদিকে সৃষ্টির সহজ প্রবৃত্তিকে যেমন দমন করে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি তারা আদর্শের নামে প্রশ্রয় দেয় ধ্বংসের বৃত্তিকে। এই ধ্বংসের প্রবৃত্তি হল যুদ্ধ। এমনিভাবে মানুষ প্রকৃতির উদ্দেশ্যকে দুইভাগে ব্যাহত করেছে, এক, প্রকৃতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে দমন করে—দুই, মানুষের ধ্বংসের বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মানুষের মনে যখন যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এল, যখন বাস্তবের হিংস্র আঘাতে রোমান্সের, আইডিয়ালের স্বপ্নসৌধগুলো ভেঙে, ধ্বসে পড়তে লাগল, তখনই মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে লাগল আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান নাটকের মূল সত্যটিকে।

শ' সাধারণ মানুষের ভুল-ত্রুটি দেখে হতাশ হয়ে তাঁর 'ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান' নাটকে বিদ্রূপ করে বলেছেন, আমি মৃত্যুর পর যদি বিধাতার দরবারে এসে দাঁড়াই, তবে তাঁকে জানাবো—

Scrap the lot, old man. Your human experiment is a failure. Man as a political animal is quite incapable of solving the problem created by the multiplication of their own numbers. Blot them out and make something better.

তাই তিনি মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকেন অতিমানুষের অভ্যুদয়ের পথে। শ' এই অনাগত ভবিষ্যৎ অতিমানুষের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেন শীর্ষস্থানীয় মানুষদের মধ্যে। শ' প্রচার করেন অতিমানব, বা মানবোত্তর প্রাণীর যখন আগমন হবে এবং নয়েসের মত বুদ্ধি ও হৃদয়বান ব্যক্তিরা হবে অতিমানবের জনসাধারণ, তখন পৃথিবীর বর্তমান সমস্যাগুলি হবে অন্তর্হিত এবং পৃথিবী হবে উন্নততর জীবের আবাসভূমি।

শ' তার 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' নাটকে প্রকৃতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন নাটকের নায়ক ডন জুয়ানের মারফৎ। আসলে ডন্ জুয়ান রূপায়িত বার্নার্ড শ'।

নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আয়ত্ত করতে চায় অনায়ত্তকে। নারীই প্রকৃতির সৃষ্টির প্রত্যঙ্গ। শুধু নারী কেন জীবলোকের সমস্ত স্ত্রীজাতিই। বিবাহ এই সৃষ্টির দায়িত্ব পূরণের জন্য নারী-পুরুষকে বাঁধতে চায়। বিবাহ-বন্ধনের এই চাপের নাম সতীত্ব। শ' সতীত্বে অবিশ্বাসী; গণিকাবৃত্তিতে যেমন সৃষ্টি-শক্তির করুণ অপচয় সতীত্বের মধ্যেও তেমনি সৃষ্টি-চেতনার প্রতি অমার্জনীয় অবহেলা। তাই ডন জুয়ান যখনই সতীত্বের প্রশ্ন তুললো, তখনই ঝলসে উঠলো সতীত্বের প্রতিনিধিস্বরূপ অ্যানা।

অ্যানা বলল, খবরদার, ডন জুয়ান, সতীত্ব সম্বন্ধে একটি কথা উচ্চারণ করেছ কি আমাকে করেছ অপমান।

প্রতিবাদ করল ডন্ জুয়ান, না, তোমার সতীত্ব সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে চাই না, কারণ সে সতীত্বের স্বরূপ হ'ল একটি স্বামী আর এক ডজন ছেলেমেয়ে। তুমি যদি পতিতাদেরও পতিতা হোতে, এর চেয়ে বেশী কি করতে পারতে বলো?

—হ'তে পারতাম বারজন স্বামীর স্ত্রী এবং নিঃসন্তান।

—ঠিক বলেছ, এইটেই হল আসল পার্থক্য।

কিন্তু সে পার্থক্য তো প্রেম বা সতীত্বের নয়, বারজন স্বামীর ঔরসে বারজন সন্তানের জন্ম হতেও পারত। আর সেই জন্মেই পৃথিবী পরিপূর্ণ হ'ত আরও সুন্দরভাবে। এই কারণেই নরনারীর সহজ ভালবাসার প্রতি শ'র চিরকাল আস্থা। সহজ যৌন-মিলনের ফলে জাত সন্তানরাই হবে সত্যিকার অভিজাত।

শ' তাঁর 'ব্যাক্ টু মেথুজেলা' নাটকের প্রথম পর্ব 'ইন দি বিগিনিং'এর মধ্যে আদিম মানব আদম এবং আদিম মানবী ইভের যে বৈচিত্র্যহীন দুর্বোধ্য জীবনের রূপ দেখিয়েছেন তা অপরূপ। আদম বলেন,—

'We have to live here for ever. "Think of what for ever means."

আদম ইভ চাইলেন এই একটানা জীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতি, তাঁরা বরণ করতে চাইলেন মৃত্যুকে। কিন্তু জন্মহীন মৃত্যু, সে যে শেষ, সে যে শূন্যতা, তাঁরা ভরসা পেলেন মৃত্যু দুঃখের নয়। যদি মৃত্যুকে জয় করা যায়, কিন্তু কেমন করে জয় করা যাবে?

আরেকটি জিনিস দিয়ে—এ জিনিসের নাম জন্ম।

জন্ম? কেমন করে জন্ম হবে?

ইভ বলেছেন,

To desire, to imagine, to will, to create.

সংক্ষেপে এর নাম হল to conceive. সেদিনই মৃত্যু হল মানুষের নিষ্কৃতি, তার প্রগতি।

শ' যদিও পরজন্মে অবিশ্বাসী, কিন্তু মৃত্যুই যে জন্মের অপরিহার্য কারণ, জন্মই মৃত্যু—শ একথা পরজন্মে বিশ্বাসীদের চেয়েও বিশ্বাস করেন অনেক বেশী।

শ' পরজন্মকে ব্যক্তিগতভাবে দেখেন নি, দেখেছেন বিশ্বগতভাবে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা তার ম্যান এণ্ড সুপারম্যান নাটকের নরক-দৃশ্যে—ডন জুয়ান ও ডেভিলের বিতর্কেও পরিস্ফুট হয়েছে।

শ' তার 'ব্যাক্ টু মেথুজেলা' নাটকে প্রস্তাব করেছেন, মানুষের বয়স অন্ততঃ তিনশত বছর হওয়া উচিত, নচেৎ তার পক্ষে কোন কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাধা করা সম্ভব নয়।

তাঁর এই ৯২তম জন্মতিথিতে কামনা করি যেন তিনশত বছর জীবিত থেকে শ' পরিপূর্ণ-ভাবে তাঁকে বিলিয়ে দেন জগতের কাছে।

## মার্শাল সাহায্য

মার্শাল সাহায্যানুসারে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হতে চলেছে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্শাল পরিকল্পনানুসারী বৈদেশিক সাহায্য বিলে সই করেছেন এবং মার্শাল সাহায্যের অন্যতম সর্তানুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে চুক্তি সম্পাদিত হতেও আরম্ভ করেছে। বলাবাহুল্য যে প্রথমাবস্থায় এই চুক্তির সর্তাবলীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের একটা প্রয়াস ছিল এবং তাই নিয়ে প্রচুর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রের মনে সংশয় জেগেছিল যে মার্শাল সাহায্যের ছিদ্র পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের গলায় অর্থনৈতিক ফাঁস পরিয়ে দিতে চায় এবং এই পথে নিজের আর্থিক জীবনে যে ইনফ্লেশন দেখা দিয়েছে তার অবসান ঘটাতে চায়। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিল ফ্রান্স তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত রাষ্ট্রদূতের মারফতে। ফ্রান্স জানিয়েছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত চুক্তি সর্তাবলী সংশোধিত না হলে ফ্রান্সের পক্ষে ঐ চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে না। অনুরূপ ধরণের আপত্তি বৃটেন প্রভৃতি অন্যান্য রাষ্ট্রের তরফ থেকেও উঠেছিল। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চুক্তির সর্তাবলী সংশোধিত করতে হয়েছে এবং তার প্রায় সংগে সংগেই বৃটেন, আয়র ও ইটালী স্বতন্ত্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সুতরাং এবার অনায়াসেই ধরে নেওয়া চলে যে মার্কিন সাহায্যানুসারে ইউরোপের প্রকৃত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হবে। প্রায় ১৩ মাস পূর্বে যে মার্শাল পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছিল এবার সত্যই তার চরম পরিণতি হতে চলেছে। এই চুক্তির অন্যতম সর্ত হল সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হয়, তার খবরাখবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়মিত সরবরাহ করতে হবে। এসর্তে অনেক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রেরই আঘাত লাগার কথা। কিন্তু এ সর্ত আরোপ করা ছাড়া সাহায্যদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই বা গত্যান্তর কোথায়? তাদের দেশের অর্থ যাতে অকারণে অপচয়িত না হয়, তার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন তারা করবে বৈকি! তা ছাড়া ভবিষ্যতে যখন পুনরায় সাহায্যদানের প্রয়োজন হবে, তখন তো বর্তমানের হিসাবনিকাশের প্রয়োজন হবে। এই সাহায্যদানের ফলাফল লক্ষ্য করার জন্যে এবং কাজটি সহজে সম্পন্ন করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে হয়েছে।

ইউরোপের রাজনীতি আজ জটিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে চলেছে। পূর্ব ইউরোপের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে সোভিয়েট রাশিয়া আজ হাত বাড়াচ্ছে পশ্চিম ইউরোপের দিকে। জার্মানীকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধ ঘনীভূত। এই অবস্থার মধ্যে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যদি অনতিবিলম্বে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে না পারে, তবে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে

**সভাপতি পদপ্রার্থী রিপাব্লিকান দলের মনোনীত সদস্য মিঃ টমাস ডিউই**

এই সব দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন অসম্ভব হবে না। সুতরাং কার্যকরীভাবে মার্শাল সাহায্য ব্যবহার করা না করার উপর পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভর করে। এ প্রশ্নের আর একটা দিকও আছে। আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন আসন্ন এবং সে নির্বাচনে রিপাব্লিক্যান বিজয়ও প্রায় সুনিশ্চিত। ডেমোক্রেটদের তুলনায় রিপাব্লিকানদের বৈদেশিক নীতি অনুদার ও সংকীর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি যে সাহায্য পেতে চলেছে, তার সদ্ব্যবহার যদি তারা করতে না পারে, তবে রিপাব্লিকান আমলে নতুন করে এই সাহায্য পাওয়া হবে কঠিন। ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিই পড়বে বিপাকে। তাই পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির উচিত মিলিতভাবে এ সম্বন্ধে কাজে হাত দেওয়া

## কমিনফর্ম ও মার্শাল টিটো

যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান মন্ত্রী মার্শাল টিটোকে কেন্দ্র করে পূর্ব ইউরোপের বল্কান রাজনীতিতে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের ৯টি কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত দেশ নিয়ে পূর্ব ইউরোপীয় ব্লক সংগঠিত। যুগোশ্লাভিয়া এই ব্লকের অন্যতম সদস্য। পশ্চিম জার্মানীতে মুদ্রা সংস্কার নিয়ে যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে তার পটভূমিকায় সম্প্রতি ওয়ারসাতে ৯টি দেশের বৈদেশিক সচিবদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেছে। এই বৈঠকে মার্শাল টিটোর গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিবও উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বৈঠক থেকে জার্মানী সম্বন্ধে যে নয়া নির্দেশনামা প্রচারিত হয়েছে তার একটি নির্দেশে চতুঃশক্তিকে জার্মানি সম্বন্ধে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। এর প্রায় পরে পরেই প্রাগে কমিনফর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির দাবীক্রমে কমিনফর্মের এই বৈঠকে মার্শাল টিটোকে কার্যত যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কমিনফর্মের এই অধিবেশনে যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট দলের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। মার্শাল টিটোকে অবশ্য সরাসরি সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার মূলগত অর্থ হল টিটোর অপসারণ। যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে ভ্রান্ত পথগামী তাদের নেতারা যদি ঠিক পথে চলতে না পারেন, তবে তাঁদের যেন তারা পার্টি থেকে অপসারিত করেন। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণায় সমগ্র বহির্জগৎ প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ইউরোপে যে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব ইউরোপ বনাম পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে একটা শক্তি পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া অসম্ভব নয়। এরই মধ্যে মতভেদের দরুণ স্টালিনের পূর্ব ইউরোপীয় ব্লকে ভাঙন ধরল—এটা বিস্ময়ের কথা নয় কি? সোভিয়েট লৌহ-পরদার আড়ালে অবস্থিত পূর্ব ইউরোপ সম্বন্ধে আজকাল সঠিক সংবাদ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের পর এত বড় চমকপ্রদ সংবাদ আর পাওয়া যায়নি। মার্শাল টিটো [illegible] অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী নেতা—নিজের রাজ্যের অধিবাসী

আস্থা আছে তার উপরে। তিনি মার্শাল ষ্টালিনেরও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁর উপর হঠাৎ এই খাঁড়ার ঘা তাই এত বিস্ময়কর। মার্কিন রাষ্ট্রনৈতিক মহল তো প্রথমে এ সংবাদ বিশ্বাস করতেই চাননি। তাঁদের পক্ষে সংবাদটি এতো ভাল যে সহজে এ সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক তাই তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে হয় ইতিমধ্যে মার্শাল টিটোকে হত্যা করা হয়েছে কিংবা তাঁকে বন্দী করা হয়েছে। তা নইলে এত বড় সংবাদ প্রচার কিছুতেই সম্ভব হত না। এখন দেখা যাচ্ছে যে মার্শাল টিটো সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তেই আছেন—শুধু তাই নয় তাঁর নেতৃত্বাধীন যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছে এবং কমিনফর্মের আনীত প্রত্যেকটি অভিযোগের বিরুদ্ধে জানিয়েছে তীব্র প্রতিবাদ। এই লড়াইএর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে বিশ্বের জনমানসে ঔৎসুক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। ইউরোপের কম্যুনিষ্ট ক্যাম্পে এই বিরোধের সূচনা দেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো এরই মধ্যে উল্লসিত হয়ে উঠেছে এবং যুগোশ্লাভিয়া যদি পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যোগ দেয় তবে তাহাকে অর্থ সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার নির্দেশেই যে এই টিটো বধের আয়োজন কমিনফর্ম থেকে করা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। মার্শাল টিটো ও যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রকৃত অভিযোগ যে কি তাও নিশ্চয় করে বলা শক্ত। যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদমুখী নেতৃত্বের পাল্লায় পড়ে যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্ক্স-লেনিনিষ্ট মতবাদ থেকে দূরে সরে আসছে, কুলাক বা বড় বড় জমিদার জোতদারদের সমর্থন করছে, সোভিয়েট রাশিয়া অপেক্ষা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে অধিকতর বন্ধুত্বভাবাপন্ন বলে মনে করছে, ফ্যাসিষ্ট পন্থায় পার্টি ও মন্ত্রিমণ্ডল থেকে বিরোধী নেতাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, [illegible]ভিয়েট রাজনৈতিক ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের [illegible]র করা হচ্ছে না এবং পার্শ্ববর্তী [illegible]ষ্ট রাষ্ট্রগুলির সংগে নীতির [illegible]খে চলা হচ্ছে না এই অভিযোগ-[illegible]ধান। কিন্তু এসব অভিযোগের [illegible]র মত তথ্য কিন্তু সন্নিবেশিত [illegible]গোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির অভিযোগ অস্বীকৃত হয়েছে। [illegible]যোগ এনেছে এই বলে যে, [illegible]র আছে তা না শুনেই জবর-[illegible]য়ে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির [illegible]য়েছে। মার্শাল টিটোর বিরুদ্ধে এর চেয়ে গুরুতর অভিযোগের কারণও হয়তো আছে। তিনি বল্কান অঞ্চলে সমজাতীয়তার ভিত্তিতে যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়ার একত্রীকরণের পক্ষপাতী। অনুরূপ পরিকল্পনা প্রচার করতে গিয়ে ইতিপূর্বে বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডিমিট্রোভকে সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে নাকাল হতে হয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়া এ পরিকল্পনাকে নিজের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে। এই সব কারণেই যে আজ মার্শাল টিটোর ঘাড়ে সোভিয়েট খড়্গের আঘাত এসে পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি অনুরাগের চেয়ে মার্শাল টিটোর স্বদেশানুরাগ বেশী এই হল তার মূল অপরাধ। স্বদেশপ্রীতি নিয়ে যে সোভিয়েট প্রভাবিত অঞ্চলে বাস করা সম্ভব নয়, এ ঘটনার দ্বারা তাই প্রমাণিত হল। নিজের দেশে মার্শাল টিটোর অসম্ভব প্রভাব। কিন্তু সেই প্রভাবের জোরে তিনি সোভিয়েট রাশিয়া পরিচালিত পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিঁকে থাকতে পারবেন কিনা তাই হল দ্রষ্টব্য।

## ইরাণে নতুন মন্ত্রিমণ্ডল

জুন মাসে ইরাণে এম হাকিমীর মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর স্থলবর্তী হয়ে প্রধান মন্ত্রী পদে বৃত হয়েছেন এম আবদুল হোসেন হাজির। ইনি ইতিপূর্বে একাধিকবার ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্য ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেছেন এবং ইরাণ মজলিস ৮৮—৬ ভোটে তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি আস্থা জ্ঞাপনও করেছেন। কিন্তু তাঁদের এই আস্থা কতদিন অক্ষুন্ন থাকবে—সেই হল কথা। সমস্যা কণ্টকিত ইরাণে প্রধান মন্ত্রীর গদীতে বসা খুব সুখের বিষয় নয়। আজ যিনি হয়তো জনপ্রিয়তার উচ্চাসনে, কাল তাঁকে দেখি লোক চোখে একেবারে অবজ্ঞাত। ইরাণের অন্যতম ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী এম সুলতানি আজ ঘুষ ও দুর্নীতির দায়ে রাজদ্বারে অভিযুক্ত। গত ছয় মাসের মধ্যে ইরাণে তিন তিনবার মন্ত্রিমণ্ডলের রদবদল হতে আমরা দেখেছি। গত ডিসেম্বরে মজলিসের অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে সুলতানীর মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটেছিল। তার পরে এলেন সর্দার হেকমৎ প্রধান মন্ত্রী হয়ে। কিন্তু তি[illegible] একদিনের বেশী গদীতে বসে [illegible] পারেন নি। দশদিন পরে এম [illegible] হাকিমীর নেতৃত্বে গঠিত হল নতুন মন্ত্রিমণ্ডল। তিনি দেশবাসীদের কাছে এক বিরাট কর্ম তালিকা উপস্থাপিত করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল ইরাণের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করা[illegible] কথা, ইরাণে বৈদেশিক রাষ্ট্রের ব্যবসায়ঘটি[illegible] একচেটিয়া অধিকার পুনর্বিবেচনা করার ক[illegible] এবং আরও অনেক জনকল্যাণকর কাজের ব[illegible] কিন্তু তাঁর প্রধান মন্ত্রীত্বের পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে তাঁর গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতি নিয়ে এত সমালোচনার ঝড় উঠেছিল যে, তাঁকে কয়েকবার আস্থা জ্ঞাপক ভোটের জন্যে মজলিসের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল।

ইরাণের এই ঘন ঘন মন্ত্রিমণ্ডল রদবদলের হেতু হল এই দেশটি তৈল সম্পদের জন্যে পরস্পর বিরোধী বিদেশী স্বার্থের ক্রীড়াস্থল বিশেষ। ইরাণের তৈল নিয়ে রুশ-মার্কিন বিরোধের কথা কারও অজ্ঞাত নেই। এ সম্বন্ধে কোন দৃঢ় কর্মনীতি অবলম্বনের ক্ষমতা ইরাণের নেই বলেই বারবার মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটে[illegible] যার বদলে যাকেই গদীতে বসানো হোক না কেন, ইরাণের চিরন্তন সমস্যার কোন সমাধান[illegible] হয় না। আজ এবার সেই একই সমস্যা সমাধানের দুরাশায় গঠিত হয়েছে এম হাজিরের নতুন মন্ত্রিমণ্ডল। স্বদেশে এবং বিদেশে তাঁর পূর্ববর্তী মন্ত্রিমণ্ডলগুলির সম্মুখে যে সমস্যা এল, তাঁরও সম্মুখে সেই একই সমস্যা। এবং সে সমস্যা আরও জটিলতর হয়ে উঠেছে। সুতরাং তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলের আয়ু কতদিন কে জানে। তবে জ্ঞাতব্য এই যে, পূর্ববর্তী প্রধান মন্ত্রীদের তুলনায় তিনি [illegible]নতর। তাঁর বয়েস ৫২ বৎসর আর [illegible]লতানি এবং হাকিমীর বয়সে যথাক্রমে ৭[illegible] এবং ৭৬।

৪-৭-৪৮

# ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত

**শ্রীসজনীকান্ত দাস**

ভারতবর্ষে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল একমাত্র জাতীয় সংগীতরূপে প্রচলিত "বন্দে মাতরম্" গানকে ভারত গবর্ণমেণ্ট বাতিল করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছেন। "মধ্যবর্তী কালের" জন্য "বন্দে মাতরম্"এর স্থলে "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানটিকে জাতীয় সংগীত (National anthem) হিসাবে চালাইবার জন্য সরকারী আদেশ জারিত হইয়াছে। একদা বাঙালীই বাঙলা ভাষার সাহায্যে ভারতবর্ষের আত্মাকে বাণী-মূর্তি দিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই জন্য বাঙলা দেশ ও বাঙলা সাহিত্য হইতেই ভারতের জাতীয় সংগীত "বন্দে মাতরম্"এর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বাঙালী কবির কণ্ঠনিঃসৃত এই স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃবন্দনা-গানকে গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে শুধু বাঙালী সৈনিকের নয়, সারা ভারতের দেশপ্রাণ বীরবৃন্দের বক্ষরক্তপাত ও আত্মবলিদানের সহিত যুক্ত হইয়া এই গান মন্ত্র-মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহাকে "মহামন্ত্রে"র মর্যাদা দিয়াছিলেন। যথা—

"কাজের সময় হঠাৎ দেখিতে পাই, যাহা সত্য তাহা কষ্টকল্পনা নহে, তাহার শক্তি অধিক, অথচ তাহা নিতান্ত সহজ। আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে এতকাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম, তাহাতে নিজের অপমান লাঞ্ছনার বোঝাই বেশি জমিল, আর দেশী ভাষায় স্বদেশীর হৃদয়-দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম, অমনি মুহূর্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন। সেইজন্য আমি বিবেচনা করি, বাঙলা ভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে, তবে আর-সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে, এই "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রটি বংগসাহিত্যেরই দান।"

পণ্ডিত জওহরলাল "বন্দে মাতরম্"কে বাতিল করিবার অন্যতম অজুহাত দেখাইয়াছেন—"বন্দে মাতরম্" গানের সুর সমবেত-ভাবে সামরিক ভংগিতে গাহিবার উপযুক্ত নয়। "বন্দে মাতরম" কি এতকাল সমবেতভাবে গাওয়া হয় নাই? ইংলণ্ডের জাতীয় সংগীত "Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them" না হইয়া "God save the King" হইল কেন? রাজা-বন্দনা অপেক্ষা দেশ-মাতৃকার বন্দনা কি অধিকতর সমর্থনযোগ্য নয়? আর মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্যের দল জাতীয় সংগীতে সামরিক ভংগী পরিহার করিতেও তো পারিতেন। সৈন্যদের অভিযানে সামরিক সংগীতের অভাব হইত না। দীর্ঘ-কালের সংস্কার ও শ্রদ্ধার উপর "বন্দে মাতরম" পাকা আসন গাড়িয়া বসিয়া আছে, "জনগণ-মন" দিয়া সেটিকে যদি স্থানচ্যুত করা যায় "জন-গণ-মন"কে সরাইতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না, কারণ "জনগণমন" দিয়া কোনও শ্লোগান হয় না—এই অজুহাত তো থাকিয়াই গেল। "জনগণমন" গানের এই অপ্রত্যাশিত সম্মানে যাঁহারা তৃপ্তিবোধ করিতেছেন, তাঁহারা কি একথাটা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

আর একটি কথা, সুরের যুক্তি দিয়া সুরসেবী কর্তারা সমগ্র ভারতবর্ষের সুর-স্রষ্টাদের অপমান করিয়াছেন। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের যে কোনও পাঠ যাঁহারা ইচ্ছা করিলে মালকোষ বা ইমন কল্যাণের ছাঁচে ফেলিতে পারেন, তাঁহারা সহজেই ব্রাম ব্রাস-ব্যাণ্ডের উপযোগী করিয়া "বন্দে মাতরমে"র সুরকে ঢালিয়া সাজিতে পারিতেন। রাষ্ট্রগত-ভাবে সে চেষ্টা ইঁহারা করেন নাই, কারণ "বন্দে মাতরম্"কে রাখা ইঁহাদের লক্ষ্য নয়, ইঁহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, "বন্দে মাতরম"কে অপসারণ। যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শত শত তরুণ প্রাণবলি দিতে ছুটিয়াছে, সে মন্ত্রকে—মহামন্ত্রকে অপসারণ করিতে গেলে যে হাজার হাজার তরুণ জীবনপণ প্রতিরোধ করিতে ছুটিয়া আসিবে, এই কথাটা কেবল কর্তারা খেয়াল করিতে পারেন নাই।

পারেন নাই, কারণ ইঁহারা, কি কারণে জানি না, ভারতবর্ষের প্রতি হৃদয়হীন হইয়াছেন। এ মহাদেশের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর সহানুভূতি ও সমবেদনা থাকা চাই। যে মহামন্ত্রকে ইঁহারা আজ অকারণে ক্ষুণ্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রকে তরুণেরা কি মর্যাদা দিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন—প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতেও ইঁহারা কি দিতে পারিবেন ঋষি-কবির উক্তির মধ্যে তাহারও ইংগিত আছে। জনগণমনকে সম্ভ্রম না করিয়াই যাঁহারা ভারত-ভাগ্যবিধাতা হইয়া আছেন, রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি তাঁহারা একবার স্মরণ করিবেন—

"তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাঙলা-দেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্যরূপে ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে, যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—বন্দে মাতরম।......

"হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন, আমি নিশ্চয় জানি—অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং সেই চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিকাল ভুজঙ্গের বিষাক্ত দর্প পরিশ্রান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইও না, লুব্ধ হইও না, ভীত হইও না।......

"দেশের হৃদয়-নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী তোমার দেশের নবপ্রভাতের আরম্ভে শংখধ্বনি করিয়া দেশের পুরুষযাত্রিগণকে বল, তোমাদের যাত্রা সার্থক হউক, তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমাদের জয় হউক, তোমাদের যাত্রাপথে আমরা পুষ্পবর্ষণ করিব বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেশের পুরুষকণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বল—বন্দে মাতরম্!"

এই প্রসংগে মহাত্মা গান্ধীর কথাও ভারত ভাগ্যবিধাতাদের স্মরণ করিতে বলি, কারণ জীবিতকালে তিনি ইঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয় ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পূর্বে ১৯৪৭ ২২ আগষ্ট তারিখে কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কে প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন—

'Vande Mataram.' That was no religious cry. It was a purely political cry. The Congress had to examine it. A reference was made to Gurudev about it. And both the Hindu and the Muslim members of the Congress Working Committee had to come to the conclusion that its opening lines were free from any possible objection, it should be sung together by all on due occasion. It should never be a chant to insult or offend the Muslims. It was to be remembered that it was the cry that had fired political Bengal. Many Bengalis had given up their lives for political freedom with that cry on their lips. He felt strongly about 'Vande Mataram' as an Ode to Mother India ....'Vande Mataram,' the national song and the national cry of Bengal which sustained her when the rest of India was almost asleep and which was, as far as he was aware, acclaimed by both the Hindus and the Muslims of Bengal.

২৯-৮-৪৭ তারিখে কলিকাতায় অন্যত্র তিনি বলেন—

There should be one universal notation for 'Vande Mataram,' if it was to stir millions, it must be sung by millions in one tune and one mode.

গান্ধীজীর উক্তি হইতেই দেখা যাইতেছে যে, "বন্দে মাতরমে"র বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অপরাধ টেকে না এবং ভারত সরকার চেষ্টা করিলেই ইহা এক সুরে একভাবে সর্বত্র গীত হইতে পারে। কিন্তু ভারত সরকার সে চেষ্টা না করিয়া হঠাৎ মধ্যবর্তীকালের জন্য "বন্দে মাতরম্"ক সরাইয়া "জনগণমন"কে আসনে বসানোতেই আমাদের সন্দেহ হইতেছে, ইঁহারা কাঁটা দিয়া কাঁটা সরাইবার মতলবে আছেন। যদি গণপরিষদের বিচারে ভারতের জাতীয় সংগীত নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত "বন্দে মাতরম্"ই চালু থাকিত, তাহা হইলে এই সন্দেহের অবকাশ থাকিত না; আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না যে, সামান্য কয়েক মাসের জন্য কণ্টকমুকুট-শোভিত এই "বন্দে মাতরম্"কে গদিচ্যুত করার মধ্যে কর্তৃপক্ষের যুক্তি কোথায়? যুক্তির অভাবই সন্দেহের উদ্রেক করে। শ্রদ্ধেয়কে সন্দেহ করার দুঃখ বড় কম নয়।

('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫)

# শ্রমশিল্পে দুর্ঘটনা নিবারণের উপায়

ডাঃ জন বার্টন

বৃটেনে শ্রম শিল্পে দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য ১৯৩৭ সালে ফ্যাক্টরী আইন পাশ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে তাহাকে কার্যকরী করার জন্য কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। অধুনা বৃটেনে বিশেষজ্ঞগণ দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্বেও দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল এবং বিভিন্ন কারখানায় বহু নিরাপত্তা কমিটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। দুর্ঘটনা সংখ্যা হ্রাস পাওয়া বহু কারণের উপর নির্ভর করে, কোন একটি বিশেষ কারণেই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় না।

যুদ্ধ বাধিবার সময় বৃটেনে বিভিন্ন ধরণের ১,৪৪৯টি নিরাপত্তা কমিটি কাজ করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোন কমিটিতে বেতনভোগী "সেফটি অফিসার" এবং তাহাদের সহকারীও ছিল। বয়ন শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রে এই কাজের জন্য ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করা হইত।

এই সময় বৃটেনে দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য ক্রমবর্ধমান উৎসাহ পরিলক্ষিত হওয়ায় টেকনিক্যাল কলেজগুলি নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করে, বিভিন্ন কারখানার সহযোগিতায় উপযুক্ত শিক্ষকদের অধীনে তাহারা যুবকদের হাতে কলমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করে। যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিতে হইলে কি ধরণের বিপদ হইতে পারে শিক্ষাব্রতীরা এখানে তাহাই শিক্ষা করে।

যে সমস্ত কারখানায় নিপুণ কর্মী হিসাবে শিশুদের গ্রহণ করা হয়, দেখা গিয়াছে দুর্ঘটনার সংখ্যা সেই সমস্ত কারখানাতেই হ্রাস পাইয়াছে। একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ৪০০ বালক কাজ করে, এক বৎসরের মধ্যে সেই কারখানায় দুর্ঘটনার সংখ্যা ৯·৫ হইতে ৫·৪-এ হ্রাস করা সম্ভব হয়।

যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমশিল্পে নূতন নূতন অনভিজ্ঞ শ্রমিক লওয়া হইতে লাগিল, ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইল, অবশ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা এবং সুষ্ঠুরূপে কর্ম পরিচালনেরও অভাব ছিল। মারাত্মক রকমের দুর্ঘটনা ১৯৩৮ সালে সংঘটিত হয় ৯৪৪ আর ১৯৪১ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১,৬৪৬টিতে দাঁড়ায় অর্থাৎ শতকরা ৭৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

দুর্ঘটনার সংখ্যা এইরূপ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি দুর্ঘটনা নিবারণী "রয়াল সোসাইটি" এবং বিভিন্ন মালিকদের প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য সর্বরকমের প্রচারকার্য আরম্ভ করে। ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টর সর্বত্র নিরাপত্তা কমিটি গঠনের কাজ পূর্ণোদ্যমে চালাইতে থাকে। প্রচার পুস্তিকা, পোস্টার এবং বক্তৃতা প্রভৃতি মুদ্রিত করিয়া বিলি করা হয়। টেকনিক্যাল স্কুলগুলি এবং সরকারী ট্রেনিং কেন্দ্রগুলি নূতন ছাত্রদের নিরাপত্তামূলক বিষয় শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "সেফটি অফিসার" ট্রেনিংএর বিশেষ ব্যবস্থা করার আন্দোলন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অক্সফোর্ড ট্রেনিং লইবার পর বিভিন্ন কারখানার দায়িত্বপূর্ণ কাজে এই সমস্ত অফিসাররা নিযুক্ত হইলে ফল ভালই দেখা যাইতে লাগিল। ইহাদের ছাড়াও ১৯৪০ সালে প্রত্যেক কারখানার চিকিৎসা বিভাগ স্থাপিত হইল।

১৯৪২ সাল হইতে অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিল। সাংঘাতিক রকমের দুর্ঘটনা সংখ্যা ১,৩৬৩-এ নামিল এবং তৎপরবর্তী বৎসর হইতেই দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পাইল। শ্রমিকদের "ক্যানটিন"এ বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা প্রচারকার্য চালান হইতে লাগিল। যে সমস্ত শ্রমিক এই সমস্ত বক্তৃতা প্রভৃতি শুনিত তাহাদের মধ্যে দুর্ঘটনার সংখ্যা কম হইত।

একটি বয়নশিল্প কারখানায় ৬০০ শত শ্রমিকদের মধ্যে ৫ বৎসরে মাত্র ৪টি দুর্ঘটনা ঘটে। এই কারখানায় প্রচুর জায়গা আছে এবং যন্ত্রপাতি বেড়া দ্বারা ঘিরিয়া রাখার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং ক্রমাগত প্রচারকার্যও চালান হইতেছে। বিভিন্ন কারখানায় যে সমস্ত স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছে স্থানীয় টেকনিক্যাল স্কুলগুলির সহিত তাহাদের সহযোগিতার ফলে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

মিডল্যাণ্ড-এর একটি বিরাট ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার সমস্ত বালক শ্রমিকদের টেকনিক্যাল স্কুল হইতে ট্রেনিং দিয়া আনা হইয়াছে। এখন ঐ কারখানায় যে সমস্ত শ্রমিকদের অনুরূপ ট্রেনিং নাই কর্তৃপক্ষ তাহাদের চাকুরী দিতে অনিচ্ছুক। বিগত ৩ বৎসর ১,৬০০ ছাত্র এই স্কুলে ট্রেনিং লইয়াছে তন্মধ্যে একটি ছাত্র দুর্ঘটনায় পতিত হয়।
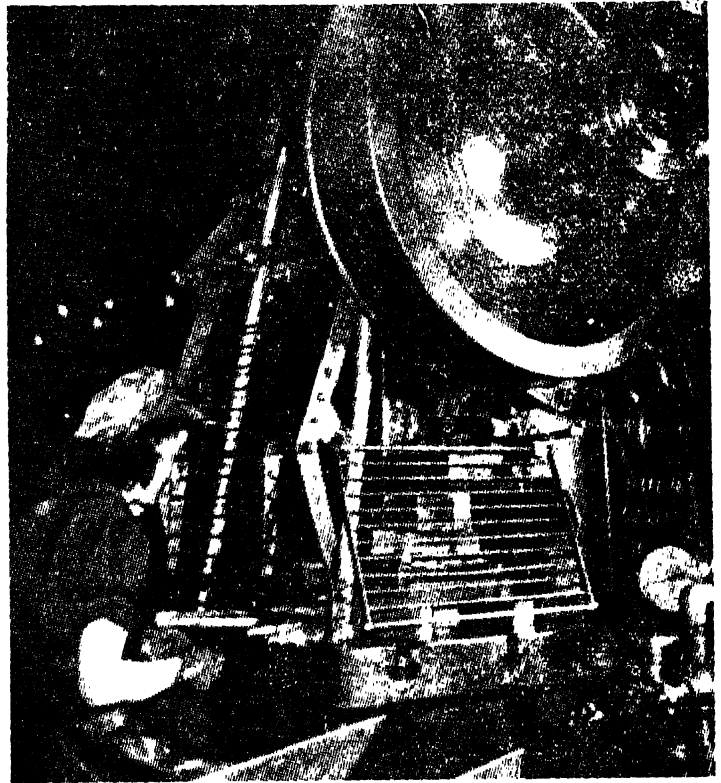
দুর্ঘটনা এড়াইবার জন্য যন্ত্রপাতির অদলবদল করিয়া যন্ত্রের চাকা উপরে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বেল্টের চতুর্দিককে লোহার রড দিয়া খাঁচার মতন ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙলার চিত্র-শিল্প বর্তমানে সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে এমন একটা চাপ আজ এসেছে যার জন্যে শিল্পের ব্যাপারে অস্তিত্বের মূলটাই আলগা হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। যুদ্ধ থেকে দম নিয়ে বাঙলা ছবির বাজার বেশ তরতর করে এগিয়ে চলল এবং দেশ ভাগ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গতি অব্যাহত তো ছিলই বরং একটির জায়গায় দুটি রাষ্ট্র হয়ে যাবার ফলে ব্যবসা আরও কিয়ে ওঠারই আভাষ পাওয়া গিয়েছিলো। এই অবস্থাতেই এলো পূর্ব পাকিস্থান সরকারের নতুন শুল্ক প্রবর্তন—ফুট পিছু পয়সা করে শুল্ক ধার্য হওয়ায় গত প্রায়

বন্দ্যামতের 'আলোছায়া' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী শিপ্রা

দেড় মাস যাবৎ পূর্ব পাকিস্থানে বাঙলা ছবি পাঠানো একেবারেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। এর দ্বারা বাঙলা ছবির ব্যবসা একেবারে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে আর সেটা এমনি অবস্থা যে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বাকি অর্ধেক-বাজার থেকে লাভ করা সমস্যার বিষয়। অর্থাৎ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আগেকার মত ক্ষেত্র না পেলে বাঙলা ছবি তোলাই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থা, বাঙলা দেশ তো বটেই, এমন কি সারা ভারতের কৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমাদের মনে হয় এ অবস্থায় বাঙলা চিত্র-প্রযোজকের উচিত হবে না হিন্দী ছবির প্রযোজকদের সংগে একজোট হয়ে থাকা। তার কারণ পাকিস্থানে শুল্ক ধার্য হওয়ায় সাময়িক-ভাবে হিন্দী ছবির বাজারও কিছু ছোট হয়ে গেল বটে, তাছাড়া শেষ পর্যন্ত পাকিস্থানে হিন্দী ছবি যদি একেবারে বন্ধও হয়ে যায় তো ভারতের সর্বত্র নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের যে ধুম পড়ে গিয়েছে তাতে হৃত আয় ফিরে পাওয়া হিন্দী ছবির পক্ষে অদূর ভবিষ্যতেই সম্ভব হতে পারবে। কিন্তু বাঙলা ছবি এখন যে পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে এবং আরও বৃদ্ধি পাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে, পাকিস্থান বন্ধ হয়ে গেলে সবই যাবে রুদ্ধ হয়ে। শুধু এক পশ্চিম বাঙলা নিয়ে বাঙলা ছবি থেকে লাভ করাটা এমনি দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠবে যে বাঙলা ছবি শেষ পর্যন্ত হয়তো লোপ পেয়েই যাবে আর বাঙলা বাজারে হিন্দী ছবির একাধিপত্য অধিকার ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ বাঙলা ছবির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে হিন্দী ছবির বাজার বাঙলা দেশে যেভাবে সংকুচিত হয়ে আসছিলো এবং পাকিস্থানে বন্ধ হওয়ায় হিন্দী ছবি যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বাঙলা ছবির বিপর্যয়ে হিন্দী ছবি সেই ক্ষেত্র অধিকার করে তার ক্ষতির পরিমাণ অনেকখানি লাঘব করে নিতে পারবে। সুতরাং বাঙলা ছবিকে যদি বাঁচতে হয় এবং হিন্দী ছবির একচ্ছত্র আধিপত্য যদি রোধ করতে হয় তো বাঙলা ছবির ব্যবসায়ীরা যেন পূর্ব পাকিস্থান সরকারের সংগে দরকার হলে আলাদাভাবেই একটা কিছু বোঝাপড়া করে নেয়। মনে হয় শুধু বাঙলা ছবির বিষয় ধরলে পূর্ব পাকিস্থান সরকারের কাছ থেকে একটা বিশেষ কনসেশন পাওয়াও অসম্ভব হবে না—বাঙলা ছবির ব্যবসায়ীরা এই ধরণের কোন চেষ্টার দ্বারা তাদের বাজার আগেকার মতই রাখতে পারলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে, না হলে তো বাঙলা ছবির সম্পূর্ণ বিনাশ। হিন্দী ছবির সংগে জোট পাকিয়ে থাকলে বাঁচবার যদি কোন চারা না পাওয়া যায় তো তার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে বেঁচে ওঠার চেষ্টা করতে দোষ কী? আর এটা আশা করা বোধহয় অমূলক হবে না যে, শুধু বাঙলা ছবির বিষয় ধরলে পূর্ব পাকিস্থান সরকারের কাছ থেকে একটু বেশী সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনা পাওয়া বোধহয় সম্ভবও হতে পারে।

জুন মাসের মাঝে একদিন রূপক চিত্রাঞ্জলির প্রথম ছবি 'স্বস্ত্যয়ন'এর মহরৎ কার্য ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন প্রাক্তন সহকারী পরিচালক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাহিনী রচনা করেছেন নির্মল রায় চৌধুরী।

*    *    *    *

সুনন্দা ব্যানার্জীর প্রতিষ্ঠান এস বি প্রডাকসন্সের পরবর্তী ছবিখানি পরিচালনা করবেন নীরেন লাহিড়ী: নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর কাহিনীটি রচনা করছেন।

*    *    *    *

'প্রিয়তমা'ও 'অরক্ষণীয়া'র সাফল্যের পর পশুপতি চট্টোপাধ্যায় 'নীলদর্পণ' চিত্রায়িত করবেন বলে একটি পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। ইতিপূর্বে গত দু'বছরে আরও দু'জন 'নীলদর্পণ' তুলবেন বলে খবর বেরিয়েছিল কিন্তু পরে আর কিছু শোনা যায়নি।

*    *    *    *    *

পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত এম পি প্রডাকসন্সের পরবর্তী ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত আছেন।

*    *    *    *

কে সি দে প্রডাকসন্স এবার নারায়ণ গাঙ্গুলীর একটি কাহিনী অবলম্বনে তাদের পরবর্তী ছবি তুলবেন।

*    *    *    *

মণিপুরের মহারাজা শ্রীবোধচন্দ্র সিংহের

মণিপুর ফিল্ম করপোরেশনের 'মাইমুপেনচা' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় থাম্বল দেবী

পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত মণিপুর ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রথম ছবি 'মাইমুপেনচা'র মহরৎ কার্য গত ১৬ই জুন কালী ফিল্মস স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। ছবিখানি তোলা হচ্ছে হিন্দীতে এবং নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিমান ব্যানার্জী ও থাম্বল দেবী; পরিচালনা করছেন জ্যোতি সেন।

*    *    *

চিত্রশ্রী নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'চিতা বহ্নিমান' উপন্যাসখানির চিত্ররূপ দেওয়ার উদ্যোগ করেছেন।

*    *    *

বিভা ফিল্মস্ প্রডাকসন্স নামক একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ণ টকীজ স্টুডিওতে 'সাক্ষী গোপাল' নামে একখানি ছবি তোলা আরম্ভ করেছেন; এর কাহিনী সংলাপ গান রচনা করেছেন গৌর সী এবং পরিচালনায় আছেন চিত্ত মুখোপাধ্যায় ও গৌর সী; সুর-যোজনা বলাই চট্টোপাধ্যায়ের; আলোকচিত্র শচীন দাশগুপ্ত এবং অভিনয়ে আছেন মনোরঞ্জন, সুপ্রভা তুলসী অনুপ দুলাল, অমর, ঝর্ণা ফেলুবাবু, হারাধন, নগেন প্রভৃতি।

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড দলকে শোচনীয়ভাবে ৪০৯ রাণে পরাজিত করিয়াছে। পর পর দুইটি টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান দল বিজয়ী হওয়ায় সকলেরই ধারণা হইয়াছে "এসেজ কাপ" অষ্ট্রেলিয়ান দলই পাইবে। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইবে।

### খেলার বিবরণ

অষ্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ব্যাটিং লাভ করে। সূচনা বিশেষ ভাল হয় না। তবে দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়ান দল ৭ উইকেটে ২৫৮ রাণ করিতে সক্ষম হয়। বাম হাতের খেলোয়াড় মোরিস শতাধিক রাণ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার শত রাণ পূর্ণ করিতে তিন ঘণ্টা বাইশ মিনিট সময় লাগে। ১৯২৬ সালে ওয়ারেন্স বার্ডস্লে বাম হাতের খেলোয়াড় হিসাবে টেষ্ট খেলায় লর্ডস মাঠে শতাধিক রাণ করেন। ২২ বৎসর পরে মোরিস সেই গৌরব অর্জনে সক্ষম হইলেন।

দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বেই অষ্ট্রেলিয়ান দলের প্রথম ইনিংস ৩৫০ রাণে শেষ হয়। ট্যালন শেষ সময় ব্যাটিংএ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইংলণ্ড দল পরে খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৯ উইকেটে মাত্র ২০৭ রাণ করে।

তৃতীয় দিনের অল্প সময় খেলিয়া ইংলণ্ড দল ২১৫ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। অষ্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। দিনের শেষে ৪ উইকেটে ৩৪৩ রাণ হয়। বার্ণেস একাই ১৪১ রাণ করেন। ইহা ছাড়া ব্রাডম্যান, বার্ণেসও ব্যাটিংয়ে সাফল্য লাভ করেন।

চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের অল্প পর পর্যন্ত খেলিয়া অষ্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৪৬০ রাণ করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। ইংলণ্ড দল ৫৯৫ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। চতুর্থ দিনের শেষে

বাঙ্গালী এ্যাথলীট শ্রীমান সুবোধ সিংহ। ইনি বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভ্রমণ বিষয়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১০৬ রাণ হয়। কম্পটন ও ডোলারী নট আউট থাকেন। সকলেই কল্পনা করিতে থাকেন ইংলণ্ড দল পঞ্চম দিনে সারাদিন খেলিবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় না। অষ্ট্রেলিয়ান বোলার তোস্যাক বা শেষ দিনে মাত্র ৪০ রাণে ৫টি উইকেটের পতন সম্ভব করেন। ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৮৬ রাণে শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া খেলায় ৪০৯ রাণে জয়লাভ করেন।

খেলার ফলাফল :—

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস :—৩৫০ রাণ (মোরিস ১০৫, ব্রাডম্যান ৩৮, হ্যাসেট ৪৭, ট্যালান ৫৩, বেডসার ১০০ রাণে ৪টি, ইয়ার্ডলী ৩৫ রাণে ২টি ও কক্সসন ৯০ রাণে ২টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস :— ২১৫ রাণ (কম্পটন ৫৩, ইয়ার্ডলী ৪৪, লেকার ২৮, হাটন ২০, লিণ্ডওয়াল ৭০ রাণে ৫টি, জনষ্টন ৪৩ রাণে ২টি, জনসন ৭২ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস :—৭ উইঃ [illegible]০ রাণ (মোরিস ৬২, বার্ণেস ১৪১ ব্রাডম্যান [illegible], হ্যাসেট ৭৪, মিলার ৩২, ইয়ার্ডলী ৩৬ রাণে [illegible], লেকার ১১১ রাণে ২টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস :—১৮৬ রাণ (ওয়াসব্রুক ৩৭, কম্পটন [illegible], ডোলারী ৩৭, ইভান্স নট আউট ২৪, লিণ্ডওয়াল ৬১ রাণে ৩টি, তোস্যাক ৪০ রাণে ৫টি, জনষ্টন ৬২ রাণে ২টি উইকেট পান।)

### তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া দলের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ ৮ই জুলাই হইতে আরম্ভ হইবে। ইংলণ্ড দলের খেলিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ মনোনীত হইয়াছেন :—

ইয়ার্ডলী (অধিনায়ক), এড্রিচ, ওয়াসব্রুক, এমেট, কম্পটন, ডোলারী, ক্রাপ, ইভান্স, বেডসার, পোলার্ড, ইয়ং ও লেকার। কেন হাটন, রাইট ও

জো লুই বনাম জো ওয়ালকটের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় লুই একাদশ রাউণ্ডে ওয়ালকটকে নক আউটে পরাজিত করেন। ছবিতে নক আউটের পূর্বে লুই কিভাবে ঘুষি মারিয়াছিলেন, ওয়ালকটও কিভাবে ভূতলশায়ী হইয়াছিলেন—তাহা দেখা যাইতেছে।